শেক্‌স্‌পীয়র সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

756.3
0094

সম্পাদিকা : লীলা রায়

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বর্ষ-সূচী—২৯ বর্ষ : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		
অমলেন্দু বসু	শেক্সপিয়র চিন্তা দেশে দেশে (প্রবন্ধ)	৯
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	সনেট ৮ (অনুবাদ কবিতা)	৪০
	পথে নেমে মনে হল (কবিতা)	৪১৯
অনিলচন্দ্র রায়	বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	৮৯, ২৬৫
	হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	৪০৫, ৫৮১, ৭৫৯,, ৮৩২, ৯০৫, ৯৮৭
	নেতাজী সহ নমস্কার (কবিতা)	৭০৭
অনাথবন্ধু দত্ত	আদর্শ বাঙালী রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	১৫৯
অরবিন্দ ভট্টাচার্য	মেলা শেষ হ'ল (কবিতা)	২১৮
অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বর্গত শশিভূষণ (শ্রদ্ধাঞ্জলি)	২৪১
অপূর্ব বসু	সন্ধ্যা (কবিতা), দুই বিন্দু (কবিতা) গান করো, গান শুনি (কবিতা)	২৭৮, ৬৭২
অজয় ভট্টাচার্য	রাজপুত্র (ছোট গল্প)	২৭৯
অরবিন্দ গুহ	নিরুত্তাপ (কবিতা)	৪২২
অনিরুদ্ধ কর	কুয়োতলায় (কবিতা)	৪২৫
অসীম সোম	বাংলা ছবির বিবর্তন (প্রবন্ধ)	৫৪৫
অরিন্দম সেনগুপ্ত	ইউটোপিয়া ও বাস্তব : সভ্যতার সঙ্কট (আলোচনা)	৮৪৯
আ		
আর্যদেব	মেলাতলা (গল্প)	৬১৩
আশাপূর্ণা দেবী	ছোট সে তরী (গল্প)	৪২৭
আল মহমুদ	জাপানী আড্ডা (কবিতা)	৬৭২
ই		
ইরা সরকার	রাত্রিকে গ্রহণ করি (কবিতা)	৮২৮
	একগুচ্ছ (কবিতা)	৯৮৪
উ		
উমাপদ নাথ	রাতকে দেখলাম (কবিতা)	১০২
ক		
কেতকী কুশারী	শেক্সপিয়র সমালোচনা : বিভিন্ন শতকের দৃষ্টিভঙ্গী (প্রবন্ধ)	২০
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	সনেট ১৪১ (অনুবাদ কবিতা)	৩৯
	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (স্মৃতিতর্পণ)	৯৯
	দর্পণের কয়েকটি মুখ (কবিতা)	২৭৭
	নিজের কবিতার উদ্দেশ্যে (কবিতা)	৪১৬
	টি, এস, এলিয়ট : অনুচিন্তা (আলোচনা)	৮৩৭
কালীচরণ ঘোষ	আদর্শ মানব রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	১৬৫
	বিপ্লবীর ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৭২৩
কৃষ্ণ ধর	আমার ঈশ্বর ও তুমি (কবিতা)	৪১৭
কৃষ্ণা দাশগুপ্ত	টার্কো (অনুবাদ গল্প)	৯২৩
জেনারেল কাওয়াবে	আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযান (অনুবাদ সংকলন)	৭০৯

বর্ষ-সূচী—২৯ বর্ষ : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
কুমুদরঞ্জন দাস	পথ চলা (কবিতা)	৮৩১
ক্ষ		
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঘোষাল	শেকসপিয়র (প্রবন্ধ)	১
গ		
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	সনেট ৩৫ (অনুবাদ কবিতা)	২৬
	সংঘারাম (কবিতা)	৪১৯
	একটি নদীর নামে (কবিতা)	৯১২
	অন্তিম রৌদ্র (কবিতা)	৯১২
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	স্যার ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সংকলন)	৩১৯
গোপাল ভৌমিক	যুগযুগান্ত (কবিতা)	৪১৬
গোবিন্দ চক্রবর্তী	অন্যান্য কথা বল (কবিতা)	৫২৮
চ		
চিত্রভানু	আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (কবিতা)	৮২৮
	রৌদ্রের দাক্ষিণ্য (কবিতা)	৮২৮
জ		
জয়ন্ত দত্ত	কাচের জানালা (ছোট গল্প)	২১৯
জ্যোতির্ময় দত্ত	ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের মহাপ্রয়াণে (শ্রদ্ধাঞ্জলি)	২৩৯
জগন্নাথ চক্রবর্তী	এক বোবা রমণী ও দুটি মুখর অতিথি (কবিতা)	৪২৪
জয়দেব রায়	রবীন্দ্র সঙ্গীতে গায়কী (প্রবন্ধ)	৫৫৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার	দিল্লীতে বন ফুল (স্কেচ)	৬৬৭
ত		
তথাগত	একটি ঐতিহাসিক মৃত্যু (প্রবন্ধ)	১১০
দ		
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	সনেট ২৭ (অনুবাদ),	৪০
	নয়ানজী (কবিতা)	২৭৪,
	নীরবতা (কবিতা), রেপাবলিক (কবিতা)	৪১৮, ৬৭০
	চতুর্দশ নদী (কবিতা)	৯১৩
	একবার ঘুম ভেঙে যায় (কবিতা)	৯১৩
দিনেশ দাস	কালো অন্ধকার (কবিতা)	৪১৫
দুর্গাদাস সরকার	লোহার দরজা (কবিতা)	৪১৭
দিব্যেন্দু পালিত	সিঁদুরের দাগ (গল্প)	৫২৯
দর্শন সেন	মুখোশটা খুলে রাখ(কবিতা)	৬৭১
দীপংকর চক্রবর্তী	আমি আজিও সারারাত (কবিতা)	৯২৯
দিলীপ কুমার নন্দী	স্যার আশুতোষ : স্বপ্ন ও সাধনা (প্রবন্ধ)	৯১৯
ধ		
ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত	আচার্য শীলের প্রশ্নোত্তর (সংকলন)	৩২৩
ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই	বিষণ্ণ শীতের ঋতু (কবিতা)	৬৬৯
ন		
নচিকেতা ভরদ্বাজ	সনেট ৫১ (অনুবাদ)	৩৯
	রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	১৯১
	যুগান্তর (কবিতা)	৪১৮
নরেশ গুহ	রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপিয়র প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা (প্রবন্ধ)	৬১
নবেন্দু ঘোষ	একটি তেতো গল্প (গল্প)	৪৪৩
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	চাঁদফুলের শিকড় (গল্প)	৪৩৭
নীলিমা দাশগুপ্ত	হীরকের একটি স্বর্ণাভ বিকেল (গল্প)	৫১[illegible]
প		
পূর্ণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সনেট ৪৮ (অনুবাদ)	[illegible]
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	ভরা থাক স্মৃতিসুধায় (শ্রদ্ধাঞ্জলি)	২৪[illegible]
পবিত্র মুখোপাধ্যায়	শাশ্বতী (কবিতা), ট্রেন (কবিতা)	৩১৭, ৪২৫
	কৈশোরে অলৌকিক বুকের জন্যে বারবার (কবিতা)	৮০৩
	স্বরূপ (কবিতা)	[illegible]

বর্ষ-সূচী—২৯ বর্ষ : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রদিত রায় চৌধুরী	শিক্ষাব্রতিনী বিনোদিনী রায় চৌধুরী (জীবনী)	৫৩১
পরিমল রায়	শিক্ষকের মর্যাদা (প্রবন্ধ)	৩৯৫
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	কথোপকথন (কবিতা)	৪২৩
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	বেলাভূমি (গল্প)	৪৫৯
	ধলেশ্বরী (ধারাবাহিক উপন্যাস)	৫৩৯, ৬৫৭, ৭৫১, ৮৫৫, ৯৪৩
প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়	বামপন্থা ও প্রাণীজগৎ (প্রবন্ধ)	৫৩৯
প্রভাকর মাঝি	রাত্রিক নাটকে (কবিতা)	৫৯৭
ব		
বিকাশ দাস	একটি সনেট (কবিতা)	১০১
বিজয়কুমার দত্ত	অকারণে (কবিতা)	৯১১
বিনয়কুমার সরকার	আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা (জীবন-আলেখ্য)	৯৫
বিনোদ বেরা	অনুভব (কবিতা), পূর্বরাগ (কবিতা)	২১৮, ৮২৭
বুদ্ধদেব গুহ	ভুলে গেছি (কবিতা)	২৪৬
ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়	ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় কবি : চেরিল আনওয়ার (বিদেশী-সাহিত্য)	২৭৪
	ইহুদী সাহিত্যের পুনর্জন্ম ও আলাকিৎ রায় (বিদেশী সাহিত্য)	৬২৩
বিজনকুমার ঘোষ	ভালবাসা (গল্প), কান্না, (গল্প)	৩৩৯, ৫০৩
	জোয়ার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	৫৯৯, ৬৭৩, ৭৩১, ৮৪১, ৯৩২ ১০০৩
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আর এক আশ্রয়ের জন্য (কবিতা)	৪১৫
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	সমুদ্র (গল্প)	৪৭৭
বিভা সরকার	মুখর মর্মর (রম্য রচনা)	৫৪৯
বাসুদেব দেব	পুলিনের বীণা (কবিতা)	৫৯৭
	অনুভব সম্পর্কিত (কবিতা)	৯৮৬
বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন	দক্ষিণ ভারতের দেশে নয় মাস (প্রবন্ধ)	৭৪৩
ভ		
ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (জীবন আলেখ্য)	৩১৫
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	ছাত্র জীবনে সুভাষচন্দ্র (আন্তরিক চিত্র)	৭২১
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	সামান্য পথ অনেক দূর (নক্সা)	১০১১
ম		
মীরা বালসুব্রহ্মনিয়ন	একটি নায়কের জন্ম ও মৃত্যু (নক্সা)	১১৯
	ক্ষতি (গল্প)	৫৩৩
মন্মথনাথ সান্যাল	মাতৃপূজারী রামেন্দ্রসুন্দর	১৯১
মন্মথ দাশগুপ্ত	অপেক্ষা (কবিতা)	৪১৭
মণিভূষণ ভট্টাচার্য	বিজয়া (কবিতা), সন্ন্যাস (কবিতা)	৪১৯, ৬৭০
মানস রায় চৌধুরী	দিনযাপন (কবিতা)	৪২৫
	অনুচ্ছার তিনটি কবিতা (কবিতা)	৩১৪
মোহিত চট্টোপাধ্যায়	চৈত্রের উৎসব (কবিতা)	৪২৫
মিহির মুখোপাধ্যায়	ডানায় রৌদ্রের গন্ধ (গল্প)	৪৬৯
মঞ্জুলিকা দাশ	সুখ এবং আমি (কবিতা)	৮৩১
মণি মুখোপাধ্যায়	আকাশে বাজাবো (কবিতা)	৮২৯
র		
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	শিক্ষাপ্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	১৭৩
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	সতের বছরের কংগ্রেসী শাসন (প্রবন্ধ)	৩৬৩
রত্নেশ্বর হাজরা	হৈমন্তী (কবিতা)	৫৯৮
রথীন্দ্রনাথ রায়	কবি কামিনী রায় (জীবনী)	৬৪১
রমেন্দ্রলাল রায়	বাস্তুহারা (কবিতা)	৭৯০

বর্ষ-সূচী—২৯ বর্ষ : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্র গুহ	ঈশ্বরের আশ্রয়ে (কবিতা),	
	অনর্থ (কবিতা)	৮৩০, ৮৩০
রাখাল দত্ত	এবারের বাজেট	৯০১
ল		
লীলা রায়	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায় (আলোচনা)	৭১৯, ৮১৩, ৮৮৩, ৯৬৩
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	সনেট ৫৫ (অনুবাদ)	২৭
	তুমি শিল্প (কবিতা),	৩১৪,
	পার্কের দুপুর (কবিতা),	৪২১
	মনোরমা শুধু নাম (কবিতা)	৬৭১
	দশ বছর (কবিতা)	৯৭৫
	জ্বর (কবিতা)	৯৮৫
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	বিবেকানন্দ গবেষণার নয়া দিক (আলোচনা)	২৮
শান্তি লাহিড়ী	ভাসান (কবিতা),	২৭৮,
	প্রিয়তমা (কবিতা)	৪১৮
শচীন্দ্রনাথ বসু	ভাবীসমাজের ভাবনা (প্রবন্ধ)	৪১১
শান্তশীল দাস	জীবনের জয় (কবিতা)	৪২০
	হে দুর্গম, হে নির্ভীক (কবিতা)	৭৮৯
শিশিরকুমার দাশ	কলসীতে ফিরে (কবিতা)	৪২২
শোভন সোম	এই মধ্য বেলা (কবিতা)	৪২২
	স্বপ্নে ছোট্ট হাত (কবিতা)	৯১২
	অভিমান (কবিতা)	৯১২
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	তুমি কি আমার চেয়েও বড় (কবিতা)	৪২৫
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	চাঁদ (গল্প)	৪৫১
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	ভুল (গল্প)	৫০৯
শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য	রাসবিহারী বসু ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (প্রবন্ধ)	৭৬১
স		
সরোজেন্দ্রনাথ রায়	শেকস্পিয়র প্রতিভা (প্রবন্ধ)	১৫
	ভোজন সংকট (প্রবন্ধ)	৩৯১
সুকান্ত ভট্টাচার্য	সনেট ১ (অনুবাদ)	২৬
	দেবযানী কাহিনী (কবিতা)	৪১৫
সন্তোষ দাস	বসন্ত আসবেই	৯৮৪
সলিল গঙ্গোপাধ্যায়	কুমুদরঞ্জনের কাব্য রীতি (আলোচনা)	৯১৫
সুরজিৎ দাশগুপ্ত	আসল ও নকল (আলোচনা)	৪১
সুকুমার দত্ত	পূর্ব এশিয়া পরিক্রমা (ধারাবাহিক ভ্রমণ)	৫১, ১৩৯, ২৫৫
	আচার্য রামেন্দ্র সুন্দরের সঙ্গে তিন বৎসর (স্মৃতিকথা)	১৮২
সুনীল দাস	মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট (প্রবন্ধ)	১০৫
	মূল্য ও খাদ্য সংকট (প্রবন্ধ)	২৪৭
সুখেন্দু মল্লিক	বিষণ্ণতার জন্য (কবিতা)	১০২
সতীশরঞ্জন খাস্তগীর	পদার্থ বিজ্ঞান ও রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	১৮৭
সুশান্ত বসু	সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	১৯৮
সমর গুহ	ঘনায়মান দুর্যোগ (রাজনৈতিক পর্যালোচনা)	৩০৪
	ক্রুশ্চভপতন, বিশ্ব কম্যুনিজম ও ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ),	৫৭৩
	স্বাধীনতা ও সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৭৯১
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জগৎ (প্রবন্ধ)	৩৭৩

বর্ষ সূচী—২৯ বর্ষ : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সত্যেন্দ্রনাথ সেন	পরিকল্পনা ও বর্তমান মুদ্রাসংকট (প্রবন্ধ)	৩৮৫
সন্তোষ আচার্য	আন্তরিক প্রতিবিম্ব (গল্প)	৪৮৫
	রক্ত সূত্র (গল্প)	১০০১
সুনীল বসু	স্বপ্নের ভিতরে (কবিতা)	৪২১
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	স্বপ্ন সংসার (কবিতা)	৪২৩
সুনন্দা দাশগুপ্ত	সীতাহরণ পালা : ১৩৭১ (কবিতা)	৪২৪
সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	সেতু, শঙ্খ, সমুদ্র (গল্প)	৪৯১
স্নেহাকর ভট্টাচার্য	বিপন্ন স্মৃতির বেলা (কবিতা)	৫৯৭
	সৃষ্টির আরম্ভে ছিল (অনুবাদ কবিতা)	৯৮৬
সরল কুমার চট্টোপাধ্যায়	ম্যাক্স ওয়েবার ও তাঁর চিন্তাধারা (প্রবন্ধ)	৬০৫
সুধীরকান্ত গুপ্ত	মাদমোয়াজেল প্যান’ (অনুবাদ গল্প)	৬৮১
হ		
হরেন্দ্রনাথ সিংহ	শেষ রহস্য (কবিতা)	৪২৫
হেনা হালদার	সমস্ত নিভন্ত স্বপ্ন (কবিতা)	৮২৭
সম্পাদকীয়		৭৫, ৮১, ১৫১, ২৩১, ২৯৯, ৫৬৮, ৬৩৩, ৭৯৯, ৮০৫, ৮৭৫, ৯৫৫
বিশ্বাবর্ত		৭০, ১৪৭, ২২৭ ২৯৪, ৩৫৭, ৫২৬, ৭০১, ৯৫১,
পুস্তক পরিচয়		৬৫, ১৫৯, ২২৩, ২৮৭, ৩৪৭, ৬১০, ৬৯৫, ৮৬৪, ১০২২
বিবিধ	এই কালের নৈতিকতা (অনুবাদ প্রবন্ধ)	৩৫৫
	শারদীয়া ১৩৭১	৩৬১

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

শেক্স্পিয়ার

ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঘোষাল

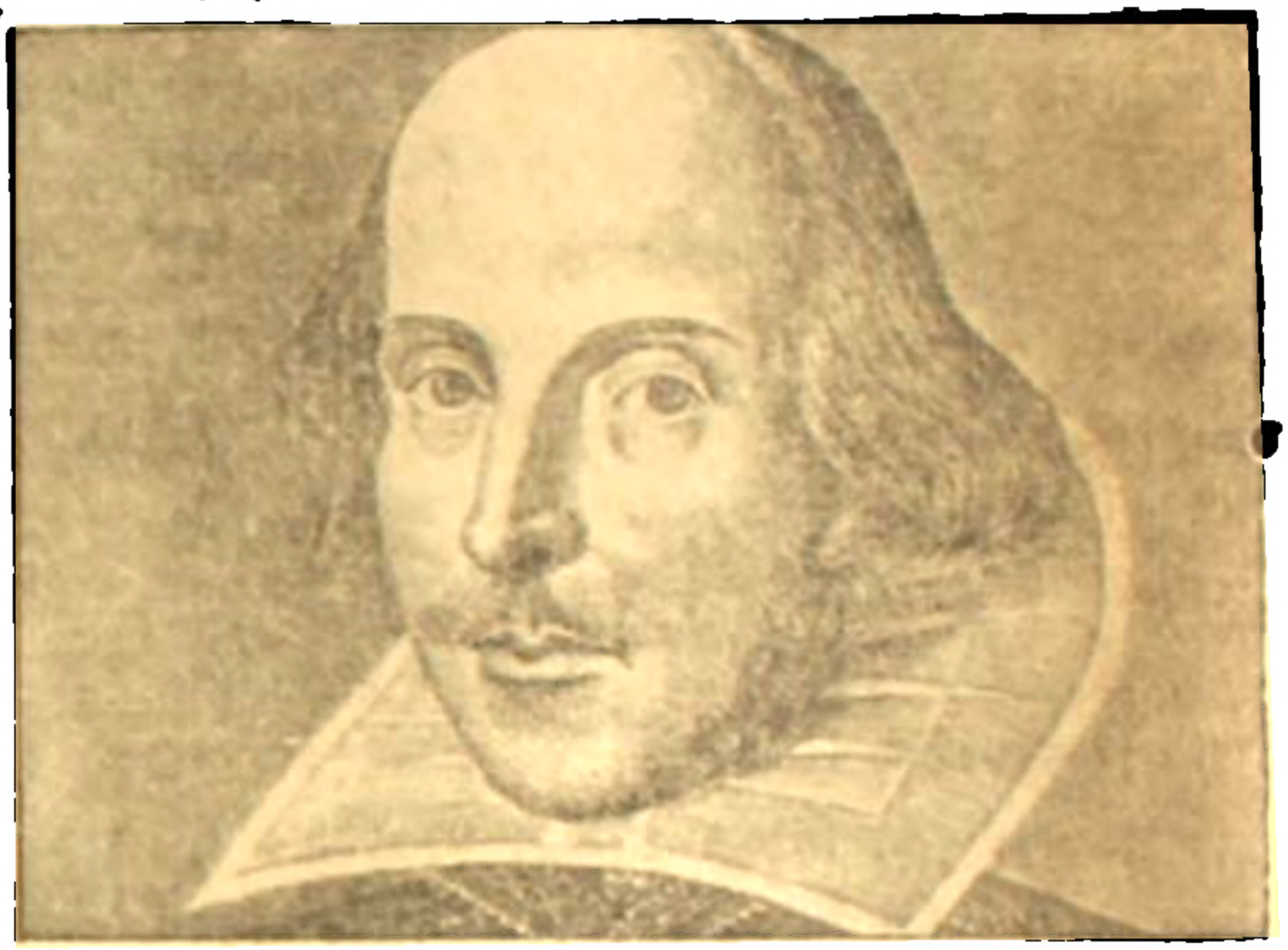

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার উইলিয়াম শেক্স্পিয়ার যাঁর চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী মহা উদ্দীপনা এবং সমারোহের সঙ্গে বিশ্বের সর্বত্র এখন উদ্‌যাপিত হচ্ছে, ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে[1] এপ্রিল ইংলণ্ডের ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টির স্ট্র্যাট-ফোর্ড-আপন-এ্যাভন নামক ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তৃতীয় সন্তান। পিতা জন শেক্স্পিয়ার ব্যবসায়কর্মে এক সময়ে বেশ অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের বহু উচ্চ দায়িত্বের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সচ্ছলতা স্থায়ী হয়নি। শেক্স্পিয়ারের বাল্যকালেই তাঁর পিতার ব্যবসায়ে অবনতি সুরু হয়। অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে স্থানীয় গ্রামার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য হন বলে একটা কিংবদন্তী আছে। শেক্স্পিয়ারের মাতা মেরী আর্ডেন নিকটবর্তী একটি গ্রামের অবস্থাপন্ন ও মর্য্যাদাশীল একটি রোমান ক্যাথলিক পরিবারের কন্যা ছিলেন। শেক্স্পিয়ারের পিতাও সম্ভবতঃ ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন,—অন্ততঃ সমকালীন গির্জার নথিপত্র থেকে এরকম একটা সন্দেহ জাগে।

শেক্স্পিয়ার খুব অল্প বয়সেই বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো এবং তাঁর স্ত্রী এ্যান হ্যাথাওয়ের বয়স ছাব্বিশ। মাত্র একুশ বছর বয়সেই তিনটি সন্তানের পিতা হয়ে শেক্স্পিয়ার উপার্জ্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েন এবং ক্রমে লণ্ডনে এসে একটি নাট্য সংস্থায় যোগ দেন। অভিনেতা, নাট্যকার এবং প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এই ত্রিবিধ ভূমিকাতেই আমরা তাঁকে লণ্ডনে দেখতে পাই। কিন্তু কী

১। শেক্স্পিয়ারের জন্ম তারিখের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। স্ট্র্যাটফোর্ড গির্জায় তাঁর ব্যাপ্টিজমের (baptism) তারিখ লিখিত আছে ২৬শে এপ্রিল, ১৫৬৪। এ থেকে অনুমান করা হয় যে তাঁর জন্ম তারিখ ২৩শে এপ্রিল হওয়াই সম্ভব।

ভাবে তিনি নাট্যরচনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার উদ্যোগ পর্ব্বের কোনো দিক্ নির্দ্দেশ আমরা পাই না।

নাট্যকার হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাই ১৫৯২ সালে। তাও প্রত্যক্ষ উল্লেখ নয়, সমসাময়িক অপর নাট্যকারের বিদ্বিষ্ট আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হিসাবেই এই তির্য্যক্ উল্লেখ তাঁর সম্বন্ধে। রবার্ট গ্রীন নামে একজন নাট্যকার "গ্রোট্স ওয়ার্থ অফ উইট" নামক পুস্তিকায় শেক্স্‌পিয়ারকে ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক ইত্যাদি নানা গালগালিতে ভূষিত করে। এবং শেক্স্‌পিয়ারের "হেনরি দি সিক্স্‌থ্" নাটকের তৃতীয় পর্ব্ব থেকে একটি লাইনের প্যারডি করে এবং শেক্স্‌পিয়ারের নামেরও প্যারডি (শেক্‌সিন) করে পাঠকদের স্থূল ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় এ আক্রমণের লক্ষ্য কে। এই আক্রমণে শেক্স্‌-পিয়ার কতটা হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তা আমরা জানি না, তবে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই সময়ের মধ্যেই নাট্যকার হিসাবে কবি নিজেকে লণ্ডনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর এই প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক নাট্যকারদের প্রভূত ঈর্ষার কারণ হয়েছে। এই ঈর্ষার আর একটি কারণ শেক্স্‌পিয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়ের-সংস্পর্শরাহিত্য। রেনেসা-ন্সের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যে কয়জন নাট্যকার তখন ইংলণ্ডে নতুন নাট্যযুগের সূচনা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপমারা। তাঁদের বলা হোত "ইউনিভার্সিটি উইট্স্"। ওদিকে শেক্স্‌পিয়ার বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাই সমাপ্ত করেন নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোনো তো দূরের কথা। তা ছাড়া ইউনিভার্সিটি উইট্স্‌রা অভিনেতা-দের ঘৃণাও করতেন। অভিনেতা হিসাবে তাঁরা কেউ কোনো নাট্য সম্প্রদায়ে যোগ দেবার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। এদিকে শেক্স্‌পিয়ার একজন সামান্য অভি-নেতা হয়ে নাট্যকার হয়ে উঠেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত নাট্যকারদের খ্যাতি ম্লান করে দিচ্ছেন, এটা তাঁদের স্বভাবতঃই দুঃসহ বোধ হচ্ছিল।

১৫৯২'র পর থেকে কিন্তু নাট্যকার, অভিনেতা ও কবি হিসাবে শেক্স্‌পিয়ারের উল্লেখ অসুলভ নয়। তাঁর বহু নাটক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং সে কারণে মুদ্রিত নাটক হিসাবেও প্রকাশিত হয়। কয়েকটি নাটকের—যেমন হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েট—জনসাধারণের অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে চোরাই প্রকাশ ঘটে। ১৫৯৩ ও ১৫৯৪ সালে শেক্স্‌পিয়ারের দুখানি কাব্যগ্রন্থ "ভেনাস এ্যাণ্ড এ্যাডোনিস" এবং "রেপ অফ লুক্রিস্" পর পর প্রকাশিত হয়। এ দু'খানি কাব্যই আর্ল অফ সাদাম্পটনকে উৎসর্গিত। কাব্য ও নাট্যকার হিসাবে শেক্স্‌পিয়ারের উৎকর্ষ যে তাঁর প্রতি অভিজাত শ্রেণীর মনোযোগ ও আনুকূল্য ক্রমেই আকর্ষণ করছিল তাতে ভুল নেই। তাই যখন দেখি যে ১৫৯৬ সালে কবি তাঁর পিতা জন শেক্স্‌পিয়ারের জন্য "জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান" এই কৌলিক রাজ-সম্মানের অধিকার অর্জ্জন করছেন তখন আমরা খুব বিস্মিত হই না।

প্রথম পর্ব্বের নাটকের মধ্যে যে তিনখানি নাটক লণ্ডন নাট্যরসিকদের চিত্ত জয় করে তা' হোল "রিচার্ড দি থার্ড", "টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস" ও "রোমিও-এ্যাণ্ড-জুলিয়েট"। এ তিনখানি নাটকের উৎকর্ষ কিন্তু সমান নয়। "টিটাস এ্যাণ্ড্রো-নিকাসের" জনপ্রিয়তা আমাদের বিস্মিতই করে।

মধ্য পর্ব্বের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে "হেনরি দি ফোর্থ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে—এবং এখনো সমান জনপ্রিয়—অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি "ফলষ্টাফ"-এর জন্য। শেক্স্‌পিয়ারের পরিণত কমেডি-গুলি, যেমন—"মাচ এ্যাডো", "এ্যাজ ইউ লাইক ইট", "টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট"—তাদের বাক্‌বৈদগ্ধ্য, সুকুমার রোমান্টি-কতা, অদ্ভুত হাস্যকর ঘটনা সংস্থান এবং ঈষৎ বিষাদের সুরের প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনায় এখনো পৃথিবীতে অতুলনীয়।

কিন্তু শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং নাট্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষস্থল তাঁর পরিণত ট্র্যাজেডিগুলি : "হ্যামলেট", "ওথেলো",

"লীয়ার", "ম্যাকবেথ", "কোরিওল্যানাস"। এগুলি তাঁর পরিণত জীবন জিজ্ঞাসার ফল এবং চূড়ান্ত শিল্পসিদ্ধিরও সার্থক নিদর্শন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ কোন দুর্দ্দৈবের বশে পাপ, দুষ্কৃতি ও প্রলোভনের চক্রান্তের মধ্যে পড়ে কেমন করে' ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়, তার তীব্রতম দুঃখ ও যাতনার ভীষণ সুন্দর চিত্র এই ট্র্যাজেডিগুলি। বিশ্বসাহিত্যে এরা অনুপম। এই ট্র্যাজেডি পর্ব্বে শেকসপিয়ার যেন মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই মনোভাবের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখি "টাইমন অফ এথেন্স" নাটকে। মানুষের হীনতা ও কুৎসিত নীচতার উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্ত অভিশাপ বর্ষণ করে' (মানবপ্রেমী থেকে রূপান্তরিত) চরম-মানবদ্বেষী টাইমন মানবসংসর্গ ত্যাগ করে আমৃত্যু আত্মনির্বাসিত অরণ্য জীবন যাপন করছে, হিংস্র মানববিদ্বেষ ও ঘৃণাকে লালন করে' এ চিত্র যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি নিরন্ধ্র অসাচ্ছন্দ্য ও শ্বাসরোধক। কবিই যেন এই টাইমন। মানুষের প্রতি ঘৃণায় তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, উন্মত্ত ধিক্কারে তিনি মানব সংসারের সমূহ বিনষ্টি কামনা করছেন!

এর পরই, এই আত্মহননের চরম পর্য্যায় অতিক্রম করে, কবি পুনরায় আত্মস্থ হলেন। ফিরে পেলেন মানুষের প্রতি তাঁর হারানো বিশ্বাস, হারানো আনন্দ। নবীন জীবনের নিষ্পাপ শুভ্রতা ও নবীন প্রেমের নিষ্কলুষ সরলতায় পেলেন তিনি মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত, মানুষের পাপক্ষালনের মন্দাকিনী নির্ঝর। তাঁর শেষের নাটকগুলির আখ্যান বস্তুর উপজীব্য এই সত্যেরই উপলব্ধি, এই আশ্বাসই ঘোষিত হচ্ছে সব কয়টিতে। শেষের এই নাটকগুলির মধ্যে "এ উইন্টারস্ টেল" ও "দি টেম্পেস্ট"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে' স্বীকৃত। অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি বাদ দিলে টেম্পেস্টই শেকসপিয়ারের নাট্যকলার চরমোৎকর্ষ। কিন্তু আশ্চর্য্য! এখানে পৌঁছেই কবি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নাট্যলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। টেম্পেস্টে প্রস্পেরোর যাদুদণ্ড ভগ্ন করার ও যাদুবিদ্যা বর্জ্জনের সিদ্ধান্তকে অনেকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা করে' থাকেন। এর পর শেক্সপিয়ার ফিরে এলেন তাঁর স্বগ্রামে, স্বগৃহে। বিশ বছর কালের মধ্যে বিশ্বনাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে সাঁইত্রিশ খানি অমূল্য নাটক উপহার দিয়ে এই অক্লিষ্টকর্ম্মা নাট্যকার জীবনের শেষ চার বছর অতিবাহিত করলেন গৃহমণ্ডলের স্নেহ, প্রেম, সেবা ও শান্তির নিভৃত বলয়ে। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল[1] শেক্সপিয়ার পরলোকগমন করেন।

বিশ্বের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিভার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কতো সামান্যই জানি! অথচ সে-যুগের তুলনায় খুব সামান্যও নয়। সমকালীন বহু নাট্যকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো সীমাবদ্ধ। যে-উপাদান আমাদের হাতে আছে তা থেকে স্থানে কালে ও পরিবেশে বিধৃত একটি মানুষের রেখাঙ্কিত চিত্র আমরা পাই। সে-চিত্র বর্ণাঢ্য না হতে পারে কিন্তু তার পরিলেখ অপরিস্ফুট নয়। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ-চিহ্নিত। লণ্ডনে তাঁর, নট, নাট্যকার ও নাট্যসংস্থার অংশীদারের ত্রিবিধ ভূমিকাও অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণে বিধৃত। নাট্যকার রূপে তাঁর সাফল্য অর্জ্জন, তাঁর নাট্যসংস্থার ক্রমোন্নতি, তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন, এ সবের নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। তৎকালে প্রকাশিত তাঁর নাটক ও কাব্য পুস্তক এখনো সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। তাঁর ও তাঁর লেখা সম্বন্ধে সমসাময়িক সাধারণ ও অসাধারণদের উক্তি ও মন্তব্যের পরিমাণও খুব নগণ্য নয়। মৃত্যুর পূর্বে

১। এ তারিখটিও অনুমান। তাঁর শেষকৃত্য নিষ্পন্ন হয়েছিল ২৫শে এপ্রিল, ১৬১৬, স্ট্র্যাটফোর্ড গির্জার খাতায় এ কথা লিপিবদ্ধ আছে। এ থেকেই অনুমান করা হয়, ২৩শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু দিবস। জন্মদিন ও মৃত্যুদিবসের তারিখের অভিন্নতা খুবই নাটকীয়। এই নাটকীয় আবেদনও হয়তো এই তারিখটির নির্বাচনকে প্রভাবিত করে থাকবে।

সম্পাদিত তাঁর উইলও তাঁর অস্তিত্বের অসংশয়িত প্রমাণ বহন করছে।

তাই আজ যদি একথা কেউ বলেন যে শেক্‌স্‌পিয়ার বলে প্রকৃত কেউ ছিলেন না, ওটা একটা ছদ্ম নাম মাত্র, তা যেমন হাস্যকর ছেলেমানুষী উক্তি; তেমনি শেক্‌স্‌পিয়ার আসলে ইংরেজ ন'ন, অন্যদেশীয় (জর্মান, রাশিয়ান বা অন্য কোনো) এক লেখকের নামের অপভ্রংশ সংস্করণ মাত্র, একথাও সেইরূপই অশ্রদ্ধেয়। আবার শেক্‌স্‌পিয়রের অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে, তাঁকে তাঁর নাটকের স্রষ্টারূপে সম্মান না দেওয়া তাঁকে বেকন বা আর্ল অফ অক্সফোর্ড বা মার্লোর বেনামদার বলে' কল্পনা করাও যুক্তিসহ নয়। ব্যক্তি শেক্‌স্‌পিয়ারের অস্তিত্বও যেমন অনস্বীকার্য্য, তাঁর নাট্যকার স্বরূপও তেমনি। এত সব সাক্ষ্যপ্রমাণকে অস্বীকার ক'রে, যুক্তির অদ্ভুত ঊর্ণাজাল বিস্তার ও চাতুর্য্যের মরীচিকা রচনা আমাদের বিস্মিত করে সত্য কিন্তু বিন্দুমাত্রও আমাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হয় না।

তবু একথাও সত্য যে এখনো শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনের অনেক অধ্যায় সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এবং তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধেও তাঁর রচনাবলীর পরোক্ষ সঙ্কেত ছাড়া প্রত্যক্ষ বিশেষ কোনো অভিজ্ঞান আমাদের হাতে এখনো আসেনি। যে-বয়সে মানুষ জীবনের বহুমূল্য অভিজ্ঞতাগুলি অর্জ্জন করে সেই পরম গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি, তাঁর জীবনের কুড়ি থেকে আটাশ বছর, শেক্‌স্‌পিয়ার কোথায় কী ভাবে, কোন্ কোন্ বিচিত্র মানুষ ও অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করলেন, কাব্য ও নাটকরচনায় তাঁর শিক্ষানিবিশীর সূত্রপাত কোথায় হোল এবং কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে তা অগ্রসর হয়েছিল, এসব তথ্যের পদচিহ্ন এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। যখন তাঁকে আমরা প্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখে দেখতে পাই তখন তিনি প্রায়-পূর্ণ প্রস্ফুটিত কাব্য নাট্যকার, বয়স আটাশ।

রচনাবলীর সাক্ষ্যও ঝাপ্‌সা। শেক্‌স্‌পিয়ার মূলতঃ নাট্যকার। নাটকের বস্তুকেন্দ্রিক শিল্পপদ্ধতির মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তি সত্তার প্রকাশের অবসর কম এবং ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। এবং প্রায় সর্ব্বদাই তা ঘটে পরোক্ষভাবে, লেখকের প্রায় অজ্ঞাতসারেই, এবং তা-ও এত সূক্ষ্ম যে তা দিয়ে তাঁর জীবনীর ফাঁক ভরানো চলে না। আখ্যান কাব্যের ক্ষেত্রেও সমস্যাটা অনুরূপ। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ার নাটক ও আখ্যান কাব্য ছাড়াও ১৫৪টি সনেটরূপ গীতিকাব্য লিখেছিলেন। এই সনেটগুলি ১৬০৯ সালে কবির বিনা অনুমতিতে চোরাই সংস্করণে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী কাব্য সহিত্যে এই সনেট গুলির স্থান শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ে। অধিকাংশ সমালোচকই বিশ্বাস করেন যে এই সনেটগুলিতে কবির অন্তর্জীবনের একটি আলেখ্য বিধৃত আছে। তীব্র বেদনাময় একটি প্রণয়লীলার আকর্ষণ বিকর্ষণের, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের একটি করুণ ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ। কবির এক তরুণ বন্ধু এবং কবির প্রণয়িনীকে অবলম্বন করে এই ট্র্যাজেডি। কে এঁরা, কে এই রহস্যময়ী নারী, এই সনেটগুলিতে যাঁকে "ডার্ক লেডি"—কৃষ্ণাঙ্গী, কৃষ্ণাক্ষী, কৃষ্ণকেশী—বলা হয়েছে, কবির প্রেম ও ঘৃণাকে যে সমান বেগে আকর্ষণ করেছে কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেয় নি?

এই রহস্যময়ীকে নিয়ে অজস্র লেখক গবেষক অনেক গভীর চিন্তা ও চতুর অনুমান আশ্রয় করে অনেক লেখা লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন। কিন্তু এঁর রহস্য এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। বার্নার্ড শ' তাঁর "দি ডার্ক লেডি অফ্ দি সনেট" নাটিকায় মেরী ফিটন নামে রাণী এলিজাবেথের একজন অভিজাত সঙ্গিনীকে এই "ডার্ক লেডি" বলে কল্পনা করেছেন। তখন ঐ অনুমান চলিত ছিল। এখন দীর্ঘকাল আর নেই। কিন্তু তবু ডার্ক লেডির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে শেক্‌স্‌পিয়রের অনেক নাটকেই কৃষ্ণকেশী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃষ্ণাক্ষী নায়িকার বারে বারে আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথম দিকের নাটক "লাভস্‌ লেবারস্‌

লষ্ট" য়ের রোজালিন (Rosaline) থেকে শেষের দিকের নাটক "এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা"র ক্লিওপেট্রা পর্যন্ত। এই নায়িকারা সকলেই সুচতুরা এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্য নিপুণা। এ থেকে বাস্তবজীবনে ডার্ক লেডির অস্তিত্ব ও ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধে একটা অনুমান অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

প্রাত্যহিক জীবনে কবি কেমন মানুষ ছিলেন, ব্যবহার মধুর অথবা কর্কশ, সুদূর অথবা ঘনিষ্ঠ, কৃপণ অথবা উদার ছিল এ বিষয়ে খুব বেশী তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে সামান্য যা আছে তা থেকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যে কবির ব্যবহার ছিল মধুর, ভদ্র, অকপট ও আন্তরিক। সঙ্কীর্ণচিত্ত ও কৃপণ ছিলেন না তিনি। বন্ধু বান্ধবদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছেন, দিয়েছেন সাহচর্য ও আনন্দ। দম্ভ ও অহঙ্কার, বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার লেশ মাত্র ছিল না তাঁর স্বভাবসীমায়। তাঁর সম্বন্ধে একটা উক্তি আমাদের বারে বারে চোখে পড়ে: তিনি ছিলেন 'gentle' বা স্বভাবতঃই শান্ত ও ভদ্র। যে ব্যক্তিত্ব উগ্র নয়, অসহিষ্ণু নয়, যা আঘাত করে না, যা সহজ ও সদয় এবং অপরকে সহজ হতে অবকাশ দেয়, আহ্বান করে, সেই ব্যক্তিত্বই ছিল কবির। তাই মানুষকে তিনি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে পেরেছিলেন, মানবজীবনের সকল দিক তাঁর অবারিত দৃষ্টিতে এমন ধরা দিয়েছিল, তার সব ঐশ্বর্য ও কুশ্রীতা নিয়ে।

কবির আজকের এই জগৎজোড়া খ্যাতি কিন্তু একদিনে হয়নি। তাঁর জীবিতকালে তাঁর খ্যাতি ইংলণ্ডের দ্বীপসীমাও অতিক্রম করেনি। এমন কি তাঁর মৃত্যুকালে অধিকাংশ ইংরাজ তাঁকে সে সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে' মনে করতেন কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য ১৫৯৮ সালে প্রকাশিত "প্যালাডিস টেমিয়া" গ্রন্থে তাঁর কাব্য ও নাটকের খুবই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে; কিন্তু তারই চৌদ্দবছর পরে নাট্যকার ওয়েবষ্টার সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের সপ্রশংস উল্লেখ করে সেই সঙ্গে শেক্সপিয়রের যে তাচ্ছিল্যপূর্ণ উল্লেখ করেছেন তা থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে শেষের দিকে নাট্যকার হিসাবে শেক্সপিয়ার তাঁর পূর্ব্বের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই হারাচ্ছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণই এই যে তা ক্রমে সাময়িক ফ্যাশনের নাগরদোলার উঠতি পড়তি অতিক্রম করে আপনার স্থায়ী মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেক্সপিয়রের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে কবি ড্রাইডেন শেক্সপিয়রের নাটক বিচার করে তার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আপনার বলিষ্ঠ মত ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মনীষীগণের কণ্ঠে শেক্সপিয়রের জয়ধ্বনি বার বার ঘোষিত হয়েছে। সেই ঘোষণা এখনো তেমনি দৃপ্ত, তেমনি শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ।

অষ্টাদশ শতক থেকেই শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত হয়েছে শুধু ইংলণ্ডে নয়, জার্মানীতেও। জার্মানীর রোমান্টিক আন্দোলনের মূলে শেক্সপিয়রের নাটকের প্রভাব বিপুলভাবে কাজ করেছে। ফ্রান্স কিন্তু প্রথমে শেক্সপিয়ারকে গ্রহণ করেনি, নিন্দা করেছে। ফ্রান্সের ক্লাসিক ঐতিহ্যের বিপরীতধর্মী এই নাট্যকারকে তারা অমার্জ্জিত ও অদ্ভুত বলে উপহাস করেছি। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে রোমান্টিক আন্দোলন ফ্রান্সেও বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করলো তার পতাকায় শেক্সপিয়ারেরই নাম চিহ্নিত ছিল। এবং শেক্সপিয়ারের নাটকের অনুপ্রেরণায় এই আন্দোলন ফ্রান্সেও ক্রমে জয়যুক্ত হোল।

উনিশ শতকে রোমান্টিকতার প্রাবল্যে শুধু ইংলণ্ডে নয়, সারা ইয়োরোপেই শেক্সপিয়ার-পূজার এক অভূতপূর্ব্ব মনোভাব ব্যাপক হয়ে ওঠে। এই মনোভাবের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হলেন কোলরিজ। তাঁর মতে শেক্সপিয়ার হলেন এমন এক দৈবী প্রতিভা যে সাধারণ মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতার স্পর্শরহিত তাঁর মহিমা ভীত-বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুধাবনীয়। অপরাপর লেখকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিচার রীতিও তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। "Assuredly that criti-

cism of Shakespeare will alone be genial which is reverential"—বল্লেন কোলরিজ। কার্লাইল বল্লেন, শেক্‌স্‌পিয়ার একজন দৈবপ্রেরিত পুরুষ, মহান প্রফেট। এই রোমান্টিক আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই সুরু হোল, গতশতাব্দীর শেষে। সুরু হোল শেক্‌স্‌পিয়ারকে একজন পরমকৌশলী জনগণের মনোরঞ্জক, স্রোতের অনুকূলে সাঁতার দেওয়ার বিদ্যায় পারঙ্গম নাট্যকার রূপে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা। বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য, শেক্‌স্‌পিয়ারকে বহুদিকদিয়ে দেখবার এবং বোঝবার চেষ্টা। একদিকে যেমন তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর যুগের ও জগতের পরিপ্রেক্ষিত বস্তুনিষ্ঠ বিচার করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর নাটকের ধ্বনি, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা ও কাব্যময়তার গভীর বিশ্লেষণ চলেছে। সব বিচারেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অসংশয়িতরূপে স্বীকৃত হচ্ছে, কিন্তু উনিশশতকী ভাববিহ্বল উপাসক মনোবৃত্তি এ যুগে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

এই সর্ব্বব্যাপী শেক্‌স্‌পিয়ার চর্চ্চার ফসল যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র। অনেক নতুন দিকদিয়ে, নতুন পদ্ধতিতে, নতুন দৃষ্টিকোন থেকে কবিকে আমরা এখন দেখতে শিখেছি। যেমন, একটা পরম মূল্যবান দৃষ্টিকোণের উল্লেখ করা যেতে পারে : এলিজাবেথীয় যুগের রঙ্গমঞ্চের পুনরাবিষ্কার এবং সেই যুগের বিরল-সজ্জা মঞ্চে, তৎকালীন প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বনে শেক্‌স্‌পিয়ারকে পরিবেশন। এর দ্বারা শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকের কতো দিকের কতো যে সম্পদ আমাদের চোখে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শেক্‌স্‌পিয়ারের সাহিত্যিক উৎকর্ষই এতদিন উদ্‌গীত হয়েছে, মাঞ্চিক দিকের তুলনায়। এখন কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারের মূল্যায়নে রঙ্গমঞ্চের স্থান, মূল্য ও মর্য্যাদা যথাযথ নিরূপিত হচ্ছে। সে স্থান মুদ্রিত ও পঠনীয় শেক্‌স্‌পিয়ারের তুলনায় হীন নয়। এবং এ-যুগের বিশ্বাস যে দুয়ের সমবায়েই শেক্‌স্‌পিয়ারের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব, অন্য উপায়ে নয়।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

DIPTI

more than a household name

The Trade name Dipti is a hall mark of quality. Dipti Lanterns can easily be claimed as one of the most popular household articles throughout India. Khas Janata Kerosene Cookers have earned great popularity as indispensable household utility; simple in operation, sturdy in construction and remarkable in performance. these Kerosene Wick Cookers help you save time and fuel. Dipti enamel wares - proud addition to the existing range of Dipti products.

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD.

77, Bowbazar Street, Calcutta-12.

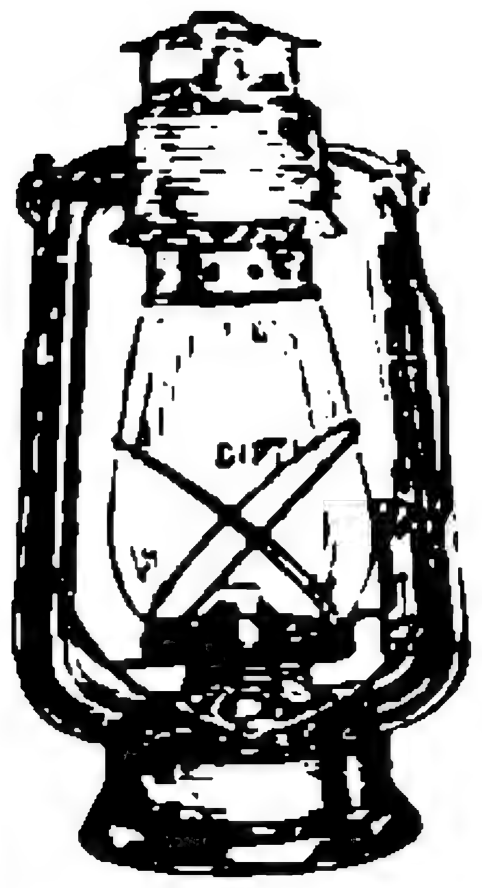

DIPTI LANTERNS

ENAMEL WARES

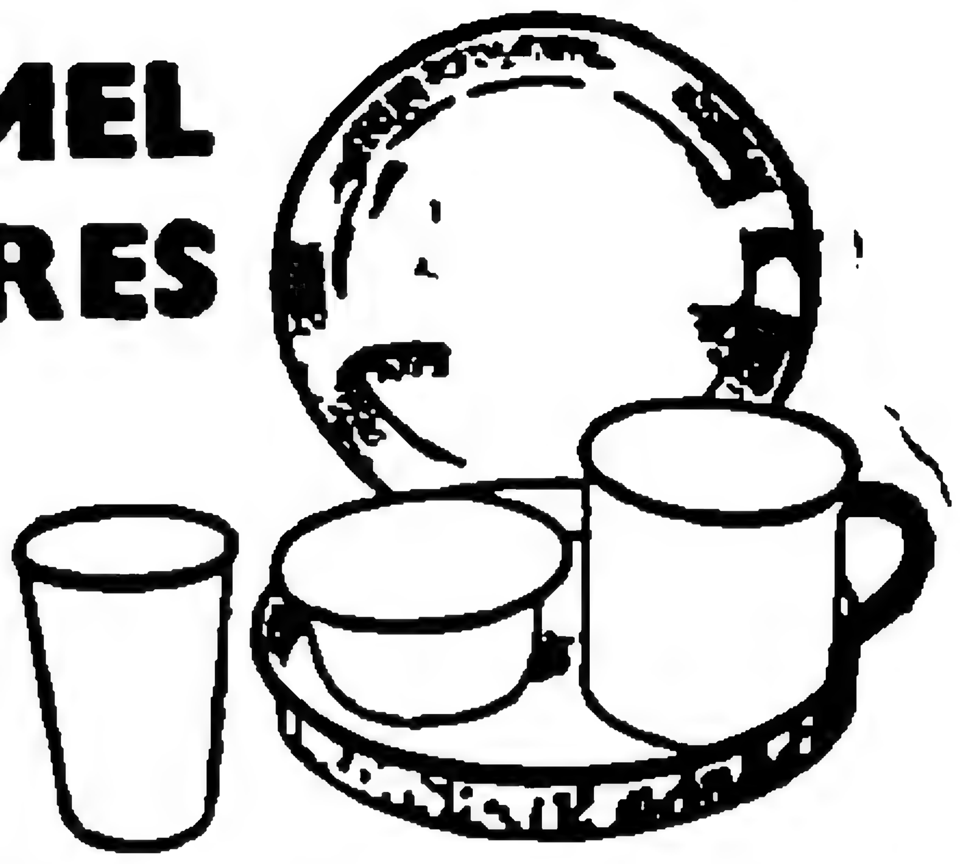

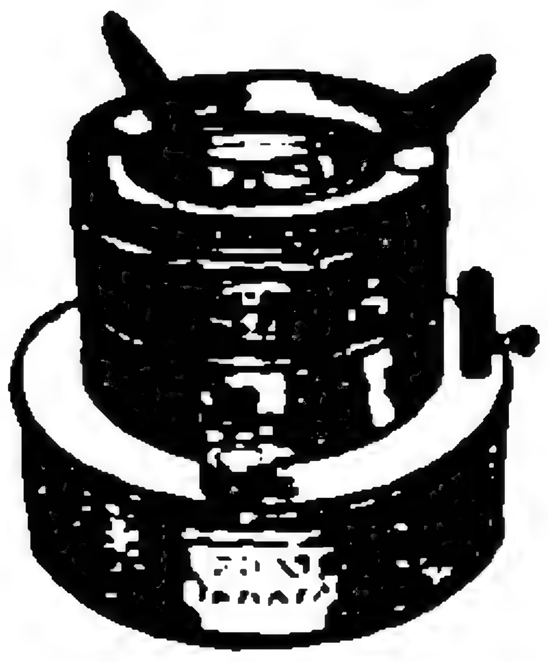

KHAS JANATA

Kalpana

একজাতি
একপ্রাণ
একতা
দেশের প্রগতি ও প্রতিরক্ষার সংগ্রামে
আমরা প্রত্যেকে এক একটি সৈনিক
এক বছর আগে আমাদের স্বাধীনতা হয়েছিল বিপন্ন। প্রধান মন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানের প্রেরণায় ঐক্যের পথে আমাদের নবজন্ম দেখা দিল। আমরা সবাই এক, সকলেই ভারতবাসী, এই পুণ্য চেতনার পুনরুদয় হ'ল।
এই একতা, এই নবজাগরণের ধারাকে সঞ্জীবিত রেখে দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ কর্মপ্রচেষ্টাই আজ আমাদের মহত্তম ব্রত। সদাজাগ্রত সাধনায় আমাদের সংহতি ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত ক'রেই আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে পারি সেই সব বীর জওয়ানদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।
PRO/WBG-131
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শেক্‌স্‌পিয়র চিন্তা দেশে দেশে

অমলেন্দু বসু

....

মহৎ ব্যক্তিত্বে দু'টি যেন পরস্পরবিরোধী সূত্র কাজ করে। মহৎ ব্যক্তি একদিকে নিবিড়ভাবে স্বকাল চিহ্নিত, স্বদেশ রঞ্জিত, আপন দেশ ও যুগের সঙ্গে যেন তাঁর সমগ্র সত্তা, সম্পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা, ওতপ্রোত হয়ে আছে। অপর দিকে মহৎ ব্যক্তি দেশ ও যুগোত্তীর্ণ, তাঁর আকাঙ্খা ও কর্মপ্রচেষ্টা যেন কোন মতেই বিশেষের মধ্যে, সীমার মধ্যে, আবদ্ধ না থেকে সর্বমানবিক চিরন্তন মূল্যের অভিসারে চলেছে। বস্তুতঃ এই দুই সূত্রে কোনও বিরোধ নেই। সীমা ও অসীমের নিয়ত টানা পোড়েনে বিশ্ব সংসার প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকে। শিল্পীর যে ভাবনায় সমগ্র বিশ্ব চরাচর বিধৃত হয় সেই বিস্তীর্ণ ভাবনা সংহত বাক্‌রূপ পায় একটি সামান্য শব্দে একটি সীমিত কথায়। এই দুই সূত্রের সুসমঞ্জস সমবায় যিনি করতে পারেন তিনিই মহৎ ব্যক্তি, তিনি ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতীক হয়েও ইতিহাস-কবলিত নন, তিনি কোনও বিশেষ সমাজের মুখপাত্র নন, তিনি সমগ্র মানবতার প্রতীক।

শেক্‌স্‌পিয়রের ব্যক্তিত্বে এই দুই সূত্রের সমবায় অতুলনীয়। একদিকে তিনি ষোড়শশতকী ইংরেজি রেনেসাঁসের সর্বাধিক মূল্যবান প্রতিভূ, সমসাময়িক ইংলণ্ডের আশা আকাঙ্খা তাঁর রচনায় অবিস্মরণীয় প্রতিফলন পেয়েছে। পুরোপুরি ভাবেই তিনি ইংরেজ। ইংরেজ জাতিকে, বিশেষত ষোড়শশতকী ইংরেজ জাতিকে বুঝতে হলে শেক্‌স্‌পিয়র অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু অন্যদিকে শেক্‌স্‌পিয়র ইংরেজের চেয়েও বড়ো, তিনি যেন সর্বদেশীয় সর্বকালীন মানুষের প্রতিনিধি, তাঁর প্রমুখাৎ যেন বিশ্বমানবের আশা আকাঙ্খা আমরা শুনতে পাই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

শেক্‌স্‌পিয়র-সাহিত্যের শাশ্বতরূপ এ যুগের আবিষ্কার নয়। শেক্‌স্‌পিয়রের বন্ধু বেন্ জন্‌সন্ বলেছিলেন, He was not of an age but of all time, তিনি একটি মাত্র যুগের নন, তিনি সর্বকালের। এই উক্তির শতাধিক বৎসর পরে ডক্টর স্যামুয়েল জন্‌সন্ বলেছিলেন: He has long outlived his century...... , His characters are not modified by the customs of particular places, unpractised by the rest of the world; by the accidents of transient fashions or temporary opinions; they are the genuine progeny of common humanity, such as the world will always supply, and observation will always find. His persons act and speak by the influence of those genral passions and principles by which all minds are agitated, and the whole system of life is continued in motion. [নিজ শতাব্দীর চেয়েও তাঁর আয়ু দীর্ঘতর...তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা কোনও স্থান বিশেষের আচারব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত নয়, বিশাল জগতের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়, ক্ষণস্থায়ী রীতি অথবা ক্ষণিক মতামতের অনুগত নয়। তারা সর্বমানবিকতার ধারণা

থেকে উদ্ভূত, যে-ধারণা জগতে চিরকালই পাওয়া যাবে, লক্ষিত হবে। তাঁর চরিত্রেরা সেই সব চিত্তবৃত্তি ও নীতি দ্বারা গঠিত যাদের প্রভাবে সকল মানবচিত্ত উদ্বুদ্ধ, যাদের আবেগে সমগ্র জীবনের চক্র নিয়ত চালিত হচ্ছে।]

শেক্‌স্‌পিয়রের শাশ্বত মূল্য সম্বন্ধে তাঁর স্বদেশবাসী দুই মনীষির বচন উদ্ধৃত করলাম। ইংল্যাণ্ড থেকে সাত সাগর তেরো নদীর পারে বাংলা দেশে, শেক্‌স্‌পিয়রের জন্মের তিনশো বছর পরে যে বাঙালী মহাকবি জন্মেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথও শেক্‌স্‌পিয়র-সাহিত্যের চিরন্তন সর্বমানবিক মূল্যের কথা বলেছেন।

> যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
> ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
> আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
> কেবল আপন ধন।

বাস্তবিকই শেক্‌স্‌পিয়রের সমকালীন এবং অনতিপরবর্তী ইংরেজরা (বেন্ জন্‌সনের উক্তি সত্ত্বেও) শেক্‌স্‌পিয়রের ইংরেজিয়ানার আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিলেন, শেক্‌স্‌পিয়র যে ইংরেজেরও বড়ো, তিনি যে বিশ্বকবি, বিশ্বমানব, তেমন চিন্তা এঁদের মাথায় আসেনি। কিন্তু কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়রের একান্ত যুগসীমিত মূল্যগুলি দু'শো বছর পরের ইংরেজদের কাছেই বিবর্ণ হয়ে গেল, তাঁরা শেক্‌স্‌পিয়রের রচনায় এমন সব নূতন মূল্য লক্ষ্য করতে লাগলেন যা কিনা নিতান্তই রাণী এলিজাবেথের যুগসীমাবদ্ধ নয় বরং সর্বকালের আকৃতিতে উজ্জ্বল। ক্রমে এই সর্বকালীন আকৃতি ইংল্যাণ্ড থেকে ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশে, তারও কিছুকাল পরে আরও ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপের বাহিরে অন্যান্য মহাদেশে, অন্যান্য সভ্যসমাজে—এশিয়ার দেশগুলিতে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়। শেক্‌স্‌পিয়র সাহিত্যের এই ক্রমপ্রসরণশীল বিশ্বব্যাপ্ত আবেদন লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> তারপরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
> দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
> উঠিয়াছ দীপ্ত জ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে;
> নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
> বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।

স্ট্রাটফোর্ড-অন্-এভন্ শহরের যে ঘর-পালানো তরুণ একদা নাট্যমুখর লন্ডন্ শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গণ্য হয়েছিলেন, যাঁর লেখায় অসংখ্য সমকালীন উল্লেখ ও ইঙ্গিত হাজার হাজার লন্ডন্‌বাসীর চিত্তে হর্ষ ও বেদনা জাগাতো, সেই অমায়িকস্বভাব "জেন্ট্‌ল্" শেক্‌স্‌পিয়রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যে কালে সমুদ্রবেষ্টিত স্বদেশের সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়বে সে কথা তাঁর সমকালীন কেউই হয়তো ভাবতে পারেননি কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে শেক্‌স্‌পিয়র আজ ইউরোপের কবি, আবার এশিয়ারও কবি, ভারতেরও কবি।

২

শেক্‌স্‌পিয়রের যশোবিস্তার জগতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অতীব স্মরণীয় ঘটনা কেননা গত দুই তিন শত বৎসরে শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তা প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রবল পরিবর্তন এনেছে। এই চিন্তার অভিঘাত কালানুক্রম অনুসারে কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত।

শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তা ইংল্যাণ্ডের বাহিরে প্রথম লক্ষ্য করা যায় ফরাসীদেশে আঠারো শতকে, আর সেই শতকেরই শেষার্ধে জার্মানি দেশে। সতেরো শতকে কিছু ইংরেজ নট-সম্প্রদায় ফ্রান্স জার্মানি বেলজিয়ম্ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেছিল ও শেক্‌স্‌পিয়রের কোনো কোনো নাটক মঞ্চস্থ করেছিল, এখানেই বিদেশে শেক্‌স্‌পিয়র-প্রীতির শুরু। কিন্তু আঠারো শতকে ফরাসী ভদ্রব্যক্তিদের পক্ষে প্রবল ভাবে শেক্‌স্‌পিয়র-অনুরাগী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সে যুগ ছিল

ফরাসী দেশের বিখ্যাত ক্লাসিক যুগ। কর্ণেইয়ে, মলিয়েরে, রাসীন্ ইতিমধ্যে তাঁদের মহৎ নাটকগুলির সৃষ্টি করেছেন, বোয়ালো রচনা করেছেন কাব্যের আইন, ডেকার্তের দর্শন-তত্ত্বে বিচার বুদ্ধিবিশ্লেষণ ও যুক্তিকে মানা হয়েছে মানব-চিত্তের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে'—এই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে শেক্‌স্‌-পিয়রের অনুভূতিপ্রধান জগৎ মনে হত নেহাৎই কল্পনা বিলাস, অলীক ও অপ্রাকৃত। ভোল্‌তেয়র (যাঁর খ্যাতি সেকালে ছিল অতীব তুঙ্গ অথচ মহাকালের নিকষে যাচাই করলে যাঁকে না মহৎ লেখক না মহৎ মনীষী বলে মানা যায়) বললেন, শেক্‌স্‌পিয়র আসলে বর্বর, কেন না তিনি প্রতিপদে ক্লাসিক-সাহিত্যের সর্বসম্মত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। ক্লাসিক-সাহিত্যের নিয়মানুসারে বরং বেন্ জনসন্‌কে প্রশংসা করা যায় কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়রকে তো করা যায় না,—এই ধারণা প্রবল ছিল আঠারো শতকী ফ্রান্সে। শুধু ফ্রান্সে নয়, এমন কি ইংল্যাণ্ডেও অনেক রসগ্রাহীর পক্ষে সমস্যা হল কী ভাবে ক্লাসিক নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে শেক্‌স্‌পিয়রের তারিফ করা যায়। ইংরেজ লেখক ড্রাইডেন, পোপ, ডক্টর জনসনের শেক্‌স্‌পিয়র-আলোচনায় একদা দোমনা সংশয়াকীর্ণ মনো-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সংশয়ের সমাধান এলো ইংরেজ সমালোচকদেরই তরফ থেকে। ড্রাইডেন বললেন, বুঝলাম তো ক্লাসিক-সাহিত্যের নিয়ম অনুসারে শেক্‌স্‌পিয়রের এই দোষ ওই দোষ, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়র-রচনা আমার চিত্তে যে নাড়া দেয় তেমন তো অন্য কোনো রচনা দেয় না, অতএব আমার শেক্‌স্‌পিয়রই ভালো বহু দোষ সত্ত্বেও। আমি মানছি যে বেন্ জনসন্ বড়োই শুদ্ধ রূপরীতিতে লিখে থাকেন, I admire him but I love Shakespeare, বেন্ জনসনের তারিফ করব কিন্তু ভালোবাসি আমি শেক্‌স্‌পিয়রকেই।—এই কথারই প্রতিধ্বনি পাব অ্যাডিসনের উক্তিতে: Our inimitable Shakespeare is a stumbling-block to the whole tribe of these rigid criticks [গোঁড়া সমালোচকদের পক্ষে আমাদের অনুপম শেক্‌স্‌পিয়র হোঁচট-লাগানো বাধা-স্বরূপ।] শেক্‌স্‌পিয়রের আঠারোশতকী ইংরেজ অনুরাগি-গণ (বস্তুত সব ইংরেজই শেক্‌স্‌পিয়রের অনুরাগী ছিলেন) তাঁদের রূপরীতিস্বস্তা সত্ত্বেও যে শেক্‌স্‌পিয়রের ভক্ত হয়ে-ছিলেন তার কারণ নেহাতই স্বাজাতিকতা নয়, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে শিল্পজগতের প্রধান অতুলনীয় সত্য হৃদয়ের ও প্রকৃতির (যাকে তাঁরা বলতেন 'নেচার') স্বাধীন অব্যাহত স্ফুরণে, কল্পনার অসঙ্কুচিত অবয়বীকরণে, শিল্পের সত্য অনড় নিয়মের শৃঙ্খল দৃঢ়তায় নয়।

ইংরেজ অনুরাগীদের এই বোধ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মস্ত কথা। এতদ্বারা নিয়মের চেয়ে বড়ো হল প্রকৃতি, যুক্তির চেয়ে বড়ো হল কল্পনা। আধুনিক সংস্কৃতির সব চেয়ে বড়ো বিপ্লবের সূত্রপাত হ'ল, যে-বিপ্লবকে বলা হয় রোমান্টিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের সম্যক ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নয়, কিন্তু একথাটি অবিস্মরণীয় যে যে নতুন ঢংয়ের সাহিত্য ও শিল্প আঠারো শতকের শেষভাগে শুরু হয়ে সমগ্র ইওরোপীয় জগতে ছড়িয়ে পড়ল উনিশ শতকে (যার অরোধ্য তরঙ্গের মুক্তিদায়ী অভিঘাত লেগেছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যেও, মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে যার উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি), সেই মহান বিপ্লবের গোড়ার কথা মুক্তি, স্বাধীনতা, স্বতোৎসার চেতনা, মানবচিত্তের অব্যাহত প্রকাশ, মানুষের সৃজনী প্রেরণার নব নব অভিযান।

সংস্কৃতির এই নূতন অধ্যায়ের মূলে শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তা। যাঁরা শেক্‌স্‌পিয়রের অনুরাগী তাঁদের উপলব্ধিতে নূতন মূল্য-জ্ঞান এসে গেল। আঠারো শতক থেকে যখন উনিশ শতকে পৌঁছলাম তখন ব্লেক, ওআর্ডস্বোয়র্থ, রুসো, ভিক্তর ইউগোর চেষ্টায় সেই স্বতোৎসার স্বাধীনতাকামনার জয়জয়কার হল যে-কামনার উৎস শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তায়। এই বিজয়ের পুরোধা হলেন জার্মান মনীষিগণ—শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, শেলিং,

গ্যোয়টে। শেক্স্‌পিয়রকে ভিত্তি করে এঁরা নূতন দর্শন প্রস্তুত করলেন, সে দর্শনে শিল্পসমাজ আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরবোধ সমভাবে বিবৃত হল আর ফ্রান্স ইংল্যণ্ড ও জার্মানির এই সর্বভূতস্পর্শী নূতন জীবনবোধের ফলে ইওরোপের দেশগুলিতে (আমেরিকায়ও) রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হল, ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিরও জিগীর তোলা হল। শেক্স্‌পিয়র বলেছিলেন শিল্পীর কাজ হল holding the mirror up to Nature, প্রকৃতির প্রতিবিম্বন। এই যে প্রকৃতিকে শিল্পের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে মানা হল, তারই জের টেনে আধুনিক সংস্কৃতি দর্শন রাজনীতি সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের অভিযান শুরু হল। আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা শেক্স্‌পিয়র।

আমার বিচারে শেক্সপিয়র-চিন্তার প্রথম তরঙ্গের এই-টেই মূল কথা। এই তরঙ্গের অভিঘাতে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে—বিশেষত জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে—সাহিত্যের মস্ত পরিবর্তন তো হলই, তার অনুষঙ্গে পরিবর্তন হল সমাজে, জীবনের সব কয়টা মূল্যবান পরিচ্ছেদে। অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পী শেক্সপিয়রের রচনার অনুবাদ করলেন অথবা সে-রচনার অনুভাবে গ্রন্থ রচনা করলেন অথবা শেক্সপিয়রের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নকর্মে লিপ্ত হলেন: হের্ডের, ম্বাইল্যাণ্ড, গ্যোয়টে, শিলের, শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়; মাদাম দ স্তায়েল, আলেক্‌জন্দর দ্যুমা, ভিক্তর ইউগো, আলফ্রে দ ভিনী, আলফ্রে দ মুসে; পুশ্‌কিন্‌, তুর্গেনিভ্‌। যে দুর্বার মুক্তির স্বাদ ও প্রেরণা শেক্সপিয়র-থেকে ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে, তার সঙ্গে স্বভাবতঃই আরও কয়েকটি ভাবাদর্শ সমাজ জীবনে আত্ম-প্রকাশ করল। মুক্তির মানে দাঁড়ালো ব্যক্তির মুক্তি—রেনেসাঁস যুগের প্রকাণ্ড তত্ত্ব এই মুক্তি আর এই মহার্ঘ তত্ত্ব শেক্সপিয়রের মাধ্যমে আঠারো-উনিশ শতকে ইউরোপে আবার জাগ্রত হল—ব্যক্তির মুক্তিতেই ভূমারও মুক্তি, ব্যক্তির স্বার্থে ও ভূমার স্বার্থে প্রভেদ নেই। মুক্তির এই অর্থ গ্রহণ করার সঙ্গে অবধারিত আরেকটি ভাবাদর্শ এসে পড়ল—সোশ্যাল জাসটিস্‌, অর্থাৎ সমাজ জীবনে ন্যায়নীতি। কোনও প্রথা-আড়ষ্ট প্রভেদ থাকবে না মানুষে মানুষে, কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয় অন্তত সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী ও অধিকার কারুরই বেশি বা কম নয় যদিও একের তুলনায় অপরের আত্মিক শক্তি বেশি বা কম হতে পারে। শাইলক্‌ ইহুদী বটে কিন্তু সে-ও মানুষ, তার রক্ত খৃষ্টান-শোণিতের চেয়ে পৃথক নয়। ক্যালিবান অসভ্য বর্বর, প্রস্পেরোর আত্মিক শক্তি তার নেই কিন্তু সে-ও চায় স্বাধীনতা। এই সব ভাবাদর্শের সঙ্গে এলো আরেক চিন্তা নগর নির্ভর বিলাসী জীবনের তুলনায় সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সারল্য। "অ্যাজ ইউ লাইক ইট্" নাটকে এই দুই জীবনের তারতম্য প্রকট হল। তা ছাড়া, শেক্স্‌পিয়রের সব নাটকেই, বিশেষত: মহৎ কমেডি ও ট্র্যাজেডি গুলিতে, আরেকটি সত্য উদ্ভাসিত হল যে বহিরঙ্গের চেয়ে অন্তর্জীবনের পরিচয়েই মানুষের সত্যি কারের পরিচয়। মানুষের জীবনে যেমন প্রচণ্ড দুঃখ আসে, তেমনই আছে যৌবনের আনন্দ। দুঃখ ও আনন্দ দুইয়ের সঙ্গেই মানুষের পুরুষকার সম্পৃক্ত। দুঃখ বা আনন্দ তো দৈব শক্তির খামখেয়াল নয়, ব্যক্তির নিজ কর্মফল যদিও অবশ্য কর্মে ও কর্মফলে সাযুজ্য না-ও থাকতে পারে। রজালিণ্ডের বা পোর্শিয়ার জীবনে যে সুখ এলো সে-সুখের তারা প্রকৃত অধিকারী। হ্যামলেট বা ওথেলোর জীবনে যে বিনাশ ঘনিয়ে এলো তার উৎস অনেকাংশে তাদের নিজ চরিত্রে। শেক্স্‌পিয়রের নাটকে আধুনিক পাঠক পেলেন নতুন মানবিক নীতি, সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে মানবিক ব্যাখ্যা। শেক্স্‌পিয়র-চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠল আধুনিক মানুষের জীবনাদর্শ।

৩

দেশে দেশে শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তার প্রথম পর্য্যায়ে পেলাম মুক্তির গান। দ্বিতীয় পর্য্যায়েও একই গান শুনি, তবে সে-গান এখন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকতর জগতে। শুধু পশ্চিম ইওরোপে নয়, পূর্ব ইওরোপের অনেক তমসাচ্ছন্ন দেশেও শেক্‌স্‌পিয়র চিন্তার অভিঘাতে রোমান্টিক মুক্তির আবাহন সঙ্গীত উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হল। উনিশ শতকের শেষভাগে যে রোমান্টিক আন্দোলন প্রবল হল পোলাণ্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, গ্রীসে, হাঙ্গেরিতে, রোমানিয়ায়, তারও মূলে ছিল শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তার অমর প্রভাব। এসব দেশের ভাষাতে শেক্‌স্‌পিয়র গ্রন্থাবলী অনূদিত হল, কখনও বা পরোক্ষ অন্য লেখকের মাধ্যমে শেক্‌স্‌পিয়রের প্রভাব বিস্তৃত হল। এই বিলম্বিত তরঙ্গের আঘাত এসে পৌঁছেছিল আমাদের দেশেও। উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে নবজাগরণের উন্মাদনা প্রকট হয়েছিল তার পিছনে ছিল শেক্‌স্‌পিয়র-অধ্যয়নের সৃষ্টিশীল প্রেরণা। এক বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে বাঙালী মধ্যযুগীয় চিন্তার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন আধুনিক চিন্তার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাংলা সাহিত্য আসন পেলো বিশ্বসাহিত্যের দরবারে, ব্যক্তিমানবের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন ঐশ্বর্য্যময় হল। যে সব ভাবাদর্শের উল্লেখ করেছি ইতিপূর্ব্বে তার সব কয়টিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হল, বাঙালীর নিজস্ব ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে।

৪

এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমকালীন তৃতীয় এক পর্য্যায়ও আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে ফ্রান্স থেকে শুরু হয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে (বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যেও ছড়িয়ে পড়ে) অন্য এক জীবনভঙ্গী তথা সাহিত্যপ্রত্যয় যাকে রিয়্যালিজম্ বলা হয়। (সাহিত্যরীতি হিসাবে 'ন্যাচরালিজম্' বস্তুতঃ রিয়্যালিজ্‌মেরই কিছু একপেশে রূপ।) বালজাক্ থেকে এমিলে জোলা, জর্জ গিসিং ও জর্জ মূর থেকে আর্নল্ড্ বেনেট্ অবধি ন্যাচরালিজম্-প্রত্যয়ী লেখকগণ তৎকালীন বিজ্ঞানের তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণাগ্রহণ করলেন যার প্রধান প্রতিপাদ্য হ'ল যে মানুষ গোড়া থেকে আখের অবধি সম্পূর্ণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল প্রাকৃতিক জগতেরই অংশ, মানুষের সম্পূর্ণ সত্তা সেই নিয়মের অধীনে যে-নিয়মে দৃশ্যমান স্পর্শসাধ্যজগৎ চলছে, এই নিয়মের অতিরিক্ত এবং অতীত কোনও শক্তি মানুষের নেই। প্রাক্‌দেহ কোনও অস্তিত্ব মানুষের নেই, দেহোত্তর কোনও অস্তিত্ব নেই, আত্মা কিছু নেই, মানুষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মিলবে বিজ্ঞান জগতের cause and effect, কারণ ও পরিণামের বিশ্লেষণে।—এই জড়বাদী সাহিত্যতত্ত্ব থেকে কিছু মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু এই জড়বাদ বহুযুগাচরিত অতীন্দ্রিয়বাদী (মিস্‌টিক্যাল) ধর্ম্মভিত্তিক, মানবধর্ম্মীয় (হিউম্যানিস্‌টিক্) প্রত্যয়ের বিরোধী, আর যে হেতু কিছুকাল পরে (বর্তমান শতকে) বিজ্ঞানীরা জড়বাদ পরিত্যাগ করলেন এবং এমন কথা বলতে লাগলেন যে জড়জগতের চরম অনুশক্তি কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলের অনুবর্ত্তী নয়, সে জন্য এই শতকে জড়বাদের প্রভাব কমে গেল। সাধারণ মানুষ তৃপ্ত থাকলনা জড়তত্ত্বে, সে-তত্ত্বের অতিরিক্ত কোনও আধ্যাত্মিক শক্তির আকাঙ্খা বোধ করল, এবং সাহিত্যশিল্পী এই আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার এমন শিল্পসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলেন যাতে নিয়ত সীমার মাঝে অসীমের আকুতি পাওয়া যায়, যাতে দৃশ্যমানের গভীর কন্দরে পাওয়া যায়, অবাঙ্‌মনসোগোচর সত্য। একদা জড়বাদ ঘোষণা করেছিল,

ওরা শোনেনা, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে, পশুই শাশ্বত। এখন শোনা গেল অন্য বাণী,

[illegible] বলে, যেযো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।

এই বিদ্রোহী প্রত্যয় ভাষার স্থূল সাবয়ব নিগড়ে বাঁধা যাবে কি করে? শিল্পী সে-প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রতীকের প্রয়োগ দ্বারা। প্রতীকপ্রয়োগে এমন এক শিল্পরীতি মিলল যার সাহায্যে সীমার মাঝে অসীমকে বাঁধা গেল। এরই সাহায্যে সম্ভব হল, ইংরেজ কবির ভাষায়'

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee!

[তোমাকে আমরা দেখতে পাই হে অদৃশ্য জগৎ, হে স্পর্শাতীত জগৎ, আমরা তোমাকে স্পর্শ করি, হে জ্ঞানাতীত জগৎ, তোমাকে আমরা জানতে পাই ধারণার অগম্য হে জগৎ তোমাকে আমরা আঁকড়ে ধরি।]

সাহিত্যে প্রতীকতত্ত্ব শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের ফ্রান্সে, বোদেলেয়র থেকে ভা'লেরি অবধি কবিদের চিন্তায় ও কাব্যরীতিতে প্রতীকতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বিশ শতকে আরও অনেক দার্শনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থনে প্রতীকতত্ত্ব এখন প্রায় সর্বপ্রচলিত নিঃসংশয় শিল্পবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

যে কালে নিছক জড়বাদ অগ্রাহ্য করার প্রয়াসে শিল্পচিত্ত অতীত শিল্পের সাহায্য খুঁজছিল সেই কালে শেক্‌সপিয়রের রচনা আবার এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হল। দেখা গেল, শেক্‌স্‌পিয়র-নাট্যের চরিত্র, ঘটনা-সংস্থান, আবেগ, বাক্‌প্রতিমা সব কিছুতেই প্রতীকের রহস্যময় ইশারা মেলে। একদিকে যেমন এই মানবধর্মী নাটকাবলী মানব চিত্তের প্রায় সবরকম সম্ভবপর আবেগেরসন্ধান দেয়, মানুষে মানুষে সম্পর্কের অব্যর্থ সংযোজনা প্রস্তুত করে, দৃশ্যমান স্থূল জগৎ সম্বন্ধে আমাদের চেতানা তীক্ষ্ণতর করে, অন্যদিকে আবার এই স্থূল জগতের অতীত কোনও আলো-আঁধারী জগৎ আমাদের কল্পনানেত্রে ক্ষণোদ্ভাসিত হয়। শেক্‌স্‌পিয়র হয়ে দাঁড়ালেন প্রতীকপন্থী সাহিত্যতাত্ত্বিকের উজ্জ্বলতম সমর্থক। শুধু যে সেক্‌সপিয়রের শেষ নাটক কয়টি (উইন্টার্স টেল্‌, সিম্বেলিন্‌, টেম্‌পেস্‌ট্‌) এই প্রতীকপন্থায় ব্যাখ্যাসাধ্য হল তা নয়, তাঁর সনেটগুলি ও আগেকার অনেক নাটকই যেন সে-পন্থায় নির্ভরশীল বলে মনে হল। বস্তুতঃ হ্যাম্‌লেট তো বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধতম প্রতীক কেন না হ্যাম্‌লেটকে প্রত্যেক পাঠক নিজ সংবেদনার রসে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

প্রথম দুই পর্য্যায়ে দেশে দেশে শেক্‌স্‌পিয়র-চিন্তার মূলকথা ছিল রোমান্টিকপন্থা, তৃতীয় পর্য্যায়ে হল প্রতীকপন্থা। শেষ বিচারে প্রতীকপন্থা তো রোমান্টিক পন্থারই অংশ। হয়তো আগামীকালে সমাজমনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়র ব্যাখ্যাও বদলাবে কিন্তু বোধ হয় একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায় যে যতকাল মুক্তির স্বাদে মানুষ চঞ্চল থাকবে, যতকাল প্রাণের কাহিনী থাকবে শিল্পের উপজীব্য, ততকালই শেক্‌স্‌পিয়র চিন্তা অমলিন থাকবে। এই অমলিনতার কিছু আভাস পাওয়া যায় "শেক্‌স্‌পিয়র সার্ভে" নামক বার্ষিক গ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত দেশ বিদেশের রিপোর্ট গুলিতে।

শেক্সপীয়ার প্রতিভা

সরোজেন্দ্র নাথ রায়

ইউরোপীয় মধ্যযুগ একটি অন্ধ যুগ। গীর্জা ও পুরোহিতের আত্যন্তিক চাপে মানুষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও নানাবিধ পদ্ধতির উপর। স্বর্গ ও নরক মাত্র এই দুইটিই হ'ল মানুষের সমগ্র চিন্তার বিষয়বস্তু। মানুষ তাকিয়ে রইল উর্দ্ধ আকাশের দিকে, চাইল না তারই সগোত্র মানুষের মুখের দিকে, দেখল না কি সৌন্দর্য্য, কি আনন্দ লুকিয়ে আছে তার বুকের তলায়, দেখল না স্বর্গ ও নরক কোন সুদূর জগতের বস্তু নয়, কিন্তু রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী এই সুন্দরী ধরণীর ক্রোড়ের মধ্যেই তারা বাসা বেঁধে রয়েছে। তাই আনন্দ হ'তে যে রস সৃষ্টি হয়, সেই রসের মধুর আস্বাদ হ'তে তারা বঞ্চিত রইল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জাদুস্পর্শে একদিন সেই অন্ধ নিশির অবসান হ'ল। মধ্যযুগ এসে দাঁড়াল নব নবীনের দ্বারদেশে। মানুষের শৃঙ্খলিত আত্মার মুক্তি হ'ল। মানুষ আবার আনন্দস্বরূপের মোহন রূপ দেখে মুগ্ধ হ'ল। নব যুগের প্রথম উষার ভাস্বর আলোকে যারা চোখ চেয়ে দেখেছিলেন বিশ্বের মোহন মূর্ত্তি, মানুষের সুখ দুঃখ যাদের চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল, যারা সকল মানব প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত সত্যরূপটি দর্শন করে আকুল কণ্ঠে তার গান গেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে শেক্সপীয়র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিখিল বিশ্বে সর্বকালের জন্য তাঁর আসন রচিত হয়েছে।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে তাঁকে দেখতে হবে তাঁর সমকালের মধ্যে ও অনন্ত কালের শাশ্বত মূল্যবোধের মধ্যে। শেক্সপীয়র যখন নাটক রচনা আরম্ভ করেন তখন ইংরেজী ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা অতিশয় দুর্বল ছিল। কাব্যরচনায় কোন বিশিষ্ট শৈলী বা ধারা রচিত হয়নি। ইংরেজী নাটক যতটুকু ছিল নাট্যসাহিত্যে তার স্থান ছিল অনাদৃত। সৃজনী শক্তির বহুধা প্রকাশ ছিল কিন্তু তার কোন শ্রদ্ধেয় রূপ ছিল না।

ইংরেজী নাটকের জন্ম হয়েছিল গীর্জ্জার মধ্যে। পুরোহিত ও ধর্ম্মের চিহ্ন ছিল তার প্রত্যেক অঙ্গে। ধর্ম্মীয় কঠোরতা দূর করতে আনতে হোত অতি নিম্ন শ্রেণীর ভাঁড়ামো। সাহিত্যের অবস্থা যখন ছিল এইরূপ শৈশবোচিত জড়তাগ্রস্ত, তখন দৈবক্রমে এসে পড়ল রোম ও গ্রীসের নবজীবনসুধা, যাকে বলা হয় রেনেসঁস্। ইংরেজ বিদ্বৎসমাজ পেল একটা অপূর্বলোকের সন্ধান—অভাবনীয় অমৃতাস্বাদ। সেই বৈপ্লবিক প্লাবনে বদলে গেল রসসৃষ্টির সমগ্র রূপ।

প্রাক্‌রেনেসঁস্ ইংরেজী নাট্যসাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। প্রাচুর্য্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাকে সম্পন্নই বল্‌তে হবে। কিন্তু প্রাণশক্তির বহুধা বিস্ফুরণে তা বিস্ময়কর হলেও তার না ছিল নাটকীয় বৈশিষ্ট না ছিল কাব্যপ্রতিভা। মানুষের মন তখনও ছিল মূক, কাব্যের ভাষা হৃদয়ের ভাব প্রকাশে অসমর্থ। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নাট্যশাস্ত্র একটা বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তার আঙ্গিক রূপ ও ভাবের উৎকর্ষ আজকার পৃথিবীতেও বিস্ময়কর। রেনেসঁসের প্রভাবে ইংরেজী নাটকেও এই রূপ ও ভাব ক্রমেই প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করল। মার্লো ও কীডের নাট্যমাধ্যমে বিয়োগান্ত নাটকের নবজন্ম হ'ল গ্রীন ও পীলের রচনায় প্রাচীন নাটকের হাস্যরস সঞ্চারিত হল। রোমান সেনেকা দিল রক্তক্ষরা হত্যাকাহিনীর ভয়ঙ্কর রূপ। প্লটাস ও টেরেন্স নিয়ে এল হাসির তরল স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। এই ভাবে ইংরাজী নাটকের জীবনে এল অভূতপূর্ব রূপান্তর।

শেক্সপীয়রের জন্মকাল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভন নামক ক্ষুদ্র সহরে তাঁর পিতা ছিলেন সমৃদ্ধিশালী পশম ব্যবসায়ী ও শহরের পৌরসংস্থার অল্ডারম্যান। সেক্সপীয়রের শিক্ষা দীক্ষা ছিল যৎসামান্য। তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজে তাঁর কোন স্থান ছিল না। তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গ্রীক লাটিন সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত। শেক্সপীয়রের যা কিছু শিক্ষা তা ছিল প্রকৃতির বিদ্যালয়ে। ক্ষুদ্র ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভন শহরের বক্ষস্থল ভেদ করে সপিল ভঙ্গীতে চলেছে এভন নদীটি মন্থরগতিতে। উইলোগুচ্ছ নুয়ে পড়েছে রজত শুভ্র স্রোতধারার উপর। যুগল রাজহংস ভেসে যায় নদীর স্রোতে। বসন্তে সহস্র ফুল ফোটে বিচিত্র বর্ণের। পীচ, নাসপাতি, খুবানি, আপেলের লাল, নীল, সাদা ফুলের প্লাবন লাগে। ফোটে সেখানে ল্যাভেণ্ডার ও মিন্ট, মেরিগোল্ড ও মার্জোরাম, ভায়লেট ও প্রিমরোজ যার শোভায় শোভান্বিত হয়ে উঠত পাড়িটার ক্ষুদ্র কুটীরটী। প্রভাতের থ্রাস ছুগ ছুগ গানে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। প্রতিদিন কোকিল এসে ডাক দিয়ে যেত দিবসের কর্ম্মে। এই প্রকৃতির অনন্ত আহ্বানই শেক্সপীয়রের মানস চৈতন্যকে জাগ্রত করেছিল। এভন নদীর খেয়াঘাটে প্রতি প্রভাতে বাণিজ্যসম্ভারে পূর্ণ কত না নৌকা এসে লাগত। বিচিত্র বর্ণের, বিবিধ চরিত্রের কত না লোক তাদের নানা ছন্দের ধ্বনিতে কবির চিত্ত পূর্ণ করে দিত। এই ছিল শেক্সপীয়রের বাল্যশিক্ষা, যৌবনের প্রেরণা ও প্রৌঢ়ত্বের কাব্যস্মৃতি।

ষ্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে শেকসপীয়র কেন ও কি করে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। তিনি নাকি স্থানীয় জমিদার স্যর টমাস লুসির সংরক্ষিত বনে হরিণ শিকার করেছিলেন এবং শাস্তির ভয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এসেছিলেন। লণ্ডনে এসে নাকি তিনি নাট্যমন্দিরের দ্বারে দর্শকদের ঘোড়ার পরিচর্য্যা করে জীবন আরম্ভ করেন। ক্রমে দ্বার হতে মন্দিরের অভ্যন্তরে উন্নীত হন ও অবশেষে মঞ্চের উপরে ও সাজঘরে স্থান লাভ করেন। ধীরে ধীরে সৌভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলেন ও জীবনের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে কাব্যযশ হল তাই নয়, প্রচুর ধনাগমও হ'ল। একদিন যিনি নাট্যমন্দিরের দ্বারে অশ্বের লালন কর্ম্মে জীবিকাহরণ করেছিলেন, তিনিই পরে রঙ্গমঞ্চের মালিক হলেন ও প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হলেন। কাব্যলক্ষ্মী তাঁর স্বর্ণভাণ্ড নিয়ে তাঁর দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। সে এক অপূর্ব জীবনকথা।

ভাগ্যের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন কি করে সম্ভব হ'ল? যেমন পৃথিবীজীবনে ঋতু আছে তেমনি সমাজজীবনেও ঋতু আছে। ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দী জাতীয় জীবনে বসন্ত ঋতু এনে দিয়েছিল। নবকুসুমিত কুঞ্জবনে সহস্র কোকিল জাগ্রত হয়েছিল। সেই সহস্রের মধ্যে শেকসপীয়র সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বকালে সর্বদেশে নরোত্তম। অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। নতুবা ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের একটি অজ্ঞাতকুলশীল যুবক যে লণ্ডন শহরে রঙ্গশালার দ্বারদেশে ঘোড়ার লাগাম ধরে জীবিকার্জ্জন আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ তারই লেখা একটি নাটক (Henry VI) লণ্ডনবাসীকে জানিয়ে দিল যে নাট্যসাহিত্যে নূতন তারকার উদয় হয়েছে। এই কীর্ত্তি কিছু দিনের মধ্যেই আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হল যখন প্রকাশিত হ'ল তাঁর কবিতাগ্রন্থ Venus and Adonis। রঙ্গমঞ্চের চাহিদাক্রমে কিছু দিন পর পর বেরিয়ে চল্ল Henry VI এর আরও দুটি খণ্ড, Richard III, Titus Andronious, Love's Labour Lost, The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew। তখনও তাঁর বয়স আটাইশ বৎসর হয়নি। এই নবোদিত প্রতিভার জ্যোতিতে গ্রীনের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের যশ ম্লান হয়ে গেল। তাই তাঁর হিংসাপীড়িত আত্মা মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করতে পারল না। জীবনের আঠারটি বৎসরের মধ্যে শেকসপীয়র লিখলেন

প্রায় চল্লিশখানি নাটক ও কবিতাগ্রন্থ। বৎসরে দুখানার চাইতেও বেশী। তাঁর মৃত্যুর সাত বৎসর পর তাঁর দুই নটবন্ধু হেমিং ও কণ্ডেল যখন তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলেন তখন তাতে জানিয়ে দিলেন যে শেকসপীয়রের পাণ্ডুলিপিতে একটি কাটাকুটিও নাই। যা লিখেছেন তা একেবারেই লিখেছেন। কতখানি প্রতিভা থাকলে এই ব্যাপারটি সম্ভব তা যাঁরা লেখেন তাঁরাই বুঝবেন।

শেক্সপীয়রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাঁর রচনার প্রত্যেক অঙ্গে সুস্পষ্ট। একথা সত্য যে তাঁর অধিকাংশ নাটকের প্লট ধারকরা। কিন্তু যখন সেই ধারকরা প্লটের সঙ্গে তাঁর রচিত নাটকের তুলনা করা যায় তখন দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হবে যদি আমরা হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের সঙ্গে তাদের মূল উপখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা করি। ধরা যাক্ হ্যামলেট Saxo Grammaticus নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একজন ডেনমার্কবাসী লেখকের Historia Danica থেকে হ্যামলেটের উপাখ্যানটি নেওয়া। তাতে দেখতে পাওয়া যায় এ্যামলেথ নামে এক রাজকুমার তার পিতার প্রেতের নিকট জানতে পারে যে তার খুল্লতাত ফেঙ্গো কর্তৃক তার পিতা গোপনে নিহত হয়েছেন। প্রেতের নিকট এই তথ্য জানতে পেরে এ্যামলেথ প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য পাগলের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। পরে ফেঙ্গো তার চক্রান্ত বুঝতে পেরে তাকে ইংলণ্ডে নির্ব্বাসিত করেন। এ্যামলেথ ইংলণ্ডের রাজকুমারীকে বিবাহ করে ও পরে ডেনমার্কে ফিরে এসে ফেঙ্গোকে হত্যা করে ও নিজে ডেনমার্কের রাজা হয়। এই গল্পটি ষোড়শ শতাব্দীর বিয়োগান্ত নাট্যকারদের অতি লোভনীয় বস্তু ছিল। এতে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড, গোপন চক্রান্ত, উন্মত্ততা, ছদ্মবেশ প্রভৃতি সেনেকাধর্ম্মী নাটকের অতি প্রিয় উপাদান ছিল। শেকসপীয়রের পূর্ব্বগামী কীড্ এই গল্পের মধ্যে বহু রক্তপাত, বহু গোপন চক্রান্ত, প্রেতের আবির্ভাব ও বহু ভীতিজনক ঘটনা সমাবেশ করে একে একটি অতি রোমাঞ্চকর নাটকে পরিণত করেছিলেন। নাটকটি ষোড়শ শতাব্দীর পক্ষে খুবই মুখরোচক নাটক হয়েছিল। শেকসপীয়র সেই ঘটনাগুলি নিলেন কিন্তু কাহিনীর এমনভাবে মোড় ফিরিয়ে দিলেন যে কীডের নাটকের বা মূলের সঙ্গে তার আর বিশেষ কোন সাদৃশ্য রইল না। কীডের নাটকের ন্যায় এটিও একটি প্রতিহিংসামূলক নাটক বটে। কিন্তু যখন আমরা শেকসপীয়রের নাটকটি দেখি বা পড়ি তখন আর রক্তপাত, প্রেতাবির্ভাব বা গোপন চক্রান্ত আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে না। আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত মুগ্ধচিত্তে শুধু দেখি কেন্দ্রীভূত চরিত্র হ্যামলেটকে। তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী আমাদের বিস্মিত চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। শেকসপীয়রের হ্যামলেট প্রতিহিংসাকাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে সম্পূর্ণ পৃথক। শত্রুনিধন কাম্য বটে, কিন্তু প্রেম যে হিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে হবেই কিন্তু না নেওয়া যে মহত্তর; দাঁতের বদলে দাঁত চোখের বদলে চোখ নেওয়া যে ঘৃণ্য; জীবনের সমস্ত কাজই যে ভগবৎবাঞ্ছিত; একটি ছোট পাখীও যে ভগবদিচ্ছা ব্যতীত মাটিতে বসে না, এই সব প্রত্যয় তাকে প্রতিহিংসার পথ থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত করে। প্রতিহিংসার চির-প্রচলিত দাবীর সঙ্গে এই অনুভূতির সংঘর্ষই হ্যামলেট নাটকের মূল আখ্যায়িকা। এই ভাবনাই হ্যামলেটকে ক্লীব করে রাখে। প্রতিশোধ নিতে হবে—এই ছিল পিতৃদত্ত আদেশ; কিন্তু তাতে কোন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই। এর ফলে হ্যামলেট হয়ে পড়েছে দুর্ব্বল, প্রতি পদক্ষেপে চিন্তাগ্রস্ত, দ্বিধাজড়িত। প্রতিহিংসা কাহিনীর কেন্দ্রচরিত্র সুযোগ পেলে প্রতিহিংসা নিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না—ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর। কিন্তু হ্যামলেটের চরিত্র তার ঠিক বিপরীত। পিতৃব্য ক্লডিয়াসকে অসতর্ক পেয়েও শাস্তি দিতে পারল না-তরবারি

হাতে করে তার বিবেকক্লিষ্টমন নিজের কাজ ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল। এই দুর্বল ব্যক্তিটিকে শেষ পর্য্যন্ত এই অপ্রীতিকর কর্তব্যটি সমাধা করতেই হল। এই খানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও কবি-কল্পনার মহত্ব। এতে তার প্রাণ গেল কিন্তু কর্তব্য তো সমাধা হ'ল। সেনেকাপন্থী প্রতিহিংসা নাটকে বিবেকের দ্বন্দ্ব নাই বা থাকলেও অতিশয় ক্ষীণ। তার প্রধান চরিত্রের ধ্যান জ্ঞান প্রতিহিংসা। সে আর কিছু জানে না। কিন্তু কর্তব্যবোধ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে এইরূপ কোমল চরিত্র যখন রক্তপাত করতে বাধ্য হয়—যে-কার্য্যের জন্য সে সঙ্কুচিত ও দুঃখিত, এবং যার জন্য তার প্রাণনাশ হয়—তার চাইতে মহৎ চরিত্রসৃষ্টি আর কিছু হ'তে পারে না। প্রাচীন উপকথায় যে ছিল হৃদয়হীন ঘাতক তাকে শেকসপীয়র তৈরী করলেন বিবেকপীড়িত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, কোমল অথচ কর্তব্যবুদ্ধিদ্বারা অনুপ্রাণিত শাস্তিদাতারূপে। এই জন্য বিখ্যাত জার্ম্মাণ কবি ও দার্শনিক গোটে হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনা করলেন একটি চীনামাটির ফুলদানির যাতে রোপন করা হল ওক বৃক্ষ। কিন্তু ওকের ভারে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

শুধু কি চরিত্রসৃষ্টিতে শেকসপীয়র অনন্যসাধারণ হলেন—তাঁর সমকালবর্ত্তী সকল কবিকে অতিক্রম করলেন? কাব্য-রচনাতেও তিনি হলেন অনন্যসাধারণ। তাঁর নাটকগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই ছন্দ মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আমদানী হয়েছিল ভার্জ্জিলের ছন্দের অনুকরণে। প্রথমে স্যাকভিল ও নর্টন নামে দুই শিক্ষকপ্রবর এই ছন্দকে গর্বোডাক নামক নাটকে প্রবর্তন করেন। তার পর পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ এই ছন্দের ব্যবহার করেন। গর্বোডাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল হাতে পায়েবাঁধা—চলৎশক্তি হতে বঞ্চিত। ক্রমে তা ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কীড তাকে মনোরম করে তুলল মার্লোর মধ্যে তা পেল উচ্ছ্বসিত গতি। মার্লোর নায়কদের আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্দ্ধার সে বাহন হ'য়ে উঠল। কিন্তু নাটকের প্রকৃত বাহন হতে হলে তাকে এমন খাতে প্রবাহিত হতে হবে যাতে সে সাধারণ কথ্য ভাষার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারে। ভাবের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রক্ষা করে কখনও উচ্চ গ্রামে কখনও নিম্ন গ্রামে তাকে রূপায়িত হতে হবে। শেকসপীয়রের হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয়ে দাঁড়াল যেন একটি মোমের পুতুল। স্রষ্টার খুশীমত সে রূপপরিগ্রহ করে। কখন সে হ্যামলেটের দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের কুণ্ঠিত ভাবকে বহন করে, কখনও সে ভীতত্রস্ত ম্যাকবেথের মুখে বিভীষিকারূপে প্রকাশিত হয়, কখনও সে বিষাদসলিলে নিমজ্জিত বিভ্রান্ত ওথেলোর হৃদয়ভেদী হাহাকার ছন্দিত করে তোলে। সেই ছন্দ আবার শান্ত সৌম্য প্রস্পেরোর মুখে গম্ভীর হয়ে ওঠে, পোর্শিয়ার প্রখর যুক্তিজালে সে উজ্জ্বল হয়। আবার তাতে প্রত্যাশাক্রান্ত জুলিয়েটের আকুল আকাঙ্ক্ষা বেগান্বিত হয়। বীণাটি সেই একই। কিন্তু বাদকের কোমল অঙ্গুলিস্পর্শে তাতে নানা মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়।

ম্যাকবেথ একটি কৃতঘ্ন হত্যাকারী। নিজ অপরাধের জালে সে জড়িত হয়ে আপনার ধ্বংস আপনি নিয়ে আসে। একটি অপরাধ থেকে বাঁচতে গিয়ে আর একটিতে লিপ্ত হয়। ক্রুর, রক্তপিপাসু, নির্ম্মম ম্যাকবেথ পথের সকল কণ্টক তুলে ফেলতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু খুনী ব্যক্তিটির আবার একটু বিবেকবুদ্ধিও আছে। সে যে কত বড় অপরাধী তা সে জানে। তাই নিজ অপরাধের রুক্ষ প্রেতমূর্ত্তি তাকে পীড়িত করে। ভয়ের তাড়নায় তার ত্রস্ত চিত্ত অন্ধকার রজনীর কৃষ্ণ যবনিকায় নানা বিভীষিকার মূর্ত্তি দর্শন করে। সম্মোহিত চক্ষুর সম্মুখে কখনো দেখে চলন্ত ছুরিকার শানিত রূপ তাকে ডান-কানের শয়নকক্ষের পথ দেখিয়ে চলেছে। অপরাধক্লিষ্ট বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে কখনও দেখে সমুদ্রের অনন্ত উচ্ছ্বসিত বারিরাশি তার হাতের রক্তে রঙীন হয়ে উঠছে। তার পাপকর্ম্মের

সহকারিণী তার স্ত্রী একদিন তার দোলায়মান চিত্তকে উৎসাহের দ্বারা—ভর্ৎসনার দ্বারা এই জঘন্য কার্যে উদ্যোহিত করেছিল। বলেছিল কর্তব্যসাধনের জন্য সে তার ক্রোড়ের সন্তানকে স্তন থেকে ছিনিয়ে তার মস্তক চূর্ণ করে তাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু পাপের অনুশোচনায় তার উন্নত মস্তক নত হয়ে পড়ল। নিশীথের অন্ধকার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল; নিদ্রার কোমল স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হল। দিনরাত সে ধোয় তার রক্তমলিন হাতটি। রক্তের দাগ আর কিছুতেই যায় না। "এক, দুই, তিন, নিখিল আরবের সকল সুগন্ধি কি আমার ছোট্ট হাতখানি সৌরভান্বিত করতে পারে না?" তার বুকফাটা হাহাকার এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নরকের গাঢ় অন্ধকার যেন তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। তাই দিনরাত বাতি জ্বালিয়ে রাখে। কী ভীষণ কল্পনা! অনুশোচনার এই যে দৃশ্য তা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে আর একটিও নাই। কোন সাহিত্যেই আছে কি?

কিন্তু শুধু বিয়োগান্ত নাটকেই নয়, মিলনান্ত নাটকেও শেক্সপীয়রের কৃতকার্যতা কোন অংশে কম নয়। আমরা যখন তাঁর মিলনান্ত নাটকের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করি তখন যেন একটা স্বপ্নলোকে আপনাকে হারিয়ে ফেলি। এ হয়ত একটা বনভূমি, উদ্যান বা সাগরউপকূল—পৃথিবীর কোলাহল এখানে পৌঁছাতে পারে না। এখানে প্রেমের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কোন চক্রান্ত নাই। সম্মোহিত এই কাননভূমির মধ্যে যে প্রবেশ করে সে পশ্চাতে ফেলে আসে হিংসা, ক্রূরতা, বিদ্বেষ, তার রক্ত-নগর-দম্ভের আস্ফালন। এই খোলা মাঠের খোলা হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ভেসে আসে পাখীর গান, ফুলের সৌরভ। তরুণ তরুণীর মিলন ক্ষেত্র এখানে। প্রথম দর্শনেই তারা মুগ্ধ হয়। যা কিছু বাগবিতণ্ডা, দ্বন্দ্বকলহ, গোপন মন্ত্রণা সবই প্রেমের। এখানে অন্ধকারের পরিবর্তে তরল প্রভাত-আলোক। ছুরিকার পরিবর্তে কুসুমাঘাত। তরল হাসি, চটুল রসালাপ নৃত্য ও গান মুখরিত করে বনভূমি। A Mid Summer Night's, Dream, As you Like it ও Twelfth Night এই চিত্রটি তুলে ধরে। বিয়োগান্ত নাটক গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শোকতপ্তশান্তির বার্তা ও মিলনান্ত নাটক লঘু আনন্দ —যৌবনের আনন্দ—পরিবেশন করে। সৃষ্টি করে একটি স্বপ্নলোক যেখানে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তালের সঙ্গে শীতের দেশের উইলো, উত্তরের ওকের সঙ্গে দক্ষিণের জলপাই কোলাকুলি করে আছে। যেখানে ফোটে সব দেশীয় ও সব ঋতুর ফুল এক সঙ্গে। সে দেশের কোন ভৌগলিক পরিচয় নাই। সে দেশে সাপের দাঁতে বিষ নাই, বাঘ সিংহ ভয় দেখায়, মারে না। চিরবসন্ত সেইখানে; সেইখানে প্রেম ও শান্তি নিত্যবিরাজিত।

এই হ'ল শেকসপীয়র-প্রতিভার সামান্য একটু পরিচয়। এই জন্যই সকল দেশের, সকল কালের মানবহৃদয়ে শেক্সপীয়রের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত।

শেক্‌স্‌পীয়র সমালোচনা: বিভিন্ন শতকের দৃষ্টিভঙ্গী

কেতকী কুশারী

ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচনার স্থান পরিমাণ ও গুরুত্ব এই দুই দিক থেকেই অত্যন্ত বিশিষ্ট। এই সমালোচনার প্রকৃত কেন্দ্র এলিজাবেথীয় যুগ থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়রের রচনার মৌল উৎকর্ষের দৃঢ় স্বীকৃতি, যে স্বীকৃতি এসেছে শুধু সমালোচকদের কাছ থেকেই নয়, ব্রিটেনের পাঠক, অভিনেতা, নাট্যদর্শক এক কথায় জনসাধারণের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতে তাঁর স্বীকৃতি এসেছে ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে; যদিও সাধারণত এ কথা সুবিদিত নয়, তবু ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভুক্ত হ'তে ইংরেজী সাহিত্যের বেশ দেরী হয়েছিল, কারণ সেখানকার পাণ্ডিত্যের জগতে গ্রীক-লাতিনের মহিমাই বহুকাল একচ্ছত্র থেকে এসেছে, যেমন আমাদের দেশে সংস্কৃতের। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সমালোচনা বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিলো; তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শেক্‌স্‌পীয়র-সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা শিক্ষাজগতেরও অঙ্গীভূত হোলো। শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচনার ঐতিহাসিক ধারাটির দিকে গোড়া থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাকালে শ্রেণীনির্বিশেষে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার একটি স্বীকৃতি, এবং সে-সম্পর্কে ইংরেজের জাতিগত একটি স্বাভাবিক গৌরববোধ—এ দু'টি জিনিস চোখে পড়ে। এ-প্রসঙ্গে কোলরিজ সর্বকালের জন্য একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন: যে ইংরেজ গর্ব এবং সস্নেহ শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যতীত উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের নাম উচ্চারণ করতে পারে সে সমালোচক-পদের যোগ্য নয়।

সমসাময়িকদের কাছ থেকে এই সস্নেহ এবং সশ্রদ্ধ সমাদরই শেক্‌স্‌পীয়র পেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁকে "আপনার জনের" মত দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতা লক্ষিত হয়: অনেকটা যেন অন্যান্য ভাইয়েরা একজন বিশেষ-ভাবে গুণী এবং কৃতী ভাইকে প্রাণপণ প্রশংসা জানাচ্ছে। তাতে ভ্রাতৃসুলভ সমভাব আছে, দূরত্ব নেই, নাট্যরস-উপভোগের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর আছে, ঈর্ষা নেই, জনহৃদয়ের উপর তাঁর গভীর প্রভাবের সাক্ষ্য আছে, আবার তাঁর অবশ্যম্ভাবী স্খলন-পতন-ত্রুটির উল্লেখও আছে। সমসাময়িকেরা স্বভাবতই পরবর্তীদের থেকে অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীকে দেখে থাকে: শিল্পীর অমরত্ব উপলব্ধি করতে পারলেও সঙ্গে সঙ্গে একটা নৈকট্যজনিত সৌহার্দ্যরসও তারা অনুভব করতে থাকে। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে শিল্পকে একত্রে মিলিয়ে দেখবার ফলে তারা শিল্পী-সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কথা বলে। পক্ষান্তরে পরবর্তীরা শিল্পীকে দেখে বেদীতে স্থাপিত মূর্তির মত—দূর থেকে, এবং অন্তর্বর্তী কালের সঞ্চিত ও ঘনীভূত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে।

ফলত ১৬২৩ সালে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম ফোলিও সংস্করণের ভূমিকায় হেমিঞ্জ এবং কণ্ডেল প্রকাশকদ্বয় অকপট বন্ধুসুলভ বিশ্বাসে ইংলণ্ডের "বিচিত্র পাঠকসম্প্রদায়কে" উদ্দেশ করে বলেন: 'আপনারা জানুন, এই নাটকগুলির

বিচার আগেই হয়ে গেছে, এদের বিরুদ্ধে কোনো আপীলই খাটেনি ; আদালতের হুকুম অনুসারেই এরা খালাস হয়ে এসেছে, কোনো তদ্‌বির লাগে নি।" এই আদালত, বলাই বাহুল্য, এলিজাবেথীয় প্রেক্ষকসমাজ। সমসাময়িকেরা স্বভাবতই শেক্‌স্‌পীয়রের এই অবিসংবাদিত প্রত্যক্ষ সাফল্যকে তার গণতান্ত্রিক মূল্য দিয়েছিলেন ; এলিজাবেথীয় যুগের গৌরব এই যে তার জনসাধারণের প্রমোদপরিবেশক হিসাবে সে শেক্‌স্‌পীয়র-জনসন-মার্লোকে পেয়েছিলো, এবং এ অর্থে এঁরা লোকশিল্পী। বিংশ শতাব্দীর দুর্ভাগ্য এই যে সে স্থান এখন নিয়েছে টেলিভিশন, যা লোকরঞ্জক হ'লেও লোকশিল্প এখনও হ'তে পারে নি, এবং তার সঙ্গে এই শতাব্দীর প্রকৃত শিল্পচর্চার কোনো যোগসূত্র নেই বললেও ত্রুটি হয় না। বেন জনসনও জোর দিয়েছেন শেক্‌স্‌পীয়রের লোক-সমর্থিত কৃতিত্বের উপরে : "Tis true, and all men's suffrage"। শেক্‌স্‌পীয়র নির্বাচিত প্রতিনিধি ; ইংলণ্ডের তদানীন্তন সমাজের তথা য়োরোপীয় রেনেসাঁসের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ; ক্রমে ক্রমে মানবহৃদয়ের সাধারণ পার্লামেন্টেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বেন জনসন বুঝতে পেরেছিলেন যে লিলি, কিড, মার্লো, এঁদের চাইতে শেক্‌স্‌পীয়রের কৃতিত্ব আরও কত ঊর্ধ্বে ; এমন কি অল্প লাতিন এবং আরও অল্প গ্রীকের জ্ঞান নিয়েই যে শেক্‌স্‌পীয়র গ্রীসের ঔদ্ধত্য বা রোমের দর্পের সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা চালাতে পারেন এবং পরিণামে সর্বকালের বরমাল্য অর্জন করবেন তাও বেন জনসনই ১৬২৩ সালে প্রথম ফোলিওতে সংযুক্ত তাঁর প্রিয় কবির উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাটিতে বলে যান।

"Triumph, my Britain, thou hast one to show,
To whom all scenes of Europe homage owe
He was not of an age, but for all Time !"

বেন জনসন নিজে ছিলেন পণ্ডিত লোক এবং ধ্রুপদী রুচির নাট্যকার। গ্রীকলাতিনে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিলো প্রচুর। এদিকে শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন প্রকৃত রোমান্টিক, "নিয়ম" ভাঙতে ওস্তাদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুঃসাহসী এবং সে সময়কার কবিদের যতটা লাতিনজ্ঞ হওয়া দরকার ততটা পুরোপুরিই, তবে পণ্ডিতী প্রবণতা নিয়ে নয়, তাঁর নাট্যশিল্পের গতিশীল বিচিত্র প্রয়োজনের খাতিরে, নূতন রীতি উদ্ভাবনের, নূতন শব্দ-সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় ও তাগিদে। নাটকরচনা ও ভাষাব্যবহারের অনেক ব্যাপারেই এই দুই শিল্পী ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন ; এঁদের দুজনের মধ্যে যে "wit-combat" হোতো টমাস ফুলার তার উল্লেখ ক'রে গেছেন। এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যরচনায় বেন জনসনের স্থান শেক্‌স্‌পীয়রের পরেই : কাজেই বেন জনসনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসাঞ্জলি যে কতখানি মূল্যবান তা সহজেই অনুমেয়। বেন জনসনের মতে শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন মন-খোলা দিল-দরিয়া চরিত্রের লোক, তাঁর কল্পনা ছিলো চমৎকার, চিন্তা সুন্দর, ভাষা সুচারু, এবং ভাষাব্যবহারে তিনি ছিলেন স্রোতের মত সাবলীল, এতই স্বচ্ছন্দ যে মধ্যে মধ্যে তাঁকে থামানোরই দরকার পড়তো, নইলে তিনি শব্দের তোড়ে অনেক মজাদার কথাও বলে ফেলতেন। নাটকের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধেই জনসন এ কথা বলেছেন, এবং "জুলিয়াস সীজার" থেকে উদাহরণও দিয়েছেন। এ সত্ত্বেও বেন জনসনের মতে সামগ্রিক বিচারে এই সব স্খলন নিতান্তই ক্ষমার্হ, কারণ তাঁর প্রিয় কবির রচনায় সর্বত্রই ত্রুটির চাইতে শ্লাঘনীয় গুণই বেশি।

স্থানাভাবের জন্য এই প্রবন্ধে বিভিন্ন শতকের শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচনার মূল কাণ্ডটির কথাই আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি ; অন্যান্য অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আছে যেগুলিকে উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এই মূল ধারাটিকে অনুসরণ করতে থাকলে সপ্তদশ শতকের শেষে ড্রাইডেনে চলে আসতে হয়। এ যুগে ইংরেজী সাহিত্যে সমালোচনা-নামক

বিভাগটি দৃঢ়তর হয় ; ইংরেজী গদ্য প্রাচীনপন্থী বাক্যগঠনরীতি থেকে মুক্তি পায়, রয়াল সোসাইটির প্রভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও সহজ রচনাশৈলী সমাদৃত হ'তে থাকে, এবং সাহিত্যের অভিপ্রায়ই বা কি, তার প্রচেষ্টা এবং প্রণালীই বা কি—এই নিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা চলতে থাকে। সমসাময়িক ফরাসী জগতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক প্রভাবে ইংলণ্ডে এক "নব্য ক্লাসিসিজমের" সূত্রপাত হয়। নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে যে স্থানগত ও কালগত ঐক্যকে শেক্‌স্‌পীয়র এবং অন্যান্য রোমান্টিক নাট্যকারেরা মোটামুটি উপেক্ষা করেছিলেন তার দাম আবার বেড়ে যায়। বস্তুত, নব্য ক্লাসিসিজমের সূচনা যেন জনসনেই আছে ; কিন্তু উত্তরসাধক ড্রাইডেনই তাকে পরিণতি দিলেন। ড্রাইডেনের চিন্তাতে তাই নাট্যরচনার বিভিন্ন তত্ত্বীয় সমস্যাগুলি, যেমন "ঐক্যত্রয়" মেনে চলার ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সংমিশ্রণ সমর্থনযোগ্য কি না, বারবারই ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। এই যুগ এবং পরবর্তী শতকে ফরাসী নাটক এবং সমালোচনার প্রভাবে শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে গুণিজনদের মধ্যে একটা দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সহৃদয় ইংরেজ পাঠক হিসেবে এঁরা শেক্‌স্‌পীয়রের উদাত্ত মুক্তচ্ছন্দের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না, এবং যখনই গুণগ্রাহীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তখনই উদার প্রশস্তি লিখে যান। কিন্তু "সমালোচনার যথার্থ নিয়ম" অনুসারে বিচার শুরু করতে গেলেই তাঁর খুঁতগুলি নজরে আসে এবং অমার্জনীয় মনে হয়। এই দোলাচল মনোবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝামাঝি একটা রফা। শেক্‌স্‌পীয়র "প্রকৃতির সন্তান", তিনি কড়াকড়ি পছন্দ করতেন না, বইপত্র ঘেঁটে লিখতেন না, নিয়মের ধার ধারতেন না ; অর্থাৎ তিনি একরকমের অশিক্ষিতপটুত্বের জোরেই এত চমৎকারিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত কমবেশি ঝোঁক দিয়ে প্রচারিত করা হয়। যেমন ১৬৬৮ সালে ড্রাইডেন শেক্‌স্‌পীয়রকে ক্লাসিক আধুনিক উভয় জগতেরই উদারতম আত্মা বলে ঘোষণা করছেন : অন্যান্যদের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়র যেন বনের মধ্যে দীর্ঘ সাইপ্রেস গাছ ; হোমারের সঙ্গে ভার্জিলের যে সম্পর্ক শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে যেন জনসনের তাই। শেক্‌স্‌পীয়রের পটুত্বের পিছনে যে প্রাকৃত, অশিক্ষিত পটভূমিকা ধরে নেওয়া হয়েছে তার উপরে ড্রাইডেন কিন্তু তত বেশি মৌখিক জোর দেন নি। আবার অশিক্ষিতপটুত্বের দিকটাতে বেশি জোর দিয়েছেন অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশে পোপ। "তাঁর নানাবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি অতুলনীয়" এই কথা এ সময়ে বারবার শোনা যেতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ডাঃ জনসনেও ত্রুটির দিকটা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হয়। ডাঃ জনসনের শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচনা নিজেই একটি বিরাট বিষয়—তার আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয় ; তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ডাঃ জনসন বেশ স্কুলমাস্টারী ভঙ্গীতে শেক্‌স্‌পীয়রের বিচার করেছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র যেন এমন একজন মেধাবী এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্র যার দুষ্টমির দিকে হামেশাই গতি এবং যাকে সেজন্য কড়া নজরে রাখতে হয় এবং থেকে থেকে ধমকধামকও দিতে হয় ; যখন সে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় তখন মাস্টারমশাইয়েরও আনন্দের সীমা থাকে না। এক দিকে জনসন তথা অষ্টাদশ শতকের সুদৃঢ় রক্ষণশীল রুচি ও অভ্যাস, আভিজাত্যবোধ এবং নৈতিক শুচিবায়ু, অন্যদিকে জনসনের স্বকীয় সাহিত্যবোধ এবং সাধারণ জ্ঞান—এই দুই বিপরীতমুখী বলের দ্বন্দ্বে যে বিচিত্র সমালোচনার সৃষ্টি হয় তা একান্তভাবে বিশিষ্ট। ফলে জনসন একাধারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখপাত্র এবং স্বতন্ত্র প্রতিভা হিসাবে পরিচিত হ'তে পেরেছেন। এক দিকে এই দৃঢ়শক্তির সাহায্যে তিনি শেক্‌স্‌পীয়র-কৃত স্থান-ও কাল-ঘটিত ঐক্যের লঙ্ঘন এবং ট্র্যাজেডি-কমেডির সংমিশ্রণকে

সমর্থন জানাতে পেরেছিলেন এবং শেক্স্‌পীয়রের বনানী-তুল্য বিচিত্র প্রতিভার সম্মুখে মাথা নত করেছিলেন, অন্য দিকে তিনি শেক্স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিকে তাঁর কমেডির চাইতে কম মর্যাদা দিয়েছিলেন, সুনীতির প্রচারে শেক্স্‌পীয়রের অবহেলাকে ক্ষমা করতে পারেন নি এবং কি ডেসডেমোনা কি ক্লিওপেট্রা কি জুলিয়েট কারও প্রেমোন্মাদনা বরদাস্ত করতে পারেন নি। এক দিকে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যুগের নবলব্ধ সচেতনতাকে তিনি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তাঁর শেক্স্‌পীয়র-ভাষ্যে : যার ফলে শেক্স্‌পীয়রের তিনিই প্রথম ঐতিহাসিকদৃষ্টি-সম্পন্ন ভাষাবিদ পণ্ডিত সম্পাদক, যিনি পূর্বসূরী ওয়ারবার্টনের একাধিক টীকাকে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছেন; আবার অন্যদিকে শব্দের জগতে তিনি আভিজাতিক মূল্যবোধে দারুণ বিশ্বাসী, যার ফলে dun শব্দটি তাঁর মতে কেবল আস্তাবলের সহিসের উপযুক্ত এবং knife রান্নাঘরের বাবুর্চির, এবং "ম্যাকবেথে" এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ তাঁর মতে রসভঙ্গ এবং হাস্যোদ্রেক করে।

১৭৭৭ সালে প্রকাশিত মরিস মর্গ্যানের ফলস্টাফের উপরে বিখ্যাত প্রবন্ধ শেক্স্‌পীয়র-সমালোচনার ইতিহাসে প্রথম রোমান্টিক অধ্যায়ের সূচনা করে। এবং পরবর্তী শতকে শেক্স্‌পীয়র-সমালোচনার জগতে এক হাওয়াবদল শুরু হয়, যে অবস্থান্তরের সঙ্গে জড়িত কোলরিজ, ল্যাম, হ্যাজলিট ইত্যাদি স্মরণীয় সমালোচকদের নাম। এই শতকের চিন্তাধারা তথা সমালোচনারীতির সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত পঠন-পাঠনপদ্ধতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এই শতকের সমালোচকেরা আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং মোটামুটিভাবে এঁদের প্রদর্শিত পথই আমরা অবলম্বন করে থাকি। এই সমালোচকগোষ্ঠী বিগত শতকের শেক্স্‌পীয়র-সংক্রান্ত দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। "প্রকৃতির সন্তান" হিসাবে পণ্ডিতী পৃষ্ঠপোষকতার যে ভঙ্গীতে তাঁকে গত শতকে দেখা হোতো সেটা উনিশ শতকী রসিকদের কাছে অসহ্য ধৃষ্টতা বলে মনে হ'তে লাগলো। তাঁরা শেক্স্‌পীয়রের রচনাকে অশিক্ষিত-পটুত্বের নিদর্শন হিসাবে না দেখে সহজাত প্রতিভা এবং অনুশীলিত শিল্পের সমন্বয় হিসাবেই দেখতে শুরু করলেন। স্কুলমাস্টারী কায়দায় কবির পতনের তালিকা রচনা না করে তাঁরা তাঁর উৎকর্ষের মহান ব্যাপ্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এ যুগের বিশিষ্ট অবদান হোলো শেক্স্‌পীয়রের "গণতান্ত্রিক" ভাষাচেতনাকে স্বীকৃতিদান এবং এ ক্ষেত্রে আভিজাতিক কুসংস্কার বর্জন; তাঁর বহুমুখী কল্পনাশক্তির, উপমা-চিত্রকল্প-প্রয়োগের, অভিপ্রেত ছান্দস পরীক্ষানিরীক্ষার এবং প্রাণবন্ত চরিত্রচিত্রণের যথাযোগ্য সমাদর। আসলে এঁরা ঠিক সমালোচকের ভূমিকা নিলেন না, নিলেন সমঝদারের, এবং কবির দোষগুণকে তুলাদণ্ডে মাপজোক না করে তাঁর রচনার সৌন্দর্য এবং তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন। অবশেষে সমালোচনা-জগতে শেক্স্‌পীয়রের শিক্ষিতপটুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হোলো। শেক্স্‌পীয়র নিয়ম মানতে পারতেন না বলে নিয়ম লঙ্ঘন করতেন তা নয়, আরও অর্থবহ কোনো নিয়মের অনুশাসনে ছোটখাট নিয়ম বাতিল ক'রে দিতেন। কোলরিজ তাঁর বিখ্যাত কল্পনাতত্ত্বের পটভূমিকায় শেক্স্‌পীয়রকে স্থাপন করলেন, এবং শেক্স্‌পীয়রের চূড়ান্ত উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করলেন। "রোমিও-জুলিয়েট", "অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রা", "হ্যামলেট", "ম্যাকবেথ", "ওথেলো", "কিং লীয়র" এবং আরও অন্যান্য নাটক তথা শেক্স্‌পীয়রের যৌবনের খণ্ডকাব্য দু'টি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং এই শতাব্দীতে স্বীকৃত। এই ব্যাখ্যারূপ পদ্ধতির একটি বিপদ হোলো এই যে আলোচ্য বিষয় এবং আলোচকের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখা মুস্কিল। রোমান্টিক ব্যাখ্যাতারা নাটকের চরিত্রদের এত অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তরঙ্গতা নিয়ে দেখতে শুরু করলেন যে তারা যে আর্টের সৃষ্ট, জীবনের নরনারী নয়, এ

কথা মধ্যে মধ্যে ভুলে যেতে লাগলেন। এ দিক দিয়ে তাঁদের স্থিতি স্বভাবতই এলিজাবেথীয় প্রেক্ষকদের সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে। শেক্স্পীয়রের নাটকগুলিকে উনিশ শতকী ব্যাখ্যাতারা ঠিক নাটক হিসাবে না দেখে প্রায়ই কাব্য হিসাবে দেখতে লাগলেন; ফলে নানারকম বিভ্রান্তি, যথা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ("How many children had Lady Macbeth ?") বা অবাস্তব সিদ্ধান্ত দেখা দিতে লাগলো। দ্বিতীয় বিভ্রান্তির উদাহরণস্বরূপ "কিং লীয়র' অভিনয়যোগ্য নয়, কেবল কল্পনার দ্বারা বোধ্য, ল্যাম্বের এই মত উল্লেখযোগ্য।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত ব্র্যাডলীর শেক্স্পীয়র ট্র্যাজেডির উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ উনিশ শতকী মন্ময় রীতিরই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। শেক্স্পীয়রের ছাত্র পাঠক মাত্রেরই অতিপরিচিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন; এই রীতির অনস্বীকার্য গুণ এবং অবশ্যম্ভাবী কতগুলি ভ্রান্তি এবং অপূর্ণতা—উভয় সম্পর্কেই বিশ শতক অবহিত হবার চেষ্টা করেছে।

উনিশ শতক আর বিশ শতকের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট বিরোধিতা বা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আমি দেখি না। কাব্যরসগ্রাহিতার ব্যাপারে এ যুগের যে শ্রেষ্ঠ অবদান—শ্রীমতী স্পার্জনের চিত্রকল্প-বিশ্লেষণ এবং তার আদর্শে উইলসন নাইটের "thematic" পর্যালোচনা—তাকে আমার কোলরিজের কল্পনাতত্ত্বেরই অনিবার্য পরিণাম ব'লে মনে হয়। তবে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া কতগুলি আছে, তা ছাড়া আছে বিশ শতকে সমালোচকদের ঐতিহাসিক ধারণার উন্নতির কতগুলি ফল। প্রথমত শেক্স্পীয়রের পাঠনির্ধারণ এবং দ্বিতীয়ত এলিজাবেথীয় সমাজের আচারব্যবহারের যথার্থ চিত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা: এই দুইটি দিকে গবেষণার ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে কতগুলি তথ্যগত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাঠনির্ধারণের আকাশে একদল "disintegrationist" বা ব্যবচ্ছেদপ্রিয় সমালোচক উঠে আবার মিলিয়ে গেছেন। গ্র্যানভিল-বার্কার শেক্স্পীয়রকে আবার রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং আমাদের অবহিত করেছেন যে শেক্স্পীয়রের নাটক একাধারে কাব্য এবং নাটক, শুধুমাত্র কাব্য নয়। আরও একটি বিদ্যা যা শেক্সপীয়র-সমালোচনাকে গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে তা হোলো ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের চর্চা। অষ্টাদশ শতকের ভাষাবিচারের কৃত্রিম প্রণালীর বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উত্তর। শেক্স্পীয়রে ব্যবহৃত বহু শব্দের অর্থই ইংরেজীতে এখন বদলে গেছে; এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই অনুশীলিত ভাষাতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া তাঁর মৌলিক অর্থের পুনরুদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রেই, যেখানেই নাট্যকারের উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে অস্পষ্ট মনে হয়, সেখানেই ভাষাতত্ত্বের দিশারী টর্চ আলোকপাত করতে সক্ষম হয়। "নাটকের ঐ মুহূর্তে ঠিক কি কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন"—এর বস্তুনিষ্ঠ নিশানা দিতে ভাষাতত্ত্ব যেমন পারে তেমন আর কিছু নয়। এই বিদ্যার একাগ্র তন্ময়তা মন্ময় রীতির একাধিক বিপদ থেকে সমালোচককে রক্ষা করে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে তন্ময় এবং মন্ময় এই দুই রীতির সুষ্ঠু সমন্বয়েই সার্থক সমালোচনার জন্ম হয়। এবং বিশ শতকের যাঁরা যাঁরা টনটনে মাত্রাজ্ঞান নিয়ে শেক্স্পীয়র-চর্চায় ব্যাপৃত হন—এটা খানিকটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার ফল—তাঁরা অত্যন্ত সাবধানে ঐতিহাসিক জ্ঞানের তন্ময়তা এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মন্ময়তা এই দুয়ের মাঝামাঝি বুদ্ধকথিত পথে চলাফেরা করেন। তবে "নির্ভুল" বা "শুদ্ধ" সমালোচনার রীতি একটা সাময়িক স্থিতির লক্ষণ, যা বিশিষ্ট এক রূপে অষ্টাদশ শতকে এসেছিলো, এবং আমার মনে হয় অন্য আরেক রূপে বিশ শতকের এই শেষার্ধেও দেখা দিয়েছে। উনিশ শতকী রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই অবস্থা অনিবার্য ছিলো। তবে

আমার মনে হয় জীবনেও যেরকম ভারসাম্যসম্পন্ন চরিত্র অপেক্ষা কোনো একটি বিশেষ দিকে ঝোঁক আছে এরকম মানুষই বেশি দেখা যায়, সমালোচনাও সেরকম আদর্শ মধ্যপথে বেশিদিন চলতে পারে না—কিছু দিন বাদেই সোজা সড়ক ছেড়ে আবার সে অলিগলি বনজঙ্গল মেঠো পথে অ্যাডভেঞ্চার শুরু করে। বস্তুত, সমালোচনাও বহুদিন যাবৎ-ই একরকম সৃষ্টিশীল সাহিত্যে দাঁড়িয়েছে : কাজেই তারও নিজের মনের মত একটি বিশেষ প্রিয় সুরে গীত না গাইলে মন ভরে না। চরম বিচারে উৎকৃষ্ট সমালোচনা তাই বেশ খানিকটা মন্ময় হ'তে বাধ্য : এমন কি তা না হ'তে পারলে তার মুক্তি নেই, নইলে সে পঞ্জীতে পর্যবসিত হবে। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার সমস্ত গুণের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকের কাছ থেকে তাঁর স্বকীয় গুণগ্রাহিতার স্বাদটিও আমরা পেতে চাই—তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার খবর নিতেও আমরা উৎসুক। আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে এই দিকটির মূল্য বর্ধিততর। সুতরাং মনে হয় যে শেক্সপীয়র-সমালোচনা শিগগিরই কোনো একটি বিশেষ দিকে মোড় নেবে, এবং রোমান্টিক রীতির উৎসাহ এবং আবেগ হয়তো ফিরে আসবে। লক্ষণীয়, সামাজিক আচারের সাহজিকতা ("informality"), আবেগময়তা, বিশ্বাস ইত্যাদির দিকে একটা ঝোঁক তরুণতমদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। শেক্সপীয়রের উদার দিল-খোলা প্রকৃতির সঙ্গে এই প্রবণতার খানিকটা আত্মীয়তা আছে ; এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে "দি গ্রেট বীট," "দি গ্রেট বোধিসত্ত্ব," বা সস্নেহে "দি গ্রেটেস্ট ল্যাড অব দেম অল" নামে ভূষিত হ'তে দেখলেও অবাক হবো না !

● সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৩%

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৫%

● আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেডঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সনেট ১

কামনা-বর্দ্ধক যতো আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপসীরা,
ফলত ভাবছি বুঝি শুকোবে না সৌন্দর্য্য-গোলাপ,
কিন্তু পরিণামদাতা, নিতে গেলে সময়ের মাপ,
অবশ্য ক্ষয়িষ্ণু, তার নম্র বংশধরে যদি পীড়া
দেয়ও বা পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি। তুমি, সঙ্কুচিতা
নিজের উজ্জ্বল চোখে, আপন সত্তার কাঠ-খড়
পুড়ে পুড়ে আলোশিখা দীপ্ত রাখো, মনে জানো কি তা,
দুর্ভিক্ষ আনো যে ছিল যেখানেই সমৃদ্ধির ঘর,
তুমিই তোমার বৈরী, আপনার মাধুর্য্যের প্রতি
অত্যন্ত নির্ম্মম। তুমি অধুনা যে তাজা এক শোভা
পৃথিবীর এবং তুমিই রঙদার বসন্তের দূতী
আপন কুঁড়িতে ঢেকে রাখো স্বীয় বস্তু মনোলোভা
তুমিই মৃদুলা গ্রাম্য অপচয়ী কৃপণের মতো।
পৃথিবীকে দয়া করো, অথবা রাক্ষসী হও, মেয়ে,
পৃথিবীর সব ঋণ উদরে নেওয়াই যার ব্রত,
পৃথিবী নিষ্কৃতি পাক কবর ও তোমায় বুকে পেয়ে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সনেট ৩৫

যা করেছ তার তরে আর দুঃখ সমীচীন নয় :
গোলাপে কাঁটার বাস, রূপালি ঝর্ণাও দুষ্ট পাঁকে,
মেঘাবৃত কিংবা রাহুগ্রস্ত চাঁদ, সূর্য ম্লান হয় ;
এবং মধুরতম কোরকে নাশী ঘা জেগে থাকে।
সবাই তো দোষ করে, এমন কি আমি এইবার
তোমার অনধিকারে তুলনায় দিয়েছি গরিমা,
নিজে দোষী করে, করি তোমার ভ্রমের প্রতিকার,
তাদের পাপের চেয়ে তোমার পাপেরও ঢের ক্ষমা ;
তোমার ইন্দ্রিয়গত অপরাধে যোগাই চেতনা—
স্বপক্ষের ওকালতি করাও বিরুদ্ধ পক্ষ দিয়ে—
আমার বিপক্ষে এক মামলার যে করেছে সূচনা।
এমনই গৃহযুদ্ধ আমার প্রেম ও ঘৃণা নিয়ে,

যে আমাকে সহায়তা করতে হবে তারই কুক্রিয়ায়
যে মধুর চোর, যে বিষণ্ণ হয়ে সব নিয়ে যায়।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সনেট ৪৮

কী সজাগ ছিলাম যে—পথ বেছে নিলাম যেদিন—
বেঁধে নিতে অকিঞ্চিৎকরকেও সত্যতম শিকলের তলে
যাতে ক'রে প্রয়োজনে পাই তাকে কলুষবিহীন
মিথ্যার স্পর্শাতীত, ধ্রুবতম প্রত্যয়-মহলে।
কিন্তু তুমি, যার কাছে আমার মাণিক-রত্ন অকিঞ্চিৎকর,
মহার্ঘতম সুখ, আজ আমার দুঃখ তীব্রতম,
তুমি, প্রিয়তমদের শ্রেষ্ঠতম, আর আমার ধ্যানের দোসর,
আজ তুমি পরিত্যক্ত, সর্বেতর তস্করের কাছেও সুগম।

আর-কোনও সিন্দুকেই কখনো তো বাঁধিনি তোমায়—
যেখানটা তুমি নেই তবু যেন আছ ভাবি আমি
আমার এ-হৃদয়ের সেই নম্রতম আঙিনায়,
যেখানে স্বেচ্ছায় তুমি আসতে-যেতে পার দিবা-যামী ;
কিন্তু, বড় ভয় লাগে, সেখানেও হারাব তোমাকে,
সত্য-ও তস্কর হ'য়ে এত প্রিয় বর পানে লালায়িত থাকে।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সনেট ৫৫

মর্মর কিংবা স্বর্ণিম রাজন্যের স্মৃতিসৌধগুলি
এই দৃঢ় ছন্দাপেক্ষা হবে নাকো ঢের বেশি স্থায়ী,
তুমিও উজ্জ্বলতর রবে এতে, সময়ের ধূলি
অমার্জিত প্রস্তরে যেহেতু তার হাত রেখে যায়ই ;
বিধ্বংসের যুদ্ধে সব স্ট্যাচুগুলি উল্টেপাল্টে গেলে
আর ঝড় উন্মূলিত করলে কারুকর্মের রচনা
ঈশ্বরের তরবারি কিংবা যুদ্ধ তার অগ্নি জ্বেলে
পারবে না পোড়াতে তব স্মৃতির জীবন্ত লিপিকণা।
মৃত্যু, সর্ববিস্মৃতির শত্রুতার বিরুদ্ধে তুমি যে
এগিয়ে যাবেই : তব স্তুতি করে নেবে স্থান তার
পরবর্তীকালেরও দৃষ্টিতে, জেনো সেই কাল নিজে
পৃথিবীকে ক্ষয় করে নিয়ে যায় ধ্বংসের ওপার—
সেজন্যে বিচারাবধি—যা তোমার প্রয়াসনির্ভর—
এতে থাকো, বাস করো প্রেমিকের দৃষ্টির ভিতর।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ-গবেষণার মহাগ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[১৩৭০ চৈত্র সংখ্যার পর]

। ৯ ।

কিন্তু বিবেকানন্দ যখন বাইরে লড়াই চালাচ্ছেন তখন তিনি ভিতরে সর্বাধিক শান্ত আছেন। অন্ধকারের অন্তর্লীন সেই অন্তর্জ্যোতির কথা বলতে লেখিকার এতটুকু ভুল হয়নি। এইখানেই তাঁর বড়ো কৃতিত্ব—তিনি কখনো ভুলে যাননি, বিবেকানন্দ মূলে অধ্যাত্ম চরিত্র। বিবেকানন্দের 'ডায়নামিক' বিশেষণ তাঁর স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে যে ধারণাগত ভ্রান্তি ঘটায়, তাকেও লেখিকা দূর করেছেন। ডায়নামিক তিনি, নিশ্চয়ই, কিন্তু 'এক্সপ্লোসিভ' নন। স্বামীজীর পত্র থেকে অংশ তুলে লেখিকা দেখিয়েছেন, ঈশ্বরসান্নিধ্যের কী অপূর্ব কাব্য তিনি রচনা করে চলেছেন, যখন দুর্ভাগ্যের রূপ দেখে মনে হয়, বুঝি ঈশ্বর তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন।

বিবেকানন্দের এই পরমহংস-স্বরূপকে,—ঈশ্বরাদিষ্টের ভূমিকাকে লেখিকা ঘটনার পর ঘটনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আশ্চর্যজনক সেই সব কাহিনী, বিদ্যুৎ-চমকের মত তা মানুষের অন্তর্জীবনের রহস্যে আলোকসম্পাত ক'রে তার গভীরে আমাদের ব্যগ্র নয়নকে আকৃষ্ট করে। আমি দুটি ঘটনার উল্লেখ করব, যেগুলি বহির্গতভাবেও বিশেষ চমকপ্রদ। প্রথম ঘটনাটি বিখ্যাত আমেরিকান ধনকুবের ও দানবীর জন ডি রকফেলার সংক্রান্ত।—

"স্বামীজী তখন চিকাগোর মিঃ 'এক্স'-এর চিকাগোর বাড়িতে ছিলেন। মিঃ এক্স, জন ডি রকফেলারের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়ের সূত্রে জড়িত ছিলেন। বহু সময়ই রকফেলার 'অপূর্ব অত্যাশ্চর্য' হিন্দু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের কথা বলতে শুনেছিলেন, এবং বহু সময়ই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, তিনি সকল সময়েই সাক্ষাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সে সময়ে রকফেলার তাঁর সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেন নি, তবু তখনি তিনি যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। এই দৃঢ়চেতা মানুষটিকে ইচ্ছামত নাড়ানো যেত না এবং উপদেশ শুনবার পাত্রই তিনি ছিলেন না।

কিন্তু একদিন রকফেলার, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের যদিও কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তবু কোনো এক আকর্ষণে চালিত হয়ে বন্ধুর বাড়িতে সোজা চলে এলেন এবং যে বাটলার দরজা খুলে দিল তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"বাটলার স্বামীজীর অবস্থানকক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলে বিনা ঘোষণায় রকফেলার সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন। এবং তিনি বিশেষ বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন, কে এসেছে দেখবার জন্য স্বামীজী লেখার টেবিল থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

"কিছু পরে স্বামীজী, মাদাম কালভেকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি রকফেলারকেও তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন, যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে-টাকা তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন, তার মালিক তিনি নন, তিনি

নিমিত্ত মাত্র,—পৃথিবীর মঙ্গল করাই তাঁর কর্তব্য—ভগবান তাঁকে সম্পদ দিয়েছেন, যাতে করে তিনি মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারেন।

"রকফেলার বিরক্তিতে ও অস্বস্তিতে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বা তাঁকে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাহস! তিক্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আবার বিনা ঘোষণায় স্বামীজীর পাঠকক্ষে তিনি প্রবেশ করলেন, এবং স্বামীজীকে পূর্ববৎ উপবিষ্ট দেখে ডেস্কের উপরে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যার মধ্যে জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থদানের পরিকল্পনা লিখিত আছে।

"আপনার কথামতই কাজ হয়েছে, খুশী হলেন তো? আশাকরি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন",—রকফেলার বললেন।

স্বামীজী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। তারপর কাগজটি নিয়ে শান্তভাবে পড়ে বললেন, "আপনার আমাকেই ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

এইখানে শেষ। এবং এইটেই জনকল্যাণে রকফেলারের প্রথম বড় দান।'

রকফেলার সংক্রান্ত এই কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী গভীর জীবনরসময় একটি কাহিনী পাচ্ছি মাদাম কালভের ক্ষেত্রে। মাদাম কালভে ফরাসিনী, তখনকার পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর সেরা গায়িকা তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে স্বামীজীর অপূর্ব স্মৃতিকথা রেখে গেছেন। বিবেকানন্দের মধ্যে ঈশ্বর-পুরুষকে দর্শন করে 'ঈশ্বর-আনিত বিবেকানন্দের' শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম স্বামীজীর সংসর্গে আসার যে কাহিনী মাদাম কালভে পরবর্তীকালে তাঁরা আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, সেটিও মনোহারী, কিন্তু শ্রীমতী বার্ক জানিয়েছেন—মাদাম কালভে গোটা কাহিনীটি বলেন নি; সেই পূর্ণ কাহিনী তিনি বলেন ঘটনাটি ঘটে যাবার পরেই তাঁর বান্ধবী মাদাম পল ভার্ডিয়ারের কাছে। মাদাম ভার্ডিয়ার তখনি ঐ ঘটনার যে নোট রাখেন, সেই নোটটি শ্রীমতী বার্ক উপস্থিত করেছেন। ঐ নোট থেকে যে ঘটনাকে পাচ্ছি—সে যেন কোনো মহান সাহিত্য—বেদনা ও পাবনের গদ্য কাব্য। আমি এখানে শ্রীমতী বার্কের রচনা উপস্থিত করছি:

"বেশ বোঝা যায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, যখন এমা কালভে মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানীর সঙ্গে চিকাগোয় আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ঐসময়ে তিনি সাফল্যের শিখরে, সদ্য ইউরোপ ও নিউইয়র্কে কার্মেনের ভূমিকায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করে এসেছেন। পৃথিবী তখন তাঁর পায়ের তলায় সমাজের মাথা-মানুষেরা তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। স্বামীজী ঐকালে যাদের বাড়িতে আছেন (খুব সম্ভব হেল পরিবার নয়) তাঁদের সঙ্গে কালভের বন্ধুত্ব হয়েছে। দুই মহাদেশের মাথার মণি এমা কালভে কিন্তু সুখী হবার মত স্বভাব নিয়ে আসেন নি। প্রবল আবেগপ্রবণ, উৎকন্ঠিত, বাসনাময় কালভে প্রায়ই হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেন। ঐ জাতীয় ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে গভীর একটি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের বেদনাময় সমাপ্তি ঘটেছে সম্প্রতি। নিঃসঙ্গতায় ভরে আছে তাঁর মন। একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর কন্যা, যে চিকাগোয় তাঁর সঙ্গে এসেছে, যাকে বুকজোড়া ভালবাসায় তিনি আঁকড়ে রাখতে চান। এবার আমি মাদাম ভার্ডিয়ারের নিজের কথা তুলে দিচ্ছি, কারণ তার মধ্যে মাদাম কালভের মুখের কথা যথাসম্ভব বজায় আছে।

"কালভে আমাকে বলেছিলেন, অপেরায় একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন কার্মেনের গান গাইছেন তখন তাঁর স্বর এত মধুর হয়ে উঠল যা পূর্বে কখনো হয়নি; থিয়েটারে যেতে সেদিন যদিও তিনি নার্ভাস বোধ করেছিলেন, তবু প্রথম অঙ্কের পরে তাঁর ভূমিকা অভূতপূর্ব সাফল্যের অভিনন্দন লাভ করল।

"প্রথম বিরতির পরে কালভে সহসা যেন দারুণ ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, দ্বিতীয় অঙ্কে নামতে পারবেন না। তবু বিশেষ চেষ্টায় তিনি নিজেকে তৈরী করে নিলেন, এবং যদিও তাঁর মনে হয়েছিল যে, গাইতে পারবেন না, তবু গাইলেন অপূর্ব কণ্ঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের পরে ড্রেসিংরুমে এসে তিনি প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন; ম্যানেজারকে ঘোষণা করে দিতে বললেন, তিনি অসুস্থ। তিনি পূর্বের থেকেও নিজেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্তবোধ করতে লাগলেন, নিশ্বাস নিতেও তাঁর যেন কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু ম্যানেজার ও সেখানকার অন্য সকলে তা সত্ত্বেও এত জোর করতে লাগল যে, অবশেষে তাঁকে ষ্টেজে যেতেই হল। শেষ অঙ্কে তো তাঁকে কার্যত ধরাধরি করে ষ্টেজে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কালভে আমাকে বলেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে তাঁকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। কালভে আরও বলেছিলেন, এই দিনই জীবনের সেরা গান তিনি গেয়েছিলেন, আর শ্রোতারাও অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র, শ্রোতাদের অভিনন্দনের অপেক্ষা না করেই তিনি ড্রেসিংরুমে ছুটে চলে এসেছিলেন—সেখানে দেখলেন ম্যানেজার ও কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ মুখে—কালভে বুঝলেন, মর্মান্তিক কিছু ঘটেছে।

"ট্রাজিক ঘটনা হল, তাঁর কন্যা সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ছিল—সে মারা গেছে—পুড়ে মারা গেছে—যখন কালভে কার্মেনের গান গাইছিলেন। কালভে লুটিয়ে পড়লেন।

"তারপর একটা সময় এল যখন কালভে চাইলেন আত্মহত্যা করতে। তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী 'ক' এই সময় তাঁর সঙ্গে সর্বসময় থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন আর বার-বার অনুরোধ জানাতেন, তাঁর বাড়িতে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কালভে প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কালভে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর একমাত্র চেষ্টা তখন লেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা। তিনবার তিনি ঐ উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে লেকের দিকে গেছেন, তিনবারই, যেন কিসের ঘোরে, স্বামীজীর বাড়ির পথ ধরেছেন। কালভে বলেছেন, সে যেন হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জাগরণ। প্রতিবারই তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। অবশেষে, চতুর্থ কি পঞ্চম বারে তিনি দেখলেন যে, তাঁর বান্ধবীর বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর বাটলার দরজা খুলে দিচ্ছে। প্রবেশ করে ভিতরের ঘরে একটা চেয়ারে তিনি ডুবে বসে পড়লেন। সেখানে কিছু সময় তিনি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তারপরে ঠিক পাশের ঘর থেকে এক আহ্বানের স্বর শুনলেন, 'বৎসে, এখানে এস। ভয় নেই কিছু।' কালভে যন্ত্রবৎ উঠে পাশের ঘরে গেলেন, সেখানে স্বামীজী একটা বড় টেবিলের ওধারে বসেছিলেন।"

স্বামীজীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ও পরবর্তী ভ্রমণাদির বিস্তৃত স্মৃতিকথা মাদাম কালভে স্বয়ং লিখে গেছেন। সে স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, স্বামীজীর সকল বড় জীবনীতে তা পাওয়া যাবে, কিন্তু শ্রীমতী বার্ক যেটি বলতে চেয়েছেন তা হল, এ রকম ঘটনা অজস্র ঘটেছে আমেরিকায়, প্রত্যেকের জীবনে এরকম ঘটনা অজস্র ঘটেই থাকে, লিপিবদ্ধ হয় অল্পই। কিন্তু এক মহিলার শ্রদ্ধাকোমল উক্তি এই প্রসঙ্গের শেষে উদ্ধৃত না করে পারছি না স্বামীজী তখন ডেট্রেইটে; তাঁর বক্তৃতার বন্যাশক্তিতে সহর প্লাবিত। এই কালের একটি ঘটনা বলেছেন মহিলা কবি মিসেস চার্লস ইরস্কিন স্কট উড। সে ঘটনা হচ্ছে—মিস্ মার্গারেট কুক নামে এক জার্মান শিক্ষিকা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। মিস্ কুকের কঠোর জার্মান স্বভাব আবেগের ধার ধারে না। কিন্তু স্বামীজীর শক্তিতে তিনি এমনই অভিভূত হলেন যে, জীবনে প্রথম তাঁর ইচ্ছা জাগল বক্তাকে অভিনন্দিত করবেন। বক্তৃতান্তে স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে গেলেন।

করস্পর্শ করেই তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর সব কথা হারিয়ে গেল। স্বামীজী কয়েক মুহূর্ত তাঁর হাত ধরে রইলেন। মিস কুক মিসেস উডকে বলেছিলেন পরবর্তী কালে—'আমি সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে কখনো ভুলব না। তার বিরাটত্ব আর পবিত্র মহিমা আমাকে এমন গ্রাস করে ফেলল যে, আমি তাঁর স্পর্শপূত হাত তিন দিন পর্যন্ত ধুতে পারলুম না।'

॥ ৭ ॥

সর্বশেষ প্রসঙ্গে এসে গেছি। আগেই বলেছি শ্রীমতী বার্ক এই গ্রন্থে স্বামীজীর মত-বিষয়ে একটি নূতন থীসিস উপস্থিত করেছেন, এবং তার উপরই এই গ্রন্থের মূল্য প্রধানত নির্ভরশীল। অবশ্য আমরা স্বামীজী সম্পর্কে নানা অজানিত তথ্যের আবিষ্কারকে গৌণমূল্য করছি না, সেই 'উৎস'-তথ্যগুলি পরবর্তী লেখকদের পরম সহায়ক হবে, কিন্তু আমার বলবার কথা এই, শ্রীমতী বার্ক এখানেই না থেমে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে স্বামীজীর মনোজগতে আলোকসম্পাত করতে পেরেছেন আশ্চর্য মনস্বিতায়। তার ফলে তিনি স্বামীজী-জীবনের তথ্যদাতা ও ব্যাখ্যাতা দুইই হতে পেরেছেন।

স্বামীজীর কার্যধারা সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন লেখিকা এইসব তথ্যের আবিষ্কারের পূর্বেই বোধ করেছিলেন। লেখিকার মতে, স্বামীজীর জীবনীর যে কোনো অভিনিবিষ্ট পাঠকই সেই প্রয়োজন অনুভব করবেন। স্বামীজী, দেখা যাবে ধর্মমহাসভার পরে বৎসর খানেক আমেরিকার চতুর্দিকে ঝড়ের মত বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন। বক্তৃতা-কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরেও তাঁর বক্তৃতাগতি বেশ কিছুদিন অব্যাহত ছিল। কেন? স্বামীজী নিজের কষ্টের কথা বেশী বলতেন না, তবু বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ পরিশ্রম অমানুষিক। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে রাত একটা দুটো পর্যন্ত তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন—এইভাবে একই দিনে দুই জায়গায় বক্তৃতা করার জন্য কয়েক শো মাইল ছুটেছেন—ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে যে কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কেন? ১৮৯৪ সালে তাঁর তখন পূর্ণ শক্তির কাল—কেন তিনি জীবনের এই সেরা বছরে নিজেকে উজাড় করে দিলেন আমেরিকার সহরে সহরে—এ প্রশ্ন স্বভাবতই লেখিকার মনে জেগেছে। স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরাজী জীবনীতে তিনি উত্তর পেয়েছেন যে—স্বামীজী ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে, ভারতের সম্বন্ধে মিশনারী প্রচারিত ভুল ধারণা দূর করতে, এবং আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে একাজ করেছিলেন। দুঃখের হাসিতে পূর্ণ হয়ে লেখিকা প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন:

"এইসব কথা শুনে আমরা এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হই যে, বিবেকানন্দের মত প্রথম থাকের জ্যোতির্ময় মুক্ত পুরুষ তাঁর সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করেছেন ভারতের জন্য টাকা জোগাড় করতে, আমেরিকার লোকের কাছে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু রীতি ব্যাখ্যা করতে এবং শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দান করতে—যে শ্রোতাদের বড় অংশ অজ্ঞান, গোঁড়া এবং নির্বোধ!"

দুঃখের সঙ্গে হলেও দৃঢ়ভাবে লেখিকা এক্ষেত্রে স্বামীজীর জীবনীকারদের ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। তাঁরা অনেক সময়ই স্বামীজীর জীবনের গভীর দিকে দৃষ্টি দেন নি। স্বামীজীর বহিরঙ্গ কাজের প্রতি জোর দিয়ে তাঁরা তাঁকে দেশপ্রেমিক ও সমাজনায়ক করে তুলেছেন। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপন্থীরা এমনকি একথাও বলেছেন,—স্বামীজী, রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরের কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যেরা নিয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিকতা বিস্তারের ভার। এবং বিবেকানন্দ নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত না হলে ভারতের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা

হয়ে দাঁড়াতেন—এই অদ্ভুত কথা স্তম্ভিত হয়ে শুনেছেন লেখিকা। তারপর তিনি মধুরভাবে প্রশ্ন করেছেন, ভারতবাসীর কাছে না হয় বিবেকানন্দের দেশপ্রেম বড় হতে পারে, কিন্তু একজন আমেরিকানের কাছে তার মূল্য কি? সে যদি মানবজীবনে দেশপ্রেমের মূল্য স্বীকার করেও, তবু বিবেকানন্দের দেশহিতৈষণা কি তার কাছে অল্প গুরুত্বের বস্তু নয়? শ্রীমতী বার্ক না জানিয়ে পারেন নি, স্বাধীনতার পরে ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর কাছেই বিবেকানন্দের দেশপ্রেম তার গুরুগৌরব হারিয়ে ফেলবে।

তাহলে? স্বামীজীর আমেরিকা-ব্যাপ্ত ধাবমান বক্তৃতা ধারার কোন্ সঙ্গত কারণ লেখিকা দেখাচ্ছেন? বিবেকানন্দের অন্য জীবনীকারদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে—কোন্ সার্থক উত্তর তিনি উপস্থিত করেছেন?

স্বীকার করতেই হবে অপূর্ব উত্তর দিয়েছেন লেখিকা। গভীর শ্রদ্ধা ও ধ্যানের ভিতর থেকেই এমন একটা উত্তর বেরিয়ে আসে। লেখিকা বলেছেন, নতুন মহাদেশ আমেরিকায় বিবেকানন্দ হলেন প্রথম 'ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ'—তাই তাঁর ঐ ব্যাপক ভ্রমণ।

অর্থাৎ? লেখিকা বলেন,—ঋষিদের জীবনের দুটি কর্মস্তর। একস্তরে তাঁরা সচেতন, যেখানে তাঁরা বহিরঙ্গ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত। অন্য স্তরে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেদের বিতরণ করেন। ঈশ্বরচালিত বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা, কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি ক'রে, বা পরে যখন স্বেচ্ছায় চতুর্দিকে বক্তৃতা ক'রে বেড়িয়েছেন, তখন তিনি জানতেন, তিনি ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, ও হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকানদের ভ্রান্তি দূর করছেন,—ঠিক তখনি বিবেকানন্দের ঈশ্বর জানতেন, তাঁর পুত্র আমেরিকার সহরে প্রান্তরে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে বক্তৃতাছলে উপস্থিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন, সূর্যের মতই, যে সূর্য আলো দেয়, এবং দেবার সময়ে স্থান কাল পাত্র বিচার করে না।

লেখিকার সিদ্ধান্ত, ১৮৯৩ সালের শেষভাগ থেকে ১৮৯৪ সালের শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র আমেরিকাব্যাপী স্বামীজীর বক্তৃতা সফর বাইরে পরিকল্পনাহীন মনে হলেও উর্ধ্বতর ঐশ্বরিক পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এই এক বৎসর তাঁর জীবনের গুরুত্বহীন সময় তো নয়ই, পরন্তু শ্রেষ্ঠ গুরুত্বে পূর্ণ।

স্বামীজীর কর্মধারা সম্বন্ধে লেখিকার যে নতুন বক্তব্যের কথা বলেছি, এটি তার অংশ ও সূচনা। মূল বক্তব্যে আসা যাক।

এ বিষয়ে এক কথায় বলা যায়, লেখিকা স্বামীজীর ভাব ও কর্মধারার ক্রমবিকাশের রূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। অবশ্য সমস্ত ভাবধারার নয়—একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের।

চিন্তাশীল পাঠক স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ও জীবনী পড়বার সময়ে সাধারণত দুটি জিনিস লক্ষ্য করেন, এক, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তির উপস্থিতি, দুই, ধারণার ক্রমবিকাশের অভাব। প্রথম বিষয়টি বহুল আলোচিত এবং এখানে একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে, বিবেকানন্দের আপাত-বিরোধী বক্তব্যগুলি ভিতরে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত এবং সেগুলি অনেক সময়ে একই বক্তব্যের নানামুখী দিক।

কিন্তু স্বামীজীর চিন্তার ক্রমবিকাশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ে আলোচনা না হবার কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমত সর্বসমক্ষে 'প্রথম আবির্ভাবেই' বিবেকানন্দ বিজয়ী বীর। অনুভূতি ও মনীষার ব্যাপারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঐ 'প্রথম আবির্ভাবেই' এমন ভাবে উদ্ঘাটিত হল যে, সকলেই পূর্ণ পরিণত প্রতিভারূপে তাঁকে স্বীকার করে নিল—তাঁর মাত্র ৩২ বৎসর বয়স সত্ত্বেও। ঐ ৩২ বৎসর আর মাত্র ৭ বৎসর বৃদ্ধি পাবে—তার পরেই ঊনচল্লিশে অবসান—এবং সেই সাত বৎসর বিবেকানন্দের স্বীকৃত আচার্যত্বের কাল। ঐকালে ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং যদি ৩২ বৎসরে পূর্ণ প্রকাশের

পূর্ববর্তীকালে স্বামীজীর চিন্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য, মিলিত বা তাঁর ঐকালে লিখিত রচনা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত, তাহলে তাঁর ভাবের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনার অসুবিধা হত না, কিন্তু ৩২ বৎসরের পূর্বে তাঁর রচিত কিছু পত্র এবং তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে কথিত কিছু স্মৃতিকথা ছাড়া খুব বেশী কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্লেষণও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য আমি এখানে নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তরের ব্যাপারটি বাদ দিচ্ছি। কৈশোর-যৌবনের ইউরোপীয় দর্শন-প্রভাবিত নাস্তিকতা বা অজ্ঞেয়বাদ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে ইতিহাসকে ধরছি না। সেই আমূল পরিবর্তনকে 'ক্রমবিকাশ' না বলাই ভাল (যদিও একথা স্বীকার্য, নরেন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সকল সংশয় আস্তিক্যের গভীর জিজ্ঞাসাসঞ্জাত)—আমি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরবর্তী ক্রমবিকাশের কথাই বলছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে বিবেকানন্দের ভারত ভ্রমণ; এই সময়টি তাঁর আত্মগঠনের কাল। আত্মগঠন এই অর্থে—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যে আত্মাকে পেয়েছিলেন তার দেহগঠন করেছেন এই কালে। স্বামীজীর পত্রাদি সন্ধান করলে দেখব, পরিব্রাজক জীবনের প্রথম দিকে তীব্র বৈরাগ্য—ক্রমে সেই বৈরাগ্যের সঙ্গে তীব্র মানবপ্রেমের সংযোগ। এরই চূড়ান্ত পরিণতি কন্যাকুমারিকার ধ্যান-সিদ্ধান্তে—'বাঁচতে গেলে রুটি চাই'।

রুটি চাই—এই তাগিদ তাঁকে আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল। আমেরিকায় যাওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য তাই। সেই প্রাথমিক উদ্দেশ্য কিভাবে ক্রমপরিবর্তিত হয়ে স্বামীজীর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে—সেই তত্ত্বই তথ্যযোগে উপস্থিত করেছেন লেখিকা। এবং একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর পূর্বে এ বক্তব্যকে কেউ এইভাবে উপস্থিত করেন নি।

লেখিকার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দাঁড়ায়—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগের আগে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের অভিপ্রায় স্বামীজীর মধ্যে জাগেনি। কিন্তু এই সামান্য কথাকটির মধ্যে এমন কী বড় বক্তব্য আছে? আমরাও তো স্বামীজীর প্রচলিত জীবনীতে পড়েছি, প্ল্যাটফর্ম-বক্তৃতার অসারতা উপলব্ধি করে স্বামীজী ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকে মনস্থ করেন, এবার তিনি ক্লাস ক'রে বেদান্ত ও যোগপদ্ধতি ইত্যাদি শেখাবেন।

বিবেকানন্দের জীবনী-সাহিত্যে শ্রীমতী লুই বার্কের বড় দান এইখানে—প্রচলিত জীবনীতে সাধারণ একটা তথ্যরূপে উল্লিখিত জিনিসটির মধ্যে অতি গভীর তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন,—স্বামীজীর মূল জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে যা যুক্ত।

শ্রীমতী বার্কের সিদ্ধান্তকে অতি সংক্ষেপে যেভাবে হাজির করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজী ১৮৯৪ সালের শেষভাগ থেকে 'বেদান্ত' প্রচার করতে মনস্থ করেন। অথচ আমরা জানি, তার অনেক আগে থেকেই তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচার করেছেন, আর হিন্দুধর্ম মানেই তো বেদ-বেদান্ত!

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—শ্রীমতী বার্ক 'বেদান্ত' শব্দকে বিশিষ্টার্থে ধরেছেন। কী সে অর্থ?

এ বিষয়ে শ্রীমতী বার্ক এক জায়গায় লিখেছেন—

"It was a complex and profound idea, involving an intimate and mature knowledge of the characteristics and needs of the Western mind. As Swamiji later conceived it, Vedanta was the one unifying force of all the diverse religions, philosoplical and cultural outlooks of man. He made it the philosoply of all religions, the ultimate goal of science, the justification of all social, moral, psychic and philoso-

plical efforts of man to realise his own glory, and he made it also the method by which that glory might be fully attained. Vedanta, as he conceived it, was India's saving gift to the world."

এর অর্থ, 'বেদান্ত' স্বামীজীর ক্ষেত্রে অর্থব্যাপ্তি লাভ করেছে। আগে বেদান্ত ছিল অদ্বৈততত্ত্বের সমার্থক, কিংবা উপনিষদপ্রোক্ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের সমাহার; —স্বামীজী নিজ বেদান্তের মধ্যে ঐ সকল প্রত্যয়কে গ্রহণ করার পরেও তার অধিকতর ভাবপ্রসার ঘটালেন—তা শুদ্ধ ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়াল, যার মধ্যে কেবল ধর্মতত্ত্বই নয়—ঐ ধর্মকে প্রাপ্তির পন্থাও নির্দেশিত; সুতরাং বিবেকানন্দের বেদান্তের মধ্যে যোগমার্গ এসেছে, এবং এসেছে সাংখ্যদর্শন, এসেছে বিজ্ঞান ও মিস্টিসিজম মেলে বেদান্ত হয়ে দাঁড়াল বিবেকানন্দের বিশ্ববাণী, আধুনিক ও আগামী মানুষদের উদ্দেশ্যে।

শ্রীমতী বার্ক বলতে চান, উপরের অর্থে বেদান্ত শব্দের প্রয়োগ স্বামীজী প্রথমাবধি করেন নি। তিনি আমেরিকাকে বদলে দিয়েছিলেন বক্তৃতার দ্বারা, এবং বক্তৃতাকালে আমেরিকার ও বিশ্বের প্রয়োজন বুঝে নিজেও বদলে গিয়েছিলেন আইডিয়ার ব্যাপারে। ঐ আইডিয়ার সর্বশেষ পরিণতি 'বেদান্তে'।

শ্রীমতী বার্ক দীর্ঘ আলোচনায়, তন্ন তন্ন ভাবে তথ্যবিচার করে নিজ মত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। আমি এখানে সামান্যভাবে তার সারসংক্ষেপ করতে পারি মাত্র।

পুরনো প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিই। স্বামীজীর আমেরিকায় যাওয়ার মূল দুটি উদ্দেশ্য ছিল—১) ভারতের জন্য টাকা তোলা, ২) হিন্দুধর্মের যথার্থ রূপ জানানো। এখানে সমগ্র বিশ্বের জন্য কোনো মেসেজের কথা নেই।[1]

সেই মেসেজ কখন কি ভাবে এল, তা নির্ণয়ের একমাত্র উপায় তাহলে ঐ মেসেজের পূর্ণতালাভের পূর্ববর্তী স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতাদি বিশ্লেষণ করা। শ্রীমতী বার্ক তাই করেছেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের সূচনায় স্বামীজীর 'বেদান্ত' পরিণতি লাভ করার পূর্বে আমেরিকায় তিনি যেসব বক্তৃতাদি করেছেন সেগুলিকে বিষয়ানুযায়ী তিনভাগে লেখিকা ভাগ করেছেন—১) ভারত সংক্রান্ত, ২) ধর্মসমন্বয় সংক্রান্ত, ৩) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত। সাধারণভাবে বলা যায়, এই সব বক্তৃতার উদ্দেশ্য, ভারতের অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া, এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে প্রচার করা। শেষোক্ত ব্যাপারে বুদ্ধের করুণার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

ধর্মমহাসভার পূর্বে ও পরে স্বামীজীর বক্তৃতার সুরে একটি পার্থক্য লেখিকা লক্ষ্য করেছেন। ধর্মমহাসভার পূর্বে এবং ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী খ্রীস্টানদের আক্রমণ করে বলেছিলেন, তোমরা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভারতে ধর্ম দিতে যাও, রুটি দাও না। স্বামীজীর আশা ছিল, ভারতের শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা বুঝিয়ে বলে আমেরিকানদের তিনি ভারতে শিল্পবিস্তার করতে আগ্রহী করতে পারবেন।

আমেরিকানরা ভারতে শিল্পবিস্তার করবে, এ ধারণা তাঁর দূর হল অচিরে। তখন স্থির করলেন, নিজে টাকা জোগাড় করে ভারতে শিক্ষাবিস্তারে লাগাবেন। ধর্মমহাসভার পরবর্তী বক্তৃতাবলীতে স্বামীজী ভারতের এই শিক্ষাপ্রয়োজনের কথায় জোর দিয়েছেন। ভারতের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কথা বলা কমিয়েছেন, কারণ তাতে দারিদ্র্য দূর তো হয়ই না,

---

১। এইখানে একটি প্রশ্ন ওঠানো যায়। আমেরিকায় যাত্রার আগে স্বামীজী নাকি বলেছিলেন—'আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, খ্রীষ্টধর্ম যার সুদূর প্রতিধ্বনি।' এ ধর্ম কোন্ ধর্ম? নিশ্চয়ই প্রচলিত হিন্দু ধর্ম নয়—নিশ্চয়ই বিবেকানন্দ-দৃষ্ট হিন্দুধর্ম—বেদান্ত নাম নিয়ে যা তাঁর মেসেজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরে।

শুধু অপমান বাড়ে ; তার বদলে তিনি হিন্দুর মূল জীবননীতির ব্যাখ্যা সুরু করলেন। শিক্ষিত হিন্দুরা পাশ্চাত্যে গিয়ে যে নিম্নস্তরের হীনমন্যতার পরিচয় দিত আত্মাবমাননায়—স্বামীজী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যথার্থ ভারতকে জানাতে গিয়ে স্বামীজী বললেন (মিস্ মেয়োর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর স্মরণীয় উক্তির বহু আগে)—"The product of the slums of any nation can not be the criterion of our judgment of that nation." বস্তীর পাঁক দিয়ে দেশের বিচার হয় না। স্বামীজীর প্রচারের আগে আমেরিকা জানত, ভারত হল ভূতপ্রেত কিলবিলকরা দেশ, সে এমন রাক্ষসের দেশ যেখানে মায়েরা ছেলেদের খেয়ে ফেলে। সহসা তাদের সামনে উন্মোচিত হল এক নতুন জগৎ—প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীভূমি, চরম আত্মত্যাগ ও পরম পবিত্রতার আধারক্ষেত্র এক দেশ—ভারতবর্ষ।

বিবেকানন্দ এই ভারত ব্যাখ্যাতেই তাঁর কাজ শেষ করলেন না, এমনকি ধর্মসমন্বয়বাণী প্রচারেও নয়—তিনি এ সব কিছুকে অতিক্রম করে বিশ্বধর্মে উপনীত হলেন। 'ধর্মসমন্বয়' থেকে 'বিশ্বধর্মে' উত্তীর্ণ হয়েই বিবেকানন্দের ভাবনা চরম পরিণতি পেয়েছে।

'ধর্মসমন্বয়' ও 'বিশ্বধর্ম' আপাতভাবে সমার্থক মনে হতে পারে, কিন্তু যথার্থ তা নয়—লেখিকা নিপুণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। স্বামীজী ধর্মমহাসভায় প্রথম ভাষণে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বা ধর্মসমন্বয়ের কথায় জোর দিয়েছিলেন। ধর্ম-সমন্বয়ের অর্থ, প্রতি ধর্মের লোক অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার ও শ্রদ্ধার মনোভাব রাখবে, কারণ প্রতিটি ধর্মই ঈশ্বরকে পাবার পথস্বরূপ। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয়ই এই 'নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও' মতের গ্রহণের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত দেখেছিলেন। তখন তিনি বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের উপর জোর দিলেন। ধর্মমহাসভার নবম দিনে 'হিন্দুধর্ম' নামক তাঁর সুবিখ্যাত রচনায় ধর্মসমূহের মধ্যে ঐক্যসন্ধান চেষ্টা দেখা যায়। সেখানে সর্বজনীন ধর্মের প্রকৃতি বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সে ধর্ম এমন হবে যা—'দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না ; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে ঐ ধর্মকে তাহারই মত অসীম হইতে হইবে ;····· স্বীয় উদারতাবশত ঐ ধর্ম তাহার অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে.····· উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে।'

পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজী ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণা বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। যথা ১) প্রতি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি স্বীকারের দ্বারা ; ২) সহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধির পক্ষে প্রচারের দ্বারা ; ৩) প্রতি দেশের ধর্মে অন্য দেশীয়কে আহ্বানের দ্বারা। অবশ্য শেষোক্ত মতটি (যথা ভারতে 'হিন্দু খ্রীস্টান' কিংবা আমেরিকায় 'খ্রীস্টান হিন্দু') পরিত্যাগ করেছিলেন অল্পদিনের মধ্যে। স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে ভাবগত সংমিশ্রণের স্বরূপও উদঘাটিত করতে লাগলেন এইকালে। এবং সর্বজনীন ধর্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠানরূপে তিনি আমেরিকায় 'সর্বজনীন ধর্মমন্দির' এবং মাদ্রাজে ধর্মশিক্ষায়তনের' পরিকল্পনাও করলেন।

স্বামীজী ধর্মসমূহের ঐক্যসন্ধান করেছিলেন নানা প্রেরণায়। প্রথমত তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং ঋষি একই দেহে। এ ক্ষেত্রে সকল বস্তুর অদ্বয়তত্ত্ব তিনি অনুভব ও প্রতিপাদন করবেনই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু তিনি মূলে ঋষি বা দ্রষ্টা—তিনি দেখছিলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়ে পৃথিবী একত্রবদ্ধ হয়ে যাবে শীঘ্রই—সেই বন্ধন যাতে শীঘ্র ভেঙে না যায় তার জন্য মানবস্বভাবের শ্রেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ ধর্মে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য—এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বাণী এই ধর্মৈক্যের।

ধর্মসমূহের ঐক্য সন্ধান করার চেষ্টায় স্বামীজীর কাছে

একটি সত্য প্রতিভাত হল—পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহকে ধর্ম না ব'লে সম্প্রদায় বলাই উচিত। সেই ধর্মই যথার্থ 'ধর্ম' নাম নিতে পারবে, যে ধর্ম মূল লক্ষণ রূপে মানবের দেবত্বে বিশ্বাস ক'রে সকলকে ঐ সত্য স্বাধীনভাবে অনুভব করার আহ্বান করতে পারবে।

সেই ধর্মের নাম বেদান্ত।

স্বামীজী অনুভব করলেন এবং দেখালেন, বেদান্তের মধ্যে সব মতের সম্মিলন। যে বেদান্ত হিন্দুধর্মকে অতিক্রম করে বিশ্বধর্ম হবে, সেই বেদান্তের অদ্বৈত শাখায় পড়বে বৌদ্ধধর্ম ও যোগধর্ম, দ্বৈত শাখায় পড়বে খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম। এই বেদান্তের অদ্বৈত শাখার মতের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকবে না এবং আধুনিক জীবনের গভীর প্রশ্নের সমাধান সেখানে হবে।

এই বৈদান্তিক বিশ্বধর্মকে উপস্থিত করার সময়ে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল স্বামীজীকে বারবার—ভারত যদি এই বেদান্ত ধর্মের আবিষ্কর্তা সে ভারতের এমন দুর্দশা কেন? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন,- ঐহিকতার সঙ্গে পারমার্থিকতার চির বিরোধ, সুতরাং ধর্ম-অগ্রসর জাতির এই লৌকিক পতনে আশ্চর্য হ'ার কিছু নেই। কিন্তু মানুষ কি আর ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে লৌকিক পতনে রাজি হবে? রাজি হলেও তাকে রাজি করানো উচিত হবে কি? প্রশ্নটা কেবল অপরপক্ষের নয়—স্বয়ং বিবেকানন্দেরও। ভারতের ঐহিক পতনে তাঁর থেকে বেদনাহত কে? তাই ভাবী বিশ্বধর্মে ঐহিকতা ও পারমার্থিকতার সমন্বয়ের প্রশ্ন আছেই, ভারতের এবং বিশ্বের সকলের জন্যই। এক্ষেত্রে স্বামীজী বুদ্ধের কর্মযোগের আদর্শকে তুলে ধরেছেন। এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরসমর্পিত কর্মাদর্শকেও।

বিবেকানন্দ তাঁর এই বিশ্বধর্মকে—যাকে তিনি 'The Religion' বলতেন, যা হিন্দুধর্মও নয়, খ্রীষ্টধর্মও নয়,—তাকে 'বেদান্ত' নাম দিলেন এই জন্য যে, এই ধর্ম বহু সহস্র বৎসর ধরে 'বেদান্ত' নামে প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে। তা ছাড়া একটা ধর্মতত্ত্ব দেওয়াই বড় কথা নয়—তার প্রয়োগগত বিশুদ্ধির জন্য পরীক্ষিত পথের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হয়। 'বেদান্ত' নাম দিয়ে স্বামীজী তাঁর প্রচারিত বিশ্বধর্মের তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা দূর করেছেন, আবার ঐ বেদান্তকেও প্রচলিত হিন্দুর ধর্মাচরণের গণ্ডীমুক্ত করেছেন।

সবই বুঝলুম, কিন্তু স্বামীজী তাঁর বেদান্তকে মানসিক ক্রমবিকাশের পথে লাভ করেছেন তার প্রমাণ কি? লেখিকা বলেন, আমেরিকায় স্বামীজীর প্রথম দিকের বক্তৃতাদি বা চিঠিপত্র থেকে ঐ পরিণত বেদান্তের পরিচয় মেলে না। তিনি এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তথ্যবিচার করেছেন। একটি মনাকর্ষক তথ্য তিনি জানিয়েছেন—যতদিন স্বামীজীর মাথায় এই বেদান্তের মেসেজ প্রচারের ইচ্ছা জাগেনি, ততদিন তিনি ভারতে ফিরতে ব্যস্ত ছিলেন; যখন থেকে 'বেদান্তের' আবির্ভাব হল—তিনি আশু প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সমগ্র আমেরিকা পরিভ্রমণ করে দেখলেন সম্পন্ন আমেরিকানরা ভারতীয়দের মতই অভাবী। তারা বিদ্যুতের আলো পেয়েছে, চাইছে আত্মার আলো। যে কোনো অভাবই বিবেকানন্দের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভারতে খাদ্যের অভাব তাঁকে আমেরিকায় টেনে এনেছে, আমেরিকার ধর্মের অভাব তাঁকে আমেরিকায় ধরে রাখল। এখানে আমেরিকা অর্থে পাশ্চাত্য জগৎ ধরতে হবে। এই সময় থেকেই তিনি ভারত ও পাশ্চাত্যের দেওয়া নেওয়ার কথা বলতে লাগলেন। ভারত দেবে তার ধর্ম, আমেরিকা দেবে তার বিজ্ঞান। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে এতদিন আমরা বিবেকানন্দের আত্মসম্মানী স্বভাবের সান্ত্বনাসন্ধান দেখেছি, লেখিকা দেখালেন, এর মধ্যে আছে আরও বড় কথা—বিবেকানন্দের মত মানুষের

ক্ষেত্রে 'দেওয়া-নেওয়া' নামক আদানপ্রদান ব্যাপারটা আসল কথা নয়—দেওয়াটাই মূল কথা—শুধু আমেরিকাকে নয়, ভারত-শুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে—ঐ বিশ্বধর্ম। সেই কারণেই, যদিও লেখিকা তাঁর পরিধির বহির্বর্তী বলে একথা বলেন নি, তবু আমরা জানি, স্বামীজী এই কারণেই ভারতে এসে হিন্দুদের 'হিন্দু' নামের বদলে 'বেদান্তী' নাম নিতে বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন, রাজনীতি সমাজনীতি সবই ভারতকে করতে হবে, কিন্তু ধর্মের মধ্য দিয়ে।

প্রথম দিকে যে-বিবেকানন্দ ঘরে ফিরতে অস্থির ছিলেন, তিনি কিভাবে বদলে গেলেন—কিভাবে আমেরিকাকে নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করে বললেন—'আমার আবার আলাদা ঘর কি, সব দেশই আমার ঘর',—এমন কি ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের বাসনাতেও তাঁর কিরকম ঔদাসীন্য এল—সে সব প্রসঙ্গ লেখিকা স্বামীজীর পত্রের কালানুক্রমিক বিচার করে যুক্তিসিদ্ধভাবে উপস্থিত করেছেন।

স্বামীজীর প্রয়োগে 'বেদান্ত' শব্দটির অর্থপরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে তার চমৎকার আলোচনাও পাচ্ছি। নিজ রচনায় স্বামীজী বেদান্ত শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিতে। এখানে বেদান্ত হিন্দুর অন্যতম ধর্মশাস্ত্ররূপে উল্লিখিত। পরে একই ব্যক্তিকে লেখা এক চিঠিতে বেদান্ত শব্দকে 'অদ্বৈত বেদান্ত' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র অর্থে ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'বেদ-বেদান্ত' শব্দের ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাইট সাহেবকে লেখা চিঠিতেও 'অদ্বৈত বেদান্ত' অর্থেই বেদান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। বেদান্ত শব্দের প্রথম অর্থব্যাপ্তি পাওয়া গেল ১৮৯৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমি নানা দিক দিয়ে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছি।' এই সূচনা, বেদান্ত শব্দের অর্থব্যাপ্তির, যা ক্রমেই ব্যাপ্ততর হয়ে কিভাবে কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কাছে বিশ্ববাণীর রূপ নেবে তা কালক্রমিক উদ্ধৃতিযোগে লেখিকা দেখিয়েছেন।

এই ক্রমপরিবর্তনের প্রমাণ লেখিকা অন্য দিক দিয়েও দিয়েছেন। বেদান্তের এই নূতন ভাব যখন তাঁকে অধিকার করল তখন এই তত্ত্বের উপর গ্রন্থরচনার প্রবল ইচ্ছার কথা স্বামীজী বারবার বলতে লাগলেন। ১৮৯৪ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর মেরী হেলকে, ১৯শে সেপ্টেম্বর ওলিবুলকে, ২১শে সেপ্টেম্বর ও ২৭শে অক্টোবর আলাসিঙ্গাকে ঐ বিষয়ে লিখলেন। এই কালে রচিত মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর জোর দিয়েছেন এবং ভারতের প্রয়োজনের মতই পাশ্চাত্যের প্রয়োজনের কথাও তুলেছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভাববিনিময়ের কথা পরবর্তী কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরেও পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থরচনার বাসনা স্বামীজীকে ত্যাগ করল না। এই কালে লিখিত বলে অনুমিত একটি প্রবন্ধের খসড়ায় সর্বজনীন ধর্মপ্রসঙ্গ তুলে স্বামীজী বলেছেন, মানুষের দুটি পুরাতন স্বপ্ন—পৃথিবীর এক সাম্রাজ্য ও এক ধর্ম। ঐ খসড়া প্রবন্ধে স্বামীজী বলেছেন, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধধর্মে মানববৃত্তির সর্বমুখী বিকাশের সুযোগ না থাকায় ওগুলি বিশ্বধর্ম হতে পারে না। বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থরচনার ইচ্ছা ও চেষ্টা ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালের বিভিন্ন পত্রেও পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরিউদ্ধৃত তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামীজীর মনে 'বেদান্ত' সক্রিয় ভাবনার রূপ নেয়। ঠিক এর পূর্বে স্বামীজীর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার দিকে লেখিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্বামীজী জুলাই-আগস্টে 'গ্রীনএকার কনফারেন্সে' যোগ দেন। শ্রীমতী বার্ক বলতে চান, স্বামীজীর মিশনের ব্যাপারে এই গ্রীনএকার কনফারেন্সের মূল্য অপরিসীম।

গ্রীনএকার কনফারেন্স শুরু করেন মিসেস সারা ফার্মার। গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে গ্রীনএকারে নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে

নরনারীরা সমবেত হয়ে মুক্ত স্বাধীনতায় সর্বমতের চর্চা করবে, এই হল এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য। স্বামীজী এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে ধর্মের উন্মাদনা বয়ে গিয়েছিল সমাবেশে। মানুষগুলি ছিল স্বাধীন, বিচিত্র, আন্তরিক এবং আনন্দময়। স্বামীজী নিশীথ রাত্রে মুক্ত আকাশের তলে একটি পাইন গাছের তলায় (যেটি পরে 'স্বামীজীর পাইন' নামে পরিচিত হয়) পদ্মাসনে বসে সকলকে শিবোঽহম, শিবোঽহম' মন্ত্র বলতে শিখিয়েছিলেন।

এইখানেই প্রথম স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দিলেন। এই খানেই 'বেদান্ত' বিশ্বধর্মরূপে তাঁর মনকে অধিকার করল, এবং কয়েকমাস পরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে ঐ বেদান্তের দিব্যবাণী উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠে।

শ্রীমতী বার্কের দীর্ঘ গ্রন্থের দীর্ঘ পরিচয় দিলাম। আমার অসামর্থ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন। প্রথম শ্রেণীর বিবেকানন্দ সাহিত্যের পরিচয় প্রথম শ্রেণীর হওয়া উচিত, দুঃখের বিষয় সে চেষ্টায় কেউ এগিয়ে আসেন নি ; তাই অগত্যা সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে আমাদের সে চেষ্টা করতে হয়েছে। স্বামীজীর World Mission-এর স্বরূপ ও সেই 'মিশনের' ক্রমবিকাশের রূপ সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করার পরে লেখিকা সগৌরবে স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,—"I have a message to the East as Buddha had a message to the West"। স্বামীজীর এই কথাগুলি আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পাতাতেও উদ্ধৃত আছে দেখা যাবে। গ্রন্থ সুরু করবার সময়ে যদি স্বামীজীর ঐ উক্তির মধ্যে কেউ দাবির অহঙ্কার লক্ষ্য করেন, গ্রন্থ শেষ করার পরে, তিনি যদি গোঁড়া না হন, ঐ দাবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। বিবেকানন্দ পৃথিবীর জন্য জীবন দিয়ে গেছেন ; তিনি কোন্ জীবন দিয়েছেন লেখিকা তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

সনেট ১৪১

মনে হবে দুটি চোখে ভালো আর বাসিনা তোমাকে,
যেহেতু তোমার মাঝে দ্যাখে তারা বিভ্রান্তি হাজার ;
কিন্তু এ হৃদয় মোর ভলোবাসে ঘৃণা করে যাকে,
বিতৃষ্ণার দৃশ্যতেও সে স্নেহের বিমূর্ত আধার।
আমার কানও প্রীত নয় তব ঠোঁটের ধ্বনিতে
সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি নীচ স্পর্শে নয় অবনত,
স্বাদ নয় ঘ্রাণ নয় বাসনাও আসে না ইঙ্গিতে
ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ভোজে তোমার সমীপে প্রণামত।
কিন্তু পঞ্চ বুদ্ধি নয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়রা মোর পারে
নির্বোধ হৃদয়টাকে দূরে রাখতে তব দাস্য থেকে
মানুষের প্রতিরূপ রেখে যায় অকম্প জোয়ারে,
গর্বিত হৃদয়-দাস, তব অনুগত ব্যক্তিটিকে।

একমাত্র দুশ্চিন্তায় লাভবান হতে পারি ঢের
যে নারীর জন্যে পাপী, পুরস্কৃত করে সে-ই ফের।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সনেট ১৫১

প্রেম বড় ছেলে মানুষ—জানে না বিবেক কাকে বলে,
অথচ কে না জানে প্রেমে জন্ম হয় বিবেকের ?
অতএব হে বিনম্র কুহকিনী, ভ্রান্তি মোর দেখো না তাহলে
অন্যথা আমার দোষে হে মধুরা, প্রমাণিত আত্মাপরাধের
দায়ভাগী হবে। কারণ, বঞ্চনা করে আমাকেও করেছ প্রতারক
মহৎ সত্তাকে মোর স্থূল দেহ-কারাগারে করেছি বঞ্চনা ;
শরীরের কানে কানে আমার আত্মা বলে, বিজয়ী আলোক
পাবে সে অম্লান প্রেমে ; দেহ শুনতে চায় না যে যুক্তির মন্ত্রণা,

তোমার তৃষিত নামে জেগে উঠে তোমাকেই দেখায় নির্ভয়ে
বিজয়ীর জয়মাল্য। সুখ-পরিতৃপ্ত দীন দাসের মতন
আত্মসমর্পিত থাকে তোর কাছে এই গর্বে গর্বিত হয়ে,
একপায়ে খাড়া থাকে সব কাজে, হীন, ব্রাত্য পার্শ্ব-চারণ।

ব্যত্যয়ী বিবেকে গ্রাহ্য নয়—জানি আমি তাকে বলি
তার প্রেম এই,—যে দুর্লভ প্রেমে উঠি পড়ি আবেগে উচ্ছলি।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

সনেট ৮

শ্রবণেরই গান, তবু অমন বিধুর হয়ে শোনো ?
মধুরে-মধুরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, হর্ষে-হর্ষ বাড়ে,
কেন ভালোবাসো যাকে জানাতে পারো না আবাহনও,
কিংবা নিজ বিরক্তি বরণ করো তৃপ্তিসহকারে ?
শ্রবণসহজ যতো ধ্বনি আর শ্রুতির সম্মিতি
মিলনান্ত ঐক্যতানে লাগায় তোমার কানে ধাঁধাঁ,
ললিত ভর্ৎসনা করে, এইমাত্র ; একত্রে প্রতিটি
অংশ রাখে যা তোমার সহনীয় আলাদা-আলাদা।
ভাখো না কেমন তন্ত্রী তন্ত্রীতে উঠেছে রণরণি',
এ ওকে পরস্পর সামঞ্জস্যে বশ্যতা মানায়,
যেন গৃহস্বামী, আর শিশু, আর ভরণী ঘরণী,
যারা একসঙ্গে মিলে শ্রবণজুড়ানো গান গায়,
তাদের অরব গান বিমিশ্র তবুও ঐক্যময়
তোমার একা-র পক্ষে অসম্ভব স্বরে স্বরে কয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সনেট ২৭

শ্রমে ক্লিষ্ট, আপনারে বহে নি ত্বরায় শয্যাপরে,
পথশ্রান্ত সারাদেহ যেথা পায় লভিতে বিশ্রাম.
কিন্তু অচিরাৎ মোর মস্তিষ্ক বাহিরায় সফরে,
শরীরের কর্মশেষে সূচিত চিত্তের কর্মযাম ;
কারণ তখনই মোর সব চিন্তা গৃহ পরিহরি,
নিশ্চিত তীর্থার্থীসম ব্রজে পথ তোমার উদ্দেশে,
নিদ্রাভারানত আঁখি থাকে তারই প্রযত্নে জাগরী,
আঁধারে সে চেয়ে রয় অন্ধের দৃষ্টিতে অনিমেষে :
তথাপি আমারই ধ্যান মোর দৃষ্টিহীন আঁখিপটে
সযত্নে রচিয়া দেয় ছায়ামূর্তি তব, দ্যুতি তারই
বহ্নিমান মণিসম নীরন্ধ্র রজনীভরে রটে,
জরতী তামসীরে সে করে অপরূপ সুকুমারী।
দিন কাটে পথশ্রমে, রাত্রি তব তাপিত ধেয়ানে
অস্থির তাড়সে কাটে, চিত্ত মম শান্তি নাহি মানে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসল ও নকল

সুরজিৎ দাশগুপ্ত *

কবি ও নাট্যকারের পরিচয় তাঁর রচনায় এবং সে-রচনার তাৎপর্য ও মূল্য যদি সময়ের সমস্ত পরাক্রম তুচ্ছ করে দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় তবে রচয়িতার অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্বন্ধে কোনও তর্ক চলে না। শেকসপীয়রের বেলাতেও তর্কটা প্রতিভার অনন্যতা সম্পর্কিত নয়, তা ওতপ্রোত হয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে। কেননা সত্যি বলতে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী শেকসপীয়রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তৃপ্তিদর তথ্যাবলী ইংরেজদের মতো রক্ষণশীল জাতও সর্বগ্রাসী কালের কুটিল আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কোন্ তারিখে তিনি জন্মেছিলেন, কী ছিল তাঁর বাবার প্রকৃত বৃত্তি, কতদূর লেখাপড়া করে তাঁকে জীবিকার অন্বেষণ করতে হয়, কে তাঁর স্ত্রী ছিলেন—এসব মামুলি প্রশ্ন এবং সরাইখানায় মারামারির কাহিনী, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৫৯২ পর্যন্ত তাঁর অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি মিলে শেকসপীয়রের জীবনাকে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ও রহস্যময় করে তুলেছে। কোন নাট্য সম্প্রদায়ে তিনি প্রথম যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে আস্তাবল সামলাতেন না অভিনয় করতেন সে সম্বন্ধেও প্রচুর গল্প প্রচলিত। তবে ১৫৯৪ হতে অভিনেতা হিসেবে তাঁর নাম চেম্বারলেন্স্ কোম্পানী অব অ্যাক্টর্স ঘোষণা করেন; অবশ্য "অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্-"এ অ্যাডাম্ বা "হ্যাম্লেট্-" এ ভূত ইত্যাকার ভূমিকাতেই তিনি নামতেন এবং এতেই বোঝা যাবে নট হিসাবে তাঁর কতটা দর ছিল। নট হতে শেকসপীয়রের নাট্যকারে বিবর্তনের কাহিনীও কিংবদন্তীর পর্যায়ভুক্ত। আর অভিনেতা শেকসপীয়র সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য; যেটুকু জানি সেটুকুও আমার অমন অতুলনীয় প্রতিভাবানের চরিত্রের উপযুক্ত নয়।

এলিজাবেথীয় যুগের এমন অনেকের কথা আমরা সবিস্তারে জানি শেকসপীয়রের তুলনায় যাদের খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা অনেক কম, যাদের প্রতিভা বলে কোন বস্তুই ছিল না। যত কুহেলিকা সব শেকস্পীয়রকেই ঘিরে! তাই অবশেষে তাঁর জন্মের প্রায় সওয়া শ' বছর পরে বার্টন-ইন-দি-হিথের রেক্টর রেভারেণ্ড জে, উইল্মট্ ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কিত কুহেলিকা অপসরণে উদযোগী হলেন। কিছুকাল তথ্য সংগ্রহের কাজ করে তিনি দেখলেন যে অমন সব নাটক ও কবিতা রচনার জন্যে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন তা শেক্স্পীয়রের একেবারেই থাকতে পারে না। অবাক হবার কথা বৈকি! উপরন্তু উইল্মট আবিষ্কার করলেন শেকসপীয়র ও বেকনের রচনার মধ্যে অবিশ্বাস্য ভাবসাদৃশ্য। এক এক সময় বিদ্যুৎচমকের মতো তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে থাকল: তবে কি শেকসপীয়রের

---

* [রোজ পূর্বে দুধ ওঠে বলা শেক্স্পীয়র সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই বলাও আমার পক্ষে তাই। তিনখানা বই হতে মালমশলা কুড়িয়ে কয়েক পাতা আলোচনা করার সঙ্গে মাছিমারা কেরানির কাজে তফাৎ সামান্য। আমি শুধু চেষ্টা করেছি শেক্স্পীয়রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে যে বিতর্ক আছে তার একটু-খানি পরিচয় দিতে। আমার প্রধান অবলম্বন ছিল এইচ. এন্ গিবসন্ প্রণীত "দি শেক্স্পীয়র ক্লেমেন্ট্স্।"]

নামের আড়ালে বেকনই ওই নাটক ও কবিতাগুলো রচনা করেছেন? কোথায় নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্বে উৎফুল্ল হবেন তা নয় উইল্মট বিষণ্ণ ও বিমূঢ় হলেন। তিনি যে শুধু আরও অন্বেষণে বিরত হলেন তাই নয়, সংগৃহীত তথ্যাবলী যে সব কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলোও পুড়িয়ে ফেললেন। একজনকে বিশ্বাস করে উইল্মট তাঁর অনুসন্ধান কার্য্যের সম্ভাব্য পরিণামের কথা বলেছিলেন—জে, সি, কোয়েল্‌কে। কোয়েলের বিবরণ মাত্র ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ নাট্যকার হিসেবে শেকসপীয়রের খ্যাতি হরণের কণামাত্র চেষ্টা উইলমটের আশঙ্কা ও অনুমান এযাবৎ করেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে যাঁরা শেকসপীয়রের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহগ্রস্ত হন তাঁহার মধ্যে "হু রোট শেক্‌সপীয়র?" প্রবন্ধের মার্কিন লেখক জে, সি, হার্টের নাম উল্লেখযোগ্য। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডীয় নট সর্বপ্রকারে প্রতিভাহীন ছিলেন মুখ্যত এই নেতিমূলক পূর্বকল্পনাকে অবলম্বন করেই শেকসপীয়রের নামে প্রচলিত কীর্তি সমূহের জন্যে প্রাপ্য কৃতিত্ব বেকন বা আর কারও নামের সঙ্গে জড়িত করার মতবাদগুলি ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে থাকে। বোধকরি শেকসপীয়রের অন্ধ ভক্তবৃন্দ যদি তাঁকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞানান্বিত ব্যক্তিরূপে ইতিপূর্বেই অতিরঞ্জিত না করে থাকতেন তাহলে তার আংশিক প্রতিক্রিয়ায় এজাতীয় বিতর্ক উত্থিত হতো না। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড এলেসমেরকে যে-পত্রটি লেখেন উইলিয়ম্ হেনরি স্মিথ সেইটেই পরের বছর পরিবর্ধিত আকারে 'বেকন অ্যাণ্ড শেকসপীয়র' নামে পুস্তিকা হয়ে বেরোয়। তাতে বেশ স্পষ্টই এ-ইঙ্গিত ছিল যে শেকসপীয়রের রচনা বলে কথিত নাটক ও কাব্যের জন্যে প্রকৃত কৃতিত্ব বেকনেরই প্রাপ্য।

সেকালে সাহিত্যরচনা ভদ্রলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল। উইলিয়ম্ কন্‌গ্রিভের প্রতি যখন রেস্টোরেশন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে ভল্‌তেয়ার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তখন কন্‌গ্রিভ্ সপ্রতিবাদে নিজের পরিচয় দেন জনৈক ভদ্রলোক বলে; অবশ্য ভল্‌তেয়ার্ মুখের উপরেই জবাব দিয়েছিলেন যে ভদ্রলোক কন্‌গ্রিভের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরুৎসুক। আজকের দিনে আমরা ভাবতেই পারিনে যে ইংলণ্ডে নবজাগরণের যুগে সাধারণত সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বসতে দেওয়া হতো বাড়ির চাকর দাসীদের-সঙ্গে। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে আপন সামাজিক খ্যাতিকে বিড়ম্বনার হাত হতে রক্ষার জন্যে শেকসপীয়রের নামের আড়ালে বেকন্ যে নাটক ও কবিতা রচনা করতে পারেন স্মিথের এ-অনুমানকে অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা বলে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না; উপরন্তু উইলমটের মতো তিনিও দেখতে পান যে শেকসপীয়র স্বাক্ষরিত ও বেকন স্বাক্ষরিত রচনাবলীর কোন কোন অংশে রয়েছে বিস্ময়কর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। অবশ্য স্মিথ সাহেব কোনও কিছুই নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ করতে চাননি, সবটাই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন সারস্বত-সমাজের নির্ধারণ শক্তির উপরে।

যা হলো তাকে বলা যায় শেক্‌স্‌পীঅর নামক নটের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কিত বিতর্কের বারুদে অগ্নিসংযোগ। বেকনপন্থীগণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন একে একে আইন সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক প্রাকাশ্যের যে-পরিচয় নাটকগুলিতে প্রকট তা কেমন করে একজন সাধারণ অভিনেতার করতলগত হবে? তদুপরি বেকনের রচনাবলী হতে এমন বহু অংশ উদ্ধৃত হলো যার অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞা নাটকগুলির বিস্তর অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞার সমান্তরালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যাঁরা মনে করেন শেকসপীয়রের নামের আচ্ছাদনে বেকন্‌ই আসলে ওই আশ্চর্য সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য, যুক্তি-ও-নির্ণয়-পদ্ধতি যে এক তা ভাবার কারণ নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার পারস্পরিক বৈষম্যও কোনখানে উচ্চণ্ড আকার ধারণ করেনি। মোটামুটিভাবে এবিষয়ে সকল

বেকনপন্থী একমত যে আইনজীবিকা কোনদিনই বেকনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, নিতান্তই গুরুজনদের চাপে আইনের চর্চায় প্রকাশ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং তার থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে তিনি আপন আন্তরিক প্রেরণার বশে একান্তে করতেন সাহিত্যচর্চা।

এসময়ে আয়ারল্যাণ্ড অভিযানে ব্যর্থ হয়ে আর্ল অব এসেক্স্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে যখন দেখেন যে তিনি রাণি এলিজাবেথের উষ্মাভাজন হয়েছেন তখন বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহে তাঁর অন্যতম প্রধান সঙ্গী স্যার গিল্‌বি মেরিক লণ্ডনবাসীদের উত্তেজিত ও এসেক্সের পক্ষভুক্ত করার জন্যে চেম্বারলেন্'স কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ দিয়ে নির্বাসন-দৃশ্য-সহ "রিচার্ড দি সেকেণ্ড" নাটকখানি অভিনয়ে রাজি করালেন। মেরিকের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে অংশত সফল হয়েছিল; তবে নাটকটির অভিনয় শুধু বিদ্রোহে নয়, এলিজাবেথের রোষেও প্রচুর ইন্ধন জুগিয়েছিল খুব স্বাভাবিক কারণেই। অভিনেতা-গণ অব্যাহতি পেলেও মেরিকের কপালে জুটল চরম দণ্ড। বেকন ছিলেন এসেক্সের বন্ধু, যদিও বিদ্রোহে তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেননি; কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে এসেক্স্ সংক্রান্ত মামলায় তদন্ত ও বিচার হতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে-ছিলেন। সে-প্রার্থনা মঞ্জুর তো হয়ইনি, বরং তাঁর পক্ষে যা সব-চাইতে অপ্রীতিকর ও মর্মান্তিক সেই গ্রন্থকার সম্পর্কিত দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হয়। বেকনের স্বীকারোক্তি হতে জানা যায় যে কোনও একটি বইয়ের গ্রন্থকার সম্পর্কে এলিজাবেথ বিশেষ সন্দিগ্ধ ও ওই গ্রন্থকারের প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হন। সমকালে আর্ল অব এসেক্সকে উৎসর্গিত ও জন হেওয়ার্ড প্রণীত "দি ফার্স্ট পার্ট অব দি লাইফ অ্যাণ্ড রেন অব হেনরি দি ফোর্থ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যাতে সিংহাসনে এলিজাবেথের অধিকার সরাসরিভাবে অস্বীকৃত। যদি বেকনের ভাষ্যকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হয় তবে বুঝতে অসুবিধে থাকে না যে এলিজাবেথের মনে সন্দেহ জেগেছিল লেখক হিসেবে জন্ হেওয়ার্ডের যাথার্থ্য সম্বন্ধে। কিন্তু বেকনপন্থিগণ একই ভাষ্যের অন্তরালে খুঁজে পান এক অন্তর্লীন অর্থ: এলিজাবেথ নাকি "রিচার্ড দি সেকেণ্ড"র প্রকৃত লেখক সম্বন্ধে সংশয়ান্বিতা ছিলেন। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করলে মানতে হবে যে শেকসপীয়র নামের কুয়াশা ভেদ করে সত্য উদ্ধারের কৃতিত্ব তথাকথিত বেকনপন্থীদের আগে এলিজাবেথেরই প্রাপ্য।

যা হোক, বেকনপন্থিগণ মনে করেন যে অতঃপর বেকন অনুভব করলেন ছদ্মনামের প্রয়োজন। এটা না হওয়াই সম্ভব যে বেকন ছদ্মনাম গ্রহণের আগে থেকেই উইলিয়ম্ শেক্স্‌পীয়রকে জানতেন; খুব সম্ভব নিতান্তই আকস্মিক যোগাযোগে তাঁর ছদ্মনামের সঙ্গে জনৈক অভিনেতার নাম মিলে যায়। তবে সকল বেকনপন্থীই যে বাস্তববোধ ও মাত্রা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ এতদূরও মনে করেন যে স্পেন্সরের "ফেয়ারি কুইন", বার্টনের "অ্যানাটমি অব মেলানকলি" প্রভৃতিও প্রকৃত পক্ষে বেকনেরই রচনা। শুধু বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ নয়, স্যার এডুইন ডার্নিং-লরেন্স মনে করেন, বেকনই ফরাসীতে মঁতেনের রচনাগুলি লিখেছেন। অবশ্য আর. এন্. থিয়োবোল্ড, লর্ড পেনৃজান্স প্রমুখ বেকনপন্থিগণ স্বপক্ষে এমন অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন ও তাঁদের দাবির ক্ষেত্রকে এমন পরিমিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন যে তাঁদের বিশ্লেষণের ধারা, বিবেচনা-বোধ ও বোধ-শক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা কঠিন। এঁদের দাবিতে তখনই আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি যে অনেক সহজ সরল যুক্তিকে এঁরা উপেক্ষা করে গেছেন। যেমন শেক্স্‌পীয়রের আইন-জ্ঞান সম্পর্কিত যুক্তিটা। একজন কঠোর অনুশীলন-শীল আইনজ্ঞ ব্যতীত আর কারও লেখনী হতে ওইসব নাটক বের হতে পারে না এই বক্তব্যের সত্যিই কি কোনও ভিত্তি আছে? শেকসপীয়রের নাটকাবলী যে সে-যুগে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল তা বেকনপন্থীরাও হাজারবার স্বীকার করবেন।

আইনের কূট তর্ক ও সমস্যায় কণ্টকিত রচনার জনপ্রিয়তা কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিচার করলে আদৌ টেঁকে? এলিজাবেথীয় যুগের একজন রাস্তার লোকও তাহলে আইনের ধাঁধা ভালোই ভেদ করতে পারত। যে জিনিষ অত্যন্ত সাধারণ জনসমাজে অমন সমাদৃত হয়ে ছিল তা একজন সাধারণ অভিনেতার পক্ষে লেখা অসম্ভব, তার জন্যে অতি ব্যাপক অনুশীলন ও অগাধ পাণ্ডিত্য আবশ্যিক এমন কথা ভাবার কোনও ন্যায়সংগত কারণ নেই।

বেকনপন্থীদের রচনায় একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু সত্যিই বিস্ময়কর। সেটি হলো হতভাগ্য শেকসপীয়রের প্রতি তাঁদের উৎকট আক্রোশ। তাঁদের বরণের ধন বেকনকে নাম ধার দিয়ে যে লোকটা এলিজাবেথের কোপের মুখে এগিয়ে গেল, বেকনকে যে লোকটা বাঁচাতে গিয়ে দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিল তার প্রতি বেকন্-ভক্তবৃন্দ কৃতজ্ঞ থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বেকন্‌পন্থিগণের রচনা পড়লে মনে হবে যে শেকসপীয়র লোকটা বদের ধাড়ি, কোঁচ্ছেলে মতলববাজ, ইচ্ছে করেই বেকনকে বঞ্চিত করেছে তাঁর প্রাপ্য কৃতিত্ব হতে। স্যার এডুইন ডানিং-লরেন্স তো পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেক্‌সপীয়রকে গালাগালি করেছেন আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে মোটা মোটা বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন "বেকন্ ইজ শেক্‌সপীয়র"। পক্ষান্তরে যাঁরা মনে করেন অক্‌স্‌ফোর্ডের সপ্তদশ আর্লই প্রকৃতপক্ষে শেকসপীয়রের নামে প্রচলিত নাটক ও কাব্যের রচয়িতা তাঁরা অভিনেতা শেকসপীয়রের প্রতি আগাগোড়া কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত। অক্‌স্‌ফোর্ডকে নিজের নাম ব্যবহার করতে দিয়ে শেক্‌সপীয়র যে অশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন এবিষয়ে তাঁদের মনে কোনও সংশয় নেই।

প্রায় একশ বছর ধরে বেকনের স্বপক্ষে প্রচুর ওকালতীর পরে দেখা গেল শেকসপীয়রের রচনাবলীর জন্যে আরও দাবীদার আছে। দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চে এঁদের উকিলদের আবির্ভাব হলো। অধ্যাপক লেফ্রান্ নামক জনৈক ফরাসী ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ঘোষণা করলেন যে ডার্বির ষষ্ঠ আর্লই নাটের গুরু। কিন্তু তাঁর এ ঘোষণা তখন চাপা পড়ে গেল গেট্‌স্‌হেডের জনৈক বিদ্যালয়-শিক্ষক জে, টি, লুনির কণ্ঠস্বরে, যিনি ১৯২০-তে স্বদেশবাসীকে জানান যে শেক্‌স্‌পীয়র এতদিন যে-গৌরব ভোগ করেছেন তাতে অকসফোর্ডেরই প্রকৃত অধিকার। অবশ্য লুনির অনুসারিগণ তাঁদের মহাজনের বাক্য ষোলআনা শিরোধার্য করেননি, তাঁরা সেই বাক্য সংশোধন করেছেন অনেকখানি। তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে অকস্‌ফোর্ড একাই সব কটি নাটক ও কবিতা রচনা করেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে বেশ কয়েকজন মিলে এগুলি রচনা করেছিলেন এবং এই কবি-ও নাট্যকার সম্প্রদায়ের অধিকারী অথবা নেতা ছিলেন অকস্‌ফোর্ড স্বয়ং; অর্থাৎ ওই নাটক ও কাব্য রচনার পিছনে আর্ল অফ্ অকস্‌ফোর্ডের অবদান পরোক্ষ হলেও প্রধান ও প্রচুর।

বিদ্যালয়ের প্রাগ্রসর ছাত্রদের কাছে "দি মার্চেন্ট্ অব্ ভেনিস্" পড়াতে পড়াতে লুনি এই ভেবে সচকিত হলেন যে ইতালি ও ইতালীয় জীবন ধারা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকলে পরের মুখে ঝাল খেয়ে অমন নাটক লেখা যায় না। তা যখন স্ট্রাট্‌ফোর্ডের অভিনেতার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় তখন নিশ্চয়ই ওই রচনাবলী আর কারও কীর্তি। শুরু হলো খোঁজা। প্যালগ্রেভের "গোল্ডেন্ ট্রেজারী"তে হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন অক্‌স্‌ফোর্ড স্বাক্ষরিত একটি কবিতাঃ "If women could be fair and yet not fond." অবিকল এ যে "ভেনাস্ অ্যাণ্ড অ্যাডোনিসে"র প্রতিধ্বনি। তখন তিনি অক্‌স্‌ফোর্ডের সপ্তদশ আর্ল এডোয়ার্ড ডে ভেরের জীবনীও আগ্রহ সহকারে গবেষণায় লেগে গেলেন। দেখা গেল রাজা, রাজসভা, উচ্চস্তরের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অক্‌স্‌ফোর্ডের অভিজ্ঞতা শুধু যে বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল তা-ই নয়, তিনি প্রচুর ভ্রমণও করেছেন এবং তাঁর ইতালি ভ্রমণের

কথা ছিল সর্বজনবিদিত। অবশ্য অক্সফোর্ডের নিজের নামে লেখা কোনও নাটকের হদিশ মেলেনি, কিন্তু ফ্রান্সিস মেরেস্ সমকালের যে-সতেরজন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের তালিকা দিয়েছেন তার প্রথম নামটি অক্সফোর্ডের আর্ল। তদুপরি লুনি দেখলেন যে শেকসপীয়রের নাটকে এমন কোনও কোনও ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা অক্সফোর্ডের অথবা তাঁর আত্মীয়দের জীবনে ঘটেছে।

কিন্তু অক্সফোর্ডপন্থিগণ ক্রমে ক্রমে আরও অনুসন্ধানের পরে দেখলেন যে নাটকগুলি অক্সফোর্ড স্বয়ং রচনা করেছেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই সন্দেহ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এই মতবাদ পরিণততর রূপ পায় অধ্যাপক গিল্‌বার্ট স্লেটরের গবেষণায় কবিতা ও সনেটগুলো যে অক্সফোর্ডেই রচনা করেছিলেন এবিষয়ে স্লেটর নিশ্চিত। অক্সফোর্ডের নেতৃত্বে যে নাট্যকারগণ ওই নাটকগুলি রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডার্বির আর্ল, ফ্রান্সিস্ বেকন্, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, কাউন্টেস পেম্‌ব্রোক, ক্রিস্টোফার মার্লো প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। মার্লো ছিলেন পেশাদার নাট্যকার ও এই সম্প্রদায়ের একজন মুখ্য নীতি-নির্ধারক ও পরামর্শদাতা। শেকসপীয়র এঁদের কাছে মধ্যে মধ্যেই আসতেন নাটকগুলি মঞ্চস্থ ও মুদ্রণ করার ব্যাপারে মধ্যস্থতার জন্যে। অর্থাৎ রচনাতে শেকসপীয়রের কোনও হাত না থাকলেও দর্শক ও পাঠকের কাছে নাটকগুলি পৌঁছে দেওয়ায় বিলক্ষণ তাঁর একটি গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। এই সারস্বত সমাজের সকলকেই তিনি নিজের নামটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন; যে কারণে বেকন্‌পন্থিগণ মনে করেন যে বেকন্ নিজের নাম গোপনে রাখতে চেয়েছিলেন সেই একই কারণে এই নাট্যকার গোষ্ঠীও স্বনাম প্রকাশে বিমুখ ছিলেন। আর এটা তো খুবই সম্ভব যে মঞ্চের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে শেকস্‌পীয়র অনেক সময়ে অনেককেই নাট্যরচনাতেও পরামর্শ দিতেন। অক্সফোর্ডপন্থীদের রচনায় তাই শেকসপীয়র একটি গৌরবময় সম্মানিত ও সৎ ব্যক্তির স্থান পেয়েছেন।

অবশ্য সমস্তটারই ভিত্তি হলো অনুমান। বেকনের বেলায় যে-ধরণের প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে তারও অভাব। অক্সফোর্ড যে নাটক লিখিতেন তার একমাত্র প্রমাণ ফ্রান্সিস্ মেরেসের সাক্ষ্য। তাঁকে ডাক দিলে তিনি কিন্তু এক নিঃশ্বাসে অক্সফোর্ডের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। তিনি যেমন কমেডি রচয়িতা হিসাবে অক্সফোর্ডের নাম সবচাইতে উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন তেমনই তৎকালের অন্যান্য উল্লেখ্য নাট্যকারদের তালিকায় শেকস্‌পীয়রকেও স্মরণ করেছেন; উপরন্তু অক্সফোর্ডের কোনও নাটকের নাম করেননি অথচ শেকস্‌পীয়রের বেলায় তাঁর অনেকগুলি নাটকের নাম করেছেন। এই ধাঁধার সমাধান অক্সফোর্ড-পন্থীদের উদ্ভাবন। তাঁদের ধারণা গোড়ার দিকে অক্সফোর্ড স্বনামেই নাটক লিখিতেন, পরবর্তীকালে অন্যান্য সহনাট্যকার-গণের সঙ্গে তিনিও শেকস্‌পীয়রের অন্তরালে আত্মগোপন করেন এবং মেরেস্ আর-দশজনের মতোই এতে প্রতারিত হয়েছেন, দু'বার দুটি নাম উল্লেখ করে এইভাবে তৃপ্তি পেয়েছেন যে সত্যি সত্যি দুজন আলাদা নাট্যকার তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্গত। অক্সফোর্ড যে একটি নাট্যকার গোষ্ঠির নেতৃত্ব করতেন এর স্বপক্ষে উদ্ধৃত হয়েছে "আর্ট অব্ ইংলিশ পোয়েজি" গ্রন্থের একটি অংশ, যার লেখক জর্জ পুটেন্‌হাম্, মতান্তরে লর্ড লুম্‌লে। কিন্তু উদ্ধৃতিটি খুঁটিয়ে পড়লে এটাই মনে হয় যে অক্সফোর্ডের সমসময়ে আরও অনেক কবি ছিলেন, যাদের কাব্য উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নাম অজ্ঞাত; তাঁদের সঙ্গে অক্সফোর্ডের আদৌ কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা সে-কথা বলাই মুশকিল, আর তিনি যে তাঁদের নেতা ছিলেন এ-কথা নিশ্চিতরূপে বলা আরও কঠিন।

জে. টি. লুনির যেমন "দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্" থেকে তেমনই অধ্যাপক লেফ্রানের "লভ্'স্ লেবর্'স্ লস্ট্" পড়তে

গিয়ে শেকসপীয়রের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সংশয় জাগে ও ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে ১৫৮৩ নাগাদ নেয়াকে অবস্থিত নাভারের রাজসভাতে সশরীরে উপস্থিত না থাকলে ও-নাটক কারও পক্ষে লেখা অসম্ভব। গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হলেন ডার্বির ষষ্ঠ আর্ল উইলিয়ম্ স্ট্যানলি। আর পাওয়া গেল এলিজাবেথের রাজত্বকালীন সরকারী নথিপত্রের মধ্যে ১৫৯৯ নাগাদ লেখা জনৈক জেসুইট গুপ্তচরের একটি চিঠি। তার একস্থানে লেখা আছে: "আওয়ার্ আর্ল অব্ ডার্বি ইজ্ বিজি ইন্ পেনিং কমেডিস্ ফর্ দি কমন্ প্লেয়ার্স।" আরও অন্বেষণ ও আরও তথ্য আর তত্ত্ব আবিষ্কার। লেফ্রানের বই বেরয় ১৯১৯-এ, লুনির এক বছর আগে। কিন্তু লেফ্রানের আবিষ্কার তখনকার ইংলণ্ডে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। পরের বছর লুনি যখন ইংলণ্ডে বসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অক্সফোর্ডের প্রতি তখন আপনা হতেই ডার্বির মামলা মুলতুবী হয়ে গেল। নতুন করে শুনানী শুরু করলেন ডাঃ টিদারলি মাত্র ১৯৫২-তে। তিনি লেফ্রানের তথ্য ও যুক্তি পুনরাবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না, তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন বংশানুক্রমের অনেক কূট তত্ত্ব, গণিত-বিজ্ঞান ইত্যাদি আধুনিক হাতিয়ারের সাহায্য। অবশ্য স্ট্রাটফোর্ডের অভিনেতা কেমন করে নাটকগুলি রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন সে-বিষয়ে তাঁর মত নতুন কিছু নয়, তা প্রচলিত মতেরই প্রতিধ্বনি। আর্ল পদলাভের অনেক আগে থেকেই উইলিয়ম স্ট্যানলি নিজের নামের আদ্যাক্ষর ডব্লিউ. এস. নামে কবিতা লিখতেন; সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্যে নাটক লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন। তাঁর বড়ো ভাই ডার্বির পঞ্চম আর্ল লর্ড স্ট্রেঞ্জের অনুগৃহীত একদল অভিনেতা ছিল। এই দলের একজনের নাম উইলিয়াম্ শেকস্পীয়র। আদ্যাক্ষর জুটির মিল দেখে ওই তরুণ অভিনেতাকে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে স্ট্যানলি নিয়োগ করলেন তাঁর নাটকগুলিকে জন-সমক্ষে উপস্থাপনের কাজে। কিন্তু শেকসপীয়র যে আদৌ এই নটসম্প্রদায়ের একজন ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। দু-এক বছর পরে এ. জে. ইভান্স মতবাদটিকে অংশত শোধন করেন। তাঁর মতে ডার্বি একা নাটকগুলি লেখেননি, একটি নাট্যকারগোষ্ঠী ওইগুলি লেখেন এবং ডার্বি ছিলেন এই সম্প্রদায়ের নেতা। অবিকল অকসফোর্ডপন্থিগণের সংশোধিত মতবাদ। শুধু অকসফোর্ডের স্থলে ডার্বি।

সে আমলে কজন নাট্যকার মিলে "স্যার টমাস মুর" নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটির পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। পাণ্ডুলিপিটি একজনের হাতে লেখা নয়, বেশ কয়েকজনের হাতে লেখা। প্রথম হাতের লেখাটি যার তিনিই বেশীর ভাগটা লিখেছেন। এটা একটি সাধারণ বিশ্বাস যে "ইন্সারেকশন্ সিন্"টি শেক্স্পীয়রের হাতে লেখা। মুরের মৃত্যুদণ্ড টিউডর যুগের বোধকরি সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক। সেই যুগেই মুরকে নিয়ে লেখা নাটকের অংশ-বিশেষ সম্পর্কে সরকারী বাধানিষেধ অনায়াসে আরোপিত হতে পারে। "ইন্সারেকশন্ সিন্" সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে টানাহেঁচড়া করতে করতে পৃষ্ঠা কটি হারিয়ে যায়। পরে শেক্স্পীয়রের ডাক পড়ে ওই পৃষ্ঠা কটি লিখে দিতে। ফলে নাটকটির পাণ্ডুলিপিতে মাত্র তিন পৃষ্ঠায় ধরা পড়েগেল শেক্স্পীয়রের হাতের লেখা। আর টিদার্লি এই তিন পৃষ্ঠার উপরেই দাবি জানালেন ডার্বির হয়ে। যদি এই তিন পৃষ্ঠা শেকসপীয়রের লেখা হয় এবং যদি নিজের হাতেই সেটুকু তিনি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে লিখে দিয়ে থাকেন এবং যদি আসলে শেকসপীয়রের না হয়ে ওই অংশ ডার্বির হয়ে থাকে তবে ডার্বিই সেই ব্যক্তি এতদিন শেকসপীয়র নামে পরিচিত ছিলেন। এতগুলো "যদি"র উপরে নির্ভর করতে দেবদূতদেরও বুক কেঁপে উঠত, কিন্তু টিদার্লি অকুতোভয়। "রিচার্ড দি সেকেণ্ড"-র লেখকই নাকি রাজরোষ হতে আত্মরক্ষার জন্যে শেকসপীয়রের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেন

এ বিষয়ে প্রায় সকলপন্থীই একমত। কিন্তু তিনি কেন আর একবার "ইনসারেকশন সিনে"র মতো বিপজ্জনক দৃশ্যের তিনটি পৃষ্ঠায় নিজের হাতের লেখা রেখে দেবেন? ওই দৃশ্য যে টিউডরদের পক্ষে আপত্তিকর হবে এ তো স্বাভাবিক কথা, বিশেষ দৃশ্যটিকে একবার নিষিদ্ধও করা হয়েছিল। ভাবি যখন আত্মরক্ষার্থে একবার অন্য নাম নিয়েছেন তখন তাঁর পক্ষে অমন একটি দৃশ্যের রচয়িতা হিসেবে হাতের লেখা রেখে দেবার কোনও কারণ থাকতে পারে না, সেখানেও তিনি নিশ্চিতরূপে আর কারও হাতের লেখায় আত্মগোপন করবেন।

আত্মগোপন কাহিনীগুলির মধ্যে সবচেয়ে রোমহর্ষক হচ্ছে ক্যাল্‌ভিন্‌ হফ্‌ম্যানের মতবাদ। এই মার্কিন ভদ্রলোক মনে করেন যে ক্রিস্টোফার মার্লোই আসল নাট্যকার। মাত্র ন-দশ বছর আগে এই মতবাদের জন্ম। মার্লোর রচনা বলে যেগুলো সর্বজনস্বীকৃত সেগুলোর সঙ্গে শেকসপীয়রের নামে প্রচলিত রচনার সাদৃশ্য হইতেই হফ ম্যান্‌ অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হন। হফ্‌ম্যানের পক্ষে প্রধান বাধা এই ছিল যে মার্লো মারা যান ১৫৯৩-এ অথচ শেকসপীয়রের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোই এর পরে লেখা। আর কেউ হলে এখানেই নিরস্ত হতেন, হফ্‌ম্যান কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করে মার্লো লণ্ডনে গিয়ে নাট্যকার হিসেবে ভাগ্যপরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। খ্যাতি জুটল, কিন্তু বিত্তের ঘরে শূন্য। স্যার টমাস ওয়ালসিংহাম নামে জনৈক কেন্টীয় ভূস্বামী ছিলেন অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের প্রতিপালক। মার্লো পেলেন তাঁর আশ্রয়। কিন্তু হফম্যান মনে করেন ওয়ল্‌সিংহাম্‌ ও মার্লোর সম্পর্কটা শুধু শিল্পীর অনুরাগী ও অনুগৃহীত শিল্পীর ছিল না, তাঁদের মধ্যে সমকামের সম্পর্কও একটা ছিল। এর মধ্যে প্রিভি কাউন্সিল থেকে শমন এল মার্লোর নামে। কী ব্যাপার? ফ্লাণ্ডার্স থেকে তাড়া খাওয়া একদল প্রোটেস্টান্ট সরকারের অনুমতি নিয়ে লণ্ডনে বসবাস শুরু করে। লণ্ডনের নাগরিকদের আশংকা হলো এই লোকগুলো ব্যবসায় তাদের ভাত মারবে। অনেক দেয়ালপত্র পড়ে গেল রাতারাতি। কারা এসব করছে তার অনুসন্ধানে প্রিভি কাউন্সিল অনেককে গ্রেপ্তার করল। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে নাট্যকার টমাস কিডের কাছে পাওয়া গেল কিছু ধর্মবিরোধী লেখা। কিড্‌ বললেন ওগুলো মার্লোর লেখা, মার্লো তাঁর সঙ্গে কিছুকাল একঘরে ছিলেন। অমনই শমন পাঠানো হলো মার্লোর নামে। তখনকার দিনে ধর্মবিরোধিতা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হতো। স্যার টমাস্‌ ওয়ল্‌সিংহাম্‌ দেখলেন তাঁর প্রেমের মানুষ মারা যায়। তিনি মার্লোকে বিস্তর টাকাপয়সা দিয়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে পালাবার পরামর্শ দিলেন; অন্যদিকে তিনজন ভাড়াটে খুনেকে লাগালেন যে কাউকে খুন করে ধরা দেবার জন্যে। ধরা পড়ে তারা সাফাই গাইল যে যাকে মেরেছে সে-ই মার্লোই আগে মারতে আসে, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তারা মার্লোকে অনিচ্ছায় মেরে বসেছে। মার্লো ওদিকে দিব্যি উত্তর ইতালিতে বসে এক একটি নাটক লিখছেন, ওয়ল্‌সিংহাম্‌কে পাঠাচ্ছেন আর ওয়ল্‌সিংহাম্‌ স্ট্রাট্‌ফোর্ডের এক স্থূল রুচির অভিনেতাকে দিয়ে সেগুলো প্রকাশ করাচ্ছেন।

হফম্যানের এই মতবাদকে পদে পদে জেরা করার আগেই সকলেরই মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। যখন একজন প্রায় অজ্ঞাত লোককে মার্লো বানিয়ে খুন করা হয় তখন তো আসল মার্লো ডোভারে পৌঁছেই গেছেন, আর অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ইংরেজ আইনের আওতার বাইরে চলেই যেতেন। অর্থাৎ পালানোর ব্যাপারে ওই হত্যাকাণ্ডটি কোনও সাহায্য করেনি; হত্যাকাণ্ডের আগেই তিনি পালিয়েছেন বলা যায়। পালিয়ে গিয়ে উত্তর ইতালিতে যদি তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন তবে প্রিভি কাউন্সিলের সাধ্য ছিল না মার্লোর চুল পর্যন্ত স্পর্শ করে। যথেষ্ট টাকাপয়সা সঙ্গে দিয়ে দিলেই তো

মার্লোর নিরাপত্তা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। ওই হত্যাকাণ্ডটি কেন? আর যদি হত্যাকাণ্ডটি মার্লোর পলায়নে আচ্ছাদন হিসেবে এতই জরুরি ছিল তাহলে সেটি কেন রানির করোনারের এলাকায় সংঘটিত হলো, অনায়াসে তা কি কোনও স্থানীয় বা নিকটস্থ করোনারের এলাকায় হতে পারত না? তাহলে ঘুষ দিয়ে করোনারের মুখ চাপা দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো নাকি ওয়লসিংহামের পক্ষে?' তা না করে ওয়ল্‌সিংহাম্‌ কেন অত বড়ো একটা ঝুঁকি নিলেন? হত্যাকাণ্ডের জন্যে ভাড়াটে খুনেদের প্রচুর অর্থ দিতে হলো, রানির করোনারের মতো অশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ড্যান্‌বিকেও নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য রকমের মোটা ঘুষ দিতে হলো, এত সব ব্যাপার যাতে ফাঁস না হয় তার জন্যে দারুণ ঝুঁকি নিতে হলো। অথচ ড্যান্‌বি যে আদৌ ঘুষ খেতে পারেন এমন কথাই কল্পনা করা যায় না, কিন্তু যদি কল্পনা করাই যায় তবে মানতে হবে যে ওই হত্যাকাণ্ডের দরুণ মার্লো অথবা ওয়ালসিংহামের নিজেদের কোনও বিশেষ সুবিধেই হয়নি, বরং একজনের টাকা ও মানসিক স্বস্তিই গেছে, যা হয়েছে তা শুধু ভাড়াটে গুণ্ডা তিনজনের, ড্যানবির এবং হফম্যানের সুবিধে।

শেকসপীয়রের আরও অনেক দাবিদার আছেন, তবে তাঁদের মধ্যে এই চারজনই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য, এঁদের দাবিই সবচাইতে চাঞ্চল্যকর। যে সময় বেকনের নাম প্রকৃত নাট্যকার হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছিল তখন শেকসপীয়রের সম্বন্ধে কোনও তথ্যই প্রায় জানা ছিল না। যাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না তাঁকে বাতিল করে যাঁর সম্বন্ধে অনেকখানি জানা ছিল সেই বেকনকে কতকগুলি আপতিক যোগাযোগের কারণে প্রকৃত নাট্যকার হিসেবে দাবি তোলা একেবারে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অন্যান্যদের সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যে দাবি তোলা হয়েছে তা অনেকটা বেকনের জন্যে দাবি তোলার অনুকরণে বলা অন্যায় হবে না হয়তো। অর্থাৎ বেকনের পক্ষে ওকালতীর মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের সৎ মনোভঙ্গি ছিল। পরবর্তীকালে যখন শেকসপীয়র সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তখন, তা যথেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও, আর কাউকে প্রকৃত নাট্যকার হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টায় উদ্দাম কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। কেননা বাস্তব যুক্তির দিক থেকে শেকসপীয়রকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনাটা কোনমতে সমর্থন পায় না।

শেকসপীয়র যদি সত্যিই একজন মূর্খ, মূঢ় ও মাতাল হতেন তবে তাঁর পক্ষে যে কোন মুহূর্তে ব্যাপারটির গোপনতা ভেঙে দেবার বিপদ ছিল। বেকন, অক্‌সফোর্ড, ডার্বি কিংবা ওয়লসিংহাম কি এতটা নির্বোধ ছিলেন যে ওই বিপদের ঝুঁকি নেবেন? তাছাড়া শেকসপীয়র যদি সত্যিই নাট্যকার না হতেন, শুধু একজন সামান্য অভিনেতা হতেন তবে তাঁর পক্ষে কোনও নাটক মঞ্চস্থ করার কালে তাতে কিছু যোগ-বিয়োগ করারও ক্ষমতা থাকত না। অথচ এটা সহজেই অনুমেয় যে কোনও নাটককে মঞ্চস্থ করার সময় তাকে মঞ্চোপযোগী করার জন্যে কিছু সংশোধনের প্রস্তাব অভিনয়টির প্রযোজকদের পক্ষ থেকে করা হতো। বিশেষত প্রযোজকগণ যখন জানতেন যে তাঁদেরই সম্প্রদায়ের জনৈক অভিনেতা নাটকটির রচয়িতা তখন নাটকটিকে ষোলআনা মঞ্চোপযোগী করে দেবার অনুরোধ বা আদেশ তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারতেন এবং অভিনয়ের মহড়ার মধ্যে নাট্যকারকে সেসব করে দিতে হতো। এই অনুমান মিথ্যে হলে মানতে হবে নাটকগুলির প্রযোজক ও পরিচালকবর্গও জানতেন যে কে ওগুলির মূল রচয়িতা। তাঁরা জানতেন মানে অনেকেই জানতেন। তার মানে ব্যাপারটা মোটেই গোপন ছিল না। অথচ ব্যাপারটা যে বহুজনবিদিত ছিল তার কোনও প্রমাণই নেই। আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে বিচার্য। তখনকার দিনে সাহিত্যিক হওয়াটা সম্মানের ব্যাপার ছিল না একথা সত্যি বটে। কিন্তু যাঁদের পক্ষে দাবি তোলা হয়েছে তাঁরা যে সাহিত্যের চর্চা করতেন এর স্বপক্ষে কিছু-না-কিছু দলিল তো আছেই। সুতরাং

সাহিত্যের চর্চা অসম্মানকর শুধু এই কারণে তাঁরা নিশ্চয়ই আত্মগোপনের চেষ্টা করেননি।

তাহলে বলতে হয় যে সরকারী রোষ থেকে তাঁরা আত্মরক্ষার্থে শেকসপীয়রের নামের আড়ালে লুকিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকারের রাজদ্রোহী কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কোনও অংশ যদি নাটকগুলিতে থাকত তবে তা আদৌ মঞ্চস্থ হতে পারত না। সরকারী বিধি-নিষেধ তখনকার দিনে অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং কোনও নাটক বা নাটকের অংশ আপত্তিকর হলে তা নির্বিবাদে ছাঁটাই পড়ত। "স্যার টমাস মুর" নাটকটির বেলায় এরকমই হয়েছিল, শেকপীয়রের রচনা বলে চিহ্নিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র "রিচার্ড দি সেকেণ্ড" নিয়ে একটু বা গোলমাল হয়েছিল। কিন্তু সেটাকে যতক্ষণ-না চিহ্নিত রাষ্ট্রদ্রোহীগণ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে ততক্ষণ কিছুই হয়নি। যখন হলো তখন অভিনেতাদের শাস্তি হয়নি, নাট্যকার বলে যিনি পরিচিত ছিলেন সেই শেকস্পীয়রের নামেও শমন পর্যন্ত বের হয়নি। যেসব রচনার জন্যে শেকস্পীয়রের কোনও বিপদ হয়নি সেসব নাটকের রচয়িতা যদি সত্যিই বেকন বা অকসফোর্ড, ডার্বি বা আর কেউ হতেন তাহলে তাঁদেরও বোধকরি বিপদে পড়তে হয়নি। সেজন্যে সরকারের হাত থেকে বাঁচার জন্য শেকপীয়রের নামে লুকিয়ে থাকাটাকে সম্পূর্ণ অনর্থক মনে হয়। আর যদি লুকোতেই হয় তবে একজন অভিনেতাকে শিখণ্ডি দাঁড় করানো কেন? যে কোনও একটা ছদ্মনামই তো নেওয়া যেত! শেকস্পীয়রকে শিখণ্ডী করাটা তো সমান বিপজ্জনক।

অবশ্য এত সবকিছুর পরেও বলতে হয় যে শেকসপীয়র একজন অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন কি ছিলেন না এ-তর্কে মাথা ফাটাফাটি করে কোনও লাভ নেই। শেকসপীয়রের রচনা বলে পরিচিত কাব্য ও নাটকগুলি আমাদের হাতের কাছে আছে এবং এগুলো গীতা-বাইবেলের প্রতিদ্বন্দ্বী। এসব বাক্যের স্পর্শে আমাদের চেতনা কালকে জয় করে, দেশকে অতিক্রম করে, আত্মনকে বিদ্ধ করে। কে কালিদাস, কে শেকসপীয়র নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করুন, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কয়েকটি নাটক, কিছু কাব্য নিয়েই তুষ্ট।

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

পূর্ব-এশিয়া পরিক্রমা

ডঃ সুকুমার দত্ত

(১৩৭০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে

বর্ম্মা হইতে ক্যামবোডিয়া পর্যন্ত নানাদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গলাভ করিয়াছি। জাপানেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। তবে জাপানে এক'শোর উপরে বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ের সহিত সংস্পর্শ হয় নাই। বেশী হইয়াছে নিচিরেণ ও জেন সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

জেনধর্ম্ম চীন হইতে জাপানে আসিয়াছিল বারো শতাব্দীতে ; মধ্যযুগে জাপানী কৃষ্টির সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হয়। জেন হইতেই জাপানের হাইকু-কবিতা, নো-নাট্য, চা-পান অনুষ্ঠান, স্থাপত্যরীতি ও জাপানী সভ্যতার আরও নানা অঙ্গ উদ্ভূত হয়। জেনধর্ম্ম বাদ দিয়া জাপানী সভ্যতার অন্তর্নিহিত ভাব-ধারার উপলব্ধি হয় না।

চীন ও জাপান ব্যতীত অন্যদেশে জেনধর্ম্মের কোনও প্রভাব নাই। পাশ্চাত্যখণ্ডে যিনি প্রথম জেনধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার নাম সুজুকি। তিনি জেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় প্রায় একশোখানা বই লিখিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু আমি পড়িয়াছি। লিখিবার ভঙ্গী ও ব্যাখ্যার সরলতায় এই বইগুলি জেনধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। চমৎকার ইংরাজী,—হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা। ইঁহার লেখারগুণেই জেনধর্ম্ম এখন আমেরিকায় সুপরিচিত ও আমেরিকা হইতে অনেকে এই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য জানিতে ও ইহার বিধি-নিয়ম অভ্যাস করিতে কিয়োটোর জেন আশ্রমে আসিয়া কালাতিপাত করেন।

ইহার একটি আশ্রমের কর্ত্রী একজন আমেরিকান মহিলা — মিসেস্ সেসাকি। ইঁহার স্বামী একজন জাপানী জেন ধর্ম্মযাজক ছিলেন এবং কিয়োটোতে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। বহু বৎসর হল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই হইতে তাঁহার আমেরিকান স্ত্রী এই কিয়োটোতে আশ্রমটি চালাইতেছেন, ইঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের কথা পরে বলিব।

জেনধর্ম্ম সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত আছে। কেহ কেহ ইহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন ও বুজরুকি আখ্যা দিয়াছেন। ধর্ম্মের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই এবং ভ্রমণ-কাহিনীতে এইরূপ চেষ্টাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

সংক্ষেপতঃ এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধ্যান (জাপানী—জাজেন) দ্বারা বোধি (জাপানী—সাটোরি) অর্জ্জন করা। কিন্তু এই ধ্যান একটু বিশিষ্ট প্রকারের। পদ্মাসনে স্থির হইয়া শিক্ষকের দত্ত একটি প্রশ্ন-সমাধানের চেষ্টা। প্রশ্নটি এমন যে কোনও ন্যায়-নির্দ্দিষ্ট চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োগে তাহার সমাধান অসম্ভব। এই প্রশ্নের নাম—কোয়ান। যথা বহু চলে যদি একের দিকে, তবে একের গতি কিসের দিকে ? তালি বাজে দুই হাতের সংঘাতে, কিন্তু এক হাতের ধ্বনিটি কি ? যখন তোমার জন্ম হয় নাই, তখন তোমার চেহারা কি ছিল ? ইত্যাদি। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন, সাধারণ বুদ্ধির

অগম্য। জেন-ব্যাখ্যাতারা বলেন যে এই সব প্রশ্ন-সমাধানের একমাত্র উপায় মনের স্তরকে ধ্যানের দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রশ্নকর্তার মন-লোকে পৌঁছান। সে মন-লোকে আকার নাই, শ্রেণীভেদ নাই, সংজ্ঞা নাই, আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় তুরীয়।

এই জেন ধর্ম্মের আধুনিককালের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক স্বজুকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্ম আমরা তাঁহার একজন প্রাক্তন জাপানী ছাত্রের সঙ্গে টোকিও হইতে কামাকুরা গেলাম।

মহাস্থবির, ঋষিতুল্য, জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত। বয়স এখন চৌরানব্বই। ইনি যৌবনে জাপানের ওটানি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাপক ছিলেন।

ওটানি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম ও সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। অধিবেশনের পরে একটি আলোচনা সভা হয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপকদের লইয়া। জাপান ও ভারতবর্ষের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'বোরোমন সোজো' ব্যতীত অন্য কোনও নাম করিতে পারিলেন না। বক্তৃতায় আমি প্রধানতঃ স্বজুকির কথাই বলিয়াছিলাম। এখনও তিনি Emeritus Professor রূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত আছেন।

স্বজুকি ওটানি হইতে আমেরিকার বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া চলিয়া যান। বহুবৎসর আমেরিকায় কাটাইয়াছেন ও সেখানে জৈনিকা আমেরিকান রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী আমেরিকায়ই মারা যান, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্বজুকির কামাকুরাস্থ গৃহের একটি কক্ষে তাঁহার আলেখ্য প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি পায়। স্বজুকি নিজে আমাদের এই ঘরে নিয়া দেখাইয়াছিলেন। ছবির নীচে ফুলের স্তূপ।

কামাকুরা সমুদ্রতীরে ছোট সহর। টোকিও হইতে রেলে ঘণ্টা তিনেকের পথ। গ্রামাঞ্চলেরই একটি অংশ। এখানে জাপানের দ্বিতীয় বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি। সর্ব্ববৃহৎ মূর্ত্তিটি নারার তোদাইজি মন্দিরে। আমাদের সঙ্গী সেসাকি,—স্বজুকির ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং বর্ত্তমানে টোকিওর Unesco দপ্তরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী—আমাদের অনেক গলি-ঘুঁচি পার করাইয়া একটি পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া আসিলেন। শীর্ষে স্বজুকির বাড়ী লম্বা ধাপ-কাটা পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া যাইতে হয়। দুই পাশে বাঁশের বন, সমস্ত পথটা ছায়ায় ঢাকা। যেন সহরের কলরব ছাড়িয়া কোনও পরম শান্তির ধামে উঠিতেছি।

একটি সুন্দরী জাপ-আমেরিকান (Jap-American) যুবতী আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। জাপানী-ছাঁদের কাঠের বাড়ী। দরজা-জানালা কাঠের ফ্রেইমে বাঁধান কাগজে আবৃত। আমি অনাবধানতা বশতঃ একটি দরজা খুলিতে গিয়া কাগজ একটু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। কেহ কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু এজন্য আমার অনেকদিন মনস্তাপ ছিল।

যুবতীটি আমাদের একটি অতি সুস্বাদু ও কিঞ্চিৎ জাপানী মদ্য মিশ্রিত পানীয় পরিবেশন করিতেছিলেন, এমন সময় স্বজুকি আসিয়া আমাদের পাশে একখানা আসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার তিরানব্বই বৎসর বয়স, কানে একটু কম শোনেন। আমাদের কথা তাঁহার যুবতী সেক্রেটারিটি কানের কাছে মুখ নিয়া বলিয়া দিলে তিনি উত্তর দেন। কিন্তু শরীর জরাগ্রস্ত নয়। কি সুন্দর প্রশান্ত মুখ, ইংরাজি উচ্চারণ কি পরিষ্কার, মনের শক্তি কিছুমাত্র লোপ পায় নাই।

কলিকাতায় গেলে আমি প্রবীণ বঙ্গ-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসমঞ্জস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তাঁহার বয়সও প্রায় পাঁচ-

আশীর কাছাকাছি। তাঁহার সঙ্গলাভের একটি আকর্ষণ তাঁহার সস্নেহ কথাবার্তা। ভারতবর্ষ হইতে এতদূর এই জাপানে আসিয়া স্বজুকির কাছেও তাহার আভাস পাইলাম। অধিকবয়স্কের স্নেহ পাইলে বৃদ্ধবয়সে মনে হয় যেন অতি-দুর্লভ কিছু লাভ হইল।

স্নেহ করার মত লোক বিরল। হয়ত কিছু প্রথাগত শ্রদ্ধা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুধের তৃষ্ণা ত ঘোলে মেটে না।

জেন ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার সেই যুবতী সেক্রেটারির মাধ্যমে মন দিয়া শুনিয়া কাগজ ও পেন্‌সিল চাহিলেন ও কাগজে কতগুলি formula (সূত্র) লিখিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বুঝিলাম বলিতে পারি না।

১৯৬০ সনে স্বজুকি ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের করুণা ও প্রজ্ঞা জেন ধর্মে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে, স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগৃহে সে সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়া দেখিলাম যে দিল্লীতে আগমনের কথা তাঁহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু বলিলেন যে তাঁহার মনে আছে যে বছর দুই আগে তিনি ভারতবর্ষে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন ও লুম্বিনী ও বুদ্ধগয়া দেখিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত দুই খণ্ড পুস্তক নিজহস্তে আমার নাম লিখিয়া ও নিজের স্বাক্ষর দিয়া উপহার দিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া রাত্রিতে টোকিও ফিরিলাম।

আর দুইজন জেন পণ্ডিতের সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল তাহা কিয়োটোতে—ম্যাডাম সেসাকি ও অধ্যাপক হিসামাৎসু।

ম্যাডাম সেসাকির কথা পূর্বে একটু বলিয়াছি। বর্ষীয়সী আমেরিকান মহিলা, পাশ্চাত্য পোশাক ছাড়েন নাই, ঘরের আসবাবের মধ্যে চেয়ার টেবিলও আছে। আমাদের চা'র পরিবর্তে কফি খাওয়াইলেন। তাঁহার আশ্রমটি কিয়োটোর এক নিভৃত প্রান্তে। ধ্যান-গৃহটিতে একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি ও কতগুলি ধ্যানের আসন আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "সিপ্পোখানা (Shippo—ধ্যানকালে তন্দ্রাগ্রস্তকে জাগাইবার জন্য যে বংশখণ্ড ব্যবহৃত হয়) কোথায়?" তিনি একটু যেন বিব্রত হইয়া বলিলেন: "সিপ্পোর ব্যবহার কচিৎ-কখনো হয়। কিন্তু বিদেশ হইতে যাহারা আসেন তাঁহারা ঐ সিপ্পটিই আগে দেখিতে চান, যেন এই ধ্যান-গৃহে মার-ধোরই চলে।" দণ্ডখানি পরিপুষ্ট,—বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হইল না।

ম্যাডাম সেসাকি তখন Zen Dust (জেনের ধূলা) নামে একখানি বই লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন (এখানা এখন প্রকাশিত হইয়াছে) ও চীনা জেন সাহিত্য মন্থন করিতেছিলেন।

আমরা বারান্দায় উপবিষ্ট হইলে চীনা বই হইতে ইংরাজিতে তর্জমা করিয়া 'কোয়ানে'র অর্থ ও তাৎপর্য্য বুঝাইতে লাগিলেন। চীনা ভাষা জাপানী জেন পণ্ডিতদের মাতৃভাষার সমতুল্য। পড়া শেষ হইলে আমরা আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে শুক্লপক্ষ তৃতীয়ার চন্দ্রখণ্ড উঠিতেছিল। ম্যাডাম সেসাকি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন: "দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর চাঁদটি আকাশে।" জেন ধর্ম্মে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যের স্পর্শকাতর অনুভূতি মর্ম্মগত,—ইহার বিশেষ প্রকাশ জেন-প্রভাবিত জাপানী 'হাইকু' কবিতায়।

হিসামাৎসু আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজি ভাল জানেন, কিন্তু কখনও ইংরাজিতে কথা বলেন না। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আমেরিকান শিক্ষার্থী একখানা বড় নোট-বই লইয়া আমাদের সঙ্গ

লইলেন। বলিলেন: "আপনারা হিসামাৎসুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন? তিনিত জাপানী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন না। আমি আপনার দোভাষী হইয়া সঙ্গে যাইব। জাপানী ভাষা আমার খুব ভাল জানা আছে। আর এই দুই পণ্ডিত, ডাক্তার দত্ত ও অধ্যাপক হিসামাৎসু, কি আলোচনা করেন এই নোটবুকে তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিব।" জাপানী সংবাদপত্র লেখকরা আমাকে কি লজ্জাতেই ফেলিয়াছেন,—পাণ্ডিত্যে হিসামাৎসুর সহিত আমার দূরত্ব যে আকাশ-পাতাল এখন কি করিয়া এই আমেরিকান যুবকটিকে বুঝাই?

হিসামাৎসু একটি সরু গলির উপর খড়ের ছাদ দেওয়া একখানা ছোট বাড়ীতে থাকেন। আলাপ-পরিচয় ও ভদ্রতা-বিনিময়ের পরে আমি জেন-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলাম। আমেরিকান যুবকটির পেন্সিল দ্রুতলিপির (Short hand) দ্রুতগতিতে পাতার পর পাতায় ছুটিয়া চলিল। হিসামাৎসু সংক্ষেপে জাপানী ভাষায় অতি-সুচিন্তিত অতি-সারগর্ভ উত্তর দিলেন যাহা আমেরিকান সঙ্গীটি অনুবাদ করিয়া দিলেন ও শেষে বলিলেন: "যদি জেনের মর্ম্মগ্রহণ করিতে চান্, ভাষায় তাহা পাইবেন না। কিয়োটোর Rock-garden (বালি ও নানা আকারের প্রস্তরখণ্ড দিয়া তৈরী বৃক্ষহীন পুষ্পপল্লবহীন পাথর-ঘেরা উদ্যান-খণ্ড) দেখিয়া আসুন। আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

কিছু পরে বাহিরের আঙ্গিনায় একটি ট্যাক্সির honk (হুঙ্কার) শুনিলাম। চা ও মিষ্টান্ন ভোজন সারিয়া অধ্যাপক হিসামাৎসুকে সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া ট্যাক্সিতে Rock-garden এ গেলাম। ভাড়া দিতে গেলে ট্যাক্সিওয়ালা বলিল: "ভাড়া ত অধ্যাপক মহাশয় আমাকে পূর্ব্বেই দিয়া দিয়াছেন।"

একটি বড় জেন-মন্দিরের পাশে এই Rock-garden. পাথরের দেয়াল ঘেরা একখণ্ড জমি। বালি দিয়া ঢাকা। বালির উপর কতগুলি পাথরের খণ্ড নানা জন্তুর আকারে সাজানো।

বিশ্ব-প্রকৃতির যে নিগূঢ় অন্তস্তলে বাহিরের নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য, নানা নাম ও আকারের বিভিন্নতা এক হইয়া মিশিয়া যায়, নানা প্রকাশের নানা রূপ মিটিয়া গিয়া কেবল একটানা ধূসরের বিস্তার ও তাহার উপর সৃষ্টির আদিম প্রাণশক্তির পাশবিক খেলা,—এ যেন তাহারই প্রতীক। যেন বিশ্ব-প্রকৃতির বাহির হইতে গভীরতম স্তরে ডুবিয়া যাওয়া,—যেখানে বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রস নাই, বস্তু-নিচয়ের পার্থক্য নাই, কেবল প্রকৃতির আদিম প্রাণ-শক্তির মননহীন স্ফূর্ত্তিবৃত্তির খেলা চলিতেছে। Rock-garden এর এই যে প্রকৃত তাৎপর্য্য হলফ্ করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমার ভারতীয়-সংস্কারাপন্ন মনে এই অর্থটিই জাগিয়াছিল।

এই তিনজন নাম-জাদা জেন পণ্ডিত ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতব্যক্তিদের সঙ্গে অন্যত্র আলাপ-ব্যবহার হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নাগাও একজন। তিনি আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত,—'লঙ্কাবতার সূত্রে'র দুইখণ্ডে একটি শব্দতালিকা (Index) প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাকে উপহার দিলেন। কিন্তু ইনি সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারেন বলিয়া মনে হইল না। জাপানে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। তাঁহাদের একজন জাপানীতে 'কুমার সম্ভবে'র অনুবাদ করিয়াছেন। এককপি আমাকে উপহার দিয়া অনুরোধ করিলেন: "আমি সংস্কৃত উচ্চারণ জানি না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া শুনান।" আমি তাঁহাকে 'অস্ত্যুত্তরাস্যাং দিশি দেবতাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকটি শুনাইলে তিনি আগ্রহের সহিত কান পাতিয়া শুনিলেন।

প্রাচীন জাপানে—কিয়োটো

টোকিও হইতে আসিলাম কিয়োটোতে।

জাপানীরা দেশের রাজধানীর অবস্থান অনুসারে ইতিহাসের যুগ-বিভাগ করে,—যথা নারার যুগ, কিয়োটোর যুগ, কামাকুরার যুগ, ওডোর (টোকিওর) যুগ। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরাও এ-প্রথা বাতিল করেন নাই।

৭১০ খ্রীস্টাব্দে নারা হইতে কিয়োটোতে রাজধানী সরিয়া যায়। কিয়োটোর প্রাচীন নাম ছিল হিয়াই। হিয়াইর কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড় আছে, তাহার নাম হিয়াই পাহাড়। এই পাহাড়ের শীর্ষে অষ্টম শতাব্দীতে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। বহুযুগ ধরিয়া তাহা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে আমরা এক রবিবার দিন গিয়াছিলাম। এখন সেখানে প্রধানতঃ রবিবারের ছুটির দিনে ভিড় হয়। নান দোকান পাট বসিয়াছে। চড়িভাতি খাওয়া হইতেছে;—নানারকম ফুর্ত্তি চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের নিত্য-অভ্যস্ত ক্যামেরার 'ক্লিক্'। ছবি তুলিবার ক্যামেরা প্রায় প্রত্যেক জাপানীই সঙ্গে লইয়া বাহির হন। এগুলি এখানে খুব সস্তা ও খুব নিপুণ-ভাবে তৈয়ারী। হিয়াই পাহাড় ঘন জঙ্গল বেষ্টিত। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার জন্য 'বাস' আছে ও নামিবার 'জন্য' 'বাসে' ঝুলিয়া অরণ্যের শীর্ষ ঘেঁসিয়া যাইবার Cable Way (লোহার দড়িতে ঝুলিয়া ঝুলিয়া অবতরণের বন্দোবস্ত) আছে। এই কৌশলটি ভারতবর্ষে বা এশিয়ার অন্য কোথাও দেখি নাই। অনভ্যস্ত থাকায় একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল,—কখন দড়ি ছিঁড়িয়া বাসটি গভীর অরণ্যে তলাইয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন জাপানে তেমন হিয়াই-পাহাড়। এখানে টেণ্ডাই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের অধ্যায়ন ও চর্চ্চা হইত। জাপানের বহু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথম জীবনে এই খানেই বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিয়োটোর প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে আমি কিয়োটো অবস্থানকালে প্রায়ই আসিতাম। প্রাচীন গ্রন্থাগার,—অসংখ্য চীনা গ্রন্থ। গ্রন্থাগারে পাঠকদের মধ্যে অনেক আমেরিকান পণ্ডিত একান্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে ব্যাপৃত দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত আমার দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিদের কংগ্রেসে আবার দেখা হইয়াছিল। আমি এখানে নারার 'বোয়োমন সোজো'র জীবনী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইতাম। জাপানী ও চীনা গ্রন্থ হইতে তত্ত্বানুসন্ধানে ওখানকার চীনাভাষাজ্ঞ একজন আমেরিকান পণ্ডিত, নাম হারবিট্‌জ (Herbitz) আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বেই কিছু জানা ছিল। ইনি অনেক আমেরিকান মাসিক পত্রিকায় প্রাচ্য সম্বন্ধে লেখেন। আমার Early Buddhist Monachism বইখানির কোনও প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্রিকায় ইঁহার লিখিত দীর্ঘ সমালোচনা আমাকে দেখাইলেন।

একদিন আমরা যখন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উদ্যত, ইনি আমাদের সঙ্গ লইলেন। আধঘণ্টা বাক্যালাপ করিবেন বলিয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাটাইলেন। কথাবার্ত্তা হইল জাপান সম্বন্ধে। বলিলেন: জাপানে তিনটি জিনিস লক্ষ্য করিবার,—এখানে Unemployment (বেকার-সমস্যা নাই, Illiteracy (নিরক্ষরতা) নাই ও Poverty (দারিদ্র্য) নাই। চাকর কি রাঁধুনী কি পরিচারিকা পাওয়া মুস্কিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে আমেরিকার মতই ঘরের কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত ভৃত্য পাওয়া যাইবে না। জাপানীরা তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টায় নানাভাবে ব্যাপৃত।

কিসে দেশের অর্থাগম বাড়িবে সেই দিকে প্রধান দৃষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা।

আমরা নারা হইতে কিয়োটো ফিরিয়া দুই দিন ছিলাম মিয়া-কৈকানে। 'কৈকান' কথাটির অর্থ হোটেল। বাকি দিন দশেক রিকিউ-কৈকানে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য দোতালার কয়েকটি ঘরে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। বাকিটা সভা-সমিতি, বক্তৃতা, গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিবাহ-উৎসবের জন্য। এখানে থাকা-কালীন কয়েকটি বিবাহ-উৎসব আমরা দেখিয়াছিলাম। জনৈকা পাত্রীর পরিহিত জরির কাজ করা কিমোনা দেখিয়া আমি দাম জানিতে উৎসুক হই। দাম যাহা বলিল তাহা আমাদের দুই সহস্র টাকার সমান। জাপানীদের বিবাহ হয় শিন্টো প্রথায়, মৃত্যুর পর প্রেতকার্য হয় বৌদ্ধ প্রথায়।

মিয়া-কৈকানে দুই দিন সুনীতি বাবুর (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে কাটাইবার আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমেরিকা হইতে ম্যানিলা হইয়া দেশে ফিরিবেন মনস্থ করিয়া জাপান ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় প্রবেশদ্বারের কাছে তাঁহার সুপরিচিত গলার আওয়াজ শুনিয়া বাহির হইয়া দেখি সুনীতিবাবুও মিয়া-কৈকানে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। কলেজের ছাত্রাবস্থা হইতে আমার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও আমার স্ত্রীর সহিতও যথেষ্ট পরিচয়। তাঁহার মত ভাষাতত্ত্বে এত বড় পণ্ডিত যে গল্প-গুজবে, হাসি-তামাসায়, পরিহাস-রসে এত সুপক্ব হইতে পারেন তাহা সাক্ষাৎভাবে না জানিলে বিশ্বাস করিবেন না। ভাষা নকল করিতে তাঁহার মত ওস্তাদ দ্বিতীয়টি নাই। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীর সহিত প্রাদেশিক ভাষায় কিরূপ আলাপ করিতেন তাহার চমৎকার নকল শুনাইলেন। আলাপটি বোধহয় স্বকপোলকল্পিত।

রিকিউ কৈকানে একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় মিঃ চক্রবর্তী নামে একজন বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া দেখা করেন। বলিলেন তিনি সংবাদপত্রে আমাদের এখানে আসার ও রিকিউ কৈকানে থাকিবার সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। দক্ষিণ এসিয়ার অনেক জায়গা ঘুরিয়া এখন তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে (Language School) ইংরাজি শিক্ষকের পদে স্থায়ী হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী জাপানী মহিলা। তাঁহাদের বীণা নামে একটি ছয়-সাত বৎসরের মেয়ে আছে। কিয়োটোর প্রায় প্রান্তে একটু জমি কিনিয়া বাড়ী বানাইয়াছেন। পরের সন্ধ্যায় আহারের জন্য তাঁহার বাড়ীতে আমাদের লইয়া যাইবেন বলিলেন।

সন্ধ্যার পরে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তাঁহার জাপানী স্ত্রী ও শ্বশ্রূমাতা তখন রাঁধিতেছিলেন। মেয়েটি কোথা হইতে আসিয়া আমার স্ত্রীর কোলে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন মিঃ চক্রবর্তী বলিলেন : মেয়ে আমার কাছে শুনিয়াছে যে তাহার দাদু ও দিদিমা জাপানের অনেক দূরে ভারতবর্ষ নামে এক দেশে আছে। একদিন সেখানে গিয়া তাহাদের দেখিতে পাইবে। আজ আমার কাছে শুনিয়াছে যে ভারতবর্ষের একজন বৃদ্ধ সস্ত্রীক এখানে আসিয়া আহারাদি করিবেন। এই কথায় ওর ঔৎসুক্যের আর সীমা নাই। বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে কখন তাঁহারা আসিবেন,—সন্ধ্যার সময় ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে,—আজ আর ঘুমায় নাই। আপনারা ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন শুনিয়া ও ভাবিতেছে যে নিশ্চয়ই এঁরাই আমার দাদু ও ঠাকুমা হইবেন।"

মেয়েটি দেখিতে মায়ের মতই জাপানী চেহারার। নাম 'বীণা' বটে, কিন্তু এক অক্ষরও বাংলা জানে না। সে আমার স্ত্রীর কোল ছাড়িল না এবং আমরা যতক্ষণ ছিলাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। বীণার মা নিজেকে বাঙালী বলিয়াই পরিচয় দেন, 'জনগণমনে'র কয়েকটি পদ গাহিতে পারেন, দু-চারটা কথা বাংলায় বলিতে পারেন, শাড়ি পরিলে অনেকটা

ভারতবর্ষীয় মনে হয়, কিন্তু অবিকল জাপানী মুখ-চোখ ও ঈষৎ হরিদ্রাভ গায়ের রং।

রিকিউ কৈকানে আরামেই ছিলাম। এখানকার খাদ্য পাশ্চাত্য ধরণের, তবে স্নানাগারটি জাপানী।

পূর্ব্বে জাপানে যে স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে একই স্নানাগারে নাহিবার প্রথা ছিল, এখন আর তাহা নাই। গ্রামাঞ্চলে থাকিতে পারে, সহরে কোথাও দেখি নাই। তবে স্নানের বন্দোবস্ত যে রকম তাহাতে আমাদের সুবিধা হয় না। মাঝখানে চারদিক বাঁধানো একটি চতুষ্কোণ জলাধারে প্রায় ফুটন্ত জল থাকে। এই জলাধারের পাশে বসিয়া সাবান দিয় প্রথমে ভাল করিয়া গা ধুইতে হয়, পরে একটি সিঁড়ি দিয়া জলাধারে নামিয়া ঐ প্রায়-অসহ্য গরম জলে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিতে হয়। উঠিয়া গা মুছিয়া বস্ত্র-পরিধান।

কিয়োটোতে বারো দিন ছিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধ ও সিন্টো মন্দির,—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান হোপাসি হোঙ্গানজি। জাপানী 'জি'র অর্থ-মন্দির। আগাগোড়া কাঠের তৈরি এত বড় বাড়ী আমি আর কোথায়ও দেখি নাই। সমস্ত মেজেটা তাতাসি (জাপানী মাদুর, নীচে গদি-দেওয়া) দিয়া আবৃত। চিয়োনিন নামে আর একটি বৃহৎ মন্দির রাস্তার অপর পাশে। এখানকার পুরোহিত আমাদের চাক খাওয়াইলেন পিছনের একটি ঘরে। ঘরের সাজ-সজ্জা, আসবাব-পত্র, তাতাসি-মোড়া মেজে ও আহারের বন্দোবস্ত সমস্তই পুরাপুরি জাপানী প্রথায়। ঘরের উপরটা বৃক্ষ-গুল্ম-শাখা-পল্লবে আবৃত, সামনে একটি ছোট পুকুরে নানা রং এর মাছ খেলা করিতেছে। ভোজন কালে সমস্ত দেহ-মন যেন শান্তিতে ভরিয়া যায়।

ভিক্ষু ওগাটার সঙ্গে ভারতবর্ষেই আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি যে জেন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, একদিন তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ওগাটা বিবাহিত,—জেন ধর্ম্মে ভিক্ষুদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস—বিখ্যাত জাপানী যোদ্ধা ও শাসনকর্তা হিদেয়োসির সম-সাময়িক। ইহার সঙ্গেই সংলগ্ন তাঁহার প্রাসাদ।

আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন মন্দিরের বিরাট্ গর্ভগৃহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু-বার্ষিকীর আয়োজন হইতেছিল। দ্বারপথে আমাদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া অর্ঘ্য দিবার জন্য হাতে ফুল-পাতা দেওয়া হইল। শাস্ত্র-পাঠ, বন্দনা, সমবেত স্তব-পাঠ ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে শেষ হইলে প্রধান পুরোহিত ও পদবী-অনুসারে অন্যান্য পুরোহিতেরা সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে রক্ষিত প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতির নীচে পাদ্যার্ঘ্য দিলেন। পরে আমরা সকলে একে একে পাদপীঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অর্ঘ্য দিয়া আসিলাম। মন্দির হইতে বাহির হইলেই হিদেয়োসির বিরাট্ প্রাসাদ। প্রকোষ্ঠগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও এক একটির প্রাচীর গাত্রে পৃথক পৃথক নমুনার ছবি আঁকা, যেমন একটি Stork Room (তাহাতে কেবল দলে দলে উড্ডীয়মান সারস-পাখীর ছবি), একটি Deer Room (তাহাতে কেবল মৃগযূথ ও পলায়মান মৃগের ছবি), ইত্যাদি ছবিগুলির রংএর ও রেখার বিন্যাস অপূর্ব্ব,—এত বর্ষ পরেও ম্লান হয় নাই।

মধ্যযুগে জাপানের শাসনকর্তাদের আখ্যা ছিল সোগুন। তাঁহারা ছিলেন জেন ধর্ম্মাবলম্বী ও সৌন্দর্য্য-বিলাসী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানুষের হাত-গড়া শিল্প-সৌন্দর্য্য কি অনির্ব্বচনীয়ভাবে তাঁহারা সমন্বয় করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিতেন সোগুনদের পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিয়োটোতে এই রকম একটি প্রাসাদ দেখিতে আমরা গিয়াছিলাম। সুনীতিবাবুও সঙ্গে ছিলেন। অবিশ্রাম বৃষ্টি হইতেছিল।

এই প্রাসাদের পরিস্থিতি অনেক একর জমি লইয়া। এখনও তাতাসিগুলি ঝক্‌ঝকে, আসবাবপত্র যথাস্থানে সজ্জিত। মনে হয় যেন কাল পর্য্যন্ত এ-বাড়ীতে বাসিন্দারা ছিলেন।

নানা শিল্পকার্য্যখচিত কাঠের বাড়ী। সামনে পূব-মুখী বারান্দা। বারান্দা হইতে নামিলেই চারিদিকে জাপানী ক্যায়দার বনোদ্যান,—কোথায়ও উঁচু, কোথায়ও ঢালু, কোথায়ও সমতল। বৃক্ষশ্রেণী, জলাশয়, জলপ্রবাহ ও পার হইবার জন্য কাঠের সেতু,—জাপানী বনোদ্যানের সকল বৈচিত্র্যই আছে। কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে একটি অংশে পৌঁছিলাম যাহাকে ইহারা 'মস গার্ডেন' (Moss garden) বলে। শ্যাওলা যে কত আকারের ও কত বর্ণের হইতে পারে এখানে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। গুণিলে বোধহয় হাজারের বেশী হইবে।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান—নারা

কিয়োটো হইতে নারা ও টেনরিতে গিয়াছিলাম। বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ওসাকা সহরের কিছু উত্তরে, প্রায় লাগালাগি।

নারা জাপানী বৌদ্ধদের তীর্থস্থানের মত, যেমন ভারতবর্ষে সারনাথ যাহার প্রাচীন নাম ছিল মৃগদাব। সারনাথের সঙ্গে তুলনার একটি সার্থকতা যে এখানে হরিণের পাল আছে। এই হরিণদের খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত স্থানীয় মন্দিরগুলির কর্ম্মচারীরা অতিযত্নে করিয়া দিয়াছেন

বৌদ্ধধর্ম্ম (চীনা ছাঁদের) কোরিয়া হইতে জাপানে আসে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। যিনি ইহাকে প্রতিষ্ঠাদান করেন তিনি ছিলেন তৎকালীন সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি (Regent)। নাম প্রিন্স সোটোকু। আটাশ বৎসরে তিনি শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

কোরিয়া হইতে সেই সময়ে যে ধর্ম্মপ্রচারকেরা আসিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের শিষ্য হন ও চীনা বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। সোটোকুর বিশ্বাস ছিল যে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাপানে প্রবর্ত্তন না করিতে পারিলে জাপানের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ চীনের বৌদ্ধধর্ম্মে। এই বিকাশে তিনি চীনের সহিত কৃষ্টিগত সম্বন্ধ স্থাপনে প্রথম প্রয়াসী হন। চীন হইতে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত নারায় আমদানি হইল, বস্তায় বস্তায় চীনা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আসিতে লাগিল, শিক্ষার্থীরা চীনে গিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, চীনা ভাষা-শিক্ষা ও চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থ-পাঠের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বড় বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান চীনা স্থাপত্যে ও চীনা শিল্পকলায় সুসজ্জিত হইয়া নারাকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকেরা হইলেন সমাজের নেতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেবল ধর্ম্ম লইয়া তাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন না, রাজনীতি-পরিচালনায়ও তাঁহারা হাত চালাইতেন। নারা হইতে কিয়োটোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম্মযাজকদের এই অকারণ প্রভুত্ব।

সোটোকু জাপানী ইতিহাসের প্রথম যুগের প্রবর্ত্তক। চীনের প্রভাবে প্রভাবিত সোটোকু-প্রবর্ত্তিত এই যুগকে জাপানে 'নারাযুগ' বলা হয়।

প্রবল বর্ষাপাত মাথায় লইয়া কিয়োটো হইতে প্রায় ষাট-সত্তর মাইল দক্ষিণে নারার পথে একখানা মোটর গাড়ীতে জন দুই জাপানী সঙ্গী লইয়া আমরা প্রত্যুষকালে ছুটিলাম। নারার মেয়রের অপিসে নামিব। সেখানে গিয়া দেখি একদল মেয়ে পুরুষ ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত। সংবাদপত্রে আমাদের নারা-আগমনবার্ত্তা রটনা হইয়াছিল। মেয়র মহাশয় সমস্ত দিনের জন্য তাঁহার গাড়ীখানি আমাদের ব্যবহারে দিলেন। প্রাতরাশ খাওয়াইলেন ও নারা সম্বন্ধে কিছু কিছু সচিত্র পুস্তিকা দিলেন।

আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সোটোকুর সেই কালের নির্ম্মিত মন্দির ও প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিলাম অনেক ভাঙিয়াছে, কিন্তু ভগ্নাবশেষ হয় নাই। একটি মন্দিরের নাম 'যুমেদোনো'। এখানে 'কান্নোনের' (চীনা বৌদ্ধধর্ম্মে করুণার দেবী) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চীনা ভাস্কর্য্যের অপরূপ কীর্ত্তি। এটি

ছিল সোটোকুর নিজস্ব উপাসনাগৃহ। পরে প্রায় সাত শতাব্দী পরে বৌদ্ধ নিচিরেণ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিচিরেণ বহু অত্যাচার সহিয়া এই মন্দিরে সোটোকুর পূজিত কায়োন-দেবীর আরাধনা ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সর্ব্ব বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি এই নারাযুগেই সম্রাট সোমুর শাসনকালে নারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই যুগে এইটি ছিল জাপানের প্রধান বৌদ্ধ মন্দির। নাম তোদাইজি। আমরা এক ঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়াও ইহার আদি অন্ত সবটা দেখিতে পাই নাই। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ চলিয়াছে,— মধ্যের গর্ভগৃহে বিগ্রহ। একটি ফুটন্ত পদ্মের উপর আশীর্ব্বাদ-দানরত বুদ্ধ। উচ্চতায় একশো পঞ্চাশ ফুটের বেশী ছাড়া কম হইবে না। বোধহয় পোড়া মাটির গঠিত মূর্ত্তি,— সমস্তটা তামার পাতে মোড়া তোদাইজির বুদ্ধের নাম 'লোচন' বা 'অবলোচন' বা, 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় মূর্ত্তির দুইটি লোচন খুলিয়াছিলেন একজন ভারতীয় ভিক্ষু-পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সোজো। তাঁহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূর্ত্তির চোখ-খোলা, অর্থাৎ সোনার জলে তাহা আঁকিয়া দেওয়া। ইহার ভার সোজোকে দিয়াছিলেন স্বয়ং সম্রাট। বিগ্রহের পাদপীঠের পাশে দাঁড়াইয়া মনে হয় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহারাজের সিংহাসন তলে দাঁড়াইলাম। বিরাটের পায়ে ক্ষুদ্রের প্রণতি,—'গর্ব্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া'।

মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন হইলে জাপানী সঙ্গীরা প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইতে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি কিছু চীনা চা ও মিষ্টান্ন দিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু এ-চীনা চা দেখিলাম নতুন সংস্করণের। থকথকে ঘন সবুজ চা-পাতা মিশান, প্লেটের উপর সাজানো। ভীত চায়ের চেহারা দেখিয়া হাত গুটাইলেন। তারপর আমি 'কিছু না খাইলে অশ্রদ্ধা দেখান হইবে' বলিলে একটু চাখিয়া সরাইয়া রাখিলেন। অদ্ভুত রকমের একটা আস্বাদ,—চায়ের আস্বাদ মোটেই নয়।

আমার মন কিন্তু চা'য়ের দিকে ছিল না। আমি ভাবিতেছিলাম যে দক্ষিণ-ভারতীয় বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ' বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সময় চীন হইতে আসিয়াছিলেন এবং 'লোচন' বুদ্ধের চোখ দুটি আঁকিয়া দিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কোনও তথ্য এখানে সংগ্রহ করিতে পারি কি না। সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম। 'ব্রাহ্মণ সোজো সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন লেখা এখানে আছে? তিনি বলিলেন; এখানে নাই। তবে সোটো-ইনে একখানা পুঁথি আছে তাহাতে তোদাইজি প্রতিষ্ঠানে যাহারা যাহারা অধ্যক্ষ ছিলেন সকলের ইতিবৃত্ত আছে। আপনি যদি সোজোরে বিষয়ে জানিতে চান্ পুঁথির সেই অংশটুকুর একখানা নকল আপনাকে দিতে পারি। আমার পার্শ্বস্থ জাপানী বন্ধুকে এই কাজের ভার দিয়া আমরা তোদাইজি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কিয়োটো ফিরিয়া এই প্রতিলিপিটি পাইয়া ও তাহার অনুবাদ করাইয়া কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে দুই তিনদিন কাটাইয়াছি।

ফিরিবার পথে টেন্‌রি হইয়া আসিয়াছিলাম। এই ছোট সহরটির প্রসিদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য নয় ও বেশী প্রাচীনও নয়। গতশতাব্দীতে একজন জাপানী মহিলা এখানে একটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন—নাম টেন্‌রির ধর্ম্ম (জাপানীতে টেন্‌রি-কিও,)। ইহার নেতাদের উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সকলেই সম্প্রদায়ের uniform পরা। সকালে বাহির হইয়া সহরে ছড়াইয়া পড়ে ও নূতন নূতন অতিথিশালা, স্কুল-গৃহ, বাগান, হাসপাতাল, পুষ্করিণী বানাইবার কাজে লাগিয়া যায়। এ-সব কাজের জন্য কোনও মজুরি নাই। নিকটে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থালয় আছে। এতবড়

লাইব্রেরি সচরাচর দেখা যায় না। অনেককালের পুস্তক সংগ্রহ,—একটা পাশ জাপানী পুস্তকে ঠাসা।

টেন্‌রি সম্প্রদায়ের পুরাণে বলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এই টেন্‌রি। অনেক মাপ-জোক করিয়া ঠিক কেন্দ্রস্থলে ইঁহারা এক বিরাট্ প্রার্থনাশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কাঠের তৈয়ারি। স্থাপত্য জাপানী। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে টেন্‌রি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে স্তব-পাঠ, নৃত্য-গীত, সমবেত প্রার্থনা হয়। প্রার্থনার বুলি : 'জননী, টেন্‌রির সম্রাজ্ঞী, তুমি পৃথিবী হইতে সকল পাপ মুছিয়া লও আমাদের রক্ষা কর।' হাঁটু গাড়িয়া মেঝের উপর বুক এই প্রার্থনা বারম্বার আবৃত্তি করিতে হয়।

আমরা দুই দিন টেন্‌রির বিশিষ্ট অতিথিশালায় ছিলাম। দুইটি যুবতী ও একটি বৃদ্ধা জাপানী মহিলা অতিথি সৎকারে ব্যস্ত থাকিতেন। যত্নের অবধি নাই। আহারে অগুন্তি পদ,—পরিবেশন অনবদ্য। নরম তাতামি-বিছানো মেঝের উপর বসিয়া যখন সামনের নীচু টেবিলের কানায় কানায় ভর্ত্তি খাদ্য-পাত্রগুলির সংখ্যা দেখিতাম, দুঃখ হইত—কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা খাই।

নারা ও টেন্‌রি দেখিয়া কিয়োটোতে ফিরিলাম। জাপানী ছাড়া এশিয়ার কোন জাতি এই গর্ব্ব করিতে পারে—

"We are ancients of the earth,
But in the morning of time."

(আমরা পৃথিবীতে প্রাচীন জাতি, কিন্তু এখনও কালের প্রত্যুষে আছি।)

জাপান যে অতীতকে আঁকড়াইয়া আছে, তাহার সাক্ষী কিয়োটো—পুরা বিশ্বাসে যে বর্ত্তমানকে ধরিয়াছে, তাহার সাক্ষী টোকিও। (ক্রমশঃ)

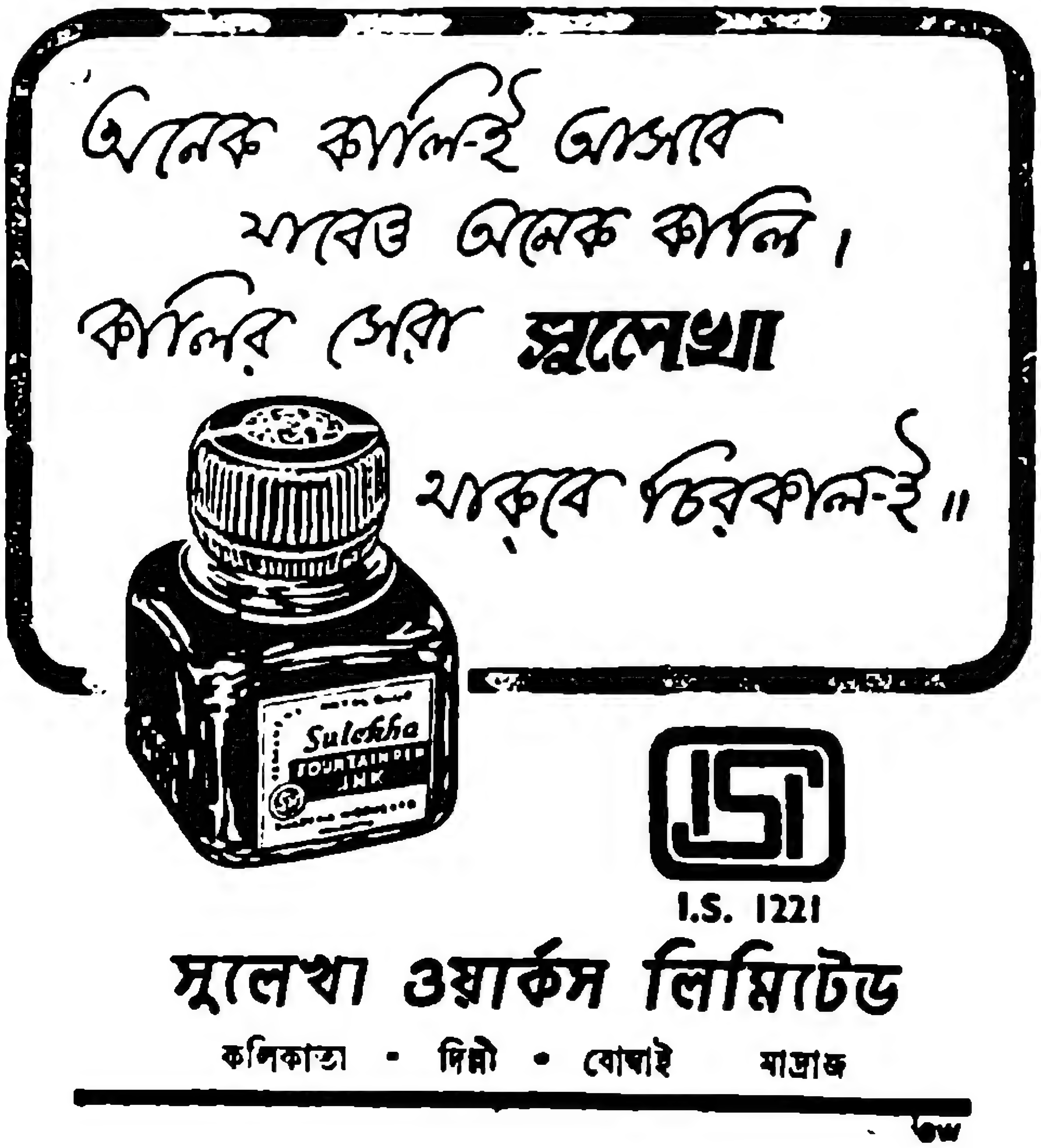

রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌স্‌পিয়র প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা

নরেশ গুহ

কম্পারেটিভ লিটারেচর বা তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়টা কী তা নিয়ে কিছুকাল হয় ভারতবর্ষের দু একটি স্থানেও একটু আধটু আলোচনা হচ্ছে। অবশ্য বিরোধীদের কোলাহল ছাপিয়ে সে আলোচনার বিষয়বস্তু কোথাও পৌঁচচ্ছে কিনা বলা শক্ত। বিরোধীরা ব্যতিব্যস্ত, কারণ যা কিছু আমাদের অভ্যাসের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা নয় তার প্রচলন করতে গেলেই অনেকের মানসিক শান্তির মধ্যে অতিশয় ব্যাঘাত ঘটে, মনে হয় নিয়ম শৃঙ্খলার বিধি-বিধান কিছুই থাকলো না আর, সব রসাতলে গেল। তবু তুলনামূলক সাহিত্যের স্বপক্ষীয়েরা অন্তত এইভেবে সুখী হতে পারেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাদের সহায়। এটা কোনো আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অর্থে বলছি না। "আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব"—এই বলে; আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, ন্যাশনাল্ কাউন্সিল অব এডুকেশনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ যাদবপুরে বক্তৃতা করেছিলেন। রচনাবলীর গ্রন্থ পরিচয়ে এই স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। কিন্তু "সাহিত্য" গ্রন্থের পাতা উল্টিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ কম্পারেটিভ লিটারেচর-এর নাম শুনেই মূর্চ্ছো যান নি, যদিও তার কিছুকাল পূর্বেই মাত্র পৃথিবীতে সাহিত্যপাঠের এই পদ্ধতিটির জন্ম হয়েছে। একথাও বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ যাকে "বিশ্বসাহিত্য" বলেছেন তা কোন্ ভাষায় পড়তে হবে, অনুবাদে সাহিত্য পাঠ আদৌ গ্রাহ্য কিনা, এবং "তুলনামূলক" বলতে কিসের অথবা কার সঙ্গে কার-কিসের তুলনা—ইত্যাকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্ন তিনি একবারও উত্থাপন করেন নি। তার চাইতেও যেটা মূল কথা তিনি সেই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলেছেন: "পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সাহিত্যকে অখণ্ড ভাবে দেখেছেন, ভাষা বা জাতির ছাপ দিয়ে দিয়ে, নানাভাগে টুকরো ক'রে দেখেন নি; বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে এক ব'লে গণ্য ক'রে, সাহিত্যকে বলেছেন সেই সমগ্র মানুষের প্রকাশ চেষ্টা। যতদূর জানি তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হ'য়েছিল এই বক্তৃতার দুই থেকে অনধিক বারো বছর আগে, ফ্রান্সের সরবোন্-এ, আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। জানতে কৌতূহল হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মধ্যে এমন কে ছিলেন যাঁর মনে এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য চর্চা পদ্ধতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বক্তৃতা করানোর কথা

প্রথম মনে হ'য়েছিল। তিনি কি প্রতীচীর সাহিত্যে জ্ঞানী শ্রীঅরবিন্দ ?

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তৃতা হয় ১৯০৬ সালে। তারও চার-বছর আগে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তুলনামূলক সাহিত্যের যে আশ্চর্য প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার সঙ্গেও সাহিত্য পাঠকের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। প্রবন্ধটি আপাতত শকুন্তলা বিষয়ে, কিন্তু শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে পারঙ্গম কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ প্রবন্ধ লেখা কখনো সম্ভব ছিলো না, কেন না অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এবং তার লেখকের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাষার এমন একজন মহৎ লেখককেও একই সঙ্গে আলোচনা করতে হ'য়েছে যাঁর রচনার সঙ্গে শকুন্তলা আখ্যানের ঐক্য রয়েছে যদিও কাব্য-রস ভিন্ন। অন্তপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের ডিগ্রিওলা ডাক্তার-বৈদ্যদেরও সাধ্য ছিল না এমন রচনায় হাত দেবার, কেননা সংস্কৃত ভাষার নাম জানলেও তাঁরা সচরাচর কলোনিয়াল প্রাদেশিক ইংরেজেরই ছায়ামাত্র। তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়টা কী এবং সাহিত্যের আলোচনায় সেই পদ্ধতি কোন কাজে লাগে—এই যাদের প্রশ্ন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা প্রবন্ধটি আবার প'ড়ে দেখতে পারেন। আমার ধারণা, বাংলাদেশে শেক্সপিয়রের উপর একটিমাত্র বিশিষ্ট রচনাই লেখা হয়েছে যার লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অথচ তিনি কোনো পরীক্ষকের খাতায় শেক্সপিয়র বিষয়ক প্রশ্নোত্তর লিখে কখনো মার্কা পান নি।

ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় দুই শতাব্দীর পুরনো। হিন্দু কলেজের স্থাপনা হোলো যখন তারও বহু বছর আগে থেকে। পরিচয়ের সেই আদিযুগে আমাদের সম্পর্ক ছিল রাজা প্রজার, বিজয়ী-বিজিতের, জীবিত ও মৃতের। নব্য শিক্ষিতের চোখে দেখবার মতো বাংলাসাহিত্য তখনো রচিত হয়নি। দেশের যাত্রা ছিল, কবিগান ছিল, পাঁচালী ছিল, রামায়ণ মহাভারত পাঠ হোতো ঘরে ঘরে; কিন্তু নাটক ছিল না, থিয়েটার ছিল না, নভেল, ছোটোগল্প মাসিকপত্র কোনো কিছুরই জন্ম হয়নি। তখনো আর সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করতেন যাঁরা তাঁরা তো টুলোপণ্ডিত। কাজেই টেরিকাটা হিন্দু কলেজ ফেরতাদের মগজে গিয়ে রাজার জাতের সাহিত্যনেশা একেবারেই চড়লো। এবং আশ্চর্য এই যে মাইকেল মধুসূদনের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের একশো বছর পরেও সেই উনিশ শতকী কলোনিয়াল প্রাদেশিকতার মনোভাব আজ পর্যন্ত আমাদের কাটলো না। এখন পর্যন্ত ইংরেজিদিগ্‌গজেরা স্বভাষার চর্চা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাঁদের হাত দিয়ে একলাইন স্বভাষা বেরোতে গেলে কলম ভেঙে যাবার দশা। তাঁরা ইংরেজ হ'তে পারেন নি এই শোকে বাকি জীবনটা ইংরেজি চর্চাতেই কাটিয়ে দেন।

একথার এইজন্য উল্লেখ করছি যে আপন ভাষা-সাহিত্য এবং ঐতিহ্যের প্রতি এঁদের যদি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকতো তাহলে এঁদের ইংরেজি চর্চার ফলে ভাষা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি দেখতে পেতুম আমরা। কেননা যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা সত্ত্বেও নিছক ইংরেজি সাহিত্যালোচনায় অপূর্ব কিছু দান করা কদাচিৎ সম্ভব। অথচ সাহিত্যকে যদি অভিন্ন মানবচিত্তলোকের প্রকাশ চেষ্টা ব'লে স্বীকার করি তাহলে ভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে অপর ভাষার সাহিত্য আলোচনা প্রভূত পরিমাণে ফলপ্রসূ হ'তে পারে। অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্যই সেই উপায় যাতে ক'রে পাণ্ডিত্য নিষ্ফলা হয় না।

আমার হাতের সামনে এই মুহূর্তে তুলনামূলক সাহিত্যের যে বর্ষপঞ্জী রয়েছে তাতে ১৯৬৩ সালে নানাদেশের নানাভাষায় শেক্সপিয়র বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের অনিংরেজ বিদ্বানরা যে সব প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখাচ্ছেন জানিয়ে কোনো খাঁটি ইংরেজের পক্ষে কিছু বলা দুষ্কর হোতো। একটি প্রবন্ধের নাম 'Pasternak's Zhivago—Hamlet—Christ" ফ্রান্স থেকে লেখা হচ্ছে

'Eighteenth Century French Translation and Adaptation of Shakespeare.' কিংবা Shakespeare on French Stage Since 1940'। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে –'Shakespeare and Dostoevsky'। আরবি পত্রিকা 'আল্ মারিফা'-তে প্রবন্ধ বেরিয়েছে— 'Arabic Elements in Shakespeare's work। অথচ শেক্স্পিয়রের রচনায় ভারতবর্ষ—এবিষয়ে আমি কোনো রচনার নাম মনে করতে পারছি না যদিও আরব দেশের তুলনায় শেক্স্পিয়র চর্চা আমাদের বোধ করি ভালোই হয়।

রবীন্দ্রনাথ আপাতদৃষ্টিতে সমগ্রভাবে শেক্স্পিয়র বিষয়ে কিছু লেখেন নি মনে হতে পারে। বহু প্রবন্ধে এবং চিঠি-পত্রে—হঠাৎ কোনো উল্লেখ আছে। কিংবা সাহিত্য বিষয়ে কোনো নিজস্ব বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও দৃষ্টান্ত হিসেবে শেক্স্পিয়রের নাম করেছেন। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে তাঁর বলবার কথা সমস্তই তিনি বলেছেন 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে টেম্পেষ্ট প্রসঙ্গ তুলে। ইউরোপীয় তথা শেক্স্পিরীয় সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের উস্কে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর মনে হয়েছে ভারতীয় সাহিত্যের বিশ্ববাৎসল্য সেখানে অনুপস্থিত, কেননা "বহিঃ-প্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।" এই প্রবন্ধ লেখার দশ বৎসর পরে ইংরেজি "সাধনা" গ্রন্থ লেখা হয়। তাতেও এই একই কারণ দেখিয়ে তিনি গ্রীক্ যুগ থেকে শুরু ক'রে সমগ্র ইউরোপী-সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। তবে কি রুসো থেকে শুরু ক'রে যে রোমান্টিসিজমের বাণ ডেকেছিল ইউরোপে, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান কথাই হচ্ছে প্রকৃতির প্রেম—সেই রোমান্টিসিজম্-কেও তাঁর ভালো লাগেনি, বিশ্বাস লাগে নি? ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থও কি বহিঃপ্রকৃতিকে পর করে ভাবেন?

ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের ধারণা বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সুস্থির বোধ করতে পারেন নি। প্রেমেই প্রেমের মূল্য – একথা কখনো মনে হয়নি তাঁর। শকুন্তলায় তাই প্রেমের পরিণতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রেম এবং মিলনকে তাই বলেছেন –'পতন', 'পরাভব', 'ধুলা লাগা'। এটা হচ্ছে মানব স্বভাবের অন্তর্গত। কিন্তু, তাঁর মতে, স্বভাবের অনুসরণে সাহিত্যের মুক্তি নেই, স্বভাব থেকে প্রেমের ধর্মে পরিণতি দেখানোই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্বভাব মিলনকে বলেছেন পূর্বমিলন। উত্তরমিলন না দেখালে স্বস্তি নেই তাঁর। এবং একথা শুধু যে কালিদাস বিষয়ে ভেবে বলেছেন তা নয়, "চিত্রাঙ্গদা" নাটক লিখতে গিয়ে নিজেও পূর্বমিলন আর উত্তরমিলনের রূপ দেখিয়েছেন। অনায়াসে বলা যেতে পারে "চিত্রাঙ্গদা" হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা।

তা যদি হয় তবে তো শেক্স্পিরীয় প্রেম চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনোখানেই মিলবার কথা না, কেননা শেক্স্পিয়রে কোথাও রবীন্দ্রনাথের অর্থে উত্তরমিলন নেই। প্রেম বিষয়ে এই ধারণা কি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের লক্ষণ? আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও? নাকি ১৯২০ সালের পর থেকে, অন্ততঃ বাঙালি সাহিত্যিকরা ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমে মজেছেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকদের বড়ো তফাৎ কি তাহলে এই যে আধুনিকেরা স্বভাবপন্থী, আর রবীন্দ্রনাথ স্বভাব উত্তীর্ণ হওয়া ধর্মের পন্থী?

শেক্স্পিয়রের সঙ্গে, যেমন ইউরোপীয় অন্য কবিদের সঙ্গেও, আরো একজায়গায় বড় তফাৎ রবীন্দ্রনাথের। "প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই, য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন।" তুলনায় রবীন্দ্রনাথ সংযত, গম্ভীর, শান্ত। এখানেও তো আধুনিকদের সঙ্গে

ইউরোপের মিল। তাহলে কি বলা চলে আধুনিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট? তবে কি ইউরোপ নিজের স্বভাববিরোধী বলেই এককালে তাঁর পায়ের কাছে নত হ'য়ে বসেছিল, এবং সেই একই কারণে বেশিদিন সহ্য করতে পারেন নি তাঁকে?

শেষ কথা। এই সবই যদি ঠিক হয় তাহলে শেক্‌স্‌পিয়রের রচনা পড়ে মুগ্ধ হন যাঁরা তাঁদের পক্ষে কি রবীন্দ্রনাথ পড়েও সমপরিমাণে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব? দুজনকে কি একই সঙ্গে ভালোবাসা যায়? নাকি সাহিত্য আমাদের হৃদয় হরণ করে তার প্রকাশ ভঙ্গীর উৎকর্ষ দিয়ে? বক্তব্য নিরপেক্ষ ভাবে আমরা কি সাহিত্যের রসাস্বাদন করি? "চিত্রাঙ্গদা" যাঁর ভালো লাগে তাঁর পক্ষে কি ভালোলাগা সম্ভব "এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা"? শেক্‌স্‌পিয়র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নগুলি বোধ করি আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আপনারও দায়িত্ব রয়েছে

আমাদের স্বাধীনতা নিরাপদ রাখার জন্য, সম্পূর্ণতম প্রচেষ্টা, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করে উৎপাদন বাড়িয়ে আপনি দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

আপনার নিয়মানুবর্তিতা দেশকে শক্তিশালী করে

পুস্তক পরিচয়

প্রাগিতিহাসের মানুষ—ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা ১-২৭০ সচিত্র : ফার্মা কে এল্ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৩ : মূল্য-আট টাকা।

বাংলা ভাষায় সুলিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত—নৃতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্বের পুস্তক তো নিতান্ত বিরল বললেই হয়। অবশ্য মানুষের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় বিবিধ বিজ্ঞান পরিচয়ের প্রয়োজন। সুতরাং এ বিষয়ে গ্রন্থকারকে নানা জ্ঞান সঞ্চয়নে অবহিত থাকতে হয়। তাছাড়া পরিভাষার দুরূহ কাজটিও তাঁকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। অবশ্য আজও প্রত্নতত্ত্বের টেক্‌নিকাল্ বাংলা পরিভাষা অসম্পূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার মানুষের পুরাকাহিনী অনুধাবনে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন এবং তথ্য ভারাক্রান্ত দুরূহ বিষয়বস্তু যথা সম্ভব সহজ ও সরল ভাবে রচনা করেছেন। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থে সর্ববিষয়ে সকল পৃষ্ঠায় যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বা নির্ভুলভাবে লিখিত হয়েছে, এমন কথা সমালোচক বলতে না পারলেও পুস্তকটির সমগ্র বিচারে যে একটি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভঙ্গী রচিত হয়েছে সমালোচক তা স্বীকার করেন। স্বভাবতঃ এই ধরণের গ্রন্থে একটি বিশেষ পটভূমিকার অনিবার্য্য প্রয়োজন এবং আলোচ্য বইর প্রথম খণ্ডে সংক্ষিপ্তভাবে লেখক তা বর্ণনা করেছেন। মানুষের জন্মস্থান কোথায়—এশিয়া অথবা আফ্রিকায় এ প্রশ্নের উত্তর আজও কোনও বৈজ্ঞানিক সঠিক ভাবে দিতে পারেন নি। কোন্ বিশেষ দেশের কোলে মানুষ জন্ম নিয়েছে এ প্রশ্ন আজও অমীক। বানর বনমানুষের অনেক পরে প্রাইমেট্ প্রশাখার একেবারে শেষে মানুষের উৎপত্তি—এ তথ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে সঠিক মেলে না।

আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (গুহার মানুষ)—পুরাপ্রস্তর যুগের ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার "ফসিল" মানুষের আকৃতি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, তাদের হাতিয়ার ও শিল্প ইত্যাদি গ্রন্থকার চিত্রে, দৃষ্টান্তে ও বর্ণনায় সমৃদ্ধ করেছেন। অবশ্য এরা সকলেই যে-'গুহার মানুষ' এমন নয়, পুরাপ্রস্তর যুগের অন্যতম উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী মানুষেরও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে (যেমন জাভা ও আফ্রিকার প্রাচীন মানুষ)। পিকিং মানবের গুহায় সবচেয়ে পুরানো মানুষের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে এমন দাবী অবশ্য করা চলে না। পিকিং মানুষের চেয়েও প্রাচীন আফ্রিকার 'কাফুয়ান্' ও 'অল্ডোয়ান' হাতিয়ার অথবা অষ্ট্রালোপিথেসিন্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'ফসিল' মানুষ যে প্রাচীনতম হাতিয়ারের অধিকারী - এ তত্ত্ব কয়েকজন বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়টি আজও বৈজ্ঞানিক তর্কাধীন এবং এ সম্বন্ধে 'খোলামন' রাখাই সঙ্গত। চীন জাভার প্রাচীনতম মানব গোষ্ঠীর বিশদ বিবরণ লেখক দিয়েছেন কারণ অন্যান্য প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর তুলনায় এদের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি তথ্য জানা গিয়েছে।

ভারতবর্ষের (পাকিস্তান সহ) পুরাপ্রস্তর যুগের প্রত্নতত্ত্ব বেশ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে, ফলে সমগ্র চিত্রটি সহজবোধ্য হয়নি। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সাম্প্রতিক বহু গবেষণা হয়েছে, বহু তথ্য সংগৃহীত এবং বহু ব্যাখ্যা হয়েছে—তার কোনও আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পায়নি।

ভারতবর্ষের ও বিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে ভারতীয় কর্মীদের নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

লবন পর্বতে সোয়ান কৃষ্টির কোনও দৃষ্টান্ত নেই। -এ পর্যন্ত এই কৃষ্টির ভৌগলিক সীমানা, এটকের (Attock) নিকট-বর্তী সিন্ধু উপত্যকা (পশ্চিম পাকিস্থান) থেকে শুরু করে— ভারতবর্ষের পূর্ব পাঞ্জাবে শতদ্রু ও শীর্ষা উপত্যকা এবং বিপাশা ও বাইনগঙ্গা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এই ভূখণ্ডে মাদ্রাজীয় কৃষ্টির দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। লেখক হাত-কুড়ালের (Handaxe) বর্ণনা কালে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে এগুলি দৈর্ঘ্যে এক ফুট কি তারও বড়! লেখক এই তথ্য কোথায় পেলেন জানান নি—কিন্তু কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামগুলিতে বা কোনও প্রকাশিত গ্রন্থে এইরূপ বৃহদাকার হাতকুড়ালের কোনও সন্ধান নেই। এটি হয়তো ছাপার ভুল হয়ে থাকতে পারে। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে এই অস্ত্রগুলি তিন ইঞ্চি থেকে কমবেশি নয়-দশ ইঞ্চি হয়ে থাকে। প্লাইস্টোসিনের মধ্যবর্তীকাল থেকে অস্থিশিল্প আরও মার্জিত হয়ে উঠলো— এই বিবৃতিটিও সঠিক নয়—কারণ এই শিল্পের শুরুই হয় মধ্য প্লাইস্টোসিন থেকে। উপর প্লাইস্টোসিনে অবশ্য এ শিল্প উন্নততর হয়। এই অধ্যায়ে (অক্ষয় পাথরের বাণী) ১০৩ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন—"হাতকুড়াল হাতে দাক্ষিণাত্যের 'আর্য্য' আর চাছনি বা কোপানি হাতে পাঞ্জাবের ম্লেচ্ছ যখন মুখোমুখি হয়েছে তখন পরস্পরের সম্বন্ধে তারা কি ভেবেছে কি বলেছে কে জানে!"—আর্য্য ও 'ম্লেচ্ছ' এই দুটি শব্দ লেখক কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা সমালোচকের বোধগম্যের বাইরে। এদের জাতিগত বা সমাজগত কোনও সূত্রই যখন আমাদের বিশেষভাবে জানা নেই তখন এইরূপ বিবৃতি সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। আর কিছু না হোক, এই বিষয়বস্তুটিকে নিতান্তই হাল্কারসে পরিবেশন করা হয়েছে।

লেখক ভূমিকায় লিখেছেন যে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত হয়েছে, কিন্তু ১০৪ পৃষ্ঠায় এক বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকের যে আনুমানিক চিত্রটি (মধ্যপ্লাইস্টোসিন ভারতীয়দের সম্বন্ধে) দিয়েছেন তা যোগ্য হয়নি, বিশেষভাবে যখন সে চিত্রটি নিতান্তই খাপছাড়া রকমের এবং পাঠক তা থেকে কোনও তথ্যই উদ্ধার করতে পারবেন না। যা হোক এই কয়টি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইয়ের এই খণ্ডটি সুকল্পিত ও সুলিখিত।

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে (ঘরের মানুষ নবপ্রস্তর যুগ) লেখক বহু তথ্য ও খবরাখবর সরবরাহ করেছেন যার দ্বারা পাঠকের মন সজাগ ও আকৃষ্ট হয়। ঘরের মানুষের একটি পরিচিত ধারাবাহিক কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার যেমন, চক্রযুক্ত যান, যানবাহনে পশুর ব্যবহার, ধাতুশিল্প, বর্ষপঞ্জী, লিপি—এগুলির প্রবর্তন হয় ব্রোঞ্জ যুগে, নবপ্রস্তর যুগে নয়। নবপ্রস্তর যুগের তাৎপর্য হ'ল—কৃষি ও পশুপালন—যুগান্তকারী এই দুইয়ের সমন্বয়ে মিশ্র চাষ আবাদ ও গ্রাম্য শিল্প। যথার্থে নবপ্রস্তর যুগে ধাতু শিল্পের ব্যাপক ব্যবহার হয়নি। নব-প্রস্তর যুগের অন্তিমে তাম্র-প্রস্তর যুগে ধাতু (তামার) নিষ্কাষণের পত্তন হয়। মধ্য-প্রাচ্যের মত ভারতবর্ষেও যথার্থ নবপ্রস্তর যুগের অন্তর্গত কোনও স্থানে ধাতুবিদ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যদিও শেষভাগে কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক ('নেটিভ্') তামার ব্যবহার দেখা যায়।

সমগ্রভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি ভাষা ও বর্ণনায় প্রাঞ্জল। সমালোচকের মতে লেখকের সরস দৃষ্টিভঙ্গী, ভাব ও ভাষার মুন্সিয়ানা গ্রন্থের অন্যতম বিশেষ গুণ। আশাকরি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি তার নিজস্ব স্থান অধিকার করবে।

ধরণী সেন

রাজা থেকে নিরাজ সমাজ

১

ভারত য়ুনিয়নে খণ্ডিতদেহ বাংলাদেশ আজ অবহেলিত। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার, স্বার্থান্বেষী নেতাদের বিরুদ্ধ মনোভাব ও বুদ্ধিহীন, বিচারহীন কার্যকলাপ, বাংলাদেশে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ও শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালীর পশ্চাদবর্তিতা—এমন আরও অনেক কারণই বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী। অথচ এই বাংলা দেশেই একদিন ভারতের নবযুগের সূচনা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে থেকেও সেদিন বাংলাদেশের নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক ও আইনসম্মত অধিকারের জন্যে ও সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ; পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, তার জন্যে নিরলসভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা তখন যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা ও যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন বর্তমান ভারতবর্ষে তার পরমাণবিক অস্তিত্বও বিরল। কালের গতি সত্যই কুটিলা।

২

পলাশীর যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দৃঢ়ভিত্তিক ইংরাজ-শাসন কায়েমী হ'ল। সিপাহি বিদ্রোহ সেই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ যার মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল। এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়ে পরবর্তী কালের সমাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিরাট কর্মী পুরুষ। একাই তিনি দেশকে এক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কার আর রাজনৈতিক ও আইনসম্মত অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহন পথিকৃৎ। শিক্ষার উন্নতি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান সর্বজনবিদিত। প্রয়োজনীয় মত গঠন, প্রচার ও আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা তিনিই করেছিলেন ; সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। কার ট্যাগোর এ্যাণ্ড্ কম্পানী ও য়ুনিয়ন ব্যাংকের পত্তন করে দ্বারকানাথ য়ুরোপীয় কায়দায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করেন। তাঁদের সেই সহযোগিতার ইতিহাসই শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গবেষণার বিষয় ; ফল—রূপায় **ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন** [প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৭০, দাম—ছয় টাকা]।

যে চার্টার এ্যাক্ট্ অনুযায়ী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানীর পত্তন হয়েছিল তারই বলে কম্পানী ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই এই অধিকার ছেড়ে দিয়ে একচেটিয়া মুনাফা হারাতে তারা কখনও চাইত না। রামমোহন ও দ্বারকানাথ অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পবিকাশের সহায়ক বিদেশী উদ্যোগ, মূলধন ও নৈপুণ্য আমদানির পক্ষে ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বাণিজ্যমূলক কৃষিদ্রব্যের চাষ ও পাশ্চাত্য শিল্প ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হলে সর্বস্তরের লোকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে। তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুতায়ন সম্ভব হবে না।

তাঁদের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন সংস্কারমুক্ত, চিন্তাধারা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে প্রবহমান। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প বিপ্লবের পক্ষে, বাংলার জমিদাররা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ছিলেন তার বিপক্ষে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উদ্দেশ্য ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা, আর জমিদারদের উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে কৃষক শোষণ করা। নীলের চাষ ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের যে অভিযোগ জমিদাররা করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ করা যায়। শ্রমিক ও চাষীর দুঃখে যে

চোখের জল তারা ফেলেছিলেন সেটা কায়েমী স্বার্থের 'মেকী কান্নার মতলবী চোখের জল।' দ্বারকানাথের মতে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দূর হলে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সুরু হবে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার হবে, ফলে উৎপাদন ও মজুরি বাড়বে; জিনিসপত্রের দাম কমবে। বিদেশীদের ব্যবসায়ের ফলে দেশীয় শ্রমিক ও চাষীদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে—তাঁর এই মতের যাথার্থ প্রমাণ করার জন্য তিনি অনেক অর্থনৈতিক তথ্য হাজির করেছেন।

রামমোহনও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। ১৮৩১ সালের ১২ই এপ্রিল লিভারপুলে তিনি বলেছিলেন, "আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সন্ধা দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালত সম্পর্কীয় কোনো কোনো সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবনাদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয় দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে তদ্দেশ বহিভূ'ত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যগুপি কম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব"—(সমাচার দর্পণ ২০.৮।১৮৩১)। পার্লামেন্টীয় কমিটির দুটি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেছিলেন—

'চরিত্রবান ও মূলধন সম্পন্ন য়ুরোপীয়দের যদি ইণ্ডিয়া বোর্ডের অনুমতিক্রমে, বা কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর অনুমতি-ক্রমে কিম্বা স্থানীয় সরকারের অনুমতিক্রমে দেশে বসবাস করতে দেওয়া হয় তবে চাষের উন্নত পদ্ধতি দেখানোর ফলে এবং মজুর ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার শেখানোর জন্যে দেশের সম্পদ প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয়-দের অবস্থা উন্নত হবে।' কিন্তু দেশীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে ভালোমন্দ নির্বিশেষে সব ধরণের ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাস করতে দেওয়া উচিত নয়; তাতে দেশের অমঙ্গল হবে।

পরে ১৮৩২ সালে জুলাই মাসে রামমোহন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে রাম-মোহন য়ুরোপীয়দের ভারতে বসবাসের ফলাফল বিশদভাবে আলোচনা করেন।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ—দুজনেই অসাধারণ ঐতিহাসিক চেতনা সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ভারতে শিল্প বিপ্লবের উপায়, সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুজনেই নির্দ্বিধ ও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তা' বলে' এই বিপ্লব সাধনের জন্যে যে মূল্য অবশ্য দেয় তা তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। শিল্প বিপ্লবের সূচনায় কুটীর শিল্পের সংকোচন ও বেকার সমস্যার উদ্ভব অনিবার্য; কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সামগ্রিক উন্নতি হবে তার তুলনায় এই সাময়িক ক্ষতি অতি সামান্য—এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। 'তাই ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্যে দুটি অসামান্য পুরুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।'

৩

কোন দেশে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার আর অরাজক দুঃশাসনের জঞ্জাল জমে ওঠে, তখন নিঃস্বার্থ, শুভবুদ্ধি ও ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সুশাসন ও সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থা কামনা করেন; যেমন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁরা ভেবেছিলেন, দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে আর কোন অন্তরায়ই থাকবে না। সেই স্বরাজ কামনার মধ্যে স্বরাজের জন্যে আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। স্বরাজের জন্যে আন্দোলন ও স্বরাজ কায়েম হলে তা' রক্ষা করার জন্যে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে সব পরিবর্তন প্রয়োজন আর ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ী বিকাশের জন্যে যে শাসন ও স্বাধীনতার প্রয়োজন সে সবের দাবি নিয়ে আন্দোলন সুরু করেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে আজ আমরা স্বরাজ পেয়েছি,—একথা অনস্বীকার্য। বিদেশী রাজ বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ, স্বার্থান্বেষী ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতা, ক্ষমতা-লিপ্সা, মদান্ধতা, অজ্ঞতা ও অবিবেচনা আর জনসাধারণের অসহায়তা, ক্ষমতাহীনতা ও নিরবলম্ব নিষ্ক্রিয়তার ফলে আজ রাষ্ট্রযন্ত্রের অবাধ অপব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। এ অবস্থায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সমন্বয়ী বিকাশ সম্ভব নয়, তাই স্বভাবতঃই অনেকের পক্ষেই নিরাজ সমাজের আবেদন উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪

যখনই কোন শক্তি তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার সীমা ছাড়িয়েছে আর রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, তখনই অবিচারের চড়ায় ঘা খেয়ে ইতিহাসের ধারা গতি পরিবর্তন করেছে। সময়ের বাঁকে বাঁকে তাই রাষ্ট্রবিরোধী তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মতই নিরাজতন্ত্র ও নানান ধরণের। কেউ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী, আবার কেউ সমাজকেন্দ্রিক নিরাজ সমাজের অনুরাগী। কেউ সমাজের ক্রমপচনশীলতার নৈরাজ্যবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাই তারা ঘরে ফেরার উন্মুখ ইচ্ছা নিয়ে কৃত-বা সত্য-যুগের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রূপার 'নৈরাজ্যবাদ' শীর্ষক বইটিতে (প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৭০ ; দাম— দশ টাকা) পরলোকগত ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু প্রাচীন যুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। লেখাটি চতুরঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তারই গ্রন্থরূপ। শ্রীনারায়ণী বসু বইটির ভূমিকায় বলেছেন :

'নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী ভাবনা সংকলিত করে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের এখনও অভাব রয়েছে। লেখক এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন এবং স্থির করেছিলেন সর্বশেষে তিনি ভাবী সমাজ গঠনের তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা দেবেন যাতে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক বাস্তব সমন্বয় সাধন, হয়তবা সম্ভব। অর্থাৎ বইখানি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে পর্যবসিত না হয়ে হবে একটি নতুন সমাজদর্শনে। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তার পূর্ণ পরিণতি আত্মপ্রকাশ করবে এই গ্রন্থে। কিন্তু তিনি এই শেষের কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। তা হলেও নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানি স্বয় সম্পূর্ণ।'

লেখকের অকাল মৃত্যুতে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও এর উপসংহারে বিভিন্ন ধরণের নৈরাজ্যবাদের সমীক্ষায় তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর ভাবদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে অনেক মৌল প্রশ্ন তুললেও নৈরাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে, পাশ্চাত্য নৈরাজ্যবাদীরা, নিরাজ সমাজগঠনের কোন বাস্তব পন্থা দেখাতে পারেন নি, অত্যধিক রাষ্ট্রবিদ্বেষের ফলে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন এবং শাসন-হীন সমাজগঠন সম্ভব করতে হলে সমকালীন ব্যক্তিমানস ও সামাজিক পরিবেশের যে পরিবর্তন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে, কোন চিন্তা করেন নি। প্রাচ্যদেশের আত্মিক নৈরাজ্যবাদ পাশ্চাত্যের নৈরাজ্যবাদের এই দোষ থেকে মুক্ত। তাই লেখক বলেছেন :

'পাশ্চাত্য জগতে নৈরাজ্যবাদ যখন নিদ্রার আবেশে ম্রিয়মান অথবা বিভীষিকায় উত্তেজনায় উন্মত্ত তখন এর পুনরাবির্ভাব হল প্রাচ্যে যেখানে আড়াই হাজার বছর আগে এর জন্ম হয়েছিল। নতুন বিশ্ব পরিবেশে প্রাচ্যখণ্ডে উত্থিত হল এক আত্মিক বিদ্রোহের ঘোষণা, বিত্ত ও ক্ষমতার উন্মাদ কামনার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সাবধানবাণী। এই নব নৈরাজ্য-বাদের ঋত্বিক টলস্টয়, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী।'

৫

রূপার এই দুটি বইয়ের প্রত্যেকটিতেই লেখকের তথ্য নিষ্ঠা, দীর্ঘ গবেষণা, গভীর পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত বিচার ও যুক্তিসংহত মূল্যায়নের ছাপ রয়েছে। বই দুইটি তাই বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

অরিন্দম সেনগুপ্ত

বিশ্বাবর্ত

চীন-সোভিয়েট সংঘাতের নবপর্যায়

সাম্প্রতিক এশিয়া ও আফ্রিকা সফরের পর ন্যাশনাল পিপল্‌স্‌ কমিটির ষ্টাণ্ডিং কমিটি ও ষ্টেট কাউন্সিলের সাধারণ সভার যুক্ত বিবৃতি দেবার সময় চৌ-এন-লাই সীমানা বিরোধ মীমাংসায় শক্তির প্রয়োগ বর্জনের সোভিয়েট প্রস্তাবকে "নূতন জালিয়াতি" ("new fraud") আখ্যায় অভিহিত করেন। কারণ এই প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ফলে পররাজ্য গ্রাস ও ইতিহাস পরম্পরায় সীমানা সমস্যা—এই দুই ঘটনাকে একই পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে চৌ-এন-লাই-এর দৃষ্টিতে। সাম্রাজ্যলোলুপদের গ্রাস থেকে ভূমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োগ বর্জন করলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই বর্জন করতে হয়! তাই চৌ-এন-লাই-এর মতে "the present international situation is favourable to the revolutionary people of the world " অতএব, সোভিয়েট রুশের ধোঁকায় যেন কেউ না ভোলে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই চৌ-এন-লাই-এর এশিয়া ও আফ্রিকায় দীর্ঘায়িত সফর। এই দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের এবং বিশেষ করে এদের সোভিয়েট রুশের আওতার বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে বান্দুং সম্মেলনের অনুসরণে আর একটি আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতমরাষ্ট্র রূপে চীনের স্থান নির্দেশ করতে চৌ-এন-লাই ব্যস্ত হয়ে বলেছেন "...the Chinese Govt will do its bit to ensure the success of the preparations for the second Asian-African conference." আফ্রো-এশীয় শিবিরের মুরুব্বীর ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই জাকার্তার প্রস্তুতি বৈঠকে সোভিয়েট রুশকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণের ভারতীয় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে চীনা প্রতিনিধিদল। এবং এই বিরোধিতার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে বর্ণের প্রশ্ন তুলতেও চীনের বাধে নাই। আফ্রো-এশীয় নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই পটভূমিকায় গত মে দিবসের বৃহৎ সমাবেশে মস্কোর রেড স্কোয়ারের মঞ্চে ক্রুশ্চেভের পাশে আলজিরিয়ার বেন বেলা একমাত্র সম্মানিত অতিথির স্বীকৃতি পেয়েছেন। ক্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক মিশর সফরও তাৎপর্যময়।

সোভিয়েট রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে প্রচারেও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। গত ২১শে এপ্রিল মস্কোর সংবাদে প্রকাশ 'প্রাভদায়' এই প্রথম চীনাদের 'দলত্যাগী' ('Renegade') বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। তাছাড়া, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার সহযাত্রী দুই একটি পার্টি বাদে মস্কো থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির কাছে একটি সার্কুলার পাঠিয়ে মাওৎসে তুং-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান সুরু করা হয়েছে। এই সার্কুলারে বলা হয়েছে: (১) পিকিং-এর কর্তারা মার্ক্স-এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনা প্রচারের পরিবর্তে মাও-এর রচনার বহুল প্রচার করে তাঁকে অবিসম্বাদী নেতারূপে প্রমাণিত করতে চায়। (২) স্টালিনের মত মাওকেও দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ চলেছে। যার ফলে চীনা জনসাধারণ তাদের খাদ্যের জন্য, শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য মাও-এর নিকট কৃতজ্ঞ। (৩) চীনা সংবিধান ও দলীয় আইন-কানুন নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করে মাও স্টালিনের মত স্বৈরাচারী হয়ে

উঠেছে। গত আট বছরের মধ্যেও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস আহুত হয় নাই, যদিও প্রতি পাঁচবছরে একবার কংগ্রেসের বৈঠক আহ্বানের বিধান রয়েছে। (৪) ফলে মাও কর্তৃক সাম্প্রতিক নীতি-পরিবর্তনগুলি অবৈধ ও অসিদ্ধ। গ্রাম্য কমুন স্থাপন, শিল্পে উল্লম্ফন (leap forward) এবং পরবর্তীকালে পশ্চাদাপসরণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বিরোধ ইত্যাদি গুরুতর নীতি-পরিবর্তন পার্টি কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতেই গ্রহণ করা হয়েছে।

মাওৎসে তুং ও চীনের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সোভিয়েটের আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিণতিকে চীন প্রত্যাখ্যাত করবেই। দুই কম্যুনিষ্ট দলের তাত্ত্বিক সংঘাত দুই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংঘাতে রূপান্তরিত হলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপর্যায়ে সংঘাত দেখা দেবে কি না তা কে বলতে পারে! ক্রুশ্চেভ অবশ্য কবুল করেছেন সমাজবাদী শিবির থেকে চীনকে বিতাড়নের কোনো উদ্দেশ্য তাঁর নেই এবং চীনকে সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে অবশ্যই স্বীকার করা হবে। মাও-ইসম্ বিতাড়নই তাঁর উদ্দেশ্য এবং মাও-ইজম্ এর সমাজ-চ্যুতির এবং চীন ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিচ্ছেদ স্থায়ী হলেও ক্রুশ্চেভ সচেষ্ট থাকবেন "to work for an improvement of inter-state relations"—দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতির জন্য।

কিন্তু দুই পার্টির মধ্যে কি বিচ্ছেদ আসন্ন? ক্রুশ্চেভ ও সুসলভ আগামী সেপ্টেম্বরে কম্যুনিষ্টদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য উদ্যোগ করেও সাড়া পেলেন না। কম্যুনিষ্ট দুনিয়াতে এ ধরণের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বও ইতিপূর্বে এ-ভাবে অবহেলিত হয় নাই। এমন কি তাঁর সত্তর বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষেও মস্কোতে কেবলমাত্র পূর্ব ইউরোপের দলগুলির প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের, এশিয়ার কিম্বা আফ্রিকার দলগুলির কোনো প্রতিনিধিই সেখানে হাজির হবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। বহু দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির দপ্তর থেকে সেপ্টেম্বরে সম্মেলন সম্বন্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে। কেউ বা লিখেছেন চীনাদের জাতিচ্যুত করার পরিণাম মারাত্মক হবে।

একমাত্র ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা থোরেজ দ্ব্যর্থহীন-ভাবে ক্রুশ্চেভকে সমর্থন করেছেন। আর করেছে পূর্ব-জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টি। পোল্যাণ্ডের সমর্থন সর্তসাপেক্ষ, চীনের সঙ্গে বিরোধ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মেটবার সম্ভাবনা থাকলেই সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। হাঙ্গেরীয় কম্যুনিষ্ট নেতা কাডারের এবং পোল্যাণ্ডের নেতা গোমুলকার স্তুতি করেও ক্রুশ্চেভ তাদের দলে টানতে পারেন নাই। রুমানিয়া সরাসরি বিরোধিতা করেছে। ইতালীয় দলের নেতা তোগলিয়াত্তিও খোলাখুলি বলেন বর্তমান অবস্থায় সম্মেলন আহ্বান করলেই কম্যুনিষ্ট শিবিরে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সোভিয়েট রাশিয়া ও ক্রুশ্চেভের আসপত্ন নেতৃত্বের এই পরাজয় কম্যুনিজমের এককেন্দ্রিক গড়নে বহু-কেন্দ্রিকতার আঘাত সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

আর একটি ঘটনাও এই আঘাতের তীব্রতা তুলে ধরেছে। গত ২৬শে এপ্রিল রুমানিয় ভাষায় সোভিয়েট বেতারের একটি ঘোষণায় নিজের শক্তিকে সমাজবাদ গঠনের স্পর্ধার বিরুদ্ধে সকল দেশকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়। তার অব্যবহিত পরেই সকল Comecon দেশগুলির (কম্যুনিষ্ট-দে গুলির অর্থ নৈতিক সংহতি—ইউরোপীয় কমন মার্কেটের কম্যুনিষ্ট প্রত্যুত্তর) জন্য যুক্ত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও একটি মাত্র পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের সোভিয়েট উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুমানিয়া মত ব্যক্ত করে। কারণ রুমানিয়ার মতে এই ব্যবস্থা "......not in keeping with principles which underlie the relations between Socialist countries." নিজ দেশের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার অপরের হাতে তুলে দিলে সার্বভৌমত্ব অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে

"...to turn sovereignty into a notion without any content." আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রুমানিয়ার এই বিদ্রোহও সোভিয়েট নেতৃত্বের উপর আর একটি দুঃসাহসী আঘাত।

লাওসে সঙ্কট

১৯৫৪ সালে জেনেভায় ইন্দো-চীনের যুদ্ধ-বিরতি মীমাংসিত হবার পর লাওসে পর্যায়ক্রমে সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৬২ সালে জেনেভায় পুনরায় লাওস সংক্রান্ত বৈঠকে প্যাথেট লাও, দক্ষিণপন্থী ও নিরপেক্ষ—এই তিন দলের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিসন সরকার গঠিত হয় নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভানা ফৌমার নেতৃত্বে। লাওস সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি বৃটেন ও রাশিয়া এবং লাওস মীমাংসার তদারকের জন্য তিন সদস্যভুক্ত আন্তর্জাতিক কন্ট্রোল কমিশন সংগঠিত হয়। সুভানা সরকারের বাইশ মাস আয়ুষ্কালের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ঘেঁসা প্যাথেট লাও বিভিন্ন সামরিক কৌশল অবলম্বন করে কোয়ালিশনের ওপর দুই শরীকের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে কোয়ালিশনের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে। এই বিরোধ-মীমাংসা ১৮ই এপ্রিল ব্যর্থ হওয়ার পরই ১৯শে এপ্রিল দক্ষিণপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান লাওসে ক্ষমতা দখল করে, প্রিন্স সুভানাকে কার্যত বন্দী করে রাখে। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেন জেনারেল কুভাসিথ অভয় এবং ১৬জন সামরিক অফিসারদ্বারা গঠিত রেভল্যুশনারী কমিটি ক্ষমতা দখল করে।

দক্ষিণপন্থী জেনারেল ফৌমী নোসাভান এই অভ্যুত্থানের বাইরে আছেন বলে শোনা গেলেও, তাঁর অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা ঘটা সম্ভব বলে মনে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন, বিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ এই অভ্যুত্থানের ঘোরতর বিরোধিতা করেছে। কারণ, সুভানা বিদায় নিলে লাওসের নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হবে এবং এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। কয়েকদিন দরকষাকষির পর প্রিন্স সুভানার ২রা মে'র ঘোষণায় জানা যায় দক্ষিণ-পন্থী ও নিরপেক্ষদের মধ্যে নূতন মৈত্রীর ভিত্তিতে প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানোভংকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্যাথেট লাও-এর পক্ষ থেকে প্রথমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যার ফলে প্রিন্স সুভানা সুফানোভং-এর নিকট আবেদন জানিয়ে কোয়ালিশন পরিচালনায় সহযোগিতার অনুরোধ জানান। প্যাথেট লাওকে আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে সুভানা আরও বলেন যে প্রতিরক্ষা দপ্তর তিনি স্বহস্তে রাখবেন এবং দক্ষিণ-পন্থীদের সেনাবাহিনী তার অধীনে থাকবে। গত ৪ঠা মে প্যাথেট লাও-এর প্রধান দপ্তর খাং খেতে সুভানা-সুফানোভং বৈঠকের প্রথম দফা সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই আলোচনার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সুভানা বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্লেইন অব জারস্-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি থেকে দক্ষিণপন্থী সেনাবাহিনী-দের সরিয়ে নিরপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন করেছেন। সুফানো-ভং-ও এ লড়াই সুরু করতে আপাতত ইচ্ছুক নন। এদিকে চীন কোয়ালিশন সরকারকে বজায় রাখবার দাবী জানিয়েছে এবং প্যাথেট লাউ-এর পক্ষ থেকে ২৯শে এপ্রিল তারিখে বিজ্ঞাপিত পিকিং-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে লাওসের কোয়ালিশন সরকারের গড়নে সামান্য-তম পরিবর্তন হলেও ব্যাপক অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেবে। সুতরাং চীনের নির্দেশে প্যাথেট লাও কি ভূমিকা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। এদিকে কাম্বোডিয়ার প্রিন্স সিহানুক লাওসের সাম্প্রতিক সঙ্কটের পর গোটা ইন্দো-চীনের মীমাংসার পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন।

টাঙ্গানাইকা ও জাঞ্জিবারের সংযুক্তি

গত ২৩শে এপ্রিল দার-এস-সালামের এক অতর্কিত

ঘোষণায় জানা যায় যে ২২শে তারিখে টাঙ্গানাইকার প্রেসিডেন্ট নায়ারে ও জাঞ্জিবারের প্রেসিডেন্ট কারুমে এই দুই দেশের সংযুক্তির জন্য এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে স্বাধীনতালাভের পর এই সংযুক্তি কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কারণ মাত্র জানুয়ারী মাসে বিপ্লবী পরিষদ জাঞ্জিবারের ক্ষমতা দখল করে সেখানকার কায়েমী স্বার্থ বিদায় করেছিল। তাদের আশা ছিল এই বিপ্লবকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য বিভিন্ন বন্ধুভাবাপন্ন দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে। চীনও মাত্র ১৭৫,০০০ পাউণ্ড সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জাঞ্জিবারের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দারুণ অর্থসঙ্কট সৃষ্টি করে আর্থিক বিপর্যয় আসন্ন করে তুলেছিল এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ মহম্মদ বাবু বৈদেশিক মুদ্রার সন্ধানে এসময় বিভিন্ন দেশে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরছিলেন। জাঞ্জিবার পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি আসন থাকা সত্ত্বেও, তার জন্মকাল থেকেই আর্থিক স্থিতির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না। আর্থিক কারণে এই সংযুক্তি সমপরিস্থিতিতে অবস্থিত রাষ্ট্রকে পথ প্রদর্শন করলে প্রকৃতিগত ভাবে বঞ্চিত অনেক পীড়িত দেশের মানুষের বঞ্চনার অবসান হবে।

৯. ৫. ৬৪

গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটা স্যান্ডাল আর বাটা চপ্পল পায়ে দিয়েই আপনি খুশি হবেন। নিমেষে জানতে পারবেন এদের বৈশিষ্ট্য কী। এমন আরামদায়ক উপকরণ, নির্মাণশৈলী আর মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য।
ঠিক মনের মতো জুতোটি খুঁজে পাওয়া পরম তৃপ্তিকর।

Bata

সম্পাদকীয়

এবারের নববর্ষ: ১৩৭১ এর পদক্ষেপ বারা পাতার উপর উদাসী বাউল বেশে নয়, এবার তার আগমন মৃতদেহের স্তূপের উপর, সর্বস্ব-লুণ্ঠিত নারী, ফুলের মত শিশুদের ছিন্নভিন্ন দেহের উপর পা ফেলে; যারা এই পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু যাদের বাঁচা আর হোলো না, অনাস্বাদিত রূপ-রস-গন্ধের পসরা পড়ে রইলো সব পেছনে। এ দেহের বন্ধন, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকল স্পৃহা,—মানুষের কল্পনা যতপ্রকার নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতার কথা ভাবতে পারে- তার সবকিছুকে সর্বদেহমনে ধারণ করে এই পৃথিবীর যন্ত্রণাময় প্রাণধারণের তিলে তিলে সমাপ্তি করলো। কার কৃতকার্যের, কার প্ররোচনায়, কার ষড়যন্ত্রের, কার স্বার্থপর ভোগস্পৃহার বলি হলো তারা? একদিন ঐতিহাসিক গবেষণায় তা প্রকাশ পাবে হয়তো, কিন্তু সে গবেষণা স্পন্দনহীন প্রস্তরীভূত হাড়গুলিতে মৃদুতম কম্পনও জাগাবেনা। আর আমরা আজকের ভারতবাসী, বিশেষ বাঙ্গালী আমরা, যারা সাজানো মঞ্চে, জলসার আসরে বসে বৈশাখকে আবাহন করেছি, সুরেলা সঙ্গীতে, ছন্দোময় নৃত্যে, ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে, তাদের এই স্বার্থপর উপভোগও একদিন কণেকমুষ্টি ভস্মে পরিণত হবে। কিন্তু জীবন্মৃত্যু লোকের কোন দিকে তার স্বাক্ষর থাকবে না। একদিকে অসহায় অবর্ণনীয় গ্লানিময় মৃত্যুর যন্ত্রণা, অন্যদিকে স্বার্থপর ক্লেদাক্ত ভোগের ধিক্কারজনক বিলাস। দ্রষ্টা আমরা যন্ত্রণায় আমাদের আকণ্ঠনীল হয়ে উঠেছে। সে যন্ত্রণার ভাগ আমরা আর কাউকে দিতে পারিনি, সেই ব্যর্থতার গ্লানি আমাদের সর্বাঙ্গে। জয়শ্রীর সর্বশ্রেণীর বন্ধু ও সতীর্থদের আজ প্রশ্ন করছি এ যুগ-যন্ত্রণার ছোঁয়া কি তাঁরা অনুভব করেননি? আজকের দিনে জয়শ্রীর একটিই মাত্র কামনা, সে যন্ত্রণা তাঁদের অক্ষয় শাশ্বত হোক।

বহু সুহৃদ নববর্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই সঙ্গে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে জানাচ্ছি ব্যক্তিগতভাবে সে সব শুভেচ্ছার অ-স্বীকৃতি তাঁরা যেন ক্ষমা করেন।

সেক্‌স্‌পীয়র

বিশ্বের সর্বত্র সেক্‌স্‌পীয়রের চতুঃশত জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত পালিত হয়েছে। সারা বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিম বাংলাও নানা প্রতিষ্ঠান ও পত্রপত্রিকায় দেশকালাতীত এই বিস্ময়কে স্মরণ ও শাশ্বতের কষ্টি পাথরে নূতন করে মূল্যায়ন করেছে। মানুষের মস্তিক, হৃদয় ও মননার ইতিহাসে এ সত্যটির তাৎপর্য গভীর। এমন বস্তু মানুষ সৃষ্টি করে, শত সহস্র বৎসরের পার্থিব পরিবর্তন যার রসাস্বাদনে বাধাস্বরূপ হয় না। একজন সেক্‌স্‌পীয়র, একজন রবীন্দ্রনাথ মানুষের বাইরের পরিবর্তনশীল এই বিচিত্র মিছিলের অন্তরালবর্তী মননার ও অন্তর লোকের চিরন্তনীকে সত্য বলে প্রকাশ করে। শ্রীঅরবিন্দের অনবদ্য ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীতে He is……a great vital creator & intensely-though within marked limits—a seer of life. His art itself is life arranging its forms in its own surge & excitement, not in any kind of symmetry—for symmetry here there is none…his way indeed is not so much the poet himself thinking about life, as life thinking itself out in him…his is not a drama of mere externalised action, for it lives from within and more deeply than our external life.

এই ভাষাকে ভাষান্তরিত করবার দুঃসাহস আমাদের নেই। কাজেই মূল ইংরেজীই রইলো, যাতে আমাদের পাঠকেরা এর যথার্থ মর্মার্থে পৌঁছতে পারেন। সেক্‌স্‌পীয়রকে এর চাইতে যোগ্যতর ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা পৃথিবীতে আর কারো হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। ভারতের-বাংলার একসত্যদ্রষ্টা ঋষি সেক্‌স্‌পীয়রের সত্যকে যথার্থ উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন, ভারতের পক্ষে এ কম গৌরবের নয়। এর পরে বলতে দ্বিধা নেই সেক্‌স্‌পীয়রকে ভারত যথার্থ পেয়েছে।

সেক্‌স্‌পীয়র সংখ্যা প্রকাশে যেসকল বিদ্বজ্জন জয়শ্রীকে-সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই সংখ্যা বাংলার পাঠকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হোলো।

পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটি

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে বাঁচাও কমিটি পরিকল্পিত আন্দোলনের শেষ ধাপে অর্থনৈতিক অবরোধের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানগামী মালগাড়ী আটকের কর্মসূচীতে এসে পৌঁছায়। এর আগে পূর্বপাকিস্তানে অবরুদ্ধ সংখ্যালঘুদের প্রতি ভারতের বিশেষ পশ্চিম বাংলার বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্বকে স্বীকার করে প্রধানতঃ প্রজা সোসিয়ালিষ্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল ও সম-উদ্দেশ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি করে সে কমিটি গঠিত হয় প্রথমদিকে প্রধানতঃ বনগাঁয় সে আন্দোলন সীমাবদ্ধ করা হয়। বাংলার বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি, রেলগামী জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত না করার দিকে দৃষ্টি রেখে এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়েছে উদ্যোক্তাদের। এ যাবৎ এই আন্দোলনে প্রায় ৫০০জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছেন। গত ১৯শে এপ্রিলের ভোররাত্রে এই আন্দোলনের বহু কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাদের ভারত-রক্ষা আইনে ধরা হয়। বাংলা সরকার এই আন্দোলনের প্রবক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের বক্তব্য বুঝবার ও সে অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিকে অদল বদল করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি বা এই বিরাট জাতীয় সমস্যাকে সমস্ত দায়িত্বশীল দল ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহযোগে ও সুচিন্তিত ভিত্তিতে সমাধান করবার মনোভাব কোনো স্তরে দেখান নি। তাঁদের সমস্ত অনুমান ভ্রান্ত, তথ্য অ-নির্ভরযোগ্য, পরিকল্পনা অবাস্তব ও অদূরদর্শী বলে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তবু সরকার পক্ষ বিরোধীদল, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান-দের সহিত পরামর্শ করা অথবা তাদের সহিত আলোচনা করে নীতি স্থির করতে প্রস্তুত নন। অথচ তারস্বরে এটাকে 'জাতীয় সমস্যা' আখ্যায়িত করে বক্তৃতামঞ্চ ও সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করতে কুণ্ঠিত নন। আর কোনো গণতান্ত্রিক দেশ আছে কিনা জানিনা যেখানে এই ধরণের ঘটনা ঘটে। ভারত সরকার পাকিস্তানের নানা মন্ত্রীর সহিত হাজারবার দরবার করতে প্রস্তুত অথচ দেশপ্রেমিক দল ও ব্যক্তিদের বিষবৎ শত হাত দূরে রাখবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। আর এদের নির্বুদ্ধিতা, হৃদয়হীনতার ফসল দেখে, নিজেদের ভুল স্বীকার না করে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির "প্ররোচনা" বলে উল্লেখ করতেও লজ্জাবোধ করেন না। কিন্তু অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কতদিন আর চলবে? এতে শেষ রক্ষা হবে বলে কি এঁরা আশা করেন?

এই আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে আন্দোলন পরিচালনা করে প্রায় ৫০০ সত্যাগ্রহী 'বাঁচাও কমিটি'র নেতৃত্বে কারাবরণ করেছে এটা এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতেই হবে। সমস্যার প্রতি সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আন্দোলনের দাবীগুলি পরোক্ষভাবে বাস্তব ঘটনার মারফৎ যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে যদিও সরকারপক্ষ তা এখনো স্বীকার করার মত খোলামনের পরিচয় দেননি এবং দেবেন বলেও আমাদের আশা নেই।

উদ্বাস্তুদের আসা বন্ধ হয়নি বরং তীব্রতর হয়েছে

ভারত সরকার নির্যাতিত পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বলিষ্ঠ কোনো নীতিই গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাঁদের একমাত্র পন্থা হচ্ছে পাকিস্তান ভারতকে যত অপমান, অ-মর্যাদাই করুক না কেন পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উপরেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চাপিয়ে দেয়া, যাতে সংখ্যালঘুরা ভারতে এসে ভারতবর্ষকে বিব্রত না করে। ভারত সরকার ঢাকাস্থিত হাইকমিশনারকে মাইগ্রেশন আইন কিছুমাত্র শিথিল করবার নির্দেশ দেননি তার বহু প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে ঐ নরক থেকে উদ্বাস্তুরা প্রতিদিন হাজারে হাজারে ভারতে চলে আসছে। আসবার পথে সারা রাস্তা তারা পূর্বপাকিস্তানী পুলিশ, পাকিস্তান রাইফেল্স ইত্যাদির হাতে মার খেয়েছে, মেয়েদের পথে পথে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে—যাদের শিশু বললেও হয়—ঐ পশুদের পাশবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তারা চলে আসছে, দুই রাষ্ট্রের স্বার্থপর নেতৃত্বের প্রতিরোধ সত্ত্বেও আসবার পথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দা বটি বর্শা বল্লমে সজ্জিত হয়ে নারী বালকবালিকা শিশুদের মধ্যে রেখে ব্যূহ রচনা করে বীরবেশে তারা আসছে —হয়তো পথে তারা মৃত্যু বরণ করবে কিন্তু কি গৌরবময় সে মৃত্যু! এই বীরত্বকে প্রাণ ভরে অভিনন্দন জানাই, দেখে ও শুনে অন্তর আনন্দে শ্রদ্ধায় ভরে গেছে। মিথ্যা শান্তি ও মৈত্রীর বাণী যার পেছনে রয়েছে ভীরুতা ক্লীবতা, স্বার্থপরতা ও ফাঁকি প্রতিটী ভারতবাসীর নিকট থেকে তার বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণা ও ক্রোধই উচ্চারিত হোক্ তাই নয়, নির্ভীক, জীবনপণ অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে উঠুক।

এতদিন পর বম্বাইতে অনুষ্ঠিত এ আই সি সি বৈঠকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশব্যাপী নারী সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তান কর্তৃক নারী নির্যাতনের কাহিনী সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্বজনমত গঠন করবার জন্য। বহু বিলম্বে হলেও এতদিন পর কংগ্রেসের নেতাদের যে এদিকে দৃষ্টি পড়েছে তার জন্য আমরা কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি। আশাকরি সহকারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন লোকসভায় যেসব গর্হিত উক্তি করেছেন তার সংশোধন এবার হবে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী পরিবর্তন, শ্রী ত্যাগীর নিয়োগ, দণ্ডকারণ্য সংস্থা হ'তে সহানুভূতিহীন জনসনের অপসারণ, 'পাক মুস্লিম অনুপ্রবেশ' সুদৃঢ় হস্তে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত শ্রীনন্দ কর্তৃক ঘোষিত হওয়াতে ভারতের নীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করাতে পূর্ব পাকিস্তানসংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটি গত ১৪।১।৬৪র বৈঠকে আন্দোলনের বর্তমান ধারা—পাকিস্তানগামী মালগাড়ী আটক —স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। শীঘ্রই তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষিত হবে। পশ্চিম বাংলার বিমূঢ় বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় আন্দোলন খুব জোরালো হয়নি, তাতে উদ্যোক্তাদের নিরাশ হবার কারণ নেই, কোনো প্রচেষ্টার সত্যাসত্য সফলতা-নিষ্ফলতা তার আপাত ফল দিয়ে অনেক সময়েই মাপা যায় না, কিন্তু ইতিহাসের এই বেদনাময় অধ্যায়ে বাংলা দেশের অন্ততঃ কিছু ছেলেমেয়েরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত লাঞ্ছিত মানবতার যন্ত্রণাকে নিজেদের হৃদয় ও আচরণ দিয়ে ভাষা দিতে চেয়েছিল এ কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। এই সত্যব্রতীদের জয়শ্রীর অভিনন্দন জানাই।

শেখ আবদুল্লা, কাশ্মীর ও ভারতীয় রাজনৈতিক দল

শেখ আবদুল্লার মুক্তির পর থেকে কাশ্মীরের সমস্ত ব্যাপারটী নূতন করে সারা ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বিশ্বরাষ্ট্র সমূহে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আলোড়নের যথার্থ কারণ অনেকাংশেই কৃত্রিম তা হচ্ছে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কাশ্মীর সম্বন্ধে মুরুব্বীয়ানা, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু

গণহত্যা বিশ্বে এমন কি ভারতের কোনো আলোড়নের সৃষ্টি করলো না কিন্তু করলো একটার পর একটা কাশ্মীর 'রহস্য'। এই রহস্য সৃষ্টিতে ভারত সরকারের কৃতিত্ব প্রচুর। হজরতবাল মসজিদ থেকে মহম্মদের কেশ অপহরণ করলো এক বা একাধিক মুস্লিম, পাকিস্তানে আয়ুব জিগির তুললেন ঐ কেশচুরি মুসলমানের কাজ হতেই পারে না, এ হিন্দুর কীর্তি না হয়ে যায় না। ফলে কয়েক হাজার হিন্দু—বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানও বাদ গেল না—খুন হোলো, নারীরা ধর্ষিতা, হত হোলো—এখনো হচ্ছে—তা নিয়ে বিদেশী মুরুব্বিরা নীরব! আব্দুল্লার মুক্তি দেয়া হোলো ১১বছর পর তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের কেশ চুরির ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়া হোলো। গণতান্ত্রিক ভারতের জনসাধারণ ও অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলসমূহ, ভারতীয় লোকসভা, কেউ জানলোনা আব্দুল্লার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল, তার ভিত্তি কি ছিল, কেন কারা কেশ চুরি করেছিল। এসবই চির রহস্যাবৃত রইলো। সুরু হোলো কাশ্মীরে আব্দুল্লা অধ্যায়, এই খুনে ব্যক্তিটিকে পুনরায় কাশ্মির সিংহে রূপান্তরিত করা হোলো। তিনি জম্মু কাশ্মীর চষে বাক্ স্বাধীনতার চূড়ান্ত করে. ভারতের সার্বভৌমত্ব, সংবিধান. কাশ্মীরের ভারতভুক্তি, তার পশ্চাতে ভারতের অঢেল অর্থ ঢালা, কাশ্মীরকে পাকিস্তানী আক্রমণ মুক্ত করবার জন্য বহু ভারতীয় জোয়ানের প্রাণ দেবার পর আবার প্রথমথেকে সুরু হয়েছে গণভোট, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার. কাশ্মীরীরাই কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ন্তা প্রভৃতি শ্লোগান আর এই পাক-ভারত উপমহাদেশের ত্রাণকর্তা হিসাবে আব্দুল্লার আসরে অবতরণ, শ্রীনেহেরুর নীতিহীন নীতি, সব মিছিল করে চলছে—ভারতের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, কোটি কোটি জনসাধারণের ভাগ্য সব নিয়ে ভারতের ক্লীব নেতৃত্ব ছিনিমিনি খেলছেন আর তার সঙ্গে পার্টি বিহীন গণতন্ত্রের সর্বোদয়ী বাহক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি উচ্চতর প্রমূল্যের পরীক্ষা চালিয়েছেন। আবদুল্লার যত আব্দার সমর্থন করে যাচ্ছেন, পূর্ব পাকিস্তানের হতভাগ্য সংখ্যালঘুদের 'নিম্নতর' স্বার্থ বা দাবী উপেক্ষা করে অসাম্প্রদায়িকতার ও উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। আর জুটেছেন পাকিস্তানের ভারতীয় জন্মদাতা শ্রীরাজগোপালচারিয়া—তিনি নূতন থিসিস্ দিয়েছেন যা রয়েছে শেখজীর পকেটে, ভারতীয় জনসাধারণ জানেনা, ভাবেজীও শেখজীকে গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন। লক্ষ্যের বিষয় এসব পরামর্শদাতারা ভারতের জনসাধারণকে বিশ্বাস করে তাঁদের পর্দান্তরালগত ভূমিকা সম্বন্ধে বিচার করবার সুযোগ দেন্‌না, কিন্তু শেখজীকে পরামর্শ নিতে দ্বিধা করেননি!

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দলের সুস্পষ্ট নীতি জানা যায়নি, প্রজাসমাজতন্ত্রীরা কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত ও আত্মনিয়ন্ত্রণনাধিকার দাবী সংবিধান-বিরোধী বলে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন। জনসঙ্ঘও অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত বলে মত দিয়েছেন স্বতন্ত্রদল ও তার নেতা নিশ্চয়ই এই অন্তর্ভুক্তিকে চূড়ান্ত মনে করেন না তাদের কার্যকলাপ দ্বারাই তা প্রমাণিত। এই পটভূমিতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আব্দুল্লা পাকিস্তান যাত্রা করবেন আর এই ব্যক্তিটির প্রত্যাবর্তনের পথের দিকে ভারতরাষ্ট্র সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকবে। হায়! ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আর তার কোটি কোটি জনসাধারণের মর্যাদা!

চাউল সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি

এ বছর জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে চাউল কলগুলি বাজারে ৪ লক্ষ ১ হাজার টন চাল সরবরাহ করেছে। গত বছর ঐ সময়ের মধ্যে এই সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টন। গতবারের চাইতে প্রায় এক লক্ষ টন বেশী চাল যোগান সত্ত্বেও বাজারে চালের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। মে মাস পড়তে না পড়তেই গতবারের মে মাসের দরে চালের

দাম পৌঁছাল। অথচ এবার ৪৮ লক্ষ টন আমন উৎপন্ন হয়েছে। আউশ হবে প্রায় ৫ লক্ষ টন, এর উপর উড়িষ্যা থেকে আমদানী হবে ৩ লক্ষ টন এবং কেন্দ্রের মজুদ থেকে পাওয়া যাবে ১ লক্ষ টন। অবশ্যি রাজ্য সরকার আরও ৩০ হাজার টন চাল কেন্দ্র থেকে চেয়েছেন। এছাড়া, গোড়াতেই ধান-চালের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং চাউল মজুদ রাখবার জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চালের সঙ্গে তেল, ডাল, মাছ এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের দামও দ্রুত উর্ধগামী হয়েছে।

ধানের সরবরাহের অভাবে চাউলগুলি অচল হয়ে চাউলের সরবরাহ কৃত্রিমভাবে হ্রাস করে এ-সময় চালের বাজারে ঘাটতির ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কট সৃষ্টি করতে জোতদার ও মজুতদারেরা সহায়তা করেছে। এ-সঙ্কট তারা বরাবরই সৃষ্টি করে আসছেন এবং প্রতিবারই প্রায়-দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে মজুতদখলের ও ধান-চাউলের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী ওঠে। সরকার সে-দিকে কাণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে একদিকে জোতদার-মজুতদার-মুনাফাখোরদের চক্রে শোষণের পীড়নে বাংলাদেশের মানুষ নিঃশেষিত হয়ে এসেছে এবং অন্যদিকে চাউলের মূল্য আকাশ ছোঁয়া হয়েছে।

গতবছর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীরা চাউলের বাজার করায়ত্ত করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য নূতন চাউল বাজারে উঠবার পরই উদ্বৃত্ত চাউল সরকারী উদ্যোগে মজুত করা সুরু করলে, এপ্রিলের শেষের দিকেই মুনাফাখোরেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না। সরকার সেদিকে না গিয়ে কেবলমাত্র চাউল কলের উপর লেভি বসিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। যার ফলে ধানের সরবরাহ বন্ধ করে জোতদার-আড়তদার-মজুতদার—যাদের সঙ্গে কোনো কোনো চাউল কলওয়ালার যোগাযোগও রয়েছে—চাউল কলে ধান সরবরাহ বন্ধ করে মিলগুলি অচল করে দিল। বাজারে চাউলের যোগান বন্ধ হবার উপক্রম হল—তাছাড়া আড়তদার-পাইকাররাও চাউলের দর নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বৃদ্ধি করে খুচরা বাজারেও দাম বাড়িয়ে দিল। এই অবস্থায় গত ৭ই মে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভা বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত চাউল দখল করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর নির্দেশ জারী করেছেন। যে নির্দেশ জানুয়ারীতে পাওয়া উচিত ছিল, সে নির্দেশ গেলো মে মাসে, যখন চাউল শুধুমাত্র উৎপাদকের হাতেই মজুত নেই, আড়তদার-পাইকার-কলওয়ালারাও সে সময় ধান মজুত করেছেন। সুতরাং শুধু উৎপাদকের ধান মজুতদখলের নির্দেশ না দিয়ে, আড়তদার-পাইকার-কলওয়ালাদের ধান ও চাউল মজুত দখলের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, মজুত দখলের সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রচারিত করে, মজুতদারদের মজুত সরিয়ে ফেলবার এবং বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মজুদ বেনামীতে বিন্যস্ত করবার সুযোগ না দিয়ে, অতর্কিতে এই অভিযান আরম্ভ করা উচিত ছিল। যেভাবে কোনো কোনো জেলায় বিলম্বে নির্দেশ পৌঁচেছে এবং যেভাবে নির্দেশ পৌঁচান সত্বেও মজুত দখল অভিযান সুরু করতে বিলম্ব হয়েছে, তাতে সংশয় থেকে যায় বাস্তবিকই কি পরিমাণ মজুত সরকারের দখলে এসে চাউল কলচাল চালু করতে সহায়তা করবে। ১০ই মে তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় জানা যায় ২৪ পরগণা জেলায় কাজ সুরু হয় নাই। ঐ পত্রিকার ১১ই মে তারিখের সংখ্যায় জানা গেলো একটি জেলায় রবিবার অধিক রাত্রি পর্যন্ত মজুত দখলের সরকারী নির্দেশনামা পৌঁছায় নাই। হুগলী জেলায় একটি দুর্ঘটনার ফলে মজুত দখলের কাজ সুরু করতে বিলম্ব হয়ে গেলো।

সাধারণ, মিহি, অতিমিহি ধানের দাম যথাক্রমে ১৫, ১৫, ও ১৬ টাকা মণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সে-সময় সরকার

ঘোষণা করেছিলেন, যে যদি ধানের সরবরাহ উপযুক্ত মত না হয়, ১লা এপ্রিল থেকে মণ.প্রতি ধানের দর একটাকা হারে কমিয়ে দেওয়া হবে। সরবরাহের বর্তমান অবস্থা দেখে সরকার এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু উৎপাদক-আড়তদারেরা খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার ছয়লক্ষ মজুতদারও চাউল উৎপাদক ও নিজ নিজ প্রয়োজনের পরিমাণ অঙ্ক কষে উদ্বৃত্ত পরিমাণ নির্ধারণ করতে নাকি সরকারী বিভাগ হিমসিম খাচ্ছেন। পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ও কৃষিদপ্তর, রাজস্ব বিভাগের সহযোগিতায় গতকয়েকবছরের স্থায়ী সঙ্কটের মুখে এই অঙ্ক কষে উদ্বৃত্তের আনুমানিক গড় হিসাব করে রাখেন নাই কেন, সে কৈফিয়ৎ কে দেবে? ধানকাটার সমসাময়িক কালে জানুয়ারী-মাসে এ-হিসাব খুবই সহজসাধ্য ছিল।

উড়িষ্যার চাউলের যোগানে বাধা হয়ও চাউলসঙ্কটে সহায়তা করেছে। এর পেছনে উড়িষ্যার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ীদের যোগসাজস আছে কিনা, তা অনুসন্ধানযোগ্য। গত বছর প্রতিশ্রুত ৩ লক্ষ টনের পরিবর্তে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন উড়িষ্যা থেকে পাওয়া গেছে। এবছর মে'র প্রথম দিকে গত বছরের ৮২ হাজার টনের তুলনায় এবার মাত্র ৬৭ হাজার টন পাওয়া গেছে। তছাড়া উড়িষ্যার চাউল কলকাতার বাজারে নির্ধারিত দরের তুলনায় যদি মণপ্রতি পাঁচ টাকা কম দরে উড়িষ্যায় না ক্রয় করা সম্ভব হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে সে চাউল কিনে লোকসান দিয়ে বাংলাদেশে বিক্রি করা সম্ভব হবে না। উড়িষ্যার লেভি তুলে দেবার অনুরোধ এ-পর্যন্ত উড়িষ্যা সরকার কার্যকরী করে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই অসঙ্গতির মীমাংসা না করলে উড়িষ্যার চাউল পশ্চিম বঙ্গের সংকট মোচনে কাজে লাগবে না তাছাড়া বিহারে চাউলের দাম অত্যধিক বৃদ্ধির দরুণ উড়িষ্যার চাউল সেদিকে চালান হচ্ছে. পশ্চিম বঙ্গেও চাউল ও চোরা পথে বিহারের চড়া বাজারে চালান হয়ে এখানকার সঙ্কট গভীরতর করে তুলছে।

ধান-চাউল মজুদের জন্য লাইসেন্স এবং উদ্বৃত্ত দখল কঠোর হস্তে চালু করে চাউল কলগুলি সচল করতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ীদের পাইকার-আড়তদারদের পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে বাজারে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চাউলের পাইকারী ব্যবসায় ও চাউল কলগুলির রাষ্ট্রায়ত্তের এই স্বর্ণ সুযোগ। ভুবনেশ্বরের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্কল্পের পরীক্ষাও পশ্চিম বাংলার চাউল সঙ্কট নিরসনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই সুযোগ গ্রহণেই ভুবনেশ্বরের খসড়া রচয়িতাদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হবে।

চাউল মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারী দৃঢ়তা অন্যান্য দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি রোধে অবশ্যই সহায়ক হবে। যদিও সরকার সরিষার তেলের মূল্য ৩ টাকা বেঁধে দায়িত্ব স্খলন করেছেন, এই মূল্য-মাত্রা আরও নিম্নগামী অবশ্যই করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সরিষার দামও বেঁধে দিতে হবে।

মাছের বাজারেও সরকার পিছু হটেছেন। সেখানেও পাইকারী বাজারের পাশে পাশে খুচরা বাজার পরীক্ষামূলক-ভাবে খুলতে পারলে মৎস্য ব্যবসায়ীদের আঘাত ফিরিয়ে দেবার ভূমিকা সরকার তৈরী করতে পারবেন। তা না হোলে কেবল লুকোচুরিই চলবে।

দুধ নিয়েও সরকারের কেলেঙ্কারী কম যায় না। স্নেহ-জাতীয় পদার্থের ভাগ শতকরা ৪'৫ ভাগ থেকে ৩ ভাগে কমিয়েও সরকার দাবী করেছেন এর ফলে স্বাস্থ্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ কমলেও এতে নাকি গরুর দুধের মান রক্ষিত হবে। সরকার তবে এতোকাল এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড দুধ সরবরাহ না করে গরুর দুধ কেন সরবরাহ কর-ছিলেন, যদি ক্রেতা সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য এতোই উদ্বেগ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সরকার গরুর দুধের মূল্য ৯৬ নঃ পঃ লিটার থেকে ৮৪ নঃ পঃ হ্রাস করে? মান অবিমিশ্র রয়ে গেলো অথচ মূল্য কমে গেলো। সরকারের এ-এক বিচিত্র ব্যবসায়! ভেজালে দেশী গোয়ালাদেরও সরকার এবার হার মানিয়েছেন।

মহালানবীশ কমিটির রিপোর্ট ও আরো কয়েকটি কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা যাবে, স্থানাভাবে বৈশাখে যা দেয়া গেলনা।

১৫।৫।৬৪

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এড্ভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

সম্পাদকীয়

জওহরলাল নেহেরু—মৃত্যুর অমোঘ হাত, দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতোত্তর প্রধানতম ও প্রবলতম পুরুষ জওহরলালকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেল—ভারত ও বিশ্ব মঞ্চ থেকে। ঠিক এই মুহূর্তে, এই বিদায় নাটকীয়তা ও আকস্মিকতায় এক স্তব্ধ বিমূঢ়তা এনে দিয়েছে ভারতের উপরে, হয়তো বা বিশ্বেরও স্তব্ধ ঝটিকা-কেন্দ্রগুলিতে। বিশ্বের দিক্‌পালদের উপস্থিতিতে যথোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সহিত শোককৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। দেশ-বিদেশের প্রধানেরা বিভিন্ন ভাষায়, ভঙ্গীতে, শ্রদ্ধা, প্রীতি নিবেদন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাবধানী বাণীও উচ্চারণ করেছেন, নেহেরু-বিহীন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। জাতি উপযুক্ত মর্যাদার সহিত বার দিনের রাষ্ট্রীয় শোকতিথি পালন করেছে। লোকান্তরিতের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী চিতাভস্ম পবিত্র প্রয়াগ-সঙ্গম, গঙ্গা ও ভারতের নানা নদী প্রবাহে ও মৃত্তিকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলি আমাদের নিকট পৌনঃপুনিকতায় এবং প্রতিক্ষেত্রে সৈন্য বিভাগের জলস্থলব্যোমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও প্রথাবদ্ধ সামরিক সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গী, সংযম ও শোভনতার দিক দিয়ে জাতির ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদার পক্ষে অনুপযুক্ত মনে হয়েছে। অন্যান্য জাতি তাদের রাষ্ট্রনায়কদের স্মৃতির প্রতি অনুরূপ ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কি না জানি না, অবশ্য, তাদের অনুসরণ অথবা অনুকরণের প্রশ্নই বড় নয়, বড় হচ্ছে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বিরাট দেশ ও তার কোটী কোটী জনতার পক্ষে মর্যাদা সংযম ও যথার্থ রুচির প্রশ্ন, সস্তা ভাবালুতার প্রতিযোগিতা নয়। জওহরলালের লোকান্তরের এক পক্ষকালের মধ্যে নানাস্থানে পাহাড়, বন্দর, জনপথের

নামান্তকরণ এবং স্মারক টিকিট প্রকাশ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই যেন এক অতি দ্রুততার ভাব, যেন এসবের জন্য উপযুক্ত সময়ের অভাব সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হয়েছেন সরকার। আমাদের চোখে এই অতিদ্রুততা অশোভন ঠেকেছে ভারত ও লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতি উভয় দিক দিয়েই।

এরপর শ্রীজওহরলাল নেহেরু নামীয় ব্যক্তি ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে গেলেন ; যে ইতিহাস ভারতের ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটিত করবে, দিনে, মাসে বৎসরে নয়, শত শত হাজার বৎসর ধরে। ভারতে ইতিহাসের এক বিপুল সম্ভাবনা ও ইঙ্গিতপূর্ণ সময়ে যে ব্যক্তি প্রধানতম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, অবিচ্ছিন্ন ১৭ বৎসর ধরে স্বাধীনতা ও বিভাগোত্তর ভারতবর্ষে, নিজ আদর্শ, লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে, তার সফলতা নিষ্ফলতা বিশ্লেষণ করবে নিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও তার ফলশ্রুতির ভাগী হবে এই উপমহাদেশের কোটি কোটি জনতা। আজকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অত্যুক্তি অথবা বিকৃতউক্তি কোনটারই স্থায়ী মূল্য নেই। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ছাড়াও মানুষ জওহরলালেরও মূল্যায়ন করবে, করছে ভারতের ও বিশ্বের মানুষ। সে মূল্যায়নের নিকষে কার কি ধরা পড়ছে জানি না, আমরা দেখছি এক সুকুমার, বিচিত্র-রুচি মানুষ, শৈশব থেকে যে স্বপ্ন দেখেছে, এক চঞ্চল অশান্ত, অধৈর্য্য অধীর ব্যক্তিত্ব বিশ্বের যত অত্যাচার অবিচার বঞ্চনা যাকে মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত করেছে, নানা অবাস্তব পদক্ষেপে, যার কল্পনা-প্রবণ কবিমন হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে যা অনুভব করেছে অবিচল দৃঢ়তা, অচঞ্চল লক্ষ্য, শ্রান্তিহীন নিষ্ঠা ও কুণ্ঠাহীন বাস্তবতায় তাকে ধারণ করতে পারেনি, হয়তো সেই যাত্রাপথের দিকে গভীর আশায় তাকিয়ে রয়েছে তার সহযাত্রী, অনুসারী ও অনুগামীরা, কিন্তু গভীর হতাশায় ক্ষণিকের প্রজ্জ্বলিত সে অগ্নিশিখাকে আবৃত হতে দেখেছে শত সংশয় কুণ্ঠায়। দ্বিধায় পথ চলা হয়েছে লক্ষ্যহীন, চলার পথে পথে জেগেছে প্রশ্ন, এক স্পর্শকাতর দরদী মন বাস্তবের মুখোমুখী হয়েছে বিভ্রান্ত, পথশ্রান্ত, হয়তোবা লক্ষ্যচ্যুত। তবু—তবু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ পথযাত্রী আমাদের মনকে সেদিন উদ্দীপিত করেছে, এই চিরবিস্ময় ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করবার, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসবার বন্ধনে নিজেকে বাঁধবার প্রেরণা দিয়েছে, যে অবিস্মরণীয় সত্তা, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মত আমরাও সেই জওহরলালের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছি, তাকে ভালবেসেছি পরিপূর্ণ ভাবে। তার চিরবিদায়ের ক্ষণে আমরাও অনুভব করেছি গভীর রিক্ততা, অনুভব করেছি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সম্পর্কে আমাদের রয়েছে

বহু অভিযোগ, বহু-বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এসবেও মানুষ জওহরলালের স্মৃতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে আমাদের বাঁধছেনা বিন্দুমাত্র।

নেহেরুর পরে কে? অবশেষে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হয়েগেলো। নেহেরুর পক্ষে ও অন্যান্যদের পক্ষেও সুন্দরভাবে। নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ঐক্য প্রদর্শন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতা নির্বাচন, দেশের অভ্যন্তরে পূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি দ্বারা আপাততঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, শাসক দল এবং দেশ, শক্তি ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে। সে জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও তার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহ প্রশংসার দাবী রাখে। এই একটীমাত্র কাজ দ্বারা লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রীর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং সমস্ত জাতি তারজন্য নিশ্চিতভাবে গৌরব বোধ করবে। শাস্ত্রীজি কোন পথ নিতে বাধ্য হবেন, কি ভাবে বিভিন্ন সঙ্কটপূর্ণ সমস্যার মীমাংসা করবেন, কতটা নেহেরুর পথে ও নীতিতে অবিচল থাকবেন, কি থাকবেন না, তার অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ তা থাকা বা না-থাকা কোনটা জাতির পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর হবে এসব প্রশ্নের মীমাংসা হতে হয়তো বেশী দেরী হবে না। কারণ ঘটনা-প্রবাহ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে ভারতকেও সেই ঘূর্ণায়মান আবর্তের অনিরোধ্য টান থেকে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার অথবা দুর্যোগপূর্ণ বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে এবিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। সহযোগিতা ও সহানুভূতির সহিত নূতন প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করবো। এই ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটপূর্ণ সময়ে বিরোধী দলগুলিও দেশপ্রেম, বলিষ্ঠতা, আদর্শনিষ্ঠা, পরিচ্ছন্ন লক্ষ্য ও সুসম্বদ্ধ সংগঠন গড়ে না তুলতে পারলে তাদের ভূমিকা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে না, আশা করি বিরোধী দলগুলি সে সম্বন্ধে অবহিত আছে।

১৪।৬।৬৪

চতুর্থ পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি

ভারতবর্ষের আর্থিক বিন্যাসে অমানিশার অন্ধকার উত্তরণের পর সূর্যালোকিত মালভূমির মরীচিকায় পৌঁছাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহেতা। এই প্রতিশ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অবশ্য ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—"Sunlit plateau by 1982"—বঞ্চিত, নিপীড়িত ভারতবাসী, যাদের ২৭ কোটির আয় দৈনিক ১৯ নয়া পয়সা। এই অবকাশে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উত্তীর্ণ হবে এবং আশু পরিকল্পনাটির কাঠামোর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সুরু হয়ে গেছে। এই চতুর্থ পরিকল্পনায় বাইশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। পরিকল্পনার প্রাথমিক কাঠামোতে কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে মাথাপিছু মাসিক আয় কুড়ি টাকা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য জাতীয় আয় ঐ সময়ের মধ্যে ৩১,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে হবে। তৃতীয় প্ল্যানে এই আয় ১৮ হাজার কোটিতে দাঁড়াবে যদিও আনুমানিক আয় ছিল ১৯ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় আয় এই মাত্রায় পৌঁছাতে হলে জাতীয় আর্থিক বিস্তৃতির বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ থেকে ৭-এ তুলতে হবে এবং মূলধন সঞ্চয়ের হার চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ১৪।১৫ থেকে ১৯৭০-৭১-এ শতকরা ২১ ভাগে উন্নীত করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও বর্তমানে সমগ্র বিনিয়োগের শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ১৯৭০-৭১-এ শতকরা ৭ ভাগে হ্রাস করে ১৯৭৫-৭৬ সালে বৈদেশিক সাহায্য পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। পরিকল্পনার এই ক্রম অনুসরণ করার পাশাপাশি পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দেশের বিনিযুক্ত মূলধনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও ঊর্ধ্বে দাঁড়াবে।

পরিকল্পনা কমিশনের এই দুঃসাহসিক অভিযানে স্বপ্নের মাত্রা আরও কতটা। হিসাবমতচুম্বী ও মূল্যবৃদ্ধির হার আরও কত আকাশচুম্বী হবে এবং ফলে বঞ্চনা ও নিপীড়নের হতাশ্বাস কত ব্যাপক ও বিষাক্ত হয়ে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে দুস্তর জটিলতা সৃষ্টি করবে। সে-সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় রয়ে গেছে। গত তিনটি পরিকল্পনার পরিণতিতে তার আভাস কঠিন স্বাক্ষর রেখে গেছে। প্রথম পরিকল্পনায়—সরকারী ও বেসরকারী দুই স্তরেই—৩ ০৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয়টিতে ৬৭৫০ কোটি টাকা এবং তৃতীয়তে ১০৪০০ কোটি টাকার দাম মিটিয়েও কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন পশ্চাদগামী হয়ে রয়েছে। এর উপরও আরও তিনটি পরিকল্পনায় চক্রবৃদ্ধি হারে বিনিয়োগের পর শ্রীঅশোক মেহেতার কল্পলোকের সূর্যালোকিত মালভূমিতে—"sunlit plateauতে" পৌঁছবার জন্য কতজন সৌভাগ্যবান অবশিষ্ট থাকবেন সেই প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে শঙ্কাতুর করে তোলে। অতঃপর উন্নয়নের কল্পলোকের শরীক হতে জনসাধারণ দ্বিধা বোধ করলে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়?

ডেবর কমিটির ব্যাখ্যা

ভুবনেশ্বরে গৃহীত গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আদর্শকে রূপদানের কর্তব্য নির্ধারণে শ্রীডেবরের নেতৃত্বে কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করেছিলেন, কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কমিটি সমাজতন্ত্রের রূপায়ন সম্বন্ধে কোন নূতন কথা তো বলেনই নাই, বরং সরকারের কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপিত করেছেন। তালিকাগুলিও মামুলী এবং ঔচিত্যবাচক। কমিটির রিপোর্টে সমাজ-পরিবর্তনের গতিপথ নির্ণয়ে সমাজজীবনে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সংঘাত-সমন্বয়ের বিশ্লেষণ নাই, যে বিশ্লেষণের ফলে সমাজ-পরিবর্তনের বর্তমান গতিবেগ, সে গতিবেগ কি পশ্চাদগামী না অগ্রগামী, সমাজ-পরিবর্তনের অন্তরায় কিনা, কোন্ কোন্ সামাজিক ও আর্থিক শক্তির বিন্যাসে অন্তরায় দূর করে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ ত্বরান্বিত করা যায়

এবং তরাম্বয়ের কর্মসূচী কি হবে—বিশ্লেষণের এই পারম্পর্য অনুসরণ করে রিপোর্ট রচনা করলে ডেবর কমিটির উদ্দেশ্য সফল হত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তিভূমিগুলিকে অভ্রান্ত মৌলিক কৌশলরূপে গ্রহণ করে ডেবর কমিটি অগ্রসর হয়েছেন। তাই তাদের বিচারে লক্ষ্যে পৌছাতে না পারার জন্ম দায়ী কৌশল নয়, প্রয়োগের শৈথিল্য—"...the failure is not that of strategy but of implementation."

প্রশ্ন হল প্রয়োগের ব্যর্থতা কেন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কৃষির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন শতকরা পাঁচভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির ছিল। তা হয় নাই। তাই শেষের দুই বছর শতকরা ৭৮ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদন ৯ কোটি ২০ লক্ষ টন থেকে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টনে পৌছাতে হবে। এই পুনরুক্তির মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? সেই সঙ্গে বলা হয়েছে ভূমি সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে ভূমি সংস্কারের সম্পর্ক, ভূমি সংস্কারের পথে অন্তরায় কি এবং কেন—এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না নিয়ে অগ্রসর হলে উটপাখীর মত বালুচরে মাথা গুঁজে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া হবে মাত্র। ডেবর কমিটি এদিক থেকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

ডেবর কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলিও লক্ষ্যে পৌছাবার কতকগুলি সদিচ্ছা মাত্র। যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে, যে সকল পিতামাতার আয় জাতীয় গড় আয়ের চাইতে কম, তাদের ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং মেধাবী ছাত্রেরা বিনা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পাবে। এগুলিও পুরাতন সদিচ্ছার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

পরিশেষে কমিটি নির্বাচনের তাগিদে মৌলিক নীতি বিসর্জন দেবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ভূমি সংস্কার, আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এবং বকিত্রদের সম্পর্কিত কর্মসূচী ও নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপোষ চলবেনা—এই নীতিগুলিতে স্থির থেকে কংগ্রেস হয় বাঁচবে না হয় নিশ্চিহ্ন হবে, ডেবর কমিটির এই সিদ্ধান্তগুলি আদর্শভিত্তিক ও প্রশংসনীয়। এই আদর্শগুলি বহু পুরাতন এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে বার বার কংগ্রেসের এই আদর্শবিচ্যুতি ঘটেছে। সে-অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি ডেবর কমিটির রিপোর্টে নাই। এইখানেই কমিটি ব্যর্থ।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু

রাসবিহারী স্মারক সমিতির উদ্যোগে এবারেও ভারতের অন্যতম বিপ্লবী-নায়ক রাসবিহারী বসুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হলো পরম শ্রদ্ধাসহকারে। বিপ্লবী-নায়কের দুঃসাহসী জীবনব্রত এবং স্বদেশপ্রেমের অনন্ত কাহিনী একটি স্মারক গ্রন্থে সংকলিত করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অগ্নিময় যুগের একটি অপূর্ব অধ্যায় জাতির সামনে তুলে ধরে স্মারকসমিতি একটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। বিপ্লবী রাসবিহারী ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে শুধু সংগঠিত করেননি এই সংগ্রামের সঙ্গে নিজের জীবনকেও নির্ভীকভাবে গ্রথিত করেছেন। ভারত থেকে পালিয়ে জাপানে গিয়ে এক মহিয়সী নারীর সাহচর্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের হস্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়ে বিদেশ থেকে আজীবন তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে প্রচার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পতনের পরে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন এবং পরে নেতাজীর হাতে এই জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়ে তিনি পরামর্শ

দাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রচেষ্টায় বিপ্লবী নায়ক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ভারত বসুও এই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন এবং এই সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে এই মহান-অগ্নিহোত্রীরও দেহাবসান ঘটে। জাপানে রক্ষিত তাঁর দেহভস্ম পূর্ণ জাতীয় মর্যাদাসহ ভারতে এনে এই বিপ্লবী বীরের প্রতি অবিলম্বে ভারতের জাতীয় শ্রদ্ধার্পণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্মারক-সমিতি এই বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছেন কিন্তু এই সমিতি যেন অতিমাত্রায় অফিসিয়াল গোষ্ঠির প্রতিচ্ছবিতে পরিণত না হন, সেটাই দেশবাসী আশা করবে।

শিশু-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লোকান্তর

খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক নামে সুপরিচিত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপনাকালে তাঁর জন্মভূমি বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখে তিনি সুখ্যাত হন। 'হাসিখুশি' ও অন্যান্য হৃদয়-গ্রাহী শিশু সাহিত্য এবং পরে 'শিশুভারতী' নামে শিশুদের জন্য একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। শিশু-সাহিত্যিক নামে পরিচিত হলেও তিনি অন্যান্য বিষয়েও কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'বাংলার মহিলা কবি', 'ভারত মহিলা' 'সাধক কবি রামপ্রসাদ', 'সাধক কমলাকান্ত' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই যশস্বী লেখকের স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

অবিশ্রান্ত উদ্বাস্তু স্রোত ও পুনর্বাসন

পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সম্প্রতি ভারত-পাক মৈত্রী ও সম্প্রীতির সুপারিশ করে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করা সত্বেও এরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ উক্তির পশ্চাতে আন্তরিকতা কতখানি ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমনের অবিশ্রান্ত স্রোত সৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ পূর্বের মতই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লোকসভায় এক বিবৃতিতে উদ্বাস্তু মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী জানিয়েছেন যে পয়লা জানুয়ারী থেকে পয়লা জুন পর্যন্ত ৪৩৪,০০০ উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে এবং এখনও প্রতিদিন গড়ে চার হাজার করে উদ্বাস্তু আসছে।

শ্রীত্যাগী আরও জানিয়েছেন যে এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে মাত্র ৯৪,০০০ অর্থাৎ প্রায় এক পঞ্চমাংশ ভারতে এসেছে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে, ৭৭,০০০ পাক পাসপোর্টের সাহায্যে ভারতে এসে পাসপোর্ট জমা দিয়েছে—এবং কোনরূপ ছাড়পত্র বিনা ভারতে এসেছে ২৫৩,০০০ উদ্বাস্তু। অর্থাৎ বেশির ভাগ উদ্বাস্তু কোনরূপে সীমান্ত অতিক্রম করে চোরাপথে ভারতে আসছে।

আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৪৭,০০০ খৃষ্টান এবং ২০,০০০ বৌদ্ধ। আসামে এসেছে ১২৭,০০০ এবং তাদের আসামেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। পশ্চিম বঙ্গে আগত ২৫৬,০০০ উদ্বাস্তুর মধ্যে ১২৭,০০০ উদ্বাস্তু সরকারী সাহায্য ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর ৫০ শতাংশ মাত্র বাইরে যাচ্ছে। ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দার চেয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের বাইরে পাঠান হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রশ্ন স্থায়ী ও উদ্বাস্তু জনসংখ্যার তুলনা দ্বারা বিচার করা সঙ্গত নয়—প্রশ্নটি দেখা উচিত সম্ভাব্য জমি ও জীবিকার খতিয়ান করে। সেদিক দিয়ে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যাটি এখনও সুবিবেচিত হয়নি। ত্রিপুরা থেকে অনেক পাক-অনুপ্রবেশকারী বহিষ্কৃত হয়েছে—সেই জমিতে কেন যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে কোন

সঙ্গত কারণ জানান হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে যে ৫০ শতাংশ উদ্বাস্তু রয়ে যাচ্ছে তাদের কেন নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের প্রয়াসে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে না তারও কোন সঙ্গত কারণ দেখানো হয়নি।

বাংলার বাইরে ১১টি নতুন ট্রানজিট শিবির খোলা হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অস্থায়ী ও সাময়িক উদ্বাস্তু শিবির খোলার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের 'অফিসিয়াল রাজনীতির' যে তীব্র আপত্তি জাহির হয়েছে শ্রীত্যাগী তার কাছে নতি স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। শিল্পায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে পুনর্বাসনের নীতি গৃহীত হয়েছে, সেই শিল্পাশ্রিত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কেন যে পশ্চিম বাংলায় হবে না তার কোন সঙ্গত জবাব পশ্চিম বাংলার সরকার বা পুনর্বাসন মন্ত্রী দিতে পারেন নি। শিল্পানুগ পুনর্বাসনের জন্য যে বিরাট অংশের পুঁজি অন্য রাজ্যে ব্যয় হবে সেই অর্থ পশ্চিম বাংলায় ব্যয় হলে শুধু উদ্বাস্তুরাই নয়, সমগ্রভাবে পশ্চিম বাংলার জনজীবনও সমৃদ্ধ ও উপকৃত হতো। সীমান্ত সুরক্ষা নীতির সঙ্গে পুনর্বাসন ব্যবস্থার সংযোগ বিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও শ্রীত্যাগী নীরব। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপাঞ্চলে পুনর্বাসনের নীতি গৃহীত হলেও সেই অঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থার উদ্যোগপর্বের এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মৌখিকভাবে শ্রীত্যাগী পুনর্বাসন ব্যবস্থায় সামরিক উদ্যমের কথা প্রকাশ করেছেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা' কতখানি প্রয়োগ করা হয় সেটাই মূল প্রশ্ন।

ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ

পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটির নেতা ও কর্মীদের ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইনের শুধু অপপ্রয়োগ করেন নি, আইন-শৃংখলা রক্ষার নামে এক গর্হিত অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতরক্ষা আইন চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ রোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে। এই আইন একমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য। কিন্তু যারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহ নীতির পথে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাদের কোন মতেই রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দেওয়া যায় না। সরকার-বিরোধী কাজ আর রাষ্ট্রবিরোধী কাজ এক নয়। 'বাঁচাও কমিটির' নেতৃবর্গ তাঁদের প্রতি ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দের কাছে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণকারী সরকার-বিরোধী সত্যাগ্রহীদের দেশ ও জাতীয়তা-বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে ফেলা শুধু গণতন্ত্রানুসারী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে অপমানকরই নয়,—রাষ্ট্রদ্রোহ ও সরকার-বিরোধিতার অর্থ ও গুরুত্ব যে এক নয়,—সে সম্বন্ধেও জাতীয় সচেতনতাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কোন ক্রমেই ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়,—এ সম্বন্ধে যথাসময়ে কঠোর প্রতিবাদ উত্থিত হওয়া উচিত।

চীনা ব্যাংকের টাকা ও কম্যুনিষ্ট পার্টি

চীন-ভারত সশস্ত্র সংঘাতের সমসময়ে পশ্চিমবঙ্গে চীনা ব্যাংকের লেনদেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বে-আইনী করে এই ব্যাংকের অনেক কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হলেও কলকাতার চীনা ট্রেড কনসালের অফিসের দলিলপত্রের ব্যাপক অগ্নিদহন বন্ধ করতে পারেনি। চীনা দূতাবাসের সঙ্গে চীনা অনুচর রাজনীতিক ও সহযোগীদের অনেক সংবাদ ও সূত্র এইভাবে সরকারী গাফিলতির জন্য বিনষ্ট করতে সুযোগ দেওয়া হয়। চীনা ব্যাংকের হিসাবপত্রের তল্লাস ও সন্ধান করতে ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ দুই বছর লাগিয়েছে। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৬২

সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট পার্টি ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য লাভ করে এই চীনা ব্যাংক থেকে এবং এই টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা নাকি এখনও এক কম্যুনিষ্ট সহযোগীর কাছে গচ্ছিত রয়েছে।

এই সংবাদটি শুধু গুরুতর নয়,—ভারত-চীন সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মকও বটে। ভারতের শত্রুর অর্থে যারা রাজনীতি ও নির্বাচন করে তারা শুধু 'দেশহিতৈষীর' ছদ্মবেশে দেশদ্রোহী নয়,—তাদের অস্তিত্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের পক্ষেও বিপদজনক। এরূপ চৈনিক অনুচরদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভারতের স্বরাষ্ট্র বিভাগের পক্ষে এক আশু ও অপরিহার্য কর্তব্য।

সংযুক্ত সমাজবাদী দল

সম্প্রতি প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি ও সোস্যালিষ্ট পার্টির মিলনে ভারতবর্ষে সমাজবাদী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। গত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে রামগড়ে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির শেষ জাতীয় সম্মেলনে এবং তারই কয়েক-দিনের মধ্যে সোস্যালিষ্ট পার্টির গয়া সম্মেলনে এই সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংযুক্ত দল অতঃপর সংযুক্ত সমাজ-বাদী দল নামে পরিচিত হবে। অন্যান্য অকম্যুনিষ্ট ও সমাজবাদে বিশ্বাসী আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় বিভিন্ন বিরোধী দলগুলিকে এই নূতন দল সমাজবাদী ঐক্যে সংহত হবার আবেদন জানিয়েছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের পেজেন্টস এণ্ড ওয়ার্কাস দল এই সংযুক্তিতে যোগ দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। বাংলা দেশে ফরোয়ার্ড ব্লককেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৯৫৫ সালে প্রজা সোস্যালিষ্ট দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠিত হবার ফলে ভারতবর্ষের সমাজবাদী শক্তি বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যার ফলে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষে সার্থক সমাজবাদী সংগ্রামের সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়লেও, এই দলের পিকিংপন্থী ও তাদের সহযাত্রীরা ভারতবর্ষে অন্তর্বিদ্রোহের ভূমিকা রচনায় বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসও সমাজতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী পোষণের ভূমিকায় প্রতিক্রিয়া-মুখীন প্রবণতার হাতে এখনও বন্দী। এরই মধ্যে অশোক মেহতা ও তার অনুগামীরা সমাজতন্ত্রের উৎস সন্ধানে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, পৃথক সমাজবাদী দল তাদের কাছে অবান্তর হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার মদমত্ততা ও বিরোধী দলের দুর্বলতা, একতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার পরিণতির দিকে কংগ্রেসকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি না দেশে বলিষ্ঠ বিরোধী সমাজবাদী দল গঠিত হয়। সংযুক্ত সমাজবাদী দলের উদ্ভব এই সম্ভাবনাকে বহন করে এনেছে। আমরা এই নূতন দলের শক্তিবৃদ্ধি কামনা করি। ১৪. ৬. ৬৪

ভ্রম সংশোধন

১৩৭১ বৈশাখ সংখ্যা জয়শ্রীর ৩৮ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের অষ্টম লাইনে একটী মারাত্মক ভুল হয়েছে—লাইনটির শুদ্ধ পাঠ হবে "I have a message to the West as Buddha had a message to the East." এই ভুলের জন্য লেখক ও পাঠকদের নিকট ত্রুটী স্বীকার করছি। জ: স:

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

মার্ক্স-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

[১৩৭০ চৈত্র সংখ্যার পর]

মধ্যযুগে ৫ম হইতে ১৭শ শতক পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের প্রভাব য়ুরোপীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। এটা বিশ্বাসের এবং আনুগত্যের যুগ এবং এই যুগে দৈহিককে ছাড়াইয়া আত্মিকের দিকেই য়ুরোপ ঝুঁকিয়াছিল। স্বভাবতই এই যুগে ব্যক্তিতন্ত্র মাথা উঠাইতে পারে নাই। ব্যক্তিগতভোগকে একদিকে মানুষ খৃষ্টধর্মের প্রভাবে দাবাইয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনেও আনুগত্যকে সহজেই বড় করিয়া মানিয়াছে। এই যুগে দাম্পত্য প্রেম ছিল না, বলিলে একদেশদর্শিতা হইবে। পূর্বে প্রেম সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে প্রেম সামাজিক বৃত্তি তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বন্ধনহীন, বিধিনিষেধবর্জিত, উন্মার্গী দেহোন্মাদনাই যদি প্রেম হয় তবে এযুগে সর্বসাধারণের জীবনে তাহা ব্যাপক-ভাবে ছিল না বলিতেই হইবে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন যুগেই কোন সমাজেই একটী মাত্র ধারায় সমাজজীবন প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক সমাজেই কয়েকটী পৃথক ধারা পাশাপাশি চলিতে থাকে; কোন সময়ে কোনটী হয়তো বা প্রবল হইতে পারে। মধ্যযুগের প্রথম অংশে য়ুরোপের সামাজিক ধারাটী মূলতঃ ব্যক্তিতান্ত্রিক ছিল না। (তাই প্রেম বা বিবাহে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। সমষ্টিতন্ত্রের চাপ প্রবল হইয়া ক্রমে পীড়নেও পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তি ছিলনা, ব্যক্তি জীবনে কোনো স্বাতন্ত্র্য সার্থকতাই ছিলনা, এমন কথা সত্য নয়। প্রেমও ছিল বিবাহে কিন্তু সে প্রেমের প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা ভিন্ন স্তরের। মধ্যযুগের নরনারীর জীবনে কেবল যৌনজীবন ছিল, অনুরাগ এবং প্রীতি দ্বারা সেই যৌনজীবন অনুবিদ্ধ ও অনুরঞ্জিত হইতনা ইহা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিরোধী অস্বাভাবিক মতবাদ।

মধ্যযুগীয় প্রেম বলিতেই সাধারণতঃ দৃষ্টি পড়ে নাইটদের পরকীয়া প্রেমের প্রতি। কিন্তু নাইটদের শিভালরী-প্রণোদিত প্রেম যে কামগন্ধ রহিত ছিল তাহা ভুলিলে চলিবে না। ১২শ হইতে ১৫শ শতক য়ুরোপে এই শিভালরীতন্ত্রের যুগ বলা চলে। এই যুগে মানুষ ক্রমে ক্রমে দৈহিকের দিকে বেশী ঝুঁকিতে আরম্ভ করিল। পূর্বযুগের প্রতিক্রিয়া হইয়া এই যুগে একদিকে ব্যক্তিতন্ত্র, অন্যদিকে দেহতন্ত্র ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। ফলে প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রেও এই দুইটী বৈশিষ্ট্য ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন যুগেই কেবল একটী মাত্র প্রণালীতে সমাজজীবন প্রবাহিত হয় না। এই যুগেও নানা স্রোত বহিয়া জীবন প্রবাহকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমের ক্ষেত্রেও একই রীতি এই যুগে সর্বত্র ছিল না। এই যুগেও দেখি তিনটী রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী পাশাপাশি রহিয়াছে। একদিকে ধর্মপ্রভাবিত পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলা চলে

প্রেমের মধ্যেও একটা দেহবর্জী (ascetic strian) দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিরাগী অধ্যাত্মমুখী প্রেমের ও বিবাহের মধ্যে বরাবরই রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে একটা ধারা হইল রোমান্টিক প্রেমের (Platonic strian) দেহবর্জী ধারা। সে দৃষ্টি মানবমনকে কল্পলোকে লইয়া এবং সেখানকার অপার্থিব রঙে-রসে-আলোতে জাগতিক সম্বন্ধকে রূপান্তরিত করিয়া তোলে, সেই দৃষ্টিই রোমান্টিক প্রেমের প্রধান অবদান। কল্পনার ও আপন মনের মালমশলা মিশাইয়া এই প্রেম সাধারণকে অসাধারণ এবং দেহকে দেহাতীত করিয়া তোলে। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতাকে ছাড়াইয়া এই প্রেম আপন কল্পলোকেই বাসা বাঁধে। মধ্যযুগে অতি অল্পকালের জন্য এই এক বিশিষ্ট ধরণের প্রেম য়ুরোপে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই আতিশয্য আপনার ভারেই কল্পলোক হইতে একেবারে পথের ধূলিতে নামিয়া আসিল। অতিরিক্ত কাল্পনিকতার প্রতিশোধ মানবপ্রকৃতি উঠাইল অতিরিক্ত দেহ-লোলুপতার বিকৃততর ধারা। শিভালরীতন্ত্রে এই রোমান্টিক প্রেমের পাশাপাশি তৃতীয় ধারাটী হইল ইন্দ্রিয়পর দৈহিক প্রেমের ধারা। কোনো যুগেই এই ধারাটীর বিলুপ্তি ঘটে নাই মানবসমাজে। চিরকালই দৈহিক স্তরে প্রেমের একটা প্রকাশ বাঁচিয়া ছিল। কখনো প্রবল হইয়াছে, কখনো মৃদু। কিন্তু আছে সর্বকালে।

মধ্যযুগেও এই তিনটী ধারাই ছিল। যাহারা বলে, মধ্য-যুগ শিভালরীকী প্রেমের যুগ, তাহারা একদেশদর্শী। যাহারা বলে, মধ্যযুগ কেবলি দৈহিক প্রেমের যুগ তাহারাও ভুল। যারা মধ্যযুগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বর্ণযুগ বলেন, তাঁরাও ভুল। শিভালরীকী প্রেম একটা অস্বাভাবিক পরিণতি যাহা সেকালের য়ুরোপের বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি। এই তিনটী ধারার প্রতিনিধি তিনটী বিখ্যাত বইকে ধরা চলে। দান্তের বিখ্যাত 'Divine Comedy'কে দেহবিরাগী প্রেমের প্রতিনিধি বলা যায়। দান্তে-বিয়াত্রিস প্রেম এবং কিছু অংশে পেট্রার্ক লরা (Petrach-Laura) প্রেম এই অতীন্দ্রিয় স্তরের। শিভালরীকী প্রেমের নমুনা পাই ১৩ শতকের 'Roman de la Rose' নামক লরিস্ রচিত (Guillaume de Lorris) রূপক-কাহিনীর প্রথম খণ্ডে। এখানে পাই বিশুদ্ধ, উদার, মধুর, রোমান্টিক প্রেমের চিত্র। শিভালরীকী রীতির যে আইন-কানুন ১২, ১৩ শতকে গড়িয়া উঠিয়াছিল ("Regulations of the court of Love") তাহার বিকৃতি পাওয়া যায় Andre Chapalain নামক পণ্ডিতের 'De Amore' নামক বইয়ে। প্রেমরীতির ৩১টী আইন ইনি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় আইন হইল: "একজনের জন্য এবং চিরকালের জন্য প্রেম" (Love for one and for ever) এজন্যই শিভালরী কী প্রেমকে ব্যভিচারমুখী বলিয়াছেন তাহা নয়। প্রথম অবস্থায় ইহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ ও দেহাতীত ছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে ইহার বিকৃতি ঘটিয়া অস্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় ধারাটার চিত্র পাওয়া যায় এই পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ডে। এই খণ্ডের রচয়িতা Jean de Meung (Roman de la Rose by Jean de Meung). এই বইয়ে যে প্রেম পাই তাহা দৈহিক প্রেম: কামকে, ইন্দ্রিয়কে, রক্তমাংসকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রেম দৈহিক স্তরে রূপ পাইয়াছে। যৌন আবেদনই ইহার সার এবং প্রেম এখানে দেহতত্ত্ব (Physiology).

কাজেই মধ্যযুগে প্রেম ছিল না শুধু ব্যভিচার ছিল, এই মত ভ্রান্ত। সকল যুগেই আদর্শের বিকৃতি ঘটিয়া ব্যভিচারের অস্তিত্ব ছিল, ইহা ইতিহাসসম্মত কথা। প্রটেষ্টান্ট ধর্মের আবির্ভাবে মানুষ এবং দাম্পত্য প্রেম দুইই নতুন মর্যাদা পাইল। পূর্বযুগের বিকৃতি ষোড়শ শতকে শেষ হয়। ব্যক্তি-তন্ত্র সমাজে দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবল হইতে থাকে। মানুষের মন নতুন সামঞ্জস্যের সন্ধানী হয়। শিভালরী যুগের বিকৃতিকে এবং মঠে-চার্চে মহান্ত পাদ্রীদেরও জীবনের বিকৃতিকে সংশোধন

করিয়া সমাজে বৈবাহিক রীতি আবার নতুন করিয়া দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে রূপ নিল। এই যুগকে আধুনিক যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের একবিবাহ ৪০০ বছরের বিবর্তনের ফলে যে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এঙ্গেল্‌স ব্যঙ্গ করিয়া 'গণিকাবৃত্তি' বলিয়াছেন। বিশেষতঃ আজীবনব্যাপী এক-বিবাহ তাঁহার মতে গণিকাবৃত্তিরই তুল্য; ["sells it (body) once and for all into slavery" (83) Engels]. বুর্জোয়া একবিবাহে স্বামীর প্রাধান্য কারণ পত্নীর ধনসম্পত্তিতে অধিকার নাই। এইজন্য বিবাহকে দেহ-বিক্রী বলিয়াছেন।

বিবাহের এই বর্ণনা বা ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত নয়; ইহা রাজনৈতিক প্রচারনা। প্রথম আলোচ্য হইল এই, প্রেম বস্তুটা কি? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার মধ্যে নানা উপাদান মিশ্রিত হইয়াছে। বিবাহও জটিল। অর্থ, প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা, ব্যক্তিগত রূপ ও গুণ, প্রভৃতির প্রভাব মনের উপর, তথা যৌন আকর্ষণের উপরে সর্বদাই রহিয়াছে। ব্যক্তিক আকর্ষণ অকারণে হয় না; তাহার কোন-না-কোন কারণ থাকে। এইসব কারণই যৌন কারণ নয়। নানা বাহ্য factorর সূত্রধরিয়া মনপ্রবাহিত হইয়া অপরের প্রতি উন্মুখ হয়। প্রেম একটা মিশ্রবৃত্তি। বিশুদ্ধ অবিমিশ্র প্রেম বলিয়া কিছু সাধারণতঃ নাই। বাহ্য অবস্থাগুলি এবং রূপ, গুণ, অর্থ, মর্য্যাদা, ইত্যাদি বাহ্য factorকে অবলম্বন করিয়াও মানুষ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কাজেই বুর্জোয়াপুরুষের হাতে ধনসম্পত্তি আছে বলিয়াই প্রেম কলুষিত হইয়া উঠিল এবং বিবাহটা "দেহবিক্রী" তে পরিণত হইল, ইহা যুক্তিসম্মত নয়। বাহ্যবস্তু ও অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া যেমন প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে, বাহ্য পরিস্থিতি নিরপেক্ষ ভাবে কিংবা পরিস্থিতির সহিত বিরোধেও প্রেম সৃষ্টি হইতে পারে। অর্থ-মর্য্যাদা-রূপ ইত্যাদি যেমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে, অর্থ মর্য্যাদা-রূপ-গুণের অভাবেও প্রেম উদ্ভূত হইতে পারে। অর্থব্যবস্থা বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার যদি পুরুষের হাতে থাকে, তাহা হইলেই বিবাহিতা পত্নীর মনে প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না, এই কল্পনা উদ্ভট।

প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মনুষ্য যেমন প্রেমকে মূল্য দেয়, তেমনি মানুষ সন্তানসমৃদ্ধিকে, ঐশ্বর্য্যকে, সামাজিক মর্য্যাদাকেও মূল্য দেয়। মানুষের নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধের (sense of value) রাজ্যে-এই সব মূল্যেরই স্থান আছে। কোন মানুষের প্রেম যদি কামনীয় হয় তার সাথে অন্য কামনাও মিশ্রিত থাকিতে পারে। প্রেমের সহিত যদি সামাজিক মর্য্যাদা বা ঐশ্বর্য ভোগসুখ কেহ চাহে তাহা হইলেই কি বলিব যে, প্রেমের সাহিত ঐহিক প্রাপ্তির (consideration) আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, অতএব ইহা 'দেহ-বিক্রয়' বা 'গণিকাবৃত্তি'? প্রেমের সহিত অর্থাকাঙ্খার কোন বিরোধ নাই কিন্তু অচ্ছেদ্য সম্পর্কও নাই। প্রেম দারিদ্র্য ব্রতীও হইতে পারে, সমৃদ্ধিকাম-ও হইতে পারে। প্রেম মিশ্র বৃত্তি, ইহার সহিত অন্য বহু কামনাও জড়িত থাকিতে পারে। অন্য কামনা বা কোন প্রকার প্রাপ্তির আশা করিলেই তাহা "selling it" বা বেচাকেনা বা ব্যবসার পর্য্যায়ে পড়িবে, তাহা একেবারে অযৌক্তিক।

আসলে প্রেম অন্যান্য বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে। এই সামঞ্জস্য এক এক যুগে এক এক রকম হয়। প্রতি যুগের প্রমূল্যবোধ বা sense of values র উপরে এই সামঞ্জস্য নির্ভর করে। তাই প্রেমের কল্পনা যুগে যুগে বিভিন্ন। এক যুগে যাহা আদর্শ প্রেম, অন্য যুগের রুচি ও মূল্যবোধের কাছে তাহা নিম্ন স্তরের। একই যুগাদর্শের মধ্যেও আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রেমের আদর্শে পার্থক্য হয়; তাহার কারণ প্রতি ব্যক্তিরই একটা বিশেষ প্রমূল্য-সাম্য বা balance of values থাকে।

প্রেমের দীর্ঘস্থায়িত্ব নির্ভর করে কতকগুলি ইতিমূলক এবং কতকগুলি নেতিমূলক অবস্থার উপর। এই সব সহায়ক

অবস্থা বা factor না থাকলে প্রেম বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বিরোধী অবস্থা যদি পীড়া না দেয় তবেই প্রেম বহাল থাকিতে পারে। জৈবিক প্রয়োজনের চাপ প্রেমকে মারিয়া ফেলিতে পারে। অর্থাভাব ও মর্যাদাভাবও প্রেমের হানিকর। জৈবিক প্রয়োজন এবং সামাজিক মর্যাদাবোধ যদি ক্ষুণ্ণ না হয় তবে যে-কোন শ্রেণী, সমাজ বা অবস্থায় প্রেম সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। যুগে যুগে সমাজ সাম্যের ও যুগাদর্শের বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মর্যাদাবোধও বদলায়। বর্তমান যুগে ব্যক্তিতন্ত্র ও ঐহিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে মানুষের মন প্রখর ভাবে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন সংগ্রাম তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াও ঐহিক তুষ্টির মূল্য এ যুগের কাছে বেশী। শুধু তাই-নয়, ব্যক্তির মর্য্যাদা সম্বন্ধে মূল্যবোধ বদলাইয়াছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই তাই সাম্য ও স্বাধীনতার ডাক উঠিয়াছে। কাজেই বিবাহ ও প্রেমের ক্ষেত্রেও সাম্য-স্বাধীনতার বাণী মানুষকে নাড়া দিয়াছে। তাই আজ নতুন মূল্যবোধের আলোকে নতুন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন পড়িয়াছে। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যেও নতুন সামঞ্জস্য চাই। প্রেম সামাজিক বৃত্তিও বটে। তাই সমাজবোধে মানুষের পরিবর্তন হওয়ার ফলে প্রেমের পরিকল্পনায়ও তদনুযায়ী কিছু অদল বদল হইবেই। কারণ এক্ষেত্রেও পারস্পারিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া বা Law of Functional Interactionর প্রভাব রহিয়াছে। তাই বলিয়া এ যুগের "প্রেম" কিম্ভূতকিমাকার, অভূতপূর্ব কিছু আজব বস্তুতে পরিণত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। মানব-মনের ও সমাজের প্রমূল্য-লোকেও (world of values) একটা পৌর্বাপর্য্য, একটা মৌলিক ও শাশ্বত সত্তা (persistence-value) থাকে। সকল অদল-বদল, সকল প্রবাহের ও চঞ্চলতার পশ্চাতে একটা স্থায়ী পটভূমি, একটা সর্বমানবিক সাধারণ ভিত্তিপট থাকে। প্রেমের বেলায়ও এই সত্য অক্ষুণ্ণ। তাই সকল যুগেই নরনারী প্রেমের দ্বারা জীবনকে রসমধুর করিয়াছে; সকল অবস্থায়ই মানুষ সকল প্রকার অসঙ্গতিকে প্রেমের প্রাচুর্য্য দ্বারা সুসহ এবং সুসঙ্গত করিয়া লইয়াছে।

কাজেই প্রেম কেবল বিশেষ কোন শ্রেণীর একচেটিয়া, ধনী বা বুর্জোয়ার প্রেম নাই, শ্রমিকেরই প্রেম সম্ভব, এঙ্গেল্সের এই মত চরম অর্থবাদী ব্যাখ্যার ফল। যেমন, নিগ্রোর প্রেম অসম্ভব এবং আর্য্যেরই প্রেম একচেটিয়া, এই বংশবাদী ব্যাখ্যাও আজ অচল, তেমনি য়ুরোপের প্রেম সত্যিকার প্রেম এবং এশিয়ার বেলায় ঝুঁটা প্রেম, এই ভৌগলিক ব্যাখ্যাও হাস্যকর। প্রেমকে ভূগোল, অর্থনীতি, বংশ, কোন একটী দ্বারাই শৃঙ্খলিত করিয়া একবাদী ব্যাখ্যা করিলে আজিকার বিজ্ঞানে তাহা অচল। একথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে।

আর একটী কথা রহিয়াছে। এঙ্গেল্স্ প্রেমের কথা বলিতে গিয়া কার্য্যতঃ যৌন প্রেমের কথাই বলিতেছেন। প্রেম এই মতে শুধু বিশুদ্ধ যৌনবৃত্তি। বিবাহের উপর জোর ইহারা দেন না, জোর দেন ব্যক্তিক যৌন প্রেমের উপর। যদি প্রেমই বিবাহের ভিত্তি হয় তবে তো অন্য সামাজিক দিক, গুলি হিসাবে আনার কোন দরকারই হয় না। অর্থ, মর্য্যাদা, সমাজরক্ষা, সন্তানসম্পদ, প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক দিকগুলি তাহা হইলে নিরর্থক, অন্ততঃ নিতান্ত গৌন, হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে শ্রমিক বুর্জোয়ার পার্থক্যও অপ্রাসঙ্গিক এবং পুরুষপ্রাধান্য বা নারীপ্রাধান্যও মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। প্রেম নিছক কামে আসিয়া দাঁড়ায় এবং শয্যাঘরকে কেন্দ্র করিয়াই ('bed-room-affair') প্রেম বিগ্রহ ধারণ করে।

তারপরে বিবাহ। বিবাহ কি শুধু যৌন প্রেমেরই বন্ধন? শুধু ব্যক্তির সুখের বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা? এই উগ্রব্যক্তিবাদ অন্ততঃ আমার সমাজে অচল। বিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান, দুই একসঙ্গে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেমন বিরোধ নাই, অথচ একটা সমন্বয় স্থাপন অত্যাবশ্যক, তেমনি বিবাহ ব্যক্তিজীবনের সার্থকতার সহিত

সমাজজীবনের কল্যাণের একটা সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা। ইহার মধ্য দিয়া যেমন ব্যক্তির প্রেম, সন্তান কামনা, বাৎসল্য, বংশ রক্ষা, আস্বাদের প্রভৃতি সফলতা লাভ করে, তেমনি সমাজের অগণিত লোকের মঙ্গল, সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যবস্থা, এসবও বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সার্থক হয়। এই কারণে সামাজিক কল্যাণের চতুঃসীমার মধ্যে বিবাহকে সার্থক হইতে হইবে। বিবাহ তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহাকে শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত আনন্দের যন্ত্র বা বাহন করিলে ইহা সমাজধ্বংসী অকল্যাণে পরিণত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে পিষিয়া মারিয়া ব্যক্তির আনন্দ ও অন্তরঙ্গ জীবনকে দলিত করিয়া সমাজ বিবাহকে ষোলআনা সামাজিক করিয়া রাখিবে তাহাও একদেশদর্শী আতিশয্য। ব্যক্তির আনন্দ ও আত্মবিকাশের সহিত সমাজবিবর্তনের সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রতিযুগে বিবাহপ্রথার রূপ দিতে হইবে।

প্রেমের সহিত বিবাহের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক এই যে, প্রেমও বিবাহের মৌলিক একটা উপাদান। ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যদি প্রেমের অভাব ঘটে তবে বিবাহ-প্রতিষ্ঠান অসার্থক হইয়া উঠিবে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই ব্যাহত করিবে। কিন্তু প্রেম ছাড়া অন্যান্য উপাদানও বিবাহের অঙ্গীভূত আছে। সন্তান পালন, অর্থনীতি, সমাজ-কল্যাণ, ইত্যাদি দিকগুলিও ইহার সহিত আছে। এই দৃষ্টিতে শুধুই প্রেমকে ভিত্তি করিয়া বিবাহ প্রতিষ্ঠান সফল হইতে পারে না।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল আজ বিবাহ ও প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুধু সমাজ মঙ্গলের ভিত্তির উপরেই বিবাহকে গড়িতে চাহেন। বর্তমানে প্রজনন-বিজ্ঞানও (Eugenics) বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। তাই যৌনজীবনকে, এবং ব্যক্তির জীবনে সন্তানধারণ ও পালনকে ইহারা বৈজ্ঞানিকভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত করিতে চাহেন। সমাজে কে কাহাকে বিবাহ করিবে, যৌনজীবনে কাহার সহিত কাহার সুসঙ্গতি (compatibility) আছে ইত্যাদি ব্যাপার কেবল ব্যক্তির খেয়ালের উপরে না রাখিয়া সমাজ বা রাষ্ট্র ঠিক করিয়া দিবে। ইহাদের মতে বিবাহে প্রেমের স্থান নাই।

এঙ্গেল্‌স্‌ ও মার্ক্সবাদী যেমন প্রেমকেই বিবাহের একমাত্র ভিত্তি করিতে চহেন, তেমনি প্রজনন বিজ্ঞান প্রেমকে একেবারেই বাদদিয়া চলিবার মত প্রবর্তন করিতেছে। এই দুই মতই চরম একদেশদর্শী। বিবাহ কেবল ভাববৃত্তির (emotion) সৃষ্ট নয়, বিবাহ কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্বার্থের বাহন ও নয়। রাসেল এই দুই চরমের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব এই: বিবাহ থকুক সন্তান-প্রজননের জন্য; কিন্তু প্রেম দরকার হইলে, স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যপুরুষ বা স্ত্রীর জন্য থাকিবে। অতিবৈবাহিক (extra-marital) যৌন সঙ্গমের দ্বারা প্রেমতৃষ্ণাকে মিটাবার অধিকার বিবাহিত দম্পতির থাকা উচিৎ, এই ইহার মত। রাসেলও প্রয়োজন হইলে বিবাহ ও প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাহেন। কিন্তু এই সব মতের সমর্থনে যেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, তেমনি ব্যক্তিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ডেও এই সব মত অবাস্তব এবং একদেশদর্শী প্রমাণ হয়। কেবল প্রজনন বিদ্যায়ই নয়, মনস্তত্ত্বে ও সমাজতত্ত্বেরও বিবাহের রূপ নির্দ্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে এবং থাকিবে। এইদিক হইতে বিবাহকে ব্যক্তি ও সমাজের আর্থিক, জৈবিক, ভাবগত (emotional), সামাজিক সর্বপ্রকারের সার্থকতার উপায় এবং পন্থা বলিয়া পরিকল্পনা করাই আদর্শসম্মত এবং বিজ্ঞানস্বীকৃত।

একটা কথা বাকি রহিয়াছে। বিবাহের সাধারণ দুইটী রীতি প্রচলিত আছে, সম্প্রদান (match making) এবং স্বয়ংবরণ (choice)। এই দুইরীতিই কমবেশী সর্বত্র প্রচলিত আছে। এঙ্গেল্‌স্‌ চরম ব্যক্তিবাদের উপর জোর দিয়াছেন বলিয়া ব্যক্তির ইচ্ছাকেই সবার বড় করিয়াছেন।

["That the mutual affection of the people concerned should be the one paramount reason for marriage, outweighing everything else…" (93) Engles] তাঁহার মতে স্বয়ংবৃত পাত্রপাত্রী না হইলে প্রেম হইতে পারে না। যাহারা বিবাহে সমাজকল্যাণকেই বড় করিয়াছেন তাঁহারা সম্প্রদান-পদ্ধতিকেও প্রেমের বিরোধী বা পরিপন্থী মনে করেন না। ভারতবর্ষে এইরীতি সমাজ-তাত্ত্বিকেরা প্রাচীন যুগ হইতেই প্রচলন করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদের সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল এই যে, প্রেম বৃত্তিকে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করিয়া অনেক পরিমাণে জাত ও বিকশিত হইতে সহায়ত করা চলে। যৌবন কালই প্রেম-বৃত্তির প্রকৃতিনির্দিষ্ট উদ্ভবকাল। যৌবনাগমের পূর্বে বিবাহ দিলে প্রেমবৃত্তির পল্লবিত হইবার একটা অবলম্বন ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে মনোবৃত্তিকে প্রবাহিত হইবার একটা সহায়ক প্রণালী দেওয়া হয়। বিবাহের পরে বিবাহদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রেম বিকশিত হয়। এক্ষেত্রে কি "প্রেম" হয় না ? বিবাহের পরে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে প্রেম হইতে পারে না, এই মত বাস্তবতথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এই রীতি আধুনিক পাশ্চাত্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আগে বিবাহ, পরে প্রেম, এই রীতি প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষ সমাজে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। কোন্ রীতি শ্রেষ্ঠ ও বর্তমান কালোপযোগী, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে শুধু বক্তব্য এই যে স্বয়ং বরণের অধিকার যদি নির্বিশেষ এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্তির না থাকে তবে 'প্রেম' ও 'বিবাহ' একেবারে অসম্ভব এবং ষোল আনা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়, এবং আদিমকাল হইতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অদ্য পর্যন্ত 'প্রেম' বলিয়া কিছু ছিলনা এবং নাই,—এঙ্গেল্‌সের এই মতের কোন ভিত্তি নাই। সতীত্ব কোন একটা বিশেষ স্তরে হঠাৎ আর্থিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আর্থিক কারণে একবিবাহ প্রেমহীন হইতে বাধ্য, এই মার্ক্সবাদী মত ইতিহাস ও বিজ্ঞানেরবিরোধী। ব্যক্তিতন্ত্রের প্রসারের ফলে নারী আন্দোলন এবং নারী প্রগতিও এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে এঙ্গেল্‌স্ কথিত আর্থিক স্বাধীনতাও পাশ্চাত্যে আজ বহু পরিমাণে নারীর জীবনে আসিয়াছে। তাহার ফলেই যে একবিবাহ পাশ্চাত্যে খুব প্রেম-সমৃদ্ধ এবং সফল হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অর্থনীতিই প্রেমের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয় ; বহুদিকের ও অবস্থার সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যই প্রেম ও বিবাহকে সার্থকতায় পূর্ণতা দান করিতে পারে, বাস্তব পরিস্থিতি ও বিজ্ঞান এই কথাই আজ বলিতেছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা

বিনয়কুমার সরকার

লোকেরা জানে,—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা ছিল কলেজ স্কোয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরগুলার কোনো কুঠ্‌রিতে। তাঁহার পরলোকগমনের পর আজ আট বৎসর কাটিল। এতদিনে তাঁহার কার্য্যাবলী নতুন চোখে দেখিতে আর যুবক বাঙ্গালার ঘাট-পড়কে তাঁহার আসল ঠিকানা চুঁড়িয়া বাহির করিতে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

শত শত যুবক আশুতোষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিল। ছোক্‌রা বন্ধুদের দলে আশুতোষ অত্যন্ত আরাম অনুভব করিতেন। মনে রাখা উচিত যে, যেসব যুবক তাঁহার কাছে অগ্রসর হইত, তাহাদের প্রত্যেকেই যে চাকরির প্রার্থনা অথবা ঐ 'ধরণে'র কোন সাংসারিক অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইত, তাহা নয়। কিন্তু যাহারা কাগজে কলমে কোন সাংসারিক অনুরোধ জানাইত, অথবা সাংসারিক সুখ-সুবিধার বাসনা মনে মনে পুষিত, তাহাদেরকেও আশুতোষ পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি হিসাবেই দেখিতেন। তাহাদের কাছ হইতে নতুন নতুন প্রচেষ্টার নতুন নতুন মতলব আশুতোষ সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। কর্ম্মিৎকর্ম্মা যুবকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই যে আশুতোষ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে যে সব রাষ্ট্রিক কর্ম্মবীর বাংলার সমাজ জীবনে দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ—আশুতোষের মত যৌবন-ধর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ছেলেদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিতেন। এইজন্য, যুবকদের সঙ্গে আশুতোষের ঘনিষ্ঠ লেনদেনকে একটা বিস্ময়কর ও অসাধারণ কাণ্ড বলিয়া মনে করিলে অনেকে আশ্চর্য হইবে না।

১৯০৫ হইতে ১৯২৫ সন পর্যন্ত বিশ বৎসর,—স্বদেশীর এই গৌরবময় যুগে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ত্রি-বীর। তাঁহারা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কর্ম্মপ্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের তিনজনেরই জীবনী-শক্তির উৎস ছিল একপ্রকার। যাহারা কাঁচা, নবীন ও অনভিজ্ঞ, তাহাদের নিঃসঙ্কোচ ও অফুরন্ত আব্‌দারগুলার সহিত নিরবচ্ছিন্ন ও সক্রিয় সংস্পর্শই এই ত্রি-বীরের জীবন সত্তার আসল উপাদান। যে যুবক-বাংলা অজানা পথে দুর্গম যাত্রায় বাহির হইয়াছে এবং নয়া নয়া রাজ্য-জয়ে রত, সেই যুবক-বাংলার পায়েই এই তিন কর্ম্মবীর তাঁহাদের মেধা ও শক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

প্রধানতঃ, এমন কি একমাত্র ইস্কুল-পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজকর্মে ওস্তাদ বলিয়াই আশুতোষ সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে স্বজাতিনিষ্ঠ ও স্বদেশ প্রেমিক। কথাটা এরূপ ভাবেও বলা চলে যে, স্বজাতিনিষ্ঠ ও স্বদেশ সেবক হিসাবে যে শক্তিস্রোত আশুতোষের চিত্তে প্রবাহিত হইত, সেই শক্তিস্রোতই লেখা-পড়া সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদ হিসাবে আশুতোষের জীবনে মূর্ত্তি—লাভ করিয়াছিল। বাজারে সুপ্রচলিত ইস্কুলমাস্টারী বিদ্যার ওস্তাদি করা আশুতোষের স্বধর্ম ছিলনা। তাঁহার

শিক্ষা বিষয়ক কর্ম্মনীতি ও চিন্তাপ্রণালী ছিল এক বিরাট গঠনমূলক স্বদেশ সেবার অন্যতম বনিয়াদ।

শিক্ষার সংস্কারক হিসাবে তাঁহার চেষ্টাচরিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? তাহা এই যে, বাঙালীর সাধনাকে মৌলিক, স্ব নিয়ন্ত্রিত, সর্বগ্রাসী ও সৃষ্টিশীল বিশ্বশক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। যুবক বাংলা দুনিয়ার শক্তিগুলার মধ্যে এক নতুন শক্তিরূপে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সমানে সমানে, এবং পূরব-পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক, আর্থিক ও সামাজিক ধুরন্ধরদের সহিত সহযোগীর ন্যায় চলা-ফেরা করে,— লেখা-পড়ার ওস্তাদ ও দেশভক্ত হিসাবে ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। এরূপ বাসনায় আশুতোষ বর্ত্তমান বাংলায় মাত্র আর একজন সমধর্ম্মী পাইয়াছেন—তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ। এইখানে প্রসঙ্গত: বলিয়া রাখি যে, আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—সরকারী বা সামাজিক হিসাবে,—কখনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করাতে আশুতোষের একটা প্রধান কথা বিশেষভাবে মনে পড়িয়া গেল। বাংলাদেশে রাম-মোহনের সময় হইতে যে সব বড়লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পয়লা নম্বরের, তাঁহাদের ভিতর আশুতোষই বোধহয় একমাত্র লোক যিনি সাগর পাড়ি দেন নাই এবং বর্ত্তমান দুনিয়ার গড়ন ও গতিভঙ্গী নিজের চোখে দেখিয়া আসেন নাই। তবুও ভারতবাসীর জীবন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমূহকে আধুনিক করিয়া তোলার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আশুতোষের দৃঢ়বিশ্বাস যতটা ছিল, আমাদের কোনো সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রসাধক ও শিক্ষা প্রচারকের মধ্যে তাহার চেয়ে বেশী ছিলনা।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি। ১৯০৭ সনে—বর্ত্তমান লেখক যখন উনিশের কোঠা পার হন নাই, তখন অনেকবার আশুতোষের সহিত প্রাণখোলা আলাপের সুযোগ জুটিয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা, স্বরাজ, দেশহিত এবং সামাজিক ও আর্থিক নানা কথা লইয়া তর্কাতর্কি চলিত। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার মুখ হইতে এই কয়টী বিদ্রূপাত্মক কথা বাহির হয়—"একশো দেড়শো বছর আগে আমাদের ঠাকুরদাদারা কি ক'রতো জানিস? তারা দুপাতা ফারসী প'ড়তো আর খড়ম পায়ে দিয়ে বেড়াতো। এই তো ছিল সেকালে আমাদের দৌড়!"

প্রাচীন সভ্যতার অথবা মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান আদর্শের রঙফলানো গোলাপী বর্ণনায় হতভম্ব বনিবার মত পাত্র আশুতোষ ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি বিদ্যাসাগরের মত আশুতোষেরও বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু, আধুনিক ভারতীয় চিত্তকে কর্ম্মক্ষম করিবার উপায় হিসাবে সংস্কৃত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বিদ্যাসাগর খোলাখুলি স্বীকার করিতেন। বিদ্যাসাগরের মস্তিষ্ক ছিল বস্তুনিষ্ঠ। আশুতোষের মগজও ঠিক এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ মগজ ছিল। বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আশুতোষ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতীত বা মধ্যযুগের কোন নিন্দাপ্রচার থাকিত না। বরং ভারতের অতীত ও মধ্যযুগকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা তিনি বিশেষ রূপেই বুঝিতেন। তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজে আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যোগাইবার ইচ্ছা এবং লেখাপড়ায় ও জীবনের কাজকর্ম্মে বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ঢোকাইবার বাসনা-জনিত উৎসাহই আশুতোষের সারা মনপ্রাণকে পাইয়া বসিয়াছিল।

সেকালে তাঁহাকে লোকেরা সাদাসিধা "ভবানীপুরের আশুবাবু" বলিয়া জানিত। সাদাসিধা বলিয়া তিনি "সেকেলে" লোক ছিলেন না। বরং বর্ত্তমান-নিষ্ঠায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন বলিয়াই বিশ্বশক্তির ঘাত প্রতিঘাতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সজাগ। সেইজন্য, যখনই সুযোগ উপস্থিত হইল তখনই ইয়োরামেরিকা ও জাপানের সম্পদ লুটিবার দিকে তাঁহার ঝোঁক খেলিল। হার্ভার্ড, লণ্ডন, প্যারিস,

বার্লিন, রোম ও তোকিওতে যে সব মাল পাওয়া সম্ভব, তাহা ভারতের স্বার্থে কিরূপে কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা চলিতে থাকিল।

আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা এইখানেই থামে নাই। বিশ্বশক্তির নানা ধারাকে যুবক ভারতের জাতিগঠকদের সংস্পর্শে আনিয়া, আর ভারতবাসীর সহিত ভারতের বাহিরের শিক্ষা ও সাধনার একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই তিনি কাজ খতম করেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, এই আদান প্রদান যেন সমানে সমানে চলে। ভারতের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, বিদেশীদের সহিত বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক সংস্পর্শে আসিবার সময় ভারত সন্তানেরা সমকক্ষের মত লেন দেন চালাইবে, ইহাই তাঁহার জীবনীরক্তের উপাদানস্বরূপ ছিল। বিদেশীদের সঙ্গে ভারতবাসীর সাম্যবিষয়ক চিন্তা তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি যোগাইয়াছিল।

স্বদেশী যুগের প্রথম দিককার আর খানিকটা কথায় আশুতোষের মানসিক ও নৈতিক গড়নকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারা যায়। তাঁহার স্বাভাবিক 'যুদ্ধং দেহি' ভাব লইয়া একবার তিনি বলিয়াছিলেন "তোদের জাতীয় নেতারা, আজকালকার স্বদেশীওয়ালারা, সিমলা বা দার্জ্জিলিং এমন কি কলিকাতার রাস্তায়ও, ধুতি প রে চটিজুতা পায়ে বেরুতে সাহস করে না, পাছে তাদের সাহেব বন্ধুরা দেখে ফেলে। কিন্তু বামুনের বাচ্চা আমি, সাহেবদের কাছে আমি পৈতা দেখাতে কখনও সঙ্কুচিত হইনি। তোদের নেতারা যেমন ভীরু, তারা সাহেবদের কাছে সম্মানের দাবীই বা ক'রবে কি করে. অথবা, যুবক বাংলার মনকে দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রবেই বা কি করে, কিংবা আধুনিক জগতের শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে যুবকদের মনে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাবই বা ঢোকাবে কেমন ক'রে?" এই কথাগুলির মধ্যে বড় তেতো সত্য নিহিত আছে। অনেক বছর পরে, তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষার জোরে কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক যুগান্তর সৃষ্ট হয়, তাহার আভাস এই কড়া বাণীর ভিতর পাওয়া যায়।

যুবক বাংলার মস্তিষ্কজীবীরা হীনতার চরিত্র ও দৈন্যকে পদাঘাত করিবে ও ইয়োরোপ আমেরিকা ও জাপানের মস্তিষ্ক জীবীদের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া চলিবে, ইহা তাঁহার আশার অন্তর্গত ছিল। জীবনের নানাক্ষেত্রে একটার পর একটা করিয়া ক্রমাগত প্রথম শ্রেণীর কাজ দেখাইয়া তিনি যুবক বাংলার মনো-রাজ্য হইতে ক্লৈব্য ও দীনতা একদম নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তিনি নিজ দেশবাসীর মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতার কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেন। ভারতের যুবক ও বয়োবৃদ্ধেরা বিদেশী মস্তিষ্ক জীবীদেরকে যে মহা-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা আধাদেবতা বা আস্ত অবতার বিশেষরূপে পূজা করিয়া থাকে, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। বিদেশী পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট ও পরিচয়-পত্রকে যে ভারতীয় সুধীরা অতি-কিছু সমঝিয়া থাকেন আর সার্টিফিকেট-দাতা দিগকে উচ্চশ্রেণীর প্রভু হিসাবে প্রণাম করিতে অভ্যস্ত তাহা আশুতোষ চোখের দিনরাত দেখিতেন। পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের বইগুলার সারমর্ম্ম তৈয়ার করাই ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে তাঁহাদের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করেন তাহাও তাঁহার ভালরূপ জানা ছিল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মাথার ঘী যেরূপ, তাহাতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিতে অপারগ আর দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজলিশে সমান আসনের দাবী করা যে তাঁহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, তাহা বুঝিতে তাঁহার সময় লাগিত না। ধুতি সম্বন্ধে তাঁহার দেশবাসীর মনোভাবে তিনি যে কাপুরুষতা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাদের নিজমাথার ঘীর কদর বোঝা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ একটা সার্ব্বজনিক কাপুরুষতা লক্ষ্য করিতেন। আশুতোষের মহত্ত্ব মাপিতে হইলে দেখিতে হইবে হয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষার

উচ্চতা না হয় তাঁহার স্বদেশবাসীর কাপুরুষতা ও আত্মিক দৈন্য।

আশুতোষের জীবন তেমন দীর্ঘ ছিলনা বলিয়া তাঁহার জীবন-স্বপ্নকে কাজে পরিণত করিবার জন্য নিতান্ত প্রাথমিক প্রথম ধাপটি ছাড়া তিনি আর কিছু করিতে পারেন নাই। বদান্য-বীর রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহারই ধরণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার সমসাময়িকেরা এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ এবং অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেন। যখন আমাদের দেশের লোকেরা এম্-এ, এম-এস্-সি পাশের পরবর্ত্তী ধাপের জন্য বিস্তৃত ও নিয়মিতভাবে পড়াশুনা ও অনুসন্ধান-গবেষণার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইবে, তখনব্যক্তিগত কীর্ত্তির দিক হইতে ইয়োরোমেরিকার প্রথমশ্রেণীর শক্তিগুলার ও জাপানের সঙ্গে সমান হওয়ারূপ আশুতোষের স্বপ্ন কাজে পরিণত করিবার প্রথম ধাপটা আমাদের আটপৌরে জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণত হইবে। যুবকবাংলায় আশুতোষের যে সব ভক্ত ও উপাসক আছেন, তাঁহারা এই কথাটা দিন-কতক বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে সচেষ্ট হউন।

আশুতোষের সময় উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহে এবং সমাজ জীবনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলায় বাংলাভাষার প্রতি অসম্মান, এমনকি ঘৃণা দেখানো হইত। তাঁহার ছোটবড় সকল সহকর্মীর মধ্যেই নিজেকে খাটো ভাবা-রূপ যে দুর্ব্বলতা ছিল, উহা তাহারই অন্যতম প্রকাশ। দেশবাসীর এই দুর্ব্বলতার জন্যও আশুতোষ তীব্র ব্যথা অনুভব করিতেন। সুতরাং যখন তিনি বাঙালীর ধুতির আদর ও বাঙালী মস্তিষ্কজীবীর আত্মসম্মান বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার ইজ্জত প্রচার করিতে থাকিলেন তখন তাঁহার মতলব ছিল বাঙালী জাতির শিরদাঁড়াকে শক্ত করিয়া তোলা, আর বাঙালীর সাধনার জন্য আধুনিক বিশ্বশক্তির কাছ হইতে আন্তর্জাতিক সমাদর টানিয়া আনা। বাঙালীর মাতৃভাষাকে বাঙলা দেশের উচ্চতম শিক্ষার মর্য্যাদা-যুক্ত আসনে উন্নীত করিয়া তিনি এই দিকে প্রথম চাল চালিলেন। ইহাতে বিপ্লবটা শুরু করা হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকদের সমানে সমানে পরস্পর সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইলে, প্রত্যেক সহরে ও পল্লীকেন্দ্রে, প্রত্যেক বিজ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চতম শিক্ষা, গবেষণা ও গ্রন্থ-প্রকাশ যাহাতে বাংলাভাষার বাহনেই চলে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহা একটা বিপ্লবসাধন সন্দেহ নাই। সেই বিপ্লবের পরিণতি এখনও আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। যুবক-বাংলা সম্বন্ধে আশুতোষের নানা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এইটাই বর্ত্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করা উচিত। কেন না সেই আত্মিক বিপ্লবের এইরূপ পরিণতি না ঘটিলে আমাদের মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতা বাড়িবে না, শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হইবে না, আর বাঙালীর জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার বাড়িতে পারিবেন না।

প্রাচীন গ্রীসের এপামিনন্দাস হইতে একালের মুসলিনি পর্যন্ত সকল বড় বড় কর্ম্মবীরদের গঠনমূলক উৎসাহ ও চেষ্টার মধ্যে যে উচ্চতম আদর্শনিষ্ঠা ও নির্ভীকতম কর্ম্মযোগ দেখা গিয়াছে, আশুতোষের জীবনে ঠিক সেই শ্রেণীরই আদর্শ নিষ্ঠা ও কর্ম্মযোগ দেখিতে পাই। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আশুতোষকে গতিপ্রবণ কর্ম্মবীরত্বের অধিকারী, বৈপ্লবিক শক্তি যোগের প্রতিমূর্ত্তি আর আধুনিক মানবজাতির ক্ষমতাশালী স্রষ্টা হিসাবে অন্যতম প্রধান ঠাঁই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। *

* কলিকাতার 'সিরাটি' দৈনিকে প্রকাশিত ২৫শে মে ১৯৩২ ইংরেজি রচনা হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত।
নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন—শ্রীবিনয় কুমার সরকার; ২য় ভাগ হইতে সংগৃহীত। প্রকাশ ১৯৩২
চক্রবর্তী ও চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

[চতুর্থ মৃত্যু-বার্ষিকী : জুন, ১৯৬৪]

১৯৩৭ সাল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত থাকতেন তখন তাঁদের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পুতুলমূর্তিশোভিত হলদে রঙের সুবৃহৎ পৈত্রিক বাসভবনে। 'পরিচয়' পত্রিকা সে-সময়ে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকপত্রে সদ্য রূপান্তরিত হয়েছে। কাগজটির বহু মূল্যবান রচনাসমৃদ্ধ পুরাতন সংখ্যাগুলো তার কিছুকাল আগেই সংগ্রহ ক'রে পড়বার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। এই সংখ্যাগুলো আমার মতো আরো বহু তরুণের মানসলোকে নব-নব বিস্ময়মণ্ডিত ঐশ্বর্যের কপাট যেন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, সুশোভন সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির মূল্যবান প্রবন্ধ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা এবং প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প যে-কোনো তরুণ প্রাণে জোয়ার জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। সবার উপরে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরিচয় তাঁর স্নেহসিক্ত সহযোগিতায় ধন্য হয়েছিল।

মনে পড়ে মফঃস্বলনিবাসী উনিশ বছরের একটি তরুণ সাহিত্যপত্রের একজন রাশভারী সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই হয়তো সেদিন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এক রৌদ্রদীপ্ত বায়-মুখরিত সকালে হাজির হয়েছিল। হয়তো কিছু সাহিত্য-রচনা সম্পর্কিত উপদেশ, কিছু মতামত শোনবার প্রত্যাশায়। পকেটে সদ্য-লিখিত কবিতা, যদি সুযোগ পাওয়া যায়, সম্পাদকের হাতে দিয়ে আসা যাবে।

সুধীন্দ্রনাথের বয়স কতো হতে পারে তখন মনে জাগেনি। পরিচয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর অজস্র গদ্যরচনা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হওয়ায় লেখার বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে মনে-মনে একটি বিশেষ মূর্তি তৈরী ক'রে নিতে অসুবিধে হয়নি। গুরু গম্ভীর রাশভারী এক প্রৌঢ় পণ্ডিত ব্যক্তির ছবির সঙ্গে সে-মূর্তির মিল ছিল হয়তো।

কিন্তু কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল, সুধীন্দ্রনাথ মামুলী অর্থে সম্পাদক কিংবা কবি বা প্রবন্ধকার নন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সচল মনীষাসম্পন্ন পুরুষ। দেখলাম, বড়ো হলঘরে কেদারায় বসে তিনি বইপত্র নাড়ছেন, চারদিকে বড়ো বড়ো বুক্‌শেলফগুলো বইয়ে ঠাসা। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, সদ্য-প্রকাশিত বহু বই যার নামটা শুধু আমাদের কানে এসেছে শেলফগুলোতে সাজানো রয়েছে। বইগুলো ইংরেজি, মার্কিন ও কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্য সংক্রান্ত এবং অনুরূপ গ্রন্থাদি তখনকার দিনে কলকাতার মতো শহরেও খুব বেশী আমদানী হতো না। ঘরের দেয়ালে তাকাতেই চোখে পড়লো শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত ছবি। যতোদূর মনে পড়ে, পরের বার যখন সুধীন্দ্রনাথের কাছে যাই তখন এই ঘরেই দেখেছিলাম প্রথম যামিনী রায়কে এবং সুধীন্দ্রনাথই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে কী কথাবার্তা হয়েছিল বিস্তারিত মনে থাকার কথা নয় কিন্তু এটুকু মনে আছে আমার তরুণ প্রাণে মস্ত একটা অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরেছিলাম।

সুধীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য সুখকর স্মৃতি হয়ে উঠেছিল। সজ্জন ও বন্ধুবৎসল সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুর সংখ্যা প্রচুর ছিল। কিন্তু এইসব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়াও সাহিত্যক্ষেত্রে এমন বহু বহু তরুণ লেখক ও পাঠক ছিলেন সুধীন্দ্র-সান্নিধ্যে, অনেক সময় অল্প-কালের জন্যে হলেও, যাঁরা সাহিত্য-আলোচনার মাধ্যমে তৃপ্তি-কর রসাস্বাদনের সুযোগ পেয়েছিলেন। যে-সময়ে তাঁকে প্রথম দেখলাম তাঁর বয়স তখন চল্লিশের নীচে, বোধহয় বছর সাঁইত্রিশ হবে; দেহসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে তাঁকে তখন সরস্বতীর বরপুত্রের মতোই মনে হয়েছিল। তার পরেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে সুধীন্দ্রনাথকে দেখেছি,—কখনো মনে হয়নি যে তাঁর বয়স খুব বেড়েছে কিংবা তাঁর মানসলোকের সক্রিয়তা কোনো দিক থেকে হ্রাস পেয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের জন্ম বিত্তশালী, বনেদী পরিবারে, তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত ও পরম বৈদান্তিক। মনে পড়ে, মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রাসলীলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পরিচয়েই ধারাবাহিকভাবে পড়বার সুযোগ পাওয়া গিয়ে-ছিল। সে-সময়েই মনে হয়েছিল যে পিতাপুত্রের মানসিক সংগঠনে অনেকখানি প্রভেদ। পিতা রক্ষণশীল ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মহিমাকীর্তনে মুখর; পক্ষান্তরে পুত্রের মানসলোকে সমকালীন য়ুরোপীয় ভাবধারার অরুণালোক সঞ্চারিত। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে আমার মাতামহের (রজনীকান্ত গুপ্ত) সান্নিধ্যেও এসেছিলেন এবং আমার মাতুলালয়ে অখিল মিত্রী লেনের বাড়িতেও যাতায়াত করে-ছিলেন। সে-কারণেই মনস্বী হীরেন্দ্রনাথকে দেখবার প্রবল আকর্ষণ আমার ছিল। সুধীন্দ্রনাথকেও পরিচয়ের সূচনাতেই একথার উল্লেখ করেছিলাম মনে পড়ছে। মাতুলালয় কলকাতায় হলেও ঢাকাতেই আমার পড়াশোনা ও কর্মজীবনের আরম্ভ। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ঢুকেছি তখনই কলকাতায় এসে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে-ছিল। ১৩৪৩ সালের পৌষ সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায় আমার 'অধ্যায়' নামের কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সতেরো-আঠারো বয়সের তরুণের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, আমি অনেক সময়েই কবিতা বার ক'রে সুধীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে তখনই মতামত দাবী করতাম। সুধীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই পরম ধৈর্যের সঙ্গে আগাগোড়া দেখে কবিতা সম্পর্কে মতামত দিতেন। মনে পড়ে, 'গর্দভনখ' নামের কবিতাটি পরিচয়ে প্রকাশিত হবার পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ একদিন আমার উপস্থিতিতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল কবিতাটির সফলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছিলেন। একজন শক্তিমান কবির এই সহৃদয়তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, বলা বাহুল্য।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে সুধীন্দ্রনাথ চলে এসেছিলেন হাজরা রোডের বাসায়। বোধ হয় ১৩৪০ সালে। বন্ধুবর বীরেন দাশের সঙ্গে একবার তাঁর ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। 'উত্তর ফাল্গুনী' কাব্যগ্রন্থ সেই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার পরের অনেকগুলো বছর বড়ো তাড়াহুড়ো ক'রে অতিক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী বোমা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, সবার ওপর বঙ্গবিভাগ ও স্বাধীনতা। সব খবর নেবার উপায় ছিল না; শুধু জেনেছিলাম, সুধীন্দ্রনাথ তখন স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'ঈস্ট' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছেন। বস্তুত, এই দুঃসময়ের বছরগুলোতে সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তেমন সক্রিয় ছিল না। অন্তত প্রকাশ্যে তার কোনো আভাস পাওয়া যায় নি।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সুধীন্দ্রনাথ দামোদর ভ্যালী কর্পো-রেশনের চিফ ইনফরমেশন অফিসার রূপে কাজ করছেন জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম অ্যাণ্ডারসন হাউসে। আমি তখন (১৯৫১) ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে এসেছি। অনেকদিন বাদে দেখা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে দেখে-

ছিলাম সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। ইতিপূর্বেই 'কবিতা' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় সেক্‌স্‌পীয়র, ম্যালার্মে ও অন্যান্য কবির সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ পড়েছিলাম। সেক্‌স্‌পীয়রের অনেকগুলো সনেটের অনুবাদই ইনি এই সময়ে সম্পূর্ণ করেছিলেন। দেখলাম সুধীন্দ্রনাথ আপিসঘরে বসেই পূর্ব প্রকাশিত অনুবাদগুলোর উন্নততর অনুবাদকর্মে নিরত। বললাম: আপনার এই কবিতাগুলোর অধিকাংশই কি আগে প্রকাশিত হয় নি? হেসে বললেন: নতুন করে অনুবাদ করছি। অনেকগুলো একেবারেই স্বতন্ত্র চেহারা নিয়েছে। আবার ছাপা হতে আপত্তি কি।

১৯৫৩ সনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে সুধীন্দ্রনাথ কবিসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতা পাঠ করতে এসেছিলেন। কবি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন দিলীপ কুমার গুপ্ত। দু'দিনে প্রায় ষাট জন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। মনে পড়ে, সুধীন্দ্রনাথ যখন কবিতা পাঠ করছিলেন তখন সমস্ত হল নিস্তব্ধ। একটি কবিতাই সুধীন্দ্রনাথ পড়তে চেয়েছিলেন বোধ হয়। কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধে তাঁকে সেদিন একটি একটি ক'রে চার পাঁচটি কবিতা পড়তে হয়েছিল। অত্যন্ত নিখুঁত কাব্যপাঠ এবং উপভোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ যে তরুণ মহলে ক্রমশই অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেদিন।

সুধীন্দ্রনাথের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে কলকাতায় থাকতে কয়েকবার গিয়েছিলাম। শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে এই বাড়িতে প্রথম দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম দুটি পারসিক বিড়াল, ঠিক সাজানো পুতুলের মতো নিঃশব্দ, স্থির। সেদিন সুধীন্দ্রনাথ লেখকের সমস্যা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন। একজন প্রকাশক উপযুক্ত প্রাপ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন একথা এই প্রথম তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম।

চিঠি পত্র লেখার ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। শিক্ষা, বিবেকসম্মত রুচি ও ভদ্রতা এক্ষেত্রে তাঁর সহায়। যখনই চিঠি লিখেছি, উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন নি তিনি। বেশ বড়ো বড়ো উজ্জ্বল স্পষ্টাক্ষরে লিখিত তাঁর চিঠির কথা এখনও স্পষ্ট চোখের সামনে। তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'স্বগত' যখন প্রকাশিত হয় একখণ্ড কিনেছিলাম ১৯৩৮ কি ১৯৩৯ সালে। সে সময়ে তাঁর গদ্যরচনাকেও দুর্বোধ্য বলবার লোকের অভাব হয় নি। মনে পড়ে, বইটি আদ্যন্ত পড়বার পর বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একদিন বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। অশিক্ষিত লোকও চলতি গদ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কী ভাবে বাংলা চলতি গদ্যকে সমৃদ্ধ করবেন, বক্তব্যে ও বিন্যাসে ঐশ্বর্যময় করবেন তার দৃষ্টান্ত সুধীন্দ্রনাথের গদ্য। আজ, এই পঁচিশ বছর বাদে, সুধীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সমাদর লাভ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের মধ্যে আজ সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত বলা যায়।

জীবনের শেষের দিকে সুধীন্দ্রনাথ তেমন লিখতেন না। কিন্তু পুরাতন লেখার পরিমার্জনায় যতটা সম্ভব সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন। কবি যে নিছক অনুপ্রেরণার তাগিদেই কবিতা লেখেন না, কবি যে কারিগরীতেও বিশেষ মনোযোগী সুধীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেই প্রথম সে কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছিলাম।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

জলপাহাড়
শান্তি লাহিড়ী

সামনে নদী চমকে ওঠে বিদ্যুতের সাপ
এক প্রহর, দুইপ্রহর, ভীষণ অন্ধকারে
বিছানো নুড়ি, রংমশাল কাছের তেপান্তর
এক পা আগে এক পা পিছে চন্দনের টিপ
মাথায় নিয়ে ভাঙছে সিঁড়ি আকাশ নীলাম্বরী।
জলপাহাড়, রংবাহার বৃক্ষ বনস্পতি
মনে পড়ে শাঁকোর সীমায় পাকের নোলক, ঢেউ
খেলার মত আঁচড়ে মাথা স্বপ্ন দেখে কার
চমকে ওঠে বিদ্যুতের শীতল অজগর
ভাঙছে নদী, ভাঙছে পাহাড় উড়ছে শুধু খৈ।
রৌপ্য বিলোয়, স্রোতস্বিনী শাল পাইনের বনে
সহস্র দল কমল হয়ে পাতার পরে পাতা
খেলছে বালক দুঃখবাদে, জলের সাতমহল
ডুবে ভ্রমর কোথায় আছে অসংখ্য কৌতুকে।
রূপে তোমায় ভোলাবোনা বলনা কার ঘরে
কুমারী তোর কচি গালের লাবণ্য সন্ধানে
এক প্রহর, দুইপ্রহর পাহাড় নদী বন
রূপ কথার অন্ধকার বৃষ্টি ডুবে যায়।
ঝড়বাতাস মন উদাস কিশোর বয়সী
দূর পাহাড় মাণিক ঝাড় একাকী চৈত্রের
নানান ফুল তুলির টান। অসুখ যেন কার?
ভাঙছে পথ অবিশ্রান্ত দূরের রংবাহার।

একটি সনেট
বিকাশ দাস

কোনো পরাভূত লগ্নে ডুবে যেতে চেয়েছি অতলে—
যে অতলে অবলুপ্ত-নগরীর মতো অন্ধকার;
অথচ সূর্যের দিকে সবুজ পল্লবগুলি মেলে,
অজস্র আলোর স্তবে ফিরেছে বৃক্ষেরা বারংবার!
ক্ষিপ্র বাতাসের মুখে কুসুমিত চৈত্রের খবর
পেয়ে আন্দোলিত হ'ল আরবার রুগ্নশাখাগুলি।
রক্তে রক্তে আলোড়ন, প্রতীক্ষার উর্মিল প্রহর
কেটেছে,—ভরেছে গানে বর্ণে গন্ধে রক্তিম গোধূলি!

বারংবার ফিরে তাই নির্ভীক নাবিক উপকূলে
জীবনের,—যৌবনের। রক্ত কণিকারা প্রাণাকুল;
যদি বিদ্ধ হ'তে হ'তে যন্ত্রণায়, মৃত্যুর ত্রিশূলে,
বিশীর্ণ পাণ্ডুর ডালে কখনো ফোটানো যায় ফুল!

মৃত্যুর সীমান্ত একদিকে, অন্য প্রান্তে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ ভিড়,
ক্রমশ নিকটে আসে সবুজ বলয়ে ঘেরা দূরবর্তী তীর।

বিষণ্ণতার জন্যে

সুখেন্দু মল্লিক

দেখো আমার অন্ধকারে দুঃখ নেই,
সকল ঘরে অন্ধকার দৃশ্যমান।
হয়তো বাঁচি তোমার হাওয়ার স্পর্শতেই—
অনেক মেঘে হারিয়ে গেছে বিবস্বান।

এখন মানি ভ্রান্তি নয় তোমার বুকে ফুলের স্বাদ,
কখন জলদচি রেখা হারায় অপরাহ্ণ কাল।
সবুজ ঘন দেয়ালে ভীত অশান্তির নখরাঘাত
চতুর্দিকে উধাও কাঁপে নিরন্তরের অন্তরাল।

তোমার নাম তোমার কাছে লুকিয়ে রাখি
তোমার ভালোবাসাতে নেই বিষণ্ণতা—
সকল স্রোতে নিমজ্জিত শেষ কথা কি!
আকাশ কোন নদীতীরের ভুলের ব্যথা।

তবুও দেখো দীর্ঘশ্বাসে সকল আলো পল্লবিত
কোথাও ম্লান দরোজা নেই, তোমার ঘরে ভালোবাসা।
সুচির কাল বাহির পথে সে কার ছায়া দীর্ঘায়িত।
তোমার হাত ধরবে বলে দাঁড়িয়ে আছে কে প্রত্যাশা।
জানি জানি একদা সব আকাঙ্খিত পড়বে মনে।
স্বর্ণ তুমি, শুভ্র তুমি বিষণ্ণতা অযৌবন।
আয়না কোন সুখের ছবি, ছবির পরিবর্তনে
আয়না ভাঙি। কুসুমে কিছু দুঃখ দিয়ো হে ক্রন্দন।

রাতকে দেখলাম

উমাপদ নাথ

অনেক রাত্রে উঠে দেখি, হিমলাগা চাঁদের চোখে জল।
ঝিটকিনির শব্দে আগেই যে-সারমেয় চকিতে জেগেছে
তার চোখে বিভ্রান্তি বিরল—একবার তাকিয়ে সে
দু'থাবায় মাথা গুঁজে নিশ্চিন্তিত হলো পরক্ষণ।
আর আমি দেখলাম, সে রাত
আমার নিঃশব্দ দ্বারে গুপ্তচারী সস্মিত অতিথি।

পৃথিবীর বক্ষাবরণ তখন বিস্রস্ত ছিল, তার
পৃথুল কুচের নিচে অস্পষ্ট নিঃশ্বসিত নাচে
হৃদয় জাগ্রত শুধু। নিস্তরঙ্গ দিগন্তি বিবশ
ক্রমাগত অনাহত কী-এক বেদনাময় সুরে।
দেখলাম, আমি এক অনিকেত স্বয়ম্ভূশঙ্কর:
হিমময় শিলাসনে ধ্যানরতা শর্বরী পার্বতী।

এ এক আশ্চর্য বোধ। দুর্বোধ্য প্রেয়সী
মেলে আছে কালো চোখ—কালান্তরী বানের চাদর!
মনে হলো এরই জন্যে বহুরাত গিয়েছে অঘুমে,
যৌবনের জ্বালা নিয়ে শ্যেনসম দিয়েছি চক্কর
দিনের বিচিত্রবেশা ধরণীর নাভির উপর;

আজ দেখি: দিন মিছে. রাতে আমি বাঁচি সত্যিকার।

মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট

সুনীল দাস

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ উপান্তে এসে পৌঁচেছে। ইতিমধ্যে দুইটি পরিকল্পনায় প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। কিন্তু পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য, সমাজে আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের সর্ত, সুদূরের বস্তুই রয়ে গেলো। প্রথমটা চাপা গুঞ্জন, ক্রমশ মুখর সমালোচনা, অতঃপর বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ, পরিকল্পনার পরিণতিতে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস সম্বন্ধে জনসাধারণের সংশয় বিকীর্ণ করে দিল। সরকারের আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের সঙ্কল্প অচিরেই উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। অথচ, পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির নিরিখ সহজেই স্বীকৃতি পেলো। পরিকল্পনার আর একটি সর্তও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হোলো। সেটি পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। পূর্ণ কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, প্রতিটি পরিকল্পনার অন্তে কর্ম-সংস্থানের অসম্পূর্ণ লক্ষ্য বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলো, মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধির দিকে, কিন্তু এই বর্ধিত আয় গেলো কোথায়? সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই বৃদ্ধির তো প্রতিফলন নেই! তাদের জীবনে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার হতাশ্বাস দীর্ঘায়িত হয়েই চলেছে। তবে কি উদ্বৃত্ত আয় মুষ্টিমেয়ের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে সমাজে বৈষম্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের বঞ্চনার বোঝাও বাড়তির দিকে! এই সংশয়ের আলোড়নে পরিকল্পনার উপযোগিতা আচ্ছন্ন হয়েছে, ক্ষুব্ধ মানুষের আবেগ বার বার তীব্র ধিক্কারে পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঘোষণা করে সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছে, বিনিয়োগের পরিণতিতে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির তদন্ত হউক। গোড়ায় সে দাবী, সে আবেদন, সরকারী মহলে আমল পায় নাই। শেষটায় সরকারী অনমনীয়তা শিথিল হয়ে আর্থিক হ্রাস-বৃদ্ধি ও সম্পদের কেন্দ্রায়ন সম্পর্কিত তদন্ত স্বীকৃতি পেলো।

ঘটনাটি ঘটলো ১৯৬০ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে। সেদিন তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া লোকসভায় উপস্থাপিত করে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রথম দুই পরিকল্পনার আমলে অর্জিত অতিরিক্ত আয়ের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাস অনুসন্ধান করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর অধ্যাপক পি, সি, মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হোলো। এই কমিটিতে ছিলেন ডঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও, ডঃ পি, এস, লোকনাথন, ডঃ বি, এন, গাঙ্গুলী, শ্রীবিষ্ণু সহায়, শ্রী ডি, এল, মজুমদার, ডঃ বি, কে, মাডান, শ্রী পি, এন, ডাটার, শ্রী পি, সি, ম্যাথু, সম্পাদক-সদস্য শ্রী কে, আর, নায়ার। এঁরা কেউ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, কেউ বা প্রশাসক, যাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভেদও দুস্তর। এঁদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সহমর্মী থেকে পুঁজিবাদের সহযাত্রীরা রয়েছেন। কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রস্তুত হয়েছে, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। এই খণ্ডটিই গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৬৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী বি, আর ভগত লোকসভায় পেশ করেছেন। রিপোর্টটি সম্পর্কে সরকার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। কারণ কমিটি অনুরোধ জানিয়েছেন

রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে আলোচিত হবার পর সরকারী সিদ্ধান্ত যেন গৃহীত হয়। সুতরাং সরকারী স্তরে মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষা করবে।

অতএব, মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টটি পরিস্থিতির আংশিক বিচার মাত্র, সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ নয়। সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে প্রবণতা কোন দিকে এবং আর্থিক ক্ষমতার পরিমাণগত কেন্দ্রায়ন সম্পর্কে কমিটি আলোচনা করেছেন। কিন্তু রিপোর্টে কোথাও কোথাও বিশ্লেষণের স্থূলতা, নিম্নকণ্ঠ আলোচনা, সাবলীল ও সুতীক্ষ্ণ মত প্রকাশে কমিটির কার্পণ্য বা অক্ষমতা, এবং রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশে স্ববিরোধিতা প্রশয় পেলেও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণায় কমিটি বলেছেন দশ বছরের পরিকল্পনার পরও অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টনে মাত্রাধিক্য বৈষম্য মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে অনিবার্যভাবেই সমাজের স্বল্পসংখ্যকদের হাতে প্রভুত আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন যাদের স্বার্থমুখীন, আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির স্বাক্ষর যাদের স্তব্ধ বিবেকে দংশনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তাদের স্বগোত্রীয়েরা কমিটির রিপোর্টে ছিদ্র খুঁজে বা'র করে কমিটির মূল বক্তব্যকে স্ববিরোধিতার গ্লানিমায় আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'Economic Times' পত্রিকার ১লা মে'র (১৯৬৪) সংখ্যার সম্পাদকীয়তে কমিটির সুপারিশগুলিকে লঘু করবার প্রবণতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এরা বলছেন "To the star question whether concentration of economic power has been increasing or decreasing, the committee's statistics do not reveal any definite and significant trend in concentration ratios during the first ten years of planning." 'ইকনমিক টাইমস্'-এর এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর।

জীবনমানের স্তর পরিবর্তন সম্পর্কে কমিটির বিচার-বিশ্লেষণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আর্থিক বিন্যাসে বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা এবং আয় বণ্টনে শিল্পায়নের অনিবার্য প্রত্যাঘাত সম্পর্কে কমিটি সচেতন। আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের সহচর। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তের জন্য আরও তথ্য চাই, তাই কমিটির প্রস্তাবেও আছে পুরো সময়ের জন্য একটি তদারকী সংস্থা গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। যারা সর্ববিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নগত শক্তিসমূহকে অনাবৃত করে তাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন। জনস্বার্থরক্ষার এই প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছেন, 'মনোপলি কমিশন' তারই স্বীকৃতি।

অবশ্য কমিটির মন্তব্যে উল্লেখ্য স্ববিরোধিতা রয়েছে, যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কমিটির রিপোর্টের মত একটি প্রামাণ্য অর্থনৈতিক দলিলে এরূপ স্ববিরোধিতা অসংলগ্ন ও অর্থহীন বাক্যবিন্যাস বলে মনে হবে। এরূপ একটি উক্তি সম্পর্কে 'Economic Times'-এর (১লা মে '৬৪) মন্তব্য উল্লেখ না করে পারা গেল না: "on the one hand, it states that the process of planning has assisted the expansion of big business and concentration but, on the other hand, it points out that, during all these years the Govt has sought to limit unhealthy growth through a series of countervailing measures." সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি বৃহৎ শিল্প-ব্যবসার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির গতিরোধ করে থাকে, তবে পরিকল্পনার ফলে সম্পদের ও ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন কি করে সম্ভব হোলো? কমিটির পক্ষে চিন্তার এই অসঙ্গতির কারণ কি, সে-প্রশ্ন থেকে যায়।

বৃহৎ ব্যবসায় ও শিল্পপতি গোষ্ঠির আর্থিক সামর্থ্যের

বিস্ময়কর বৃদ্ধি অনেক কালেরই জানা কথা। মহলানবীশ কমিটি এই ঘটনাকে তথ্যভিত্তিক পরিচিতি দিয়েছেন। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন এদের অস্বাভাবিক স্ফীতি ববে খর্ব করলো? বড় বড় কোম্পানী ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি অবাধে টাকার বাজারে আনাগোনা করতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি, লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশন, ট্রাস্ট, সরকারী আধা-সরকারী তহবিল, শিল্পোন্নয়নের জন্য গঠিত ছোট, বড় নানা জাতের সংস্থা, এরাই বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সুযোগ দরাজ হাতে দিয়ে থাকেন। বৃহৎ শিল্প-ব্যবসা, আর্থিক সামর্থে বলীয়ান হয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এমন কি সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। আমাদের আর্থিক কাঠামোতে ঋণ ও বিনিয়োগের জন্য মূলধন পাবার অধিকারী সকলেই নয়। ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবসাগুলি ও এই প্রকার যে-সকল প্রতিষ্ঠান টি‍ঁকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের ঋণ কিম্বা দাদন সংগ্রহের উপযোগিতা নেই। অথচ, বৃহৎ শিল্প-ব্যবসার জন্য সকল সুযোগই উন্মুক্ত। কমিটির রিপোর্টে ডঃ আর, কে, হাজারী কর্তৃক ২০টি প্রমুখ শিল্পগোষ্ঠির আর্থিক সামর্থের অনুসন্ধানের ফল উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে এদের ২৩৬ কোটি টাকা মূলধন-বিশিষ্ট ৯৮৩টি কোম্পানীর উপর নানাপ্রকারের দখল ছিল। ১৯৫৮ সালে (সরকারী কোম্পানী বাদে) এদের দখল ৩৫২ কোটি টাকা মূলধন-বিশিষ্ট ১০৭৩টি কোম্পানীর উপর বিস্তৃত হয়। ১৯৫১ ও ১৯৫৮ সালে এই কোম্পানীগুলির, বেসরকারী কোম্পানীগুলির মোট মূলধনের যথাক্রমে শতকরা ২৯'২ ভাগ ও শতকরা ৩২'৪ ভাগ আয়ত্তে ছিল। চলতি কোম্পানীগুলির সংখ্যা বহু হলেও আদায়ীকৃত মূলধনের অধিকাংশ অংশ কয়েকটি মাত্র কোম্পানীর আয়ত্তে রয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবে দেখা যায় পঞ্চাশ লাখের উর্দ্ধে আদায়ীকৃত মূলধন আছে এমন কোম্পানীর সংখ্যা সকল কোম্পানীর শতকরা ১'৬ অগ। অথচ এদেরই হাতে মোট আদায়ীকৃত মূলধনের ৫৩ ভাগ সঞ্চিত আছে। এছাড়া, বৃহত্তম তেরটি, বৃহত্তম দশটি এবং বৃহত্তম চারটি শিল্প-গোষ্ঠি সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান করেও কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বেসরকারী যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন সংশয়াতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮র মধ্যে এই বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ("...that concentration of economic power exsits to a significant extent in the public non-Govt corporate sector and also that it has increased significantly between 1951 and 1958.") বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশও বৃহৎ গোষ্ঠিগুলির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। ইদানীংকালে বিদেশী মূলধন ও দেশী মূলধনের যৌথ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। শুধু মূলধন নয় কারিগরী সাহায্যও এ-পথে এসে বৃহৎ-গোষ্ঠির সামর্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

বৃহৎ-গোষ্ঠীগুলির আর্থিক প্রাধান্যের অন্যতম কারণ, তাদের পারস্পরিক গ্রন্থি-বন্ধন – interlocking। একই ডিরেক্টার একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক, বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে শেয়ারের চালাচালি, শিল্পগোষ্ঠির নিজস্ব ব্যাঙ্ক মারফৎ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা ভাবে আর্থিক প্রাধান্য বিস্তারের জাল ছড়িয়ে আছে। এমন কি কৃষিপণ্যের দাদন থেকে সুরু করে বিপনণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃহৎগোষ্ঠির প্রসারিত বাহু সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সুতরাং আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে আর্থিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রায়ন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হচ্ছে এবং বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠি যতই উন্নয়নের প্রসাদে পুষ্ট ও স্ফীত হচ্ছে, তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিকল্পনার এই পরিণতি ছোট গোষ্ঠীর উপর নিষ্করুণ।

ব্যাঙ্কগুলিও বৃহৎ ও মাঝারীর সহায়ক। এমন কি ব্যাঙ্ক শিল্পও কেন্দ্রায়নের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মনোপলির জন্মও এই পথে। স্থানীয় ভিত্তিতে শিল্পের কেন্দ্রায়নও মনোপলির সুযোগ তৈরী করে দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রায়ন এভাবেই আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন অনিবার্য করে তুলছে।

কমিটি বৃহৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংবাদপত্রের গ্রন্থি-বন্ধনে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সংবাদপত্রগুলি বৃহৎগোষ্টির জো-হুকুমের ভূমিকায় তাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রায়নের শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের উৎস হলেও এই বিপদমুক্তির জন্য বলিষ্ঠ পথ নির্দেশ চাই। কারণ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু রোগ নিরাময়ের দায়িত্ব আরও বেশী।

বৃহৎ শিল্পগোষ্টীর কেন্দ্রায়ন প্রবণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েও তাদের সততা সম্বন্ধে সংশয় দূর করার জন্য কমিটির সার্টিফিকেট নেহাৎই অবান্তর মনে হবে। আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন অনিবার্যভাবে সামাজিক সম্পর্কে নূতন নূতন টানাপোড়েন সৃষ্টি করবে। যার ফলে সমাজের কোনো কোনো মহলে বঞ্চনার পীড়ন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, প্রভূত ক্ষমতার ব্যবহার-সে ক্ষমতা আর্থিকই হউক কিম্বা রাজনৈতিক হউক—আত্মস্বার্থ পোষণের প্রবণতা সৃষ্টি করে নৈতিক অধঃপতনের পথও প্রশস্ত করে দেবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকবে হয়তো, কিন্তু ক্ষমতার অনুষঙ্গরূপে তার ব্যবহারে ব্যভিচার দেখা দেবেই, যদি তা সংশোধনের জন্য সজাগ প্রহরা সমাজজীবনে অন্তর্লীন না থাকে। সুতরাং অর্থনীতির ভিত্তিভূমিতে যে ঘটনার সুরু, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে তার অনভিপ্রেত পরিণতি কোনো বিস্ময়ের বস্তু নয়। তাই কমিটির মন্তব্য "...the growth of big business does not necessarily mean the deliberate adoption of an anti-social policy..." নিছক অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর। বিগ বিজনেস কিছু সাধু-সন্ত নন। তাদের অর্থ নৈতিক আচরণের আঘাতে সমাজ-জীবনে নাভিশ্বাস উঠে থাকে এ-খবর তাদের অজানা নেই। সামাজিক ন্যায় বিচারের তাগিদের উৎস এখানেই।

কমিটি বলছেন সামগ্রিকভাবে আয়ের বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও, শহরে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামে বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। গ্রামের বৈষম্য হ্রাসের সিদ্ধান্তটি কৃষিগত তথ্যনির্ভর নয়। গ্রামে কৃষির ক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে অনিবার্যভাবে নিম্নগামী হয়েছে। চাষের জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও এই দুই পরিকল্পনার আমলে বৈষম্য তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের মোট কৃষিজীবিদের শতকরা ২০ ভাগ একেবারে ভূমিহীন—দুই পরিকল্পনার আমলেই। কৃষিজীবিদের শতকরা ১০জনের হাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে শতকরা ৫৮ভাগ জমি থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে শতকরা ৫৬ ভাগে নেমে এসেছিল। আর অবশিষ্ট ৭০ ভাগের হাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে শতকরা ৪২ ভাগ, ১৯৫৯-৬০ সালে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৪ ভাগে। সুতরাং চাষের জমির মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্যের তীব্রতা আদৌ হ্রাস পায় নাই। অবশ্য অপর একস্থানে কমিটি বলেছেন: "There is a fair degree of concentration of personal wealth held in the form of land among both the urban and rural sectors." অর্থাৎ জমির মাধ্যমে সহরে এবং গ্রামে ব্যক্তিগত সম্পদের কেন্দ্রায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জমির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যে বৈষম্যের বৃদ্ধি ছাড়া কমতি হয় নাই। কারণ ভূমি বণ্টনের সূচী, প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচল হয়ে রয়েছে। বড় জোতের কৌলীন্য-গুলিও অটুট রয়েছে। সুতরাং কৃষি-আয়ের বৈষম্যও অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম দুই পরিকল্পনায় শতকরা ৪২ ভাগ জাতীয় আয় বাড়লেও, বণ্টন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ার ফলে

বৈষম্যের সূচীমুখ তীক্ষ্ণতর হয়েছে, এ-সত্য মহলানবীশ কমিটি স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আয়ের বৈষম্য সম্পদের বৈষম্যের ক্ষেত্রে আরও সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাই ভারত সরকারকেও খুবই অনিচ্ছায় স্বীকার করতে হয়েছে দেশের শতকরা ৬০ জনের দৈনিক আয় ৪৭ নয়া পয়সা! মহলানবীশ কমিটির স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত, ঢিলেঢালা বিশ্লেষণ, দ্ব্যর্থহীন মতপ্রদানে দ্বিধা এবং বিলম্বিত ও অসম্পূর্ণ রিপোর্ট, রিপোর্টটির গুরুত্ব খর্ব করলেও, প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে এই রিপোর্টের বিরুদ্ধেও গুঞ্জন উঠেছে। আশাকরা যাচ্ছে, নবগঠিত 'মনোপলিজ কমিশন' মহলানবীশ কমিটির ত্রুটি বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে উঠে বর্তমান সরকারের মিশ্র অর্থনীতির পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সমাজবাদের গোড়া-পত্তনের দিকে কয়েক ধাপ দ্রুত পদক্ষেপের রাজপথ রচনা করবেন।

জয়শ্রী। আষাঢ়। ১৩৭১

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আজীবন যিনি স্বদেশের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন, স্বাদেশিকতা যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সেই অবিচল ব্যক্তিত্ব-সমৃদ্ধ রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব-জিজ্ঞাসার একটি সামগ্রিক চিত্র জয়শ্রীর আষাঢ় সংখ্যায় ফুটিয়ে তুলবেন :

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
ডঃ সুকুমার দত্ত
মন্মথনাথ সান্যাল
যোগেশচন্দ্র বাগল
কালীচরণ ঘোষ
অনাথবন্ধু দত্ত
রামেন্দ্রনারায়ণ রায়
সুশান্ত বসু
নচিকেতা ভরদ্বাজ

দাম ০·৭৫ সডাক ০·৮৩

জয়শ্রী

৩১২, গাঙ্গুলি বাগান, কলিকাতা-৪৭

একটি ঐতিহাসিক মৃত্যু

তথাগত

সে অনেকদিনের কথা। ইউরোপের জাতীয় জীবন মধ্যযুগীয় চার্চের দোর্দণ্ড প্রতাপে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট। পোপ শাসিত চার্চের প্রভাব গণজীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। জড়তার কুণ্ডলীপাকে সবাই আবদ্ধ। তখনও কনষ্টান্টিনোপল-এর পতন হয়নি। রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের উদার উপস্থিতি ভাঙতে পারেনি পোপ শাসিত অন্ধ ভেদের উদ্ধত প্রাচীর। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ। জীবনকে অপরিমিত করার সক্লেশ সাধনা নেই। নূতন পৃষ্ঠা উল্টে জীবনের নূতন পাঠোদ্ধারের প্রেরণা নেই, তবুও মাঝে মাঝে মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তার উদয় হয়েছে। হিমশীতল সমাজদেহে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের সেই উত্তাপকে বিকারের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের জীবনের বিনিময়ে অচলায়তনের ভিত্তি শিথিল হয়েছে, সেই সব যুগ দধীচির বুকের পাঁজর দিয়েই সভ্যতার জয়তোরণ গড়ে উঠেছে যুগে যুগে।

জন হাসের জীবন কাহিনী কঠিন বীর্য ও নির্ভীক আত্মোৎসর্গের একটী গৌরবময় ইতিহাস। দক্ষিণ বোহেমিয়ার এক দরিদ্র ঘরে হাসের জন্ম। সেটা ১৩৭০ খ্রীস্টাব্দের কথা। গরীব হ'লেও হাস সেদিনের বিখ্যাত প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ উপাধি নিয়েছিলেন ১৩৯৬ খ্রীস্টাব্দে। থিওলজিতেও তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৪০১ সনের মধ্যেই তিনি কর্ম দক্ষতার গুণে কলা বিভাগের ডীন হন। অল্পদিনের মধ্যেই বেথেলহেম চ্যাপেল (Bethelehem Chapel) তাঁকে ধর্ম যাজক রূপে নিযুক্ত করে। চেক (Czechs) দের মধ্যে তখন জাগরণ এসেছে। হাস তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সেদিনের ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে চলেছেন। পোপ ও ধর্ম যাজকদের জীবন ছিল ধর্ম জীবনের পরিপন্থী। বাইবেলের সহজ ও সরল উপদেশগুলি মানুষের বোধগম্য ছিল না। লাতিন ভাষায় বাইবেল পড়তে হোত। নানান্ ছল চাতুরীর মাধ্যমে বিকৃত ধর্মের প্রচার করে সেদিনের ধর্মযাজকেরা খ্রীস্টের পবিত্র জীবন থেকে অনেক দূরেই ছিলেন। ইংলণ্ডের Wyoliffeর বিখ্যাত ধর্ম পুস্তকগুলো—Dialogues, Trialogues —পড়ে হাস বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। হাসের পূর্বসূরী অবশ্য আরও কয়েকজন ছিলেন। সেদিন Peter Waldo ও তাঁর দল (Waldensians) এবং Marsiglio প্রোটেসটান্ট ধর্ম আন্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন গণ-মানসে।

লাতিন ভাষার পরিবর্তে বোহেমিয়ার নিজস্ব ভাষায় প্রার্থনা পড়ার রেওয়াজ শুরু করলেন হাস। মানুষের প্রাণের কথা যেন সোজা ভগবানের কাছে পৌঁছায়, তাই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের মাতৃভাষায় বাইবেল পড়ে ধর্ম জীবন যাপন করতে বলেন। হাসের সহকর্মী Jerome ছিলেন প্রাগের লোক তিনি ইংলণ্ডে যান পড়াশুনার জন্য। Wycliffeর বই তিনিও পড়েন এবং দেশে নিয়ে আসেন। হাস ধর্মসভায় Wyoliffeর বইগুলো পড়তেন। তাঁর সরল পবিত্র জীবন, তাঁর বাগ্মীতা, তাঁর সুস্থ সবল ধর্মজীবনের প্রচার মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। এমনকি রাজা ও রাণী পর্যন্ত তাঁর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল। নানান্ দেশ থেকে

লোক নির্ভেজাল সত্য-তত্ত্বকে জানবার জন্ত এখানে ভিড় করতো চার্চের মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করল স্বাধীন চিন্তার পথ বন্ধ করতে তারা উঠে পড়ে লাগলেন। প্রাগের আর্চ বিশপ বিশ্ববিদ্যালয়ের Wycliffe-র বইগুলো পুড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন, হাস নিরুপায়। তিনি দেখলেন তাঁর চারদিকে একদল স্বার্থান্বেষী লোক, তারা শাপদের মতো ভয়ঙ্কর, অন্ধকারে দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই বইগুলোকে এরা ধ্বংস করতে চায়। ক্রোধে ফেটে পড়লেন হাস। প্রতিবাদ জানালেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। কিন্তু সবই হোল ব্যর্থ। পুড়ে-যাওয়া বইগুলোর দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন : Flames, my friend, do not consume the truth ; it is always the mark of a little mind to vent anger on inanimate and injurious objects ; the books which are being destroyed to-day are a loss to the entire nation.

হাসের আন্দোলন দিনে দিনে বেড়ে চল্ল। সকলস্তরের মানুষ তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। রোমের আদেশে রাজা রাণী অবশ্য সরে দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তিনজন ছাত্র একজন ধর্মযাজকের কাজে বাধা দিয়ে বসল, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ তাদের ধরে নিয়ে গেল। হাস অনুরোধ করলেন কর্তৃপক্ষকে দয়া দেখানোর জন্ত। কর্তৃপক্ষ টিটকারি দিল হাসকে। জনতার চাপে তারা কর্তব্যবুদ্ধি হারায় নি। পিছনের দরজা দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হোল। জনতাকে শান্ত হ'তে বল্লেন হাস। অশ্রু ছল ছল চোখে হাস মৃতের শেষকৃত্য করলেন। বহু অধ্যাপক ছাত্র ও জনতা শহীদের দেহগুলো Bethelhem Chapel-এ এনে কবর দিল।

হাস উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। ধর্মের নামে নানান্ অত্যাচারে জর্জরিত মানুষকে তিনি ভগবানের সহজ সরল কথা শুনাতে চেয়েছিলেন। এই সব ব্যাপারের পর তিনি আর প্রাগে থাকলেন না। পাছে গোলমাল বাড়ে। কিছুদিন তাঁর নিজ গাঁয়ের দিকে থাকলেন। পড়াশুনা ও প্রচার কিন্তু সমানেই চল্ল। এদিকে তাঁদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের মধ্যে Wycliffe-র বই পড়ানোর ব্যাপারে মতভেদ চরম স্তরে পৌঁছল। শেষে চেকদের কর্তৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা চলতে লাগল, হাস রেক্টর নিযুক্ত হলেন, চেকদের মধ্যেও সবাই হাসের মত সমর্থন করতেন না। নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়তে লাগল স্বভাবতই তাঁর অনুগামীর দল কমতে লাগল, রোমের কর্তৃপক্ষ হেসকে বহিষ্কার করার আদেশ দিলেন। "Wherever John Huss is present, it is forbidden to the people to celebrate mass or to baptize their children or bury the dead." তাঁর অনেক বন্ধু উপদেশ দিলেন প্রচার ও লেখা বন্ধ রাখতে। কিন্তু হাস অবিচলিত। তিনি বল্লেন : "If I ceased to preach, I would be traitor on the day of Judgment." শেষে এল চরম আঘাত। সত্যের নামে কল্যাণের এই বিদ্রোহকে বেশী দিন সহ্য করলেন না চার্চের কর্তৃপক্ষ। আবার কণক রশ্মিকে অবৃত করতে চাইলেন তারা। সুইজারল্যাণ্ডের কন্‌সট্যান্স-এ এক ধর্মসম্মেলন বসল। সেখানে হাসের বিচার হবে। অবশ্য আরও দুটো ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্ত এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। হাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ধর্মদ্রোহিতা, heresy তৎকালীন সমাজে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ আর নেই, পোপ এদের উপর চরমশাস্তি দিয়ে থাকেন। হাসের শুভার্থীরা অত্যন্ত বিচলিত হ'লেন। বিবাদের অতি প্রাদুর্ভাব এক অনিশ্চিত উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তাঁদের মনে। বাইরে বিক্ষোভ ও বিপর্যয় থাকলেও হাসের অন্তরের গভীরে অতলান্ত শান্তি। যেন আশার আকাশে আশ্বাসের সূর্য। আত্মত্যাগের

উচ্ছ্বসিত বহ্নি। অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার জ্বলন্ত মূর্তি। বন্ধুরা তাদের বদান্য আত্মীয়তায় অভয় দিলেন, প্রাণ দিয়ে তাঁরা তাঁর জীবন রক্ষা করবেন। যে দুর্ধর্ষ নাইটগণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরা বল্লেন: "Stay here, and let them come to fetch you—if they can!" হাস বললেন: আমি যাব—"I will go to Constance and defend my doctrines"

রোমের অনুগত রাজা সিগিসমণ্ড (Sigismund) হাসকে অভয় দিলেন। তিনি জানালেন যে হাসকে Constance এ জনতার সামনে তার বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হবে, বিপদ না আসে এমন সব ব্যবস্থা করা হবে, যদি সম্মেলনের সঙ্গে তিনি একমত না হতে পারেন তবে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, বন্ধুদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি চল্লেন। সঙ্গে তিনজন বিশ্বাসী নোবেলকে দিলেন রাজা দেহরক্ষী হিসাবে। ১৪১৩ তিনি এলেন Constanceএ। হাস চেয়েছিলেন জনতার সঙ্গে মিশতে—প্রচার করতে। না, হাসকে কোন অধিকার দেওয়া হয়নি যা ধর্ম যাজকের প্রাপ্য। তিনি তাঁর দেহরক্ষী Lord of Chlumর সঙ্গে ডিনারে বসেছেন। সেই নগরের মেয়র ছল করে ডেকে নিয়ে তাঁকে কারাগারে বন্দী করলো Lord of Chlum বৃথাই কান্নাকাটি করলেন, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন জানালেন, ভয় দেখালেন, দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, রাজা নিরুপায়, কার্ডিনালদের হাতের পুতুল। শেষ পর্যন্ত তারা জবাবদিল: "A promise made to a heretic is not binding" হাসকে শিকলেবেঁধে স্যাঁত সেঁতে পুতিগন্ধময় ঘরে রাখা হোল, ভীষণ অসুখে পড়লেন হাস। একটি ভাবকে জীবনে অনুভব করেছেন হাস। তাই প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত হৃদয়ে ধরা ভগবানের মূর্তি। নিঃসঙ্গতার বেদনায় মুহ্যমান তবুও অন্তরে আত্মনিবেদনের সুশান্ত পবিত্রতা, ক্ষোভ নেই এতটুকু, ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি তাঁর বেদনার জন্য। এ এক মমতাভরা ঔদার্য। প্রায় তিন বৎসর ধরে এই বিচারের প্রহসন চলেছিল। সহানুভূতির অভাব আশঙ্কায় ব্যাকুল দিনগুলি, তবুও কি অনন্ত বিশ্বাস! বোহেমিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিঠিতে জানাচ্ছেন: "pray for me! my dear Bohemians, I am suffering for His word"

Constance এর এই সম্মেলন একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিচার দেখার জন্য জমায়েত হয়েছে অগণ্য লোক—প্রায় ৫০ হাজার থেকে একলক্ষ। ইউরোপের নানান্ প্রান্তের লোক। পোপ ও রাজা ছাড়া ২৯ কার্ডিনাল (Cardinal), ৩৩ আর্চবিশপ, ১৫০ বিশপ, ১০০ মঠাধ্যক্ষ, ৩০০ থিওলজির বিশিষ্ট অধ্যাপক, ১০৭ ডিউক ও আর্ল, আর ২৪০০ নাইট। শুধু ৩০,০০০ ঘোড়াই সহরে রাখা হয়েছিল। এত লোকের ব্যবস্থা করা বেশ শক্ত ব্যাপার হয়েছিল—বিশেষ করে যে সহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৮০০০। সুব্যবস্থার জন্য শুধু বিশেষ পুলিস নিযুক্ত হয়েছিল প্রায় ২০০০। তবুও ৫০০ লোক লেকের জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিল।

হাসকে আনা হয়েছে বিচারের জন্য। থিওলজির মাতব্বরগণ Wyclifferর বই'য়র বিভিন্ন অংশ তুলে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছেন। তাদের কাছে Wyclifferর যুক্তি ভ্রমপূর্ণ। হাসের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। জার্মানদের কর্তৃত্ব থেকে হটিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বোহেমিয়ানদের তাঁবেদারে আনা হয়েছে। শেষে অভিযোগ করা হয়েছে সামাজিক বিপ্লবের। Huss had "turned the Czech people against their masters." He had "stirred up civil revolution" in Bohemia. হাসের চেহারায় বিদ্যা প্রদীপ্ত পৌরুষ—আবার দয়ায় তিনি

(শেষাংশ ১৩৭ পৃষ্ঠায়)

মিনুর আত্মহত্যা

আর্যদেব

হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। শোনাকথার একটা উপর-চিকণ আলগা-চটক আছে। মুখে মুখে শোনাকথায় পালিশ লাগে, ব্যবহারে দীপ্তি আসে। সবাই শিল্পী। শোনাকথা মনের অন্দরমহলে পাঠায়, সেখানে বিচিত্র জারক রসে ভিজিয়ে তার রূপান্তর ঘটায়। আমার ঠাকুমা ও-রকম করতো, আমার পিসিমা মাসিমাও। এক কথাই দুজনে দুরকমভাবে বলে। কেউ এক অংশে জোর দেয় কেউ অন্য অংশে। আমি আপিসের কান-পাতলা বড়সাহেব নই, কেবল শোনাকথার ওপর নির্ভর করে সি. সি. আর লিখতে বসি নি (আমার সি. সি. আর কে লিখবে!)। শোনাকথার আসল কথা আমি জানি কারণ কথা শুনে শুনে শুনে আমার একটা বিশিষ্ট প্রবণতা জন্মেছে যার ফলে আমি প্রতি বিষয়ের সারমর্ম চট করে বুঝে ফেলি। আর এ-ব্যাপারে ত বুঝবোই।

প্রথমে শুনলাম ওর শাড়িতে লাল সুতো দিয়ে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ আঁকা ছিল। ভূগোল পরীক্ষার দিন খাতার কাগজের ফাঁকে সেটি বসিয়ে কপি করছিল ও। আর পড়েছিল (বক্তার উক্তি) সুধাদির হাতে—সেই সুধাদি যিনি কোনরকম ফাঁকি বরদাস্ত করেন না, ভীষণ কড়া বলে যার সুনাম-দুর্নাম দুইই ছিল। সুধাদির চোখে কোন ফাঁকিই এড়িয়ে যেতে পারে না (হায়রে সুধাদি, তুমিও জানো না ··)······। স্কুল থেকে চোখ লাল করে বাড়ি ফিরেছিল ও, তারপর ঘর বন্ধ করে সেই কাপড়টার ফাঁসেই·······!

.পরে শুনলাম কয়েকদিন থেকেই ওর মুখ ভার-ভার ছিল। ভাল করে পরীক্ষার পড়া বোধ হয় তৈরি হয় নি। আর ও পরীক্ষায় পাশ করে চাকরিতে ঢুকলে পরেই নাকি সংসারটার একটা বিলি-বন্দোবস্ত হত। সেই দুঃখেই···!

আরো পরে শুনলাম সেদিন সকালে ভাইয়েদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে একগাদা চানাচুর, চিনেবাদাম খেতে বসেছিল, খেয়েও ছিল অনেক। ওর মা তখন ওকে বকেন। ও তখন গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে দেয় অনেকক্ষণ ধরে। তারপর স্কুল থেকে ফিরে অভিমানভরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে····!

এরকম আরো কয়েকটি শোনাকথা নানাভাবে কানে এসেছিল, কিন্তু সারমর্ম আমি বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছে ও। একবারও এদিক ওদিক কোনদিক ভেবে দেখে নি। ভাবলে ও ওরকম করতো না। অথবা হয় ত ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়েই ওরকম করেছে। অপোগণ্ড একগাদা ভাইবোনের একজনেরও মুখ যাতে না দেখা যায় সেইজন্তে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। শূন্যে দোদুল্যমান দুটি পায়ে ও সকলের প্রতি লাথি মেরে গেছে, আমাকে মেরেছে, আরো যে যেখানে আছে সকলকে।

• • • •

আমি ওর সব কথা জানি। জ্যামিতিক সূত্রের মতন মুখস্থ আমার। ওকে কিংবা ওর আচরণ দেখেই আমি বলতে পারতাম ওর এই হয়েছে, ঐ হয়েছে। ওর কথা পুরোপুরি বলতে গেলে আমার পুরনো ডায়েরীগুলো না দেখলে এক-আধটু ভুল থেকে যেতে পারে।···

• • • •

১০ই মার্চে লেখা : "মিনু আজ এসেছিল। ওর ঐ পাতলা চেহারা দেখলে মনে অন্য কোন ইচ্ছা জাগে না, জাগে করুণা। এতদিন এক পাড়ায় আছি বলে ওর সঙ্গে পুরুষের মত মেশার সুযোগ হয়েছিল। পুরুষালি তাস, পাশা খেলতে ও ভালবাসতো। আজ কদিন দেখছি ও নারী হয়ে গেছে—এবং কেমন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। শাড়িটা ঠিকমত পরতে পারে না। মাথার চুলে, মুখের পাউডারে কেমন এলোমেলো অযত্ন। ও একটু একটু লজ্জা পায়। আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ও বললো—কী দেখছো, এতদিন ধরে দেখলে, আবার কী দেখছো! আমি হেসে ফেললাম। আর ও কেমন আড়ষ্ট, কঠিন হয়ে গেল। একসময় হুড়ুৎ করে চলে গেল।…

• • • •

১৪ই মার্চের লেখা : "ও আমাকে ভালবাসে না জানি, যেমন আমিও বাসি না ওকে। ওকে দেখে দেখে দেখে-আমার চোখ পচে গেছে। আজ ওর সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিল। দেখি দরাদরি করে বাজার করছে। আলু, পটল, কুচো চিংড়ি কিনলো। যেতে যেতে আমাকে বললো : আমার সবচেয়ে বড় শত্রু কে জানো?—আমার মা, মা মেয়ে হয়েও নিজের মেয়েকে চিনলো না।… ওর মাকে আমি দেখি নি, শুনেছি লাজুক প্রকৃতির, সচরাচর বাইরে বেরোন না।"

• • • •

আর একদিন ও আমার সেই ছোট্ট ঘরখানায় এসেছিল। বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল। একসময় মাসিক পত্রিকা-গুলি টেবিল থেকে এনে খাটের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। শিশি থেকে খানিকটা স্নো নিয়ে মুখে ঘষলো, মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমলো, তাতে বরং কুৎসিতই দেখাল ওকে। সিগারেটের বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, মনে হচ্ছিল পরখ করবে কারণ ওর পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়—কিন্তু করে নি। কী মনে হতে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। আবার উঠলো, উঠে কুঁজো উপুড় করে ঢক ঢক শব্দে জল খেল খানিকটা। আঁচল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো। আমি বাক্স গোছাচ্ছিলাম। ও আমার কাঁধে ঝাঁকানি দিল : "সোনাদা, কী করছো, বসো, গল্প করো। আমি ঘুরে বসেছিলাম, এবং বুঝতে পারছিলাম ওর ছোট্ট বুকের ভেতর একটা অস্থিরতা চুলবুল করছিল। আমি দেখছিলাম ওর শরীরটা কাচের মত—বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। ও যা যা বলেছিল আমার পরিষ্কার মনে আছে। বলেছিল : ক্লাসের মেয়েরা আমাকে ব্যাটাছেলে বলে কারণ আমি দোকান বাজার করি, ভাইয়েদের নিয়ে গিয়ে চুল ছাঁটাই, বাবার কাপড় দিয়ে আসি লণ্ড্রিতে।…আমি মনে মনে হাসছিলাম। ঈশ্বর কি প্রগল্‌ভ, ঈশ্বর কি শয়তান! ওর অপুষ্ট শরীর দেখলে নারীরাও লজ্জিত হত জানতাম আমি।…ও বলেই চললো : প্রথমে বুঝতাম না, পরে বুঝলাম—থিয়েটারের জন্যে ওরা কেন আমাকে কেবলই পাহারাদার কিংবা সৈনিক, কিংবা ঐরকম কোন ব্যাটাছেলের পার্ট দিত। সামান্য একটা সখীর ভূমিকা দিতেও ওদের কত কুণ্ঠা।…বলতে বলতে অনেকবার জল খেয়েছিল ও। বলেছিল : জানো সোনাদা, অরুণাকে দেখতে ব্যাটাছেলের মতই। ওমা, তুমি অরুণাকে দেখো নি—সেই যে গো ব্যারিস্টার কে. ডি. মিত্তিরের মেয়ে—হ্যাঁ ওরা খুব বড়লোক—অরুণার কিন্তু, জানো সোনাদা, বেশ বড় বড় গোঁফ আছে ঠোঁটের ওপর, গলার স্বরও ওর দাঁড়কাকের মত, ওরও নানা সাইজের কত যে তুলোর প্যাড ছিল কি

বলবো—গোঁফ কামিয়ে ওকেও ওরা রাণী সাজাতো, কিন্তু আমাকে ··।

• • • •

আর কিছুটা মাধবী বলেছিল আমাকে। মাধবীদের বাড়িটা ওদের বাড়ির পাশে। মাধবীদের বাড়ির থেকে ওদের বাড়ির কল, চৌবাচ্চা, বিছানা, ঘরদোর সব দেখা যেত। মাধবীকে আমি ভালবাসতাম কারণ মাধবীর মধ্যে একটু অপরিচয়ের দূরত্ব ছিল, মাধবী গায়ে-পড়া ছিল না, আর মাধবীর শরীরে নারীত্বের সব কটি প্রতিশ্রুতিই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকতো। মাধবী একদিন বলেছিল: "তুমি ত ছেলেবেলায় ওকে দেখো নি, ওর বাবা-মা ওকে ছেলেদের মত হাফ প্যান্ট, শার্ট পরিয়ে রাখতো। আমরা কতদিন ওর মা আর বাবার কথা শুনেছি—আমার মা, মাসি, দিদিরা শুনেছে আর হেসেছে। ওর বাবা বলেছে: মিনু আমাদের বড় ছেলের মত। ওর মা বলেছে—হ্যাঁ। ওর আমরা বিয়ে দেব না, লেখাপড়া শেখাব, ও চাকরি করবে··ইত্যাদি বলতে বলতে হি হি করে হেসেছিল মাধবী, কিন্তু কি নির্মম কি নিষ্ঠুরই না সেই হাসি! মাধবী তারপর মুখ ফিরিয়ে অভিমানভরে বলেছিল একসময়: ও সেইজন্যে সুলভ একমাত্র তোমাকেই গ্রাস করে নিতে চায়!"

• • • •

মাধবীর কথা শুনে আমার ভেতরটা নাড়া খেয়ে উঠেছিল। ওর বাবার ছবিটা ত এখনো চোখে পড়ে। কোন সরকারী অফিসের কেরানি, জবুথবু ভীরু-ভীরু চেহারা। ওর হাতে সব সময় একটা বাজারের থলে থাকে, যখন যেখানে যা যা সস্তা পান পয়সা থাকলে কিনে নেন। সব সময় কেমন ক্লান্ত দেখায় ওঁকে। হয় ত ব্লাডপ্রেসার আছে। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল। জীবনবহনের দায়ই যেন ওঁর কাছে সবচেয়ে বড় দায়। আমি গলির ধারে কাবলিওয়ালার সঙ্গে ফিসফিস করতে দেখেছি ওঁকে। একদিন আমাকে বুঝি বলেছিলেন: কয়েকটা টিউশনির খবর দিও ত ভাই। দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারেন নি উনি, ছাত্রের বাড়ি গিয়ে ঝিমোতেন। দিনকয়েক দেখেছিলাম গুঁড়ো চা আর পাতা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এর বাড়ি ওর বাড়ি সাপ্লাই দিচ্ছেন। তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে দাম দেয় নি। অনেকে বলেছিল চায়ের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো চামড়ার গুঁড়ো ছিল। ওর বাবা আর একদিন আমাকে বলেছিলেন: মিনুর একটা চাকরি খুঁজে দাও না, ভাই—যে কোনরকম চাকরি! আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম: ঐ চেহারা নিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় ও যা পাবে তাতে জাত যাবে, পেট ভরবে না।

• • • •

এরপর একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। গ্যাসের আলোয় বড় রাস্তার ওপরটা সাপের পিঠের মত চকচক করছিল। এক একটা গাড়ি জল ছিটোতে ছিটোতে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় আমার ঘরের কড়া নড়ে উঠলো। দরজা খুলতেই সপসপে ভিজে কাপড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো মিনু। আমি বললাম: মিনু তুমি?

—হ্যাঁ আমি, বলেই সেই ভিজেকাপড় সুদ্ধ মাটিতে বসে পড়েছিল ও। বললাম: ছাড়ো কাপড়টা, ছেড়ে আমার একটা ধুতি পরে নাও।

ও সঙ্গে সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে উঠলো: তুমিও আমাকে ধুতি পরাবে সোনাদা—কেন, আমি কি শাড়ি পরতে পারি না? বলেই সেদিন পটপট করে জামার বোতামগুলো খুলতে আরম্ভ করেছিল মিনু—খুলতে খুলতে বলেছিল: কেন আমি

কি মেয়ে নই মেয়েমানুষ নই, তোমারও অবিশ্বাস হয় সোনাদা ?

বাইরে তখন অঝোরধারে বৃষ্টি পড়ছে। রোয়াকে তার চড়বড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাস্তার গাছগুলোর হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল। আর ভেতরে দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল মিনুর। মুখটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ও বলছিল : তুমি নিশ্চয় জানতে সোনাদা⋯আমি বাধা দিয়ে বললাম : হ্যাঁ জানতাম যে পূর্ণেন্দুকে তুমি ভালবাসো, এবং লোকে তোমার-আমার নিয়ে যা বলে তা তুমিও জানো সত্যি নয়, আমিও জানি সত্যি নয়। আঙুলগুলো কামড়াতে কামড়াতে মিনু তারপর বলেছিল : জানো সোনাদা, পূর্ণেন্দু আরকদিন বাদেই বিয়ে করবে। ও এত দিন শুধু ভাঁওতা দিয়ে এসেছে আমাকে, ও জোচ্চোর, বদমাস, ওর শিরদাঁড়া নেই পিঠের। পূর্ণেন্দুর অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ ছিল। বাবা সাহেবকে বলে অতিকষ্টে ওর চাকরি করে দিয়েছিল। আজ ও উঠে গেছে। লেখাপড়া জানে, বয়স কম —বাবাকে ছাড়িয়ে ডিঙিয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে—আজ আমাদের ঠকাতেও ওর বিবেক বাধে না।

মুখটা মুছতে মুছতে উঠে একগ্লাস জল খেল মিনু। দু হাতে চুলগুলো ঝাড়লো। টপটপ করে জলের ফোঁটা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। উঠে পায়চারি করতে করতে বললো : আজ ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, আমাকে যেন চিনতেই পারলো না—তারপর যখন রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম তখন বললো : ওঃ হো তুমি, ভালই হল—বিয়েতে আসছো ত, নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখলাম আগে থেকে, তারপর জিগেস করলো : 'কী করছো, চাকরি ? তোমার মা-বাবা চিরদিনই ত তোমার চাকরির কথা ভেবে এসেছেন'। আমি কি মেয়ে নই সোনাদা, আমি কি মেয়েমানুষ নই, সবাই আমাকে কেন এত অপমান করবে—বলেই জামার বোতামগুলো পটপট করে খুলে ফেললো মিনু। ওর আচরণের নাটকীয়তায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল, আর এক আদিম অরণ্যে যেন জন্তুদের মিছিল দেখতে পেলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরলো মিনু, সাপের মতন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো। আর ঠিক তখনই এক ক্লেদাক্ত গভীর অন্ধকার ভাললাগার মধ্যে ডুবে গেলাম আমি। আমার বিছানা, বালিশ, বইপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল—আর এক অন্ধকার সমুদ্রের ফেনপুঞ্জে দুটি প্রাণী আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগলো। ফিরে যাওয়ার সময় সেদিন মিনু বলেছিল : আমি মেয়ে, মেয়েমানুষ একথা কেউ বুঝলো না। ওর দুচোখে কান্নার আভাস ছিল কিনা বুঝতে পারি নি। ও চলে যাওয়ার পর বালিশে ওর দীর্ঘ সরু একগাছি চুল লেগেছিল, তাই দেখে আমি আমার মাথায় হাত দিয়ে জেনেছিলাম—আমার চুল ত এত সূক্ষ্ম, এত দীর্ঘ হয় না। আর তখনই আমার মন এক করুণায় ডুবে গিয়েছিল।

● ● ● ●

এর পরে যা যা ঘটে ছিল বা যা যা শুনেছিলাম তার কোনটাতেই বিশেষ আমল দিই নি আমি, কারণ আমার মনে হত আমি অনেক অভিজ্ঞ, অনেক প্রাজ্ঞ হয়ে গেছি। একটা বৃহৎ ঘটনার কাছে অন্য সব ঘটনাই ম্লান হয়ে যায়। মাধবী আবার এসে যথারীতি সাবধান-বাণী শুনিয়েছিল : তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছো, মিনুর সঙ্গে তোমার অত মেশামেশি আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমাদের বাড়িরও একটা সুরুচি-কুরুচির প্রশ্ন আছে। ও সেছো মেয়ে, ওকে আমার ঢের জানা আছে।

আমি হেসেছিলাম মনে মনে, বলেছিলাম : জানলেও পুরো জানো না—ওর সঙ্গে আমার তেমন কোন ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নেই যাতে তুমি ভয় পাবে—বলেই নিজের কানে কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম।

মাধবী বলেছিল : ঐ পুরুষালি মেয়েকে কে চাইবে বলো। জানো ত পূর্ণেন্দু ওকে পাত্তা দেয় নি। তাই চুপ করে থাকে আজকাল। দেখি সব সময়ই ওর মুখভার। বাইরে চিনেবাদাম খায়, ফুচকা খায়, আর বাড়িতে এসে বমি করে, হ্যাঁ বমি করে।··· কথাটা শুনে আবার চমকে উঠেছিলাম আমি। আমার মন বলেছিল, কি আশ্চর্য এই মাধবী··· মিনুদের কলঘর, বারান্দা, ঘরদোর সব দেখেও চোখের স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে নাকি—মাধবী কি মেয়ে-মানুষ না। কি ওর চোখের নজর কম।···আমার বুকটা সেদিন চিরে চিরে যাচ্ছিল, ওর মা, মিনুর মা-ও কি মেয়েমানুষ—অতগুলো ছেলেমেয়ের মা, সন্তানধারণপটু সেই বয়স্কা রমণীটি তিনিও কি অন্ধ—না হলে এতদিনেও কিছু বুঝতে পারলেন না। নাকি আমার আন্দাজ ভুল, মিথ্যা। সেই একদিনের অন্ধকার অন্ধকারই থেকে গেছে, অস্পষ্ট থেকে গেছে। এই সংশয় সন্দেহের দোলাচলে কেমন একটা ভয়, একটা নিদারুণ দুঃখ আমার মনের মধ্যে গুমরে উঠেছিল সেদিন।

• • • •

মাধবী আর একদিন এসে বলেছিল—ও যে আর তোমার কাছে আসে না তাতে সত্যিই আমি সুখী। জানো, সেদিন পূর্ণেন্দুর বিয়ে হয়ে গেল। ওদের বাড়িতে বৌ এনেছিল। মিনু কিন্তু হেসে হেসে বেশ কথা বললো। আচ্ছা, ও কি পাগল হয়ে গেছে। আজকাল খুব খুশি-খুশি ভাব ফোটায় মুখে। ভাইবোনদের-প্রতি যেন আদর ওর হঠাৎ বেড়ে গেছে, ছ' মাসের ভাইটাকে কোলে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় ও। মাধবী হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো : কিন্তু, তুমি অত ছটফট করছো কেন !···মাধবী সেদিন আমার বুকের ভেতরটা দেখতে পায় নি।

• • • •

ওর বাবার সঙ্গে সেদিন বাজারে দেখা হয়েছিল, এক-পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন আমাকে : তোমাদের সঙ্গে মিশে মিনুর বোধগম্যি হয়েছে আজকাল। বলেছে পরীক্ষার পরই চাকরিতে ঢুকবে, আমি বলে রেখেছি বড়সাহেবকে। আজকাল ছেলেমেয়ের কি আর ভেদাভেদ আছে—তুমিই বলো। চাকরি চাকরিই, সে ছেলেই করুক আর মেয়েই করুক। আমি ঢুক ঢুক মাথা নেড়েছিলাম। ভদ্রলোককে আমার একটা শকুনি বলে মনে হচ্ছিল, মুখটা থলথলে গোলাকার, চুলগুলো কাঁচাপাকা। আবার খানিক পরে উনি বললেন—ওর মারও সেই মত, বলে বিয়ে-টিয়ে পরে সময়মত দেওয়া যাবে। আর ওকে দেখতেও ত বাচ্চা-বাচ্চা—ইউরোপ হলে ত প্যান্ট কোট পরে ও স্বচ্ছন্দে সৈনিক হয়ে যেতে পারতো।···

এরপর সেই সাবধানী লোকটি কলার খোসা বাঁচিয়ে, নোংরা জল ডিঙিয়ে ধীর পায়ে চলে গেলেন। মনে হল ওঁর হাতের থলেটি খুললে হিসেবী বাজারটাও চোখে পড়বে—লাউয়ের সঙ্গে কুচো চিংড়ি, কুমড়োর সঙ্গে পুঁইডগা ইত্যাদি ইত্যাদি।···

• • • •

যেদিন পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল সেদিন আমার ঘর থেকে ওকে ফিরতে দেখেছিলাম। অনেকবার ডাকলাম—মিনু, মিনু···ও না শুনে হন হন করে চলে গেল। ওকে দেখে কেমন-কেমন মনে হচ্ছিল—ওর পায়ে যেন লজ্জার ঘুঙুর, চোখে সুদূর রহস্যময়তা ! চোখের কোণগুলো বসা, শরীরটাকে সেই অন্ধকার বৃষ্টি-ঝরা রাতটির মতই পেঁচিয়ে নিয়েছে শাড়িতে। সর্বাঙ্গে কেমন এক প্রফুল্লতা, যেন ভোরের পবিত্র স্থলপদ্ম।···

• • • •

তারপর অনেক শোনাকথা শুনলাম। ওর বাবা কী বলেছে, স্কুলের সুধাদি কী বলেছে, মাধবী কী বললো সবই আমি মনে রেখেছি। ওরা কেউ আমার ডায়েরির পাতা ঘাঁটে নি, ওরা আমাকে ঠিকমত জানেও না। হিসেব করে দেখলে ঠিক সেই অন্ধকার রাত্রির পাঁচমাসের মাথায় মিনু আত্মহত্যা করেছে। ওরা হয়ত পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে, এর ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু সবটা বুঝতে পারে নি।

• • •

ওর বাবার প্রতি এতদিনে আমার একটু শ্রদ্ধা হল। শুনলাম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে উনি ওর দেহটা মর্গে পাঠাতে দেন নি, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝরঝর কেঁদে ফেলেছিলেন। আমার মনে হল—ওর বাবাই কেবল ওর আসল কথা বুঝতে পেরেছেন। আমার মনে হল—ওর বাবা, মা, পূর্ণেন্দু, মাধবী, আমি সকলের কাছেই ও ওর মৃত্যুর সাক্ষ্যে বলে গেল ও মেয়ে, ও মেয়েমানুষ, ওর সমস্ত সম্ভাবনা ছিল!

• • • •

আর একটি কথা আমি চালু করলাম যে হঠাৎ অকারণেই আমি মাধবীর সঙ্গে বিয়েতে অমত করেছি।...জানি, ওরা বলবে আমি পাগল, আমি শয়তান।...আমি জানি—আমি তা-ই।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

●

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২

একটি নায়কের জন্ম ও মৃত্যু

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

অন্যবারের মতো সেদিনও আমরা বারীনের বৈঠকখানায় মিলিত হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য সাহিত্যালোচনা। অবশ্য একমাত্র বারীন ছাড়া আমাদের কারুর জীবিকার সংগেই সাহিত্যের কোনই সম্পর্ক ছিলনা। সাহিত্যিক হবার প্রচেষ্টাও প্রথম যৌবনের কবিতার খাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবু মাসে একবার করে আমরা বারীনের কাছে আসতাম। আমার বোন ছন্দা অবশ্য অনেকদিন বলেছে যে বারীনের বৌয়ের হাতের চমৎকার আলুর চপ আর চায়ের লোভেই নাকি আমরা যাই ওখানে। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। বারীনের বৌয়ের রান্নার হাত চমৎকার ছিল সত্যি—কিন্তু রোজই কিছু সে আলুর চপ ভাজতো না। তবে চা এক কাপ করে পেতাম এটা ঠিক।

আসল কথা জীবনে আমরা কেউই তেমন কিছু হতে পারিনি—এই বোধটা আমাদের অহরহ পীড়া দিত। আর সেটা ভোলার জন্যই হয়তো আমরা সাহিত্যালোচনার চেষ্টা করতাম। লিখতে পারি আর নাই পারি, সাহিত্যকে বোঝবার মতো মন আমাদের আছে এই বোধটা তৃপ্ত করতো আমাদের।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বারীন ছাড়া আমরা কেউই প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিক ছিলাম না। অবশ্য বারীনও তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি (খান পাঁচেক গল্প মাত্র ও প্রকাশ করতে পেরেছিল), লেখার চেয়ে লেখার আলোচনাতেই সময় কাটাতো বেশী। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আমরা কিন্তু বিশ্বাসী ছিলাম। জীবিকার জন্য ওকে লেখার ওপর নির্ভর করতে হোত না। ছোট্ট সংসার—পিতৃদত্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ আর বাড়ী ভাড়াতেই চলে যেত।

আমরা মাসে একবার করে আসতাম—সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরিজী বাংলা সাহিত্য নিয়ে বাগবিতণ্ডা হোত। তারপর বারীন পড়ে শোনাতো ওর অর্ধসমাপ্ত কোন লেখা। নয় তো বলতো ওর পরবর্তী গল্পের প্ল্যান। অবশ্য এ বৈঠকে আমাদেরও কিছু সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতাম বারীনকে—বারীন সেগুলি নাড়তো চাড়তো নিজের মনে—যেমন করে অভিজ্ঞ কুমোরেরা মাটির ডেলা টিপে টিপে পরীক্ষা করে। কোনটা ওর পছন্দ হোত না—কোনটা হোত। কোনটা বা গল্পের রূপ নিতে সুরু করেও অকাল মৃত্যু বরণ করতো। কিন্তু তবুও আমরা আমাদের সবটুকু অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে দিতাম বারীনের কাছে—তারপর অধীর আগ্রহে ওর মতামত শুনতাম। আশা করতাম একদিন না একদিন বারীনের কলম মারফৎ আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অমরত্ব পাবে।

এর আগের বৈঠকে আমি বারীনকে বলছিলাম আমার রাণীখেত ভ্রমণের কথা। সেবার পূজোর ছুটিতে দুই সহ-কর্মীর সংগে রাণীখেত গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার মুখে বাস থেকে নেমে দেখেছিলাম হোটেলে সীট খালি নেই। অগত্যা খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আমরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে রওনা হয়েছিলাম জনৈক ইয়োরোপীয় ভদ্রমহিলার "Rustic Boarding" এর উদ্দেশে। বাড়ীটার সেই জনমানবহীন বিরাট আঙিনা—ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের টিমটিমে আলো—আর

সর্বোপরি বোর্ডিং এর সেই অদ্ভুত-দর্শন কর্ত্রী—সব কিছুতেই যেন একটা ছমছমে ভাব। সেসব কথাই বলেছিলাম বারীনকে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বারীন এ নিয়ে একটা গল্প লিখুক।

কিন্তু আজ বারীন সে সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য-করছেনা দেখে অগত্যা আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হোল—"রাণীখেতের সেই ব্যাপারের কথা ভেবেছ কিছু?"

"ভেবেছি—," বারীন বল্লে। "সত্যি কথা বলতে কী পটভূমিকাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে চরিত্রগুলি ঐ পটভূমিকায় খাপ খাচ্ছে না।"

"তাহলে চরিত্র গুলোকে বদলে দাওনা কেন?"

বারীন আহতস্বরে বল্লে—"তোমরা কিচ্ছু বোঝ না। চরিত্রের জন্য পটভূমিকা না পটভূমিকার জন্য চরিত্র?"

অগত্যা চুপ করে গেলাম আমি। একটু পরে বারীন আবার বলতে সুরু করলো—'তার চেয়ে আজ তোমাদের বলি আমার নতুন আইডিয়ার কথা—',

"নতুন আইডিয়া?" আমরা নড়ে চড়ে বসি।

"আধুনিক সাহিত্যের একটা দিক লক্ষ্য করেছ তোমরা?" বারীন প্রশ্ন করলো। "আজকালকার গল্প উপন্যাস যেন আমাদের হৃদয়কে তেমন ভাবে মাতিয়ে তোলেনা যদিও আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিতে সুড়সুড়ি লাগায় ঠিকই। এর কারণ কী জানো? আজকালকার সাহিত্যে যে সব চরিত্রকে আমরা দেখতে পাই তাদের কারুরই চারিত্র্য নেই।

শেখর বল্লে—"ঠিক বুঝতে পারলাম না।—"

আমার বক্তব্য হচ্ছে—আধুনিক সাহিত্যে এমন চরিত্র আমাদের চোখে পড়ে না যাঁরা চরিত্র মহিমায় আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। গত শতাব্দীতে যে সব চরিত্রকে আদর্শ চরিত্র বলে ধরা হোত তারা আজকালকার সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। কারণ হিসেবে সবাই বাস্তবতার দোহাই দেন। মানব চরিত্রের একমাত্র হীনদিক-গুলোই কী বাস্তব? উঁচু ভাবের কোন অস্তিত্বই কী নেই মানব চরিত্রে?"

একটু থেমে বারীন আবার সুরু করল—"তাই আমি ঠিক করেছি এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করবো যাকে সব দিক দিয়ে আদর্শ বলা যায় অথচ যা মোটেই অবাস্তব নয়। তোমরা কী বলো—'

আমরা একযোগে বল্লাম—"ভালোই তো—"

বারীন বল্লে—"ধর, আমার চরিত্রটির নাম ধনঞ্জয়। প্রথমে আমি ধনঞ্জয়ের কৈশোর থেকে সুরু করতে চাই। ওর মা বাবা অনেকদিন মারা গেছেন। থাকে ও দাদুর কাছে। দাদুর বিস্তর টাকাপয়সা—কিন্তু মনটি ভালো। শুধু তাই নয়। ধনঞ্জয়কে সত্যিকারের মানুষ করে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। এহেন দাদুর কাছে থেকে ধনঞ্জয় ছোটবেলা থেকেই মিথ্যা, অসাধুতা আর কপটতাকে আন্তরিক ঘৃণা করতে শিখল। স্কুলে, খেলার মাঠে—যেখানে এতটুকু অন্যায় বা অসত্য দেখতো—বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করতো। স্কুলের মাস্টার মশাইরা ওকে রীতিমত ভয় খেতেন—সহপাঠীরা মন খুলে ওর সংগে গল্প করতো না। মনের দিক দিয়ে ধনঞ্জয় ছিল নিঃসংগ। কিন্তু তাতে এতটুকু দুঃখ ছিল না ওর। মিথ্যা ও অন্যায়ের সংগে সে যে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারছে মাথা উঁচু করে—এই বোধটাই তাকে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি দিত।

আগেই বলেছি ওর মাস্টার মশাইয়েরা ওর সত্যনিষ্ঠাকে সম্মান করতেন,—ওকে সমীহ করতেন যথেষ্ট—'

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—"কিন্তু তার কারণ কী শুধু মাত্র ধনঞ্জয়ের চরিত্র? তার দাদুর বিস্তর টাকা পয়সার কী কোন ভূমিকা নেই এতে?"

বারীন ক্ষুব্ধ স্বরে বল্লে—"আমি এই দিকটা ভাবিনি। আচ্ছা না হয় ধরে নেওয়া গেল যে ধনঞ্জয়ের দাদুর পয়সার

জন্যই ওকে বয়স্করা সমীহ করে চলতেন। কিন্তু তাতে ধনঞ্জয়ের চরিত্রের কোন হেরফের হয় না—”

“তা হয় না বটে —” আমায় স্বীকার করতে হোল।

“তাছাড়া ধনঞ্জয়কে বেশীদিন বড়োলোক দাদুর আশ্রয়ে থাকতেও হোল না। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলো তার চরিত্রবান দাদুর প্রথম জীবনের এক দুরপনেয় কলংকের ইতিহাস। ও জানতে পারলো দাদুর এই বিত্তর অর্থের গোড়াকার কথা। প্রথম জীবনে দাদু এক সহায়সম্বলহীন বিধবাকে ঠকিয়ে ওর বেশ কয়েক-হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। সেই ক’হাজার টাকাই ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে উঠে দাদুকে বিত্তবানের আসনে বসিয়েছে। আর সেই বিধবাটি অসহ্য দারিদ্র্যে কয়েক বছর কাটিয়ে টি. বি. তে মারা গেছেন—আর ওঁর একমাত্র ছেলেটি বিশেষ লেখাপড়া না শিখতে পেরে কোন এক অফিসে পিয়নের কাজ করছে।

এসব কথা ধনঞ্জয় যখন জানতে পারলো তখন ওর মনে দাদুর প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা জন্মাল। দাদুর এতদিনকার সদাচার দানধ্যান সব কিছুই মনে হোল এক অসহ্য ভণ্ডামি মাত্র, ঘৃণা হোল শুধু দাদুর ওপরে নয়—দাদুর এই কলংকিত অর্থের ওপরও। এই অর্থেই ধনঞ্জয় এতদিন জীবন যাপন করে এসেছে একথা ভেবে নিজের ওপরও ঘৃণা হোল যথেষ্ট। শেষে এই মনোকষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে একদিন ও দাদুর আশ্রয় ত্যাগ করলো।”

আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম। বল্লাম “তারপর ?”

বারীন বল্লে “এর পর আর বিশেষ কিছু ভাবিনি। তবে এটুকু জানি যে ধনঞ্জয়ের সত্যি-কারের জীবন এখনই শুরু হোল—”

নির্ম্মল বল্লে-“ধনঞ্জয়কে কী তুমি দেশনেতা করতে চাও বারীন ?”

“ধনঞ্জয় তো নেতা হবেই। কিন্তু তার আগে ওর চরিত্রকে বিকশিত করে তুলতে হবে তো। আর দুঃখ কষ্টের কষ্টিপাথরেই যাচাই হবে যে ধনঞ্জয় নিখাদ সোনা। হ্যাঁ যা বলছিলাম - ধনঞ্জয় দাদুর আশ্রয় ছেড়ে চলে এলো। কিন্তু তখনো ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি।”

নির্ম্মল বল্লে “ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই কলেজে পড়বে ?”

“নিশ্চয়ই পড়বে। আমার ইচ্ছা ধনঞ্জয় শুধু নীতি বোধ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে বিচার করবে এই জগতটাকে। ধনঞ্জয় তাই কলেজে পড়বে—অর্থনীতি অথবা সমাজতত্ত্বে এম. এ. পাশ করে রিসার্চ করবে। হ্যাঁ তোমাদের বোধহয় বলিনি ওর অসম্ভব মেধার কথা—”

শেখর বল্লে—“কিন্তু পড়বে ও কী করে-অন্য কোন কোন আত্মীয় কী ওকে সাহায্য করবে ?”

বারীন বললো—“না ধনঞ্জয়কে তোমরা এখনো বুঝতে পারো নি। ও কারুর কাছে এতটুকু কৃপার প্রত্যাশী নয়। তাছাড়া বলেইছিতো তোমাদের—দুঃখ কষ্টের মধ্যেই মানুষ হতে হবে তাকে। তাই ধনঞ্জয় থাকবে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা মেসের সিঁড়ির নীচের এক ফালি ঘরে। সকাল সন্ধ্যা ছাত্র পড়াবে—দুপুরে যাবে কলেজে, দিনরাত অভাবের সংগে সংগ্রাম করবে ধনঞ্জয়। তারপর একদিন—”

শেখর হটাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলো “তুমি থামো বারীন। ধনঞ্জয়কে ও ভাবে রাখলে সে কোনদিনই বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। স্কুল-ফাইন্যালের পর আমিও ছিলাম অমনি একটা মেসে—দু’বেলা ছাত্র পড়িয়ে খরচ চালাতাম, দু’খানা ধুতি আর দুটো শার্ট ছাড়া কোন জামা কাপড় আমার ছিল না। শীতকালে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে শীত তাড়াতে হোত। দুবেলা মেসের সেই অখাদ্য খাবার ছাড়া টিফিন একদিনও জোটেনি আমার কপালে। আর মেসের মিল চার্জ সময় মতো দিতে পারতাম না বলে প্রায়ই মিল কাটা যেতো। তখন

দু'পয়সার মুড়ি আর কলের জল ছাড়া কিছু জুটতো না আমার।"

"অথচ,"—শেখর নিঃশ্বাস ফেলে আবার সুরু করে—"অথচ পড়াশোনায় আমি ভালই ছিলাম আগে। মেট্রিকে তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, ছেলেবেলা থেকেই সাধছিল আমার—এম. এ. পাশ করে রিসার্চ করবো, প্রফেসর হবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হোল? টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে করতেই এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে আমার সব সম্ভাবনা মিলিয়ে গেল। আই. এ. টা টেনেটুনে প্রথম বিভাগেই পাশ করলাম বটে—কিন্তু বি. এ. তে অনার্স রাখতে পারলাম না। তারপর মনে হোল কী হবে এমন ভাবে যুদ্ধ করে? ক্লান্ত হয়ে একদিন ঢুকলাম এসে এই মারোয়াড়ী ফার্মে ফাটকাবাজীর বিললেখার কাজে।

"তাই তোমাকে বলছি বারীন—ধনঞ্জয়কে তুমি এত কষ্টে পড়তে দিয়োনা। ফুরিয়ে যাবে ও। ওর মেধা ওর বুদ্ধি সব কিছু ভোঁতা হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমারি মতো কোন এক অফিসে—"

"না না—"আঁৎকে ওঠে বারীন—"ধনঞ্জয়ের এমন পরিণতি আমি হতে দেবোনা—,"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি বারীনের ছোট মেয়েটা কখন এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সভা ভংগের ইংগিত এটি। আমরা ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখলাম—দশটা বেজে গেছে। "আমরা এবার উঠি তবে—"বললাম আমি।

বারীন কী-যেন ভাবছিল—অন্যমনস্ক ভাবে বললে—"হ্যাঁ এসো।"

শেখর বল্লে-"ধনঞ্জয়ের সম্বন্ধে কী ঠিক করলে জানিও কিন্তু বারীন—"

"হ্যাঁ জানাবো। এখনো অবশ্য আমি কিছু ভাবতে পারছি না—কিন্তু আমার বিশ্বাস ওকে আমি সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে পারবো। ওর চারিত্র্যে মুগ্ধ হবে তোমরা—প্রেরণা পাবে। হয়তো আগামী বৈঠকেই ধনঞ্জয়ের জীবনের বাকীটা শোনাতে পারবো।"

এর পরের বৈঠক বসতে কিন্তু বেশ দেরী হয়েছিল। বারীন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠলো কিছুদিন। নির্মলকে কিছুদিনের জন্য যেতে হোল বাইরে। সবাই একসাথে হলে পরেই ধনঞ্জয়ের কাহিনী শোনা যাবে এই ঠিক করেছিলাম আমরা। তাই আর বারীনের কাছে যাই নি।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের কথা ভাবতাম আমরা প্রায়ই। ওকে নিয়ে বারীন যে সমস্যায় পড়েছে তার সমাধান কী ভাবে করা যায় এ নিয়েও আলাপ আলোচনা করতাম। আর আশ্চর্যের বিষয় সেই আলোচনার মুহূর্তগুলিতে আমাদের মনেই থাকতো না ধনঞ্জয় একটা কাল্পনিক চরিত্র। ওর অস্তিত্বে আমরাও বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম ক্রমশঃ।

নির্মল ফিরে আসতেই বারীনকে ফোন করলাম আমি। "কবে আসবো আমরা?"

"কাল তো শনিবার,—কালই এসো"-বারীন বল্লে।

ওকে সেদিন খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমাদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা করল ও। আর আমরা বসতে না বসতেই ট্রে তে করে খাবার নিয়ে এলো বারীনের বৌ। আলুর চপ আর পাপড় ভাজা। মহা উৎসাহে আমরা সেই গুলির সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম।

শেখরই প্রথম প্রসংগটা তুললো—"ধনঞ্জয়ের সম্বন্ধে কী ঠিক করলে?"

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো বারীন—"সব দিক ভেবে কী ঠিক করলাম জানো? ধনঞ্জয়কে এম. এ পাশ করতে হবে না—"

"সে কী?" সমস্বরে প্রশ্ন করলাম—

"দেখ শেখর—মানুষের ডিগ্রীটাই কী ওর মনুষ্যত্বের বা জ্ঞানের মাপকাঠি? নাই বা এম. এ. পাশ করলো ধনঞ্জয়—কিন্তু তার জ্ঞান অর্জনের বাধা কোথায়? জ্ঞানতৃষ্ণা

লাইব্রেরী রয়েছে কিসের জন্যে? আর ওকে প্রফেসরই বা হতে হবে কেন? আমি তো ওকে আদর্শ শিক্ষক করতে চাই নি—আদর্শ মানুষ করতে চেয়েছি—"

"কিন্তু ওর উচ্চাশা?"

"গোড়াতে একটু ভুল করেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম ধনঞ্জয়ের উচ্চআশাও বুঝি আর সবারি মত। জীবনে উন্নতি করাই ওর একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভুল করেছিলাম। ধনঞ্জয় ওর সততার আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচুকরে বাঁচতে চায়—এই ওর একমাত্র উচ্চাশা।"

"তাহলে কী করবে ও?"

"আই. এ. টা পাশ করবে অবশ্য। হ্যাঁ সেই মির্জাপুরের মেসে থেকেই। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে ধনঞ্জয়কে সৃষ্টি করতে বসিনি আমি। তাই ধনঞ্জয়কে বাঁচতে হবে সব দুঃখ কষ্টের সংগে সংগ্রাম করে। তাই ঠিক করছি আই. এ. পাশ করে সরকারী অফিসে কেরানী হয়ে ঢুকবে ধনঞ্জয়।"

"আর তারপর এক মেয়ে-কেরাণীকে বিয়ে করে সংসার পাতবে বোধ হয়!" বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করলো শেখর।

"আরে না-না। ধনঞ্জয়ের ওদিকটার সম্বন্ধে এখনো কিছু ভাবিনি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাজে ঢুকে ধনঞ্জয় দেখলো যে ওদের বিভাগের সংগে জনসাধারণের যোগাযোগ রয়েছে নানাভাবে। বিল পাশ করা নিয়ে নানাজনের আনাগোনা হোত। ধনঞ্জয় ভাবলে এখানেই ওর সততার পরীক্ষা হবে। অবশ্য ও যে ধাতুতে গড়া তাতে এ পরীক্ষায় পাশ করা ওরপক্ষে একটুও কঠিন ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হোল সহকর্মীদের নিয়ে—"

"আমি জানি—" নির্মল বলে উঠলো। "আমিও অমনি একটা ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছিলাম কিছুদিন।"

"তাই বুঝি!" অন্যমনস্কের মতো প্রশ্ন করলো বারীণ। "থাক শোন এবার। ধনঞ্জয়ের সহকর্মীদের অসাধু বলা যেতো না হয়তো—তবে ছোটখাট সুবিধে চা পান জল-খাবার এগুলো-একটা প্রথার মতোই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হপ্তাখানেকের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের চোখে পড়লো এ সব। বলি বলি করেও বললো না কিছু ও। কিন্তু এসব প্রসংগ উঠলেই চুপ করে যেতো ও—একটা নির্লিপ্তের ভাব এনে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চেষ্টা করতো। ওর মনের ভাবটা আঁচ করতে পারলো কেউ কেউ।

আর তার ফলেই একটা কাণ্ড ঘটলো একদিন। বিল পাশ হয়ে যাবার পর এক ভদ্রলোক টাকা দিয়েছিলেন পুরো সেক্সনকে লুচি-মাংস খাওয়াবার জন্য। টিফিন টাইমেই ব্যবস্থা হোলো সব, কিন্তু ক্যান্টিনের বয়টা ধনঞ্জয়ের টেবিলে লুচি মাংসের প্লেটটা রাখতেই ও বলে বসলো—"নিয়ে যা এ গুলো, আমি খাবো না।"

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। খাবে না কেন? ধনঞ্জয়ের কী শরীর খারাপ?

কিন্তু ধনঞ্জয় আজ স্পষ্ট কথা বলার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। নিজের মনের সংগে আপোষ চালানো সম্ভব ছিল না বেশীদিন। তাই কোনরকম ভণিতা না করেই ও জানিয়ে দিল যে ঘুষের জিনিষের ভাগ নেয় না ও।

"তার পর, বুঝতেই পারছ, চেঁচামেচি হোল খানিকটা, অবশ্য ধনঞ্জয়ের অটল গাম্ভীর্যে প্রতিহত হয়ে থেমে গেল কিছু পরেই। কিন্তু এর পর সুরু হোল আড়ালে আড়ালে ঠাট্টা বিদ্রূপ। দরকার না হলে কথাও বলতো না কেউ ওর সংগে। অবশ্য এতে ধনঞ্জয় দমলো না একটুও। ছেলেবেলা থেকেই নিঃসংগতায় অভ্যস্ত ছিল ও সে কথা তো আগেই বলেছি।"

"আমি একটা কথা বলবো বারীন?"

"বেশ তো বলো না

"সৎ হওয়া খুবই ভালো। কিন্তু ধনঞ্জয় একটু বাড়াবাড়ি করছে না কি? ওর সহকর্মীদের পক্ষেও তো কিছু বলার থাকতে পারে? হয়তো ওদের

অবস্থা এমনই যে সাধারণ ভাবে লুচি মাংস ওদের একদিনও জুটবে না—"

"মানলাম সে কথা। কিন্তু তবু কোদালকে কোদাল ছাড়া অন্য কিছু বলবে কী? আর আগেই তো বলেছি আপোষ করতে পারে না ধনঞ্জয়—করবেও না কোনদিন—"

"তাহলে বলবো ধনঞ্জয় অবাস্তব—"

"সেখানেই ভুল করছ শেখর—; তোমার আমার সবার মধ্যেই ধনঞ্জয় রয়েছে। হয়তো ছায়া হয়ে। আমি তাকে কায়া দিতে চেয়েছি মাত্র। আচ্ছা নির্মল, তুমিই বলো—তোমার কী কখনো ইচ্ছে হয়নি অমনি করে লুচি মাংসের প্লেট ফিরিয়ে দিতে?"

"হয়েছে বই কী—" নিঃশ্বাস ফেলে নির্মল জবাব দিল। "কিন্তু আমার তো ধনঞ্জয়ের মতো মনে জোর ছিল না। তাই টিটকিরি বিদ্রূপ সহ্য করতে পারিনি আমি। অবশ্য একজায়গায় সীমারেখা টেনেছি নিশ্চয়—।"

আমি বল্লাম "তর্ক থাক না—ধনঞ্জয়ের কী হোল বলো।"

বারীন আবার শুরু করলে—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সহকর্মীদের অসহযোগে ধনঞ্জয় দমলোনা একটুও। বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগলো ও। কিন্তু কিছুদিন পরই ও বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা আর অসহযোগ নয় চক্রান্তে পরিণত হয়েছে। ও বুঝতে পারলো ওর চারদিকে অসংখ্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে অহরহ একটুখানি অসতর্ক হলেই দুর্নীতির অপবাদ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে ওকে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও।

তবুও ধনঞ্জয় কিছুদিন চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একা একজনের পক্ষে চল্লিশজনের সংগে লড়ে যাওয়া সম্ভব হোল না বেশীদিন। অগত্যা ধনঞ্জয় পদত্যাগ পত্র লিখে দিল।"

শেখর বল্লে—"আমি কিন্তু এটা সমর্থন করতে পারলাম না। তুমি বলে এসেছ ধনঞ্জয় ওর আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। কিন্তু এটা কী মাথা উঁচু করে বাঁচা হোল? পদত্যাগ পত্রটি দাখিল করার সংগে সংগেই এটাই কী প্রমাণিত হোল না যে ধনঞ্জয় আর তার আদর্শ পরাজিত হয়েছে?"

বারীন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্ল—"কিন্তু ধনঞ্জয় একা একজনের সংগে লড়বে কী করে?"

শেখর বলে উঠলো—"তার অর্থ তুমি স্বীকার করছ যে সংখ্যার শক্তিই আসল শক্তি?"

ওদের থামাবার চেষ্টা করে আমি বল্লাম "বারীন—এ তর্কের শেষ হবে না কোনদিন। ধনঞ্জয় এবার কী করবে সেটা বরং ভাবো।"

"সেকথাই তো ভাবছি—" চিন্তাকুল স্বরে বারীন বল্লে। "আচ্ছা তোমাদের কী মনে হয়?"

নির্মল বল্লে—"আচ্ছা, আমি একটা কথা বলবো?"

"বলো না—"

"ধর, এমনও তো হতে পারে যে ধনঞ্জয়ের সততার কথা শুনে খুব বড়ো একজন বিজনেসম্যান ওকে মোটা মাইনের চাকরী অফার করলেন? ধরনা কেন—যে ভদ্রলোক ধনঞ্জয়ের অফিসে লুচিমাংস খাওয়ার টাকা দিয়েছিলেন ঘটনাটা জানতে পেরে তিনিই ধনঞ্জয়কে ভালো একটা চাকরী দিলেন? তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়

আমি বল্লাম—"কথাটা মন্দ বলেনি নির্মল। ভেবে দেখ বারীন। আরও কী সুবিধে জানো? এ চাকরীতে মালিকের সক্রিয় সমর্থন থাকার ফলে সহকর্মীদের বিরুদ্ধতা কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। আগের অফিসে যে কারণে ধনঞ্জয় হেরে গেল সে কারণগুলি এখানে অনুপস্থিত।"

বারীন কিছুক্ষণ ভাবলে, তারপর বল্লে—"না ভাই; সমস্যাটার সমাধান এ ভাবে হবে না। সেই বিজনেসম্যানটি ধনঞ্জয়কে যতোই সৎ এবং বিশ্বস্ত দেখতে চান না কেন, নিজে সব সময় সদাচরণ করবেন কী? ধর ও'র কন্ট্রাক্টরী বিজনেস, ফার্স্ট ক্লাশ ইটের বদলে থার্ড ক্লাশ ইট দিয়ে ভদ্রলোক যখন বেশ দুপয়সা ঘরে তুলবেন ধনঞ্জয় সেটা সহ্য করতে পারবে

কী ? কিংবা ওঁর ওষুধের কারখানা,—যখন ওষুধে ভেজাল মেশানো হবে—"

শেখর বল্লে—"অর্থাৎ ধনঞ্জয় এখানেও হারবে—এই তো ?"

বারীন আহত স্বরে বল্লে—"ধনঞ্জয়কে তুমি বুঝতে পারছ না শেখর। অন্যায়ের সংগে সে আপোষ করবে কী করে ? যদি করে তবে সে কী আর ধনঞ্জয় থাকবে ? জানি না কেন তুমি ওকে আক্রমণ করছ শুধু শুধু। না কী ধনঞ্জয় প্রফেসর হয়নি বলে ?"

"তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ বারীন। ধনঞ্জয়কে শুধু শুধু আক্রমণ করার কোনই ইচ্ছে নেই আমার--" শেখর বল্লে, "আমি শুধু এ কথাই বলতে চাইছি যে ধনঞ্জয়ের আদর্শ যদি সব জায়গায় পরাজিতই হবে তবে ধনঞ্জয়কে সৃষ্টি করার অর্থ কী

"কিন্তু একে তুমি পরাজয় বলে ভাবছ কেন ?"

"পরাজয় ছাড়া কী ? মানলাম সে নিজে শেষ পর্যন্ত খাঁটি সৎ রইলো। মানলাম সে সত্যিই একটা আদর্শ চরিত্র কিন্তু এই আদর্শ চরিত্রের দাম কতটুকু ? ধনঞ্জয়ের আদর্শ যদি আশেপাশের একটি লোককেও না অনুপ্রাণিত করতে পারে—ওর জগতের একটুকরোও যদি ও বদলাতে না পারে—তবে কী লাভ হলো ধনঞ্জয়কে সৃষ্টি করে ? আমরা সবাই যেমন আছি তেমনি যদি থাকবো তবে ধনঞ্জয় কেন শুধু শুধু আদর্শের আস্ফালন করবে-যে আদর্শ কারুর এতটুকু উপকারে আসবে না—এমন কী ধনঞ্জয়েরও না ? কী পাবে ধনঞ্জয় এই আদর্শের কাছ থেকে—শুধু দুঃখ বেদনা আর গ্লানি ছাড়া ? অবশ্য খানিকটা আত্মপ্রসাদ হয়তো আছে—তবু বলবো এ অর্থহীন—অর্থহীন।"

এরপর বারীন আর শেখরের তর্কটা ধনঞ্জয়কে ছাড়িয়ে দার্শনিক কচকচি নিয়ে পড়লো। জীবনের অর্থ কী-দুঃখ বেদনার কতটুকু মূল্য—আমাদের জীবনে—সুখী হওয়াই কী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি যে আমাদের মনেও কখনো কখনো জাগতো না তা নয়। কিন্তু শেখর আর বারীন দুজনেই এ বিষয় অল্পবিস্তর পড়াশোনা করেছিল এবং দু'চার জন মনীষির মতামতের সংগেও পরিচিত ছিল। ফলে ওদের তর্কটা অন্ততঃ আমার কাছে নেহাৎ অবাস্তব আর পুঁথিঘেষা বলে মনে হচ্ছিল। কেন জানিনা, আমার সব সময়েই মনে হোত এ প্রশ্নগুলির উত্তর নেই। কিন্তু দেখলাম শেখর আর বারীন দু জনেই মনে করে এ প্রশ্নগুলির উত্তর আছে এবং দুজনেই নিজ নিজ উত্তরকে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করে।

ফলে সেদিন সারাটা সন্ধ্যা ধনঞ্জয়ের কথা আর ভাবাই গেল না। শেখর আর বারীনের তর্ক ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমরা ওদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করলাম। পর্দা ঠেলে বারীনের মেয়ের ছোট্ট মুখটাও দু'একবার উকি দিয়ে গেল। অথচ শেখর আর বারীনের থামার কোন লক্ষণ নেই। শেষে নির্মলকে ইশারা করে আমি উঠে দাঁড়ালাম—বল্লাম "এবার চলি আমি—কাজ আছে একটু—"

"আমিও উঠছি—" নির্মল বল্লে।

অগত্যা শেখরও উঠলো। কিন্তু যাবার আগে বলে গেল—"আমার প্রশ্নগুলির উত্তর তোমাকে দিতেই হবে বারীন। আর উত্তর দিতে গেলেই বুঝবে যে ধনঞ্জয়কে যে-ভাবে তুমি সৃষ্টি করতে চাইছ তা হবে সম্পূর্ণ অবাস্তব—এবং নিরর্থক।"

এর পরের মাসে বারীন কিন্তু ওর ওখানে যাবার জন্য আহ্বান জানালো না। এমন কী কোন খবরও পাঠালো না। আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বারীনের কী আবার কোন অসুখ বিসুখ করলো ? নির্মল আবার কী একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। শেখরকে বল্লাম—"চলো, বারীনের ওখান থেকে ঘুরে আসি।"

শেখর বল্লে— "আজ তুমি একাই যাও অশোক, আমার

হাতে কতগুলো কাজ আছে,—পরে নির্মল এলে সবাই মিলে আবার যাবো 'খন।

অগত্যা আমি একাই গেলাম বারীনের বাড়ী। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল বারীনের বৌ। জিজ্ঞেস করলাম—"বারীন ভালো আছে তো?"

"ভালো আর কই"—ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল বারীনের বৌ। "দিনরাত শুধু আকাশ পাতাল ভাবেন বসে বসে। কী যে হয়েছে। আর লেখাও তো শিকেয় উঠেছে। খবর দিয়ে দিচ্ছি, আসবে এক্ষুণি বসুন আপনি—"

বারীন এলে ওর চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। অনেক রোগা হয়ে গেছে এ ক'দিনে। চোখে মুখে একটা অপরিসীম ক্লান্তি মাখানো।

"কী হোল তোমার বারীন? কোন খবর দেওনি যে? বৌদি অনুযোগ করে গেলেন দিনরাত খালি কী সব ভাবো—"

"ভাবি ধনঞ্জয়ের কথা। ও যেন আমাকে পাগল করে ছাড়বে—"

'কেন কি হোল ধনঞ্জয়ের?"

"দেখ অশোক, সেদিন তোমরা যাওয়ার পর থেকে ধনঞ্জয়কে নিয়ে অনেক ভেবেছি; ও এবার কী করবে? ব্যবসা? না। তাহলে তো ওর সমব্যবসায়ীরা ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। আর হয়তো ওর সততার সুযোগ নিয়ে ক্রেতারাও ওকে ঠকিয়ে যাবে। তবে কী ধনঞ্জয় রাজনীতি করবে? দেশনেতা হবে? কিন্তু জানো অশোক যতোই ভাবতে লাগলাম দেখলাম যে আজকালকার রাজনীতিতে ধনঞ্জয় একেবারে অচল। কোন গোষ্ঠীর মতকেই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারবে না ও। বিপক্ষের মতে বিন্দুমাত্র সত্য থাকলেও সে তা স্বীকার করবে। আজকালকার দিনে নেতা হওয়ার পক্ষে এটা নিশ্চয়ই কোয়ালিফিকেশন নয়। তা ছাড়া কাদের নেতা হবে ধনঞ্জয়? যারা সততার আদর্শকে সুবিধা মত মেনে চলে যায়—অন্তর থেকে বিশ্বাস করেনা তাদের? আর রাজনীতি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি নয়, কূটনীতি মাত্র সে তো জানো? কিন্তু এই কূটনীতির সংগে ধনঞ্জয়ের আদর্শের মিল কোথায়?

"তাহলে কী করবে এখন।"

"জানো অশোক—শেখরের মত আমি মানি না, আদর্শ থেকে সুখ না পেলে সে আদর্শের কোন মূল্য নেই একথা আমি স্বীকার করি না। করবোও না। কিন্তু জানো—যতোই ভাবতে লাগলাম ততোই দেখলাম যে ধনঞ্জয়কে আমাদের চেনা জগতের কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছি না। অহরহ সংগ্রাম করে নিজে সে নিখাদ থাকছে বটে তবু ওকে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে আসতে হচ্ছে প্রতিবার।"

'কিন্তু তুমিই তো বলেছ বারীন এটা ধনঞ্জয়ের পরাজয় নয়—আপোষহীন মনোভাব মাত্র?'

বারীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"কিন্তু ধনঞ্জয় যদি কোথাও টিকতে না পারে তবে কী হবে কোথায় যাবে ও? কী করবে? আর যদি অহরহ যুদ্ধ করতে করতে একদিন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে? যদি সে নতি স্বীকার করে?"

দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বারীন আবার বললে—"ধনঞ্জয়ের এমন পরিণতি হতে দিতে পারবো না আমি। তার চেয়ে—তার চেয়ে ধনঞ্জয়কে সৃষ্টি করবো না আমি—করবো না—"

"কিন্তু বারীন—'

"না অশোক, হয়তো শেখরের একটা কথা সত্যি, ধনঞ্জয় আমাদের জগতের এক কণাও বদলাতে পারবে না—সে চেষ্টা করলে একটি বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যাবে ও। তার চেয়ে নাই বা থাকলো ধনঞ্জয়—"

বারীনকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মনে হোল ধনঞ্জয় নয়—বারীনই হেরে গেছে। আর শুধু কী বারীন! আমার মনে হোল আমরাও হেরে গেছি। একটা প্রদীপের শিখার মতো জ্বলছিল ধনঞ্জয়—আমাদের সবাইকে নিরাশ করে শিখাটা হঠাৎ নিভে গেছে।

বারীন খবরের কাগজটা টেনে নিলে হয়তো যাতে ওর মুখটা দেখতে না পাই সেজন্য। তার পর বল্লে—"ওদের তুমি খবরটা দিয়ে দিও অশোক।"

পুস্তক পরিচয়

বাঙ্গালী প্রসঙ্গ

বাঙালী। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

রূপা অ্যাণ্ড কোং কোম্পানী। কলিকাতা ১২। ছয় টাকা। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৯, পৃ. ১৭২।

এক

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নেই বলে দুঃখ করেছিলেন। ইতিহাস না বলে বরং বলা চলে বাঙালীর ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য একথার প্রমাণ। দেবমহিমা এবং কালবিস্মৃতি সে যুগের সাহিত্যে একটা তমসার সৃষ্টি করেছে। না পাওয়া যায় কবিদের ব্যক্তি পরিচয়, না পাওয়া যায় তাদের দেশকাল এবং রচনার সুনিশ্চিত নিদর্শন। অনুমাননির্ভরতা শেষ পর্যন্ত তাই আমাদের আশ্রয় হয়ে ওঠে।

নতুন যুগে বঙ্কিম ইতিহাসসন্ধানের একটা পথ নির্দেশ করে গেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলতে কতকগুলি উপাদানের প্রশ্ন আসে। তথ্য আহরণ, তথ্য নির্বাচন এবং তথ্যগত ব্যঞ্জনা বা সত্যবিশ্লেষণ। সে বিশ্লেষণে চাই আবার তীক্ষ্ণ যুক্তি, বাস্তববুদ্ধি এবং নিরাসক্তি। কারণ নিরাসক্ত মন বা পক্ষপাতহীনতা ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমের মধ্যে নির্ভুল না হলেও এ পন্থার পরীক্ষা লক্ষ্য করি। এই পন্থার পরবর্তীকালে বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করার প্রয়াস দেখা গেছে। বিগত লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদশাস্ত্রী (প্রাচীন বাংলার গৌরব), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলার ইতিহাস), বিপিনচন্দ্র পাল (নবযুগের বাংলা), ক্ষিতিমোহন সেন (বাংলার সাধনা, চিন্ময় বঙ্গ) প্রমুখ ব্যক্তির নাম করা যায়। জীবিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য), রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলা দেশের ইতিহাস), রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (বাংলা ও বাঙালী, বিশাল বাংলা), নীহাররঞ্জন রায় (বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব) প্রভৃতির নাম।

এঁদের পন্থার অনুসরণ করে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বাঙালী জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত, ১৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর পরিশিষ্ট বাদ দিলে আলোচনা ১৫৫ পৃষ্ঠার পরিসরেই নিবদ্ধ। তবে এই স্বল্লায়তনের মধ্যেই লেখক বাঙালীর একটি যথার্থ পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনায় উপরি-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পদ্ধতি বর্তমান। আলোচনাধারা থেকে কিন্তু আরেকটি জিনিস ধরা পড়ে। নানা বাধাবিপত্তি, দুর্গতি-দুর্গতির মধ্যে আলোড়িত যে বাংলা এখনো বেঁচে আছে, তাকে লেখক ভালোবাসেন। এদেশের ঐতিহ্যে তাঁর শ্রদ্ধা আছে, অবনতিতে তিনি ব্যথিতচিত্ত, আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। এই জননীপ্রেমকে যদি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পক্ষে বাধা বলে ধরা হয়, তবে এটি লেখকের মনোরম ত্রুটি। এই 'ত্রুটি'ই গ্রন্থটির প্রাণ।

দুই

'বাঙালী' গ্রন্থ তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব—রাষ্ট্র ও সম্পদ; আলোচনাক্রম—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক

যুগ, সমস্যা। দ্বিতীয় পর্ব—সমাজ ও সংস্কৃতি ; আলোচনাক্রম—বৈশিষ্ট্য, সমাজের রূপ ও রূপান্তর, আজব শহর, সংস্কৃতির ধারা, আধুনিক সংস্কৃতি, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ভবিষ্যৎ। তৃতীয় পর্ব—পরিশিষ্ট; বিষয়ক্রম—মানচিত্র ও টীকা, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য প্রথম দুটি পর্বেই অভিব্যক্ত। তৃতীয় পর্বে অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে ১৬৬০, ১৭৩০, ১৯০৫, ১৯১২ এবং ১৯৪৭-এর বাংলার ৫টি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে। এ মানচিত্রগুলিতে বিভিন্ন সময়ে বাংলার সীমাপরিবর্তনের, বিশেষতঃ নদীবিপ্লবের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় নিহিত।

প্রথম পর্বে রাষ্ট্র ও সম্পদের পরিচয়। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বাংলার রাষ্ট্রশক্তির নানা উত্থান-পতন, শাসন-শোষণের নানা জটিল প্রক্রিয়ার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালী যে ভীরু সমরবিমুখ জাতি নয়, তা পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বের রাষ্ট্রধারার বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গুপ্তযুগে পশ্চিমবঙ্গের সিংহবর্মা ও তৎপুত্র দেববর্মার শৌর্য, তারপর রাজা শশাংকের বীরত্ব উল্লেখযোগ্য। পালরাজা এবং সেনরাজাদের রাষ্ট্র-শক্তিও গৌরবদীপ্ত। এমনকি, মুসলমান যুগে রাজা গণেশের মত বীরও আবির্ভূত হয়েছিলেন। মোগলযুগে বার ভুঁইয়াদের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং শক্তির কথা সগৌরবে স্মরণযোগ্য।

কিন্তু অধিকাংশ রাজার শাসনকাল খুব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তার কারণ বিভিন্ন নরপতির মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা, গৃহবিবাদ, নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার, অদূরদৃষ্টি এবং সর্বশেষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ। মুসলমানদের নবদ্বীপ বিজয় সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অবাস্তব হলেও এর মধ্যে উপরি-উক্ত অন্তর-দুর্বলতার ইঙ্গিত নিহিত। রাজা লক্ষ্মণ সেন ভীরু বা দুর্বল ছিলেন না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাঁর শোচনীয় পরিণামের জন্যে দায়ী। মোগল যুগে প্রতাপাদিত্যের মত বীরকেও মানসিংহের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তার হেতু প্রতাপাদিত্যের নিজস্ব ক্ষমতাদম্ভ, আভ্যন্তরিক কলহ এবং সহযোগীদের বিশ্বাস-ঘাতকতা। ১৭৫৭তে পলাশীপ্রান্তরেও তো এই বিশ্বাস-ঘাতকতারই নগ্নরূপ দেখা গেছে। তবু বাঙালীর শৌর্য এবং স্বাধীনতাকামনাকে খর্ব করে দেখা চলেনা। স্বাধীনভারতেও অন্যান্য অঞ্চলের নামে সেনাবাহিনী গঠিত হলেও বাঙালী পল্টনের দাবী উঠলেই বড় কর্তাদের মুখে যেন অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু ইতিহাস এই অবিশ্বাস সমর্থন করে না। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় বাঙালী বীরত্বের যে কীর্তিগাথা গেয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই কীর্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

বাংলার অর্থনীতি কেমন ছিল তারও পরিচয় দিয়েছেন এই পর্বে। কৃষিসম্পদ এবং কুটিরশিল্পই বঙ্গীয় অর্থনীতির মূল আশ্রয় ছিল। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে এই অর্থনীতি কি রূপ গ্রহণ করেছে, তার সুপরিমিত আলোচনা আছে গ্রন্থটিতে। প্রাক্ বৃটিশ এবং উত্তর বৃটিশকালের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় দেখিয়েছেন ইংরেজ কি অভাবনীয় নিষ্ঠুরতায় সচেতনভাবে এ দেশের সম্পদ হরণ করেছে। শোষণে করেছে রিক্ত আমাদের। বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কুটির-শিল্প হয়েছে অবলুপ্ত। বিদেশী পণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ পরাহত। অথচ আমাদেরই শোণিত শোষণ করে ওরা নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধির উচ্চ স্তরে স্থাপন করেছে। বৃটিশ শোষণের তিনটি প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করেছেন লেখক—১) প্রত্যক্ষভাবে শোষণ ; ২) বিদেশী বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস এবং ৩) বিদেশী মূলধনের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে পরোক্ষভাবে শোষণ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতির চক্রান্তের ফলে আমাদের অর্থনীতিতে পরাশ্রয়ীবৃত্তি অনিবার্য হয়ে

উঠেছে। বিশেষতঃ তৃতীয় প্রণালীর শোষণ স্বাধীনতা-উত্তর দেশেও অব্যাহত গতিতে চলেছে। এই সংকট থেকে আমাদের অর্থনীতিকে মুক্ত করার মত বলিষ্ঠ পরিকল্পনা এখনো নির্ধারিত হয়নি এবং হওয়াও খুব কঠিন। কারণ পরাশ্রয়ের রাহুগ্রাস থেকে অব্যাহতি লাভ করাই এখন দারুণ সমস্যা।

বৃটিশ শাসনে বাংলার ক্ষতি সর্বাধিক। কলকাতার নাগরিক জীবনের আবহাওয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ভালো-মন্দ বাঙালীকে সর্বাগ্রে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতাবোধ, নবমানবতার চেতনা তাই এখানেই প্রথম জেগেছিল। আর এই জাগ্রত বাংলাকে অবদমিত করার জন্তে পর্বে পর্বে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। বঙ্গবঙ্গ, বাংলা ভাষাপ্রধান অঞ্চল-সমূহকে অন্যপ্রদেশভুক্ত করা, শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী-বিরোধের জন্মদান এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ বপন—এসবই পরিকল্পিতভাবে বাঙালী দমনের চক্রান্ত। স্বাধীন ভারতে বাংলা আজ তাই রিক্ত, রক্তাক্ত আর দিশেহারা। পূর্ব ও পশ্চিমে খণ্ডিত বাংলা। অথচ নদীমাতৃক বাংলার উভয় অংশের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোন দিক দিয়েই বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না।

বাংলার অর্থনীতি এবং বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রণে নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নদীবিপ্লব বা নদীপথের পরিবর্তনে কত সম্পন্ন শহর অবলুপ্ত। গঙ্গা আর সরস্বতীর বিপ্লবে তমলুক আর সপ্তগ্রাম স্বপ্নকল্পনায় পরিণত। পশ্চিমের নদী শুকিয়ে পূর্বে প্লাবন ঘটাতে পারে। নদীর সঙ্গে সংগ্রামে জীবনেও একটি গতিময়তা, সচলতা। এ সচলতা বিভক্ত বঙ্গে বাধাহত। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পপ্রধান, পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান। কাঁচা মাল পড়ে রইলো ওখানে, শিল্প এখানে। এভাবে উভয় বঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ এই তো চেয়েছিল বিভেদবাদী বৃটিশ রাজনীতি।

কিন্তু এ বিচ্ছেদ কৃত্রিম। সংকটাবসানের দিগন্ত দৃশ্যমান। এ প্রসঙ্গে শ্রীঘোষের নিম্নোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক যুক্তিনির্ভর :

"পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রগঠনের পর দ্রুত বর্ধমান মুসলমান মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক সংকটের দিনে শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না ; আর তা ছাড়া তাদের মধ্যে অনেকেরই মধ্যবিত্ত ঐতিহ্য নেই। পূর্ববঙ্গে সেই জন্য শ্রেণীবিরোধ প্রখর হতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত উন্নততর ও দৃঢ়তর। কিন্তু ১৯৩৯ এর পর থেকে নানাকারণে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এখানকার নিম্নমধ্যবিত্ত এমন বিপন্ন হয়েছে যে নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে তার পার্থক্য, দিন দিন কমে আসছে। তা ছাড়া, মধ্যবিত্তের মধ্যে বামপন্থী অসন্তোষ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের আকার নিচ্ছে। এইসব ব্যাপারের মধ্যদিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে যে ঐতিহাসিক শক্তি পুঞ্জীভূত হবে তার আঘাতে আগামীযুগে বিপ্লবী পরিবর্তন হতে বাধ্য। র‍্যাডক্লিফের কৃত্রিম বিভাগের ভুল হয়তো এইখানেই ধরা পড়বে ; দু পক্ষের অসুবিধার ভিতর দিয়েই হয়তো জাগ্রত হবে শুভ সমাজবুদ্ধি ও রাজনৈতিক কল্যাণ।" (পৃঃ ৫৪-৫৫)

লেখক বিশ্বাস করেন, 'ইংরেজ পরিত্যক্ত ভারতের অভিশপ্ত বাংলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের বাংলা'। বাংলার প্রাণশক্তির যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তাতে আস্থা রেখে আমরাও এই ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রত্যাশারত।

তিন

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম সমাজ ও সংস্কৃতি। এখানে প্রধানতঃ বাংলার সমাজবিন্যাস এবং সংস্কৃতির রূপসন্ধান। সংস্কৃতিকে কেউ বলেন ঐহিক জীবনের প্রয়াস, কেউ বলেন মানসচৈতন্যের প্রকাশ। আমাদের ধারণায়, মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের রূপই হল সংস্কৃতি। সেই বিকাশে অধ্যাত্মজগৎ এবং বাস্তবপৃথিবী উভয়েরই সমান অবদান। তারই বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করি সাহিত্যে, শিল্পে,

সমাজভাবনায়, রাষ্ট্রচিন্তায়, অর্থনৈতিক প্রয়াসে, আচার-বিচারে এবং ধর্মে।

বাঙালী সংস্কৃতির একটি প্রধান কথা হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।' (১০ পৃষ্ঠায় লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত) একটি আচার-সর্বস্বতামুক্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং উদার মানবদৃষ্টি বাঙালী সংস্কৃতির প্রাণ। বিপিনচন্দ্র পাল এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন, 'এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই।' (নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৭)

ইংরেজ শিক্ষার ফলে বাংলার জাগরণ এসেছিল সর্বাগ্রে। কারণ এই শিক্ষা 'আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে' জাগিয়ে দিয়েছিল। বাংলার রেনেসাঁসে পাশ্চাত্য শিক্ষার একক মাহাত্ম্যকীর্তনে যাঁরা সহস্রমুখ তাঁরা বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি অনুধাবন করলে সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

বাঙালী জাতের যন্ত্রণাকে কোনকালে প্রশ্রয় দেয়নি। বল্লালী কৌলীন্য তাই তার কাছে 'বল্লালী বালাই'। বাঙালীর রক্তে অসংখ্য জাতির মিশ্রণ। এই মিশ্রণ তার মানসিক জড়ত্বমুক্তির এক প্রধান কারণ। প্রাচীন যুগে ঘটেছে আর্য-অনার্যের রক্তমিশ্রণ, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের রক্তমিশ্রণ। উচ্চজাতির অত্যাচারে ধর্মান্তরিত মুসলমান রক্তের সম্পর্কে আসলে বাঙালী হিন্দু।

লেখক তাই আজকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কলুষিত হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ম্যাক্‌কার্লেন রক্ত পরীক্ষা করে বলেছেন যে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি নয়, রক্তের কোনো প্রভেদ নেই।' (পৃঃ ৮৪) একথা শুনলে বোধ হয় কৌলীন্যগর্বিত উভয় দলই আতঙ্কিত হবেন। কিন্তু ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথা বৈজ্ঞানিক সত্যকে তো অস্বীকার করা যাবেনা। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তাই 'রক্ত, পরিবেশ, ঐতিহ্য, যৌথসংস্কৃতি ও যুগধর্ম অস্বীকার করে ইসলামী সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা আত্মঘাতী হতে বাধ্য।' (পৃঃ ৯৫) সেই আত্মহননে আজ দ্বিখণ্ডিত বাংলার দেহ রক্তকলঙ্কিত। আর তা দেখে বিতাড়িত বৃটিশের কি আত্মতৃপ্তি হচ্ছেনা? পাকিস্তানের জনক কি অতখানি কল্পনা করতে পেরেছিলেন?

মুসলমান আমলের প্রথমদিকে হিন্দুর ওপর অত্যাচার যে না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে বিজেতা আর বিজিতের সহাবস্থান এবং সমন্বয় শুরু হয়েছে। সমাজ-জীবনেও গুরুতর কোনো পরিবর্তন দীর্ঘ ছ শ বৎসরের মুসলমানী শাসনে হয়নি। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাচীন পদ্ধতি বজায় ছিল, সমাজজীবনও ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। কিন্তু বৃটিশ আমলে সমাজজীবনের আমূল রূপান্তর ঘটলো। পুরনো সমাজবিন্যাস গেল ভেঙে। গ্রামীণ মানুষ হলো শহরমুখী। মহানগরীর দুর্নিবার আকর্ষণে গ্রাম হ'ল অবহেলিত। শ্রম-শিল্পের প্রভাবে কুটির শিল্প নির্জীব। কিন্তু সমাজের এই রূপান্তর বাংলার কল্যাণ করেনি। গ্রামগুলি হয়েছে প্রাণহীন, অন্য দিকে শিল্প ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ। আধুনিক শিল্পযুগের প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে বৃটিশ শাসক-কুল, কিন্তু তার আশীর্বাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করেছে যথাশক্তি।

আধুনিক যুগে বাংলার প্রাণকেন্দ্র হয়েছে 'আজবশহর' কলকাতা। গ্রামপ্রাণ বাংলার হৃদস্পন্দন আর গ্রামে ধ্বনিত হয় না, শহরে তার দ্রুত প্রতিধ্বনি। লেখক আলালের ঘরের দুলাল (প্যারীচাঁদ মিত্র), হুতোম প্যাঁচার নক্সা (কালীপ্রসন্ন সিংহ) এবং সে যুগের সাময়িক ও সংবাদপত্রাদি থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক জীবনের বিকৃত রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুলক্ষণও যে ছিল না, তা নয়। তার পরিচয়ও লেখক

দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দু কলেজের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য-শিক্ষা এবং ইংরাজী ভাষার স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। নব্যবাংলার (ইয়ং বেঙ্গল) প্রাথমিক আত্মবিস্মৃতি যখন কাটলো তখন পাশ্চাত্য, সংস্কৃতিকে নিজস্ব ভাবধারার সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা চললো। সে পথের দিশারী রামমোহন। তিনি হিন্দুকলেজের ছাত্র নন, অথচ নতুন বাংলা তাঁরই সৃষ্টি, নতুন ভারতেরও জনক তিনি। তারপর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর; ধর্মান্দোলনে কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ; সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ নবযুগচেতনাকে বিশ্বপটভূমিকায় এবং মানবতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করলেন। তাঁদের মিলিত প্রয়াসে বাঙালীর চিরন্তন প্রাণেরই জয়যাত্রা লক্ষ্য করি। নতুন পথে, নতুন পরিবেশে বাংলা চলতে ভয় পায়নি কোনোদিন।

দেশবিভাগ এই চলার পথে এক দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটিশ সৃষ্ট এবং আমাদের মূর্খতাপুষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভেদ বহুকালসঞ্চিত ঐক্য ও সমন্বয়ের ধারাকে চোরাবালিতে ব্যাহত করেছে। লেখক ব্যথিতহৃদয়ে এই সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। আর বলেছেন—পথসন্ধানের পালা আসন্ন। বৈচিত্র্য, স্বাধীনতাস্পৃহা, সমন্বয় এবং সর্বোপরি মানবতা-বোধ বাঙালী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম সব কিছুতেই রূপায়িত।

বাঙালীকে ভবিষ্যতে তার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা-দান করার মধ্যেই সংকটত্রাণের আশ্বাস নিহিত। পথ-সন্ধানীদের এই লক্ষ্য সামনে রেখেই অগ্রসর হতে হবে। 'বাঙালী' গ্রন্থের লেখক এ দায়িত্ব সম্বন্ধেই প্রভূত পরিশ্রমে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন।

চার

'বাঙালী' গ্রন্থে বিষয়বস্তুর মোটামুটি একটি চিত্র পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস এ পর্যন্ত করা হ'ল। এবার বইটির রচনারীতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এ বিচারে গুণ-দোষ দুই-ই লক্ষণীয়।

ভাষার প্রসাদগুণ এবং সাবলীলতা প্রশংসনীয়। ভাষার জন্যে বক্তব্য কোথাও অস্পষ্ট থাকেনি। ভাষণ সংক্ষিপ্তি বইটির আরেকটি বড় গুণ। লেখক বহুসূত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। আর সেই তথ্যগুলির সহায়ে খুব অল্প-কথায় বক্তব্য প্রস্তুত করেছেন। অনাবশ্যক বিবৃতিতে তাই বইটি গুরুভার হয়নি। প্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলি সুনির্বাচিত এবং কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রেখেই তারা বিষয়বস্তু প্রকাশে সহায়ক।

ওপরে যে গুণের কথা বলা হ'ল, তাই স্থানে স্থানে আবার ত্রুটির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষণ সংক্ষিপ্তি মাঝে মাঝে সাধারণ পাঠকের বক্তব্য উপলব্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। সংক্ষিপ্তি প্রশংসনীয়, কিন্তু তা যেন কার্পণ্যের স্তরে না পড়ে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতিতে খুব পারঙ্গম না হলে অনেক জায়গায় বক্তব্য অনুধাবন করা কঠিন। সূত্রাকারে উপস্থাপিত বিষয়ের মর্মোদ্ধার করা একমাত্র বিদগ্ধজনের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু অবিদগ্ধ সাধারণ মানুষ কি এই বই থেকে বঞ্চিত থাকবে? পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে কিছু সংস্কার সাধন করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করেও মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ বক্তব্যবিস্তার সম্ভব ছিল। কারণ অনেক জায়গায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পুনরুক্তি বর্জন করলে প্রয়োজনীয় বক্তব্যগুলি অধিকতর প্রাঞ্জল করা যেত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এবং সাম্প্রদায়িক কলহের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের দীর্ঘধারায় হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় চলছিল। বৃটিশসৃষ্ট ভেদনীতি সেই সমন্বয়কে বিনষ্ট করে বিরোধের বীজ বপন করল, যার পরিণাম '৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, বঙ্গবিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক

বিশ্বের। এই সমস্যার উল্লেখ দেখি বহুবার। গ্রন্থের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নানা জায়গায় এই একই বিষয়ের পুনর্কথন মাঝে মাঝে পীড়াদায়কই মনে হয় (প্রথম পর্ব—পৃষ্ঠা ৩১, ৩৩, ৩৪, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬১ ; দ্বিতীয় পর্ব—পৃষ্ঠা ৯২, ৯৩, ৯৫, ১১২, ১১৫, ১৩১ ইত্যাদি)। এ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও পুনরুক্তি বর্তমান। দ্বিতীয় পর্বে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য শীর্ষক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটির প্রায় সমস্তটাই (পৃ ১৩৭—১৪০) গ্রন্থবর্ণিত বিষয়সমূহের পুনর্কথন।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে দু' একটি মামুলি উক্তি লক্ষ্য করি। যেমন—'এ সাহিত্যে সমাজচেতনা অত্যন্ত প্রবল।' (পৃ ১৪৮) সমাজচেতনা মানবচেতনারই অঙ্গ। লেখক আলোচনায় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন মধ্যযুগে, এমনকি প্রাচীনযুগেও বাঙালী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য মানবচেতনা। তা হলে সাহিত্যে সমাজচেতনা শুধু আধুনিকযুগের সম্পত্তি হয় কি করে? বাংলাসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদই তো ঐ ধারণার বিপরীত প্রমাণ। চর্যাপদের কবিরা তো ধর্মসাধক ছিলেন। ধর্মভিত্তিক কবিতা রচনার কষ্ট স্বীকার করার কি প্রয়োজন ছিল তাঁদের? সাধারণ মানুষকে ধর্মের উত্তরাধিকার দানই কি এই কষ্ট স্বীকারের মৌল প্রেরণা নয় দ্বিতীয়তঃ, চর্যার অনেক কবিতায় সমাজের জীবন্ত চিত্র পাই। তা কি সমাজচেতনার ফল নয়? তাহলে প্রাচীনতম বাংলাসাহিত্যের এই নিদর্শনেই তো 'সমাজচেতনা অত্যন্ত প্রবল।'

দু' এক জায়গায় বক্তব্যে স্ববিরোধ লক্ষণীয়—'এই রহস্যময় অস্পষ্ট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা বাঙালী।' (পৃ ১৪৯) 'রহস্যময়' কথাটাই যথেষ্ট, অস্পষ্ট বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত নয়। দ্বিতীয় পর্বের অন্তে 'ভবিষ্যৎ' নামক অধ্যায়টি বড় উচ্ছ্বাসময়। ১৫০ পৃষ্ঠায় এই উচ্ছ্বাসের একটু মাত্রাধিক্য ঘটেছে :

"কিন্তু চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব নেই বাঙালীর। আজ চরম পরীক্ষার দিনে তাকে নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে। চাই খাঁটি আদর্শবাদ, চাই দুর্বার সংগঠন প্রতিভা। দেখতে হবে সমাজের সব স্তরেই যেন আদর্শবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সব স্তরেই যেন সাড়া পড়ে যায়।' অথবা 'চাষীকে বাঁচাতে হবে, মজুরকে বাঁচাতে হবে।' এ জাতীয় উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে কি করে চাষী এবং মজুরকে বাঁচাবো তার ইঙ্গিতদান করলেই শোভন হ'ত। এ-ধরণের বইয়ে সেই স্থৈর্যটুকু আশা করাই স্বাভাবিক।

তবে এ উচ্ছ্বাসের কারণও আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই নির্দেশ করেছি। লেখকের বাঙালী প্রেম। এই প্রেমের স্পর্শেই গ্রন্থের অন্য ত্রুটিগুলো নগণ্য হয়ে যায়। বাংলাকে আমরা ভালোবাসি। বাঙালী আজ সংকটের আবর্তে দিশেহারা। বাঁচবার পথ সবাই অনুসন্ধান করছে। ভারতবাসী হিসেবে সাধারণ অস্তিত্ব বজায় রেখেও বাঙালীর নিজস্ব বিশেষত্বটুকু জাগ্রত না রাখতে পারলে বাংলা বাঁচবেনা। ভারতেরও তাতে কল্যাণ নেই। কারণ বিভিন্ন প্রাদেশিক বৈচিত্রের সমন্বয়েই তো ভারত মহান। সেই বৈচিত্র্য একটি প্রদেশে অবলুপ্ত হলে ভারতেরই তাতে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। এসবদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এই গুণে আকৃষ্ট হয়েই আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকটির দীর্ঘ আলোচনা করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।

রমেন সরকার

৩০শে মে, ১৯৬৪

জাতিভেদ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী [শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের সম্পাদনায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন ইউরোপীয় রেঁনেসা ও ফরাসী বিপ্লব প্রসূত নবচিন্তাধারা আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় তামসিকতা ও জড়তাকে আঘাত করে জাতীয় জীবনে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি

করেছিল তখন বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত থেকে মহা সমন্বয় ও সাধনার পথ নির্দেশ করে যে অতুলনীয় প্রতিভাবান মহাপুরুষ এই প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত দেশ ও জাতিকে অনিবার্য্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করলেন তিনি রাজা রামমোহন রায়। যে সব প্রতিভাবান মহাত্মাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন প্রচারিত নবজাগরণের বাণী বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং যাঁরা নিজের জীবনে ঐ আদর্শ রূপায়িত করে দেশের যুবশক্তিকে যথার্থ পথের সন্ধান দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বর্তমানে আমাদের দেশের একদল লেখক ও গবেষকদের প্রচেষ্টায় বিগত শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন এবং কিছুকাল আগেও কোন কোন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান বা "পুনরুত্থানকারী" সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় উক্ত আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করেছিল এই সকল লেখক ও গবেষকদের প্রচেষ্টায় তা, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি নিরসন হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে এই নবজাগরণ আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস জানবার আগ্রহ বুদ্ধিজীবী মহলে ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছে এবং যদিও উক্ত ইতিহাসের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন এখনও আরো গবেষণা-সাপেক্ষ তবু একথা বলা চলে যে এ বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটনের ফলে আগে যে সব বিষয় অস্পষ্ট ছিল সে সব বিষয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক কালে গত কয়েক বৎসর ধরে এই নবজাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত "জাতিভেদ" নামক পুস্তকটি তাদের মধ্যে অন্যতম। নবজাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম মনীষী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই কোলকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাটিই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু, বলাবাহুল্য এই বক্তৃতাটি যে সে যুগে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সমসাময়িক পত্র পত্রিকাদিতে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ নানাদিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। এই বৎসরের প্রথমেই নবজাগরণ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পরলোকগমন করেন, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এর আগের বৎসর আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন ও তার ফলে দেশে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সেই বৎসরেই কেশবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্য আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও ধর্ম্ম সমন্বয় সম্পর্কে বক্তৃতাদি দিয়ে প্রচুর খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে পরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দক্ষিণেশ্বরের ভক্তশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যিনি এর কিছুকাল আগে থেকেই কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৌতূহল, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন—তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে তখন একদল আদর্শবাদী যুবক সমবেত হতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে এক নূতন আদর্শ প্রবর্তন করে দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাটভস্কির নেতৃত্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণানন্দ স্বামীর নেতৃত্বে নব্য হিন্দুধর্ম্ম আন্দোলনও তখন ক্রমে দানা বেঁধে উঠছে।

এই পরিবেশের মধ্যে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুলাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। নবজাগরণ আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যুক্তিবাদের ভিত্তিতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে শোধন করে নেওয়া; নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন নয়। তৎকালীন প্রধান প্রধান সংস্কার আন্দোলনগুলি (যথা, রামমোহন রায়ের সতীদাহ আন্দোলন, বিদ্যা-

সাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন ইত্যাদি) এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতেই পরিচালিত হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর এই বক্তৃতাটিতেও এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিভাবে আমাদের দেশের এই প্রাচীন প্রথাটি সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে এর গুণাগুণ বিচার করতে হবে সেই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মশাই বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলেছেন :—

"আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে একটি জাতির সাহিত্য কাব্য নাটক ধর্ম্মশাস্ত্র পুরান প্রভৃতি যদি পাওয়া যায় এবং ঐ সকল গ্রন্থের কাল নির্ণয় যদি কোন প্রকারে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমরা বহুল পরিমাণে উক্ত জাতির সামাজিক ইতিবৃত্ত নির্ণয় করিতে পারি। এইরূপে জাতিভেদ প্রথার আদি নির্ণয়ের জন্যও আমাদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র সকল অবলম্বন করিয়া ইতিবৃত্তের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে।" এরপর তিনি আমাদের দেশের প্রাচীনতম শাস্ত্র এবং সম্ভবতঃ মানব সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের মন্ত্র ও ভাষা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও তথ্যমূলক আলোচনা করে তৎকালীন আর্য্য সমাজের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করে প্রমাণ করেছেন যে পুরুষ সূক্ত নামে একটি সূক্ত ব্যতীত ঋগবেদের কোথাও জাতিভেদ প্রথার কোন রকম উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পুরুষ সূক্তের ভাষা ও ছন্দ সম্পূর্ণ আধুনিক, ঋক্‌বেদের অন্যান্য মন্ত্রের মত দুর্বোধ ও প্রাচীন নয়। তাছাড়া ঐ সূক্তের প্রথম অংশ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ঐ মন্ত্রগুলি বেদ ঋক, সাম, যজুঃ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর রচিত। সুতরাং এই মন্ত্রটি যে অনেক পরে ঋগবেদের মধ্যে সংযোজন করা হয়েছে সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এরপর তিনি মহাভারত, হারীত স্মৃতি প্রমুখ পুরাণাদি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন জাতিভেদ সম্পর্কে এই শাস্ত্র সকল পুরুষ সূক্তেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। হারীত স্মৃতির শ্লোকে তো স্পষ্টই পুরুষ সূক্তের উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীনতম কালে যে জাতিভেদের অস্তিত্ব ছিল না কর্মের বিভিন্নতার (Division of labour) জন্যই ক্রমে পরে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছিল মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে শাস্ত্রী মশাই তা প্রমাণ করেছেন। ক্রমে প্রাচীন আর্য্য সমাজে প্রথমে 'আর্য্য' এবং 'দস্যু' এবং পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হলো এ সম্পর্কে তিনি অতি সুন্দর যুক্তি ও তথ্যমূলক আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন :—অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের যে তিনটি প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয় (১) নিম্নজাতিদিগের অন্নপান গ্রহণ নিষেধ, ২) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ (৩) জাতির প্রভেদ অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা—আদিম আর্য্য সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটিই লক্ষিত হয় না।" কিভাবে প্রবল দলাদলি ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্রমে উপরোক্ত বিধিনিষেধগুলি পরবর্ত্তী কালে সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করলো বিবিধ শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে এমন এক সময় ছিল যখন এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে যাওয়া ও পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ক্রমে "জাতিভেদের কঠোর নিয়ম সকল সৃষ্ট" হয়ে এই প্রথা কিভাবে নিম্নজাতীয়দের প্রতি অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে উঠলো তা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "মনু রচিত সংহিতা যে সময়ে সংকলিত হইয়াছিল, সেই সময়কে জাতিভেদের প্রকোপের পরাকাষ্ঠাকাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব সেই মনুসংহিতা হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিতেছি তাহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন প্রাচীন আর্য্য সমাজে হতভাগ্য শূদ্রজাতির কতদূর দুর্গতি হইয়াছিল।" এরপর তিনি মনুসংহিতা থেকে প্রচুর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে গোটা দুই শ্লোক উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :—

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভূবা।"

মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায়।

অর্থ—"শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ॥

মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায়।

অর্থ:—"শূদ্র যদি কোন দ্রব্য উপার্জন করে ব্রাহ্মণ অসংকোচে সমুদয় কাড়িয়া লইবেন, কারণ ধনে অধিকার নাই; সে যে কিছু উপার্জ্জন করিবে সে সমুদয় তাহার প্রভুর। এরপর এই মহা অনিষ্টকর কুপ্রথা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন;

"এই কি ধর্ম? এই যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম কি? মানবকে যাহাতে পশু করিবার আদেশ দেয়, সেই কি শাস্ত্র? যদি কোথাও নরক কুণ্ড থাকে তবে শাস্ত্রের এই অংশকে পোড়াইয়া ভস্ম কর এবং সেই ভস্ম কর্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর। আমি হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করি যে ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রতাপের দিন খর্ব হইয়াছে; শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে।" মানবতাবাদী ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্তর্বেদনা ও ক্ষোভ এই লাইন কয়টির মধ্যে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উপসংহারে তিনি জাতিভেদের সপক্ষে যুক্তি খণ্ডন করে এই সামাজিক কুপ্রথার বিভিন্ন অনিষ্টকারিতা বিশ্লেষণ করে তীব্র বেদনার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"এই জাতিভেদ প্রথা……শত শত বৎসর ধরিয়া নিম্নজাতীয়দিগকে _ চাপিয়া রাখিয়াছে এবং সর্বশেষে এদেশবাসী দিগকে পরের দাসত্ব-পাশ বহনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। আর কি শুনিতে চাও? এমন প্রথার স্বপক্ষে আবার কথা কও? আমি যখন এই সকল অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি এই জাতিভেদ প্রথা যদি কোন কোন বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হাতে সজোরে উপড়াইয়া ফেলিতাম। ইহা উন্নতির কণ্টক ও দেশের শত্রু।'

পুস্তকের পরবর্তী অংশে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক তথ্যমূলক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কি ভাবে সংগঠনমূলক সংগ্রাম করে দেশের জনমত সৃষ্টি করেছে, এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অনেকাংশে শিথিল হলেও এক সময়ে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তুলতে তৎকালীন সংস্কারকদের কঠোর সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ দিলীপবাবুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে অনেক নূতন তথ্য ও চিন্তার খোরাক পাবেন। আমাদের দেশে হরিজন আন্দোলনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার অনেক আগেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করে তুলেছিলেন মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিঠলরাম সিন্দে।

এরও আগে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের নারায়ণ স্বামী মুদেলিয়ার "Native Philanthropic Association for the Regeneration of Pariahes in Southern India." নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিঠলরাম সিন্দের বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে "নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন হতে থাকে। ১৯২০ সালে নাগপুরে এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাহাত্মা গান্ধী। গোখলে, লালা লাজপত রায় প্রমুখ অনেকই এই সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজি যে শুধু বিঠলরাম সিন্দে কর্তৃক সংগঠিত

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে এসেছিলেন তা নয় ১৯০ সালে যখন তিনি কোলকাতায় আসেন তখন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শাস্ত্রীজির আত্মজীবনীতে এর উল্লেখ আছে।

জাতিভেদ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত বিশ্লেষণ করে দিলীপবাবু প্রমাণ করেছেন যে মহর্ষিও এই কুপ্রথাকে সমর্থন করতেন না। তবে এ বিষয়ে তিনি ধীর ভাবে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। কিন্তু কোন সামাজিক কুপ্রথার সংস্কার করে নূতন আদর্শ প্রবর্ত্তন করতে হলে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার না করেও একথা বলা চলে যে নূতন আদর্শ যাঁরা প্রবর্ত্তন করতে চান তাঁদের অগ্রসর হয়ে স্বীয় জীবন ও কার্য্যপদ্ধতিতে এ আদর্শ রূপায়িত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। তা না হলে কোন সংস্কার আন্দোলন সফল হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুবর্ত্তী শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে রেখে এঁরা কার্য্যক্ষেত্রে ঐ আদর্শকে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

প্রবন্ধ সমাপ্ত করার আগে একটি অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক প্রসঙ্গের অবতারণা না করে পারলাম না। বিগত শতাব্দীর নবজাগরণ আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় যখন ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আমাদের দেশের এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়ে উঠছে এবং তাতে বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত মনীষী দ্বিধাহীন ভাবে নেতৃত্ব করছেন, অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে এর কিছুকাল পরে কায়স্থ কুলোদ্ভব মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ এই সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ও আপোষমূলক ভাব পোষণ করতেন। অথচ এই কুপ্রথা থেকেই উদ্ভূত "ছুৎমার্গের" তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন। বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই এটা বোঝা যায়:

"আমি সব জাতিকে একাকার কত্তে বলিনা। জাতি-বিভাগ খুব ভাল। এই জাতি বিভাগ প্রণালীই আমরা অনুসরণ কত্তে চাই।...ভারতে এই জাতি বিভাগ প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ।" (লণ্ডনের 'একো' সংবাদপত্রের প্রতিনিধির প্রতি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ—"কথোপকথন"—৭ম সং·পৃঃ ২৭)

এই জাতীয় আরো অনেক দ্বিধাগ্রস্ত ও আপোষমূলক উক্তি তাঁর বক্তৃতাদিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমরা মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম যে কতকগুলি ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রগতিশীল ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার ধারক হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন মনীষীর এই কুপ্রথা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ও আপোষমূলক মনোভাব ও উক্তি দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনকে কিছুটা ব্যাহত করেছে এবং তাঁর এই জাতীয় উক্তিগুলির সুযোগ গ্রহণ করে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ জীবনীকারগণ তাঁকে "পুনরুত্থানকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল" ধর্ম্মনেতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ, তথ্যবহুল পুস্তকটির মূল্য মাত্র ৭৫ নয়া পয়সা ধার্য্য করার জন্য প্রকাশকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করলাম।

সুরথ চক্রবর্ত্তী

(১১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিত্য নির্ঝর। প্রার্থনা আর প্রেম এক সঙ্গে। বীর্য আর মাধুর্যের সংযোগ। বিচারকদের ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতাকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখলেন। ঠিক যীশুর ভাব—"Father forgive them, for they know not what they do,' আবার তীক্ষ্ণ প্রহারের মত বর্ষণ করলেন তিরস্কার—দুর্বার সত্যের তেজে সমুজ্জল—অপ্রতিরোধ্য। বললেন: 'Reverend Fathers, it was not civil rebellion I recommended, but spiritual regeneration. A simple turning from the ritualism of the crowd to the righteousness of the individual.' তারপর ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে বললেন "Show me anything better or more holy than what I taught, and I am perfectly ready to retract.'' তিনি দেখলেন যেন একটি সনাতন মধ্যযুগ সেই বিচারালয়ের চারদিকে পাঁচিলের মত অটল! বিশ্ববোধের প্রসারতা ও চিত্তবৃত্তির উদারতা আশা করা নিরর্থক। তাঁর দৃঢ় আশা ছিল সম্মেলন তার বক্তব্যের সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করবে। মদমত্ত সভা—যেন মূর্তিমান্ তামাশা। তাঁর স্বপ্ন বিধ্বস্ত।—কোন সাহসে—কিসের জোরে তুমি চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করেছ? প্রশ্ন করল সভা।

—বিবেকের অনুশাসনে। উত্তর দিলেন হাস।

—এত সব অভিজ্ঞ বিচক্ষণ শাস্ত্রবিদ তোমার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে। তুমি কি তাদের এই অধিকার মানবে না? চার্চের চেয়ে তুমি কি নিজেকে বেশী বিজ্ঞ মনে কর? ক্রোধে ফেটে পড়ল সভা, চারদিকে উদ্ধত বর্শা।

—আমি ভগবান ও বিবেকের অনুশাসন মেনে চলি। আপনাদের সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন আমি বিবেকের নির্দেশ মেনে চলব।

সিগিসমণ্ড অনেক বুঝালেন। অনেক পদ ও অর্থের প্রলোভন দেখান হোল। সভার কর্তৃপক্ষ নানান ভাবে অনুরোধ করলেন হাসকে। আবার ভয়ও দেখালেন। হাস অচল, অটল, উত্তাল জীবন সমুদ্রের পারে অনির্বাণ আলোক শিখা। ললাটে লেখা নির্ভুল ঈশ্বরের ঠিকানা। একটা দুঃখে তিনি বড় ব্যথা পেলেন। তাঁর তিনজন পুরাণ সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা। টাকার লোভে, পদমর্যাদার লোভে তারা আজ জনতার কাছে প্রমাণ করতে চায় হাস একজন heretic। হায় বন্ধুত্ব! একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি তাঁর অমূল্য জীবন দিতে প্রস্তুত। সেই সত্যটি হোল—'Thou shall not prevent any man from interpreting God's teaching in his own way.' হাসের চারপাশে যারা ছিল তারা যেন কয়েক শতাব্দীর দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জগৎ আর সম্মেলনের জগৎ যেন আকাশ জমিন ফারাক। তাদের উদ্ধত কোলাহল যেন তাঁর কানেই পৌঁছায় না। হাসের মৃত্যুদণ্ড হোল। মৃত্যুর ২ মাস পূর্বে Bohemian ও Moravian নোবলগণ প্রাগ থেকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন হাসকে ছেড়ে দেবার জন্য। তাদের ধারণা Sigismund তাদের অনুরোধ রাখবেন। Council এর চেক নোবলগণ কিছু পোল নোবলদের সহায়তায় হাসের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সবই হোল ব্যর্থ।

হাসের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হোল। ক্রশের আকারে মাথা কামিয়ে দেওয়া হোল। একটি কাগজের টুপিতে তিনটি শয়তানের মূর্তি এঁকে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হোল। শেকল দিয়ে বেশ শক্ত করে একটা কাঠের সঙ্গে বাঁধা হোল। তারপর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হোল। হাস মৃত্যুর আগে প্রার্থনা করলেন। ৬ই জুলাই ১৪১৫। কিছুদিন পরেই হাসের সহকর্মী Jerome of Pragueকেও পুড়িয়ে মারা হোল। হাসের চিতাভস্ম রাইন নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয় কারণ ভস্মকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ হ'তে পারে, হাসের অনুগামীরা (Hussite) এই পবিত্র ভস্মকে

শ্রদ্ধা দেখাতে পারে। Council এর আরও একটি আদেশের বলে Wycliffe-র মৃত দেহকে পবিত্রস্থানের বাইরে সরিয়ে দেওয়া হোল।

সিংহবীর্য বিরাট পুরুষ হাসের এইভাবে অমর জীবনের অবসান হোল। কিন্তু তাঁর চিন্তার বিদ্যুৎ স্পর্শে সেযুগের অচল মন নূতন উদ্দীপনায় জেগে উঠেছিলো। হাসের মৃত্যুতে ধর্ম বিদ্রোহ কমেনি, বরং বহুগুণ বেড়েছিল। কিছুদিন পরে জার্মানদের আক্রমণে বোহেমিয়া আবার জাতীয় চেতনায় জেগে উঠেছিল। যার পরিণাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র চেকস্লোভাকিয়ার সৃষ্টি। Prostestant সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। তাদের সাধনা অবশেষে সার্থক হোলো। Council of Constance এ হাস যা পারেননি লুথার Diet of Worms এ তা করেছিলেন। ১৪১৫র ৬ই জুলাই এর বেদনাকে ভাষা দিয়েছিলেন লুথার ১৫২১ এর ১৭ই এপ্রিল।

যুগে যুগে মানুষের চিন্তা এভাবেই তার মুক্তির পথ করে নিয়েছে।

স্বাধীনতা বিপন্ন
সর্ব্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করুন
—জওহরলাল নেহরু

একমাত্র সামরিক শক্তি দিয়েই প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে না। আর্থিক শক্তিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তি বিস্তার তাড়াতাড়ি উন্নয়ন করে এই শক্তি বাড়াতে হয়। কাজেই আপনার কাজও প্রতিরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মানুবর্ত্তী থেকে এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।

DA64/F5

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়োজন

পূর্ব-এশিয়া পরিক্রমা

ডঃ সুকুমার দত্ত

[১৩৭১ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

জাপানে শেষের কয়েকদিন

নারা ও টেনরিতে দুই তিন দিন কাটাইয়া কিয়োটোতে ফিরিলাম। এবার বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে। বন্ধুবর তোয়োহারা সন্ধ্যায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিলেন।

পরের দিন এখানকার 'ভারত-জাপান সোসাইটি'র (Indo-Jap Society) তরফ হইতে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Dean) মহাশয় আমাদের একটি ভোজ-সভায় আহ্বান করিলেন।

সভার স্থান ছিল একটি প্রাচীন জাপানী বাস-ভবন। এখন ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। সন্ধ্যার পর আমাদের গাড়ীতে লইয়া গেল কিয়োটোর অনেক প্রাচীন গলি পার করিয়া। বাড়ীটি পুরানো কালের, সমস্তটাই কাঠের; চারদিকে জাপানী বাগান, নানা রংএর মাছে ভরা পুকুর, বৃক্ষ-লতায় আচ্ছাদিত। ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলে দলে উপস্থিত হইলেন। হল-ঘরে সকলে সমবেত হইলে আমাকে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করা হইল। সভান্তে আহারের ঘরে গিয়া দেখি আসনগুলি জাপানী কায়দায় সাজানো,—তাতামির উপর নীচু চতুষ্কোণ টেবিলের চারদিক জুড়িয়া,—কিন্তু সেদিন আহার্য্য ছিল পাশ্চাত্য ধরণের। রাত্রি দশটার পর 'সিয়োনোরা' বলিয়া বিদায় লইলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে দুই একটি ভদ্রতার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখি, তিনি মৌন হাসিতে তাহা গ্রহণ করিলেন,—প্রত্যুত্তর কিছু দিলেন না। মনে হইল ইংরাজিতে কথাবার্তা বলিতে ইনি সুবিধা পান না। এতবড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ইংরাজিতে কথা বলেন না,—আশ্চর্য্য বটে।

কিয়োটো ছাড়িয়া আবার আসিলাম টোকিও।

টোকিওতে আবার একটি সভার আয়োজন। এখানে কোয়েকার (Quaker) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ আছে। পাশ্চাত্যদেশগুলির যে সকল দূতাবাস টোকিওতে সেখানকার কর্ম্মচারীরাই এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্য। সর্ব্বসমেত প্রায় একশত জন হইবেন। জাপানী বিরল। আমার বক্তৃতার জন্য আধ ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল,—তাহার পর মাধ্যাহ্নিক ভোজের পালা ও ভোজের পর প্রশ্নোত্তর।

দুই একজন জাপানী ব্যতীত সকলেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের। আমি জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। ভোজের পর নানাদিক্‌ হইতে আমার উপর প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিলেন যে এখন বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জাপানীরা আধুনিক সংস্কার ও সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতেছে না কেন? আর সব বিষয়েইত জাপানীরা আধুনিক,—কেবল বৌদ্ধধর্ম্মে ও সিন্টোধর্ম্মে প্রাচীনপন্থী রহিয়া গিয়াছে কেন? উত্তরে বলিয়াছিলাম যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী সভ্যতার অঙ্গীভূত। তাহাদের স্বকীয় সভ্যতাকে বিসর্জ্জন না দিলে, বৌদ্ধধর্ম্মকে

বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। এরূপ চেষ্টা গায়ের চামড়া ছাড়িয়া বাহির হইবার মত অসম্ভব চেষ্টা।

সভাভঙ্গের পর দরজা দিয়া বাহিরে আসিতেছি এমন সময় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা মহাশয়া একখানি সুন্দর চিত্রিত খাম আমার পকেটে গুঁজিয়া দিলেন। বাড়ী ফিরিয়া খুলিয়া দেখি তাহার মধ্যে একখানা পাঁচ হাজার ইয়েন, প্রায় আশী টাকার একখানি চেক্।

এই সভাটি হয় টোকিয়োর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে (International House)। বিখ্যাত কোনও ব্যক্তি জাপানের বাহির হইতে এখানে আসিলে প্রথম অভ্যর্থনা এই স্থানেই হয়। আমরাও ভারত-সরকারের প্রেরিত লোক হিসাবে অভ্যর্থনা-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলাম। টোকিয়োর মেয়র, নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, জাপান সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন।

জাপানী অভ্যর্থনার রীতি নীতি আমাদের জানা ছিল না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কোটে নাম ও পদবী জ্ঞাপক জরিতে লেখা তকমা ছিল। আমরা করমর্দ্দন শেষ করিয়া দেখিলাম যে মধ্যস্থলে একটী টেবিলের উপর কিছু খাদ্য ও দুইখানি খালি চেয়ার স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবস্থাটা ঠিক বুঝিলাম না। তখন একজন জাপানী বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন যে অভ্যর্থনার রীতি এই যে প্রথমে অভ্যর্থিত ব্যক্তিরা নিজেরা কিছু মুখে দিলে ভোজ আরম্ভ হইবে। টেবিলের চারদিকে দর্শকেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। আমরা সঙ্কোচ কাটাইয়া শূন্য চেয়ার দুখানা অধিকার করিয়া একটু কেক্ মুখে দিলাম চারদিকে করতালি পড়িয়া গেল। তখন প্লেটে করিয়া নিমন্ত্রিতদের হাতে হাতে খাদ্য পরিবেশন হইল। কোনও বক্তৃতা হইল না। এই অভ্যর্থনারীতি বোধ হয় জাপানের প্রাচীন সংস্কারগত।

টোকিও ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট হলে এখানকার ইণ্ডো-জাপ সোসায়েটি (Indo-Jap Society) একটি বিদায়-সম্ভাষণের আয়োজন করিয়াছিলেন। সুনীতিবাবুও নিমন্ত্রিত ছিলেন।

এখানে বিখ্যাত জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত কিমুরাকে প্রথম দেখিলাম। ইনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। সুনীতিবাবুর সমসাময়িক। পরিষ্কার বাংলা বলিতে পারেন। তবে ভাষাটা প্রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলের শুদ্ধভাষা। তিনি এখন অশীতি বর্ষীয়। বাংলা দেশে এখন বৌদ্ধ পণ্ডিত কে কে জীবিত আছেন, খোঁজ লইলেন সুনীতিবাবুর নিকট। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অভ্যস্ত শুদ্ধ বাংলায় "তিনিও কি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন?" সভাপতিত্ব করিলেন কিমুরা।

প্রথমে সুনীতিবাবু ও আমি কিছু বলিলাম। আমি 'বয়োমন সোজোর' সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। দুই জন আমার সম্পূর্ণ ভাষণটি হ্রস্বলিপিতে লিখিয়া লইলেন। ইহার পর সভাপতি আমার স্ত্রীকে জাপানে কি কি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ও কোনটা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে ও কোনটা ভাল লাগে নাই তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলিলেন: "জাপানে যাহা যাহা দেখিয়াছি, সকলই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু কিয়োটো যাইবার পথে দেখিলাম বড় বড় ধানের খেতের ঠিক মধ্যখানে এক একটি বিরাট আয়তনের বিদেশী মদের বোতল বিজ্ঞাপন-স্বরূপ প্রোথিত আছে। এইটি আমার ভাল লাগে নাই।"

আমরা কিয়োটো হইতে টোকিও ফিরিলে-আমার স্ত্রী বাহির হইতেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য ও অন্যান্যবিবিধ সমাজসেবার ব্যবস্থা জাপানে কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা পরিদর্শনে ও আমি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিতে। ডঃ মিয়াঝাকি, যিনি এখন জাপানের অর্থসাহায্যে আগ্রায় প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রমের পরিচালক, আমাদের দিল্লীর বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার

স্ত্রীকে লইয়া জাপানের বিবিধ লোকসেবার প্রতিষ্ঠান দেখাইয়া আনিতেন।

জাপানে পূর্ব্ব কালে বহু কুষ্ঠরোগীছিল কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই রোগ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন জাপানীরা একটি A-ian Leprosy Mission গড়িয়াছেন। জাপানের বাহিরে আগ্রায় এই মিশনের প্রথম কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা টোকিও থাকা কালীন ইহার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ হইতেছিল। ডঃ মিয়াঝাকির সহিত আমার স্ত্রী নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের ঢক্কানিনাদ করিয়া এ দেশে সমাজসেবার কার্য্য আরম্ভ হয় না। আরম্ভ হয় নীরব কর্ম্মীদের মধ্যে, পরে সরকারি সাহায্যে পুষ্ট হয়। ইহাদের কর্ম্মপটুতার প্রমাণ নানাবিধ সমাজসেবার প্রতিষ্ঠানে। একদিন Social Welfare Work এর মন্ত্রীর আপিসে গিয়া আলাপ করিয়াছিলাম। জাপানীরা স্বভাবতই অল্পভাষী। ইনি কিছুটা আমাকে মুখে বুঝাইয়া অনেকগুলি ইংরাজিতে লেখা রিপোর্ট, কার্য্যতালিকা, পরিকল্পনা, ইত্যাদি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়িয়া দেখিবেন,। আমি অনভিজ্ঞ,—আমাদের Community Development এর মন্ত্রী দে মহাশয় এইগুলি পড়িলে হয়ত লাভবান্ হইতেন। ভারতীয় ও জাপানী পরিকল্পনা ও কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কি প্রভেদ বুঝিতে পারিতেন।

জাপানী সংবাদপত্রগুলি সরকারি সাহয্যের তোয়াক্কা রাখেনা; মন্ত্রীদের বাণী, ও ভাষণ, দিয়া পত্রিকার স্তম্ভ ভরায় না; সরকারের কাজের সামান্য সাফল্য বড় বড় কথার জরি-আঁকা পোষাকে সাজাইয়া বাড়াইয়া জনসাধারণের দৃষ্টিভ্রম করায় না। যাহা হউক, আমি সামান্য আদার ব্যাপারী এই সব বড় বড় জাহাজের খবর লইবার আমার যোগ্যতা ও কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিলো না।

জাপান হইতে বিদায়

প্রায় দেড়মাস জাপানে থাকিয়া আমাদের বহু বন্ধু সংগ্রহ হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে এত হৃদ্যতা হইয়াছিল কারণ আমি ভাবিতাম যে ইঁহারা বেশী ভারতবাসী দেখে নাই। ত্রিশ শতকের শেষের দিকে যখন জাপান চীন আক্রমণ করে ও পরে দ্বিতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে কম লোকই জাপানে গিয়াছেন। ভারত-বাসীদের সম্বন্ধে ইহাদের এখনও কৌতূহল ও আগ্রহ আছে।

কিয়োটোর রাস্তায় একজন বৃদ্ধ জাপানী কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে আমি একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি আমাদের দিকে এত নজর দিতেছেন কেন। উত্তরে তিনি প্রশ্ন করিলেন: আপনারা ভারতবাসী লোকত? আমি হাঁ বলিলে বলিলেন: 'এই যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রঠাকুর এখানে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তার পরই দেখিলাম আপনাদের। এত বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী কাহাকেও দেখি নাই।' মনে মনে বলিলাম: সাবাস্ আপনার সমদর্শিতা। রবীন্দ্রনাথের পরেই আমরা! সকল ভারতবাসীই আপনার দৃষ্টিকোণ হইতে একই মাপের, নগাধিরাজ হিমালয় হইতে বিহার প্রদেশের টিলাগুলি পর্য্যন্ত।

টোকিও ছাড়িবার পূর্ব-সন্ধ্যায় মিঃ গুহ তাঁহার বাড়ীতে আমাদের জাপানী বন্ধুদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়া একটি বিদায়-ভোজের আয়োজন করিলেন। প্রায় ষাট সত্তর জন দূর দূর হইতে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রী সঙ্গে না লইয়া কন্যা লইয়া আসিয়াছিলেন। আমাদের আদর্শ অনুসারে জাপানী স্ত্রীলোকদের সুন্দরী বলা যায় না। কিন্তু রিরি নিকায়ামার যুবতী কন্যাটিকে অপূর্ব্ব সুন্দরী মনে হইল। Japan Leprosy Mission ও International House হইতে কয়েকটি মহিলা আসিয়াছিলেন,—বিশেষ-

ভাবে আমার স্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য। Leprosy Mission এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি মূল্যবান্ জাপানী ট্রানসিষ্টার রেডিও (Tansistor Radio) উপঢৌকন দেওয়া হইল। নিমন্ত্রিতরা সকলে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন ও করতালির ধ্বনি উঠিল। স্ত্রী উৎফুল্ল হইলেন বটে, কিন্তু আমি একটু শঙ্কিত হইলাম। এ জিনিষটি ভারতীয় পোর্টে শুল্ক আদায়ের কর্ম্মচারীদের হাত হইতে কি ভাবে বাঁচাইব? তবে শেষরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বটে। অনেক রাত্রে বিদায়-ভোজ শেষ হইল।

ব্যবস্থা ছিল যে জাপান হইতে জলপথে হংকং ও সিঙ্গাপুর হইতে সিংহলে যাইব।

ইয়াকোহামা বন্দরে

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বন্দরের দিকে রওয়ানা হইলাম। টোকিও হইতে প্রায় পনেরো মাইল দূরে। ভারতীয় দূতাবাস হইতে একটি Station Wagon আসিল ও আর দুইখানা মোটর গাড়ীর যোগাড় হইল। মিঃ গুহ সপরিবারে চলিলেন, আর একদল জাপানী বন্ধু যাঁহারা আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিতে উৎসুক ছিলেন তাঁহারাও সঙ্গে চলিলেন।

বন্দরে তীরসংলগ্ন হইয়া ফরাসী জাহাজ 'ক্যাম্বোজ' যাত্রীদের অপেক্ষায় ছিল। দুইজন যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি ছোট ক্যাবিন পাইলাম। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জাপানী বন্ধুরা কেহ ফুলের ঝুড়ি, কেহ বিস্কুটের বাক্স, কেহ জাপানী মিষ্টান্ন আমাদের ক্যাবিনে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

জাপান আমরা ছাড়িয়া যাইতেছি, কিন্তু জাপানী বন্ধুরা যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছাড়িতে চান না। বন্দর ত্যাগের ঘণ্টা পড়া পর্য্যন্ত কেহ না কেহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

আমরা দক্ষিণ চীনা সাগর (South China Sea) দিয়া দক্ষিণে চলিতেছি, ফরমোসা প্রণালীর (Strait of Formosa) দিকে। এই প্রণালীর মধ্য দিয়া হংকং বন্দরে পৌঁছিব। এক রাত্রি তিন দিনের পথ।

এই জলপথটা কখনও শান্ত থাকে না। ঢেউয়ের দোলার দোলানি একটু অস্বোয়াস্তিজনক। সারা রাত্রি দক্ষিণ চীনা সাগরে দোল খাইতে খাইতে যাইতেছিলাম; পরের দিন দেখি আকাশে আলো নাই; দিগ্বলয় ঘিরিয়া মেঘ। তাহার ছায়া পড়িয়া সমুদ্রের নীল জল কালো হইয়া গিয়াছে। ঢেউ আরও মাথা তুলিয়াছে। আরও জোরে দোলা খাইতেছি। সমুদ্র-যাত্রা আমার অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু স্ত্রী কিছু অসুস্থ (Sea-sick) বোধ করিলেন,—সমুদ্র বক্ষে আরোহণ এই তাঁহার প্রথম।

রাত্রির ভোজন কালে গ্লাস, প্লেট, কাঁটা-চামচ, মায় চেয়ার-টেবিল, জাহাজের দোলানিতে না পড়িয়া যায়, এই জন্য সব ভাল করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। জাহাজের পরিচারক-পরিচারিকারা বোধহয় ভাল ঘুমের অভাবে কাজ-কর্ম্মে শ্লথ-হস্ত হইতেছিল।

প্রত্যূষে বিছানা ত্যাগের পূর্ব্বে স্ত্রীর একটু চা পানের অভ্যাস, তাহা ক্যাবিনের পরিচারিকাকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু চা পাওয়া গেল একটি ঢাকা-দেওয়া চায়ের বাটিতে কবোষ্ণ অবস্থায়। আমি ষ্টুয়ার্ডের (Steward) ক্যাবিনে গিয়া দেখি একটি সুদর্শন ফরাসী যুবক।

জাহাজের কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ ইংরাজি বুঝিতে ও বলিতে পারে। আমি তাহাকে Early Tea এই ভাবে পরিবেশন সম্বন্ধে একটু ধম্‌কাইয়া দিলাম। তিনি আমাদের ক্যাবিন নম্বর লিখিয়া লইলেন। পরের দিন দেখি প্রত্যূষ-কালীন চা'র (Early Tea) রকম বদ্‌লাইয়াছে। এবার সোপকরণ ধূমায়মান সুসজ্জিত।

এই ষ্টুয়ার্ডটির কথা আরও একটু বলিবার আছে। আমাকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিত:

'Is Ma satisfied now' (মা কি এখন তৃপ্ত হইয়াছেন?)। আমি ষ্টুয়ার্ডের মুখে 'মা' শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম, কারণ সাধারণতঃ ইহারা 'ম্যাডাম' (Madam) বলে। পরে কারণ জানিলাম।

স্ত্রী বলিলেন যে একদিন ইনি ষ্টুয়ার্ডের ক্যাবিনের পাশদিয়া যাইতেছিলেন। যুবকটি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল: 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, দুই এক মিনিটের জন্য আমার ক্যাবিনে আসিবেন? স্ত্রী স্বীকৃত হইলে ক্যাবিনে নিয়া তাঁহাকে একখানা ফোটোগ্রাফ্ বাহির করিয়া বলিল: 'আমার মাকে অনেকদিন ছাড়িয়া আসিয়াছি। এই দেখুন আমার মা দেখিতে ঠিক আপনার মত।'

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় আমরা হংকং পৌঁছিলাম। তীরে নামিবার সিঁড়ি ফেলা হইয়াছিল। ফরাসী যুবকটি একপাশে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া স্ত্রী করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেই সে তাঁহার হাতখানি দুইহাতে লইয়া নত হইয়া হস্ত-চুম্বন করিল। এটা সম্মান ও অনুরক্তি দেখাইবার ফরাসীপ্রথা, কিন্তু তাহার হৃদয়ের রসে এই প্রথাগত অভিবাদন অভিসিক্ত ছিল। বেচারি,—ফ্রান্সের কোন্ গ্রামাঞ্চলে নিজের মাকে ছাড়িয়া আসিয়া কতদিন সমুদ্রবক্ষলগ্ন হইয়া কাটাইতেছে কে জানে? ভিন্নদেশীয়া বয়স্কা রমণীর মুখে আপন মায়েরই আদল দেখিতে পায়।

হং কং এ চার দিন

হং কং এর বন্দরটি দেখিবার মত। সমুদ্রের নীল জল ভেদ করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় পৃথক্ পৃথক্ মাথা তুলিয়াছে। দূরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চীনের দিকে বাড়িয়া গিয়াছে। ভোরের আলোতে দৃশ্যটি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার একজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থাকিব এই বন্দোবস্ত ছিল। তিনি আসেন নাই। সুতরাং সমুদ্রতীর হইতে হংকং সহরে প্রবেশের সমস্ত ধকলটা আমাদের বহিতে হইল। কুলিরাও আমাদের বিদেশী দেখিয়া যথাসম্ভব আদায় করিয়া লইল,—ছোট বড় প্রত্যেকটি মোটের জন্য একটি করিয়া হংকং ডলার যাহা একটাকার সামান্য কিছু কম। বন্দরের বাহির হইয়া একখানা ট্যাক্সিতে আমাদের পরিচিত সেই সিন্ধী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির ঠিকানা ধরিয়া চলিলাম।

হংকং সহর উচুনীচু। ব্যবসায়ী পাড়ার কেন্দ্র হোলিউড ষ্ট্রিট্ ধরিয়া চলিলাম। সরু রাস্তা, যানবাহনের অসম্ভব ভিড়, নীচ হইতে খাড়া চড়াই। দুই পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি সূর্য্যালোক ঢাকিয়া রাস্তাটাকে প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীগুলি একটানা। ভিতরে ছোট ছোট এপার্টমেন্ট (apartment)। ঠিকানাদৃষ্টে এক জায়গায় গাড়ী থামাইয়া বিষম সরু ও খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া তিন তলার একটি এপার্টমেন্টের দরজায় আমাদের সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির নাম লেখা রহিয়াছে দেখিলাম' কিন্তু দরজায় দুইটি বড় বড় তালা।

আমার ওঠার শব্দে পার্শ্ববর্ত্তী একটি এপার্টমেন্টের দরজা খুলিয়া একটি সিন্ধী মহিলা বাহির হইলেন। তাহার প্রমুখাৎ জানিলাম এই সিন্ধী ভদ্রলোকটি এখানকার ব্যবসায় গুটাইয়া অল্পদিন হয় দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরিচয় দিতেই তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া আমাদের মালপত্র একজন চাকরের স্কন্ধে দিয়া আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

এই ব্যবসায়ীটির নাম রামচান্দানি। মহিলাটি তাঁহার ভগ্নী ও ব্যবসায়ে অংশীদার। ইঁহারা সিন্ধী। আমরা আশ্রয়স্থল খুঁজিতেছি জানিয়া মহিলাটি বলিলেন: 'আজ আমাদের এইখানেই দুপুরে আহার করিবেন। বৈকালে চায়ের পর আমরা বাহির হইব ও আপনাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিব'।

বিকালে বাহির হইয়া হংকং এর চেহারাটা দেখিলাম। এ-পাড়াটা অর্থাৎ হোলিউড্ ষ্ট্রিট হইল কোয়ানুন বন্দর

পর্য্যন্ত হংকং এর ব্যবসার কেন্দ্র। এখানে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের আদান-প্রদানে শুল্ক-ধার্য্য করিবার কোনও নিয়ম নাই,—সমস্ত জিনিসই 'ডিউটি-ফ্রি' (Duty-free)। সুতরাং অসম্ভব সস্তা। আমি জাহাজে একটি তামাক খাইবার পাইপ কিনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। দাম বলিয়াছিল ষোলো টাকা। হংকং এ ঠিক ঐ রকম একটি পাইপ কিনিলাম পাঁচ টাকায়। কিন্তু হংকং হইতে যদি ভারতবর্ষে মাল রপ্তানি করা হয়, তবে ওখানকার নির্দ্দিষ্ট শুল্ক-সমেত তাহার দাম এই দেশে দ্বিগুণেরও বেশী হইবে। হংকং এ ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক সিন্ধী আসিয়াছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট লাভ করিতে না পারিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

এমন মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া অবিচ্ছিন্ন দোকানের শ্রেণী আমি আর কোথায় দেখি নাই। দোকানদারেরা প্রায়ই চীনা কিম্বা ভারতীয়।

মিঃ রামচান্দানি আমাদের একটি বড় কাপড়ের দোকানে লইয়া গিয়া সত্ত্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপের পর বলিলেন: 'আপনাদের থাকিবার জায়গা স্থানীয় হিন্দু মন্দিরে বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইনি ইহার কর্ম্মকর্ত্তা। আপনারা যতদিন খুসি মন্দিরের অতিথিশালায় থাকিতে পারেন।' আমরা জিনিষ-পত্র গুছাইয়া মন্দিরে গেলাম।

অতি সুন্দর বন্দোবস্ত,—সামনেই একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এখানকার সিন্ধী পুরোহিত মহাশয় আমাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিলেন। বিদায়ের দিন বলিলেন: 'মা'কে আমি কিছু জিনিস দিতে চাই। দয়া করিয়া গরীব ব্রাহ্মণের দান প্রত্যাখ্যান করিবেন না।' তিনি আমার স্ত্রীকে দোতালায় তাঁহার থাকিবার ঘরে লইয়া গেলেন। নীচে নামিলে দেখিলাম উপহারের জন্য তিনি মূল্যবান্ পাঁচ-ছয় খানা নতুন আনকোরা শাড়ী নামাইয়াছেন। দাম আন্দাজ করিলাম ২৫০ হইতে ৩০০ টাকার মত হইবে। স্ত্রী এত দামের উপহার লইতে অতিশয় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় নাছোড়বান্দা। বলিলেন: 'এরকম অনেক শাড়ী আমরা পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে পাইয়া থাকি। এ সবগুলিই মা'য়ের ব্যবহারের জন্য দিলাম। আপত্তি করিবেন না।' যাইবার সময় আমাদের তিন দিনের থাকিবার ও খাইবার খরচ বাবদ কিছু দিতে চাহিলে বলিলেন: 'অতিথিদের কিছু দিবার নিয়ম নাই। ইচ্ছা হইলে সামান্য কিছু দেবতা-প্রণামী দিয়া যাইতে পারেন।' আমরা তাহাই করিলাম।

হংকংএ দুটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। একটি 'টাইগার বামে'র (Tiger Balm) সত্ত্বাধিকারীর নির্ম্মিত একটি চীনা বৌদ্ধ মন্দির ও অপরটি মাউণ্ট পীকের (Mount Peak) চূড়া হইতে হংকং এর দৃশ্য।

'টাইগার বাম' আমাদের দেশের 'অমৃতাঞ্জনে'র মত একটি বেদনা-নিবারক মলম। পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার হয়। ইহার আবিষ্কর্ত্তা ও সত্ত্বাধিকারী একজন চীনা। তিনি এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া কোটি-পতি হইয়াছিলেন। এখন তিনি পরলোকগত; তাঁহার বিধবা স্ত্রী তাঁহার উত্তরাধিকারী। এই ক্রোড়পতি চীনা মহাজন হংকং এ ও ইন্দোনেশিয়ার একটি সহরে দুইটি বিরাট বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মন্দিরের আয়তন ও ভিতরের শিল্প-প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। কিন্তু শিল্পে প্রাচুর্য্যই আছে, শ্রীছাঁদের কোনও বালাই নাই,—ভারতীয়, চীনা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নানা শিল্প-পদ্ধতির সমন্বয় বলিলে ঠিক হইবে না,—অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। সবটা দেখিয়া মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোনও সৃষ্টি-ছাড়া স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলাম।

মন্দিরের ওপাশে একটা নালার ওপারে পাহাড়ের গায়ে চীনা বস্তি। এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট ছোট কাঠের ঘর। অনেক নীচে নামিয়া যাইতে হয় জলের জন্য। কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রমী চীনারা বংশখণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটি বড় বড় জলের ঘড়া ঝুলাইয়া কি অবলীলাক্রমে চড়াই

বাহিয়া চলিয়া যায় তাহা আমাদের দেশে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন কচিৎ-কখনো চোখে পড়ে।

হংকং-এর সর্ব্বোচ্চ স্থান মাউন্ট পীক। এখানে ইয়োরোপ-বাসী ব্যবসায়ী ধনপতিরাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। পাহাড়ের চূড়ায় রেলপথে যাইতে হয়। সেখানে রেষ্টুরেন্ট্ ও আমোদ প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা আছে। একটি বড় টেলিস্কোপ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত। তাহা দিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। হংকং এর বিরাট বিরাট প্রাসাদের উপরিভাগ, সমুদ্রের নীল জল ও ভাসমান নানা আকারের নৌকা, সমুদ্র জল হইতে পৃথক পৃথক উত্থিত পাহাড়ের শ্রেণী, আর দূরে ধূসর গিরিমালা চীনদেশের দিকে অপসৃয়মান।

হংকং ছাড়িবার দিন আসিয়া গেল। আমরা মাল-পত্র লইয়া মন্দিরের বাটি হইতে রামচান্দানীর হোলিউড ষ্ট্রীটের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার ভগ্নীর সহিত আমার স্ত্রীর সখ্য হইয়াছিল। তাঁহাকে তিনি এত উপহার দিয়াছিলেন ও এত প্রকারের উপহার যে আমাদের বাক্সে তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়া সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

একজন চীনা স্ত্রীলোক রামচান্দানির পাচিকার কার্য্য করিত। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিল যে এই মান্য অতিথিদের বিদায়ের দিনে সে তাহার মনমত চীনা খানা খাওয়াইবে। দুপুরের সময় খাইতে বসিলে দেখিলাম টেবিলটি নানাচিত্র ভূষিত চীনা মাটির বাটিতে ভরিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি পদই আমাদের অজানা, কিন্তু স্বাদে অপূর্ব্ব। মাঝখানে একটি বড় প্লেটে একটি ল্যাজা-মুড়ো সমেত আস্তো মাছ আগুনে ঝলসানো হইয়া শোভা পাইতেছে। চীনা পরিবেশন প্রথায় খণ্ড করা মাছ অতিথিকে দেওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ,— তাহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। চমৎকার স্বাদ।

বন্দরে জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল। দশবৎসর পূর্বে ইতালীয়ান লয়েড্ ট্রিষ্টিনো কম্পানীর এই 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজে নেপ্‌লস হইতে বম্বে আসিয়াছিলাম। চৌদ্দ দিন এই জাহাজে কাটাইয়া ইহার মধ্যের অলি-গলি খাওয়া-থাকার নানা ব্যবস্থা মুখস্থ ছিল। আমরা কিছু বেশী টাকা দিয়া দুইজনের জন্য নির্দিষ্ট একটি কুপে ক্যাবিন, ভাড়া করিয়াছিলাম; এ জাহাজের সকল ব্যবস্থা যে ফরাসি জাহাজ 'কস্তোজে' আমরা ইয়াকোহামা হইতে হংকং আসিয়াছিলাম, তাহা হইতে বহু শ্রেষ্ঠতর।

সন্ধ্যার পূর্বে মিঃ রামচান্দানি তাঁহার ভগ্নীসহ আমাদের জাহাজে পৌছাইয়া দিলেন। কিছু পরে আমাদের বিদায় দিতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

তখন জাহাজের সামনের ডেকে এক বিরাট বাজার বসিয়াছে। হংকং এর অপূর্ব সম্ভার মাল যাত্রীরা শেষবারের মত কিনিয়া লইতেছে। আমাদের হংকং এর ডলারগুলি (এক টাকার কিছু কম) প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছিল। একটি তামাক খাইবার পাইপ মাত্র কিনিতে পারিয়াছিলাম।

হংকং হইতে সিঙ্গাপুর

বন্দর-সংলগ্ন জাহাজেই খাওয়া-দাওয়া ও রাত্রিবাস হইল। কাল দেয়ালির উৎসব। বাজারে বিষম ভিড় ও ব্যস্ততা। দূর হইতে মৃদু কলরব কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সকলে বিদায় নিলে আহার শেষ করিয়া শয্যাশায়ী হইলাম। প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িবে। চলিয়াছি সিঙ্গাপুরের দিকে। তিনদিনের পথ।

পরদিন প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা দুই পরেই বিষম দোলানি। ঢেউগুলি সিংহের মত কেশর ফুলাইয়া মাথা ঝাঁকিতে লাগিল। আকাশে মেঘ নাই; হাওয়ার জোর নাই; তবু সমুদ্রের এই উত্তাল ভাব কেন? জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে উত্তর দিকের সমুদ্রে প্রায় একশো মাইল দূরে কালরাত্রে একটা প্রচণ্ড টাইফুন (Typhoon) ঝড় হইয়া

গিয়াছে,—তাহার ধাক্কাটাই এখান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আমি দোলানিতে খুব মজাই পাইলাম, কিন্তু স্ত্রী তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন : 'কোনওমতে নিজকে সাম্‌লে বেড়াচ্ছি—শুয়ে কাটালাম ক্যাবিনে। একবার Luggage Roomএ গিয়ে মালগুলি দেখে রসিদ আনলাম। আজ যেন ২৪ ঘণ্টায় সোয়াস্তি পাওয়া যাবে না একেবারে।" পরের দিন আবার সমুদ্র শিষ্ট শান্ত ছেলেটির মত ঘুমাইয়া পড়িল। এখন ভারত-মহাসমুদ্র সাম্‌নে।

পরের দিন সকালে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিলাম। এখানে চব্বিশঘণ্টা জাহাজ থামিবে।

সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র আছে। সকাল-বেলাই সেখানে দেখাশুনা সারিয়া ফিরিয়া আসিব মনে করিয়া জাহাজের বাহির হইতেছি, ঠিক এমন সময় দেখিলাম নীচের ডেকে সংবাদ পত্র হাতে লইয়া ভারতগামী যাত্রীরা জটলা করিতেছে। সকলের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া। জিজ্ঞাসায় জানিলাম আজ সকালে এখানকার দৈনিক পত্রিকায় চীনাদের ভারত-আক্রমণের খবর বাহির হইয়াছে।

বাহির হইয়া নিকটবর্তী বাজার হইতে যত রকমের ইংরাজী দৈনিক পত্র পাওয়া যায় কিনিয়া আনিলাম। ভারতীয় কোনও পত্রিকা নাই। ক্যাবিনে ফিরিয়া পত্রিকাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াও, বিশেষ কিছু খবর পাইলাম না। মনটা ভার হইয়া রহিল।

সিঙ্গাপুরের বাজারে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া মিশন-গৃহে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় স্বামিজি খুব অন্তরঙ্গ ব্যবহার করিয়া আমাদের রাত্রে ওখানেই আহারাদি করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন : 'মিশনেরই গাড়ী আছে। আপনাদের আসিবার জন্য গাড়ী পাঠাইব। রাত্রে আমিই আপনাদের সঙ্গে করিয়া জাহাজে তুলিয়া দিব।'

মিশনগৃহটি সহরের বাইরে, অনেক একর জমি লইয়া, একটি বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সভা-গৃহ, পূজার একটি বড় হল, প্রভৃতি লইয়া আশ্রমটি বহু-প্রসারিত, প্রাসাদোপম। চার-দিকে ফুল-ফলের বিস্তৃত বাগান।

আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন বাঙালী মহিলা ও যুবককেও স্বামিজি আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এখানকার একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের বিধবা পত্নী ও পুত্র। পরিচয়ে জানিলাম ঐ ব্যারিষ্টার মহাশয় আইনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখানে অগ্রণী ছিলেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী হইয়া সিঙ্গাপুর সহর হইতে নেতাজীকে বহু অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দেন।

"সিঙ্গাপুরে নেতাজীর কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে কিনা?" —জিজ্ঞাসায় তিনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা আমাদের বর্তমান কংগ্রেস সরকারের পক্ষে লজ্জাজনক,—হয়ত বা ঈর্ষামূলক।

শুনিলাম স্বাধীনতা লাভের পর নেতাজী সিঙ্গাপুরে যে গৃহে থাকিতেন তাহা ভারত সরকার কিনিয়া স্মৃতি সৌধে পরিণত করুন এই মর্মে সিঙ্গাপুরবাসী ভারতীয়েরা বারংবার দরখাস্ত করিয়া বিফল মনোরথ হয়। তাহারা অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল। শেষ প্রস্তাব হয়, এই গৃহে ভারতীয় দূতাবাস বা ভারত-সরকারের কোনও অপিস প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহারও কোন উত্তর দিল্লী হইতে পাওয়া যায় না। কিছু পরে বাড়ীটি একজন ইহুদী ব্যবসায়ী কিনিয়া নিয়াছেন। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে নেতাজীর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই।

রাত্রি প্রায় এগারোটায় স্বামীজির সহিত তাঁহার মোটর-গাড়ী ঘুমন্ত নগরীর নিস্তব্ধ রাস্তাগুলি চক্রমুখরিত করিয়া আমাদের 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজে পৌঁছাইয়া দিল।

প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িবে। সিধা দক্ষিণপথে ভারত-মহাসাগর পাড়ি দিয়া সিংহলের কলম্বো সহরে পৌঁছিব।

ক্রমশঃ

বিশ্বাবর্ত

লাওস : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুঃস্বপ্ন

লাওসে আবার সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। জারের সমতলভূমিতে শেষ আঘাত হানবার জন্য প্যাথেট লাওএর উন্নত আয়োজন ১৬ই মে তারিখ থেকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জারের সমতলভূমির 'ফাও কোট' এবং 'মাউং কিউঙ্গ' নিরপেক্ষদের হাতছাড়া হয়ে প্যাথেট লাওএর কুক্ষিগত হয়েছিল। তারপর অবশ্যি নিরপেক্ষরা এই দুই ঘাঁটি পুনঃ দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। সপ্তাহ না ফুরাতেই ৫ই মে তারিখে প্যাথেট লাও এই অঞ্চলে আবার অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। এই সময়টা নানা মীমাংসার সূত্র ধরে আলোচনা চলছিল।

১৬ই মে আক্রমণের পর থেকে প্যাথেট লাও-এর সঙ্গে উত্তর ভিয়েটনামের সেনাবাহিনীর অবস্থিতি পরিষ্কার হয়ে গেছে। লাওসের নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভামা ফুমা গত ২ শে মের সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য পরিবেশন করে বলেন মার্কিনী টহলদারী বিমানবাহিনী উত্তর ভিয়েটনামের যোগসাজস সংক্রান্ত ফটো তুলে এনেছে। সেই সূত্রে প্রিন্স সুভামা স্পষ্টই বলেন "As long as there is external interference in the Kingdom of Laos, it will not be possible to have peace."

এদিকে প্যাথেট লাও প্রিন্স ফুমাকে লাওসের প্রধান মন্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে এবং তিনিও লাওসে প্যাথেট লাও, নিরপেক্ষ ও দক্ষিণপন্থী—এই ত্রিশক্তির সমবায়ের অবসান দাবী করেছেন। তাঁর মতে 'Troika' বা ত্রিশক্তি ব্যর্থ হয়েছে, কারণ প্যাথেট লাও এই পদ্ধতিতে লাওসের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে চায় না। প্রিন্স ফুমা তাই আন্তর্জাতিক কন্ট্রোল কমিশনের শক্তিবৃদ্ধি করে চৌদ্দ রাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে লাওসের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবী জানিয়েছেন। অবশ্যি সেই সঙ্গে কোনো আলোচনার পূর্বসর্তরূপে যুদ্ধবিরতি এবং ১৬ই মের পূর্বেকার সীমারেখায় প্যাথেট লাও এবং উত্তর ভিয়েটনামের গরিলাদের ফিরে যাবার দাবী জানিয়েছেন।

ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রিন্স সুভানা ফুমার দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তাছাড়া, লাওস এবং গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে বিপন্ন করে তুলবার জন্য ১৬ই মে তারিখে জারের সমতল ভূমিতে প্যাথেট লাও এবং উত্তর ভিয়েটনামের আক্রমণকে দায়ী করে সোভিয়েট রুশের নিকট ব্রিটেন পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছে যে জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি-রূপে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে যেন এই বিবৃতি চৌদ্দটি রাষ্ট্রের নিকট পাঠানো হয়। এই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েটনাম ব্রিটেনের সঙ্গে লাওস সমস্যার আলোচনার জন্য একটি বৈঠক করতে সম্মত হয়েছেন। ভারতবর্ষ প্রথমটা এই সম্মেলনে হাজির হতে রাজী হয় নাই। পরে কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে এই সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কন্ট্রোল কমিশনের অন্যতম সদস্য পোলাণ্ড একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় নিরপেক্ষ দেশে ব্রিটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, পোলাণ্ড-এর সঙ্গে লাওস সরকারের নেতৃস্থানীয়দের বৈঠক হওয়া উচিত। সোভিয়েট

সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করেও চৌদ্দ-রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। ফ্রান্সের পক্ষ থেকেও একই প্রস্তাব এসেছে। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও সোভিয়েট প্রস্তাবের সমর্থন করেছে।

এদিকে ২৭শে মে তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণায় জানা গেলো তারা লাওসের রাজকীয় বিমানবাহিনীকে সবেমাত্র কিছুসংখ্যক T—28 ধরণের বিমান দিয়ে লাওসে কম্যুনিষ্ট অভিযানের অগ্রগতি বন্ধ করতে সহায়তা করেছে। ২৭শে মে তারিখে প্রিন্স ফুমার এই অনুরোধ যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিমানের সাহায্য লাওসে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং বিমানের সাহায্যে জারের সমতল ভূমিতে প্যাথেট লাও এবং উত্তর ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনীর ওপর বোমা ফেলে তাদের অগ্রগতি ব্যাহতও করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট লাওসে মার্কিনী বিমানের সাহায্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। সিয়াটো ব্রকশক্তি বর্গকে লাওসে জড়িয়ে ফেলার চক্রান্তরূপেই সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট এই মার্কিনী সাহায্য দেখা দিয়েছে।

লাওসে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চীনা ও উত্তর ভিয়েৎনামী তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল নির্ধারণের জন্য হনুলুলুতে গত ১লা ও ২রা জুন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ, রাষ্ট্রদূত ও সমরকুশলীদের এক বৈঠক রাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক ও সমর সচিব ম্যাকনামার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হনুলুলু যাবার পথে সায়গনে গত ৩১মে ডীন রাস্ক পিকিং ও হ্যানয়ের উদ্দেশ্যে একটি কঠোর বিবৃতি দিয়ে বলেন : "We are serious about South East Asia. It is absolutely necessary that Hanoi and Peking decided to leave their neighbours in this part of world alone."

All our eforts will be bent on requiring them to make that decision. If we do so there can be peace in this part of the world. It is just as simple as that."

এই কঠোর সতর্কবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে হনুলুলুর বৈঠক বসে। ভিয়েৎনাম ও লাওসে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করতে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ উত্তর ভিয়েৎনামে এবং উত্তর লাওসে প্যাথেট লাও অধিকৃত এলাকায় প্রসারিত হওয়া অনিবার্য কি না, হনুলুলুর বৈঠকে এই সমস্যাই প্রবল ছিল। যতদূর মনে হয় এখনই এশিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার জড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। কারণ আগামী নভেম্বর মাসে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। তার পূর্বে রাষ্ট্রপতি জনসন সহজে এই ধরণের কোনো দায়িত্বের ঝুঁকি নিতে সম্মত হবেন না। হনুলুলু বৈঠকে শেষবারের মত সতর্ক করে দেওয়া হল সংশ্লিষ্ট চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামকে। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াকেও। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে মার্কিনী সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এখনই এদিকে আরও অগ্রসর হয়ে সংঘাতের আবর্ত টেনে আনবে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

মালয়েশিয়া

লাওসের সংকট যেমন তীব্রতর হয়ে ব্যাপকতর যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, তেমনি মালয়েশিয়াকে কেন্দ্র করে যে সংকট কয়েক মাস ব্যাপী আবর্তিত হচ্ছে, তা প্রশমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সংকটের উত্তরণ হোলো কিনা তা এখনও চূড়ান্তরূপে বলা সম্ভব নয়। কারণ অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয়েছিল, ইন্দোনেশিয়া অবিলম্বে উত্তর বোর্ণিও অঞ্চল থেকে গেরিলাবাহিনী-অপসারিত করবে, যার পরিণতিতে ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা টোকিওতে ৩০ মে তারিখে বৈঠকে বসবেন। থাইল্যাণ্ড পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় ইন্দোনেশিয়ার গেরিলাবাহিনী অপসারণসূচী লক্ষ্য করবে। পররাষ্ট্র-

মন্ত্রীদের বৈঠকের পরই এই তিনদেশের প্রধানদের বৈঠক হবে।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়া পূর্বসর্তরূপে বোর্ণিও থেকে গেরিলা-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে অপসারণে সম্মত না হওয়ায় সংকট দেখা দিয়েছে জাকার্তা থেকে বিবৃতিতে ১লা জুন তারিখে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত লোপেজকে স্পষ্টভাবে মালয়েশিয়ার টেঙ্কুকে একথা জানিয়ে দিতে বলেছিলেন যে এই তিনদেশের মধ্যে আলোচনা, অগ্রসর হলেই ক্রমান্বয়ে গেরিলাবাহিনী অপসারিত হতে—"...farther withdrawal of volunteers will take place in conformity with progress of political talks," সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার বাহাদুরী এই সমস্যা মীমাংসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে।

কম্যুনিষ্ট শিবিরে

মস্কো থেকে ৪ঠা জুনের সংবাদে প্রকাশ সেদিনকার 'প্রাভদা'র একটি প্রবন্ধে খোলাখুলি লেখা হয়েছে কম্যুনিষ্ট শিবিরে ভাঙনের সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে—'...threat of a split is a reality which the world Communist movement must reckon with," এবং নীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত আপোষ করে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। ক্রুশ্চেভ ও সুশলভ আগামী সেপ্টেম্বরে কম্যুনিষ্ট শিবিরের বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করে চীন-সোভিয়েত দলের মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চাইলে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি এ-সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছিল, যার ফলে মস্কোর অসপত্ন নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু 'প্রাভদা'র এই প্রবন্ধে জানা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি "অনতিবিলম্ব সম্মেলনের পক্ষপাতী"। অবশ্য এই সম্মেলনে চীন আহুত হবে না এবং অনায়াসেই সোভিয়েট শিবিরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন থেকে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি বহিষ্কৃত হবে।

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট শিবিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করেছে 'প্রাভদা'র সংবাদ অনুযায়ী। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৯০টি কম্যুনিষ্ট পার্টি রয়েছে, তার মধ্যে ৬৩টি পার্টি মস্কো-অনুযায়ী। সোভিয়েটের তাত্ত্বিক পত্রিকা 'কম্যুনিষ্ট',-এ প্রকাশিত তালিকা থেকে এ-সংবাদ জানা যায়। এই তালিকায় কিউবার নাম নাই।

এই তালিকায় প্রকাশিত সংখ্যা থেকে দেখা যাবে মস্কো শিবিরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মোটেই চমকপ্রদ নয়। প্রতিটি দেশে দুইটি কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের—চীনপন্থী ও রুশপন্থী—নীতি নিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি অগ্রসর হচ্ছে—বিশেষ করে এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় এই নীতি অনেকটা সফলও হয়েছে। আফ্রো-এশীয় সলিডারিটি সম্মেলনের সম্পাদকীয় বৈঠকেও কিছুদিন পূর্বে তার সূচনা দেখা গেছে। সিংহলে শ্রীমতী থেজা গুণবর্ধন পরিচালিত সংখ্যালঘিষ্ঠ উপদলকে সলিডারিটি কমিটির পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেবার জন্য চীনা কম্যুনিষ্টরা বায়না ধরেছিল। মার্চ মাসে আলজিয়ারসে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয়ান কাউন্সিলের বৈঠকে সফল চীনা শঠতা, শ্রীমতী গুণবর্ধনের সংখ্যালঘু দলকে কাউন্সিল বৈঠকে স্থান দিতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে কায়রোতে কমিটির সম্পাদকীয় বৈঠকে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দাবীর বিরুদ্ধে চীনা ওজর নাকচ হয়ে যায়। স্থির হয়েছে সরেজমিনে অনুসন্ধান করে শ্রীমতী গুণবর্ধনের সমর্থন নির্ণীত হবে। পিকিং-বিরোধী দলই অতঃপর সিংহলের কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব পাবে, এই অনুসন্ধানের ফলে।

সম্প্রতি ক্রুশ্চেভের মিশর সফরেও পিকিং-বিরোধী প্রচার সফল হয়েছে বলে মনে হয়। ক্রুশ্চেভ মিশরকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—শুধু আর্থিক ও সামরিক সাহায্যই নয়, ইসরাইলের সঙ্গে জর্ডনের জল নিয়ে যে গুরুতর

বিরোধ মিশরের সঙ্গে দানা বেঁধে উঠেছে, সেই বিরোধে ক্রুশ্চেভ আরব স্বার্থকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। ক্রুশ্চেভের কাণে একমাত্র আরব-জাতীয়তাবাদের আবেদনটা ভাল লাগে নাই, তাই এই আন্দোলনকে নিপীড়িত আরবদের আন্দোলনে রূপান্তরের আভাস দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। ইরাক ও ইয়েমেনের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও ক্রুশ্চেভের সৌহার্দ্দ আরব দুনিয়াতে মস্কোর প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে। এই সফরের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া আরব দুনিয়ার কাছে এশীয় শক্তিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়াকে আমন্ত্রণের জন্য পিকিং-এর আপত্তির বিরুদ্ধে মিশরের সক্রিয় সমর্থনও নিশ্চিত হয়ে গেছে। চৌ-এন-লাই এর আফ্রিকা সফরের প্রচারে সোভিয়েট-বিরোধিতা অনেকাংশে ক্রুশ্চেভের সফরে খর্ব হলেও, আফ্রিকায় প্রচারের চাবিকাঠি পিকিং-এর হস্তগত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াকে পিকিং-এর পশ্চাদ্ধাবন করে ঘর সামলাবার ভূমিকায় নামতে হয়েছে।

৫. ৬. ৬৪.

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৭১

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদকীয়

রামেন্দ্রসুন্দর

'জয়শ্রী' বর্তমান সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শতবার্ষিকী স্মৃতি-তর্পণ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদেরই একজন, যাঁরা বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ধারা সমগ্র সত্তা দিয়ে বিংশ শতাব্দীতেও সঞ্চারিত করে, এই শতাব্দীর নবায়নের ভূমিকায় অগ্রবর্তীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে সযত্ন-রচিত যে কয়েকটি নিবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের চল্লিশ বছর পরেও তা সপ্রমাণ করবে, সমসাময়িক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশ করে মননার সার্বিকতায়, প্রত্যয়ের দৃঢ়তায়, চরিত্রের তেজস্বিতায় এবং সর্বোপরি মানবতার সহমর্মিতায় তাঁর অবদান কালোত্তর। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মধ্যেও তাঁরই মত এই উপাদানগুলির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

তাই রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি-চারণা খুবই দুরূহ কর্ম। মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর, দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর, শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দর, দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দর, সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর, সাহিত্য পরিষদের সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দর— রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের এরূপ বহুমুখী আলোচনায়ও তাঁর ব্যক্তি-সত্তার সামগ্রিক পরিচয় নিঃশেষিত হয় না, যদি আদর্শ-বাঙালী রামেন্দ্রসুন্দর, অনুল্লেখিত থেকে যান। বাংলাভাষায় পাঠন, বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব বাংলায় পরিবেশন, সেদিন পোষাকে-আচরণে বাঙালীয়ানা এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বক্তৃতামালা চক্রে বাংলায় বক্তৃতা দেবার অধিকার স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে প্রত্যয়নিষ্ঠার যে অনন্যসাধারণ উদাহরণ আমরা পাই, তার অনুসরণে চিরদিনই জাতি লাভবান হবে। বিশেষতঃ, সার্বিকতার সঙ্গে বাঙালীত্বের সমন্বয় রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বোত্তম পরিচয়। বাংলাপাঠকদের কাছে এই পরিচয় পরিবেশনে যাঁরা সহায়তা করেছেন, 'জয়শ্রী' তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এ-প্রসঙ্গে আমরা শুনে দুঃখিত হলাম যে এ বছর থেকে বাংলার এম, এ পাঠ্যতালিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রখ্যাত বই "জিজ্ঞাসা" বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি এ-সংবাদ সত্য হয়ে থাকে তবে বলতে হবে শতবার্ষিকী স্মৃতি-বৎসরে এই মনস্বী অগ্রবর্তীর নিকট এ-এক অভিনব ঋণ স্বীকার।

মূল্য ও খাদ্যসঙ্কট

দ্রুতগতি মূল্যবৃদ্ধির ফলে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্ক পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এই অব্যাহত-গতি মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য উচ্চ-

পর্য্যায়ের আলোচনা-বৈঠক কয়েক দফা হয়ে গেলেও, এ-পর্যন্ত কোনো কার্যকর পন্থা গ্রহণে সরকারী দৃঢ়তা দেখা যায় নাই। গত ৩০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে, সে-সময় গোটা ভারতের পাইকারী মূল্যসূচক ১৪৪-৫-এ পৌঁছায়; এ-যাবৎ যা কখনও হয় নাই এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের বার মাসে পাইকারী সূচক বৃদ্ধির হার শতকরা ৯-৩। এ-ও অভূতপূর্ব; কোন একবছরে এ-ঘটনা ঘটে নাই। তার পরও মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের ও প্ল্যানিং কমিশনের নিকট আর্জি-পত্র পাঠিয়ে দ্রুত এই সঙ্কট নিরসনের জন্য তাদের উদ্যোগী হতে বলেছেন।

সাধারণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যশস্যের মূল্য আরও আকাশচুম্বী; গতবছরে শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তণ্ডুল জাতীয় শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৬·৫ ভাগ। শুধু মূল্য বৃদ্ধিই নয়, খাদ্যশস্য দুষ্প্রাপ্যও হয়ে উঠেছে। চাউলের কথা ধরা যাক্। এ-বছর চাউল-এর উৎপাদন গত বছরের চাইতে বেশী হয়েছে—সারাভারতবর্ষে ১৯৬২-৬৩ সনে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টন, এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টন। পশ্চিম বাংলার পরিমাণ: '৬২-৬৩তে ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন '৬৩-৬৪তে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অথচ, না বাজারে সরবরাহের দিক থেকে, না মূল্যের দিক থেকে অতিরিক্ত উৎপাদনের কোনো পরিচয় পাওয়া গেল! এক কলকাতায়ই এ বছর মে মাস থেকে শুরু করে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে! সরবরাহের দিক থেকে, বর্দ্ধিত উৎপাদন সত্ত্বেও, জুন পর্যন্ত বাজারে আমদানী হয়েছে গত বছরের চাইতে শতকরা ১৬-৫ ভাগ কম। এ-ছাড়া এবারকার জুনমাসে ব্যবসায়ীদের হাতে গত বছরের চাইতে শতকরা ৪·৮ ভাগ বেশী মজুত ছিল। এই দুইয়ে মিলিয়ে মজুতদারী সপ্রমাণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের বক্তব্য, ব্যাঙ্কের টাকায় মজুদের সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কালোটাকাই মজুদের জন্য দায়ী।

মূল্য ও খাদ্যসঙ্কট নিরসনের জন্য এই পরিস্থিতিতে গত ২৪শে জুন থেকে তিন দিন দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়ে গেলো। বৈঠকে খাদ্যনীতি-নির্ধারক দীর্ঘমেয়াদী যে কয়টি প্রস্তাব নূতন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সুব্রহ্মনিয়ম রেখেছিলেন, তার সব কয়টিই মুখ্যমন্ত্রীরা লঘু করে দিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদী কিম্বা স্বল্পমেয়াদী কোনো কার্যকর স্থির-সিদ্ধান্তই সম্মেলনে গৃহীত হল না। খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব দূরে থাকুক, ফুড গ্রেণস্ ট্রেডিং কর্পোরেশনের মত খাদ্যশস্যে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসা পরিচালনার প্রস্তাবও সম্মেলন গ্রহণ করে নাই। উৎপাদক এবং ক্রেতাদের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের মূল্যনির্ধারণের জন্য খাদ্যমন্ত্রী সুব্রমনিয়মের উচ্চ-পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাবেও মুখ্যমন্ত্রীরা স্বীকৃত হোলেন না। এ-সঙ্কটে মুখ্য-মন্ত্রীদের বিকল্প প্রস্তাব, বিভিন্ন রাজ্যে চাউল ও গমের সর্বোচ্চ মূল্যনির্ধারণের প্রস্তুতির জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সুরু করা হউক। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যনির্ধারণ সম্পর্কে সম্মেলন নিরুত্তর।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রস্তাব সমূহের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে সম্মেলন সম্মত হয়েছেন। অথচ, এই সম্মতি আদায়ের জন্য সম্মেলনের প্রয়োজন ছিল না। মোটাদানার শস্য ও ডালের অবাধ বেচা-কেনা মঞ্জুর হয়েছে, অবশ্য ছোলা বাদে। মধ্যপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে চাউলের অবাধ চলাচলের প্রস্তাব সম্মেলনে মঞ্জুর হোলো না। যদিও অন্ধ্র ও মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় চাউলের অবাধ চলাচল স্বীকৃত হয়েছে এবং এই দুই এলাকায় লেভি বা প্রকিওরমেণ্ট প্রথা রদ করা হয়েছে। গমের চলাচলের নিয়ন্ত্রণ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

ভুবনেশ্বর প্রস্তাব অনুযায়ী চাউলকলগুলি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের

সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীদের চাপে বর্জন করে সে-স্থলে নূতন চাউল কল স্থাপনের প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। উদ্বৃত্ত চাউল (marketable surplus) দখলের কোনো প্রস্তাব সম্মেলনে গ্রহণ না হওয়ার ফলে মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোটাকার ব্যাবসায়ীদের হাতে লুণ্ঠনের ও শোষণের নির্বাধ অধিকারে স্থায়িত্ব দিয়ে, আমেরিকা, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, বর্মা ও নেপালের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।

সরকারী খাদ্য ও মূল্য নীতির প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে দেশে দেখা দিয়েছে। আগ্রায় ও মধ্যপ্রদেশে খাদ্য শস্যের দোকান লুঠ হয়েছে, রাজকোটের ইমারত-শ্রমিকেরা দশদিনের চরম-নোটিশ দিয়ে শস্যের গুদাম দখলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের মানুষ চাল-তেল-মাছ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও সরবরাহের পরীক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। সর্বাত্মক আর্থিক সঙ্কট, প্রশাসনিক সঙ্কটে পরিণত হবার বিপদ-সঙ্কেতের সামনে দাঁড়িয়েও সরকারী অব্যবস্থা ও কালক্ষেপণ সারা দেশকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে টেনে নিচ্ছে। কালোটাকার কারসাজী কঠোর হস্তে দ্রুত দমনের সাহস না থাকলে সামাজিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আয়ুবের ভারত-মৈত্রীর কূটনীতি

ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে পাক ডিক্টেটর আয়ুবের উক্তিগুলি একই সঙ্গে আন্তরিকতা ও কূটনৈতিক সংশয়ের অবকাশ সৃষ্টি করেছে। অতীতের তিক্ততা বিস্মৃত হওয়ার আবেদন জানিয়ে পাক-ভারত বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে ভারতের পরলোকগত ও বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে আগ্রহ আয়ুব প্রকাশ করেছেন, তা' ভারত সম্পর্কে পাক-রাজনীতির পরিবর্তনসূচক বলে মনে হতে পারে। ভারতকে এক লক্ষ টন চাল ন্যায্যদামে দেওয়ার সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনায় ভারতের প্রতি পাকিস্তানের সহযোগীসুলভ মনোভাব,—এই যুক্তিকেই শক্তিশালী করে যে, আয়ুব ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে যথার্থই ইচ্ছুক। কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ভারত সম্বন্ধে পাকিস্তানের যতগুলি সদ্য-অনুসৃত নীতি বরং আয়ুবের মনোভাব সম্বন্ধে গভীর সংশয় সৃষ্টি করে। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত থেকে পুলিস অফিসারসহ কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের অপহরণ, কাশ্মীর সীমান্তে গুলি বিনিময় ও পাক-ভারত সামরিক ব্যক্তিদের নিধন, আফগান, ইরাণ ও ইরাকসহ পাকিস্তানের প্যান ইসলামিক কনফেডারেশন গঠনের প্রয়াস, কাশ্মীর সম্বন্ধে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি, চীনের কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব নেই বলে ভারত-বিরোধী উক্তি—এরূপ আচরণগুলি এই তাৎপর্য্যই তুলে ধরে যে ভারত সম্বন্ধে আয়ুবের উক্তি ও আচরণ সমান্তরালবর্তী নয়।

পূর্ববঙ্গে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিণতি রোধ করবার জন্য ভারত যে মৈত্রীর আহ্বান জানায় কিছু কাল আগেও তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করে এবং সম্প্রতি পাক-ভারত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের আলোচনায় পাকিস্তান অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে হঠাৎ কেন যে ভারতের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে আয়ুব আগ্রহান্বিত হলেন এবং কেন অতি দ্রুতমাত্রায় ভারত সম্পর্কে মৈত্রী-মনোভাব ব্যক্ত করতে তিনি অগ্রণী হলেন কূটনৈতিকস্তরে তার কারণ সন্ধান করে তবেই ভারতের পক্ষে পাক-কূটনীতির সম্মুখীন হওয়া উচিত।

কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণে আবদুল্লার অস্বীকৃতি ও কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে সমগুরুস্থান, শ্রীনেহেরুর পরলোকগমনের ফলে ভারতীয় সরকারী মহলে মনস্তাত্ত্বিক চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা, ভারতের সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ইঙ্গ-মার্কিণ সহায়তা দান ও প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি, আগামী নির্বাচনে বৃটেনের পাক-বন্ধু রক্ষণশীল সরকারের পতনের আশঙ্কা, রুশ-চীন বৈরিতার ফলে ভারতের প্রতি রাশিয়ার

বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং আয়ুব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ক্রমবর্দ্ধমান গণ-আন্দোলন এবং সে সম্বন্ধে ভারতের বর্দ্ধিত আগ্রহ—এরূপ কি কি কারণের জন্য আয়ুব ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আগ্রহান্বিত হলেন সে সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ সচেতনতা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

আয়ুব সামরিক নেতা এবং এই পাক-ডিক্টেটরের রাজনীতিও সামরিক ষ্ট্র্যাটিজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। কাশ্মীর দখলে ভারত-চীন সামরিক বৈরিতার পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে আয়ুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই সুযোগ হাত ছাড়া হলে সামরিক প্রস্তুতিতে বলীয়ান ভারতের সামনে যে আয়ুবকে সর্বদা সংযত থাকতে হবে সেকথাও এই পাক-নেতার অজ্ঞাত নয়। আবহাওয়া-পরিস্থিতি এবং ইঙ্গ-মার্কিণের চাপের সুযোগে বিনা সামরিক সংঘাতে কাশ্মীর দখল করা সম্ভব কিনা এবং তা না হলে বর্ষা শেষে চীনের সামরিক তৎপরতার সুযোগ গ্রহণ করে কাশ্মীর দখলের শেষ চেষ্টা করার পাক-কূটনৈতিক ভূমিকা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতি আয়ুবের কূটনৈতিক মৈত্রীর মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছে কিনা,—সে সম্বন্ধে সতর্ক কূটনৈতিক বিচার একান্ত আবশ্যক। পাকিস্তান আজ গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন,—এই দ্বন্দ্ব বিস্ফোরিত হওয়ার আগে আয়ুবের হাত শক্তিশালী করা উচিত কিনা সেকথাও আজ বিবেচ্য। উচ্চাদিক আদর্শবাদের নামে ভারত এতকাল অনেক বন্ধ্যা ও অবাস্তব রাজনীতির পরিচয় দিয়েছে,—আয়ুবের সঙ্গে আলোচনায় কূটনীতিই হবে প্রধান অস্ত্র,—ভারত যেন সেকথা না ভোলে।

গোপন দলিল

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে মার্কিনী গুপ্তচর বিভাগ যে গোপন দলিল তৈরী করেছিল, এতোদিন পর সেই অপ্রকাশিত দলিল ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এই দলিলে নেতাজীকে জাপানী-পুষ্টরূপে চিহ্নিত ও পরিচিত করবার মার্কিনী আগ্রহ খুব উদগ্রভাবে ফুটে উঠেছে। গত আঠার বছরের মধ্যে নেতাজী ও তাঁর আই, এন, এর স্বাধীনপ্রয়াসের কীর্তিগাথা সারা দেশকে উদ্বেল করেছে। কোনোপ্রকার আপোষ না করে, ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে, স্বাধীন সরকারের প্রাপ্ত সকল অধিকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা করে নেতাজী সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতে যে অনন্য-সাধারণ সম্মানের আসন অর্জন করেছিলেন, কোনো কুৎসা কিম্বা অপপ্রচার তাকে ম্লান করতে পারবে না। আমরা বিস্মিত হই এই ভেবে, মার্কিনী ঔদ্ধত্য-এর এই প্রকাশ, এই সময়ে সম্ভব হল কেন এবং ভারত সরকারই বা এই গোপন দলিল গ্রহণে সম্মত হয়ে তাতে সায় দিলেন কেন? এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দলিলটি প্রত্যাখ্যান করে কিম্বা তার প্রতিবাদে দলিলটির সম্পর্কে ভারত সরকারের নিজস্ব মত প্রচার করে ভারত সরকার জাতীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন, এই দাবী জানাচ্ছি।

পূর্ব-পাক সংখ্যালঘু নিধনের তথ্যানুসন্ধান

গত জানুয়ারীর হত্যাকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কিরূপ শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, পাকিস্তানে ন্যায়ের শাসন ও মানবিক অধিকার বর্তমান আছে কিনা এবং কেন লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারতীয় জুরিষ্ট কমিশন উদ্যোগী হয়েছেন। এজন্য এই কমিশন পূর্ববঙ্গ ত্যাগী সংখ্যালঘুদের বিবৃতি সংগ্রহ করার কাজে অগ্রসর হয়েছে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ এবং আসাম ও আগরতলায় শিবিরে যে সমস্ত উদ্বাস্তু রয়েছে, কমিশন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত উদ্বাস্তু, যারা কোন সরকারী আশ্রয় শিবিরে যায়নি এবং যারা পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণও একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশাকরি যে

এরূপ ব্যক্তিরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কমিশনের কাছে বিবৃতি পাঠাবেন। কমিশনের সেক্রেটারি শ্রীপুরুষত্তম ত্রিকমদাস (১০৫, সুন্দর নগর, নয়া দিল্লী) শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী অথবা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত সমাজসেবীদের বিবৃতি পাঠিয়ে গত জানুয়ারীর দাঙ্গায় ভুক্তভোগী পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কমিশনের এই প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত গত দাঙ্গার অনুসন্ধান এবং সুরিষ্ঠ কমিশন কর্তৃক তার রিপোর্ট প্রস্তুতির গুরুত্ব কতখানি আশাকরি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা সেকথা উপলব্ধি করে সর্বতোভাবে কমিশনকে সাহায্যদানে এগিয়ে আসবেন।

কায়রণ বিদায়

একক ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত দাশ কমিশন পাঞ্জাবের একদা জাঁদরেল মন্ত্রী কায়রণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্ত সম্পাদনে এক ঐতিহাসিক নজীর স্থাপন করেছেন। কায়রণের ন্যায় প্রতাপশালী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তে বিচারপতি দাশ যে সাহস ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় বিচার বিভাগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীত্বের স্তরে দুর্নীতিরোধে এক নতুন ঐতিহ্য রচিত হয়েছে। কায়রণ সম্বন্ধে নির্ভীক রিপোর্ট প্রকাশের জন্য বিচারপতি দাশ ভারতীয় জনতার অভিনন্দন লাভ করবেন।

নেহেরু-যুগের প্রথায় কায়রণের কৃতিত্বের সুখ্যাতি করে তাঁকে বিদায় দেওয়ার যে চেষ্টা পাঞ্জাবের কংগ্রেস দল করতে চেয়েছিল, শাস্ত্রী-কামরাজ তার অনুমোদন না করে যথার্থ কাজ করেছেন। কায়রণ বিদায়ের পরে নব গঠিত রামকিষাণ মন্ত্রীত্ব কায়রণের দুর্নীতিগ্রস্ত ঐতিহ্য, সরকারী আমলাতন্ত্রকে সংবিধানগত দায়িত্বের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার বাইরে মন্ত্রীসভার আজ্ঞাবহ রাখার প্রচেষ্টা এবং কায়রণের অনুচরবর্গকে গদীয়ান রাখার চেষ্টা সম্বন্ধে কিরূপ নীতি গ্রহণ করে, তার উপরে নির্ভর করে কায়রণ বিদায়ের নৈতিক তাৎপর্য। দাশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী যে সকল মন্ত্রী ও আমলা দুর্নীতির কারক ও সহায়ক তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে দাশ কমিশনের গুরুত্ব অসম্পূর্ণ থাকবে।

উদ্বাস্তুদের শিবির ত্যাগ ও পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন

সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় পনের হাজার উদ্বাস্তু শিবির ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছে বা ফিরে আসার চেষ্টা করছে। এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে প্রায় তিন হাজার শিবির-ত্যাগী উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্থানে যাওয়ার পথে কোন কোন উদ্বাস্তুকে ভারতীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

কেন উদ্বাস্তুরা শিবির ত্যাগ করছে, তার জন্য দায়ী করা হয়েছে একশ্রেণীর উস্কানীদাতা প্ররোচকদের। কিন্তু এই এজেন্টরা কারা একটি ক্ষেত্রেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি বা এরূপ কোন এজেন্ট গ্রেপ্তারও হয় নি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সরকারের পুনর্বাসন নীতি ও শিবির ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও অনুপযোগিতার অপকীর্তি ঢাকার জন্য উদ্বাস্তুদের শিবির ত্যাগের জন্য দায়িত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এই কল্পিত এজেন্টদের। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভার যৌথ-চক্রান্ত প্রতিরোধ করে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাইরে পাঠাবার নীতি পরিবর্তন এবং উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উপযুক্ত উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠাবার নীতি গৃহীত হলে কোন উদ্বাস্তুই শিবির ত্যাগের পথে অনিশ্চিত ও ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার দিকে ঝাঁপ দিত না। লক্ষ্যের বিষয় যে আসাম বা আগরতলার কোন উদ্বাস্তু শিবির থেকে উদ্বাস্তুরা পালিয়ে যায় নি বা যাবার চেষ্টা করে নি। কারণ সীমান্ত পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

বস্তাবন্দী করে এই উদ্বাস্তুদের এক অসহনীয় পরিবেশে পাঠান হয় নি।

যে উদ্বাস্তুরা ব্যর্থতা ও হতাশার প্রতিমূর্তিরূপে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের শোচনীয় কায়িক দুর্ভোগই নয়,—তারচেয়ে তাদের অভিশপ্ত চিত্র ও কাহিনী পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনে যে মনোবলহীনতা ও ব্যর্থ আশার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে,—তার পরিণাম যে কী ভয়াবহ হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ক্ষমতালোলুপ এবং সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি নেতৃত্বের পক্ষে সেকথা অনুধাবন করা সম্ভব না হলেও, গোটা পশ্চিমবঙ্গও তার সম্ভাব্য পরিণাম থেকে রেহাই পাবে না।

মার্কিন নিগ্রোদের সমানাধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা এতকাল পূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জনসন দক্ষিণাঞ্চলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও 'সিভিল রাইট বিল' পাশ করে নিগ্রোদের সরকারী স্কুল, সিনেমা, রেস্তোরা,' পার্ক, ইত্যাদি স্থানে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন এবং পুলিসের সাহায্যে এই আইন কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেছেন। আসন্ন নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ফলাফলের কথা বিবেচনা না করে প্রেসিডেন্ট জনসন এই সিভিল রাইট আইন প্রবর্তন করে সমগ্র মার্কিন জাতিকে বিশ্বের কাছে অভিনন্দনযোগ্য করে তুলেছেন। মানবিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের ব্যথা ভারতের অজ্ঞাত নয়—অস্পৃশ্যতা নিবারণে এবং 'নিম্ন সম্প্রদায়'কে মানবিক অধিকারদানে ভারতের জাতীয় নেতাদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছে সে কথা স্মরণ করে সহমর্মীর মনোভাব নিয়ে ভারতের প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এই সিভিল রাইট বিল পাস করবার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যথাযোগ্য কাজ করেছেন। মার্কিন নিগ্রোদের মানবিক অধিকারের জন্য মার্কিনরাষ্ট্রে দীর্ঘ সংগ্রাম চলেছে এবং এজন্য প্রেসিডেন্ট অ্যাব্রাহাম লিংকন ও কেনেডি প্রাণ দিয়েছেন। আজ সেই মহৎপ্রাণের আত্মোৎসর্গ মানবতার ইতিহাসে জয়ী হলো।

উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা

উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এম-এস-সি পাশ ফিজিক্স ও কেমেস্ট্রি এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। মফঃস্বল অঞ্চলের অনেক স্কুলেই নিম্নমানের শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানেও বাঙালী বিজ্ঞানীর অভাব ঘটতে আরম্ভ করেছে। বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানীর এরূপ অভাবের কারণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগের অভাব। ডিসটিংশন পেয়ে যারা বি-এস-সি পাশ করে তারাও এবং যারা অনার্স পায় এরূপ সকল ছাত্রদের পক্ষেও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ আর্টসের ন্যায় বর্দ্ধিত হয় নি। নানা নীতি এবং অর্থকরী অসুবিধার অজুহাতে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সংকুচিত করা হয়েছে। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধক ল্যাবরেটারীর ব্যবস্থা করা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল-বিকাল-রাত্রে এই তিন শিফটে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলে বর্তমানের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছাত্রকে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষকতার প্রচলিত বিধির কিছুটা পরিবর্তন করা হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকেরও অভাব ঘটবে না। অন্যান্য প্রদেশে ছাত্রদের যেখানে বর্দ্ধিত হারে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেখানে বাংলা দেশে উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত রাখা বাংলা দেশের পক্ষে এক অপরিণামদর্শী ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে।

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান

যাঁকে অখণ্ড ভারতবর্ষ একদিন সীমান্ত গান্ধীর সম্মানে

ভূষিত করেছিল সেই অতুলনীয় চরিত্রের ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষটি দেশভাগের সতের বছরের মধ্যে সামান্য কিছু সময় ছাড়া প্রায় সমস্ত সময় হয় কারাবন্দী না হয় অন্তরীণ রয়েছেন। তাঁর লালকোর্তা বাহিনীর সহকর্মীদের নির্মমভাবে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে এবং বহু লালকোর্তা নেতা এখনও কারাগারে পচে মরছেন। সীমান্ত গান্ধী বৃদ্ধ ও রুগ্ন হয়ে পড়েছেন তবুও পাকিস্থানের আয়ুব শাসন এই মহান মানবটিকে যথার্থ চিকিৎসার সুযোগ দিতে পর্য্যন্ত রাজী নন। ভারতের উচিত আন্তর্জাতীয় অভিমত সৃষ্টি করে যাতে সীমান্ত গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের উপরে মানবতাসুলভ ব্যবহার করা হয় তার জন্য পাকিস্থানের উপরে চাপ সৃষ্টি করা। এই জাতীয়তাবাদী পাঠানেরা যারা শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের অনুগামী ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে অপরাধ ভারতের কংগ্রেস নেতারা করেছেন সে জন্য কি আজ কিঞ্চিৎ বিবেক-দংশনও হয় না ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের?

পূর্ববঙ্গে ছাত্র দলন

পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজের প্রতি এক বর্বর নীতি চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের আয়ুব শাহী। এই ছাত্রদের অপরাধ যে তারা পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকামী এবং পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী। পূর্ববঙ্গে ছাত্র সমাজের প্রতি দমন নীতি আজ এমন পর্য্যায়ে উঠেছে যে কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সলিমুল্লা হলের প্রায় ৫০০ ছাত্রকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জোর করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্রদের হোষ্টেল থেকে বিতাড়িত করা, লাঠি-গুলি ও কাঁদুনে গ্যাসের প্রয়োগই শুধু নয় বহু ছাত্রের গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বহু ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং রাষ্টিকেট করাও হয়েছে অনেক ছাত্রকে। এরূপ পাশব দমন নীতি সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার মুসলীম ছাত্র সমাজ তাদের গৌরবময় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে ছাত্র সমাজের প্রতি আয়ুব শাহী যে নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে ছাত্র ও যুব সমাজ কর্তৃক তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন

১৯৬২ সনের পর গত ৬ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত লণ্ডনে ১৮টি রাষ্ট্রের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে গেলো। এই ১৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টিই অশ্বেত রাষ্ট্র, পাঁচটি শ্বেতরাষ্ট্র। কেনিয়া ও উগাণ্ডা এ-বছরই প্রথম সম্মেলনে যোগ দিল। ডাঃ হেষ্টিংস বাণ্ডার মালওয়াই রাষ্ট্র ৬ই জুলাই স্বাধীন হয়েছে। ৯ই জুলাই থেকে এই রাষ্ট্রও সম্মেলনের শরীক হয়। ২৪শে অক্টোবর উত্তর রোডেসিয়া জাম্বিয়া নাম নিয়ে স্বাধীন হলে, তারাও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হবে। কমনওয়েলথের সর্বপ্রধান প্রবক্তা নেহেরু লোকান্তরিত, তার স্থলবর্তী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। শ্রীশাস্ত্রীর প্রতিনিধি ভারতের অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর আসন সম্মেলনের পেছনের সারিতে, কারণ তিনি রাষ্ট্রপ্রধান নন। ভারতের দ্বিতীয় প্রতিনিধি তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসন আরও পেছনের সারিতে। সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা খুবই অস্পষ্ট, বোধহয় অনাবশ্যক ছিল। ভারতবর্ষের মত সাইপ্রাস ও জামেইকার রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিবর্তে অন্য মন্ত্রীরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সিরিয়া লিওনের প্রধানমন্ত্রী স্যার মিলটন মারগাই লোকান্তরিত হয়েছেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মারগাই ও কানাডার নূতন প্রধানমন্ত্রী লেষ্টার পিয়ারসন বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন।

নেহেরুর লোকান্তর ও শ্রীশাস্ত্রীর অনুপস্থিতি কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারতের রাজনৈতিক গুরুত্ব খর্ব করে তার কূটনৈতিক পরাজয়ের কারণ হয়েছে। সম্মেলনে কয়েকটি গঠন মূলক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। ঘানার নক্রুমা কমনওয়েলথ সম্পাদকীয় চক্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন, সিংহলের

বন্দরনায়ক ও ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রী ডঃ এরিক উইলিয়মস কমনওয়েলথের আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য আপোষ-রফা কমিশন গঠনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন. ডঃ এরিক উইলিয়মস কমনওয়েলথ তথ্যকেন্দ্র এবং কমনওয়েলথ উন্নয়ন তহবিল গঠনের ওপরও জোর দিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী লেষ্টার পিয়ারসন কমনওয়েলথ-এর উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি শান্তিবাহিনীর কথা বলেছেন, এছাড়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছয়-দফা গঠন মূলক কর্মসূচী রূপায়নের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ-বন্ধন সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভারতের কণ্ঠ নীরব। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার গঠন মূলক প্রস্তাব উত্থাপিত হতে দেখা গেলো না।

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আয়ুবখান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথে উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে আর্থিক বৈষম্যমূলক আচরণ-এর উল্লেখ করে কমনওয়েলথের এশীয় ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতের অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায়ও কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ না করে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশের সম্মুখে ভারতের নৈতিক নেতৃত্বের আসন বিপর্যস্ত করেছেন। কিন্তু, তার চাইতেও শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে, সম্মেলনের শেষে প্রধানমন্ত্রীদের বিবৃতিতে মুরুব্বীর ভঙ্গীতে, মৈত্রীর ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্থান সমস্যার সমাধানের উপদেশ বর্ষণে। কাশ্মীরের নাম উল্লেখ না করেও, এই উপদেশ কাশ্মীর-বিরোধ লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছে ; এ-বিষয়ে পৃথিবীর কারো মনে কোনো সংশয় থাকবে না। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই প্রসঙ্গ উল্লেখে সম্মত দিয়ে যেমন গুরুতরভাবে কর্তব্যচ্যুত হয়ে ভারতরাষ্ট্রের অসম্মান ডেকে এনেছেন, তেমনি ব্রিটেন এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে সহায়ক হয়ে ভারতীয় জনগণের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। অতঃপর ভারতীয় মনে কমনওয়েলথে যুক্ত থাকার সার্থকতা সম্বন্ধেও গভীর সংশয়ের অবকাশ সৃষ্টি করবে। অথচ, ভারতের চীনা আক্রমণ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ বিবৃতিতে স্থান পেলো না। কিন্তু মালয়েশিয়া তার বিপন্ন সার্বভৌমত্ব-এর ও প্রতিবেশীদের সহিত সংঘাতের প্রশ্নে গোটা কমনওয়েলথের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করে নিয়েছে, যদিও ঘানার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সদ্ভাব রয়েছে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গেও বর্তমানে অসদ্ভাব নাই।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে আফ্রিকার প্রতিনিধিদের বক্তব্য সব চাইতে গুরুত্বলাভ করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এবং সংখ্যাগুরু আফ্রিকানদের সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতার দাবীতে কেনিয়া ও ঘানার নেতৃত্বে আফ্রিকার সকল প্রতিনিধিদের জোটবদ্ধতা এবং এই দাবীর প্রতি ভারত ও কানাডার সমর্থন শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে স্বীকৃতি পেয়েছে। কমনওয়েলথের বন্ধন ছিন্ন করার প্রবল দাবী বারবার ভারতবর্ষে উত্থাপিত হলেও, কমনওয়েলথ-এর নবরূপায়নে নেহেরুর অবদান ছিল সর্বাধিক। আজ এই কমনওয়েলথ গোষ্ঠিতে ভারতবর্ষ নিঃসঙ্গ ও হতমান এবং ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার এই কালিমা লেপনে অন্যতম সহায়ক। অতঃপর কমনওয়েলথ বন্ধন ছিন্ন করার দাবী অনিবার্য ভাবেই প্রবল হয়ে উঠবে। ১৭. ৭. ৬৪

ভুল-সংশোধন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বহ্নিতে "মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনের পাঠ "...দুইটি পরিকল্পনায় প্রায় হাজার কোটি টাকা"র পরিবর্তে "...দুইটি পরিকল্পনায় প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা" হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। বঃ সঃ

আদর্শবাঙ্গালী রামেন্দ্রসুন্দর

অনাথবন্ধু দত্ত

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্দ্যলগোত্রীয় জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ জনাদরাম ত্রিবেদী গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া-বৈদ্যপুর নামক গণ্ডগ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমো-রাজবাটীতে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া উক্ত গ্রামেই বসবাস আরম্ভ করেন। বলভদ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম গোবিন্দসুন্দর, ইনি রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ সকলেই সাহিত্যানুরাগী, কেহ ছিলেন নাট্যকার কেহ কবি। এই কাব্যামোদী পরিবার একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিল। যাহারা এই পরিবারের মতই উত্তর ভারত হইতে আসিয়া এদেশে স্থায়ী হইয়াছিল তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি হইত। বাঙ্গালা দেশের এক বৃহৎ জনসংখ্যা বাহিরাগতের সন্তান এবং বর্ত্তমানে তথা প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতির ধারক এবং জনক, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের বংশে মাতা চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে ইংরেজী ১৮৬৪ সনের ২০শে আগষ্ট (১২৭১, ৫ই ভাদ্র) রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে (১৮৭০, ২৫শে মে) গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। তাঁহার নিজের ভাষায়—"পিতৃদেব পুনঃপুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।"

১৮৭৫, নভেম্বর মাসের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম হন এবং বৃত্তিলাভ করেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গলা বই পড়ার নেশা হয়। ১৮৭৬ সনে কান্দি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময় কিছু কিছু কবিতা লেখেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষার বৎসরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, পাঠের ব্যাঘাত হয়, তবু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান।

ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় তিনি পাঠ্যপুস্তক-ব্যতীত বাহিরের ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে বেশী মন দেন ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান হারাইয়া দ্বিতীয় স্থানে নামেন (ইং ১৮৮৩), কিন্তু ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

পরের বৎসর (১৮৮৫) তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যু হয় এজন্য তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি নেশা এই সময় জন্মে। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া ছাড়িয়া দেন। ১৮৮৬ সনে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পান এবং পর বৎসর পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ দিবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৮৮৭ সনে এম, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম হন এবং ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার পান। উক্ত দুই বিষয়েই পরীক্ষা দিয়া পর বৎসর (১৮৮৮) প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র এই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পর দুই বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর বিনাবেতনে প্রেসিডেন্সি

কলেজের লেবোরেটারিতে বিদ্যাচর্চ্চা করেন। কিছু কালের জন্য তিনি আইন-ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাল না লাগায় অল্পদিন মধ্যেই ইহা ত্যাগ করেন। এই সময় বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহপাঠি ছিলেন।

কান্দি ইংরেজী স্কুলে পাঠকালে ১৮৭৮ ৬ই মে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে, জেমোর রাজবাটীতে, নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের মত কৃতীছাত্রের চাকুরীর অভাব হয় না। কিন্তু তিনি কলিকাতাকে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাব্রত ও বঙ্গবাণীর সেবা আপনার কর্তব্য এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেন। জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তিনি ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে যোগ দিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যাপনা প্রণালী মামুলী রীতি হইতে পৃথক ছিল, তিনি ইংরেজী বাঙ্গলা মিশাইয়া বক্তৃতা করিতেন এবং এজন্যই ছাত্রগণ তাঁহার শিক্ষায় খুবই উপকৃত হইত। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই ছিল বাঙ্গালী অথচ শিক্ষা হইত ইংরেজী মাধ্যমে, যাঁহারা এই অস্বাভাবিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (অসহযোগ বলাই ঠিক) তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধাররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ হয় এজন্য তিনি আমৃত্যু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৩ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ছয় মাসের ছুটী লইলে তৎস্থানে রামেন্দ্রসুন্দর অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কৃষ্ণকমল আর কলেজে যোগ না দিয়া অবসর গ্রহণ করিলে তিনি উক্ত পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলেজে ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যবহারের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান ব্যতীত ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ছাত্রেরা তাহাদের আবেদন সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত, আপিসের মারফত নহে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলিয়া বিচার মীমাংসা করিতেন। ইহাতে ছাত্রের ভিড় হইত, কিন্তু তাঁহার বিরক্তি ছিল না। দারিদ্র্য ও অক্ষমতাজনিত অভিযোগে তাঁহার ছিল বিরাট মানবীয় সহানুভূতি কিন্তু নৈতিক অপরাধের দণ্ডবিধানে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। অপরাধী ছাত্রগণের জরিমানার অর্থ কলেজের কোষে যাইত না, দরিদ্র ছাত্র ভাণ্ডারে জমা পড়িত এবং উহাদ্বারা নিঃস্ব শিক্ষার্থীদের সাহায্য হইত। তিনি সকল সময় ছাত্রদের স্মরণ করাইতেন যে তাহারা ভারতের সন্তান, দেশের খ্যাতি-অখ্যাতি, উন্নতি-অবনতি তাহাদের আচরণের উপর নির্ভর করে। এরূপ দরদী মনের সংস্পর্শে আসিয়া তরুণের মন ধন্য হইত।

সকল অধ্যাপকদের সহিত তিনি একঘরে বসিতেন, তাঁহার কোন খাস কামরা ছিল না। এরূপে অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যেও একটা আনন্দের ও নানা সদবিষয়ের আলোচনার পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা আধুনিক কলেজরূপ যন্ত্র-জগতে সুলভ নহে। কখনও বৈদিক যজ্ঞ, ইহুদী জাতির ইতিহাস, প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, বৌদ্ধদর্শন, বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রভৃতির সরস আলোচনা চলিত। নবীন অধ্যাপকগণ ইহাতে খুবই উদ্বুদ্ধ হইতেন। রামেন্দ্রসুন্দর সকলকে বাণীর সেবায় উৎসাহিত করিতেন। সংক্ষেপে তাঁহার উপদেশ ছিল—"চর্চ্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ।" অধ্যাপকগণের একটী সঙ্ঘ ছিল (অবশ্য ইহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম কানুন ছিল না কারণ রামেন্দ্রসুন্দর এরূপ নিয়মাবলী এরূপ প্রতিষ্ঠানে

অনাবশ্যক মনে করিতেন) ; তিনি নিজেই অনেক সময় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থাপিত করিতেন। অনেক সময় বাহিরের দুই একজন বিশেষজ্ঞ বন্ধুকেও ইহাতে আমন্ত্রণ করা হইত। ছাত্র হইলেও এই সকল বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদেরও যোগ দিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত প্রবন্ধ (নিজের শরীর বিশেষ সুস্থ না থাকায়) সাধারণতঃ অপর একজন অধ্যাপক পাঠ করিতেন। এইরূপ একটী ধারাবাহিক পঠিত প্রবন্ধ পরে 'জগৎ কথা' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরকে সাধারণতঃ লোকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াই জানে এবং যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে কতবড় দার্শনিক ছিলেন আজও উহার পরিমাপ হয় নাই। একটা কথা আছে যে যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানে দর্শনের আরম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক দানও জ্ঞান-বিজ্ঞান শেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দার্শনিক সাহিত্যে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছে —তাঁহার তুলনা নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধাবলী ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইলে তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় মনীষিগণের মধ্যে স্থান পাইতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর সেবাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক নামের মোহ তাহাকে কখনও পায় নাই। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গ তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল তাঁহার প্রাণের জিনিষ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকের ১৯১২-১৯১৬ সন পর্য্যন্ত (আই-এ, বি-এ ক্লাসে) রিপন কলেজে পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার গুণমুগ্ধ সহকর্মী শিক্ষাব্রতীগণের সান্নিধ্যে আসায় নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বলা প্রয়োজন যে জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মূলে একজন শিক্ষাব্রতী এবং ১৯১২-১৩ সেশন পর্য্যন্ত তিনি রীতিমত কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি আমাদের আই-এ ক্লাসে Froud's Seamen in the Sixteenth Century পড়াইতেন। ঐ বৎসর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় সময়াভাব দরুণ তাহাকে কলেজের অধ্যাপনার কাজ পরিত্যাগ করিতে হয় যদিও উহার পরিচালনার সহিত আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট থাকিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর কোন গুরুতর অপরাধ করিলে রামেন্দ্রসুন্দর তাহাকে শাস্তি দেন এবং এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে বাধা দিয়া কলেজের অধ্যক্ষপদের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই বিষয়ে যেরূপ চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই প্রমাণিত হয় তিনি একদিকে ছিলেন "বজ্রের মত কঠোর আবার অন্যদিকে কুসুমের মত কোমল।" এই বিভিন্ন গুণের সমাবেশ তাঁহার জীবনকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করিয়াছিল।

প্রাচ্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইলেও রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইউনিভার্সিটি (স্যাড্‌লার) কমিশনের (১৯১৭) নিকট এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

রিপন কলেজের কোন সাময়িক পত্রিকা বা ম্যাগাজিন ছিল না। তৎকালে মাত্র চারিটি কলেজে এরূপ পত্রিকা ছিল। আমরা কলেজ ইউনিয়নের সাহিত্য শাখার (উহার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী—পরে অধ্যাপক) পক্ষ হইতে রিপন কলেজ হইতে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের স্মরণাপন্ন হইলাম।

কলেজের তৎকালীন অধ্যাপকগণ বিপিনবিহারী গুপ্ত, অতুলচন্দ্র সেন, কিরণকুমার বসু, সুকুমার দত্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই বিষয়ে আমাদের সহায়ক হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্ন করিলেন "বেশ কাগজ না হয় বাহির হইবে, কিন্তু কি ভাষায় হইবে ?" আমরা বলিলাম "ইংরেজী ও বাঙ্গালা।" তিনি বলিলেন "ইংরেজী কেন ?" আমরা যখন বলিলাম সর্ব্বত্রই ইংরেজী, চর্চ্চার দিক দিয়াও ইংরেজী যেমন প্রয়োজন, বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগও ইহার মাধ্যমে সম্ভবপর ও সহজ।' রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন 'আচ্ছা তা হ'লে ইংরেজী-বাঙ্গালা দুই থাকিবে, বেশ !' কাগজ বাহির হইবে ইহাতে আমাদের খুবই আনন্দ, অধ্যক্ষের আনন্দও কম নহে। ছাত্রগণ, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে মিলিয়া এই পত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চ্চা করিবে ইহাতে তিনি খুবই আনন্দিত। পত্রিকার "মটো" লিখিয়াছিলেন :—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

(শ্লোকটী যজুর্ব্বেদের ঈসোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত)

রিপন কলেজ ম্যাগাজিন প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৯১৫-আগষ্ট মাসে। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর প্রথম দৃষ্টিতে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কেহই সম্পূর্ণরূপে মর্ম উদ্ধার করিতে পারিলেন না। শেষে 'বেঙ্গলী' আপিসের যিনি সুরেন্দ্রনাথের হাতের লেখা দেখিয়া হরফ বসান (কম্পোজ করেন) তাহার সাহায্যে উদ্ধার পাওয়া গেল।

ম্যাগাজিনে অধ্যাপক এবং ছাত্র উভয়ের লেখা প্রকাশিত হইত। প্রথম বৎসর যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক সুকুমার দত্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ, মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গুপ্ত এবং ছাত্রদের মধ্যে রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, অবনীনাথ রায়, কৃষ্ণধন দে, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং বর্ত্তমান লেখক অন্যতম।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধন রামেন্দ্রসুন্দরের শৈশব হইতেই মূলমন্ত্র ছিল। ১২৯১, পৌষ সংখ্যা নবজীবনে তাঁহার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। দুরূহ ও জটিল বিষয় সহজবোধ্য করায় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অদ্বিতীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন "দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক, রামেন্দ্রসুন্দর যাহা লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত—'মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলি মোটেই অত্যুক্তি নহে - রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাগুলির প্রকাশের তারিখ এরূপ ১) প্রকৃতি (১৮৯৬) ২) পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা (১৯০০) ৩) জিজ্ঞাসা (১৯০৪), ৪) বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা (১৯০৬) ৫ মায়াপুরী (১৯১১) ৬), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৯১১) ৭) কর্মকথা (১৯১৩), ৮) চরিতকথা (১৯১৩), ৯) বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪), ১০) শব্দকথা (১৯১৭), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১১) বিচিত্র জগৎ (১৯২০) ১২) যজ্ঞ কথা (১৯২০) ১৩) নানা কথা (১৯২৪), ১৪) জগৎ-কথা (১৯২৬)

ইহা ব্যতীত পাঠ্য পুস্তক Aids to Natural Philosophy (১৮৯১), পদার্থ বিদ্যা (১৮৯৩) ভূগোল (১৮৯৮) বিজ্ঞান পাঠ, (১৯০২) এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহযোগে বিজ্ঞান কথা লিখিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং বহু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তৎলিখিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বহু পত্রপত্রিকায় আজও ছড়াইয়া আছে। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি হইবে বলাবাহুল্য। কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদ পাঁচ খণ্ডে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিয়াছে।

কলেজ ব্যতীত তাঁহার আর একটী কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ইহা ১৮৯৩, ২৩শে জুলাই বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে শোভাবাজার মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে তাঁহার সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়। ইহার কার্য্যাবলী হইত ইংরেজীতে এজন্য উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাখা হয় (১৮৯৪, ২৯শে এপ্রিল) এবং এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য্য বঙ্গভাষায় হইতে থাকে। পরিষৎ নবরূপ গ্রহণ করার একটু পরেই রামেন্দ্রসুন্দর ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন এবং পরবর্তী ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৭ই বৈশাখ ১৩০০ পরিষদের নূতন কার্যারম্ভ) তাহাকে অন্যতর সম্পাদক রূপে দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের অমূল্য সময় সাহিত্য সেবা ও সাহিত্য পরিষদের গঠনে দিয়া গিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইহার অন্যতম সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, আয়-ব্যয় পরীক্ষক, কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, সহকারী সভাপতি এবং সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর ছয় দিন পূর্বে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, মৃত্যু শয্যায় শুইয়া তিনি এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন (মৃত্যু ৬ই জুন ১৯১৯)। মৃত্যুযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বড় আক্ষেপে বলিয়াছিলেন "আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটা প্রিয় জিনিষ ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। ১৩১২ সালে পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে বলেন "জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।" বঙ্গভঙ্গের পর (বঙ্গভঙ্গ ৩০শে আশ্বিন ১৩১২) জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করিবার জন্য ১৩১৪, ১৭-১৮ কার্ত্তিক, রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের ঐকান্তিক-চেষ্টায় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে পরে 'জাতীয় চিত্রশালা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়। ইহাতে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে ভাষণ দেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সমর্থনে যাহা বলেন তাহা আজও প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা টাউন হলে কবির দীর্ঘ জীবন কামনায় যে বিরাট উদ্যোগ করে এবং কবিকে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয় সেই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎ পক্ষে স্বরচিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। পরে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে কবি বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার দেশবাসীর অভিনন্দন মুখরক্ষ করিয়াছিল এবং ইহার কৃতিত্ব বহুলাংশে সাহিত্য পরিষৎ তথা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাপ্য। পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে এক আয়োজন করে (৫ই ভাদ্র ১৩২১) এবং ইহাতে সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দরের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন "তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী, অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন হইতে পাদ্রী এণ্ড্রুজের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া নিজ হস্তে লিখিত অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। (কবির সুন্দর হস্তে লিখিত এই অভিনন্দন পত্রখানি পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে)

অভিনন্দনে কবি বলিয়াছেন—"সর্ব্বজন প্রিয় তুমি মাধুর্য্য-ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

"সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমা দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্ব নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুগণের হৃদয়াসনে আহ্বান করি। ৫ই ভাদ্র, ১৩২১।"

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশপ্রেম অতুলনীয়। অধ্যাপক জীবনে শুরুতে চোগা চাপকান কিছুদিন পরিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পোষাক ছিল ধুতি সার্ট-চাদর। চিঠিপত্র নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সর্ব্বদাই মাতৃভাষায়। এমন কী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাও তিনি মাতৃভাষায় দিয়াছিলেন—এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বক্তৃতা সম্পর্কীয় অনুরোধ তাহাকে দুইবার প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। স্বদেশী দ্রব্য ছাড়া তিনি ব্যবহার করিতেন না এবং সকলকে কেবল মাত্র স্বদেশী ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন বা উপদেশ দিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ব্যতীত তাহাকে কখনও কলেজে আসিতে দেখি নাই। তিনি যখন সুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইতেন তখন মনে হইত তাঁহার দৃষ্টি যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিতেছে। এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জীবনে খুব অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। এরূপ কোমল হৃদয়ের স্পর্শও খুব অল্পই পাইয়াছি। তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা ধন্য হইয়াছে। তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকা "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" পাঠ করিলে রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরের পরিচয় মেলে। এই বিরাটপুরুষ কলেজ-নিজগৃহ-সাহিত্য পরিষৎ লইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। নেতাদের মধ্যে তাহাকে বড় দেখা যায় নাই। তিনি ছিলেন দেশসেবক এবং সাহিত্যসাধক, আজীবন উহাতে ব্যাপৃত ছিলেন—নীরব ছিল তাঁহার কর্ম্ম ও সাধনা। তাঁহার সকল সাধনার উৎস ছিল অনাবিল স্বদেশপ্রেম।

পারিবারিক জীবনে নানা শোক পাইয়াছেন কিন্তু নীরবে তাহা সহ্য করিয়াছেন। তরুণ বয়স হইতে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্য চিরদিন মস্তিষ্কের রোগে ভুগিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে মাতৃ বিয়োগের আঘাতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মাতৃ শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া কলিকাতায় যখন ফিরিলেন তখন আর তাঁহার চলিবার শক্তি ছিল না, তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাহার শেষ শয্যা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে রামেন্দ্রসুন্দরের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া কবির লাট সাহেবের নিকট লিখিত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। রামেন্দ্রসুন্দর শয্যা হইতে উঠিয়া কবির পদধূলি লইতেও অক্ষম, কবির পদধূলি প্রার্থনা করিলেন। মৃত্যুযাত্রী পরমহৃদের এই শেষ অনুরোধ কবিকে রক্ষা করিতে হইল। কবি দুর্ব্বল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এই তাঁহার শেষ নিদ্রা। ৬ই জুন ১৯১৯ (২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) রাত্রি ১০ ঘটিকায় মহাপ্রাণ, পরম সাধক, আদর্শ মানুষ স্বদেশপ্রাণ খাঁটী বাঙ্গালী রামেন্দ্রসুন্দরের পরমাত্মা সাধনোচিত অমর লোকে মহাপ্রয়াণ করিল।

দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেশের প্রতি ভালবাসা হারাইয়াছি। দেশ লাভ করিয়া দেশভক্তি হারানো যে কি দুর্ভাগ্য আজ বুঝিবার ও উহার প্রতিকার করিবার সময় আসিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর খণ্ডিত বাঙ্গালার জন্য ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিরোধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিকারও সম্ভব হইয়াছিল। আজ স্বাধীন ভারত খণ্ডিত। দেশ গৃহের এবং বাহিরের শত্রুতে পরিবেষ্টিত।

এই দুর্দিনে রামেন্দ্রসুন্দর তোমাকে স্মরণ করি। তোমার জন্ম শতবার্ষিকীতে তোমার জীবনের সাধনা জাতীয় তরুণ হৃদয়ে নবজীবনের প্রেরণা আনুক।

আদর্শমানব রামেন্দ্রসুন্দর

কালীচরণ ঘোষ

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দায়িত্বশীল পদ অধিকার করিয়া থাকেন, সাধারণের কাজে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, সমাজের গভীর ক্লেদ দূর করিবার কাজে লিপ্ত থাকেন, বিদ্যার খ্যাতি ও নানাগুণের অধিকারী বলিয়া যশোলাভ করিবার ফলে যোগ্য ও অযোগ্য লোকে সমালোচনারূপ তীক্ষ্ণ শরাঘাতের উপর যাহাদের স্থাপন করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ মিথ্যা অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করা দুরূহ। অর্থলিপ্সা, স্বার্থপরতা, পক্ষপাত, কর্তব্যে ত্রুটি, দাম্ভিকতা, কটুভাষণ, চারিত্রিক দোষ প্রভৃতি কুৎসা পরোক্ষ গুঞ্জন হইতে প্রত্যক্ষ ঘটনার আকার ধারণ করে। যাঁহারা বিরাট পুরুষ, মহৎকর্ম যাঁহাদের জীবনের ব্রত, যাহাদের দ্বারা সমাজের, রাষ্ট্রের বিবিধ গুরু কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাঁহারা এ সকল পরিবাদে লক্ষ্যচ্যুত হন না। দুর্নামের সকলই হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে মহাকবির ভাষায় বলিতে হয় "অনন্ত রত্নঃ প্রভবস্য যস্য" তাঁহার একদোষে সকল গুণ নাশ পায় না।

ইহার আরও এক দিক আছে। নিতান্ত বিরল হইলেও এমন মানুষ কালে ভদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন যাঁহারা দুর্নাম কুৎসারও উপরে; যাঁহারা নিঃশত্রু, যাঁহারা জীবনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা-বাক্য-কর্ম-সমন্বয়ে অলীক কুৎসার জিহ্বাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবিকল্প স্যার গুরুদাস প্রভৃতি কয়েকটি নামের সহিত দেবপ্রতিম রামেন্দ্রসুন্দরের নাম যোগ করতে পারি।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দর আমরণ ক্রমেই ভরা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পৌঁছিয়াছিলেন; কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয় স্পর্শ করে নাই। ছাত্রজীবন ক্রমাভিসারে জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ১৮৮১ সালে তিনি জানকীনাথ ভট্টাচার্যের সহিত একত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে যুগের এক কাহিনী প্রচলিত আছে। জানকীনাথ ইহাতে ক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া বলিয়াছিলেন "এফ. এ. তে আর রামজানকীর এক ব্র্যাকেট রাখবো না।" এই পরীক্ষায় ১৮৮৩ সালে জানকীকে শ্রেষ্ঠ স্থান ছাড়িয়া দিয়া রাম দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তাহার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন পথ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় আর এ "গজ-কচ্ছপ" এর লড়াই দেখিবার সুযোগ পায় নাই। ছাত্র হিসাবে তিনি অতুল গৌরবের অধিকারী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র এফ.আর-এস. সম্মানে বিভূষিত হইলে দেশবাসী তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করে, সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার অধ্যাপনা জগতে তিনি যে প্রথম দলের ছাত্র পাইয়াছিলেন তাঁহাদের যিনি পুরোভাগে, তাঁহার মত ছাত্র তিনি আর জীবনে পান নাই। তিনিই হইলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। জগদীশচন্দ্র আরও বলিয়াছিলেন, তিনি শিষ্যগৌরবে তুলনাবিহীন। দ্বিতীয় বৎসরের ছাত্রের মধ্যে ছিলেন পরম জ্ঞানী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপনা জগৎ রামেন্দ্রসুন্দরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে কত বিচিত্র মনস্বিতা, দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার, কোমল-কঠোর ব্যবহার, ছাত্র-গুরু, সহকর্মী অধ্যাপক,

অভিভাবক-অধ্যক্ষ রূপের পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সংগ্রহ করিতে পারিলে শিক্ষা জগতে তাহা এক অপূর্ব গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে পারে। পাঠশালা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহারা অন্ধকারে পথ চলিবার সহায়ক রশ্মি দেখিতে পাইবেন।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ সালে তদানীন্তন রিপন কলেজে কর্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসুস্থ হইলে তিনি অস্থায়ী এবং ১৯০৪ সালে স্থায়ী অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন প্রায় ১৬ বৎসর একাদিক্রমে রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তাঁহার শিক্ষকজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; কেহ ঈর্ষায় তাঁহার শত্রুতা করেন নাই। জানকীনাথের সহিত ছাত্রাবস্থায় যে প্রতিপক্ষতা ছিল রিপন কলেজে তাহা ছিল না। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মীরূপে অধ্যাপনা করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর তিনি অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সে সময় রিপন কলেজ ছিল বিশ্রুত পণ্ডিতদিগের কর্মকেন্দ্র। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, গদাধর মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মী। এ সকলে যেন এক পরিবার ভুক্ত। তিনি ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিতশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি জ্ঞানের আকর, তাঁহার নিকট নানাভাবে আলোচনা বিতর্কের মধ্যে সকলে নানা রত্নের সন্ধান পাইতেন। অধ্যাপকমণ্ডলীর সহিত যে অসীম প্রেম ও পরস্পর প্রীতি রিপন কলেজে দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা তদানীন্তন কালেও বিরল।

ছাত্রদের কল্যাণ সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তিনি শিক্ষক আবিষ্কার করিতেন। একখানি পুস্তক, The Approaches to Truth, ডাকযোগে তাঁহার হস্তগত হয়। লেখক, শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি সন্ধান করিলেন এই অমূল্য রত্ন "The dark unfathomed caves of ocean bear" অর্থাৎ মাণিকতলার বাগানে এক তাপস ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষা দান করেন এবং বৃক্ষোপরি এক "কুলায়" নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। স্বপাক ভোজন, আশ্রমবাসীর জীবন। ধন জন হীন; আত্ম সেবার উপর নির্ভর। রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট হইতে লোক গিয়াছিলেন; তাঁহার আমন্ত্রণ প্রমথনাথ প্রত্যাখ্যান করিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়া পাঠাইলেন যদি তিনি না আসেন, তাহা হইলে রামেন্দ্রসুন্দরকে স্বয়ং যাইতে হইবে।

প্রমথনাথ এ আহ্বান আর উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দর্শনের অধ্যাপক নিয়োগের কথা হইলে প্রমথনাথ বিপদ গণিলেন। স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান তিনি শিষ্যমহলে দান করেন। তাহাদের দেয় স্বল্প কয়েকটি মুদ্রায়—তিনি পরমানন্দে কালযাপন করেন। কাহারও হুকুম তামিল করিতে হয় না। সরকারী বাঁধা নিয়মে যে প্রতিষ্ঠান চলে, তাহার সহিত প্রমথনাথের চিন্তা ও কর্ম্মধারার সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধের সম্ভাবনা। তাহার উপর গুরুতর চিন্তা 'অতগুলি টাকা লইয়া কি করিবেন।' তাঁহার অভাব প্রয়োজন ত অতি অল্প।

রামেন্দ্রসুন্দর সকল ভার লইলেন; পরিহাস করিয়া বলিলেন যে উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি গ্রহণ করিয়া প্রমথনাথকে উৎকট চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিবেন। প্রমথনাথ দর্শন, গণিত, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। পোষাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, শিক্ষাদানের রীতি পদ্ধতিতে তিনি অধ্যক্ষের একেবারে প্রতিরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দর্শনের metaphysics লইয়া তিনি বি. এ. ক্লাশের শিক্ষা সুরু করেন। Introduction to Vedanta Philosophy, ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, তন্ত্র সম্বন্ধে পত্র পত্রাদি, জগদ্গুরুম্

(৬ খণ্ড) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। গার্হস্থ্য-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বর্ত্তমানে স্বামী শ্রীপ্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী নামে গড়িয়াতে এক আশ্রমে বাস করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও পাঠন প্রণালী লইয়া মতভেদ হওয়ায় তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আজ যাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তিনিই তাঁহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

একই ভাবে ভাবিত হওয়ায় অধ্যক্ষের সহিত প্রমথনাথের যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা দুর্লভ। অপরাপর অধ্যাপকদের সহিতও রামেন্দ্রসুন্দরের ভ্রাতৃভাব, সখ্যভাব ও গুরুভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে আনন্দচন্দ্র সিংহ, সুকুমার দত্ত, অশ্বিনীকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র স্থানীয়। তিনি গল্পচ্ছলে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দানে ইঁহাদের শিক্ষকের জীবন সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ও বিপিনবিহারী গুপ্তর সঙ্গে তাঁহার যে আলাপ আলোচনা হইত, তাহার অতি সামান্য কিছু বিপিনবিহারীর লেখার মারফত পরিচয় পাওয়া যায়। সে আলোচনার ভাব রিপন কলেজের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া বাঙলা দেশের আকাশ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িত। জানকী নাথের সহিত যখন হাস্য পরিহাস জমিয়া উঠিত, তখন যে জ্ঞান মিশ্রিত হাস্যধারা প্রবাহিত হইত, তাহাতে অধ্যাপক মণ্ডলী আপ্লুত হইয়া আনন্দে ভরপুর হইতেন। ক্ষেত্রমোহন, রবীন্দ্রনারায়ণ ও হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের সহিত রামেন্দ্রসুন্দর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করিতেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও এখানে দিবার সুযোগ নাই। কিন্তু—একটা বিষয় না বলিয়া পারি না। রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। তিনি ইংরেজি ও দর্শনের এম-এ। মনে হয় ইতিহাসেও তাঁহার একটা বড় স্থান ছিল। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষার আবির্ভাবে তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ পরিচালিত কলেজে নামমাত্র পারিশ্রমিকে যোগদান করেন। এ বিষয়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দের যথোপযুক্ত অনুচর। পরে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রিপন কলেজে আসেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মন জাতীয়তাভাবে পরিপূর্ণ; তিনি এ সম্বন্ধে (চরিত কথা) লিখিয়াছেন :

"মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে, স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম। ...আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বাদেশিকতার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।"

সহজেই অনুমেয় রবীন্দ্রনারায়ণকে পাইয়া, প্রমথনাথের সঙ্গে, রামেন্দ্রসুন্দর কি আনন্দে মজিয়াছিলেন। এই দেশপ্রেমের লক্ষণ রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট নানাভাবেই পাওয়া যায়।

কলেজ সম্পর্কে রামায়ণ-মহাভারত রচনা করিলে রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে বলা শেষ হয় না। তিনি নিজেকে অধ্যক্ষ বলিয়া কখনও জাহির করিতেন না। সকলের সাথে একঘরে বসিয়া তিনি অধ্যক্ষের গুরুভার অকাতরে বহন করিয়াছেন। তাঁহার স্বতন্ত্র কামরা বা চেম্বার ছিল না। আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কামরার মধ্যে কাঠ ও কাচের পার্টিসন দেওয়া একখানা ক্ষুদ্র কামরা। অফিসের সামান্য কাগজ্‌পত্র ছাড়া টেবিলের উপর তাঁহার প্রয়োজনীয় বই স্তূপাকার হইয়া থাকিত। কলেজ লাইব্রেরীতে কোনো ভাল বই ক্রীত হইলে তাঁহাকে জানাইবার নির্দেশ দেওয়া ছিল। বইখানি পাইলেই তিনি একবার "পাতা উল্টাইয়া" দেখিয়া লইতেন। কচিৎ সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেন। ঐ সকল পুস্তক তাঁহার

টেবিলের উপর থাকিত। অন্যান্য অধ্যাপক সম্বন্ধে যথাকালে বই ফেরত না-দেওয়া লইয়া লাইব্রেরীয়ান-এর যে মতামতই থাকুক, অধ্যক্ষ সম্বন্ধে কখনও এ অভিযোগ করিবার কারণ ঘটিত না।

অধ্যাপকমণ্ডলীর ঘরে বসিয়াই তিনি কলেজ পরিচালনার সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিতেন। ছাত্রদের অভিযোগ শুনিয়া বিচার করা ঐ ঘরে বসিয়াই চলিত। তাহাদের অসুবিধার কাহিনী সম্বলিত আবেদন পত্র রিপন কলেজের অফিসে জমা দিবার নিয়ম প্রায় লোপ পাইয়াছিল। অভিযোগপত্র সরাসরি তাঁহার হাতে দিলে তিনি তাহা দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কঠোর দণ্ডও লোককে ক্ষিপ্ত তিক্ত করিয়া তুলিত না; রায় দিবার ভঙ্গী এমনই সুন্দর ছিল। ছাত্রদের কোথায় ত্রুটী গলদ হইয়াছে, তিনি কেন শাস্তি দিতেছেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতেন। চরিত্রের নীচতা হীনতা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। শাস্তি এ ক্ষেত্রে কঠোরই হইয়াছে। কিন্তু "লাঠি না ভাঙ্গিয়াই সাপ মারা"র কৃতিত্ব তাঁহার ছিল।

কলেজের অধ্যক্ষের নামে রিপন কলেজে কেহ রহস্য ছলেও কোনো দুর্ব্বলতা অর্পণ করিতে পারে নাই, বা করে নাই। ১৯১৩-১৪ সালে কলেজের অধ্যাপকদিগের কয়েকজনের উপর কটাক্ষ করিয়া এক কবিতা রচিত হয়। তাহাতে কেহ "জাপানী ফানুষ" কেহ "হাস্যরসের ঝুড়ি," কেহ বা "চলেন যেন কলের মেকুর", কেহ বা "পদ্ম-লোচন", কাহারও "হুঙ্কার ধ্বনি", কাহারও 'দাঁত-খিঁচুনি" প্রভৃতি মুদ্রাদোষের উল্লেখ করা হয়। ইতিহাসের এক অধ্যাপক সম্বন্ধে "নয়ন-বাণ হানা" বলায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কবিতার প্রথম অংশ এইরূপ—

আহা কি সুন্দর নাম রিপন কলেজ ধাম
হ্যারিসন রোডে অবস্থিত,
যেন দুইখানি রথ আগুলিয়া আছে পথ
মার্টিনের কীর্ত্তি বিঘোষিত।
সুরেন মালিক তার কাণা তার চৌকিদার
রামেন্দ্র সারথি বিচক্ষণ,
হারাণ সহায় তার রথ টানে অনিবার
রাজেন দেবেন দুই জন।
প্রায় ষোল শত ছেলে আধাআধি পেটে পিলে
স্কলারশিপ হোল্ডারও আছে;
কেহ তেতলায় যায় এদিক ওদিক চায়
পাছা-পেড়ে শাড়ী কোথা আছে।

মালিক সুরেন্দ্রনাথ; সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অমৃত লাল ঘোষ (এক চক্ষুহীন), রামেন্দ্রসুন্দর সারথি প্রিন্সিপাল; হারাণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ভাইস-প্রিন্সিপাল; রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে আর্টস্ ও ল' বিভাগের দপ্তর রক্ষক।

প্রফেসর "অ" পদ্যপাঠ করিয়া ছাত্রের অসৌজন্যে ক্রুদ্ধ হন এবং অধ্যক্ষের নিকট সেই ছাত্রের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবার কথা বলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কবিতা পড়িলেন; মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষে বলিলেন, "দেখ! একে কি বলা যায়? না লিখলে ভাল হত, কিন্তু এত সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ। তোমরা খালি বুঝতে চেষ্টা কর, এর power of observation কতখানি!" "অ" নাছোড়বান্দা। ও-রকম দুর্বিনীত ছাত্রকে সাজা না দিলে কলেজে প্রফেসারদের ইজ্জত থাকিবে না; ছাত্ররাও সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে। ইত্যাদি।

ছাত্রকে ডাকা হইলে সে সসঙ্কোচে অধ্যক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে প্রফেসরমণ্ডলী, বাহিরে ছাত্ররা ভিড় করিয়াছে। ত্রিবেদী মহাশয় ছাত্রটীর নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন:

'এ কবিতা তুমি লিখেছ?

"হ্যাঁ, সার।"

তিনি উৎসাহভরে বলিয়া ফেলিলেন, "এই ত চাই; সত্য কথা বলবার সাহস তোমার আছে, আমি খুশী হয়েছি।"

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল আর যাহাই হউক, তাহার পাঠ্যাবস্থা শেষ হইবার বিলম্ব আছে, হয় ত জরিমানার উপর দিয়া এ যাত্রা কাটিয়া যাইবে।

"তোমার শিক্ষাগুরুদের সম্পর্কে তুমি এ রকম হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে লিখেছ; কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

"না, সার।"

"অন্যায় স্বীকার করছো?"

"হ্যাঁ, সার।"

"আর এমন করবে?"

"না, সার।"

"যাও। কবিতা লেখা ছেড়ো না; ভাল ভাল কবিতা লিখ্‌বে, যাতে সকলে আনন্দ পায়। এমন একটি কবিতা লিখ্‌লে যাতে গুরুজনের বিরক্তি হ'তে পারে। যদি কাছে কবিতার নকল থাকে ছিঁড়ে ফেলবে। আর সবাইকে বলে দেবে এ কবিতা যেন তারা না আওড়ায়।"

ছাত্রটি ঘর হইতে সবে মাত্র বাহির হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "দুদিনে সব ভুলে যেত, এটা হ'ল কি,—দেয়ালে দেয়ালে লিখে বেড়াবে; মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। ওহে—একে উপেক্ষা করলে ঢের বেশী ফল হ'ত।"

এই ছিল তাঁহার শাসনপদ্ধতি। কখনও রাষ্টিকেট কাহাকেও করেন নাই, হয় ত কয়েক টাকা জরিমানা হইয়াছে, তাহাও দুস্থ ছাত্রদের জন্য ব্যয় হইয়াছে।

শেষ দিকটা তিনি নিজে বড় একটা ক্লাশ লইতেন না। ১৯১২-১৩ সালেও প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পদার্থ বিদ্যার ছাত্রের প্রথম দিন তিনি ক্লাশে আসিতেন। কেবল তাঁহার কলেজের অন্য বিভাগের এবং বিজ্ঞান পাঠেরও নয়, অন্য কলেজের ছাত্ররা আসিয়া ঘর ভরিয়া ফেলিত। তখনকার দিনে আগ্রহশীল ছাত্ররা মেট্রোপলিটান, বঙ্গবাসী আর রিপন কলেজের নাম-করা শিক্ষকদের ক্লাশে গিয়া জমিত। রিপনের জানকীনাথ, বঙ্গবাসীর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেট্রোপলিটনের কুঞ্জবিহারী নাগ মহাশয়ের সেক্সপিয়র পড়ানো শুনিবার জন্য ছাত্ররা ছুটিয়া বেড়াইত। কেহ কোনো আপত্তি করিতেন না, বরং আনন্দলাভ করিতেন। ত্রিবেদী মহাশয় ক্লাশে ফিসিক্স থিয়েটারের সব গ্যালারী ভর্ত্তি এবং দেয়ালের গায়ে ছাত্রদের ভিড় দেখিয়া বলিলেন, "বাপ সকল, সবাই তোমরা আমার কলেজের ছাত্র নও। দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু গোলমাল ক'রো না, তা হ'লে আমার কথা কিছুই শুনতে পাবে না।"

ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য, বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে কৃতবিদ্য হইয়া ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে যথেষ্ট আবেগের সহিত বলিলেন। পরে, সহজ সরস সকলের বোধগম্য করিয়া পদার্থ বিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব, বিষয় বস্তু কি, কোথায় সাধারণ ছাত্রের পক্ষে দুরূহ মনে হইতে পারে বাঙ্গলায় তাহা বুঝাইয়া বলিতেন। সে বলিবার ভঙ্গীর তুলনা নাই। কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার ফলে তাঁহার ছাত্রদের মনে পদার্থ বিদ্যার প্রতি ভয় দূর হইয়া প্রীতি সঞ্জাত হইত। সে যে কি অপরূপ শিক্ষা প্রণালী তাহা যাহারা না শুনিয়াছেন তাহাদের লিখিয়া বুঝাইতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস।

ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ বিদ্যার্জ্জন স্পৃহা উদ্বুদ্ধ করা ব্যতিরেকে তিনি দেশপ্রীতি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকিবার নির্দ্দেশ দিতেন। তিনি University Commission কে যে-মতামত দেন, তাঁহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, দেশে পশ্চিমী শিক্ষায় বহু উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য বড় খেসারত দিতে হইয়াছে—"at what cost, a cost as regards culture, a cost as regards respects for self and

reverence for others, a cost as regards nobility and dignity in life." তিনি এই ক্ষতি সম্পর্কে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। কালের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার ছাত্রদিগকে নিজ আদর্শ, শিক্ষা, উপদেশ, উৎসাহদানে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে রিপন কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া দক্ষিণে আসিতেছে। হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে ফুট্‌পাথের ঠিক কোণে ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, তিনি পূর্ব্ব হইতে হ্যারিসন রোড ধরিয়া পশ্চিম মুখে আসিয়া উত্তরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে মোড় ফিরিতেছেন; কেহ কাহাকেও দেখিতে পান নাই। একেবারে সাম্‌না সাম্‌নি। ছাত্রটি নীচু হইয়া পাদস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইতেই ত্রিবেদী মহাশয় ছাত্রের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার কলেজের ছেলে, না?" ছাত্র যখন তাঁহার অনুমান সমর্থন করিল, তখন মুখে সেই শান্ত স্নিগ্ধ শঙ্কালেশহীন দেবদুর্লভ হাসি হস্তে কোমল রোমাঞ্চকর স্পর্শ; বলিলেন, "তা না হলে, এ শিক্ষা হবে কোথা থেকে!" তিনি কলেজকে এত ভালবাসিতেন, ছাত্রদের এইভাবে কলেজের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেকে সচেষ্ট থাকিতেন।

নিজে ছিলেন গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার অবতার। মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে চরণ দ্বারা তাঁহার শিরস্পর্শে বাধ্য করিয়াছিলেন, সে কাহিনী আজ classic পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এ উদাহরণ তাঁহার ক্ষেত্রে বিরল নহে। সেনেট হলের পিছনের ছোট প্রকোষ্ঠে তাঁহার "যজ্ঞকথা" পাঠ শেষ হইয়াছে। সেদিন সার গুরুদাস সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধের শেষ দিকে রামেন্দ্র যজ্ঞ ও ভারতমাতার যে কবিত্বময় চিত্র দান করেন, তাহাতে লোকে মোহিত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাগজ পত্র সুবিন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে ভক্তরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এ দিকে গুরুদাস বাহিরে আসিয়া অধুনা অবলুপ্ত সেনেটের সেই বিশাল সোপান শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন; রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বাহির হইয়া সার গুরুদাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক বা দুই ধাপ নীচে। শ্রদ্ধায় শির অবনত, জোড় হস্ত তাহার মধ্যে কাগজ পত্র রহিয়াছে। গুরুদাস বলিলেন, "রামিন্দির! আজ যদি আমি না আসতুম, আমার জীবনটা বৃথা মনে হত।"

রামেন্দ্র দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে সার গুরুদাসের পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'আপনি আসবেন না, তা কি হতে পারে? আমার যজ্ঞ তাহলে পূর্ণ করতেন কে?"

গুরুদাস রামেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। খুব্রাকৃতি মানুষটী, আর রামেন্দ্র যখন অনুরূপ-ভাবে গুরুদাসকে জড়াইয়া ধরিলেন তখন, গুরুদাস বিরাট পুরুষ রামেন্দ্রসুন্দরের বক্ষের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গেলেন। দুই জনেরই দেবমূর্ত্তি, ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিকৃতি। পরিধানে দুইজনেরই শ্বেত শুভ্রধুতি। লংক্লথের কফ্ যুক্ত সার্ট এবং গলদেশের দুইধারে প্রলম্বিত শ্বেত উড়ানি। কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া গেল। দর্শকরা, কয়েক শত, নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই "মহিমায় মহিমায় পরস্পরে মেশামিশি অপূর্ব্ব মিলন" দর্শন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। স্বর্গ ইহা অপেক্ষা গরীয়ান কি না জানা নাই, তবে মর্ত্ত্য যে সে দিন স্বর্গকে নিষ্প্রভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর একবার চরণস্পর্শ করিয়া রামেন্দ্র ঋজু হইয়া দাঁড়াইলেন। যাহারা সার গুরুদাসকে চেনেন না, এবং সাধারণ লোকে তাঁহাকে অল্পই দেখিবার অবসর পাইয়াছে, তাঁহারা মহা প্রশ্ন লইয়া ফিরিল, এত বড় একটা লোক, যিনি যজ্ঞ কথা লিখিয়াছেন, তিনি আবার অপর একজনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ঐ খুব্রাকৃতি লোকটি তাহা

হইলে কত বড়! আর যিনি প্রণাম করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার অবতার। "যোগ্যং যোগ্যেন"।

তাঁহার রচনা দেশাত্মবোধে ভরপুর। তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে কচিৎ অংশ গ্রহণ করিতেন। একবার ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন এ্যানি বেশান্ট কারাগারে বন্দী। একদল তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট করিতে প্রস্তুত, অপরপক্ষ বাধাদানে উদ্যত। অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে; বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় তাঁহার সভাপতি। ১৯১৭ সাল আগষ্ট ৩০ তারিখে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে সভা হট্টগোলের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যায়। তখন প্রকাশ্য দুই দল রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এক পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নীলরতন সরকার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যানন্দ বসু প্রভৃতি; আর দ্বিতীয় পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, ফজলুল হক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এচ ডিঃ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অখিলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। সারা বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া বিতর্ক উঠিল কোন্ পক্ষের দোষে সভা পণ্ড হইয়াছে। যথারীতি দৈনিক পত্রিকা বেঙ্গলী ও অমৃত বাজার পত্রিকা দুই দলের মুখপত্র হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল।

দ্বিতীয় পক্ষ ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে থিওজফিক্যাল সোসাইটী হলে নূতন অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিল। সেই সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অপরাপর নেতাদের সহিত, উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নূতন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের নিজের কথায় তিনি "ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেসওয়ালা" কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি "উৎকট" কংগ্রেসের দলে ঘরের বাহিরেও রাজনীতি করিয়াছেন। সভাভঙ্গ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর পাশাপাশি সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন, তখন পথে দণ্ডায়মান সমবেত জনসমুদ্র উদ্বেল হইয়া করতালি ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা ও অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিল। রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ্য সভায় রাজনীতির দলে যোগদান করিবার পরিচয় আর বিশেষ শোনা যায় না।

শান্ত ধীর জীবন যাপন করিয়া কিভাবে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাহা সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়, তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠন ও তাহার নিজ ভবন নির্ম্মাণে পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মে প্রীতি, সাহিত্যে অনুরক্তি এবং দার্শনিকের অনাসক্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া লোকচক্ষে তিনি আদর্শ মানবের প্রতিরূপ দান করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অধিক বিতর্কের মধ্যে যান নাই। তিনি মাত্র বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির যে সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বিধানকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি।"

কর্ম্মময় জীবন তাঁহার, বৈরাগ্য তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কর্ম্মের মধ্যে তিনি বৈরাগ্যের সন্ধান করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত অতি প্রাঞ্জল। তাঁহার উপদেশবাণী কর্ম্মীর চিত্তকে আলোড়িত করিবে; বৈরাগীর মনকে সমাজ সেবায় ফিরাইয়া আনিবে। মনুষ্য সমাজকে তিনি পরম ভাগবত জ্ঞানে সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কথায় বলিতে হয়, "কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি শান্তি লাভ করিতে পার, কিন্তু মানবজাতি তোমায় ক্ষমা করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করিয়া তুমি আপনাকে লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিতে পার, কিন্তু মনুষ্য সমাজ তোমাকে স্তুতি করিতে বাধ্য থাকিবে না।"

মোক্ষাভিলাষীদের সম্বন্ধে তাঁহার মত তাঁহার রচনা পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অতি স্পষ্ট। "মুক্তি কামনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু মুক্তির পথ তত সরল নহে। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবনহীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত

করিয়া, দুঃখ হইতে একরকমের মুক্তিলাভ না ঘটিতে পারে এমন নহে, কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ নহে। সংশয়ের শোণিত কর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষণে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মানুষের গৌরব এবং এই জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয়, তাহাতেই চরম দুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্য সাধনই তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে। তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, সেই দুঃখ স্বীকারই জীবনে উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে। দুঃখভোগ শক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়া লইবে, এবং আপনার প্রতি, পুত্র কলত্রের প্রতি, স্বজন বান্ধবের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, বিশ্বের প্রতি—কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই এমন এক পরম প্রীতি, এমন এমন অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করিবে, জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।"

"ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য" বলিয়া তাঁহার সন্দেহাতীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্মানুবৃত্তি দ্বারা যদি তিনি শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে স্থান করিয়া থাকেন, তিনি প্রেমদ্বারা আপামর সাধারণের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। পিতা উপেন্দ্রসুন্দরকে তাঁহার গ্রন্থ উৎসর্গ করিতে গিয়া বলিলেন, 'উষর সংসার মরুতে জ্ঞানের অপেক্ষা প্রেমের প্রবাহের প্রয়োজন অধিক, আতপদগ্ধ নরনারী স্নেহবারির জন্য লালায়িত'। সুতরাং তিনি তাহা হইতে তাঁহার দেশবাসীকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তিনি বুঝিয়াছেন:

"অন্তরবাসী অন্তরবাসী অন্তরে বন্দি একা,
দাও প্রেম, আরো প্রেম, আরো আরো প্রেম, আরও প্রেমে
মিলিবে দেখা।"

তিনি ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করিতেছেন সে প্রেমের উৎস শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। "হতভাগ্য বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র পল্লীর নিভৃতদেশে যে স্নেহের উৎস ও করুণার প্রস্রবণ পরিজন-বর্গের ও প্রতিবেশীবর্গের শুষ্ক কণ্ঠে অমৃতধারা ঢালিয়া দিত, তাহা অকালে রুদ্ধ হইয়াছে।" তাই তিনি প্রেমময় হইয়া আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র, বন্ধু, দেশবাসী সকলের নিকট প্রেমের প্রীতির প্রতীক হইয়া দেখা দিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরকে অপর এক মহৎ ব্যক্তি ভাল রূপে চিনিয়াছিলেন। পরিহাস ছলে লিখিত হইলেও ঘরোয়া রামেন্দ্র-সুন্দর অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ৮ই জুন ১৯০৬ সালে বন্ধু দেবকুমার রায় চৌধুরীকে কাঁদি হইতে দ্বিজেন্দ্র-লালের পত্র হইতে তাহা বোঝা যায়:

"এখানে এখন থাকার মধ্যে আছেন স্থবিরপ্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। সে দিন অনুগ্রহ করিয়া আবার এখানে আসিয়াছিলেন। বহুদিন বাদে একজন নামজাদা বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ (?) গম্ভীর মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময় মৃদু হাস্য অর্থাৎ "দশন কৌমুদীর" স্ফুরণ হইতে লাগিল। সুতরাং আমারও "সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল।" তর্ক হইল না। অহো—দগ্ধ—অদৃষ্ট····· বড় ধীর ও শান্ত মানুষটা, দেখতে কতকটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্ব্বোধের মত হইলেও বিদ্যার জাহাজ। কিন্তু তর্ক যখন করেন না, তখন বুঝিলাম—বে-রসিক, এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব খাওয়াইলেন, অতএব বুঝিলাম উদারমনা মহাজন।"

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা বহুমুখী, কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল, সে সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার স্থান এখানে নাই। আমরা বলিতে পারি তিনি দর্শনের রাম, বিজ্ঞানের ইন্দ্র, সাহিত্য সাধনা ও জীবন বেদে সুন্দর, অতি সুন্দর, অতুলনীয় সুন্দর। পারিবারিক, সামাজিক জীবন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। পবিত্রতায় তিনি শিশির, আনন্দে শোভাময়, শিক্ষাক্ষেত্রে মঙ্গল আলয়; জ্ঞান ভিক্ষুর নিকট, অক্ষয় প্রস্রবণ; চরিত্র গৌরবে সুন্দর উজ্জ্বল। সাংসারিক মানুষের পক্ষে যে ত্রি-বেদ, সচ্চিন্তা, সৎকর্ম্ম, সদালাপ তাহা তাঁহার নিত্য সহচর। তাই তিনি 'ত্রিবেদী'। কর্ত্তব্যে অটল, আচার, আচরণ, আস্তিক্যবুদ্ধি, আপামর সাধারণ সকলের প্রতি আনন্দময় ব্যবহার তাঁহার বৈশিষ্ট্য। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি,

"নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

শিক্ষাপ্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

বাংলার দুই বরপুত্র বিদ্যাসাগর আর রামেন্দ্রসুন্দর। এঁদের জীবন একটি গূঢ় ইঙ্গিতবাহী। দু'জনই শিক্ষানায়ক। অথচ উভয়ের শিক্ষালাভের পন্থায় পার্থক্য বর্তমান। প্রথম জনের প্রথানুস্যত ইংরেজী বিদ্যার অভাব, কিন্তু আপন চেষ্টায় সে বিদ্যার প্রাণসম্পদে সমৃদ্ধ। ফলে তিনি সংকীর্ণ সংস্কারশূন্য এবং বৈজ্ঞানিক চেতনায় দীপ্ত। দ্বিতীয়জন প্রথানুসারী ইংরেজী এবং বিজ্ঞানবিদ্যায় পারঙ্গম অথচ ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট। বিদ্যাসাগর প্রথমাবধি সংস্কৃতবিদ্যায় সুপণ্ডিত, আবার স্বপ্রচেষ্টায় পরবর্তী জীবনে পাশ্চাত্য বিদ্যা আহরণে নিরত। রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্যায় সুসিদ্ধ, কিন্তু আপন সাধনায় ভারতীয়তার অন্তরে তীর্থযাত্রী। দুয়ের মিলনে পরিপূর্ণ ভারতীয় জ্ঞানসাধকের একটি মূর্তি প্রস্ফুটিত। এ থেকে সহজেই অনুমেয় – শুধু পাশ্চাত্যশিক্ষার আশীর্বাদেই আমাদের আধুনিকতা প্রসূত এ ধারণা অযৌক্তিক। ভারতীয় শিক্ষার প্রেরণাতেই আধুনিকতার সম্ভাবনা নিহিত। প্রয়োজন শুধু একটু বহিরালোড়ন। সে আলোড়ন পাশ্চাত্য আলোকের আঘাত। ভারতীয় প্রজ্ঞায় সুস্থিত বিদ্যাসাগর এবং রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই অতি আধুনিক মনোভাবে আবিষ্ট। কাজেই শুধু বিদেশী শিক্ষাকে আমাদের ঘর-বিমুখতার এবং দেশীয় শিক্ষাকে বাহির-বিমুখতার হেতু হিসেবে স্থাপন অসঙ্গত। এ দু'য়েরই জন্যে দায়ী শিক্ষাপদ্ধতি, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার সারগ্রহণে অক্ষমতা। এ অক্ষমতা বিদ্যাসাগর এবং রামেন্দ্রসুন্দরে অনুপস্থিত। ফলে এঁরা পরিপূর্ণ ভারতীয়, হয়তো পরিপূর্ণ 'বিশ্ববাসী'ও। সেই পরিপূর্ণতার প্রতীক রামেন্দ্রসুন্দরই আমাদের এ আলোচনার প্রসঙ্গ। আরো সোজা কথায় সেই পরিপূর্ণতার পথ-সন্ধানই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। সে পথ আলোকস্নাত শিক্ষার পথ। রামেন্দ্রসুন্দর সেই পথের পথিক। অতএব এ পথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি, তাই-ই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। এ প্রবন্ধ সেই অনুসন্ধানেরই কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

রিপন কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষা-দান-পদ্ধতির কথা তাঁরই প্রত্যক্ষ একজন ছাত্রের জবানীতে পরিস্ফুট :

"তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর যে একটু বিশেষত্ব ছিল, তাহার কথাই সর্বাগ্রে উত্থাপন করিতে চাই। রসায়নবিদ্যার হাতে খড়ি এই সময়েই আমাদিগকে করিতে হয়। নূতন বিদ্যার উপর বক্তৃতা দিয়া, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা সহজসাধ্য নয় বিবেচনা করিয়া, তরলমতি যুবকদিগের মনে রসায়ন-প্রীতি জাগাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীকে আমরা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সে পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা প্রদর্শন (Pratical Experiments)। বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে নূতন পদার্থ উৎপাদন করিয়া তিনি আমাদিগের মনকে 'নূতনে'র দিকে আকৃষ্ট করিতেন। নূতনের মোহে আমরা নূতন জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শন-জনিত আনন্দ আমাদের কৌতূহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র

করিত। আর সকলেই স্বীকার করিবেন, এই কৌতূহল-সৃষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কৌতূহল না জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না।

"……তাঁহার অধ্যাপনার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, বরাবরই তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদান সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রচলিত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া—গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসান না দিয়া, তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিতেন। আমরাও বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতাম।" (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৭-৫৮)

প্রদত্ত উদ্ধৃতি রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাচিন্তার দুটি দিকের ইঙ্গিতবহ। এক, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কৌতূহলের উদ্বোধন : দুই, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে মর্যাদাদান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের নিবিড় সম্পর্কের কথা সুবিদিত। রামেন্দ্রের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিপ্রদত্ত সম্ভাষণের একাংশ বহুবিদিত—"সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

"পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

হাস্যময় রামেন্দ্রসুন্দরের হৃৎপদ্মের প্রস্ফুটিত মাধুর্যের মূলে জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের ত্রিবেণীধারা বিদ্যমান। আর সেই ধারা দেশপ্রেম এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগে গতিশীল। পূর্ণাঙ্গ মানবচরিত্র বিকাশের প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণেই তিনি সমৃদ্ধ। তাঁর মধ্যে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের সমন্বয়। মাতৃভূমির গৌরব এবং ভাষাজননীর সুষমা তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত। আর দেশবিদেশের চিত্তলোকের সুধায় তাঁর অন্তর অভিষাত। রবীন্দ্রনাথের মিতভাষণে একথাই ব্যক্ত। এই তো রামেন্দ্রসুন্দর। সর্বাঙ্গসুন্দর ত্রিবেণী-তাপস। এই তাপসের চিন্তাক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রের অনির্বাণ জ্যোতি প্রসারিত। সেই জ্যোতির্লোকে তাঁর শিক্ষাজীবন এবং শিক্ষাভাবনা নির্বাণহীন আলোকে উদ্ভাসিত।

রামেন্দ্রের শিক্ষাভাবনা তাঁর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ নিবদ্ধ। এ সম্বন্ধে তাঁর রচনা অঙ্গুলি-গণনীয়। মোট কথা, রামেন্দ্রের নিজস্ব জীবনই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মৌল ভাষ্য। স্বল্প সংখ্যক নিবন্ধে সে চিন্তা সংহত আকারে গ্রথিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত রামেন্দ্র-রচনাবলীতে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক নিম্নোক্ত রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট—

১. ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম (রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩ ২৫), ২. শিক্ষাপ্রণালী (ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৮৭) ; ৩. আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ—এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল, কি মন্দ (ঐ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-১৪৬) ; ৪. স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় (ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫১-১৫৯) ; ৫. লোকশিক্ষা (ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৭-২১৪) ; ৬. যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী (ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২৩৪)।

এই স্বল্প সংখ্যক রচনাতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি উভয় বিষয়ই আলোচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থে সাধারণভাবে শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিশেষভাবে ভারতবাসীর শিক্ষার অভীষ্ট অনুসন্ধান। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাপদ্ধতি অর্থে শিক্ষাস্তর, শিক্ষাসূচী, শিক্ষাদানপ্রণালী, শিক্ষার মাধ্যম এবং পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির বিবেচনা।

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য—১. শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য

সম্বন্ধে তাঁর অভিমত রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতের অনুরূপ। তাঁর 'শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধ থেকে একটু উদ্ধৃতি :

"শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি ; এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে, তাহাও আমাদের কল্পনায় আসেনা।··· কেবল বিজ্ঞান বা কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলিবেনা। যেরূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।··· শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাহার বিধানের নামই শিক্ষা।" (রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮২)

মনুষ্যত্ব কি? মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের সমষ্টিই তো মনুষ্যত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত দেবতার অধিষ্ঠান।' এই ঘুমন্ত দেবতা মানে তার অন্তহীন সম্ভাবনা, তার অনন্ত শক্তি। সেই অনন্ত শক্তি সম্পর্কে মানুষ অনেক সময়ই অচেতন। সেই আত্মবিস্মৃতি থেকে আত্মসচেতনায় প্রত্যাবর্তনেই তো মনুষ্যত্ব সার্থক। আর সেই সার্থকতা বিধানের উপায়ই তো শিক্ষা। রামেন্দ্রের কথা আবার স্মরণযোগ্য :

"বস্তুতঃ আমার চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান ও শক্তি, উভয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া লইতে পারি, এবং সেই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ জ্ঞানের মধ্যে নিজের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান একটু বিশেষ আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে শক্তি নিগূঢ়ভাবে সঞ্চিত আছে, তাহা আমরা অনেক সময় জানিতে পারি না ; এই জ্ঞানটাকে ফুটাইয়া তোলা শিক্ষার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য।" (লোকশিক্ষা, রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৮-৯)

তুলনীয়—

(ক) "এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে ; কোন সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব ; নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব।" ('শিক্ষার মিলন'—রবীন্দ্রনাথ)

(খ) "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।··· আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।" ('জাতীয় বিদ্যালয়'—রবীন্দ্রনাথ)

(গ) "মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহার প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা। সুতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলিকে সরাইয়া দেওয়া।" (বিবেকানন্দ)

(গ) "যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয়না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।" (বিবেকানন্দ)

রামেন্দ্র-কথিত শিক্ষার আদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ কথিত আদর্শ মূলতঃ অভিন্ন। অভিন্ন এইজন্যে যে, শিক্ষার অন্যতর আদর্শ থাকা অসম্ভব। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় শিক্ষানায়কের চিন্তায়ও কোন না কোন উপায়ে এই আদর্শের কথাই প্রতিফলিত। শিক্ষার উপকরণ, প্রণালীতে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু উদ্দেশ্যের অভিন্নতা অপরিহার্য। এ

উদ্দেশ্যের বিকার মানে শিক্ষার আদর্শ-বিকৃতি। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন।

রামেন্দ্রসুন্দর মনুষ্যত্বের সম্ভাবনায় আস্থাশীল। তিনি মানুষের অনিঃশেষ শক্তিতে প্রত্যয়নিষ্ঠ। সেই শক্তির উদ্বোধনই তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষকজীবনের ব্রত। তাঁর দৌহিত্র লালগোলারাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' স্মৃতিকথায় এ ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর অন্তহীন প্রয়াসের বহু দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত।

শিক্ষাদর্শের আরেকটি দিক সম্বন্ধে তাঁর মতামত এ প্রবন্ধের প্রথমে প্রদত্ত রামেন্দ্র-শিষ্য প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় সুব্যক্ত। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর অন্তরের কৌতূহলকে গতিদান। এ লক্ষ্য অবশ্য পূর্বকথিত আদর্শেরই পরিপূরক। মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য তার জিজ্ঞাসার সদা চঞ্চলতা প্রয়োজন। উপনিষদের অনুসারে—শিক্ষালাভের জন্যে পরিপ্রশ্ন (curiosity) একান্ত আবশ্যক। পরিপ্রশ্নেরই আরেক নাম জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার তীব্রতা মানসিক উন্নতির একটি বড় লক্ষণ। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ জড়পদার্থের তুল্য। মানুষ যেহেতু মন্ময়, সেই হেতু মননশীলতা মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান। তাই রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের মননশীলতার উদ্বোধনে নিয়ত যত্নশীল। তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি এ মন্তব্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

"তুমি (শিক্ষাদাতা) তাহার (শিক্ষার্থীর) আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্মশিক্ষা।" (শিক্ষাপ্রণালী, রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৫)

আনন্দ, আগ্রহ, উৎসাহই রামেন্দ্রসুন্দরের মতে শিক্ষার মৌল প্রেরণা। সেই প্রেরণার ফলশ্রুতি মনুষ্যত্বের বিকাশ।

২. শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার্থীর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থাবিধানের কথাও চিন্তনীয়। এ ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দরের মত খুবই স্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় অনাড়ম্বর জীবন-বদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের বড় স্থান। সে জীবন জ্ঞানবিভায় এবং চরিত্রের দীপ্তিতে ভাস্বর। রামেন্দ্র নিজেই সে মহাজীবনের উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্য দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর। এ প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধি তাঁর নিজ সাধনা-সম্ভব :

"ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানবসম্প্রদায় অতি প্রাচীন-কাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটীর ও শাকান্ন লইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতীয় ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোষে অর্থ ছিল না, তাহার হস্তে তরবারি ছিল না ; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়াছিল ; এবং এই গরীয়ান স্বার্থসংহারের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়া পূজা করিত।" (ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম, রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩)

এই অনাড়ম্বর জীবনচর্যা ভারতীয় বিদ্যার গূঢ়তম দাবী। আর ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের কিছু পরিচয়লাভের ব্যবস্থাও ভারতবাসী ছাত্রের জন্যে অত্যাবশ্যক।

অনেকের কাছ থেকেই হয়ত একাধিক প্রশ্নবাণবর্ষণ এস্থানে সম্ভাব্য এবং প্রত্যাশিত। বর্তমানযুগের পক্ষে উপরি-উক্ত জ্ঞানার্জনস্পৃহা কতখানি বাস্তব? জীবিকাসংগ্রহ এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নের প্রশ্ন কি শিক্ষা প্রসঙ্গে একেবারেই অবান্তর? বর্তমানকালের গতিশীল জীবনসংগ্রামে এই 'নিরালম্ব' জ্ঞানার্জনপ্রয়াস কি বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক?

এ প্রশ্নমালার উত্তর রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনাদীপ্ত জীবন ; বিদ্যাসাগরের সংগ্রামোজ্জ্বল জীবন। চরিত্রের দৃঢ়তা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধিতে সমন্বিত মানবমহিমার নিকট জীবিকার সমস্যা তুচ্ছ। জীবিকার পথ তাঁদের কাছে স্বতোৎসারিত। অবশ্য

স্বল্পপরিশ্রমে লব্ধ বিদ্যায় প্রভূত উপার্জনকামীদের কথা স্বতন্ত্র। যথার্থ শিক্ষা,এবং যথার্থ শিক্ষিত লোকদের কথাই আমাদের এ আলোচনার বিষয়। আমাদের কাম্য তথা রামেন্দ্রসুন্দর-নির্দিষ্ট বিদ্যার সঙ্গে বিলাসের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। বিদ্যার সঙ্গে বিলাসের বিপরীত সম্পর্ক। কারণ বিদ্যার্জনের জন্যে কিঞ্চিৎ দুঃখবরণ, কিঞ্চিৎ স্বার্থসংহরণ অতি প্রয়োজন। নতুবা বড়লোকের আদুরে দুলাল মাত্রেরই যে মহাপাণ্ডিত্যের অধিকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ আলালের ঘরের দুলাল যদিও বা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সরস্বতীর আসন তাঁদের থেকে অনেক অনেক দূর। পরিণামে ধনের গর্ব আর লালসার গগনস্পর্শী মূর্তি শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে শঙ্কার কারণ। তার লেলিহ জিহ্বা সভ্যতার রক্তপানে উন্মুখ। ফলে অনেক তথাকথিত 'উচ্চশিক্ষিতে'র সঙ্গে আদিম বর্বরের পার্থক্য সামান্যই।

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর আর বিদ্যাসাগর? কি তাঁদের উপকরণ? তাঁদের আহার-বিহারে, চালচলনে ঐশ্বর্য কোথায়? সে ঐশ্বর্য কি ধনে, না চরিত্রে? সে ঐশ্বর্য কি উপকরণে, না ত্যাগে? জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জ্ঞানতাপস এঁরা। কিন্তু এঁরা কি বেকারত্বের জ্বালায় জর্জর প্রাণহীন শিক্ষার কঙ্কালবাহী ভার মাত্র? জীবিকা নিজ গরজে এঁদের পদতলে আসীন। জীবিকার পশ্চাদ্ধাবন এঁদের পক্ষে সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এঁদের তপস্যা দুঃখনির্ভর। কিন্তু তা কি দারিদ্র্যদ্যোতক? চরিত্রমাহাত্ম্য আপাতঃ আকাশ কুসুম কল্পনা, কিন্তু পরিণাম-চরিতার্থ, চিরজীব। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-বাণীর আলোকসম্পাত খুবই প্রাসঙ্গিক:

"শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো: অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে প্রয়োজন জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি।" ('আশ্রমের শিক্ষা'—রবীন্দ্রনাথ)

(খ) শিক্ষা পদ্ধতি

(১) শিক্ষাস্তর এবং পাঠ্যবিষয়—শিক্ষণীয় বিষয় অর্থাৎ পাঠ্যতালিকা শিক্ষাপদ্ধতির প্রাথমিক বিষয়। আধুনিককালে আমাদের ছাত্রদের পাঠ্যসূচীর সমস্যা এক বড় সমস্যা। 'স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়' (রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫৯) প্রবন্ধে প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে রামেন্দ্রের অভিপ্রেত পাঠপর্যায় প্রণিধানযোগ্য। কল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপর্যায় নিম্নরূপ:

নিম্ন ও মধ্যশিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা। প্রথম স্তরের বিদ্যার্থীদের বয়ঃক্রম পাঁচ থেকে ষোল; দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছাত্রের প্রবেশ এবং তার সমাপ্তি ডিগ্রী বা বি. এ পরীক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায়। স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং গবেষণা তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত। জীবিকা-সংস্থানের জন্যে চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষা।

শিক্ষাস্তরের সঙ্গেই শিক্ষাসূচী অর্থাৎ পাঠ্যতালিকার প্রশ্ন জড়িত। প্রতিস্তরের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে রামেন্দ্রের বিস্তৃত কোন নির্দেশ অনুপস্থিত। প্রথম স্তরের পাঠ্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই—"বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শ স্কুলের পাঠ্য নির্দেশ করিবেন ও শিক্ষক নিয়োগাদি দ্বারা স্কুলে আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।" নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্যে একটি আদর্শ স্কুল তাঁর প্রস্তাবের অঙ্গীভূত। একথা সহজবোধ্য যে, পাঠ্যতালিকার অতি চাপ তাঁর অনভিপ্রেত, কারণ বিদ্যার্থীদের স্বাধীনচিন্তা ও কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটানো তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য।

উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে স্বদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার স্থান নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত। কেননা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ—

"বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি ইঁহাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।"

ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে তার নির্দেশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট—

জমিসংক্রান্ত ও মহাজনী কাজের জন্যে আইন এবং জরিপ-পরিমিতির জ্ঞান; আইনশিক্ষার জন্যে Jurisprudence এবং Law of the land জানা আবশ্যক; হিসাবরক্ষা, টাইপ রাইটিং এবং শর্ট হ্যাণ্ড ইত্যাদি; চিকিৎসাবিদ্যা; উচ্চস্তরে ব্যবহারিক বিজ্ঞান (mechanics, physics, chemistry, political economy, geography) প্রভৃতির ভিত্তির উপর শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা।

এ ছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে অল্পব্যয়সাধ্য ব্যায়ামশিক্ষাও তাঁর প্রস্তাবের অন্তর্গত। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত—"আনুষ্ঠানিক ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা উচিত। ছাত্রদিগকে আপন ধর্মচর্চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।"

নীতিশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত মূল্যবান—"পুঁথিদ্বারা নীতিশিক্ষা হয় না। গুরুশিষ্যের মধ্যে দেশের পুরাতন সম্বন্ধস্থাপন আবশ্যক। উহাই প্রশস্ত পথ। ছাত্রদিগকে কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষকের অনুচরত্বে বা ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। পুঁথিতে স্বদেশের ও বিদেশের মহাপুরুষদের উন্নত চরিত্রের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।" প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শিষ্যের উপর গুরুর গোসম্পদপালন এবং সমিধ্ আহরণের দায়িত্বভার অর্পণের গূঢ়ার্থ কি? শিষ্যের কষ্টসহিষ্ণুতা, আজ্ঞাবহতা এবং শ্রদ্ধাপরায়ণতাবিধানের জন্যই ঐ দায়িত্ব ভার তাঁকে অর্পণ। নীতিশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই তো এই বিনয়, শ্রদ্ধা এবং কার্যকুশলতার মাধ্যমে শিষ্যের চরিত্রগঠন। আর সে চরিত্রগঠন প্রত্যক্ষভাবে আচার্যের সংসর্গ ব্যতীত অসম্ভব।

তাছাড়া, "বিদ্যারম্ভ হইতেই অল্পে অল্পে ছাত্রদিগকে সাধ্যমত স্বজাতিসেবায় নিযুক্ত করা আবশ্যক। সেবাকর্ম দ্বারা স্বদেশীভাবে জাগ্রত করিতে হইবে।"

২. শিক্ষাদানপ্রণালী—শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাদানপ্রণালী এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিক্ষকের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে বিবেচনার বিষয়। শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা শিক্ষার্থীর আন্তর শক্তির উদ্বোধন এবং তার জিজ্ঞাসার সজীবতা বিধান। এই উদ্দেশ্যসাধনে শিক্ষকই প্রধান সহায়। তিনি বন্ধু, তিনি পথপ্রদর্শক, স্নেহশীল মন্ত্রণাদাতা। এই সহানুভূতি এবং স্নেহের উপর ছাত্রের মনোবিকাশ অনেকখানি নির্ভরশীল। আর এই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের সঙ্গে শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ তথা নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্নও অনেকাংশে জড়িত। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে—"আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ও অনুরাগের সম্বন্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য কেবল পণ্য বিনিময়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়; এবং সেই পণ্য বিনিময়ের ফল আর যাহাই হোক না কেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের পুষ্টিলাভের কোন আশা থাকেনা।...শিক্ষার্থীর অন্তকরণে যে সকল শক্তির অঙ্কুর হইতেছে, সেই সকল শক্তিকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত না করিয়া স্বাধীনভাবে খেলিতে দাও, এবং যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে থাকিবে ততক্ষণ একটু দূরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যদি তাহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে দেখ, তখনই সময় নষ্ট না করিয়া সাবধান করিয়া দাও; মুখের কথায় ফল না হইলে তীব্রতর শাসনের ব্যবস্থা কর। কিন্তু যখন বেত্রদণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান হইবে, তখনও যেন তোমার মূর্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে না পারে। এ কথাই মনে রাখিবে যে, জননীর পীযূষপূর্ণ স্তন্যধারাতেই তোমার জড়দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, কারাগৃহের নিয়মের মধ্যে তোমাকে বাস করিতে দিলে তোমার গুরুত্ব প্রাপ্তির অবকাশ ঘটিত না।" (শিক্ষাপ্রণালী, রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১ এবং ৮৪)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গুরুশিষ্যের এই অনুরাগের উপর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের ধারণায়, এই সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আজকের যুগে ছাত্র-শৃঙ্খলার সমাধান অনেকখানি সম্ভব। আজকের দিনে 'অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য কেবল পণ্য বিনিময়ের ন্যায়।' এই নিষ্প্রাণ ব্যবস্থাই তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলার জন্যে বহুলাংশে দায়ী। রিপণ কলেজে তাই অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর সর্বদা ছাত্রদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ সন্ধানে নিরত।

৩. শিক্ষার মাধ্যম—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' মাতৃস্তন্য যেমন দেহের পুষ্টিদায়ক, মাতৃভাষা তেমনি মনের পুষ্টিবিধায়ক। এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যেহেতু মনের বিকাশ, সেইহেতু শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার স্থান সর্বাগ্রে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে অবহেলার মনোভাব স্বাধীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক। ইংরেজী বা অন্যতর বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। শিক্ষার সর্ববিধস্তরে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থার দাবী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন রকম অবাস্তব উন্নাসিকতার প্রভাবে এ দাবীর প্রতি ঔদাসীন্য-প্রদর্শন আত্মঘাতী। দেশগৌরব বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন মাতৃভাষার এ মর্যাদা ঘোষণায় ব্রতী, তখন তাঁর বিরুদ্ধবাদী এবং বিদ্রূপকারীদের অট্টহাস্যে এমনকি দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন মুখর। এ এক হাস্যকর এবং যন্ত্রণাদায়ক পরগাছাবৃত্তি, অবাস্তব বিশ্বপ্রেমের রঙ্ মাতাল নেশা। যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থের অভাবের ভয়ে কম্পমান তাঁদের কাছে কবিগুরুর এই শ্লেষপূর্ণ উক্তি নিবেদনযোগ্য :

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।" ('শিক্ষার বাহন')

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিও স্মরণযোগ্য—"যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারেনা।" ('বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ)

রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাদানপ্রণালীতে তাই মাতৃভাষার প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা। রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলাভাষায় অধ্যাপনার একমাত্র উদ্দেশ্য তরুণ বিদ্যার্থীর হৃদয়কোরকের পূর্ণ বিকাশ। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির একটি কথা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাশে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী, চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধপাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এজন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই।" (আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, পৃঃ ১৪-১৫)

মাতৃভাষার প্রতি রামেন্দ্রের অনুরাগের সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব সব বিষয়ে বঙ্গভাষায় তাঁর রচনা অসংখ্য। সরলতা এবং কৌতুকের সহায়ে গম্ভীর বিষয়বস্তু

তাঁর রচনাতে জলবৎ তরলং। এরপরও কি বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাবের অজুহাত যুক্তিসহ?

বাঙালীর চিত্ত এবং ভাষার ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষায় সংকীর্ণতার পরিবর্তে উদার মানবপ্রেমের জয়যাত্রা। বিশ্বের সমস্ত মানুষের উন্নতির রাজপথ তো প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষা। বিদেশীভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে নিন্দনীয় অপরাধ। কারণ নিজস্ব ভাষায় আলোকদীপ্ত মানুষ স্বতঃপ্রকাশ. বিদেশীভাষা-চর্চা তখন সেই প্রকাশের পরিপূরক। মানুষের এ অধিকারহরণ মনুষ্যত্বের প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা।

রামেন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষার শক্তিগ্রহণের পক্ষপাতী, তার দাসত্ব-বরণে তিনি অনুৎসাহী। তাঁর শিক্ষাচিন্তা দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল। আর এ জন্যেই বঙ্গবাণীর কনকপদ্মে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠ।

৪. পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি—আধুনিক শিক্ষায় পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি একটি জটিল সমস্যা। প্রাচীনভারতীয় তপোবনাশ্রমে শিক্ষাশেষে গুরুর অনুমতিক্রমে শিক্ষার্থীর সংসারজীবনে প্রবেশের জন্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা সুবিদিত। সংসার-জীবনে প্রবেশের যোগ্যতা শুধু বিদ্যা এবং দায়িত্ব পালন-ক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত। আর বিদ্যা অর্থে পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে আত্মীকৃতবিদ্যা, জীবনের সঙ্গে সমন্বিত বিদ্যা। গুরুগৃহবাসের দীর্ঘ তপস্যাময় দিনগুলিতে এই যোগ্যতা অর্জনের সাধনায় তৎপর শিষ্যই গুরুস্নেহধন্য, পরীক্ষোত্তীর্ণ শিষ্য।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় এই পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর চিন্তারই অভাব। পরীক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রের যোগ্যতানির্ধারণ অসম্ভব। এ পরীক্ষা যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম। দীর্ঘদিনের সাধনা এবং আচরণের পরিচয়লাভের পরিবর্তে দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টায় শিক্ষার্থীর চাতুর্যের পরীক্ষা। এ এক হাস্যকর মাননির্ণয় প্রণালী। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

"উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেননা, কেবল পরীক্ষা করেন; এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন যে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই; যে মুখস্থ করে, সে-ই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের হাতে;····· [বিদ্য]ালয় শিক্ষা দেয়না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করে মাত্র।" (শিক্ষাপ্রণালী, রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮)

কাজেই আজকের দিনে পরীক্ষাপ্রণালী পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ একান্ত আবশ্যক। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে রামেন্দ্রের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ তাঁর রচনাবলীতে অনুপস্থিত। তবে একথা ঠিক, পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য চতুরতার পরিমাপ গ্রহণের পরিবর্তে যোগ্যতার বিচার। কারণ রামেন্দ্রের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাহার বিধানের নামই শিক্ষা" (ঐ, পৃঃ ৮২) বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতিতে এই সামর্থ্যের পরিচয়লাভ অসাধ্য। এ জন্যেই দেশের শিক্ষাবিদ্-গণের সম্মুখে আমাদের প্রশ্ন—পরীক্ষাগ্রহণের অন্যতর প্রণালী কি অচিন্তনীয়। শিক্ষাদানের অন্তিম উদ্দেশ্য কি তবে শিক্ষার্থীর চালাকির পরীক্ষাগ্রহণেই পর্যবসিত?

লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা

লোকশিক্ষাসম্পর্কে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনাবলীতে মুদ্রিত। (রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫-২১৪) আমাদের দেশের প্রায় সব শিক্ষানায়কের চিন্তাতেই লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষার (Mass Education) কথা বর্তমান। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর চিন্তায় বিশেষত জনশিক্ষার উল্লেখ সুপ্রচুর। এঁদের ধারণায়, বৃহত্তর জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি অসম্ভব। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে গণতন্ত্রের গূঢ়ার্থ অনুধাবন দুঃসাধ্য। তার জন্যেই চাই

জনশিক্ষা। লেখা, পড়া এবং সামান্য অংকের জ্ঞান প্রত্যেকের আবশ্যক, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞান। কারণ রামেন্দ্রের মতে, "যে লিখিতে পড়িতে ও খড়ি পাতিতে শিখিয়াছে, সে যেন একটা নূতন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে। বিধাতা যে কয়টা ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, ইহা তাহার উপর অতিরিক্ত লাভ। এই কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনুষ্যের বল কতটা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই কৃত্রিম ইন্দ্রিয়লাভে কাহাকেও বঞ্চিত রাখা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। প্রত্যেক বালক বালিকা যাহাতে এই নূতন সামর্থ্যলাভের সুযোগ পায়, তজ্জন্য সমাজের সমবেত চেষ্টার প্রয়োগ করা কর্তব্য। লোকশিক্ষা ন্যূনকল্পে এই ত্রিবিধ বিদ্যাতে—লেখাপড়া ও খড়ি পাতাতে আবদ্ধ হওয়া উচিত।" (ঐ, পৃঃ ২০৯)

তবে একথাও ঠিক, প্রাইমারী শিক্ষার শেষে নতুনত্বের মোহে জনসাধারণের স্বধর্মত্যাগের হানিকর প্রবণতার প্রতিও রামেন্দ্র সজাগ। তাঁর সাবধানবাণী অতিশয় মূল্যবান, "কিন্তু চাষার ছেলে, তাঁতীর ছেলে, মুদির ছেলে, যাহাদের জন্য মুখ্যতঃ এই লোকশিক্ষা, তাহাদের পরিণামটা একবার চিন্তনীয়। প্রাইমারী ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া অর্থাভাবে তাহারা ইংরেজী ইস্কুলে প্রবেশ করিতে পারে না; এদিকে চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরিতে, তাঁতীর ছেলে তাঁতে বসিতে ও মুদির ছেলে তুলদাঁড়ি হাতে লইতে লজ্জাবোধ করে। এগ্‌জামিন পাস করিয়া তাহারা ভদ্রলোকে পরিণত হইয়াছে; জুতা, জামা, ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া 'ইতর' কাজে হাত দিতে পারে না।" (ঐ, পৃঃ ২১৩) রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণায় এই প্রবণতার মূলে শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি। এই ত্রুটিই জনসাধারণের স্বধর্মে শ্রদ্ধাত্যাগের কারণ। সে কারণ দূরীকরণের জন্যেও তাই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী এবং রবীন্দ্রনাথের মত খুব স্পষ্ট। কোন জাতির উন্নতি স্ত্রীজাতির উন্নতি ভিন্ন অকল্পনীয়। তাই স্ত্রীশিক্ষার জন্যে তাঁদের রচনায় বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট। রামেন্দ্রের রচনায় এ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ অপ্রতুল, কিন্তু স্থানে স্থানে ইঙ্গিত বর্তমান। যেমন 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বালক-বালিকা উভয়েরই শিক্ষার কথা উল্লিখিত—"উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা দেশের বালক-বালিকাকে কিছুনা কিছু জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে।" (ঐ, পৃঃ ২১০)

ফলতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাচিন্তার প্রাণ তাঁর স্বদেশ-প্রেম। সর্ববিধ চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর সুন্দর প্রকাশ, শিক্ষাচিন্তার বেলাতেও তাই। বিশেষতঃ মানববিশ্বাস, স্বাধীন চিন্তা এবং বঙ্গভারতীর প্রতি অতলান্ত শ্রদ্ধায় তাঁর শিক্ষা-ভাবনা প্রাণবন্ত। আমরা পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই সশ্রদ্ধ ভাষণের সঙ্গে সমকণ্ঠ—

"কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্মে ও নিষ্কাম কর্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ কর—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক।" (আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, পৃঃ১৭)

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তিন বৎসর

ডঃ সুকুমার দত্ত

* * * * * * * * * * * *

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভার সমালোচনা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে, কারণ আমি তাঁহাকে শিক্ষাগুরু ভিন্ন অন্য চোখে কোনও দিন দেখি নাই। তিন বৎসর তাঁহার অধীনে রিপন কলেজে চাকুরী করিয়াছি, তাঁহার স্নেহ ও সান্নিধ্য পাইয়াছি। তিনি আমাকে কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন সেই ব্যক্তিগত কাহিনীই এই প্রবন্ধে বলিতে চাই। রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত আমার স্বকীয় সম্বন্ধ বিবৃত করিয়া উত্তম পুরুষের উল্লেখ অনিবার্য্য,—তাহাতে কেহ অহমিকা আরোপ করিলে লেখকের প্রতি সুবিচার হইবে না।

১৯১৫ সনে এম, এ পাশ করিয়া ইংরাজির একজন অধ্যাপকরূপে রিপন কলেজে ঢুকিয়াছিলাম। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আমি স্কটিস্ চার্চ্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম। সেখানকার অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা ছিল যে কলেজের অধ্যক্ষ মানে Chief Administrator, যিনি অন্য সকলকে কাজের আদেশ দিবেন, অধ্যাপকেরা ঠিক সময়ে ও নিয়মিত বিধিতে কাজ করিতেছেন কি না দেখিবেন, শিক্ষকদের মধ্যে কি ছাত্র-শিক্ষকে বিবাদ-বিসম্বাদ হইলে তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন ও কলেজের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন। কিন্তু দু'চার দিন রিপন কলেজে কাজ করিয়াই দেখিলাম যে রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে এ ধারণা খাটে না। কলেজের আয়-ব্যয় দেখিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল না। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং রোজ দুই-তিন ঘণ্টা অফিস ঘরে বসিয়া ৺অমৃতলাল ঘোষের পরামর্শ লইয়া তাহা পরীক্ষা করিতেন। কিছুকাল ইংরাজী পড়াইতেনও। Malleson's Akbar, Cowper's Letters, Gray's Elegy, এই সব বই আই, এ ক্লাসে পড়াইতেন। অধ্যাপক স্বরূপে যে তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল তাহা নয়। তবে ছেলেরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া মন দিয়া শুনিত। কচিৎ কখনও অধ্যাপকদের বসিবার ঘরে আসিয়া কিছু সময় কাটাইতেন। কিন্তু একবার একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়াতে তিনি আর অনাহূতভাবে আসেন নাই।

রামেন্দ্রবাবু ঘণ্টা ধরিয়া কলেজে আসিতেন না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কিছু বিশ্রাম করিয়া কলেজের নিকটস্থ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে হাঁটিয়া আসিতেন। যাহাকে Administrative work বলে তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎকাল মাত্র কাটাইতেন। অধিকাংশ সময়টাই বিপিনবাবু, জানকীবাবু ও অন্যান্য বয়স্ক অধ্যাপকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন ও বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্লাসে গিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট অধ্যাপনার কার্য্যে মন দিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে

পাঠন যে বাংলায় হইতে পারে তখন তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে ছিল। কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর অধ্যাপনা হইত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়।

রামেন্দ্রবাবু যখন তাঁহার বসিবার ঘরে বয়স্ক অধ্যাপকদের লইয়া আলাপ-আলোচনায় বসিতেন, তখন আমিও মাঝে মাঝে এককোণায় আসন-গ্রহণ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতাম। একটু কুণ্ঠিতভাবে দুই একটি কথা আমিও বলিতাম। সৌভাগ্য-ক্রমে রামেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া নিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নূতন শিক্ষকরা কি রকম পড়াইতেছে তাহার খবর তিনি গোপনে নানাদিক্ হইতে লইতেন।

বোধহয় আমার সম্বন্ধে ভাল রিপোর্টই পাইয়াছিলেন। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাইতাম। কোনও ইংরাজির ক্লাসে শিক্ষক-ছাত্রে ঠিক বনিবনাও হইতেছে না জানিলেই আমাকে ডাকিয়া সেই ক্লাসে পড়াইবার ভার ন্যস্ত করিতেন। এক বৎসরের মধ্যেই আমাকে আই, এ ক্লাস পড়ানো ছাড়িতে হইল। বি, এ এবং অনার্স ক্লাসে অধ্যাপনার ভার পড়িল। সেই বৎসর শিক্ষকদের কাহার কত বেতন বৃদ্ধি হইবে এই প্রশ্ন লইয়া শিক্ষকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ওঠে এবং এই সিদ্ধান্ত হয় যে রামেন্দ্রবাবু যাহা উচিত বিবেচনা মনে করিবেন তাহা শিক্ষকেরা নির্বিবাদে মানিয়া লইবেন। রামেন্দ্রবাবু একটি বেতন বৃদ্ধির হার ঠিক করিলেন। ঊর্দ্ধতম বেতন বৃদ্ধি হইবে ২৫ (পঁচিশ টাকা)। এই হারে বেতন বৃদ্ধি দুইজনার হইল—অধ্যাপক স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও আমি। রবীন্দ্রনারায়ণবাবু পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি নিজেকে কখনও তাঁহার সমতুল্য মনে করি নাই।

কিছুদিন আলাপের পরেই রামেন্দ্রবাবু টের পাইলেন যে আমি ইংরাজিতে এম্, এ-পাশ করিলেও আমার অন্যান্য দিকে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আছে, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও কীর্ত্তির দিকে। ইহার বীজ আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত-ই অল্পবয়সে আমার মনে রোপন করিয়াছিলেন।

একদিন রামেন্দ্রবাবু হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তিনি আপন মনে কিছু একটা ভাবিতেছেন। কিছু পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন: 'দেখ, একটা কথা আমি কিছুদিন হয় ভাবিতেছি। আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক লইল কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন ভারত-বর্ষের প্রাচীন civilization প্রধানতঃ spiritual অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। কথাটা অনেকাংশে ঠিক। ইহার কারণ আমার মনে হয় যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা গৃহত্যাগী অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষী সন্ন্যাসীরাই নানা যুগে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতি হইতে আধুনিক দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকল যুগাবতারেরাই ছিলেন গৃহ-সংসার ত্যাগী। তাঁহারা এই ব্যবহারিক জগতের ঊর্দ্ধে যে জগৎ আছে সেই দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি করিয়া আমাদের সভ্যতা গঠন করিয়াছেন, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তুমি কি মনে কর? তাঁহাদের সংগঠন-মূলক কীর্ত্তির কোন প্রকার ইতিহাস রচনার চেষ্টা কি আরম্ভ হইতে পারে না?''

রামেন্দ্রবাবু কেন আমাকে এ-সব কথা বলিতেছেন ভাবিয়া একটু থতমত খাইলাম। বয়স আমার একুশ-বাইশ বৎসর,—কলেজে পড়িয়াছি ইংরাজি-সাহিত্য। আমি একটু কুণ্ঠার সহিত বলিলাম: "আমি ত এ বিষয়ে কিছু জানিনা। তবে ছোটবেলা জ্যেঠামহাশয়ের মুখে বৌদ্ধ-সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। পালি এখনও শিখি নাই। কিন্তু ভারত-বর্ষে বৌদ্ধসঙ্ঘ ও তাহার কীর্ত্তি সম্বন্ধে আমার নিজের জানিবার ইচ্ছা আছে।'' রামেন্দ্রবাবু একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন: "ইচ্ছা আছে? তবে ইচ্ছার সঙ্গে অন্য সব শিক্ষা আপনি

আসিয়া জুটিবে। তুমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে চাও? ভয় পাইও না। আমি তোমার মনের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি। তুমি যদি আরম্ভ কর, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

ইহার পর বৌদ্ধধর্ম ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে ভাল-মন্দ নূতন-পুরাণ পাঠ্য-অপাঠ্য যতগুলি বইএর খোঁজ পাইলাম, পালি ব্যাকরণ ইত্যাদি সমেত একখানা লম্বা তালিকা লাইব্রেরিয়ানকে দিয়া বলিলাম: "আমার এই বইগুলির দরকার। রামেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া এ-গুলির জন্য অর্ডার দিন।"

পরের দিন রামেন্দ্রবাবুর ঘরে আবার ডাক পড়িল। দেখি লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমার লিখিত তালিকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং বুঝাইতেছেন যে এই সকল অপ্রয়োজনীয় বই কিনিয়া টাকা খরচ করিলে প্রয়োজনীয় বই কিনিবার টাকায় কম পড়িবে। বিশেষতঃ আমি ইংরাজির অধ্যাপক। ইংরাজি পড়াইতে এ সব বইয়ের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। মোট দাম প্রায় পাঁচশো টাকার মত পড়িবে।

রামেন্দ্রবাবু তালিকাটি লইয়া কিছুক্ষণ পড়িলেন। পরে আমাকে মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি এ বইগুলি পড়িবে ত?" "সে জন্যই ত চাহিয়াছি।" "যদি একজন পাঠকও এই বইগুলি পড়ে, তবে পাঁচশত টাকা ব্যয় সার্থক" —লাইব্রেরিয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন: 'অর্ডার দাও ও সুকুমারবাবু আর যে যে বই চাহিবেন তাহাও আনিয়া দিবে।"

বৎসর খানেকের মধ্যেই পালিভাষা কিছু কিছু শিখিলাম। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুদের সম্বন্ধে পালিভাষায় যে 'বিনয় পিটক' আছে সেই গ্রন্থখানি পাইতে কিছু বেগ পাইতে হইল। কলিকাতায় নানাস্থানে ঘুরিয়া কপালীটোলার এক বৌদ্ধ বিহারে গ্রন্থখানি পাইলাম বটে, কিন্তু বর্মী অক্ষরে লেখা—পড়িতে পারিলাম না। গ্রন্থখানি ১৮৭৯-১৮৮৮ সনে বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত ওল্‌ডেনবুর্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতি দুর্লভ।

কিন্তু আমার ভাগ্য বোধহয় প্রসন্ন ছিল। একদিন কলিকাতার বাহিরে যাইব বলিয়া কিছু জিনিসপত্র কিনিতে পকেটে পঞ্চাশটি টাকা লইয়া বাহির হইয়াছি। রাধাবাজার দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ভগ্নপ্রায় দালানে দেখিলাম Old Book Shop (পুরানো বইয়ের দোকান) ও তাহার সঙ্গে ১৮৫৮ বৎসরাঙ্ক লেখা। সেটা সিপাহী বিদ্রোহের পরের বৎসর।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম একজন অতিবৃদ্ধ মুসলমানের দোকান, প্রতিষ্ঠাতা বৃদ্ধের পিতা। অভ্যন্তরে ঝুলান কেরোসিনের বাতির আলোকে একটি সেলফে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ ওল্‌ডেনবুর্গের 'বিনয় পিটক' হঠাৎ নজরে পড়িল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর শাসন কালে অনেক উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ কলিকাতায় চাকুরি লইয়া আসিতেন। হয়ত তাঁহাদের কেহ জার্মানি হইতে কিনিয়া বইখানি কলিকাতায় লইয়া আসেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বইগুলি ফেলিয়া কি জলের দরে বিক্রি করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। দাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিল যে প্রতিখণ্ড চার টাকা, কিন্তু আরও বলিল যে গতকাল এই দোকানে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছিলেন ও আগামী কাল আসিয়া বইখানা কিনিয়া নিবেন বলিয়া গিয়াছেন। আমি প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকায় কিনিবার লোভ দেখাইলেও তাহার মত করাইতে পারিলাম না। অবশেষে এই সর্ত হইল যে আগামী কাল যদি ঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যা সাড়ে আটটার মধ্যে উপস্থিত না হন, তবে প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা দামে আমি পাইতে পারিব।

গ্রন্থখানি আমার চাই-ই চাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য দশ টাকা চাহিলেও ফিরিব না, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আমার ভাগ্যপথে শনি তাহা ভাবিয়া উৎকণ্ঠায় রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না।

পরের দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সেই দোকানে উপস্থিত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সাতটা

বাজিল,—ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া আটটার উপর আসিল,—দুরু দুরু বুকে ঘড়ির কাঁটার অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছি। প্রবেশ দ্বারে কাহারও কোন পদশব্দ নাই। ঠিক সাড়ে আটটা বাজিতেই আমি লাফাইয়া উঠিলাম ও দোকানীকে আমার সহিত তাহার সর্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া পঁচিশ টাকা ফেলিয়া দিয়া গ্রন্থখানি আত্মসাৎ করিলাম।

ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতিয়া বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বিজয়ীর যে মনোভাব, অনেকটা সেই রকম মনোভাব লইয়া ফিরিলাম।—আরও আত্মশ্লাঘা হইল এই ভাবিয়া যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়া দিলাম।

তাহার পর দিবারাত্র ইংরাজি অনুবাদের সাহায্য লইয়া তন্ন-তন্ন করিয়া পালি 'বিনয় পিটক' পড়িলাম। কি লিখিব মনে মনে তাহার একটা খসড়া করিয়া রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলাম: "স্যার, এবার ভাল করিয়া 'বিনয়-পিটক' পড়িয়াছি। শীঘ্র আমার বইখানা লিখিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু কেমন লেখা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আপনার মতামত না পাইলে অগ্রসর হইতে পারিব না।" রামেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন: "আমার শরীর আজকাল খারাপ যাইতেছে। কলেজ হইতে কিছু কালের জন্য ছুটি লইয়াছি। তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়া কি লিখিতেছ যদি পড়িয়া শুনাইয়া যাও, তাহাতে আমি রাজি আছি। তবে আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। মোটামুটি আমার যা মনে হয় নিরপেক্ষ ভাবে বলিব। আমার পছন্দসই হয় নাই বলিলেও লেখা ছাড়িয়া দিও না।" শেষে সর্ত হইল এই যে প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি যতদূর লিখিয়াছি বৈকালে তাহা পড়িয়া শুনাইব।

টাইপ করিয়া যতদূর লেখা হইত তাঁহাকে শুনাইয়া আসিতাম। তিনি একটি তাকিয়ার মাথা দিয়া চোখ বুজিয়া খুব মনোযোগ দিতেন। দুই অধ্যায় শুনাইবার পর বলিলেন: "লেখা খুব ভালই হইয়াছে। তবে যিনি পালি ভাষায় পণ্ডিত তিনিই তোমার ভুল-চুক ধরিতে পারিবেন।" ক্রমে ক্রমে শেষ অধ্যায় শুনাইয়া শেষ করিলে বলিলেন: "তোমার লেখার বাঁধুনি চমৎকার। আমি খুবই প্রীত হইয়াছি। তবে —একটু 'তবে,' আছে। তা এই যে তুমি পালি হইতে যে সব fact (তথ্য) বাহির করিয়াছ, তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করার মত আমার বিদ্যা নাই। তবে সে পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার এই লেখাটি ছাপাইয়া বাহির করিও না।" উত্তরে বলিলাম: "আপনার উৎসাহে ও আদেশেই এই লেখা। আপনার উপদেশমতই কাজ করিব।"

রামেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন: "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি prize (পুরস্কার) আছে। তাহার নাম 'গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল প্রাইজ'। মৌলিক কোনও গবেষণার জন্য দেওয়া হয়। ইহার নিয়ম যে সন্দর্ভ-লেখকের নাম লেখার সঙ্গে থাকে না। তাহাতে কেবল একটি 'মটো' থাকিবে। এই 'মটোর' সহিত লেখকের নাম রেজিষ্ট্রারের কাছে আলাদা পাঠাইতে হয়। পরে সন্দর্ভগুলির পরীক্ষা শেষ হইলে, পুরস্কৃত সন্দর্ভ কাহার লেখা তাহা এই কাগজ হইতে জানা যায়। তুমি এই 'অনামী' প্রতিযোগিতায় যদি টিঁকিতে পার, তবেই প্রমাণ হইবে যে তোমার লেখা ঠিক হইয়াছে।"

নিয়মটির উদ্দেশ্য এই যে পরীক্ষক সন্দর্ভ লেখকের নাম যাহাতে পরীক্ষার সময় জানিতে না পারেন ও তাঁহার বিচার কোনও রূপ পক্ষপাতদুষ্ট না হয়।

আমি রামেন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিলাম। পরীক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির প্রধান অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া। এই পুরস্কার পাইবার পর বড়ুয়ার সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন: "সন্দর্ভটি পড়িয়াই আমার মনে একটু সন্দেহ হয় যে লেখা শুধু পালি-শিক্ষিত পণ্ডিতের সাধ্য নয়। দৃষ্টিভঙ্গী একটু নূতনতর। ইংরাজিরও style (লিখিবার বিশেষ ভঙ্গী) আছে যাহা

কেবল পালিপণ্ডিতের রপ্ত করা অসম্ভব। একদিন কথায় কথায় আমি এই thesisটির কথা প্রফুল্লবাবুকে (প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজি অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে) বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন: সুকুমারের লেখা নয় তো? একদিন রাস্তায় তাহাকে এক গাদা বইয়ের বোঝা লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি পথে থামাইয়া কি কি বই লইয়া যাইতেছে দেখিতে চাহিলাম। সুকুমার আমার ইংরাজি ক্লাসের ছাত্র ছিল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ঐগুলির একখানা বইও ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে নয়। প্রাচীন ভারত ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক। চুপি চুপি ও ইংরাজি সাহিত্যের রাজপথ ছাড়িয়া প্রত্নতত্ত্বের জঙ্গলে ঢুকিতেছে মনে হইল।"

সন্দর্ভটি পুরস্কৃত হইলে পুস্তকাকারে বিলাতে পাঠাইয়া দেই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডড ওয়েল সাহেব বিলাতে কেগেন পল কম্পানীদ্বারা পাণ্ডুলিপি-পরীক্ষক (Reader) নিযুক্ত হইয়া উহা প্রকাশযোগ্য বলিয়া রিপোর্ট দেন ও ১৯২৪ সনে বইখানা Early Buddhist Monachism নামে প্রকাশিত হয়। বৎসর পরেই বেণীমাধব বড়ুয়া বইটি পালি ও প্রাচীন ভারত বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের ছাত্রদের পঠিতব্য গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

শেষ পর্য্যন্ত যখন বইখানি প্রকাশিত হইল, যিনি আমাকে হাতে খড়ি দিয়া লেখাইয়াছিলেন, সেই পূণ্যপাদ গুরুদেব রামেন্দ্রসুন্দর আর ইহলোকে নাই। আমি তাঁহাকে বইখানি উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলাম: "যাঁহার জীবন ভারতীয় কৃষ্টির গবেষণায় উৎসর্গীকৃত ছিল, যিনি এই যৎকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি লিখিতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতে উৎসর্গ করিলাম—তাঁহার পরলোকগত মহীয়ান্ আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়া, সসম্ভ্রমে, সবিনয়ে, কৃতজ্ঞতার সহিত।"

এ কথা আমার প্রাণের কথা ছিল, লৌকিকতার বাক্য বিন্যাস নয়। অনেক বৎসর পরে ১৯৬০ সনে ইহার একটি ভারতীয় সংস্করণ (Indian Edition) ছাপা হয় বম্বের Asia Publishing House হইতে। বিলাতে ছাপানো প্রথম সংস্করণ দুই বৎসরেই শেষ হইয়া যায়। মাঝের বৎসরগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিলাতের অনেক ছাপাখানা বন্ধ ছিল।

বার্দ্ধক্যের পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে দেখিতে পাই ভাগ্যবিধাতা আমার জীবনধারা একটানা চালান নাই। নানা আবর্ত্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একদিক হইতে আরেক দিকে বহাইয়াছেন বারম্বার। রিপন কলেজে তিন বৎসরের বেশী টিঁকিলাম না।

একদিন সকালে রামেন্দ্রবাবুর ঘরে ডাক পড়িল। তিনি আমার পিঠে হাত দিয়া কলেজের একটি খালি ঘরে নিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কথোপকথন এইরূপ হইল:

"আজ সকাল বেলাই তোমার পদত্যাগ পত্রখানা আমার হাতে আসিয়াছে। পদত্যাগের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন আমাকে বলিবে?" "স্যার বরিশালে আমাদের একখান পৈত্রিক বাড়ী ও কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে। বাড়ীতে এখন কেউ নাই, বিষয়-সম্পত্তিতে কিছুই আদায় হইতেছে না। যদি এখন বরিশালে গিয়া না থাকি ও বিষয় সম্পত্তি না দেখি তবে অচিরাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য দেশে ফিরিয়া যাইতে চাই।" "ঐ কাজেত তোমার সমস্ত সময় কাটিবে না। আর কি করিতে চাও?" আমি বলিলাম: "ওকালতি ব্যবসায় করিব স্থির করিয়াছি।" রামেন্দ্রবাবু একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন: "মন যখন স্থির করিয়া ফেলিয়াছ, আমি কিছু বলিয়া তোমাকে যে টলাইতে পারিব, সে আশা নাই। হয়ত অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, খ্যাতিলাভ হইবে। কিন্তু অর্থ দুই-এক পুরুষেই খরচ হইয়া যায়, ব্যবসায়ের খ্যাতি হয় সমসাময়িক, স্বল্পস্থায়ী। তুমি যে সব লাভের কথা ভাবিতেছ, তাহার উপরেও বড় লাভ আছে।" কিছুক্ষণ দুই জনই চুপ্ চাপ করিয়া রহিলাম। পরে রামেন্দ্রবাবু তাঁহার শেষ কথাটি বলিলেন: 'যে লাভ পাইলে, মৃত্যুর পরও মানুষকে লোকে স্মরণ করে, তোমার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় যদি তোমার মনের যে দিকে ঝোঁক তাহাকে সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা দেও। আশীর্ব্বাদ করি, যেখানেই থাক তোমার মঙ্গল হউক।" আমি তাঁহার দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বিদায় লইলাম। তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎকার হয় নাই।

কিন্তু তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই। অর্থোপার্জ্জন হয় নাই, খ্যাতিলাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যে শেষ কথাটি বলিয়াছেন তাহা, যতই চরমের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রামেন্দ্রসুন্দর

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

আজ থেকে একশ' বছর আগে ১২৭১-সালের ৫ই ভাদ্র (ইং ২০শে আগষ্ট, ১৮৬৪) জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম হয়। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রগুণে, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা দেশে তাঁর খ্যাতি অবিস্মরণীয়। এই প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী পুরুষের জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্-কালে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—পদার্থবিজ্ঞান ও রামেন্দ্রসুন্দর। জীবনের প্রারম্ভেই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন ক'রে ঐ শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ও কৃতবিদ্য ছাত্র ব'লে সম্মান লাভ ক'রেছিলেন। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ও অধ্যাপনায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব সে-সময়ে সর্বজন-প্রশংসিত। তাঁর জীবনের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বিজ্ঞানের বাহ্য স্বরূপকে অতিক্রম ক'রে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাঁকে নিয়োজিত ক'রেছিল। সেই-জন্যই তাঁকে দার্শনিক বলা হয়। বিশ্বের প্রকাশলোকের অন্তরে যে অপ্রকাশলোকের কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভূমিকায় লিখেছেন, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সারাজীবন এই অপ্রকাশলোকের গহনে প্রবেশ ক'রে সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেজন্য ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎকে অতিক্রম ক'রে সম্প্রসারিত হ'য়েছিল। এই সম্প্রসারণের আলোচনা ক'রতে গেলে, রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানানুশীলনের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধের প্রথমেই তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞান-চর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঞ্ছনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর গ্রামের পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বৃত্তি লাভ ক'রেন। কান্দির উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে ইং ১৮৮২-সনে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পান। এর কয়েকমাস আগেই তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দরের মৃত্যু হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইং ১৮৮৪-সনে তিনি ফার্স্ট্-আর্ট্স্ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। এর পর থেকেই তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষার আরম্ভ। পিতা গোবিন্দসুন্দর ছিলেন সাহিত্যানুরাগী—জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং গণিতেও তাঁর দখল ছিল। পিতার প্রভাবে বাল্যকালেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগ জন্মে। ইং ১৮৮৬-সনে বি. এ-পরীক্ষায় তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে 'অনার্স্'-কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক পেড্লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের একটি 'ক্লাশ-এক্সারসাইজ্' দেখে 'out and out the best' ব'লে তাঁর প্রশংসা ক'রেছিলেন। অধ্যাপকের এই প্রশংসা রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা

এনেছিল। ইং ১৮৮৭-সনে তিনি এম্. এ-পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণ পদক ও একশত টাকার পুস্তক পুরস্কার পেয়েছিলেন। এম্. এ পরীক্ষায় তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল—"Natural and Physical Science।" সাধারণভাবে এ-কেই বিজ্ঞান শাস্ত্র বলা হ'য়েছে। ইং ১৮৮৮-সনে রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দু'বছর প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে তিনি বিজ্ঞান-চর্চার অনুমতি পেয়েছিলেন। ইং ১৮৯২-সনে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন এবং পরে ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ-রূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ইং ১৯১৯-সনের ৬ই জুন রামেন্দ্রসুন্দর ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রসর হন নি—তার প্রধান কারণ মনে হয়, তাঁর প্রতিভায় বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অপেক্ষা দার্শনিক প্রকৃতিই অধিকমাত্রায় কার্যকরী হয়েছিল। তা ছাড়া যে-সাহিত্যানুরাগ তিনি পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তারই গভীর প্রভাব তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। সেই জন্যই দেখা যায় ইং ১৮৯৪-সনে তারই আগ্রহ ও চেষ্টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। প্রথম চার বছর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। মৃত্যুর ক'য়েকমাস পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে সভাপতি মনোনীত ক'রে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন।

যতদূর জানা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'আকাশ-তরঙ্গ' এবং পরে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' 'বঙ্গ-দর্শন', 'আর্যাবর্ত', 'ভারত' প্রভৃতি সমসাময়িক অনেক মাসিক পত্রে ছাপা হয়। ইং ১৮৯৬ সনে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একত্র করে 'প্রকৃতি' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। লিপি-কৌশলের গুণে এই পুস্তকখানির আজ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ হয়েছে। 'প্রকৃতি' পুস্তকে এবং ঐ সময়ে নানা পত্রিকায় যে-সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন—যা 'জগৎ-কথা' পুস্তকে পরে স্থান পেয়েছে—সেই সব লেখা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক রূপটি আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। নিউটন, ফ্যারাডে, হেল্‌ম্‌হোল্ট্‌স্, কেল্‌ভিন্ প্রভৃতি প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীরা যে-ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির পরিকল্পনা করেছিলেন. রামেন্দ্রসুন্দর সেই একইভাবে যেন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'প্রকৃতি'-পুস্তকের 'জ্ঞানের সীমানা,' 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে অবশ্য একটা বিপরীত ভাবের ইঙ্গিতও পরিলক্ষিত হয়—কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা বা দ্বিধার ভাব দেখা যায়। এই দ্বিধা থেকেই 'জিজ্ঞাসা'-র উৎপত্তি। ইং ১৯০৩ সনে রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রবন্ধগুলি একত্র করে 'জিজ্ঞাসা'-নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের সুধিজনের নিকট এই পুস্তকের যথেষ্ট সমাদর হয়। এ পর্যন্ত এই পুস্তকেরও তিনটি সংস্করণ হয়েছে।

'জিজ্ঞাসা'র—'মায়াপুরী' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায় বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের বিশাল পুরী মর্মর নির্মিত হলেও তা সত্য-সত্যই মায়াপুরী। এই প্রবন্ধের এক স্থানে আছে—"প্রত্যক্ষগোচর, অনুমান-লব্ধ ও কল্পিত—এই তিন অংশ একত্র করে বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্তি গড়ে নিয়েছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত মূর্তি যে কি তা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানবার উপায় নাই।" আধুনিক বিজ্ঞানেও এই কথারই সায় পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও বস্তু নিয়ে আইনষ্টাইনের যে জগৎ-দ্রষ্টার নিকট তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত। এই বিভিন্ন প্রকাশই তো

'মায়া'। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্তও তাই "ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র দিয়ে আমরা যা দেখি, 'ইহ বাহ্য,' প্রকৃত সত্য তা' নয়। ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।" 'জিজ্ঞাসা' পুস্তকে 'বিজ্ঞানে পুতুল পূজা' প্রবন্ধে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে নানা আলোচনার পর রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন—"যে সকল জাগতিক সত্য নিয়ে আমরা স্পর্ধা করি এবং তাদের সনাতন সার্বভৌমিক সত্য বলে নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, এগুলি সর্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপী পরম দেবতা কোথায় কি ভাবে আছেন জানি না; আমরা কেবল 'উপাসকানাং সিদ্ধার্থং' কতকগুলা মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ঢাক্ ঢোল বাজিয়ে তাদের পূজা করছি।" বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন্ বলেছিলেন—"বিগ্রহ বা symbol নিয়েই বিজ্ঞানীর কারবার।" এই তো সেই একই কথা—বিজ্ঞানে পুতুল পূজা! গণিতের গোড়ার কথা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে-সব আলোচনা করেছিলেন, পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানী ম্যাক্, পোঁয়াকারে, কার্ল পিয়ার্সন্ প্রভৃতিকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মায়াপুরী'-র কল্পিত জগৎকেই রামেন্দ্রসুন্দর ব'লে-ছিলেন—প্রাতিভাসিক জগৎ। এ-কেই বলা যেতে পারে প্রকাশের জগৎ। বিজ্ঞানী এই প্রকাশের জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে থাকেন ব্যস্ত। এই অবস্থায় স্বতঃ-ই মনে প্রশ্ন জাগে—বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ কি? শাশ্বত ধ্রুব সত্য কি? ভারতীয় দর্শনে ও ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ভাবধারায় রামেন্দ্রসুন্দর এর উত্তর পেয়েছিলেন। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে এবং তাঁর রচিত পুস্তকাবলীতে এ-বিষয়ের বিশদ আলোচনা তিনি ক'রে গিয়েছেন। রিপন কলেজের অধ্যাপক-সম্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারা-বাহিকভাবে যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠ করেন—তাতে তিনি ব্যবহারিক জগৎ, প্রাতিভাসিক জগৎ ও পারমার্থিক জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা ক'রেছিলেন। ইং ১৯১৪-সনে রামেন্দ্র-সুন্দরের কতকগুলি মৌখিক বিবৃতি "বিচিত্র প্রসঙ্গ" (প্রথম পর্য্যায়)—নামে প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় পর্য্যায় তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে ছাপা হয়। এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধাবলীতে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'নানা কথা, 'জগৎ কথা' ও 'বিচিত্র জগৎ' পুস্তকগুলিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর শেষ বয়সের বইগুলিতে (যেমন, 'কর্ম কথা, 'যজ্ঞ কথা') জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়, বৈদিক সাধনা ইত্যাদির কথা তিনি আলোচনা ক'রেছিলেন। জার্মান ভাষায় দার্শনিক চিন্তাকে বলা হয়—'Nachdenken, ; অর্থাৎ Denken বা বস্তুচিন্তার পর যা উদিত হয় তাকেই বলে দর্শন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবনে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারায় গোড়ার দিকে দেখি—বস্তু-বিজ্ঞান। পদার্থ-বিদ্যার জটিল বিষয়গুলি আয়ত্ত ক'রে তাঁর মূল তত্ত্বগুলি দেশবাসীর নিকট প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি পরিবেশন ক'রেছিলেন। এ থেকে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে পুঙ্খানু-পুঙ্খ জ্ঞান আমরা লাভ করি। তারপরে আসে দর্শন ও অধ্যাত্মসাধন।

পরিশেষে এ-কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে সংযত ও সংহত ক'রে অতিবিস্তৃতি থেকে রক্ষা ক'রেছিল। তাঁর দার্শনিক প্রতিভা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আশ্চর্য সফলতা লাভ ক'রেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

DIPTI

more than a household name

The Trade name Dipti is a hall mark of quality. Dipti Lanterns can easily be claimed as one of the most popular household articles throughout India. Khas Janata Kerosene Cookers have earned great popularity as indispensable household utility ; simple in operation, sturdy in construction and remarkable in performance, these Kerosene Wick Cookers help you save time and fuel.

Dipti enamel wares - proud addition to the existing range of Dipti products.

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD.

77, Bowbazar Street, Calcutta-12.

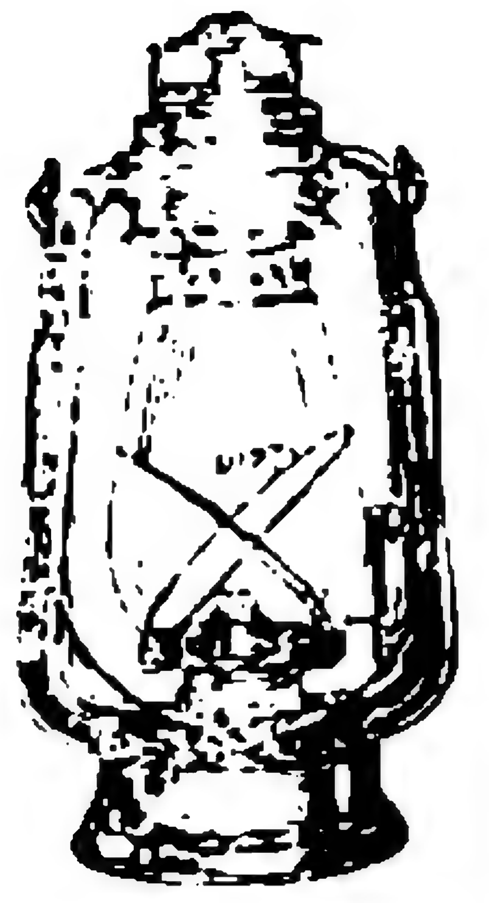

DIPTI LANTERNS

ENAMEL WARES

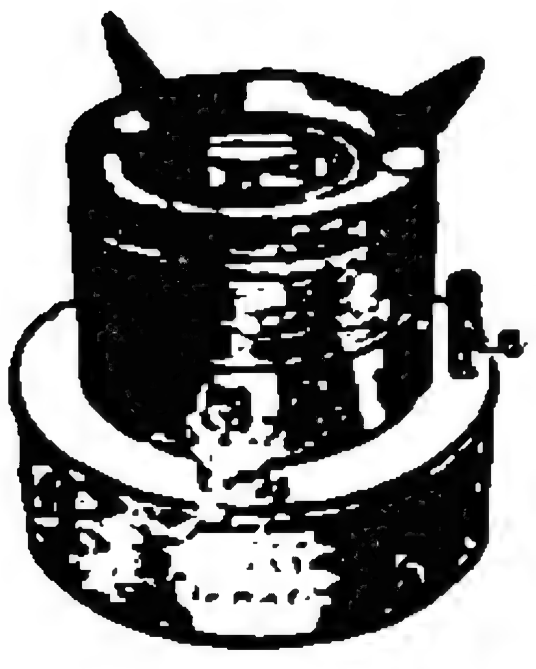

KHAS JANATA

Kalpana

মাতৃ-পূজারী রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে যাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলেন, অথবা দেশের হিতসাধনের জন্য প্রবর্তিত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন; আন্দোলনের উদ্দেশ্য মৌখিক ভাষণের সাহায্যে বা অন্যভাবে জনসমাজে প্রচার করে তাদের উদ্বোধিত করেন; অভীষ্টলাভের জন্য দুঃখ বরণে প্রস্তুত থাকেন বা দুঃখ বরণ করেন, তাঁরাই সাধারণত, পরাধীন জাতির মধ্যে বিশেষ করে, দেশপ্রেমিক বলে আখ্যাত হন। দেশপ্রেমিক তাঁরা অবশ্যই। দেশের মুক্তির জন্য বা হিতের জন্য যাঁরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করেন বা নিপীড়ন সহ্য করেন তাঁরা নমস্যও। কিন্তু এভাবে দেশসেবায় যাঁরা লিপ্ত নন, দল গঠন করে বা দলে যোগদান করে দেশসেবার সুযোগ যাঁদের হয় নি, বা যাঁদের প্রকৃতি সে ভাবে দেশসেবার অনুকূল নয়, তাঁরাও যে দেশপ্রেমিক হতে পারেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে দেশকে ভালবাসতে পারেন, এ সত্য উপলব্ধি না করলে দেশের বহু বরেণ্য সন্তানের মাতৃসেবাকেই অস্বীকার করা হবে। প্রত্যক্ষ-ভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ বা দুঃখ বরণ করেন নি, অথচ সমস্ত সত্তা দিয়ে দেশকে ভালবেসেছেন, দেশের সেবা করেছেন বাংলার যে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের অন্যতম। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা সকলেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, দেশপ্রেম ও দেশসেবা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ব্যাপার ছিল। যাঁরা তাঁকে দেখবার বা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান নি, তাঁরাও তাঁর জীবন ও কর্মকথা আলোচনা করলে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন বলে আশা হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁর সমসাময়িক এমন কয়েকজন মনস্বীর উক্তি তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রমাণ-স্বরূপ এখানে প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যাক।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সকল বিষয়ে মতৈক্য না থাকলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। তিনি যে রামেন্দ্রসুন্দরকে কী চোখে দেখতেন তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'এই গেল একদিক, অন্য দিকে চলেছিল আমাদের মিলনের সাধনা। সামনে যাকে পেতাম তাঁরই হাতে বাঁধতাম রাখি। এই সময়ে আমার সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায়। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধি কখনও আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে পারে নি। এমন মহৎ প্রাণ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি।'—(শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৪৭। পৃঃ ১২৫-১২৬)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশপ্রীতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশ-

প্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সমন্ত হয়েছিল।' (রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত, ভূমিকা।)

স্বদেশপ্রেমে রামেন্দ্রসুন্দরের তন্ময়তার প্রমাণ-প্রাচুর্য থাকলেও আমরা আর একজন মনীষীর উক্তিই মাত্র এখানে উদ্ধৃত করব। তিনি হলেন অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ছাত্রজীবনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিযোগী ছিলেন। স্বয়ং শিক্ষাব্রতী বলে সমকালীন শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখবার, জানবার ও বোঝবার সুযোগও তিনি পুরোপুরি ভাবেই পেয়েছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'স্বদেশ-প্রীতিই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি ছিল।·· তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথ সাহিত্য-সেবক হারাইয়াছি ; তাহা নহে ; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারকও হারাইয়াছি। ···তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন তাহা কতকটা ভারত বলিয়াই, কিন্তু আরও ভালবাসিতেন, ভারত তাঁহার নিজের বলিয়া। ভারতের যাহা কিছু,—তাহার আকাশ-মৃত্তিকা, তাহার উদ্যান-প্রান্তর, তাহার হিমালয়, তাহার ভাগীরথী, তাহার কথাবিশ্রুত নরনারী, তাহার কবি ও দার্শনিক—সবেতেই তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার ভারত, বাল্মীকি-বুদ্ধের ভারত যে কালের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইল, এই যন্ত্রণাতেই তিনি ছটফট করিতেন। স্বদেশের সেবাই তিনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহার অবস্থা অনুসারে এই সেবার প্রণালী নির্দিষ্ট হইল।' (আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। পৃঃ ১৩১-১৩২)

বৈজ্ঞানিক বিচারে গ্রাহ্য কি না জানি না, কিন্তু অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বলে যে, পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষের দেহ-সংস্থানের মত মানস-প্রকৃতিরও উপর ছাপ ফেলে যায়। তার কতটা জন্মগত অর্জন আর কতটাই বা পরবর্তী পরিবেশ বা প্রভাবজাত বলা মুশকিল। তবে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পুরুষপরম্পরার মানসধারার সূত্রের সন্ধান পাওয়া কঠিন হয় না। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৩০৭) তাঁর বংশপরিচায়ক গ্রন্থ 'পুণ্ডরীক—কুলকীর্তিপঞ্জিকা' পাঠ করলে এ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, চরিত্রমাধুর্য, শাস্ত্রানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি, শুভানুষ্ঠান-প্রবণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ যেমন বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তেমনই স্বদেশানুরাগের বীজ তার মধ্যে উপ্ত হয়েছিল তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দর থেকে জন্মসূত্রে ও তাঁর চারিত্র-প্রভাবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাব-প্রসন্ন মেঘমন্দ্রস্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার কতই না প্রয়াস পাইতেন।' (পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা। পৃঃ ৭৮)

তিনি এ সম্বন্ধে আরও বলেছেন—"শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন ; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল ; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।" ('পরিষৎ-পত্রিকা' থেকে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' গ্রন্থে উদ্ধৃত ৮২ পৃঃ)

পিতৃপ্রভাবে দেশপ্রেমের যে বীজ তাঁর হৃদয়ে উপ্ত হয়েছিল কালক্রমে তা পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়ে অমৃতফল প্রসব করেছে। জননী জন্মভূমির সেবায় উৎসৃষ্ট তাঁর প্রাণ আচরণে, ভাবনায় ও কর্মে মাতৃসেবার অর্ঘ্য রচনা করেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যক্ষভাবে দেশমুক্তির আন্দোলনে যোগ-

দান করেন নি, আগে যা বলেছি তা থেকে সেরূপ ধারণা হওয়াই সম্ভব। সে ধারণা মোটামুটী ভাবে সত্যও বটে, কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। তাঁর জীবন-চরিতকার বলেছেন, 'বঙ্গ বিভাগের হেতু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জন্মভূমিকে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিবার জন্য স্থানীয় জমিদার-সন্তানকে পুরোবর্তী করিয়া একবার মাত্র প্রকাশ্যভাবে তিনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর আর কখন প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখি নাই।' (রামেন্দ্রসুন্দর। ২৪৮-২৪৯ পৃঃ)

এই আন্দোলন তাঁর জন্মস্থান জেমোকান্দি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে যে ভাবাবেগে কীরূপ উদ্বেল করে তুলেছিল তার একটা উজ্জ্বল চিত্রও তাঁর গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বোধেই এখানে তা উদ্ধৃত করে দিলাম।

"লর্ড কর্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচার করিলে ১৩১২ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা নগরী উক্ত আন্দোলন সৃষ্টির আদি স্থান। আন্দোলনের প্রথম সময়ে লোকমুখে এবং সংবাদপত্র দ্বারা কলিকাতার সমাচার রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি অঞ্চলে আনীত হইতেছিল মাত্র। সেই সময় পূজার অবকাশে রামেন্দ্রসুন্দর দেশে আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পূজার পর চতুর্দশী তিথিতে বিপুল সমারোহে একটা বিরাট জনতা শোভাযাত্রা করিয়া ৺কালী মন্দির অভিমুখে গমন করিল; সেদিন আমাদের জেমোকান্দির আপামর নরনারীর মনে একটা অতি-প্রবল ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। ১লা নবেম্বর ঘোষণা প্রচারের দিবসে আর একটা ঐরূপ বিরাট জনতা শোভাযাত্রা করিয়া নদীতীরে 'হোমতলায়' সমবেত হইল। সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দেশবাসীর মনে যে আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলা বাহুল্য তাঁহার জন্মভূমি অঞ্চলে তাঁহার চেষ্টায় আন্দোলন পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আন্দোলন প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে সকল প্রকার বিরাট ও ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা সঙ্গীত ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান তাঁহা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশবাসিনী মহিলাদিগের জন্য তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক একখানি সরল অথচ মধুর ভাবপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ৩০এ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবী স্বদেশব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা বেবালয়ের (বিষ্ণু মন্দিরের) প্রাঙ্গণে আমন্ত্রিতা ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর পল্লীবাসিনীদিগের সম্মুখে সেই বঙ্গলক্ষ্মীর মধুর ব্রতকথা পাঠ করিয়াছিলেন।" (রামেন্দ্রসুন্দর। পৃঃ ৬৯-৭০)

এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সম্বন্ধে বিশেষ করে দু'একটা কথা বলবার আছে। পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও রচনারীতির দিক থেকে বিচার করলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে বাংলা-সাহিত্যে ক্লাসিকের গৌরব অর্পণ করতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সুদূরপ্রসারী ভাবনা একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, কোন আন্দোলন যত প্রবল ও ব্যাপকই হক না কেন, দীর্ঘকাল তার উদ্দীপনা বজায় থাকা সম্ভব নয়, কালাত্যয়ে তা মন্দীভূত হতে বা ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য। হয় ত সাময়িক উত্তেজনার অবসানে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াও সম্ভব। কাজেই এই ভাবধারাকে যদি সমাজগত করে ফেলা যায় তা হলে এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া চলে। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত'কে যদি বারমাসের তের পার্বণের অঙ্গীভূত করে দেওয়া যায় তা হলে একদিকে যেমন তা দেশপ্রেমের এক স্বচ্ছন্দ ধারায় মনকে অভিষিক্ত করে রাখবে তেমনই তা সহজেই অন্যতম নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়ে সমাজ জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করবে। মেয়েদের মনের সহজাত রক্ষণশীলতার উপর আস্থা ছিল বলেই একে তিনি সর্বজনের আচরণীয় ধর্মানুষ্ঠানের রূপ না দিয়ে সর্বশ্রেণীর গৃহলক্ষ্মীর পালনীয় ব্রতরূপে পরিকল্পিত করেছিলেন। অন্যান্য ব্রতের মত এ ব্রত পালনের পদ্ধতিও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, ব্রতকথা

বেধে দিয়েছিলেন। সে ব্রতকথা ভাবের প্রাঞ্জলতায়, রচনার সারল্যে, মাধুর্যে ও হৃদয়গ্রাহিতায় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। দেশের রূপ, তার সমস্যা, তার প্রতি কর্তব্যের নির্দেশ এতে এত সহজ কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে তা একেবারে নিরক্ষরা নারীরও সহজবোধ্য হবে। সরলতা, সরসতা ও বিষয়বস্তুর মনোহারিত্বের এ অপূর্ব সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ত বটেই, অন্য সাহিত্যেও দুর্লভ। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ণে অর্ধসহস্রাধিক পুরনারী রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃদেবীর আহ্বানে তাঁদের বাড়ির পূজাঙ্গনে সমবেত হয়ে সে ব্রত-কথা শুনেছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে এই ব্রতের প্রচলন হলে জাতীয় জীবনে তার পরিণতি কী হওয়া সম্ভব তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এ ব্রত নারীদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার অর্থই হল সমাজ-মানসের গভীরে তা অনুপ্রবিষ্ট হওয়া। নারীজাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের সকল স্তরে সেই ভাব সঞ্চারিত করে দেওয়াই যে পরিকল্পয়িতার উদ্দেশ্য তা বুঝে নিতেও তাঁরা ভুল করেন নি। তাই তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই এই আপাতনির্দোষ পুস্তিকাখানির প্রচার বন্ধ করে দেন।

ব্রত-কথাটি প্রথমে ১৩১২ সালের পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। সরকার কর্তৃক প্রচার নিষিদ্ধ হওয়ার দরুণ ব্রিটিশ শাসনকালে অনেকেরই তা দেখবার সুযোগ হয় নি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' গ্রন্থে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত) ও পরিষৎ-প্রকাশিত 'রামেন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে ব্রতকথাটি মুদ্রিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠককে তা আস্বাদন করতে অনুরোধ করছি। কিন্তু এই ব্রতের প্রবর্তক এতে পালনীয় যে আচার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, জাতীয় জীবনে কী গভীর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে সেগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল তা দেখাবার জন্যই পালনীয় ব্রতাচারগুলি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে (৩০শে) বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

'পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখী-বন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসর কাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।'

লক্ষণীয় যে, এই ব্রতে শঙ্খধ্বনি করার ভার বালকদের উপর অর্পিত; ব্রতান্তে তাদের হাতেও রাখী বন্ধনীয়। কত সহজভাবে জীবনের প্রারম্ভ থেকে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করার উদ্যোগ। এখানে উল্লেখযোগ্য, সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে ধারণা হয় যে, রাখীবন্ধনের প্রথা রবীন্দ্রনাথের ও অরন্ধন রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাপ্রসূত। আর এক কথা। জাতীয় ঐক্য বা সংহতির জন্য কমিটি করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের পরিবর্তে সর্বভারতে অনুষ্ঠেতব্য কোন ব্রত প্রবর্তন ও ব্রতকথার প্রচলন কি সম্ভব নয়? এ কাজে রামেন্দ্রসুন্দরের বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত ও ব্রতকথাকে আমরা আদর্শরূপে নিয়ে

প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পদ্ধতি ও কথা রচনা করতে পারি।

প্রশ্ন করতে হয়, আন্দোলন সৃষ্টির এ সামর্থ্য সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ্য আন্দোলনের পথ পরিহার করলেন কেন? তাঁর জীবনী বা রচনা থেকে এর স্পষ্ট কোন জবাব না পাওয়া গেলেও চরিতকারের বর্ণনা থেকে অনুমান হয় আন্দোলনের গুপ্ত হিংসাত্মক পথের গতি তাঁকে প্রকাশ্য রাজনীতিক পথ থেকে সরিয়ে এনেছিল। জীবন চরিতকার বলেছেন যে, গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে ব্যথিত হয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'এই পাপে আমাদের এই আন্দোলন পণ্ড হইবে, গবর্ণমেন্ট কঠোর হস্তে ইহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইবেন।' রামেন্দ্রসুন্দর যদি একথা বলে থাকেন তবে তার পাশাপাশি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে যে, তিনি নিজে প্রকাশ্য আন্দোলনের পথ পরিহার করলেও উত্তেজনা কালের ভুল ত্রুটিকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখতেন। ঘৃণা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেও তিনি রাজী ছিলেন না। ১৩১৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই ছিল যে, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হবে না, এখন কাজ কর। এর উত্তরে আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে রামেন্দ্রসুন্দর একই শিরোনামায় প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি বৃহৎ। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রাজনীতিক মতবাদ ও আদর্শের এর চেয়ে স্পষ্টতর প্রকাশ তাঁর আর কোন রচনায় হয় নি। কাজেই তাঁর রাজনীতিক মতের যাঁরা মোটামুটী পরিচয় পেতে চান, এ প্রবন্ধটি তাঁদের অবশ্য পঠনীয়। এর আলোচ্য সমস্যার গুরুত্বের জন্য এর থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন সঙ্গত মনে করছি।

'.. কর্মে প্রেরক জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে; কর্মে প্রেরণ করে ভাব। ভাবের প্রবাহে মানুষ কর্মে প্রেরিত হয় ও অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৃহৎ জনসঙ্ঘে সময়ে অসময়ে যে ভাবের স্রোত বহিয়া যায়, তখনই সেই স্রোতের বেগে বাধা বিঘ্ন ভাসিয়া যায়, তখন মূক বাচাল হইয়া উঠে, পঙ্গু তখন গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়। যাহাদের কর্মেন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, সহসা স্নায়বিক উত্তেজনা পাইয়া সেই সকল কর্মেন্দ্রিয় কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। জ্ঞানের অভাবে হয়ত কাজ পায় না, বুদ্ধির অভাবে হয়ত বিপথে প্রেরিত হয়, বিচারশক্তির অভাবে হয়ত উল্টা কাজ করিয়া বসে, কিন্তু ভাবের তাড়নায় কাজের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ভাবের তাড়নায় উত্তেজিত হইবার শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ থাকে না। যদি ভাবের উত্তেজনায়ও স্নায়ুযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে না পারে, যদি স্নায়বিক পক্ষাঘাতে শরীর অবশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিন্তু কোন আশাই থাকে না।

গত আন্দোলনে যে দেশের মধ্যে একটা ভাবের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। উহা হয়ত আন্দোলন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অথবা কতকগুলা অকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে; নেতার অভাবে, বিচারশক্তির অভাবে, অভ্যাসের ও জ্ঞানের অভাবে, কি কাজ করিবে, কোন্ কাজে হাত দিবে, তাহার ঠাহর পায় নাই। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর নির্জীব নহে।' (রামেন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৬-১৮৭ পৃঃ)

এ থেকে এবং রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা ও জীবন কথা সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিরূপতা নয়, রুচি, মানবিক প্রবণতা ও শারীরিক অপটুতা এই তিনটিই তার প্রকাশ্য আন্দোলনের পথ বর্জনের প্রধান হেতু।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ্য আন্দোলনের পথ পরিহার মাতৃসেবার সাহিত্যকে মাতৃপদে অঞ্জলিদানের পুষ্প হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসা, কর্মকথা, যজ্ঞকথা, নানাকথা

ইত্যাদি গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন রামেন্দ্রসুন্দরের এই অঞ্জলির পুষ্প কী শ্রদ্ধায় উৎপাদিত, কত যত্নে আহৃত, আর কী অপূর্ব সুরভিময়। 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সদনে মুক্তবেণীতে পরিণত' হয়েছিল। দেব অর্থাৎ মনস্বী-সেব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মন্দাকিনীবারিকে আনিয়া তিনি মর্ত্য অর্থাৎ সাধারণ জন-আস্বাদ্য সুরধুনী ধারা বইয়ে দিয়াছেন। এ কৃতিত্ব যে কী অসাধারণ তাঁর রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত না হলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বচ্ছ প্রজ্ঞা, সুগভীর চিন্তাশীলতা আর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী আর একান্ত আন্তরিকতা তাঁর রচনায় এক অমৃতোপম স্বাদুতার সৃষ্টি করেছে। বলেছি এই মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য-চর্চা, সাহিত্য প্রসারের প্রয়াস ও মাতৃভাষার সসম্মান প্রতিষ্ঠা এই তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল। এই সাধনাই পত্র পুষ্প ফলে বিকশিত হয়েছিল তাঁর অপূর্ব্ব রচনাবলী, সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য সম্মেলন আর সাহিত্য পরিষদের মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃভাষার সেবাকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন, একেই যে তিনি দেশমাতৃকার পূজা বলে মনে করতেন তা বোঝার জন্য তাঁর রচনা থেকেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"'বন্দে মাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনীকে যে মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্মের অনুকূল মূর্তি।

...বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গা চরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয় যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে।" "যজ্জুহোষি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ"—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" (নানাকথা, মাতৃমন্দির, ২৩৪-২৩৬ পৃঃ)

মাতৃভাষার অনলস ও সশ্রদ্ধ সেবাকেই যে তিনি দেশসেবা মনে করতেন এবং সেই সেবাতে যে তাঁর নিষ্ঠা কীরূপ ঐকান্তিকী ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি সেখানে ইংরেজীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠে সম্মত হন নি। অবশেষে যখন বাংলা ভাষায় পাঠের অনুমতি মিলল তখন তিনি যে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেছিলেন তারই ফল 'যজ্ঞকথা'। সেই সাহেবীয়ানা ও ইংরেজীর আভিজাত্যের যুগেও তিনি কলেজে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অধ্যাপনা করতেন, অপরিহার্য না হলেও বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় তিনি চিঠিপত্র লিখতেন না। অশন-বসনেও তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বাদেশিকতার কথা কখনও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অনুসারী ছিলেন-যে আদর্শ বলে—'সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্য-মুদ্বিজেত বিষাদিব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্মানকে নিত্য বিষবৎ জ্ঞান করে তা থেকে দূরে থাকবে।

রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারা অনুসরণ করলে দেশপ্রেম সম্বন্ধে কতকগুলো সূত্রের সন্ধান মিলে। তার সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেই প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

তিনি বলেছেন—

(১) "মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।" (চরিত কথা, উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, ৭৫ পৃঃ)

(২) "আমাদের বর্তমান অস্বাভাবিক নিদ্রাদশায় সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারকল্পে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া আমরা জানি। রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লোকশিক্ষা এ সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে গতি হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। নতুবা সব মিছা অভিনয়, —ভুয়া বাজি। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, কংগ্রেস, শিল্পমেলা, সাহিত্যপরিষৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সমস্তই জলের বুদ্বুদ—চিহ্ন না রাখিয়া জলে মিশাইবে।" (রামেন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২০ পৃঃ)

(৩) "রাজপুত রাজপুতের, শিখ শিখের, মরাঠা মরাঠীর সহিত দল বাঁধিতে পারে ও অনেক সময় বাঁধিয়াছে। কিন্তু রাজপুত শিখ মরাঠা একীভূত হইয়া সাধারণ স্বার্থ মিলাইয়া ভারতব্যাপী 'নেসন' উৎপন্ন হয় নাই।...এইখানেই আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব রহিয়া গিয়াছে এবং একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র রহিয়াছে; এবং এই ছিদ্রেই প্রবেশ করিয়া, পরে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে ও আমাদিগের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছে।" (রামেন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮২-১৮৩ পৃঃ)

(৪) জানতে হবে, "ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির আবাসভূমি; হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী, ধনী দরিদ্র সেই মহাজাতির অন্তর্গত; আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই বাঙ্গালী, আমিই পাঞ্জাবী, আমিই সেই ভারতবাসী মহাজাতি।" (রামেন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠখণ্ড, ১৮৫-১৮৬ পৃঃ)

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। কাজেই এখানেই উপসংহার করলাম। যাঁর সমগ্র জীবন দেশমাতৃকার প্রতি সেবায় উৎসৃষ্ট ছিল, যাঁর সমস্ত সত্ত্বা জাতীয়ভাবে ওতঃপ্রোত তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—'বঙ্গজননীর প্রতি সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মার্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসন স্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক।' (চরিতকথা, বঙ্কিমচন্দ্র, ৪২ পৃঃ) তাঁর এই শুভ নির্দেশ মনে প্রাণে পালন করে আমরা যেন ধন্য হতে পারি।

সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর

সুশান্ত বসু

মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ে অমরতা প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রবন্ধকারের হৃদয় বোধ করি মূলতঃ পরীক্ষাতিতীর্ষু ছাত্রজন, এবং তথ্যসন্ধিৎসু সমালোচকেরই একমাত্র আশ্রয়। খুব বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে এ সিদ্ধান্তকে সার্বজনীন সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আজকের দিনের সাহিত্য-জগতের দিকে তাকিয়ে। অথচ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভিত্তি-মূলে মনস্বী প্রাবন্ধিকদের তথ্য এবং তত্ত্বসন্দীপ্ত জিজ্ঞাসার জাগ্রত প্রভাবও যে অকিঞ্চিৎকর নয়, পরন্তু সুচিরস্মরণ্য এবং সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিকভাবে এ তথ্য আমাদের অবিদিত নয়, কেবল অভাব বাস্তব স্বীকৃতির। এ সত্য আমরা প্রতিনিয়তই ভুলি এবং ভুলে যাই বলেই আমরা সাধারণ পাঠকসমাজ, যারা অধুনাতন দৈনন্দিন এবং সাংস্কৃতিক জীবনে চিত্ততোষ কথাকাহিনীর প্রলুব্ধ পাঠক, শিশুর চেয়েও হীনপ্রভ কৌতূহল নিয়ে বিজ্ঞানে বীতস্পৃহ, চোখ থেকে যাদের আদিম মানুষের প্রথমজা বিস্ময়ের অবোধপূর্ব কৌতূহল আজও কাটেনি, তারা বাঙালী বৈজ্ঞানিক হিসেবে একজন জগদীশচন্দ্র বসু, একজন প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিম্বা একজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামই মাত্র শুনে থাকেন, অথচ এর বাইরে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদেরই যে একটা নাড়ীর সম্বন্ধ রয়ে গেছে একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এ বিষয়ে আক্ষেপ করেই বা লাভ কি! কেননা যাদের এমনকি অনিচ্ছুক পাঠ্যচারণার মধ্য দিয়ে সুদূর অথবা অনতিসুদূর অতীত জীবিত থাকে, কিম্বা পুনর্জীবিত হয়, সেই এ্যাভারেজ যুবজনের কাছে বিগত শতাব্দী, দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, প্রায়-বিস্মৃত একটি অপরিচিত জগত। এই সংক্রামক 'ফিক্‌শন' এবং 'ফ্যাণ্টাসির' জগতে মুক্তবুদ্ধি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই-ও তাই একটি অর্ধশ্রুত নাম মাত্র। অথচ এই মানুষটির সাহিত্যিক পরিচয়টি বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জীবন এবং বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এমন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে তাকে স্মরণ করবার জন্য কোনো শতবার্ষিকী প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না।

নিতান্ত-বিজ্ঞানী কিম্বা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর আপাত-পরিচিত রচনাবলীর প্রণেতা নন রামেন্দ্রসুন্দর। বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গমে এই 'নির্মল মুকুর হৃদয়' প্রাবন্ধিকের অভিপ্রকাশ তাঁর 'জিজ্ঞাসা' থেকে 'যজ্ঞকথা'র পাতায় পাতায়।১ ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক

১. তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, এবং সাহিত্য সেবী। অতএব বিজ্ঞান দর্শন এবং সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।

> ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩১ ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি সম্বর্ধনা সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ। [সাহিত্য সাধক চরিতমালা : ৭০]

আবার সুরেশ সমাজপতি মশাই-এর লেখায়ও এর প্রতিধ্বনি: 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানব চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে মুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম বহুদিন বাঙালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে।
[সাহিত্য : আশ্বিন : ১৩২৬]

[শেষাংশ ২১০ পৃষ্ঠায়]

রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

....

আমরা বাঙালী জাতি এই তীর্থ-বরদ বঙ্গে বাস করেও, না কি বাস করেই হয়তো, এই অনুকূল আর্দ্র জলবায়ুর প্রশ্রয়ে আত্মবিস্মরণের অভিশাপে লাঞ্ছিত হয়েছি বার বার। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বার বার অভিনীত হয়েছে একই নাটক। আমাদের অগ্রজেরা অনেকেই বলে গেছেন—আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চরিত্রে এই ইতিহাস-সচেতনতার অভাব দেখে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে একদা ব্যাপৃত হয়েছিলেন বাঙালীর অতীত ইতিহাসের সন্ধানে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ বিজয়ের কল্পিত কলঙ্ক-কাহিনীর মূলোচ্ছেদে তৎপর হয়েছিলেন—তিনি—। বার বার আঘাত করেছিলেন আমাদের চৈতন্যের মর্মমূলে। কিন্তু তাঁর সে মহান প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি আজো। বোধ হয় আমাদের এই উদার আকাশ, প্রসন্ন স্নিগ্ধ বাতাস, শান্ত সমাহিত প্রকৃতির মধ্যেই রয়ে গেছে আত্মবিস্মরণের বীজ। না কি বৈরাগ্যমূলক একটি সুমহান আত্মনির্লিপ্তিই আমাদের আত্মানু-সন্ধানের পথে—ইতিহাস আবিষ্কারের অন্তরায় হয়ে আছে? কারণ যাই হোক এটি মোটেই সুলক্ষণ নয়। যেহেতু অতীতের ভিত্তি-প্রস্তরের উপরই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের মহামন্দির, যেহেতু স্থানকাল পাত্রের বন্ধন অস্বীকার করতে পারি না আমরা কিছুতেই,—না ব্যক্তিগতভাবে না সমষ্টিগতভাবে; পরন্তু এই বন্ধনের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয় মহামুক্তিতে উত্তরণ, সেই হেতু সম্পন্ন জাতি হিসেবে, পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হলে অতীতের মৌন ভূমিতেও আত্মানুসন্ধানের বীজ বোনার প্রয়োজন। ইতিহাসের পরিচর্যা ছাড়া, অতীতের স্বীকৃতি ছাড়া আমাদের বর্তমান ব্যর্থ,—ভবিষ্যৎ অচল। খুব দূরের ইতিহাসের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর সৌর-করোজ্জ্বল সূর্যসাধনার ইতিবৃত্তও আজ আমরা ভুলতে বসেছি। অথচ এই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফসলে আজো পূর্ণ করে চলেছি আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার। যাঁদের দানে সমৃদ্ধ হয়ে দুই হাতে ফসল তুলেছি আমাদের ঘরে ঘরে,—আজো তুলছি, হয়তো নতুন প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে গেলে অপূর্ণ থাকতো না আমাদের কোনো সম্ভাবনা,—তাঁদের কোনো স্মৃতিই আজ আর বেঁচে নেই আমাদের চিত্তে, মননের অন্তঃপুরে।

– রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর আত্ম-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে গেছেন। কবিতায়-গানে-নৃত্যে নাটকে নানাবিধ উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে আছে রবীন্দ্রভাণ্ডার। তাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বৎসরান্তে একবার অন্তত: গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজা শেষ করি। রবীন্দ্র-মননে বা রবীন্দ্রাদর্শের অনুসরণের পথে নয়, —সস্তা সহজ ভাবালুতার আশ্রয়ে রবীন্দ্রকৃত্য সম্পন্ন করি আমরা তাঁরই কয়েকটি গান বেসুরে গেয়ে—বা কয়েকটি নৃত্য-নাট্যের বিবর্ণ ব্যর্থ অনুকরণে। তবু অন্তত: যা হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে এক ভদ্রলোক বাংলা দেশে এককালে জন্মেছিলেন—শিক্ষিত লোকের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আজো বেঁচে আছে— ; যাই হোক তিনি কবিতা টবিতা—কিছু গানটান লিখে একদা কিছু নামটামও অর্জন করেছিলেন; রাবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরকম একটা ধূসর অস্পষ্ট চিত্র বাঙালীর

চিত্তে এখনো রয়ে গেছে। কিন্তু আর যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর মহাযজ্ঞে হোতা বা পুরোহিত ছিলেন তাঁদের বিস্মৃত হয়েছি আমরা একেবারে। অনেকের নামটি পর্যন্ত আমরা ভুলে গেছি। অথচ ছাপার অক্ষরেই যে কেবল তাঁদের দানের ইতিবৃত্ত আজো রয়ে গেছে আমাদের গ্রন্থশালায়—গ্রন্থমন্দিরের অচলায়তনে তাই নয়, তাঁদের সমৃদ্ধ দানে নানাভাবে ফলবান হয়েছে আমাদের প্রাণের প্রান্তর। জানি না, বিদ্যাসাগরের মত মহামানব পৃথিবীতে ক'জন জন্মেছেন এ পর্যন্ত, কিন্তু তাঁকে আমরা কতটুকু মনে রেখেছি—তাঁর উচ্চশীর্ষ সেই মহান মানবতার আদর্শকে? তাঁকে কেন্দ্র করে একবারও কি উদ্বেল হয়ে ওঠে আমাদের স্মরণের আভিজাত্য? প্রিয়-বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়, আবেগে, আমরা বছরের একটি দিনও কি সমবেত হতে পারি এই পুণ্যশ্লোক নামটিকে কেন্দ্র করে? এমনি অজস্র, আরো নক্ষত্র—নাম উচ্চারিত হতে পারে আজকের বাংলার নিবিড়তম অন্ধকারে। কিন্তু আমরা উচ্চারণ করি না। যে সমস্ত কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) ও কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তির মহা সম্মিলনে উদ্দাম-উচ্ছল বিচিত্র বহুধা হয়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মহা ডায়নামো, যে শক্তির সহস্র ধারায় ও কিরণ সম্পাতে প্রাণময় হয়ে উঠেছিল দিগ দিগন্ত—আমরা দু হাতে ফসল তুলেও উৎসের সন্ধানে তৎপর হইনি কোনদিন। আজ তাঁদের অনেকেরই শতবার্ষিকী ঘুরে আসছে। কিন্তু আমাদের চিত্তের প্রস্তুতি কৈ? ইতিহাসের ধারাস্রোতে স্নান করে স্বর্ণময় ভবিষ্যৎকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছি কতটুকু?

—বাংলার সাহিত্যে, বাঙালীর জীবনে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমনি একটি চিরস্মরণীয় নাম। বাঙালীর ইতিহাসকে চৈতন্যের তড়িৎস্পর্শে যে সব মহাপ্রাণ প্রাণযোজনায় সম্ভাবিত করতে চেয়েছিলেন, আগামীর উষার স্বর্ণ তোরণ দ্বারে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বাঙালী-সংস্কৃতির বিজয় রথ,—রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের মধ্যে একজন মাত্র নন, অন্যতম।

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক। যাদের প্রতিভার স্পর্শে আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য সত্যিকার সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে—রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এহো বাহ্য। এ কেবল তাঁর বহিরঙ্গ পরিচয় মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) প্রবন্ধগুলি কোন বিশিষ্ট গুণে সাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়—এ সব আলোচনার নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এবং এজন্য অনেক জ্ঞানী গুণী ও রয়েছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর-প্রতিভা বিচারে এ সব আলোচনা মুখ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর অজস্র ধারায় নানা জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যে, ভঙ্গী ও রচনাগুণের উৎকর্ষে তা অভিনব সন্দেহ নেই। 'তিনি বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক হয়েও দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূলক, চরিতাখ্যান মূলক সমাজতত্ত্ব মূলক বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন।' এ সমস্তই সত্য। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে আরো গভীরতর সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। সাহিত্য সেবার দ্বারাই রামেন্দ্রসুন্দর দেশজননীর সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন একথাও ঠিক। তিনি ব্যক্তিজীবনে অধ্যাপনাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে মহাপ্রেরণা তাঁর জীবনের মর্মমূলে শক্তিরূপে নিত্য বিরাজমান ছিল সে হল তাঁর অনন্ত দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যাভিমান। তিনি নিজেই বলেছেন, "যথাশক্তি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিব এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাশৈলীর চমৎকারিত্ব, প্রাঞ্জলতা—তাঁর রচনার মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বিত—প্রকাশ, এ সব সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে সেকালে এবং একালে মনীষীরা সকলেই সশ্রদ্ধ প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন। তবু আমার মনে হয় রামেন্দ্রসুন্দরের যথার্থ মূল্যায়ন

সেখানেই সমাপ্ত নয়। "দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক, রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাঁহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।" শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কেউই সন্দেহ পোষণ করবেন না। কিম্বা তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী উক্তিও অসত্য নয়। "মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টম্যানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতকপরিমাণে ইতিহাস বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও সেইরূপ হয়।"

—শুধু কি তাই! তাঁর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। একবার মাত্র জীবনে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তাছাড়া প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি কোনদিন দ্বিতীয় হন নি। এবং তিনি যশস্বী অধ্যাপক। কর্মদক্ষ কৃতী অধ্যক্ষ। জীবনে সর্বক্ষেত্রেই তিনি সার্থক। তবু মনে হয়, শিক্ষা, সাহিত্যে, জীবনে সর্বত্র এই সব সার্থকতার পশ্চাতে যে মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর তিনি এ সবার অনেক উর্ধ্বে। তিনি অতুলন। সেই ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের মূল্যায়নই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন।

"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একটি সাহিত্য পরিষদ, একটি সাহিত্য সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির"—বলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ ছাড়াও তার মহান অগ্রনায়কত্বের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়ে আছে: (১) বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রবর্তনে। (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণয়ে। এবং (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনার প্রবর্তনে। এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে তাঁর সেই সুবিখ্যাত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র প্রবর্তন—এবং দেশব্যাপী অরন্ধনের উদ্‌যাপন—স্বরাজের পথে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে আজো স্মরণীয়। তবু পুনরুক্তি করে আবারও বলব—এহো বাহ্য। এই যে জীবনের নানাদিকে তাঁর সার্থকতা ও কৃতিত্ব, কর্মোদ্যম ও মহত্ত্ব, এ সবের উৎস হল মানুষ রামেন্দ্রসুন্দরের পরিশুদ্ধ উদার পরিব্যাপ্ত হৃদয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমন্বিত জীবনাদর্শের সার্থকতম প্রতিনিধি রামেন্দ্রসুন্দর—বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই সন্ধান করেছিলেন মনুষ্যধর্মের। সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির সাধনাকেই গ্রহণ করেছিলেন জীবনসাধনা রূপে। তাই নির্দ্বন্দ্ব 'শ্রেয়'র অভিমুখে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এত সুসমঞ্জস, স্থির প্রত্যয়ে ছন্দোশীল। শৈশবে পিতার কাছে দেশপ্রেমের দীক্ষা। যে দেশপ্রেম মনুষ্যধর্মের সঙ্গে একাত্ম। তাই নিরুত্তাপ, নিস্তব্ধ, স্থির তপস্যার আলোকে সে জীবন সহজ স্বাভাবিক হয়েও আদর্শ নিষ্ঠায় দৃঢ়, কঠিন, কখনো নির্মম।

জীবনকে পূর্ণের প্রাঙ্গনে নিয়ে যাবার তপস্যাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-সাধনা। পরিপূর্ণতা, সমগ্রতাই জীবনের পরম সাধ্য। আর ছিল তাঁদের স্থির বিশ্বাসের ভূমি। এযুগের জুডাসদের মত আত্মবিক্রীত 'lost soul" নয়। এবং এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয় একাগ্রতা বা sincerity র। তাই তাঁদের কর্মের ও কথার মধ্যে ছিল সত্যি-কারের আত্মীয়তা। তাঁর পরিশুদ্ধ নির্মল প্রজ্ঞা, অপরিসীম সৌন্দর্যবোধ, নিরন্ত কর্মৈষণা, চিত্তচমৎকৃত বিশ্বানুভব-এর উৎস ছিল তাঁর অনুপম মন্ত্রমুখর হৃদয়ের গোমুখীতে, যে হৃদয় মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উদাত্ত, মর্ত্য প্রীতির শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল। এবং তাঁর এই হৃদয়ভরা জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জাত তাঁর প্রতিটি চারিত্রিক ঐশ্বর্য। এবং তাঁর এ মর্ত্যপ্রীতি বা জীবনের প্রতি ভালোবাসা কিছু শেখানো বুলি-

বা কল্পনাত্মক কোনো ব্যাপার নয়—; পরন্তু সুস্থ স্বচ্ছ স্বাভাবিক জীবনবোধ ও জীবনাচরণের অঙ্গীভূত। শাশ্বত ভারতীয় হিসাবে তিনি এই প্রাণপ্রদ সুস্থ স্বচ্ছ জীবনবোধের মহান উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন তাঁর পিতৃপিতামহগণের কাছ থেকে। এই সব উজ্জ্বল জীবনবোধ ও আদর্শ তাঁর একান্ত সহজাত ছিল বলেই—তার সমগ্র ব্যক্তি-চৈতন্য জীবনের প্রতি মহান ভালোবাসায় এমন প্রসারিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। জীবনের প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই তিনি স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করেছিলেন—তার চারিত্রিক শুদ্ধি, নিষ্কলঙ্ক অমল শুভ্রতা এবং হিমালয়ের সুদৃঢ় একাগ্রতা। চরিত্রের এই শুদ্ধি থেকেই জাত তাঁর সদাজাগ্রত স্বাজাত্যাভিমান বা দেশপ্রেম। তার দেশপ্রেম বা স্বাজাত্যাভিমান ইউরোপের patriotism নয়—,অর্থাৎ এটি তাঁর কল্পনাত্মক সংকল্প মাত্র নয়। নয় বলেই জাতীয় জীবনের সেই বিচিত্র জীবনাদর্শের সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তিনি স্থির প্রত্যয়ী এক সুগভীর সমন্বিত আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন। এনিহিলেশনই নয়, পরন্তু সাবলিমেশনই জীবনের পরম কাম্য। ভারতীয় সনাতন সংস্কারের উত্তরাধিকারী হয়েও ইউরোপীয় জীবনধারা থেকে যা কিছু শ্রেয় যা কিছু মঙ্গলকর তা গ্রহণ করতে একটি বারও দ্বিধান্বিত হন নি। তাই একজন সমালোচক—বলেছেন "রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশভক্ত ও মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হলেও, তাঁর মধ্যে সংকীর্ণ স্বদেশ প্রীতি কিংবা কোনো জীবন-পরিপন্থী সংস্কার ছিল না। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ থাকলেও ইংরেজী ভাষার প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র বীতরাগ ছিলেন না।" তিনি নিজেই বলেছেন "ইংরাজী শিক্ষার কেহ দোষ দিবে না; সেকথা যে বলিবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল।"—নানাকথা। "কিন্তু তাই বলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নিয়মকে তিনি কোনো মতেই সমর্থন করতে পারেন নি।"—মনোজিৎ বসুর "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" প্রবন্ধ।

অথচ এই বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতির পরিণাম সম্পর্কে তিনি যে কত সতর্ক—তার প্রমাণ রয়ে গেছে স্যাড্‌লার কমিশনে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমতে: "Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture; a cost as regards respect for self & reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life." ঊনবিংশ শতাব্দীর মনস্বীগণের আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম এবং ইউরোপীয় মর্ত্যজীবন প্রেম এবং কর্মোদ্যম—তাঁর মধ্যে দেখেছি এই সবের সমন্বয়। সমন্বয় মানে আত্মবিক্রয় নয়—পরানুকরণ নয়—পরন্তু আত্মধর্মে স্থির হয়ে—স্বাধিকারী হয়ে তার পর গ্রহণ-বর্জনের বিচিত্র ধারায় সুন্দর এবং সাত্বিক জীবনাদর্শের অনুসন্ধান—এই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সাধনা। তিনি একাধারে centripetal এবং centrifugal force এর আশ্চর্য সমন্বিত রূপ। যেখানে যা কিছু সুন্দর, মহান, জীবনানুকূল, তিনি তা দুই হাতে জাতির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সব সময়েই আত্মভূমিতে স্থির অটল হয়ে দাঁড়িয়ে। Thesis, Antithesis & তার পরে আসে Synthesis. —। এই Synthesis বা সমন্বিত জীবন স্বরূপের সাধক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাই তাঁর চিন্তায়, বোধে, বোধিতে, কর্মে, আচরণে, বাক্যে ও চর্যায়, চরিত্রে কোথাও বিরোধ ছিল না। এবং এ কারণেই তাঁর দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমে কোনো বিরোধ নেই; ব্যক্তি জীবন এবং সমষ্টি জীবনের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। অবশ্য এই Synthesis অর্জনের জন্য তাঁকে তপস্যা করতে হয়েছিল,—ত্যাগ করতে হয়েছিল অনেক। একজন সমালোচকের ভাষায় "তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মন্থন সমুত্থ হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া; তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়াছেন।"

—অবশ্য একথাও ঠিক তাঁর এই সমন্বিত জীবনাদর্শ-সন্ধান এত সহজ হয়েছিল—কারণ, আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি ছিল তাঁর একটি স্থির প্রত্যয়ী ভালোবাসা। যুগপৎ আবেগ এবং যুক্তিনিষ্ঠার কষ্টিপাথরে যে ভালোবাসা ধ্রুব বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল তাঁর মনের মর্মমূলে। তাঁর দেশাত্মবোধের উল্লেখ করে আর একজন সমালোচক বলেছেন "তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাঁর শিক্ষা বিদেশী। দীক্ষা স্বদেশী।" এবং এ সঙ্গে আমরা বলি তাঁর এই খাঁটি বাঙ্গালীত্বের সঙ্গে—খাঁটি মানবত্বের কোনো বিরোধ ছিল না। আর বিরোধ ছিল না বলেই তিনি খাঁটি বাঙালী হয়েও খাঁটি মানুষ হিসেবে মহান বিশ্বজীবনের অংশভাক হতে পেরেছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালোবাসা—এ তো কোনো স্থান কাল পাত্রের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তো একদিকে "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার" মত রচনায় বাংলার মাটি, বাংলার বায়ু, বাংলার জল, বাংলার ভাইবোনেদের প্রতি একান্ত গভীর, অনন্ত ভালোবাসা উচ্চারণ করেছেন— ; রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধনের সহযোগী হয়ে অরন্ধনের প্রত্যয়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, আবার অন্যদিকে স্যাডলার কমিশনের সভ্যপদ গ্রহণ করে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দান করেছেন।

—কোনো এক সমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে দশটি গুণের আবিষ্কার করে এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেছেন। দশটি সামান্য লক্ষণ হল "(১) বিষয়বৈচিত্র্য (২) সরলতা ও প্রাঞ্জলতা (৩) চিন্তাধারার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা (৪) যুক্তিনিষ্ঠা (৫) কৌতুকরসময়তা (৬) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক প্রত্যয়ের সমন্বয় চিন্তা (৭) দৃষ্টির সামগ্রিকতা (৮) জাগতিক সত্যের অতীত ভাবলোকের দ্যোতনা (৯) জীবন সত্য ও জীবনের সার্থকতার আবিষ্কার প্রেরণা (১০) জ্ঞানবিত্তার অপেক্ষা জ্ঞান-পিপাসু চিত্তের উৎকণ্ঠামূলক অভিব্যক্তি। তাছাড়াও মননশীলতা ও সূক্ষ্ম 'বিশ্লেষণধর্মিতা তাঁহার সকল প্রবন্ধে তো ছিলই।"

আগেই বলেছি এ ধরণের সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। এবং যেহেতু রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রবন্ধকার—তাঁকে নিয়ে এ ধরণের তত্ত্বমূলক এবং তথ্যাশ্রয়ী আলোচনা একান্তই অপরিহার্য। তবু পুনরুক্তি হলেও সেই একই কথা এ প্রসঙ্গেও না বলে পারছি না। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিমানসের সন্ধান পেলে তাঁর প্রবন্ধের এ সব গুণগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে—জীবনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই এ সমস্ত জাত। এই জীবনের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর হৃদয়ে এনেছিল দেশপ্রেম, উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁকে বিচিত্র কর্মোদ্যমে—মুখর করেছিল তাঁর লেখনীকে। তাঁর রচনার উপরোক্ত গুণগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা না করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়—এ সমস্তই সেই একই উৎসে জাত। শুধু মাত্র তাঁর রচনায় নয়, তাঁর কর্মে, মর্মে, বাক্যে আচরণে, তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধে, তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, চিন্তায়, ধ্যানে, সাধনায়, সর্বত্রই জীবনের প্রতি একটি গভীর ভালোবাসা আশ্চর্যভাবে উচ্চারিত। তাঁর চরিত্রের একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সংকল্প, দৃঢ়তা সবই এই জীবনের প্রতি ভালোবাসার গোমুখী থেকে উৎসারিত।

রামেন্দ্র রচনাবলী পড়তে গেলে—যে কোনো অসতর্ক পাঠকেরও সর্বপ্রথমই মনে হবে সর্বত্রই তাঁর মহান ব্যক্তিত্বটি যেন ঝলমল করছে। একটি ব্যক্তিচিত্তের স্পন্দন, একটি আবেগী, যন্ত্রণাবিদ্ধ অথচ যুক্তিনিষ্ঠ ও বিবেকবান হৃদয়ের দ্রুত নিঃশ্বাস যেন সুস্পষ্ট অনুভূত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আর এক মহা মনীষীর নাম স্বভাবতঃই মনে পড়ে। তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। যে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে তিনি বিধবা বিবাহ প্রথা প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন—সেই একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর 'বোধোদয়' রচনা, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' অনুবাদ, 'ব্যাকরণকৌমুদীর' জন্ম সূচনা, দেশের শিক্ষা বিস্তারে আত্ম-

নিয়োগ এবং জীবনের প্রতিটি কর্মানুষ্ঠান। দেশ ও জাতির প্রতি একটি প্রগাঢ় অনুভব—একটি সুগভীর মমত্ববোধই প্রেরণারূপে তাঁর জীবনের সর্ব কার্যে ক্রিয়াশীল ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনেও তাই। কেবলমাত্র প্রবন্ধ রচনার জন্যই তাঁর প্রবন্ধ রচনা নয়। অথবা একালের কীর্তিলোলুপ যশের কাঙাল, অর্থের ভিখারী বাঙালী সাহিত্যিকদের মত সস্তার বাজীমাৎ করার প্রয়াস সেকালের মানুষের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা কেউ সে যুগে অর্থের জন্য লিখতেন না, যশের জন্য লিখতেন না। হয় অপার সৌন্দর্য সৃষ্টি অথবা দেশের ও মনুষ্য জাতির মঙ্গল সাধনের মহোত্তর ব্রত নিয়েই তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। তাই তাঁদের রচনার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। একালের তথাকথিত যশস্বী লেখকদের মত বিদেশী লেখকের রচনা আত্মসাৎ করে আসর জমাবার প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না। কিংবা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিমানও তাঁদের ছিল না। দেশ ও জাতির প্রতি একটি সুমহান মমত্ববোধ এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি একটি পরিব্যাপ্ত প্রীতিই তাঁদের আদর্শ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়ও একই সঙ্গে বাঙালী ও বাংলা দেশের প্রতি মমত্ববোধ এবং বিশ্বপ্রীতি পাশাপাশি প্রবাহিত। এবং এই দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রীতির উৎস সন্ধানেই রামেন্দ্রসুন্দরের যথার্থ মূল্যায়ন।

রামেন্দ্রসুন্দর একদিন বাঙালীর ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্মে, চরিত্রে, জীবনচর্যায়, সাহিত্য-রচনায়—দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা নিবেদন করে গেছেন। তাঁর রচনাবলী পাঠ করে আমরাও যদি আমাদের মধ্যে জীবনের প্রতি ভালোবাসার উদ্বোধন করতে পারি তাহলেই তাঁর শতবার্ষিকী হবে সার্থক। বাঙালীর ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে কালের নিয়মে আজ তিনি ইতিহাস হয়ে গেছেন। আমরা যেন ইতিহাস থেকে উদ্ধার করে আমাদের ব্যক্তি ও জনজীবনের পৃষ্ঠায় নিয়ে আসতে পারি তাঁর মহান জীবনবোধ। তিনি নিজে বলে গেছেন "আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।" আজকে তাঁর স্মরণোৎসবে তাঁকে কেন্দ্র করে আমরা যেন আমাদের অতীতের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার প্রেরণা পাই। তাঁর উদার স্বাজাত্যাভিমানের কণা মাত্র লাভ করি।

—রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।" আজ জাতীয় জীবনের সর্বত্র অন্ধকার এবং অসুন্দরের রাজত্ব। এর মাঝখানে আমরা যেন এই চির সুন্দরের সাধক—রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করে—তাঁর সুন্দর রচনা পাঠ করে জীবনে সুন্দর হবার দীক্ষা গ্রহণ করি। "এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার সাধন হয় তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।" —এ উক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের। আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা তাঁর সাহিত্যের পঠন পাঠন দ্বারা যেন তাঁর সেই সুমহান জীবনবোধ আমাদের জীবনে অর্জন করতে পারি। এবং তারই জন্য প্রবন্ধের উপসংহারে সংযোজিত হল রামেন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী। এবং প্রতিটি বইয়ের শেষে যুক্ত হল জাতীয় গ্রন্থাগারের ডাক নম্বর; যাতে সকল পাঠক সহজেই মনোমত বইটি পেতে পারেন জাতীয় গ্রন্থাগারে।

রামেন্দ্রসুন্দর গ্রন্থপঞ্জী

জন্ম: ১২৭১, ৫ই ভাদ্র: ইংরেজী ১৮৬৪, ২০শে আগষ্ট।
মৃত্যু: ১৩২৬, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ: ইংরেজী ১৯১৯, ৬ই জুন।

ক : রামেন্দ্র রচনাবলী :

অভিভাষণ। সপ্তম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির ভাষণ। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পরিচালক সমিতি। ২৫ পৃ। ১৩২০
182. Mc. 914. 13

কর্মকথা। কলকাতা। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি। ৬, ২১২ পৃ। ১৩২০। [ধর্ম, নীতি, দর্শন বিষয়ক নিবন্ধাবলী। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—এই বাক্যকে ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি রচিত।"

ঐ। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। অনুকূল চন্দ্র ঘোষ। ৬, ২১২ পৃ। ১৩২৭।
182. Mc. 913. 5

চরিতকথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ৮ জন মনীষীর জীবন চরিত। কলকাতা। গোপাল চন্দ্র নিয়োগী। ৪, ১০৩ পৃ। ১৩২০। [সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।]
182. Cc. 91.. 7

জগৎ-কথা। ৩৮৯ পৃ। ১৩২৬। ["১৭টি প্রবন্ধের সমষ্টি। এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।" মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।]

জিজ্ঞাসা। বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত দার্শনিক প্রবন্ধাবলী। ৩২৮ পৃ। ১৩১০।

নানাকথা। ২৪৪ পৃ। ১৩৩১। [নানা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।]

প্রকৃতি। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সংকলন। কলকাতা কিশোরী লাল চট্টোপাধ্যায়। ৮, ১৬৭পৃ। ১৩০৩। [প্রবন্ধগুলি নবজীবন, সাধনা, সাহিত্য, দাসী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত।]
182. Kc. 896. 1

ঐ। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। এস. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং। ৮, ১৮৮ পৃ। ১৯০৯।
182. Kd. 909. 1

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। কলকাতা। গ্রন্থকার। ২, ১২, পৃ। ১৩১৩। [বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষ্যে জাতীয় জাগরণকে উজ্জীবিত করার জন্য রচিত। "রবীন্দ্রনাথের রাখী বন্ধন। রামেন্দ্রসুন্দরের অরন্ধন পরিকল্পনা। তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রী জাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরুষ জাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিনী স্ত্রী জাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" রচনা করিয়াছিলেন।" বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।]
182. Jc. 906. 15

বিচিত্র জগৎ। কলকাতা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ৪৫৩ পৃ। ১৯২০। [বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।]
182. Kd. 920. 2

বিচিত্র প্রসঙ্গ। ২২৪ পৃ। ১৩২১। [১ম ও ২য় পর্য্যায়।

মায়াপুরী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর উপক্রমণিকা। কলকাতা। রামকমল সিংহ। ৩৯ পৃ। ১৩১৭। [পরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৩২। জিজ্ঞাসার ২য় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত]
182. cd.. 910. 9 (২)

যজ্ঞকথা। কলকাতা। অনুকূলচন্দ্র ঘোষ। ৪,১৮৪ পৃ। ১৩২৭। [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

182 Jc. 920. 29

রচনা সংগ্রহ। বিভিন্ন বিষয়কপ্রবন্ধাবলির সংগ্রহ। কলকাতা। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী। ১১২ পৃ। ১৩২৯। 182. Mc. 922. 10

রামেন্দ্র রচনাবলী। ১-৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৪৯-৫১। R. B 891.41/T 874r. (1-6)

শব্দ কথা। ২৪৭ পৃ; ১৩২৪। [বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী।] 182. Pc 917. 13

খ : রামেন্দ্র সুন্দর কৃত অনুবাদ ও সম্পাদনা :

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এর বঙ্গানুবাদ। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ৮, ৭৫৪, ২ পৃ। ১৩১৮। [সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৩৪] 182. Jc. 911. 5.

বংশীবদন শর্মার পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা : ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত—গ্রন্থের সম্পাদনা এবং বাংলা অনুবাদ রচনা। মুর্শিদাবাদ (জেমো)। জেমো রাজবাটী। ২, ৮৮ পৃ। ১৩০৮। [একটি পৃহস্থ বংশের ইতিবৃত্ত] 182. Cc 901. 4

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সম্পাদনা (১৩১১-১৩১৮)। 182. Qb. 894. 2-41.

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাধ্যক্ষ : (১৩০৬-১৩১০।) এবং (১৩১৪-১৩২৫।)

গ : স্কুল পাঠ্য পুস্তকাবলী :

A Geographical Reader. Pp. 46. 190?.

Aids to Natural Philosopby. Pp. 123. 1891.

পদার্থবিদ্যা। সচিত্র। ১৩৯ পৃ। ১৮৯৩।

বিজ্ঞান কথা। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের জন্য। অন্যান্য সংবাদ জানা নেই।

বিজ্ঞান পাঠ। ১ম ও ২য় ভাগ। ১৪০, ৮ পৃ। ১৩০৯। [গ্রন্থটি ঈশান চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সহযোগিতায় রচিত হয়।]

ভূগোল। ১৭০ পৃ। ১৩০৪।

ঘ : রামেন্দ্রসুন্দর লিখিত বিভিন্ন পুস্তকের ভূমিকাবলী :

অতুলচন্দ্র ঘটকের সাধুচরিত্রে ভূমিকা। কলকাতা। এস. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং। ১০, ৯০ পৃ। ১৯১১। 182. Cc. 911. 3 (1)

কিরণ-চাঁদ দরবেশের মন্দির গ্রন্থের ভূমিকা। ৪র্থ সংস্করণ। বারানসী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ (স্বামী গোবিন্দানন্দ)। ২৫৫ পৃ। ১৩৫৬। 182. Nc. 915. 66 (1)

কিরণবালা দাসীর ব্রতকথার ভূমিকা। ১৩১৯। 182. Jo 91?. 7 (1)

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রতকথার গ্রন্থের ভূমিকা। পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। ৫৪, ২৮৪ পৃ। ১৩৫৪। 182. Jo. 918. 6

চণ্ডীদাস বিরচিত, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা। ১৩১৭। B 891. 441/o 299 Sr

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা। ১৩১৪।

182. Mb 952. 4

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের খুকুমণির ছড়ায় ভূমিকা। ১৩০৬।

যোগেশচন্দ্র সিংহের কালের স্রোতের ভূমিকা। ১৩১৮।

রজনীকান্ত গুপ্তের আর্যকীর্তি গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের জীবনী ও আলোচনা। সংশোধিত ১৫শ সংস্করণ। কলকাতা। মোহিনীকান্ত গুপ্ত। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী। ১৪,২১৮ পৃ। ১৯১৯। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৩০৭) প্রকাশিত।] 182. Mc. 919. 4

রজনীকান্ত গুপ্তের প্রতিভা গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের জীবনী ও আলোচনা। ৯ম সংকরণ। কলকাতা। মোহিনীকান্ত গুপ্ত। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী। ১৪, ১৬২ পৃ। ১৯১৮। 182. Cc. 918. 18

রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা। ৪র্থ সংস্করণ ; ১৩১৮

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া ও গল্পের ভূমিকা। ১৯১৭।

সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুমের ৩য় খণ্ডের ভূমিকা। ১৯১৬।

ঙ : পুস্তকাকারে

অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী : মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনা : [কালানুক্রমে সজ্জিত]

প্রকাশের কাল	পত্রিকার নাম	প্রবন্ধের নাম
১৩০০, ভাদ্র	জন্মভূমি	ফটোগ্রাফি।
১৩০০, পৌষ	সাহিত্য	বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০১, ভাদ্র	সাহিত্য	বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০২, ভাদ্র	মুকুল	আমরা কি খাই।
১৩০২, আশ্বিন	মুকুল	মেরু প্রদেশ।
১৩০২, ফাল্গুন	মুকুল	নিউটনের কীর্তি।
১৩০৩	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা	গৌরীমঙ্গল।
১৩০৫, আশ্বিন	মুকুল	গাছের আহার।
১৩০৬, বৈশাখ	মুকুল	ঊনবিংশ শতাব্দী।
১৩০৬, আষাঢ়	মুকুল	জ্যোতিষের কথা।
১৩০৬	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২য় সংখ্যা	কাশীরামদাসের বংশপরিচয়
১৩০৬	ঐ ৩য় সংখ্যা	'অলঙ্কার শাস্ত্র' প্রবন্ধের আলোচনা।
১৩০৬	ঐ ৪র্থ সংখ্যা	ভৌগলিক পরিভাষা।
১৩০৬	ঐ ৪র্থ সংখ্যা	একখানি প্রাচীন দলিল।
১৩০৭	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা	চম্পক কলিকা।
১৩০৭	ঐ ৩য় সংখ্যা	ভাষাতত্ত্ব।
১৩০৭	ঐ ৪র্থ সংখ্যা	'রাঙ্গামাটি ও কর্ণ সুবর্ণ' প্রবন্ধের আলোচনা।
১৩০৮	ঐ ১ম সংখ্যা	—কাশীরাম দাস।
১৩০৮	ঐ ঐ	আর একখানি প্রাচীন দলিল।

প্রকাশের কাল	পত্রিকার নাম	প্রবন্ধের নাম
১৩০৮, ভাদ্র	সাহিত্য	অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
১৩০৮, আশ্বিন	বঙ্গদর্শন	অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।
১৩০৮, মাঘ, ফাল্গুন,	প্রদীপ	জড় ও চৈতন্য।
১৩১০	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-১ম সংখ্যা	৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩১০, চৈত্র	বঙ্গদর্শন	গণেশ প্রসঙ্গ।
১৩১২, বৈশাখ	ঐ	রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ।
ঐ	ভারতী	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
ঐ	ভাণ্ডার পৃ৩১-৩৮	আজকালকার পত্রিক উদযোগ-গুলির সঙ্গে প্রাকৃতি সাধারণের যোগ-রক্ষার উপায় কি? প্রশ্নের উত্তর
১৩১২, জ্যৈষ্ঠ	ভাণ্ডার	আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখানকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভালো কি মন্দ?— প্রশ্নের উত্তর
ঐ	ভাণ্ডার	প্রশ্ন।

প্রকাশের কাল	পত্রিকার নাম	প্রবন্ধের নাম
১৩১২, অগ্রহায়ণ	বঙ্গদর্শন	স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩১৪	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা	গ্রামদেবতা।
১৩১৪ আশ্বিন	প্রবাসী	ব্যাধি ও প্রতিকার। (আলোচনা)
১৩১৬, চৈত্র	সাহিত্য	রমেশভবন।
১৩১৭, বৈশাখ	প্রবাসী	লোকশিক্ষা।
ঐ আশ্বিন	মানসী	যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী
১৩১৮, মাঘ	বঙ্গদর্শন	অভিনন্দন।
১৩১৯, চৈত্র	মানসী	চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে নিবেদন।
১৩২১, বৈশাখ	মানসী ও সাহিত্য	সভাপতির ভাষণ।
১৩২১, আশ্বিন	মানসী	৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩২৩, বৈশাখ	মানসী	স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী।
ঐ ঐ	ভারতী	অম্লমধুর।
১৩৩৪ বৈশাখ থেকে আশ্বিন, অগ্রাণ থেকে চৈত্র	মানসী ও মর্মবাণী	বেদকথা।
১৩৩৫ বৈশাখ থেকে আষাঢ়	ঐ	ঐ

বি. দ্র.—যে সব পত্র পত্রিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশই জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

চ : রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থপঞ্জী :

অনিলচন্দ্র ঘোষ। বিজ্ঞানে বাঙ্গালী। [৪র্থ নিবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর'। ১৬৮ পৃ থেকে ১৭৮ পৃ দ্রষ্টব্য।] ঢাকা। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ৬, ২০৪, ৫ পৃ। ১৩৩৮।
182. Cc. 931. 43. & 182. Cc. 938. 21.

অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। কলকাতা। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স। ৩৮ পৃ। ১৯২৩।
182. Cc. 923. 11.

আশুতোষ বাজপেয়ী। রামেন্দ্রসুন্দর (জীবন কথা)। কলকাতা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৬, ১২, ৩৮৪ পৃ। ১৩৩০।
182. Cc. 923. 30

ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়। ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর। কলকাতা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৬, ২৫০ পৃ। ১৮৮১ শকাব্দ।
B 928 954 T874 gh

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। কলকাতা। বেঙ্গল বুক কোং। ৪, ২০০, ২৩ পৃ। ১৩২৭। [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সমকালীন বাঙ্গালী সাহিত্যিক মনীষীদের রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে নিবন্ধের সংকলন। পরিশিষ্টে লেখকের **সাহিত্য সম্মিলন** নামক প্রবন্ধটি উৎকলিত।
182. Cc. 920. 11

ঐ। ঐ। ২য় সংস্করণ। ১৯৫৮। B 928/T874 p

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ৬ষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৫৭।
182. Cc. 946. 2 (6)

বি. দ্র. এছাড়া শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন, ভূদেব চৌধুরী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের রচিত **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীও** এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এবং সম্প্রতি প্রকাশিত আরো ২টি গ্রন্থ রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে অবশ্য পাঠ্য :

১। অধীর দে। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা। কলকাতা। সৃষ্টি প্রকাশনী। ৬, ৩৮, ৫০৭ পৃ। ১৩৬৮।
B. 891. 44409/D6318a

২। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান। কলকাতা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৪, ৪২৫ পৃ। ১৯৬০।
B 891. 4409/Bh 470v

বি. দ্র. এছাড়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩৭১ সনে) প্রকাশিত—বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় রামেন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যাগুলিও দ্রষ্টব্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—এই গ্রন্থপঞ্জী প্রনয়ণে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬ষ্ঠ খণ্ড এবং সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র রচনাবলী (১—৬ খণ্ড) বই দুটি থেকে আমি প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি।—সংকলক।

[১৯৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

থেকে সুরু করে বিশ শতকের প্রথম দুটি দশক অবধি বাঙলার জনপ্রিয় বা 'পপুলার সায়েন্সে'র জন্য সর্বপ্রকার ঔৎসুক্যকে নিয়োজিত করে, বৈজ্ঞানিকের নৈরাত্ম্য নিরাসক্তি থেকে দার্শনিকের সংশয়ক্লিষ্ট জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির হোমাগ্নিশিখার উত্তাপে নিজের প্রাণকণিকাগুলি জাগ্রত রেখে, রহস্যদুস্তর বিশ্ববিধানের অনির্নীত আলোকের সন্ধানে তৎপর হয়ে, জাতির সংকট এবং সন্তাপে সামুহিক প্রয়াসের প্রাঙ্গনে বঙ্গলক্ষীর অপরূপ ব্রতকাহিনীর কথকতা করে, জাতীয় ঐতিহ্যের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, জাতীয় চেতনা এবং চিন্তাকে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের" মধ্য দিয়ে বাঙলার প্রান্ত থেকে প্রত্যন্তে বিকীর্ণ করে দেবার স্পন্দিত অভিপ্রায়ে আমৃত্যু যিনি দৃঢ়ব্রত, বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পরিচয়টিই তাঁর চিরন্তন পরিচয়। একদিকে কর্মের এই প্রসারিত পরিচয় অন্যদিকে মনিষৎসুর সচিন্ত বিবরণ, দুই মিলিয়ে সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর। এ ছাড়া বাঙলা সাহিত্যের পুরাতনী কথার আগ্রহী অবধায়ক, অন্যদিকে তীক্ষ্ণ স্বকালমনস্ক বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যচিন্তা-প্রসূত নানা প্রবন্ধ এবং পরিচায়িকার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টির প্রমূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই সামগ্রিক পরিচয়টির বিস্ময়করতা লক্ষ্য করে সমালোচক তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিতুলিত করেছেন।[২]

ছাত্রজীবনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক 'মহাশক্তি' নামক প্রবন্ধ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। এবং এরপর 'নবজীবন,' 'সাহিত্য' 'সাধনা' 'দাসী' এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলিত করে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র প্রকাশ। কেলিয়া কেরী থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন সম্ভব হলেও বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর বিমুখতা সর্বজনবিদিত। সে সম্পর্কে অবহিত থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন :

> বাঙলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা। সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না। ৩

কিন্তু বিজ্ঞানের মত তত্ত্বনির্ভর তথ্যপঞ্জীকেও যে কেমন অনায়াসে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করা যেতে পারে তার প্রমাণ 'প্রকৃতি' গ্রন্থের নানা লেখা। 'প্রাচীন জ্যোতিষ' কিম্বা 'আর্যজাতির নৃতাত্ত্বিক বিবরণ' কিম্বা 'ক্লিফোর্ডের কীট' নামক ব্যাসিলাস প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'পৃথিবীর বয়স' আকাশতরঙ্গ পর্যন্ত মূলতঃ বৈজ্ঞানিক অনুচিন্তন,—কিন্তু 'প্রকৃতির মূর্তি' কিম্বা 'জ্ঞানের সীমানায়' দার্শনিক চিন্তায় নিবিষ্ট অন্য এক রামেন্দ্রসুন্দরকেও আমরা এখানে দেখি। যুগপৎ বিজ্ঞান এবং দর্শন তাঁর চিন্তার আলম্বন, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি তাঁর অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর। একজন আধুনিক কবির কবিতা মনে পড়ছে, 'ওরা কেউ সত্য বলে, কেউবা সুন্দর করে বলে, সত্য ও সুন্দর ওরা একসঙ্গে দেখাতে পারে না।'[৪] রামেন্দ্রসুন্দর সেই বিরল প্রতিভার অধিকারী যিনি যুগপৎ সত্য এবং সুন্দরকে আমাদের

১, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিজ্ঞানের গবেষকও। কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রায় সর্বত্রচারী ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মচিন্তা, ধর্ম অনুষ্ঠান, লোকবৃত্ত ইতিহাস, রাজনীতি—সব বিষয়ে তাঁর ছিল জাগ্রত অনুরাগ এবং ব্যাপক অধ্যয়ন। এ দিকে সে সময়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সমানধর্মা কেউ ছিল না।

[বাংলা প্রবন্ধ ১৯০৮-২৫ : ডক্টর সুকুমার সেন
দেশ সাহিত্য সংখ্যা : ১৩৬৬]

৩, ভূমিকা : প্রকৃতি।

৪, শাদা মেঘ দাবি করে : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : 'যৌবনবাউল'

সাধনে দেখাতে পারেন। তিনি একই সঙ্গে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বিষয়ে 'বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিৎ পণ্ডিত লাপ্লাসের' মত এবং তদনুসারী 'দার্শনিক ক্যান্টের'ও কথা উল্লেখ করেন; কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রবন্ধেই দর্পণের স্বচ্ছতা যেখানে আমাদের অদীক্ষিত চিত্তও অত্যন্ত অনায়াসে জিজ্ঞাসার চরিতার্থতা অর্জন করে। আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে অত্যন্ত পরিচিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ এবং অনুষঙ্গের সহায়তায় তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপস্থিত করেন। এবং সর্বোপরি তাঁর আশ্চর্য পরিহাস-বিজড়িত ভঙ্গি, যা নিতান্ত অননুকরণীয়। উদাহরণ সর্বত্র পরিকীর্ণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ দু একটি উদ্ধার করা যেতে পারে:

[১] "জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেননা জননী ভূমিষ্ঠ (!) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিলনা, সেই জন্য জন্মকাল নির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব।" এবং পৃথিবীর বয়স নির্ণয় প্রসঙ্গে দুটিমতের উল্লেখ করে বলছেন:

"একদল বলেন মাতাঠাকুরানীর বয়সে গাছপাথর নাই। আর একদল বলে জননীর জন্মগ্রহণ সে ত কালিকার কথা। প্রথম দল চর্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই ত সেদিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা যাইতেছে।" [৫]

এ প্রসঙ্গে জননী ধরিত্রীর ভূমিষ্ঠ হবার প্রাসঙ্গিক কৌতুক, কিম্বা উভয়মতাবলম্বীদের মতাদর্শের সকৌতুক উপস্থাপনা তাঁর ওই রসাত্মক বাক্য স্বজনপ্রণেতা মানসেরই পরিচয় বহন করে। অন্যত্র তাঁর অত্যন্ত সহজ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ বোঝানোর প্রসঙ্গটির আকর্ষণীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে।

[২] স্কুলের ছুটির পর ছেলের পালকে সারি সারি দাঁড় করাও। ছেলেগুলি সমবয়স্ক বা মাথায় সমান হইলেই ভালো হয়। প্রত্যেককে শিখাইয়া দাও, সে একটিবার স্বস্থানে লাফ দিবে, ও তৎপূর্বে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সহচরকে একটি চিমটি দিবে। সহচর চিমটি খাইয়া স্বয়ং লাফ দিবেন ও তৎপূর্বে পরবর্তী সহচরকে একটি চিমটি দিবেন। এইরূপে প্রত্যেকেই আপনার বামপার্শ্বের বন্ধুর চিমটির প্ররোচনায় একটিবার উল্লম্ফন দিবার পূর্বে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বের বন্ধুটিকে চিমটি প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ নিয়মে কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রত্যেকে পুনঃপুনঃ লাফ দিবে। মাষ্টার মহাশয় দেখিবেন তাঁহার সম্মুখে ছেলেদের মাথায় তরঙ্গ খেলিতেছে। [৬]

এই নিতান্ত সহজ সরল দৃষ্টান্তটির মধ্য থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বচ্ছ চিত্তদর্পণের প্রতিফলন-জাত নিরাভরণ গদ্যের পরিচয়টি অত্যন্ত সুলভ। এমন কি তাঁর সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত রচনাবলীর ষষ্ঠখণ্ড-ধৃত বিদ্যালয় পাঠ্য 'মেরুপ্রদেশ', 'নিউটনের কীর্তি', 'ভূমিকম্প', 'চাঁদের কথা', 'উনবিংশ শতাব্দী', 'গাছের আহার', 'ধূলি' প্রভৃতি রচনায়ও এই সহিষ্ণু সরস প্রসন্ন হৃদয়ের সাক্ষাৎ মেলে। দুষ্প্রধর্ষ পাণ্ডিত্য নয় 'সহজ সুরে গভীর কথা,' বলার আনন্দিত অভিপ্রায় তাঁর অন্যসমস্ত রচনার মতো বিজ্ঞানভিত্তিক রচনারও বৈশিষ্ট। জিজ্ঞাসার সুপরিচিত 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মাধ্যমে নিউটনের 'অভিকর্ষবাদ'কে কেন্দ্র করে তাঁর জগদ্ব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলাবিধানের প্রসঙ্গটিও এই অভিপ্রায়েরই প্রমানবহ। তাঁর এই অকৌতুক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অন্যতর প্রমাণ তাঁর জিজ্ঞাসার 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

ভূত শব্দ সর্বদাই এক অর্থে প্রযুক্ত হইবে এমন কি কথা আছে? একরকম ভূত আছে যাহা অতি ভয়ঙ্কর, তাহার

৫: পৃথিবীর বয়স: প্রকৃতি
৬: আলোকতরঙ্গ: প্রকৃতি

> নাম লইতে গা ছমছম করে; স্পিরিচুয়ালিষ্ট ব্যতীত অন্যে যাহার ছায়া মাড়াইতে সাহস করে না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পাঁচ নয়, আশীও নয়, অনেক বেশি।"[৭]

বিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর সর্বত্রই এই প্রজ্ঞা এবং কৌতুকের স্বচ্ছন্দ পরিণয়ে দুরূহের সহজ শিল্পরূপ ফুটিয়েছেন অন্যান্য প্রবন্ধের মত তার বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও। আর এই বিশ্ব-বিদ্যাতীর্থঙ্করের সহজের শিল্পরূপ দেখে শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাই তাঁকে আচার্য হাক্সলীর তুল্য কীর্তিভাস্বর বিজ্ঞানী প্রাবন্ধিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮]

কিন্তু বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। 'জ্ঞানের সীমানায়' দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মূর্তি দেখে দর্শনের রহস্যদুর্গম জগতে প্রবেশ করেছেন তিনি। হাতে জাগ্রত-বুদ্ধির দীপালোক, তাই নিয়ে চৈতন্যের সমাবৃত অন্ধকারে দেবতাত্মা ভারতসংস্কৃতির বন্ধদুয়ার খুলতে চেয়েছেন, প্রণয়ণ করলেন "কর্মকথার" জ্ঞানদৃপ্ত রচনাবলী, 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' বিতর্কিত অধ্যায়সমূহ; শুনলেন 'বিচিত্র জগতের' শতস্রোতা প্রাণস্পন্দন, এবং প্রাচীন ভারতের যজ্ঞধ্বনীর পূতাগ্নিশিখারে আপন আকাঙ্ক্ষিত সত্যটিকে উত্তপ্ত করে নিলেন। এ প্রবন্ধ অধিকাংশই দার্শনিক প্রবন্ধ, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম-যুগের মনন সাধনার ছত্রছায়ায় বসে সর্বাত্মক জীবনজিজ্ঞাসার প্রেরণায় এই দার্শনিক প্রবন্ধগুলির স্ফূর্তি। সমালোচক সুন্দর করে বলেছেন কেমন করে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু বঙ্কিম সামগ্রিক মানবমনস্কতার প্রেরণায় সমাজের হিতব্রতী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৯] রামেন্দ্রসুন্দরও মননসাধনার দিক দিয়ে এই দার্শনিক প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমেরই ক্ষেমঙ্কর সাধনার উত্তরযাত্রী। আরম্ভ করেছিলেন তিনি বিজ্ঞান দিয়ে, কিন্তু বিজ্ঞানের সীমান্ত-সরণি অতিক্রম করে তিনি পৌঁছলেন দার্শনের দুর্গম তীর্থব্রজ্যায়। নিম্নতর জ্ঞানের সোপান থেকে পূর্ণসংবদ্ধ জ্ঞানতীর্থে পৌঁছানোর প্রয়াস—রামেন্দ্রসুন্দরেরই অন্যতম প্রধান স্মরণীয় বিজ্ঞানী দার্শনিকের উক্তি স্মরণে রেখে বলা যায়।[১০] এ পথপরিক্রমা তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক-জনও তাঁর রচনায় এই দ্বৈধ প্রবণতা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে ডক্টর শিশির কুমার মৈত্র মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে। তাঁরও মতে ত্রিবেদী মশাই বিজ্ঞানের সোপান বেয়ে দর্শনের রাজ্য প্রবেশ লাভ করেছেন। "যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে।" Aristotle এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics অর্থাৎ যাহা physics এর জ্ঞানলাভের পর Physics-এর মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্মান ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে Nach denken বলে (অর্থাৎ Denken বা বস্তুচিন্তার পর যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সব সময়েই Nachdenken, অর্থাৎ এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ে পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহা দেখিতে পাই।[১০]

তাঁর এই দার্শনিক প্রবন্ধ সেদিনকার যুগজাগৃতির পটভূমিকায়

---

৭. পঞ্চভূত : জিজ্ঞাসা।

৮. সত্যনিষ্ঠায়, কাঠোরতায়, বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে, রচনার সহজতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য হাক্সলীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত : 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' ললিতারঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত।

৯. "Metaphysical ego কে বঙ্কিম Social ego তে পরিণত করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মননসাধনা এই পরিবর্তনের এক চমৎকার সিদ্ধি।" শ্রীভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র [রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী]

১০, Knowledge of the lowest Kind is un-unified Knowledge ; Science is partially unified know-ledge ; Philosophy is completely unified know-ledge. [Will Durant : The story of philosophy : page 356 : Herbert Spencer]

১০. (সাহিত্য : ১৩২৬) সাহিত্য সাধকচরিতমালা ১০-এ উদ্ধৃত।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের প্রথম দিকেই যে গবেষক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের মত আকর্ষণীয় হবে, সাধারণ পাঠকের ক্ষেত্রে তা হয়ত আজকের দিনে তত আকর্ষণীয় মনে নাও হতে পারে। কিন্তু একথা আংশিক সত্য। যিনি সামান্য কিছু পরিশ্রম করে এর ভিতরে প্রবেশ করবেন তিনি অত্যন্ত অনায়াসে দর্শন-চিন্তার ভিতরেও তীক্ষ্ণ সাহিত্যানুশীলিত এক রসগ্রাহী সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধের সেই অংশটি যেখানে দুঃখ এবং সুখ প্রসঙ্গে নানা সাহিত্যপ্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্সপীয়র, টেনিসন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্য-কৃতির সূত্রসংক্ষিপ্ত পরিচায়িকার অবতারণা করেছেন।[১১]
সব মিলিয়ে বলবার এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি তাঁর অননুকরণীয় সাহিত্যপ্রাণতার পরিচয় দেয়।

কেবল দার্শনিক নয় নান্দনিক বিচারেও যে রামেন্দ্রসুন্দর কতখানি পর্যুৎসুক এবং পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর জিজ্ঞাসা গ্রন্থের 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' এবং 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটি এবং আংশিকভাবে নানা কথা গ্রন্থের 'সাহিত্যকথা' প্রবন্ধটি। কাকে বলে সুন্দর? বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে এ প্রসঙ্গে এত নিগূঢ় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সম্ভবতঃ আর হয়নি। দর্শন বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব এই ত্রিপাদভূমির উপর সংস্থাপিত করে তিনি আলোচনা করেছেন 'সুন্দরের' চিত্তনন্দন ভূমিকা। সৌন্দর্য সেই সুন্দর-বস্তুনির্ভর না তা সৌন্দর্য-ভোক্তার অস্তিত্বনির্ভর এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলছেন:

"সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অনেক সময় সৌন্দর্যভোগীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় কেন বোধ হয় সর্বত্র ও সর্বদা সৌন্দর্যভোগী নিজের ব্যবহারের জন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া লয়।"

এবং এই ক্ষমতাকে 'অনুরাগ' আখ্যা দিয়ে তিনি প্রাচীন দার্শনিকদের ব্যবহৃত একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে সৌন্দর্যের এই চিত্তাশ্রয়িতার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

"কাচ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন কিন্তু জবাফুল তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে আপন আভার আভা-যুক্ত করে; সেইরূপ বাহ্য জগৎ সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্বভাবতঃ বর্ণহীন ও রূপবর্জিত; অনুরাগীর চোখে তাহা বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র রূপ প্রকাশ করে।"[১২]

ডারুইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'—নামক মতবাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের Synthetic philosophy এই দুই কেন্দ্রীয় চিন্তা রামেন্দ্রসুন্দরকে বরাবর প্রভাবিত করেছে, এবং নন্দন-তত্ত্বপ্রাসঙ্গিক উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও একদিকে এই তত্ত্ব এবং অন্যদিকে যৌন নির্বাচন প্রভৃতি তত্ত্বের উপস্থাপনা করা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই সেই স্মিত, প্রসন্ন রামেন্দ্রসুন্দরের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেরণায় সম্ভবতঃ কোনওদিনই রামেন্দ্রসুন্দর কলম ধরেননি। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য বিশ্লেষী দৃষ্টির প্রসাদে মহাকাব্যের অন্তঃস্বরূপ [মহাকাব্যের লক্ষণ: নানাকথা] থেকে বিদ্যাসাগরের পর্বতপ্রতিম ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার এই রকম সহৃদয় দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে 'চরিতকথা'র আলেখ্য-দর্পণে বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ কিম্বা তাঁর সাহিত্য-পরিষদ সহকর্মী রজনীকান্ত গুপ্ত থেকে উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমুখ সমস্ত সাহিত্যব্রতী যেমন উদ্ভাসিত হন, তেমনি মোক্ষমূলার, হেল্‌ম্‌হোলৎস প্রমুখ প্রাচীবিদ এবং বিজ্ঞানতন্ত্রীর জীবনসাধনারও প্রতিমূর্তি ফোটে। বিজ্ঞানীর সাহিত্যচিন্তায় কোথাও ভ্রান্তিমাত্রের কোনও পরিচয় নেই, দুএকটি মিতবাক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচ্য ব্যক্তিদের সমগ্র চরিত্র মুহূর্তমধ্যে ধরা পড়ে। যেমন দেখা যায় অনুবীক্ষণের

১১. সুখ না দুঃখ: জিজ্ঞাসা [রামেন্দ্র রচনাবলী ১. পৃঃ ১৩৩]
১২. সাহিত্য কথা: নানা কথা [রামেন্দ্র রচনাবলী ৩. পৃঃ ২৮]

সঙ্গে বৈপরীত্যমূলক তুলনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত সম্পর্কে মন্তব্য :

> বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ।" [চরিতকথা]

কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের মৌন দেশহিতব্রতী-পরিচয় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :—

> বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁহার কোন কাজ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন। [চরিতকথা]

রচনাবলীতে উদ্ধৃত বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকাংশের রচনাশৈলীর মধ্য দিয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের এক উদার সংবেদনশীল রসগ্রাহী মানসের পরিচয় মেলে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধশৈলী সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য হয়তো কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে, তিনি ত্রিবেদী মশাই এর রচনায় 'মহা-কবিত্বের' স্পর্শ দেখেছিলেন[১৩]। কিন্তু তিনি যে কবিত্বের স্পর্শবঞ্চিত ছিলেন না তা তাঁর বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক রচনাবলী থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন :

> [১] কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের মাঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। [মুখবন্ধ : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]

কিম্বা

> [২] প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্তে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া দেয় তুমি বড় নির্বোধ, অথবা তোমার ভবিষ্যতের চিন্তা আদৌ নাই; তোমার চোখের উপর এত বড় সর্বনাশটা ঘটিতেছে; তাহার নিবারণে তোমার আজ পর্য্যন্ত ক্ষমতা জন্মিল না; ধিক্ তোমার জ্ঞানগর্বকে, ধিক্ তোমার বৈজ্ঞানিকতাকে। দীপশিখার এই নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে তীব্র শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। [উত্তাপের অপচয় : জিজ্ঞাসা]

প্রথম জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর কালীপ্রসন্ন ঘোষের আবেগ-উদ্দীপ্ত ভাষাশৈলীকে আদর্শ বলে মেনেছিলেন; কিন্তু উপরের উদাহরণ তাঁর সেই আবেগপ্রীতির স্মারক নয়, এ কবিত্ব তাঁর সহজ ভাষাশৈলীর সঙ্গে বৈপরীত্য-সূত্রে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল; অক্ষয় সরকারের নির্মম পরিমার্জনা সহ্য করেও বরং তা ক্ষীণায়ু ভাবে বেঁচে আছে প্রথম প্রকাশিত 'মহাশক্তি' প্রবন্ধেরই সাহিত্য শব্দার্থশরীর। শব্দ এবং অর্থের নানা সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাকরণের নানা জটিলতা প্রাকৃত-জনের কাছে দুর্বোধ্য এবং ভীতিজনক। কিন্তু রামেন্দ্র-সুন্দরের রসাত্মক দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে ব্যাকরণের আপাতবন্ধুর উচ্চাবচ ভূমিখণ্ড, সাধারণ পাঠকের কাছে মসৃণ রাজবর্ত্মে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'শব্দকথা' পুস্তক-ধৃত 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত' কারক প্রকরণ ইত্যাদি রচনার মধ্যেই তাঁর এই গ্রহিষ্ণু মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আবার বাঙ্‌লা ভাষার ভৌগলিক, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যক, রাসায়নিক বিভিন্ন পরিভাষ-প্রণয়নের মধ্যে তাঁর একটি গঠনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর এই বই-এরই 'ধ্বনিবিচার' নামক আশ্চর্য প্রবন্ধটির কথা। বাঙ্‌লা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সংস্কৃত প্রাকৃত এবং দেশজ

---

১৩. অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য যে দর্শনই হউক বিজ্ঞানই হউক ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন……পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরীই' বল 'বিচিত্র প্রসঙ্গই' বল সবই যেন কবিত্বময়। এ মহাকবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন। [সাহিত্য সাধক চরিতমালা : ৭০]

নানা সম্ভাব্য উৎসসন্ধানে তাঁর এই অপরূপ অভিজ্ঞানটি উত্তরকালের পাঠক-সমাজের পক্ষে এক স্বর্ণিল উত্তরাধিকার। বাল্মীকি কালিদাস থেকে সুরুকরে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণকথার বিস্তৃত জগত থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পলোক সর্বত্র তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির সঞ্চরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমের বাছুরটিকে ম ড ম ড়া য়ি ত করিয়াছিলেন।

২. কবিকঙ্কণ মুহুর্মুহু বজ্রাঘাতের বর্ণনা করিয়াছেন :— ব্যাঙ্-তড়্কা পড়ে বাজ।

৩. যক্ষের বাড়ির পাশের জল থ ই থ ই করিত।

৪. দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে—এখানে দড়বড় শব্দে যেন ঘোড়ারই পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

৫. মহাদেবের "ধ্বক ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।"

৬. মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুকির সহিত 'রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙ্গিত দুঃখসুখ" থামিয়া যায়।[১৪]

বৈয়াকরণিকের বিচারেও যে সরসতার স্পর্শ সঞ্চার অসম্ভব নয়, এ বিষয়ে সম্ভবত: তাঁর দোসর মেলে রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব প্রসঙ্গিত আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথ Comparative Literature বা তুলনামূলক সাহিত্যিকে বিশ্বসাহিত্য' আখ্যা দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, কালিদাসের সৌন্দর্য চিন্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীলতার সহায়তায় ম্যাকবেথ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের তুলনামূলক আলোচনা করে তার বিশ্বসাহিত্য-সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রামেন্দ্রসুন্দরকে "ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার"[১৫] বলে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে "দেশমাতার পূজা"[১৬] করেছেন তিনি, তাই কর্মব্রত এই মানুষটি 'মাতৃমন্দিরের' সোপানবেদীতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পিত মাতৃমূর্তির পদতলে প্রণতি নিবেদন করেছেন। ডিরোজিও যুগের সেই 'শুধু ভাঙা নয়' সেই Iconoclast দের স্বেচ্ছাকৃত পরাণুচীকির্ষা নয়, বর্তমান জাতিসংকটের ছত্রছায়ায় বসে তিনি 'ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম' বৈফল্য দেখে বেদনাহত হয়েছেন, "সামাজিক ব্যাধি এবং তাহার প্রতিকারের" পন্থা চিন্তা করেছেন, হেমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণে "জাতীয় ভাবের" উদ্বোধন প্রয়াসে তাঁর ভেরীর প্রতিধ্বনি শোনার কামনা জানিয়েছেন,[১৭] আর যে জ্ঞানশিক্ষা নিকট থেকে দূরে প্রসারিত তারই প্রেরণায় জেমো-কান্দি গ্রামের 'গ্রাম্যদেবতা'-র বিবরণাবলী সংগ্রহ করেছেন, আর বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় সংকট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে একদিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের' অন্যদিকে বাঙালীকে শুনিয়েছেন তার চিরন্তন ইতিহাসের অপরূপ ব্রতকাহিনী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।" অত্যন্ত আশ্চর্য সুন্দর-এর ভাষাশৈলী একদিকে চলিত ভাষা রীতির স্বচ্ছন্দস্রোতা প্রবাহ অন্যদিকে অসাধারণ এর কথকতার ভঙ্গি। একটু উদ্ধার করলেই আমাদের উক্তি স্পষ্ট হবে।

বন্দে মাতরম্। বাঙ্লা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে

---

১৪ সব ক'টি দৃষ্টান্ত : 'শব্দকথা'-পুস্তকের 'ধ্বনিবিচার' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত।

১৫ ডিরোজিও যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণের' কল্যাণ কামনা, দেশহিতব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও সে যুগের কোনো অসংযম, কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা, তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সংকল্পকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। [সাহিত্য : আশ্বিন : ১৩২৬]

১৬ পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ : ৫ই ভাদ্র : ১৩২১

১৭ "তাঁহার ভেরীর প্রতিধ্বনি যেন থামিয়া না যায়।" ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা ১৩১০

সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ব-বাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করে বেড়াতে লাগলো। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

[বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা]

এর পর ইতিহাসের নানা বিপর্যয়, পরিশেষে ইংরেজ রাজপুরুষের বঙ্গব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা এবং তারপর হিন্দু মুসলমানের জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাখিবন্ধন পারস্পরিক আলিঙ্গন এবং বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতপালনের জন্য সংকল্প গ্রহণে এই পুস্তিকার সমাপ্তি। ডক্টর সুকুমার সেন এর মধ্যে আংশিক-ভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের মরমী কবিসত্তার পরিচয় পেয়েছেন,[১৮] তা যেমন একদিকে সত্যি তেমনি আশ্চর্য্য হতে হয় ইতিহাস-ভূগোলের সত্যের এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপায়ন লক্ষ্য করে। 'বুড়ো আঙ্‌লা'র সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চাপা 'রিদয়ের' চোখে যদি এমন একটা চশমা লাগানো থাক্‌তো যা দিয়ে ভূগোলের সত্যের সঙ্গে ইতিহাসের অনিবার্য ধারাক্রমটিকেও জানতে পারতো তাহলে সে এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায়' ব্রতকথার বাংলা দেশের ছবির কথা বলতো। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কথকতা এবং অবনীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিকে যেন একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় এই অধুনা অনাদৃত পুস্তিকাটির মধ্যে।

মানুষের মধ্যে একদল মানুষ থাকেন যাঁদের জীবন তাঁদের সমগ্র বাণী না হলেও আংশিকভাবে অন্ততঃ তাঁদের বাণীবাহ ত বটেই। কর্মী রামেন্দ্রসুন্দর এবং লেখক রামেন্দ্রসুন্দর এর অনেকটা মিলিয়ে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক সত্তার প্রকাশ: তাই নিজের সর্ববিধ শক্তির মূল্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাহিত্য পরিষদের 'সারথ্য' গ্রহণ, এবং রজনীকান্ত গুপ্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সেদিনের কর্মব্রত সাহিত্যব্রতী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সমবেত সান্নিধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' নামক জাতীয় মৈত্রীবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তয়িতার ভূমিকা গ্রহণ করে বাঙলা সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং সম্প্রচারণার মহান কর্মীকৃত্য পালন করেছিলেন। আর সাহিত্য-প্রাণ রামেন্দ্রসুন্দর এবং সাহিত্য-কর্মী রামেন্দ্রসুন্দর দুই মিলিয়ে সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয়।

এবার তাঁর সাহিত্যশৈলী প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশাই যদিও তাঁকে 'ব্যাখ্যাতৃশ্রেষ্ঠ' নামে অভিহিত করেছেন তবুও তিনি পাঠকমনে সঞ্চারিত করবার মানসে তাঁর পুনরুক্তি প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন।[১৯] এ পুনরুক্তিকে তিনিও পুরোপুরি ত্রুটি বলেন, এবং আমাদের মতে এ কোনওমতেই ত্রুটি নয়। কেননা অদীক্ষিত পাঠকচিত্তে পুনঃপুনঃ সঞ্চারিত না করলে যে তাঁদের মতো 'সিরিয়াস' প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য সহজবোধ্য হবে, সম্ভবতঃ এই ধারণাই তাকে উক্ত প্রবণতায় প্রাণিত করে থাকবে।

তাঁর ভাষার সরল স্বাচ্ছন্দ্য সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। "ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও ওজস্বী। ইহা ছাড়াও এমন একটা গুণ আছে তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। ইহা বোধ হয় বাগভঙ্গির আকস্মিকতা (unexpectedness)। এই বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় রবীন্দ্রনাথের

১৮ : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : চতুর্থ খণ্ড : পৃঃ ২৬

১৯ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : বিশ্বভারতী পত্রিকা : বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪

রীতির ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়।"[২০] বলেছেন ডক্টর সুকুমার সেন। সেকালের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিম্বা সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির বিশ্লেষণেও তাঁর সহজ সারল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] বাস্তবিক সহজের নিরাভরণ শিল্পমূর্তিতে তাঁর সমস্ত রচনাগুলি উদ্ভাসিত। দুরূহের দুর্গম আকর্ষণে সহজের আলোকিত রাজপথ দিয়ে তাঁর সাধনার গতিরেখা বিসর্পিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়েছে, ডক্টর সেন তার ব্যাখ্যা না দিলেও অনুমান হয় সরস কাব্যধর্মিতা এবং নীরেট গদ্যের খট্‌খটে ভঙ্গি, সহজ পরিহাসের সম্মানিত স্বায়ত্তশাসন কিম্বা ঐ পূর্বকথিত unexpectedness এ সব কিছুই হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের মিত্রঋণমাত্র, গূঢ়সঞ্চারী প্রভাব নয়। সুকুমার সেন মশাই অপ্রশংসা না করলেও তাঁর রচনাকে ঈষৎ পল্লবিত আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু দুএকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে এ উক্তিকে তাঁর সমগ্র রচনার সাধারণ চারিত্র্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর রচনার এই নিরাভরণ চরিত্রটিকে লক্ষ্য করে কোনও সমালোচক যোগেশ রায় বিদ্যানিধি এবং রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাশৈলীর উত্তরাধিকার লক্ষ্য করেছেন।[২২] এবং নৈরাত্ম্য দৃষ্টির সাদৃশ্যে এ তিন প্রাবন্ধিকের সাদৃশ্য অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে হয়। মৃদু পরিহাসবিজল্পিত ভঙ্গি এবং জ্ঞানাত্মিকা প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য এ দু-এর মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ ইংরাজীতে যাকে বলে Wisdom in a smiling mood ঠিক তাই।

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি সুন্দর বাক্য-বন্ধের উপস্থাপনা করেছেন। "রামেন্দ্রসুন্দর এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী যার এক কোটিতে আছে যুগন্ধর বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনার স্বর্ণশস্য, আর এক কোটিতে আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ।"[২৩] বাস্তবিক বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিম-মননের সমুন্নত উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকৃত করে এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যের প্রশান্ত ছত্রছায়ায় বাস করে সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের কাছে জ্ঞানাত্মিকা সাহিত্যের এক অপরূপ রত্ন ভাণ্ডার রেখে গেছেন, আমাদের এই অতীত বিস্মৃত ক্লিন্ন বর্তমানে 'কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নেবার 'ভ্রান্তিবিবর্ণ দিনে 'নবীনতার অমৃতরসে চিরসিক্তি হৃদয়' সেই বাক্য এবং হাস্য-সুন্দর ব্যক্তিটি এবং তাঁর রচনাবলীর পুনঃ স্মরণই হবে আমাদের প্রকৃত সাহিত্যিক কৃত্য'।

---

২০ বাঙলা সাহিত্যে গদ্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃঃ ১১৫

২১ 'তিনি যাহা কিছু বলিতেন বা লিখিতেন তাহা তাঁহার অকৃত্রিম হৃদয় হইতে বাহির হইত এবং তাহা সকলই সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিশ্বভারতী পত্রিকা : বর্ষ ২০ : সংখ্যা ৪ এ উদ্ধৃত। তাঁহার সহজ প্রাঞ্জল, সরল ভাষা, তাঁহার বিপুল রচনারীতি বহুকাল বাঙালী লেখকের নিকট লোভনীয় হইয়া থাকিবে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি : সাহিত্য : আশ্বিন ১৩২৬

২২ বাঙলা প্রবন্ধ : ১৯২৬—৫০ : দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪

২৩ সাহিত্য বিচিত্রা : ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় : রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য রচনা।

একটি অনুভব

বিনোদ বেরা

এদিকে প্রখর তাপ কড়া লাল রোদ
রক্তে জলে দাউ দাউ ভয়ংকর সাপের হিংসায়,
উদ্যত ছুরিকা হাতে অজস্র নির্বোধ
হিংস্রক পামর খল স্বর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কেমন উদ্ধার পাবে আত্মা-ভীত মন,
অতিশয় বিষণ্ণতা আক্রমণ করে এক যোগে ;
সমস্ত ভারত ভূমি দারুণ নির্জন
ইতিহাস পুরুষের অকস্মাৎ গম্ভীর বিয়োগে।

(পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিয়োগ মনে রেখে)

মেলা শেষ হ'লে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

মেলা শেষ হ'লো, আজ সারা মাঠে শব্দের শ্মশান—
চিতাভস্ম মেখে রাত সকরুণ একাকীত্বে কাঁদে।
আনন্দ তিন দিন উচ্ছ্বসিত আলোয় অবাধে
মানুষকে দিয়ে গেল অফুরন্ত হাসির সন্ধান।

মেলা শেষ হ'লো, আমি শূন্য হাতে ঘরে ফিরলাম।
মনে পরিচিত আশা—তিন দিন সোনার থালায়
তৃপ্তি পেয়েছি ভেট আহরিত কড়ায় গণ্ডায়।
একটি আকাশ-ঘরে আমি এক সূর্য্য মহীয়ান।

সংসারে অনেক সুখ ; মেলা শেষে রূপসী সময়
শত স্বপ্ন-গাঁথা পথে জীবনের রূপকথা হয়।

কাছের জানালা

জয়ন্ত দত্ত

স্বাতিরা নুতন হলো এ-পাড়ায় এসেছে। কারো সাথে ভাল করে আলাপ পরিচয় হয়নি। স্বাতির বাবা হরেরামবাবু একজন অদ্ভুত ধরণের লোক। মেয়েকে একাএকা ঘরের বাইরে ছাড়েন না। সকালে-বিকেলে ছাদে বা বারান্দায় দাঁড়ানো বারণ। জানালার পর্দা একটুও নড়বার জো নেই। মেয়ে সাত সকালে উঠে কলেজে যাবে, হরেরামবাবু সাথে। কলেজের গেট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসেন। রাস্তায় একটু হাসা, কারো দিকে চোখ ফেরানো একেবারে নিষিদ্ধ। স্বাতির এত ধরাবাঁধা ভাল লাগে না। অন্যসব মেয়েরা কেমন স্বাধীন ভাবে হাসে, গল্প করে। আর স্বাতির সব মেপে মেপে। একটু বাড়তি হবার উপায় নেই। মা কিন্তু এতটা সেকেলে নন। তিনি প্রায়ই বলেন হরেরামবাবুকে – মেয়েকে একটু একলা চলতে শেখাও। পরে যে বিপদে পড়বে।

হরেরামবাবু হাসলেন। কড়া করে পাকানো গোঁফের নিচে; কালো পুরু ঠোঁট বোঝাই হাসি। বললেন—বুঝছ গিন্নি, এটা হলো কলকাতা শহর। মেয়েদের একলা পথ চলা বিপদজনক।

গিন্নি প্রতিবাদ করলেন! বললেন—রাস্তায় বুঝি কোন মেয়ে বেরয় না একাএকা।

'বেরবে না কেন। নিশ্চই বেরয়।' একটু থেমে গিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়ে কি গোল্লায় দিতে চাও!'

'গোল্লায় কেন!'

'বারে, পথে বেরতে শিখলেই সিনেমা-রেস্টুরেন্ট যেতে শিখবে। ছেলেবন্ধু জোটাবে। তারপর একদিন হয়ত একটা অপদার্থ ধরে এনে বলবে—বাবা আমি একে বিয়ে করব।'

স্বাতির মা পানের ঢোকটা গিলে মুখটা পরিষ্কার করে নিলেন। বললেন, 'ভালই'ত মেয়ে যদি নিজেই নিজের লোক খুঁজে নেয়। আর এই ব্যাপারে কি আমরা বাধা দিতে যাব। আজকাল 'ত হামেশাই ঘটছে এ-ব্যাপার।'

হরেরামবাবুর গলার স্বর এবার বেশ অনেকটা উপরে উঠল। 'মা হয়ে তুমি ত বলবেই এইসব কথা। তারচেয়ে এক কাজ কর মেয়েকে রাস্তায় বার কর শোকেসের পুতুলের মত। ভবিষ্যত সম্পর্কে একটুও চিন্তা নেই তোমাদের!'

স্বাতির মাও ছাড়বেন না। তিনিও গলা উপরে তুলে বললেন, 'মেয়ের ভবিষ্যত বুঝি ঘরে বেঁধে রাখা! লোকের সাথে না মিশলে বুদ্ধি বাড়বে কি করে। ও সংসারের জ্ঞানটা পাবে কোথা থেকে।'

এই কথা বলে তিনি গজগজ্ করতে করতে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে গেলেন।

উপরের ঘরে স্বাতি জানলার পর্দা সামান্য একটু ফাঁক করে বসেছিল। একাএকা ভাল লাগে না। জানলার পর্দা যে ফাঁক করে একটু দেখবে বাহিরে রাস্তাটা, তাও বারণ। তবুও মাঝে মাঝে পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে থাকে, দেখে আসে-পাশের বাড়িগুলোকে। বাবা এখন নিচের ঘরে আছেন, উপরে আসার সম্ভাবনা নেই, কাজেই পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে নিশ্চিন্ত হয়ে। সামনের বাড়ির সব চেয়ে কাছের জানলাটা সব সময় খোলা থাকে। পর্দার কোন নাম গন্ধ নেই। স্পষ্ট দেখাযায় ছেলেটা বসে বসে পড়ছে। প্রথম যেদিন স্বাতি এ-পাড়ায় আসে, সেদিন থেকে লক্ষ করছে ছেলেটাকে। কি অভদ্রের মত স্পষ্ট তাকায়। চোখ দুটো কিন্তু বড় সুন্দর। খুব পড়াশুনা করে। টেবিলের উপর মোটামোটা বই

পাতানো। ছেলেটা তাকালো স্বাতির দিকে। স্বাতি মুখটা নামিয়ে নিল। ইস্—বাবার চোখে যদি একদিন পড়ে যায়, তবে আর রক্ষে নেই। নিজেই চিন্তা করে ভয়ে শিউরে উঠে। এক ওই শক্ত চেহারা তার উপর আবার ভরাট গম্ভীর গলা। স্বর শুনলেই রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বেশ্ স্বাস্থ্য ছেলেটার। মনে হয় রোজ ব্যায়াম করে, তা না হলে এমন চেহারা কেউ করতে পারে! রঙটা বেশ ফর্সা। তবে খুব নয়। মাথায় কোঁচকানো কালো চুল, লম্বা করে টেনে আচড়ানো। গায়ে হাত কাটা গেঞ্জি পরেছে। গেঞ্জিটা একেবারে নতুন। বেশ চকচকে ফর্সা লাগছে। চওড়া আছে বুকটা। সরু করে গোঁফ ছেটেছে। কাল ছাঁটছিল কাঁচি দিয়ে, স্বাতি নিজে দেখেছে। এবারে স্বাতি নিজের দিকে তাকায়। 'বেশ্ মানায় এই শাড়িটা পড়লে। সবাই বলে সুন্দর লাগে। সত্যি খুব ফর্সার সাথে কালো রঙ অদ্ভুত ম্যাচ্ করে। গতবার পুজোয় কাকা দিয়েছিল এই শাড়িটা। নিজেই কোন দোকান থেকে পছন্দ করে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্য এনেছি স্বাতি। বেশ্ ভালো লাগবে। কাকার পছন্দের তুলনা হয় না।' এবার পুজোতে ভাবছে স্বাতি ঠিক এমনি একটা শাড়ি চাইবে কাকার কাছে, যাতে স্বাতিকে সুন্দর লাগে। কলেজে প্রথম দিন পরে যেতেই মেয়েরা বেশ নজর দেওয়া চোখে দেখতে সুরু করল।

'বেশ কাপড়। ভাল মানিয়েছে। কত দাম?'

স্বাতি মাথা নেড়ে বলেছে—'আমি জানি না।'

সে কিরে! নিজের শাড়ির দাম জানিস্ না!'

কি আশ্চর্য্য, সে যদি না জানে তবে বলবে কি করে।

ভাবতি বলেছে, 'কোন দোকান থেকে কেনা।'

'তাও জানি না।' স্বাতি সহজ উত্তর দিয়েছে। সত্যি সে ত দোকানটা চেনা আর কাপড়ের প্যাকেটের নামটাও মুখস্থ করার চেষ্টাও করেনি যে মনে থাকবে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবতি বলেছে, কি মেয়েরে তুই! দোকানও চিনিস না।'

'কেমন করে চিনব, আমি'ত সাথে যাইনি।'

'সেকি নিজের শাড়ি কিনতে দোকানেও যাসনি!'

'সবাই'ত হাসবে। বাবাকে ত কেউ চেনো না। কি অসম্ভব কড়া।' একবার স্বাতির বেশ মনে আছে বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিল। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল তারা। পাঞ্জাবী একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছিল। লোকটা বড় বেয়াড়ার মত কাজ করল। কাঁচের ছোট আয়নাটা এমন ভাবে ঘুরিয়ে রেখেছিল যাতে স্বাতিকে দেখা যায় স্পষ্টভাবে। একটু পরেই হরেরামবাবুর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। সেই মাঝ-পথে ট্যাক্সি থামিয়ে পাঞ্জাবীটাকে মারলেন এক চড়।

লোকটা ঠিক এই ধরণের একটা চড় খাওয়ার জন্য তৈরী ছিল না। তাই প্রথমটা একটু থতমত খেয়েছিল। তারপর রুখে দাঁড়িয়ে বলল 'মারলেন কেন?'

'আবার কথা। ফের যদি কথা বাড়াতে চেষ্টা কর, তবে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।'

লোকটা বুঝেছিল। তাই আর কথা বাড়ালো না। ইতিমধ্যে রাস্তার লোকগুলো ভিড় জমিয়ে তুলল। স্বাতি আড়ষ্টভাবে লজ্জায় একপাশে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কানে এলো ভিড়ের ভিতর থেকে দু-একটা মন্তব্য, 'কি হয়েছে মশাই?'

হরেরামবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাকলেন স্বাতিকে, 'এসো।'

স্বাতি বাবার পাশে পাশে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো।

'মনে হয় ভদ্রলোকের মেয়েকে কিছু বলেছে।'

—'হয়ত মেয়েকে কিছু বলেনি, বেয়াড়া কিছু করেছে। আজকাল ট্যাক্সি-ওয়ালাগুলো মহাবদমায়েস্।'

আরো টুকরো-টুকরো কয়েকটা কথা শুনেছিল স্বাতি।

লোকগুলো হয়ত কতকি ভাবছে। মুখরোচক চাটনি করে হয়ত সবাইকে পরিবেশন করবে।

সিনেমায় বড় একটা যায়না স্বাতি। স্কুলে পড়তে ত কোনোদিন যায়নি' এখন কলেজে উঠে মাঝে মাঝে এক আধটা হয়। তাও মা সঙ্গে থাকেন। বান্ধবীদের সাথে একদিন মাত্র সিনেমায় গিয়েছিলো। নীলা এসে খুব করে বলেছিল স্বাতির মাকে। অনুমতি পেল।

স্বাতির মা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরো নীলা, তোমার মেসো-মশাই-র আসার আগে।'

তাই ফিরেছিল তারা। তবুও ব্যাপারটা হরেরামবাবুর কানে উঠেছিল। পাড়ায় চা'এর দোকা'নের তারুখুড়ো বলে দিয়েছিল হরেরামবাবুকে।

বাড়ি এসে গম্ভীরভাবে ডাকলেন স্বাতিকে। বুকটা স্বাতির কেঁপে উঠল। গলা শুকিয়ে গেল বাবার ডাক শুনে।

'কোথায় গিয়েছিলে আজ?'

'সিনেমায়।'

'কে যেতে বলেছিল?'

'মা।'

গম্ভীর গলায় বললেন. 'মাকে ডেকে দাও।' স্বাতি ঢোক গিলে বলল, 'মা পুজোয় বসেছেন।'

'পুজো হয়ে গেলে আমার কাছে আসতে বল।'

ব্যাস্ এই পর্য্যন্ত, তার বেশী আর স্বাতি জানে না। ভয়ে মাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

অনেক কথা ভাবছিল। পুরানো সব কথা এত মনে নাড়াচাড়া দিচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে কখন যে স্বাতি নিজের হাতে পর্দাটা অনেকটা সরিয়ে দিয়েছে, একদম নজরই করে নি। লক্ষ করতেই দেখল সামনে ছেলেটা জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে স্বাতির দিকে। চোখেচোখ পড়তেই চট করে স্বাতি নড়তে পারল না। অসংখ্য লজ্জার সুতো বেঁধেছে, নড়বার উপায় নেই।

কোন রকমে পর্দাটা দ্রুত টেনে দিল। ভেবেছিল ছেলেটা সরে যাবে। একটু ফাঁক দিয়ে দেখল স্বাতি একদম নড়েনি সে, আগের মত দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। তবে কি ছেলেটা পর্দার ভিতর দিয়েও দেখতে পাচ্ছে স্বাতিকে। হাত বাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল। একটু জোর করে বন্ধ করল। ছেলেটা বুঝুক স্বাতি তার জন্য জানলার সামনে দাঁড়ায় না।

পর-পর দু-দিন জানলাটা খুললনা স্বাতি। একদম না। রোজ মনে থাকে না। কাছে আসে, মন ঠেলা মারে জানলা খোলার জন্য, তবুও না। ছেলেটার বড় বাড় বেড়েছিল। ভাবত হয়ত ওর দিকে স্বাতি এমন ভাবে দেখে। ছেলেটা কি আজকাল জানলার সামনে দাঁড়ায়! তা দাঁড়াক না; স্বাতির কি। সন্ধ্যের পর বাবলু মাঠ থেকে ফিরে সোজা এলো দিদির ঘরে। স্বাতি তখন টেবিলের উপর মাথাগুঁজে বসেছিল।

'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

বাবলু একটা চেয়ার টেনেনিয়ে বসল। স্বাতি বলল, 'এমনভাবে জেঁকে বসলি যে বড়।'

'তোর সাথে কথা আছে।'

'আমার সাথে?'

হ্যাঁ। কাউকে বলবি না!'

'না।'

'তোর কথা আজ জিজ্ঞাসা করছিল।'

অবাক হয়ে স্বাতি বলল্—কে?

'অনীশ দা।'

'সে আবার কে?'

'এই সামনের বাড়ির ভদ্রলোক।'

বুকটা স্বাতির খোঁচ মারল। গলার কাছে মনে হলো কি যেন আটকে ধরেছে। 'কি বলেছে?'

বলছিল, 'তোমার দিদির বুঝি অসুখ!'

'আমার অসুখ!'

'হ্যাঁ তোমার। তা' না হলে জানলা আজ কদিন হলো বন্ধ কেন?'

দাঁতে দাঁত চিপে স্বাতি ধারালো হল। 'আমাদের জানলা বন্ধ থাকলে ওর কি এসে যায়।'

বাবলু ঠোঁট উল্টে বলে, 'আমি কি করে বলব। তবে আমায় বলল অসুখ হলেও জানলা খোলা ভাল, ওতে রোদ-হাওয়া ভিতরে আসে, অসুখ সারে।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট চিপে ধরে স্বাতি। বাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে লুকিয়ে জানলাটা খুলল স্বাতি। দেখল কাচের জানলায় পর্দা ঝুলছে।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

পুস্তক পরিচয়

[পত্রালোচনা]

শ্রীবিজয় নাগ

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি জয়শ্রীর ১৩৭১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জাতিভেদ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে কি না জানতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য বক্তব্য অনেকই আছে, তবে কয়েকটি কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম, ছুৎমার্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজী এত কথা বলেছেন যে, সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়ে কোনো বক্তব্য উপস্থিত করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। আপনি যদি স্বামীজীর সমাজদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কাউকে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলেন, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি।

তবে একথা খুব স্পষ্টভাবে বলা যায়, জাতিভেদের ব্যাপারে স্বামীজী মোটেই 'দ্বিধাগ্রস্ত বা আপোষমূলক' মনোভাব পোষণ করতেন না। ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণাশ্রম প্রথার ভালো এবং মন্দ উভয় রূপই তিনি খুলে দেখিয়েছেন। বর্ণাশ্রম প্রথা কিভাবে কঠিন প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে তা যেমন তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, তেমনি এই স্থিতিশীল সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের উন্নতির বাসনা কি ভাবে খর্ব করেছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বর্ণাশ্রমের সর্বশেষ মন্দ পরিণতি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি কি প্রচণ্ড প্রচার চালিয়েছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে।

স্বামীজী যখন বলেন, "ভারতে জাতিবিভাগ প্রণালীর উদ্দেশ্য সকলকে ব্রাহ্মণ করা" তখন তিনি বর্ণাশ্রমের উচ্চ আদর্শের কথাই বলেছেন। সে আদর্শ যে রক্ষিত হয়নি, সে কথাও স্বামীজী অজস্র জায়গায় বলেছেন। যেমন এখানে একটি বিস্ময়কর, কৌতুকজনক অথচ সত্য তথ্য জানাতে পারি : যে-জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সম্বন্ধে সংস্কারবাদীদের এত আগ্রহ, তাঁরাই তাঁদের কাগজে স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্র, সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসে অধিকার কোথায়, এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন। 'কায়স্থ কুলোদ্ভব' দত্ত নরেন্দ্রনাথ যে, হিন্দু সমাজের আচার্য হয়ে বসেছিলেন, এ জিনিসটা সমসাময়িক জাতিভেদবিরোধী সমাজ সংস্কারকদের ভালো লাগেনি।

আর একটি কথা, জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব জাতিভেদ উচ্ছেদের প্রগতিশীল আন্দোলনকে ব্যাহত করেছে, এটা ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী কথা। বরং উল্টোটাই সত্য—এবং সেই জন্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা কখনো বিবেকানন্দকে ক্ষমা করেনি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাও জাতিভেদের চরম বিরোধী ছিল। যখন সেকালের নামী সমাজ-সংস্কারকেরা মুখে জাতিভেদ প্রভৃতির বিরোধিতা করে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বস্তু আহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে বসে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আহার করেছেন। এই সব কারণে,

কালাপানি পার হওয়ার জন্যও বটে, পাশ্চাত্য থেকে ফিরলে তাঁকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য তথ্য হল—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যিনি পরবর্তীকালে সর্বাধিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, সেই মহাত্মা গান্ধী এ ব্যাপারে স্বামীজীর উত্তরসাধক ছিলেন বলে বিখ্যাত গান্ধীবাদীরা স্বীকার করেন; যেমন আচার্য বিনোবাভাবে, কিংবা শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু।

আমি শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর রচনা থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি। আগ্রহীদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত বিবেকানন্দ-স্মারক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজসংস্কার' নামক চমৎকার প্রবন্ধটি পড়ে নেন। শ্রীযুক্ত বসু লিখেছেন:

"বিবেকানন্দ যথার্থই বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় সমাজে অন্যান্য সমস্যাগুলি অপেক্ষা জাতিপ্রথা একটি প্রধান সমস্যা। ব্রাহ্মণগণের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা ছিল। পরোক্ষভাবে তিনি এই শিক্ষিত, শৃঙ্খলাবিহীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—

'তোমরা কি শোন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণেরা আইনের বাধ্য নহেন, তাঁহারা রাজার শাসনাধীন নহেন, এবং তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করিতে পারিবে না? স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভাবে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছে সে ভাবে ইহা বুঝিও না, প্রকৃত মৌলিক বেদান্তের ভাবে ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেমলাভ ও উভয়ের বিস্তারেই নিযুক্ত,—যেদেশ কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা, সৎস্বভাব, ধর্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা অধ্যুষিত, সে জাতি ও দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর আশ্চর্য কি?... আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে।...... ব্রাহ্মণজাতি ও ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন হওয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক।'

"বিবেকানন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাতি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার সহিত ধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই, যদিও ধর্মীয় আচার-বিধিসমূহ জাতি-বিভাগের মাধ্যমে সুবিধাবাদী শ্রেণীদের সেবার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, 'জাতি ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেই উদ্ভূত এবং ইহা বংশানুক্রমিক একটি ব্যবসায়বৃত্তি।' সুতরাং তিনি আরও বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই জাতিকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাবিয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং ধর্ম ও জাতিকে একত্র জড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহারা অকৃতকার্য হইয়াছিলেন।'

"বিবেকানন্দের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। তাঁহার ভাষায় এইরূপ কথিত হইয়াছে: 'ভারতে সকলকে ব্রাহ্মণ করাই আমার পরিকল্পনা। কারণ ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।' 'এতদিন ব্রাহ্মণগণই ধর্মকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সময়ের প্রতিকূলে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যাও, ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাহাতে এদেশে সকলেই সেই ধর্ম গ্রহণ করে।'

"......সকলকেই এমনকি নিম্নতর চণ্ডালকে পর্যন্ত সেই মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তাহাদিগকে সহজ ভাষায়, জীবন ধারণের উপকারিতা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দান কর।'

'আমরা তাহাই চাই, ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ। প্রত্যেককেই এরূপ শিক্ষা দান কর

যে, তোমার মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন, এবং প্রত্যেকেই তাহার নিজ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হউক।'

'সংকতির স্বীকরণই জাতির সমতা বিধানের একমাত্র উপায়। শিক্ষাই উচ্চশ্রেণীর একমাত্র শক্তি।'

"গান্ধীজী প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে স্বামীজীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের বাস্তব সুপারিশ সমূহ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও সকল জাতিকেই সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াসী ছিলেন। যে শূদ্রগণ কায়িক পরিশ্রমে মানবজাতির সেবা করে তাহাদের উপর তিনি দেবত্বারোপ করিয়াছিলেন।… ইহা লক্ষণীয় যে, নব ভারতের এই দুই মহান সংগঠকের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য ছিল সামান্যই। আর একটি বিষয়ে তাঁহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন প্রথমে সার্বজনীন, পরে ভারতীয়।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল—কিন্তু তার দ্বারা আমাদের বক্তব্যও পরিষ্কার হয়েছে। বিবেকানন্দের জাতিভেদ সম্বন্ধে 'দ্বিধাগ্রস্ত' মত যে প্রগতির গতি রুদ্ধ করেনি, তার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের উল্লেখ করতে পারি। স্বামীজীর সমবয়স্ক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন, * তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর বক্তব্য ও 'হিন্দু সমাজ হইতে এই পচা দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য লোকের সামাজিক সদ্‌বুদ্ধি জাগরিত করিতে আমরণ প্রাণপণ চেষ্টার' সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে প্রশস্তি করেছেন। 'বিশ্ব-বিবেক' গ্রন্থে উদ্ধৃত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে পঠনীয়। আচার্য রায় স্বামীজীর সমসাময়িক এবং সমাজ-সংস্কারে ব্রতী ছিলেন বলেই তাঁর সাক্ষ্যের উল্লেখ করলাম।

পত্রাকারে যে লেখার সুরু করেছিলাম, তাকে আর দীর্ঘ করার বাসনা নেই। একটি কথা, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর 'বিবেকানন্দ চরিতে' 'পুনরুত্থানকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মনেতা হিসাবে' স্বামীজীর বর্ণনা কোথায় করেছেন জানি না। মনে হয় ঐ কথাগুলি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকের বক্তব্য। আমাদের বক্তব্য, স্বামীজী সত্যই ধর্ম নেতা ছিলেন, এবং তাঁর দ্বারা যদি ধর্মের পুনরুত্থান হয়ে থাকে, সেটাই তাঁর সাধনার বস্তু ছিল। বিবেকানন্দ অন্য সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু মূলত ধর্মনেতা। যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে ধর্মসম্পর্কীয় যে-কেউ প্রতিক্রিয়াশীল, যেমন ধর্মে যারা বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে অবিশ্বাসীরা কৃপার পাত্র। এ ঝগড়া পুরনো। অনেক দিন চলেছে, মনে হয় আরও অনেক দিন চলবে। তবে বিবেকানন্দের ধর্মের 'জাতি' কি ছিল, তা অবলম্বন করলে সত্যই কেউ প্রগতিবিরোধী হয় কি না, সে একটা বৃহৎ প্রশ্ন। বর্তমান লেখকের মতে, বিবেকানন্দের ধর্মের মধ্যেই চরম প্রগতিশীলতা আছে,—যে ধর্ম সর্ব মানবের একত্বকে স্বীকার করে, সামাজিক প্রয়োজনে নয়—সত্যের প্রয়োজনে—যে সত্য বলে. মানুষ স্বরূপে অভিন্ন। তবে সেই সত্যে লাফিয়ে ওঠা যায় না, তাকে ক্রমে অর্জন করতে হয় নিজের অধিকারে। তাই বিবেকানন্দ সমসাময়িক কালে সংস্কারকদের দ্বারা প্রচারিত সুদীর্ঘ সংস্কার-তালিকার দিকে তাকিয়ে. পরে মুখ ফিরিয়ে বলেছেন, যে-জনসাধারণ খেতে পায় না, যাদের শিক্ষা নেই, তাদের সংস্কৃত করা যায় না, ইচ্ছামত। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝবার মত শরীরের শক্তি আর মনের আগ্রহ আগে আনতে হবে। স্বামীজীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জনগণের উপর। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে নিঃশেষিত শক্তি মনে করতেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কার আন্দোলনের চেয়ে তিনি

* দুঃখের সঙ্গে আচার্য রায়ের মত মহান মানুষ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ করতে হল; স্বামী বিবেকানন্দ বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সামাজিক ধারণায় আলোচনায় তাঁরা জাতিতে কি ছিলেন, তার উল্লেখের দরকার থাকেনা, একথা বোঝাবার জন্যই আচার্য রায়ের সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছি।

অনেক বেশী মূল্যবান মনে করেছেন সাধারণ জনগণের হিত। তার জন্য তিনি শূদ্রউত্থানের জয়ঘোষণা করে গেছেন। যিনি শূদ্রউত্থান চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, তিনি যে জাতিভেদকে সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করতেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকা সম্ভব কি না জানি না।

স্বামীজীর ধারণা-বিষয়ে এই সব কথা লিখলাম—এর কারণ এই নয় যে, সমালোচকের মন্তব্যে বিচলিত হয়েছি। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বামীজীর 'দ্বিধাগ্রস্ত' মনোভাব সম্বন্ধে বিশেষ দুঃখিত,—তাঁর সেই দুঃখ দূর করার কিছু চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়েছে। নচেৎ যদি কেউ ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে স্বামীজীর মতের সমালোচনা করেন, তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। স্বামীজী তাঁর জীবনকালে এবং পরেও বিরোধী মতকে জাগিয়েছেন সর্বদাই। যাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রখর এবং মতামত নাড়া দেয়, তাঁরা এই রকম নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনই। স্বামীজীর জীবিতকালেই তিনি 'হিন্দু অভ্যুত্থানবাদী,' 'সমাজ সংস্কারক,' 'ছদ্ম রাজনৈতিক প্রচারক,' 'নব্য হিন্দু,' 'ইয়ংবেঙ্গল,' 'রক্ষণশীল পৌরাণিক হিন্দু,' 'ধর্মক্ষেত্রে ভাগ্যসন্ধানী,'—কত কি আখ্যা পেয়েছিলেন। এমন কি আজকের দিনে যেটা বিশেষ প্রগতিশীলের আখ্যা সেই 'সোসিয়ালিস্ট' বলে পর্যন্ত তাঁকে গাল দিয়েছিল আর্যসমাজের মুখপত্র। এর সঙ্গে আরও দু'একটা আখ্যা যোগ করে দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি বিবেকানন্দের মত চরিত্রের সামনে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। তিনি গতিশীল, কি জানি, প্রগতিশীল কি না!

পুনশ্চ: ব্যাপারটা কিন্তু আমার পক্ষে এখানেই শেষ। বিতর্কে অংশ গ্রহণের ইচ্ছে নেই।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে শ্রীবিজয় নাগ 'জাতিভেদ' পুস্তকের সমালোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে মন্তব্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এই পত্রটি লেখেন। 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে আর কোনো আলোচনা প্রকাশিত হবে না।

জঃ সঃ

বিশ্বাবর্ত

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয় সঙ্কট নূতন মোড় নিয়েছে। ফিলিপাইনের আন্তরিক চেষ্টার ফলে মালয়েশিয়া-ফিলিপাইন-ইন্দোনেশিয়া বৈঠক শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলেও, আরম্ভেই সেই বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই তিনরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের কথা ছিল টোকিওতে গত ৩০শে মে তারিখে। সে তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেলো, বৈঠকও বসলো না। তার কারণ, উত্তর বোর্ণিও থেকে ইন্দোনেশিয় গরিলাবাহিনী অপসারণের জন্য মালয়েশিয়া যে পূর্ব-সর্ত দিয়েছিল, ইন্দোনেশিয়া তা মানতে সম্মত হচ্ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার বক্তব্য ছিল, বৈঠকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা গরিলাবাহিনী অপসারণ করবে। তাদের এই প্রস্তাব জাকার্তা থেকে ১লা জুন ঘোষিত হয়।

অতঃপর ১৮ই জুন টোকিওতে এই তিনরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক বসলো। এই পর্যায়ের বৈঠক এই প্রথম বসলো। সেখানে তিনপক্ষের সম্মতিক্রমে মালয়েশিয়-ইন্দোনেশিয় সীমান্তে তিনটি সীমান্ত চৌকি তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। সীমান্তে নিযুক্ত থাইল্যাণ্ডের পর্যবেক্ষক দল, ৩২ জন ইন্দোনেশিয় গরিলাবাহিনীর এই চেকপোষ্ট দিয়ে ১৯শে জুন মালয় ত্যাগের সংবাদ দেবার পর, টোকিওতে ২০শে জুন তিন প্রধানের বৈঠক নিশ্চিত হল। তিন প্রধানের বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল—বর্তমান পরিস্থিতি ও মালয়েশিয়-বিরোধ মীমাংসার সূত্র আলোচনা। এ-সম্পর্কে ফিলিপাইন একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও উত্থাপন করে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব নিয়ে একটি আফ্রো-এশীয় চতুঃশক্তি কমিশন বসবে। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্র তিনজন প্রতিনিধি মনোনীত করবেন এবং এই তিনজন একমত হয়ে চতুর্থজনকে মনোনীত করবেন। এই প্রস্তাবে তিন প্রধানই সম্মত হলেন কিন্তু সেই সঙ্গে টেঙ্কু আবদুর রহমান দাবী জানালেন ইন্দোনেশিয়াকে ইত্যবসরে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গরিলাযুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এই সঙ্গত সর্ত পালনে প্রবলভাবে অস্বীকার করার ফলে, বৈঠক ভেঙ্গে যায়। অবশ্য সকল পক্ষই পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে মীমাংসা-প্রস্তাবটি আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। ফিলিপাইনের সঙ্গে মালয়েশিয়ার সম্পর্ক যে নিকটতর তা বোঝা যায়. এই পরিস্থিতিতেও মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত সাবার উপর ফিলিপাইনের দাবী উত্থাপনে। মালয়েশিয়া এই দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য না করে ভবিষ্যতে বিচার-বিবেচনার জন্য প্রসঙ্গটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখবে।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা গুরুতর। টোকিও বৈঠক ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় গরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ-এর "মালয়েশিয়া চূর্ণ করো" জেহাদ পুরোদামে সুরু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার চোখে মালয়েশিয়ার উৎপত্তির মধ্যে বৃটেনের নয়া-উপনিবেশবাদী 'চক্রান্ত' নিহিত রয়েছে। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী ও সমরসজ্জা অপসারণের ঝুঁকি নিয়ে টেঙ্কু ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত থাকলেও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে জেহাদ বন্ধ করা সহজ হবে না। একসময় ইন্দোনেশিয়ার সীমানার মধ্যে মালয়, ফিলিপাইন ও বৃটিশ বোর্ণিও অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্তির স্বপ্ন সুকর্ণ দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য মালয়,

ফিলিপাইনের আশা ছেড়ে দিলেও. বোর্ণিও অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়ার অধিকার সম্পর্কে সুকর্ণ নিশ্চিতই ছিলেন। ১৯৬১ সালে টেঙ্কু লণ্ডনে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করলে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দোনেশিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মালয়েশিয়া গঠনের পেছনে ইংরাজের সুস্পষ্ট প্রভাব অনস্বীকার্য হলেও সিঙ্গাপুর ও মালয়ের মিলনে চীনাদের সংখ্যাধিক্য থেকে পরিত্রাণের জন্য মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব গ্রহণে টেঙ্কু উৎসাহিত হয়। এদিকে, ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রাম-চাতুর্য দীর্ঘদিন যাবৎই উঁচু পর্যায়ে বাঁধা হয়েছে, সেখান থেকে অবরোহণ ইন্দোনেশিয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। বিপ্লবমুখর ইন্দোনেশীয় জনগণকে তাই জেহাদী মানসিকতায় সিক্ত রাখার তাগিদও রয়েছে। তাছাড়া, ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রবল চাপ রয়েছে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও তার সরকারের ওপর। ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনের বাইরে এশিয়ার বৃহত্তম চীনাসমর্থক কম্যুনিষ্ট দল। এই প্রবল চাপের সামনেও ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষের নিরুত্তাপ অবস্থানের উপায় নাই। তাই মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে 'confrontazi' থেকে উদ্ধার পাওয়া সুকর্ণ-শাসনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অপরপক্ষে, ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অর্থনীতির চাইতে রাষ্ট্রনীতিকে প্রধান উপজীব্য করে ইন্দোনেশিয় নেতৃবৃন্দ আর্থিক সঙ্কট ডেকে এনেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিনী সাহায্যও প্রায়, এই কারণে, বন্ধ হবার উপক্রম।

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় সোভিয়েট রুশ নেতা আনাষ্টাস মাইকোয়ানের সফর, পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছে। মাইকোয়ান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইন্দোনেশিয়-মালয়েশীয় সংঘাতে ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে ইন্দোনেশিয়াকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিপূর্বে পশ্চিম ইরিয়ানের অভিযানের সময় দরাজ হাতে সোভিয়েট সামরিক সাহায্য জাকার্তায় পৌঁচেছিল, এবার হয়তো তারা ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছে দেবে। সোভিয়েট সামরিক সাহায্যের প্রত্যুত্তরে মালয়েশিয়াকে ব্রিটিশসরকার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং এই অঞ্চলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইন্দোনেশিয়াকে সোভিয়েট সমর্থন ও সাহায্য, ফিলিপাইন খুব সুনজরে দেখে নাই। অবশ্য সোভিয়েট-এর এই সমর্থন ও সাহায্য আদৌ নিঃস্বার্থ নয়। কম্যুনিষ্ট চীনের প্রভাবমুক্ত করে ইন্দোনেশিয়াকে স্বপক্ষে আনবার তাগিদও যেমন রয়েছে, তেমনি সোভিয়েট রাশিয়ার দিক থেকে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে আমন্ত্রিত হবার জন্য ইন্দোনেশীয় সমর্থনলাভের চেষ্টাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে, মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া দ্বন্দ্বে ইন্দোনেশিয়ার প্রতি সোভিয়েট রুশের এ সমর্থনের মধ্যে। স্মরণ রাখতে হবে জাকার্তায় আফ্রো এশীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে সোভিয়েট রুশকে আমন্ত্রণে চীনা-বিরোধিতা ইন্দোনেশীয়ার সমর্থন লাভ করেছিল। মাইকোয়ান এবার সফল হয়েছেন। ইন্দোনেশীয়াও সোভিয়েট সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রবলতম রাষ্ট্রের আসন লাভের আশায় দিন গুনবে।

মালয়েশিয়ার জনকরূপে ব্রিটিশকে চিহ্নিত করে, তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতায় আচ্ছন্ন থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়া নীরব, যদিও ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক প্রস্তুতির মাঝখানে বিপদের লালসঙ্কেতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল ফিলিপাইন-মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতায় 'মফিলিন্দো' আঞ্চলিকসংহতি গড়ে উঠলে, এই সংহতির প্রতি এই তিনরাষ্ট্রের আনুগত্য এই অঞ্চলে চীনা প্রভাব খর্ব করবে। একই কারণে, সোভিয়েটও 'মফিলিন্দো'র পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য 'মফিলিন্দো'র শক্তি সঞ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মালয়েশিয়ার ওপর ব্রিটিশ প্রভাবও ক্রমশ ক্ষয় পেতো। সে-ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার 'নয়া-উপনিবেশবাদে'র অভিযোগের কারণ দূর হয়ে যেতো। কিন্তু 'মফিলিন্দো'র

সুযোগ নষ্ট করে সে-সম্ভাবনার রূপায়নও বিলুপ্ত হল। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে এবং পূর্বেই বলেছি সেখানকার অর্থসাহায্য স্তিমিত হয়ে প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

গত ১লা ও ২রা জুন হনলুলুতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্কট-জনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে উচ্চপর্যায়ের মার্কিনী বৈঠক হয়ে গেলো, তারপর মার্কিনী নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত ক্যাবট লজ-এর স্থলবর্তী হয়ে এসেছেন, আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সমরাধিনায়ক জেনারেল টেইলর। লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সংঘাতে উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের সরাসরি যোগে এই অঞ্চলের নিরপেক্ষতা বিপন্ন হয়ে বৃহৎশক্তির ভারসাম্যেও গুরুতর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। লাওসে জারের সমতলভূমির লড়াইতে প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে নিরপেক্ষ ও দক্ষিণপন্থী সেনা-বাহিনীর বিপর্যয়রোধের জন্য তাকে মার্কিণ বিমানের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। লাওসের এই অঞ্চলের দখল দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, উত্তর ভিয়েৎনামের ও চীনাদের সামরিক সাহায্য পৌছে দেওয়া সহজ হবে। ফলে সমগ্র অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং তার পরিণতিতে থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়াকেও কম্যুনিষ্ট চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। এই পরিণতির সম্ভাবনায় পূর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়ার জন্য কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও তার সহায় আমেরিকার উপর বিরূপ হয়েছে এবং কাম্বোডিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘনের জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও আমেরিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাম্বোডিয়ার অভিযোগের উৎসও এইখানে। এই অঞ্চলের নিরপেক্ষ ভূমিকা- লুপ্ত হয়ে কম্যুনিষ্ট চীনের কবলিত হলে, কাম্বোডিয়ার পক্ষে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া যাতে সহজ হয়, সেই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাম্বোডিয়ার বিপন্ন প্রতিবেশীর প্রতি বৈরী সুলভ আচরণ। কিন্তু এই অঞ্চলের নিরপেক্ষতা কি থাকবে? এই প্রশ্নের আশু মীমাংসার উপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে। জেনারেল টেইলরের দক্ষিণ ভিয়েৎনামে রাষ্ট্রদূত নিয়োগে, মার্কিণ সরকারের যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার মনোভাব উচ্চারিত হয়েছে এবং গত ৩১শে মে হনলুলু যাবার পথে সায়গনে ডীন রাস্কের কঠোর প্রতিশ্রুতি "We are serious about South East Asia······All our efforts will be bent on requiring them (Hanoi and Peking) to make that decision·······" নেহাৎ ছেঁদো কথা নয়, পরবর্তী মার্কিনী পদক্ষেপে তাই সপ্রমাণ করেছে। অবশ্য ভিয়েৎনামীদের জনবল ও মনোবল কতটা একাজে সহায়ক হবে তা বলা দুঃসাধ্য। সেক্ষেত্রে ভিয়েৎকং-এর অভিযান নির্মূল করতে প্রচুর পরিমাণ মার্কিনী জনবল ও অস্ত্রবল নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেবে। সে-কাজ সহজ হবে না। কারণ খাস আমেরিকাতেই তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল, ভিয়েৎনাম সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের—সামরিক সমাধানের বিরুদ্ধে—উল্লেখ করে ইত্যবসরে সেই প্রতিক্রিয়ার ভূমিকাও রচনা করেছেন, এবং একই কারণে আমেরিকার বিরাগভাজনও হয়েছেন। অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর দ্রুত ফললাভের জন্য—যদি ইতিমধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হয়—'কিউবা-পদ্ধতি'র পুনরাবৃত্তি করতে পারে, এই ভরসায় যে সরাসরি যুদ্ধের হুমকির সামনে পিকিং ও হ্যানয় হটে গিয়ে মীমাংসায় আসতে বাধ্য হতে পারে।

কিন্তু পিকিং নিষ্ক্রিয় নেই। ফ্রান্সের সমর্থনে কম্যুনিষ্ট চীন লাওস সঙ্কটের সমাধানের জন্য ১৪-রাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলন দাবী করেছে। ১২ই জুলাই-তে বর্মায় অলোচিত দুইদিন সফরের পর চৌ-এন-লাই ও জেনরেল নে-উইন-এর যুক্ত-বিবৃতিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও লাওসের পরিস্থিতির জন্য

উদ্বেগ প্রকাশ করে লাওস-সমস্যা সমাধানের জন্য ১৪-রাষ্ট্রের সম্মেলনের দাবীর সমর্থন জানানো হয়েছে। হয়তো বা উ থান্টের রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব নিয়েও রেঙ্গুনে এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হয়ে থাকবে উ থান্টের আসন্ন রেঙ্গুন সফরের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েটের অনুরোধে জেনেভা চুক্তিতে চীনও স্বাক্ষর করেছিল।

চীনের এই প্রস্তাবের পাশাপাশি নয়া দিল্লীর মত নিরপেক্ষ স্থানে ব্রিটেন, রাশিয়া —জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতিদ্বয় —পোল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ ও কানাডা আন্তর্জাতিক কনেট্রাল কমিশনের সদস্যত্রয়—এবং লাওস সরকারের বাহুত্রয়—নিরপেক্ষবাদী, দক্ষিণপন্থী ও প্যাথেট লাও-এর বৈঠকের জন্য পোল্যাণ্ড প্রস্তাব দিয়েছে। ব্রিটেন ও রাশিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে এবং এই বৈঠকের পর ১৪-রাষ্ট্রের বৈঠকেও তাদের সম্মতি রয়েছে। পোল্যাণ্ড-এর প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রেরও সম্মতি রয়েছে, কিন্তু চীন এই প্রস্তাবের বিরোধী। এই প্রাথমিক বৈঠকের আর একটি অসুবিধাও দূর হয়েছে। প্যাথেট লাও গোড়ায় লাওসের বাইরে কোনো নিরপেক্ষ স্থানে বৈঠকের জন্য সম্মত ছিলো না। এখন তারাও লাওসের বাইরে বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছে। তা ছাড়া এই প্রাথমিক বৈঠকের পর ১৪-রাষ্ট্রের বৈঠক সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে মতভেদ ছিল তাও দূর হয়েছে। লণ্ডনের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব বাটলারও ঘোষণা করেছেন যে পোল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী শীঘ্রই লাওস-সম্পর্কিত আলোচনার পর ১৪-রাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলন বসবে।

লাওস ও ভিয়েৎনাম আগামী দিনের বিপদের লালসঙ্কেত। ১৯৫৪ সালে জেনেভায় এই অঞ্চলের জন্য যে রাজনৈতিক সমাধান নির্ধারিত হয়েছিল, দশবছরেই তার আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারও পূর্বে দশবছর ইন্দো-চীনে একটানা যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধ না রাজনৈতিক সমাধান, এই কঠিন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি আর একটি সঙ্কটের দিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

১০. ৭. ৬৪

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি.এ.

শ্রীগীতা	৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫.০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০
কর্মবাণী	১.২৫
Soul of India Speaks	5.00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২.৫০
মানুষের মত মানুষ	.৬২
শিশু রামায়ণ	.৬২
শিশু মহাভারত	.৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.

বাংলার ঋষি	৩.০০
বাংলার মনীষী	১.২৫
বাংলার বিদুষী	২.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩.০০
রাজর্ষি রামমোহন	১.০০
রবীন্দ্রনাথ	১.০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৭১

সম্পাদকীয়

খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধে সরকার

মুখ্যমন্ত্রীদের জুনমাসের ব্যর্থ-বৈঠকের পর গত ২৭শে জুলাই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধে কয়েকটি প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন: (১) দক্ষিণাঞ্চল খাদ্য এলাকায় ১লা আগষ্ট-এর পূর্বে খাদ্যশস্যের মূল্যক্রম নির্ধারিত হবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে পরবর্তী সময়ে স্থির করা হবে। (২) জানুয়ারী মাস থেকে খাদ্যশস্যের জন্য একটি ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন চালু হবে। দূরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য-শস্যের সরবরাহে এই কর্পোরেশনের মনোপলি থাকবে। (৩) গুড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হল (৪) চিনি শিল্পের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হবে। এই কমিটির প্রথম কাজ হবে আগামী বছর চিনির মূল্যক্রম ও বণ্টন পদ্ধতি নির্ধারণ (৫) সরকার আহার্য তেলের ঘাটতি মেটাবার জন্য ১ লক্ষ টন সোয়া বিন তেল আমদানী করবেন (৬) প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব শ্রী এল্ কে ঝা'র নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি আগামী বছরের জন্য উৎপাদক, পাইকার ও খুচরাবিক্রয়ের খাদ্যশস্যের মূল্যান্তর নির্ধারণ করবেন (৭) দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মসূচীরূপে উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদকের ব্যয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য একটি গবেষক গোষ্ঠি নিযুক্ত হবেন। ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী ন্যূনতম পরিমাণ মজুতের ঊর্ধে মজুত খাদ্যশস্য ঘোষণার জন্য উৎ-পাদক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতার উপর নোটিশজারী করা হবে। একটি বছরের মাঝখানে খাদ্যাঞ্চল লোপ করার কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্মত না হয়ে আগামী বছর এ-বিষয়ে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলিতে আশু সঙ্কটত্রাণের কোনো পথ-নির্দেশ নাই। আগামী দিনে এই প্রস্তাব সমূহের প্রভাব প্রয়োগের দৃঢ়তা উপরই নির্ভর করবে, যে দৃঢ়তা এ-পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর মতে আগামী দুইমাস খুবই সঙ্কটময়। অথচ, এই দুই মাস উত্তরণের কোনো কার্যকরী পন্থা গ্রহণে সরকার অদ্যাবধি ব্যর্থ হয়েছেন। এদিকে মূল্য ও খাদ্যসঙ্কটের দাবানল মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ বাদে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিতের খাদ্যশস্য লুণ্ঠনের সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। এই সঙ্কটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গত ৮ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে মজুত বাজারে না ছাড়লে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতোদিন পর এই হুঁশিয়ারী কেন? মজুতদারেরা যদি প্রধানমন্ত্রীর

হুঁশিয়ারী উপেক্ষা করে, সে ক্ষেত্রেই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ? না, শ্রীনেহেরু যেমন নিষ্ফল আক্রোশে মজুতদার মুনাফাখোরদের নিকটবর্তী ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসী দিতে চাইলেও সতের বছর যাবৎ কালোবাজার আর কালোটাকার নেতৃত্ব দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শ্রীশাস্ত্রীর হুমকীর পরও তারই ক্রোধোক্ত পুনরাবৃত্তি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য দুই সপ্তাহকাল দেশবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করবে। অবশ্য ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্কটত্রাণ, আমেরিকার অতিরিক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এই যা ভরসা। গত ৩০শে জুলাই আমেরিকার চেষ্টার বোলস্ আগামী সাত মাসে ৪০ লক্ষ টন গম ও কয়েক লক্ষ টন চাউল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মার্কিনী খয়রাতের উপর সরকারের নির্ভরশীলতা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগে জড়তা এনে দিয়েছে। এক সঙ্কট উত্তরণের মধ্যে নিহিত গভীরতর সঙ্কট স্থায়ী হতে চলেছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি প্রত্যাসন্ন ?

টংকিন-সংঘাতের ঘটনায় বিশ্বমন, বিশেষ করে এশিয়ার জনমন, চরম উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে,—তবে কি প্রলয়-বহ্নির আমন্ত্রণ নিয়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রত্যাসন্ন ? সাইপ্রাসে বোমাবর্ষণের সঙ্গে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, টংকিন-উপসাগরের সংকট তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েৎনামের সংঘাত আপাতত কম্যুনিষ্ট বনাম গণতন্ত্রী ভিয়েৎনামীদের সংগ্রাম—কিন্তু মূলত এই সংগ্রামের পশ্চাতে রয়েছে দুইটি বিরাট শক্তি,—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। শুধু ভিয়েৎনামই নয়,—গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আজ অগ্নি-গর্ভ,—লাওস ও মালয়েশিয়ায়ও একই বিপদ সংকেত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রে যে শক্তিশালী চীনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে এবং এই অঞ্চলের আর্থিক জীবনে চীনাদের যে বিপুল প্রভাব রয়েছে তার সুযোগ নিয়ে চীন এই অঞ্চলে সম্প্রসারণকামী, পক্ষান্তরে বিরাট যুদ্ধ, এমন কি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ।

উত্তর ভিয়েৎনামের বন্দরে বোমাবর্ষণ করলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশু লক্ষ্য যে যুদ্ধ নয়,—রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আমন্ত্রণ তার প্রমাণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের নৈতিকবল ক্ষুণ্ণ করে এই অঞ্চলের জনসাধারণের মনোবল রক্ষা করতে এবং গৃহ-ফ্রন্টে গোল্ডওয়াটারের নির্বাচনী প্রচারকে কাবু করতে। কিন্তু চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক কূটনীতির আঘাত বিনা সংঘর্ষে মেনে নিয়ে পশ্চাদাপসরণ করবে কিনা,—না এই সুযোগে চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের যুদ্ধবাদী রাজনৈতিক আদর্শকে কার্যকরী করে তুলবার প্রয়াসে অগ্রণী হবে, সে কথা এখনও সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণের কোন সক্রিয় প্রত্যুত্তর চীন না দিলেও উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য পেশ করার সুযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং উত্তর ভিয়েৎনামে চীনের জঙ্গী বিমান প্রেরণে চীনের নতুন আঘাতের সংকেতই বহন করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার নীতি কি হবে,—তা' চীনের নীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করবে। রাশিয়া মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করলেও সুয়েজ বা কিউবা সংকটের ন্যায় উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্যদানের অথবা এই রাষ্ট্রের আক্রমণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিহত করার কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি। চীন 'রক্তের ঋণ পরিশোধে'র যে হুমকি দিয়েছে 'তার কার্যকারিতা বহুলাংশে রাশিয়ার নীতির উপরে নির্ভরশীল। চীন যদি মনে করে যে যুদ্ধের আবর্ত সুরু হয়ে গেলে ঘটনাচক্রে রাশিয়া চীনের পশ্চাতে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হবে তা' হলে চীন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঘাত করবে,—সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

যুদ্ধবাজদের 'ত্রিংকগ্যানীপ' আজ এশিয়াকে ধ্বংসের দাবানলের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটে ভারতের কর্তব্য কি ? যুদ্ধ যাতে না বাধে অথবা সংঘাতের ক্ষেত্র যাতে বিস্তৃত না হয় নিশ্চয়ই ভারত সেদিকে তার নৈতিক বল প্রয়োগ করবে। কিন্তু ভারতের আজ একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ভারতের নৈতিক প্রভাব অত্যন্ত নিম্নগামী। অধিকন্তু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যদি দাবানল জ্বলে ওঠে তা'হলে সেই আগুন ভারতের সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়বার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সংকটে বিপন্ন ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অগ্নি সংকেত থেকে অবিলম্বে এই শিক্ষা নিতে হবে যে যদি এশিয়ায় এই সংঘাত বিস্তৃত সমরানলে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তা হলে ভারতের সমগ্র জাতীয় প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হবে—'আত্মরক্ষা'। এই আত্মরক্ষার নীতিকে সামনে রেখে আভ্যন্তরীণ ও দেশরক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রস্তুতি করাই আজ ভারতের প্রধান জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিকে দিল্লী সরকারের চৈতন্যের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ছাত্র ভর্তির সমস্যা ও শিক্ষা সংকোচ

পশ্চিম-বাংলার শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে এই রাজ্যে সাধারণ কলেজে, মেডিকেল কলেজে বা কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোন সমস্যা নেই,—কারণ, শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত অনুযায়ী যত ছাত্র স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীট-সংখ্যা নাকি তারচেয়ে বেশি। শিক্ষামন্ত্রীর এই বিবৃতি শুধু তথ্যের পরিপন্থী ও অবাস্তব নয়, ভর্তি সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা বাস্তব ঘটনা গোপনের সামিল। বি-এস-সি ক্লাসে, অথবা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং বা পলিটেকনিক্যাল কলেজ বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য দলে দলে ছাত্ররা অসহায়ের মত এক প্রতিষ্ঠানের দরজা থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে ছুটাছুটি করছে। আগে যে নম্বর পেলে ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল কলেজ বা অনার্স ক্লাসে অনায়াসে ভর্তি হতে পারতো, এখন সেই নম্বর পেলে ভর্তি হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। একই মেরিটের সুযোগে অতীতে যারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেয়েছে, আজ সেই মেরিটের সুযোগ লাভে বর্তমান বংশধরেরা বঞ্চিত।

ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল বা বি-এস-সি অনার্সে শুধু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও ভর্তি হওয়া যায় না,—অন্তত সত্তর শতাংশ নম্বর পেলে এরূপ ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার আশা করা যেতে পারে। অথচ এখন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ ষাট শতাংশ নম্বর লাভ, কিন্তু কয়েক বছর আগেও পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করতে সক্ষম হলে সেই ছাত্রের পক্ষে যে কোন উচ্চ শিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত ছিল। জনসংখ্যা ও শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক হারেই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেই অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পায়নি। সেকেণ্ড ডিভিশনে যে সকল ছাত্র পাশ করেছে তাদের উচ্চ শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা সংকোচ করে আজ যোগ্য ছেলেদের ক্যারিয়ার তৈরী করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে ছাত্রেরা মফঃস্বলে না পড়ে কলকাতায় ছুটে আসে বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর কি একথা জানা নেই যে অধিকাংশ মফঃস্বল কলেজে অনার্স নেই এবং অনার্স না থাকলে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। তিনি কি একথাও জানেন না যে মফঃস্বলে ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক ও মেডিক্যাল কলেজ কয়টি আছে ? আত্ম-প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাংক্ষা ছাত্র সমাজের অত্যন্ত স্বাভাবিক ও

সুস্থ লক্ষণ,—তাই তারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দারিদ্রের সঙ্গে চরম সংগ্রাম করে যথার্থ শিক্ষালাভের জন্য কলকাতার দিকে ছুটে আসে।

যাদের অনার্স নেই তাদের পক্ষে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষালাভ করার কোন সুযোগ নেই। অথচ স্পেশ্যাল অনার্স ক্লাসগুলি, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগে, প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বি-এতে প্রাইভেট স্পেশ্যাল অনার্স দেওয়ার সুযোগও আর দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানে অনার্স পেলেও, এমন কি সেকেণ্ড ক্লাসে অনার্সে মোটামুটি ভাল নম্বর পেলেও, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে পাচ্ছে না। উচ্চ শিক্ষা ছাত্রদের কাছে বস্তুতই আজ একই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এমন বহু ছাত্র দেখা গিয়েছে যে ম্যাট্রিক তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে, কিন্তু একটি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য পরবর্তী শিক্ষায় অতি উচ্চস্থান লাভ করে কৃতিমানরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এরূপ ছাত্রদের পক্ষে তো বটেই, মধ্যম মেরিটের ছাত্রদের পক্ষেও, আজ বি-এস সি পড়া বা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা লাভ করা এক অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তীরা যে মেরিটে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেছে বর্তমান বংশধরেরা কি কারণে তার চেয়ে উচ্চতর মেরিটের অধিকারী হয়েও ব্যর্থ জীবনের দুর্ভোগের বোঝা বইবে?

হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না, কলেজে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপকের অভাব ঘটছে—অথচ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। অন্য প্রদেশে যখন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গে এরূপভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খর্ব করা পশ্চিম বাংলা ও বাঙালীর প্রগতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। পশ্চিম বাংলার রাজ্য কর্ণধারদের অদূরদর্শী নীতির জন্য অন্য প্রদেশে যে মানের ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে নিছক ডিগ্রির সার্টিফিকেটের জোরে উচ্চতর পদলাভের সুযোগ পাচ্ছে, তারচেয়ে অনেক উচ্চতর মেরিটের অধিকারী হয়েও বাঙালী ছেলেরা বাংলা সরকারের অদ্ভুত অবাস্তব ও দূরদৃষ্টিহীন নীতির জন্য ব্যর্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। আজ শিক্ষা সংকোচ নয়, যে—'মেরিটে' পূর্বতনরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সেই 'মেরিটে' বর্তমান বংশধরেরাও যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা এক অপরিহার্য কর্তব্য। অবিলম্বে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সীট-সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নাইট সীফ্‌ট চালু করা, মফঃস্বল কলেজে অনার্স ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা, স্পেশ্যাল অনার্সের জন্য নাইট ক্লাস খোলা, মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

শিক্ষা-কমিশন

গত ১৬ই জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডঃ ডি, এন, কোঠারীর নেতৃত্বে একটি ষোল সদস্য-বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এবছর ১লা অক্টোবর কমিশন কাজ আরম্ভ করে ১৯৬৬ সনের ৩১শে মার্চের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে কমিশন অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিল করতে পারবেন। এই কমিশনের সঙ্গে ইংরেজ ও মার্কিনী শিক্ষাবিদগণ সহযোগীরূপে যুক্ত আছেন। কমিশন শিক্ষার জাতীয় গড়ন সম্পর্কে এবং সকল স্তরে এবং সর্ববিষয়ে শিক্ষার সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করবেন। কমিশনের এক্তিয়ার-অন্তর্গত বিষয়বস্তু সর্বত্রসঞ্চারী হবার ফলে কমিশনের সুপারিশে প্রয়োগিক সুনির্দিষ্টতা ও সুস্পষ্টতার পরিবর্তে শিক্ষার আদর্শের ভাসা ভাসা তত্ত্বের ঠাসবুনানী যাতে না থাকে সেজন্য আমরা কমিশনের সভাপতির প্রতি নিবেদন জানাচ্ছি। শিক্ষা সম্বন্ধে বহু কমিশন-কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতা ও

সঙ্কট বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস পায় নাই। নূতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবানুগ হলে, তবেই কমিশনের সার্থকতা।

মৎস সংকট ও মাছের ভেরী

কোন বাজারেই এখন মাছ পাওয়া যায় না। এক আধ ঝুড়ি পচা মাছ, অথবা শুকনো মাছ বা 'ফ্রিজল' মাছ ছাড়া কোন মাছ কোন বাজারে পাওয়া যায় না। বরং পাড়ায় পাড়ায় ফেরিওয়ালার কাছে কিছু মাছ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এরূপ অদ্ভূত মৎস সংকট আর কোন দিন দেখা দেয়নি। বাজারে যারা খুচরা মাছ বিক্রি করে, সম্প্রতি তারা এই বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে যে মাছের অভাবে তাদের জীবিকা বন্ধ হতে চলেছে।

একথা আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মাছের গুটিকয় বড় বড় ব্যবসায়ী এবং ভেরিওয়ালার চক্রান্তের ফলেই আজ মাছের বাজারে এরূপ সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদেরই উৎসাহে মাছের দাম বাড়াবার জন্য খুচরা মেছুয়াদের দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। ভারতের সমগ্র রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পশ্চিম বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার লোকেরা মাছ খায়। অথচ সমস্ত ভারতবর্ষে খাল-বিল নদী-নালা অজস্র সংখ্যায় রয়েছে এবং সেখানে মাছও জন্মায়। ভারতের বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মাছের অভাব নেই। তবুও মাছ পাওয়া যায় না, শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাছের পাইকারের ষড়যন্ত্রের ফলে। আসাম বা উড়িষ্যার আড়তদারের আপাতত মাছের কোন বৃহৎ সংকট নেই,—সংকট একমাত্র পশ্চিম বাংলায়।

যদি সর্বভারতীয় সহযোগিতায় মাছের চাষ ও মাছ-ধরার পরিকল্পনায় অন্যরাজ্য সহযোগিতা করতে রাজী হয় ও সমুদ্রের মাছ ধরার সুব্যবস্থা করা হয় এবং পশ্চিম বাংলার ভেরীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করে সরকারী উদ্যোগে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও পাকিস্তান থেকে মাছ আমদানীর ব্যবসা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করপোরেশনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় তা' হলে মৎস সংকট দূর করা অসাধ্য নয়। কিন্তু বিত্তবান মৎস-পাইকার, যাদের অধিকাংশ কংগ্রেসের সহযোগী, তাদের শুধু হিতোপদেশ দিয়ে স্থায়ীভাবে মৎস সংকট দূর করা সম্ভব নয়। মাছের ভেরী রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে মাছ আমদানীর ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে মাছের সংকট দূর করা সম্ভব।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কূটনীতি

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা অতুল্যবাবু উদ্বাস্তু আগমন ও পুনর্বাসনের সমস্যা সম্বন্ধে কূটনীতির সুচতুর আবর্ত সৃষ্টি করে 'একদিকে উদ্বাস্তু দরদী' এবং অন্যদিকে 'পশ্চিমবঙ্গের মাটির সন্তানদের ন্যায্য অধিকার রক্ষাকারীর' দ্বৈতভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার যে রাজনীতি তিনি সুরু করেছেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলির দাক্ষিণ্যে তার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকখানি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও, উন্মুক্ত-দৃষ্টির মানুষদের কাছে এই কংগ্রেসী গুরুর কার্যক্রমের পরিচয় সম্বন্ধে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে 'যুদ্ধ ভিত্তিতে' তথা 'ওয়ার-ফুটিংয়ের' ভিত্তিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা উচিত। মুখে এক এবং কাজে অন্য,—এই কূটনীতির প্রয়োগ করে এই কয়মাসে তিনি অনেক ভূমিকাই গ্রহণ করছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের 'নির্যাতীত রাজনৈতিকে'র দৃষ্টিতে দেখতে হবে, এবং এদেশে তাদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে শোনা যায় যে তিনি দিল্লীতে গিয়ে পর্দার অন্তরালে সমস্ত সরকারী নেতাদের বলে এসেছেন যে উদ্বাস্তু আগমন কঠোর-ভাবে বন্ধ করা উচিত। দিল্লীর সরকারী নেতা ও কংগ্রেসী মহলে তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে একথাও প্রচার করে এসেছেন যে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে একদিনের জন্যও রাখা চলবে না,

কারণ এই উদ্বাস্তুরাই নাকি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অশান্তি ও দুর্দশার প্রধান কারণ।

অতি কূটনৈতিক ভাষায় অতুল্যবাবু বলে আসছেন যে উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সারা ভারতের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়, ঠিক সেরূপ মনোভাব দেখিয়ে তিনি বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আর একটিও উদ্বাস্তু রাখা চলবে না। কারণ সর্বজন শ্রদ্ধেয় গান্ধী সহকর্মী শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত যখন হাতে-কলমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করে দেখাচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে আরও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন করা সম্ভব, অতুল্যবাবু তখন সেই পরিকল্পনাকে 'বৃদ্ধের ভিমরতি' বলে পরিহাস করার নীতি গ্রহণ করেছেন।

যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গেছে অথচ অতুল্যবাবুদের নির্দেশে এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের 'উদ্বাস্তু-পরিচয়-পত্র' থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। যারা আহত হয়ে এসেছেন অথবা দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি স্থানে যাদের পুনর্বাসনের কোন সুযোগ নেই সেই সমস্ত ব্যক্তি এবং যারা নিজের চেষ্টায় নিজেরা পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তৎপর হয়েছেন,—তাদের সমস্ত রকম সরকারী সাহায্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ডাঃ রায়ের সময় উদ্বাস্তুরা সরকারী আর্থিক সাহায্য নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসন সম্ভব করার যে সুযোগ পেয়েছে, বর্তমানের উদ্বাস্তুদের সেই সুযোগ থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে। যে সব উদ্বাস্তু মারাত্মক ছোরার আঘাত খেয়ে দুইমাস হাসপাতালে থাকার পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে তারাও যদি পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরে গিয়ে সাহায্য প্রার্থী হয় তাদেরও শুনতে হয় 'কিছু করা যাবে না'। যে সকল তরুণ ও যুবক একা এসেছে তাদের এখানেও সাহায্য দেওয়া হবে না, দণ্ডকারণ্যেও পাঠান হবে না। কারণ এরূপ যুবকেরা নাকি শিবিরে গিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করেছে।

কিছু দিন আগে অতুল্যবাবু চোখ রাঙিয়ে বলেছেন যে এতদিন নাকি পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের বঞ্চিত করে উদ্বাস্তুদের চাকরীর যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারও নাকি 'সীমা আছে।' পঃ বঙ্গ কংগ্রেসের এই অধিপতি মহোদয় যে সঙ্কীর্ণ ও আত্মঘাতী রাজনীতির চাল চেলে 'পূর্ববঙ্গ' এবং 'পশ্চিমবঙ্গে'র মানুষদের ভেদবিভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ক্ষমতার পাল্লাটি নিজের মুষ্টিতে রাখার চেষ্টা করছেন সেকথা আজ নগ্ন হয়ে উঠেছে। অথচ আজ একথা এরূপ 'সংকীর্ণ-মন' 'রাজনৈতিক স্বার্থবাদী' ব্যক্তিদের একবারও মনে হলো না যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জমির মূল্য যে গড়ে প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার সাথে যে বিপুল পুঁজি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের হাতে গিয়েছে সেই পুঁজি পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নয়নের প্রকৃত পরিমাণে প্রগতি সাধনে সহায়তা করেছে। অতুল্যবাবু একবারও চিন্তা করে দেখেন নি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের উদ্যমের ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের গোটা সামাজিক ও আর্থিক জীবনে সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রগতির কত নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব না দেওয়ার জন্য তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন্দ্র মন্ত্রী শ্রীত্যাগীকে। এখন সংবাদটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি কূটনৈতিক আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে উদ্বাস্তুদেরও নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়া হবে। এই বিবৃতিটি না দিলে অতুল্যবাবুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনাবরিত হয়ে পড়বে, তাই তিনি এরূপ বিবৃতি দিয়েছেন।

পূর্ব বঙ্গের চিতাভস্মের উপরেই অতুল্যবাবুদের মত 'ভাগ্যবান' রাজনৈতিকেরা আজ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করে 'নেতা নামের খ্যাতি' অর্জন করেছেন। তবুও বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ আদর্শ, ঐতিহ্য এবং বাঙালী জাতীয়তার প্রতি যে

চরম শত্রুতার ভূমিকা এরূপ নেতারা গ্রহণ করেছেন অদূরভবিষ্যতেই বাঙালী জাতির কাছ থেকে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর এই 'আত্মসর্বস্ব নেতারা' লাভ করবেন।

নাগাভূমির শান্তি

বৃটিশ চার্চম্যান স্কটের উদ্যোগে শ্রীজয়প্রকাশ ও শ্রীচালিহা প্রমুখের নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি ও বোঝাপড়ার আলোচনার যে দৌত্য চলছে তা নিশ্চয়ই সমর্থনীয়। কিন্তু ভারতীয় সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই, অথবা নাগাভূমির যে দল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে নাগা সরকার গঠন করেছে তাদের দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব অস্বীকৃত হয়—এরূপ কোন প্রস্তাব ভারত সরকার বা শান্তি মিশনের গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই, রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের মাধ্যমে শান্তি-বার্তার আলোচনা চালাবার এবং শান্তি আলোচনায় নাগাভূমির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আলো'কে বর্জন করার প্রস্তাব কোনক্রমেই ভারত সরকারের গ্রহণ করা উচিত নয়। শান্তি প্রস্তাব আলোচনার সময়ে বিদ্রোহ দমনের সরকারী ব্যবস্থা এবং বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখার প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। কিন্তু আন্তর্জাতীয় সীমারেখা থেকে টহলদারী প্রত্যাহারের প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণীয়। একদিকে চীন এবং অপরদিকে পাকিস্তান, বিদ্রোহীদের মধ্যে অস্ত্র সরবরাহের সুযোগ যাতে এই 'ট্রুসের' সময়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করে শান্তি-বার্তাকে বানচাল না করতে পারে,—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ পথে নাগাভূমির সমস্যার সমাধান অবশ্যই কাম্য, কিন্তু নাগাভূমি ভারতেরই একটি অঙ্গ-রাজ্য। যারা শান্তিপ্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সহায়তা করেছে তারাও নাগাদের এক প্রধান অংশের প্রতিনিধি এবং নাগাভূমির একপাশে বৈরী ভাবাপন্ন পাকিস্তান বর্তমান—শান্তি-আলোচনার সময়ে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আসামের সরকারী ভাষা

ভাষাদ্বন্দ্বের চরম সংঘাতের পরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর মধ্যস্থতায় ভাষার যে ফর্মূলা আসামের বিবদমান পক্ষগুলি গ্রহণ করে, সেই ফর্মূলা কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন আসাম সরকার। যে পরিস্থিতিতে এই ভাষা ফর্মূলাটি গৃহীত হয়েছিল এবং তারফলে ভাষাগোষ্ঠির পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নাগাদের সমস্যা, পাকিস্তানীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ, পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সর্বোপরি চীনের ব্যাপক আঘাতের ফলে আসামের পরিবেশ ও আভ্যন্তরীন অবস্থার এক গুরুতর রূপান্তরের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত, সমগ্র আসাম আজ এক অগ্নিগর্ভ সংকটের সম্মুখীন। এরূপ অবস্থায় আসামের আভ্যন্তরীন জীবনে সাম্য, শান্তি ও সংহতির পরিস্থিতি রক্ষা করা এবং সৃষ্টি করা আজ প্রতিটি আসাম বাসীর এক জাতীয় কর্তব্য। আজ ভাষার চেয়ে প্রধান প্রশ্ন আসামের আভ্যন্তরীন সুস্থিরতা ও জনসমাজের সংহতি। আসামের ভাষাদ্বন্দ্বের সমস্যাকে আজ এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে।

বিগত ভাষা-দাঙ্গার পরে যে ফর্মূলাটি রচিত হয় তাতে কোন পক্ষই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ প্রতিটি আসামবাসীর আপোষরক্ষা ও সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে ভাষা সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হওয়া উচিত। একথা আশা করা যায় যে, কাছাড়ে বাংলাভাষা প্রবর্তনের যে আঞ্চলিক নীতি গৃহীত হয়েছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যেভাষার মাধ্যম গ্রহণ করেছে সেই সর্তগুলি শুধু পালনই নয়—আসামের অধিবাসীরা যে ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করতে চায় তাকে সেই ভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসরণের সুযোগ দানের মনোভাবে উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ভাষাগোষ্ঠির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়ার শুভবুদ্ধি চালিহা সরকার নিশ্চয়ই দেখাবেন। আসামের সমস্ত ভাষাগোষ্ঠিদের আজ মনে রাখতে হবে যে আসামবাসীদের সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমানে আসামের আত্মরক্ষা ও প্রগতির প্রধান ভিত্তিভূমি।

কাশ্মীরের মানচিত্র এবং বিনোবাজী ও শেখ আবদুল্লা

ট্রিবিউন পত্রিকায় লিখিত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের এক প্রবন্ধে জানা যায় যে বিনোবাজী স্বাধীন পাকিস্থান, স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন কাশ্মীর সংযোগে একটি কনফেডারেশন গঠন করে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। এই প্রবন্ধে আরও জানা যায় যে শেখ আবদুল্লাও অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, পাক-রাষ্ট্র নেতা আয়ুব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বিনোবাজীর সর্বোদয়ীরা আদর্শবাদী বলে বোধ হয় একটা বস্তুধর্ম নিরপেক্ষ যে আয়ুব বা ভারতের মতামতের কোন অপেক্ষা না করেই এখন থেকেই কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছেন এবং সেই নীতি অনুযায়ী একটি মানচিত্রও প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন দেশরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে।

ওদিকে, বিনোবাজী ও রাজাজীদের সমর্থনের জোরে আবদুল্লা অতি উৎসাহী হয়ে ভারতের সংবিধান-বিরোধী উক্তি করে বলতে আরম্ভ করেছেন যে "কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-বলা পাগলের প্রলাপ মাত্র।" শুধু তাই নয়, গত ৯ইআগষ্ট দশবছর আগেকার শেখ সাহেবের গ্রেপ্তারের দিনটির স্মরণে হরতালসহ প্রতিবাদ দিবস পালন করে সম্বন্ধে এক জনসভায় আবদুল্লা বলেছেন যে 'যারা কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তারা দেখে যাক কাশ্মীরের অভিমত কি।'

শেখ আবদুল্লা এক হাতে 'ছুরি' অন্য হাতে 'ফুল' নিয়ে বারবার এসে দেখা সাক্ষাৎ করছেন আমাদের দিল্লীর সরকারী নেতাদের সঙ্গে এবং ঐরূপ নেতারাও কাশ্মীরে যেয়ে বারবার এই 'ভারত-দ্রোহী' ব্যক্তিটির সঙ্গে মোলাকাত করে তার প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যে কারণে ভারত বিচ্ছেদকামী কাজাগাম্ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে সেই কারণে কেন আবদুল্লাকে আইনের আওতায় আনা হবে না, ভারত সরকারের দুর্বলতা ও অব্যবস্থা ছাড়া, তার বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তি নেই। আবদুল্লা বিরুদ্ধে সুদৃঢ় নীতি গ্রহণের সময় অতিক্রান্ত হতে দিলে তার ফল ভারতকে ভোগ করতে হবে।

পক্ষান্তরে কাশ্মীরকে পাকিস্থানের ম্যাপের সঙ্গে যুক্ত করার একটি বিলিতি কোম্পানীর মানচিত্রই শুধু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেই কোম্পানীকেও আইনের কবলে পড়তে হয়েছিল। সর্বোদয়মণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত এই কাশ্মীর মানচিত্র সম্বন্ধে সেই একই আইন কি অথর্ব হয়ে থাকবে? বর্তমান জাতীয় সংকট সময়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে এরূপ অব্যবস্থা ও দুর্বলতা অবিলম্বে পরিহার করা না হলে ভারতকে তার চরম মূল্য দিতে। 'অতিবুদ্ধিমান' রাজাজীর 'বুদ্ধির' জোরেতে ভারত ভাগ হবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ও মান গেছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, এবারে তত্ত্বদর্শী ও দানধর্মী বিনোবাজীর 'কাশ্মীরদান' নীতির ফলে ভারত যে কোন্ দুর্দৈবের মুখে যাবে এবং আরও যে কত রক্তপাত ঘটবে,—সেকথা ভেবে ভারতের বাস্তববুদ্ধি-যুক্ত-ব্যক্তিরা শংকিত হয়ে উঠেছেন।

বিধান সভায় বিক্ষোভ

যারা কোনদিন বিধান সভায় 'হল্লাবাজী' করে না তারাও এবারে ক্ষিপ্ত হয়ে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে বক্তৃতা করতে দেয়নি। অবশ্য, এবারের বিধান সভার বিক্ষোভে কম্যুনিষ্টরা অত্যন্ত সুবোধ বালকের মত ব্যবহার করে। অন্য সময় হলে আমরা বিধান সভায় সদস্যদের এরূপ আচরণকে 'হল্লাবাজী' আখ্যা দিতাম—কিন্তু বর্তমানে খাদ্য-সংকট যে চরম অবস্থায় পৌঁচেছে এবং সরকার যেভাবে খাদ্য-সংকট মোচনে অপদার্থতার পরিচয় দিয়ে বিধান সভার ভিতরে ও বাইরে শুধু পরিসংখ্যানের বয়ান দিয়ে যাচ্ছেন এবং তার ফলে আজ জনবিক্ষোভ যে এক অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে অবস্থার গুরুত্ব সরকারকে বোঝাবার জন্য সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও লোকসেবক সংঘের সভ্যেরা বিধান সভার ভিতরে জনমতের বিক্ষোভের যে অভিব্যক্তি দিয়েছেন তা বৃহত্তর জনতার সমর্থন লাভ করেছে। বিধান সভাকে অচল করার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনের নীতি সর্বদা অনুসরণ করা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কোন কোন সংকটের ক্ষেত্রে অচেতন নিষ্ক্রিয় ও আত্মতুষ্ট সরকারকে জন বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবার জন্য এরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন অথবা ডাবিক বা অগণতান্ত্রিক নয়। অবশ্য, এরূপ অস্ত্র প্রয়োগের সময় ও ক্ষেত্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত হওয়া উচিত,—অন্যথায় বিধান সভায় নিরন্তর বিক্ষোভ গণতন্ত্রের-মূলই বিনষ্ট করে দেবে।

দুই জন যথার্থ বাঙ্গালী মনস্বীর লোকান্তর

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের মহাপ্রয়াণে

জ্যোতির্ময় দত্ত

সংস্কৃত সুরভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সচিব আমাদের পরমপ্রিয় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর অকাল মহাপ্রয়াণে আমরা আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। এইরূপ নিদারুণ সংবাদের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ডক্টর চৌধুরী ছিলেন আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী। তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর সাহচর্য আমাদের প্রতিনিয়তই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বর্তমান যুগে এরূপ ঋষিপ্রতিম একনিষ্ঠ সাধক কোটিকে গুটিক মিলাও ভার।

একটি ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত পার্থিব এবং অপার্থিব গুণের এরূপ একত্র সমাহার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ভাভারে তিনি সর্বদাই অবনত ছিলেন। তিনি অহোরাত্র মাতৃভাবে, ভগবদ্‌ভাবে সমাহিত থাকিতেন এবং সেই ভাবের দিব্যদ্যুতি অনিন্দ্য সুন্দর, নয়নাভিরাম এই সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া বিরাজ করিত। তাঁহার সাহচর্য্য ছিল প্রতিটি লোকের, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একান্ত কামনীয়, পরম লোভনীয়।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বড় ভাই যোগেন্দ্রলাল জ্ঞানমার্গের সাধনায় সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবিমল সংসারবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গবেষণা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল :

১) সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান (৭ খণ্ড)

২) স্মৃতি সাহিত্যে বাংলার দান (৫ খণ্ড)

৩) সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের দান (৫ খণ্ড)

৪) সংস্কৃত দূত কাব্য সংগ্রহ (৫ খণ্ড)

৫) সংস্কৃত কোষ কাব্য (৫ খণ্ড)

৬) সংস্কৃত কাব্য (১০ খণ্ড)।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে ২০টি সংস্কৃত নাটক এবং ৩ খণ্ড সংস্কৃত গান উল্লেখযোগ্য।

তিনি একাধারে ছিলেন নিপুণ গবেষক, প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক এবং সুকণ্ঠ বাগ্মী।

যতীন্দ্রবিমল ছিলেন পরম ভক্ত—যতীন্দ্র। মাতৃভক্তিই ছিল তাঁহার জীবনের মূল উৎস। তাঁহার প্রতিটি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অনুরণিত হইত :

"হৃদয়-সরসিজে রশ্মিসুধারাং
জননীং যাচে সুধামপারাম্
বিমলাং করুণাং কণিকা-কারাং
যাচে 'যতীন্দ্র-বিমলো' নিতরাম্।"

তাঁহার রচিত প্রতিটি নাটকের মধ্যে ভক্তির মন্দাকিনী

ধারা প্রবাহিত। প্রতিটি নাটকের অভিনয়কালে ভারতের সহস্র সহস্র নরনারীর অশ্রুজল ভারতের আকাশ বাতাসকে সিক্ত করিয়াছে। তাঁহার রচিত সংস্কৃত ভক্তিমূলক গান ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়াছে।

তাই, এই পরম ভক্ত কবিটিকে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দাশ্রম, সারা ভারতের রামকৃষ্ণাশ্রম, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ, জৈন তেরাপন্থী সভা, বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি দলমত নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় একান্ত আপনার জন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

তিনি সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও নিয়ত উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতেন।

তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিরহিতৈষী এবং নিয়ত সেবক। সংস্কৃত পরিষদের সচিব হিসাবে বাংলার পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। বাংলার পণ্ডিত সমাজ তাহা চিরদিন স্মরণ করিবেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ছিলেন সর্বোপরি কর্মযোগী। নিষ্কাম কর্মের সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার প্রাচ্যবাণীর মাধ্যমে প্রাচ্যের শাশ্বত বাণীকে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি শঙ্করের ন্যায় দিগ্বিজয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। সরল, সহজবোধ, সুললিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সারাভারত এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত জনগণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষাকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও সংস্কৃত প্রচারে বাহির হইবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন।

১৯৩৯ সালের এক স্নিগ্ধপ্রভাতে তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রাচ্যবাণীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গীর্বাণ বাণীকে ভারতের এবং বিশ্বের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিবার যে মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯৬৪ সালের ১০ই জুলাই এর কাল সন্ধ্যায় তাহার যতি পড়িল। বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে মহতী জনসভা। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তিনি যতীন্দ্র এবং নরেন্দ্রের পরমারাধ্যা মায়ের স্তুতি প্রাণ ভরিয়া করিলেন এবং ধীরে ধীরে মায়ের কোলেই আশ্রয় লইলেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কর্মময়। যাঁহার স্নিগ্ধ সান্নিধ্য আমারা আরো বহুকালের জন্য কামনা করিতাম, নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে এক মুহূর্তেই ছিনাইয়া লইয়া গেল।

কর্মময় জীবনের অবসানে এই পরমযোগী, শিশু ভোলানাথ দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব কর্মনিষ্ঠার মহান আদর্শ এবং অনন্ত প্রেম। ইহাই হইবে আমাদের যাত্রাপথে পরম পাথেয়।

তাঁহার অকালপ্রয়াণে সংস্কৃত ও সংস্কৃতির যে ক্ষতি হইল তাহার পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যাতীত।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল এবং ডক্টর রমা ছিলেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল। এই নিদারুণ শোকের মুহূর্তে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের মূর্ত প্রতীক, সেবাধর্মে দীক্ষিতা, শাস্ত্রে নিষ্ণাতা, মহাবিদুষী, ব্রহ্মবাদিনী ডক্টর রমাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা ভারতের অগণিত নরনারীর সহিত তাঁহার বিয়োগ ব্যথা সমভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছি।

স্বর্গত শশিভূষণ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গিরিচূড়া ভাঙিয়া পড়ে নাই, উত্তাল সমুদ্র উদ্বেল হইয়া তটভূমি গ্রাস করে নাই, রাষ্ট্রসঙ্কট ঘনায় নাই—পৃথিবী যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতেছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছে। কালস্বরূপ কর্কটব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বন্ধুজনের অন্তরঙ্গ ও পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাভাজন শশিভূষণ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে জীবনরশ্মি সংযত করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বহু গবেষণাগ্রন্থের লেখক, স্বল্পভাষী সারস্বত সাধক শশিভূষণ এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। সভাসমিতির বরাসন তাঁহার জন্য নহে, রাজ্য ভাঙাগড়ার রাজসূয় যজ্ঞেও তাঁহার ডাক পড়ে নাই। তবে তাঁহার লোকান্তরিত হইবার সংবাদ বেতার মারফতে ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবামাত্র সকলে বিমূঢ় হইয়া পড়িল কেন?

বাংলা সাহিত্যের সৌখীন পাড়ায় যাহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা নহেন; যাঁহারা বুদ্ধিকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও পরিশ্রম-লব্ধ তথ্যকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা শশিভূষণকে চিনিতেন। বৌদ্ধ তন্ত্র, বাঙলার লোকধর্ম ও সাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যদর্শন—যাহার দ্বারা একটা জাতির অধিমানস স্পষ্ট হইয়া পড়ে, এবং যাহাকে পৈতৃক সংস্কার বলা হয়, শশিভূষণ তাহাকেই দুর্জ্ঞেয়তার জটাজাল হইতে উদ্ধার করিয়া গাঙ্গেয় ভূমির উপর দিয়া বহাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক প্রত্যয়, গভীর মনন—জীবনের চর্যা ও চর্চার মুক্তবেণী রচনা, এক কথায় তাঁহার স্থিতধী সত্তার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাই শশিভূষণের লোকান্তরের সংবাদে স্তব্ধ হইয়াছেন। মৃত্যু তো জীবদেহের অনিবার্য পরিণতি—ধর্মের প্রশ্নে ধর্মপুত্র যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু শশিভূষণের মৃত্যুতে তাঁহার বান্ধব, স্বজন ও ছাত্রসম্প্রদায় যে বেদনাবোধ করিতেছেন, তাহা শুধু মৃত্যু-জনিত শোকবিহ্বলতা নহে। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ তত্ত্ববাদী গবেষণার ক্ষতিজনিত নৈরাশ্যও নহে। তাঁহার মধ্যে আমরা ক্ষণে ক্ষণে যে অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কালকর্ম-অধ্যয়ন অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার যে মুক্ত শুভ্র জ্যোতির্ময় চারিত্রমূর্তি আভাসিত হইতে দেখিয়াছি, তাহা বুঝি বিশ শতকের শত সমস্যাতরঙ্গিত জনসমুদ্রে হারাইয়া গেল। এ ক্ষতি একটা বিশেষ চিত্তপ্রবণতার ক্ষতি, মনোধর্মের অপহ্নব, আদর্শের বিদায়।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় শশিভূষণের অর্জিত সংস্কার যেন পূর্বজন্মার্জিত বাসনাসংস্কারের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সূচ্যগ্র প্রতিভা বিষম ও বিপরীত, দুর্জ্ঞেয় ও দুরধিগম্য, গুহাহিত ও জলতলশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া যে মাল্য রচনা করিয়াছে তাহার মূল্য আজিকার প্রয়োগবাদী সামাজিকগণ বুঝিতে চাহিবেন না। আজ সাহিত্যে তো পালা শেষে পেলা আদায়ের যুগ চলিতেছে। মঞ্চমুখর করতালিধ্বনিতেই মোক্ষলাভ। এ কালে রসবিলাসী 'ডিলাটেন্ট্' পাঠক সমাজে শশিভূষণের আদর হওয়া দুষ্কর। রম্য-রচনার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ লোষ্ট্রখণ্ডও যখন শালগ্রামশিলা রূপে পূজা পাইতেছে, তখন শশিভূষণের গ্রন্থাদির মধ্যে

অনুপ্রবেশ করা বড় পরিশ্রম সাপেক্ষ। সে পরিশ্রম কে করে? কিন্তু দেশ যদি যন্ত্রদেবতার কুক্ষিগত না হয়, 'নিও-লিটারেট' নামক সাক্ষর বর্বরে দেশ ছাইয়া না ফেলে, তাহা হইলে শশিভূষণের গ্রন্থে আমরা আমাদের জাতিমানসের স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইব। সে দিন এখনও আসে নাই। কাল যখন নিরবধি, এবং পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন সে আশা করিব বৈকি!

পাণ্ডিত্য শশিভূষণের একমাত্র পরিচয় নহে। মানুষটিকে আমরা, যাহারা একটু নিকট হইতে দেখিয়াছি, তাহারাই জানি—তাঁহার চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য আমাদের আকর্ষণ করিত। রসারোডের ছোট বাড়ীটির অপরিসর ঘরে আমরা কেন হাজির হইতাম, পরে যখন তিনি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হইলেন, তখনও আমরা তাঁহার নূতন বাসায় কেন সকাল-সন্ধ্যায় যাওয়া আসা করিতাম, সে কথা এখানে বলিয়া লই।

এই ক্ষীণকণ্ঠ স্বল্পভাষী ব্যক্তিটির মধ্যে আমরা এমন একটা প্রসন্নতা লক্ষ্য করিতাম যে, তাঁহার কাছে বসিলে যেন সব তাপ জ্বালা অভিযোগ জুড়াইয়া যাইত। শুনিয়াছি, তিনি বিশেষ ধরণের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে ব্যক্তিগত চর্যার গূঢ়কথা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এইটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাঁহার দেবতা মঠে মন্দিরে নাই, তীর্থে তীর্থে নাই। তাঁহার সংস্কারমুক্ত চেতনার গভীরে যে প্রত্যয় অনির্বাণ শিখায় জ্বলিত, তাহার দিব্যবিভায় আলোকিত হইয়া থাকিত তাঁহার মুখমণ্ডল। সেই প্রসন্ন ধৈর্য ছায়া ফেলিত তাঁহার কাজে কর্মে আচারে-আচরণে। তাই মাঝে মাঝে মনে হইত, কর্মই বুঝি তাহার দেবতা, কর্ম-যজ্ঞই তাঁহার ধ্যানধর্ম ও জীবনযাগ। রোগশয্যা আশ্রয় করিয়াও তাঁহার কর্মে নিরত হইবার জন্য সে কী আকুলি বিকুলি! কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ চলিবে, কি করিলে এই বিভাগের সম্যক উন্নতি হইবে, এই চিন্তা তাঁহার রোগশয্যাকে শয্যাকণ্টকে পরিণত করিয়াছিল। অতঃপর তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই, দেহের যন্ত্রণা নাই—এখন তিনি দেহবন্ধনমুক্ত চিরায়ু জ্যোতিষ্মান।

মনুষ্যত্বের মহিমা লইয়া শশিভূষণ দাশগুপ্ত চলিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহার জন্য শোক করিতেছি। শোক করিতেছি শুধু একটি বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে, তাঁহার অকাল অবসানে একটি বীর্যোজ্জ্বল সাত্ত্বিক আদর্শের অবসান হইল—শোক এই জন্যই।

"ভরা থাক স্মৃতিসুধায়"

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চার্চ এভিনিউর জনবিরল মধ্যাহ্ন মুহূর্তে আমরা ক'জন শেষবারের মতো তাঁর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমরা সবাই তাঁর ছাত্র, আবার সহকর্মী। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি শীর্ষমণি ছিলেন, তবু মহিমার উত্তুঙ্গ শিখরে নয়, অন্তরের গোপনতম শ্রদ্ধার আসনখানি তাঁর জন্য পাতা ছিল; তিনি আমাদের আত্মীয়তম আত্মীয়।

কেউ বললেন, এই পথ দিয়ে এ বাড়ীতে হয়তো এই শেষ আসা।

আজ ৩১শে জুলাই, ১৯৬৪, তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে সুগায়ক অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় গাইছিলেন, 'তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিয়ো।' জীবনের অস্তিত্ব যে শিবের প্রতীক, মরণের অস্তিত্বও তাঁরই প্রকাশক। সুখে দুঃখে সেই পরমপ্রিয়ের চিরপ্রশান্ত মুখচ্ছবি অম্লানজ্যোতিতে ভাস্বর

হয়ে থাকবে, এই তো সাধনা। শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর যে সৌম্য ছবিখানির সামনে শ্বেতপদ্মের অঞ্জলি দিলেন বন্ধুবর শঙ্করীপ্রসাদ, সে অঞ্জলিতে আমাদের সব কথা নিঃশব্দে ভাষা পেল যেন।—মনে পড়ল কতবার কত সময় তাঁকে প্রণাম করতে মাথা নামিয়েছি, সস্নেহে মাথার উপর হাতটি রেখে বলেছেন, 'থাক থাক', সেই সলজ্জ সস্মিত শুভ্র হাসিটি আবার ফুটে উঠল, শুধু ধ্বনিত হলো না কণ্ঠস্বর।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ওই কণ্ঠস্বরে বা কণ্ঠস্বরের মৃদুতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গে অগ্রজ এক সতীর্থের কাছে শুনেছিলাম, "দেখবে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত নামে একজন অধ্যাপক আছেন, যিনি খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন, শুনতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধাই হয়, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে পড়ান খুব ভালো, তাঁর ক্লাসগুলিতে খুব মন দিয়ে শুনবে।" পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে এসে সহজাত কৌতূহলের বশে ওই নামটি মনে রেখেছিলুম। শান্ত ছোট্ট মানুষটি একদিন ক্লাশে এসে দাঁড়ালেন, উৎকর্ণ আমার প্রতীক্ষা সার্থক করে যখন দু'বছরের পাঠ্যক্রম আর একদিন সাঙ্গ করলেন, সেদিন হিসাব করি নি, আজ করতে যেয়ে দেখছি, তাঁর কাছে প্রায় প্রত্যেকটি পত্রের কিছু না কিছু অংশের পাঠ নেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। একথা সত্য যে চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাংলাসাহিত্যের সর্বত্র সর্ববিষয়ে তাঁর সহজ অধিকার আমাদের একথা কখনো মনে হতে দেয় নি যে, এই বিশেষজ্ঞতার যুগে এমন সর্বতোমুখী অধ্যাপনাপ্রতিভা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতে গেলে বোঝা যায়, সাহিত্যের সব কটি শাখায় সমান পারঙ্গমতা ও সমান অধ্যাপনা কত বড়ো দুরূহ কাজ, যে কাজ অমন দু' একজন অধ্যাপকের পক্ষেই সত্যি সত্যি সম্ভব।

ভোরের আলো, বিকেলের হাওয়া, সন্ধ্যার প্রশান্তি—এর জন্য কেউ কৃতজ্ঞতা বোধ করে না। জগৎপিতার পিতৃসম্বে আমাদের সহজাত অধিকার। ঠিক তেমনি শশীবাবুর কাছে এসে যে স্নান, যে স্নেহ, যে পরিপূর্ণতার অনুভব আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হ'ত, তার জন্য নিজেকে বিশেষভাবে ঋণী মনে হবার কারণ ঘটে নি। তাঁর যা কিছু চিত্তসম্পদ—সে তো আমাদেরই, এমন এক নিশ্চিতবোধে আমরা তাঁর অতন্দ্র কর্মপ্রয়াস লক্ষ্য করে গেছি। জানতাম না, কালের অমোঘ নির্দেশ অর্ধপথে যতি টেনে দেবে। চারু এভিনিউর পথ বেয়ে তাঁর কাছে নিশ্চিত পূরণের আশায় আমাদের নানা মুহূর্তের নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে আসা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে! তাঁর কাছে যে আরও কত শিখবার ছিল—সেকথা আমরা ছাত্রেরা যেমন অনুভব করি, আর কারও পক্ষে তা অনুমান করা অসম্ভব।

চারু এভিনিউ থেকে বেরিয়ে এসে ট্রামে উঠলুম। এমন কতদিন হয়েছে— সকালে, বিকালে বা সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত নানা প্রয়োজনে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কথা শেষ করে সামনের লোহার গেটটির ফাঁক দিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছি, খদ্দরের ধুতি ও বেনিয়ান-পড়া তাঁর স্নিগ্ধ মূর্তিটি পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, একথা অনুভব করে কী এক গভীর তৃপ্তিতে মন ভরে গেছে। চর্যাগীতি পড়াতে গিয়ে তিনি বোধিচিত্তের কথা বলেছিলেন, যে বোধিচিত্ত প্রজ্ঞা ও করুণার সম্মেলনে গড়া। বলেছিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধের কথা, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত বুদ্ধ-সম্ভাবনার কথা। ঐ প্রজ্ঞা ও করুণার সম্মেলনে গড়া প্রত্যেক বুদ্ধের একজন তিনি নিজেই।

এই স্বার্থ লোভ হিংসা হানাহানির জগতে থেকেও তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে ভালোর অংশটাই বেশী। সহকর্মী অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর একদিনের সেই বিশ্বাসদীপ্ত চোখ মুখ আমার মনে পড়ে। টলষ্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁর সাধকসত্তা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ করছিল মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের—"এ জগৎ কিছুতেই চলতে পারতো না, যদি

মানুষের মধ্যে ভালো দিকটাই বড়ো না হতো।" সে বিশ্বাস তাঁর শেষ অবধি অটুট ছিল বলেই কোনদিন তাঁর মুখে কারও অমঙ্গল কামনা ধ্বনিত হওয়া অসম্ভব ছিল—তা সে তাঁর কাজের বা চিন্তাধারার যত বিরোধী ব্যক্তিই হোক।

কর্তৃত্ব আর নেতৃত্ব ঠিক এক জিনিষ নয়; মাষ্টারমশাই কর্তৃত্ব করতেন না বলেই সবচেয়ে সফল নেতৃত্বের উদাহরণ তাঁর মধ্যে দেখেছি; আর বুঝেছি যিনি যত বিচিত্র ও বিরোধী মন ও মানুষের মিলন ঘটাতে পারেন তিনিই নেতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমরা যারা তাঁর সঙ্গে একত্র কাজকরার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, তারাই জানি অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুজের প্রতি স্নেহের এক অপূর্ব রাখীবন্ধনে তিনি কত সার্থকভাবে আমাদের একপ্রাণতায় বেঁধেছিলেন—অথচ সে ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতার বন্ধন। তার ফলে আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের মননশীল ও সৃজনশীল দুটি দিকই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল।

বিশ্ববিদ্যাপ্রাঙ্গণে আশুতোষ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ স্থান দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রূপায়নে আচার্য শশিভূষণ এমন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বিশ্বের সর্বত্র তার বৈশিষ্ট্যগৌরবে সমুদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলা তথা ভারতের সাহিত্যসাধনা থেকে ধর্মসংস্কৃতি যে বিশ্বসংস্কৃতির একটি উজ্জ্বলতম দিক সেকথা সাম্প্রতিক কালের বিশ্ববাসীকে যারা শুনিয়েছেন এবং সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে মনীষী শশিভূষণ ছিলেন একজন। সন্দেহ নেই, এই শতবর্ষের উৎসব আয়োজনে আশুতোষ প্রত্যক্ষ উপস্থিত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গৌরব ও বেদনা—এ দুয়েরই যথার্থ পরিমাপ তিনিই করতে পারতেন।

আধুনিক কালের সাহিত্যে 'যন্ত্রণা' কথাটি বহুব্যবহৃত। জীবনযন্ত্রণা, যুগযন্ত্রণা ইত্যাদি। যে যন্ত্রণাময় ব্যাধিতে আচার্য শশিভূষণের অকাল মৃত্যু, সে ব্যাধি বোধ হয় এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট যুগের যথার্থ প্রতিনিধি। শেষের ক'মাস যখন ক্যান্সারের নির্মম বিস্তারে তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলের আনন্দজ্যোতি নিঃশেষে মুছে আনছিল, তখন নিরুপায় বেদনায় দগ্ধ হতে হতেও মনে হয়েছে, তাঁর কাছে জীবন ছিল তপস্যা, সাধনা—যন্ত্রণা কখনোই নয়। দরিদ্রসংসারের পুত্র হয়েও দারিদ্র্যকে এক শুভ্র সাত্ত্বিকতায় রূপান্তরিত ক'রে এই সাহিত্য-সাধক একদা লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়েরই জয়মাল্য লাভ করেছিলেন। তবু আজীবন সেই অনাড়ম্বর নিরভিমান নিরাসক্ত জীবনের আদর্শেই অবিচল থেকেছেন। তাঁর ছোট্ট শয়নকক্ষে নানা রঙের বই ছাড়া আর কোন রঙীন সামগ্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না, তাঁর শুচিতায় কোন বহির্মুখী বাহুল্যই সম্ভব ছিল না।

গুণীর পুরস্কার বেঁচে থাকতেই পাওয়া পৃথিবীতে খুব সুলভ ঘটনা নয়। তবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য আকাদেমী—ভারতবর্ষের এ'দুটি শীর্ষ সংস্থার কাছে আমরা এজন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ হতে পারি যে, আচার্য শশিভূষণের যোগ্য মর্যাদা তাঁরা তাঁকে দিয়েছিলেন। কোন গোষ্ঠী বা দলগত সাধর্ম্যে নয়, একক ব্যক্তির নিষ্ঠা ও নিরলস সাধনার দ্বারা যে মহিমা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা সব স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ঊর্ধ্বে। তা'হলেও যোগ্যজনের সম্মানে আমরা নিজেদেরও অভিনন্দিত করি, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধার আলোকে আমরা নিজেদেরই আবিষ্কার করি। সেকথা মনে রেখে কলকাতায়, দিল্লীতে, লণ্ডনে, অক্সফোর্ডে, প্যারিসে এই আদর্শ ভারতীয় যে অভিনন্দন লাভ করেছেন, তার গৌরবে গৌরবান্বিত আমাদের অন্ততঃ এটুকু আশ্বাস রইল যে, গুণের সমাদর আজো ঘটে।

কিন্তু তাঁর জীবনের ঠিক মধ্যাহ্নসময়টিতে যখন সবচেয়ে

উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারটি খুলে যাচ্ছে, চৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণে যখন আমরা মনে মনে বলছি, 'আগে কহ আর,' ঠিক তেমনি সময়ে মৃত্যুর দেহলিপ্রান্তে ব্যাধিজীর্ণ দেহটি রেখে তিনি চিরকালের মতো আমাদের ছেড়ে গেলেন। তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন নি, আমরা সব জেনেও মানতে পারি নি, সত্যিই তাঁর মৃত্যু এত আসন্ন। তাঁর কী অসুখ তা তাঁকে জানতে দেওয়া হয় নি। একটু একটু করে ক্ষয় হয়ে আসা দেহ যে আবার সেরে উঠবে—এ বিষয়ে মৃত্যুর দু'মাস আগেও তাঁর সংশয় ছিল না। যতদিন সে বিশ্বাস যায় নি, মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি, এটা ওটা গল্প করতে চেয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন আমাদের পড়াশুনোর কথায়, পড়ানোর কথায়। খুব ইচ্ছে ছিল, সেরে উঠেই ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্রদের অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ পড়াবেন। আর যদি অতটা সেরে না উঠতে পারেন, অন্ততঃ বিভাগীয় কাজকর্মগুলি বসে বসে দেখবেন—গরমের ছুটির পরই ফিরে আসবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের ঘরটিতে।

কোনো গভীর মর্মস্পর্শী নাটকের মধ্য অঙ্কে হঠাৎ যবনিকা নেমে এলে দর্শকের পক্ষে তা কতখানি অসহ তা আমরা জানি। কিন্তু সে নাটকের যিনি একমাত্র নায়ক, তাঁর পক্ষে? শেষ যেদিন মাষ্টারমশাইর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেদিন অন্ধকার ঘরের সামনে একফালি বারান্দায় চেয়ারের উপরে বসেছিলেন—চোখের দৃষ্টি আকাশের তারার উপর রেখে। আকস্মিক উপস্থিতিতে ঘরে আলো জ্বলল, তিনি চোখ ফেরালেন। মধ্য পথে যবনিকা নামছে—সে চোখের ব্যথিত হতাশায় মুহূর্তে মানবজীবনের করুণতম বাণী পাঠ করে সেই শেষ প্রণাম তাঁর পায়ে রাখলাম। গরমের ছুটি শেষ হয়ে কুড়িটি দিন পার হলো, এবার তার সম্পূর্ণ ছুটি।

কিন্তু এ ছুটি তিনি চান নি। বঙ্গবাণী ও বিশ্ববিদ্যার যে সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন, সে সাধনার পূর্ণাহুতি এখনো বহু দূরে, এই নিশ্চিত বিশ্বাসে জীবনের কর্মক্ষেত্রে শান্ত স্থিরসঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। সে যাত্রা মৃত্যুতে ক্ষান্ত হয় নি এ আমার অন্তরতম বিশ্বাস। কোন শুচিসঙ্কল্প শ্রীমন্তের সুদুর্লভ সৌভাগ্যে এ সাধনাকে পরিপূর্ণ হতে হবে—শুধু আমাদের দৃষ্টি দিয়ে এ সাধনার শেষপর্ব আর দেখা যাবে না।

'কথাসাহিত্য'-পত্রিকার বিবেকানন্দ-সংখ্যাটি নিয়ে যে মাসের গোড়ার দিকে একদিন আলোচনা করছিলাম তাঁর ঘরে বসে। তখনও অসুস্থতার শেষ পর্যায় আসে নি। উক্ত সংখ্যাটির প্রশংসা করে নানা কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মরণমিলন' কবিতাটির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই বিষয়ে প্রবন্ধ এবং 'কথাসাহিত্যে'র বিবেকানন্দসংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে মরণমিলনের প্রেরণা-উৎস সম্বন্ধে মন্তব্য নিয়ে শশীবাবু বললেন, "আমার তো কিছুতেই মনে হয় না যে বিবেকানন্দের মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ কবিতার কোন সম্পর্ক আছে।"

মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও কল্পনা নিয়ে নানা কথা হতে হতে আমার মনে পড়লো স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শ্রীমতী ম্যাকলাউডের সেই অমর স্মৃতিচারণ—"They cabled me on the fourth of July, "Swami attained nirvana." For days I was stunned. I never answered it. And then the desolation that seemed to fill my life made me weep for years and it was only after I read Materlinck who said. 'If you have been greatly

influenced by any one, prove it in your life, and not by your tears,' I never wept again……" *

এ কাহিনী তাঁকে শোনাতে শোনাতেই আমার বুকের মধ্যে আমার ভবিষ্যতের জমাট অশ্রু উদ্বেল হয়ে দেখা দিতে চাইল। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল আশাভরা চোখ দুটির দিকে চেয়ে নিজেকে বললাম, আজও বলি : "prove it in your life, and not by your tears.'

---

* "চৌঠা জুলাই ওরা আমাকে তার করে জানালো, স্বামীজী নির্বাণ লাভ করেছেন। দিনের পর দিন আমি স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে রইলাম। সে তারের কোন জবাব দিই নি। তারপর যে শূন্যতায় আমার সমস্ত জীবন পূর্ণ হয়ে গেল, সে শূন্যতা আমাকে বছরের পর বছর চোখের জলে ভাসিয়েছে। শুধু যখন মেটারলিঙ্কের বইয়ে পড়লাম, 'যদি জীবনে কারও দ্বারা তুমি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকো, তবে চোখের জলে নয়, জীবন দিয়ে তা প্রমাণ কর।'—তার পর থেকে আর কোনদিন আমি চোখের জল ফেলি নি…"(বিবেকানন্দ স্মৃতি : Reminiscences of Swami Vivekananda)

ভুলে গেছি

বুদ্ধদেব গুহ

ভুলে গেছি কিছু নাম, কিছু হাসি, বা কিছু বিস্ময়
পরিচিত এ-পৃথিবী, অকলঙ্ক ভোরে তবু
পুরানো বন্ধুর মতো কত সজ্জায়।

কুয়াশা আড়ালে ঢাকা, স্বপ্নপদ্ম, তার তার মুখ
উঠোনে জলের ছিঁটে, হেঁয়ালি রাতের ছড়াকাটা
রূপোসী বাংলার গ্রাম, আর তার নির্জন নায়কের সুখ
অনায়াসে আমি আজ ভুলে গেছি সহরে ভাবুক ;

কখন বিদেশ হ'তে, শুনলাম, এসে গেছে কাল—
মৃণালের বৌ এলো ঘরে
সিন্দুর রাঙিয়ে কপাল।

ভুলে গেছি কিছু নাম, কিছু হাসি, বা কিছু বিস্ময়
হাওয়ায় যে গান শুনি, বহদূরে সেই গান
গায় বুঝি বিগত সময়!
তিমেরের স্বপ্নে লীন, উৎসুক শতভিষা নিরালোক
আকাশের কোণে
কানে কানে শোনা যায় লঘু হাওয়া বয়ে গেলে
নিবিড় নীরব কা'রো কথা
এসে যারা ফিরে গেছে, অথবা এমন যারা
পথ চেয়ে আজো দিন গোণে
সাধ হয় কাছে যাই, তাদের সবার কাছে
ডুব দিই সেই সব মনে ;
বেদনা মুখর হলে কখন কি যায় ভোলা
হাসি গান নাম পরিচয়,
অধৈ অন্তর আজ, ভয় হয় ভেসে যাবো
বাঁধ খোলা—নেই সংশয়।

মূল্য ও খাদ্যসঙ্কট

সুনীল দাস

পশ্চিম বাংলায় তেষট্টি সালের খাদ্যসঙ্কটের দুঃসহ দিনগুলি দুঃস্বপ্নের মত অতিক্রান্ত হওয়ার পর উচ্চহারে দাদন দিয়ে মজুতদার-ব্যবসায়ী-চক্রের নূতন ধান করায়ত্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যে আগামীদিনের বিপদ সঙ্কেত নিহিত ছিল। সে সময় বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত উদ্বিগ্ন শঙ্কাকুল সতর্কবাণী কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করতে অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। যদি তাই না হোতো, তবে পরবর্তীকালের অবস্থার পরিণতি ভিন্নতর দেখা যেতো। মূল্যবৃদ্ধির তপ্তখোলায় ধান-চাউল দুষ্প্রাপ্য হবে, অর্থনীতির এই স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম সম্পর্কে সরকারী কৈবল্য, মতিভ্রম কিম্বা বুদ্ধিনাশের লক্ষণাক্রান্ত বলে অনুমান করা যেতো, যদি গত বছরের দগ্ধ-অভিজ্ঞতায় এ-কথাটি চিহ্নিত না থাকতো যে যতই ধান-চালের দর বাড়বে, এই দুই বস্তু উধাও হয়ে সুরঙ্গপথে মজুতদারের চোরাগুদামে আশ্রয় নেবে। শুধু গত বছরই বা কেন, ইতিপূর্বেও বহুবার শ্রাবণ-ভাদ্র মাস থেকে ধান চাউলের বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে—দেখা গেছে মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সহচর। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধিরোধকল্পে মূল্যস্তর নির্ধারিত করার পাশাপাশি, খোলা বাজারে শস্যের যোগান সুনিশ্চিত না করলে, একদিকে এই নির্ধারিত মূল্যস্তরকে অবজ্ঞাভরে লঙ্ঘন করে খোলাবাজারের মূল্যস্তর অব্যাহত-গতিতে বাড়তির দিকে এগিয়ে যাবে, অপর দিকে খোলা-বাজার অল্পকাল মধ্যেই কালোবাজারে পরিণত হবে। নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা যদি সরকারের থাকে, তবেই বাঁধা দামের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হবে। অন্যথায় দর বাঁধার অনুষ্ঠানটি অচিরেই প্রহসনে পরিণত হবে—সে-পরিস্থিতিতে মজুতদার-মুনাফাখোর-কালো-বাজারীরা অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা নিয়ে লুণ্ঠনের ভূমিকা গ্রহণে নিরস্ত থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গে ধান চাউলের মূল্যস্তর সরিষার তেল, মাছ, ডাইল, সব্জি ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যস্তরের নিয়ামক। সুতরাং ধান-চাউলের বাজার মুনাফাবাজদের করায়ত্ত হলে, অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যও অনিবার্য ভাবেই দুরন্ত বেগে বৃদ্ধি পাবে।

চৌষট্টির জানুয়ারীতে পশ্চিম বাংলা সরকার ধান-চাউলের মূল্যস্তর নির্ধারিত করে তেষট্টির সঙ্কটে গুরুতর নিষ্ক্রিয়তার অপরাধ স্খালনের দায় সারতে চেয়েছিলেন। মূল্যস্তর নির্ধারণের দায়িত্ব এতোদিন এড়িয়ে যাওয়া শুধু মারাত্মক ভুলই নয়, বারম্বার জনমতের দাবী সত্ত্বেও এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ় অস্বীকৃতি, সরকারের মনোভাব সম্পর্কে নানা সংশয়েরও সৃষ্টি করেছে। চৌষট্টির জানুয়ারীতে মূল্যস্তর নির্ধারণে সরকারী তৎপরতা সে সংশয় দূর করতে পারে নাই। কারণ, মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি যে ধান-চাউল কৃষকের ঘর থেকে উদ্বৃত্ত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহিত হয়, তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হল না। অথচ এই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত (marketable surplus) করায়ত্তের জন্য মুনাফাবাজ-মজুতদার-কালোটাকার চক্র, গত ডিসেম্বর মাস থেকেই সক্রিয়। এ তথ্য সরকার খুব ভালো-ভাবেই জানতেন। এই পরিস্থিতিতে মূল্যস্তর বাঁধা হলেও, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণের অনুদ্যোগ মুনাফাবাজ-মজুতদার-কালোটাকার চক্রকে আরও কিছুকালের জন্য ক্রেতা সাধারণকে অব্যাহত লুণ্ঠনের সুযোগ দিল। মূল্যস্তর নির্ধারণ

করে অনমনীয় মনোভাবের ঝোঁক দেখিয়েও, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণে নিষ্ক্রিয়তায়, এই ব্যবস্থায় মস্ত ফাঁক রাখার কৃতিত্ব নিঃসংশয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। মুনাফাবাজ-মজুতদার-কালোটাকারচক্র এ-জন্য অবশ্যই নেপথ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে থাকবে।

ফল যা হবার তাই হয়েছে। এবছর মূল্যস্তর নির্ধারিত থাকা সত্বেও এপ্রিল মাস থেকেই ধান-চাউল, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যও হয়ে উঠলো। এ-বছর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেমন, পশ্চিম বাংলায়ও, চালের ফলন গতবারের চাইতে বেশী হয়েছিল। গোটা ভারতবর্ষে '৬২-'৬৩ সালে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টন চাউলের তুলনায় '৬৩-'৬৪ সালে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টন চাউল উৎপাদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই দুই বছরে চাউলের উৎপাদন যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন এবং ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অথচ, এই বর্ধিত উৎপাদন এ-বছর চাউলের মূল্যস্তরে কিম্বা বাজারের সরবরাহে কোনো রেখাপাত তো দূরের কথা—চাউল আরও দুষ্প্রাপ্য, আরও দুর্মূল্য হয়ে গেলো! মূল্যস্তর বৃদ্ধির নিরিখ পাওয়া যাবে পাইকারী মূল্যসূচীতে (wholesale price Index)। কি হারে এই মূল্যসূচী বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন মাসের পাইকারী মূল্যসূচীর অঙ্ক লক্ষ করলেই তা অনুমান করা যাবে। ১৯৬৪ সালের ২৮শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হল সেই সপ্তাহের সূচীর অঙ্ক ১৩৯.২ (১৯৫৩ সালের মার্চে যে বছর শেষ হল সে-সময়কার পাইকারী মূল্যসূচী ১০০র ভিত্তিতে) থেকে ৩০শে মে'র সপ্তাহান্তে তা বৃদ্ধি পেলো ১৪৪.৫-এ। ২৭শে জুন-এর সপ্তাহান্তে এই অঙ্ক ১৪৭.৭ সীমা অতিক্রম করে ৪ঠা জুলাই সপ্তাহান্তে ১৪৯.০ তে পৌঁচেছে। অর্থাৎ, এক বছরে শতকরা ৯.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। ১৯৬৩র জুনে এই মূল্যসূচী ছিল ১৩৪.০। শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যস্তরের হিসাব নিলে দেখা যাবে এই মূল্যসূচী ১৯৬৪'র মে ও জুন-এ যথাক্রমে ১৪৭.৮ ও ১৫৩.১ তে ছিল। ১৯৬৩ সালের জুনে এই নিরিখের পরিমাপ ছিল ১৩৪.৮। এই সময়ের মধ্যে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চাউলের দর শতকরা ১৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এ-বছর মে মাস্ থেকে জুনের মাঝামাঝির মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে!

আধিক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি অবশ্য একটি সর্বভারতীয় উপসর্গ। মূল্যবৃদ্ধির আলোচনা করার পূর্বে দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। এ বছর জুন মাসের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাউল যে পরিমাণে খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পৌঁছানো উচিত ছিল, তা এসে হাজির হোলো না। তার কারণ খুবই সহজ। মূল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুতদার-মুনাফাবাজ-কালোটাকার চক্র সুরঙ্গ পথে খাদ্যশস্য গুদামজাত করেছে। গত বছরের চাইতে এ-বছর ঐ সময়ের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাউল খোলাবাজারে পৌঁচেছে শতকরা ১৬.১ ভাগ কম। আবার গত বছরের জুন মাসের চাইতে এ-বছর জুন মাসে ব্যবসায়ীদের চাউলের মজুদ শতকরা ৪.৮ ভাগ বেশী ছিল। উৎপাদন বেশী হয়েছে, অথচ বাজারে বিক্রয়যোগ্য চাউলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, ব্যবসায়ীরাও গোলায় মজুদ রেখেছেন বেশী। অর্থাৎ, মজুতদারীর এর চাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

মজুতদারী বন্ধ করার সরকারী প্রচেষ্টা বরাবরই শ্লথগতি এবং দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ, 'পশ্চিম বঙ্গ চাউল ও ধান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ' ১৯৬০ সাল থেকেই চালু আছে। তাছাড়া নূতন-ভাবে ধান-চাউল ব্যবসায়ের লাইসেন্স গ্রহণের কড়াকড়িও হয়েছে এবং মজুতরোধের জন্য ভারত রক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের পথও খোলা রয়েছে। এত সব বিধি-ব্যবস্থা সত্বেও এ-বছর সঙ্কটের আবর্তের সামনেও এপ্রিল-মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরুদ্বিগ্ন ও নিরুত্তাপ। অতঃপর সরকার যখন ৭ই মে তারিখে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি উদ্বৃত্ত

জেলায় উৎপাদকদের মজুত ধান-চাউল আটকের, সে-সময়ের মধ্যে বহু উৎপাদকের ধান-চাউল পাইকার-ব্যবসায়ী-মিলমালিক—কালোটাকারচক্রের হস্তগত হয়েছে। অথচ এদের মজুদ-দখলের সিদ্ধান্ত সেদিন ক্যাবিনেট গ্রহণ করলো না। কেবলমাত্র উৎপাদকদের মজুত-দখল হুকুমই জারী হল। বৃহৎ উৎপাদকদের মজুত দখলের চেষ্টায়ও সরকারের কোনো আন্তরিকতা ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্ত ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় স্বভাবতই বৃহৎ উৎপাদকেরা—যারা জোতদার শ্রেণীর—তাদের মজুত নির্দিষ্ট পরিমাণের গণ্ডী এড়িয়ে ক্ষুদ্র মজুতে রূপান্তরের সময় পেলো। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানের মত তিনটি উদ্বৃত্ত এলাকায় এ-বছর চাউলের আনুমানিক ফলন ১৬·৩ লক্ষ টন, তার ১০ লক্ষ টন খোরাক, অপচয় ও বীজের জন্য স্থানীয় ভাবে ব্যয় হবার পরও এই তিন জেলা থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু এই তিন জেলায় মজুত সংগ্রহ অভিযান, যে ঢিলে-ঢালাভাবে পরিচালিত হয়েছে, তার ফলে আটক মজুদের পরিমাণ খুবই সামান্য। বর্ধমান জেলাতে মজুতআটক হুকুম জারী হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ সুরু হলেও জেলার বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের ১২০ লক্ষ মণের মধ্যে জুন পর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ মণ মজুত, আটক অভিযানে সরকারের হাতে এসেছে। সুতরাং বৃহৎ উৎপাদকেরা মজুত দখল অভিযানের পাশ কাটিয়ে নিজ নিজ মজুত বহাল রাখতে পেরেছেন-এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। পশ্চিম বাংলার বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ মজুতের ফলেই, খোলাবাজার চাউলশূন্য ও কালোবাজারে মূল্যবৃদ্ধি। এ-বছর পশ্চিম বাংলার বিক্রয়যোগ্য চাউলের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টন-অর্থৎ মোট উৎপাদন থেকে বীজ ও অপচয় বাবদ শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ। গত ২১ শে জুলাই তারিখে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেছে, এই ১২ লক্ষ টন বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের ৬ লক্ষ টনের হিসাব পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৬ লক্ষ টন কোথায় গেল? তার বেশীটাই মজুত হয়ে আছে। সরকার চাউল কলের উৎপাদনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ লেভী ধার্য করে আদায় করেন। পশ্চিম বাংলার প্রায় ৬০০ চাউল কলে ৭ লক্ষ টন চাউল বছরে উৎপাদিত হয়। এ-যাবৎ চাউল-কলগুলিতে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন উৎপাদিত হয়েছে। আগামী মাসগুলিতে চাউলকলগুলি থেকে আরও ২ লক্ষ ২০ হাজার টন উৎপাদনের আশা আছে, যদিও তার নিশ্চয়তা কিছু নাই। যে চাউল ইতিমধ্যে উৎপাদিত হয়েছে, তার মাত্র একলক্ষ টনের কাছাকাছি লেভীর সূত্রে সরকারের হাতে এসেছে। এ-ছাড়া যে মাসের মজুদ দখলে সামান্য কিছু—লাখ দুই মণ—সরকারের হস্তগত হয়ে থাকবে। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাউলের বৃহদংশই সরকারী আয়ত্তের বাইরে থেকে মজুতদার-মুনাফাবাজ-কালোটাকারচক্র কবলিত হয়ে নির্বাধ মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

'হোর্ডিং' অর্থাৎ মজুত, কোনো নূতন কথা নয়। সমগ্র দেশে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, এ তথ্যও স্বীকৃত। অবশ্য, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইতিপূর্বে মজুতদারের অস্তিত্ব স্বীকার করতে যথেষ্ট কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৩এর অক্টোবরে চাউলের বাজারে চরম মুনাফাবাজী ও মজুতদারীর আঘাতে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ যেসময় জর্জরিত, সেদিনও মুখ্যমন্ত্রীর পাইকার ও আড়ৎদারদের তারিফ করে বলতে বাধে নাই 'এদের হাতে চাউল মজুত থাকার কোনো লক্ষণ দেখছেন না।' এবং বৃহৎ উৎপাদকদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে তিনি বলছেন এরা "যদি দু'পয়সা পায় তাতে আপত্তি কেন?" (আনন্দ-বাজার ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৩) এবার অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর মতের পরিবর্তন হয়েছে, 'মজুত আছে।' পরিবর্তিত অবস্থায় এ-মত প্রকাশে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মজুত সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন।

১৯৫৭ সালেও তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন ব্যবসায়ীদের মজুতদারীর দায়ে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেন নাই। যদিও মজুত-নিরোধে কোনো কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণে ভারত সরকার এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ ১৯৬৩সালের জুলাই মাসে আরও সরব হয়ে ওঠে। এ-সময় তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আক্ষেপ করে বলেন ব্যবসায়ীরা প্রান্তিক ঘাটতির (marginal shortage) সুযোগ নিয়ে খাদ্যশস্যের দর চড়িয়ে দিচ্ছে। অতএব, কৃষকের ধান সরাসরি সংগ্রহ করে এদের কাবু করতে হবে। এমন কি একই সময়ে ব্যবসায়ীদের পরমবন্ধু তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস, কে, পাতিল পর্যন্ত "ফুড গ্রেণ ডিলার্স এসোসিয়েশনের" পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে ব্যবসায়ীদের চোখ রাঙিয়ে বলেন : 'হয় মুনাফাবাজী বন্ধ কর, নয় তো রেশন ও কণ্ট্রোলের জন্য তৈরী থাকো।' অবশ্যি এই পাতিল সাহেবই আবার '৬৩র ১৩ই আগষ্ট তারিখে লোকসভায় বলতে দ্বিধা করেন নাই : খোলা-বাজারে মূল্যস্তর ওঠা-নামার জন্য তিনি দায়ী নন, ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনায় তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন উঠেছে মূল্যস্তর বৃদ্ধির হারের সুস্থ সীমার পরিমাপ কি? শতকরা কি হারে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেলে, আর্থিক বিন্যাস বিপন্ন হবে না? প্রথম পরিকল্পনায় পাইকারী মূল্যস্তরের সাধারণ সূচক শতকরা ১৮·৪ ভাগ হ্রাস পেলেও, দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে এই সূচক শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। ১৯৫৬-৫৭ সালে পাইকারী মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭·৬ ভাগ, ৫৮-৫৯ সালে শতকরা ৬·৬ ভাগ, ৫৯-৬০ সালে শতকরা ৫·৮ ভাগ এবং ৬০-৬১ সালে শতকরা ৭·২ ভাগ। ৬৩-৬৪ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯·৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে কোনো একবছরে মূল্যস্তর বৃদ্ধির পরিমাণ এতো অধিক হয় নাই। প্ল্যানিং কমিশনের অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের সদস্য এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ডীন ডঃ এ, এন, আগরওয়ালার মতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর থেকে শতকরা ৭ ভাগেরও বেশী প্রতি বছরে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। তার মতে গত কুড়ি বছরে টাকার মূল্য ১৭ পয়সায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালের ২৯শে জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৎকালীন গভর্ণর শ্রী এইচ, ভি, আর আয়েঙ্গার বোম্বাইতে এক বক্তৃতায় (B. F. Madan Memorial Fund lecture) মূল্যস্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন "I would see no reason for alarm and despondency in a price increase of 2 to 3% per year for periods provided it is possible for us to keep the price level steady for a time and possible to secure some reduction in it at times, particularly in respect of essential commodities." অর্থাৎ, বছরে শতকরা ২ কিম্বা ৩ ভাগ মূল্য বৃদ্ধিতে কোনো উদ্বেগের কারণ নাই, তাও যদি কয়েক বছর পর্যন্ত মূল্যস্তর স্থির রাখা যায় এবং মাঝে মাঝে তা হ্রাস করা যায়, বিশেষ ভাবে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের বেলায়। তারপরই শ্রী আয়েঙ্গার বলছেন "on the other hand it is impossible to ignore the fact that during the last 5 years there has in fact been a continuous increase in prices at the rate of 6% per year. At no point in the second plan has the rise been punctuated by a reduction in the price level except for temporary seasonal fluctuations of minor consequences." অর্থাৎ, অপরপক্ষে, গত পাঁচ বছর একাদিক্রমে বছরে শতকরা ৬ ভাগ হারে মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ঋতু পরিবর্তনজাত কারণে মূল্যের সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়া কোন সময়ই মূল্যবৃদ্ধিতে ছেদ পড়ে মূল্যস্তর হ্রাস পায় নাই।

মূল্যস্তরের এই অপ্রতিহত ঊর্ধ্বগতির একটি মাত্রই তাৎপর্য রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বহুলোকের পক্ষে চাল, আটা, তেল, চিনি, মাছ, জ্বালানি, বাড়ী ভাড়া, যানবাহনে যাতায়াতের ব্যয় ইত্যাদি, জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণগুলি সংগ্রহ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন দ্রব্যের এবং সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্যের মূল্যস্তর সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে গিয়ে, বঞ্চনার অভিশাপ ও দারিদ্র্যের দংশন তীব্রতম আকার ধারণ করেছে। মূল্যবৃদ্ধির অপর নাম দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি। খাদ্যশস্য, সাধারণের ব্যয়-বরাদ্দের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে—শতকরা ৪০ থেকে ৬০—তাই খাদ্যশস্যের মূল বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এদিকে, মুদ্রাস্ফীতির দুরন্ত প্রবণতা মূল্যবৃদ্ধিরও নিয়ামক বটে। তাই 'ডেফিসিট ফিনান্সিং'-এর পরিমাপের মধ্যেও মূল্যবৃদ্ধির উৎস নিহিত রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর ক্রমবর্ধমান অপ্রত্যক্ষ শুল্কবৃদ্ধিরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ফাঁপাই মুদ্রার প্রচলনবৃদ্ধির পরিমাপও তাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিকল্পনায় তার পরিমাণ ছিল ৩৩৩কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪৮ কোটি টাকার কোঠায় পৌঁছেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ডেফিসিট ফিনান্সিং ৫৫০ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট করে দিলেও, এই পরিকল্পনায় তিন বছরে তা দাঁড়িয়েছে ৬৭৪ কোটি টাকা। সুতরাং, প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে, না কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সম্পদের আহরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ-সকল খাতে ব্যয়ের সীমানা নির্ধারিত হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালের প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা খাতের ব্যয়বরাদ্দ ১৪৪৩ কোটি টাকা ৬৩-৬৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ-বছরে তার পরিমাণ ২৪৫০ কোটি টাকা। ৭০ কোটি টাকা ব্যয় সঙ্কোচের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও অনুরূপ ব্যয়সঙ্কোচের আবেদন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী মূল্যস্তরের উপর চাপ কমাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও সকল দপ্তরের ব্যয়বাহুল্য কমাবার এবং অনারব্ধ বৃহৎ শিল্পের ব্যয় স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে মূল্যস্তর বৃদ্ধিরোধের পথ বাতলেছেন। কিন্তু এই ধরণের শুভেচ্ছার ক্ষীণ প্রয়োগ সঙ্কট উত্তরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী গত জুনমাসে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে মূল্যবৃদ্ধিকেই দেশের সব চাইতে গুরুতর সমস্যা-"most serious problem"—বলে চিহ্নিত করেছেন। তারও অনেক পূর্বে ১৯৬৩ সনের ১১ই অক্টোবর তারিখে মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী তার বেতারে ভাষণে বলেন: "আমাদের আর্থিক বিন্যাসে প্রচুর কালোটাকার আমদানী হয়েছে, যে টাকায় ফাটকা কারবার চলে এবং যে টাকা বিশেষ করে খাদ্যের ফাটকায় নিয়োজিত হয়।" কালোটাকার সঠিক হিসাব কেউ জানেন না, কেউ বলছেন ১০০০ কোটি টাকা, কেউ বলছেন ৩০০০ কোটি টাকা কেউবা বলছেন ৫০০০ কোটি টাকা। কিন্তু কালোটাকার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে সরকার পক্ষ নিঃসন্দেহ। কারণ, কালোটাকার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সদস্যেরা, নানা সময়ে গভীর অভিযোগ তুলে এসেছেন। তবুও কালোটাকার কারসাজি দমনে এ-পর্যন্ত কোনো তৎপরতা তারা দেখান নাই। সুতরাং, কালোটাকার সঙ্গে দীর্ঘ সময় এভাবে সরকারী সহ-অবস্থানের পর অর্থহীন আত্মবিলাপ করে মন্ত্রীবর্গরা আত্মধিক্কারই দিয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারী আচরণও মুনফাবাজ-মজুতদারদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের ন্যায়। 'অলইণ্ডিয়া ফুড গ্রেণ ডিলার্স এসোসিয়েশনের' সভা-সমিতিতে খাদ্যমন্ত্রীরা একদিকে ব্যবসায়ীদের প্রতি করুণ আবেদন জানিয়ে মূল্যস্তরবৃদ্ধিরোধে

সহযোগিতা চাইছেন এবং অন্য দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছেন অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। সরকারের এই অসহায় মানসিকতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে ব্যবসায়ীরা কখনও আদৌ পশ্চাদপদ হন নাই। বরং, সরকারের উপরোধ ও অনুরোধ-ভীতিপ্রদর্শনচক্র, তাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষারই উদ্রেক করেছে। এই সেদিনও—গত ২০শে জুন তারিখে—যে সময়ের মধ্যে খাদ্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাউলের বাজারমুখীন স্রোত ক্ষীণ হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে নূতন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি, সুব্রহ্মনিয়ম কি অসহায়ভাবে আবেদন জানালেন ফুড গ্রেণ ডিলার্স এসোশিয়নের সদস্যদের কাছে মূল্যবৃদ্ধিরোধে আত্মসংযমের জন্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য! শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম মুনাফাবাজ-মজুতদারদের কাছে সরাসরি আত্মসমর্পণই করলেন, এই এসোসিয়েশনের সদস্যদের কাছে, তার উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে: (১) বর্তমান আকাশচুম্বী মূল্যস্তরের অধিকমূল্যে যেন ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য বিক্রয় না করেন (২) এমন কোনো মূল্যে তারা খাদ্যশস্য ক্রয় করবেন না, যার ফলে বর্তমান মূল্যস্তরের চাইতেও অধিকমূল্যে তারা খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হন। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম তাদের একথাও মৃদুভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেহেতু বিক্রয়ের জন্য বাজারে সরবরাহের পরিমাণ কম, অতএব উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের হাতে সারা বছরের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রচুর শস্য অবশ্যই মজুদ রয়েছে। তারপরই সেই পরিচিত হুমকিও দিয়েছেন 'if traders did not behave stern action would be taken.' এই 'কঠোর ব্যবস্থার' গতানুগতিক ধমকানি মুনাফাবাজদের মুখে নিশ্চয়ই বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তুলে চলেছে! কিন্তু কি সেই 'কঠোর ব্যবস্থা' তা আজও ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেলো! গত ৮ই আগষ্ট তারিখে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী শেষবারের মত মজুতদারদের সতর্ক করে দিয়ে দুই সপ্তাহের সময় দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে মজুদ বাজারে না আনলে কঠোর শাস্তিমূলক—'drastic penal action' ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কি সেই 'কঠোর ব্যবস্থা' তা উহ্য থাকার ফলে প্রধানমন্ত্রীর এই হুমকি মামুলি ধমকের চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্জন করবে তা ভাববার কারণ নাই।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণও মজুদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে সমাজবিরোধীদের উচ্ছেদ করে খাদ্যে সমবণ্টন সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন "আমাকে অনেকেই জানিয়েছেন—আমার সংবাদ ভুলও হতে পারে—আজও দেশে প্রচুর খাদ্যের সংস্থান রয়েছে। যারা অবাধ বণ্টনের পথে অন্তরায় হয়ে আত্মস্বার্থ বিস্তারের সুযোগ সন্ধান করছেন, তাদের মূলোচ্ছেদ করে যদি আমরা মজুদ খাদ্য উদ্ধার করতে পারি, তবে আমাদের দেশবাসীর খাদ্য সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। আমার বিশ্বাস আছে, আমরা সেকাজ করতে পারবো।" কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের কণ্ঠেও অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের মতটা একটু ভিন্নতর। তার মতে, উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য; সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগেরও কোনো কারণ নাই এবং আরও দীর্ঘকাল দেশবাসীকে মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে জর্জরিত হবার জন্য প্রস্তুতও থাকতে হবে। শ্রীঘোষকে একথাও বলতে শোনা গেছে যে কংগ্রেস সদস্য হয়েও মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগের প্রবণতা যাদের রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানে তাদের স্থান নেই। মজুতদারের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস পক্ষ থেকে কোনো অভিযান পরিচালনায় শ্রীঘোষের ব্যগ্রতা নেই। কারণ, সরকারই এই অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট এবং সরকার যদি কখনও সংগঠনের সাহায্য চান সে-সময় কংগ্রেস সংগঠন তৎপর হতে পারে। সাধারণের প্রাত্যহিক বক্তার

অবসানকল্পে কংগ্রেসের নিরুত্তম দর্শকের ভূমিকা, সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভিনব বটে! মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে গোটা পরিকল্পনাই যে বানচাল হয়ে যাবে, যদি মূল্যস্তর বেঁধে না ফেলা না যায়, অর্থনীতির এই স্বতঃসিদ্ধ সূত্রটিকেও নস্যাৎ করে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির তাত্ত্বিক অবশ্যম্ভাবিতা, শ্রীঘোষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছেন! আর একটি তত্ত্বও শ্রীঘোষের অস্ত্রশালায় মূল্যবৃদ্ধির সমালোচকদের বিরুদ্ধে সঙ্গিনের মত উঁচিয়ে আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই তত্ত্বও অহরহ উচ্চারণ করে মূল্যবৃদ্ধির গতিবেগকে সমর্থন জানাতে শ্রীঘোষ কখনও ভুল করেন নাই। একথা নিশ্চিত যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে খাদ্যের যোগানের হারের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি করবে। প্রতিবছর বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য বছরে অন্তত শতকরা ৩ ভাগ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অনিবার্যতা রয়ে গেছে। সেদিক থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দু বছরের খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ খুবই হতাশাব্যাঞ্জক। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের পারম্পর্য কোথায়? ১৯৬৩ সালে যখন মাত্র পাঁচ-ছয়মাসের মধ্যে চাউলের মূল্য শতকরা ৯০।১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেলো, তখনও শ্রীঘোষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব দিয়ে সে অস্বাভাবিক অবস্থার মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নিরত ছিলেন। সেই পাঁচ-ছয়মাসের মধ্যে জনসংখ্যা বড়জোর শতকরা দেড়ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে! শ্রীঘোষ দেশবাসীকে কি এতই নিরেট মনে করেন? শ্রীঘোষের বোধ হয় জানা নেই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমগ্র দেশে এ বছর মাথাপিছু খাদ্যশস্যের সরবরাহ গত বছরের চাইতে বেশী। এ-সংখ্যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের। কিন্তু তত্ত্বের আবরণে ভয়ঙ্কর বাস্তবকে অন্তরালবর্তী রাখার কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচেষ্টার মাঝখানেই পরিস্থিতির রুদ্র প্রকাশ সুরু হয়ে গেছে। গত ২৪শে জুলাই নয়া দিল্লীতে পঞ্চায়েত রাজ ও কম্যুনিটি উন্নয়নের রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কম্যুনিটি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী-এস, কে, দে আসন্ন সঙ্কটের স্বরূপ উপলব্ধি করে যথার্থই বলেছেন 'যদি ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণের কাছে খাদ্য পৌঁছান না যায় অনিবার্য দাঙ্গা গণতন্ত্রের বুনিয়াদ বিপন্ন করে তুলবে।' উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বঙ্গ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে খাদ্য-লুঠ ইতিমধ্যে সুরু হয়ে গেছে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম বলেছেন: 'আগামী দুইমাস খুবই সঙ্কটকাল।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্কট উত্তরণ হবার পন্থা কি—এবারের কিম্বা আগামীদিনের সঙ্কট? প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কোথায়? গত জুন মাসে এই উত্তর-সন্ধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছিল। সে সম্মেলনে কোনো মৌলিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, নিজ নিজ রাজ্যের চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আদায়ের চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীরা কর্তব্য সমাধা করেছিলেন। মজুত দখল, মূল্যহ্রাস কিম্বা মূল্যরোধ, কালোটাকার উৎস সন্ধান, উৎপাদন, বণ্টন, উৎপাদকের জন্য নিম্নতম মূল্য, ক্রেতার জন্য উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ, এই মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান এই সম্মেলনে অনুচ্চারিত থেকে গেলো। কেন্দ্রীয় সরকারের পরম নির্ভরস্থল পি, এল—৪৮০, মার্কিণী আইন অনুযায়ী, মার্কিণী সাহায্যপুষ্ট গম ও চাউলের সঙ্কটত্রাণ ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে আরও গম-চাউলের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভাণ্ডারের উপর একান্ত নির্ভরতা এবং রাজ্য-সরকারগুলির কেন্দ্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উৎপাদন বৃদ্ধির মানসিকতা বহুলাংশে বিনষ্ট করেছে। খাদ্য সমস্যার মৌলিক সমাধান সন্ধানে অবহেলা কিম্বা উপেক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীদের উপর বর্তায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বও এ-বিষয়ে সমধিক। কারণ, ১৯৫৭ সালের 'ফুড গ্রেণস ইনকোয়ারী কমিটির'—অশোক মেহতা কমিটি—

সুপারিশগুলির প্রয়োগের কোনো উদ্যোগেই গত সাত বছরের মধ্যে হোলো না। এই কমিটির তিনটি মূল প্রস্তাব: উৎপাদকের জন্য নিম্নতম ও ক্রেতাদের জন্য উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ; খাদ্যশস্য মূল্যস্থিতি বোর্ড; এবং খাদ্যশস্যের ধীর রাষ্ট্রীয়করণ। অতঃপর, গত জানুয়ারীতে ভুবনেশ্বরে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী বেসরকারী চাউলকলগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাবটিও জুনমাসের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে তলিয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী গত ২৭ শে জুলাই মূল্যস্তররোধের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চল খাদ্য এলাকার মূল্যক্রম ১লা আগষ্টের মধ্যে নির্ধারিত হবে; অন্যান্য এলাকারটা পরবর্তী সময়ে চালু হবে। জানুয়ারী মাস থেকে ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন চালু হবে। এই করপোরেশনের জন্য রেলে খাদ্য চলাচলের একাধিকার স্বীকৃত হবে। আগামী বছরের জন্য উৎপাদক, পাইকার ও খুচরাবিক্রেতার জন্য খাদ্যশস্যের মূল্যক্রম স্থির করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। অপর একটি কমিটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উৎপাদকের মূল্যক্রম নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত হবে। এ ছাড়া গুড়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং চিনিশিল্পের মূল্যক্রম ও বণ্টনের ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। সরকার আহারযোগ্য তেলের অভাব মেটাবার জন্য একলক্ষ টন সোয়াবীনের তেল আমদানী করবেন। এই প্রস্তাবগুলির প্রয়োগে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও আশু সঙ্কট সমাধানের কোনো নির্দেশ পাওয়া যাবে না। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত দখলের জন্য ভারত রক্ষা আইন অনুসারে নিম্নতম মজুদের ঊর্ধে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ঘোষণা করতে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-সাধারণকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা থাকলেও বাঙলা দেশে অক্লেশে এই আইন লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা এই ব্যবস্থার সুফল সম্বন্ধে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী মজুতদারদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে বলেছেন, এবছর গতবছরের চাইতে চাউলের ৪০ লক্ষ টন বেশী যোগান রয়েছে, চাউলের আমদানী প্রতিবছরের চাইতে পাঁচ-সাত লক্ষ টনের কিছু বেশী হবে; এ-বছর গমের উৎপাদন ৯৭লক্ষ টন,—অন্যান্য বছরের তুলনায় ২লক্ষ টন কম হলেও,—অন্যান্য বছরের ২৫লক্ষ থেকে ৩০লক্ষ টন আমদানী করা গমের পরিবর্তে ৬৫ লক্ষ টন আমদানী করা গম সরকার বিলি করবে। এ-সব সত্ত্বেও এ-বছর মূল্যবৃদ্ধি, চাল গম দুষ্প্রাপ্য, মজুতদারের গোপন গুদামে আটক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা সরকারের অবিমৃষ্য-কারিতার ক্লেদাক্ত চিত্র সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীমন্নারায়ণ উদ্ঘাটন করেছেন। পশ্চিম বাংলার কৃষিখাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৭·৭৬ কোটি বরাদ্দ অর্থের মাত্র শতকরা ৩১ ভাগ তিন বছরে ব্যয়িত হয়েছে। চতুর্থ বছরে আরও শতকরা ত্রিশ ভাগ ব্যয়িত হলেও, পঞ্চম বছরে অবশিষ্ট চল্লিশ ভাগ ব্যয় করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ৫ লক্ষ টন সার ব্যবহারের লক্ষ নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিন বছরে মাত্র ৭৫হাজার টন সার ব্যবহৃত হয়েছে। সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গেও ভূমি-ব্যবস্থা উৎপাদন উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

সঙ্কটের ঘনঘটার আশু প্রতিকার চাই। লক্ষ্যহীন স্তোক-বাক্য, অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, মূল্য-বৃদ্ধি ও খাদ্য সঙ্কটের প্রত্যাসন্ন দাবানল রোধ করতে ব্যর্থ হবে। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত,—যা মজুতদার-মুনাফাখোর-কালোটাকার কারবারীদের করায়ত্ত হয়েছে,—কঠোর শাস্তি প্রয়োগে দ্রুত উদ্ধারে সরকারী সক্ষমতা ও কালোটাকার দ্রুত উদ্ঘাটন, পরিস্থিতির অবনতি রোধ করতে পারবে। এ-যাবৎ এই সঙ্কট নিরসনে সেই কঠিন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরের পরিবর্তে কালক্ষেপণ চলেছে। কিন্তু কাল নিরবধি হলেও, বঞ্চনার এবং পীড়নেরও সীমা আছে। সমগ্র দেশ আজ সেই সীমান্তের সমীপবর্তী।

১১. ৮. ৬৪

পূর্ব-এশিয়া পরিক্রমা

ডঃ সুকুমার দত্ত

[জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর। এই সংখ্যায় সমাপ্ত]

সিংহল-ভ্রমণ

কলোম্বোতে আগমন

সিঙ্গাপুরের বন্দর ছাড়িয়া স্ট্রেইট্ অব্ মালাক্কা (Strait of Malacca) দিয়া ভারত মহাসাগর পাড়ি ধরিলাম। সিংহল পর্য্যন্ত চারদিন চাররাত।

যাঁহারা অর্ণবপোত চড়েন নাই, তাহাদের জন্য লিখিতেছি সমুদ্রের দৃশ্য সর্ব্বত্রই এক ও অদ্বিতীয়। দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত একটানা নীল জলের বিস্তার, ঢেউগুলির অবিশ্রাম ওঠা-নামা লুটাপুটি, দূরে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় অপস্রিয়মান ফেনপুঞ্জ,— আলোর ছোঁয়া পাইলে চিক্‌মিক্ করিয়া ওঠে। আকাশে কোথা হইতে দুই একটি পাখী কোথায়, কোন্ নিরুদ্দেশ নীড়ে ভাসিয়া যায়; ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক এক ঢেউএর মাথা হইতে আর ঢেউয়ের মাথায় প্রায় জল ছুঁইতে ছুঁইতে উড়িয়া যায়। এই সব মাছের কি রকম চেহারা দেখিতে পাই নাই—দূর হইতে উড়িতে দেখিয়াছি। সাগর, উপসাগর, সমুদ্র, মহাসমুদ্র,—যে কোনও ভৌগলিক নামে অভিহিত করুন,—এই জলরাশির বাস্তবিক কোনও ছেদ কোনও বিভাগ নাই।

দৃশ্য একই রকমের, তবে পট পরিবর্ত্তন হয় যখন আকাশে ওঠে মেঘ, বাতাসের বেগ বাড়ে, ঢেউয়েরা ছেলেখেলা ছাড়িয়া সিংহগর্জনে লাফাইয়া ওঠে। আমরা এ-অবস্থায় কখনও পড়ি নাই। মৃদু মৃদু দোল খাইয়া চলিয়াছি অবিরাম ছন্দে। এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাইতে,—হয়ত তিন দিন, চারদিন বা পাঁচদিনের পথ,—জাহাজের গতি চব্বিশ ঘণ্টায় এক মুহূর্ত্তও থামে না।

এই অবিশ্রান্ত অক্লান্ত যান্ত্রিক গতির উৎস মুখ কোথায় দেখিতে একদিন আমরা এঞ্জিন রুমে নামিয়াছিলাম। ডেকের নীচে দুই তিন প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিতে হয়। অন্ধকার,—বাহিরের আলো আসে না, সর্ব্বক্ষণ বিজলি বাতি জ্বালানো থাকে। সমস্ত ঘরটা নানা আকার-প্রকারের বড় বড় কল কব্‌জায় ঠাসা। তাহার ব্যবহার Marine Engineer ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। সমস্ত ঘরটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। "কত নীচে আসিয়াছি" জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্গীয় জাপানী ইঞ্জিনিয়ারটি বলিলেন: "সমুদ্রের বক্ষ হইতে সাত-আট ফুট নীচে।" আরও নীচে যাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন: "সেখানে ঢুকিতে পারিবেন না। বড় বড় ঘনীভূত ডিসেল তেলের খণ্ড সেখানে মজুদ আছে আরও একপ্রস্থ সিঁড়ির নীচে।" এঞ্জিন রুমের কাঁপুনিতে কোথায়ও আমার পা পিছ্‌লাইয়া দুর্ঘটনা হইতে পারে এই ভয়ে স্ত্রী একটু ভীত হইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম,— যেন ময়-দানবের বিরাট্ কর্ম্মশালা দেখিয়া আসিলাম।

চোখের দেখা মাত্র,—কারণ কোন্ যন্ত্র কি ভাবে চালাইতে হয় ও কাহার কার্য্য কি, এ সব ব্যাপার অর্ণবপোতের যন্ত্র-বিজ্ঞানবেত্তা (Marine Engineer) স্বয়ংই জানেন। প্রত্যেক জাহাজ প্রায় ছয় জন Marine Engineer সঙ্গে লইয়া চলে।

সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি আজকাল কচিৎ-কখনো ঘটে। কিন্তু প্রত্যেক ক্যাবিনে এরূপ দুর্ঘটনায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিধেয় একটি দেরাজে রাখা হয় ও সপ্তাহে একবার ইহা পরিয়া যাত্রীরা সমবেত হইয়া ডেকের উপর ড্রিল (Drill) করিয়া আসেন। জাহাজ জলমগ্ন হইতে আরম্ভ করিলে যাত্রীরা কি করিবেন এই ড্রিল উপলক্ষে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। পোষাকটি রবারের। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একজন ইতালীয়ান নাবিকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। "এটি পরিয়া আপনি সমুদ্রে পড়িলে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা ঢেউয়ের ধাক্কা খাইতে খাইতে ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ আপনাকে দেখিয়া নৌকায় তুলিয়া লন, তবে আপনার পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা পাইল। নতুবা (ঈষৎ হাস্য সহকারে) অতলের তলে আপনার জন্য একটু স্থান-সঙ্কুলনাত হইবেই।"

যাহা হউক ভারত মহাসাগরের তলে স্থান পাইবার কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা ছিল না। আকাশে ছিল না একটুও মেঘের ছায়া, বাতাসে ছিল না এতটুকু মাতলামি। দিনের বেলায় উপরের ডেকে সমুদ্রের দিগন্ত-প্রবাহী হাওয়া খাইয়া ও রাত্রে বল্-নাচ বা সিনেমার ছবি দেখিয়া কয়টা দিন মহা আরামে কাটিয়া গেল।

চতুর্থ দিন প্রত্যূষে দেখিলাম সমুদ্রের মধ্যেই জাহাজ খানি থামিয়া গেল। দূরে কলোম্বো বন্দরের বাড়ীঘরগুলি আকাশের পটে আঁকা। শুনিলাম জাহাজ আর অগ্রসর হইবে না,—জলের গভীরত্ব কম। কলোম্বো হইতে একখানা লঞ্চ আসিয়া যাত্রীদের পার করিবে। কিছু পরে লঞ্চখানি আসিয়া জাহাজের পাশে থামিতেই একজন আমাদের এক-খানা চিঠি দিয়া দাঁড়াইল। মর্ম্ম এই : "আপনারা জিনিস-পত্র ছাড়িয়া লঞ্চে চলিয়া আসুন। আমি বিদ্যালঙ্কার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার অবেকুন অপেক্ষা করিতেছি। পত্র বাহক আপনাদের মাল লইয়া আসিবে।" বিদ্যালঙ্কার কলোম্বোর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। ইহার ভাইস-চ্যান্সেলারের আমরা অতিথি হইব এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল।

লঞ্চে জলপথ পার হইয়া কলোম্বো সহরে পদার্পণ করিলাম। ভারতীয় দূতাবাস হইতে কয়েকজন ও অবেকুন সাহেব আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

লঙ্কা ও তেঁতুল

রেজিষ্ট্রার সাহেব মহা-সমাদরে আমাদের লইয়া সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী 'গ্রীনল্যাণ্ড' নামে একটি "ভারতীয়" হোটেলে উঠাইয়া দিয়া কাল আবার আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

হোটেলটি বড়। আমাদের থাকিবার জন্য একখানি বড় ঘরের ব্যবস্থা হইল। শুইবার, বসিবার, স্নানের বন্দোবস্ত খুবই ভাল। বিপদ্ হইল যে হোটেলটি 'ভারতীয়' বটে, কিন্তু 'দক্ষিণ-ভারতীয়।'

স্নানের পর দুইটি বড় বড় কাঁসার থালায় অনেকগুলি ছোট ছোট বাটি সাজাইয়া যে খাদ্য আমাদের পরিবেশন করা হইল তাহার একটু স্বাদ লইয়াই আমাদের চক্ষুস্থির।

দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য আমাদের অজানা ছিল না। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে আমরা পূর্ব্বে ঘুরিয়াছি। তেঁতুল, লঙ্কা ও নারকেল তেলের রান্না আমরা গলদশ্রুনয়নে উদরস্থ করিয়াছি। কিন্তু আমরা বিশিষ্ট বলিয়াই বোধহয় এই হোটেলে লঙ্কা-তেঁতুল-নারকেল তেল একটু বিশেষ পরিমাণে খাদ্যে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্ত্রী হাত গুটাইয়া প্রশ্ন করিলেন : 'এখন উপায়?' হঠাৎ-বুদ্ধি যোগাইয়া বলিলাম : 'দইত অনেক দিয়াছে। পাঁপর, চালের গুঁড়ার পিঠা, যাহার নাম 'ইড্‌লি', ও ভাত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আছে। প্রত্যেকটার সঙ্গে দই মিশাইয়া খাইলেই হইবে।' দধির অম্লত্ব ছিল খুব উঁচু মাত্রার, কিন্তু লঙ্কার দুর্বিসহ ঝাল প্রশমনের জন্য যথেষ্ট নয়। অবশেষে পাঁপর ও চালের গুঁড়ার 'ইড্‌লি' নামক পিঠা দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম।

পরের দিন সকালে মিঃ অবেকুন উপস্থিত। আমরা আরামে আছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমি আহার্য্যের বিষয় একটু ইঙ্গিত করিলাম। মিঃ অবেকুন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। "আপনারা আপনাদের দেশীয় খাবার পাইবেন বলিয়াইত এখানে আনিয়াছি। উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের খাদ্যে যে এত বিষম তফাৎ ত জানিতাম না। একটু অপেক্ষা করিতে পারিলে আপনাদের জন্য সহরের মধ্যে কোনও ইংরাজি হোটেলে বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারি।" আমি বারণ করিলাম: "আমরা ত এখন নানাস্থানে ভ্রমণে-বাহির হইব। এই বন্দোবস্তই সম্প্রতি থাকুক। অসহ্য হইলে বলিব।"

সেইদিন বিকাল বেলা বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয় দেখাইবার জন্য আবার অবেকুন আসিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সনের 'বিদ্যোদয় ও বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়' আইনের ভিত্তিতে গঠিত, কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত নয়। ঐ আইনের প্রস্তাবনা-অংশেই লেখা আছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি সিংহলের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই দেশে যে 'পরিবেন' নামে বৌদ্ধবিদ্যালয় প্রচলিত ছিল, ইহা তাহারই পরিণতি।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্র (পালি-ভাষায় ও সিংহলে প্রচলিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের) সর্ব্বপ্রধান। অধ্যক্ষ (Vice-chancellor) মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি একজন 'থের'-পদবীর বৌদ্ধ-পণ্ডিত। ইংরাজিতে কথা বলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত ক্যাম্পাস্‌টা (Campus) দেখিলাম। অনেক শিক্ষার্থী ভিক্ষু ছাত্রাবাসে থাকেন। শিক্ষকদের মধ্যে ভিক্ষুশ্রেণীরই বেশীর ভাগ।

একজন ছিলেন যিনি বাঙ্গালী ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নন,—এখানকার ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়। ইহাকে আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। চা'-পানের জন্য ইঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বহুবৎসর কলোম্বোতে অধ্যাপনা করিতেছেন ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫৯-১৯৬০ সনে যে দুইখণ্ডে সিংহলের ইতিহাস (History of Ceylon) প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাসে কি কি উপাধি আছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন: "ফোঁটা-তিলক সবই আছে। তাহার গুণে যদি দেশের কোন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি পাই ত বাঁচিয়া যাই।" পরে জানিলাম ইনি ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম্‌ এ পাশ করিয়া পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধি পাইয়াছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইঁহাকে কলোম্বোতে পাঠাইয়া ছিলেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে আমাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে একটি সভা হয়। বৌদ্ধপ্রথায় অভ্যর্থনা। সকল অধ্যাপক সমবেত হইলেন একটি গোল টেবিল ঘিরিয়া। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের লইয়া সামনে বসিলেন। কোনও বক্তৃতা হইল না। সকলে সমবেতভাবে পালিভাষায় আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পাঠ আবৃত্তি করিলেন। পালিভাষা ইঁহাদের কাছে জলবৎ তরলম্। আমার বুঝিতে শক্ত লাগিতেছিল।

সন্ধ্যায় 'গ্রীনল্যাণ্ডে' ফিরিয়া আবার সেই লঙ্কা-তেঁতুলের প্রাণান্তকর দুর্ভোগ।

কলোম্বো হইতে পেরাডেনিয়া

পরদিন সকালে মিঃ অবেকুন বিদ্যোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। বিদ্যালঙ্কার ও বিদ্যোদয় দুইটি একই ছাঁদের—sister university বলা যায়। উভয়েরই একজন (মিঃ অবেকুন) রেজিষ্ট্রার। এখানেও প্রধান অধিতব্য বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পালি সাহিত্য।

প্রায় সকল অধ্যাপকই পালি ভাষায় ও সাহিত্যে পণ্ডিত। ইঁহাদের দলে পড়িয়া নিজকে 'হংস মধ্যে বকো যথা' (ইঁহাদের তুলনায় পালি ভাষায় প্রায়-মূর্খতা) মনে হইতেছিল। যদিও আমার বকত্ব বা বোকামি এই পণ্ডিতদের

কাছে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু নিজের কাছে জাজ্বল্যমান হইয়াছিল পেরাডেনিয়ার গ্রন্থশালায়। সে কথা পরে আসিবে।

সন্ধ্যাকালে কলোম্বোর উপকণ্ঠে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির দেখিতে গেলাম। সঙ্গী অবেকুন ইহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছিলেন।

মন্দিরটি বৃহৎ,—বহুবিস্তৃত অঙ্গন ও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। সামনের কোঠায় ভগবান্ বুদ্ধের বিগ্রহ পূজা পায় বটে, কিন্তু পাশের একেকটি কোঠায় প্রতিষ্ঠিত শিব, স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) এবং হিন্দু পুরাণের দেবদেবী। সেখানেও সিংহলীদের ভিড় কম নয়। বুদ্ধের সহিত সকল দেবদেবীরাও পূজা পাইতেছে ও বুদ্ধ বিগ্রহের পা'য় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজারিরা অন্য সকল ঘরেও অঞ্জলি দিতেছে।

সিংহলের ইতিহাসে ইহার কারণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাবিত এই দেশেও মাঝে মাঝে হিন্দু ধর্ম্ম মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিত। যাঁহারা পণ্ডিত নন, সাধারণ মানুষ, তাঁহারা কে পূজার্হ আর কে পূজার্হ নয় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে বসিত না। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', এই কূট প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া হস্তে গৃহীত হবির্ভাগ বৃথা গলাইয়া ফেলিতে চাহে নাই। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় বা সমন্বয়ের চেষ্টা সিংহলে কখনও হয় নাই। এইরূপ মিশ্র পূজার প্রথা হিন্দু-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে যে স্তরের লোকেরা পালন করে তাহারা সমাজের উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চ গ্রামের লোক নয়। এরূপ পূজা সাধারণ মন্দিরগুলিতেই হয়, বিহারের সংলগ্ন কোনও মন্দিরে দেখি নাই। সেখানে একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধেরই বিগ্রহ।

কলোম্বো হইতে পেরাডেনিয়া যাইতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইলের পথ। যে প্রদেশ দিয়া যাইতে হয় তাহাকে এখানে সিংহলের 'শুষ্ক অংশ' (Dry Zone) বলে। চারদিকে জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বসতি। বৃষ্টিপাত কম হয় বলিয়া বেশী চাষ-আবাদ নাই। পাহাড়ের পা বাহিয়া উঁচু নীচু পথ। এই রাস্তার উপরে পেরাডেনিয়ার একমাত্র বিশ্রামাগার (Rest House)। অপর পাশে সিংহলের কোনও ভূতপূর্ব্ব রাজার তৈরি ফল-ফুলের একটি সাজানো বাগান। আমরা এই বিশ্রামাগারে স্থান পাইলাম।

এখান হইতে একটা চড়াই বাহিয়া পেরাডেনিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাইতে হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটি কলোম্বোর বিদ্যোদয় ও বিদ্যালঙ্কারের মত 'পরিবেণ' নয়—আধুনিক আকারের। শিক্ষা-পদ্ধতিও আধুনিক। এখানকার প্রধান (Vice-chancellor) দেশ-জাতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত নন্, কলোম্বোর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার —নাম স্যার নিকোলাস অত্যাগল্লে (Sir Nicholas Attygalle)।

আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন: 'আপনাদের মুখে ছাত্রশিক্ষকেরা কিছু শুনিলে উপকৃত হইতেন। কিন্তু মুস্কিল যে এখন বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। কোনও সভা আহ্বান করা সম্ভব হইবে না,—পরে আমাকে একটি বিষম প্রশ্ন করিলেন: 'ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইল কেন? আপনার এ-সম্বন্ধে কি মত?' উত্তরে বলিলাম: 'অনেক ঐতিহাসিক কারণে। প্রধানতঃ এই যে গুপ্তযুগ হইতে ও প্রধানতঃ মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে পূর্ব্ব-কালের প্রভেদ আর বলবৎ রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক অংশ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

আমার এই নিদান ডাক্তার সাহেবের মনঃপুত হইল না। তাঁহার মতে ভারতবর্ষীয়দের মন অত্যধিক সংস্কারাপন্ন হওয়ায় কোন্ ধর্ম্ম ভাল কোন্ ধর্ম্ম মন্দ এই বিচারশক্তি ক্ষীণ। তাহা নহিলে এই পরম-বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়িয়া পাঁচমিশেলি হিন্দু-ধর্ম্মটাকেই তাহারা গ্রহণ করিবে কেন?

ইতিমধ্যে 'ফাইল' আসিতেছিল। একজন শিক্ষক অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের অশ্রদ্ধা প্রকাশ ও রাজনৈতিক

আন্দোলনে যোগদান সম্বন্ধে একটি সমস্যা লইয়া একখানা আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। অধ্যক্ষ-মহাশয়ের কাজের তাড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি তর্ক আর বাড়াইলাম না।

গ্রন্থাগারে কিছু সময় কাটাইলাম। এখানকার পুস্তক সংগ্রহ প্রশংসনীয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থগুলি সবই আছে। তাহার মধ্যে আমার লেখা বইগুলি দেখিয়া একটু নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিলাম। এগুলি বহু পাঠকের পঠিত হইয়াছে ও পৃষ্ঠাগুলির পাশে পাশে অনেক পেন্‌সিলের লেখা। আমার 'বুদ্ধ ও পরবর্ত্তী পঞ্চশতবর্ষ' (The Buddha and Five After-Centuries) বইখানি খুলিয়া একটি সংশোধন চোখে পড়িল। ইহার একজায়গায় একটি বিষম ভুল ছিল। বুদ্ধঘোষের 'বিশুদ্ধিমার্গ' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া 'সমাধি' সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে 'চিত্ত' লিখিয়াছিলাম। কোনও পাঠক (বোধ হইল কোনও পালির ছাত্রই হইবেন) পেন্‌সিলে ভুলটি সংশোধন করিয়া রাখিয়াছেন। পালি সাহিত্যের শিক্ষা ও চর্চ্চায় সিংহল দেশই সকল বৌদ্ধ দেশের অগ্রবর্ত্তী। এমন নিখুঁৎভাবে পালিভাষা ও সাহিত্য অন্য কোথায়ও পড়ানোও হয় না ও এত ব্যাপকভাবে তাহার অনুশীলনও নাই।

আশা করিয়াছিলাম পেরাডেনিয়ায় আমার পরিচিত ডঃ মালাল শেকরের সঙ্গে দেখা হইবে। তিনি এখানে পালি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যাপক ছিলেন। পদমর্য্যাদা এখন বাড়িয়াছে। প্রথমে সিংহলের রাষ্ট্রদূত হইয়া মস্কোতে ছিলেন, এখন U. N. O. এতে সিংহলের প্রতিনিধি হইয়া নিউইয়র্কে আছেন। ইনিই আমাকে বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও বৌদ্ধ বিহারের ইতিহাস লিখিতে উৎসাহ দিয়া ও শ্রী রাধাকৃষ্ণণকে চিঠি দিয়া এই পুস্তক খানি লিখিবার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'সিনিয়ার ফেলোসিপ' যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

আমার সঙ্গে দেখা হইল না বটে, কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকোষ (Buddhist Encyclopædia) সম্পাদন করিতেছেন তাহার আফিসটি এইখানেই। তদানীন্তন পরিচালক মিঃ দেবেন্দ্র আমাকে সেখানে নিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই বুদ্ধধর্ম্মকোষে আমার কিছু লেখাও বাহির হইতেছে। সম্পূর্ণ হইতে আরও দশবৎসর লাগিবে মনে হয়,—ব্যয়ভার সিংহল সরকারের।

পেরাডেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সেকেলে চেহারা বা প্রাচীন ধরণ নাই, যাহা কলোম্বোতে দেখিয়াছি। পাহাড়ের শীর্ষে,—সব বাড়ীগুলিই আধুনিক, সুন্দর, সুগঠিত বিশেষতঃ ছাত্রাবাসগুলি। অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে, কেহ কেহ নীচের জমিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে দু'তিন জন বাঙ্গালী।

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপকদের কেহ কেহ আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেন। তাহাদের মধ্যে একজন মিঃ পাচাও, অন্যজন ডঃ জয়বিক্রমে।

পাচাও চীনদেশীয়। অনেক বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। সিংহলে আসিয়া একটি সিংহলী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ইংরাজিতে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেন। পাচাও কয়েক বৎসর বিশ্বভারতীর চীনা ভবনে থাকিয়া এখন পেরাডেনিয়ায় অধ্যাপকতা করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। ইঁহার লিখিত ১৯৫৫ সনে বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'প্রাতিমোক্ষ' সম্বন্ধে একখানা সারগর্ভ গ্রন্থ আমার পড়া ছিল।

জয়বিক্রমে পালি সহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। ডক্তর উপাধিধারী। ইনি প্রায়ই আসিতেন। সিংহলে কি কি বৌদ্ধসম্প্রদায় আছে জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে একটি লিখিত বিবরণ দিয়া যান। তাঁহার লেখা আমার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

একদিন জয়বিক্রমে আমাদের কাণ্ডি সহর দেখাইতে তাঁহার গাড়ীতে লইয়া গেলেন। পাহাড়ের চূড়ায়,—

পেরাডেনিয়া হইতে কয়েক মাইল দূরে। একটি হ্রদের পার হইতে অনেক উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত। তীর হইতে খাড়া চড়াই-এর উপর অপরিসর রাস্তায় নানা বাঁকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোটর গাড়ীতে এতদূর উঠিতে ভয়-ভয় করিতেছিল।

উপরে সিংহলের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 'দন্তমন্দির' দেখিলাম। ইহার বিগ্রহগুলি কাপড় দিয়া ঢাকা, কি তাৎপর্য বুঝিলাম না। এই কাণ্ডিতেই ১৮১৫ সনে স্বাধীন সিংহলের শেষ অংশটুকু মিটাইয়া দিয়া ইংরাজেরা সমগ্র দ্বীপটি করায়ত্ত করেন। ফিরিবার সময় পথের পাশে কয়েকটি ভিক্ষুদের বিহারগৃহ। খড়ে ছাওয়া ছোট ছোট কুটির। জয়বিক্রমে পেরাডেনিয়ার অধ্যাপকদের লইয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁহার গৃহে একটি পার্টি দিয়াছিলেন।

অনুরাধপুর ও সিগুরিয়া

একদিন পেরাডেনিয়া হইতে বন্ধুবর দেবেন্দ্র সিংহলের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখাইবার উদ্দেশে একখানি মোটর গাড়ীতে স্বয়ং চালক হইয়া আমাদের লইয়া বাহির হইলেন।

প্রথম গেলাম অনুরাধপুরে। দেবেন্দ্রের পুত্র এখানকার ডেপুটি কমিসনার।

বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় দু'হাজার দুইশত বৎসর আগে বুদ্ধের বাণী সিংহল দ্বীপে প্রথম প্রচার করেন ভিক্ষু মহিন্দ (সংস্কৃতে মহেন্দ্র)। 'মহা বংশে' ও 'দীপ বংশে' তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী লেখা আছে। এই ঘটনা দিয়াই সিংহলের যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ।

তখন অনুরাধপুর ছিল রাজধানী,—রাজা ছিলেন দেবনাংপিয় তিস্স (দেবানাংপ্রিয় তিষ্য)। বুদ্ধধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও সমৃদ্ধি এই রাজধানীতেই হয়। ষোল শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত এই সহরই সিংহলের রাজধানী ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। ইহা বিধ্বস্ত হইলে রাজধানী সরিয়া যায় পোলোন্নরুভ সহরে ও রাজা পরাক্রম বাহুর শাসনকালে (১১৫৩—১১৮৯) বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান ও সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হয়।

অনুরাধপুর ছিল পুরাপুরি বৌদ্ধনগর। বৌদ্ধধর্ম্মের নানা প্রতিষ্ঠানই ছিল এই নগরের গৌরবময় কীর্ত্তি—বিরাট্ বিরাট্ সভামণ্ডপ, আকাশচুম্বী স্তূপাবলী, অসংখ্য বিহার ও বুদ্ধমূর্ত্তি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নানা নিদর্শন। কালের কীর্ত্তিনাশা স্রোতে অনেক কীর্ত্তিই মাটির নীচে ডুবিয়া গিয়াছে। পুরাতত্ত্বান্বেষীরা মাটি খুঁড়িয়া অনেক অতীত গৌরবের চিহ্ন বাহির করিয়াছেন। কিন্তু মাটির উপরে এখনও যাহা অবিকৃত আছে, তাহার মধ্যে দুইটি বিস্ময়কর।

প্রথমটি অনুরাধপুরের স্তূপাবলী। পৃথিবীর বৃহত্তম স্তূপ এইখানে, নাম মহাস্তূপ। এত বৃহৎ যে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে দুই পা আড়ষ্ট হইয়া যায়। এই স্তূপগুলি এখনও অক্ষত অভগ্ন অবস্থায়, যেন পৃথিবীর জীবনের ভরসা দিতেছে: 'যত তোমরা ভাঙ্-চুর কর না কেন, চিরন্তনের সাক্ষী আছি আমরা।'

দ্বিতীয়টি অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম।

কিম্বদন্তী এই যে সম্রাট্ অশোকের ভগিনী সংঘমিত্রা যখন সিংহলে আসেন, তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম হইতে একটি কলম কাটিয়া আনিয়া এইখানে প্রোথিত করেন। এখন এটি সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক বলিয়া পূজা পায় ও প্রতি বৎসর চারদিক্ হইতে সিংহলের বৌদ্ধেরা এখানে তিন দিন ব্যাপী একটি উৎসব করেন।

এই অশ্বত্থগাছটি শাখা পল্লবে বাড়িয়া এখন বিশাল হইয়াছে। চারদিকে একটা উঁচু প্রাচীরের ঘের। অভ্যন্তরে অনেক মন্দির, বিশ্রামালয় প্রভৃতি। বৃক্ষটির শাখাগুলি বিবিধ রংএর কাগজে ও রাংতায় মোড়া। যে শাখাগুলি কাণ্ড হইতে আলগা হইয়াছে, তাহাও ঐ রকম সজ্জিত করিয়া ঠেকা দিয়া রাখা। বৃক্ষটির চারদিকে উঁচু বাঁধানো বেদী। কিম্বদন্তী সত্য হইলে এই অশ্বত্থ গাছটির বয়স বারশো বৎসর

হইবে। দেখিলে অত বৃদ্ধ মনে হয় না,—তবে উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদেরাই সঠিক বলিতে পারেন। কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না।

অনুরাধপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে একটা খোলা মাঠে পড়িলাম। চারদিক্ ধু ধু করিতেছে,—কোনও মন্দির, কি বিহার, কি লোকজনের বসতি নাই। বিশাল শূন্যতার মধ্যে একটি একক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি। মনে হয় যেন সারা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়িলেও এ গভীর ধ্যান ভাঙ্গিবার নয়,—আর ভগবানের নিভৃত ধ্যানের এই স্থির অটল অবিচল ভাব অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যে এই মূর্ত্তিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম। দেবেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন: 'জহরলাল নেহেরু বহু বৎসর পূর্ব্বে অনুরাধপুর আসিয়াছিলেন। তিনিও এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও আপনার মতই অনিমেষ চোখে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিলেন।'

সিংহল সরকার এখন প্রাচীন অনুরাধপুরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া পৃথক্ করিয়া তীর্থস্থানরূপে রাখিয়াছেন। এই সীমার বাহিরে এখন একটি ছোট সহর গড়িয়া উঠিতেছে।

অনুরাধপুর ছাড়িয়া অনেক বন ও গিরিমালার মধ্য দিয়া নানা বাঁক ঘুরিয়া পৌঁছিলাম সিগুরিয়ায়।

এখানকার পান্থনিবাসটির (Rest House) বন্দোবস্ত চমৎকার। রক্ষক মহাশয় অভ্যর্থনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন হরিণের মাংস (Venison) খাইতে আমাদের আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি ছিল না,—মধ্যাহ্ন ভোজনে সুস্বাদু ও সুপক্ক মৃগ মাংস পাইলাম।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সিংহলের এক রাজা পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। প্রাণভয়ে রাজধানী ছাড়িয়া অনেকদূরে এই নির্জ্জন সিগুরিয়ায় একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়া সমতল করিয়া সেখানে নিজের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদের ঠিক নিচে পরিষদ্-বর্গ ও রাজকর্ম্মচারীদের জন্য পাহাড় খুঁড়িয়া অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয়।

আমরা সমতলভূমিতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। প্রকাণ্ড পাথরের সিঁড়ি পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে চলিয়া গিয়াছে। উঠিতে সাহস হইল না। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র; বাতাসের ধাক্কায় ছাতা ধরিবার উপায় নাই; সিঁড়ির পাশে কোনও রেইলিং নাই। নীচের প্রকোষ্ঠগুলির দেয়ালে কতগুলি বড় বড় চিত্র low reliefএ রক্ষিত আছে। বইতে পড়িয়াছি এই ছবিগুলি অজন্তার প্রাচীর চিত্রের অনুকরণে। কাছে গিয়া দেখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দুর্দ্দান্ত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ওঠার ভয়ে অগ্রসর হইলাম না।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর রাত্রে পেরাডেনিয়ার বিশ্রাম-শালায় পৌছানো গেল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। নারিকেলের সারি,—তা ছাড়া রবার, চা, গোলমরিচ, লবঙ্গের ফসল। শুনিলাম এই জঙ্গলের গভীরে হাতীর পালও বাস করে।

আরও দুইদিন পেরাডেনিয়ায় কাটাইয়া রেলপথে কলোম্বো ফিরিলাম।

সিংহল হইতে ধনুষ্কোটি

এবার কলোম্বোতে লঙ্কা-তেঁতুলের দক্ষিণ-ভারতীয় হোটেলে আর উঠি নাই।

এখানকার ভারতীয় দূতাবাসের প্রচার-বিভাগের কর্ত্তা (Publicity Officer) মিঃ বসু তাঁহার আতিথ্য লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ট্রেন হইতে নামাইয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া আসিলেন।

আমরা ধনুষ্কোটির পথে ভারতবর্ষে ফিরিব এই ছিল বন্দোবস্ত।

কলম্বো ছাড়িবার পূর্ব্বদিন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিই গাড়ী লইয়া আমাদের মিশন-গৃহ দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। কতগুলি গলি পার হইয়া একেবারে খোলা

সমুদ্রের তীরে পৌঁছিলাম। এখানে মিশনের সকল প্রতিষ্ঠানই আছে—মন্দির, শিক্ষা-কেন্দ্র, অতিথি-শালা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি। সন্ধ্যারতি দেখিয়া ছাত্রাবাসেই অনেকটা সময় কাটাইয়াছিলাম। বৃহদাকারের দ্বিতল বাড়ী, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু জনকয়েক মাত্র বাসিন্দা-ছাত্র।

দাঁড়াইলেই সামনে মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তার দেখা যায়। সমুদ্রবেলার এত কাছে যে আমরা ঢেউএর লুটাপুটি দেখিয়া ও বালির উপর অবিরাম ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া এক ঘণ্টার উপরে সেখানেই কাটাইলাম। স্বামীজি অনুযোগ করিলেন আমরা কলোম্বো আসিয়া মিশনের অতিথিশালায় থাকার বন্দোবস্ত কেন করি নাই। মিশনের মোটর গাড়ী ও অন্যান্য সব ব্যবস্থাই ত এখানে ছিল।

পরের দিন বেলা তিনটায় কলোম্বো ছাড়িলাম। এখান হইতে সারারাত্রি ট্রেইনে কাটাইয়া তালাইমান্নার নামে একটি ষ্টেশন হইতে ফেরি-জাহাজে পক্-প্রণালী পার হইলেই ধনুষ্কোটিতে পৌঁছান যায়।

এই পক্-প্রণালী বীর হনুমান্ নাকি এক লম্ফে পার হইয়াছিলেন,—আমাদের ফেরি-জাহাজে পার হইতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগিল।

ধনুষ্কোটিতে পা দিতেই, আমাদের ও অন্যসব ভারত-যাত্রীদের শুল্ক-আপিসে লইয়া গেল। ধীরে সুস্থে কাজ চলিতেছে,—এদিকে মান্দ্রাজগামী ট্রেইনখানি আসি-আসি করিতেছে। এখন এখান হইতে খালাস পাইলে বাঁচি।

আমাদের অনুনয়ে শুল্ক-কর্ম্মচারী আমাদের মালগুলি আগে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। জাপানীদের উপহৃত ট্রানজিষ্টারটি কাপড়ের নীচে ছিল। উপরে ছিল আমার বইগুলি। কর্ম্মচারী মহাশয় আমার বইগুলি নাড়াচাড়া করিয়া এক কপি Lady Chatterley's Lover আবিষ্কার করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন 'একি মহাশয়? ভারতবর্ষে এ বই-খানি, Proscribed (অর্থাৎ বাহির হইতে আনা নিষিদ্ধ)। এখানা রাখিয়া দেই?' উত্তরে নিবেদন করিলাম:

'ব্যাংকক সহরে আমার একজন বন্ধু উপহার দিয়াছিলেন; তবে যদি মহাশয়ের পড়িবার ঔৎসুক্য থাকে—সে থাকিবারই কথা, কারণ ভারতবর্ষে এ বই দুর্লভ—আমি আপনার জন্য রাখিয়া যাইতে পারি।' আমার কথায় কর্মচারীটি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বইখানি ফিরাইয়া দিলেন। ট্রানসিষ্টারটি আর ধরা পড়িল না। শুল্ক-আপিস হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ট্রেইনে চড়িলাম।

মান্দ্রাজ হইতে দিল্লীর পথে

মান্দ্রাজের এগমোর ষ্টেশনে দিল্লীযাত্রী গাড়ী ধরিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়া একখানা প্রথম-শ্রেণীর কূপে (দুইজন যাত্রীর জন্য গাড়ী) যোগাড় করিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা-সন্ধি নাগপুর পৌঁছিতেই এক ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্ম হইতে জানালার পাশে উপবিষ্ট আমার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া মিনতির সুরে বলিলেন: 'মা, আমি একজন পুলিশ কর্মচারী। আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। কিন্তু কোনও গাড়ীতেই বসিবার জায়গা পাই নাই। আমাকে এই গাড়ীতেই বিশেষ প্রয়োজনে দিল্লী যাইতে হইবে। সরকারের হুকুম।'

স্ত্রী অনুমতি দিলে তিনি চটপট গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন,—আপনারা কতদূর হইতে আসিতেছেন? ভারতবর্ষের বাহিরে কোথায় গেলেন? কি উদ্দেশ্যে? আপনার স্বামী দিল্লীতে কি কাজ করেন? ইত্যাদি।

পুলিশ কর্মচারীর এই সব খবর লওয়ার উদ্দেশ্য প্রথমটা বুঝি নাই। ইংরাজী আদব-কায়দার নিয়মে এইসব ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বর্জনীয়। কিন্তু কিছু পরেই আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদ বুঝিতে পারিলাম।

আমি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে একজন লেখক জানিয়া আমার দিকে

ফিরিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন : 'আপনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিবেন? আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। অনেক পড়িয়াছেন, অনেক জানিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের 'বর্ত্তমান বুদ্ধদের' (Modern Buddhas) সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন কি?' 'তাঁহারা কাঁহারা?'—বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম। 'আম্বেদকার সাহেব যাহাদের ভাংগী-সমাজ হইতে লইয়া দীক্ষা দিয়াছেন।' 'তাহাদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই।'—বলিতেই তিনি উৎসাহিত হইয়া উত্তর করিলেন : 'তবে আমার অভিজ্ঞতা হইতে আপনাকে একটি ঘটনার কথা বলি। আপনার বই লিখিবার কাজে লাগিতে পারে।'

'কিছুদিন আগে নেহরু-সাহেব এই নাগপুর সহরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার জন্য সহরের মধ্যে একটি বক্তৃতা-মঞ্চ বানানো হয়। সেখানকার সিকিউরিটি পুলিসদলের (Security Police) নেতৃত্বে আমি মোতায়ন ছিলাম। বক্তৃতার পর দেখি সহরের এক ভাংগীর দল তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের হাতে লাঠি, একজন নেহরু-সাহেবের হাতে একখানা দরখাস্ত দিল। নেহরু সাহেব পড়িয়া বলিলেন : আপনারা আম্বেদকার সাহেবের মর্ম্মরমূর্ত্তি এই সহরে স্থাপিত করিতে চান, সে ভালই কথা। কিন্তু ঠিক এইখানেই যে তাহা হইতে পারিবে সে কথাত আমি বলিতে পারি না। আপনারা কর্পোরেশনে দরখাস্ত করুন। 'না, কিছুতেই না। আমরা ঠিক এইখানটাই বাছিয়া রাখিয়াছি', বলিয়া একদল লাঠি হস্তে অগ্রসর। নেহরু সাহেব স্বীকৃত হইলেন না। তখন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া তাহারা মহা গোলমাল বাঁধাইয়া দিল। মারামারির সম্ভাবনা দেখিয়া আমি নেহরু সাহেবকে একখানা কাগজে লিখিয়া পাঠাইলাম যে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। আপনি আপত্তি না করিলে সামান্যভাবে 'লাঠি চার্জ্জ' (Lathi charge) করিয়া আমি এই ভাংগীর দল সরাইয়া দিতে পারি। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন : 'দেখ' এখানে মার-ধোর করিলে, আমিই তোমাদের শাস্তি দিব। খালি হাতে গিয়া এদের অনুনয়-বিনয় করিয়া আমাকে একটু বাহির হইবার পথ ছাড়িয়া দিতে বল। তখন চারদিকে ত্রিশরণ-ঘোষণার কলরব উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জনতা মারমুখো হইতেছে। কেহ কেহ লাঠি ভাঁজিতেছে। সমূহ বিপদ দেখিয়া কোনও মতে আমি নেহেরু সাহেবকে জনতার বাহির করিয়া আনিলাম। আপনি আপনার বইখানিতে এই Modern Buddha দের সম্বন্ধে কিছু লিখিলে এই দেশে বুদ্ধধর্ম কতটা জোরালো হইয়া উঠিয়াছে লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে।'

আম্বেদকরের সঙ্গে দিল্লীতে আমার কিছু পরিচয় ছিল। রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে তাঁহার স্থান ছিল অসাধারণ। বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন,—নিতান্ত পল্লবগ্রাহী জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে ও জাপানেও কেহ কেহ আমাকে ভারতবর্ষে বুদ্ধ-ধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আম্বেদকরের আন্দোলনের কি হইল প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আন্দোলনটি যে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না, পরন্তু হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য-শ্রেণীর লোকদের কতগুলি অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে,—এ কথা বাধ্য হইয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রায় পাঁচ মাস নানা দেশে ঘুরিয়া দিল্লীতে আবার আপন গৃহে ফিরিলাম।

ভারত-চীন সংঘর্ষ তখনও চলিতেছে। কিন্তু দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমান্তে। দিল্লী হানুজ দূরস্ত,—এতদূর পর্য্যন্ত হামলা পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। তবু সারাদেশেই একটু 'সাজো সাজো' রব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোক-সভার ও রাজ্যসভার পেশাদারী রাজনৈতিক নেতারা কথার তুবড়ি ছুটাইতেছেন।

ভাবিতেছিলাম,—এইরূপ ঘটনাস্রোতই কি জাতির জীবনে সব ? কিছু কি নাই যাহা চিরন্তন ?

ইতিহাস চলে এই ঘটনাস্রোতের অনুসরণে। কিন্তু যে সকল জাতি এই স্রোত বাহিয়া বিস্মৃতির রসাতলে যায় নাই, তাহারা চিরন্তন কিছু গড়িয়াছে। তাহাই ঘটনা-প্রবাহের টান হইতে পরম ও চরম আশ্রয়। এই আশ্রয় তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি।

পূর্ব্ব এশিয়ার জাতিগুলি এই আশ্রয় পাইয়াছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা হইতে।

সেইজন্য কোনও দেশে আমরা নিজেদের বিদেশী বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। শুনিয়াছি মন্দিরে মন্দিরে পালি বা সংস্কৃতে মন্ত্রপাঠ ; মন্দিরে বা স্তূপে দেখিয়াছি ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের প্রতিচ্ছায়া ; পণ্ডিতের সঙ্গে বাক্যালাপে ভারতের নানা স্থান, নানা মুনি-ঋষির কাহিনী, এদেশের প্রাচীনকালের নানা ঘটনা, নানা আধ্যাত্মিক চিন্তা ও গবেষণা আসিয়া জুটিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত পূর্ব্ব-এশিয়ার নাড়ির যোগ যে কোথায় বুঝিতে পারিয়াছি।

—আমার অপটু হাতের লেখা ভ্রমণকাহিনী এই খানেই শেষ করিলাম। বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, তাহাই বলা হইল। কিন্তু অন্তরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা এ অনিপুণ লেখকের আয়ত্তে নাই।

(সমাপ্ত)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি.এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

মর্গান-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

[জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর]

বিবাহের ভবিষ্যৎ

মর্গান-মার্ক্সবাদী মতে একবিবাহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই সৃষ্টি। পশুপালনহেতু ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভব হওয়ায় সন্তানে সেই সম্পত্তির প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পুরুষ এই একবিবাহের প্রবর্তন করিয়াছে। একবিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত যে ভ্রান্ত এবং কেবল তাহাই নয়, সম্পূর্ণ মর্গানী ছকের সবগুলি ধাপই যে কল্পিত এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন বিবাহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্কসবাদী মত ও পরিকল্পনা যে অবাস্তব ও ভ্রান্ত তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহা হইতে বাধ্য। কারণ যে ভিত্তির উপর ও মৌলিক নীতির উপর এই ছক দাঁড়াইয়া আছে তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ হইলে ইহাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও যে ভিত্তিহীন হইয়া পড়িবে, ইহাও স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও এঙ্গেল্স্ তাই নানা অসঙ্গতিতে জড়াইয়া গিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

মর্গানী মতকে স্বীকার করিয়া লইলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেই যখন একবিবাহ ও সতীত্বধর্মের উদ্ভব হইয়াছে তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা লুপ্ত হইলে একবিবাহ এবং সতীত্বপ্রথাও লুপ্ত হইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে মূল কথাটা হইল সতীত্বধর্ম। ইহার উপরেই এক-বিবাহ দাঁড়াইয়া আছে। সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার জন্যই সন্তানের পিতৃত্ব সুনিশ্চিত করিবার এবং তথা পত্নীকে সতীত্ব ধর্মে বাধ্য করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছিল। যদি ভবিষ্যতে কোন দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেখানে ব্যক্তি-সম্পত্তি থাকিবে না এবং সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নও থাকিবে না। কাজেই নারীর সতীত্ব এবং সন্তানের সুনিশ্চিত পিতৃত্ব, উভয়েরই কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আরো একটী দিকও আছে: রাষ্ট্র তখন দেশের সকল সন্তানের পালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিবে; কাজেই সন্তানের শিক্ষা ও পালনের জন্যও "পরিবার" এবং "পিতার" দায়িত্ব থাকিবে না। এদিক হইতেও একবিবাহ, সতীত্ব, পরিবার ইত্যাদির কোনও মূল্য ও সার্থকতা থাকিবে না। যে-হেতু ব্যক্তিসম্পত্তি হইতেই এই তিন প্রথা জাত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই-হেতু সম্পত্তিপ্রথার বিলুপ্তির সাথে সাথে সমাজতন্ত্রী সমাজে ইহারাও বিলুপ্ত হইবে। মর্গান-মার্কসবাদী যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। এঙ্গেল্সও বলিয়াছেন যে ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভব হেতু অর্থনৈতিক কারণেই পরিবার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিবারের এবং বিবাহের ইহারা আর্থিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরিবার আর কিছু নয়, ইহা একটা অর্থ নৈতিক unit বা প্রতিষ্ঠান। কাজেই অর্থ নৈতিক ভিত্তি লুপ্ত হইলে পরিবারও লুপ্ত হইবে। এঙ্গেল্সও এই কথাই বলেন, নারীর ষোলআনা মুক্তি হইবে সেইদিন যেদিন এই একবিবাহ ও পরিবার লোপ পাইবে। ["Then

it will be plain that the first condition for the liberation of the wife is to bring the whole female sex back into public industry and that this in turn demands the abolition of the monogamous family as the economic unit of society.' (87, Engels) মার্কস্‌ও "কম্যুনিষ্ট ইস্তাহারে" এই কথাই বলিয়াছেন। এবং স্বীকার করিয়াছেন যে বুর্জোয়া পরিবার লুপ্ত হইয়া যাইবে পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তির সাথে সাথে। ["of course the bourgeois family will disappear with the disappearance of its complements and the family and its complements will vanish when capital vanishes." (Com. Manifesto)

এ সম্বন্ধে প্রথম কথাই এই যে বিবাহের ও পরিবারের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত হইতেই এই ধারণার উদ্ভব। পরিবারের ও বিবাহের আর্থিক ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। শুধু পরিবার কেন, সমগ্র জীবনটাকেই ইঁহারা আর্থিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাই অধুনা সমাজতত্ত্বে একদেশদর্শী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত। ইতিহাসের ব্যাখ্যা বহুবাদী, ইহাই বিজ্ঞানসম্মত। ভৌতিক বা বাহ্যজগতের জড়শক্তিগুলির এবং মানুষের চিৎলোক বা মানসলোকের শক্তিগুলি দ্বারা ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দুই শ্রেণীর শক্তিকে স্বীকার করিয়া ইতিহাসের শুধুই ভৌতিক ব্যাখ্যা নয়, চিদ্‌-ভৌতিক ব্যাখ্যা বা বহুবাদী ব্যাখ্যাই সমাজতত্ত্বের স্বীকৃত মত।

বিবাহ বা পরিবার শুধুই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি হয় নাই। দীর্ঘ আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছি। পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, যে-হেতু পরিবার ও বিবাহ ব্যক্তিসম্পত্তির সৃজন নয়, সেই হেতুই ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলেও পরিবার বা একবিবাহ লুপ্ত হইবে না। এখানে শুধু বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণবাদের দৃষ্টিভূমি হইতেই এই কথা বলা হইতেছে। কোন নৈতিক আদর্শের বিচার এখানে করা হইতেছে না। বিবাহ ও পরিবার লুপ্ত হওয়া "উচিত" কি "অনুচিত" সেই প্রশ্ন বা আলোচনা এখানে নয়। এখানে ইতিহাস এবং অতীতের ও বর্ত্তমানে বাস্তব তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বনির্ধারণের কথা হইতেছে। নীতিশাস্ত্র বা প্রমূল্যতত্ত্ব (Theory of value) বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই একথা ঠিক। কিন্তু সমাজতত্ত্ব সে প্রসঙ্গ আলোচনা করে না।

সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বলিতেছে, বিবাহ সর্বত্রই একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। নানা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্য লইয়া বহুদিকের একটা সামঞ্জস্য হইল পরিবার ও বিবাহ প্রথা। অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটিলে বিবাহ ও পরিবারেও তাহার অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটিবে একথা স্বীকার্য। পারস্পরিক ক্রিয়া (Law of Functional Interaction) নীতির ইহা যুক্তি সঙ্গত ফল। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরিমাণ এবং রূপ নির্ভর করিবে বহু শক্তির ও অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঘাতপ্রতিঘাতের উপর। সবগুলি শক্তির অবস্থান ও সহ-সম্পর্ক (Correlation) বিচার করিয়া একটা সম্ভাব্যতার গড়পড়তা (average Probability) ধারণা করা যাইতে পারে মাত্র। কাজেই যাহারা সামাজিক জীবনেও কার্য্য-কারণের লৌহ-নিয়ন্ত্রণ (Iron determinism) কল্পনা করিয়া বিবাহের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছক তৈরী করিতে চাহেন তাহারা যান্ত্রিকতাবাদী (mechanist) । আধুনিক সমাজতত্ত্ব আর যাহাই না করুক, অন্তত যান্ত্রিকতা-বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কাজেই অর্থনৈতিক বা অন্য কোন যান্ত্রিকতাই বা নিয়ন্ত্রণবাদই সমাজ-বিজ্ঞানের সমর্থিত নয়। মোট কথা হইল এই যে, ব্যক্তি-সম্পত্তি লুপ্ত হইলেও তাহার ফলে পরিবার, বিবাহ বা সতীত্বধর্ম লোপ

পাইবে, এমন কথা স্বীকার করা চলে না। ব্যক্তি-সম্পত্তি লুপ্ত হইয়া সমাজসম্পত্তিতে পরিণত হইলে তাহার প্রভাবে সমাজ ও পরিবারের জীবনে নতুন একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হইবে। ব্যক্তির সহিত সমাজ ও পরিবারের, এবং অর্থনীতির সহিত অন্যান্য দিকের পারস্পরিক সম্পর্ক একটা নতুন স্তরে ও সমন্বয়ে আসিবে, এই কথা বলা চলে। কিন্তু পরিবারও থাকিবে একবিবাহ প্রথাও থাকিবে এবং সতীত্বধর্মের মহিমাও পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে। কারণ মানব জীবনের গভীরতম, মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের শিকড় রহিয়াছে।

তারপরে এই সত্যের বাস্তব সমর্থনও পাওয়া যাইতেছে রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক সামজের পরীক্ষায়। সেখানে ব্যক্তি-সম্পত্তি প্রথা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু পরিবার বা একবিবাহ তো লোপ পায় নাই বরং ইদানীন্তন বহুদিন হইতেই পরিবার ও একবিবাহপ্রথা আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়াছে। রুশীয় পরীক্ষণের বাস্তব তথ্যই মার্কসবাদী আর্থিক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছে।

এখন এঙ্গেল্‌সের বিবাহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত আলোচনা করা যাক্। আর্থিক ব্যাখ্যার জের টানিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স অসঙ্গতিতে আটকাইয়া গিয়াছেন। অর্থনীতির সৃষ্টি যদি বিবাহ হইয়া থাকে, তবে সম্পত্তিপ্রথার বিলুপ্তিতে পরিবারও লুপ্ত হইবে, বিবাহও লুপ্ত হইবে, এই সিদ্ধান্তই আসে। এঙ্গেল্‌সও এই প্রশ্ন স্বয়ং উঠাইয়াছেন। ["Having arisen from the economic causes, will monogamy then disappear when these causes disappear?" (Engels, 89)

এঙ্গেল্‌স এখানে গোঁজামিল দিয়াছেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিতেছেন, না, বরং একবিবাহই আরো সত্যিকার একবিবাহে পরিণত হইবে। কেন? না, গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হইবে, অতএব একবিবাহ থাকিয়া যাইবে। এখানে এঙ্গেল্‌স্ আসল কথাটি এড়াইয়া গিয়াছেন। ক) একবিবাহেরই ফল বা সৃষ্টি হইল গণিকাবৃত্তি। বিবাহ কায়া, আর গণিকাবৃত্তি তাহার ছায়া। ইহা এঙ্গেল্‌সের মূল প্রতিপাদ্য। তাহা হইলে মূল কায়াটী যদি লুপ্ত হইল, তাহার ফল বা আনুষঙ্গিক বা ছায়াটুকু কী করিয়া থাকে? কার্য্যকারণনীতিকে খেলাপ করিয়া এঙ্গেল্‌স্ এখানে মর্গানী মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। গণিকাবৃত্তি যে শুধু একবিবাহের আনুষঙ্গিক বা ব্যক্তি-সম্পত্তির bye product নয়, তাহাই এখানে প্রমাণ হইল। (খ) তারপরে একবিবাহের উৎপত্তির কথাটুকু এঙ্গেল্‌স চাপা দিয়াছেন। সম্পত্তি হইতেই একবিবাহ উৎপন্ন হইয়াছে; এ অবস্থায় ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলে একবিবাহের বিদ্যমান থাকিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নই নাই, সেখানে বিনা কারণে একবিবাহকে মানুষ আঁকড়াইয়া কেন থাকিবে? মনে হয়, এঙ্গেল্‌স এক-বিবাহের দৃঢ়মূল অস্তিত্ব এবং সর্বব্যাপী প্রসার দেখিয়া এই প্রথা লুপ্ত হইবে ইহা ভাবিতে পারেন নাই, তাই পরস্পর বিরোধী উক্তি করিয়া অর্থহীন অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছেন। (গ) তারপরে সতীত্বধর্মের প্রশ্নটীকে তিনি উত্থাপনই করেন নাই। একবিবাহের গোড়ার কথাই সতীত্বপ্রথা। অবাধ যৌনসঙ্গম প্রচলিত থাকিলে একপুরুষ ও একনারীর মধ্যে একবিবাহের কোন অর্থ থাকে না। সতীত্বের আর্থিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সম্পত্তি বিলুপ্তির পরে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সতীত্বপ্রথার কোন কারণ বা ভিত্তি (raison d'etre) থাকে না।

এই সব কারণে এঙ্গেল্‌স পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একদিকে বলেন, একবিবাহ 'becomes a reality' আবার অন্যদিকে বলিতেছেন "single family ceases to be the economic unit of society" (89, Engels). সম্পত্তি যদি আপন সন্তানকে দিবার প্রশ্ন না আসে, তবে পত্নীর সতীত্ব সম্বন্ধে পুরুষই বা কেন উদ্বিগ্নবোধ

করিবে। আর নারী? নারীই বা কেন পুরাতন যৌন স্বাধীনতার আনন্দ এবং নির্বাধ অধিকার ফিরাইয়া আনিবার দাবি করিবে না? [" women, not men are increasingly deprived of the sexual freedom of group marriage" 86] এই "sexual freedom" হইতে বঞ্চিত হইবার ইচ্ছা নারীরই বা কেন হইবে? এঙ্গেল্স পূর্বাপর বলিয়া আসিয়াছেন, নারীকে "pleasures of group marriage" হইতে অন্যায় পূর্বক বঞ্চিত করা হইয়াছে। একবিবাহে নারীকে বলপ্রয়োগে ও সম্পত্তির সুযোগ লইয়া পুরুষ এই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কাজেই মার্ক্সবাদী মতে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত হয় যে সম্পত্তি-লুপ্তিতে সতীত্বপ্রথা নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক হইতেই লুপ্ত করিবার দাবি আসিবে এবং লুপ্ত হইবেও। আরো কথা আছে: সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র শিশুদের দায়িত্ব নিবে। কিন্তু বৈধ এবং অবৈধ সন্তানে কোন পার্থক্য করিবে না। ['whether they are legitimate or not" (89, Engels,] বৈধ ও অবৈধ সন্তানের পার্থক্য না থাকিলে সমাজে সতীত্ববৃত্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন ও কারণ আরো শিথিল হইয়া পড়ে। কাজেই কোনদিক হইতেই আর্থিক ব্যাখ্যায় সতীত্ব এবং বিবাহের বিলুপ্তি এড়াইবার পথ নাই।

এঙ্গেলস এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলেন, সম্পত্তিহানি বা জীবিকাহানির ভয় লুপ্ত হওয়ায় নারীর উপর বাধ্যতা থাকিবেনা। নারী যে-কোন প্রেমাস্পদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন; বাধা বা ভয় থাকিবে না ["a factor that prevents a girl from giving herself completely to the man she loves" (89, Engels)] ইহাতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই সকল বাধা দূর হইয়া অবাধ যৌন-ব্যবহারের স্বাধীনতাই সমাজে পুনঃপ্রবর্তিত হইবার কথা।

কিন্তু, এঙ্গেলস বলেন, অবাধ যৌনব্যবহার ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। অর্থাৎ একবিবাহই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেন না, একটা নূতন শক্তি বা উপাদান ইতিমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। এই নব শক্তির নাম ব্যক্তিক যৌন প্রেম। ["Here a new element comes into play, an element which, at the time when monogamy was developing existed at most in germ : individual sex-love" (90, Engels.]

(ক) এঙ্গেলসে'র এই স্বীকৃতিতে আর্থিক ব্যাখ্যা আর একবার খণ্ডিত হইল। "প্রেম" নামক পদার্থের এই স্বতন্ত্র ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করিলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ভিত্তি লুপ্ত হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক শক্তি বা 'Psychological factor' অর্থনৈতিক পরিবেশকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাহার বিলুপ্তি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল সেই 'একবিবাহ'কে বাঁচাইয়া রাখিল। সম্পত্তিপ্রথার সহিত যাহার অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ সেই বিবাহ প্রথা সম্পত্তিহীন সমাজে নির্মূল ও ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়াইবে। যাহার মূল উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অর্থনৈতিক শিকড় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বিবাহ-প্রতিষ্ঠান কি করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিবে বোঝা দুষ্কর। কিন্তু এঙ্গেলস বলেন, প্রেম সেই অসাধ্য সাধন করিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে অর্থনীতিই বিবাহের পশ্চাতের একমাত্র ভিত্তি নিশ্চয়ই নয়।

(খ) তারপরে এই প্রেম কোথা হইতে অকস্মাৎ কি করিয়া উদ্ভূত হইল? এঙ্গেলস ইহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের গোঁড়ার কথা এই যে, সমাজে আর্থিক পরিবেশের ফল হইল মানুষের মনোবৃত্তি; মানবচেতনা অর্থনীতির ছায়া মাত্র। এই প্রেম কি তবে অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রতি একান্ত নিরপেক্ষ এবং সম্পর্কবর্জিতভাবে মানুষের মনে উৎপন্ন হইয়াছে? যৌথ-বিবাহে প্রেম ছিল না; যুগ্মবিবাহে প্রেম অজ্ঞাত। তবে ব্যক্তিসম্পত্তির ও একবিবাহের যুগে যদি প্রেমের আবির্ভাবই

ঘটিল, তবে তাহা কখন এবং কেন ঘটিল তাহার অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা কোথায়?

(গ) প্রেমের অর্থাৎ আদর্শ প্রেমের—সংজ্ঞা ও বর্ণনা দিয়াছেন এঙ্গেলস। তিনটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ তিনি দিয়াছেন। তাঁর মতে এই প্রেম শুধু যৌন কামনা বা কাম নয়। বৈশিষ্ট্য তিনটি এই:

(১) প্রেমের এতখানি স্থায়িত্ব এবং তীব্রত্ব, যাহার ফলে বিচ্ছেদবেদনা অসহনীয় বোধ হয়।

(২) এই প্রেম স্বভাবতই দম্পতীর মধ্যে আবদ্ধ এবং তৃতীয়-ব্যক্তিগামী হইতে পারে না ["as sexual love is by its nature exclusive....the marriage based on sexual love is by its nature individual marriage." (Engels, 97)]

(৩) এই প্রেমে প্রতিদান আছে, অর্থাৎ একতরফা, প্রতিদানহীন প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়;

এঙ্গেলস্ এই তিনটী লক্ষণসংক্রান্ত যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা তো প্রকৃত পক্ষে যৌন প্রেমই; কারণ যৌন প্রেমের বা কামের সহিত এই তিনটী লক্ষণের কোন বিরোধ নাই; বরং দৈহিক সুখের কামবৃত্তিরও এই তিনটি লক্ষণই একান্ত স্বকীয় বলা যাইতে পারে। প্রতিদান বা স্বেচ্ছাকৃত মিলন তো যৌন মিলনেরও ধর্ম হইতে পারে। তারপরে, এতখানি স্থায়িত্ব ও তীব্রতা যাহাতে একে অন্যকে না পাইলে বিপদ-গণনা করে এবং মিলনের জন্য বিপদকে অগ্রাহ্য করে। কামোন্মাদের এই দুইটী ধর্মই আছে। তৃতীয়তঃ, তৃতীয়গামিত্ব-বর্জন যৌন মিলনেরও ধর্ম, যদি প্রেমের স্থায়িত্বকালটি সংকীর্ণ হয়। সামান্যকাল ব্যাপিয়া এই তৃতীয়গামিত্ববর্জন এমন কোন গুরুতর বিশিষ্টতা কিছু নয়।

সমস্ত সমস্যাটির মূলে আসল প্রশ্নটি হইল সতীত্বধর্মের এবং দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের। তীব্রতার কোন পরিমাপ নাই, মানদণ্ড নাই। কতটুকু তীব্রতা অনুভূতিতে থাকিলে তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলিব, তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় কি? অতএব ইহা 'যৌন প্রেম' বা কাম নয় [our sexual love differs essentially from the simple sexual desire" (91. Engels)] ইহা 'আসল প্রেম' তাহা বুঝিব কোন পরীক্ষায়? কাজেই একবিবাহের ভিত্তি যদি প্রেম হয় এবং প্রেমই বিবাহের একমাত্র নৈতিক মানদণ্ড হয়, তবে প্রেম বস্তুটী কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেই হইবে।

প্রথমতঃ আজীবনব্যাপী সম্বন্ধবন্ধনের আদর্শই এক-বিবাহের আদর্শ কিনা। আমরা বলিব, স্থায়ী, আজীবন ব্যাপি বিবাহই সমাজের এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কল্যাণকারী। বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি বা অধিকার থাকিবে না, তাহা নয়। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যতিক্রম এবং বিশেষ অবস্থার বিরল প্রতিকার বলিয়া সমাজগ্রাহ্য হইবে। বিবাহবন্ধনের প্রতি নিষ্ঠা এবং তাহার শুচিতার ও স্থায়িত্বের আদর্শই সার্বজনীন আদর্শ। এঙ্গেলস্ এ প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ সতীত্বধর্মের প্রশ্নটীও এঙ্গেলস্ এড়াইয়া গিয়াছেন। একনিষ্ঠা বা Exclusiveness-র কথা তিনি বলিয়াছেন। দীর্ঘস্থায়ী বিবাহ না হইলে এই একনিষ্ঠার কোন অর্থ থাকে না। কারণ এঙ্গেলসের সংজ্ঞা অনুসারে, যতক্ষণ যাহার প্রতি আকর্ষণ টিকিয়া থাকে ততক্ষণ তাহার বন্ধন স্বীকৃত হইবে। নতুন আকর্ষণ উদয় হওয়া মাত্রই ("a new passionate love" 98, Engels) একনিষ্ঠার অবসান ও পূর্ব সম্বন্ধ ছেদন করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে একবিবাহ বা একনিষ্ঠার কোন মূল্যই থাকে না।

তৃতীয়তঃ কাগজে কলমে এঙ্গেলস্ কাম ও প্রেমে পার্থক্য করিলেও প্রকৃত পক্ষে এই পার্থক্যের কোন ভিত্তি রাখেন নাই। যে-কোন নূতন আবেগ ('Passion') উদয় হইলেই তাহাকেই আবাহন করিয়া জীবনে স্থান দেবার আদর্শ তো দৈহিক যৌনবৃত্তিতেই সম্ভব হয়। প্রেম যদি অন্যান্য বহু বৃত্তির সহিত জড়িত হয়; সন্তান কল্যাণ, আধ্যাত্মিক সমসাধিত্ব,

সামাজিক কর্মসঙ্গিত্ব প্রভৃতিই যদি দাম্পত্যসম্বন্ধকে দেহের উর্দ্ধে একটা নবলোকে পৌঁছাইয়া দেয়; তবে দৈহিক আকর্ষণকে ছাড়াইয়া, নিত্যনূতন যৌন আবেদনের প্রমত্ততাকে ছাড়াইয়া প্রেম হয় দেহাতীত ও দীর্ঘস্থায়ী। দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী; ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মন আবর্তিত হইলেই ঘনঘন নিষ্ঠার বদল প্রয়োজন হইতে পারে। সুখদুঃখ আনন্দের সমভাগি, বিপদ আপদের অংশগ্রাহী যে প্রেম সে তো ক্ষণিক ও প্রাত্যহিকের বহু উর্দ্ধে, ভোগ-স্বার্থসংঘাতের উপরে চির স্থির নীড় বাঁধিয়াছে। সে প্রেম কেন ঘন ঘন বিবাহবিচ্ছেদ কামনা করিবে? কাজেই যে আদর্শ এঙ্গেলস্ সমুখে ধরিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের আদর্শ। বিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিলে কেবল ব্যক্তি-প্রেমের বা ভাবালুতার ভিত্তিতে বিবাহ গড়িয়া তোলা চলে না। কাজেই এখানেও মার্কসবাদী বিবাহ বা প্রেমের কল্পনায় ত্রুটি রহিয়াছে। কেবল আর্থিক বা যৌনপ্রেমের ভিত্তিতে পরিবার বা বিবাহ প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানসম্মত।

চতুর্থত: এই একনিষ্ঠা বা সতীত্বধর্মের প্রশ্নই মার্কসমর্গানী মতবাদে আসে না। এঙ্গেলস্ 'exclusive' বা একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিভূমি হইতে একনিষ্ঠার সমর্থন চলিতে পারে না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্যই একনিষ্ঠায় নারীকে বাধ্য করা হইয়াছিল। সম্পত্তিলোপ হইলেও একনিষ্ঠা যে কেন নর-নারীর জীবনে থাকা উচিত তাহা বোঝা দুষ্কর। আসল কথা 'একবিবাহ' 'একনিষ্ঠা' 'প্রেম' শব্দগুলি ব্যবহার করিলেও ইহাদের সার্থকতা ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যায় কিছুই নাই। তাই সব তর্ক এবং বাক্যজালের আড়াল হইতে এই সত্যই বাহির হইয়া আসে যে আর্থিক ব্যাখ্যার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হয় একবিবাহবিলোপে। যে একবিবাহ মানবসমাজের চির-কালের প্রতিষ্ঠান, তাহাকে 'বুর্জোয়া বিবাহ' বলিয়া শ্রেণী মার্কা আঁকিয়া দিয়া তাহার বিলুপ্তির আদর্শই মার্কসবাদী গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কসও এই কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, বুর্জোয়ারা নারীকে সাধারণ সম্পত্তি ও যৌথভোগের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা প্রকাশ্যে সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চান।

[Bourgeois marriage is in actual fact the community of wives. At worst, Communists can only be charged with wanting to replace a hypocritical and concealed Community of women by an official and frankly acknowledged community." (Com. Manifesto)

অর্থাৎ ভবিষ্যত সমাজে বিবাহ বিলুপ্ত এবং পরিবার বিলীন হইয়া যাইবে ইহাই মার্ক্সবাদের শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মর্গান মার্ক্সবাদীদের এই পরিকল্পনার ভিত্তি হইল তাহাদের অতীত সম্বন্ধে এবং বিবাহের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছক। এই ছকের প্রত্যেকটী ধাপ যে বিকৃত ব্যাখ্যা এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উপরে গঠিত হইয়াছে, তাহা বিস্তৃত আলোচনায় দেখাইয়াছি। ম্যালিনাউস্কীর ভাষায় সংক্ষেপে মর্গানী সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ত্রুটি কি তাহা বিবৃত করা চলে এই বলিয়া: "The writings of Morgan's school suffer from an over emphasis of the sexual aspect, often coupled with prudish reticences; from a misinterpretation of linguistic evidence; from a neglect of the parental and economic aspects of marriage. They are full of fantastic and meaningless concepts such as 'promiscuity', 'group-marriage', 'primitive communism' which as a rule are not even laid down with sufficient concrete details to give hold to our imagination and remain mere words on paper" (B. Malinowski—II)

১৯শ শতকে নৃতত্ব যে স্তরে ছিল তাহাতে বিবর্তনবাদের প্রভাবে সে যুগের পণ্ডিতগণ যে সমাজবিকাশের ইতিহাসকে নির্দিষ্ট ক্রমান্বিত স্তরে ভাগ করিয়া দেখিবেন তাহা মোটেও আশ্চর্য নয়। বিবর্তনবাদের বিপুল প্রভাব তখনকার সকল বিজ্ঞানকেই অভিভূত করিয়াছিল। তাই পূর্বে একটা ছক গঠন করিয়া পরে পছন্দমত তথ্য দ্বারা সেই ছকের কাঠামোকে ভরাট করিবার একটা রীতি তখন সার্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল। আজিকার তথ্য সংগ্রহ আরো বিপুল হইয়াছে। গবেষণার ক্ষেত্রও আজ পৃথিবীব্যাপী। অনুসন্ধানও চলিয়াছে তন্ন তন্ন করিয়া। এই সঞ্চিত তথ্যস্তূপ হইতে মতানুযায়ী কিছু তথ্য বাছিয়া যে-কোন রকমের ছক তৈয়ার করা কঠিন নয়। এসম্বন্ধে এখনকার নৃতাত্বিকগণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। হবহাউস্-গিন্সবার্গ-হুইলারের বিখ্যাত পুস্তক্ হইতে একটি উক্তি তুলিয়া দিতেছি: "The data (of ethnology, anthropology, history of civilization) are so vast and so various that it must be an unskilled Selector who is unable, by giving prominence to the instances which agree and by ignoring those which conflict with his views, to make-out a plausible case in support of some general notion (of human evolution)" (Simpler peoples, P I)

মর্গান তাহাই করিয়াছেন। বর্তমান যুগেও রিভার্স (Rivers), ব্রিফল্ট প্রমুখ পণ্ডিতেরা পুরাতন বিবর্তনী সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত পথেই মত গঠন করিয়াছেন। কিন্তু মর্গানী পথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু মর্গানী রীতি আজ তাঁহার স্বদেশেও প্রত্যাখ্যাত এবং বিবর্তনীদের ইমারত আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জীবতাত্বিক, মনস্তাত্বিক, সমাজ-তাত্বিক ইত্যাদি নানাদিক হইতে আজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তথ্যকে বিচার ও ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ফলে পুরাতন ব্যাখ্যা বহুস্থলেই কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণ হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক সমাজতত্বে বিবাহসম্বন্ধে যাহারা প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকৃত তাহাদের মধ্যে ডারুইন, ওয়েষ্টার মার্ক, ও ক্রলীই প্রধান পথপ্রদর্শক। 'জীবতাত্বিক দিকে ডারুইনের, সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণে ওয়েষ্টার মার্কের এবং মনস্তাত্বিক বিচারে ক্রলীর নেতৃত্ব আজ বিবাহতত্বে স্বীকৃত'। ["modern theories of marriage follow closely the lead of Darwin on the biological side, of Westermerck in his sociological analysis, and of Crawley in some of his psychological suggestions." (B. Malinowski-II) ইহা ছাড়া লাউয়ী, ক্রোয়েবার, হাওয়ার্ড, থুর্ণওয়ালড্ (Thurnwald) স্মিডট্ (Schmidt), ব্রাউন (A. R. Brown), পিট-রিভার্স (Pitt—Rivers) গোল্ডেনবাইজার প্রমুখ সমাজতাত্বিকেরা আজ নতুন পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

সেই পথ অনুসরণ করিয়া নৃতত্ব আজ একবিবাহকেই আদিম এবং মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রথা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু এই মৌলিক ও স্বাভাবিক বিবাহ প্রথাই যে অতি আদিম কালেও একমাত্র বা অদ্বিতীয় বিবাহ পদ্ধতি ছিল তাহা নয়। বহুবিধ শক্তি ও অবস্থা সংঘাতের প্রভাবে সেই আদিকালেও এই প্রাথমিক প্রথার বিকৃতি হইয়া নানা প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি বা যৌনপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে। কোথাও বা বহুপত্নীক বিবাহ, কোথাও উপ-দম্পতি প্রথা, কোথাও বহুপতিক বিবাহ, কোথাও বা আংশিক যৌথ-বিবাহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্যালিকাবিবাহ, দেবর-বিবাহ, মাতুল বংশে বিবাহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ও সংগ্রহেরও বহু বিচিত্র প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা অবস্থার ও কারণের চাপে সর্বত্রই আবার গণিকাপ্রথা এবং অন্যান্য নানা ধরণের ব্যভিচারও সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিকৃতির পিছনে সকল যুগেই মানব-সমাজে প্রাকৃতিক বিবাহ পদ্ধতি হিসাবে সার্বজনীন একবিবাহপ্রথা চিরবিদ্যমান রহিয়াছে। ম্যালিনাউস্কীর ভাষায় বলা যায়, "Monogamy as pattern of prototype of human marriage on the other hand, is universal……Monogamy is, has been and will remain the only true type of marriage" (B. Malinowski II)

দূর অতীতকালের ইতিহাস আজ অন্ধকারে আবৃত। সেই আবরণ সরাইয়া মানুষ আজ যতখানি পারিয়াছে আদিম মানুষ সম্বন্ধে সন্ধান লইয়াছে। সে সন্ধানের আজো বিরাম হয় নাই। কিন্তু যতটুকু জানা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে এতটুকু বলা চলে যে নরনারীর জীবনে অতি স্বাভাবিক যৌনমিলনের পন্থা হইল একবিবাহ: ক্রলীর সহিত বলিতে পারি: "It may be confidently assumed that individual marriage has been, as far as we can trace it back, the regular type of union of man and woman" (Crawley 451)

কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ব কোন অনড়, অচল ছক নির্দেশ করিয়া সমাজবিকাশের ইতিহাসকে কোন বাধা-ধরা অনিবার্য্য ক্রমাম্বয়ের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার পক্ষপাতী নয়। বিশাল ভুবনের কত অংশ আজো অজ্ঞাত রহিয়াছে; কত সমাজ, কত জাতি সম্বন্ধে গবেষণা আজো কত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যে তথ্য শুধু বর্তমান কাল সম্বন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও কতো অসম্পূর্ণ। কাজেই বিশ্বজনীন এবং সর্বকালিক কোন ছক গড়া আজিকার বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। তথ্য সংগ্রহে মানুষের কতকগুলি মানবিক বৈশিষ্ট্য মাত্র ধরা যাইতে পারে। সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একবিবাহও একটা; এইমাত্র বলা চলে। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এই লইয়া চিরকাল মানুষ তাহার প্রাথমিক মানুষী বৃত্তি ও প্রকৃতির পরিপূরণ ও সার্থকতা খুঁজিয়াছে। এই স্বামী-স্ত্রী-সন্তান লইয়া মানুষের প্রাথমিক পরিবার। লাউয়ীর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারি: 'on the strength of this universal trait we are justified in concluding that regardless of all other Social arrangements the individual family is an omnipresent social unit. It does not matter whether marital relations are permanent or temporary, whether there is Polygyny or Polyandry or sexual licence; whether conditions are complicated by the addition of members not included in our family circle; the one fact stands out beyond all others that everywhere the husband, wife and immature children constitute a unit apart from the remainder of the community.' "(Lowie, [illegible])

এই মৌলিক একবিবাহের এবং পরিবারেরও যুগে যুগে বিবর্তন হইয়াছে। যে সব বিকৃতি ও বিচিত্রতা পরিবার ও বিবাহজীবনে দেখা দিয়াছে তাহা কালক্রমিক স্তর নয়। বিশেষ অবস্থার বিশেষ রূপান্তর। এই সব বৈচিত্র্যকে লইয়াই বিবাহ এবং পরিবার যুগ যুগান্তর পার হইয়া অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে। এই চলিষ্ণুতা ও গতির মধ্যে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট ফর্মুলার অলঙ্ঘ্য শাসন ও অনিবার্য্য বাধ্য-বাধকতা নাই। নিত্য নূতন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মানুষ নিত্য নব সামঞ্জস্য করিয়া তাহার পথে অগ্রসর হইবে। যে আত্মবিকাশ ও আনন্দের সন্ধানী হইয়া মানুষ সম্মুখে চলিয়াছে তাহার নবতর রূপায়ন কোন্ নতুন সামঞ্জস্যের মধ্যে ভবিষ্যতে দেখা দিবে তাহা অঙ্কের হিসাব করিয়া কে বলিতে পারিবে?

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি অন্ততঃ সে হিসাব দিবার দুরাকাঙ্খা রাখে না। তবে ভবিষ্যতে পরিবার ও বিবাহ কোন অভূতপূর্ব রূপ গ্রহণ করিবে না এবং মানবপ্রকৃতির সার্বজনীন ও মৌলিক বিকৃতি না ঘটিলে একবিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী-সন্তান সম্বলি, পরিবার ভবিষ্যতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকিবে, ইহা বলা চলে। তবে যুগাদর্শের এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত বিবাহ ও পরিবারেও আংশিক নবায়ন ঘটিবে সন্দেহ নাই। নবযুগের বাণী 'সাম্য এবং স্বাধীনতা'। এই সাম্য ও স্বাধীনতা একদিকে আর্থিক সমাজতন্ত্রে ও অন্যদিকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রে বাস্তব রূপ পাইবে। ইহার ফলে বিবাহ, প্রেম, পরিবারেও নতুন সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইবে।

বিবাহ ও প্রেমে এই নতুন সামঞ্জস্য কি? এই সামঞ্জস্য হইল ব্যক্তি ও সমাজের এবং দৈহিক ও আত্মিকের সামঞ্জস্য। বিবাহ ও প্রেম কেবল ব্যক্তির সুখ ও সার্থকতার জন্য নয়, সমাজকল্যাণও ইহাদের মুখ্যকথা। বিবাহ ও প্রেম কেবল দৈহিক স্তরে, কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লোকে পরিপূর্তি খুঁজিবে তাহা নয়। দৈহিককে ছাড়াইয়া, স্থূল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া আত্মিক আদর্শের স্বর্ণালোকিত ঊর্ধ্ব ভুবনেও তাহার সংযোগ স্থাপিত হইবে। শোষণহীন সমাজে সমাজ-সচেতন এবং সৃজনশীল পুরুষ ও নারীই ব্যাপক এবং দুরূহ সামঞ্জস্য স্থাপনের ভার লইবে।

সমাপ্ত

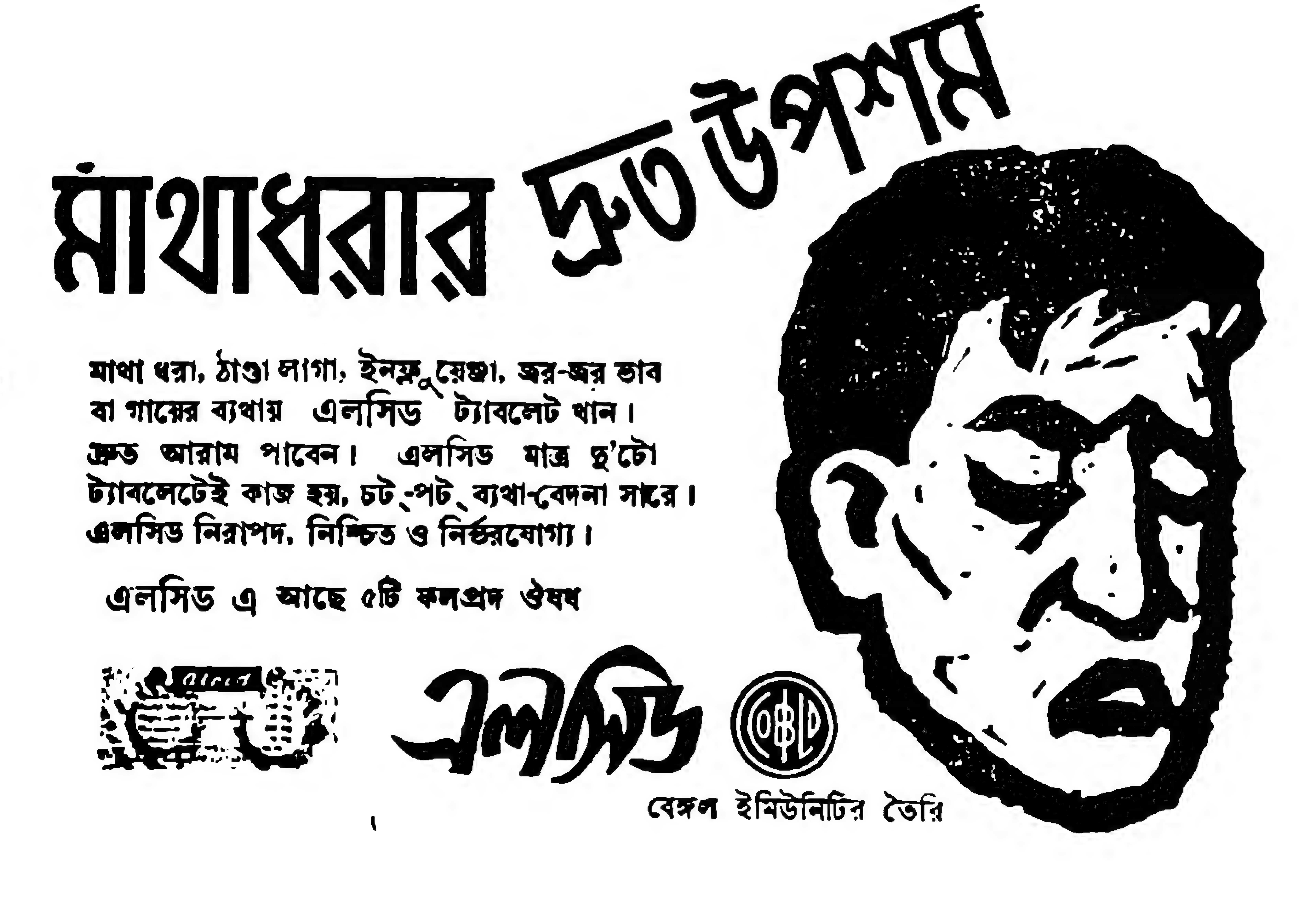

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় কবি : চেরিল্ আনওয়ার

ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

[দেশ-বিদেশের সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে এদেশে খবর পাবার বড় একটা সুযোগ নেই। ইংরেজীতে যে দু'একটি পত্র-পত্রিকা এদেশে আসে তাও সহজ নয়। দীর্ঘদিন থেকেই আমরা এই অভাব অনুভব করছিলাম। সম্প্রতি 'বিদেশী সাহিত্য' সংখ্যা প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, এবং অগণিত পাঠকের অনুরোধেই বর্তমান সংখ্যা থেকে 'বিদেশী সাহিত্য' এই পর্যায়ে একটি বিভাগ যথাসম্ভব চালু রাখতে চেষ্টা করছি। বিভিন্ন ভাষার জ্ঞ, শ্রীব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় এই বিভাগটি পরিচালনা করবেন। স: স:]

যুদ্ধোত্তর ওলন্দাজ কবলমুক্ত ইন্দোনেশিয়ার যে জাতীয়তাবোধ ও সর্ব্ব বিষয়ে আমূল সংস্কারের এক দেশ-জোড়া আয়োজনের সাড়া পড়ে গেল, ইন্দোনেশিয় কবিতার নব রূপান্তরে সেই-সময় চেরিল আনওয়ারের আবির্ভাব ঘটলো। দীর্ঘকাল ধরে ওলন্দাজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সারা ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে সংগ্রাম চলেছিল, আনওয়ার সেই সংগ্রামের পটভূমিকায় গড়ে উঠে ছিলেন ; তাই আজও সারা ইন্দোনেশিয়ার মানুষ তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে জাতীয় কবি রূপে সম্মান জানায়।

১৯২২ সালের ২৬শে জুলাই। সুমাত্রার মেদন্ সহরে তখন ওলন্দাজ সৈন্যরা স্বাধীনতা সংগ্রামী ইন্দোনেশিয়ার গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য করার অভিযোগে সহরবাসী নিরীহ মানুষদের পশুর মত অত্যাচার ও নির্বিচারে হত্যা করছে ; এমনি পরিবেশে আনওয়ারের জন্মলাভ ঘটলো। তরুণ বয়সে যখন তাঁর মধ্যে কবিতার সদ্য স্ফুরণ ঘটছে সে সময় সমগ্র মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জাপানী ফ্যাসিস্ত শাসনের কবলে। প্রতিনিয়ত শঙ্কা আর দ্বন্দ্ব, নানা পরিবর্তন আর স্বৈরাচারে সেই মহাযুদ্ধের ধূম্র-কালিমালিপ্ত অসহনীয় জ্বালাময় পৃথিবীর বুক থেকে কালোরক্ত ক্ষরিত হচ্ছে ; আনওয়ারের কবি-স্বপ্নময় চিন্তায় এই ভয়াবহ রূপ চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, যার অনিবার্য্য ফল ইন্দোনেশিয়ার চিরাচরিত ভাবের আমূল পরিবর্তন। ইতিপূর্ব্বে সুদীর্ঘকাল ধরে ইন্দোনেশিয়ার কবিতার দুটি বিশেষ নিজস্ব রীতি ছিল, 'পানতুন,' ও 'শায়ের'। শায়ের রীতি মুসলমানী রীতির অনুরূপ, পানতুন রীতি আরও অনেকদিন আগের স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের নানারীতির একরূপ। কিন্তু আনওয়ার প্রবর্তন করলেন ইউরোপীয় ভাবধারায় সনেট ও অন্যান্য কাব্যিক ছন্দরীতি, তার মধ্যে বহুরীতি ওলন্দাজ কবিতার অনুগামী। তাঁর আরও এক কৃতিত্ব হলো চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী না লিখে কবি-মানসের গভীর ভাব ও তার প্রতিফলন, জীবন ও প্রকৃতির নানা রহস্য ইত্যাদিকে উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করা। প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের কবিরা আধুনিক হবার চেষ্টা করলেও পুরোনো রীতির প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু চেরিল আনওয়ার সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারায় কবিতা রচনা করতে সুরু করলেন। তাঁর রীতি ইন্দোনেশিয় কবিতার ক্ষেত্রে নব

যুগের প্রবর্তন করলো ; আনওয়ার বাস্তববাদী কবিতার এক নতুন গোষ্ঠী তৈরী করতে সক্ষম হলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এ জন্য অবশ্য আনওয়ারকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হলো। তাঁর শুভানুধ্যায়ী দল তাঁকে যেমন বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালেন, সমালোচকেরা তেমনি নির্মম ভাষায় তাঁর লেখার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। পুরাতন প্রথার অনুবর্তী নয় বলে ইন্দোনেশীয় সমাজে তাঁর কবিতাকে অশিক্ষাপ্রসূত অভদ্রজনোচিত শ্লীলতাবর্জিত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হতে হলো। কিন্তু অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আর দৃঢ়-পৌরুষ এই ছোটখাটো অবিন্যস্ত-কেশ, অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের মানুষটি এই আঘাত শুধু শান্তভাবে গ্রহণ করলেন না, বহুগুণ শক্তিতে ইন্দোনেশিয় সমাজকে তা ফিরিয়েও দিলেন কঠোরভাবে। তিনি ঘোষণা করলেন স্কুলের শিক্ষাই মানুষের জীবন ও চরিত্র গঠনের একমাত্র উপাদান নয়। উচ্চতর সমাজে তখন স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার অভিমান প্রকট—অপর পক্ষে যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ মুক্তি-সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের বেশীর ভাগ তরুণই শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং এই জন্য সারা দেশের ভবিষ্যৎ যোদ্ধা ও নাগরিকদের সম্পর্কে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা অতিমাত্রায় চিন্তিত। আনওয়ার এবং তাঁর বন্ধু রাজনৈতিক নেতা সুলতান শ্যারির নিজেদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে দেশের কর্ণধার ও উচ্চতর সমাজের কাছ থেকে যথেষ্ট বাধা পাওয়া সত্ত্বেও দেশের তরুণ সমাজকে একই সঙ্গে সাহিত্য ও রাজনীতি শিক্ষা দেওয়ায় মনোনিবেশ করলেন জীবন পণ করে, এবং তার ফলে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল। মুক্ত কণ্ঠে দুই বীর ডাক দিলেন,—

"মারিলাহ কিতা বেরসেরু !
ইন্দোনেশিয়া বেরসাতু !"
"এসো আমরা সমস্বরে ডাক দিয়ে বলি,
ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার জয় হইবেই।"

আনওয়ারের কবিতা ও তাঁর স্বদেশ সেবার অবদান, তরুণ সম্প্রদায়কে এত অনুপ্রাণিত ক'রেছিল যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৫ ইন্দোনেশিয়া জাপানী ফ্যাসিজম্-এর কবল মুক্ত হলো। জয়ধ্বনি শোনা গেল সপ্ত সিন্ধু জুড়ে

"হিদুপ্লা ইন্দোনেশিয়া রায়া ! মার্দেকা মার্দেকা !"
"মহান ইন্দোনেশিয়া চিরস্থায়ী হোক !"
স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা !

চেরিল আনওয়ারের উদ্দীপনাময় কবিতা ইন্দোনেশিয়া ও আশেপাশের ছোট ছোট দ্বীপগুলির প্রায় সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগলো।

"দেরু চাম্পুর দেবু" বা "ধূলো ময়লার ঝাঁপি" নামে একটা কবিতা সঙ্কলন যখন প্রকাশিত হওয়ার পথে, এমন সময় ১৯৪৯ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে যুবক আনওয়ারের জীবন দীপ হঠাৎ নিভে গেল। সারা ইন্দোনেশিয়া জাতীয় কবির অকস্মাৎ মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়লো। ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য জগতে এক বিরাট ক্ষতি হলো।

বিদ্রোহী কবিদের নিয়তি বোধ হয় এই। তাঁদের জীবন প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার তরুণ সেদিন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। অশ্রু সজল নেত্রে সুলতান শ্যারির বলেছিলেন, "আনওয়ার ছিলেন এক ফলবান বাড়ন্ত গাছের মত যার শেকড় আরও রস আহরণের জন্য সমাজের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং এই বিস্তারের পথে অজানিতভাবেই কাউকে আঘাত ক'রে থাকবে। কিন্তু সে আঘাত সর্বনাশ আনবার জন্যে নয় আরও বিস্তৃত ছায়াশীতল আশ্রয় সৃষ্টি করবার জন্যে।" সত্যিই আনওয়ার পরিণত বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকলে তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করা যেত। তাঁর কবি-প্রতিভা বিশ্বজুড়ে সম্মানের অধিকারী হতে পারতো।

। কবি আনওয়ারের তিনটি কবিতা ।

অনুবাদক : ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

এসো আমরা মুক্ত হই ।

সবুজ পাতার বুকে আলো
আর খোলা মাঠ,
সদ্য হামাগুড়ি দিতে শেখা শিশু
পবিত্র, নিষ্পাপ,
মধুকণ্ঠ, মুক্তিস্বর সাদা পাখী
প্রাণরস ধারাবর্ষী বৃষ্টি, আর
নতুন যৌবন দীপ্ত জেগে ওঠা জাতি এক ;
সমস্বরে বলে ওঠে আকাশ কাঁপিয়ে,
"আমরা" !

কখন আবার
শুকনো হাওয়া, পোড়া মাটি,
এলোমেলো ঝড়ে ওড়া বালির পাহাড়,
পরিত্যক্ত ভূমি যেন মৃতের কবর ।
সে আমরা জীর্ণ হ'য়ে গেছি,
দানবিক চাপে ক্ষুদ্র, দুর্বল বামন্
মাঝে মাঝে পায়ে পায়ে এদিক ওদিক চলি ।
এসো আমরা মুক্ত হই, আমাদের স্বাধীন করি,
ডানামেলে উড়ে যাই মুক্ত পারাবত হয়ে,
আবার, আবার চিনে নিই সেই খোলা মাঠ,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব যুক্তি তর্ক ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ।

[এই কবিতাটি ওলন্দাজ পুলিশী হামলায় নিহত
কবির প্রিয়তম বন্ধু দাদিদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ।]

অতন্দ্র প্রহরী

এগিয়ে চলো । আমি জানি না এরপর কী আসবে ।
কাজ-পাগল ছেলেরা সন্দেহ-বাতিক বুড়োরা,
মুক্তির স্বপ্ন, আর চিরস্থায়ী নক্ষত্রেরা,
সকলে আমার সঙ্গে এসো,
আমি আমার হৃদ্‌-স্পন্দনের নিঃসাড় সীমানা ঘিরে,
অতন্দ্র প্রহরী ।
আমিও তাদেরই দলে
যারা রাত্রির আশ্রয় নেবে
সুখ স্বপ্ন সাধ রাত্রি, ক্লেদ ঘৃণা মলিনতা হীন ।
এগিয়ে চলো । আমি জানি না এরপর কী আসবে ।

আমায় একটু থাকতে দিও

একদিন যখন আমার ভাষা হারিয়ে যাবে,
যখন আমি আমার নিজের ঘরে ঢোকবার
সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলবো,
যখন ভীত ত্রস্ত আমি আমার ঘরের চৌকাঠে
টলমল, শক্তিহীন, কম্পমান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো,
সব পার্থিব সত্তার অনিবার্য্য পরিণতির ভারে—
(কারণ, আমি জানি, আমি জানি, মৃত্যু সকলের কাছেই
আসবে
— আসবেই, আমার কাজ শেষ হবার আগেই আমার
কর্মচঞ্চল হাত অনড় হয়ে যাবে, বিমূঢ়াত্মা আশাহত
আমি খুব কষ্ট পাব স্বপ্নে দেখেছি এই অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ)—
তখন আমায় একটু থাকতে দিও
ঐ উঁচু মিনারের চূড়ায় যেখানে তুমি আগেই পৌঁছে গেছ ।
যেখানে তুমি ফিরে গেছ এ পৃথিবীর
মত্ত কোলাহল আর আড়ম্বর থেকে—
যে আড়ম্বর বাইরে থেকে খুব আকর্ষণীয়
কিন্তু অন্তঃসার শূন্য ।
সেখানে, যেখানে তুমি নিত্য প্রার্থনায় রত
আমায় একটু থাকতে দিও ।
যতক্ষণ না আমায় ঘিরে থাকা অন্ধকার
আর গাঢ় বেদনা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হ'য়ে যায় ।

[এই কবিতাটি বিখ্যাত ইন্দোনেশীয় চিত্রশিল্পী
আফান্দির উদ্দেশে রচিত ।]

দর্পণে কয়েকটি মুখ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

না, না তুমি বাহিরের লোক। তুমি গোপন সভায়
অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ; এই সাংঘাতিক সান্ধ্য অন্ধকারে
যে ক'জন বসে আছে তারা কেউ স্নেহ মমতায়
অভিসিক্ত, মন্ত্রমুগ্ধ নয়। তারা দুর্ভেদ্য প্রাকারে
দারুণ ব্যাধির হাতে সমর্পণ করেছে হৃদয়
এবং শিকড় হতে স্নেহ মমতার চারাগুলো
উৎপাটিত করেছে ঈর্ষায়। ভীষণ যুগের অবক্ষয়
উদঘাটিত প্রতি আচরণে। দ্যাখো, ইতস্তত এলোমেলো

কোনোই আসক্তি আর বুকে নেই তীব্র হিংসা ছাড়া
এবং আলোকে নয় ঈর্ষার প্রতীক অন্ধকারে
নারী ও শিশুর কাছে ভীতিপ্রদ বিচ্ছিন্ন ইশারা
আপাতত একান্ত সম্বল। আজ শিল্পের উদ্ধারে
নির্লিপ্ত আগ্রহহীন ; অন্য কোনো মিলিত উদ্যমে
রৌদ্রালোকে পরিশুদ্ধ মানুষের সঙ্গে সম্মেলনে
উদ্ভাসিত হতে পারছে না। তুমি যদিও সুন্দর

মার্জিত হাসির দীপ্তি ঠোঁটে এনে অতি ভদ্রভাবে
সুহৃদ সান্নিধ্যে লীন হতে চাও, সবাই এখানে
বর্বর উত্তাপ ঢেলে দীর্ঘকাল বিষাক্ত স্বভাবে
নারকীয় অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যবৎ এবং সম্মানে
এখন উৎসাহী নয়, তুমি ফিরে যাও নির্বাসনে
বাইরে রৌদ্রের দেশে ; না, না তুমি এসো না এখানে।

ময়ানতলী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিল জানি গুল্মলতায় সবুজ ধাঁধায়
ঝর ঢাকা,
যায় না সেথায় যায় না কেউ সে পথে না যায়—
কচিৎ আলোয় উদ্ভাসিত কচিৎ বাধায়
সমর্পিত।

আঁকাবাঁকা—আঁকাবাঁকা—
পথ গেছে অপ্রত্যাশিত
ময়ানতলী—
সেথায় অমারাত্রি জ্বলে সেথায় রাকা
রাত্রি ঝরে—বাঁশির শিখায় দাহন লাগা,
অবাক সেথা পুড়িয়া যায় নিগুতিভোর
অশথশাখা।

দুপুরবেলায়
অলোক অন্যমনস্কতা ফুরায় অলি—
অলোক অন্যমনস্কতা বিলারে ঘোর—
কত অ-সুখ হেলায় ফোটে কত হেলায়
হারায়ে যায়···
যায় না সেথায় যায় না কেউ সে পথে না যায়—
ময়ানতলী
নয়নতলে একলহমা, আঁখি জাগায়,
পরক্ষণে ফুরায় অলি।

ভাসান

শান্তি লাহিড়ী

তোলো হে নয়ন পার্বতী প্রিয়তমা,
জানি নটরাজ তোমারে করেনি ক্ষমা,
আমি নটরাজ নই।
ওষ্ঠে লাগুক তৃষ্ণার বিনিময়
যা খুশি বলুক মানুষেরা কামনার
নাম ধরে যদি সারা পৃথিবীর শরীরে লিখিয়া রাখে
আমাদের নাম—
তোমার আমার
তোলো হে নয়ন, দেখো সেদিনের অধীর হৃদয়মা
নত হয়ে নেই ; বটবৃক্ষের শাখায় কে যেন কাকে
বলিয়া গিয়াছে একটি কথাই
যত কাছে থাকি, যত দূরে যাই
সব আরাধনা শেষ হলে তুমি নদীর উজানে
বসিয়া বিরলে অলক্ষ্যে কারো ঘণ্টার ধ্বনি
শুনে বলে দিও
বলে দিও যেন ভুলিয়া যেওনা

প্লাবনের জলে ভেসে গেল ফুলমালা !

সন্ধ্যা :

অম্বুজ বসু

মন্দিরে ঘণ্টার রোল অবিরল প্রপাতের মতো,
ধ্বনির অতীত তবু কিছু থাকে আঁধারে বিতত ;
যদি কেউ খনির গভীরে
ডুবে গিয়ে আকাঙ্ক্ষার এক কুচি হীরে
খুঁজে নিতে আলোটি নিভোয়—
নৈঃশব্দ্যের কূলে যেতে শব্দের ভেলায় গিয়ে শোয়।

দুই বিন্দু :

অদ্রুজ বসু

শহরের বিপন্ন আঁধারে
পথের নিশানা দিয়ে দীপ্ত-তনু মেয়ে
চলে গেল আলোক-রেখার পথ বেয়ে
জ্যোতির্ময় লুপ্তির ওপারে।

অন্তজন আমার গভীর অপরাধে
চোখ তুলে চেয়ে একবার
মার্জনা বিছিয়ে গেছে হৃদয়ের প্রধ্বনিত খাদে,
তাকেও ঢেকেছে অন্ধকার।

অনেক আলোকবর্ষ পার হয়ে গেলে
অগণন পরিম্লান মুখোশের ভীড়.
তার মাঝে একবিন্দু আলোর উৎসার,
একবিন্দু অম্লান তিমির।

রাজপুত্র

অজয় ভট্টাচার্য

সবাই এখন বড় ব্যস্ত। আসছে-যাচ্ছে, উত্তেজিতস্বরে কথাবার্তা বলছে। এই ব্যস্ততার তরঙ্গে মন রেখে অমিয় ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করল। মেক-আপ শেষ। আর খানিক পরেই অভিনয় শুরু হবে। পায়চারী করতে করতে নীচু গলায় অমিয় নিজের পাট আওড়াতে লাগল। চারপাশের চাপা গলার আওয়াজ এবং যান্ত্রিক শব্দে মনকে একাগ্র রাখা দায়। ওর সর্বাঙ্গে উত্তাল উত্তেজনা এখন গাঢ় ছাপ রেখেছে। ওকে এখন ভীষণ অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে। ওকে এখন বড়ই বিপন্ন দেখাচ্ছে। নিজেকে নিস্তরঙ্গ করার প্রয়াসে একটা সিগারেট ধরাল। এবং সৌভাগ্যক্রমে একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল।

চেয়ারে যুত করে বসে ও এখন চারপাশে তাকাচ্ছে। ওকে এখন প্রায় নিস্পৃহ দর্শকের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, চেতনার গভীরে অনেক চিন্তা তীব্রভাবে ক্রিয়া করছে। ফলত মুখের আদলে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ঔদাসীন্য ক্রম-রেখায়িত। এই চিন্তারত অবস্থায় ও বিনোদকে দেখতে পেল। একটা ডাক দিতে উদ্যোগী হল ও। কিন্তু তার আগেই বিনোদ হাতুড়ি নিয়ে স্টেজে ছুটে গেল। স্টেজে পেরেক ঠোকার শব্দে বুঝল, বিনোদ এখন ভয়ানক ব্যস্ত। সুতরাং ওকে এখন ডেকে বিব্রত করা উচিত নয়। এই সিদ্ধান্তে ও নিজেকে বিবেকী ও ন্যায়বান বলে গণ্য করে অস্পষ্টভাবে হাসল। এবং অসংযত ইচ্ছেটুকু তাড়িয়ে সামনে তাকাল। আর তখনি কয়েকজন নারীপুরুষের ব্যূহ ভেদ করে বিনোদ আবার ওর চোখে দৃশ্যমান হল। কিন্তু অমিয় এখন আর ওকে ডাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেনা। কেননা এই মুহূর্তে ও অলকাকেও দেখতে পেয়েছে। তাছাড়া কয়েকমুহূর্ত আগের অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এখনো ওর মনে মৃদু ক্রিয়াশীল। চক্রাকারে পরিভ্রমণরতা অলকা ওর সামনে এসে, ওকে অতিক্রম করল। তারপর সামনে এগিয়ে গেল। ধোঁয়ার রিঙ পাকাতে পাকাতে অমিয় অলকার এই বিপন্ন-ব্যস্ততা লক্ষ্য করল। অলকাকে এখন ভীষণ বিব্রত ও ব্যস্ত দেখাচ্ছে। চঞ্চলমনে ডায়লগ আওড়াচ্ছে ও। মোটামুটি ঝালিয়ে নিচ্ছে। দেখে অমিয়র ভ্রূ দুটো অল্প কুঁচকাল। এই মুহূর্তে অমিয়র ভাবনা এইরূপ : এখন মনকে শান্ত রাখা দরকার। নইলে সব ঘুলিয়ে যাবে। এই নাটকে আমি নায়কের পাট পেয়েছি। সুতরাং এখন মনে কঠিন দৃঢ়তা থাকাই সঙ্গত। অন্যথা উত্তেজিত হলেই তরী অকূলে ভেসে যাবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ভাবতে ভাবতে অমিয় সহসা ধূসর আকাশের মত ম্লান হয়ে গেছে। আজ ওর জীবনে প্রথম অভিনয়। প্রথমেই নায়কের পাট। এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। অথচ নন্দিনী আজ এই গৌরবময় ঘটনার সাক্ষী থাকবে না। নন্দিনী আসেনি, শরীর ভাল নেই ওর। এসব কথা ভেবে ওর চোখদুটো ম্লান হয়ে আসছিল। কিন্তু সহসা অলকা কাছে এসে অনড় হওয়ায় চমক ভাঙল। মৃদু হেসে অমিয় অলকার উজ্জ্বল প্রসাধিত রূপ দেখল।

অলকার চোখদুটো চঞ্চল হল। 'প্রথম দৃশ্যেই কিন্তু দুজনে আছি।'

যথেষ্ট সচেতনতা নিয়ে অমিয় কান পাতল। শব্দগুলি ভাবনায় বাজিয়ে নেওয়ার সময় ওর শরীর সহসা আলোড়িত

হল। এই সময় চেয়ার নড়ে ওঠার কর্কশ শব্দের সমতালে ওর গলায় 'হুঁ' বাচক একটি শব্দ ফুটেছে। বস্তুত, কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট কোমলতা আনার চেষ্টা করা সত্বেও চেয়ার সরানোর শব্দের মিশ্রনে তা ব্যর্থ হয়েছে। এবং 'হুঁ' শব্দটি যথাস্থানে পৌঁছানো সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় ও তৎক্ষণাৎ বলল, 'তারপর তৃতীয় দৃশ্যে।'

শব্দক'টি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার পর অমিয় আড়-চোখে অলকাকে দেখল। এই সময় ও অলকার একটি উজ্জ্বল শাণিত বাহু দেখতে পেয়েছে। ফলত মুহূর্তেই ওকে খুশী-খুশী দেখাল। এবং সহসা অলকার গলা শোনার জন্য মাথা নত করে উৎকর্ণ রইল।

অলকা অস্পষ্টভাবে বলল, 'অভ্যেস নেই মোটে, একটু যেন নার্ভাস ফিল করছি।'

'ভয় কি, আপনার ত ছোট রোল। কয়েকটি দৃশ্য মাত্র।'

'জীবনে এই প্রথম অভিনয়।'

'আমারও।'

'তাই নাকি?'

'হু, অফিসে সকলের অনুরোধ এড়ান গেলনা।'

'আমারও সেই ব্যাপার।'

'সাতটায় নাটক শুরু হওয়ার কথা।'

'ছটা-পাঁচ। কিন্তু রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে, আটটার আগে আরম্ভ করতে পারবেনা।'

'দর্শকরা অধৈর্য হলেই মুস্কিল।'

'তা বটে।'

ওদের কথাবার্তা আপাতত এখানেই থামল। কারণ, ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। ওরা চায়ের ভাঁড়ে মনোযোগ দিল। শূন্য ভাঁড়টা বাটিতে ফেলার সময় অমিয় দেখল, অলকা অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ওর লিপস্টিক-রঞ্জিত ঠোঁট তবু সামান্য ভিজে-ভিজে দেখাল। ঠোঁটদুটো যথার্থই ভিজে কিনা, এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য অমিয় আড়চোখে নজরে তীক্ষ্ণতা আনতে প্রয়াসী হতেই অলকার হাতে ছোট্ট একটা বাহারী রুমাল দেখা গেল। অলকা সাবধানে ঠোঁটের ওপর রুমাল বুলালো।

চুপচাপ কয়েকমুহূর্ত কেটে গেছে। এই নীরবতা সম্পর্কে সচেতন হতেই অমিয় এখন চঞ্চল ও অসহিষ্ণু। অকারণ এদিক ওদিক সকলের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে তবুও চুপচাপ কয়েকমুহূর্ত কাটিয়ে দিল। তারপর সহসা মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। এবং বলল, 'কাল ষ্টেজ-রিহার্সালে আপনি বেশ ফ্রি ছিলেন!'

একথা শুনে অলকার মুখে শব্দহীন হাসি ফুটেছে। শাড়ীর মসৃণতা পরখ করতে করতে বলল, 'বাইরের ভীড় ছিল না তাই। আজ যে কি হবে!'

'কোন ভয় নেই। আমি আছি, ঠিক চালিয়ে নেব।'

খানিকক্ষণ ওরা চুপচাপ রইল। অমিয় দেখল, অলকা নতমুখে চেয়ারের কোনা খুঁটছে। দেখে ও সিদ্ধান্ত করল, অলকা চিন্তারতা—সম্ভবত কিছু ভাবছে। কি ভাবছে। অমিয় অনুমান করতে চাইল। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানীর মত ও অলকার ভঙ্গিগুলো লক্ষ্য করল। তারপর এই ছেলেমানুষী সম্পর্কে সচেতন হয়ে এখন শূন্যমনে মৌন থাকায় ব্রতী আছে। সময়ের পল-অনুপলগুলির দীর্ঘতা অনুভব করতে করতে অমিয় এখন অধৈর্য। উঠে দাঁড়াল। তারপর অলকাকে ডেকে নিয়ে স্টেজের এককোনে এসে দাঁড়াল। ওরা চঞ্চল-আবেগে দু-একটা দৃশ্য ঝালিয়ে নিতে লাগল।

খানিক পরে বিনোদ এল। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে ও দুজনের অভিনয়ের মহড়া প্রত্যক্ষ করায় কয়েক মিনিট অতিবাহিত করেছে। তারপর ওর চোখের দৃষ্টি শূন্য। কোন কিছুই দেখছে না, শুধু প্রতীক্ষায় আছে। সুযোগ পেতেই ও অমিয়র কাঁধে হাত রেখে বলল, "চল একটু বাইরে যাই।"

'কেন, কি ব্যাপার?' মৃদু বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অমিয়।

অনিচ্ছার ভঙ্গি করল। এবং অন্তরঙ্গ অনিচ্ছার সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য বলল. 'কী দরকার বাইরে গিয়ে! আয়, এইখানেই বসি।'

কিন্তু অমিয়কে হতাশ করে বিনোদ বলল, 'এখানে বড় হৈ-চৈ, বাইরেই একটু বসি গে।'

অমিয় বুঝল, আর উপায় নেই। বিনোদের ইচ্ছার টানে এখন এই আলোকিত মঞ্চ ত্যাগ করতে হবে। এ কথা ভাবতে ওর ভাল লাগল না। ভাল না লাগায় ওকে অনুজ্জ্বল দেখাল। খুব আস্তে ও উঠে দাঁড়াল।

স্টেজে ব্যস্ততার ভীড়ে অলকাকে রেখে ওরা বাইরে এল। এটা হাউসের পেছন দিক। লোকজন বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে দু-একজন আসছে যাচ্ছে। সুতরাং জায়গাটা প্রায় নির্জন বলা যেতে পারে।

বিনোদ একটা সিগারেট ধরাল, অমিয়কেও দিল। বাইরে এখন মৃদু মৃদু হাওয়া, আকাশে অযুত নক্ষত্র। এখানে পাতলা অন্ধকার আলোর সঙ্গে সমভাবে মিশে আছে। সামনে লোকজন, আলো। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু কিছু শব্দ আলাদাভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছে। যেমন ট্রামের ব্যাকুল আর্তনাদ, বাসের আচমকা হুস্-হাস্, জনতার বিক্ষিপ্ত কথা-বার্তার টুকরো ইত্যাদি। মৃদু হাওয়ার স্পর্শ নিতে নিতে অমিয় এই মিশ্রিত শব্দপুঞ্জে মুহূর্তের জন্য ভাসমান নৌকা হল। তারপর পাশে বিনোদের প্রখর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলল, 'এরা আটটা বাজিয়ে দেবে দেখছি।'

কথাগুলো বিনোদ শুনল কিনা বোঝা গেল না।' কারণ, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তখুনি ও বলল, 'অলকাকে মাইরী আজ খুব চার্মিং লাগছে।'

এ কথায় অমিয়র চোখদুটো জ্বলে উঠল। চারপাশের দৃশ্যাবলী একনজরে পরখ করতে করতে ভিজে গলায় বলল, 'সেজেছে খুব।'

বিনোদ বলল, 'দারুণ অগ্নিশিখা! আমার মাইরী পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে।'

'এ আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়তে হবে।'

বিনোদ সুর করে বলল, 'হোক্. তবু সে মধুর মরণ জেনো বরণীয়।'

দুজনে সশব্দে হেসে এই আলো-ছায়ার নির্জনতাটুকু মুখর করল। হাসতে হাসতে অমিয় বলল, 'তুই খুব মজে গিয়েছিস্।'

'তুমিও বাপু কম নও। ভিজে বেড়াল, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো।'

'কি করে বুঝলি?' অমিয়র স্বর অস্পষ্ট শোনাল। এই সময় ওর চোখ দুটো প্রায় বুঁজে এসেছে। ক্লান্ত পথিকের মত আধবোজা চোখে ও বিনোদের উত্তর শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল।

বিনোদকে এখন চিন্তারত দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবল। তারপর হাল্কা গলায় হো-হো করে হেসে অমিয়র পিঠে আস্তে করে চাপড় মারল। 'হুঁ হুঁ! নায়ক-নায়িকা—স্টেজের কোনে সর্বদাই গুজ-গুজ, ফুস্ ফুস্। আমি সব বুঝি।'

কথাগুলো অমিয় সচেতনভাবে শুনল। এখানে মুহুর্মুহু স্টেজের রকমারী শব্দ ভেসে আসছে। এই শব্দের আওতা থেকে বিনোদের কণ্ঠস্বত শব্দগুলি আলাদা রেখে ও বিশ্লেষণ করতে চায়। ফলত ওর কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। কিন্তু মনের এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী রইল না। সহসা ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ঠাট্টার সুরে বলল, 'হিংসে হচ্ছে?'

'তা একটু-আধটু কি আর না হচ্ছে!'

'কিন্তু তোর অনুমান আগাগোড়া ভুল। আমি অত বেকুব নই, বুঝলি? ঘরে তাজা বৌ আছে।'

কথাগুলো শুনে বিনোদ হাসল। এবং কথার মোড়

ঘুরিয়ে বলল, 'বৌদিকে দেখছিনা যে! কি ব্যাপার, আসেন নি?'

অমিয়র মুখে ম্লান বিষণ্ণতার ছায়া গাঢ়তা পেল। এই মুহূর্তেও নন্দিনীকে ভাবনার স্থান দিতে পারছে। বলল, 'নন্দিনীর শরীরটা ভাল নেই। ওর ইচ্ছে ছিল খুব, কিন্তু কদিন ধরে সর্দিজ্বর। এলনা তাই।'

বিনোদ একটু দুঃখিত হওয়ার প্রয়াস করল। মুখে একটা আফশোষসূচক শব্দ ফুটিয়েও এখন অমিয়র ম্লানতা লক্ষ্য করছে। ক্ষণকাল অমিয়র মুখে নিষ্পলক দৃষ্টি রাখার পর বলল, 'ইস্ আচ্ছা দিনই অসুখ করল!'

'তাতে কি, এত সামান্য ব্যাপার। ও না দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।...আর তাছাড়া ফুরিয়ে ত যাচ্ছে না! যে অফিসার এসেছে, সংস্কৃতির বাই প্রায়ই চাগবে।'

'কিন্তু তোর প্রথম অভিনয়!'

'এবং নন্দিনীর অসুখ।'

একমুহূর্ত চুপ থেকে বিনোদ বলল, 'চল্, ওঠা যাক্।'

শরীরে কোন আলোড়ন সৃষ্টি না করে অমিয় স্তব্ধ হয়ে রইলো, উত্তর দিল না। একটা কাঠের টুকরো সামনে পড়ে ছিল। কুড়িয়ে নিল, এবং তাতেই মনোযোগী হওয়ার মুহূর্তের প্রয়াস ওর সর্বাঙ্গে প্রকট হল। বস্তুত সে এখন কাঠের টুকরোটায় মনোযোগী নয়। মনের আনাচে-কানাচে ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনা শরৎকালের মেঘের মত ক্রমাগত বিচরণশীল। কখনো নন্দিনী, কখনো আজকের অভিনয়-রজনী, চাকরী ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনোদের গলা শুনেও তাই এই নিস্পৃহতা। ওকে এখন খুব উদাস-উদাস দেখাচ্ছে।

স্বল্প আলোয় ঘড়িতে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে বিনোদ বলল, 'ছটা-পঁচিশ। আর দেরী করা ঠিক নয়, ওঠ্।'

অমিয় আস্তে বলল, 'তুই যা, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

এখন ছটা-পঁচিশ। সাতটায় নাটক শুরু হওয়ার কথা। এবং নির্দ্ধারিত সময়ে শুরু করা সম্ভব না হলেও আর এভাবে বসে থাকা সঙ্গত নয়। একথা ভেবে বিনোদ ব্যস্ত হল। ওর শরীরে সহসা চাঞ্চল্য ফুটেছে। এখন স্টেজে উপস্থিত হওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিনোদ দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল। তারপর অমিয়কে একপলক দেখে সামনের মুখর ব্যস্ততার দিকে এগিয়ে গেল।

বিনোদ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অমিয় সামনে তাকাল, দেখল। বিনোদের ক্রম-অপসৃয়মান শরীর দেখা সাঙ্গ করে অমিয় সামনের আলো-আঁধারীর দিকে তাকাল। যানবাহনের শব্দ ও জনতার কোলাহল খানিক শুনল। এখন এই শব্দ-পুঞ্জের স্রোতে ভেসে যেতে ওর খুব ভাল লাগছে। এই অনুভবটুকু নিয়ে কিছু একটা ভাবল। আর তখনি একটা শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়াসে কাঠের টুকরোটা সামনে ছুড়ে মারল। এবং সঙ্গতভাবেই ওর ইচ্ছা পূর্ণ হল। বস্তুত শব্দই এ জগতে যথার্থ অমর। অন্যমনস্কভাবে অমিয় ভাবল। এখুনি ও একটা ছোট শব্দ সৃষ্টি করেছে। হোক্ ছোট, তবু এই শব্দ ইথার-তরঙ্গে আমরণ প্রবাহমানতা পেয়ে জন্মমুহূর্ত থেকে যত্রতত্র বিচরণশীল। এইসব ভাবনায় ও কয়েকমুহূর্ত আচ্ছন্ন রইল। অর্থাৎ অন্তরস্থ গহন ইচ্ছার সমুদ্র থেকে উৎসারিত এই ভাবনার ফলশ্রুতি একটি ছোট শব্দের প্রবাহ-মানতায় খানিকক্ষণ এলোমেলোভাবে ভাসমান রইল। এর-পর ও অলকার কথা ভাবছে। প্রথমেই ওর মানসে অলকার আবছা প্রোফাইল শিল্পীর প্রথম তুলির টানের মত ফুটে উঠল। অলকা আজ খুব সেজেছে। ভাবল। অলকার উজ্জ্বল প্রসাধিত রূপের কথা ভাবতে ওর খুব ভাল লাগছে।

নতুন ধানের মত এই কোমল থাকাকালীন কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। দূরাগত অপার্থিব ধ্বনির মত এই স্বর চেতনায় ঘা দিতেই উৎকর্ণ হল ও। কিন্তু আর কিছু শোনা গেলনা। শুধু ক্ষণপূর্বের ধ্বনিপ্রবাহের শেষ রেশ মনের কোমল অংশগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর কোন ডাক

কানে না আসায় ওকে অসহিষ্ণু ও সংশয়ী দেখাল। ঠিক সেই সময় একটা ট্রাম প্রচুর শব্দ করতে করতে স্থির লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে। এই ক্ষীয়মান ধ্বনিতে ভেসে যেতে যেতে অমিয় কখন অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরে চঞ্চলতা ফুটতেই ও স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলেন?' নরম গলায় অলকা শুধাল।

'কোথাও না, এই এমনি একটু বাইরে বসেছিলাম। যা গরম, বাইরে তবু শান্তি।'

'আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? তা ভয় পাওয়ার কারণ?'

'শেষ মুহূর্তে যদি উধাও হন! আমার আশঙ্কা হয়েছিল।'

'এখন নিশ্চিন্ত ত!'

'বিশ্বাস কি! কোন্ ফাঁকে যদি আবার ভেগে পড়েন!'

'ভেগে-পড়া রাজ্যহারা বাংলার নবাব!' উচ্চকণ্ঠে খানিক হেসে অমিয় অলকার মুখে দৃষ্টি স্থাপন করল। যেন একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা করেছে, ওর ভঙ্গিতে এরকম একটা ভাব প্রকট হয়েছে। এইসময় ও আস্তে বলল, 'আমাকে কি সেরকম ভীতু মনে হয়?'

অলকা খানিক ইতঃস্তত করল। তারপর প্রখর সপ্রতিভ হওয়ার প্রয়াসে চঞ্চলভাবে বলল, 'হয়ই ত! ভীতু-ভীতু, একেবারে ভীতু আপনি।'

'কিন্তু স্টেজে দেখবেন আগুন ছুটিয়ে দেব।'

'ভারী ক্ষমতা! আচ্ছা, দেখা যাবে মশাই।' হাসতে হাসতে অলকা বিনোদের দিকে এগিয়ে গেল।

অমিয় অলকার এই হাস্যতরঙ্গিত রূপ দেখল। বহু ব্যবহৃত উপমা বর্ষার দুকূলপ্লাবিতা নদীর কথা মনে এল ওর। অনুভবে প্রখর তীক্ষ্ণতা নিয়ে অলকার উক্তিগুলো খানিক বিশ্লেষণ করল। অলকার কথায় একটি ইঙ্গিতই বেজে উঠেছে। কিন্তু ও কি জানে, অমিয় বিবাহিত! একথা ভেবে অমিয় মনে মনে হাসল। ও কি জানে নন্দিনীর কথা! হয়ত জানে, হয়ত জানেনা।

এইসব ভাবনায় কয়েকমুহূর্ত কেটেছে। এখন অমিয় প্রায় অসহিষ্ণু। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও এসব আজে বাজে ভাবনা তাড়াতে চাইল। এবং মনে মনে নিজের পার্টগুলো আওড়াতে ব্যস্ত হল।

কিন্তু এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে নন্দিনীর কথা মনে পড়ছে। ও এলে আজ কী ভালোই না হত! অমিয় ভাবল। ভেবে ওর দুঃখ হল। দুঃখ ভুলতে ও এখন দ্বিগুণ ব্যস্ততায় পার্ট আওড়ানোর কাজে নিজেকে মগ্ন রাখার চেষ্টায় আছে।

অলকার অনুমানমত নাটক প্রায় আটটায় শুরু হল। এবং একসময়ে শেষ হল। মোটামুটি উৎরেছে। সবাই বলল। কেউ কেউ তারিফ করল। অমিয়র অভিনয় মন্দ হয়নি। অলকারও। কয়েকজনের বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে অমিয় যুগপত চঞ্চল ও আবেগে উদ্বেল। উজ্জ্বল চোখে অলকাকে খুঁজছে। পেলনা। না পেয়ে একটু বিমর্ষ হল। খানিকদূরে কয়েকজন কলিগকে দেখা যাচ্ছে। ওরা দৃশ্যমান হতেই অমিয় প্রাত্যহিক ধূসর জগতে পা দিয়ে ক্রমেই ম্লানতর।

স্টেজের এককোণে বসে অমিয় চোখ বুঁজল। মঞ্চের আলোছায়ায় এতক্ষণ যেন এক স্বপ্নজগতের মধ্যে ও বিচরণ করছে। চোখ বুজে থাকায় মৃত কুয়াসার মত ওর ধূসর পৃথিবী তথা অফিস এবং কলিগরা মুছে গেল, এবং অত্যন্ত দ্রুততায় নাটকের দৃশ্যগুলি ভাবনায় ছোটাছুটি করতে লাগল। ক্ষণপূর্বের বিষণ্ণতা মুছে ওর মন আবার তরঙ্গাকুল। এবং অমিয় যেন এই তরঙ্গে ছোট তরী: দুলছে, এখন দুলছে।

বিনোদ দু-একটা ছোটখাট কাজে ব্যস্ত ছিল। মুহূর্তের অবসরে ওর কাছে এল। অতি নিকটে পায়ের শব্দে অমিয় চোখ খুলেছে। ওর চোখে এখনো এক আশ্চর্য স্বপ্নময় হাসি ফুটে আছে। বিনোদকে দেখে নরম গলায় বলল, 'আয়।'

পাশে বসতে বিনোদ বলল, ‘আর পারা যায় না! সারাদিন ছোটাছুটি, কাজ আর কাজ!’

এ কথা শুনে অমিয় যথার্থই ক্লান্তি অনুভব করল। ওর কোমল হয়ে আসা স্নায়ুগুলোতে ক্লান্তির কোমল অনুভব সঞ্চারিত হচ্ছে। এই আলস্য নিয়ে ও বিনোদকে লক্ষ্য করল, এবং বলল. ‘কাজের লোক অনেক আছে। এবার একটু বিশ্রাম নে।’

পাশে বসতে বসতে বিনোদ চারপাশে তাকাল। চেয়ারের নাড়াচাড়ায় খানিক কর্কশ শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধ্বনিপ্রবাহ শ্রবণে আঘাত তুলে থেমে যাওয়ার মুহূর্তে ও বলল, ‘তাইত এলাম। কাঁহাতক আর ছোটাছুটি করা যায় একটু জিরিয়ে নি।’

তারপর অভিনয় কেমন লাগল?’ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অমিয় উচ্চারণ করল।

‘ভালই। তোর অভিনয় বেশ ভাল লাগছে। মনেই হয়না. স্টেজে এই প্রথম! বেশ সাবলীল, সপ্রতিভ।’ কাটাকাটাভাবে শব্দগুলি বিনোদের মুখ থেকে ধীরগতি উপলখণ্ডের আওয়াজের মত গড়িয়ে গড়িয়ে উচ্চারিত হল। তারপর এখন চোখেমুখে তারিফ করার ভঙ্গি এনে মৃদু মৃদু হাসছে।

‘আর অলকার?’

‘সে কথা তাকেই জানিয়েছি। তোকে বলে লাভ কি!’

‘ডুবে ডুবে তুইও জল খাস্ দেখছি।’

‘খাই-ই ত। তবে সাঁতার জানি, তলিয়ে যাইনা।’

কিছু না বলে অমিয় মৃদু হাসল। ওর মুখ এখন স্টেজের দিকে ফেরান আছে। চারপাশে এখন অনুজ্জ্বল আলো। ভীড় নেই, এই স্বল্প আলোতে কয়েকজন যুবক ও প্রৌঢ়। ওরা ইতস্তত চলাফেরা করছে। সকলেই এখন কাজে ব্যস্ত। অমিয় নিস্পৃহ চোখে ওদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করল। অলকা সম্ভবত চলে গেছে। খানিক আগে এখানে অলকার প্রখর উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে। একথা ভেবে ভাল লাগল। ভাল লাগতেই ও বিনোদের কাঁধে হাত রেখেছে। বিনোদ সপ্রশ্ন চোখে ওর মুখে দৃষ্টি স্থাপন করতেই ও দ্রুত বলল, ‘সিগ্রেট আছে?’

অন্যমনস্কভাবে অমিয় সিগারেট নিল। ধরাল। তারপর স্টেজের ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ শুনতে শুনতে বলল, ‘আজকের দিনটা বেশ কাটল। ভারি ভাল লাগছে।’

‘মনে হচ্ছে, যেন রাজ্যজয় করে ফিরলি! তাই না?’

‘ঠিক তাই।’

‘দুঃখ শুধু, বৌদি এই গৌরবময় দৃশ্যের আড়ালে থেকে গেলেন।’

কথা না বলে অমিয় খানিক ভাবল। মুহূর্তেই নন্দিনীর মুখটা ভাবনায় ফুটে উঠেছে। এই সময় ও ঘাড় ফিরিয়ে হলের শূন্য চেয়ারগুলো দেখল। দুজনের মাঝে এখন সাময়িক স্তব্ধতা গাঢ়তা পেয়েছে। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বিনোদ বলল, ‘চল্, ফেরা যাক্।’

‘কোথায়?’ অন্যমনস্কভাবে অমিয় শুধাল।

‘কোথায় মানে। বাড়ী ফিরতে হবেনা?’

মুহূর্তেই অমিয় সচেতন হল। অপ্রতিভ ভাবটা কাটাতে চড়াগলায় হেসে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ, সে ত যেতেই হবে।’

‘কি ভাবছিলি?’ মৃদু বিস্ময়ে বিনোদ শুধাল।

‘কিছু না, এমনি—।’

‘উঁহু, নিশ্চয় বৌদির কথা!’

উত্তর না দিয়ে অমিয় ক্ষণপূর্বের ভাবনার খেই ধরল। তারপর নন্দিনীর কথা ভাবল। ওর ভাবনার স্তরে স্তরে একটা ইচ্ছা ক্রমে আকার নিতে থাকল। প্রতি অনুভবেরই একটা উর্দ্ধ, নিম্ন অথবা পার্শ্বচাপ আছে। ভাবনাবৃত্তের এই নিয়মে অমিয় মনের ভারসাম্য প্রায় হারাল। এবং একটি ইচ্ছার চাপে তখন ওর মনটা ঝড়তাড়িত বৃক্ষের মত অতিক্রত দোদুল্যমান।

'সাড়ে-দশ হল। সাজপোষাক ছেড়ে নে, অযথা রাত করে লাভ নেই।'

দোদুল্যমান অমিয় কোনমতে উচ্চারণ করল, 'তা ঠিক।'

'মেক-আপ এখনো তুলিস্‌নি দেখছি। ব্যাপার কি, কোটিপতির আদুরে দুলাল সেজে আর কতক্ষণ বসে থাকবি।'

অমিয় কোন উত্তর দিল না। কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল। ওর কপালে চিন্তার অস্পষ্ট ছাপ ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। বিনোদ ওকে লক্ষ্য করল, ওর চিন্তারত মূর্ত্তি এক-নজরে দেখে সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকাল। তারপর না পাওয়ার ব্যর্থতায় ওর মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ফুটল। এবং তৎক্ষণাৎ বলল, 'কি ব্যাপার?'

একথা শুনে অমিয়র শরীরে কোন আলোড়ন জাগেনি। চিন্তার গাঢ় ছায়া এখন ওর মুখে। বিনোদ আর একবার ডাকতেই সমগ্র চিন্তায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল, এবং কণ্ঠ-স্বরে কোমল আচ্ছন্নতা নিয়ে ও ডাকল, 'বিনোদ!'

'কি?'

'একটা কথা ভাবছি।'

'রাত-দুপুরে আবার কি ভাবতে শুরু করলি?' মৃদু বিস্ময়ে বিনোদ ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করল। খুব আস্তে অমিয় বলল, 'ভাবছি, নন্দিনীকে চমকে দেব।'

'মানে?'

'কোটিপতি-নন্দন সেজেই ওর সামনে হাজির হব, ওকে চমকে দেব।'

একথা শুনে বিনোদ সশব্দে হাসছে। হাসতে হাসতে ও অমিয়র পিঠে একটা চাপড় মারল, এবং বলল, 'বাবাঃ, তোর পেটেপেটে এত বুদ্ধি! তা প্ল্যান মন্দ ঠাওরাসনি। চল্, তাহলে ট্যাক্সী ডাকি।'

সমর্থনসূচক ভঙ্গি সৃষ্টি করার প্রয়াসে অমিয় মাথা কাত করেছে। ওর গলায় খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ ধ্বনিত হল। শব্দটি বিনোদের শ্রবণে পৌঁছানো সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় ও বলল, 'সেই ভাল. যাওয়া যাক্‌······ খুব মজা হবে।'

ওরা নিঃশব্দে ট্যাক্সীতে উঠল। সিনেমাহলের গেট পার হওয়ার সময় গাড়ী মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াল। এইসময় অমিয় ঘাড় ফিরিয়ে প্রায় জনশূন্য হাউসের চেহারা দেখল। ভাল লাগল না। একটু আগেই এখানে সহস্র জনতার ভীড় ছিল। এখন নেই। রাস্তার বহুমুখী জনস্রোত পার হ'তে হ'তে অমিয়র কাছে এই শূন্যতা প্রকট রূপ নিল। জনশূন্য হাউসটা দেখে ওর ভাল লাগে নি। এই ভাল না লাগাটুকু এখন ওর মনে তীব্র ক্রিয়া করছে। অস্পষ্টভাবে ও বলল, 'কাল ভাবছি ছুটি নেব।'

'দরখাস্ত?'

'পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে।'

'কাল তোর সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, শরীরের ওপর দিয়ে যা স্ট্রেইন গেল।'

'এমন আর কি! তুই ত সকাল থেকে ছুটে মরলি। বিশ্রাম তোরই বেশী প্রয়োজন।'

'সে গুড়ে বালি। ক্যাজুয়াল লিভের ঘরে বৃহৎশূন্য।'

'সে কি! এর মধ্যেই সব ছুটি নষ্ট করলি!'

'নষ্ট! তা বলতে পারিস, স্ত্রীর নিত্যি অসুখ! আর ভাল লাগে না ছাই।'

গাড়ী এখন ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কোন কথা না বলে অমিয় ময়দানের অন্ধকার গহ্বরে চোখ রাখল। ক্ষণপূর্বের মৃদু বিষণ্ণতা ওর মনে ক্রমে ব্যপ্ত হচ্ছে। নন্দিনীকে আজ খুব চমকে দেওয়া যাবে। ভাবল। আর মুহূর্ত্তেই সংসারের অভাবজীর্ণ বিশীর্ণ ছবি ওর ভাবনায় ফুটে উঠল। আমূল চমকে উঠল ও। কাল থেকে আবার প্রাত্যহিক ধূসর জীবন যাত্রা। একথা ভেবে ও এখন বড় বিষণ্ণ ও ম্লান। ওর ভাবনায় উপর্যুপরি অনেক চিন্তা একসাথে তালগোল পাকিয়ে গেল। 'এই বেঁধে-বেঁধে।' নিজের উচ্চকিত গলা

শুনে অমিয় প্রায় চমকিত। ওর ভঙ্গিতে এখন একটা চমকলাগা ভাব ফুটে উঠেছে। আস্তে বলল, 'ফিরে চল।'

অবাক-চোখে বিনোদ ওকে লক্ষ্য করল। বলল, 'সে কি! কিছু ফেলে এসেছিস্ নাকি।'

অমিয়র চোখে বিষণ্ণ হাসি ফুটেছে! ময়দানের গহ্বর থেকে ছুটে-আসা একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে ধাক্কা দিতেই সম্বিত ফিরল। মনে মনে বলল, ইস্, কী ছেলে মানুষীই না হতে যাচ্ছিল। প্রহসনের শেষে আরেক প্রহসন। এই-সব ভাবনার পর ও খুব আস্তে বলল, 'ফিরে যাওয়াই ভাল, মেক-আপ তুলতে হবে।'

'মানে?'

অমিয়র গলায় কোন শব্দ নেই। গাড়ী টার্ণ নেওয়ার সময় ও ধুতির কোনা দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করায় মনোযোগী হল। আর গাড়ীর সংকীর্ণ পরিসরে অবিরাম প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, ফিরে যাওয়াই ভাল—ফিরে যাওয়াই ভাল—ফিরে যাওয়াই—।

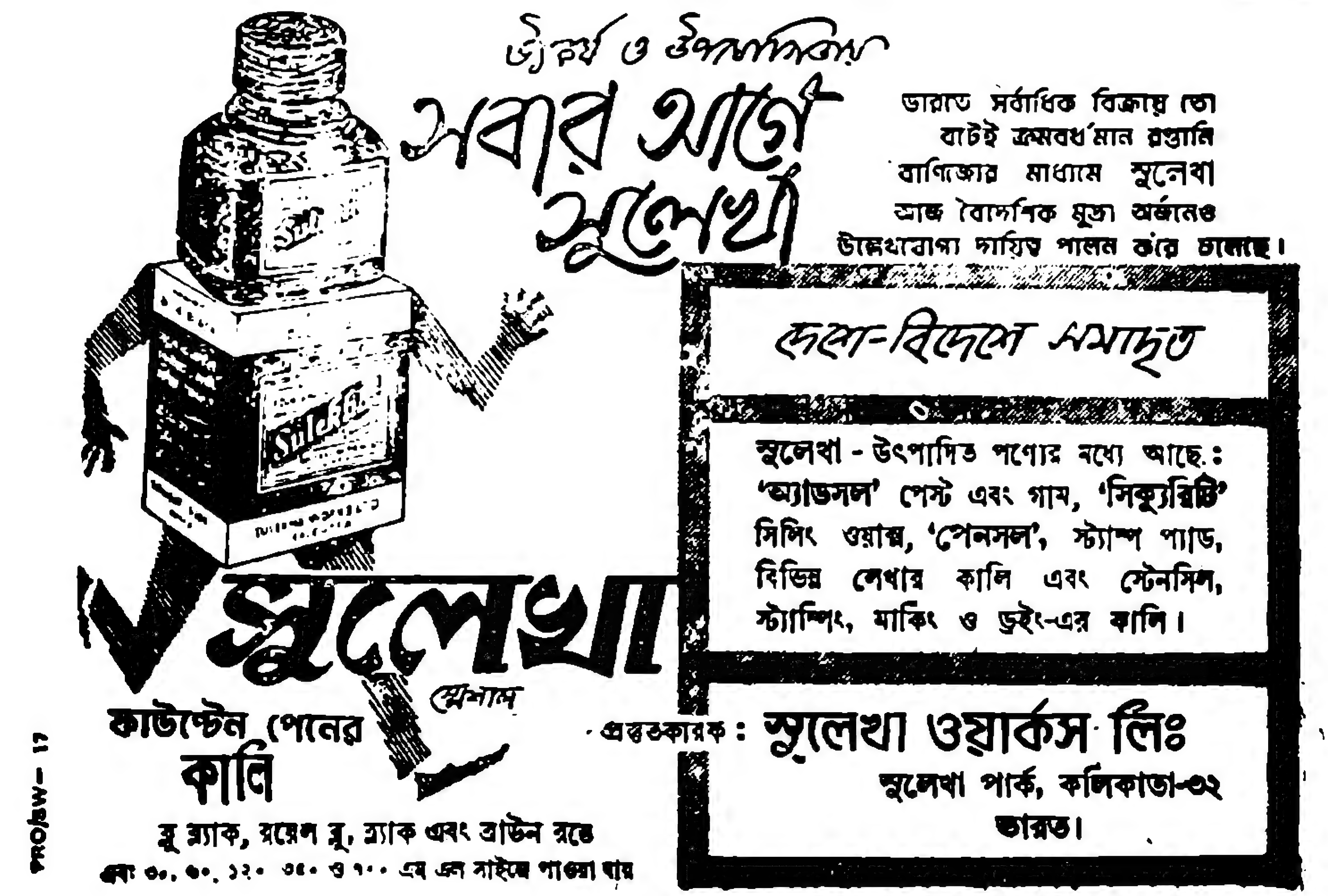

পুস্তক পরিচয়

অনুবাদ

বেদনাহত। অ্যান্টন শেখভ : অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক : জ্ঞানতীর্থ : মূল্য চার টাকা।

শুধুমাত্র রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, সমগ্র পৃথিবীর নবজায়মান ছোটগল্পশাখার ইতিহাসে আন্তন চেখফ্ একটি স্মরণীয় নাম। মানুষের বেদনার ভাষ্যকার হিসেবে চিরকালের অন্যতম অবিস্মরণীয় রূপকার রূপে বিশ্ব-সাহিত্যের বরণীয় ব্যক্তিত্ব তিনি। জীবিকায় চিকিৎসকের বৃত্তি ছিল তাঁর অবলম্বন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি নয়, বিচিত্রস্রোতা জীবনের কৌতুক এবং করুণার মিশ্রবোধে উদ্দীপ্ত ছিল তাঁর শিল্পীসত্তা। টলস্টয়ের মতো পরিব্যপ্ত নয় তাঁর পরিসর, কিম্বা পরিণামী আস্তিক্যে স্পন্দমান নয় তার কণ্ঠস্বর। ডস্টয়ভস্কীর মতো মানব-অস্তিত্বের নৈতিক সমস্যার তীব্রতায়ও আন্দোলিত নয় তাঁর মন, কিন্তু রুশ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-প্রণেতা রিচার্ড হেয়ারের উক্তি স্মরণে রেখে বলা যায় তাঁর মমতাস্নিগ্ধ রচনাগুলি বাস্তবিকই "Wonderful mossaic of incident and impression." অভিজ্ঞতার পরিশীলিত দর্পণে বর্ণবহুল ঘটনাপুঞ্জ নয়: সেই ঘটনার নেপথ্যশায়ী আনন্দ-বেদনার সূক্ষ্ম অনুভবগুলিকে তিনি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে গেছেন। বেদনার যে একটি মৃত্যুঞ্জয় তাৎপর্য আছে: যে বেদনা রূঢ় পরিপার্শ্বের সঙ্গে অসঙ্গতির ফলে উপজাত, সেই বেদনার মরমী শিল্পী ছিলেন আন্তন চেখফ্। বর্তমান উপন্যাসের নায়ক 'মিশেল' ব্যবহারিক জগতের বিচারে ব্যর্থ বিজিত 'বেদনাহত' নায়ক। শূন্যগর্ভ বংশগৌরব এবং অত্যন্ত স্থূল স্থপতিবিদ্যা নিয়ে মিশেলের পিতা মিশেলকে এবং তার ভগ্নীকে নিজের ইচ্ছার অনুক্রমে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে সশঙ্ক সত্তার বাতাবরণের বাইরে মিশেল চিনেছে এই জগতকে, বাঁচতে চেয়েছে রং-মিস্ত্রির কিম্বা কৃষিনির্ভর জীবনের শ্রমসিদ্ধ জীবনে ; ভালোবেসে চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছে এঞ্জিনিয়র ডলঝিকভের কন্যা 'মাসাকে'; প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তার ভগ্নীর প্রণয়কে তার প্রাতিস্বিক মূল্যে, কিন্তু পরিণামী হতাশা, ব্যর্থতা এবং বেদনার উপচার ভিন্ন জীবনের কাছ থেকে আর কোনও উপহার সে অর্জন করেনি। দেশ-কাল এবং পটভূমির সমস্ত রকম ব্যবধানকে উপেক্ষা করে মিশেলের বেদনাহত অন্তর্বিক্ষোভ আমাদের স্পর্শ করে। চেখফ্ জীবনালেখ্য রচয়িতা ভ্লাদিমির ইয়েরমিলভ্ তাঁর রচনার মধ্যে Poetic individuality-র কথা বলেছেন, ডুবেকনিয়ার নিসর্গদৃশ্য বর্ণনায়, শহরের নানা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় কিম্বা মিশেলের অন্তর্বেদনার অঙ্কনে চেখফের এই কবিব্যক্তিত্বের পরিচয়টি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত কবি, অপর এক কবি-প্রাণ রূপস্রষ্টার অনুবাদে তিনি যদি কবি হিসেবে 'তাঁর স্বাধিকারকে আরও একটু বেশি কাজে লাগাতেন তাহলে হয়তো অনুবাদটি আরেকটু বেশি সুপাঠ্য হোতো। সম্ভবতঃ মূলের প্রতি তাঁর আনুগত্যবোধকে তিনি খুব বেশী বিস্তৃত করতে চেয়েছেন ফলে অনুবাদে শেষের কিছুটা অংশ বাদে প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত আড়ষ্টতা রয়ে গেছে! 'বর্ধিষ্ণু গাঢ় অন্ধকার', 'তাঁর নির্মিত বাড়ীর সম্মুখভাগে সব সময়েই একটা কঠিন ভীরু রেখাঙ্কিত একগুঁয়ে ভাব থাকত,' 'তাঁর গোলাকৃতি খাড়া খাড়া দাড়ি ছিল' 'অতিথি-সেবিকা' [সম্ভবতঃ host এর

বঙ্গানুবাদ]. 'ধাবমান মাছের সংঘর্ষে জলবুদ্বুদ নড়ে উঠছিল' 'বিবর্ণ খড়ের গাদা' 'ফাঁপা এবং ভোঁতা ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী' —ইত্যাদি অনুবাদ অত্যন্ত শ্রুতিকটু ঠেকে এবং তৎসম শব্দের নানা অসঙ্গত ব্যবহারও পাঠকের রসবোধকে পীড়িত করে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদক ভাষান্তরটিকে আর একটু সতর্কতার সঙ্গে পরিমার্জিত করবেন। প্রচ্ছদপটটি অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর। আর 'শেখভ' নামকরণটি কি ঠিক? মুজতবা আলী-মারফৎ যতদূর জানি এটির সঙ্গত উচ্চারণ 'চেখফ্'!

তিনটি উপন্যাস

খড়কুটো।

বিমল কর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড্: কলিকাতা –৯: দাম চার টাকা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মশাই একটি খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন: 'শুনেছি বাঙ্‌লা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী'—কথাকাহিনীর আত্ত চিত্তজয় সাধারণ্যে প্রচলিত উপযোগিতার দিকে তাকালে এ উক্তিটির বিস্ময়কর সত্যতা সম্পর্কে কোনও দ্বিমত থাকে না। কেননা কথাসাহিত্য আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রায় রোমান্স এবং রূপকথার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'রোমান্স' শব্দটিও তার সেই অপরূপ জ্যোতির্ময় দ্যুতিস্ববলিত ব্যঞ্জনার্থ হারিয়ে অধুনা রুদ্ধশ্বাস এ্যাডভেঞ্চার কিম্বা অলৌকিক কল্পচরিতার্থতার নামান্তর। এ যুগে তাই ইতিহাসাশ্রিত ভ্রান্তিবিলাস কিম্বা জড়ভরতের সত্যসন্ধিৎসা মহাকাব্যের গদ্যাশ্রয়ী ছদ্মবেশ পরে পাঠককে প্রলুব্ধ করে, এলিয়ট যেমন বলেছিলেন, এখানে ভিন্নতর অর্থে, একখণ্ড মাংসপিণ্ড ফেলে দিয়ে চোর যেমন প্রলুব্ধ করে প্রহরী সারমেয়কে। বাঙ্‌লা উপন্যাসের এই অভিনব সমৃদ্ধির (?) দিনেও কিছু লেখক আছেন যাঁরা বাঁধা সড়কের যাত্রী নন, সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' সেই মানুষের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের আর্ত অন্তঃপুরের বিচিত্র সংবাদ যাঁরা অপাবৃত করেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের উপকূলে ভেঙে পড়া জীর্ণ সময়ের দীর্ণ 'দেওয়ালকে' যাঁরা দেখাতে পারেন অত্যন্ত নৈষ্ঠিক সততায়, বিমল কর সেই সততা-পরায়ণ শিল্পীগোষ্ঠিরই অন্যতম। রহস্য-উপন্যাস দিয়ে সুরু করেছিলেন তিনি, তার-পর মনোগহনের নানা বিসর্পিল পথরেখা অনুসন্ধানে, উপন্যাসের তথাকথিত 'এক্‌স্টারনাল রিয়ালিটি'-র বদলে 'ইনটারনাল্ রিয়ালিটির' প্রবর্তনে তৎপর হয়ে; আলোচ্য শেষতম উপন্যাস 'খড়্‌কুটো'তে এসে দাঁড়িয়েছেন বিগতকৈশোর আসন্নযৌবন এক মুগ্ধজীবনের রহস্যরক্তিম দ্বারপ্রান্তে। সৃষ্টির শেষ রহস্য, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'ভালোবাসার অমৃত' তারই নিত্যধারাসারে এ উপন্যাসটির সমস্ত পরিমণ্ডলটি পরিকীর্ণ; দুটি আশ্চর্য নাম ভ্রমর এবং অমল [একটিতে ভালোবাসার দুর্দ্বার গুঞ্জরণ, অন্যটিতে প্রথমজা প্রণয়ের অনাবিল শুদ্ধতা], একজন শীর্ণ, ধূসর,—যন্ত্রণার্ত একটি অন্ততর অতীতে, হিমানীমাসির শাসনের শঙ্কিত ছত্রছায়ায় যার বর্তমান অস্তিত্ব; অথচ খৃষ্টের মহিমার প্রতি একটি জ্যোতির্ময় বিশ্বাসে বলয়িত যার জীবন. সেই ভ্রমরের জীবনে কতকগুলি কুহেলিধূসর প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যার বিচ্ছিন্ন অনুভব এবং কথামালার সূত্রে তার পৌরুষ, তার মমতা, তার উজ্জ্বলতা, তার প্রণয়কে প্রমূর্ত করে তুলেছিল অমল, তার এই অবকাশ যাপনের মন্থর দিনগুলিতে। নিজের চারপাশে হয়তো একটি অমলিন বিশ্বাসের দিগন্ত রচনা করেছিল অসুস্থতা পীড়িত ভ্রমর; মধ্যপ্রদেশের নিঃসঙ্গ এই অধ্যাপকবাড়ির খৃষ্ট বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বপ্ন দেখতো সন্ন্যাসিনী-জীবনের, কিন্তু তার ওই ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাওয়া, বিদীর্ণবিষাদ জরতপ্ত জীবনে অন্যতর এক সুখী, যৌথ জীবনের স্বপ্নচ্ছবি তুলে ধরেছে অমল, যেখানে খৃষ্টের অলৌকিক মহিমা জীবনের ইন্দ্রনীল অনুভবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ভালোবাসার ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা

তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে এক অপরূপ রহস্যময় নীড়ের স্বপ্নকে গড়ে তোলে। কেবল ডেলিপ্যাসেঞ্জারের পারিপার্শ্বিকতা ভোলানো নয়, কেবল পৌরাঙ্গনার নিদ্রাকর্ষণের মহৌষধি হিসাবে নয়; সমসময়ের সমস্ত ক্লিন্ন বুলিমালিন্যের উপর ভালোবাসার অমৃতত্তোরণ প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য কৃতিত্বে বিমল কর অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁর শেষতম উপন্যাসে। দেশ পত্রিকায় প্রকাশের মুহূর্তে রচনাটিকে 'নভেলেট' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল; হয়তো সে অভিধাটিই ঠিক কেননা উপন্যাসের সর্বাবয়ব পরিব্যাপ্তি এখানে অনুপস্থিত, ছোট গল্পসুলভ একটি উৎকর্ণ 'তারপর?' আমাদের মনে স্বতঃই জাগ্রত হয়, কিন্তু এহ বাহ্য, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে স্বেচ্ছাচার অত্যন্ত সংক্রামক; কিছু প্রতীচী ধ্যানধারণা জোর করে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, যখন বাঙলা ভাষার নামে কিছু সংকর সন্ধ্যাভাষার সমর্থক সংখ্যাও নগণ্য নয়, তখন বিমলকরের আশ্চর্য বর্ণনায় মধ্যপ্রদেশের এক দেওয়ালীর অন্ধকার রাত্রে 'বিরিজমোহনের' বাজির কৌশলে অন্ধকার আকাশের তলায় আলোর ময়ুর ফোটে, পুণ্য খৃষ্টজন্মদিনের দিব্যসংগীতের গীত ধ্বনি বেজে চলে, আর রোগমুক্তির জন্য ভ্রমরকে রেলগাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে অমল যেখানে বুঝতে পারেনা 'ভ্রমর ফিরে আসবে কিনা,' কিন্তু যেখানে সে অনুভব করে 'ভ্রমর এখন অনেকটা দূরে', আর "অনেকটা দূরে বলে সে শুধু ভাববে, ভাববে এবং অপেক্ষা করবে।" হৃতবিশ্বাস এই যৌবনের দিনে, ভালোবাসা যেখানে আজও শুকতারার অন্যতর নাম, বিমল কর তার অনিন্দ্য রূপকার হিসেবে প্রত্যেক সৎ পাঠকের অভিনন্দন অর্জন করবেন।

প্রতিধ্বনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য: বসু চৌধুরী: তিন টাকা।

কবিপ্রসিদ্ধি ছাড়াও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অন্য একটি পরিচয়ও বাঙলা সাহিত্যে সুবিদিত। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তথাকথিত প্রথম সারির লেখক না হলেও, গল্প এবং উপন্যাসের জগতে তাঁর সঞ্চরণ অনেকদিন থেকে। আগ্রহী পাঠক, 'বৃত্ত', 'মৌচাক', 'কষ্টি দেবায়', 'কাচ' ইত্যাদি উপন্যাসের প্রণেতা সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে অবশ্যই মনে রাখবেন। মূলতঃ কবি হলেও ঔপন্যাসিকের নৈরাত্ম নিরাসক্তি তাঁর আয়ত্তাধীন, তাই বর্তমান উপন্যাস 'প্রতিধ্বনির' মধ্যেও সংযত আন্তরিকতায় তিনি একটি বেদনাঘন বিয়োগান্ত প্রণয়-কাহিনীর অবতারণা করেছেন। স্বচ্ছন্দবিত্ত উত্তরচল্লিশ লেখক অরিন্দম রায় নিঃসঙ্গ মানুষ। সাহিত্য সেবায় সৎ আদর্শপরায়ণ। পরিপার্শ্ব সাহিত্যজগতে যখন ন্যূনতর প্রতিভার অধিকারী ত্রিদিব মিত্তির প্রমুখ লেখকেরা কেবলমাত্র চীন তদ্বিরের চেষ্টায় পদ্মশ্রী ইত্যাদি উপাধি অর্জনে পারঙ্গমতা দেখায় তখন নিঃসঙ্গ আদর্শের বৃত্তে তিনি একক প্রচেষ্টায় সৎ সাহিত্য রচনায় নিমগ্ন থাকতে চান। তাঁর এই স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসনের জগতে দুটি মাত্র বান্ধব একজন দীর্ঘকালের সুহৃদ সুজন-ডাক্তার, অন্যজন অপ্রবীণ গল্প-রচয়িতা বন্ধু শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়া কচিৎ কখনো আসেন তাঁর বোন অরুণা. এবং রয়েছে সর্বক্ষণের সঙ্গী ভৃত্য নিমাই। এ হেন নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনে কেবলমাত্র শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিয়ে আবির্ভাব ঘটলো একটি মেয়ের। নাম মিত্রা, জীবিকায় শিক্ষিকা, ইতিহাসের এম. এ, সাহিত্যে, বিশেষ করে অরিন্দম রায়ের উপন্যাসে যার অপরিসীম অনুরক্তি। যৌবনের একটি অবাঞ্ছিত, অর্ধসমাপ্ত প্রণয়ের পর অরিন্দম রায়ের জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় এই শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হোলো প্রেমে। কিন্তু দেহের সংরক্ত সান্নিধ্যে মিত্রার সঙ্গে প্রণয়ের পৌনঃপুনিকতা আস্তে আস্তে ক্লান্ত করে অরিন্দমকে। মনে মনে সে যেন মৃত্যু কামনা করে মিত্রার। আর অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ম্যানেনজাইটিস্ রোগে মিত্রার মৃত্যু ঘটলে নিঃসঙ্গহৃদয় অরিন্দম অন্তরের পাপবোধ থেকে বেশিমাত্রায়

হার্টের বেদনাউপশমকারী অসুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে। মিত্রার ধ্বনি তার নির্বান্ধব নির্বাসনে যে প্রতিধ্বনি তুলেছিল মৃত্যুর পরপার থেকে সে ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনি তুলে মৃত্যুর দিকে আহ্বান জানিয়েছে। কাহিনীটি মোটামুটি সরলভাবে বর্ণনা করলেও অরিন্দম রায়ের বকলমে সাময়িক কিছু সাহিত্যিক প্রয়াস এবং প্রচেষ্টার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত নগ্ন এবং স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রীতিটি আর একটু তির্যক হ'লে পাঠকের ক্ষোভের কোনও কারণ থাকতো না। আর একটি কথা, লেখক অরিন্দম রায় দাদু্‌ংসিভর মতো তাঁর অসমবয়সিনী প্রেমিকার খোঁপায় ফুল গুঁজে দেন, লেখার ফাঁকে ফাঁকে কিছুদিন প্রতীচী উপন্যাস না পড়লে নোতুন কোনও কাহিনী তাঁর মনে আসে না, সার্ত্রের উপন্যাসের মহিমা তাঁকে আকৃষ্ট করে, হেমিংওয়ের লেখার "মনকে জড়িয়ে ধরবার ক্ষমতা" সম্বন্ধে তিনি সচেতন, আর বিশ বছরে যিনি সতেরো খানি উপন্যাসের রচয়িতা, তাঁর বই-এর নাম সেই মামুলী 'ভস্মতীর্থ'—যেখানে মিত্রা নাম্নী কোনও চরিত্র তার স্বামীকে 'বার' থেকে বাড়িতে টেনে নিয়ে এসে বলে "মদ খাও তো আমার সামনে বসে এখানে খাও, আমি যতটুকু মাপ বলে দেব ততটুকুই খেতে পাবে', স্বামীকে ওখরে ফেলে কড়া পাহারায়; কিম্বা "মিত্রার স্বামী নীতিশ অন্য একটি মেয়ের প্রেমে আসক্ত। মায়া তার নাম মিত্রা মায়ার এক চিঠি আবিষ্কার করেছে নীতিশের শার্টের পকেটে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে দুজনের। মিত্রা অবশি শেষটায় নীতিশকে মায়ার মায়াপাশ থেকে ছিনিয়ে আনবে"; কিম্বা অরিন্দমের পরিকল্পিত শেষ উপন্যাস যার নাম 'একা', এবং যার সারাংসার একটিমাত্র বাক্যে "মানুষ একা থাকলে অমানুষ হয়ে যায়'—ইত্যাকার পরিকল্পনার মহত্ত্ব সত্যি কথা বলতে আমাদের খুব বেশী স্পর্শ করে না।

দুই অরণ্য

সমরেশ বসু: আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট্ লিমিটেড্: দাম দু'টাকা।

শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে বাঙলা উপন্যাসের জগতে যখন তথাকথিত 'এপিকের' প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত সংক্রামক, তখন যে দুচারজন রচয়িতা অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত সততায় জীবনের বহুদীর্ণ রূপটি আমাদের সামনে উন্মোচিত করার প্রয়াসী, সমরেশ বসু সেই বিরল ব্রতীদেরই একজন। নিছক রোমান্স-রচনার প্রেরণায় বিঃটি রোডের ধার থেকে শালখেরির সীমানা পেরিয়ে নির্জন সৈকতের আস্তীর্ণ বালুকা-পুঞ্জে তাঁর সঞ্চরণ নয়; জীবনেরই বিচিত্র-জটিল রহস্য-দুর্গম বিপন্ন-সুন্দর রূপ তাঁকে আকর্ষণ করে এবং 'অঠিক গুরু, বেঠিক গুরু, গুরু অগনানের' হাতে জীবনের যে অপরূপ মন্ত্রদীক্ষা অর্জন করা যায় তারই প্রেরণায় বর্তমান উপন্যাসে বিহারের সীমান্তবর্তী সভ্যমানুষের শ্রুতিমাত্রনির্ভর মুণ্ডা-জীবনের এক বিশ্বস্ত আলেখ্য তুলে ধরেন তিনি, এবং সেই জীবনেরই অন্তর্গত মুণ্ডাসন্তান চেকোর জীবনে একদিকে ওই পরিচিত অরণ্য অন্যদিকে শহরের অপরিচিত অরণ্যের দ্বিমুখী আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বটিকেও আমাদের সামনে পরিস্ফুট করে তোলেন। আরণ্যক জীবনের কোনও অনুমানসিদ্ধ কল্পচ্ছবি নয়, দূরে কৃষ্ণনীল পাহাড়ের যবনিকাঘেরা দিগন্ত, চতুষ্পার্শে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ ছায়ারৌদ্রচিহ্নিত অরণ্যস্থলী, যেখানে বালি-চিহ্ন চিক কোয়েল নদীর চরে বালুকণায় স্বর্ণসন্ধান করে ফেরে বৃদ্ধ 'গোমা হোরো'; আগন্তুক সভ্যতার প্রতিধ্বনি তুলে সেখানে মাঝে মাঝে আসে 'দীখু' 'ঠিকাদারের গাড়ির আওয়াজ, যারা এসে কাঠ বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়, গোমা হোরোর রূপকথাশাসিত বিশ্বাসের সেই বিস্মিত জগতের মধ্যে স্বর্ণগৃধ্নু বনোয়ারী সাহরা এসে আস্তানা গাড়ে, আর যে জগৎ আদিম বিশ্বাসের এই প্রথাসীমা অতিক্রম করে আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে অর্থলোলুপ পাপের পথে,

বাওয়ামুণ্ডার রেলওয়ে ইয়ার্ডের দিকে কিম্বা কুরকেলার ইস্পাতনগরীর দিকে, সমরেশ বসু তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র, 'ফরেস্ট গার্ড' 'চেকো ক্যারকাটাকে' উপলক্ষ করে এই বিবর্তমান বিশ্বাসের একটি বিশ্বস্ত আলেখ্য রচনা করেন। 'দুই অরণ্যের' মধ্যে নাগর এবং আরণ্য-সভ্যতার দ্বিজসন্তান ফরেস্ট গার্ড চেকো। খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে যৌবনে পৌঁছে চেকোর দীর্ঘদিনের বাসনা চরিতার্থ হয়েছে, সে সরকারী তকমা এঁটে ফরেস্ট গার্ডের চাকরী পেয়েছে। কিন্তু নাগরিকতার বহিরঙ্গ দীপ্তি তাকে স্পর্শ করলেও অরণ্য-বিভাগের কর্মবৃত্তে এসে তার সেই মৌলিক আরণ্য-বিশ্বাস বিপন্ন হয়েছে; অত্যন্ত নির্বিকার এবং নির্বিচার চিত্তে সভ্যতার অপরিহার্য কলুষ চৌর্যবৃত্তিকে সে প্রশ্রয় দিতে পারেনি; তাই স্বজাতি মুণ্ডারেঞ্জার স্টিফেনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। এই অরণ্যের আমরা চেকো ছাড়া অন্য আরও দুটি ব্যক্তিকে বিচিত্র আকর্ষণে বেঁধেছে। একজন পূর্বতন ফরেস্ট অফিসার আলফ্রেড সাহেব অন্তজন শহরের সর্পিল জটিলতা থেকে পালিয়ে আসা স্বেচ্ছানির্বাসিত হরকিষেণ মাষ্টার—যারা অরণ্যের প্রচ্ছন্ন শান্তির মধ্যে নিজেদের অন্তর মুক্তিকে অর্জন করেছে। কর্মজীবন ছাড়াও মুণ্ডা চেকোর একটি স্বয়ংবৃত নর্মজীবন ছিল যে জীবনের অধীশ্বরী ছিল তার পরিণীতা প্রণয়িনী মাংরী। কিন্তু অরণ্যের নৃশংস হিংস্রতার হাতে সেই মাংরীকেও বিসর্জন দিতে হয়েছে চেকোকে। তার নিঃসঙ্গ হৃদয় ভার নিয়ে ড্রাইভার সন্তোষের সঙ্গে চেকো এসেছে কোলকাতা শহরে, কিন্তু এখানেও বিশ্বাসের কোনও বিমূর্ত ছবি তাকে আকৃষ্ট করেনি জীবনের করুণ অপচয় তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সেই প্রাচীন অরণ্যে। যেখানে অরণ্যের শুভ্রতাকে বিনষ্ট হতে দেখে, তার আরণ্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চেকোকে কারাবরণ করতে হয়েছে, আর উপন্যাসের শেষে চেকোকে দেখি হরকিষেণ মাষ্টারের বিশ্বস্ত আরণ্যজীবনের প্রাঙ্গনে। প্রাকৃতিক এবং নাগরিক অরণ্যের দ্বৈত জীবনে অনেক চরিত্রের অবতারণা করেছেন সমরেশ বসু; কেউই প্রসঙ্গচ্যুত কিম্বা প্রসঙ্গাতিক্রমী চরিত্র নয়। প্রাকৃতিক জীবনের বিশ্বাস এবং বেদনা, উল্লাস এবং অপচয়, উৎসব এবং সংস্কারগুলি বিশ্বস্ত পর্য্যবেক্ষণের ফলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং জীবন্তরূপে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। নিছক কাল্পনিক লোককথা নয়, একটি বিশ্বাসের জন্ম, মৃত্যু এবং জন্মান্তরের উদ্দীপ্ত কাহিনী হিসেবে 'দুই অরণ্য' বাঙলা উপন্যাসে একটি বিরল ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিত থাকবে।

সুশান্ত বসু

রম্যরচনা

ইন্দ্রজিতের আসর : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯
মূল্য তিন টাকা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইন্দ্রজিত ছদ্মনামে রসরচনা লিখে থাকেন। তাঁর এ জাতীয় রচনার অধিকাংশ প্রথম 'দেশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের একাংশ সংকলিত আছে 'ইন্দ্রজিতের খাতা' এবং 'মানসসুন্দরী' গ্রন্থদ্বয়ে। আরেক অংশ সংকলিত হ'ল 'ইন্দ্রজিতের আসরে'।

লেখক বহুকাল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন। সেখানকার সুস্মিত উদার পরিবেশে তাঁর মনে একটি সুশোভন চিন্তারাজ্যের উদ্ভব। সে রাজ্যে কবিগুরুর চিত্ত-সংস্কৃতির আলোছায়ার লীলাচাঞ্চল্যও বিস্তর। এই আলোছায়ার বাতাবরণে বর্তমান কালের আরেকজন উৎকৃষ্ট রসরচনাকার লালিত হয়েছেন। তিনি হ'লেন সৈয়দ মুজতবা আলি। একটি সংস্কৃতিস্নিগ্ধ পরিবেশেই তাহলে যথার্থ রম্যরচনা সম্ভব।

বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে এরকম একটি পরিশীলিত মনের স্পর্শ প্রায় সর্বত্র। তার ফলে রচনাগুলিতে কৌতুক আছে, হিউমার আছে, কিন্তু তারল্য নেই।

আজকাল বাংলাসাহিত্যে রম্যরচনার ভরা জোয়ার। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই রম্যতা থাকলেও রচনানিষ্ঠার অভাব। চটুল রসিকতা অনেক সময় শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করে। অথবা অবাস্তব কল্পনায় অট্টহাস্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে হাসি আনন্দসম্ভূত নয়। কষ্টকল্পনাজাত। বাংলাসাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মত নিদর্শন থাকতে আজকাল এ ধরণের রচনা না লেখাই বাঞ্ছনীয়। চার্লস ল্যাম্ব অথবা মন্তেঁই-এর রচনাও এ ব্যাপারে দিকদর্শনের কাজ দিতে পারে।

কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই রম্যরচনা লিখেছেন। এগুলি একাধারে পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত রচনা এবং রম্যরচনা। একটি অভিজ্ঞতাঋদ্ধ মন বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে একটি অনাবিল হাসির সন্ধানে নিরত। তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও আলোর ক্ষণদ্যুতি। আর অতি গুরুতর বিষয়েও অনুভবের সহজ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ কৌতুকের স্পর্শ। প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন হিসেবে নাম করা যেতে পারে—ছত্রভঙ্গ, সাইকেল রিক্সা, রিক্সা-প্রসঙ্গ, মানুষ-বাহন, জুতা আবিষ্কার ইত্যাদি কৌতুকস্নিগ্ধ এবং চিন্তার ক্ষণদ্যুতিতে উদ্ভাসিত রচনার নাম। শেষোক্ত ধরণের প্রবন্ধের উদাহরণ বহুবলধারিণীং, দাম্পত্য-দর্শন, কোষ্ঠীবিচার, নীলকণ্ঠ, ক্ষুদে অনশন, রোমান্টিক সাহিত্য ইত্যাদি রচনা। প্রথমোক্ত রচনাগুলিতে বিষয় প্রধান নয়, বিষয়-বক্তার কৌতুকস্নিগ্ধ অথচ সহানুভূতিশীল মনটিই প্রধান। এ শ্রেণীর রচনাকেই ব্যক্তিগত (Personal Essay) রচনা বলা হয়ে থাকে। আমাদের মতে এগুলি সার্থক রম্যরচনার নিদর্শন। এদের অন্তরে বিরাজ করছে বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, কৌতুকোজ্জ্বল অথচ নিরাসক্ত শিল্পীমন এবং সহানুভূতিশীল একটি হৃদয়।

বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই অনুমান করতে পারবেন, রম্যরচনার মধ্যে কৌতুকের স্নিগ্ধতা ছাড়াও অন্য তিনটি উপাদানের দিকে আমরা ইঙ্গিত করছি—অভিজ্ঞতা, নিরাসক্তি এবং সহানুভূতি। আজকাল যত্র-তত্র রম্যরচনার নামে যে কি ধরণের বস্তু পরিবেশন করা হয়, সেগুলি সাহিত্যের শ্রেণীতে অপাংক্তেয়। আমাদের লেখক ইন্দ্রজিত অন্ততঃ এই সুলভ পথে নেমে আসেন নি। তিনি রম্যরচনার জন্য যথেষ্ট সাধনা করেছেন। দুনিয়াটাকে নিরাবিল দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। আর পড়েছেন অনেক। অনেক রচনাতেই বহুপঠনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ভার নেই। লেখক অধ্যাপক হলেও নানাবিষয়ের রক্তাক্ত এনাটমিতে হাত কলুষিত করেন নি। আনন্দের রঞ্জনরশ্মিতে সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

গ্রন্থের নাম 'ইন্দ্রজিতের আসর'। লেখক সম্বন্ধে 'আড্ডা'কেই আসর বলেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আড্ডা মানেই সজ্জনলোকের একটি পরিমণ্ডল। সেই পরিমণ্ডলের বিচিত্র স্বভাব। কখন যে কি বিষয় নিয়ে আলোচনার দানা বাঁধবে তার কোন ঠিকানা নেই। দূরপ্রাচ্যের সমস্যা থেকে আরম্ভ করে নিকটতম গৃহিণীর সর্বনাশ সংবাদ-'ঘরে আর সাত সিকে মাত্র সম্বল,' চণ্ডীমণ্ডপ থেকে 'কলকাতার রূপান্তর,' 'বন্ধুবিরহ' থেকে অনশনপ্রসঙ্গ এবং তারপর রবীন্দ্রসাহিত্যের মধুসন্ধান, রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের আলোকস্নান। আড্ডাধারীর গলা এই মুহূর্তে উচ্চকণ্ঠ, পরমুহূর্তে নিম্নরব, এই মুহূর্তে কালকর্তন বা সময়ের পকেট মারার কৃতিত্বে হাস্যমুখর, পরমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের অভাবচিন্তায় বিষণ্ণগম্ভীর—'রবীন্দ্র-বিহনে গান্ধী-বিহনে আমাদের জীবন হতশ্রী, হৃতগৌরব' (২৫শে বৈশাখের জল্পনা)। বিশেষতঃ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে ইন্দ্রজিতের মেঘলোক সর্বদাই একটু শান্ত, গম্ভীর এবং শ্রদ্ধাবারি-নিষিক্ত। (দ্রঃ, বসুধৈব কুটুম্বকম্, ২৫শে বৈশাখের

জল্পনা, এক যে ছিল রবি, নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ) এত সংক্ষেপে রবীন্দ্র-মহিমার গভীরতা অনুধাবন সচরাচর দেখা যায় না। আর দেখি, ডক্টর জনসনের উপর লেখকের একটি মনোরম অনুরাগ। অনেক রচনাতেই জনসনের উল্লেখ, আর তাঁকে অবলম্বন করে একটি উৎকৃষ্ট রচনা—'ক্ষুদে জনসন'। জনসনকে ভালোলাগার কারণ হিসাবে লেখকের বক্তব্যও মনোরম—'এই একটি খাঁটি মানুষ, যিনি রাগ হলে রাগেন, হাসি পেলে হাসেন, খিদে পেলে খান। এমন নিকট-আত্মীয় মানুষ মহাপুরুষদের মধ্যে কখনো খুঁজে পাবেন না।' আর জনসনের আড্ডায় জনসনই ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। সেখানে এমন কি বাগ্মীপ্রবর বার্কও নিরুত্তর। শুধু একা জনসন মুখর। অথচ তিনি একঘেয়ে নন। 'জনসন্-এর সাধারণ কথাবার্তাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল বলেই রক্ষে, নইলে এধরণের আড্ডা নিতান্ত গুরুমশায়ের পাঠশালায় পরিণত হ'ত।' আর লেখকের একটি অভিরাম অথচ কৌতুকবহ দুঃখ এই, 'ভেবেছিলাম ক্ষুদে জনসন্ হিসেবে আমারও একটি ক্ষুদে বস্ওয়েল জুটবে। দুঃখের বিষয়, সাগরেদ যে ক'টি জুটেছে তাঁরা সবাই সেয়ানা। বস্ওয়েল আগ্রহ কারো নেই, সবাই জনসন্ হতে চান।'

ঋণং কৃত্বা এবং ঋণীনাক্ষ মতিভ্রম নামক দুটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বক্তব্য, ঋণমাহাত্ম্যে বড় লেখক হওয়া যায় এবং বড় লেখক হতে গেলেই ঋণ প্রয়োজন। লেখক বলেছেন, 'ঋণের দায়ে লিখি আবার লেখার দায়ে ঋণ করি' (ঋণীনাক্ষ মতিভ্রম)। আরেক জায়গায় বলেছেন, 'রসবোধ সবার মধ্যেই আছে; কিন্তু পাওনাদার না থাকলে কে তাকে নিংড়ে বের করবে। পাওনাদারের কাছে সবাই ঋণী। আমার লেখাকে যদি আপনারা সাহিত্য পদবাচ্য মনে করেন তো সাহিত্যের জন্য আমি পাওনাদারদের কাছেই ঋণী, পাঠকদের কাছে নয়।' এই উক্তিতে লেখকের যে নিরাসক্তি তা এমনকি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতেও মনের জোর এনে দেয়। আর কৌতুকের মধ্যে বাংলার অবহেলিত সাহিত্যসমাজের অবস্থার কথাও কি বলতে চেয়েছেন?

সমালোচকের কর্তব্য পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগসূত্র ঘটিয়ে দেওয়া। তাই বর্তমান গ্রন্থে 'সমালোচকের প্রতি' রচনায় লেখক সমালোচকদের যে দোষের কথা বলেছেন, তা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। তিনি বলেছেন সমালোচকরা শুধু ছিদ্রান্বেষী। এজাতীয় সমালোচক নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অনবহিত।— ভালোলাগার মাপকাঠিতে বিচার করাই বোধ হয় প্রথম কর্তব্য। সেই কর্তব্য স্মরণ করে বলছি—বর্তমান গ্রন্থ আমাদের ভালো লেগেছে। আমাদের সঞ্চিত আনন্দ পাঠকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক—এই আশায় তাঁদের এই বই পাঠ করতে অনুরোধ জানাই।

রমেন সরকার

বিশ্বাবর্ত

লাওস-ভিয়েৎনাম স্ফুলিঙ্গ

লাওস-ভিয়েৎনামের পরিস্থিতি ক্রমশই জটিলতর হচ্ছে। লাওস-সম্পর্কিত ছয়-শক্তির পোল্যাণ্ড-প্রস্তাবিত বৈঠক কিম্বা জেনেভা চুক্তির চৌদ্দ-রাষ্ট্রের বৈঠক, ইতিমধ্যে কোনটিই বাস্তবে রূপ নিলোনা। প্যাথেট লাও, পোল্যাণ্ড-এর প্রস্তাবে সম্মত হয়েও বৈঠকের স্থান সম্পর্কে ওজর আপত্তি তুলেছে। মনে হয় চীনের পরামর্শেই স্থান-নির্ধারণে প্যাথেট লাও-এর স্থির সিদ্ধান্ত আজও পাওয়া গেল না। এদিকে মার্কিনী বিমান বহরের সাহায্যে লাওসে জারের সমতলভূমির সামান্য কিছু অঞ্চল সুভানা ফুমার সেনাবাহিনী দখল করেছে। রাজধানী লুয়াং প্রবং-এর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। আপাততঃ সেটা দূর হয়েছে। চৌদ্দ রাষ্ট্রের সম্মেলনের দুইটি পূর্বশর্ত আমেরিকা আরোপ করেছে: (১) যুদ্ধ-বিরতি চাই (২) প্যাথেট লাও সেনাবাহিনী ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর সীমারেখায় ফিরে যাবে। সম্প্রতি ব্রিটেন এই সঙ্গে আর একটি সর্ত জুড়ে দিয়েছে: (৩) সুভানা ফুমার সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু রাশিয়ার সাম্প্রতিক মনোভাব ইংরেজ-আমেরিকার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া লাওস-সঙ্কট কেন্দ্র করে হুমকী দিয়েছেন যে চৌদ্দ রাষ্ট্রের জেনেভা বৈঠক আগষ্ট মাসে না বসলে, রাশিয়া জেনেভা সম্মেলনের যৌথ-সভাপতির দায়িত্ব বর্জন করবে। এই যৌথ দায়িত্বের অপর শরীক ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাটলার এই হুমকীর পরই মস্কো ছুটে গিয়ে ক্রুশ্চেভ ও গ্রোমিকোর সঙ্গে বৈঠক করে তাদের হুমকী প্রত্যাহারের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। বাটলারের অনুরোধে আপাতত যৌথ-সভাপতিত্বের দায়িত্ব বর্জনে সোভিয়েট রাশিয়া নিরস্ত থাকবে। অবশ্য এই হুমকী শুধু ব্রিটেনের জন্যই নয়। আমেরিকা এবং চীনও এই হুমকীর লক্ষ্যস্থল। কারণ সোভিয়েট-এর দায়িত্ব বর্জনে এই অঞ্চলের নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনবার কোনো চেষ্টাই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেক্ষেত্রে আমেরিকা ও চীনকে লাওসে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। রাশিয়া যে এই অঞ্চলে হৃতবল তার স্বীকৃতিও রাশিয়ার যৌথ-সভাপতিত্ব বর্জন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। অসহযোগের অভিমান সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষেও এক অভিনব অভিজ্ঞতা! অবশ্য এরই পাশাপাশি গত ২১ শে জুলাই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে লাওসে ক্রমবর্ধমান মার্কিন সামরিক সহযোগের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়া হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বক্তব্য, লাওসে মার্কিনী-সামরিক সূচীমুখ সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে আর বরদাস্ত—'no longer put up'—করা সম্ভব নয়। সুতরাং সোভিয়েট-চীনের দ্বন্দ্বের মাঝখান দিয়ে মার্কিনী সামরিক সজ্জা লাওসে কতকটা পথ করে নিতে পারবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে; যদিও আপাতত এই অঞ্চলে সোভিয়েট প্রভাব ক্ষীণ। নিঃসর্ত জেনেভা বৈঠক আহ্বানের রুশ দাবী সম্প্রতি চীনও সমর্থন করেছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও সামরিক সংঘাতের পটভূমিকা ক্রমশই ব্যাপ্ত হচ্ছে। আগামী নভেম্বরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে জনসনের পক্ষে এই অঞ্চলে কোনো বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব না হলেও, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। জনসনের বিরুদ্ধে গোল্ডওয়াটারের নির্বাচনী প্রস্তাবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ

একটি বড় হাতিয়ার। ভিয়েৎনামে জয়ী হবার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই—অথচ, সেখানে আমেরিকান তরুণেরা কম্যুনিষ্ট গরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে—গোল্ডওয়াটারের এই প্রচার বন্ধ করার জন্য জনসন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আরও ৬০০০ হাজার 'পরামর্শদাতা'—সেনাবাহিনীরই ভদ্র নাম—পাঠাবেন। প্রায় ১৫,০০০ 'পরামর্শদাতা' সেখানে এখনই মজুদ আছে। আমেরিকার দিক থেকে সমস্যা হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক শাসকবর্গ জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-যোগ। সেখানকার জনসাধারণের কাছে এদের পরিচয় এরা মার্কিনী তাবেদার। সুতরাং, কম্যুনিষ্ট গরিলাবাহিনীদের রোধ করতে জনসাধারণের মধ্যে আদর্শগত মানসিকতা প্রস্তুতে দক্ষিণভিয়েৎনামের শাসকবর্গ সম্পূর্ণ অযোগ্য। সায়গন থেকে নিউইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউনের সংবাদদাতা ঠিকই লিখেছেন: "lack of any understanding of the political nature of the war among the khanh-headed Revolutionary Council"। ভিয়েৎকং গরিলাদের আক্রমণের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে এদের কোনোও জ্ঞানই নেই। সুতরাং. দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিণ সামরিক সহায়তা, ক্রমশ বহিঃশক্তির সামরিক অভিযানের রূপ নেবে। যার ফলে এই সংঘাতের রাজনৈতিক মীমাংসার সময় ও সুযোগ উত্তীর্ণ হয়ে সামরিক মীমাংসা অনিবার্য হয়ে উঠবে।

গোল্ডওয়াটার : বিপদের লাল-সঙ্কেত

রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে সেনেটর ব্যারী গোল্ডওয়াটারের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়নের মধ্য দিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে দুঃস্বপ্নের মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উত্তাল হয়ে উঠেছে। ১৪ই জুলাই সান ফ্রানসিসকোর 'কাউ প্যালেসে' রিপাবলিকান দলের সম্মেলন—যে সম্মেলনে ১৩০৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে গোল্ডওয়াটার ৮৮৩টি ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর স্ক্রান্টনের ২১৪ ভোটকে পর্যুদস্ত করেন—শুধু আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনেই নয়, সারা পৃথিবীতেই প্রতি-বিপ্লবের সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে গেছে। গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন সুনিশ্চিত হয়ে উঠলো, যখন মনোনয়নের পূর্বে সম্মেলনে নীতি-নির্ধারক প্রস্তাবের তিনটি সংশোধনী গোল্ডওয়াটারের সমর্থকরা বিপুল ভোটে অগ্রাহ্য করে। আনবিক অস্ত্র-ব্যবহারের অন্তিম দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে দেবার জন্য, নিগ্রোদের অধিকার সম্পর্কিত 'সিভিল রাইটস' আইনের শক্তিশালী প্রয়োগের জন্য এবং মার্কিনী জীবনে কু-ক্লুক্স-ক্লান জাতীয় উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে স্ক্র্যান্টন সমর্থকরা সংশোধনী উত্থাপন করেছিলেন। গোল্ডওয়াটারের প্রতিক্রিয়ার তপ্ত হাওয়ার সামনে উদারপন্থীদের এই শুভেচ্ছা ছারখার হয়ে গেলো। গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন সারা পৃথিবীতেই আতঙ্কের শিহরণ এনে দিয়েছে। কারণ, গোল্ডওয়াটারের মনোনয়নের সঙ্গে শান্তি না যুদ্ধ, এই প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। গোল্ডওয়াটার সম্পর্কে প্রাভদার মন্তব্য "most reactionary, bellicose and adventurist pre-election platform in American history." ব্রিটেনের টাইমস্ বলেছে "Confidence in American democracy would be lost if Mr Goldwater is elected President." ফ্রান্সের 'France-Soir' বলছেন এই মনোনয়ন "disturbing."

মনোনয়নের সম্মতি-জ্ঞাপক বক্তৃতায়—acceptance speech—উপসংহারে গোল্ডওয়াটার বলেছেন: "Extremism in the defence of liberty is no vice and moderation in the pursuit of Justice is no virtue"। উগ্রপন্থা বা চরমপন্থার জয়গানে মুখরিত এবং moderation বা সংযম-নিন্দিত এই বক্তৃতায় স্পষ্টই যুদ্ধং দেহি ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক সভ্যতার' মুখোসের জাল বুনেছেন গোল্ডওয়াটার। যার সুরের সঙ্গে নাৎসীবাদের সাজাত্য রয়েছে।

গোল্ডওয়াটার আভাসে-ইঙ্গিতে যুদ্ধাতঙ্ক ছড়াতেও ভুলে যান নাই, তার এই বক্তৃতায়। জনসন সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে গোল্ডওয়াটার বলেন : এরা যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিনী যুবশক্তি শোচনীয়ভাবে নিঃশেষিত করছে, লক্ষ্যহীনভাবে, জয়ের সম্ভাবনা নির্বিশেষে, অকারণে। ভিয়েৎনামে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গোল্ডওয়াটার প্রশ্ন করেছেন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি জয়? জনসন সে সম্বন্ধে নিরুত্তর কেন? "We are at war in Vietnam. Yet the President····· refuses to say whether or not the objective is victory." গোল্ডওয়াটারের দৃষ্টিতে যুদ্ধ মানেই জয়, প্রতিরোধ নয়, প্রতিরক্ষাও নয়। আনবিক বোমা ফেলে ভিয়েটনামে সঙ্কটের নিষ্পত্তি গোল্ডওয়াটারের মতে খুবই সহজ কাজ। রাষ্ট্রসংঘ গোল্ডওয়াটারের হিসাবে অনিবার্য নয়। আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আমেরিকার সহায়ক হস্ত প্রসারণ, তার মতে অনভিপ্রেত!

এ-হেন গোল্ডওয়াটার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন কি না? এ প্রশ্নও উঠেছে। সাধারণতঃ, ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকানদের ভোটের ব্যবধান খুব বেশী হয় না। কেনেডি-নিক্সন প্রতিযোগিতায় এই ব্যবধান খুবই সামান্য ছিল। তাছাড়া আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এই ভোটের ব্যবধান গত নির্বাচনে আরও কমে গেছে। ১৯৬০ সালে ডেমোক্রাট-প্রধান দক্ষিণের এগারটি রাজ্যের ভোটের শতকরা ৪৭·৭ ভাগ নিক্সন পেয়েছিলেন। দক্ষিণী ডেমোক্রাটরা নিগ্রোবিরোধী। সিভিল রাইটস আইনের প্রতিক্রিয়ায় এরা জনসনের বিরুদ্ধে যাবে কি না, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অপরদিকে গোল্ডওয়াটারের মনোনয়নে রিপাব্লিকানদের ঐক্য কতটা বজায় থাকে সে-সম্বন্ধেও সংশয় রয়েছে—যদিও প্রধান রিপাবলিকান নেতা আইসেনহাওয়ার ঐক্যের আবেদন জানিয়েছেন এবং পরাজিত প্রার্থী গভর্নর স্ক্রানটন গোল্ডওয়াটারের পক্ষে প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন ঝড়ের সঙ্কেত বহন করে এনেছে। যুদ্ধ না শান্তি? নভেম্বরের পর এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য উদ্বিগ্ন বিভিন্ন রাষ্ট্র, প্রহর গুণবে।

গত ২৩শে জুলাই দ্যগল আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সকে নিয়ে নূতন জেনেভা সম্মেলনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমেরিকা ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম তা অগ্রাহ্য করেছে। লক্ষ্য করার বিষয়, ব্রিটেনের নাম দ্যগল উল্লেখ করেন নাই। দ্যগল-এর বক্তব্য, এই সঙ্কটের সামরিক সমাধান আদৌ সম্ভব নয় এবং উপরোক্ত চতুঃশক্তি এই অঞ্চলের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দায়িত্ব নেবে। এই অঞ্চলের আর্থিক সাহায্যও সমবেতভাবে স্থির করতে হবে—global ভিত্তিতে, দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে নয়। ইন্দোচীন অঞ্চলে ফ্রান্সের হৃতপ্রভাব ফিরিয়ে আনবার কৌশলও দ্যগল-এর প্রস্তাবে নিহিত ছিল।

কাম্বোডিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল—যার উৎস ভিয়েৎনাম-ভিয়েৎকং সংঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই অভিযোগ সম্পর্কে গত ৪ঠা জুনে গঠিত, সিকিউরিটি কাউন্সিল-নিয়োজিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক-দল কাম্বোডিয়ায় উপস্থিত থেকে সীমান্ত লঙ্ঘন বন্ধ করবে। আমেরিকার এই প্রস্তাব এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কাম্বোডিয়ার অভিযোগ স্বীকৃতি পেলো, অপর দিকে, কাম্বোডিয়ার সীমান্ত ব্যবহার করে ভিয়েৎকং গরিলারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আক্রমণ না চালাতে পারে, তারও ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকার এই কূটনৈতিক চালের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার শিহানুকের ও সোভিয়েট রাশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য হয়।

আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলন

গত ১৭ই জুলাই থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত কায়রোতে আফ্রিকার ৩৩টি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেলো।

চৌদ্দ মাস পূর্বে আদ্দিশ আবাবায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট নাসের সম্মেলনের উদ্বোধকের আসন থেকে আফ্রিকার মুক্তিআন্দোলনের নেতাদের প্রতি সহযোগিতার সহায়ক হস্ত প্রসার করেও মিশরের কিম্বা আরব রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব সমস্যার সঙ্গে সম্মেলনকে জড়িত করতে চান নাই। যেমন ইসরাইল-বিরোধিতার সর্ত, আফ্রিকা সম্মেলনের সম্মুখে নাসের উপস্থাপিত করেন নাই ; শুধুমাত্র ইসরাইল ও প্যালেষ্টাইন সমস্যার প্রতি আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কায়রোতে আফ্রিকা সম্মেলন আহ্বান করে আরব দুনিয়ার সঙ্গে বর্ণসমস্যাসঙ্কুল আফ্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনেও নাসের অগ্রণী হয়েছেন। মিশর শুধু আরব নয়, আফ্রিকারও অন্তর্ভুক্ত ; কায়রো সমাবেশে এই সত্য স্বীকৃতি পেলো। কায়রো সম্মেলনে অবশ্য মিশরের দিক থেকে আফ্রিকাকে আনবিক অস্ত্রবর্জিত এলাকা ঘোষণায় বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইথিওপিয়া ও নাইজিরিয়ার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। অবশ্যি সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত এই প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকে যায়।

আদ্দিস আবাবায় ঘানার প্রেসিডেণ্ট এনক্রুমা সমগ্র আফ্রিকার আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি সাধনের প্রয়োজন-বোধে, আফ্রিকা জুড়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের প্রস্তাব করে ভবিষ্যবাণী করেছিলেন—হয় আফ্রিকা সংহত হবে, না হয় ধ্বংস হবে। এবারকার সম্মেলনেও সেই প্রস্তাবের পুনরুক্তি করে, Organisation of African unityর জন্য একটি সেক্রেটারিয়েট, একজন সেক্রেটারী-জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তাঁর এক সরকার, এক কারেন্সীর প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা হলেও আদ্দিশ আবাবায় এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী দপ্তর—সেক্রেটারিয়েট—গঠনের এবং রাষ্ট্রসংঘে গিনির প্রধান প্রতিনিধি ও বর্ণবিরোধ সম্পর্কিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ কমিটির সভাপতি এম ডিআলো টেলিকে স্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেল পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এনক্রুমার ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পনার তীক্ষ্ণতম সমালোচনা করেন টাঙ্গানাইকা-জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ারে। আফ্রিকান লিবারেশন কমিটিতে—নয় সদস্য সম্বলিত—ঘানার প্রতিনিধির না থাকায় এই কমিটিকে সমর্থন না করার জন্যও নক্রুমাকে জুলিয়াস নায়ারের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ঘানার ও অন্যান্য রাষ্ট্রের এই অসহযোগিতার ফলে আফ্রিকায় পর্তুগীজ উপনিবেশে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা যথোপযুক্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আফ্রিকার সংহতি অনিবার্য। কিন্তু সে সংহতি ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। সম্মেলন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দুইটি রাষ্ট্র বাদে—মালাগেসী ও গ্যাবন—সমবেত আফ্রিকার রাষ্ট্র প্রধানেরা নন্-এলাইমেণ্ট নীতির প্রতি সমর্থন জানান এবং দুই-একটি রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সবাই দ্বিতীয় নন্ এলাইনমেণ্ট সম্মেলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কায়রোর শীর্ষ সম্মেলনের পশ্চাদপটে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের টানা-পোড়েন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। প্রথমতঃ, এই সম্মেলন থেকে এফ্রো-এশীয় সম্মেলনের স্থায়ী দপ্তরে আলজিয়ার্সে দ্বিতীয় এফ্রো-এশীয় সম্মেলনের—দ্বিতীয় বান্দুং—স্থান নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়াকে বর্জনের আয়োজন কায়রোতে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে এ-সম্পর্কে অন্তরালবর্তী প্রচার চলেছে, যাতে রাশিয়া আমন্ত্রিত না হয়। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবান্দ্রিও এই উদ্দেশ্যে মাথা মাথা আফ্রিকার নেতাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে গেছেন ; তিনি আলজিরিয়ার বেন বেলার সঙ্গেও যোগাযোগ করে গেছেন। ইন্দোনেশিয়া রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্য পেয়েও সরাসরি তাকে সমর্থন না করে মেজরিটির দোহাই দিচ্ছে—মেজরিটির সমর্থন থাকলে, ইন্দোনেশিয়ায়ও আগামী আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়ার উপস্থিতির প্রস্তাব সমর্থন করবে।

মিশরও দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবক ভারতবর্ষ, কায়রো সমাবেশের সুযোগ গ্রহণের কোনে চেষ্টাই করলো না!

কম্যুনিষ্ট শিবির

গত ১৫ই জুলাই অকস্মাৎ লিওনিড ব্রেজনেভ-এর পরিবর্তে সুপরিচিত সোভিয়েট রাজনীতিক আনাসটাস মাইকোয়ান সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। অতঃপর ব্রেজনেভ, যিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রিসিডিয়ামের এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারি-য়টের সদস্য, পার্টি সংগঠনের কাজে 'অধিকতর মনোযোগ দেবেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রপতির পদ, মর্যাদাসম্পন্ন হলেও, ক্ষমতাবিহীন। এই অবস্থায় মাইকোয়ানের মত শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ সহকর্মীকে ক্রুশ্চেভ নখদন্তহীন অবস্থায় রাখবেন, না রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করবেন, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। ব্রেজনেভের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক উঠেছে। ক্রুশ্চেভ-এর উত্তরাধিকার কি তারই উপর বর্তাবে? না পডগর্ণির উপর? সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে নিঃসন্দেহে এই পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রীম সোভিয়েটে যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত ৬৫ লক্ষ কৃষকের পেন্সন এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ সরকারী কর্মচারীর—ডাক্তার সমেত—বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদের বেতন শতকরা ১২ থেকে ৫০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নিম্নতম জাতীয় আয় বাবদ ৪০ রুবল থেকে ৪৫ রুবলে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে জাতীয় বেতন বিলের পরিমাণ ৩৩০ কোটি রুবল বৃদ্ধি পেয়েছে। বেতন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের যোগানের ওপর চাপ মেটাবার জন্য সহরের প্রয়োজনের শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ শস্য মজুদ করার প্রস্তাবও উঠেছে। এই মজুদ শস্যের কিছুটা কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করতেই হবে। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষেও তাই। সুতরাং পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আগামী দিনে অনিবার্যভাবেই বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

এই পরিস্থিতিতে গত ১৫ই জুলাই তারিখেই সোভিয়েট রাশিয়া এক বিবৃতিতে চীনের সঙ্গে তাত্ত্বিক বিরোধ মীমাংসার জন্য অবিলম্বে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে চীনের সম্মতি দাবী করে। সে-দাবী চীনও প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াকে পূর্ব ইউরোপেই প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেখানে বর্তমানে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ঝোঁক দেখা দিয়েছে, যার ফলে সোভিয়েট চক্রের 'monolithic unity' ও বিপন্ন হয়েছে। রুমানিয়া আর্থিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর। পূর্বজার্মাণী একান্তভাবেই রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। পোলাণ্ডও বহুলাংশে তাই, তবুও কিছু স্পষ্টভাষণ তার পক্ষে সম্ভব। হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বুলগেরিয়া সরাসরি চীনা অস্ত্রের বিরোধী হলেও সোভিয়েট রাশিয়ার বজ্রমুষ্ঠি এড়িয়ে চলতে সজাগ। যুগোশ্লাভিয়া, এখনই চীনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিরোধী.. রুমানিয়া সোভিয়েট-চীন দ্বন্দ্বে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণে প্রস্তুত। একমাত্র ফরাসীর কম্যুনিষ্ট পার্টি পূর্ব জার্মানীর মত সোভিয়েটের অন্ধ অনুসারী। সুতরাং বিশ্ব-সম্মেলন খুব সহজসাধ্য নয়।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। চীনের পত্র-পত্রিকা ফ্রান্সের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ১৯৬২ থেকেই ব্রিটেন চীনের সঙ্গে সামরিক সম্ভারও ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্যোগী হয়েছে। নভেম্বরে পিকিং-এ একশত কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর উদ্যোগে একশটি ব্রিটিশ সংস্থা একত্রিত হয়েছে। ব্রিটেন বাণিজ্যিক তাগিদ রাজ-নৈতিক:নিষিদ্ধ এলাকা লঙ্ঘনে প্রয়াসী হতে চলেছে।

এদিকে গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভের পররাষ্ট্রনীতির পরাজয় ঘোষণা করছে এবং মাও-পন্থীরা তীব্রভাবে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু করে দিয়েছে। ক্রুশ্চেভ-এর সহ-অবস্থান নীতিকে ব্যঙ্গ করে মাও-পন্থীরা বলেছেন, "Goldwaterism is what you get when you seek to appease American Imperialism." রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় জনসন কতটা কেনেডী-নীতি অনুসরণ করবে, তার উপর নির্ভর করবে রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ-নীতির ভবিষ্যৎ। কারণ, গোল্ডওয়াটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েত-বিরোধিতার প্রতিযোগিতা, দুই শক্তিজোটের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও তার আনুষঙ্গিক সঙ্কটের আবর্ত সারা পৃথিবীতে সঞ্চারিত করবে।

১. ৮. ৬৪

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৭১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জন্মশতবার্ষিকী

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মশতবর্ষপূর্তির স্মারকরূপে এই সংখ্যায় 'জয়শ্রী'তে এই বিরাট পুরুষের দিগন্তজোড়া মননার সামান্যতম পরিচিতি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। আচার্য শীল সম্বন্ধে আলোচনার স্বল্পতা হেতু এবং এই মহামনস্বির কোনো প্রামাণ্য জীবনী রচিত না হওয়ায়, এই জ্ঞানতপস্বীর পরিচিতি সাধারণ্যে অপ্রচারিত ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। 'জয়শ্রী'র এই সংখ্যায় আচার্য শীলের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের পরিচিতি কিভাবে তথ্যের অভাব হেতু ব্যাহত হয়েছে, তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তবুও যে সামান্য ব্যক্তি-পরিচিতি এই সংখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে, আচার্যদেব সম্পর্কিত নানা রচনার স্রষ্টা অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের আনুকূল্যে এবং ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত ও শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর সৌজন্যে। এঁদের প্রতি জয়শ্রী কৃতজ্ঞ থাকবে। শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ও আচার্য-পরিচিতি সম্বলিত নূতন একটি প্রবন্ধ রচনা করে এই সংখ্যা সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে জয়শ্রীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আচার্যদেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ স্যার মাইকেল স্যাডলার তাঁকে গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটলের সমগোত্রীয়রূপে চিহ্নিত করে তাঁকে বলেছিলেন 'Second Aristotle'—'দ্বিতীয় এরিষ্টটল।' বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের এমন বিভাগ নাই যা আচার্যদেবের অধিগত নয়। দর্শন, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি চিরকাল বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। বাংলা-ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ, বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য উদ্যোগ তাঁর প্রায় সমকালীন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষার সংগঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাশীল অবদান স্যার আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনে শক্তি যুগিয়েছে।

সকল বিদ্যায় অধিগত হওয়া সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ মূলত দার্শনিকরূপেই পরিচিত। কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও দার্শনিকসুলভ যোগী-তপস্বীর জীবন যাপন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তা-সমন্বিত মৌলিক কোনো রচনা রেখে না যাওয়ায় তাঁর চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় দেশবাসীর অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অধ্যাপক বিনয় সরকার যথার্থই বলেছেন "এই মহাপণ্ডিত নিজে কিছু লেখেন না কিন্তু বাঙালী পণ্ডিতদের লেখার প্রেরণা যোগান তিনি।" তিনি কেন লেখেন নাই ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন দত্তের প্রবন্ধে তার

কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এজন্য তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন "বাল্যকাল হইতেই আমার একটা ধারণা ছিল, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই আমার চর্চার বিষয় (every knowledge is my province)। সেই-জন্য জীবনের সকল বিষয়েই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, অনেক বিষয়েরই চর্চা করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। জ্ঞান ও সেবার যে সুযোগ ও অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমি ধন্য ও পরিতৃপ্ত। উহার অন্য কোনো ফল লাভ হইল না বলিয়া আমার কোনই দুঃখ নাই। সেবা নিষ্ফল হইবে না।"

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই সেবা সফল করবার দায়িত্ব নেবার সময় হয়েছে। জন্মশতবার্ষিকী কমিটি এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই আশা জানিয়ে আমরা এই মহামনস্বির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।

দিল্লীতে এ, আই, সি, সি অধিবেশন

এবারকার দিল্লীর এ, আই, সি অধিবেশনে মূল্য ও খাদ্যসঙ্কট যত না প্রতিনিধিদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, তার চাইতে অনেক বেশী উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, কামরাজ পরিকল্পনা প্রত্যাহারের দাবীসম্বলিত বেসরকারী প্রস্তাবের আলোচনাকালে। প্রকৃতপক্ষে, খাদ্য এবং মূল্যসঙ্কট সম্পর্কিত আলোচনার সময় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও ক্ষীণ ছিল এবং একমাত্র কংগ্রেসের বামপন্থী মেনন-মালব্যগোষ্ঠির প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ছাড়া সরকারের খাদ্য ও মূল্যনীতির তীব্র আলোচনাও শোনা যায় নাই। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা যদিও বা আলোচনায় যোগ দিয়েছে কিম্বা সংশোধনী উত্থাপন করেছে, তাজ্জবের বিষয় বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধিকে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে—যে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৩ সাল থেকে—টুঁ শব্দটি করতে শোনা গেল না। তবে কি বাংলাদেশে কোন সমস্যা নাই বলেই প্রতিনিধিদের এই নীরবতা না ওপর মহলের ধমকানি ও হুমকির নিকট আত্ম-সমর্পণ করে বাংলাদেশের কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা তাদের বিবেককে শান্ত করেছেন?

খাদ্য ও মূল্যসম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি কয়েকদিন পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হয়েছে, প্রায় হুবহু সেটিই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করেছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি আত্মসন্তুষ্টির প্রসন্নতায় ভরপুর, কেন্দ্রীয় সরকারের পিঠ চাপড়ানি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা এবং বিদেশ থেকে আমদানীর উপর চরম নির্ভরশীলতার দ্বারা বিকীর্ণ। মূল্যবৃদ্ধিরোধে পরিকল্পনার একান্ত অভাব, মজুত উদ্ধারের এবং মজুতদারদের কঠোর শাস্তিবিধানে নীরবতা, এবং সব চাইতে আশ্চর্যের কথা যে কালোটাকার সর্বনাশা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সরকারী আর্তনাদ শোনা গেছে, সে-সম্পর্কে অনুল্লেখ কংগ্রেসের খাদ্য ও মূল্যনীতি সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করেছে। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রায়ত্বকরণে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা গেছে, 'ফুড গ্রেণ করপোরেশনের পাশাপাশি খাদ্যে বেসরকারী ব্যবসায়ের অবস্থানের স্বীকৃতিতে। কালো-টাকা এবং মজুত ও কালোবাজারের প্রভাব অব্যাহত রেখে কংগ্রেসের সঙ্কটত্রাণের পরিকল্পনায় পৌনঃপুনিক সঙ্কটের পথ অবারিত রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের নিকট শাস্ত্রী-কামরাজ নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে দিল্লীর অধিবেশনে তীব্র প্রতিরোধের ধিক্কার শোনা গেলো না। সুতরাং সেই দায়িত্ব জনসমাজকেই বহন করবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। নান্য পন্থা।

কংগ্রেস কমিটির কামরাজী বার্তালাপ

নেহেরু যুগের ব্যক্তিত্ববাদের পূর্ণ প্রাধান্যের পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবারে তর্ক-বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল তাকে অনেকে কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক চৈতন্যের পুনর্জাগরণের লক্ষণ বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, কংগ্রেসী বৈঠকের এই বাক-বিতণ্ডা

গণতান্ত্রিক উদ্যমের নতুন সূচনা নয়—কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রারম্ভ মাত্র।

এবারের কংগ্রেসী বৈঠকে সমালোচনার উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল কামরাজ পরিকল্পনা নিয়ে। অনেকে সরাসরি এই অভিযোগ করেছেন যে ক্ষমতাদ্বন্দ্বের চক্রান্তে একদল কংগ্রেসী নেতাকে গদিচ্যুত করে অন্যদলের ক্ষমতা নিরংকুশ করা হয়েছে। এই অভিযোগও করা হয়েছে যে কামরাজ প্ল্যানের গায়ে নৈতিক মোড়ক দেওয়ার জন্য যাদের কেন্দ্রে বা রাজ্যে গদীচ্যুত করা হয়েছিল তাদের কয়েকজনকে আবার জরুরী প্রয়োজনের নামে গদীয়ান করা হয়েছে। কামরাজ প্ল্যানকে বাতিল করার জন্য যে 'জোর ভাবণ' কংগ্রেসী বৈঠকে দেখা গেছে, এবং এই প্রসঙ্গটিতে প্রবক্তরা যে উৎসাহ দেখিয়েছেন তাতে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এইসব তার্কিকদের পিছনে থেকে যারা শর সন্ধান করেছেন তারা হলেন কংগ্রেসের আসল ধুরন্ধর। কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্রে গদীচ্যুত 'নায়কেরা' এবারে মাত্র প্রথম শর নিক্ষেপ করেছেন,—এই রণ চাতুর্য যে অদূর ভবিষ্যতে সরব ও সংঘর্ষময় অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই। গণতান্ত্রিক চেতনা নয়—কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের নতুন ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে,—গত আগষ্টে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিতর্কে সেই লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীনন্দের পতন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আগের দিন পর্য্যন্ত যে সংবাদ প্রাত্যহিক কাগজে বিস্তৃত ও সাগ্রহ পাব্লিসিটি লাভ করেছিল তা' হলো শ্রীগুলজারীলাল নন্দের সদাচার সমিতির কার্যকলাপ এবং তাঁর সদাচারী প্রয়াস। যেভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্র সদাচার সমিতির কার্যকলাপ প্রচারের সুযোগ পাচ্ছিল তাতে একথা বলা যায় যে দুর্নীতি নিবারণের এই প্রয়াসটি জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও আশা সৃষ্টি করেছিল। শ্রীনন্দের সদাচারের অভিযান দুরাচার ও দুর্নীতি দূর করার কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনে কতখানি সক্ষম হতো সেকথা অবশ্য অনির্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই প্রয়াস যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে একটি নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছিল, সেকথা অনস্বীকার্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সদাচার অভিযান সরকারী কি বেসরকারী সে কথাটি সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ কোন প্রশ্ন সৃষ্টি করে নি। জনতা ধরে নিয়েছিল যে এই অভিযানের পিছনে সরকারের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সদাচারপদ্ধতি-বিরোধী সরোষ পত্র এবং সেই পত্রকে উপলক্ষ্য করে একই সঙ্গে শাস্ত্রী-কামরাজ কর্তৃক শ্রীনন্দের সদাচারকে নস্যাৎ করার নগ্ন ও নিষ্করুণ খর্গাঘাতের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। শ্রীনন্দ একথা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে শাস্ত্রী ও কামরাজের সমর্থন নিয়েই তিনি সদাচারী অভিযান শুরু করেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই বেমালুম সদাচারের সঙ্গে সামান্য সংশ্রবের কথাও অস্বীকার করে দিয়েছেন। ফলে আকস্মিক ট্র্যাজিডীর মতই প্রথম অংশেই সদাচারের যবনিকাপাত ঘটলো। সঙ্গে সঙ্গে সদাচার সম্বন্ধে সরব সংবাদপত্রগুলিকে একেবারে আকস্মিক সম্পূর্ণ নীরব ও নিরাগ্রহী হয়ে যেতে দেখা গেলো।

সদাচার হত্যার মত এমন রাজনৈতিক চক্রান্তের ঘটনা ইদানীংকালের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির উর্ধমহলে বেশি ঘটে নি, কংগ্রেসের মধ্যে স্থিতস্বার্থবাদী শ্রেণীর প্রভাব কি প্রবল হয়ে উঠেছে সদাচার নিধনের সদ্য ঘটনা তার সুস্পষ্ট সংকেত। সদাচারী অভিযান আর বেশিদূর অগ্রসর হলে অনেক কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীদেরই যে কাররুণের ছায়ানুসরণ করতে হতো, সেই আতঙ্কবাদ কংগ্রেসী মহলে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে যারা যারা নেপথ্যে কংগ্রেসী ইমারতের ইট-পাথরের যোগান দেয়, সে বিত্তবান শ্রেণীরাও

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। অতুল্যবাবু নিজের এবং এই 'কংগ্রেসী পুঁজিপতি'দের অন্তত আপাতবিপদ থেকে রক্ষা করলেন শ্রীনন্দর পতন ঘটিয়ে।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সগর্বে লোকসভায় বলেছিলেন যে দুই বছরের মধ্যে হয় দেশ থেকে দুর্নীতি যাবে নয় তিনি যাবেন মন্ত্রীত্বের গদী থেকে। তাঁর দুর্নীতি বিরোধী সদাচারী অভিযান উদ্যোগ পর্বেই অতুল্যপট্টনায়ক চক্রান্তে ঘায়েল হলো। এখন শ্রীনন্দের পরীক্ষা। প্রশ্ন তাঁর সামনে,—আদর্শ ও ইজ্জত বড় না গদী বড়?

ধোতের বহিষ্কার

মহারাষ্ট্র বিধান সভার সদস্য শ্রীধোতকে হিংসাত্মক আচরণের দায়ে বিধান সভা থেকে শুধু বহিষ্কার নয়, কংগ্রেসী দলের ভোটের জোরে তার সদস্যপদও অবশিষ্ট সময়ের জন্য খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ধোতের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি কাগজ-চাপা দিয়ে স্পীকারের মাইক অপারেটরকে আক্রমণ এবং পরে স্পীকারের মাইক অপসারণের চেষ্টায় ধস্তাধস্তি। কাগজ-চাপা দিয়ে আক্রমণ কিংবা বিধান সভার অভ্যন্তরে মাইক নিয়ে কাড়াকাড়ি কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টিতে বিধান সভার অভ্যন্তরে স্পীকারের কিম্বা মহারাষ্ট্রের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র সরকারের কোন দায়িত্ব আছে কিনা, সে-সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করে দেশে গণতন্ত্র বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব নির্ধারণ করা কর্তব্য। বিভিন্ন বিধান সভায় কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাধিক্য, বিরোধী সমালোচনার প্রতি মন্ত্রীসভার উপেক্ষা, এবং তাদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে একতান্ত্রিক স্বৈরাচারী মানসিকতা অনুপ্রবেশ করে' পরিষদীয় রাজনীতির ঠাটবাটে ক্রমশ অসাড়তা সঞ্চারিত করেছে। ফ্যাসিজমের জন্ম লগ্নের লক্ষণগুলি সতের বছরের শাসনের পর কংগ্রেসের আচার-আচরণে তাই ক্রমশ সুস্পষ্ট হচ্ছে। সেদিন মহারাষ্ট্র বিধান সভায় বিরোধী দলের মধ্যে সরকার অনুসৃত নীতির ফলে যে ব্যর্থতার বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে শান্ত ও সংযত করবার জন্য যে সহনীয় ও নমনীয় মনোভাব দেখাবার প্রয়োজন ছিল, মহারাষ্ট্র মন্ত্রীসভা কিম্বা বিধানসভার স্পীকার তা দেখাবার আদৌ প্রয়োজন বোধ না করে, গণতন্ত্রের বুনিয়াদে ধ্বস নামিয়েছেন। তারপর শ্রীধোতকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বহিষ্কারের পদ্ধতি গ্রহণ করে কংগ্রেস ব্যক্তিগতভাবে যে একজন সদস্যের প্রতিই বিদ্বেষপ্রসূত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাই নয়, তারা সমগ্র পরিষদীয় রাজনীতি তথা গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদের উদ্যোগ করেছে, অতঃপর খাদ্য, মূল্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে সরকারী নীতির মারাত্মক পরিণতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও সমালোচনার উপেক্ষার বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন যে কোনো সময় সরকারের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত মনে হলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্টীম রোলার চালিয়ে কংগ্রেস বিরোধীদের সংবিধানিক অধিকার গ্রহণ করতে উদ্যত হবে। সেদিন উত্তর প্রদেশে বিধান সভায় পাইকারী হারে বিরোধীদের সাময়িক বহিষ্কারের মধ্য দিয়েও পরিষদীয় গণতন্ত্র হত্যার লক্ষণগুলি মূর্ত হয়েছিল।

শ্রীধোতের ঘটনা গণতন্ত্রের উপর ফ্যাসিজমের সুস্পষ্ট রেখাপাত। তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেও পরিষদীয় শৃঙ্খলার মর্যাদা রাখা যেতো, কিন্তু কংগ্রেস ভয়ংকর পথ বেছে নিয়েছে। ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়ের সূচনায় বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীচেতনাসম্পন্নদের দুর্বার সংহতি চাই।

২. ৯. ৬৬.

জয়শ্রীর

শারদীয়া সংবাদ

আটজন তরুণ কথা সাহিত্যিকের আটটি স্বনির্বাচিত

ছোট গল্প

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, রতন ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু পালিত, মিহির মুখোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

●

এ ছাড়া থাকছে

আশাপূর্ণা দেবী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবেন্দু ঘোষ নীলিমা দাশগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প

আলোচনা

সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

পরিমল রায়

●

ভাবী সমাজের ভাবনা — শচীন্দ্রনাথ বসু

বামপন্থা ও প্রাণীজগৎ — প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্র — অসীম সোম

অমিয়চন্দ্র রায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ হেগেল দর্শন

কবিতা সংকলনে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, দিনেশ দাস, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শোভন সোম, শান্তশীল দাশ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানস রায় চৌধুরী, অরবিন্দ গুহ ও আরো অনেকে।

দাম প্রতি সংখ্যা ২.০০ সডাক ২.৫৮

প্রাপ্তিস্থান জয়শ্রী

৭১২ গাঙ্গুলি বাগান, কলিকাতা-৪৭

ঘনায়মান দুর্যোগ

সমর গুহ

ভারতের জাতীয় জীবন কি আরেকটি গুরুতর ভাগ্য বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ? এটা শুধু প্রশ্ন নয়,—এই সম্ভাবনার অগ্নি সংকেত আজ মূর্ত হয়ে উঠছে সর্বদিকে। ভিতরে বাইরে দু'দিক থেকেই দেশ আজ বিপন্ন, খাদ্যাভাব ও মূল্য-সংকটে ভারতের জাতীয় জীবনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠেছে,—দেশের সর্বত্র অস্বাভাবিক উত্তেজনা কখনো চাপা গুমরানো কখনো উদ্বেল ; এমন অস্থির বিক্ষোভ যে, যেকোন মুহূর্তে এই বিক্ষোভ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে। সর্বদিকেই শুধু 'নেই নেই' যাও আছে তারও দাম সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বাজারে বাজারে আগুন, মানুষের জঠরে আগুন,—এই দুই আগুন এক হলে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে জ্বলে উঠতে পারে এক দুর্দৈবের দাবানল।

ভিতরে যখন এমনি অভূতপূর্ব 'টেন্‌শন' তখন বাইরের অবস্থা কি ? কাশ্মীর সীমান্তে প্রতিদিনই, পূর্ব-পাক সীমান্তেও বুলেট চলছে থেকে থেকে। হিমালয় সীমান্ত বাহ্যত মৌন ও নিথর, কিন্তু সীমান্ত-পারের পাথরের বুকে কান পাতলেই শোনা যাবে অসংখ্য চীনা ফৌজের উদ্ধত পদধ্বনি। শুধু ভারতের তিন সীমান্তেই শত্রু সমাবেশ প্রবল হয়ে ওঠেনি,—ভারত থেকে দূরে, কিন্তু বেশি দূরে নয়,—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়ও বিস্ফোরিত হয়েছে মার্কিনী বারুদ। 'সাম্রাজ্যবাদী কাগজী বাঘ' দাঁত দেখিয়েছে চীনকে, এবারে উত্তর দেওয়ার পালা 'বিশ্ববিপ্লববাদী' মাও-সে-তুঙের।

জাতীয় ও সীমান্তিক অবস্থা পর্য্যালোচনায় একথা আজ সুস্পষ্ট যে সংকট শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়,—বাইরেও। ভিতরের সংকট সক্রিয়, বাইরের সংকট প্রত্যাসন্ন। এই দুই সংকট সংযুক্ত হলে ভারতের জাতীয় বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘনায়মান বিপর্যয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্তরে এখনও পর্য্যাপ্ত চৈতন্য নেই ! ১৫ই আগষ্টের প্রথাগত ভাষণে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এই প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের কোন বাস্তবানুগ সংকেত নেই। রাষ্ট্রপতির ভাষণে খাদ্যাভাব ও মূল্য সংকটের উল্লেখ আছে, মজুতদার ও চোরা-কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোরক্তি আছে, কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ভারতের তিন সীমান্তে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তার তাৎপর্য ও গুরুত্বের যথাযথ প্রতিফলন নেই রাষ্ট্রপতির পর্য্যালোচনায়। বরঞ্চ পাক-চীনের মনোভাব সম্বন্ধে অনেকখানি আশাবাদী ইংগিতের বিভ্রান্তি আছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাও, রাষ্ট্রপতির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বরং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গতানুগতিক ভাষণের প্রকৃতি দেখে এই আশঙ্কা হওয়া অমূলক নয় যে দু'বছর আগে একবার চীনা আক্রমণের সময় যে রাষ্ট্রীয় অচেতনতা, অপ্রস্তুতি ও অক্ষমতা যে অপৌরুষের কালিমায় ভারতের জাতীয় মর্য্যাদাকে কলঙ্কিত করেছিল, আবার তারই পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কারণ, ভিতর ও বাইরের ঘনায়মান সংকট সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় মানসিকতা এখনও তন্দ্রামগ্ন, অব্যবস্থিত ও উদ্দেশ্যহীন।

মূল্য-সংকটের রাজনীতি

আগুনের হলকার মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম

দিনদিনই বেড়ে চলেছে, খাদ্যাভাবও সর্বত্র। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দু'বছরে চালের দাম বেড়েছে চৌত্রিশ শতাংশ, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পঁচিশ শতাংশ। গত সতের বছর ধরে শুধুমাত্র বিপর্যস্ত কল্পিত বাংলায় বর্ষার মরসুমে বাধা-ধরা ফর্মুলার মত প্রতি বছরেই খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য ভারতের কোন কোন অঞ্চলেও কোন কোন বছরে সাময়িক ও সীমাবদ্ধ খাদ্যাভাব ঘটে। কিন্তু সারা ভারতে একই সময়ে এমন সর্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি আর কখনো। সরকার বলছেন, গতবারের অপেক্ষা চাউল-গমের মোট উৎপাদন এবারে বরং কয়েক লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারী মজুতও ঠিকই আছে এবং বিদেশী আমদানীও ব্যাহত হয় নি,—অর্থাৎ প্রচলিত খাদ্য সরবরাহে কোন ঘাটতি হয় নি। তবুও কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে এমন সর্ব-ব্যাপী খাদ্যাভাব ঘটলো কেন? খাদ্যের দামের সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব জিনিসপত্রের দামও হঠাৎ এমন আকাশচুম্বী হয়ে উঠলো কেন? একি শুধুই মাত্র অর্থনৈতিক অসঙ্গতির কোন আকস্মিক যোগাযোগের ফল?

লক্ষ্য করবার বিষয়, নেহেরুর মৃত্যু এবং শ্রীশাস্ত্রীর প্রধান-মন্ত্রীত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত চরম খাদ্য ও মূল্য-সংকট সৃষ্টি হয়েছে অকস্মাৎ; আরও লক্ষ্যের বিষয়, শুধু খাদ্য ও মূল্য সংকটই নয়,—আকস্মিক ভারতীয় অর্থ-নীতির তত্ত্ব-ও তথ্যের একেবারে গোড়ায় যেন মন্থন শুরু হয়ে গেছে। পরিকল্পনার সূত্র, নীতি, লক্ষ্য এবং শিল্প ও কৃষির কার্যক্রম ও ব্যয়ানুপাতের পুনর্বিচারে অকস্মাৎ এক বিতর্কের ঝাঁধি উঠেছে চারদিক থেকে। গোটা পরিকল্পনার নীতি ও নির্দেশের মূল্যায়ন থেকে উদ্ভূত হচ্ছে অজস্র মৌলিক প্রশ্ন। শ্রীনেহেরুর ব্যক্তিত্বের তলায় যে প্রশ্ন এতকাল চাপা ছিল, তাঁর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সেই মৌল প্রশ্ন সরব গর্জনে মুখর হয়ে উঠেছে। বস্তুত, যে সময়ে এই মূল্য-সংকট দেখা দিয়েছে তার গুরুত্ব অর্থনৈতিক তো বটেই, কিন্তু এই সংকটের গোড়ার তাৎপর্য এ অপেক্ষাও অনেক বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক কিনা তারি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে? যদি বলা হয় আজ দেশে যে খাদ্য ও মূল্যসংকট সৃষ্টি হয়েছে তার মৌলিক কারণ কংগ্রেসের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরোক্ষ পথের তীব্র অভিব্যক্তি। তবে সেটা কেবলমাত্র বিরোধী সুলভ কটূক্তি কিনা তা কি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে?

এই ভিন্ন মেরু মত ও পথের ব্যবধানে নিয়ে একই মঞ্চে এবং একই সঙ্গে ভানুমতীর খেলা দেখানোর মাহাত্ম্যে এতদিন নিহিত ছিল নেহেরু-নেতৃত্বের অসাধারণত্ব। একই সঙ্গে রুশ-মার্কিণ এবং একই সঙ্গে 'প্রাইভেট ও পাব্লিক সেক্টারের' 'টাইটরোপ ব্যালেন্স' করে নেতৃত্ব বজায় রেখেছিলেন স্বর্গীয় জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু এরূপ ব্যালেন্সের ভেল্কি নেহেরু যুগে হয়তো সম্ভব ছিল, নেহেরু-উত্তর কংগ্রেস মঞ্চে যে সেই যাদুকরী খেলা আর সম্ভব নয়,—বর্তমান খাদ্য ও মূল্য-সংকট তার সুস্পষ্ট সংকেত।

শ্রীশাস্ত্রীর নির্বিবাদী নির্বাচনকে কংগ্রেসের ঐক্য ও সংহতির অপূর্ব স্বাক্ষর বলে যে প্রচার কিছুদিন থেকে প্রবল হয়ে উঠেছিল সেটা যে কত অন্তঃসারশূন্য বর্তমান খাদ্য ও মূল্য-সংকট তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্থিত-স্বার্থ গোষ্ঠি প্রধানমন্ত্রী মনোয়নের আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছিল, আজ তারাই দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক আক্রমণ শুরু করেছে শাস্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে। এবারের খাদ্য ও মূল্য-সংকট শুধু অর্থনৈতিক অসঙ্গতির পরিণাম নয়,—এই সংকট মূলত কৃত্রিম এবং এই সংকটের মূলে রয়েছে কংগ্রেসের স্থিত-স্বার্থ গোষ্ঠির সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। 'প্রাইভেট সেক্টার' বনাম 'পাব্লিক সেক্টার' তথা 'ফ্রী-এন্টার প্রাইজ' বনাম 'কন্ট্রোলে'র যে মৌলিক দ্বন্দ্ব স্বর্গীয় শ্রীনেহেরুর ব্যক্তিত্বকে ডিঙিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি,—আজ তাই উগ্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণবাদী

অর্থনীতির উপরে। এই আক্রমণের পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতীয় পুঁজিবাদী 'এন্ড-কোম্পানী'র উস্কানী এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরী সোস্যালিজমের জিগীর। দাশ কমিশনের মর্গে কায়রণের রাজনৈতিক হত্যা ও সদাচারী শ্রীনন্দের অত্যুৎসাহী প্রচার এবং সেই সঙ্গে সোস্যালিজমের কীর্তন,—কংগ্রেসের স্থিত-স্বার্থ গোষ্ঠিকে একের পরে এক মরিয়া করে তুলেছে। কংগ্রেসের একই রাজনৈতিক মঞ্চে চলছে তাই বিচিত্র দৃশ্য। শাস্ত্রী-নন্দ-সুব্রাহ্মণ্য দিন-রাত আর্তনাদ করে চলেছেন সংকট-তারণের উপায় সন্ধানে, পক্ষান্তরে সেই কংগ্রেসরই অন্যতর মন্ত্রী শুদ্ধ মোরারজী-জগজীবন-পাতিলের কণ্ঠে খাদ্য সংকট সম্বন্ধে বাক্যস্ফূর্তিও নেই। টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা গোষ্ঠির যে পুঁজিপতিরা ভারতের যে কোন জাতীয় সংকটে সদা অগ্রণী হয়ে উপদেশামৃত বর্ষণ করে থাকেন, আজকের এই চরম অর্থনৈতিক সংকটে এই গোষ্টির মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ মঞ্চে এই শিল্প গোষ্ঠিরা অদৃশ্য হলেও, পরোক্ষে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাত এই গোষ্ঠির দৈনিক ও সাপ্তাহিক মুখপত্রগুলি সম্বরে নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন 'ব্রড সাইড' চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটের অন্তরালের কংগ্রেসী রাজনীতির দ্বন্দ্ব আজ তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

নেহেরুর অবর্তমানে আজ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নেহেরু-যুগের নিয়ন্ত্রণ-ধর্মী অর্থনৈতিকে চালু রাখার জন্য কংগ্রেসী সংগঠনের যে 'চরিত্রের' প্রয়োজন কংগ্রেসের তা নেই। কংগ্রেসী সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং আইন-সভার প্রতিনিধিদের বাগডোর নিয়ন্ত্রণে যে গোষ্ঠির প্রাধান্য প্রবলতর, তারা স্থিতস্বার্থ গোষ্ঠির মুখপাত্র অথবা এই গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের মৈত্রীর বন্ধন অনেক বেশি শক্তিশালী। আজ তাই কংগ্রেসের মধ্যেই একদিকে যতখানি সদাচার ও সোস্যালিজমের আওয়াজ উঠছে অপরদিকে একই সংগঠনের মঞ্চে তার প্রতিরোধের ব্যূহও তৈরী হচ্ছে তারচেয়ে অনেক প্রবলাকারে। এজন্যেই মুখ্য মন্ত্রী সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী 'স্টেট ট্রেডিংয়ের' যে প্রস্তাব উত্থাপন করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পরোক্ষে তাকে বানচাল করে দিচ্ছেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি মজুতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করছেন, কিন্তু অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী এসম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই সাহস পাচ্ছেন না। গ্রামাঞ্চলের মজুতদারেরা কংগ্রেসের সাংগঠনিক স্তম্ভ, সহরাঞ্চলের শিল্পপতিরা কংগ্রেসের অলিখিত কোষাধ্যক্ষ তাই শাস্ত্রী শুধু মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে সার্কুলার পাঠাচ্ছেন এবং তাত্ত্বিক ভাষণ দিচ্ছেন, কিন্তু যাদের চক্রান্তে আজ খাদ্য ও মূল্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে তাদের উপরে আঘাত হানার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা কোন স্তরের কংগ্রেসী সরকার করতে পারেননি।

এখন শুধু প্রতিবাদ নয়, কংগ্রেসের স্থিত-স্বার্থ গোষ্ঠির পক্ষ থেকে প্রতিরোধও সুরু হয়েছে। শ্রীনন্দের সদাচারের বিরুদ্ধে 'অর্বাচীন' পট্টনায়ক ক্ষিপ্ত হুংকার দিয়েছেন কিন্তু শ্রীনন্দের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন পট্টনায়ক দোসর শ্রীঅতুল্য ঘোষ। শ্রীনন্দকে এখন হয় ক্যাবিনেট ছাড়তে হবে, নয়তো নিছক প্রাণহীন 'ভূত' হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ আঁকড়ে থাকতে হবে। কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্বের গতি কোন দিকে তার তাৎপর্য বুঝে কামরাজ নাদার শ্রীনন্দকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং শাস্ত্রীকেও তিনি বুঝে-সুঝে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আক্রমণে কংগ্রেসী স্থিত-স্বার্থ গোষ্ঠির প্রথম পর্বে জয় হয়েছে,—সদাচারী শ্রীনন্দ হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন। 'সদাচার' বন্ধ হয়েছে, শাস্ত্রীকে এখন হয় কংগ্রেসের স্থিতস্বার্থ গোষ্ঠির তাঁবেদার হয়ে চলতে হবে, নয়তো চূড়ান্ত শাস্ত্রী-পতন দূরবর্তী নয়।

বস্তুত, বর্তমান খাদ্য ও মূল্য-সংকট কংগ্রেসেরই স্থিত-স্বার্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক চক্রান্তের কীর্তি। কংগ্রেস ঐক্যের পথে নয়—এক জনতর অন্তর্দ্বন্দ্বের পথে যে কত দ্রুত এগিয়ে

চলেছে বর্তমান মূল্য সংকটের রাজনীতি তার এক অদ্ভুত দিক নির্দেশ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যেই বর্তমান খাদ্য ও মূল্য সংকট যথাযথভাবে সমাধান করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। তাই জনসাধারণের দুরবস্থার মাত্রা আরও বেড়েই চলবে এবং জাতীয় সংকটের সম্ভাবনা আরও তীব্রতর হয়ে উঠবে।

আয়ুব শাহীর শেষ চক্রান্ত

ঘরে যখন খাদ্যাভাব ও মূল্য সংকটের এই চরম দুরবস্থা তখন পাক সীমান্তের অবস্থা কি? শাস্ত্রী-আয়ুবের বিবৃতি, প্রতিবিবৃতি পড়ে মনে হবে পাক ভারতের সম্পর্ক বুঝি শান্তি ও মৈত্রীর দিকে মধুর অগ্রগতি করছে। কিন্তু ঘটনার গভীর বিশ্লেষণ ঠিক তার বিপরীত সিদ্ধান্তের ইংগিতবাহী। ব্ল্যাক-মেলের মন্ত্রে জিন্না পাকিস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে সতের বছরেও পাকিস্থানের পক্ষে বাকী কাশ্মীর আদায় করা সম্ভব হয় নি, পূর্বতন পাক-নায়কদের মত, পিণ্ডি নেতা আয়ুবও একথা জানেন যে 'সিয়াটো' ও 'সিন্টো' চুক্তি দ্বারা পাকিস্থানের অস্তিত্বকে স্থায়ীত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্থানের জল সরবরাহ ও সামরিক সুরক্ষার জন্য পাকিস্থানের সঙ্গে কাশ্মীর সংযুক্তি অপরিহার্য,—অন্যথায় আগামী দিনে পাক-ভারতের খণ্ডিত সার্বভৌমিকতার আপোষরফা করে একটি কনফেডারেশন বা সুপার ফেডারেশন গঠনের নীতি অনুসরণ অনিবার্য। কিন্তু পাক নায়ক আয়ুবের পক্ষে দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণের নির্গলিত অর্থ নিজেকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরতরে অপসারিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কোন ডিকটেটারই কোন কালে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জনের এরূপ পথ বেছে নেয় নি।

কাশ্মীর দখলের বিকল্প সশস্ত্র পদ্ধতি গ্রহণের যে সাহস আর কোন পাক-নেতার ছিল না, পাক-ফৌজের প্রধান সেনাপতি মার্শাল আয়ুবের ক্ষেত্রে তার অভাব নেই।

আয়ুব ভারতের বিরুদ্ধে 'ব্ল্যাকমেলে'র শেষ আঘাত হানবেন, এবং এই আঘাত ব্যর্থ হলে বেছে নেবেন সামরিক সংঘাতের অন্তিম বিকল্প পথ। দুদিকেই মার্শাল আয়ুব এগিয়ে চলেছেন দ্রুতগতিতে গিলগিট ও চিত্রলের ন্যায় মার্কিন ঘাঁটি পাকিস্থানের বক্ষে বহন করে এবং সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সরাসরিভাবে পাকিস্থানের পক্ষে আকস্মিক ভারত-বিরোধী সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অন্তত এজন্য কূটনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ইঙ্গ মার্কিনকে একথা বোঝান দরকার যে পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বোঝা পড়া করার শেষ চেষ্টা করে তবেই সামরিক পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়েছে। এই কূটনৈতিক উদ্দেশ্যেই নেহেরুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পাক-রাষ্ট্রপতি আয়ুব নানা বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বোঝা পড়া করার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কথা বলছেন আয়ুব বেশ ভাল ভাল, কিন্তু কাজ চলছে সেই 'ব্ল্যাকমেল' রাজনীতির পন্থায়। পাক-ইরাণ-তুর্কী চক্রগঠন, কমনওয়েলথ বৈঠকে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন নিজের বাক্যের চাতুর্যে মৈত্রীভাব, পক্ষান্তরে ভুট্টোর কণ্ঠে সেই ঝাঁঝাল আওয়াজ,—সবই সেই 'ব্ল্যাকমেলে'র লক্ষণাক্রান্ত চাল। সম্প্রতি শেখ আবদুল্লা-রাজাজী-মাসানী এবং সর্বোদয় গোষ্ঠির দাক্ষিণ্যে আয়ুবের 'ব্ল্যাকমেলে'র রাজনীতি অনেকখানি সক্রিয় তাৎপর্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এবারে তবু কূটনীতির 'ব্ল্যাকমেল'ই নয়, বুলেটের ব্ল্যাক-মেলও সুরু করেছেন আয়ুব। সেই হানাদারী কার্যক্রম যে নীতিতে মিঃ জিন্না প্রায় পূর্ণ সফল হতে হতে শেষ পর্যন্ত অর্দ্ধ-কাশ্মীর দখলের সাফল্য অর্জন করেছেন। তাই একদিকে চলছে পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী বৈঠকের কূটনৈতিক প্রস্তাব এবং অন্যদিকে সীমান্তের পারে পারে জঙ্গী পদ্ধতিতে বর্ষিত হচ্ছে অবিশ্রান্ত হানাদারী বুলেট।

এই জঙ্গী ব্ল্যাকমেল যদি ব্যর্থ হয় তা, হলে আয়ুবের শেষ পন্থা হবে কাশ্মীর দখলের সশস্ত্র অভিযান। এককভাবে এরূপ অ্যাডভেঞ্চারের কথা এতদিন পাক-সামরিক

নেতাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু চীন-ভারত সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতি আজ সেই সামরিক পরিকল্পনাকে বাস্তবানুগ ও সম্ভাব্য করে তুলেছে। একক পাকিস্তানের তুলনায় ভারত অনেক শক্তিধর, কিন্তু চীন-ভারত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের আঘাত হানার ক্ষমতা বেশি,—এটাই হলো মার্শাল আয়ুবের সর্ব শেষ 'ক্যালকুলেশন' এবং আয়ুব—নেতৃত্বে সেই অন্তিম পর্য্যায়ের ভারত-বিরোধী সংঘাতের জন্য পাকিস্তান দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

হিমালয় সীমান্তে বিপুল চীনা সমাবেশ

চীনের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভারতের বর্তমান আশ্বস্ততার ভাব চরম বিভ্রান্তির পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন চীন-ভারত সংঘাতের কারণ আকসাই চীনের সাতটি মিলিটারী ঘাঁটি, চীনের পক্ষে আকসাই চীনের পথে সিংকিয়াংয়ে যাতায়াতের সুযোগ লাভ এবং নেফার কয়েকটি আউট পোষ্টের সীমানা নির্ধারণের দ্বন্দ্ব মাত্র। অর্থাৎ কিছুটা সীমানার রেখা নির্দেশ এবং কিছুটা আকসাই চীনের জমিহস্তান্তর—এই যেন চীন ভারতের সংঘাতের কারণ!

শুধু কি এরূপ সীমান্ত দ্বন্দ্বের জন্যই চীন গত দশ বছরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিস্তৃত হিমালয় সীমান্তে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে বিপুল সামরিক সমাবেশ করেছে? যে ভারত সরকার বিনা দ্বিধায় তিব্বতকে চীনের গ্রাসে তুলে দিয়েছে এবং তিব্বতে ভারতের সমস্ত অধিকার স্বেচ্ছায় চীনকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে সেই চীনের বিরুদ্ধে তিব্বত দখলের বিন্দুমাত্র মানসিকতা বা সামর্থ্য যে ভারতের নেই,—সেকথা কম্যুনিষ্ট চীনের অজানা নয়। তবুও কেন চীন তিব্বতকে একটি বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে?

রুশ চীন বিচ্ছেদের পরে এসম্বন্ধে সংশয়ের সামান্যতম অবকাশও নেই যে চীন সশস্ত্র সংঘাতের পথে কম্যুনিজম সম্প্রসারণের কার্যক্রমে সংকল্পবদ্ধ। এশিয়া ও আফ্রিকায় কম্যুনিজম সম্প্রসারণের পথে গণতান্ত্রিক ভারত চীনের প্রধান প্রতিবন্ধক। কম্যুনিজম প্রতিরোধে ভারতের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বতকে এক বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে এবং এই ঘাঁটি থেকে ১৯৬২ সালে ভারতকে আঘাতও করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সামনে চীনা কম্যুনিজম প্রতিরোধে ভারতের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতিচ্ছবিকে চূর্ণ করা ও ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে ভারতের আর্থিক প্রগতি ব্যাহত করা এবং নেপাল ভুটান সিকিমকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে চীন-নির্ভর করে তোলা,— ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণ প্রথম পর্য্যায়ের এই ত্রয়ী লক্ষ্য আশাতীতরূপে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। কম্যুনিষ্ট চীনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লক্ষ্য হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত দখল করে পূর্বাঞ্চল ভারতে 'ইয়ানান' বা 'লাওসের' ষ্ট্র্যাটিজীতে গৃহ-যুদ্ধ তথা সিভিল ওয়ারের ভূমিকা সৃষ্টি করা। চীন ১৯৬২ সালের হিমালয় সীমান্তে যে সৈন্য সমাবেশ করেছিল এবারে লাদাক, নেফা ও চুম্বী উপত্যকায় তারচেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে সৈন্য সমাবেশ করেছে। হিমালয় সীমান্তে চীনের কেন এই বিপুল সামরিক সমাবেশ? চীনের এই সামরিক তৎপরতা কি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কার্যক্রমের সূচনার আশু লক্ষণ নয়? হিমালয় সীমান্তে বিপুল চীনা ফৌজ সমাবেশের তাৎপর্য কি, লক্ষ্য কি তার পর্য্যালোচনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় মন নীরব ও অ-নাগ্রহী। চীন-ভারতের সংঘাত যেন নিছক সীমানা নির্ধারণের বিবাদ মাত্র—ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এমনই একটি মনস্তত্ত্ব ক্রমশ বেশ স্পষ্টভাবে দানা বেঁধে উঠছে। এই চিন্তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের কার্যক্রম

রুশ-চীন আদর্শনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে অ্যাফ্রো-এশিয়ার অন্তসব

দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিধা বিভক্তি স্বাভাবিক হলেও চীন-ভারত সশস্ত্র সংঘাতের উত্তপ্ত পরিবেশে চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি মূলত এক অস্বাভাবিক ঘটনা। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলিত পথে নির্বাচন ও গণআন্দোলনের রাজনৈতিক কার্যক্রম অনুসরণ করা যদি চীনপন্থীদের লক্ষ্য হতো তা' হলে নিশ্চয়ই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সাংগঠনিক বিচ্ছেদের মারাত্মক পথে অগ্রসর হতো না। হিমালয় সীমান্তের দুই পারে যেখানে ভারতীয় ও চীনা ফৌজ মুখোমুখী হয়ে বসে আছে সেই সময়ে শত্রু সমর্থক চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের অর্থ যে ভারতীয় সচেতন জনতা ও সরকারের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঘৃণা এবং পরিণামে সরকারী দমন-নীতিকে আমন্ত্রণ করা সেকথা না বোঝার মত নির্বুদ্ধিতা অন্তত চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের উপরে আরোপ করা চলে না। তবু কেন চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা চীন-সমর্থনের ক্ষুরধার বিপদের পথে পা' বাড়ালো? এই প্রশ্নের উত্তরটি ভারতীয় সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের পক্ষে সমূহ বিপদ সম্ভাবী। কেন চীনপন্থীরা এরূপ বিপদসংকুল পথে অগ্রসর হলো তার গোড়ার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে চীনপন্থী ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা সুনিশ্চিতভাবে মাউ-সে-তুঙের কম্যুনিজম সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট সময়-সূচীর সংকেত ও প্রস্তুতির নির্দেশ লাভ করেছে। আগামী রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার প্রস্তুতির জন্য পার্লামেন্টারী রাজনীতি ও আইন অমান্য আন্দোলনের সাংগঠনিক পন্থা বর্জন করে তেলেঙ্গানার মনস্তত্বে পার্টিও পরোক্ষে জনতার মনকে পুনর্গঠিত করা একান্তভাবেই আজ চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের পক্ষে অপরিহার্য। আজ চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের নিকট কর্মীর সংখ্যা বাড়ান বড় কাজ নয়,—কর্মীর জঙ্গী-চরিত্র গঠন করা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা তাই কর্মীমন তৈরীর কাজে উদ্যত হয়েছে সশস্ত্র সংঘাতের তেলেঙ্গানা পদ্ধতিতে। যথা সময়ে প্রতিটি পার্টি কর্মী যাতে 'তেলেঙ্গানা পদ্ধতিকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে তার জঙ্গী-পন্থী মানসিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিচ্ছিন্ন সংগঠনের সচেতন অনুষ্ঠান।

১৯৫০ সালের আগে কম্যুনিষ্টদের তেলেঙ্গানা মডেল ছিল বালখিল্যের বিপ্লবপ্রয়াসের সামিল, কিন্তু তিব্বত গ্রাসের পর চীন-ভারত সীমান্ত একাকার হয়ে যাওয়ার ফলে কম্যুনিষ্ট ষ্ট্র্যাটেজীর বিচারে যে জিও-পলিটিক্যাল রূপান্তর ঘটেছে তার ফলে 'তেলেঙ্গানা মডেল' এখন 'ইয়ানান' বা 'লাওসের' সংগ্রাম পদ্ধতি গুরুত্ব অর্জন করেছে। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের মূল লক্ষ্য এখন 'ইয়ানান' তথা 'লাওয়েস'র ষ্ট্র্যাটেজীতে 'পূর্বাঞ্চল তেলেঙ্গানা' সৃষ্টি করা। যে মুহূর্তে হিমালয় প্রান্তে অগ্রসরমান চীনা ফৌজ মাউ-সে-তুঙের গ্রীন সিগন্যাল তুলে ধরবে সেই মুহূর্তে পূর্বাঞ্চল ভারতে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা ঝাঁপিয়ে পড়বে 'নব তেলেঙ্গানার নয়া সংগ্রামে'। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের এই ভাবী কার্যক্রম সম্বন্ধে ভারতের রাষ্ট্রীয় মন কি সচেতন এবং সেভাবে জাতীয় মনকে প্রস্তুত করবার দায়িত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকার কি অবহিত? তার কোন লক্ষণই দেখা যায় না রাষ্ট্রীয় স্তরে।

পাক-চীন ও চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের ত্রিভুজ চক্র

সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী পাক-চীনের আতাঁতের তাৎপর্য শুধু কূটনৈতিক নয়। পাক-চীনের ভারত বিরোধী ষ্ট্র্যাটিজীকে কার্যকরী করার জন্য পাকিস্তান পামীর সংলগ্ন কাশ্মীরের পার্বত্য অংশ চীনকে উপঢৌকন দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, পিণ্ডি-নেতা আয়ুব কম্যুনিষ্ট চীনের অনুপ্রবেশের জন্য পূর্ব বাংলার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলায় চীনা কনস্যুলেট স্থাপিত হয়েছে, মফস্বল সহরে পর্য্যন্ত চীনা লাইব্রেরী খোলা হয়েছে এবং চীনা কম্যুনিজমের প্রচার

পুস্তিকায় পূর্ব বাংলা ছেয়ে যাচ্ছে। শ্রীমনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' বইটি লাহোরে বিপুল সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়ে ব্যাপক ভাবে বিলি হচ্ছে। কোন চীনপন্থী কম্যুনিষ্টই আর পূর্ব-পাকিস্তানের জেলে আবদ্ধ নেই। পূর্ব বাংলার সহরে সহরে চীনা কম্যুনিজমের প্রচার পুস্তিকা বিক্রি এখন আর বে-আইনী বা সরকার অনভিপ্রেত নয়। সরকারী বা বে-সরকারী প্রত্যেক সংবাদপত্রে চীনা সংবাদ এখন বড় বড় হেড লাইনে ছাপা হয়। চীনা কম্যুনিজম বা চীন সরকারের কোন সমালোচনা পাক সরকার এখন বরদাস্ত করতেও রাজী নয়। পূর্ব বাংলার পাট ও চামড়ার বিনিময়ে চীনা যন্ত্রপাতি আমদানী করার চুক্তি হয়েছে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে। যে মৌলানা ভাসানীকে আয়ুবশাহী চিরকালের মত সমস্ত নির্বাচনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে সেই ভাসানী চৌ-এন-লাইয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে এক বছরে দু'বার পিকিং ঘুরে চীনের উচ্চস্তরের নেতাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে ফিরে এসেছেন। মৌলানা ভাসানী এখন পূর্ব বাংলার চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট নেতাদের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত এবং তিনি নিজে কম্যুনিষ্ট না হলেও পূর্ব বাংলায় তাঁর হাতেগড়া আওয়ামী পার্টির কর্মকর্তাদের বড় অংশ কম্যুনিষ্ট। পূর্ব বাংলায় চীনা কম্যুনিজমের দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে আয়ুবশাহীর সচেতন ঔদার্যের অবদানে।

চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার এখন দিল্লী বা কলকাতায় নয়,—ঢাকায় এবং চীনা কনস্যুলেটের অফিসে। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের ঢাকা-কলকাতা যাতায়াত অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে,—কারণ, চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের শলা-পরামর্শ এবং শক্তি-সামর্থ্য ও মূলধন সংগ্রহের কেন্দ্রস্থান এখন ঢাকার চীনা কনস্যুলেট। পাক চীন আঁতাত সবচেয়ে সুযোগ এনে দিয়েছে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের জন্য। কলকাতার চীনা ব্যাংক বন্ধ হলেও, ঢাকার 'ব্যাংক অব চায়না' এখন আর দূরে নয়।

পাক-চীন আঁতাতে আয়ুবের অন্তিম লক্ষ্য চীন-ভারত সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতিতে ভারত রণক্ষেত্রকে প্রধানত চীনের সঙ্গে আবদ্ধ রেখে হানাদারী সামরিক অভিযানে কাশ্মীর দখল করা। লাদাকে চীনের চাপ, পশ্চিমে পাকিস্তানের এবং পূর্ব প্রান্তে চুম্বী ও নেফায় চীনের সামরিক অভিযান,—চীন-ভারত সশস্ত্র সংঘাতের এই তিন সীমান্তের সামরিক তৎপরতায় পাক-সৈন্যের পক্ষে কাশ্মীর সীমান্তে সংখ্যা ও শস্ত্র ক্ষেপণের প্রাধান্য অর্জন করে কাশ্মীর দখল করা অসম্ভব হবে না,—এই ধারণা মার্শাল আয়ুবের শেষ ষ্ট্র্যাটিজী।

পূর্ব বাংলার দিকে চীনকে প্রলুব্ধ করে চীন-ভারত সংঘর্ষের সক্রিয় ক্ষেত্র তৈরীতে আয়ুবশাহী যে জুয়ারীর রাজনীতিতে পদক্ষেপ করেছে তার ফলে যদি পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যায়? মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের কল্পনা ছিল 'স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বঙ্গাস্থান'-রূপে। আয়ুব জানে বিচ্ছিন্ন ও পশ্চিম-খণ্ড-বিরোধী পূর্ব পাকিস্তান একদিন পশ্চিম পাকিস্তানের হাত ছাড়া হবেই। তাই এরূপ সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মার্শাল আয়ুব কাশ্মীর'সহ বৃহৎ পাকিস্তানের কল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী করে তুলতে বদ্ধ-পরিকর। এরূপ কূটনৈতিক খেলায় পূর্ব পাকিস্তান যদি আয়ুবের হাত ছাড়া হয়েই যায়, তবে এই পূর্বদেশ যেন ভারতের হাতে না পড়ে, চীনের তাঁবেদারীতে গিয়ে এই অঞ্চল যেন ভারতের পূর্ব প্রান্তে গৃহযুদ্ধের ভূমিকা সৃষ্টি ক'রে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত ও পঙ্গু করে রাখে, পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই জুয়ারী নীতির মধ্যেই কম্যুনিষ্ট চীন ও চীনপন্থী পাক ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা সন্ধান পেয়েছে তাদের 'পূর্বাঞ্চল স্বেচ্ছাধীন মতবাদের' কার্যক্রম।

'ভারতীয়-ইসলামান' পিপলস রিপাব্লিক অব বেঙ্গল

মার্শাল আয়ুব যখন চীন কর্তৃক হিমালয় সীমান্তের অভিযানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লাদাক ও আকসাই চীন কম্যুনিষ্ট

চীনকে ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন দেখছেন তখন মাউ-সে-তুং ও চৌ-এন লাই নেতৃত্ব এবং পাক-ভারতীয় চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? চীন ও চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য পূর্বাঞ্চল ভারতে একটি 'ইয়ানান' সৃষ্টি করে লাওস ও ভিয়েৎনামের পদ্ধতিতে ভারতকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া। ভূগোল এবং বহু ভাষা ও বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির বৈরী-সম্পর্কে সংহতিহীন আসামে একটি 'ভারতীয় ইয়ানান' সৃষ্টি করা চীনের পক্ষে অসম্ভব ষ্ট্র্যাটিজী নয়। চুম্বী উপত্যকা থেকে সোজা দক্ষিণে এসে চীনা ফৌজকে পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হলে বিনা আঘাতেই চীন, আসামকে 'ভারতীয় ইয়ানানে' পরিণত করে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের বৈপ্লবিক সরকার গঠনের ষ্ট্র্যাটেজিক সুযোগ করে দিতে সক্ষম হবে। সামরিক পরিস্থিতি যদি এরূপ পথে অগ্রসর হয় তা' হলে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সমস্ত চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা ঝাঁপিয়ে পড়বে গিয়ে 'আসামের ইয়ানানে।' আসামের পার্বত্য প্রদেশ ও জংগলাকীর্ণ রাজ্য এবং উত্তরে কম্যুনিষ্ট চীনের একটানা সম-সীমান্ত ও সরবরাহের সংযোগ,—লাওস ও ভিয়েৎনামের চেয়েও সম্ভাব্য 'আসাম ইয়ানান' গঠনের ষ্ট্র্যাটেজী হবে অধিকতর কার্যকরী।

সম্প্রতি মিলান থেকে প্রাপ্ত জনৈক অজ্ঞাত বাঙালী কম্যুনিষ্টের লেখা একটি বাংলা চিঠির ফটোস্ট্যাট সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রে চৌ-এন-লাইয়ের বার্তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এবছরেই চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের 'শুভদিন' আসছে, অর্থাৎ এবছরেই চীন আবার পূর্বাঞ্চল ভারতে অভিযান চালাবে এবং সেই সুযোগে বাংলা ও আসামে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র—পিপলস রিপাব্লিক অব বেঙ্গল, এবং এই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে ভারতের পূর্ব প্রান্তে কম্যুনিষ্টদের গৃহযুদ্ধের ভূমিকা। এই চিঠিটির রাজনৈতিক রহস্য কোথায় সেকথা এখনও স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এই চিঠিটিতে নিপুণভাবে 'ভারতীয় ইয়ানান' গঠনের কম্যুনিষ্ট ষ্ট্র্যাটেজীর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'পিপলস রিপাব্লিক অব বেঙ্গল' গঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্যটিও অত্যন্ত সুনির্বাচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ হলে এরূপ একটি চিঠি রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটাতো, কিন্তু এদেশে চীনা ব্যাংকের হিসাবপত্রে কম্যুনিষ্ট নামের তালিকার অনুসন্ধান যেমন দীর্ঘ তিন বছরের পরে আজও সম্পূর্ণ হয়নি—তেমনি এরূপ একটি মারাত্মক চিঠির উৎস ও চক্রান্তের সন্ধানে সরকারী স্তরে কোন ব্যস্ততাই দেখা দেয়নি। সম্প্রতি চীন কর্তৃক কয়েকটি সুশিক্ষিত 'গেরিলা' বাহিনী পূর্বাঞ্চল ভারতে প্রেরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে,—কিন্তু সে সম্বন্ধেও সরকারী চৈতন্য একইভাবে উদ্বেগহীন ও নিষ্ক্রিয়।

টংকিনের 'অ্যালার্ম বেল'

ভারতের তিন সীমান্তে পাক-চীন চক্রান্ত যখন ভারত বিরোধী জঙ্গীব্যূহকে জোরদার করে গড়ে তুলতে ব্যস্ত, সেই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার টংকিন থেকে ভেসে আসছে আর এক বিপদ সংকেত। কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎনামের গানবোট আক্রমণের প্রত্যুত্তরে মার্কিণ বিমান টংকিন বন্দরে বোমাবর্ষণ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মার্কিণ বোমা বর্ষিত হয়েছে উত্তর ভিয়েৎনামের টংকিন বন্দরে, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এই বোমার লক্ষ্যস্থল মাউ-সে-তুঙের 'জঙ্গীপন্থী বিপ্লববাদ।' মাউ-সে-তুঙ এতকাল ক্রুশ্চভকে এই বলে বিদ্রূপ করে এসেছেন যে 'আমেরিকান ইম্পিরিয়েলিজম্' হলো আসলে একটি 'পেপার টাইগার।' উত্তরে ক্রুশ্চেভ বলেন, "দিস অ্যামেরিকান পেপার টাইগার হ্যাজ নিউক্লিয়ার টিথ্।" এই 'কাগজী মার্কিণ বাঘ' 'পারমাণবিক দাঁত' দিয়ে চীনকে এখনও কামড়ায়নি, সম্প্রতি শুধু সাধারণ বারুদের ধোঁয়া ছেড়ে শুধু একটু 'ভেংচী' দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে এবারে মাউ-সে তুঙ কি করবেন?

চীন এখনও টংকিনের জবাব দেয়নি,—আপাতদৃষ্টিতে যেন মার খেয়ে নত শিরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু এটা চীনের নিতান্তই স্ট্র্যাটেজিক নিষ্ক্রিয়তা। টংকিনের আঘাত যদি কম্যুনিষ্ট চীন হজম করে নেয় তা' হলে মাও-সে-তুঙ শুধু ক্রুশ্চেভের কাছেই পরাজিত হবেন তাই নয়,—এশিয়ার উপর কায়েমীভাবে মার্কিণী প্রাধান্যও স্বীকার করে নেবেন। তার-সাথে এশিয়া আফ্রিকায় চীনা কম্যুনিজমের প্রলম্বিত জঙ্গী হস্ত পঙ্গু হয়ে যাবে। অর্থাৎ টংকিনের জবাব দিতে সক্ষম না হলে কম্যুনিষ্ট চীনের নৈতিক পতন হবে। মাও-বাদের মৃত্যু ঘটবে, জঙ্গীবাদী কম্যুনিজমের যে আদর্শনৈতিক শ্রেষ্ঠতার দাবীতে মাও-সে-তুঙ রাশিয়ার সঙ্গে চরম বিচ্ছেদ ঘটাতে পর্য্যন্ত দ্বিধাবোধ করেননি এবং এশিয়া ও আফ্রিকার কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে বিভক্ত করতে পশ্চাদপদ হননি তিনি টংকিনে 'মার্কিণী চপেটাঘাতকে' বেমালুম হজম করে যাবেন,—একথা অর্বাচীন রাজনীতিকের পক্ষেও অবিশ্বাস্য।

কম্যুনিষ্ট চীন টংকিনের জবাবে আঘাত করবে এবং প্রচণ্ড আঘাত করবে,—কখন, কোথায় ও কিভাবে তাই বিচার্য প্রশ্ন। জঙ্গীবাদী গোল্ডওয়াটারের যদি জয় হয়, তা' হলে ক্রুশ্চেভের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই মাও-সে-তুঙ কি প্রত্যাঘাতের সময়-সূচী নির্ধারণে মার্কিণী নির্বাচন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন? মার্কিণের বিরুদ্ধে কি করে রাশিয়াকেও টেনে আনার অবস্থা সৃষ্টি করা যায়,—সেজন্য চৈনিক কূটনীতি সদা সতর্ক। একক বা রাশিয়াকে টেনে এনে,—যেভাবেই হোক না কেন,—টংকিনের জবাব কম্যুনিষ্ট চীনকে দিতেই হবে, অন্যথায় মাও-সে-তুঙের রাজনৈতিক মৃত্যু অবধারিত। মাও-সে-তুঙ যদি টংকিনের প্রত্যাঘাত করে, তবে মার্কিণও সেই আঘাত নত মস্তকে মেনে নেবে না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে চীন মার্কিণ সংঘর্ষ জ্যামিতিক হারে চক্রায়িত হবে অনিবার্য যুক্তিতে। এদিকে মালয়-ইন্দোনেশিয়ান সংঘাত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সংকটকে জটিল করে তুলেছে এবং আরও তুলবে।

উটপাখীর পন্থায় কেউ অন্ধ হয়ে না থাকলে একথা আজ সুস্পষ্ট যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগ্নি ও মৃত্যুর রক্ত-ক্ষয়ী সংঘাত প্রত্যাসন্ন। এই বিপর্যয়ী সংঘাতের এক ক্ষেত্র হবে লাওস ও ভিয়েৎনাম এবং অপর ক্ষেত্র হবে ভারতবর্ষ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই আগুন বিশ্ব সমরের দাবানলে পরিণত হবে কিনা এখনও তার পর্য্যাপ্ত সংকেত সুস্পষ্ট হয়নি। মার্কিণী নির্বাচনে তার অনেকখানি ইংগিত পাওয়া যাবে।

সংকট প্রত্যাসন্ন, কিন্তু রাষ্ট্র অচেতন

১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণকে অনেকে ভারতের পক্ষে শাপে বর আখ্যা দিয়েছিলেন। পঞ্চশীলের স্বরচিত স্বর্গ থেকে পতনের ফলে ভারত বাস্তব চৈতন্য ফিরে পাবে,—এটাই ছিল অনেকের আশা। চীনের আঘাতে ভারতের জন মনে প্রতি-রোধের যে দুর্জয় জাতীয় সংকল্প সৃষ্টি হয়েছিল তা' অভূতপূর্ব। জাতীয় উন্নয়নের বাস্তব পরিকল্পনার এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রয়াসে এই সম্বোথিত জাতীয় উদ্যমকে কাজে লাগান হবে,—তাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু চীনের প্রত্যাবর্তনের কিছুকালের মধ্যেই আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যম স্তিমিত হয়েছে, সরকারী নেতৃত্বের মানসিকতায় এসেছে গতানুগতিক নিশ্চিন্ততার ভাব। জরুরী অবস্থাকে কাজে লাগান হয়েছে একমাত্র কংগ্রেসের শাসনকে নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে। ইমার্জেন্সী প্রযুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিরোধ শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়। বর্তমানের সর্বব্যাপী মূল্য-সংকট ও জনগণের দুরবস্থা, হতাশা ও ব্যর্থতার মনোভাবে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

চরম সংকট আবার আসন্ন,—ভিতরের সংকট এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাইরের সংকট ঘনায়মান। পাকি-

স্থানের লক্ষ্য,—হানাদারী পন্থায় কাশ্মীর দখল। কম্যুনিষ্ট চীন ও চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য আসাম ও পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে 'ভারতীয় ইয়েনান' সৃষ্টি এবং লাওস ও ভিয়েৎনামের পদ্ধতিতে গৃহযুদ্ধের সূচনা করা। আসন্ন সংকট প্রতিরোধে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সংকটের গুরুত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় চৈতন্য এবং জাতীয় সংকল্প ও জাতীয় সংহতি। আভ্যন্তরীণ সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে বাইরের সংকটের সামনে কোন জাতিই দাঁড়াতে পারে না। তাই গৃহ সংকট মোচনের জন্য আজ সর্বপ্রধান প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষায় ব্যস্ত। তাই, খাদ্য ও মূল্য-সংকট নিয়ন্ত্রণে সামগ্রিক জাতীয় প্রচেষ্টাকে নিয়োগ না করে কংগ্রেস-নেতৃত্ব রক্তচক্ষু তুলে ধরেছে সেই সব বিরোধী দলের দিকে যারা জনতার শোচনীয় দুরবস্থাকে ভাষা দিতে উদ্যত কিন্তু যাদের পূর্ণ আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি। কংগ্রেসী নেতৃত্বের মূঢ় ঔদাসীন্য, স্বার্থপরায়ণতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে এক চরম জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে।

দ্রুত প্রত্যাসন্ন এই জাতীয় সংকটের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার উপায় কি, আমাদের জাতীয় জীবনের সামনে আজ সেইই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি.এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২

তুমি শিল্প

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছাতায় ঢেকেছে মুখ, খবরের কগজে অথবা
ট্রেনে যেতে যেতে যেন, রাস্তার এত যে মুখ সব
বোকা প্যাসেঞ্জার, হু হু গাড়ি আর বুকভরা হাওয়া
দক্ষিণের ডাক শুনে ঐ ঝাউ, শিরীষ, পাখিরা
সারবন্দী কোন ভি. আই. পি. র গাড়ি চলে যাবে
না জেনে অথবা বুঝি নির্মল হুজুগ একখানা
ঘরের বাইরে আনে, রথতলা পুতুলে ভরেছে
আমরা গিয়েছি পায়ে পায়ে কেনাকাটা হতে পারে ভেবে
তোমার পায়ের পদ্ম আমার বুকেই ফুটে আছে
ও আলুলায়িত কুন্তলের অনির্দেশ্য কালো
গভীর রহস্যে ভরে আছে চোখ সমস্ত শরীর
আমি পদরেখা ধরে পৌঁছে গিয়ে কড়া নাড়ি যদি
মায়াবী দরোজা খুলে কে দাঁড়াবে—ভুলে ফেলে-আসা
লাল নীল ব্যাগ—কেন ফেলে এসেছিলে
সঙ্কোচ এত কি বেশি—থাক, থাক রহস্য, সঙ্কোচ
অন্ধকার, আবছায়া—আজ মনে পড়ে তুমি শিল্পের উপমা
তুমি শিল্প, তোমার মুখের রেখা সম্পূর্ণ দেখি নি।

শাশ্বতী

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অযুত বৎসর শেষে পুনর্বার যেন দেখা হলো
যেন কতো মন্বন্তর ঘটে গেছে, যেন বহমান
সময় করেনি স্পর্শ, বাইরের কোনো কলরোলও
ভাঙেনি অন্তরশায়ী আকাঙ্খার স্পর্ধিত সম্মান।
ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অভ্যুত্থান স্বদেশে বিদেশে।
বিপ্লব সভ্যতা ধ্বংস, উত্থানের প্রবল বন্যায়
ভেসে গেছে সাম্রাজ্যের পূর্বতন সীমা, সর্বনেশে
রক্তস্রোতে ভাসমান নীতি ধর্ম ন্যায় বা অন্যায়।
অযুত বৎসর শেষে পুনর্বার তোমার আমার
দেখা হলো। কী আশ্চর্য! ঝরেনি সবুজ পত্রাবলী
সে দিনের গাছ হতে, ঝড়ের তাণ্ডবে পুষ্পভার
পড়েনি ছড়িয়ে দেখি পূর্ববৎ আছে সে সকলি
অথচ অন্তিম স্বর্গ শিরঃস্পর্শী যুগের বৃক্ষ কর।
অযুত বৎসর পরে—জেগে আছে প্রেম আমাদের।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারকার বার্ষিক স্মৃতিসভায় আগামী বৎসর (১৯৬৪) আচার্য শীলের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গত ছয় বৎসরে চার জন কীর্তিমান বাঙালির শতবার্ষিক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে মহা সমারোহে। আসছে বছর হবে আশুতোষ ও ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মের শতবার্ষিক অনুষ্ঠান।

যে বৎসর ভারতের শাসনভার বণিকের মানদণ্ড ও সৈনিকের তরবারি সজ্জিত শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় সে বৎসরই জন্মগ্রহণ করেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র। তিনি যখন আড়াই বৎসরের শিশু তখন এলেন রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এর মাত্র দেড় বৎসর পরে। তার পরের বৎসর জন্মগ্রহণ করেন আশুতোষ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রথম ছয় বৎসরে জন্মেছিলেন ছয়জন প্রতিভাবান অবিস্মরণীয় বাঙালি।

বয়সের যেমন তেমনি এঁদের অন্তরেরও যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের গভীরতা তাঁদের পত্রালাপের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গুরুদেব ও আচার্য শীলের মধ্যে শ্রদ্ধা বিনিময়ও সাহিত্যের বস্তু হয়ে রয়েছে। স্বামিজীর বিভিন্ন জীবনীতে তাঁর উপর ব্রজেন্দ্রনাথের প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে। আচার্য শীল বলতেন, "দেশে 'আনন্দ' আছেন অনেক, কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন মাত্র একজন।" জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বন্ধুতা ছিল অন্তরঙ্গ। এঁরা পরস্পরের প্রতিযোগী ছিলেন না, ছিলেন সহযোগী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান অবিস্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে যখন আশুতোষকে সব্যসাচীর মতো এক হাতে দেশী ও অপর হাতে জেন্‌স্ সাহেবের নেতৃত্বে বিদেশী পণ্ডিতদের আক্রমণ রুখতে হয়েছে তখন তাঁর সাহায্যে কোচবিহার থেকে ছুটে আসতেন ব্রজেন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী ও পাঠক্রম নির্ধারণে আচার্য শীলের দান অপরিসীম।

চন্দ্রচূড়ের জটাজালে আবদ্ধ গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে সাগরে নিয়ে এসেছিলেন ভগীরথ। এই মনীষীগণ মধ্যযুগীয় সংস্কারে আবদ্ধ, স্তব্ধ গতিহীন জাতিতে প্রাণ সঞ্চার করে নতুন পথ ধরে মহামানবের সাগরে নিয়ে যাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্যের ঐক্য এঁদেরকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করত। পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতির আক্রমণে নির্জীব সমাজ যখন দিশেহারা তখন বাইরের সংঘাতের সংগে আপোস রফা করে দেশকে নতুন পথের সন্ধান এঁরাই দিয়েছিলেন। আচার-ব্যবহারে, আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে এঁরা ছিলেন খাঁটি বাঙালি, কিন্তু চিন্তা ও কর্মে ইউরোপীয় আদর্শ এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতীয় আদর্শের প্রতি এঁদের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। রাজদরবারেও এঁরা উপস্থিত হতেন বাঙালির বেশে।

সন্ত্রাসবাদের যুগ। একদিকে তরুণ দেশপ্রেমিকরা ত্রাসের সঞ্চার করছে শাসকদের হৃদয়ে, অপরদিকে নিরপরাধ জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত সরকারের অত্যাচারে। সকালবেলা একদল ছাত্র এসেছে ডঃ শীলের বাসভবনে। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সংগে শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নাটকের

অভিনয় হবে। নির্বাচিত বইখানার জন্য অধ্যক্ষের অনু-মোদন আবশ্যক। তিনি বই নিয়ে শিক্ষকের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি বইটি পড়ে দেখবেন। ভারতের নৈতিক আদর্শ বিরোধী কোনো কথা যদি থাকে তাহলে বই অনুমোদন করবেন না।' সরকার বিরোধী কিছু আছে কি না তা দেখবার কথা উল্লেখ করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বেরিয়েছে। একটা গানে শাস্ত্রীয় বিতর্কে রত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের উপহাস করা হয়েছে। বিচার সভার আলোচনায় মত্ত পণ্ডিতদের কাছা খুলে গেছে, মাথার সংগে দীর্ঘ টিকি ঘন ঘন নড়ছে। এতে লেখক নিজের হাসিতে যোগ দেবার জন্য পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র ক্লাসে এসে বেদনার সুরে বললেন, 'যে জাতি শ্রদ্ধেয়দের বিদ্রূপ করে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

যে যুগে পিতাপুত্রের মধ্যে ইংরেজিতে চিঠিলেখা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় বলে গণ্য হত এবং ইংরেজি অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের সভায় গ্লাডষ্টোনী ঢঙে বক্তৃতা দিলে কোনো আপত্তি উঠত না সে সময় জগদীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষীগণ ছিলেন মাতৃভাষা বাংলার বিশেষ অনুরাগী। এরা বাঙালীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন, বাংলায় বক্তৃতা করতেন এবং বাংলায় বই লিখেছেন। আচার্য শীল বাংলায় কিছু লেখেননি বটে, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগও কম ছিল না। ছাত্ররা ইংরেজি লেখায় ভুল করলে তিনি ক্ষোভের সহিত বলতেন, 'আমাদের কি দুর্ভাগ্য! নিজের মনের কথা পরের ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।' বাংলা বি এ. পাঠ্যসূচিতে সবেমাত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশের ঘরে বাংলার অধ্যাপকের অধ্যাপনা শুনে ডঃ শীল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন' 'আমাদের আজ কি আনন্দ! কলেজে বাংলা পড়ানো হচ্ছে।'

জ্ঞান ও চিন্তার ধ্যানলোকে বাস করেও দেশের দরিদ্র, অসহায় ও নিপীড়িত জনগণের কথা এঁরা ভোলেন নি। সকালবেলা আচার্য রায় ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো থাকতেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন; দুপুরে অধ্যাপনা; বিকেল বেলাটা তিনি কাটাতেন দরিদ্র ছাত্র ও অন্যান্যদের পরামর্শ দান ও অভাব মোচনে। উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের হাহাকার তাঁর লেবরেটরীতে গিয়ে পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে এলেন তাদের সংকটত্রাণের জন্য। তাঁর আহ্বানে শিষ্য ও ভক্তরা এসে গেল দলে দলে কাজে যোগ দিতে। কিছু দিনের জন্য বিজ্ঞান কলেজ রূপান্তরিত হল সাহায্য শিবিরে। হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ সবার অভাব অভিযোগ শোনার জন্য প্রত্যহ সময় করে নিতেন। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের বাসভবনের দ্বার থাকত সদা উন্মুক্ত। দীনতম ব্যক্তিরও তাঁর সংগে আলাপে বাধা ছিল না। স্বামিজী, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মানব প্রেমের কথা সুবিদিত।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে এঁরা সবাই হাত দিয়েছিলেন মানুষ গড়ার কাজে। গড়ন্ত বয়সের তরুণদের শিক্ষাদান হয়েছিল এঁদের জীবনের ব্রত। পাঠদানের সময় শব্দের অর্থ ও বাক্যের ব্যাখ্যায় আচার্যদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকত না। বিদেশী ভাব ও চিন্তা বটের ঝুরির মতো শূন্যে ঝুলিয়ে না রেখে দেশের মাটি জলের সংগে তাদের যোগ সাধন করে দিতেন। তাঁদের শিক্ষার এই ছিল বৈশিষ্ট্য। ডঃ জনসনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য শীল বললেন, 'বাংলার সাহিত্য-বিচারে ঊনবিংশ শতকে বঙ্কিমের যে স্থান ছিল, অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডঃ জনসনেরও ছিল সেই স্থান। উভয়েই ছিলেন সাহিত্যের ডিক্টেটর বা একনায়ক।' বার্কের ফরাসী বিপ্লব পড়াবার সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনার সহিত বিপ্লবের প্রতি ঘটনার সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য দেখিয়ে দিতেন। জানার সংগে অজানার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ায় ছাত্রদের মনে হত তাদের চোখের সামনে যেন ফরাসী বিপ্লবের পুনরাভিনয় হচ্ছে। দেশের দোষ ত্রুটির কথা শুনে ছাত্রদের মুখ বিমর্ষ দেখালে তিনি

বলতেন, 'ভয় নেই, মানুষ হও, তোমরা দেশকে গৌরবমণ্ডিত করবে।' এঁদের প্রতি কথায় থাকত দেশপ্রেমের মন্ত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটরি থেকে বিজ্ঞানীর সংগে সংগে বেরিয়ে আসতেন দেশপ্রেমিক ও দেশকর্মী।

'আচার্য' উপাধির ভিতর দিয়ে এই তিন মহান শিক্ষকের শিক্ষা পদ্ধতির স্বীকৃতি দিয়েছে দেশবাসী। আচার্য রবীন্দ্রনাথ 'গুরুদেব' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন না, কিন্তু তিনি অধ্যাপক তৈরী করেছেন। রমণ ও রাধাকৃষ্ণণ তাঁরই আবিষ্কার। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করে আশুতোষ সে সব বাধা অপসারিত করেছেন। বহু শতাব্দির সুপ্ত ভারত স্বামিজীর আহ্বানে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বসভায় ভারতের জন্য গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করেন এঁরাই প্রথম। সিকাগোর ধর্ম্মমহাসভার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমী জনগণের ভুল ভেঙে দেন। সেদিন তারা বুঝেছিল ভারত শুধু সাপ, জাদুকর, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার দেশ নয়; মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসার উত্তরও সেখানেই পাওয়া যায়। রোমক সেনাপতির মতো স্বামিজী বলতে পারতেন, 'এসেছি, দেখেছি, জয় করেছি।' তার ছয় বৎসর পরে আমন্ত্রিত হয়ে আচার্য শীল যান রোমে প্রাচ্য-বিদ্দের মহাসভায়। সেখানে তাঁর ভাষণে তিনি বৈষ্ণব ও খ্রীস্ট ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং খ্রীস্ট ধর্ম্মের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবের প্রমাণ দিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে পৃথিবীর সকল জাতির এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার উদ্বোধক ছিলেন আচার্য শীল। উদ্বোধনী ভাষণের বিষয় ছিল গোষ্ঠী, খণ্ডজাতি ও জাতি। জীববিজ্ঞানীদের মতে জীববিদ্যার গবেষণা ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে এই সভায় তিনি প্রস্তাব করেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ মীমাংসার যে উপায় সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন জাতির বিরোধও সেই উপায়েই মীমাংসিত হওয়া উচিত।

জীব ও জড়ের মধ্যে সীমারেখার সন্ধানে যারা ব্যাপৃত আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা তারা ভুলতে পারবেন না। বেতারের ইতিহাসে জগদীশচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কয়েকটি রাসায়নিক যৌগিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে প্রফুল্লচন্দ্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। নোবেল পুরস্কার লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ভারতকে গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

যে কয়জন মনীষীর প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হল তাঁদের মধ্যে আচার্য শীলই জনসাধারণের নিকট সবচেয়ে স্বল্প পরিচিত। তাঁর নাম শোনেন নি এমন শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী-দের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথ

দেহের গঠনে আচার্য শীল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের সমশ্রেণীর। স্থূল ও উন্নতকায় ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখামাত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার হত। তাঁর বক্ষবিলম্বিত শ্বেতকৃষ্ণ সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি ভারতের ঋষিদিগকে স্মরণ করিয়ে দিত। দেহের তুলনায় তাঁর মস্তকের আকার ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। মস্তকের অনুন্নত পশ্চাদ্‌ভাগ গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত প্রায় এক সমতল গঠন করেছিল। মাথার তিন দিক ঘিরে সরল কাল কেশ আর উপরিভাগ কেশহীন। ভাসা চক্ষু দুটিতে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, আর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি। দার্শনিকের অচঞ্চল ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি তাঁর ছিল না। সুনিপুন অভিনেতার মতো প্রতিটি চিন্তা ও ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠত। অমন অনাবিল উচ্চহাসি আর কাউকে হাসতে দেখি নি। হাঁটতে

অনভ্যস্ত লোকের মতো মাটিতে জুতো ঘষতে ঘষতে সামনে ঝুঁকে চলার অভ্যাস তাঁর ছিল। একঘোড়ার ব্রুহাম গাড়ি ছাড়া কখনোও পথ চলতেন না।

বিপত্নীক শীল কোচবিহারে ছিলেন এক কন্যা, তিন পুত্র, জনৈকা প্রৌঢ়া আত্মীয়া ও পরিচারক নিয়ে। বসবার ঘরটি ছিল অনাড়ম্বর। ফরাসে ঢাকা তক্তপোশের উপর একটি ছোট তাকিয়া, আগন্তুকদের জন্য দু'খানা সাধারণ কাঠের চেয়ার. ঘরের এক কোনে একটি অব্যবহৃত টেবিল আর দেয়ালের গায়ে ছোট একটি র‍্যাক্। র‍্যাকে চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত একখণ্ড বিদ্যাসাগর-চরিত, বিরাজ সেনগুপ্তের বনৌষধি দর্পণ আর দু'চারিটি ছোটোখাটো বই। তিনি বসতেন ফরাসের উপর। কলকাতার রামমোহন সাহা লেনের বাড়ীতে বসবার ঘরে অনুরূপ ব্যবস্থাই ছিল। একা যখন থাকতেন তাকিয়ার উপর বুক রেখে শায়িত অবস্থায় কিছু পাঠ করতেন। আলাপের সময় উঠে বসতেন। সকাল থেকে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত তাঁর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকত।

তাঁর হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল যেন তাঁর রক্ষক। সন্ধ্যা সাতটায় ছাত্রদের সঙ্গে দর্শণ নিয়ে আলাপ সুরু করবেন। সে এসে বললে, 'আপনি আগে খেয়ে নিন।' ভৃত্য মুখে লুচি পুরে দিতে লাগল। একটু পরে মুখ ফেরালেন। সে বলল, 'না, আপনার পেট ভরে নি।' আবার খেলেন। কলেজে যাবার সময় হলে এই ভৃত্যই তাঁকে চোগা-চাপকান ও মোগলাই পাগড়ি পরিয়ে গাড়িতে তুলে দিত। জ্ঞানতপস্বীর বাস ছিল জ্ঞানলোকে। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ বিষয় ছিল তাঁর চিন্তার বাইরে।

পাণ্ডিত্যের চাপে তাঁর অন্তরের কোমলতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। পূজার অবকাশের পর বাংলার অধ্যাপক দাশরথী বাবুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি শোকাতুরা জননীর মতো অভিভূত হয়ে পড়েন। যে সব ছেলে ছুটির পরে ফিরে আসেনি তারা সুস্থ আছে কিনা জানবার জন্য তাদের বাড়ীতে চিঠি দেবার আদেশ দিতেন।

তাঁর হৃদয়ের কোমলতা কখনোও মনের দুর্ব্বলতায় পরিণত হয় নি। বি. এ. পরীক্ষার সময় আরদালির ঘন্টা বাজাতে পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গেল। এই অপরাধে সে কর্ম্মচ্যুত হ'ল। কলেজের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়ে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর এক সুদর্শন ছাত্র রাজকুমারের সংগে প্রমোদ বিহারে দিন কাটাবার অপরাধে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোচবিহার থেকে বহিষ্কৃত করে দেন।

শেষ বিদায় গ্রহণ করবার সময় ছেলেদের উপদেশ দিতেন, "কোনো মানুষকে ঘৃণা কোরো না।" নিজের জীবনে তিনি তা পালন করে চলতেন। একবার এক নারী এসেছেন সাহায্যের জন্য। তাকে দুটি টাকা দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমি গরীব এর বেশী দেবার সাধ্য আমার নেই'। ছেলেরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হলে তাদের বসাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁক ডাক করে চেয়ার আনাতেন। যতক্ষণ তারা না বসবে ততক্ষণ কথা বলতেন না। কলেজে খবর এল তাঁর হিন্দুস্থানী ভৃত্য কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। তাকে দেখবার জন্য হাসপাতালে ছুটে গেলেন। তার জন্য আচার্য শীলের কতই না উৎকণ্ঠা। সে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ভৃত্য যাবে দেশে। মনিব রেল স্টেশনে তাকে বিদায় দেবার জন্য উপস্থিত। যতক্ষণ না গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ততক্ষণ এই মহা-পণ্ডিত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিরক্ষর হিন্দুস্থানীর দিকে চেয়ে রইলেন।

ছাত্রদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতো। ছাত্রাবাসে আহারের ভালো ব্যবস্থা হয় না জেনে একদিন তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। খাদ্যতালিকার কথা শুনে বললেন, "এই খেয়ে শরীর রক্ষা পাবে কি করে, পড়াশুনাই বা কি করে করবে?" নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল। পনেরো দিন

পরে পোলাও এবং মাংসের ভোজ হবে শুনে তাঁর কি আনন্দ! রান্নার জন্য নিজের পাচককে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, 'শুনেছি আমার ঠাকুর নাকি আগে তামাক বেচত। এখন সে কোচবিহারে ঠাকুরের সেরা'। মকর সংক্রান্তিতে রাজ কর্ম্মচারীদের তিলের পাটালি বরাদ্দ ছিল। তাঁর বরাদ্দ সাড়ে সাত সের। ছেলেরা গিয়ে তাঁর বরাদ্দের কার্ডখানা চাইলো। বালকের মতো সরল হাসি হেসে তা দিয়ে দিলেন। ছাত্রদের লেখায় ভুল হলে দুঃখ করতেন; তিরস্কার করতেন না। লোকে বলত, তিনি ব্রাহ্ম। তিনি বলতেন 'আমি সংস্কারমুক্ত হিন্দু।' সরস্বতী পূজায় চাঁদা দেবার সময় বলে দিতেন, তাঁর টাকা যেন দরিদ্রের সেবায় ব্যয়িত হয়।

সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ব্রজেন্দ্রনাথ

এক সভায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল যে আচার্য শীল একজন জীবন্ত ও চলমান বিশ্বকোষ বিশেষ। তিনি পরে বলেছিলেন, "এরা মনে করে আমাকে বিশ্বকোষ আখ্যা দিয়ে আমার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হল। আমি নিজে এটা অপমান বলে বোধ করি। আমি অভিধানের বিষয় অভিধানেই রেখে দিয়ে থাকি।' বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ থাকে। আচার্য শীলের বিদ্যা বিভিন্ন ব্যক্তির মতবাদ সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। তিনি কোনো বিষয় কণ্ঠস্থ না করে আত্মস্থ করতেন। এজন্য বিশ্বকোষ বলায় তিনি অপমানিত বোধ করেছেন।

জন্ম মৃত্যু, ইহলোক-পরলোক, সুখ দুঃখ পাপ-পুণ্য, সৃষ্টি ও প্রলয়, স্রষ্টার স্বরূপ প্রভৃতি দর্শনের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন দার্শনিকগণের ব্যক্তিগত চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ছিল তাঁদের মতবাদের ভিত্তি। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি পুরুষ, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কপিলের নিজস্ব চিন্তার ফল। আধুনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় অধিকার লাভ আবশ্যক মনে করেছিলেন। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র ভূগোল ও পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে সন্তুষ্ট না হয়ে নিজে গিয়েছিলেন ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে। আচার্য শীলও সেরূপ অপরের কথার উপর নির্ভর না করে স্বয়ং সকল বিদ্যার চর্চা করেছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি যে পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে চল্লিশ বৎসর বয়স না হতেই তিনি এত বিদ্যা আধিগত করলেন কি করে! তিনি একদিন নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। "If you follow the geometrical method, the Euclidian method, there is no sebject under the sun which cannot be mastered," (যদি তুমি জ্যামিতির ইউক্লিডের, পদ্ধতি অনুসরণ কর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন বিদ্যা নেই যা আয়ত্ত করা যায় না)। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফরাসী, জার্মাণ, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি দশ-এগারোটি ভাষা আয়ত্ত করে বিভিন্ন বিদ্যায় অধিকার লাভ করেছিলেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তিনি তাঁর পিতা জেম্‌স্ মিলের বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির গুণে তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শিখতে আরম্ভ করেন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। আমাদের আচার্য শীলের বালক বয়সে কৃতিত্বের জন্য তিনি কার কাছে ঋণী ছিলেন তা জানবার কৌতুহল সকলেরই আছে। শোনা যায় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখে গেছেন। শতবার্ষিকী সমিতি যদি তা প্রকাশ করেন দেশবাসী বিশেষ উপকৃত হবে।

শিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ

ডঃ শীলের পাণ্ডিত্যের পূর্ণ ফললাভে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর

তাঁর কর্ম জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠাংশ অতিবাহিত হয়েছিল বহরমপুর ও কোচবিহারের নির্বাসনে। এই নির্জীব ও নিষ্পন্দ শহর দুটিতে তাঁর কথা শোনবার ও বোঝবার মতো লোক ছিল না। সেখানে তাঁর সময় কেটেছে নিঃসঙ্গতায় নিষ্ফলতায়। বহরমপুরে হরকান্ত ভট্টাচার্য নামে টোলের এক ছাত্রকে ডেকে এনে বেদান্ত সম্বন্ধ কথা বলতেন। এ যেন তাঁর সরব চিন্তা। মৃণ্ময় মূর্তি সামনে রেখে একলব্যের অস্ত্রশিক্ষার মতো তিনি হরকান্তকে সামনে রেখে নিজে নিজে উপনিষদ ও বেদান্তের আলোচনা করে যেতেন। ঋষির নাম অক্ষপাদ কেন হল তার উত্তর দিতেন। কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন কোচবিহার রাজসরকারের একজন কর্মচারী। তিনি শংকরের ভাষ্য নিয়ে সিতানাথ তত্ত্বভূষণের সহিত এক দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। তারপর লেখেন উপনিষদের উপদেশ। আচার্য শীল এঁর সংগে মাঝে মাঝে আলাপ করতেন। ইংরেজীর অধ্যাপক জয়গোপালবাবুকে পাঠ করে শোনাতেন স্বরচিত ইংরেজী কবিতা। অস্নাতক ছাত্রদের দিনের পর দিন পড়ানো ছিল নিঃসঙ্গতার চেয়ে বেশী বেদনা-দায়ক। এ ছিল অরসিকের কাছে রসের নিবেদনের মতো। যাদের জীবনের উদ্দেশ্য কোনোমতে পাশ করে অর্থের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া তারা এই মহামনীষীর দেশপ্রেম, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত অবান্তর বলে গণ্য করত।

আচার্য শীলের অধ্যাপনা ছিল অনন্যসাধারণ। আপন-ভোলা মানুষ, যখন পড়াতেন পড়ার মধ্যে সমস্ত শক্তি ঢেলে দিতেন। উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছেন কিনা এ বোধ তাঁর থাকত না। তিনি পাঠ্য-পুস্তকের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে আলোচ্য বিষয়ের উপর জোর দিতেন। বিষয়টি সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার চেষ্টা করা হত। কাব্য সম্বন্ধে জনসনের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এরিষ্টটলের মূল 'Poetics' (কাব্য বিচার) গ্রন্থ আনা হল। গ্রীক থেকে অনুবাদ করে শোনালেন। অবশেষে বললেন, "এখন 'সাহিত্য দর্পণ' পড়ে শোনালে ঠিক হত।" দর্শনের অধ্যাপনাতেও অনুরূপ রীতি অনুসৃত হত। তাঁর তন্ময়তা ও রসবোধ ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত না হয়ে পারত না। তাঁর অধ্যাপনা উত্তেজক টনিকের মতো কাজ করত।

লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার লিখেছেন, 'এই মহাপণ্ডিত নিজে কিছু লেখেন না কিন্তু বাঙালি পণ্ডিতদের লেখার প্রেরণা যোগান তিনি।' কেন তিনি বই লেখেন না আচার্য শীলকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নতুন কিছু লেখার নেই বলে।

তিনি দার্শনিক বলে পরিচিত কিন্তু দর্শন সম্বন্ধে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। শোনা যায় তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকায় তাঁর রচিত ছয় খানা গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এদের নাম ও প্রকাশ-কাল এখানে দেওয়া হল—

1. A memoir on the co-efficients of numbers. 1891.
2. Comparative studies in Vaisnavism and Christianity. 1899.
3. New essays in Criticism. 1903.
4. The Quest Eternal. 1936.
5. Ram Mohan Roy. 1956.
6. The positive sciences of the ancient Hindus. 1958.

এ ছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে Atomic theory of the Hindus নামে অধ্যায়টি তাঁর লেখা। এই গ্রন্থে আচার্য শীলের নিবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১১ সনে লণ্ডনের মহাসভায়

জীববিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তার সারমর্ম সে যুগের 'Dacca Review' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনকার Modern Review-তে-এ সবের পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য শীলের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার সম্পর্কে ধারণার পক্ষে এ সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধই যথেষ্ট। গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য দর্শন, বস্তুবিজ্ঞান, রাসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় এ সকল গ্রন্থে।

জনসাধারণের নিকট অপরিচিত কেন

বাঙালি মনীষার চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে। দেশে বিদেশে তিনি বাঙালির মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ রূপায়নে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর সাধনে এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের মূল্য অপরিসীম। এ সব সত্ত্বেও বাংলা দেশের জনসাধারণের নিকট তিনি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। এর কারণ নির্দেশ করা কঠিন নয়। তিনি ছিলেন নিউটনের মতো বিনয়ী ও আত্মপ্রচারে বিমুখ। তিনি নিজে পণ্ডিত, যা কিছু লিখেছেন তাও পণ্ডিতদের জন্য। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু যেমন সাধারণের নাগালের বাইরে তেমনি তাঁর ভাষাও কঠিন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকতা থেকে দূরে। সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে কয়েক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হয়ে চলে যান মহিশূরে। মহিশূর থেকে ফিরে এসে জরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এঁদের জীবন ও সাধনা আমাদের চিন্তা ও কর্মে প্রেরণা জোগাবে, এঁদের গুণকীর্তন করে ও স্মরণ করে আমরা ধন্য হব।

স্যার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী

[জন্ম ১৮৬৪, ৩রা সেপ্টেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩৮ ৩রা ডিসেম্বর : ৭৪ বৎসর তিনমাস]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে জাতীয়-আন্দোলন, বাংলাদেশে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে সংক্রামিত হইয়া পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ সেই বিরাট আন্দোলনের একজন প্রথম ও প্রধান সূত্রধার (খ)। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন সহপাঠী ('Fellow-Student') এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। স্বামীজীর সম্মুখে আদর্শ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আর ব্রজেন্দ্রনাথের সম্মুখে আদর্শ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। স্বামীজী যেমন রাজা রামমোহনকে বর্তমান যুগের প্রবর্তক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজার নিকট হইতে (ক) বেদান্ত (খ) হিন্দুমুসলমান একতা (গ) স্বদেশ-প্রেম শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—আবার অন্য পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবকে নরদেহে দেবতা (Divine Man) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৯৮ খ্রীঃ বিপিনচন্দ্র যখন বিলাত গমন করেন, তার পূর্ব্ব হইতেই বিপিনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বাঙালীর বর্তমান শতাব্দীর নূতন জাতীয়তাবোধের স্বরূপ বুঝিতে আরম্ভ করেন। যে দার্শনিক ভিত্তির উপর বিপিনচন্দ্র বাঙালীর জাতীয়তাবোধের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূলে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। স্বামীজীর যিনি এতবড় একজন গুণগ্রাহী বন্ধু. শতাব্দীর ১ম দশকে বিপিনচন্দ্রের চিন্তাস্রোতের মধ্যদিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। ব্রজেন্দ্রনাথ এই নূতন জাতীয়তাবোধের একজন স্রষ্টা। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের

বিস্তার ও গভীরতা আলোচনা করিবার মত শক্তি আমার নাই। আর যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

বিপিনচন্দ্রের 'নিউইণ্ডিয়া'র যে মতবাদ, তার মূলেও ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপিনচন্দ্র 'নিউইণ্ডিয়া' লিখিতেন।

যে বৎসর বিপিনচন্দ্র বিলাত যান ঠিক তার পরের বৎসর (১৮৯৯ খ্রীঃ) ব্রজেন্দ্রনাথ যান রোমে। রোমে সে-বৎসর প্রাচ্যদেশীয়দের এক কংগ্রেস হয় (Orientalists' Congress)। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাচ্যদেশীয়দের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ নিমন্ত্রিত হন। বিবেকানন্দ-বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ সেদিন উপযুক্ত সম্মান পাইয়াছিলেন। চিকাগো ও রোম গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে দুই বাঙ্গালী যুবকের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সহরে আমেরিকাবাসী স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছেন অদ্বৈত বেদান্ত অথবা শাঙ্কর বেদান্ত। তার ছয় বৎসর পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে প্রাচ্যদেশীয়দের কংগ্রেস ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছে হিন্দুর বৈষ্ণব ধর্ম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম। কিন্তু কি বিবেকানন্দ কি ব্রজেন্দ্রনাথ, কেহই হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম বিশেষতঃ বাঙালীর তান্ত্রিক অথবা শাক্তধর্মের অপূর্ব তত্ত্বের কথা কহেন নাই। জানিয়াও তাঁহারা হয়তো বিদেশে ইহা প্রচার করেন নাই। কিন্তু রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া অরবিন্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর তন্ত্রে হোমশিখা সমান প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তান্ত্রিক ছিলেন। বাঙ্গালীর তন্ত্রে, তত্ত্বে ও সাধনে রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিগত শতাব্দীর প্রথম ও শেষে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। বিগতশতাব্দীতে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর তন্ত্রের ধারক ও বাহক শুধু নয়, পরন্তু জীবন্ত বিগ্রহ।

ব্রজেন্দ্রনাথের কথা হইতেছে। তিনি রোমে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের রস-তত্ত্বব্যাখ্যা করিলেন। সেই প্রাচ্যদেশীয় বিদ্বৎ-জনমণ্ডলী ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের রস-তত্ত্বের বিশ্লেষণ শুনিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। (*গ)

বাঙ্গালী উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুগল-প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রজেন্দ্রনাথের এই বৈষ্ণব ভাব—বিপিনচন্দ্রে সংক্রামিত হইয়াছে। এবং বিপিনচন্দ্রের বৈষ্ণব ভাব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে সংক্রামিত হইয়াছে। কিন্তু তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির ভূমিতে একই বৈষ্ণব ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনটি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। একই ধর্ম্ম বিভিন্ন স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। ব্রজেন্দ্রনাথের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

(*ঘ) "His (Brojendranath) was the talk that inspired and rationalised the political thought and activity that has come to be known in history as the Nationalist Movement in the first decade of the present century that had Rabindranath Tagore for its minstrel, and Upadhyaya Brahmabandhav and Bipin Chandra Pal for its philosophay and preachers.

"And when we know that Acharya Brojendra Nath Seal was a fellow student of Swami Vivekananda, there appears to be a fitness of time and place and circumstances in which he played his part in the evolution of thought that has re-made India since the eighties of the last century. Those years were marked

by a *revolt of educated India* against the values that British method of administration and enlightenment had introduced in India.

* * * *

"Glimmerings of this message of India's storied past had begun to reach the educated men and women of India when the generation to which Swami Vivekananda and Dr Brajendra Nath Seal belonged was called upon to take up the destiny of their country in their own hands. In this work the former found his inspiration in the life of Ramkrishna Paramhansa Dev and the latter in the life and thought of Raja Rammohan Roy. From certain points of view these two men can be regarded as the confluence where met the East and the West. They are representatives of the attempt of an old social polity to reform itself under the stress and strain of an alien invasion into the region of thought and into the region of active life. Brojendra Nath Seal interpreted this spiritual travail, and in this interpretation contributed his best to the enrichment of the life of modern Bengal, of modern India. This is his title to glory." [Hindusthan Standard Dec 4, 1938].

[শ্রীগিরিজাশংকর রায় চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ' গ্রন্থ হইতে সংকলিত। পৃঃ ২৬৩-২৬৬ ।]

আচার্য শীলের প্রশ্নোত্তর

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম .এ. পি. এইচ. ডি.

বিগত ১৩৩৭ সালের ১৫ই আশ্বিন বিজয়া দশমী দিবসে আচার্যদেব স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি তখন পীড়িত হইয়া ভবানীপুরে তাঁহার কন্যার গৃহে বাস করিতেছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ দীর্ঘকাল বাক্যালাপ করা চিকিৎসকদের নিষেধ ছিল। মাত্র আধঘণ্টাখানেক তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইয়াছিল।

বাংলার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত সমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তাঁহার কতিপয় ছাত্র এবং বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অন্য অনেকেরই নাই। যুগপৎ এত বহু বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য একজনের থাকিতে পারে ইহা ব্রজেন্দ্রনাথকে না জানিলে বিশ্বাস করাই দুষ্কর হইত। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের আভাস তাঁহার "Positive Sciences of the Hindus" গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের সাহিত্য,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুবিধ ভাষা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সমাজবিজ্ঞান এবং সর্বোপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আছে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কোন গ্রন্থ তাঁহার নাই। জাগতিক দৃষ্টিতে ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা পরিতাপের বিষয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের চিন্তা ও গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইলে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হইত, জগতের দর্শন-ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব তেমনিই বৃদ্ধি পাইত। সুতরাং তাঁহার অসামান্য দান হইতে বঞ্চিত হওয়া ভারতের পক্ষে একটা মহা দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে হয়।

কি কারণে তিনি দর্শন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিলেন না, ইহা জানার ঔৎসুক্য অনেকেরই হয়। আমার সঙ্গে প্রধানতঃ এই বিষয়ে ও অন্য কয়েকটি বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। বাংলার এই প্রবীণ মনীষীর মতামত জানার আগ্রহ অনেকেরই আছে। সেই জন্য এই কথোপকথনটির ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা উচিত মনে হইল।

কথোপকথনকালে আমার সঙ্গে আচার্যদেবের অন্যতম ছাত্র ও প্রিয় শিষ্য বোম্বাই প্রদেশস্থ তত্ত্বজ্ঞান-মন্দিরের (Institute of Philosophyর) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ও ছিলেন। তিনজনের মধ্যেই কথাবার্তা হয়। আমরা মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করি এবং তদুত্তরে আচার্যদেব অনেক কথা বলেন। অনেক বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকিয়া গেলেও তাঁহার অসুস্থতার জন্য অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সঙ্গত মনে হইল না।

প্রথমতঃ কুশল মঙ্গল ও ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের পর আচার্যদেব দর্শন ও রাষ্ট্রনীতির কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে দর্শনের ক্ষেত্র অতিব্যাপক। রাষ্ট্রনীতিও দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। রাষ্ট্রনীতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, সুতরাং উহার দৃষ্টিও ক্ষুদ্র, সীমানিবদ্ধ। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ড, বিষয়-বিশেষের সীমায় উহা আবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতার আবেগে মানুষ ভুলভ্রান্তি করিতে পারে, তবে স্বাধীনভাবে ভুল-সংশোধন করিবার শক্তিও অর্জন করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। ইহা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে সহায়ক একটা উপায় মাত্র। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন হইয়া পরে কি করিব, কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিব ইহা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ভুলিয়া গেলে স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া মানুষ এমন উপায় অবলম্বন করে যাহাতে স্বাধীনতা তাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে সহায়ক না হইয়া বিঘ্নকারকই হইয়া উঠে। কিন্তু স্বাধীনতাকে জীবনের উদ্দেশ্য না ভাবিয়া একটা উপায় বলিয়া বিবেচনা করিলে এই অনর্থ ঘটে না। দর্শনের দৃষ্টি বা সমগ্রের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে দেখিলে ইহাদের এই যথার্থ স্থান সহজেই উপলব্ধ হয়।

ইহার পর আমি বলিলাম, "আপনার অসীম পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কোনই ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন না। আপনার দর্শন সাধনার কোনই চিহ্ন রহিল না, ইহা ভারতের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্য।"

উত্তরে আচার্যদেব বলিলেন, "দর্শন সম্বন্ধে আমার লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুইবার দুটি দৈবদুর্বিপাকে তাহা লেখা হইল না। জার্মান দার্শনিক 'ভুণ্ড্' (Wundt) পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসমূহে যে-সব সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সমস্ত বিবেচনা করিয়া ও সমন্বয় করিয়া মনে মনে নিজে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম এবং তদনুযায়ী একটা দর্শনের রূপ আমার মনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহা লিখিয়া ফেলিব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় আইনস্টাইনের নূতন মতবাদ প্রচারিত হইল। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের পুরাতন মতসকলও পরিবর্তিত হইল। নূতন

বিজ্ঞানের সহিত আমার সিদ্ধান্তের অসামঞ্জস্য ঘটিল। ফলে নিজ সিদ্ধান্তে অনাস্থা আসিল। যে মতের প্রতি আমার আস্থা নাই তাহা প্রচার করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম না। এই আমার প্রথম দুর্বিপাক। ইহার পরে নূতন বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম। আইন্‌স্টাইন্ চার Dimensions এর মত প্রচার করিয়াছেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যাহাকে চার Dimensions দ্বারা বুঝান যায় না, পাঁচ Dimensions এর প্রয়োজন হয়। পরে আরও সূক্ষ্ম কতকগুলি তত্ত্ব দেখিয়া ছয় Dimensions এর প্রয়োজন বোধ হইল। কিন্তু আরও ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, যে-বস্তুতঃ চার, পাঁচ বা ছয়-এর ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট Dimensions ঠিক নয়। অনির্দ্দিষ্ট 'n' সংখ্যক Dimensionsই সত্য। মানুষের অভিজ্ঞতার এক একটা বিশেষ সংখ্যক স্তরের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এক-একটা বিশেষ সংখ্যক Dimensions এর প্রয়োজন হয়। ছয়-এর উর্দ্ধে কোন Dimensions এর প্রয়োজন হয় এমন কোন তত্ত্বের সন্ধান অদ্যাপি পাই নাই। তবে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার রাজ্যে ইহার চেয়ে বেশী Dimensions এর প্রয়োজন না হইলেও ইহা হইতে উচ্চ কোন Dimensions এর কোন সময় প্রয়োজন হইবে না, ইহা ভাবার কারণ নাই। Dimensions এর সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

তিনি পরে বলিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূরে কোনও বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতিরূপে আমি এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে পুস্তকাকারে আমার মত লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল। এমন সময় হঠাৎ আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। ফলে ইহাও লিখা হইল না। এই আমার দ্বিতীয় দুর্বিপাক। এইরূপে দুইবার বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে আমার লেখা আর হইল না।"

আমরা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হওয়াতে তিনি বলিলেন, "ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমার ভিতরে যে-সব চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা এই যুগেরই ভাব, এবং ইহা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয় ইহা ভূমারই ভাব ব্যক্তি-বিশেষের ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং যাহা আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্য আধারে প্রকাশিত হইয়া যাইবে। সম্প্রতি শুনিলাম এক-জন বৈজ্ঞানিক পাঁচ Dimensions এর কথা বলিতেছেন।"

তখন আমি বলিলাম—"আপনার কথা ঠিক হইলেও ইহা ত অস্বীকার করা যায় না যে, পাত্রভেদে অভিব্যক্তির তারতম্য ঘটা সম্ভব। আপনার মত আধারে ভূমার ভাব যত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইত তত পূর্ণভাবে অন্যের ভিতরে প্রকাশিত না হওয়াই সম্ভব।"

তিনি উত্তরে বলিলেন, "তা সত্য বটে। তবে আমরা বুদ্‌বুদ্ মাত্র। একটু বড় বুদ্‌বুদ্, কেউ একটু ছোট। এই যা পার্থক্য।"

আমি বলিলাম, "আজকাল আমাদের দেশে ও অন্যত্র জ্ঞানের এক-একটি বিশেষ বিশেষ শাখায় অনেক বিশেষজ্ঞ হইতেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ মাত্র রাখেন। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগে আবিষ্কৃত সকল সত্যের সমন্বয় করিয়া সমগ্র সত্যরাজ্য সম্বন্ধে কোন দর্শন রচনা করা এই খণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। আপনার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী পণ্ডিত ভিন্ন কেহই এইকাজ করিতে পারিবে না। জগতে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমুখী পাণ্ডিত্য যে ক্রমেই অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই আমাদের নৈরাশ্য হইতেছে; আপনি যাহা করিতে পারিতেন, তাহা অন্য কারও দ্বারা হয়ত সম্ভবপর হইবে না।"

ইহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন,—'বর্ত্তমান যুগে বিশেষজ্ঞদেরই প্রাধান্য বাড়িতেছে ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষ

কোন দিনই বিশেষজ্ঞের খণ্ডদৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিবে না, ভারতের দৃষ্টি সর্ব্বদাই অখণ্ড ও ব্যাপক (synthetic) ছিল; খণ্ড দৃষ্টিতে ভারত কোনদিনই সন্তুষ্ট থাকে নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, বর্ত্তমানেও ভারত বিজ্ঞান সাধনায় খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। জগদীশচন্দ্র প্রথমতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে গবেষণা আরম্ভ করেন। এখন তিনি এমন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন ও এমন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন যে, উহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানের মধ্যে একটি যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক রামনও প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য লইয়া আবিষ্কার আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে-সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে একটা ব্যাপক দৃষ্টি আছে। ভারতীয় সভ্যতার এই বিশেষত্ব কোনদিনই খণ্ডদৃষ্টির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। অখণ্ড-দৃষ্টি সম্পন্ন দর্শন-রচনাও অসম্ভব হইবে না।"

আমি বলিলাম—"তাহা সত্য হইলেও কবে ইহা হইবে তাহা অনিশ্চিত।"

উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন—"বাল্যকাল হইতেই আমার একটা ধারণা ছিল, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই আমার চর্চ্চার বিষয় (every knowledge is my province)। সেইজন্য জীবনের সকল বিষয়েই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে; অনেক বিষয়েরই চর্চা করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। জ্ঞানও সেবার যে সুযোগ ও অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমি ধন্য ও পরিতৃপ্ত। ইহার অন্য কোন ফল লাভ হইল না বলিয়া আমার কোনই দুঃখ নাই। সেবা নিষ্ফল হইবে না।"

ইত্যবসরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি আত্মার অমরত্ব এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"জন্মান্তর বাদ একটা সম্ভবপর সিদ্ধান্ত। (is a possible hypothesis)। খ্রীস্টানরা মনে করেন এক জীবনের পরীক্ষার উপরেই জীব হয় অনন্ত নরকে, নয় অনন্ত স্বর্গে গমন করে। এই মত অপেক্ষা জন্মান্তরবাদ অধিক যুক্তিযুক্ত। আত্মা আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে না কিনা এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকিলেও আত্মার যে ধ্বংস নাই ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এই পৃথিবীতে বা অন্যগ্রহে, মানবরূপে বা অন্যরূপে আত্মার অস্তিত্ব যে থাকিবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আত্মা শাশ্বত, অনন্ত ভূমারই প্রকাশ মাত্র। এই শাশ্বত পদার্থের সাক্ষাৎ অনুভূতি আজকাল করিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভূমার অনুভূতি হইতেছে। তাহাতেই যেন আত্মা মগ্ন হইয়া আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই অনন্ত শাশ্বত পদার্থের অনুভূতি আপনার কিভাবে হইতেছে? অদ্বৈতিগণ বলেন—'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম।' আপনার কি ঐ প্রকার বোধ হইতেছে?"

আচার্য্যদেব বলিলেন—"অদ্বৈতিগণ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় গতিহীন (static) বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমি যে-ভূমার অপরোক্ষানুভূতি করিতেছি তাহা তেমন নয়; তাহা গতিশীল, ক্রিয়াশীল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে এই অনন্ত শাশ্বত গতিশীল পদার্থের অনুভূতি আপনি কিসের ভিতর দিয়া পাইতেছেন? সাক্ষি-চৈতন্যের ভিতর দিয়া ইহার অনুভূতি হয় কি? বার্গসঁর মত জীবন বা প্রাণের অনুভূতির ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ হয়?"

অধ্যাপক দাশ মহাশয় বলিলেন—"বোধহয় প্রাণানুভূতির ভিতর দিয়া।"

উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন—"এই নিত্য পদার্থের অনুভূতি কিরূপ ও কিভাবে ইহা হয় এই ভাব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাষায় প্রকাশ

করিতে পারিতেছি না। সাক্ষাৎ অনুভূতি ভিন্ন ইহা বুঝা কঠিন। ভূমার এই অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি এখন প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। ইহাতে আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। এই অনুভূতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। পূর্ব্বে আমার বহুদিন বিশ্বাস ছিল, ভূমার মধ্যে এই জাগতিক জীবনের সকল আনন্দ ও সকল অনুভূতি একটা স্থান পাইবে। এই সবও কোনও প্রকারে রক্ষিত হইবে। কিন্তু এখন ভূমার যে অনুভূতি হইতেছে তাহাতে এই সবের কোনই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। (এই সমস্তই যেন একেবারে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।) এই অনুভূতির এমন একটা জোর আছে যে, যে উহার সম্বন্ধে কোনও সংশয় মনে আসিতেই পারে না। এই অনুভূতির সামনে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা যেন দাঁড়াইতেই পারে না ; এই সব অতি তুচ্ছ মনে হয়। দৈনন্দিন জগতের সহিত এই অনুভূতির জগতের কোনই সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই না। এই দুই জগৎ যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন (discontinuous)। দৈনন্দিন জগৎটা একেবারে মিথ্যা এইকথা বলিতে চাই না। এক হিসাবে ইহাও অনন্ত। কিন্তু বর্ত্তমানে অনুভূতির মধ্যে যে অনন্ত, শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎকার পাইতেছি তাহার তুলনায় ইহা অত্যন্ত নিম্নস্তরের সত্য। এই দুইটির মধ্যে কোনই যোগসূত্র পাইতেছি না। হয়ত ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং ভূমাতে বিলীন হইয়া গেলে পরে হয়ত কখনও এই সম্বন্ধের উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কোনই উপলব্ধি হইতেছে না। বর্ত্তমানে সর্ব্বদা যে সত্যের অনুভূতি করিতেছি বহুদিন পূর্ব্বে জীবনে আর একবার মাত্র এই অনুভূতি হইয়াছিল।"

অসুস্থ শরীরে তাঁহার পক্ষে অধিকক্ষণ কথা বলা ভাল নয় মনে করিয়া আমরা বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের এককোণে আচার্য্যদেবের একটা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিল। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম—"আপনার এই ছবিখানি বড় সুন্দর। ইহা কি—।"

শুনিবামাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"এই নশ্বর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। এই নশ্বর পদার্থের প্রতি কোন আসক্তি থাকা উচিত নয়। হিন্দুদের মধ্যে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা ছিল, অন্যদিকে তাহার বিপরীত একটা উচ্চ ভাবও ছিল। তাঁহারা ইতিহাস লিখিয়া বা প্রতিকৃতি গড়িয়া নশ্বর দেহ ও জীবনকে ধরিয়া রাখার বৃথা চেষ্টা করিতেন না।"

আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলাম। তিনি করজোড়ে প্রণাম করিতে বাধা দিলেন। আমি বলিলাম—"আপনি একি করিতেছেন। আপনি যে আমাদের গুরু।"

উত্তরে তিনি সসম্ভ্রমে জোরের সহিত বলিলেন—"মানুষ কখনও গুরু হইতে পারে না।"

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার সকল কথা হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একদিকে হৃদয়ের চিরপরিচিত, চিরপূজিত, মহাপণ্ডিত ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অন্যদিকে সকল পাণ্ডিত্য বিস্মৃত, সংসারবিরক্ত অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে মগ্ন শিশুভাবাপন্ন মহাপুরুষ। প্রথম রূপটি এতদিন আদর্শ ও আরাধ্য দেবতা বলিয়া বুদ্ধির নিকট পূজা পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় শিশু মূর্ত্তির আবির্ভাবে হৃদয়ে উভয়ের মধ্যে এক সংগ্রামের সৃষ্টি হইল ; এক সংশয় জাগিল—ইহাদের মধ্যে কে সত্য? কে বড়? কে জীবনের আদর্শ?

(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৮ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রণ)

[আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হয়তো কিছু সভা, কিছু গতানুগতিক বক্তৃতা ও কয়েকটি স্মারণিকা প্রকাশিত হবে, কিন্তু দুঃখ ও বেদনার বিষয় বিগত বৎসরাধিক কাল জয়শ্রীর সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইচ্ছানুরূপ সফল হওয়া যায় নি। এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রাবন্ধিকদের কর্মক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের রচনা অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই কেউই উৎসাহিত নন এ বিষয়ে পরিশ্রম ও অধ্যয়ন করে কিছু লিখবার ব্যাপারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রবন্ধ না পাওয়ার প্রধান বাধা তাঁর গুটি কয়েক প্রকাশিত বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত অর্দ্ধশতাব্দীকাল পূর্বে প্রকাশিত 'New Essays in Criticism' গ্রন্থের অধিকাংশ পৃষ্ঠাই আংশিক ছেঁড়া, সে জন্য, বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও 'The Neo-Romantic movement in Literature' প্রবন্ধের বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত অংশটির একটি অনুবাদ জয়শ্রীতে প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। 'Positive sciences of the ancient Hindus' গ্রন্থের অবস্থাও ঐ একইরূপ। সম্পাদকীয় বিভাগের প্রতিনিধি বইটি issue করেও ব্যবহার করতে এমনকি ছুঁতেও ভয় পেয়েছেন, যদি এই অমূল্য গ্রন্থের পাতাগুলি খসে গিয়ে চিরদিনের মত লুপ্ত হয়। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৎক্ষণাৎ বইটি বাঁধাতে দেওয়া হোলো। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকারী কমিটি হয়েছে, কিন্তু এই সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যা আজ ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার যথোচিত সংরক্ষণ ও তা পুনর্মুদ্রণের নাম মাত্র প্রচেষ্টাও নেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তদানীন্তন পত্রপত্রিকায় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ সুযোগ হেতু সে সব উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জয়শ্রীর বর্তমান সংখ্যায় শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নূতন প্রবন্ধ ও সেই সাথে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত কতিপয় প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হল। এ সংখ্যায় আশানুরূপ প্রবন্ধ দেয়া গেল না এটা আমাদের পক্ষেও বেদনাজনক। এ অক্ষমতা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে জয়শ্রীর কোনও সংখ্যায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও তথ্য বহুল কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। জঃ সঃ]

শিক্ষা বিস্তার—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটিকে কাজে খাটাইবার জন্য দুইটি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। প্রথম উপায়—মাতৃভাষায় সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের জন্য বাংলাভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা, যাহাতে মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়—মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা, যাহাতে ছাত্র অধ্যাপক দুজনেরই যথার্থ মানসিক বিকাশ হইতে পারে এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। বস্তুত এই দুইটি উপায়ের মধ্যেই একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কারণ, সাহিত্য ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষা ছাড়াও সাহিত্য হয় না।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কোন দেশের প্রচলিত ভাষায় এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা দুইটি উপায়ের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। দ্বিতীয়ত, একাডেমি বা সোসাইটি বা পরিষদের দ্বারা। ইতালী দেশে 'Della Cruxa Academy, ফরাসী দেশে বহু সংখ্যক Academy, এবং জর্ম্মানি ও রাশিয়াতে State Universityর সাহায্যে সেই সেই দেশের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়া একটা বড় রকমের সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেছে। চীন দেশে ও জাপানে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই কাজ অগ্রসর হইতেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল বিভাগে এবং বেনারস কলেজে সংস্কৃত বিভাগের জন্য উচ্চ অঙ্গের দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় Locke এর Human understanding গ্রন্থের অনুবাদ আছে এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিক, ইতিহাস, অর্থনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থাদিও দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিভাগেই শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ থাকায়, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহাদিগকে

হাটিতে হইয়াছে। হিন্দী প্রচারণী সভা হইতেও একটা পরিভাষা সংকলিত হইয়া ইউরোপীয় ভাষায় এ কাজের প্রস্তাব অনেকবার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয় নাই। কেবল ক্যাম্পবেল স্কুল, সার্ভেস্কুল ও ছাত্রবৃত্তি পরিক্ষার্থীদের জন্য শারীর বিজ্ঞান, অস্থিতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিত, জরীপ বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাভাষায় কতক কতক গ্রন্থলিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল শিক্ষা এখন আর মাতৃভাষায় হয় না, কিম্বা সে সকল শিক্ষার স্রোত রুদ্ধপ্রায়। তাহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, এ সকল শিক্ষার সহিত উচ্চ বিজ্ঞানের শিক্ষা জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই; সেই জন্য ইহারা প্রাণ পাইতেছে না।

বাংলা দেশে শিক্ষার ভিতর মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেসন, ইন্টারমিডিয়েট, ও বি. এ পরীক্ষায় বাংলাভাষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কয়েকজন সাহিত্যিক উৎসাহিত হন এবং ছাত্রেরা অল্প স্বল্প বাংলা পড়িতে ও লিখিতে অভ্যস্ত হয় – আমার মত একেবারে আনাড়ী থাকিয়া যায় না এইটুকুই বা লাভ। কিন্তু তাহা কিছুই নয়, অতিসামান্য। এ ব্যবস্থায় বাংলা-সাহিত্য বা ভাষা বিশেষভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয় হয় নাই; পরীক্ষা অনেকটা সখের জিনিষ দাঁড়াইয়া গেছে। আর ইহাতে বাংলার ভিতর দিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবার কোন কথাই নাই; সুতরাং যথার্থ মানসিক-বিকাশের কোন সুযোগ নাই। বরং বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম. এ পরীক্ষা পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট তালিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ঐ দুইভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে বেশ কাজ হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্যের Reader-ship আছে এবং বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাও হয়—কিন্তু ইংরাজিতে।

আর একটি ব্যবস্থা এ সকলের চেয়েও মাতৃভাষায় শিক্ষা-লাভের পথকে বেশ একটুখানি প্রকাশ করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে ইতিহাস বিষয়ে বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারে; সে বিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তকও নির্দিষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয়ও ইচ্ছা করিলেই অধ্যাপনার সময়ে বাংলাভাষা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক স্কুলে ছাত্র কিম্বা অধ্যাপক এই সুযোগটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমে Simla Committee তে এ-সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন আশা করিয়াছিলাম যে এই নজিরে ক্রমে অঙ্ক ও ভূগোল এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার লজিক ও ইতিহাস এবং ক্রমশঃ আরো দু'একটি বিষয় বাংলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার জন্য এ সম্ভাবনাকে হারাইতে বসিয়াছি।

কাশীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে হিন্দী ভাষায় অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কতদূর কাজে দাঁড়াইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, ইহাই সুখের বিষয়।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য:

(১) বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির বাহিরে কি কাজ হইতে পারে:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে নানা সমিতি বা পরিষদের ভিতর দিয়া নানাবিধ শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সায়ান্স এসোসিয়েশনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায়— সাহিত্য পরিষদে ও সাহিত্য সভাগুলিতেও ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এসকল বক্তৃতার দ্বারা কোন নিয়মিত শিক্ষার কাজ হয় না।

সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের extension lectures এর প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়মিতরূপে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা যায়। সেই সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা, মেডাল প্রভৃতি দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন ও তাহাদিগকে প্রশংসিত পুস্তকের তালিকাভুক্ত করিবেন। এই রূপে ক্রমে বাংলায় একটা University Publication শ্রেণী বা Home University শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিবে। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই সকল বক্তৃতায় শ্রোতার অভাব হইবে না—বিশেষতঃ কলিকাতায়, ঢাকায় কিম্বা অন্য কোন প্রধান সহরে কিংবা শিক্ষার কেন্দ্রে। কেবল যে কলেজ বা স্কুলের ছাত্ররাই আসিবে তাহা নয়, অনেক শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক, যাঁহারা স্কুল বা কলেজ ছাড়িয়া কাজ-কর্ম বা ব্যবসায়ে লাগিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাংলা বক্তৃতাদি শুনিতে আসিবেন। এগুলি সান্ধ্য-বক্তৃতার মত কাজ করিবে। এইরূপে বাংলায় শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য উভয়েরই ক্ষেত্র বিস্তৃত থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির ভিতরে বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার কি ব্যবস্থা হইতে পারে:

পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছে, এখন ইমারত গাঁথা চাই। ম্যাট্রিকুলেশনের ইতিহাস, ইণ্টার মিডিয়েটের লজিক-এ বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয় এবং ইতিহাসে বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণও করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বিদ্যালয়েই বাংলায় এই সকল বিষয় শেখানো হইয়া থাকে এবং অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী বাংলায় ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দেয়। যদি ছাত্রদের বা স্কুলের কর্তৃপক্ষদের বা ছাত্রদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভুগোল, অঙ্ক, মেকানিক্‌স্ লজিক ও ইতিহাস, এই সকল বিষয়েও বাংলায় শিক্ষাদান ও বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা যাইত ও আলোচনা করা যাইত। এখনও সুযোগ আছে, এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম আবশ্যক। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ প্রস্তাব না আনিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ প্রস্তাব না আনিয়াও এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব নয়। আমি কোন কোন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অধ্যাপকের কথা জানি যাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট এমন কি বি. এ. শ্রেণীতেও বাংলা শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহা সর্ববাদীসম্মত যে তাঁহাদের অধ্যাপনায় ছাত্রেরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ শিক্ষায় কোন আপত্তি করেন নাই। কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যদি অধ্যাপক মাঝে মাঝে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার সময়ে বাংলায় বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। তাহা হইলে ছাত্রদেরও যেমন যথার্থ মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে অধ্যাপকদেরও তেমনি প্রভূত মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে। 'শিক্ষার বাহন' আসিবার জন্য ইহাই সদর রাস্তা—একমাত্র বড় রাস্তা। আজকাল প্রত্যেক কলেজে, অনেক কলেজ বোর্ডিংয়ে বা মেসে সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য ক্লাব আছে। ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া সেই সকল সভাসমিতিতে বাংলাভাষায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিতে পারে। কলেজের কাগজে বা মাসিক পত্রাদিতে সেই সকল প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারে। এসকল উপায় অবলম্বন করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়।

(৩) সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সভা সকল পরিভাষা সঙ্কলন ও গ্রন্থ প্রকাশ বা প্রবন্ধাদির দ্বারা মাতৃভাষায় দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। সাহিত্য পরিষদ একাজে ইতোমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন—বিজ্ঞানের পরিভাষা এবং আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিও মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। চিন্তার ও শিক্ষার কেন্দ্রগুলি তৈরী না হইলে এ পরিভাষা কখনও চলিবে না। সুতরাং সেই সকল কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়া মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবেই সাহিত্য পরিষদের এতকালের চেষ্টা সফল হইবে।*

---

* [সবুজপত্র দ্বিতীয় বর্ষ। নবম সংখ্যা। পৌষ ১৩২২। পৃঃ ৬০৮-৬১৪ হইতে উদ্ধৃত]

শিক্ষাব্রতিনী

বিনোদিনী রায় চৌধুরাণী

প্রসিত রায় চৌধুরী

[জন্ম ১৮৭৭ খৃঃ—মৃত্যু ১৯৫১ খৃঃ]

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধেয়া লীলা রায় সম্পাদিত "জয়শ্রী" পত্রিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়, "বাংলার স্ত্রী-শিক্ষার" কথা শীর্ষক ক্রমশঃ প্রকাশিত নিবন্ধে, উনবিংশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের (Renaissance) লগ্নে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচেষ্টার অবহেলিত ইতিহাসটিকে অতি যত্নে ও শ্রমে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন দেখে বড় আনন্দ হ'ল। তবে তাঁর আলোচনা মূল্যবান হলেও অতি সংক্ষেপে ইতিহাসের out lineটি মাত্র এঁকে গেছেন। অতি নিঃশব্দে, সুদূর পল্লীতে, অখ্যাত গণ্ডগ্রামে, যে সমস্ত মহৎ প্রাণ নারী-শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করে গেছেন,—পরাধীনতার অন্ধকার দিনে আলো জেলে দিয়েছেন, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁদের স্মরণ করে ধন্য হোক।

বিনোদিনী রায় চৌধুরাণী, এমনি একজন মহীয়সী নারী। উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার সহস্র আচার কণ্টকিত জীবন যাপন সত্ত্বেও, নীরব ত্যাগ ও সেবার, সর্বোপরি স্ত্রীশিক্ষা দানের পুণ্যকর্মে নিযুক্ত থেকে এক সুদুর্লভ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

শ্রদ্ধেয় বাগল মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে "বাংলার স্ত্রীশিক্ষার কথা" নিবন্ধে লিখেছেন,—

"কলিকাতার দক্ষিণে হরিনাভি—রাজপুর অঞ্চলে এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকারী প্রযত্নের কথা সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি। এই অঞ্চলে বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্তা বিনোদিনী বসু (পরে রায় চৌধুরী) অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক মাসিক ত্রিশটাকা বেতনে ১৮৯৮ সনে নিযুক্ত হন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটি পাঠ্য তালিকাও আমরা পাইয়াছি। তবে ইহা দেখিয়া মনে হয় অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষাদান কার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিত।"
["জয়শ্রী" কার্তিক—১৩৬৭ সাল]

পুণ্যবতী বিনোদিনীর নামটি যে ঐতিহাসিকের চোখে পড়েছে ইহা কম আনন্দের কথা নয়। তাঁর নিঃশব্দ প্রচার-বিমুখ জীবনের অনেক ঘটনাই বিস্মৃতির অতলে—সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য তা সত্ত্বেও তাঁর মধুর আচরণ, সেবা ও ত্যাগের কাহিনী আজও বর্ষীয়ান ও বর্ষীয়সী অনেক মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিনোদিনীর শিক্ষাব্রতিনী জীবন অনেকটা আকস্মিক, অকাল বৈধব্যের বজ্রপাত না ঘটলে হয়তো বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সুগৃহিনী হিসাবে তাঁর জীবন কেটে যেত; কারণ উনবিংশ শতকের শেষ দিকেও, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য আপ্রাণ শ্রম সত্ত্বেও রক্ষণ-শীল হিন্দু পরিবারে নারীশিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। আর হিন্দু বিধবার পক্ষে শিক্ষিকাবৃত্তি তো রীতিমত বৈপ্লবিক কার্য্য। কাজেই সেই পশ্চাৎবর্তী কালের নারীশিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করলে বিনোদিনীর শিক্ষাব্রতিনী জীবনের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে সুবিধা হবে।

উনবিংশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষে নারী মনীষার যে অতুলনীয় প্রমাণ পাই তাতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হই। মুসলমান

আসলে ভারতীয় নারীরা বঞ্চিত হল শিক্ষাস্বাধীনতার অধিকার থেকে। হিন্দু সমাজেও এল নিন্দনীয় নারী অবরোধের সংস্কার আর "পর্দাপ্রথা"। লেখা পড়া শিখলে, বই পড়লে মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে, অকালে বিধবা হবে—এমনি কদর্য্য সংস্কার এই সেদিনও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল মহলে বর্তমান ছিল।

মুসলমান যুগের অবসানে বিদেশী বণিকের সঙ্গে আনা, ইংরেজী ভাষার আধারে এল ইউরোপীয় ভাব-চেতনা। নতুন ভারতবর্ষের জন্ম হল: সেই চেতনা স্পর্শে সেই নব্য ভারতের প্রথম মানুষ বাঙালী রামমোহন রায়। সহস্র আচার আর সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভারতবর্ষকে আমন্ত্র করলেন। সতীদাহের মত নৃশংস ব্যবস্থাকে রদ করতে তাঁর অনেক শক্তি নিঃশেষ হয়েছে নয়ত তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন—ভারতীয় নারীদের চরম দুরবস্থা আর বুঝেও ছিলেন "না জাগিলে, ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।" আর তার জন্য চাই শিক্ষা।

শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেবও (১৭৮৪-১৮৬৭) ছিলেন নারী শিক্ষার পৃষ্ঠ-পোষক। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায়, রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রতিবাদী হিসাবে তাঁর জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টার প্রগতিশীল ভূমিকাটি লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে।

জোড়াসাঁকো ও শোভাবাজারের রাজপরিবারের মহিলারা বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চা করতেন। কলিকাতা ও বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলেই হয়।

মিশনারী প্রচেষ্টা

এ ব্যাপারে খ্রীস্টান মিশনারীরাই পথ দেখালেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা স্থাপন করলেন "The female juvenile society for the establishment and support of Bengal female choolঃ"

এই সোসাইটি সাতটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। শিক্ষয়িত্রী সবই বিদেশিনী মেমসাহেব,—পড়াশুনা হ'তো প্রাথমিক পর্য্যায়ের। কোন মাইনে লাগত না বিদ্যালয়ে। মাধ্যম বাংলা ভাষা। তবে-উচ্চ-বর্ণেরা তাঁদের কন্যা পাঠাতেন না কারণ খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হতো এসব-বিদ্যালয়ে। অবশ্য স্কুলে মেয়ে পাঠাবার মনোভাব গড়েও ওঠেনি সমাজে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় Ladies society for native female education in Calcutta and its vicinity (১৮১৪ খৃঃ)। মেম সাহেব শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে মিসেস উইলসন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

স্ত্রীশিক্ষা সমর্থক মনোষীবৃন্দ

রাজা রাধাকান্তদেব, সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করে প্রাচীন নজির যোগাড় করে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" রচনা করেন। (১৮২৪ খৃঃ) বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিও তাঁর "পার্থেনন" কাগজে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখনী চালনা করেন। (১৮২৮ খৃঃ)

দানবীর মতিলাল শীল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সংস্থ স্থাপনে প্রয়াসী হন, (১৮৩৭খৃঃ)

গৌর মোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমীনারীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা চলে। (১৮৪০ খৃঃ) সুবিখ্যাত বক্তা, ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা কারীকে পুরস্কার দেন। মধুসূদন দত্ত (কবি) স্বর্ণপদক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় রৌপ্য পদক লাভ করেন। (১৮৪২খৃঃ)

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেতন হয়ে উঠলেও মিশনারীদের স্কুলে তখনও পর্য্যন্ত কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কন্যা প্রেরণের কথা ভাবতে পারছিলেন না।

Council of Educatin এর সভাপতি এলিয়ট

নারী বন্ধু বেথুন ও বিদ্যাসাগর।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে "ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের" স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি ছিল বেসরকারী ও অবৈতনিক। বেথুন ছিলেন কেমব্রিজের প্রখ্যাত ছাত্র—চিরকুমার। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইনি ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করতে আহ্বান জানালেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। (১৮৫০ খৃঃ) বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্তরিক প্রযত্নে বেথুন সাহেবের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে পরবর্তী কালের বাংলা দেশের আদর্শ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়রূপে বিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়টির সহিত বেথুন সাহেবের পুণ্য নামটি যুক্ত করেন। ঘোড়ার গাড়ীকরে ভদ্র পরিবারের কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে আনবার ব্যবস্থা করেন এবং গাড়ীর গায়ে মনুসংহিতার বিখ্যাত শ্লোক "কন্যা প্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" উৎকীর্ণ করাইয়া দেন।

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক রাধাকান্তদেব—, বেথুন সাহেবকে পত্রে তাঁর প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। এ আশাও প্রকাশ করেছিলেন "স্কুলসোসাইটির আমলে (১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকাল) দেশী পাঠশালায় ছাত্রদের সহিত ছাত্রীরাও অধ্যয়ন করিত সে ব্যবস্থা পুণঃপ্রবর্তন করিলে ভাল হয়।" তবে সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন "সেই হেষ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তদবধি সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি মাত্রেই এরূপ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ মর্য্যাদা হানিকর বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।" কিন্তু সে আশঙ্কা বৃথা প্রমাণ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবীকে বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর সুহৃদ্ মদনমোহন তর্কলঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা তো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই ছাত্রী হন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষও তাঁর আত্মীয় কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে স্বীকৃত হলেন।

বেথুন সহেবের মৃত্যুর পর সরকার তাঁর স্কুলটির দায়িত্ব নেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষও ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তৎকালীন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডের উৎসাহে, বিদ্যোৎসাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলীতে ২০টি, বর্দ্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (১৮৫৭খ্রীঃ) অবশ্য স্থানীয় পণ্ডিতেরাই শিক্ষকের কার্য্য করতেন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ভারত সরকার বালিকা বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। অকুতোভয় বিদ্যাসাগর 'নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার' খুলে চাঁদা তুলে বিদ্যালয়গুলিকে রক্ষা করলেন। এই বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে তৎকালীন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনসট্রাকশনের সহিত মতান্তর তাঁর সরকারী চাকুরী ত্যাগের অন্যতম কারণ।

কেশবসেনের মহিলা বিদ্যালয়

এদিকে ব্রাহ্মনেতা কেশবসেন নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তাঁর "ভারত আশ্রমে" মহিলা বিদ্যালয় খোলা হয়। অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল। অন্যান্য ব্রাহ্ম মহিলাদের সহিত কেশব সেনের স্ত্রীকে পড়াতেন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী। (১৮৭২ খৃঃ)

নারীশিক্ষায় উৎসাহিত ব্রাহ্ম

প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মরা দুর্গামোহন দাশ (দেশবন্ধুর কাকা) শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ছিল এঁদের একান্ত আগ্রহ। মূলতঃ এঁদেরই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কাদম্বিনীবসু বি. একে বিবাহ করে ডাক্তারী পড়তে স্ত্রীকে বিলাত পাঠান।

প্রায় এই সমসাময়িক কালে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার পাঁচক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত রাজপুর গ্রামে শিক্ষাব্রতিনী বিনোদিনীর জন্ম হয়।

কলিকাতার অতি সন্নিহিত বলে কলিকাতার প্রতিটি ভাব **দেশ ও কালের** স্পন্দনের সহিত এ অঞ্চল পরিচিত। এই **পরিচয়** গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উনবিংশ শতকের বাংলার অতিপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতামহ রাজনারায়ন বসু (বোড়াল)। বিখ্যাত সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (হরিনাভি)। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (রাজপুর)। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (হরিনাভি)। বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক অঘোর চক্রবর্তী (রাজপুর) আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী (জন্ম-চাংড়ীপোতা) অধুনা সুভাষগ্রাম। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী (হরিনাভি) ডাঃ কার্তিক বসু, বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্র রায়, বিপ্লবী হরি কুমার চক্রবর্তী (কোদালিয়া) জানকীনাথ বসু (নেতাজীর পিতা) (কোদালিয়া) প্রমুখ প্রতিভাবান পুরুষেরা মাত্র ১৬ বর্গমাইলের মধ্যে গত শতকে আবির্ভূত হয়ে অঞ্চলটিকে একটি ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দান করেছেন।

পিতৃকুলের পরিচয়

বিনোদিনীর পিতা ৺উপেন্দ্রনাথ বসু, মাহিনগরের প্রসিদ্ধ বসু বংশীয়। এই বংশেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম। বসুদের জনৈক পূর্বপুরুষ মহীপতি বসুর নামেই মাহিনাগরের নাম-করণ হয়েছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের দক্ষিণ অভিমুখী সাগর যাত্রার পথে আদিগঙ্গার কূলে এই মাহিনগরের নাম পাওয়া যায়।

লঘুপতি সদাগর যায় কালীঘাট।
দুইকূলে জপতপ যাত্রিকের ঠাট।
তীরের মতন যেন চলে তরীবর।
তাহার মেলানি বাহে "মাহিনগর।"

এই বসু বংশের গোপীনাথ বসু বাংলার জনপ্রিয় নবাব হোসেন শাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন। হোসেনশাহ, গোপীনাথকে "পুরন্দর খাঁ" উপাধি দেন। বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম কুমুদিনী (১৮৭৪-১৯৪৪)' কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র ১৮৮০-১৯৩৭) ও রমেশচন্দ্র (১৮৯২-১৯৩৩)।

বালিকা বিনোদিনী ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে, বিদ্যাসাগর সুহৃদ্ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র ডাঃ শ্রীনাথ বিদ্যানিধি প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়ে (১৮৬৯) প্রবিষ্ট হন ও দুই বৎসর পর ১৮৮৫ খৃঃ নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃঃ উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় ও প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পেয়ে গ্রামবসীগণের অশেষ প্রশংসাভাজন হন। তখন প্রাইমারী পর্য্যায়ে সহশিক্ষার বাধা ছিলনা এ জন্যই বোধহয় বিনোদিনীর পক্ষে বিদ্যালাভ ঘটেছিল। এরপর বিনোদিনী ষষ্ঠ মানের উপযোগী বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। প্রতিজেলার মধ্যবাংলা (M. V.) বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ মানের ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষা দিতেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ বিনোদিনীকে পরীক্ষার উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করে দেন। কিন্তু বাধা আসে। তখন পরীক্ষা হ'ত কলিকাতা সিনেট হলে কাজেই বারো বছরের একটি বয়স্থা (!) কন্যার পক্ষে কলিকাতা গিয়া পরীক্ষা দেবার পক্ষে সামাজিক অনুমোদন মেলেনি। কাজেই পরীক্ষা দেওয়া আর হয়নি। এই বছরই ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে রাজপুর গ্রামের সুপ্রাচীন দশানী রায় চৌধুরী পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। পাত্র সুরেন্দ্রনাথ (১৮৬৭-১৮৯৭) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলোসংস্কৃত বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালাভ করে গোয়ালন্দে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের (E. B. R) কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পারিবারিক সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। কারণ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দশানী রায় চৌধুরীদের এক পূর্বপুরুষ রাজা রাজবল্লভ রায়, কুলদেবী "আনন্দ ময়ী"কে (কালীমাতা) নিয়ে দুই

ক্রোশ দক্ষিণে বারুইপুরে বসবাস করেন। সে অবধি দেবত্তোর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় রাজপুরের রায় চৌধুরীদের অবস্থান্তর ঘটে। রায় চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মদনমল্ল মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ঢালীবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এঁর নামানুসারেই "মদন মল্ল" পরগণার নাম করণ হয়েছে। হরিনাভির কবি দ্বিজ রামচন্দ্রের "দুর্গামঙ্গল" ও 'হর পার্ব্বতী মঙ্গল' কাব্যে রায় চৌধুরী বংশের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

বিনোদিনীর বিবাহিত জীবন মাত্র ৮ বছরের (১৮৮৯-১৮৯৭)। ইহার মধ্যে তাঁর একটি কন্যা অকাল মৃতা ও একটি পুত্র প্রফুল্লকুমার (১৮৯৬—১৯৬১) জন্ম গ্রহণ করে। সুরেন্দ্রনাথ মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে "ম্যানিনজাইটিস্" রোগে মারা যান। গ্রামে তখন সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব ছিল। বিংশতিবর্ষীয়া বিধবা বিনোদিনী শিশুপুত্রকে নিয়ে অতি দরিদ্র পিতৃ গৃহে ফিরে এলেন। সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সারদাপ্রসাদ (১৮৫৮-১৯৪০) ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে City Collegiate স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হরিনাভি স্কুলে শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রকাশ রায়ের—৺বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা ও ছাত্র ছিলেন তিনি। গুরুদের গুণ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় নি। অসহায় বিধবা বিনোদিনী ও তাঁর শিশুপুত্রকে তিনি বিপদের দিনে ত্যাগ করেছিলেন।

বিনোদিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশ চন্দ্র তখন অর্থাভাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করে স্থানীয় এক উকিলের কাছে সামন্য ৩৲ টাকা মাহিনার মুহুরী। পরে পূর্ববঙ্গ রেলওয়েতে (E. B. R) মাসিক ১২৲ টাকার কর্মে নিযুক্ত হন। আপনযোগ্যতা ও সততার জোরে A. T. S পর্য্যন্ত পদোন্নতি হয়েছিল তাঁর। ইংরাজী ভাষায় তাঁর দক্ষতা উপরওয়ালার প্রশংসা অর্জন করেছিল। রাজপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানও হন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সরকার তাঁকে Hony Magistrate মনোনীত করে পত্র দিয়েছিলেন।

বিপদ যখন আসে তখন বুঝি দল বেঁধেই আসে তাই জামাতা সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাসছই আগে ঋণের দায়ে বিনোদিনীর পিতা উপেন্দ্রনাথের ভিটা বিক্রি হবার উপক্রম হয়। এ ব্যাপারে—যোগেশ চন্দ্র হরিনাভির ৺শরৎ চৌধুরীকে যা বলেছিলেন নীচে অবিকল বিবৃত হ'ল।

"বাবা দুহাতে পয়সা রোজগার করতেন, সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক ছিল না, তার উপর ছিল অনেক পোষ্য। দেনা জমে গেল বাজারে। ভিটা বন্ধক দিলেন স্থানীয় "গঙ্গা উদ্ধবে"র কাছে। সুদে আসলে যখন অনেক হয়ে গেল "গঙ্গা উদ্ধব" আদালতের সাহায্যে ডিগ্রী পেয়ে দখল নিতে এল ঢোল সহবত করে—সে সব কি দিনই গেছে

"ছোড়দিদি (বিনোদিনী) খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে আমায় ডেকে পাঠাল। আমি কাঁদতে কাঁদতে ছোড়দিদির শ্বশুর বাড়ী—আমাদের বাড়ীথেকে পাঁচ মিনিটের পথ যাই। ছোড়দিদি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলী আমার হাতে দিয়ে বলে—বিক্রী করে ভিটে রক্ষে কর্।"

আমি বলি—"এতে কি আছে?"

ছোড়দিদি বলে "আমার সব গহনা।"

সেই গহনা বিক্রী করে ভিটে মাটি বাঁচলো। এর ক'মাস পরে বিনোদিনী বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরলেন। বাপের আয় নেই, পোষ্য অনেক—এমন দিন গেছে সেই অন্ন স্বাচ্ছন্দ্যের দিনেও অন্না ভাব ঘটেছে।" .....

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে এল। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয় শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তিনি বুঝেছেন স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া এ দেশের ভবিষ্যৎ নেই, তাই বিদুষী মার্গারেট নোবেলকে—পরে সিস্টার নিবেদিতা—এ দেশের নারীশিক্ষার কাজে আত্মদান করতে আহ্বান করে এনেছেন। ১৮৯৮ সালের গোড়ার দিকে মিস নোবল ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেন। আর ঐ বছরই পাশের বাড়ীর ৺যোগেন্দ্র চক্রবর্তী এসে—উপেন বসুকে বললেন, "দাদা, গভর্ণমেন্ট ভদ্র-

লোকের বাড়ীর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্ত শিক্ষয়িত্রী চাইছে, ভাল মাইনে দেবে ·· বিনোদ তো বেশ লেখাপড়া জানে, নিক্ না কাজটা" । উপেনবাবু চমকে উঠলেন কথাটা শুনে. ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়ে হবে শিক্ষয়িত্রী না, না এ হয় না·· । যোগেনবাবু বুঝিয়ে বললেন, "কেন হয় না, কাজটা মোটেই অসম্মানের নয় বরং বেশ সম্মানেরই"......

কর্মগ্রহণ

সংসারে নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা ভেবেই শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলেন উপেনবাবু। ১৮৯৮ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে শিক্ষাব্রতিনীর জীবন আরম্ভ হল বিনোদিনীর। মন প্রাণ ঢেলে দিলেন এ কাজে—প্রথমটায় লজ্জা এলেছিল—শত হোক গ্রাম্যসমাজ। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিশুদ্ধ চরিত্রা পুণ্যবতী এই নারীর আচরণ-মাধুর্য্যে তাঁর বয়স্কা ছাত্রীরা বশ হ'ল। বেলা এগারোটার সময় গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চুকিয়ে সামান্ত ধান কাপড় পরে, গায়ে মোটা চাদর জড়িয়ে বিনোদিনী,দৈনিক ব্যবস্থায় ভাড়াকরা ঘোড়ার গাড়ীতে বসতেন—গাড়োয়ানকে বলতেন চল, অমুক পাড়ার অমুক বাবুর বাড়ী। এক এক দিন এক এক পাড়ার কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসতো তাঁর চলমান বিদ্যালয়। সেই বাড়ীতে উপস্থিত হতেন আশপাশের বাড়ীর অল্পবয়সী মেয়েরা আর তাদের মা, কাকী, জেঠীরা। এঁরাই ছাত্রী। চল্লিশ বছর বয়সেও বর্ণপরিচয় হয় নি, এমন ভদ্রমহিলার অভাব সেদিন রাজপুর অঞ্চলে ছিল না। অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্ত একটা পাঠ্যতালিকা (Syllabus) সরকারী শিক্ষা বিভাগ তৈরী করে দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে মুদ্রিত পাঠ্য পুস্তকের এমনি একটি Syllabus দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাতে দেখাযাচ্ছে গণিত, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সূচীশিল্প থেকে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রীদের যোগ্যতা অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হ'ত। বিনোদিনী হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের কন্যা। পড়াতে এসে ভদ্রলোকের বাড়ীর নিরুপায় অভ্র-কন্যাদের অসহায় চেহারাটা বড় চোখে পড়ে। তার উপর বিধবা হ'লে তো কথাই নেই। বাপের বাড়ীর অনাদরের অন্ন তখন বরাদ্দ, অনেক জায়গায় তাও দুর্লভ। অন্তঃপুরিকাদের এই Mobile School পরিদর্শন করতে আসতেন সরকারী শিক্ষা বিভাগ থেকে নিযুক্ত, হৃদয় বালা বসু (H. Bose. M. A.) নীরজা সোম (N. Some. M A.), কামিনী বোস (K. Bose. M. A) মনীষা রায়, লাবণ্য লেখা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সব উচ্চশিক্ষিতা কেউ কেউ আবার বিলাত ফেরৎ—সবাই ব্রাহ্ম সমাজের। এঁদের দেখেন আর ভাবেন বিনোদিনী কবে হিন্দু সমাজের মেয়েরাও অমনি লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হবেন,—দুমুঠো ভাতের জন্তে, একখানা নেকড়ার জন্তে আত্মীয় গৃহের অপমান তুচ্ছ করতে পারবেন? কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা কই মেয়েদের? রাজপুরে তখনও মেয়েদের একটা নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। নিজে যেটুকু জানেন তাই প্রাণপাত পরিশ্রমে ছাত্রীদের শেখান। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কাজ চলে। ছাত্রীদের বলেন ভালকরে বাংলা লিখতে পড়তে শেখ তাতেই অনেক কাজ হবে। স্বাস্থ্যবিধির সাধারণ নিয়ম গুলো তাদের মেনে চলতে বলেন। ছোট ছেলে মানুষ করবার শিক্ষাও তাদের দেন। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় অনেক গ্রাম্যসংস্কার কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। তাই যেদিন তাঁর কাজে সাহায্য করতে দেশী খ্রীস্টান মহিলা বিরাজমোহিনী বিশ্বাস সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক রাজপুরে প্রেরিত হ'লেন সেদিন ছয়ানী চৌধুরী পাড়ার মধ্যে (যেখানে ব্রাহ্মণদের বাস বেশী) বাসা ভাড়া করে বিরাজ মোহিনী ও তাঁর কন্যা-জামাতার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অনেক রক্ষণশীল মানুষই তা প্রসন্ন চিত্তে নেন নি। কিন্তু বিনোদিনীর

সমাজে নারীর অসহায় অবস্থা

বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান

খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী

বিনীত অনুরোধের কাছে তাঁদের হার মানতে হয়েছিল। তাই খ্রীস্টান পরিবারটি ছোঁয়া বাঁচিয়ে ব্রাহ্মণপল্লীতে টিকে গিয়েছিল। বিরাজ মোহিনী বিনোদিনীর পিতা ৺উপেন বাবুকে "বাবা" বলে ডাকতেন। এর অনেক পরে বিনোদিনীর পুত্রবধূ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন ছাত্র, ডাঃ ভোলানাথ বসুর কন্যা নিভাদেবী সব গ্রাম্য সমালোচনা উপেক্ষা করে এই খ্রীস্টান পরিবারের মেয়েদের ঘরে এনে বসিয়েছেন—আদর যত্ন করেছেন। সেদিন এই সামান্য কাজটিই ছিল পরম দুঃসাহসের। বিনোদিনী প্রথমদিকে বেতন পেতেন ৩০৲ ত্রিশ টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাকঘর মারফৎ এ টাকা আসতো সরকারী দপ্তর থেকে। আজ থেকে ৬০।৬৫ বছর আগে ৩০৲ টাকার দাম বড় কম ছিল না। তিনি যদি কৃপণ স্বভাবের সাধারণ স্ত্রীলোক হতেন তবে একমাত্র পুত্রের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় রেখে-যাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু দরিদ্র পিতার সংসারের অন্নাভাব দূর করতে শেষ পাইটি পর্য্যন্ত ব্যয় করতেন। ইতিমধ্যে-জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনী বিধবা হয়ে পাঁচটি শিশু সন্তানসহ বাপের বাড়ী এসে উঠেছেন। তাঁরও ভরসা স্থল বিনোদিনী। দূর সম্পর্কের

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অন্নপূর্ণা

ভ্রাতা প্যারীমোহন ও তার স্ত্রী অকালে মারা গেলেন। তাঁদের চারটি অপোগণ্ড শিশু সন্তানের সবদায় নিলেন করুণাময়ী বিনোদিনী। কঠিন রোগে কে মৃতকল্প--শুশ্রূষার প্রয়োজন, সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর—রোগীর শিয়রে রাত জাগছেন সেবাময়ী বিনোদিনী। কার বাড়ীতে উনুন জ্বলেনি না খেয়ে আছে সব, বিনোদিনী আহার্য্য সামগ্রী নিয়ে গোপনে সেখানে হাজির। বিনোদিনী তাঁর করুণাময়ী জননী অন্নপূর্ণাদেবীর—কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছে, বিনোদিনী মহার্ঘভাতা হিসাবে আরো ১৫৲ টাকা বেশী পাচ্ছেন। ভ্রাতা যোগেশ চন্দ্রের চাকুরীতে উন্নতি হয়েছে। ভ্রাতা রমেশ চন্দ্র ও চাকুরীতে ঢুকেছেন। পুত্র অতি অল্প বয়সেই জাপানী সওদাগরি অফিসে অ্যাকাউনটেন্ট হয়েছেন। সুখ ও ঐশ্বর্য্যের দিনে পল্লীর দরিদ্র মানুষকে ভোলেননি বিনোদিনী আরো বেশীকরে বুকে টেনে নিয়েছেন এই মহীয়সী নারী। বাড়ীর পেছনেই বাসকরে ক'ঘর মুসলমান বড় গরীব ওরা, তাই নিঃশব্দে চাল, ডাল, কাপড় ওদের দিয়ে দেন। চারিত্রিক স্বাভাবিক ঔদার্য্যবশেই জাতিভেদের গোঁড়ামীকে বেশী প্রশ্রয়দিতেন না।

ভাইয়েরা দেবীর মত ওঁকে শ্রদ্ধা করেণ—উপার্জনের—শেষ পাইটি পর্য্যন্ত ছোড়দিদির হাতে তুলে দেন। ছোড়দিদির কিন্তু বড় ভয় এ কথা যেন শুনতে না হয় "গুছিয়ে নিয়ে ছোড়দিদি বাড়ী ছেড়েছে।" তাই নিজের পুত্রের বলতে একটা তামার মুদ্রাও সঞ্চয় করেন নি।

নির্লোভ প্রকৃতির দুর্লভ নারী

পঁয়ত্রিশ বছরের সব উপার্জন অকাতরে দান করে গেছেন। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে রাজপুরে একটি প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ৺আশুতোষ চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁর মায়ের নাম ৺পদ্মমণিদেবীর নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ হ'ল। কলিকাতার "জুভেনাইল সোসাইটির' বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একশ বছর পরে রাজপুরের এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। রাজপুরের জীবনে এ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে গেলে। আশুচক্রবর্তী মহাশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনোদিনীর উপদেশ নিয়ে যেতেন। বিনোদিনীর মনে আশা হ'ল এতদিনে এ অঞ্চলের মেয়েদের জীবনে সত্যকার আলোএসে পড়লো—বহুশতাব্দীর অন্ধকারের পাপ থেকে এবার তারা মুক্ত হবে।

বিনোদিনীর প্রকৃতি ছিল একান্ত নির্লোভ একথা আগেই বলা বলা হয়েছে। একটা ঘটনার কথা বলি যা থেকে বোঝা যাবে সংসারের বিষয়বিষ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এসে তাঁকে ধরে পড়লেন দ'

পাঁচেক টাকার তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজন। অথচ শুধু হাতে টাকা তিনি চান না,—তাঁর বাড়ী জমিটা বন্ধক স্বরূপ রাখতে হ'বে। সুদের, বন্ধকের ব্যবসার প্রতি বিনোদিনীর ছিল আন্তরিক বিতৃষ্ণা। অথচ ব্রাহ্মণও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি কথা হ'ল, ছমাসের মধ্যে বিনা সুদে টাকা শোধ দিয়ে, জমি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন, ততদিন জমিটা বিনোদিনীর নামে বন্ধক রইল রীতিমত কোর্ট মারফৎ। সেই ভদ্রলোক কিন্তু ছ'বছরেও সেই জমি ছাড়াতে পারলেন না—অনেক তথাকথিত হিতৈষী উল্লসিত হয়ে বিনোদিনীকে জানলেন যাক এতদিনে তোমার ছেলের একটা বাড়ীঘর হ'ল। বিনোদিনী কিন্তু ভয় পেয়ে সেই ভদ্রলোককে জানালেন তাঁর বাড়ীজমি ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে দায় মুক্ত করুন। সেই ভদ্রলোক জানালেন, একসঙ্গে ৫০০৲ টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। বিনোদিনী ব্রাহ্মণকে জানালেন টাকা যখন হয় শোধ করবেন এখন বাড়ীজমি ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে দায় মুক্ত করুন নচেৎ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নিয়ে তিনি প্রত্যবায় ভাগী হতে রাজি নন। যে গ্রামে দরিদ্র অসহায়ের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে—গ্রাসকরে লোকে ধনী হয়েছে, সেই গ্রামে বিনোদিনীর নির্লোভ চরিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

মানুষের বিপদের দিনে তিনি আপনার লাভ ক্ষতি বিবেচনা করতেন না। হাতে টাকা না থাকলেও, কেউ এসে টাকা চাইলে নিরাশ করতেন না। আপন পুত্রবধূর গায়ের গহনা খুলে তাকে দিয়ে বলতেন, "যাও বাঁধা দিয়ে টাকা নাও গে।"

মানুষের প্রতি এই বিশ্বাস এ যুগে যেন গল্পকথা মনে হয়। আর্তমানুষ, দুঃখী মানুষ, তথাকথিত "ছোট লাকেরা" তাঁকে আপন ভেবে ভালবেসেছে। ১৯২৮ সালে দীর্ঘ চুরাশী বছর বয়সে বিনোদিনীর পিতা উপেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। যৌথ পরিবারের তখন ভরাভর্তি অবস্থা চারিদিকে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি। আকস্মিক ভাবে অকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হ'ল ১৯৩০ সালে। এই বছরেই বিনোদিনী কর্মথেকে অবসর গ্রহণ করলেন। অকৃতজ্ঞ বিদেশী সরকার তাঁকে পেনসন থেকে বঞ্চিত করলেন।

মৃত্যুর আবির্ভাব

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় ইংরেজের হার চলছিল জাপানের কাছে—বেশী মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে জাপানী পণ্যের আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা চলছিল। জাপানীঅফিসগুলো কর্মচারীদের মাহিনা কমিয়ে, অথবা কর্মীছাঁটাই করে—তাল সামলাবার চেষ্টা করছিল। বিনোদিনীর পুত্রের মাহিনা কমে যাওয়ায়, তিনি কর্মত্যাগ করেছেন। এদিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকে ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র ভেঙে পড়লেন। তাঁর মৃত্যু হল ১৯৩৭ সালে। নিরলস সেবায়ও তাকে ধরে রাখতে পারলেনা তাঁর ছোড়দিদি। এবার যোগেশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন—জীবনের আশা ছিল না। সেই মহাব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করে 'পিসিমা' 'ভাইপো'কে ফিরিয়ে আনলেন। এবার বড়বোন কুমুদিনী অসুখে পড়লেন—ছোটবোন ছুটলেন "দিদিমণির" সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। শোকে জীর্ণ শরীর আর সইতে পারলো না, একেবারে শয্যাশায়ী হলেন। একদিন যিনি প্রতিটি আত্মীয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে সেবা করছেন আজ তাঁর সেবার জন্য কারোর দেখা মেলেনি। এক পুত্রবধূই অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের এক শান্ত সন্ধ্যায় অতি নিঃশব্দে চির শান্তির রাজ্যে যাত্রা করলেন বিনোদিনী।

বিনোদিনীর অতি নিঃশব্দ ত্যাগের জীবনে চমকপ্রদ ঘটনার বিন্যাস আশা করা বৃথা। তবু উনবিংশ শতকের কলেজী শিক্ষাবিহীন বালবিধবা কেমন অকুতোভয়ে নিদারুণ শ্রমে ভ্রাতাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেই শুধু নয়, পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন চারিত্রিক চৌম্বকশক্তির জোরে তা সত্যই প্রশংসার্হ। এই চারিত্রিক চৌম্বকই ব্যক্তিত্বের বিভূতি। আর সেই রক্ষণশীল নারী নিগ্রহের যুগে "নারীর ব্যক্তিত্ব" একটা সুদুর্লভ ঘটনা। সেই একক ব্যক্তিত্ব সরকারী সাহায্য হ লও নির্ভয়ে সামাজিক সমালোচনা উপেক্ষা করে যে শিক্ষয়িত্রীর দুশ্চর সাধনাকে জীবনের ব্রত করেছিলেন সেই জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সকলের বিশেষতঃ নারী জাতির অবশ্য কর্তব্য।

ভা ল বা সা

বিজনকুমার ঘোষ

ধড়মড় করে উঠে বসল যতীন। বিছানার ওপর। যেন হঠাৎ অন্ধকারে সাদা কাপড় নড়ে উঠতে দেখল। হাসল একটু। তারপর আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলো ট্রেনের শব্দ। ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ঝিক্ ঝিক্ করে উঠল। গাড়ি এবার খড়ে নদীর পোলের ওপর উঠছে, শব্দটা শুনতে শুনতে যতীনের শেষ রাতের স্বপ্নেলা আবেশটুকু ছিড়ে গেল। অগত্যা জামার পকেট হাতড়ে একটা মলিন বিড়ি বের করে ধরাল। মুখে যতক্ষণ রাখা যায়, চেষ্টা করে রেখে তারপর ছাড়ল। সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল ঝাপ দেওয়া ছোট্ট জানালাটার দিকে! সারা মুখে ধোঁয়ার মতই নির্লিপ্ত—নির্ভাবনার ছাপ।

ভোর সাড়ে চারটের ট্রেন গেল লালগোলা ঘাটের দিকে। এই গাড়িটা মিস্ করার জন্যে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল যতীনের। ও এই গাড়িটার নাম দিয়েছে লক্ষীর গাড়ি। মাঝে মাঝে কপাল ভাল থাকলে বেশ মোটা রকম দাও মেলে। এই সময়ে রিকশাওয়ালার সংখ্যা থাকে কম। অবশ্য বেশী প্যাসেঞ্জারও নামে না। যারা নামে তারা এই তরুণ অন্ধকারে মালপত্র নিয়ে বড় বিপদে পড়ে। আর মওকা পেয়ে তক্ষুনি যতীন এগিয়ে আসে। ন্যায্য ভাড়া যেখানে আট আনা, যতীন অনায়াসে সেখানে এক টাকা হাঁকে। দরাদরি করতে চাইলে, কি রেট জানতে চাইলে ও তথাগতের ভঙ্গীতে মুখটা হাসি হাসি করে। যেন ওর বিন্দুমাত্র গরজ নেই, নেহাৎ পরোপকার করা ছাড়া, তখন চলে অনুনয়, বিনয়। ইচ্ছে হলে, কোন কোন দিন ভাড়াও নামিয়ে দেয়, বড় জোর চৌদ্দ আনায়। ভোর ভোর অন্ধকারে একটু একটু শীতের ভিতর দিয়ে রিকশা চালাতে ভালই লাগে তখন। দু'পাশে মিউনিসিপ্যালিটির নিভে আসা আলো চোখ পিট পিট করে দেখতে থাকে। পথ নির্জন। শিশিরের ভারে একটি দু'টি দুর্বল পাতা গায়ের ওপর ঝরতে থাকে। চলতি কোন ফিল্মের গান এই সময় হেড়ে গলায় মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করে। তাই পারত পক্ষে যতীন এই গাড়ীটা হাতছাড়া করে না। মনে পড়ে না গত দেড় বছরের ভিতর একটা দিনও কামাই করেছে কি না। এই দেড় বছরের ভিতর কতদিন বেলার জ্বর হয়েছে, যন্ত্রনায় ছটফট করছে; মাধবের তো টাইফয়েড-ই হয়ে গেল একবার। কিন্তু লক্ষীর গাড়ীর ডাকে রোজ রোজ শেষ রাতের কুয়াসা ছিঁড়ে ছুটে গিয়েছে। কারো দিকে তাকায়নি।

মনটা তাই খারাপ হয়ে গেল আজকে। আর যত রাগ গিয়ে পড়ল ঘুমের ওপর। কোনদিন এমন হয় না। একটা অশ্লীল গাল উচ্চারণ করল ঘুমের উদ্দেশ্যে। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সহকর্মীদের সৌভাগ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে। যে কয়টি রিকশাওয়ালা ছিল, ভাবল, সববাই একেকজন মালদার প্যাসেঞ্জার পেয়েছে। রেট হেঁকেছে পাঁচসিকে থেকে দেড় টাকা। বাদ গেল শুধু যতীন।

বিড়িটা শেষ হয়ে এল সুতোর কাছাকাছি। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ডাক দিল, বেলা!

উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাক দিল, বেলা ?

এবার অনুচ্চ কণ্ঠে উত্তর এল কেন আমাকে ? আমি বাসন মাজছি।

—শুনে যাও ইদিকে।

আম কাঁঠালের ছায়াভরা চারপাশ, মাঝখানে নিচু মাটির ঘর। একটা মেটে জানালা উত্তর দিকে। তাই ঘরের ভিতর এখনো অন্ধকারের রাজত্ব। বেলা এসে দাঁড়াল সামনে। জল কাদা মাখা দুই হাত। যতীন তাকাল। আর চমকে উঠল। এতদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছে, ভোর চারটেয় বেরিয়ে গভীর রাত্রিতে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ঢুকেছে। মাঝখানে দুপুরে অবশ্য একবার খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন রোদে পুড়ে পুড়ে ক্লান্ত খিদেয় মানবিক অনুভূতিগুলি হারিয়ে নিজেকে একটা নেকড়ে বাঘের মত মনে হয়েছে। আর রাত্রিতে ? ক্লান্ত চোখে কালিপড়া হারিকেনের আলোয় দেহের কতটুকু অংশই বা দেখা যায় ! তাই অবাক হল এতদিন পর।

বেলা অধৈর্য হয়ে উঠল।

—কেন ডাকছ ?

সম্বিৎ ফিরে এল যতীনের। কিন্তু ভুলে গেল কি জন্যে ডেকেছিল। শুধু অপলক চোখে চেয়ে দেখতে লাগল বেলার দেহের মধ্যাঙ্গ। পেটটা ফুলে উঠেছে। ঠিক যেন ফুটবল। কাপড় রাখা যায় না খুলে খুলে পড়ে। চোখে মুখে ছল ছল ভাব। ঘন ঘন বুক উঠছে নামছে। যতীনের হঠাৎ শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বর্ষার নদীর কথা মনে এল।

বেলার সুর এবার সপ্তমে চড়ল।

—কি হাঁ করে চেয়ে দেখছ ? আদিখ্যেতা রাখ।

ঢোক গিলল যতীন। কি কাজে মাধব এই সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। কৈফিয়ৎ তলব করল, বলি আজ ডেকে দাওনি কেন ?

—অনেক রাতে ফিরেছ তাই ডাকিনি।

—তাই ডাকিনি !—মুখ ভ্যাংচাল যতীন : ও সব ঘুমোন টুমোন আমাদের জন্যে নয়।

উত্তরে হাসল বেলা।

—সে আমি বুঝব।

—কি বুঝবে ?—অগুণ সুতোয় পৌঁছবার আগেই বিড়িটা ফেলে দিল : তোমার জন্যে দু'টাকা বরবাদ হোয়ে গেল।

—সে একটা দিন আমি চালিয়ে নেব। তুমি ঘুমোয়।

—হাঁ, তুমিই তো চালাচ্ছ ! রিকশা টানছ, টাকা আনছ। সংসার তো তোমার জন্যেই চলছে।

—আহা, অমন করে বলছ কেন ? আমি কি—আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, যতীন হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল : বাসন মাজতে মাজতেও তো কথা বলা যায়। শেষকালে ন'টার গাড়িও ফেল মারাবে নাকি ?—বলেই তাকাল মাধবের দিকে। ও খাটের নিচে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে।

—এ্যাই কি করছিস ওখানে ?

—বেলের আঁঠা।

—বেলের আঁঠা দিয়ে কি হবে ?

মাধব করুণ চোখে তাকাল দাদার দিকে।

—ঘুড়ি জুড়ব।

—ঘুড়ি জুড়ব ! হারামজাদা ছেলের লেখাপড়া নেই ? বসে বসে খাওয়াচ্ছি, মাইনে দিচ্ছি কি ঘুড়ি জুড়বার জন্যে ? বদমাইস—

গোলমাল শুনে বেলা আবার উঠে এল।

—সকাল বেলায় কি লাগালে বল তো ? আমারি ঘাট হয়েছে না ডেকে।

—একশোবার হয়েছে—যতীন গায়ের জোরে কাঁথাখানা ছুঁড়ে ফেলল : তোমাকে কে মোড়লি করতে ডাকল ? আমি মাধবকে বলছি।

—এ্যাই দেখ, ভাল কথা বলতে গেলাম—

—ভাল কথা বলে দরকার নেই। আমার সামনে থেকে দূর হও—

বেলা বুঝল দু'টাকা বরবাদ হয়ে যাওয়ায় রিকশাওয়ালার মথার ঠিক নেই। তাই না ঘাটিয়ে খাটের নিচে তাকিয়ে বলল, পড়তে বসরে মাধব। দাদার মেজাজ দেখলি তো?

যতীন খেঁকিয়ে উঠল, হয়েছে হয়েছে, এখন তোমার কাজে যাও।—একটু চুপ করে থেকে: সবাই মিলে সংসারটাকে গোল্লায় দিল।"

তারপর প্রচণ্ড শব্দে একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বেশ বেলা হয়েছে। বাইরে তাকালে বোঝা যায়। কচি আমের পাতায় রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। কোকিল ডাকছে কোথাও। ভারী ভাল লাগল এই সকালটা। যতীন বাইরে এসে দাঁড়াল। লোকাল ট্রেনটা আসবে সেই ন'টায়। এখনো অনেক দেরী। এর ভিতরে অবশ্য রিকশাটা নিয়ে কোর্টের কাছে দাঁড়ান যায়, কি বাজারের কাছে। বাবুদের কেনাকাটা হঠাৎ বেশী হয়ে পড়লে কখনো কখনো রিকশা করে বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজ আর ইচ্ছে করল না। বেলা বলছে নাকি চালিয়ে নিয়ে যাবে। চালাক। কাজ তো রোজই করে একটা দিন না বেরুলে কি হয়েছে। মোট কথা যতীনের ভারী ভাল লাগল সকালটা। মনে করতে লাগল এমন একটি সুন্দর ঝিরঝিরে সকাল কোথাও দেখেছে নাকি?

—কোথায় যাচ্ছ এখন?

যতীন তাকাল। কিছু বলল না। বেলার এখনো মাজা শেষ হয়নি। পেট অসম্ভব ফুলে ওঠার জন্যে ঠিকমত বসতে পারছে না। আহা বেচারা।

—তোমার কি হয়েছে বল তো? সকাল থেকে দেখছি কেমন কেমন ভাব।

এবার কিছু বলল না যতীন। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখল বারান্দার এক কোণে একটা বস্তা বিছিয়ে মাধব পড়তে বসেছে। দেখেই রক্ত মাথায় উঠল।

—ওখানে পড়া হয়?

কিছু বুঝতে না পেরে মাধব মুখের দিকে তাকাল।

—বলি ওখানে পড়া হয় না। কথা গেলা হয়। আমতলায় গিয়ে পড়তে পার না?

মাধব আবার উঠল। এক বগলে ছেঁড়া বই, আরেক বগলে বস্তা। ইতিমধ্যে বেলার বাসন মাজা শেষ হয়ে গেল। সামনে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে গায়ে একটু ধাক্কাও দিল।

—কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?

—কিছু হয়নি।

—তাহলে এত রাগ করছ কেন সকাল থেকে?

—কোথায় রাগ করছি?

—এই যে মাধবের ওপর রাগলে, আমার ওপর রাগলে?

—ও পড়াশোনা করে না।

—পড়াশোনা তো অন্য দিনও করে না?

—অন্য দিন তো আমি ঘরে থাকি না। আজ আছি তাই বৌদি ঠাকুরপোর ভারী অসুবিধে হয়েছে।

—না গো না—কাছে এগিয়ে এল বেলা: তোমার মেজাজটাই খারাপ হয়েছে। দু'টাকার জন্যে? বলেছি তো আজ আমি চালিয়ে নেব।

—সে জন্যে না।

—তবে?

আরেকটু এগিয়ে এল। মুখের সঙ্গে মুখ বেশ ফাঁক, কিন্তু পেটের সঙ্গে স্ফীত পেট লেগে গেল। যতীনের গাটা একবার সির সির করে উঠল। আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে ও হাত রাখল।

—আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি, তাই না? আমাকে আর ভাল লাগে না।—মুখের সঙ্গে মুখ ঠেকাতে চায় যেন।

—আমি কি তাই বলছি?—যতীন হাতটা দিয়ে সমস্ত পেটটা পরিমাপ করতে চাইল।

—আঃ কি করছ? দেখবে যে!

যতীন ঘুরে তাকাল। দূরে আমগাছের তলায় মাধব খেলা খেলা পড়ছে। কি জানি, দাদাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে কি না হাতটা সরিয়ে এনে বলল, ভারী খিদে লেগেছে।

—ঘরে চল দিচ্ছি।—বেলা একটু সরে গেল।

—কি আছে ঘরে?

—পান্তাভাত, পেঁয়াজ, আম—তুমি যা ভালবাস।

—মাধব খেয়েছে?

মাথা ঝাঁকাল বেলা, হ্যাঁ।

—তুমি?

—সকালে খেতে দেখেছ কোনদিন?

উত্তর দিল না যতীন। চিন্তিত মুখে ঘরে এসে বসল। বেলা হাড়ি থেকে জল চিপে চিপে জাম বাটিতে ভাত রাখল। জিজ্ঞাসা করল, আম আছে দেব?

—না। পেঁয়াজ।

—খাও না একদিন?

—না।

বঁটিটা পেতে বেলা পেঁয়াজ কুটতে বসল। একটু পরে চোখ জলতে লাগল, বলল, তোমার যেন আজ কি হয়েছে, বলবে না তো?

যতীন নিস্তব্ধ। এক এক গ্রাস ভাত মুখে দেয় আর এদিক সেদিক তাকায়। একবার মাধবের দিকে, আরেকবার বেলার দিকে, দেহের মাঝখানটায়। এক সময় বলল, এত বড় যে পেট হয়েছে আমি জানতেই পারিনি এতদিন।

লোকটার একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। লজ্জা পেল বেলা হঠাৎ। ঘুরে বসল ওর দিকে পিছন ফিরে।

—এদিকে তাকাও-গ্রাসটা নামিয়ে রাখল: তোমার খুব ব্যাথা হচ্ছে তাই না?

আড়ভাবে সুন্দর করে হাসল বেলা। বলল, এই ব্যাথার পর ঘর জুড়ে যখন ছেলে আসে তখন?

যতীন খুশি হল না এ কথায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ভাবী আনন্দের ব্যাপারে একটুও যেন মাথাব্যাথা নেই। বর্তমানের ব্যাথা নিয়েই যা কিছু ভাবনা-চিন্তা। তাও বেলার ব্যাথা নয়। সম্পূর্ণ ওর—একান্তভাবে নিজের। সেই ব্যাথা ঘিরে রয়েছে বড় সংকোচ, বড় লজ্জা। আর তার ওপর অন্ধকার। ঘন আর কালো। যতীন চেষ্টা করেও খুশি হতে পারল না এ কথায়।

খাওয়া দাওয়ার পর বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এল।

—কোথায় চললে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ডাক দিল' ইদিকে শোন।

—কি?

—মাধবের সামনে তুমি বেরোবে না।

—ওমা, সে কি কথা! ওইটুকু ছেলে—বিস্ময়ে বেলা গালে আঙুল দিল।

—যা বলছি তাই করবে। বকবক করবে না।—যতীন কটমট করে তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বেলার কথাই ঠিক, আজ মেজাজটা বিগড়ে গেছে। কিন্তু কেন? মনে মনে যতীন কথাটা আবৃত্তি করল, কেন, কেন? দু' টাকার জন্যে? মোটেই না। রিকশাওয়ালারা ওকে বড়লোকদাদা বলে ডাকে। কেননা, কয়েক বিঘে জমি আছে বাইরে। ঘরটাও তুলেছে কোন রকমে। আর রিকশাটা ওর নিজের। খদ্দের জুটুক না জুটুক, দিনের শেষে মালিককে বারো আনা পয়সা গুণে দিতে হয় না। এক ভাই মাধব ছাড়া সংসারের বিশেষ ঝামেলাও নেই। তাই অন্য রিকশাওয়ালারা হিংসে করে। ছোটলোক আসলে তবু নাম দিয়েছে বড়লোকদাদা। একেক সময় ভালই লাগে শুনতে। তাই মাঝে মাঝে কামাই দেওয়া ভাল। ওরা দেখুক রোজ রোজ না বেরুলেও যতীনের চলে। তাই আজ

বাজারে গিয়ে দাঁড়াবে না। কিম্বা ন'টার ট্রেনও ধরবে না। ঘরে বসে থাকবে। সত্যি, অনেক কাল পর আজকের সকাল ভারী ভাল লাগছে। রোদ উঠেছে মাথার ওপর। গায়ে হুঁচ ফুটাচ্ছে না। আমপাতার ছায়ায় সকালটা ভ্রমরের মত মাতাল হয়ে উঠেছে। আজ যতীন বেরোবে না। ঘরে বসে মাধবের পড়া দেখবে। বেলাকে দেখবে। কিন্তু—

একটু চিন্তিত হল যতীন। মনে হল, বেরুলেই বুঝি ভাল ছিল। তাহলে এই সব বিশ্রী চিন্তার পাল্লায় পড়তে হত না। কিন্তু একবার যখন এসেছে তখন তাড়ায় কি করে। যতীন নিরুপায়। ইচ্ছে হয় অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয় মাধবকে অথবা বেলাকে। ওর বাপের বাড়িতে কিম্বা অন্য কোথাও। তাহলে যদি ও মুক্তি পায়! ভাবতে ভাবতে যতীন পাকা রাস্তায় এসে পড়ল। আবোল তাবোল ঘুরল খানিকক্ষণ। সুন্দর সকালটা মিইয়ে গেল চোখের ওপর। আর ভাল লাগে না রোদ তেতে উঠেছে। মুখে এসে পড়েছে নোনা ঘাম। বস্তির দিকে ফিরল।

বারান্দায় এক কোণে বেলা রাঁধছে। আর মাধব তাই দেখছে আপলক চোখে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল যতীন। তার পর একটু কাশল। শব্দ শুনে যাতে মাধব উঠে যায়। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ-ই নেই ওর। আজকাল বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। কিছু বলাও যায় না।

—ভাত হয়েছে?

বেলা উত্তর দিল, হ্যাঁ।

—তবে যায়গা কর।

—সে কি, এত সকালে? স্নান করবে না?

—না।

বেলা আরেকবার তাকাল বিস্ময়ে। কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিল। খেয়ে দেয়ে উঠতেই বেলা বলল, বিছানাটা করে দে তো মাধব।

—থাক, দরকার নেই।

—এই দুপুরেই আবার বেরোবে নাকি?—এখন কি প্যাসেঞ্জার পাবে ভেবেছ?

মেজাজ দেখাল যতীন, সে কথায় তোমার কি দরকার?

আমগাছের মাথায় নজর ফেলে রিকসাটা নিয়ে আবার ছন্নছাড়ার মত বেরিয়ে পড়ল। মাথার ওপর আমপাকা রোদ। এখন কোন গাড়িও নেই। জানে, বাজারের কাছে দাঁড়ালেও কোন ফল হবে না। এক দুপুরের ম্যাটিনী সো'তে কিছু লোক চড়তে পারে। কিন্তু সেখানে জোর যার মুলুক তার। দশজন যদি খদ্দের থাকে তাহলে একশো জন রিকশা-ওয়ালা ছুটে আসে। এই রেওয়াজ হয়েছে এই শহরে। হবেই বা না কেন? দু'শো রিকশার জায়গায় পাঁচশো রিকশা হয়েছে এখন। সে জায়গায় চড়নদার কয়জন বেড়েছে? তবু এর ভিতরেই মারামারি করে বাঁচতে হবে—সবাই জানে এ কথা। খদ্দেরের টিকি দেখলে যতীনও ঝাঁপিয়ে পড়ে সবার আগে। উপায় নেই। কিন্তু আজ আর ইচ্ছে হল না মারামারি করতে। মনটাই খারাপ। আবার রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে এল। দুপুরের রোদে এখন বিকেলী রং ধরেছে। আমতলার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে শুরু হয়েছে। বেলা বুঝি কাঁথা সেলাই করছিল, ঘন্টির শব্দে চমকে ফিরে তাকাল। হাসল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। মুখটা আরো। পাতলা কানের দুলের মত চলচল করছে।

—ক' টাকা পেলে গো?

যতীন রিকশা থেকে নেমে পড়ল।

—মাধব কোথায়?

—খেলতে গেছে।

ঘরে ঢুকে ও কতগুলি চট বস্তা টেনে নিয়ে এল বাইরে।

—কি হবে?—সেলাই থামিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল বেলা।

—শোবার জায়গা হবে।

—কে শোবে?

—মাধব।

—তার মানে? ওই এতটুকু ছেলে?

—ও এখন থেকে বাইরে শোবে।

—ও বুঝেছি—বেলার মুখটা কঠিন হল: দেখ এখন যদি কিছু কর ভাল হবে না বলছি।

চেঁচিয়ে উঠল যতীন, মুখ সামলে কথা বল, ভেঙ্গে ফেলব মুখ।—ইচ্ছে হল রিকশার ঘন্টিটা তুলে প্রাণপণ শক্তিতে বেলার মাথায় ছুঁড়ে মারে। একেবারে মেরে ফেলে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকল। চোখ পড়ল মাধবের দিকে। যেন এইমাত্র মাটি ফুঁড়ে উদয় হল। যেন হাসছে। ওর চোখ মুখ—সর্বাঙ্গ যেন বিদ্রূপে ঝিলিক দিচ্ছে। আর সহ্য হল না।

—এ্যাই হাসছিস কেন?

—কোথায় হাসছি?—মাধব যেন প্রমাণ দিতে চায়। ঃকুনি। একটুও ভয়ডর নেই। চোখে চোখে চেয়ে আছে।

—যা বেরিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।—ইচ্ছে হল কষে এক চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে।

কি আশ্চর্য! তবু সরল না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পলকহীন চোখে চেয়ে দেখছে। আপাদমস্তক। স্নেহ দৃষ্টির গরম হল্‌কা ছুঁড়ে মারছে ওর অ-নে-ক ব-ড় দাদার দিকে।

হতভম্ব হয়ে গেল যতীন। লজ্জায়-ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। আগে ও এমন ছিল না।

মাধব বেরিয়ে গেল হাল্‌কা চালে। যতীন কি করবে বুঝতে পারল না। সুচটা দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বেলা।······

শেষ পর্যন্ত জিদটা টিকল।

মাধব বাইরে বস্তার ওপর। ঘরে যতীন আর বেলা। ঘুম আসছে না! গভীর রাত। হাওয়ার শন্‌শনানি থেমে গেছে। বাইরের গরম আর মাথার গরমে দুপুরের রেল লাইনের মত তেতে উঠেছে ঘরখানা।

—বেলা!—কোমল স্বরে ডাকল।

—তোমার সাথে কথা বলব না। তুমি একেবারে আসল রিকসাওয়ালা।

—বারে, রিকসা চালাই রিকসাওয়ালা হব না?—যতীন বালিশ থেকে মাথা তুলল। দেখতে চেষ্টা করল ওর হাসি দেখা যায় কিনা। কিন্তু বেলা কালো। অন্ধকারের মতই। তাই নিরাশ হয়ে বলল, রাগ করেছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?—গায়ে হাত রাখল।

এবার ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিল বেলা। আবার হাত রাখল। এবার পেটের উপর: তোমার ভীষণ ব্যথা হচ্ছে এখানে—আনাড়ীর মত বলল।

—দেখ, কথা ঘোরালে ভাল হবে না বলছি।

—কোথায় কথা ঘোরাচ্ছি?

- তাহলে কি হয়েছে বল?—অন্ধকারে আরো জড়িয়ে এল বেলা। দু'হাত দিয়ে সাঁড়াশির মত বেড় দিল। হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল যতীন। ওর সামনে অন্ধকার। একঘেয়ে কাতর অনুনয় কানে আসছে - বল—বল—। চেতনার পরতে পরতে জমাট মেঘের মত অন্ধকার। আকাশ ফাটানো আলো নেই কোথাও। আর যেন সহ্য করতে পারছে না।·· ···

মাধবের বয়েস এখন বারো বছর। তের বছর আগে যতীন এই বয়েস টাকে ফেলে এসেছে দেশের বাড়িতে। সেদিন ওর বাবা দারোগা হবার মহৎ আশায় ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। ভেবেছিলেন, পাশ করবে আর সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর ডেকে নিয়ে যাবে খাস কামরায়। হায়রে আশা! জানেন না যে, ওই বয়সেই যতীনের কতগুলি তুখোর বন্ধু জুটেছিল। আর ইস্কুল ছিল বাড়ি থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। পথে যেতে আমের বাগান, মটর্ শুঁটির ক্ষেত, পুকুর আর ছোট নদী

পড়ত। দুপুর বেলার কি রকম যেন হাওয়া উঠত বনে বনে। মন আকুল হয়ে উঠত। বইগুলি গাছের ডালে ঝুলিয়ে জটলা হত পুকুর পাড়ে। কে কত গল্প জানে! নদীর মত কল কল করে উঠত জটলার মাঝখানে। কিন্তু গল্পের সেরা গল্প ছিল লোমহর্ষক। পাচু চিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করত, এ্যাই, কেমন করে ছেলে হয়রে?

—জানি না।

—বোকা।—সমস্ত দলটা পাখি উড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠত। প্রতিধ্বনি জাগত নির্জন প্রান্তরে। আবার প্রশ্নের পালা শুরু হত, কোন্ দিক দিয়ে হয় জানিস?

—না তো।

—ক্যাবলা!—যতীনের গালে টোকা মারত ওর চেয়ে বয়সে ছোট একটি ছেলে।

ঘা খেয়ে খেয়ে যতীন সেয়ানা হল তার পর। সবাইকে ছাড়িয়ে উঠল। অনেক জানল, শিখল, বুঝল বারো বছর বয়সে। আর সেই বয়েসটাই এখন চলছে মাধবের। বাবার মত না হলেও বেশ খানিকটা আশা নিয়ে ওকেও ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। ইস্কুল অনেক দূরে। পথে নিশ্চয় সঙ্গী সাথীও আছে। আর তারা নিশ্চয়-ই পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একটি মাত্র ভাই। যতীন তো ওকে ভালবাসেই। মাধবও এতদিন অজ্ঞান হত দাদা বলতে। কিন্তু এখন বিগড়ে গেছে। একটুও ভয় করে না। দাদার চোখে চোখে তাকায়। সাপের মত বিদ্রূপের বিষ ছিটিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। কেন না, ও তো সব জানে। বোঝে, কেমন করে হিংস্র অন্ধকার সাঁতরে একটি শিশু আসে কূলে। সুন্দর ফুলকে পায়ের তলায় চেপ্টে ফেলার মত, একটি নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধনকে রাতের পর রাত অন্ধকারে হিংস্র উন্মত্ততায় ছিন্ন ভিন্ন করেছে, ও জানে। তাই দাদাকে আর ভয় করে না। ঘৃণা করে।

কিন্তু সে কথা কেমন করে বেলাকে বলে? কি মনে করবে ও? না না, কোন দিন বলতে পারবে না কি জন্যে মাধবকে এখন দূরে দূরে রাখতে চায়।

যাক, যতীন সন্তর্পণে চেয়ে দেখল, বেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর কাতর আনাতন করবে না তাহলে। ঘুমোক। ওর-ও ঘুম আসুক। তারপর কুয়াসার মত অন্ধকারে ঘর ছেয়ে যাক।

বাড়ি এখন ফাঁকা। দুটি মাত্র প্রাণী। রিকশা আর রিকশাওয়ালা। বেলা ওর বাপের বাড়িতে। হঠাৎ একদিন ব্যাথা উঠল। যতীন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বেলার কথা মত শেষের কয়দিন কাজে বেরুত না। ওকে সঙ্গে সঙ্গে রিকশায় করে দাতব্য হাসপাতালে নিয়ে আসে। তারপর নার্সের মুখে শোনে খুব সুন্দর নাকি ছেলে হয়েছে। ওর মত পোড়াকাঠ চেহারা নয়, বেলার মতই। শুনে যতীনের বিশেষ কোন ভাবান্তর হয় নি। আট আনার জায়গায় বারো আনা হাকলে চড়নদার যদি দরাদরি না করে তাহলে যা হয়, অর্থাৎ কি না চার আনা পরিমাণ আনন্দ। তার বেশী নয়। সাত দিন ছিল দাতব্য হাসপাতালে। তার পর ওখান থেকে সোজা রিকশ করে নয় মাইল দূরে সোনাখালিতে ওর বাপের বাড়িতে নিয়ে যায়। বেলা ওখানেই থাকবে কিছুদিন। বাপের অবস্থা ভাল। অন্তত যতীনের থেকে। যতীন ও যা পারে মাসে মাসে দিয়ে আসবে, ওর ভাইএর সাথে এমনি রফা হয়েছে। অর্থাৎ কি না যতদিন চোখের আড়ালে থাকে।

এর ভিতর আর কোন অঘটন ঘটে নি। কেন না বুদ্ধি করে মাধবকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওর মামার বাড়িতে। বাড়ি তাই এখন ফাঁকা। তেতে পুড়ে দুপুরে এসে নিজেকেই রান্না চাড়াতে হয়। এই সময়টা বড় বিশ্রী লাগে। আমবন থেকে হু-হু করে হাওয়া আসে। ঘুণধরা খুঁটিগুলি মড় মড় শব্দে আর্তনাদ করে। উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় বহুদূরে। রিকশাটা হতভম্বের মত রোদে দাঁড়িয়ে পুড়তে থাকে। এর ভিতর ইচ্ছে করে না উনুন ধরাতে, কি রান্না করতে। চোখের

পাতা ভার হয়ে আসে। তারপর ঘুম দিয়ে উঠে তিনটে চারটের সময় দোকানে গিয়ে শুকনো রুটি আর আলুর তরকারি খায়। এই সময় রোজ মাধবের কথা মনে হয়, ও যদি থাকত! এই সময় হঠাৎ হাওয়ার মত একদিন মাধব এসে উপস্থিত হল। বলল, মামাবাড়ি ওর ভাল লাগে না। যতীন খুশি-ই হল। ছেলেমানুষ কতক্ষণ আর মনে করে বসে থাকতে পারে? সেইসব অন্ধকারের নাড়ি নক্ষত্র ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছে, যেমন পরীক্ষার পড়া ভুলে যায়। যতীনের ভাল লাগল। অনেক কাল পর যেন হঠাৎ দুই ভাই-এ দেখা হয়ে গেল রাস্তায়।

আমবনে হাওয়া বাড়ে। ঘুন ধরা বাঁশের খুঁটিতে মড় মড় শব্দ ওঠে দিনরাত। সেদিন বিকেলে মাধব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, দাদা বৌদিকে কবে আনবে?

চমকে উঠল যতীন। তাকাল। যেন বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা।

—কি বললি নিয়ে আসব?

—হ্যাঁ।—মাথা কাৎ করল।

—আনলেই তুই—বলতে যাচ্ছিল, বিগড়ে যাবি, কিন্তু থেমে গেল। ভাবল, এবার আনলে হয়। ছ'মাস তো হয়ে গেল। সেদিন বাজারের কাছে ওর শালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছিল, কি দাদা, আর কতকাল ভাত রেঁধে খাবে? তালাক দিলে নাকি?

নিয়ে এল একদিন। রাস্তায় বেলা ছেলেকে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবচক্কর দেখে কথা বলতে সাহস হল না। মাঝ পথে রোদ তেতে ওঠায় গাছের ছায়ায় রিকশা থামিয়ে যতীন বিড়ি ধরাল। আড়চোখে একবার ছেলের দিকে তাকাল। হাসল বেলা। বলল, আমার কথা না হয় বাদ-ই দিলাম, কচিছেলের ওপরেও রাগ?

—চুপ কর। রিকশা টানতে ঠেলা আছে। এসব আদিখ্যেতো পোষায় না।

—আর মনুষ্যে বুঝি টানে না?

উত্তর দিলনা যতীন। ওর মুখে ছায়া নামছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাধবের মুখের রেখা বদলে যাচ্ছে। বৌদির ছেলেকে দেখে সেই সব অন্ধকারের কথা মনে পড়ছে। আবার এতদিন পর নিঃশব্দে বিদ্রূপের বিষ ছড়াতে আরম্ভ করবে অ-নে-ক ব-ড় দাদার দিকে। অসহ্য।

আবার একদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেল। আমের পাতায় ঝিকিমিকি রোদ খেলতে দেখে আবার রক্ত মাথায় চড়ে গেল। খানিক্ষণ নিজের মনেই বকাবকি করল। তারপর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আমবাগানের সরু পথ দিয়ে খানিকটা এসেছে, হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। অভিভূত হয়ে গেল নিমেষে। তাড়াতাড়ি যাতে ফুরিয়ে না যায়, তাই এক লাফে সীটের ওপর লাফিয়ে উঠল। ঢাকনি ফেলে ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল অপরূপ দৃশ্য।

বারো বছরের মাধব আর মাস সতেকের শিশু। খেলছে। যেন গভীর বন্ধুত্ব। আদর করছে মাধব। আর ও খিল খিল করে হাসছে ফোকলা দাঁতে। যেন কত বুঝতে পারছে; বিজ্ঞের মত ভাব। একবার মাধব ওকে ফেলে রেখে গাছের আড়ালে লুকাল। কয়েক মুহূর্ত যায়, ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। হঠাৎ কেঁদে ওঠে এক সময়। ছুটে আসে মাধব। কোলে তুলে নেয়। চুমু খায়। আবার ও হাসতে থাকে। ফুলের মত। যেন একরাশ যুঁই ফুল।

আশ মেটে না দেখে দেখে। দেরী করে ওঠে, ট্রেন ফেল করেও যে এত আনন্দ থাকতে পারে ভাবেনি। একটা গভীর আনন্দের শিহরণ শরীরের প্রতি শিরা, উপশিরা, রোমকূপ, কোষ বেয়ে বেয়ে ঘুমের মত সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করতে লাগল।

একটি শিশুর জন্ম—তা সে যতই গহীন অন্ধকার সমুদ্র সাঁতরে আসুক—তার ইতিহাস—উত্তরোল রাত্রির বুকে একটি সুন্দর ফুলকে যতই ছিন্ন ভিন্ন করুক—তবু সে আলোর কূলে এসেছে—আর মাধব তাকে ভালবাসছে—ভালবাসে—ভালবাসুক।

সাহিত্য সমালোচনার পঞ্চপদ্ধতি

এক

সাহিত্য সমালোচনাকে চিরস্থায়ী কোন পদ্ধতির সীমায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন যুগে সমাজ, মানুষ, সাহিত্যকর্মের নানা পরিবর্তন ঘটে। সমালোচনাকেও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রসর হতে হয়। সমালোচক দুই কারণে সাহিত্য আস্বাদন করতে পারেন—(১) তাঁর নিজস্ব তৃপ্তি এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে (২) সাহিত্যকে পাঠক-সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার জন্যে। প্রথমোক্ত কারণ কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনায় কথিত নীরব কবিত্বের মত, দ্বিতীয়টিই সচল এবং বেগবান প্রেরণা। যে আনন্দ তিনি নিজে পান সাহিত্যপাঠে, সে আনন্দ অন্যের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার প্রেরণাতেই বোধ হয় সাহিত্য সমালোচনার উদ্ভব। এখানে আনন্দ বলতে অবশ্য বিশুদ্ধ, অনির্বচনীয়, অমূর্ত কোন রসের কথা হচ্ছে না। বিভিন্ন উপায়ে সাহিত্য আস্বাদন এবং তার বিচিত্র ফলশ্রুতির কথাই বলা হচ্ছে। এই বৈচিত্র্যে একক পদ্ধতির একাধিপত্য যেমন অসহনীয়, সৃষ্টিকর্মের নব নব রূপের, নব নব কল্পনার সম্ভাবনার কথাও তেমনি সাদরে বরণীয়।

"Five Approaches of Literary Criticism" গ্রন্থখানি * সাহিত্য সমালোচনার সেই বৈচিত্র্যের প্রতি যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তেমনি বিভিন্ন সমালোচকের রচনায় সাহিত্যকর্মের বিচিত্রতার প্রতিও আলোকপাত করেছে। সাহিত্য সমালোচনাকে পাঁচটি পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে—Moral, Psychological, Sociological, Formalistic এবং Archetypal ; এদের বাংলা অনুবাদ করে বলা যায়—নীতিগত, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজবাদী, গঠনবাদী এবং পৌরাণিক বা আদিম হেতুসন্ধানী সমালোচনা। সমালোচনাকে অবশ্য এই পাঁচটি পদ্ধতির সংকীর্ণতায়ও সীমাবদ্ধ করা যাবেনা। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক সে দাবীও করেননা। তাঁর বক্তব্য—খুব সাধারণভাবে আমাদের কালে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটি এই পাঁচ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁর মনোভাবে যেন কোন অপরিবর্তনীয় গোঁড়ামি প্রবেশ না করে। তাই বলেছেন, 'No, there are many good critical pieces which defy the compulsion to pigeonhole ; and it is equally foolish to suppose that any critic deserving of continued attention will stay within the confines of a single approach.' (Argument, পৃঃ ১১) এই উদার মতাদর্শের জন্যেই বর্তমান গ্রন্থখানি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ আশার বাণী বহন করে এনেছে। বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আজ একটি পরিচ্ছন্নতা এবং উদারতা প্রয়োজন। প্রয়োজন এইজন্যে যে, সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা খুব অস্পষ্ট। আর সেই অস্পষ্টতার জন্যে অনেক সময়

---

* Five Approaches of Literary Criticism
Edited by Wilbur S. Scott
The Macmillan Company, New York
(First Macmillan edition 1962)
Pages—352
S 6. 50

নিজস্ব অভিমানে সাহিত্য বিচার করি, অথবা একটি পদ্ধতিকেই সর্বশেষ বলে মান্য করি। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু একটি বিস্ময়কর উদারতা লক্ষ্য করি। তিনি নিজে সাহিত্যকে সমাজকল্যাণ থেকে আলাদা বলে মনে করতেন না। অথচ শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটকের তুলনা করতে গিয়ে শুধু সাহিত্যসৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন, চরিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণী দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচারে তিনি তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালী স্বভাবের দু' চারটি উদাহরণ সন্ধান করতে ভোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সমালোচনার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমের সেই উদারতার যেন এখনো অভাব। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে তাঁর সমালোচনা জীবন্ত। বর্তমান সংকলন গ্রন্থটিতে এই সচলতা লক্ষণীয়।

পাঁচটি পদ্ধতিতে শ্রেণীভুক্ত করে প্রবন্ধগুলি সংকলিত। প্রতি পদ্ধতির মধ্যে সেই পদ্ধতির প্রয়োগে আলোচিত তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পাদক স্কটের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচ্ছন্ন ভূমিকা যুক্ত হয়েছে। সেই ভূমিকায় তিনি প্রত্যেক পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ, তার বৈশিষ্ট্য এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি ভূমিকার সঙ্গে একটি করে গ্রন্থতালিকা যুক্ত হয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে এবং সেই পদ্ধতিতে লিখিত বিভিন্ন লেখকের সমালোচনাগ্রন্থ এবং রচনাদির একটি নামপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে এই উল্লেখ-পঞ্জী খুবই প্রয়োজনীয় হবে বলে মনে হয়।

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির সংকলনরীতির একটি ছক দেওয়া হল

(ক) ভূমিকা (Introduction)

(খ) রচনাপঞ্জী (Bibliographical note)

১. সংকলিত প্রবন্ধ	২. সংকলিত প্রবন্ধ
৩. ঐ	

অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থে পাঁচটি পদ্ধতির সম্বন্ধে পাঁচটি ভূমিকা, পাঁচটি রচনাপঞ্জী এবং পনেরোটি প্রবন্ধ সঙ্কলন করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থের সূচনাতে সাধারণ ভূমিকাহিসাবে সম্পাদকের দুটি প্রবন্ধ আছে—Argument এবং The Background. দ্বিতীয় প্রবন্ধে সাহিত্যসমালোচনায় ভিক্টোরীয় যুগের 'Provincialism, Puritan prudery, and Philistinism'-এর আধিপত্য দূর হয়ে কি ভাবে নতুন মনোভাবের জয় হ'ল, তার একটি পরিচয় দিয়েছেন। নতুন আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে বার্ণার্ড শ, জেম্‌স্ গিবন্‌স্ হনেকার (James Gibbons Huneker) এবং এইচ. এল. মেঙ্কেন (H. L Mencken)-এই তিনজনকে চিহ্নিত করেছেন। তারপর বিভিন্নধারার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথম প্রবন্ধে বর্তমান গ্রন্থসংকলনের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ পরিচয় এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শেষটায় Synthesis নামক অধ্যায়ে পঞ্চপদ্ধতির সমন্বয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থশেষে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত। তার মধ্যে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য শব্দ, লেখক, রচনা প্রভৃতির নাম এবং গ্রন্থমধ্যে তার সংস্থান নির্দেশ করা হয়েছে পৃষ্ঠাচিহ্নের উল্লেখমাধ্যমে। মোট কথা, গ্রন্থসম্পাদনার একটি পরিষ্কার আদর্শ এখানে পরিস্ফুট। বাংলাদেশে অনেক গবেষণানির্ভর গ্রন্থেও এই নিষ্ঠা দেখা যায় না। বড় বড় তথ্যপূর্ণ গ্রন্থেও উল্লেখপঞ্জী এবং নির্ঘণ্টের অভাব পাঠকবৃন্দের বিস্ময়ের কারণ হয়, যদিও লেখকের 'পাণ্ডিত্য' উগ্রভাবেই প্রকট থাকে।

দুই

বইটির বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তার আগে তার বিষয়সূচীটি উদ্ধৃত করা গেল। বর্তমান সূচীতে পূর্বকথিত সাধারণ ভূমিকা দুটি এবং প্রতি অধ্যায়ে

বিশেষ ভূমিকাগুলি বাহুল্যবোধে বর্জন করা হ'ল। এ গুলি বাদ দিলে বিষয়-পঞ্জী নিম্নরূপ :

১. The Moral Approach : Literature and Moral Ideas

প্রবন্ধসূচী

(ক) Irving Babbit—"Genius and Taste"

(খ) T. S. Eliot-"Religion and Literature"

(গ) Edmund Fuller—"The New Compassion in the American Novel"

২. The Psychological Approach : Literature and Psychological Theory

প্রবন্ধসূচী

(ক) Kenneth Burke—"The Poetic Process"

(খ) Geoffrey Gorer-"The Myth in Jane Austen"

(গ) Simon O. Lesser—"The Image of the father"

৩. The Sociological Approach : Literature and Social Ideas

প্রবন্ধসূচী

(ক) Joseph Wood Krutch—"The Tragic Fallacy"

(খ) Christopher Caudwell—"George Bernard Shaw : A Study of the Bourgeois Superman"

(গ) George Orwell—"Rudyard Kipling"

৪. The Formalistic Approch : Literature as Aesthetic Structure

প্রবন্ধসূচী

(ক) James Smith—"As You Like It"

(খ) Elder Olson—"Sailing to Byzantium" : Prolegomena to a Poetics of the Lyric"

(গ) Cleanth Brooks—"Keats's Sylvan Historian : "History without Footnotes"

৫. The Archetypal Approach : Literature in the Light of Myth

প্রবন্ধসূচী

(ক) Gilbert Murray—"Hamlet and Orestes"

(খ) Robert Heilman—"The Turn of the Screw as Poem"

(গ) Leslie Fiedler—"Come Back to the Raft Ag'in, Huck Honey !"

৬. Synthesis

Richard Blackmur—"A Critic's Job of Work"

তিন

পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য প্রতি প্রবন্ধের বক্তব্যের মূল কথাটি এবার সংক্ষেপে বিবৃত করি। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় হ'ল সাহিত্যসমালোচনায় নীতিবাদ। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ই হ'ল এই সমালোচনার মূল লক্ষ্য। এই অধ্যায়ের ভূমিকায় নৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পাদক যে ভূমিকা দিয়াছেন তার মূল কথা হ'ল—এই নীতিবাদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের রক্ষণশীলতার অনেক পার্থক্য। এই পদ্ধতির অনুসারীবৃন্দকে তিনি বলেছেন নব্য-মানবতন্ত্রী—Neo-Humanist, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হল, সাহিত্যকে জীবনসমালোচনা হিসেবে দেখা। সাহিত্য মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং মনোভাবের জগতে যে

প্রভাব বিস্তার করে, এবং সাহিত্যের উপরও মানবজগতের যে প্রভাব তারই অনুসন্ধানে নিরত এঁরা। এঁদের কাছে মানবতন্ত্রের নির্ধারণমান হ'ল—সামঞ্জস্য, সংযম এবং নিয়মানুবর্তিতা। কোন সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে অবশ্য এ নীতিবাদ আবদ্ধ নয়।

আরভিং ব্যাবিট "Genius and Taste" প্রবন্ধে প্রতিভা ও তার আস্বাদন (genius এবং taste সম্পর্কে স্পিংগার্ন (Spingarn) এর অভিমতকে খণ্ডন করেছেন। স্পিংগার্ন ক্রোচের সমর্থক। তাঁর অনুসরণেই তিনি মনে করেন যে, স্রষ্টা এবং সমালোচক অভিন্ন। একের সৃষ্টি-সৌন্দর্য অনুভব করাই অন্যের কর্তব্য। স্রষ্টার সৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনা, তাঁর বৈশিষ্ট্য, এমনকি তাঁর মুদ্রাদোষও বাধাহীনভাবে প্রকাশ পেতে পারে। স্রষ্টা তাঁর স্বক্ষেত্রে স্বরাট। সেই সার্বভৌম স্রষ্টার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াই হবে সমালোচকের কাজ। ক্রোচে এবং তাঁর অনুগামী স্পিংগার্নের এই মত বিচার করে ব্যাবিট বলেছেন—লেখকের কল্পনা উদ্দাম হতে পারেনা। কতকগুলি সাধারণ মানবিক মূল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। সেই মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য রচিত হয়েছে কিনা সমালোচকের তা দেখতে হবে। কারণ যথার্থ সৃষ্টি হল সংযত এবং মানবিক গভীরতায় মণ্ডিত (restrained and humanized intensity)। সেই গভীরতা শান্তি এবং ধৈর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"Religion and Literature" প্রবন্ধে এলিয়ট ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন। ধর্মীয় সাহিত্যকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(ক) যে সমস্ত রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত। যেমন বাইবেল, বাইবেলের অনুবাদ ইত্যাদি। (খ) ধর্ম এবং ভক্তিমূলক কবিতা; (গ) যে সমস্ত রচনায় পরোক্ষভাবে ধর্মের আদর্শকে তুলে ধরা হয়—এসব রচনায় তাই একটু প্রচারের স্পর্শ হয়ত থাকতে পারে। খৃষ্টধর্মের মহৎ আদর্শের পোষকতাই সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আদর্শ বলে এলিয়ট মনে করেন। আধুনিক যুগের ধর্মবিহীন সাহিত্যকে তিনি উদ্দেশ্যহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যে একটি চিরন্তনতার আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—তা হল খৃষ্টধর্মের মহান নীতি। এলিয়ট অবশ্য কোন আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের কথা বলেননি। তবে সেই মহৎ নীতির লক্ষণ কি তাও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেননি। হতে পারে তা উদারতা, স্বার্থত্যাগ, জীবনবিসর্জন, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণের ধারণা। আধুনিক যুগের কোন কোন সাহিত্যে যে উৎকট ঐহিকতা বিদ্যমান তার পরিপ্রেক্ষিতে এলিয়টের সমালোচনা-মান গুরুত্বপূর্ণ। এ মনোভাব আধুনিকদের কাছে হয়ত মধ্যযুগীয় বলে গণ্য হবে, কিন্তু আমরা জানি এই আদর্শহীনতার অভাবেই সাহিত্য মানব-মনকে অনেক সময়ই ঐহিকতার স্থূল অবলেপে কলঙ্কিত করে।

"The New Compassion in the American Novel" প্রবন্ধে এডমাণ্ড ফুলার আধুনিক আমেরিকান উপন্যাসের বৃহত্তর অংশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকবৃন্দের যত সহানুভূতি যেন বিকৃতির প্রতি। মদ্যপ, যৌনতাদোষদুষ্ট, অস্থিরচিত্ত, খুনী প্রভৃতি যতরকম বিকৃত স্বভাব মানুষ, তাদের উপরই যেন এঁদের নিরঙ্কুশ সহানুভূতি। আর এঁদের মতে, যারা ভালো, যারা সুস্থির তারাই নিন্দনীয়। সমস্ত মঙ্গল এবং শোভনের প্রতি এই অট্টহাসিকে প্রবন্ধ লেখক অহিতকর মনে করেছেন। সেক্সপীয়রের নাটকে এবং ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাসে পাপ-পুণ্য, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানুষই সহানুভূতির পাত্র। ডস্টয়েভ্স্কিকে এঁরা গুরু বলে মানেন অথচ এই কথাটি এঁরা ভুলে যান। তিনি অন্ধকার চিত্রিত করেছেন সত্যি, কিন্তু সেই অন্ধকারের ললাটে আলোর ধ্রুবতারার দিকেই তাঁর লক্ষ্য। তবে ফুলার এক

জায়গায় এই লেখকদের উপর একটু অবিচারও করেছেন। সামাজিক বিকৃতির জন্যে যদি সামাজিক শক্তিই দায়ী হয়, তবে ঐ লোকগুলি সহানুভূতি পাবেনা কেন? সমালোচকের কর্তব্য তাহলে সেই দায়িত্বকেও যথাযোগ্যস্থানে চিহ্নিত করা। তা না হলে তো গ্লোসার উপন্যাসগুলি পাঠযোগ্য বলেই বিবেচিত হতে পারতোনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। সম্পাদক এই পদ্ধতি-প্রয়োগের তিনটি ধারা নির্দেশ করেছেন। (ক) একটি পরিমিত সংকেতময় ভাষার প্রয়োগ, যার সহায়ে সৃষ্টির আন্তর কথা অনুধাবন করা সম্ভব। (খ) সাহিত্যের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রক্ষেপ অনুসন্ধান (গ) কাহিনীগত চরিত্র-বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে অবচেতনার আলোছায়া লক্ষণীয়। তবে সাহিত্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বনীয়। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার একাধিপত্য, কিন্তু স্বপ্নাবিষ্ট লোক সে আধিপত্য পেতে পারেনা। তাই অবচেতনা, স্বপ্নাবিষ্টতা প্রভৃতি থিওরী প্রয়োগের আগে স্বপ্নাবিষ্টের অসহায়তা এবং শিল্পীর সজ্ঞান মানসিক প্রকর্ষের পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার।

"The Poetic Process" প্রবন্ধে সমালোচক কেনেথ বার্ক সাহিত্য আলোচনায় মনস্তত্ত্ব প্রয়োগের প্রথমোক্ত ধারাটিকে অনুসরণ করেছেন। শিল্পীর একটি মৌলিক অনুভূতি কিভাবে বিভিন্ন ভাষা সংকেত এবং তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে তারই অনুসন্ধান এ প্রবন্ধটি। শিল্পীর ভাবটি অন্যকেও প্রবুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সেই উদ্বোধনের জন্যে সুনির্বাচিত শব্দ, সংকেত ইত্যাদির প্রয়োগ। কেনেথ বার্ক ভাষাকৌশলের উপর জোর দিলেও ভাষার প্রাণবন্ত ভাবকে অস্বীকার করেননি, যেমন করেছেন আই. এ. রিচার্ড্স্ অনেক জায়গায়। তিনি সাহিত্যকে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমহিসেবেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। বার্কের প্রবন্ধটি বড় কষ্টপাঠ্য, নীরসভাষা বক্তব্যের সহজবোধ্যতা নষ্ট করেছে।

জিওফ্রে গোরার "The Myth in Jane Austen" রচনায় মিস অস্টেনের ব্যক্তিগত জীবনের অচরিতার্থ পিপাসা কি ভাবে তাঁর উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে তার আলোচনা করেছেন। বিশেষত: তাঁর শেষ উপন্যাস Persuation (১৮১৫-'১৬)-এ এই ব্যক্তিগত জীবনপ্রক্ষেপ তিনি স্পষ্টত: লক্ষ্য করেছেন। অস্টেনের অন্য উপন্যাসগুলিতে পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসাবে অঙ্কিত। কিন্তু শেষ উপন্যাসে নায়িকা এ্যানের পিতাকে গর্বিত, অপদার্থ এবং সীমাহীন স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে লেখিকার ব্যক্তিজীবনের গরলধারা প্রবাহিত বলে মনে করা হয়েছে। তার অচরিতার্থ জীবনে পিতার দায়িত্বকে অনুসন্ধান করেছেন লেখক।

সাইমন লেসার হথর্ন-এর 'My Kinsman, Major Molineux, এবং শেরউড এণ্ডারসনের 'I Want to Know Why' কাহিনী দুইটির কিশোর নায়কদ্বয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে অবচেতনার অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম গল্পের নায়ক আত্মীয় খুঁজতে শহরে গিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে আত্মীয় মেজর মলিনেক্সের দেখা পেয়েও তাঁকে এড়িয়ে গেছে। তার এই মনোভাবের পেছনে অবচেতন মনের বন্ধনমুক্তিস্পৃহা প্রতিফলিত। দ্বিতীয় গল্পের নায়ক একটি ঘোড়া এবং তার সহিসকে জীবনের আদর্শ বলে মনে করে ছিল। শেষে কুখ্যাত স্থানে কুখ্যাত নারীর বাহলগ্ন চুম্বনরত সহিসকে দেখে একদিকে তার মোহমুক্তি অন্যদিকে অনির্বচনীয় মানসিক শিহরণ। এর পেছনেও যৌন অবচেতনার প্রভাব আছে বলে The Image of the Father' প্রবন্ধের লেখক লেসার মনে করেছেন।

সহিত্য সমালোচনায় মনস্তত্ত্বপ্রয়োগের যে তিনটি ধারার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেই তিনটি ধারা এ অধ্যায়ের তিনটি

প্রবন্ধের মধ্যে যথাক্রমে উদাহৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্যসমালোচনায় সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির কথা সন্নিবিষ্ট। সাহিত্য শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না। দেশকালের প্রভাবসীমায় বর্ধিত শিল্পী সাহিত্যকে সমাজব্যতিরিক্ত করতে চাইলেও পারবেন না। সম্পাদক বলেছেন, সাহিত্য এমন একজনের সৃষ্টি যে 'author fixed in time and space, answering to a community of which he is important, because articulate part.' (পৃঃ ১২৩) অষ্টাদশ শতকে ভিকোর হোমারীয় এপিকের আলোচনা থেকেই এ পদ্ধতির সূত্রপাত বলা চলে, উনবিংশ শতাব্দীতে হার্ডার এই পদ্ধতির একজন বড় সমর্থক, এর পূর্ণতা ফরাসী লেখক টেইনের আলোচনায়। গতশতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আবার মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্‌-এর 'উৎপাদিকাশক্তি'র মতবাদ গৃহীত হয়। ঐতিহাসিক বিচারকেও এই পদ্ধতিভুক্ত করা চলে। কিন্তু এ পদ্ধতির প্রয়োগে অতি সারল্যের ভয় আছে। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক একমুখী নয়, দ্বিমুখী। হেরী লেভিনের মতে, 'সাহিত্য শুধু সামাজিক কারণের পরিণাম নয়, সামাজিক পরিণামেরও কারণ।' (পৃঃ ১২৬) এই জটিলতার কথা স্মরণ রেখে এ পদ্ধতিরও প্রয়োগসীমা নির্ধারণ করা সঙ্গত।

যোসেফ উড ক্রুচ "The Tragic Fallacy"-তে আধুনিক যুগে ট্র্যাজেডির মহিমারিক্ততার কারণহিসাবে আধুনিক যুগমানসকে স্থাপন করেছেন। প্রাচীন ট্র্যাজেডিতে চিত্র দেখানো হ'ত, কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশের নয়। মহান নায়কের মহান পতন, বিনাশ নয়। মৃত্যুঞ্জয় মানবমহিমা সর্বপতনের ঊর্ধে স্থিত হ'ত। এই মহিমায় আজ আর মানুষ বিশ্বাস করেনা। ইবসেনের 'ঘোষ্ট'-এ তাই জীবনের যত তুচ্ছতার মেলা, কারণ আধুনিক যুগ বাস্তবতার যুগ।

ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েলের প্রবন্ধে বার্ণার্ড শ'র মধ্যে বুর্জোয়া উপাদান সন্ধান করা হয়েছে, শ' বুদ্ধির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। কিন্তু কড্‌ওয়েলের মতে এ বুদ্ধিবাদের সঙ্গে কর্মশক্তির সংযোগ নেই। নিরালম্ব বুদ্ধির সার্বভৌম অধিকার ঘোষণাতে শ'র মধ্যে বুর্জোয়া অভিমান পরিদৃষ্ট। বার্ণার্ড শ মার্কস পড়েছিলেন। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু অন্যকোন উন্নততর ব্যবস্থার চিন্তা ও চেষ্টা তিনি করেননি। বুর্জোয়া সমাজকে সংস্কার করার ব্রত নিয়েছিলেন, এর অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখে। কিন্তু তাঁর এ আস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ প্রতিবিপ্লবী কর্মবিমুখতা সে সংস্কারের সহায়ক নয়। তাই শ শুধু দ্বন্দ্ব জর্জরিত, অভিমানের প্রকোষ্ঠে বন্দী। তবে একটি কাজ তিনি করেছেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, নির্লজ্জ স্বার্থপরতাকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যদিও মুক্তির পথ দেখাতে পারেননি। শ'র মত ব্যক্তিকে এমন নির্ভীকভাবে সমালোচনা করা দুঃসাহসের কাজ। কড্‌ওয়েলের সেই মানসিক প্রস্তুতি আছে বলেই শ-র জীবন দর্শনের অন্তর্গত স্ববিরোধ তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সাহিত্যসমালোচনায় মার্কসীয় পদ্ধতিপ্রয়োগের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ কড্‌ওয়েলের প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির ভাষাও খুব সাবলীল এবং যুক্তিসিদ্ধ। জর্জ অরওয়েল কিপলিং-এর কবিতার মধ্যে সমসাময়িক কালের মানসপরিবেশের প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। কিপলিং এর কবিতা বুদ্ধিবাদী না হয়ে সাধারণমানুষের হৃদগম্য হল কি করে তার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে প্রবন্ধটিতে কিপলিং-এর কবিতার ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজপরিবেশের কথা খুব গৌণভাবে এসেছে। কাজেই এই অধ্যায়ে এর চাইতে প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা সংযোজিত করা যেত কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গঠনবাদী সমালোচনা স্থানলাভ করেছে। ভূমিকা অনুসারে, এ পদ্ধতিকে আরো নানা নামে চিহ্নিত

করা যায়—সৌন্দর্যবাদী (aesthetic), মূলগ্রন্থনির্ভর (textual), তত্ত্ববাদী (ontological), অথবা নতুন সমালোচনা (new criticism)। এ পদ্ধতিতে কবিতা বিচারে বা সাহিত্যের যে কোন শাখার বিচারে সমাজ বা কবিজীবন সন্ধানের পরিবর্তে রচনার গঠনসৌষ্ঠব, বিভিন্ন অঙ্গের সুষ্ঠু অন্বয় ইত্যাদির দিকেই নজর দেওয়া হয়। টি. এস এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, হ্যুমে (Hulme) এই রীতির বড় পৃষ্ঠপোষক। কোলরিজকে এ সমালোচনার অন্যতম প্রবক্তা বলা হয়েছে। অবশ্য ক্রোচে আদি প্রবক্তা এবং আই. এ. রিচার্ডস এ পদ্ধতির এক শক্তিশালী সংগঠক।

এ পদ্ধতির বিপক্ষে নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উত্থাপিত হয়ে থাকে—

(ক) গঠনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে মানব-সম্পর্ককে অবহেলা করা হয়।

(খ) সাহিত্যকর্মের একাংশের বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় সমগ্রতার কথা ভুলে যাওয়া হয়।

তবু এ সমালোচনা মূলগ্রন্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করবার প্রেরণা দেয়। সমালোচনায় একটি শ্রদ্ধা এবং শ্রমের আবহাওয়া প্রস্তুত হয়।

আমাদের মনে হয়, সম্পাদক ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত নন। সেখানে সাহিত্যের ভাব এবং রূপের আস্বাদনপন্থার যে বিচিত্র বিশ্লেষণ, তার উল্লেখই তাই এ গ্রন্থে নেই।

"As You Like It" প্রবন্ধে জেমস্ স্মিথ সেকসপীয়রের বিখ্যাত কমেডির কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করেছেন। বলেছেন কমেডির মধ্যে যে ভাব, পরবর্তীকালের ট্র্যাজেডিতে সেই ভাবের পরবর্তিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্য শুধু পরিবেশন পদ্ধতির। প্রবন্ধটি অতিশয় নীরস, ভাষা দুরূহ।

এলডার ওলসনের "Sailing to Byzantium" কবি ইয়েট্‌স্-এর এই নামীয় কবিতার মনোরম বিশ্লেষণ। কবিতাটির মূল ভাব হল—বৃদ্ধ বয়সের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয়ে প্রাচীন বাইজানটিয়ামে যাত্রার কথা বলা হয়েছে। কামনাবিরহিত প্রাণপূর্ণ আত্মার জগতে উত্তরণ করতে পারলেই সেই যন্ত্রণা মুক্তি। সেই বিনাশহীন শিল্পজগতের ভূমি বাইজানটিয়াম। আর এ শুধু শিল্পভূমি নয়, শাশ্বত আত্মার অপরিবর্তনীয় স্মৃতিক্ষেত্র। এই ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে কবিতায় কি তুলনা, কি বিপরীত দৃশ্যসংস্থান, কি শব্দপ্রয়োগ করা হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন প্রবন্ধলেখক। কবিতার প্রতি স্তবকের সঙ্গে অন্য স্তবকের সম্পর্ক, প্রতি পংক্তির সঙ্গে পূর্বাপর অন্য পংক্তির সম্বন্ধ প্রভৃতি সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা সমালোচনা যে কত উৎকৃষ্ট হতে পারে, তার নিদর্শন এই প্রবন্ধটি। প্রবন্ধের ভাষার সাবলীলতা, বিশ্লেষণের গভীরতা আমাদের রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সমালোচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ক্লীন্‌থ্ ব্রুক কীটস-এর 'Ode on a Grecian Urn' গীতি-কবিতার আলোচনা করেছেন। 'Beauty is truth, truth beauty'—কবিতার এই অন্তিম পংক্তির বক্তব্য যে সমগ্র কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একথাই প্রবন্ধটির মুখ্য আলোচ্য। গ্রীসীয় আধারটির গায়ে যে সমস্ত চিত্র, তারা একাধারে সুন্দর এবং সত্য, ইতিহাস এবং জীবনসত্য। কিন্তু সে ইতিহাস সন তারিখ কণ্টকিত ইতিহাস নয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে পৌরাণিক সমালোচনা (Archetypal Approach)। এ পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব হল এই যে, পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির কিছু কিছু লক্ষণ এর মধ্যে বিদ্যমান। গঠনবাদী সমালোচনার মত এতেও মূল গ্রন্থের নিবিড় অধ্যয়ন প্রয়োজন, কিন্তু সৌন্দর্যতৃপ্তির চাইতে মানবিক মূল্যসন্ধান এর অন্যতম লক্ষ্য। কাজেই এর সঙ্গে নৈতিকপদ্ধতির যোগ। আবার পাঠকের উপর সাহিত্যের প্রভাব বিশ্লেষণে এর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাদৃশ্য, কিন্তু মূল সাংস্কৃতিক অবয়ব

(basic cultural patterns) সন্ধানে এর সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার নিবিড় সম্পর্ক। আরও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পাদকের অনুসরণে নির্দেশ করা যাক—

"কোন সাহিত্য বা শিল্পকর্মের অভ্যন্তরে কোন মৌল সংস্কৃতিগত চিহ্ন (archetype) প্রদর্শন করাকেই এই পদ্ধতির লক্ষ্য বলে অভিহিত করা যায়।" (পৃ. ২৭৭) তাই অধুনা পুরাণকথার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। য়ুং (Jung)-এর সামাজিক অবচেতনার (Collective unconsciousness) তত্ত্ব এই পদ্ধতিকে শক্তিশালী করেছে। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—সাহিত্যমূল্যায়নের চাইতে অতীতসন্ধানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করা যায় না—এ সমালোচনার মধ্যে মানুষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যুক্তিবাদী শুধু নয়, তার স্বভাবে আদিম উপকরণ অবচেতনার আকারে বিদ্যমান। সেগুলি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মানুষকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা গেল। এ পদ্ধতি আমাদের স্মরণ করায় যে, "আমরা অতি পুরাতন মানবগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত।" (পৃ. ২৫১)

"Hamlet and Orestes" প্রবন্ধে ক্লাসিক সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক গিলবার্ট মুরে গ্রীক সাহিত্যের অরেস্টেস এবং ইংরেজীসাহিত্যের হ্যামলেট কাহিনীর পশ্চাতে অতি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বা অতিকথার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। দুটি কাহিনীর আদি উৎস এবং নানারূপান্তর নির্দেশ করে বলেছেন, এদের মধ্যে আদিম অতি প্রাচীন মাতা-পুত্র সম্পর্ক গ্রীষ্ম ও শীতের দ্বন্দ্ব, জীবন ও মৃত্যুর সংঘাতময়তার মানব বিশ্বাস বিদ্যমান। এই লক্ষণগুলিকে 'archetype' বা আদিম চেতনার অভিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

হোমারের কাব্য এবং রামায়ণের মধ্যে যে কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করি, তাতে আমাদের মনে হয়, এই দুই কাব্যের মধ্যে অনুসন্ধান করলে মানবসমাজের আদিমতম সংস্কৃতিচিহ্ন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের মহাকাব্যগুলির বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুগে যুগে ঐতিহ্যের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও যে শাশ্বত সত্য (eternal durability) বর্তমান, তারই অনুসন্ধানে এই পদ্ধতি সার্থক।

রবার্ট হীলম্যান হেনরী জেমসের The Turn of the Screw' উপন্যাসের মধ্যেও অতি প্রাচীন স্বর্গোদ্যানের কাহিনীর (Garden of Eden) চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন এবং ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব নির্দেশ করেছেন। হেনরী জেমসের ভাষার সাংকেতিকতার কথাও লেখক আলোচনা করেছেন। আর পৌরাণিক বিশ্বাসকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেছেন বলে ঔপন্যাসিককে সাধুবাদ দিয়েছেন।

লেসলি ফিডলার 'The Adventures of Huckleberry Finn' উপন্যাসের অন্তরালে আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি মৌল উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। আমেরিকান উপন্যাসের মধ্যে যে সমরতি (homosexuality) এবং কৃষ্ণাঙ্গী প্রীতি লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে মার্কিন জীবনের পৌরাণিক চেতনাই ক্রিয়াশীল বলে প্রবন্ধলেখকের ধারণা। আমাদের মনে হয়, এ সমস্ত উপন্যাস ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির আলোকে বিচার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। উপসংহারে পঞ্চপদ্ধতির সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন রিচার্ড ব্ল্যাকমুর। তাঁর "A Critic's Job of Work" প্রবন্ধে সমালোচকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। তিনি অন্য অনেকের মত একটিমাত্র পদ্ধতিকে সর্বব্যাপারে প্রয়োগের বিরুদ্ধে। একে সমালোচনায় 'critical monism' বলা যায়। তিনি সব পদ্ধতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন। সমালোচনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ব্ল্যাকমুর দু' এক জায়গায়। যেমন—

'Criticism, I take it, is the formal discourse

of an amateur.' (পৃ ৩১৫)—সমালোচনা অপেশাদার সাহিত্য রসিকের আলোচনা।

বিভিন্ন সমালোচকের রীতি বিচার করে তিনি তাঁদের দুর্বলতাও দেখিয়েছেন। সমালোচক কেনেথ বার্কের পদ্ধতিকে তিনি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কারণ তাঁর মনোভাবটি উদার। তিনিও ত্রুটিমুক্ত নন, তবে বার্ক সমালোচনার নানা সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন।

ব্ল্যাকমুরের মতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণীয়। সর্বক্ষেত্রে একটিমাত্র পদ্ধতিপ্রয়োগ বিপজ্জনক। এতে সমালোচনা গোঁড়ামির নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্ল্যাকমুর বলেন, "…you must adopt always an attitude of provisional skepticism; where, imperatively, you must scrutinize until you have revealed, if it is there, the inscrutable divination." (পৃ: ৩৪২)

তবে মানবিক সম্পর্কের সঙ্গে যেহেতু সাহিত্যের নিবিড় বন্ধন, সেইজন্যে সাহিত্য সমালোচনায় সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিকে প্রয়োগ করাই বোধ হয় তর্কাতীত। কারণ এ ক্ষেত্রে গোঁড়ামির প্রশ্ন ওঠেনা।

চার

বর্তমান বইটির সম্পাদনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমেই সপ্রশংস আলোচনা করেছি। এর মুদ্রণ, সজ্জা প্রভৃতি সম্বন্ধেও দু' চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ৩৫২ পৃষ্ঠার বইয়ে একটিও মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়লোনা। পরিষ্কার কাগজে অনায়াসে পাঠযোগ্য হরফে সমগ্র গ্রন্থটি পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত। শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ থেকে সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনার পাঠ গ্রহণ করতে পারেন, প্রকাশকবৃন্দ পরিচ্ছন্নতার দীক্ষা নিতে পারেন, আর মুদ্রাকরগণ নিখুঁত মুদ্রণের আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

রমেন সরকার

এই অভিনব নৈতিকতা(!)*

লণ্ডনে সমাজগত মনোবিকার বিশেষজ্ঞদের (Social Psychiatry) এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডাঃ ফিলিপ টিউফিক বৃটেন সম্বন্ধে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁর মতে সমগ্র বৃটেন একটি অসুস্থ সমাজে পরিণত হতে চলেছে। বৃটেনের অধিকাংশ অধিবাসী আজ স্নায়বিক রোগের রোগী। ক্রমবর্দ্ধমান সম্পদের সঙ্গে সমান গতিতে চলতে গিয়ে এদের পদে পদে হচ্ছে ছন্দপতন।

এক অভিনব নৈতিকতা সমগ্রদেশের উপরে ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করছে, কিন্তু এই দিকে মনোবিকার বিশেষজ্ঞ ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টি এখনও অবরুদ্ধ। ডাঃ টিউফিক লণ্ডনের এক সুপরিচিত হাসপাতালের পরামর্শদাতা। অসুস্থ বৃটেন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন নবার্জিত সম্পদের সঙ্গে কেমন উদ্দেশ্যহীন মানুষ দিশাহারার মত এগিয়ে চলেছে। তাই টেলিভিসন ও ছায়াছবির পর্দা উপন্যাস সবকিছুই আজ অশান্ত উগ্রতা ও যৌন আবেদনের আবিলতায় পরিপূর্ণ। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আশায় বৃটেনবাসীরা নিরাশ্রয়, হতাশা ও শোচনীয় দুর্দশার মূল্য দিচ্ছে। কিন্তু আজ যে ছবি আমরা দেখতে পাই তাতে ফুটে উঠেছে এক বিচিত্র ও বিকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি—যা অভিনব এক নৈতিকতার ফলশ্রুতি।

বৃটেন শিক্ষা, স্বাস্থ্যও গৃহ নির্মাণের অপেক্ষা বেশী ব্যয় করে প্রতিবছর ও তামাকে। তামাকের ধোঁয়ায় বৃটেনের সংস্কৃতি আজ সম্পূর্ণ ধোঁয়াটে। একশকোটি পাউণ্ড কেবলমাত্র ফুঁয়াতে উড়িয়ে দিয়ে তারা তৃপ্ত। কি অদ্ভুত শূন্যতা এদের জীবনে!

বিশিষ্ট চিত্রকরেরা রেখায় ও সঙ্গীতজ্ঞেরা সুরে রূপ

দিচ্ছেন বর্তমান যুগের এই অসঙ্গতিকে। যা কিছু জনপ্রিয় তার বিরুদ্ধ নির্বাচনই এই উৎকট রোগ প্রকাশ করে।

'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উগ্রপ্রভাব ও যৌনসম্পর্কের অবাধ স্বাধীনতা' এই দুটি অভিনব নৈতিকতাবাদের ফল। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। দৈহিক বাঁচার প্রয়োজনে জন্ম হয়েছিল পরিবারের। ডাঃ টিউফিক এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসাবে মনে করেন পার্থিব সম্পদের অলীক মোহ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদগ্র আকর্ষণ। বৃটেনবাসির চিত্তের ওপর এই দুইটির অবাধ অধিকার। অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের নিজেদের স্বার্থসম্বন্ধে সচেতন হবে আশা নিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠান। সেইজন্যেই-বিশেষ করে যে সব শিশু ছাত্রাবাসে থাকে তারা ভবিষ্যতে অনেকগুণের অধিকারী হয়েও সহানুভূতি, দরদ, দয়া ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। তিনি মনে করেন এই উগ্রতা শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর উপযোগী। স্বভাবতই এই আবহাওয়ায় মানুষ স্বদেশবাসী বা ভিন্ন জাতির সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাবকে লালন করে না এবং এর ফলে দেখা দেয় অনিবার্য সংঘাত।

ঐ কনফারেন্সে আমেরিকাবাসী দুইজন অপরাধ-বিজ্ঞানীর উক্তি থেকে জানা যায় যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রথম দিনেই অর্থাৎ ছয় বছর বয়সের আগেই যদি অভিভাবক ও শিশুকে কতগুলি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করা যায় তবে শিশুর মনের সংগোপনে অপরাধের বীজ লুকিয়ে আছে কিনা প্রায় নির্ভুল ভাবে তার ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব। তাঁরা মনে করেন অপরাধী শিশুর জন্য দায়ী করা চলে তার পরিবার ও বিশেষ করে তার 'মা'কে। যৌথ পরিবারের ভিতর শিশু যদি মায়ের সাহচর্যে সুশৃঙ্খল জীবন ধারায় বেড়ে ওঠে তবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কল্যাণবহ হয়।

ডাঃ ইলিন গ্লুয়েক (৬৬ বৎসর) ও তাঁর স্বামী হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেলডন গ্লুয়েক (৬৮ বৎসর) তাঁদের ৪০ বৎসরের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন ভবিষ্যৎ অপরাধী নির্ণয়ের সময় সমাগত। বিশেষ করে বৃটেনে হাজার হাজার অপরাধীর মনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় পারিবারিক অনৈক্য, মায়ের দায়িত্বহীনতা ও খামখেয়ালী শাসন এই তিনটি কারণ প্রধানত এই সামাজিক বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী। যে শিশু স্বাভাবিক ও সুস্থ আবহাওয়ায় বড় হয় তার মধ্যে এই ধরণের বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং এই সব ব্যাপারকে আকস্মিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ ও সম্পদের প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন ও অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জাপানে ও আমেরিকায় দশ বছর আগে যে শত শত শিশুর মধ্যে অপরাধের বীজ অঙ্কুরিত বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল শতকরা ৮১ থেকে ৯৬·৪ জনের ক্ষেত্রে তা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মী, মনস্তত্ত্ববিদ বা মনোবিকার বিশেষজ্ঞ বিদ্যালয়ে প্রথমেই শিশু ও তার অভিভাবককে এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর করলেই শিশুর মনের গতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দিক-সংকেত পেতে পারেন। তিনি নিঃসন্দেহে ঘোষণা করেন যে যৌথ পরিবার বিলুপ্তিই এই সামাজিক দুর্যোগের সূচনা করেছে।

লণ্ডনে এই ধরণের সম্মেলন এই প্রথম। চল্লিশটির বেশী দেশ থেকে একহাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সামাজিক মনোবিকার প্রতিষ্ঠানের (Institute of Social Psychiatry) ও মার্লবোরো দিবা হাসপাতালের (Marlborough Day Hospital) পরিচালক ডাঃ জোসুয়া বায়েরার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর উদ্বোধনীভাষণে তিনি বলেন যে মনোবিকার বিশেষজ্ঞদের আজ নির্মম আত্মবিশ্লেষণের সময় এসেছে। এই ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণমনা ও অসহিষ্ণু লোকের সংখ্যা এত বেশী কেন? কেনই বা তারা অনেকে স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অস্থিরচিত্ততার অধীন?

তিনি মনোবিকার বিশেষজ্ঞদের নিজেদেরই চিকিৎসা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

---

* ২৩।৮।৬৩ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার শ্রীমতী আশাবরী লাহিড়ীর করা সারমর্ম অনুবাদ।

বিশ্বাবর্ত

টনকিন উপসাগরে ঝড়

গত ২রা আগষ্ট আমেরিকার নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ার 'ম্যাডক্স'-এর উপর তিনটি টরপেডো বোট-এর অতর্কিত আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুরন্ত সংঘাতের-সূচনা দেখা দিয়েছে। আমেরিকার মতে এই আক্রমণ উপসাগরের আন্তর্জাতিক এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। 'ম্যাডক্স' থেকে বোমাবর্ষণ করে এবং 'টাইকন ডেরোগা' নামক বিমানবাহী জাহাজ থেকে চারটি বিমান সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে একটি টর্পেডো বোটকে ঘায়েল করে এবং অপর দুইটিকেও জখম করে। পরদিনই প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েৎনাম উপকূলের নিকটস্থ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির এবং আক্রমণকারীদের ধ্বংস করার হুকুম জারী করেন। এই হুকুমনামার বলে ৫ই আগষ্ট মার্কিণী বিমানবাহিনীর আক্রমণ টনকিন উপসাগরে ২৫ টি টর্পেডো বোট এবং প্রচুর মজুত পেট্রলের ডিপো ধ্বংস করে দিয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামের হ্যানয় বেতার থেকে আন্তর্জাতিক এলাকায় 'ম্যাডক্স'-এর উপর আক্রমণের কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে, উত্তর ভিয়েৎনাম এলাকাতেই 'ম্যাডক্স'-এর উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে।

উত্তর ভিয়েৎনামের টর্পেডো বোট ঘাঁটিগুলি, উপকূলবর্তী অন্যান্য ঘাঁটি এবং হাইফং বন্দরে মার্কিনী প্রত্যাঘাতের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুদ্ধের দিকে এক ধাপ অনিবার্যভাবে অগ্রসর হয়েছে, যদিও প্রেসিডেন্ট জনসন থেকে সুরু করে অন্যান্য মার্কিনী ধুরন্ধরেরা আপাতত এই প্রত্যাঘাতকে সীমিত বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য হ্যানয়, পিকিং ও মস্কো থেকে তীব্র প্রতিবাদ ইতিমধ্যেই উঠেছে। লাওসের ঘাঁটি থেকে উত্তরভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলে বোমাবর্ষণ, ৩১ শে জুলাই হন্‌ মে নামক টনকিন উপসাগরের অন্তবর্তী দ্বীপে মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামী অভিযোগ, রক্তের ঋণ পরিশোধের চীনা হুমকী ও সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতি সমর্থন,-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কটে নূতন মোড় ঘুরিয়েছে। কাম্বোডিয়ার সিহানুকও উত্তর ভিয়েৎনামকে সমর্থন জানিয়ে টনকিন উপসাগরের ঘটনার জন্য আমেরিকাকে যুদ্ধের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সীমান্তে চীনাবাহিনীর সমাবেশের এবং হ্যানয়ে চীনা বিমান প্রেরণের সংবাদ শোনা গেছে, অপরপক্ষে মার্কিণী সপ্তম বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মার্কিনী যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতির সংবাদও পাওয়া গেছে। দুই পক্ষের তোড়জোড়ের মাঝখানে আপাতত টনকিন উপসাগর নিস্তব্ধ হলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মারাত্মক সম্ভাবনায় সারা-পৃথিবী আলোড়িত হচ্ছে।

লাওস-ভিয়েৎনাম সঙ্কটের সীমানা যত বেশী প্রসারিত হচ্ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবও এই অঞ্চল থেকে সেই পরিমাণে অপসারিত হচ্ছিল। কারণ, ১৯৫৪ সালের জেনেভা বৈঠক কিম্বা ১৯৬২ সালের চৌদ্দরাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলন—যার যৌথ-সভাপতি রাশিয়া এবং ইংলণ্ড—প্রাক্তন ইন্দোচীন অঞ্চলে নিরপেক্ষতার ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য প্রতিশ্রুত। এই প্রতিশ্রুতির সার্থক প্রয়োগের জন্য এই অঞ্চলে একদিকে লাওস-ভিয়েৎনামে চীন প্রভাবিত কম্যুনিষ্ট শক্তি ও অপরদিকে মার্কিণ প্রভাবিত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তি সংযত রাখতে সোভিয়েট রাশিয়া তৎপর ছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্ট প্যাথেট লাও এর লাওসে অগ্রগতি এবং কম্যুনিষ্ট গরিলাবাহিনী ভিয়েৎ-কং-এর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অগ্রগতিতে এই অঞ্চলে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতি সম্পূর্ণ

পর্যন্ত হয়, যার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া চৌদ্দরাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলনের যৌথ-সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগের হুমকি দেয়। টনকিন উপসাগরে নিক্ষিপ্ত মার্কিনী বোমা, সোভিয়েট রাশিয়াকে এই অঞ্চলে পুনঃপ্রবেশের এবং প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়েছে কিনা তার যথার্থ উত্তর এখনই দেওয়া সম্ভব হবে না, যদিও এই ঘটনার পর আমেরিকার বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামকে সোভিয়েট রাশিয়া সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়েছে। সোভিয়েটের এই সমর্থন পরোক্ষে চীনের প্রতিই সমর্থন। কারণ, উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিনী প্রত্যাঘাত লাওস-ভিয়েৎনামে অনুসৃত চীনের নীতির বিরুদ্ধেই আঘাত, যে চীনা-নীতি এই অঞ্চল থেকে সোভিয়েট প্রভাব খর্ব ও অপসারণে সক্ষম হয়েছে। চীন ও আমেরিকার অসম সামরিক শক্তি সত্ত্বেও, বিশেষভাবে রাশিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে, আমেরিকার বিরুদ্ধে আনবিক শস্ত্র প্রয়োগে চীন যেখানে একান্তই হতবল—চীনের সামরিক সম্প্রসারণ নীতি যদি লাওসে ও ভিয়েৎনামে অব্যাহত থাকে—আমেরিকা এই অঞ্চলে অল্পকালের মধ্যেই হয় আপোষ-রফার মধ্য দিয়ে না হয় সামরিক মীমাংসার মধ্য দিয়ে লাওস ভিয়েৎনাম সঙ্কট উত্তরণে বাধ্য হবে।

কিন্তু চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্ব ও চীনের সম্প্রসারণ নীতি আপোষ-রফার পথে অন্তরায় হবে। যদি আপোষ-রফাই চীনের উদ্দেশ্য হতো। সোভিয়েট প্রভাব এই অঞ্চলে আরও বজায় থাকতো। আপোষ-রফার বিকল্প ব্যবস্থা সামরিক সমাধানের দিকে চীন আমেরিকাকেও ঠেলে দিতে চাচ্ছে। আমেরিকার পক্ষে বর্তমানে আপোষ-রফার পথে যাবার বিষম অন্তরায় রয়েছে। কারণ সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আসন্ন এবং এই নির্বাচনে লাওস-ভিয়েৎনাম সঙ্কটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়ে গেছে। তাছাড়া ডেমোক্রাট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরুদ্ধে তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী গোল্ডওয়াটারের অভিযোগ, জনসন-প্রশাসন ভিয়েৎনাম-লাওসের সঙ্কট জিইয়ে রেখে আমেরিকার তরুণদের রক্তে ভিয়েৎনাম লাওসের যুদ্ধপ্রান্তর সিক্ত হতে দিচ্ছে এবং এই যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা জনসন-গোষ্ঠির অনভিপ্রেত। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরেও যেমন, চীনা আক্রমণের মুখে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখাবার জন্যও বটে, টনকিন উপসাগরে বেপরোয়া মার্কিনী বোমা উত্তর ভিয়েৎনামের ক্ষুদ্র নৌবহর বিধ্বস্ত করে দিল। সুতরাং, মার্কিনী আভ্যন্তরীণ রাজনীতির খাতিরে এবং চীনানীতির প্রতিক্রিয়ায় সামরিক সমাধানের পথেই যেন লাওস-ভিয়েৎনাম সঙ্কট এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, চীন-সোভিয়েট তাত্ত্বিক বৈপরীত্য যেমন এই অঞ্চলে সোভিয়েট স্বার্থকে হতমান করেছে, তেমনি চীনানীতির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সোভিয়েট-মার্কিন বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এই অঞ্চলে সোভিয়েট-মার্কিণ সংঘাতের ভূমিকাও রচনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে চীনা নীতি জয়ী হবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ঘটনার সাম্প্রতিক পরিণতিও সেই দিকে। সেখানে ভিয়েৎকং বাহিনীর তৎপরতাই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের দ্রুত পরিবর্তনশীল আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের আঘাতে আমেরিকার ভিয়েতকং-বিরোধী সামরিক প্রস্তুতিও—জেনারেল টেইলারের মতো মার্কিনী রাষ্ট্রদূতরূপে উপস্থিতি সত্ত্বেও—বিপর্যস্ত হবার মুখে। ভিয়েৎকং গরিলারা এবং তাদের উৎস কম্যুনিষ্ট চীন, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উদ্যত। জানুয়ারী মাসে গঠিত সামরিক বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি জেঃ খান গত ১৬ই আগষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামে রিপাবলিক ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর থেকেই ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন সুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল খানের যে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল মিন ও প্রাক্তন সমর সচিব জেনারেল খিয়েম—এই গোলোযোগের সঙ্গে তাদেরও যোগাযোগ ছিল অনুমান করা যায়। জেনারেল খানের

বিরুদ্ধে ছাত্রদের তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। তাদের বক্তব্য রাষ্ট্রপতিপদে বে-সামরিক অধিকারী চাই, সংবিধানের পরিবর্ত্তন চাই, প্রশাসনিক পরিবর্তন চাই এবং সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা চাই। একই সময়ে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অথচ এই জেনারেল খানই ছিলেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টগরিলা-বিরোধী মার্কিনী অভিযানের শেষ ভরসাস্থল। ছাত্র ও বৌদ্ধ অভিযানের কাছে নতি স্বীকার করে ২৭শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি খান বিদায় নিলেন। নূতন সংবিধানও বাতিল হয়। অতঃপর জেনারেল খান, জেনারেল মিন ও জেনারেল খিয়েম গঠিত ত্রয়ীশাসন ২৭শে আগষ্ট প্রবর্তিত হয়। তারপূর্বে জেনারেল খানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্যাথলিকদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এই ত্রয়ীশাসনের আয়ু দুইদিনেই শেষ। ২৯শে আগষ্ট আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত ডঃ ওয়ানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে ত্রয়ীশাসন তার হাতে দুইমাসের জন্য শাসনভার তুলে দিয়েছেন এবং জেনারেল খানকেও ত্রয়ী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

— ভিয়েৎনামের দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে মার্কিনী তদারকে কম্যুনিষ্ট গরিলাবিরোধী অভিযানের গতিবেগ শিথিল করে চীনের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে এবং আমেরিকার অভ্যন্তরে গোল্ডওয়াটারের শক্তি বৃদ্ধি করবে। এই গোলযোগে চীনা প্ররোচকদের ভূমিকাও থাকতে পারে। মোট ফল দাঁড়াবে, চীন মার্কিন সংঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, যার ফলে মার্কিন-রুশ বৈপরীত্যও এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পাবে এবং অনিচ্ছুক সোভিয়েটের সমর্থন দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় চীনা নীতির পেছনে দাঁড়াতেও বাধ্য হবে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই পরিস্থিতিতে আগামী ডিসেম্বরে কম্যুনিষ্ট শিবিরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য খসড়া কমিটির বৈঠক আহ্বানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি জানিয়েছে যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট শিবিরে ভাঙন ধরাবার শরীক তারা কখনই হবে না। বৈপরীত্যের মধ্যেই অতঃপর মিলনের চাপ সোভিয়েট রাশিয়াকে মেনে নিতে হবে কিনা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আগামী দিনে তার জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাইপ্রাস

ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস দ্বীপেও গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীদের মধ্যে হানাহানি চরমে উঠেছে। গত ৮ই আগষ্ট তুর্কীর বিমানবাহিনী সাইপ্রাসের তুর্কী অধিবাসীদের সাহায্যার্থে সাইপ্রাস-গ্রীক অধ্যুষিত অঞ্চলে 'ন্যাপাম' বোমা বর্ষণ করে। তারই প্রতিশোধের জন্য গ্রীসের বিমান-বাহিনীও সাইপ্রাসের তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চল বোমা বিধ্বস্ত করবার হুমকি দেয়। ঘটনাটি রাষ্ট্রসংঘে প্রেরিত হবার পর আপাততঃ পরস্পর বোমাবর্ষণ স্থগিত আছে। কিন্তু ইতি-মধ্যে সাইপ্রাসের সমর্থনে ক্রুশ্চেভ তুর্কীকে সাবধান করে দিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়াও সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট মাকারিস মিশর ও গ্রীসের সমর্থন লাভ করেছে। তুর্কী এবং গ্রীস উভয়েই ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাইপ্রাসের তুর্কী ও গ্রীস অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে। সাইপ্রাসের গ্রীক রাষ্ট্রপতি মাকারিস সম্প্রতি গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের অন্তর্ভুক্তির এতোদিনকার দাবী—যে আন্দোলন 'ইনোসিস্' নামে পরিচিত—বিরোধিতা করেছেন যদি 'ইনোসিস্' এই মুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটির সাপেক্ষ হয়। মিশরও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি সম্বলিত ইনোসিস বিরোধী সর্তেই তুর্কীর বিরুদ্ধে সাইপ্রাসকে সমর্থন করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া, মিশর প্রভৃতির সাইপ্রাস সংঘাতের পশ্চাদভূমিকায় আগমনের পর, ভূমধ্যসাগরের ন্যাটোভুক্ত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির ন্যাটো-~~বিমুখতা বৃদ্ধি পেয়ে সোভিয়েটমুখীনতা অবশ্যই গাঢ়তর~~ হবে।

ইন্দোনেশিয়ার নবায়ন

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এতোদিন কম্যুনিষ্টদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেন নাই। সম্প্রতি এই নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করে ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রীসভায় কম্যুনিষ্ট দলের একজন সদস্য ঠাই পেলো। ইন্দোনেশিয়ার মার্কিনী অর্থ-সাহায্য ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে সম্প্রতি প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। সুতরাং আমেরিকার সাহায্যের মুখ চেয়ে সুকর্ণের পক্ষে আর কম্যুনিষ্টদের মন্ত্রীসভার বাইরে রাখার প্রয়োজন নাই। এই ঘটনার ফলে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশী ও 'মাফিলিন্দো'র অন্যতম শরীক ফিলিপাইনসও ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বিরূপ হয়েছে। তাই ইন্দোনেশিয়া শুধু ঘরেই কম্যুনিষ্টদের উপর আরও বেশী করে ভর করেছে তাই নয়, বাইরেও মালয়েশিয়ার সঙ্গে যুঝবার জন্য উত্তর ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, প্রভৃতি চীন সমর্থকদের সঙ্গে আঞ্চলিক জোট বাঁধবার জন্য তৈরী হয়েছে। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার চীন কবলিত হবার দিনগুলি দ্রুত এগিয়ে আসছে এবং সেই পরিমাণে এই অঞ্চলে চূড়ান্ত সংঘাতের দিনগুলিও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

১।৯।৬৪

ভুল সংশোধন

৩৪৬ পৃ: প্রথম কলমে :	১৯ লাইনে	ছ'মান-এর স্থলে ছ'মাস
	৩০ লাইনে	পেষায়-এর স্থলে পোষায়
দ্বিতীয় কলমে :	১ম লাইনে	মনুষের স্থলে মানুষের
	১০ ”	চোখ-এর স্থলে চোখের
	১৬	সত্তেকের স্থলে সাত্তেকের
	২২ ”	কেলে-এর স্থলে কোলে
	২৯	সিশুর জন্ম-এর স্থলে শিশুর জন্ম
	৩০ ”	উত্তরোলের স্থলে উত্তরোল

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

DIPTI

more than a household name

The Trade name Dipti is a hall mark of quality. Dipti Lanterns can easily be claimed as one of the most popular household articles throughout India. Khas Janata Kerosene Cookers have earned great popularity as indispensable household utility; simple in operation, sturdy in construction and remarkable in performance, these Kerosene Wick Cookers help you save time and fuel. Dipti enamel wares - proud addition to the existing range of Dipti products.

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD.

77, Bowbazar Street, Calcutta-12.

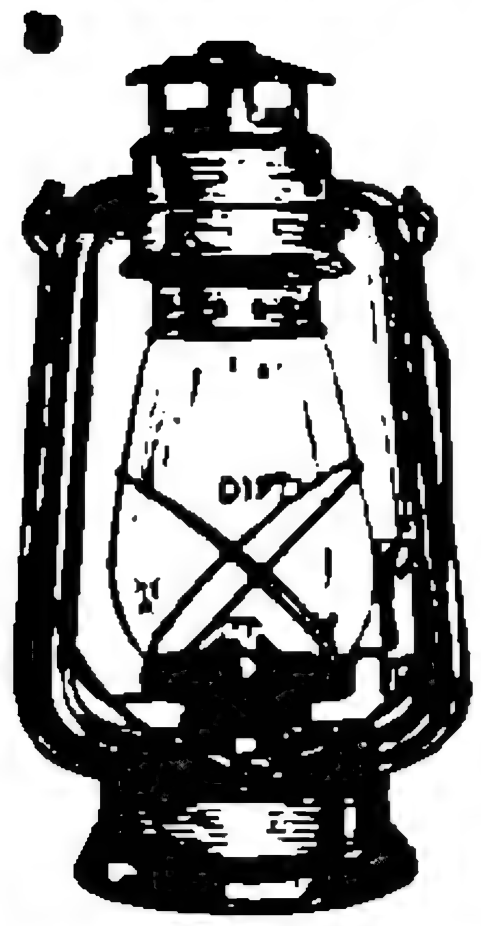

DIPTI LANTERNS

ENAMEL WARES

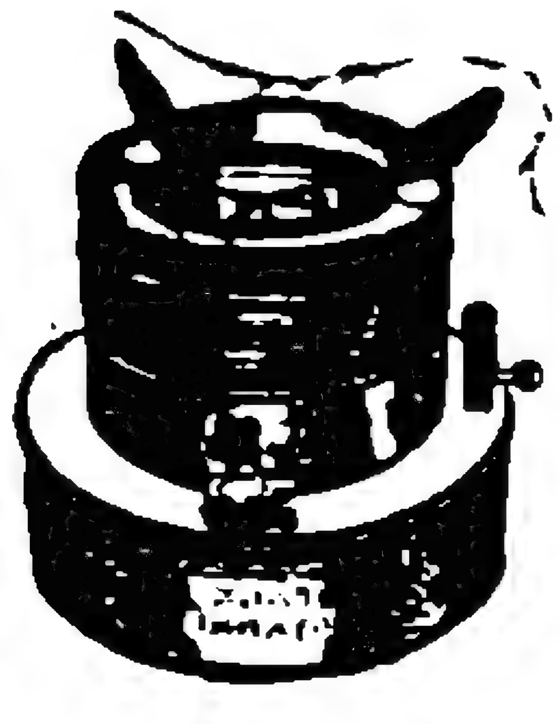

KHAS JANATA

Kalpana om 227

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহিচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশবিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

জয়শ্রী : আশ্বিন : ১৩৭১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৩৭১ শারদীয়া		৩৬১
সতের বছরের কংগ্রেসী শাসন (প্রবন্ধ)	ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার	৩৬৩
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমকালীন জগৎ	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭৩
পরিকল্পনা ও বর্তমান মূল্যসঙ্কট	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন	৩৮৫
ভোজন সংকট	ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়	৩৯১
শিক্ষকের মর্যাদা	ডঃ পরিমল রায়	৩৯৫
পরিকল্পনা ও জনমত (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য	৪০১
হেগেলীয় দর্শন	অনিল রায়	৪০৫
ভাবী সমাজের ভাবনা	শচীন্দ্রনাথ বসু	৪১১
দেবযানী কাহিনী (কবিতা)	সজল ভট্টাচার্য	৪১৫
কালো অন্ধকার (কবিতা)	দিনেশ দাস	৪১৫
আর এক আশ্রয়ের জন্য (কবিতা)	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪১৫
যুগ যুগান্ত (কবিতা)	গোপাল ভৌমিক	৪১৬

পূজোর দিনে
দিয়েও আনন্দ
পেয়েও আনন্দ
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী খাবার
দিয়েও আনন্দ
পেয়েও আনন্দ
লক্ষমীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

জয়শ্রী

UNIVERSITY

২১ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭১

১৩৭১ শারদীয়া

একদিকে বাঁচবার মত নিম্নতম প্রয়োজনেরও সর্বব্যাপী দুষ্প্রাপ্যতা, আকাশমার্গী দুর্মূল্যতা, ভেজালের সর্বগ্রাসিতা এবং তার ফলে নানা কঠিন রোগের প্রাদুর্ভাব, আর অন্যদিকে লজ্জাহীন দম্ভ, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে স্তব্ধ করবার জন্য শাসন যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার, ১৩৭১ এর শারদীয়া এলো এরই উপর পা ফেলে।

বিরোধীদলগুলি এই অবস্থাকে মুখ বুজে নির্বিচারে স্বীকার করে নিতে পারেনি। নানাভাবে কয়েকমাস ধরেই জনতার জীবনের এই সর্বব্যাপী বঞ্চনাকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু উপেক্ষা ও বিদ্রূপ বর্ষণ ছাড়া সরকারের উপর আর কোনো প্রভাব বা মানুষের হতাশা ও দুর্দ্দশাকে দূর করবার কোনো চেষ্টারই কোনো ফল হয়নি। এই অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংযুক্ত সমাজবাদী দল গত ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতব্যাপী সর্বাত্মক হরতালের আহ্বান জানায়, অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এবং জনসংঘ এতে সমর্থন জানায়। ভারতের বহুস্থানে এই আহ্বানে হরতাল পালিত হয়েছে। জনসাধারনের রুদ্ধ বিক্ষোভ তার ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে ব্যাপক ও সার্থকভাবে। সেটা দু আনা, চার আনা বা আট আনা সফল হলো কি হলো না তার গবেষণা করুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই ক্ষুধা, এই দুর্মূল্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা, ভেজাল এগুলো যখন মায়া, বিরোধীদের ষড়যন্ত্র মাত্র, তখন এই পুলিশী জুলুম, সরকারি অর্থ ও ক্ষমতার নির্বিচার ও সর্বাত্মক শক্তি ব্যবহার কেন এই "ব্যর্থ" হরতালকে রুখবার জন্য?

এবারকার শারদীয়া জয়শ্রীর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের লেখাগুলি ভারতের বিশেষ বাঙ্গলার জনজীবনের নানা দিকের সুনিষ্ঠ চিত্র, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও মননশীল সমাধানের ইঙ্গিত বহন করছে। তাঁদের লেখাগুলি পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে আশাকরি।

কিছুদিন পূর্বে তরুণ কথাশিল্পীদের লেখাসহ একটি বিশেষ গল্প সংখ্যা প্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল জয়শ্রীর, কিন্তু যথোপযুক্ত সাড়া না পাওয়াতে সেসময় তা সম্ভব হয়নি। এবারকার জয়শ্রীর শারদীয়া সংখ্যায় ৮ জন তরুণ কথাশিল্পীর গল্পগুলো সে সময়ে জয়শ্রীর আমন্ত্রণে লিখিত। সব গল্পগুলোই সমান উত্‌রেছে না বলা গেলেও এদের বিভিন্ন স্বাদ ও রচনাশৈলী পাঠকদের আনন্দ দেবে এবং বাঙ্গলার তরুণ কথাশিল্পীদের গৌরবোজ্জ্বল সম্ভাবনার সঙ্গেও পরিচিত করবে। এদের সঙ্গে জয়শ্রী পরিবেশন করেছে কয়েকজন জনপ্রিয় প্রখ্যাত কথা শিল্পীর গল্প। তাছাড়া আছে প্রবীণ ও নবীন ত্রিশ

জন কবির একগুচ্ছ কবিতা, সবগুলো সমান রসোত্তীর্ণ না হলেও কাব্যরসিকদের আনন্দ দেবে বেশীর ভাগ কবিতাই একথা অত্যুক্তি নয়। যাঁরা জয়শ্রীর আমন্ত্রণে সানন্দে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের লেখার অর্থমূল্য দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই তবে জয়শ্রীর সুদীর্ঘদিনের সচেতন পাঠকবৃন্দ তাঁদের মননশীল লেখাদ্বারা লাভবান হবেন আনন্দ পাবেন, একথা জোর করে বলা চলে এবং আমাদের বিচারে লেখার সার্থকতা প্রধানতঃ সেটাই। প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী প্রচ্ছদটী এঁকে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

ভাদ্র সংখ্যা জয়শ্রী প্রকাশিত হবার পর দুইজন স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বাঙ্গালী লোকান্তরিত হয়েছেন। বিশিষ্ট দেশব্রতী ও অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাসভ্য অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর ৬৯ বছর বয়সে সুদীর্ঘ রোগভোগের পর কর্মবহুল জীবনের অবসান হয় গত ২০শে ভাদ্র এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী পথিকৃৎ, বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বদেশবৎসল মনস্বী ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৮২ বৎসর বয়সে গত ৩রা আশ্বিন মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁদের অকুণ্ঠ সেবা ও মনীষা বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে দেশ লাভ করে সমৃদ্ধ ও ধন্য হয়েছে। এঁদের স্মৃতির প্রতি জয়শ্রী গভীর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করছে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি সোভিয়েত রাশিয়া ও আয়ার্ল্যাণ্ড এবং বৈদেশিক মন্ত্রী শ্রীশরণ সিং নেপাল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান ও সিংহল সফরান্তে স্বদেশে ফিরেছেন। এঁদের সফর জাগতিক পরিস্থিতি, বিশেষভাবে কাশ্মীর এবং প্রবাসী ভারতবাসী সম্পর্কে ভারতের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ঐ দেশগুলিকে অবহিত করাতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতি ক্রমশই উত্তরোত্তর উগ্রতর হচ্ছে এবং দীর্ঘ আলোচনা ও জটিল শান্তিসূত্র ঘোষণার পরও বিদ্রোহী নাগাদের কার্য্যকলাপ গভীর হতাশাব্যঞ্জক। আগামী মাসখানেকের মধ্যেই ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার ফলাফল বিশ্বপরিবেশের উপর সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে বিশ্বপরিস্থিতিতে অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হওয়াও অসম্ভব নয়। এই উদ্বেগজনক সম্ভাবনার মুখে ভারতবর্ষের লক্ষ্য ও আচরণ সম্বন্ধে জাতীয় সঙ্কল্প কি তা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। "শান্তিদ্বারা সকল বিরোধের মীমাংসাতে ভারতবর্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ"—এই নীতি ক্রমাগত ঘোষণা করা ব্যতীত স্পষ্টতর নীতি ও আচরণের প্রমাণ আমরা পাই নি। এই অবস্থায় সচেতন দেশবাসীর একটিই মাত্র কর্তব্য জনসাধারণকে তাদের অবস্থা ও কর্তব্য সম্বন্ধে নিরন্তর অতন্দ্রভাবে অবহিত রাখা এবং এই প্রচেষ্টায় অটল থেকে এই সরকারকে পরিবর্তিত করবার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে ভারত ও বিশ্বের যথার্থ কল্যাণময় ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করা।

এই শারদীয়াতে সেই শক্তি ও দৃঢ়তা কামনা করে আমাদের লেখক, পাঠক ও অন্যান্য শুভার্থীদের জয়শ্রীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৭১

সত্তের বছরের কংগ্রেসী শাসন

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সত্তর বৎসর আমরা স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছি। যিনি এই স্বাধীন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন সম্প্রতি তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। দেশ এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত। সুতরাং আজ পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে—স্বাধীনতার ফলে আমাদের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে-আমরা কোন্ লক্ষ্য ধরিয়া কোন পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা কতদূর সফল হইয়াছে। নথিপত্র ঘাঁটিয়া তথ্য নির্ণয়পূর্বক এই যুগের ইতিহাস রচনার সময় হয়ত আসে নাই অন্তত তাহার সুবিধা আমার নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে যাহা মনে হইয়াছে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

দেশের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমে এই কথাটিই মনে হয় যে সর্বত্র একটা ব্যর্থতা, অবসন্নতা ও নিরুৎসাহের ভাব। ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগষ্টে যে আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছিল, তাহা যে কবে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব—মনে হয়-সে কোন সুদূর অতীতের স্বপ্ন। আজিকার বাস্তব জীবনে তাহার ক্ষীণ আভাষও আর নাই। সকলেরই চিত্ত নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিতেছে। যাহাদের চিন্তা করিবার শক্তি ও সময় আছে তাহারা দেখিতেছে কেমন করিয়া ধ্বংস পথের যাত্রীরা ধীরে ধীরে মরণের দিকে চলিয়াছে। ভগবানের অসীম করুণা অথবা কোন যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইলে ভারতবাসীর উদ্ধারের পথ দেখা যায় না।

এই নৈরাশ্য ও অবসাদ ও এই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের আশঙ্কার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, অথবা ইহা অলীক কল্পনামাত্র তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ—কিন্তু এই বিচার করিতে হইলে যে সকল কারণে এই মনোবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক।

বর্তমান জগতে স্বাধীনতার অর্থ জনমতের ভিত্তির উপর দেশের শাসন পরিচালন। ইহার জন্যই স্বাধীন ভারত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু সত্তর বৎসরের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে বেশ বোঝা যাইতেছে—যে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—কংগ্রেসীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অর্থাৎ একটি রাজনীতিক দলই এই দেশের সর্বময় কর্তা এবং দেশের মঙ্গল ও ইষ্ট সাধন অপেক্ষা দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই এই কংগ্রেস-তন্ত্র শাসনের প্রধান লক্ষ্য। এ কথা সত্য যে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর জনগণের ভোটেই কংগ্রেস এই অধিকার লাভ করিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসের নির্বাচনে জয় কিরূপে সম্ভব হইল তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসই সর্বপ্রধান অংশ

লইয়াছিল। তখন কংগ্রেসের সভ্য, আর আত্মত্যাগী মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক ও দেশপ্রেমিক প্রভৃতি প্রায় একার্থবাচক ছিল। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পরে প্রথম নির্বাচনে যে দেশের লোক কংগ্রেস দলের প্রার্থীকে ভোট দিবে ইহাই খুব স্বাভাবিক। সাধারণ লোকের কাছে এই যুক্তিই প্রবল বলিয়া মনে হইয়াছিল যে যাহাদের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহারাই দেশের শাসন পরিষদে যাইবার অধিকার ন্যায্যতঃ দাবী করিতে পারে—সুতরাং তাহাদিগকেই ভোট দেওয়া উচিত—এবং ভোট তাহারা দিয়াছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে যে এই যুক্তি বিচারসহ নহে। দেশের জন্য সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেই দেশশাসনের যোগ্যতা জন্মে না। ইংরেজের কয়েদখানাই শাসনকর্তার গুণের একমাত্র মাপকাঠি নহে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সমুদয় ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা যদি দাবী করিত যে অতঃপর পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কেবলমাত্র তাহারাই সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবে—তাহাদের মধ্যে যে যত কষ্ট-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে তাহারা সেই অনুপাতে মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদ ভোগ করিবে—তাহা হইলে ইংলণ্ডে তো বটেই আমাদের দেশেও ইহা হাস্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কার্যত স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে ঠিক এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। আমার বেশ মনে আছে যখন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাংলা দেশে-কংগ্রেসের নায়করূপে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন তাঁহাকে আমি এই নীতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সাবহিত করিয়াছিলাম—কোন ফল হয় নাই। নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে সেদিন এমন সব লোকের উপর শাসন পরিষদে কর্তৃত্বভার দেওয়া উচিত ছিল যাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত শাসননীতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ইহার জন্য যে সকল গুণ ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহা মুক্তিসংগ্রামী মাত্রেরই থাকে না। যাহারা দেশের জন্য দুর্গতি ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য—তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ সুগম করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে একশত কোটি টাকা ব্যয় করিলেও দেশের তত দুর্গতি হইত না—যত দুর্গতি হইয়াছে পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের হাতে নির্বিচারে শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়া।

আজ যে দুইজনকে কংগ্রেসের দুই প্রধান স্তম্ভ বলিয়া গণ্য করা হয়—তাঁহারাও এই বিপদ সম্বন্ধে সাবহিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুর অল্প পূর্বে যে প্রস্তাবনা দেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্ব রাখা হইবে না। ইহার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ঠিক এই মতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তির মাদকতা বড় তীব্র—তাহা এড়ান কঠিন।

বাইবেলে বর্ণিত আছে যে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণরূপ আদিম পাপের ফলেই মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। কংগ্রেসীদলের নির্বাচন-যুদ্ধে যোগ দেওয়া স্বাধীন ভারতের আদিম পাপ। আমাদের যত কিছু দুর্দশা তাহা তাহারই ফলে ঘটিয়াছে। প্রথম নির্বাচনে জয়লাভের ফলে কংগ্রেস অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শাসন-ক্ষমতা হাতে পাইল। কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা পরিচালনার যোগ্যতা বিচার করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে সদস্য প্রার্থী নির্বাচন করিলে কংগ্রেস দলের নির্বাচিত প্রার্থী যে শতকরা নব্বই জন বাদ পড়িত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস ও অন্যদলের আদর্শের প্রভেদ থাকিলেও ক্ষুদ্র-সংখ্যক কমিউনিষ্ট ও ঐরূপ কয়েকটি নগণ্য দল বাদ দিলে আর যে কোন ভারতবাসীই যে কংগ্রেসের সদস্যদের ন্যায়ই দেশের প্রকৃত ইষ্ট সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত—এবং তাহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিরা যে ঐ বিষয়ে

অধিকতর সফলতা লাভ করিত—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে ক্ষমতা হাতে পাইলেই লোকে দুর্নীতি-পরায়ণ হয়—আর অপ্রতিহত ক্ষমতার অবশ্যম্ভাবী ফল চরম দুর্নীতির প্রতিষ্ঠা (Power corrupts and absolute power corrupts absolutely)।

স্বাধীন ভারতেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। রক্তের আস্বাদ পাইলে যেমন ব্যাঘ্র হিংস্র হইয়া ওঠে, ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া কংগ্রেসী দলও তেমন হিতাহিত ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল। দেশভক্ত প্রকৃত কংগ্রেস-সেবক ও ভক্ত ছাড়াও অনেকে ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় কপালে তিলক কাটিয়া—এক্ষেত্রে খদ্দর ও গান্ধিটুপি—স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের দলে যোগ দিল ও নেতা সাজিল। যাহারা এক বৎসর আগেও ইংরেজের ভক্ত ছিল ও সাহেবী পোষাক পরিত—তাহারা অবিলম্বে হ্যাটকোটের বদলে ধুতি ও গান্ধীটুপি পড়িয়া দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিল। তাহারা স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কোন ধর্মের ধার ধারিত না। নীতির বালাইও তাহাদের ছিল না—সুতরাং অধিকাংশ খাঁটি কংগ্রেস সেবক ও দেশপ্রেমিক তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না। অর্থ-নীতির একটা সিদ্ধান্ত এই যে বাজারে একবার জাল টাকার আমদানি হইলে খাঁটি টাকা লোপ পায়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। খাঁটির বদলে মেকীই বাজারে চলিতে লাগিল।

অযোগ্য লোক উচ্চপদ অধিকার করিলে তাহার রক্ষার একমাত্র উপায় কর্তাকে স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করা। কংগ্রেসী-দলে এই নীতির ফলে পণ্ডিত জওহরলালকে সন্তুষ্ট রাখাই কর্তব্য ও কূটনীতির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিল। স্তুতির মাহাত্ম্য আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বিলক্ষণ জানিতেন। স্বয়ং মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া কত অধমকে বর দিয়াছেন পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যখন দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবস্থা তখন জওহরলালকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনিও ক্রমে ক্রমে দেবতার পদ গ্রহণ করিলেন—এবং কংগ্রেসী দল তাঁহার বাক্য ও কার্যের অভ্রান্ততা প্রাণপণে ঘোষণা করিল। সুতরাং জওহরলাল কেবল আপ্তবাক্য ও সত্যদ্রষ্টা নহে সত্যপন্থার একমাত্র স্রষ্টা হইলেন। গণতন্ত্রের শবদেহের উপর দেবাদিদেবের চতুর্দিকে তাঁহার ভূত প্রেতগণ নৃত্য আরম্ভ করিল।

পরবর্তী ঘটনাগুলি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত। একবার ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহা বজায় রাখা শক্ত নহে। অর্থের অভাব হয় না অপ্রতিহত ক্ষমতা যাহাদের হাতে—যাহারা এক কলমের আঁচড়ে ছোট ও বড় ধনী ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করিতে পারে তাঁহাদের তুষ্টির জন্য ইহারা খোলাখুলি চাঁদা দিতেন আবার কংগ্রেসের কার্যবিবরণীর এক পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সহস্রাধিক (মুদ্রা কখনও বেশী) দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তার পর আছে পার্মিট, লাইসেন্স, কন্ট্রোল। স্বর্ণ সুযোগ। ব্যবসায়ীরা নিজেরা যাচিয়া কেবল কংগ্রেসকে নহে প্রতিপত্তিশীল কংগ্রেসনায়ককে (অনেক সময় চুনোপুঁটিকেও) টাকা দিতে লাগিল কারণ তাহারা বেশ জানিত একলাখ টাকা এইভাবে খাটাইলে অক্লেশে পাঁচ লাখ ঘরে আসিবে। সাধুত্বের খাতিরে এইরূপ প্রলোভন জয় করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নহে। সুতরাং দাতা বা গ্রহীতা কাহাকেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না—দোষ তাহাদের যাহারা এইরূপ সুযোগের সৃষ্টি করে। নির্বাচনের সময় অনেক কংগ্রেস নেতা যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ঘুষের অনেক শ্রেণীভেদ আছে। কেহ নিজে ঘুষ নেন না কিন্তু যাহারা নেয় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন—যথাসম্ভব এবং যতদিন সম্ভব বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। কারণ কংগ্রেস দল বজায় রাখিতে হইলে তাহাদের সাহায্য মূল্যবান। কেহ নিজে ঘুষ নেন না কিন্তু পুত্র পরিবারকে ব্যবসায়ে বা

অন্য উপায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে সাহায্য করেন—অর্থাৎ তাহারা কর্তার নাম ভাঙ্গাইয়া খায় এবং কর্তা তাহা জানেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ক্যাইরণের তদন্তে এ সকল রহস্যের প্রকট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—মন্ত্রী মালবিয়া ও সিরাজুদ্দিনের ব্যাপারও সুপরিচিত। কিন্তু এগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র। বস্তুতঃ এরূপ যে কত আছে কে বলিবে। সরকারের ভাবটা এই যে মন্ত্রীদের দুর্নীতি প্রমাণ করিবার ভার দেশের নাগরিকদের উপর—তাহারা সন্দেহের যথেষ্ট কারণ দেখাইলেও সরকার সহজে অনুসন্ধান করিতে রাজী হন না। দুই একটি তদন্ত কমিশন বসানোর ফলে এত গলদ বাহির হইয়াছে যে সম্প্রতি সরকার স্থির করিয়াছেন আর এরূপ কমিশন বসান হইবে না। বেচারা নন্দার 'সদাচার সমিতি' যে কংগ্রেস নেতাদের মনঃপূত হয় নাই ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

নির্বাচনে কংগ্রেস যে জয়লাভ করে তাহার মূলধন কিরূপে সংগৃহীত হয় তাহার কিছু নমুনা দিলাম। কিন্তু আরও নানা উপায়ে কংগ্রেস গোড়া হইতেই নির্বাচনে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখে। সংবাদ পত্রে বহু সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে সেগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর গলায় সত্য কথাও বলিতে সাহস করে না কারণ মোটা রকম টাকা লোকসান হইবে। নিরপেক্ষ নির্ভীক স্বাধীন মতাবলম্বী সংবাদ-পত্র গণতন্ত্র রক্ষার প্রধান উপায়—আমাদের দেশে এরূপ সংবাদ পত্র এখন আর নাই বলিলেই হয়। তারপর যে সব লোকের ভোট জোগাড় করার ক্ষমতা আছে—তা সে যে কোন উপায়েই হউক—অন্য সকল গুণের অভাব থাকিলেও তাহারাই দলের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের টাকায় প্রতি গ্রামে পঞ্চাইতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিনা খরচায় কংগ্রেসের স্বপক্ষীয় নির্বাচন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস সভ্যরা বলিয়া থাকেন কংগ্রেসকে ভোট না দিলে সে অঞ্চলে রাস্তা ঘাট নলকূপ প্রভৃতির কোন উন্নতি হইবে না। ভোটদাতাদের ইহাও জানা আছে যে কংগ্রেসকে ভোট না দিলে কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হইতে হইবে এবং নানা রকমে উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নানা উপায়ে ভোট সংগ্রহ করা কঠিন নহে কারণ ভোটদাতারা অধিকাংশই নিরক্ষর, দেশের রাজনীতি কি তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সুতরাং টাকা দিয়া বা ভয় দেখাইয়া তাহাদের—অনেক স্থলে তাহাদের সর্দারদের—হাত করা খুবই সহজ। একবার গদীতে বসিতে পারিলে এই সব এবং এই রকম আরও অনেক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা যায়, যাহা অন্য কোন দলের পক্ষে সম্ভব নহে। হস্তগত শাসনযন্ত্রের এইরূপ অপব্যবহার দেশের পক্ষে অনিষ্টজনক-কিন্তু সেদিকে কংগ্রেস নেতাদের লক্ষ্য নাই। কারণ ভোটের উপর কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য; যে কোন উপায়ে হউক দলের প্রাধান্য বজায় রাখা। হয়ত কংগ্রেস নেতারা মনে করেন যে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা না থাকিলে এদেশের সর্বনাশ হইবে। অতএব দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও কংগ্রেসকে শক্তিশালী রাখিতে হইবে; এবং এই যুক্তি দ্বারাই নিজের মনকে প্রবোধ দেন (কারণ বিবেকের দংশন যে কংগ্রেস দলের কেহই অনুভব করে না—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই)।

সুতরাং দেখা যাউক কংগ্রেস দেশের স্বার্থ কতটা রক্ষা করিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—বড় জোর ৪।৫ লাখ লোক বাদ দিলে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকই মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন—তাহাদের অবস্থা কি। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে—সম্প্রতি চাউল গম তেল মাছ, চিনি প্রভৃতি কেবল দুর্মূল্য নহে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা' একথাটার অর্থ আজ বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রভাত হইলেই চিন্তা-কিভাবে অন্নের সংস্থান হইবে অর্থাৎ চাউলের 'কিউ' তেলের 'কিউ' রেশন দোকানের কিউ—প্রত্যেকটিই প্রায় শত শত গজ লম্বা—কোথায় কাহাকে পাঠান যায়। ভেজাল-বিহীন খাদ্য কি রকম তাহা লোকে

ভুলিয়া গিয়াছে। সরকার নানা রকম সম্ভব অসম্ভব উপায় বাৎলান কোনটাই কাজে লাগে না। কিন্তু প্রচুর অর্থব্যয় হয় আর তাহা বহন করিতে হয় প্রধানতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—কারণ তাহারাই বেশীর ভাগ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর দেন—ধনীরা অনেকেই আয়-কর এড়াইবার কৌশল জানেন। ক্রোড় ক্রোড় টাকা অনাদায়ী কর ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কংগ্রেস ফণ্ডে টাকা দিয়া যে অনেকে এই কর এড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ অভাবের দিনেও এই ক্রোড় ক্রোড় টাকা আদায়ের সুব্যবস্থা হইতেছে না। দেশের যত কিছু অভাব অভিযোগ তাহার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিজেদের ঘাড়ে ছাড়া আর সকলের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে ব্যস্ত। যাহারা গোপনে মজুত করে (hoarder) তাহাদেরই সকল অপরাধ এবং খাদ্য সংকটের জন্য একমাত্র তাহারাই দায়ী। যাহারা খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া দলবদ্ধভাবে আন্দোলন করে তাহারাই নাকি সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভণ্ডুল করিয়া দেয়। কিন্তু সরকার কেবল একটা কথার আলোচনা করেন না। দেশের লোক সংখ্যা বাড়িতেছে—সে অনুপাতে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই কয়েকজন কৃষি-বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে বহু খরচ করিয়া বিদেশে পাঠান হইয়াছিল। শুনিয়াছি তাহারা ফিরিবার পূর্বেই সমস্ত পরিকল্পনা ফাইলের তলায় অদৃশ্য হইল। কৃষির কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই কিন্তু প্রত্যাগত কৃষি-বৈজ্ঞানিকের একজন প্রথমে পশ্চিম-বাংলায় পরে দিল্লীতে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হইয়াছিলেন (সম্ভবতঃ এখনও আছেন)।

খাদ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস সরকারের যত্ন ও উৎসাহের একটি নমুনা দিলাম। আর কি কি পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা জানা নাই—কিন্তু খাদ্যদ্রব্য যে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কারণ সুদীর্ঘ সতের বৎসর পরে এ দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এতদিন পর্যন্ত এই সব ছোটখাট তুচ্ছ জিনিষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বড় বড় পঞ্চবার্ষিকী কল্পনায় দ্বারা দেশের শ্রমশিল্প বাড়াইবার দিকেই কংগ্রেসের নজর ছিল-ইহাতেই যে দেশের যাবতীয় দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে ইহা পনর বৎসর ধরিয়া ঢক্কানিনাদের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বৃক্ষের পরিচয় ফলের দ্বারা। সেই বিচার করিলে দেখা যায় দেশে বেকার সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে—ধনীর ধন বাড়িতেছে দরিদ্র আরও দরিদ্র হইতেছে - জাতীয় আয়ের পরিমাণ যান যেটুকু বাড়িয়াছে-দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে তাহার অনেক বেশী! আজ অন্নের জন্য বিদেশের কাছে ভিক্ষা করিতেছি। অথচ কোটি কোটি মজুদ স্বর্ণমুদ্রা (ষ্টার্লিং) ছিল তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বিদেশের কাছে ঋণের সংখ্যা যে পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে মাথা তুলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তৃতীয় পরিকল্পনায়ও তাহার শতাংশের একাংশ সফল হয় নাই। অথচ নানা প্রকার করের অসম্ভব বৃদ্ধিতে দেশের সর্বনাশ হইতেছে।

সরকারের বড় বড় পরিকল্পনায়ও যেমন, ছোট ছোট অসংখ্য পরিকল্পনা সংস্কারের চেষ্টায় তেমনি, আশানুরূপ কোন ফলই হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও সততার একান্ত অভাব। অযোগ্যতার উৎপত্তির কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। অসাধুতা যে শাসনের সমস্ত বিভাগে—মাথা হইতে পা পর্যন্ত কিভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সাধারণের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ঘুষ না দিলে কোন কাজ উদ্ধার করা যায় না। ইহা যে বহু পরিমাণে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা কেবল মাত্র সাধারণ লোকের ধারণা নহে। এ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি শ্রীপ্রকাশের উক্তি বিশেষ

প্রণিধানযোগ্য। তিনি ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। পণ্ডিতজী মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্বে ডেরাডুনে অবস্থানকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ভাই কেমন আছ'—ইহার উত্তরে শ্রীপ্রকাশ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন—উহার দুইটি কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। প্রথমতঃ তিনি পণ্ডিতজীকে বলিলেন 'ভাই তোমার রাজ্যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সুখে বা শান্তিতে থাকা অসম্ভব' (ইহার কারণও দেখাইলেন)। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সদাচার সমিতির (বা ঐ শ্রেণীর আর কোন সমিতির) সভ্য হইতে স্বীকৃত হইলে না কেন? শ্রীপ্রকাশ বলিলেন—ঐ সমিতির সভ্য হইতে হইলে প্রথমেই এই অঙ্গীকার করিতে হয় যে আমি ঘুষ লইব না এবং ঘুষ দিব না। আমি প্রথমটি সই করিতে রাজী ছিলাম - কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সই করিতে পারি নাই—কারণ ঘুষ না দিলে আজকাল জীবনযাত্রা অসম্ভব ইহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি সবিস্তারে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী ডেরাডুন ছাড়িবার পূর্বে শ্রীপ্রকাশকে অনুরোধ করিলেন—এ সম্বন্ধে তাঁহাকে চিঠি লিখিতে। একদিন কি দুই দিন পরে যখন শ্রীপ্রকাশ চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন সংবাদ পাইলেন পণ্ডিতজী আর ইহজগতে নাই। মনে হয় যদি পণ্ডিতজী সর্বদা যো হুকুম (yes men) দলের দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিয়া শ্রীপ্রকাশের মত লোককে কাছে রাখিতেন তাহা হইলে ভারতের এত দুর্গতি হইত না। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই কারণ শ্রীপ্রকাশ কংগ্রেসের অনেক কার্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতেন, প্রিয় বন্ধুর খাতিরেও নির্বিচারে তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই।

এই ঘুষ নেওয়ার রীতি এমন সর্বব্যাপী হইল কেন তাহার কারণ অতিশয় স্পষ্ট। সংস্কৃত কবিতায় আছে রথের আগের চাকা যে পথে চলে পেছনের চাকাও সেই পথে চলে। পূর্ব বাংলার চলিত প্রবাদ আছে: 'আগের নৌকা যে পথে যায় পাছের নৌকাও সেই পথে যায়'। পারসী ভাষায় একটি বয়েৎ আছে 'রাজা যদি এক গ্রেণ অপকার্য সহ্য করেন তাহার দলের লোকেরা এক টন উৎপীড়ন করিবে।' কংগ্রেস সরকারেও তাহাই ঘটিয়াছে। মাথাওয়ালারা যাহা করেন সকলেই তাহার অনুসরণ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। কয়েক-দিন পূর্বে আমাদের একজন মন্ত্রী পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন এক পাহারাওয়ালা ঠেলাগাড়ীর গাড়োয়ানের নিকট হইতে চারি আনা ঘুষ লইয়াছে। তিনি অমনি গাড়ী থামাইয়া সেই পাহারাওয়ালাকে সাজা দিলেন—নিজের কাণ ধরিয়া ওঠা বসা করানো। কাজটি হয়ত খুব ভালই—কিন্তু চারি আনা ঘুষের জন্য পাহারাওয়ালার যেমন শাস্তি হইল-উচ্চ পদস্থ কংগ্রেস সদস্যগণের চারি হাজার বা চারি লক্ষ টাকা ঘুষের জন্য যদি সেই অনুপাতে নগদ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তবেই ঘুষ বন্ধ হইবার আশা থাকিত। প্রত্যেকেই নিজের মনকে বুঝাইবে যে উপরিওয়ালা মোটা মাইনা পাইয়াও যদি ঘুষ নেয় তবে আমি গরীব বাদ যাই কেন। এই ভাবে ঘুষ সর্বব্যাপী হইয়াছে এবং ইহা যে অন্যায় সে ধারণাও লোপ পাইতে চলিয়াছে।

এরূপ অনেক সংবাদ প্রায়ই শোনা যায় যে কোন কর্মচারী অধস্তন কর্মচারীর ঘুষ বা চুরির সন্ধান পাইলে দোষী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের কোন হোমরা চোমরাকে ধরিতে পারিলেই তাহার সাতখুন মাপ হয়। উপরিস্থ কর্মচারী ইঙ্গিত বুঝিয়া নিরস্ত না হইলে তৎক্ষণাৎ বদলি হয়। ন্যায্য ইনকম-ট্যাক্স দাবী করার অথবা ইনকম-ট্যাক্স ফাঁকি ধরার অপরাধে কর্মচারীরা টেলিগ্রামে বদলি হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্তও শোনা যায় - সাধারণ নাগরিকের পক্ষে ইহার সত্যতা নিরূপণ দুরূহ। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্টের যোগ্যতা ও সততার প্রতি লোকের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই এবং জনসমাজে গভর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তি একেবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই শ্রদ্ধা ও প্রতিপত্তির একান্ত অভাবই দেশের মধ্যে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ।

সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ারও এ গুলিই প্রধান কারণ। যে সর্ষে দিয়া ভূত তাড়াইতে হইবে সেই সর্ষেই যদি ভূতে ধরে তবে ভূতের প্রাধান্যই বজায় থাকে। মাথাওয়ালারা যদি ঘুষ নেয় বা অসাধুতার প্রশ্রয় দেয় তবে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অসাধুতা দূর হইতে পারে না। এদিকে পরিকল্পনা কেবল যন্ত্র দিয়া সফল করা যায় না, তাহার জন্য চাই যোগ্য মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী। সুতরাং যোগ্য মন্ত্রী বা সৎকর্মচারী যেখানে নাই, সেখানে পরিকল্পনার জন্য যেমন কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ বাড়িতেছে—অসাধুতাও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে—আর সকলেরই লক্ষ্য পরিকল্পনা বৃদ্ধি করা—কারণ ইহাতে যত বেশী টাকা ব্যয় হইবে ঘুষের পরিমাণও ততই বাড়িবে। যতদিন শাসন-পদ্ধতিতে অন্ততঃ স্বাভাবিক পরিমাণে সততা ও যোগ্যতার ব্যবস্থা না হয় ততদিন এই সকল বড় বড় পরিকল্পনা শুধু বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়। আজ দেশের সেই অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই শাসন-পদ্ধতিতে সততা এবং কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা। কারণ কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা না থাকিলে অধস্তন কর্মচারীরাও সাধারণতঃ অযোগ্য হয় এবং যোগ্য হইলেও তাহাদের যোগ্যতা কার্যকরী হয় না। আমাদের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মন্ত্রীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে অধীনস্থ কর্মচারী যে যোগ্যতা সত্ত্বেও ঠিক মত কাজ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পান না ইহার অনেক দৃষ্টান্তই সুপরিচিত।

কোন দিক দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি? ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদী বলিতেন যে কেরাণী সৃষ্টি করার জন্যেই তৎকালীন শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের শিক্ষা প্রণালীতে মানুষ সৃষ্টি হইবার তো কোন লক্ষণ দেখা যায় না! অপর দিকে ছাত্রেরা ভতি হইতে পারে না বলিয়া শোভাযাত্রা করিয়া ও অন্য উপায়ে অভিযোগ করে। পরীক্ষার প্রশ্ন মনোমত না হইলে শিক্ষককে মারে, নানা অজুহাতে কর্তৃপক্ষকে অবরোধ করিয়া রাখে। শিক্ষকেরা স্বল্প বেতনের জন্য তুমুল আন্দোলন ও ধর্মঘট করেন। কিন্তু শ্রমিকদের ধর্মঘটের মত তাহা সফল হয় না। কারণ শিক্ষালয় বন্ধ হওয়া অপেক্ষা কারখানা বন্ধ হওয়া গুরুতর সঙ্কট বলিয়া বিবেচিত হয়। একজন ডাক পিওন, চাপরাশি বা ট্রাম কণ্ডাক্টর অনেক শিক্ষকের অপেক্ষা বেশী বেতন পায় তবু তাহারা বেতন বৃদ্ধির ধর্মঘট করে এবং সফলও হয়। কিন্তু দেশের মানুষ গড়িবার ভার যাহাদের উপর তাহাদের আবেদন-নিবেদনে বিশেষ কোন ফল হয় না।

দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধ্বংসের পথে যাইতেছে—তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—কিন্তু শ্রমিকদের বেতন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইতেছে। গড়ে এই শ্রেণীর সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যা অনুপাতে শতকরা তিন হইতে পাঁচ—সুতরাং তিনজনের উন্নতির জন্য সাতানব্বই জন দুঃখ ভোগ করিতেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকল দেশে সকল যুগেই সমাজের ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই সম্প্রদায় লোপ পাইলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি লোপ পাইবে। কংগ্রেস শাসনের এই পরিণাম ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে।

কংগ্রেস ইংরেজআমলের যে সকল নীতির স্বাধ্যতঃ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পাইয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। আইনের সহিত শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার বিরোধ ঘটিলে শাসন নীতির যথোচিত পরিবর্তন না করিয়া আইনের পরিবর্তন এমন কি সংবিধান অনুসারে প্রতি নাগরিকের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) খর্ব করা; আদালতের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া অব্যাহত শাসন-ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা;

ইংরেজ রাজ ও ইংরেজ কর্মচারীর (বর্তমান ক্ষেত্রে কংগ্রেস রাজ ও কংগ্রেস নেতাদের) সপক্ষে যাহারা বলিবে তাহাদের পুরস্কার ও উন্নতি এবং বিপক্ষে যাহারা বলিবে তাহাদের উপেক্ষা, লাঞ্ছনা ও অবনতি ; স্বাধীন মত প্রকাশ, জনসভা ও শোভাযাত্রা করিয়া প্রতিবাদ জানান প্রভৃতি গণতন্ত্রানুমোদিত প্রণালী কেবলমাত্র শাসন ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, এবং ইহার জন্য রাজ্য রক্ষা আইন (Defence of India Act) প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত সামরিক বিধানের অপব্যবহার ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বৈদেশিক নীতির প্রশংসায় কংগ্রেস পঞ্চমুখ কিন্তু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ইহার কোনই ভিত্তি নাই।

প্রতি স্বাধীন দেশেরই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহার জন্য প্রয়োজন সামরিক প্রস্তুতি, বিদেশের সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করা ও বহির্জগতের মতিগতির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা। চীনের আক্রমণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই তিনটির কোনটিই আমাদের ছিল না। আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল সূত্র ছিল বিশ্বমৈত্রীর মহান আদর্শ প্রচার কিন্তু রূঢ় বাস্তবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা। চীনের সহিত সন্ধি এবং তাহার ফলে তিব্বতের বলিদান স্বাধীন ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির দুরপনেয় কলঙ্করূপে চির-দিন বিঘোষিত হইবে। তিব্বত চীনের হস্তগত হইলে যে ভারতের সমূহ বিপদ একথা জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহুবার বলা হইয়াছে—কলিকাতায় আহূত তিব্বত কনভেনশনে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কংগ্রেস এই কনভেনশন বর্জন করিয়াছে, আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রী প্রকাশ্যে পার্লামেন্টে ইহা লইয়া উপহাস করিয়াছেন। তারপর সত্য সত্যই যখন পঞ্চশীলের মালা জপিতে জপিতে চীনা সৈন্য ভারতে গুটি গুটি হানা দিল তখনও কংগ্রেস সরকার অনেক বৎসর পর্যন্ত তাহা গোপন করিয়া রাখিলেন। যখন চীনারা ভীমবেগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করিল তখন উত্তর পূর্বদিকে আমরা যুদ্ধ করিতে করিতে একেবারে তেজপুর পৌছিলাম—সেখানকার লোকজন ও সরকারী কর্মচারী কোনমতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এই যুদ্ধের বিশেষত্ব এই যে ভারতীয় জওয়ান চীনের হাতে সহস্রাধিক বন্দী হইল বহুশত হতাহত হইল। কিন্তু একটি চীনা সৈন্য হত, আহত বা বন্দী হইয়াছিল এরূপ কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধের কাহিনী আছে বলিয়া আমার জানা নাই। স্বাধীন ভারত যে কত দুর্বল, অসহায় ও অন্তঃসারশূন্য ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চীন আপাততঃ নিরস্ত হইল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাকালে এশিয়া মহাদেশে তাহার যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। তাই আজ ভারত সন্তান ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত, সিংহলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পাকিস্থান সীমান্তে বহুবার হানা দিয়া ভারতবাসীকে হত্যা করিয়াছে তাহার ঘরবাড়ী লুন্ঠন করিয়াছে। আমরা মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া কিছু করি নাই। সহস্র সহস্র হিন্দু নর-নারীর প্রতি পাকিস্তানে অমানুষিক অত্যাচার আজ ১৭ বৎসর ধরিয়া প্রায়ই সংঘটিত হইতেছে আর আমরা ভীরু অসহায় শিশুর মত আর্তনাদ করিতেছি। আমাদের স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রীর অতি সাফল্যমণ্ডিত বৈদেশিক নীতির এই পরিণাম। মহান আদর্শের বক্তৃতা দিয়া দেশ বিদেশে বাহবা পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু যদি ফলের দ্বারা বৈদেশিক নীতির বিচার করিতে হয় তবে বলিতে হইবে আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়াছে। কাশ্মীর-পাকিস্থান-চীন এর কোন সমস্যারই মীমাংসা দূরের কথা, সমাধানের পথেও অগ্রসর হয় নাই।

কংগ্রেসের বহু-প্রশংসিত বৈদেশিক নীতির মূল কথা কোন-পক্ষের সহিত যোগ না দেওয়া (non-alignment), অর্থাৎ আমরা কাহারও তোয়াক্কা রাখি না। কিন্তু চীনারা আক্রমণ করিলে সকল পক্ষের নিকটই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাড়াইয়াছি। তাহারা দয়া করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ভিক্ষার দানে দেশরক্ষা কি সম্ভব না তাহা গৌরব করিবার মত বস্তু। কিন্তু এই নীতির বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র আলোচনা করিলে কংগ্রেসীদল ক্ষেপিয়া উঠে—নেহরুর বুদ্ধির উপরে যে সন্দেহ মাত্র করে সে পাকিস্তান-চীনা বিক্রীত। কনভেনশনের সময় কয়েকজন প্রসিদ্ধ নেতা ইহার সহিত যোগদান করেন নাই, কারণস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে নেহরু থাকিতে অপরের এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কিন্তু নেহরু নীতির প্রত্যক্ষ ফল ও পরিণাম দেখিয়াও যে কংগ্রেসী দল সচেতন হইয়াছে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

ফেষ্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য আমাদের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে
ফেষ্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

এছাড়া আমাদের দীর্ঘমেয়াদী রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা আছে।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

FDS/UB 108

S U M A N A

(SEWING MACHINE)

An
OUTSTANDING PRODUCT
OF
THE EAST

SOLE SELLING AGENTS

AALOKA SYNDICATE

Bullion Association Building
ZAVERI BAZAR
Bombay—2

Telephone { 326670 / 326613 }

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমকালীন জগৎ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে ভাষণ-কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মানুষ যে শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তা'তে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।"

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি একান্তভাবে কল্পনা-রাজ্যে বাস করার গ্লানি থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান এমনি করে আমাদের জানিয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র প্রবর্তনা ও সমস্যার ডাকে মানুষকে সাড়া দিতে হবে। নইলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দেশকেও তিনি শুধু কল্পনার সামগ্রী করেন নি। যিনি ভারতের রূপ-বর্ণনা উচ্ছ্বসিত হয়ে গেয়েছেন—'ঐ ভুবনমনমোহিনী' তিনিই আবার ভারতকে যথার্থভাবে দেখতে হলে কি ভাবে দেখা উচিত সেটার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপর শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণস্বরে বীণা বাজাইতেছেন এ কথা ধ্যান করা নেশা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।" (ছাত্রদের প্রতি ভাষণ)

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ মহাকবি দেখেছেন আমাদের গ্রামগুলিতে। বলছেন—"মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই, এইখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। সেই আসন অনেক কাল প্রস্তুত হয় নাই ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে সহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা অনেক কাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজ-বন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে।"

বলছেন কবি—"বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতে রসের যোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণ-নাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে এই গ্রামে গাঁথা দেশকে।" (শিক্ষার বিবরণ)

তাঁর প্রাণের মাতৃভূমিকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। ১৩১৩ সালের ৪ঠা কার্তিক তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লেখেন—"তোমরা বাঁচাও এই দেশকে। অন্ন দাও, শিক্ষা দাও, ধর্ম দাও।…দেশে যখন ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে এখানে করবার জিনিস অনেক আছে কিন্তু করবার পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়, এখানকার হাওয়া আলস্য

জড়তার বীজে পূর্ণ।...দেশব্যাপী ক্ষুদ্রতার ভারাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। এখানে সমাজের মধ্যে উৎসাহের লক্ষণ নেই—নিজের ভিতর থেকে কল্যাণের উৎসকে উৎসারিত করতে হবে। এই ক্ষুদ্রতার সপ্তরথী বেষ্টনের মধ্যে পড়ে হতাশ হোয়ো না। প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যখন আশু সফলতার লক্ষণ দেখতে পাবে না তখন যেন নিজের বা দেশের বা বিধাতার উপর রাগ করে হাল ছেড়ে দিও না। মনে এ কথা স্থির রেখো যে, সিদ্ধিই যে একমাত্র লাভ তা নয় সাধনাও বড় লাভ।"

কি করে আমরা দেশকে ত্রাণ করবো এই দুর্গতি থেকে, আমাদের চরিত্রের কোন গলদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে তারও নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তিনি বলছেন—"দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম থেকে।" (সত্যের আহ্বান) তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে শুধু জ্ঞানের বড়াই করে দেশকে বাঁচানো যাবে না। তাঁর কথায়—"কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।"

আর সেই জ্ঞান, উদ্দেশ্য ও কর্ম সবই নিষ্ফল হয়ে যায় যদি মানবপ্রেম হৃদয়ে না থাকে। প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় যে কর্ম সে কর্ম কখনো মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই।...প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা"। (লোকহিত)

এই দরদহীন দাতাগিরির মনোভাব একান্ত অশ্রদ্ধের। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"যদি তোমার গ্রামের লোকেরা দেখতে পায়, অন্তরে অনুভব করে তাহলেই ওরাও হৃদয় দিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারবে। কুকুরকে যেমন দূর থেকে হাড় ফেলে দেয় সে রকম যেন না ঘটে। একেবারে বুক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়।"

দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তখন তারা যে চোখে দেখে তার বর্ণনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমরা ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এই ভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে। (গ্রামবাসীদের প্রতি)

বলছেন—"এখানে চালের কল আছে। সেই কলদানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখ দুঃখের কি হিসেব আছে? প্রতিদিনের পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে বসে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছুই থাকে না।"

(গ্রামবাসীদের প্রতি)

তাই একান্ত দরদহীন উপর-তলার-মানুষদের-পরিচালিত এই সমাজ-ও-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নেই। এটা ঘটতে বাধ্য কেন না রবীন্দ্রনাথের-কথায় "ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।"

তাই উন্নাসিক দাতাগিরির মনোভাব সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে যদি আমরা মানুষের কল্যাণসাধনকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করি। মানব-প্রেমের উৎস থেকে যে কর্মের ধারা প্রবাহিত হয় নি সে কর্ম ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য, সে কর্মের

ফসলে পোকা ধরবেই ধরবে। তাই মানব-প্রেমকে অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করে তারি সুরে কর্মের সুর বেঁধে নিতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে বলেন—"যারা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মত করে যা হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কি পল্লী, কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত, প্রেত, ওঝা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্যে শিক্ষার একটুখানি যে কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষা করা চাই।"

অধিকাংশ কর্মীদের কাছে দেশ হৃদয়-আবেগের বস্তু, ভাবালুতার সামগ্রী থেকে যায়। দেশের মানুষদের জীবন-ধারা যে বিচিত্র প্রবাহে বয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বলেই চলে। গ্রামের ছড়া, গান, পূজো পার্বণ, প্রচলিত কিম্বদন্তী, আচার প্রভৃতি থেকে গ্রামবাসীদের জীবন-ধারার যে ইতিহাস জানা যায়, তার সংগে শিক্ষিত সমাজের কোনো যোগ নেই। সেই ইতিহাস থেকে যে অনেক কিছু জানবার ও বোঝবার আছে সেটা শিক্ষিত সমাজের লোকেরা স্বীকারই করে না। জ্ঞানের অভাবকে ঢাকা দেয় তারা সব কিছুকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে। এই কেতাব-দুরস্ত মনোভাব নিয়ে যে দেশের কোনো কল্যাণই করা সম্ভব নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুযুগ আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—"য়ুরোপের দিকে আমরা চেয়ে আছি আমাদের দেশকে জানার জন্য। তাদের গল্প, নাটক, কাব্য সাহিত্য পড়ে তাদের সমাজ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়। আমাদের দেশে যারা মা ষষ্ঠী ওলাবিবির আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে যে তথা-কথিত ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ খুব উপরে উঠেছে তা নয়—তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। পাশের গ্রামের লোকের আচার, বিচার বিধিব্যবস্থা জানার জন্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিত-দের দিকে চেয়ে আছে শিক্ষিত জন। বিরাট দেশ যে সমাজ-বিজ্ঞানের বৃহৎ নিকেতন এ কথা আমাদের চিন্তায় নেই। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রীধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্য অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোক আমাদের বিদেশী।" (পল্লীসেবা)

তাই মঞ্চাশ্রয়ী অতি-মুখর দেশাত্মবোধের সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথ চিরদিনই সন্দেহ পোষণ করতেন। নবজীবনের উদ্ভব নীরব সাধনার মৃত্তিকা থেকে। কোলাহলে ও উত্তেজনায় যদি সব শক্তি ব্যয়ই হয়ে যায় তাহলে সৃষ্টির জন্যে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর দেশবাসীদের গ্রামের দিকে ও নীচের তলার অগণিত মানুষের দিকে মুখ ফেরাতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রাজ-দরবারে আবেদন-নিবেদনে যে শক্তির আমরা অপব্যয় করছি সেই শক্তি যদি আমাদের ক্ষেতের আগাছা তুলতে আমরা নিয়োগ করি তাহলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। এই কথাই তিনি পাবনা কনফারেন্সে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। তাঁর কথা সেদিন উপেক্ষিত হয়েছিলো। পাবনা কনফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা স্মরণযোগ্য—"পাবনা কনফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্র-নেতাকে বলেছিলুম আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটিকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম

যে আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।··· সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি—শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে—কিন্তু দেশের যে উপরি তলায় শব্দের আবৃত্তি হয়—সেইখানেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।" (রাশিয়ার চিঠি)

গভীর বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে "দেশের দুঃখ দূর করবার জন্যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন দেশের মানুষের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্যকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস নেই। ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিকেই দেশের জন্যে 'হাতেকলমে' কাজ বলেন।" (হাতেকলম)

১৩১৪ সালের ১৭ই পৌষ-তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামের কাজ সম্বন্ধে লিখলেন—"আসল কথা আমাদের এখনকার কর্তব্য আমাদের দেশের নীচের স্তর থেকে শিক্ষার কাজ আরম্ভ করা—সেই সব সাধারণ লোকদের মধ্যে দল বেঁধে তাদিগকে নিজেদের হিতসাধন ব্যাপারে অভ্যস্ত করা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বক্তৃতাবায়ু উদ্দাম হয়ে উঠেছে এবং দ্বেষহিংসার ঢেউও উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে অরণ্যে রোদন করে কোনো ফল নেই।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই পল্লী সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন এই বক্তৃতাবায়ুতরঙ্গিত শিক্ষিতসমাজের আওতা থেকে সরে গিয়ে। ১৩১৩ সালে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে এই সময়ে তাঁর চিন্তা-ও-কর্মের ধারা কোন দিকে বইছিলো তার হদিশ পাই। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"কিছুদিন হইতে আমি 'পল্লীসমিতি' স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমাদিগকে এখন পল্লীর patriotism জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি প্রতি পল্লীর সকল অভাব মোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি।···আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ পল্লীসমিতিতে আমাদের এখন হইতেই হাতে খড়ি করিতে হইবে।"

কিন্তু এই আত্মশক্তি চালনা কোন পথ ধরে চলবে? গ্রাম্যজীবনের পঙ্কিল জলাশয়ে নবজীবনের স্রোত কোন দিক থেকে আসবে? চাষ যে প্রণালীতে এতো দিন চলে আসছে সেই প্রণালী বজায় রেখে, গ্রাম্য-শিল্পগুলি যে নির্মাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে যুগযুগান্ত ধরে সেই প্রণালী ও নির্মাণ-পদ্ধতি অটুট রেখে কি গ্রামের জীবনে সত্যিকরে পরিবর্তন আনা সম্ভব? পল্লী-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পল্লীর জীবনকে মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সামগ্রী হিসেবে দেখেন নি। পরিবর্তন আনতেই হবে গ্রামের জীবনে আর সে পরিবর্তনের স্রোতে জীবনধারণপ্রণালীর বহু সংস্কার ভেসে যাবে। ওঝা, মাদুলী, বনবিবি, দক্ষিণারায়—এই সব ভাসিয়ে না দিতে পারলে সত্যি করে কোনো সংস্কার সম্ভব নয় গ্রাম্যজীবনের। যা কিছু পুরাতন তা সবই অপূর্ব ও সেগুলি সবই ভারতের জীবন-নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক—এই রোম্যানটিক অজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমকে কখনো কলুষিত করে নি। যেখানে দেশবাসীর অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন উঠেছে সেখানে তাঁর মন একেবারেই কল্পনাশ্রয়ী কবির মন নয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য দেশবাসীদের আহ্বান করেছেন।

তিনি বলছেন—"এ কথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবলে হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতেই দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতো বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর নেই।" ১৩১৩ সালে

শিলাইদহের চাষীদের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি ছড়িয়ে দেবার উপদেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র রায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলেন—"প্রজাদের বাস্ত বাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য; শিমুল, আঙ্গুর প্রভৃতি গাছ বেড়ার কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কি রূপ খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।......কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশ মতো চেষ্টা করিবে।"

জমিদারী প্রথা যে চাষীদের উন্নতির অন্যতম বাধা সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সংশয় ছিলো না। ১৩১৪ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"নিজের কর্মশক্তির উপর নিজে নির্ভর করবার মতো শিক্ষা আমরা বাল্যকালে হতে পাই নাই, সেইজন্যে আজ এমন পঙ্গু হয়ে আছি—সেইজন্যে নিজে কোনো কর্ম না করে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে পৃথিবীর parasite এর মত জীবন যাপন করচি, হাতে আর কোনো উপায় নেই—এই জীবিকায় আমার বড়ই ধিক্কার জন্মেছে।" ১৩১৫ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"রথীরা ফিরে এলে তার পরে ওদের কর্মক্ষেত্র ঠিক করে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ইচ্ছা এখানে প্রজাদের মধ্যে থেকে ও কাজ করে। কারণ এই প্রজারাই ওকে শিক্ষার খরচ জুগিয়েছে, সেই ঋণ ওর শোধ করে দেওয়া কর্তব্য। আমার খুব ইচ্ছা, এদের সঙ্গে রথী co-operative system এ কাজ করে। প্রজারা তাঁদের জমি এক করে মিলিয়ে রথীকে নিয়ে যদি বড় রকম চাষে প্রবৃত্ত হয় তো আমি খুব খুসি হই। এরা প্রতি বিঘায় গড়পড়তায় যত লাভ করে যদি প্রতি বৎসর আমরা লাভ হোক লোকসান হোক সেই টাকা এদের নিশ্চিত বেঁধে দিই এবং তার উপরে যে বছরে লাভ হবে তার উপযুক্ত অংশ তাদের দিই তাহলে নিশ্চয়ই এরা জমি দিতে কুণ্ঠিত হবে না। যে বছর গড়পড়তার চেয়েও কম উৎপন্ন হবে সে বারে ক্ষতিপূরণ করতে বেশী লোকসান হবে না—কারণ, তাদের labour ত জমির সঙ্গেই এই সর্ত্তে পাওয়া যাবে—সে জন্যে তো আর বেশী দিতে হবে না—তাদের দিয়ে তাদের জমি চাষ করাব, কেবল তাদের সুবিধে এই হবে যে দুর্বৎসরের জন্যে তাদের ভাবতে হবে না এবং হাল গরু বীজ খোরাকীর জন্যে মহাজনের দ্বারে তাদের দাঁড়াতে হবে না। জমিদারের খাজনাও কম্পানি থেকে দেওয়া হবে—মামলা মকদ্দমা অত্যাচার উপদ্রব কিছুই থাকবে না।"

আমেরিকায় কৃষি-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন-রত রথীন্দ্রনাথকে ১৩১৫ সালের ৭ই আষাঢ় তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"দেশে ফেরবার আগে একবার তোকে আমেরিকায় southern statesগুলো ঘুরে আসতে হবে। তারপর intensive culture study করবার জন্যে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও পর্যবেক্ষণ করে আসতে হবে। আমেরিকাতে জমির অভাব নেই—সেখানে বড় বড় ক্ষেত্রে বড় রকমের চাষ হয়—আমাদের দেশে এতবড় ক্ষেত্র কোনো এক জায়গায় এক সংলগ্ন পাওয়া অসম্ভব। এতএব এখানে চাষাদের শিক্ষা দিতে গেলে ছোট ছোট ভূমিখণ্ড কি করলে দুই একজনের চেষ্টায় যথা সম্ভব অধিক ফসল ফলাতে পারে তারই পরীক্ষা করা চাই। যন্ত্রতন্ত্রও খুব সাদাসিধে রকমের না হলে আমাদের চাষাদের কাজে লাগবে না। তবে চাষারা অনেকে সমবেত হয়ে যদি কাজ করতে পারে তাহলেই নানা হিসাবে ভালো হয় কিন্তু আমাদের দেশের হাওয়ায় কি চাষা কি ভদ্রলোক কোনোমতে সমবেত হতে জানে না।....ইতিমধ্যে

আমি আমাদের জমিদারীকে পাঁচ ছ'টা মণ্ডলীতে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলীতে পল্লীসমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা করচি।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা যে তিনটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলুম সেগুলি সবই ছাপ্পান্ন, সাতান্ন বৎসর আগে লেখা। তাই, নতুন প্রণালীতে ও নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গঠনের সমস্ত ধারণার উৎস ১৯১৭ সালের পরবর্তী কালের রাশিয়ার চিন্তাধারায় যারা খুঁজতে ব্যস্ত ও সেই রাশিয়া সমকালীন চিন্তাধারার উৎস প্রমাণ করতে উদ্‌গ্রীব, সেই রাশিয়া-বরদারদের নিরাশ হতে হবে। ষাঠ সত্তর বছর আগের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নতি সাধনের সমস্যা গভীর ভাবে ভেবেছিলেন ও হাতে কলমে সেই সমস্যার সমাধানের কাজে লেগেছিলেন। কো-অপরেটিভ কৃষি-ব্যবস্থার কথা তিনি ভেবেছিলেন এবং গ্রামে শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ধরণের হবে সে নিয়ে তিনি যে শুধু আলোচনা করেছিলেন তা নয়, শিলাইদহে চাষীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে শিক্ষায়তন পত্তন করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের কুটীর-শিল্প সুরু করে দিয়েছিলেন এলাকার বিশেষ অবস্থার সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে। কর্মী রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কর্মের মধ্যে ভাবালুতার আবিলতার চিহ্ন মাত্র নেই। তথ্য-নিষ্ঠা, বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সমস্যার বিচার ও স্বল্প পরিধির মধ্যে নীরবে তার পরীক্ষা—এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের কর্ম-রীতি।

তাঁর জমিদারীতে 'সাধারণ ফণ্ড' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফণ্ডের সমস্ত টাকাটা জমিদার দিতেন কিন্তু এই ফণ্ড পরিচালনা করতেন চাষীরা। এই ভাবে চাষীদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে, তাদের কর্ম-শক্তির জাড্য ঘুচিয়ে, গ্রামবাসীদের মনে খাঁটি পল্লী-প্রীতি উদ্বুদ্ধ করে গ্রাম-উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব বহন করবার উপযুক্ত করে তাদের তৈরী করে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একমাত্র এই উপায়েই গ্রাম্য-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের মত। নিজে জমিদার-পরিবার-ভুক্ত হলেও জমিদারী পেশার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কি রকম বিতৃষ্ণা ছিলো তা আগেই দেখিয়েছি। আরো দু একটি নজীর পেশ করছি এই প্রসঙ্গে। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"স্বেচ্ছাচার শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা, আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করিবে।"

প্রমথ চৌধুরী-লিখিত 'রায়তের কথা' ভূমিকায় জমিদার জীবটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারী দেখার ভার ন্যস্ত করেছিলেন। গ্রাম্যজীবনের নানান দিক খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে। মানুষের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের প্রতি জমিদার ও জমিদারের আমলাদের পশুবৎ আচরণ সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিব-হাল ছিলেন। এসম্বন্ধে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলে তাঁর জমিদারীর কর্মচারীদের সেটা উদ্ধৃত করি—"তারপর চলে গেলে. তিনি ম্যানেজারের সামনেই আমীনকে উপদেশ দিলেন,—"প্রজাদের মান দিয়েই জমিদারের মান। দেখো, নিজের দোষে, কোনো কারণেই যেন প্রজার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ কোর না।'' (জমিদার রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে যিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন সেই প্রমথ চৌধুরী তাই লিখেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি

সম্পূর্ণ জানি। কেননা তাঁর সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলার কাজ করেছি। …রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন, জমিদার হিসাবেও তেমনি unique।" (রায়তের কথা)

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে দেশের কাজ যখন শুধু শহরে বসে থিওরি আওড়ানোর নামান্তর ছিলো, তখন রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সালে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে "কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিষ নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।……আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করছি।" (পল্লীর উন্নতি)

আর 'রসালসজড়ত্ব'-এর সর্বনেশে বাঁধন থেকে দেশবাসীদের মুক্তি সাধন করাবার জন্য ১৩:১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"স্বার্থের মন্থন-দণ্ডের তাড়নায় তবেই আমাদের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব তাতেই 'আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। কাজে লাগলেই তর্ক-কীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাবে।"

আমাদের দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিলো এবং কি ভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করছি। এখন সেই আলোচনার পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া যাক, দেশের সীমানাকে মিলিয়ে দেওয়া যাক পৃথিবীর সীমানার সঙ্গে। সমকালীন জগতের স্বরূপ ও তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি ভেবেছেন ও বলেছেন সে দিকে নজর দেওয়া যাক।

সাচ্চা দেখনেওয়ালার দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজের কি রূপ ধরা পড়ছে? চোখে পড়ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের নিষ্ঠুর উদাসীনতা, রাক্ষসী লোলুপতার কাছে মানুষ-বলি আর ধনপতিদের মুঠোয়বাঁধা সমাজ-ও-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন "আজকাল চলছে যা কিছু সে ধনপতির হাতেই চলছে। …এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটা বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার। তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্দ্ধ-বেনে-রাজেশ্বর-মূর্তি।" (কালের যাত্রা)

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের সমাজপতিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এরা "যন্ত্র-বেদীর উপর তৃষ্ণা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।"

ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় এক দল মানুষ উৎপাদনের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করেছে, অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগ বিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত। স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশী দিন টিকতেই পারে না।"

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মুখের উপর থেকে মেকী সভ্যতার চিকন ঘোমটাটি টেনে তুলে দিয়ে কবি বলছেন—"মুনাফার লোভে, ক্ষমতার আকাঙ্খায়, মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনোই হয় নি।" (যাত্রী)

জগৎ-জোড়া মানুষের দুঃখের যে রূপ তাঁর মনকে পীড়িত

রয়েছে সে সম্বন্ধে বলছেন—"যে-দুঃখের কথাটা বলছি এই জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্তা রাহুগ্রস্থ। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এতো সহজ হল।······মানুষের ফুলে-ওটা পকেটের তলায় মানুষের চুপ্‌সে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। **সর্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিৎ আকারে দেখা দেয় নি** " (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী)

এই মুনাফা লোভী সর্বভুক পেটুকতা মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন হতে বাধ্য। মানুষ সম্বন্ধে একান্ত ভাবে দরদহীন না হতে পারলে মানুষকে শুধু মুনাফা-তৈরীর যন্ত্র হিসেবে দেখা কি কখনো সম্ভব হোতে পারতো? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে। সর্ব সাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়!"

(গ্রামবাসীদের প্রতি)

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মোড়লরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণ-ভাবে দখল করে নিয়েছে, লক্ষ্য তাদের মুনাফা লোটা সেটা স্বেচ্ছাচারতান্ত্রিক উপায়েই হোক আর তথা-কথিত গণতান্ত্রিক উপায়েই হোক। গণতন্ত্রের মোহ-বাষ্প দিয়ে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে এই বীভৎস লুটতরাজ আরো সুনিপুণ ভাবে ও স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে চালানো চলে। চলছেও তাই পৃথিবী জুড়ে। তার ফলটা কি হচ্ছে? ফলটা হচ্ছে মানব-সমাজে বৈপরীত্যের ক্রমবর্দ্ধমান স্ফীতি—একদিকে কতিপয়ের আরাম, সুখস্বাচ্ছন্দ, কুৎসিত ভোগ ও বিলাস, অন্যদিকে কোটি কোটি লোকের ভাগ্যে অর্দ্ধাহার, অনাহার, স্বাস্থ্যহীন, আনন্দহীন অস্তিত্ব। কিন্তু মানুষের এই দুর্ভোগের কারণ প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক। মুনাফা-ধর্মীদের হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র থাকায় তারা কৃষিজাত শস্য ও কারখানা-জাত সব দ্রব্য খুসি মতো আটক করে রাখছে, বাজারে শস্যের ও দ্রব্যের সংখ্যা কমাচ্ছে ও বাড়াচ্ছে মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে।

যে ফসল ও কারখানা-জাত পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সেটা যদি ঠিক ভাবে বণ্টন করা হোতো মানুষের কল্যাণের দিকে নজর রেখে, তাহোলে পৃথিবীর কোনো দেশে মানুষ অনাহারে কষ্ট পেতো না কিম্বা মরতো না। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে ভাবে প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে এনে কাজে লাগিয়েছে, সেই বিজ্ঞান-জ্ঞানলব্ধ শক্তি যদি পকেট-ধর্মী মুনাফাবাজ সমাজপতিদের হাতে না থেকে মানবকল্যাণব্রতী মানুষদের হাতে থাকতো, তাহোলে কি অন্য রকমই না হোতো এই পৃথিবীর চেহারা! জৈবিক তাড়নার দৈনন্দিন কশাঘাত থেকে মানুষ মুক্ত হোতো, মানুষের আত্মিক-সৃষ্টির স্রোতে সব গ্লানি ধুয়ে যেতো পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর মুখ এতো পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ থাকতো না, আনন্দ-উজ্জ্বল হোতো আমাদের এই পৃথিবী। মানুষের দুর্দশার এই সামাজিক কারণ দর্শাতে গিয়ে আমরা কতো কথাই না বলে থাকি। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা দিয়ে মানুষের উপবাসের কারণ যে সামাজিক সেটা কি চমৎকার করেই না আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—"ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেছে উপবাস।" (কালের যাত্রা)

প্রাকৃতিক কারণে রিক্ত-শস্য ফসলের ক্ষেতে উপবাস বাসা বাঁধে নি এ যুগে, মানব-সভ্যতাকে ধিককার দিয়ে সে বাসা বেঁধেছে ভরা ফসলের ক্ষেতে। তাই এই মুনাফা-ধর্মী সমাজ-ও-রাষ্ট্রপতিদের অত্যাচারের ফলে পৃথিবী জুড়ে সংঘাত সুরু হয়ে গেছে ভোগ-পরিতৃপ্ত কতিপয়ের সঙ্গে কোটি কোটি নিরন্ন মানুষদের—

"ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য-নামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন।"

বল্‌ছেন কবি—"প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা
বলি করেছিলো দান,
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ,
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানা-ছেঁড়া তারি,
দিকে দিকে যায় ব্যেপে,
রক্ত-পঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।"

যারা এই নরমাংসাশীদের কাড়াকাড়িকে ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে গিয়ে শান্তির বাণীর গিল্টি দিয়ে এই বীভৎসতাকে ঢাকতে চায়, অগ্নিজ্বালা বিদ্রূপে সেই নকল-ধার্মিকদের দগ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—

"ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গীর্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়,
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা ভীত প্রার্থনা-রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
স্তূপাকার লোভ বক্ষে রাখিয়া জমা,
কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা।"

বিধাতা এই ফাঁকা-ভক্তির অপমান কখনো সইবেন না। কল্যাণ-শক্তির তেজে ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত করে নূতন আলোকে নূতন দেশে নূতন জীবন বিকশিত হবে। মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন যে বিচারক তাঁর কাছে শক্তি-ভিক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ বজ্রবাণীর আশীর্বাদ চেয়েছেন যাতে করে তিনি এই শিশুঘাতী নরঘাতী বিভৎসতার উপর ধিক্কার হান্‌তে পারেন। কিন্তু যতো অন্ধকারই আজ আমাদের জীবনকে ঘিরে থাকুক না কেন, এ অন্ধকার বিলীন হবেই নূতন জীবনের আলোকে, এ যুগের এই পঙ্কিলতা ধুয়ে দেবে নব জীবনের দুর্বার স্রোত—শত হানাহানি ও বীভৎসার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস অম্লান রেখেছিলেন তাঁর অন্তরে। মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপর তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিলো অন্তহীন। আধুনিক কাল তার ক্ষণিকের কালো আবরণ দিয়ে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে যতোই ঢাকবার চেষ্টা করুক না কেন, মহাকবির কাল-জয়ী দৃষ্টি সেই আবরণ সরিয়ে মানুষের মহান সত্তাকে সহজেই দেখেছিল।

মানুষের সহজ মহত্ত্বে সম্পূর্ণ আস্থাশীল মহাকবি তাই আমাদের আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—এই প্রহসনের মধ্য অঙ্কে এই দুষ্ট স্বপনের শেষ হবে। শুধু পড়ে থাকবে পুড়ে-যাওয়া মশালের ছাই আর বাজবে কালে অদৃষ্টের অট্টহাসি।

বল্লেন তিনি—নিজের রক্ত শতধারায় পান করে এ কুৎসিত দানবী লীলা যখন শেষ হবে, এ পাপ-যুগের যখন অবসান হবে, তখন মানুষ আবার নির্মল হয়ে শুচি হয়ে তপস্বীর বেশে নতুন সৃষ্টির ধ্যানে বসবে। কামানের শব্দ সেই নতুন যুগের আগমনী ঘোষণা করছে।

আমাদের এই যুগ তাই বোঝা-পড়া-করবার যুগ, যাচাই-করার যুগ। যে ঝড় উঠেছে বিশ্বের আকাশে বিশ্ব-মানবের হৃদয় থেকে, সে ঝড় কঠিন ভাবে আমাদের যাচাই করবে। এই যুগান্তিকা ঝটিকা পালা-বদলের বারতা নিয়ে এসেছে—

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে।
জীর্ণ-যুগের সঞ্চয়েতে কি যাবে কি রইবে।
পলিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই উঠেছে বাজি।

সেই অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলছেন—"কী হবে মন্ত্ররে! কালের পথ হয়েছে দুর্গম। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।" (কালের যাত্রা)

রবীন্দ্রনাথ 'লড়াইয়ের মূল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৩২১ সালের (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের) পৌষ মাসের 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্য-বিস্তারপন্থী রাষ্ট্রগুলি কেমন করে এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তাদের স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছে সেটা রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন। সেই প্রবন্ধেই ভবিষ্যতের ইংগিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছু দিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকলেই বর্তমান যুগের পালা শেষ হয়ে নূতন মন্বন্তর পড়িবে।"

রাশিয়া থেকে ধার-করা চিন্তা ও কথা এ নয়, কেন না ১৯১৭ সালের রুশীয় বিপ্লবের বছর চারেক আগে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই চিন্তাটাই পরবর্তী কালের রচনা 'কালের যাত্রা' নাটিকাটির মূল সূত্র। এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে এ যুগে কালের রথের রশিগাছি রাজার হাতে নয়, পুরোহিত কিম্বা ধনপতি, তাদের হাতেও নয়। এদের ডাকে রথের রশি সাড়া দেয় না। এদের সাধ্য নেই এই রশি তুলে কালের রথকে টেনে নিয়ে চলবার। কিন্তু যেই সর্দারপাড়া থেকে সর্দাররা এসে সেই রশিতে হাত লাগালো অমনি সেই অনড় রশি কেঁপে উঠলো, তাদেরই টানে কালের রথ জীবনের রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চললো। এ যুগে কালের রথের রশি খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে, তাদের ডাকেই রশি সাড়া দেয়, তাদেরই শক্তিতে কালের রথ চলে।

চললো তো কালের রথ, রথের রশি তো তুলে নিয়েছে হাতে খেটে-খাওয়া মানুষের দল, কিন্তু সে রথ গিয়ে থামবে কোন ঠিকানায় গিয়ে? এতো কল্পনা-জগতের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, এযে মানুষের পথ-চলাকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাত্রা সুরু করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যটি কি? 'করতে হবে সব সমান'—রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনাগত ভবিষ্যতের সেই লক্ষ্যের কথা আগেই বলেছি।

এবারে তাঁরই কথা উদ্ধৃত করে তাঁর ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে ধরে দেওয়া যাক। ১৮৯৩ সালে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে' দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোন পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে।"

(ছিন্নপত্র)

দেখা যাচ্ছে যে একাত্তর বৎসর আগে যুবক রবীন্দ্রনাথকে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র ও অর্ধাশন দুঃখ দিয়েছে ও এই অসহনীয় অবস্থাকে যারা সনাতন বিধি বলে জাহির করছে ও কায়েম রাখবার চেষ্টা করছে তাদের রবীন্দ্রনাথ মোলায়েম ভাষায় কড়া-দিলের লোক বলে অভিহিত করেছেন।

এবারে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লেখা আর একটি চিঠি দেখা যাক। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলিকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। সোশালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধনবিভাগ করে দেয়, সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।" (ছিন্নপত্র)

নভেম্বর বিপ্লবের একুশ বছর আগে ধন-বিভাগের সোশালিষ্ট নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা তাঁর চিঠির এই উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট। ধন-বিভাগ যদি নিতান্তই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান নিষ্ঠুর বিধান—

এই মন্তব্য তিনি করেছেন। এর থেকে এও সুস্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের মনের টান কোন দিকে ছিলো। নিষ্ঠুর অর্থ-নৈতিক অসমতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শোণ-পঙ্কিল হিংস্র সমাজ-ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অন্তরের স্বীকৃতি দেননি।

এই বৈষম্যকে রক্ষা করবার জন্যে রাষ্ট্রের ও সমাজের মোড়লদের কথায় কথায় আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দেওয়ার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "ল অ্যাণ্ড অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দারোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড রেস্‌পেক্‌ট্‌ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী)

মুনাফা-ধর্মীদের এই দারোয়ানিতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমতাধর্মী সোশ্যালিজমের ধর্মতন্ত্রে মানুষকে পৌঁছতেই হবে। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ।

কিন্তু এই মুক্তি-সাধনার পথে চল্‌বার সময়ে রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য উপদেশটি, এই সতর্ক-বাণী সর্বদা মনে রাখ্‌তে হবে, যে "নূতন কালের প্রয়োজনটি তার নিজের কথায় ও আবেদন শুনে বিচার করা চলে না কারণ প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। আশু উত্তেজনা ও আকস্মিক মোহে সে তার যথার্থ প্রয়োজনের উল্টো কথাও বল্‌তে পারে। হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা আগাছা ফসলের ক্ষেতের প্রতিবাদ করতে পারে।"

একটি বিশেষ কালের দাবী যাদের মুখ থেকে সাধারণত ধ্বনিত হয় তাদের না আছে মানব-ইতিহাসের গতির ধারণা কিম্বা সেই গতির সূত্রের জ্ঞান, তাদের না আছে ইতিহাস-সচেতনতা কিম্বা মানব-সমাজের গতি-নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্যের ধারণা। তাই একটি বিশেষ কালের দাবীর চারণগিরি সাধারণত যে সব মানুষেরা করে থাকে তাদের দ্বারা উচ্চ-ঘোষিত কালের দাবী যে কালের যথার্থ দাবী সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে। কালের দাবী কালের অন্তরে নিহিত, তাই সে দাবী তিনিই বুঝতে পারেন ও সকলের কাছে ধরে দিতে পারেন যিনি ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, যিনি মানব প্রেমিক, মানুষকে যিনি রাজনীতির পাশাখেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন না, যাঁর দৃষ্টি আদর্শ-নিষ্ঠার দ্বারা শুদ্ধীকৃত ও আত্মরতির কলুষ-মুক্ত এবং যিনি উত্তেজনা ও মোহ দুই-ই বর্জন করে তথ্যের বিচার করেন ও সত্যের সন্ধানে অবিচলিত থাকেন।

তাই স্বার্থসিদ্ধিরত মানুষের অসংযত চীৎকারে যে দাবীগুলি সচরাচর কালের দাবী বলে ঘোষিত হচ্ছে, চীৎকারে অভিভূত কিম্বা আতঙ্কিত হয়ে সেগুলির যথার্থতা নির্বিচারে গ্রহণ করলে মানব-সমাজের বিপদ ঘটতে পারে কেন না "হঠাৎ-গজিয়েওঠা আগাছা ফসলের প্রতিবাদ করতে পারে।"

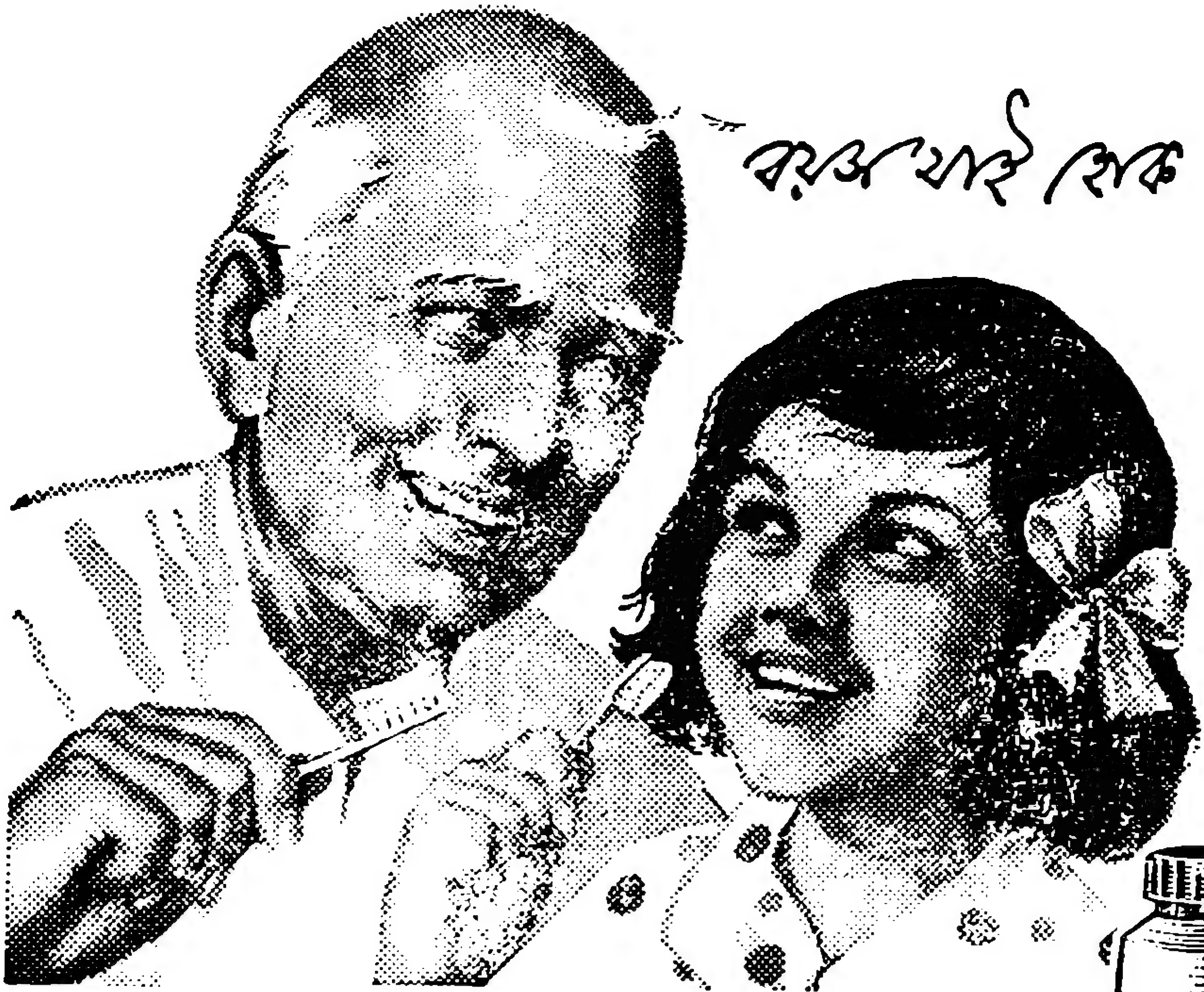

নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।

নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

নিম-এর তুলনা নেই।

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ কলিকাতা—২৯।

NTP/200 B

পরিকল্পনা ও বর্তমান মূল্য সঙ্কট

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

বর্তমানে আমরা যে, দ্রব্যমূল্য সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে, যে গত এক বৎসরের মধ্যে মূল্যস্তর শতকরা ১৪.৫ ভাগ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে টাকার দাম ১০০ পয়সা থেকে ৮৭ পয়সারও নীচে নেমে গেছে। এক বৎসরে এতটা নেমে যাওয়া বেশ অস্বাভাবিক। যারা মনে করেন এবং বলেন যে দেশের আর্থিক উন্নতির হার যদি আমরা বাড়াতে চাই তবে আমাদের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি সহ্য করতে হবে—তারাও এই হারে মূল্যবৃদ্ধির কথা ভাবেন না। অথচ গত দুই বৎসরে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ সেরকম কিছু বাড়ে নাই। মূল্যবৃদ্ধির অনুরূপ হিসাবে জিনিসপত্র সংগ্রহ-সঙ্কট যে আরো অত্যধিক পীড়াদায়ক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মূল্যস্তরের এই উর্দ্ধগতি যে অবিলম্বে রোধ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে সকলেই অবশ্য একমত। কিন্তু মতভেদ দেখা যাচ্ছে দুতিনটি বিশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে। প্রথমত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি বর্তমান মূল্যসঙ্কটের জন্য কতটা দায়ী—এ নিয়ে জনসাধারণ ও ধনবৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণ লোকের ধারণা এই মূল্যসঙ্কটের কারণ প্রধানত তিনটি,—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সরকারী কাজের গাফিলতী এবং ব্যবসায়ী মজুতদারদের সমাজবিরোধী লোভাকাঙ্ক্ষা। অধ্যাপক সিনয়পন্থী ধনবৈজ্ঞানিকগণও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অনেকাংশে দায়ী মনে করেন। সুতরাং তাদের মত এই যে তৃতীয় পরিকল্পনার বাকী দুই বৎসরে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনা এমনভাবে কেটে ছেটে ছোট করতে হবে যার ফলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা যেন আর না থাকে। প্রথম থেকেই আমরা পরিকল্পনা বাবদ এত বেশি অর্থ ব্যয় করতে লেগেছি যা আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের আয় এত কম যে আমাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। যতটুকু সঞ্চয় করা সম্ভব ততটুকু অর্থ আর্থিক-উন্নতিতে বিনিয়োগ করা হলে কোন অসুবিধার আশংকা নাই। কিন্তু সঞ্চয়ের অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করা হলে দেনা বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই সাধ্যাতীত অর্থব্যয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে। ফলে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এই মত কতখানি ঠিক এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মূল্যস্তরবৃদ্ধির সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্বন্ধ দুই দিক থেকে আসতে পারে। প্রথম, পরিকল্পনায় মোট যত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি সেই অনুপাতে বাড়ান না যায় তবে মূল্যবৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য। এদেশে অধিকাংশ লোকের আয় এত কম যে তাদের পক্ষে কিছু সঞ্চয় সম্ভব হয় না। সঞ্চয়ের ক্ষমতা রাখে এইরূপ লোকের সংখ্যা কম ও ফলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও খুব বেশি হয় না। সরকার কর বসিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এবং এই রাজস্ব থেকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাধারণ ব্যয়ের (বিনিয়োগের জন্য ব্যয় নহে) পরিমাণ বাদ দিলে সরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায়। সরকারী ও বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় হতে কম হয়, তবে বাড়তি বিনিয়োগব্যয় মিটাবার জন্য সরকারকে কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক ও অন্য ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে হবে অথবা অতিরিক্ত কাগজী নোট চালু করতে হবে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি হবে।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার প্রকৃতিও মূল্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক উন্নতির কাজে বহু অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। এর ফলে লোকেদের আয় বেড়ে যাবে। আয় বাড়লে ব্যয় বাড়ে। অর্থাৎ লোকেরা বেশি পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য কিনতে চাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তবে চাহিদার চাপে মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য। পরিকল্পনা যদি এমনভাবে গঠন করা হয় যে মূলধনজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে না, তবে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ঠিকমত বাড়বে না, অথচ ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায়ও মূল্যবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। ঠিকমত পরিকল্পনা গঠন করা হলে যে অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে সেই অনুপাতে এদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা এবং তাহা কার্যকরী করা প্রয়োজন।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছি এর ফলে এই দশ বৎসরে মোট মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা মাত্র ছয় পারসেণ্ট। মনে রাখতে হবে এই দশ বৎসরে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং অধিকাংশ দেশেই বেশি হারে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মূল্যবৃদ্ধির হার একটু বেশি সন্দেহ নাই। কিন্তু এর প্রধান কারণ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সাধ্যাতিরিক্ত না হলেও কৃষির উন্নতির জন্য ঠিকমত ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে ফসলের উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়া উচিত ছিল তা বাড়ছে না। এ কথা ঠিক যে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যত অর্থব্যয় করা হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার চেয়ে কম বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় এদোষ অনেকটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য মোট ব্যয়ের ১৫ ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা কমিয়ে ১১ ভাগ করা হয়। পরে তৃতীয়টিতে বাড়িয়ে শতকরা ১৪ ভাগ করা হয়েছে। ফসলের উৎপাদন যদি ঠিকমত না বেড়ে থাকে, তার জন্য পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দকে দায়ী করা চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এর জন্য বহুলাংশে দায়ী কৃষিবিভাগের অকর্মণ্যতা।

পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ আমাদের সাধ্যাতীত কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এক দিকে যেমন বিনিয়োগ-ব্যয় বেশি করা হচ্ছে, আবার করলব্ধ রাজস্বের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। বাজেট ঘাটতিপূরণ বাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট থেকে সরকারকে যে বেশি হারে টাকা ধার করতে হচ্ছে এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। অবশ্য এ বিষয়ে দুই মত থাকা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল বারশত কোটি টাকা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ অনেক কম হচ্ছে। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরেই মূল্যবৃদ্ধির হার খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। যারা মোট বিনিয়োগ-ব্যয় বেশি করার পক্ষপাতী তারা বিশেষ করে জোর দেন এ দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে। এ দেশে বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এর পূর্বে আর তা হয় নাই। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের দশ বছরে আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছিল মাত্র শতকরা ৫·৭৩ ভাগ। পরের দশ বৎসরে জনসংখ্যা কমে যায়। ১৯৩১-৪১ সালের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৪·২২ ভাগ। এর পরের দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার এর চেয়ে কম ছিল। এর পূর্বে কোন দশ বৎসরেই

জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার শতকরা ২১.৫০ ভাগ হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বৎসরে ১.০৬ ভাগ। গত দশ বৎসরে এর দ্বিগুণ হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। যদি দেশের আর্থিক উন্নতি করতে হয় তবে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার অনেক বাড়াতে হবে এবং তা করতে হলে মোট বিনিয়োগের সেই অনুপাতে পরিমাণ বাড়াতে হবে। সাধারণভাবে অর্থাৎ বিশেষ কোন চেষ্টা না করে—সঞ্চয় অনুযায়ী বিনিয়োগব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করা হলে আর্থিক উন্নতির হারও অনেক কম হবে। যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হয়েছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে বাৎসরিক ১'৬০ হারে। আর জনসংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১'০৬ ভাগ। সুতরাং আর্থিক উন্নতি বিশেষ হয়েছে বলা চলে না। যে টুকু হয়েছে তা অনুভবযোগ্য নয়। সেই অনুপাতে এখন বিনিয়োগ করা হলে আর্থিক উন্নতি ত দূরের কথা, আর্থিক অবনতি হবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার যতটা সম্ভব বাড়াতে হবে এবং বেকারের সংখ্যা কমাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বাড়ার অর্থ কর্মপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি। বিশেষত বর্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার যুগে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি বাড়ছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বেশি করা এবং বেশি কর্মসৃষ্টির ব্যবস্থা করা—সবই ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং বিনিয়োগব্যয় কম রাখার বিষয়ে ধনবৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই মত দিতে পারছেন না।

কিন্তু মোট বিনিয়োগব্যয় বেশী রাখতে হলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটা বন্ধ করা যাবে, কি ভাবে? যে ভাবে বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে এ চলতে পারে না এ বিষয়ে সকলেই এক মত। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেও বেশি হারে বিনিয়োগব্যয় করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরে মূল্যস্তর কমে যায় ও দ্বিতীয় বৎসরে মূল্যস্তর প্রায় সেই পরিমাণে বাড়ে। ফলে এই দুই বৎসরে বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই-যদিও এই সময়ে মোট ২৫০০৲ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় বৎসরের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কাঁচা মাল—বিশেষত কৃষিজাত কাঁচা মাল (যেমন তৈলবীজ)—এর মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৬৪ সালের প্রথম ছয় মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা ১৩'৬ ভাগ, কাঁচামালের মূল্য বেড়েছে শতকরা ১০'৮ ভাগ। কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা মাত্র ১'৮ ভাগ। কাজেই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ কৃষিজাত ফসলের দাম বেড়ে যাওয়া। পরিকল্পনায় যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তবে এইখানে হয়েছে কিনা দেখতে হবে। আমরা কি কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যয়বরাদ্দ করি নাই?

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর মতে অন্তত এই বৎসর কৃষির উৎপাদন এমন কিছু কম ত হয়ই-নি, বরং বেড়েছে। তার মতে পশ্চিম বঙ্গে এ বৎসর ধানের উৎপাদন ভাল ভাবেই বেড়েছে। সুতরাং উৎপাদনের স্বল্পতা মূল্যবৃদ্ধির কারণ নয়। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী যারা বেশি দামের আশায় বা আশঙ্কায় ধান ও অন্য শস্য মজুদ করে রেখেছে। ফসলের উৎপাদনব্যবস্থার দোষে নয়, বিক্রয়-ব্যবস্থার গলদের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। এর খুব সহজ উত্তর আছে। উৎপাদন হয়ত কিছুটা বাড়তেও পারে, আবার নাও বাড়তে পারে। যদি বেড়ে থাকে তবে বৃদ্ধির হার প্রয়োজনের তুলনায় কম স্বীকার না করে উপায় নাই। কারণ ১৯৬১-৬২ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর খাদ্যশস্যের উৎপাদন মোটামুটি ভালই বেড়েছিল এবং ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য কমেও গিয়েছিল। খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে অথচ দাম ও বেড়ে যাচ্ছে এর অর্থ উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদাবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে। না হলে মজুতদারেরা মাল ধরে রেখে দাম বাড়াতে সফল হোত না। তাহলে তাঁরা ১৯৬১-৬২ সালেও মজুত রেখে দাম বাড়াবার

চেষ্টা করত সন্দেহ নাই। মজুতদারেরা হঠাৎ এ বৎসর কেন ঠিক করে থাকবে যে মাল ধরে রাখলে খুব উঁচু দাম পাওয়া যাবে? তারা চিরকালই লাভের অঙ্ক যতটা বাড়ান সম্ভব সে চেষ্টা করে। এ বৎসর এতটা সফলতা লাভের কারণ কি হতে পারে? তারা এই বৎসর সকলে মিলে কেন ভেবে রেখেছে যে আমরা অন্যবারের চেয়ে বেশি শস্য জমিয়ে রাখব যার ফলে দাম বেশ চড়ে যাবে? তখন চড়াদামে গুদামজাত শস্য বিক্রি করে অনেক বেশি লাভ করা যাবে। এর অর্থ এই যে ব্যবসায়ীরা জানে যে এ বৎসর আশানুরূপ ফসল হয় নাই এবং দাম চড়ে গিয়ে তাদের ধারণা যে ঠিক তা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। না হলে দাম বাড়লেও তা বেশি দিন উঁচু থাকতে পারত না। ফসলের উৎপাদন বাড়াটাই একমাত্র কথা নয়—চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় বেড়েছে কিনা এই হোল আসল কথা। তা হয় নাই। কারণ তা হলে মূল্যবৃদ্ধি খুব সাময়িক ব্যাপার হোত এবং এত দেশব্যাপী ও দীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারত না।

এখন কথা উঠতে পারে যে আমরা যখন কৃষির উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়াতে পারছি না তখন যতটুকু পারি সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গঠন করা উচিত হবে। কৃষির উৎপাদন যখন বেশি হারে বাড়ান যাচ্ছে না তখন খাদ্যশস্য বা কাঁচা মালের চাহিদা যাতে বেশি না বাড়ে তাই দেখতে হবে। খাদ্যশস্যের চাহিদাবৃদ্ধি নির্ভর করছে দুইটি বিষয়ের উপর। —জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং জনগণের আয়বৃদ্ধির হার। জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ অবশ্য নানাদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ সময়-সাপেক্ষ—দুতিন বৎসরের মধ্যে হঠাৎ জন্মের হারের পরিবর্তন সাধন করা খুব শক্ত। তাহলে রইল আয়-বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ— অর্থাৎ বিনিয়োগব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে যার ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বেশি হারে না বাড়তে পারে। এদিক দিয়েও অনেকে মনে করেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক কম রাখতে হবে। যতটা কাপড় হাতে আছে, সেই মাপেই জামা কাটতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হবে খাদ্যশস্যের চাহিদা ততটুকু বাড়তে দেওয়া হবে। অর্থাৎ লোকের এবং সাধারণ লোকের আয় যাতে বেশি হারে না বাড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আয় বাড়লে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়বে। মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ কম রাখতে হবে যার ফলে আয়বৃদ্ধির হার ও কর্মবৃদ্ধির হার কম থাকবে। পরি-কল্পনাকে এইভাবে ছাঁটাই করলে তবেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

এ বিষয়ে বলা যতটা সহজ জিনিসটি মেনে নেওয়া তত সহজ নয়। জনসাধারণের আয় বেশি বাড়তে দেওয়া হবে না এবং বেকারের সংখ্যা না বাড়লেও কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—এই ভাবে পরিকল্পনা গঠনের কোন সার্থকতা নাই। পরিকল্পনা গঠন না করলেও আমাদের আর্থিক অবস্থা হয়ত এই রকমই থাকত,—যেমন ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত হয়ে এসেছে। তাহলে দেখতে হবে ফসল উৎপাদনের হার আরো বাড়ান সম্ভব হবে কিনা। যে বৎসরই ফসলের উৎপাদন ভাল ভাবে বেড়েছে, দেখা গেছে যে সে বৎসর উচ্চহারে বিনিয়োগব্যয় হওয়া সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারও সন্তোষজনক হয়েছে। কারণ ফসলবৃদ্ধি হলে এবং দাম না কমলে চাষীর আয় বাড়বে। চাষের আয় মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক। আর ফসল বেশি পাওয়া গেলে শিল্পোন্নতি ও অন্যান্য খাতে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করা যায়। এর ফলে আয়বৃদ্ধি এবং কর্মবৃদ্ধি হলেও জিনিষ পত্রের মূল্যবৃদ্ধি হবে না। কিংবা হলেও সামান্য হবে। সুতরাং বেশি নজর দিতে হবে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে। চাষের অবস্থার উন্নতি না হলে আর্থিক উন্নতির গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে কি

এমন কোন গলদ আছে যার ফলে কৃষির উন্নতি ঠিকমত হচ্ছে না? অর্থাৎ কৃষির উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ-বিনিয়োগ করা উচিত ছিল তৃতীয় পরিকল্পনায় কি তা করা হয় নাই? তৃতীয় পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছিল যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালে ৭৬০ লক্ষ টন থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে বেড়ে অন্তত ১০০০ লক্ষ টন হবে। তা করতে পারলে পরিকল্পনার মালিকদের আশা ছিল যে খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটান যাবে ও হয়ত মূল্যবৃদ্ধি হবে না। এই হিসাবে তৃতীয় বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মোট ৯০০ লক্ষ টন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার চেয়ে হয়েছে অনেক কম। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও ধরা হয়েছিল যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে ৮০২ লক্ষ টন করতে হবে। কিন্তু পাওয়া গেছে এর চেয়ে কিছু কম ৭৯১ লক্ষ টন। কাজেই বলতে হবে যে পরিকল্পনার কল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি হলে হয়ত এইভাবে মূল্যবৃদ্ধি হোত না। এ রকম না হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম, বিনিয়োগব্যয়ের হিসাবে ভুল থেকে গেছে। অর্থাৎ ওই পরিমাণ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে যত অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন তা হয়ত পরিকল্পনায় করা হয় নাই। অথবা পরিকল্পনার হিসাবে ভুল না থেকেও প্রশাসনিক ব্যবস্থার গাফিলতির জন্য ঠিকমত উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হচ্ছে না। এই দুইটি কারণের মধ্যে প্রথমটির সত্যাসত্য বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। বিভিন্ন ধরণের কৃষিকর্মে কত অর্থ বিনিয়োগ করলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কতটুকু বেড়ে যাবে—এর ঠিকমত হিসাব আমাদের জানা আছে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর প্রশাসনিক গলদের কথা আমরা প্রায় প্রতি পদক্ষেপে টের পাচ্ছি। আমেরিকার এক অধ্যাপক আমাদের পরিকল্পনা সমালোচনা করে লিখেছেন যে প্রশাসনিক গলদের জন্য পরিকল্পনা ঠিক সফল করা যাচ্ছে না। একথা বলা অন্যায় হবে। আমাদের উচিত ছিল প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা কতটুকু আছে তার হিসাব করে পরিকল্পনা গঠন করা। ক্ষমতা বা কর্মেচ্ছার অতিরিক্ত কিছু করতে দিলেই সেখানে ব্যর্থতা অনিবার্য। হয়ত এ ভুল আমাদের হয়েছে। তবে প্রশাসনিক ব্যবস্থারও যে উন্নতি হবে এ আশা করাটা খুব অন্যায় হয় নাই। আর প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত নয় বলে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা কম করে করতে হবে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। যেমন আর্থিক উন্নতি করতে হবে সেই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থারও উন্নতি দেখতে হবে।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

ক্যালকাটা, মাদ্রাজ

Phone : 22-6831

With Compliments

From

BHARTIA ELECTRIC STEEL CO LTD.

1 & 2, Old Court House Corner

Calcutta-1

ভোজন সংকট

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

জয়শ্রীর সম্পাদিকা মহাশয়া গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবাসীর জীবনে যে-কোন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু লিখতে আদেশ করেছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, সামাজিক বা ধর্মীয় কোন একটি পরিবর্তন সম্বন্ধে লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু লিখতে বসে দেখা গেল যে সে সব চিন্তাকে অতিক্রম করে যে চিন্তাটি বারবার মনের উপরতলায় ভেসে উঠলো সেটি হচ্ছে সরষের তেল, মাছ ও চাল সংকট। বাজারে চাল নাই, এই প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু তেল নাই, মাছ নাই, মাখন নাই, আটা নাই (মুখ্যমন্ত্রীর ভরসাস্থল আটা)। এই প্রথম যেখানে হাত দিই সেখানেই নাই, নাই। অনেক কষ্টে যদিবা একটু বাদাম তেলের জোগাড় হ'ল, তেল দিয়ে ভাজব কি? আলু এক টাকা কিলো, পটোল পাঁচসিকে, বেগুণ এক টাকা, কচু যে কচু তাও বারো আনা। পেপে, কাঁচাকলাও তদ্রূপ। বড়িওয়ালী আনায় ২৫টি বড়ি থেকে ১৬টিতে নামিয়েছে। ডিম বা মাংসের কথা নাই বললাম। সবই অগ্নিমূল্য। আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি মানুষ মরছে না। তথাপি পচামাছের দোকানে লম্বা লাইন। এই দুরবস্থার সিকিভাগেই তো ১৩৫০এ লোক এই কলকাতা শহরে কীটপতঙ্গের মত রাস্তায় পড়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু এখন লোক মরে না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত হার মেনেছে। এখন মারতে হলে একবারে হৃদয়ের উপর আঘাত হানতে হয়। শুনছি জন্মের হার ভীষণ বেড়ে গেছে। তার উপর সত্তর বছরের বৃদ্ধ এখন আপনাকে যুবক সাজাবার জন্য ব্যস্ত। বুড়োরা আর মরে না। আশি বছরেও মরে না। তবুও লোক খাচ্ছে। দাম ভীষণ বেড়েছে। কিন্তু কেউ না খেয়ে মরছে না। এ বড়ই আশ্চর্য্য! পূজোর বাজারের ভিড় একটুও ক'মেনি। সিনেমার কিউ তেমনি চলেছে। স্যাকরারা নাকি অনেকে আত্মহত্যা করেছে। দোকান তো একটাও ওঠেনি। চৌদ্দ ক্যারাট কেউই কেনে না! ভিড়ও পূর্ব্ববৎ। তথাপি চারিদিকে হাহাকার! কেন এমন হয়?

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন যে উন্নতিশীল দেশে নাকি পুরোপুরি শিল্পোন্নতি হবার আগে এমনিই হয়। তাতে আমাদের এই যুগের মানুষদের কি লাভ? বিশেষতঃ যারা এককালে পেটভরে খেয়েছে এবং এখন পরপারে যাবার জন্য তল্পীতল্পা বাঁধছে। ছোটরা বলবেন যে, "মশায়, আপনারা তো এককালে খুব খেয়েছেন, এখন নাইবা খেলেন। আমরা তো খাইনি। ভবিষ্যতে যাতে পেটভরে খেতে পাই তার কথা ভাবুন।" "খাও, ভাই। কিন্তু ভাত খাবে না ট্যাবলেট খাবে?"

পেটভরে যে খেয়েছি সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তার নমুনা একটু পরেই দেব। কিন্তু আমরা এমনিটি কি চেয়েছিলাম? পঞ্চাশ বছর আগে যখন ছাত্র ছিলাম তখন গোলদিঘিতে একদিন অমৃতবাজার পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক মতিলাল ঘোষ চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন: "এই দেশ একদিন শস্যশ্যামলা ছিল। গোলাভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, ডিমভরা কইমাছ

ছিল। বৃটিশের আমলে সব গিয়েছে। আবার সেই দিন ফিরে আনতে হলে স্বাধীনতা চাই।" অনেক চেষ্টায় স্বাধীনতা তো এলো কিন্তু ডিমভরা কই কোথায়? সে তো পাকিস্তানে রয়ে গেল। "সুজলাম্ সুফলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম্" বলে চোখের জল ফেলেছি; "কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন" বলে গৌরব করেছি। কোথায় গেল সে সুদিন? এখনতো দেশবিদেশে থেকে এমনকি মার্কিন দেশ থেকে চাল আমদানী করতে হচ্ছে। অবিশ্যি এই সঙ্গে একটু স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ সোনার স্বপন দেখেছিলেন তখনই বাংলা দেশের হাটবাজারে সাদা সাদা বর্ম্মাচালের আবির্ভাব হয়েছে। ধানের ভাণ্ডার সুদূর উত্তর বাংলার গ্রামে বসে সেই চাল খেয়েছি। রাজশাহী জেলার পতিসরে বা নদীয়া জেলার শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ কি সেই চাল দেখেন নি?

স্বদেশী যুগে প্রাচুর্য্য খুবই ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য এখনকার চাইতে বেশী বই কম ছিল না। ধনীর গৃহে ভোজের নিমন্ত্রণে পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জন অতিশয়োক্তি ছিল না। তা দেখেছি ও খেয়েছি। কিন্তু দারিদ্র্যও কম ছিল না। গ্রামে বহুলোক একবেলা বা একদিন অন্তর খেয়ে বেঁচে থাকত—এ নিজের চোখে দেখেছি। বছরের এমন একটা সময় আসত যখন গরীব লোকেরা বন জঙ্গল হাতড়ে বুনো আলু, কচু প্রভৃতি সংগ্রহ করে চালের সঙ্গে ঘেঁটে খেয়ে দিন কাটিয়েছে। অতি পরিচিত লোকের মধ্যে এটা দেখেছি। গ্রাম দেশে হাজারো লোক নেংটি পরে দিন কাটাতো। নেংটি রূপক অর্থে নয়। একেবারে সাধা চোখে দেখা। কোমরে ঘুনসি বাঁধা, একটা ১০।১২ ইঞ্চি নেকড়া সামনের দিক থেকে পেছনে নিয়ে সুতোর সঙ্গে বাঁধা —এ দৃশ্য নিজের চোখে বহু বহু দেখেছি। এখন তো গ্রামে কেরোসিনের লণ্ঠন নাই এমন বাড়ী নাই। কিন্তু তখন সন্ধ্যার সময় সরষের তেল বা রেড়ীর তেলের প্রদীপ (বা পিদিম) গৃহের একমাত্র আলোর ব্যবস্থা ছিল। যাঁরা একদিন রেড়ীর তেলে পড়ে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হয়েছেন, তাঁদেরই নাতিরা আজ ফ্লোরেসেণ্ট আলোতে পড়ে পরীক্ষায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। এখন ঘরে ঘরে সাইকেল। তখন সাইকেল একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। রাজা বাহাদুর হাতিতে যেতেন, ল্যাণ্ডো বা জুড়িগাড়ীতে চড়তেন, ঘোড়া হাঁকাতেন। কিন্তু যদি সাইকেলে চড়তেন তবুও তাঁর রাজগিরি ম্লান হ'ত না। খড়ের ঘর ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। খড়ও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। টিন বা টালি তাদের স্থান দখল করেছে। কিন্তু তখন একটা খড়ের আটচালা সমৃদ্ধির পরিচায়ক ছিল। তখন পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ধুতি চাই, তখন হাঁটুর একটু নীচে হলেই বেশ চলত। এখন তো আবার ধুতিই উঠে যাচ্ছে। তার স্থান দখল করছে প্যাণ্ট বা পায়জামা। শুধু একটা চাদর কাঁধে খালি গায়ে যেতে কেউ কি লজ্জা পেত? আর এখন?

একদিকে পেটে খাবার নাই অপরদিকে সাজসজ্জার বাহার! এ কী অবস্থা! একি দারিদ্র্য না ঐশ্বর্য্য! আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি? পর্ব্বতের চূড়ায়? না গিরিগহ্বরের অনন্ত অন্ধকারের তীরে? রূপোর টাকা উঠে গেছে। সোনার মোহর দিয়ে কেউ আর নাতির মুখ দেখে না। শুধু কাগজ আর নিকেল। তাও আবার বাক্সের তলায় রাখলেও তাকে টেনে বার করতে হয়। টাকার পাখা উঠেছে। সিঁদুরের কৌটাতেও আর লুকানো থাকে না।

আজকালকার বাজারদরের আভাস একটু গোড়াতেই দিয়েছি। এখন চল্লিশ বছর আগের লেখা একটা দৈনিক হিসাবের খাতা থেকে তখনকার বাজার দরের একটু আভাস দেবার চেষ্টা করব। একটি স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের হিসাব। তাতে প্রাচুর্য্য ছিল না কিন্তু অভাবও ছিল না। তাতে পরিবারের লোকদের বেশ চার বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই ধরা যাক্ চাল। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে চাল এক মণ ৩৷৹ বা ৪৲ টাকা। মুগ ডাল একসের

।৵০। মসুর ডাল একসের ৶০। মটর ডাল একসের ৵১০। ছোলার ডাল /১৷০ ৶০। রহর ৶০ (এখন ১'৪০)। আলু /১ ৴১০। ৵০ থেকে ৶০ আনার বাটা বা পার্শে মাছে (খুব সম্ভব একসের) চার পাঁচ জনের দুবেলা খুব ভাল ভাবেই চলে যেত। ভয়সা ঘি /১—১৵০। সরষের তেল ।/০ বা ।৵০ সের। চিনি ।৵০ থেকে ।৶০ সের। এক পয়সার সিম; এক পয়সার পেঁয়াজ, এক পয়সার আদা ও লঙ্কা, এক পয়সার বেগুন একটা ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ডিম টাকায় ২০টা; সুজি ৶০ সের; ময়দা ৵১০ সের; একটা বড় পাঁউরুটি ৵১০; এক বোতল কেরোসিন তেল ৵১৫; এক পাউণ্ড মেথিলেটেড্ স্পিরিট ।১০। চুলকাটা ৴০। একদিন দেখছি ।১০ আনার মাছ কেনা হয়েছে—নিশ্চয়/।০ রুই মাছ। মাংস ।৶০ থেকে ।০ সের। এক আনার গরম মসলায় প্রায় মাস চলে যেত। তখন এক পয়সার গোল মরিচ পাওয়া যেত। এখন গোল মরিচ একটা মস্ত বড় ডলারক্রেতা; কাজেই নিজ দেশে দুষ্প্রাপ্য। জুলাই মাসে পটোল ছিল সের প্রতি ৶১৫। পরে আরও সস্তা। একজোড়া ধুতি ৩।/০ আনায় পাওয়া গেছে। দুটি টুইল সার্টের দাম ২।৵০ ছিল। এক পাউণ্ড চা ১৶১০। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুগন্ধী নারকেল তেল এক বোতল ।৴০। দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট জল পায়খানা সমেত ৩০৲ টাকা।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, যদিও বাজার দর ছিল মাটির দর [অবশ্য এখন মাটির দর কথাটির অর্থ সম্পূর্ণ বদলে গেছে] তথাপি বলতে হবে সাধারণ লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। মধ্যবিত্ত লোকের টানাটানির শেষ ছিল না। চাকুরেদের তখনও যে দুর্দশা এখনও তাই। কেরাণীর মাইনা ২০৲।২৫৲ টাকা। বি. এ. পাশ কেরাণীর বেতন আরম্ভ হত ৩৫৲। খুব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলে অথবা মুরুব্বির জোর থাকলে ৫০৲ টাকা। মাষ্টারী জীবনেও ঐ প্রকার। হেডমাষ্টারের বেতনই হ'ত ৭০৲ থেকে ১০০৲। গভর্ণমেণ্ট স্কুলের বেতনের হার অবশ্য কিছু বেশী ছিল। কলেজের লেকচারারদের মাইনা ১০০৲ থেকে আরম্ভ হ'ত। কোন কোন স্থানে তার কমও ছিল। ডাক্তারদের ফী ছিল ১৲।২৲ টাকা গুণানুসারে। উকিলের ফী ২৲। ৪০০৲ টাকা বেতনের বহু ব্যক্তি কলকাতায় বাড়ী করেছেন। ৬০০৲ টাকা আয়ের লোকেরা জুড়িগাড়ী ও মোটর গাড়ী চালাতেন। এখন তো বহু লোক গোড়া থেকেই ৪০০৲-৬০০৲ টাকায় চাকুরী আরম্ভ করে। বহু যুবক হাজার টাকা মাইনা পায়। কিন্তু সুখশান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই বাড়েনি। যে তিমিরে সেই তিমিরে। অবশ্য জীবনযাত্রার মান বেড়ে গেছে। এখন ছেলে মেয়েদের পড়াতে হলে সাহেব মেমের স্কুলে পড়াতে হয়। সেখানে পড়া যেমনি হোক, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলতে লজ্জা হয় না। এখন পিঁড়ি পেতে আর খাওয়া চলে না। টেবিল চেয়ার চাই। কাঁসার থালা গ্লাস উঠে গেছে। দামও বেশী, মাজবার লোক নাই। তাছাড়া ফ্যাসন নাই। কলকাতার বাসিন্দাদের কষ্ট চরমে উঠেছে। একেতো ঘরবাড়ীর অশেষ কষ্ট। ভদ্রতা বা গোপনীয়তা রক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছে না। শোবার ঘরই খাবার ঘর, বসবার ঘর ও ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর। ঠাকুর ঘরের অভাবে ঠাকুর দেবতা এখন মূর্ত্তি ছেড়ে পটে চড়েছেন ও দেয়ালে ঝুলছেন। ফুটপাত ছেলেদের খেলার মাঠ, মেয়েরা জানলার ধারে বসে যদি একটু হাওয়া পায় তো নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। এই ভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে ?

এই হিসেবে শহরবাসীদের চেয়ে গ্রামবাসীরা অনেক সুখে আছে। সেখানে এখনও স্থানাভাব নাই। সেখানে মাছ তরিতরকারী পাওয়া দুষ্কর নয়। কলকাতার একটু বাইরেই খাদ্যাভাব একরকম নাই বলেই হয়। দাম যাই হোক সেখানে মাছ, তেল ও চাল পাওয়া যায়। পটোল বেগুনও এক টাকা কিলো নয়। আজকাল কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কয়েকদিন আগে এক গ্রামবাসীর কাছে শুনলাম যে আটকাঠা জমিতে পুঁইশাক লাগিয়ে এক মাসে

২৫০৲ টাকা পেয়েছে। অবশ্য ফার্টিলাইজারের কৃপায়। গত যুদ্ধের বাজারে শুনেছিলাম যে আমার একজন গ্রামবাসী কৃষক যে অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে দিন কাটাতো সে তার এক বিঘা জমিতে কচু লাগিয়ে ২৫০৲ টাকা পেয়েছে। ঐ জমিতে আগে কিছুই জন্মাতো না। এখন নিশ্চয় ৫০০৲ টাকা পায়। সে অবশ্য এখন দুবেলা খায়; ঘরের চাল দিয়ে আর জল পড়ে না; দশহাতী ধুতি পরে; ছেলেপিলে আর পিলে বড় হয়ে মারা যায় না। কিন্তু তারও সুখ নাই। এখন অভাব-বোধ বেড়ে গেছে। ছেলেটাকে স্কুলে পড়িয়ে কারখানার চাকরীতে লাগাতে চায়। পৈত্রিক জমিতে আর চলে না। মেয়েটাকে আর একবারে হেলো চাষার ঘরে দিতে চায় না। তাছাড়া মেয়ের এখন ১১ হাতী শাড়ী চাই, শেমিজ ব্লাউস চাই, একটা স্যাণ্ডাল চাই। একটু পাউডার ক্রীম বারেদাবারে মাখতে ইচ্ছা করে।

স্যাণ্ডাল চাই! কিন্তু যে স্যাণ্ডালের দাম আগে ১।০ টাকা ছিল এখন তা ১২৲ টাকা হয়ে গেছে। চামড়ার বদলে রবার উঠেছে। পুরোন টায়ারের তলা বা সোল হলে কিছু সস্তা পড়ে। যদি একটু সৌখীন স্যাণ্ডালের দিকে ঝোঁক থাকে তবে সোলার তলার উপর একটা ইল্যাস্টিকের টানাতে সখ মেটাতে হবে। চামড়া দেশে নাই। চামড়ার জুতো এখন রুবল কামায়। তাই রুশ দেশে লক্ষ লক্ষ জোড়া চলে যায়। একদিন ছিল যখন ৭।৮৲ টাকায় খুব সুন্দর সু পাওয়া যেত। এখন তা পেতে হলে ৪০৲।৫০৲ টাকা লাগে। ফলে আমাদের দেশী সাহেবরা গলায় নেকটাই ও পরনে টেরিলিনের স্যুট পরে সোলার স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে সাহেবিয়ানা করেন। এখন ঐটেই চালু হয়ে গেছে। না হয়ে উপায় কি? জুতো কেনাতো এখন সাধ্যের বাইরে।

এককালে এই দেশে চিনি আমদানী হ'ত জাভা, মরিশাস, জার্ম্মানী থেকে (বীটের চিনি)। এখন আমাদের চিনি যায় মার্কিন দেশে ডলার রোজগার করতে, আর আমরা ২।০ টাকা কিলোয় কালো বাজারে চিনি কিনে দিনগুজারা করি। আগে সব কাপড়ই আসত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে। এখন আমাদের কাপড়ই যায় ল্যাঙ্কাশায়রে স্টার্লিং আদায় করতে। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি? আমাদের যে নিত্য অভাব তা একটুও কমেনি।

আগে দেশে কাগজ, কলম, পেনসিল, সূচ, সুতো, চীনা-মাটির বাসন, কাচের বাসন, ক্ষুর, ব্লেড এই সব নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ বিদেশ হতে আমদানী হ'ত। এখন সবই এই দেশে তৈরী হয়। ভারতের সাইকেল, সেলাইএর কল, রেডিও প্রভৃতি জিনিষ এখন বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। কিন্তু তথাপি আমাদের সুখসমৃদ্ধি কোথায়? একদিন আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতা এই ভেবে যে স্বাধীনতা এলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আবার গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা তো এল কিন্তু চাল, দুধ, মাছ, তরকারী, তেল, ঘি সবই উধাও হয়ে গেল। কি হল তবে স্বাধীনতা পেয়ে?

এখন এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই এক দায় হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে হ'লে সৈন্যবল বাড়াতে হবে। তার জন্য চাই অস্ত্রশস্ত্র, হাওয়াই জাহাজ ও নৌবহর। এত দিন ভাবা গিয়েছিল ওগুলো কিনতে পাওয়া যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে কেউই বেচতে রাজী নয়। দেশেই তৈরী করতে হবে। তার জন্য কারখানা চাই। কারখানার মালমসলা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। তার টাকা চাই। অতএব ঘরে যা কিছু আছে সব বেচে দিয়ে লোহালক্কড়, কলকব্জা কিনতে হবে। খাই আর না খাই, বিদেশীরা যা চায় তাই বেচে দিতে হবে। চা, চিনি, কাপড়, জুতা, পাট কাজু বাদাম সায় তার খোসা, গোলমরিচ সব বেচে দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধানের বদলে পাট, গমের বদলে আখ লাগাতে হচ্ছে। তা না হ'লে ডলার ঘরে আসবে না। সুতরাং ১'২৫এ এক কিলো চাল, ৪'৭৫এ তেল, ১'৪০এ চিনি কিনতেই হবে। সুখ কোথায়? কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে আজ কৃষিবিভাগের প্রাক্তন কর্ম্মচারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে জিজ্ঞাসা করি, মশায়, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত এই দেশে আপনি যে খোয়াব দেখেছিলেন: "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।" কী খেয়ে তা দেখেছিলেন?"

শিক্ষকের মর্যাদা

পরিমল রায়

দাবী-পূরণ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হরতাল, ধর্মঘট, কর্মবিরতি, গণশোভাযাত্রা, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রভৃতি শ্রমিকসমাজ সুলভ কার্যপদ্ধতির প্রচলন আজকাল শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। ফলে শিক্ষকদের প্রতি যাহারা সচরাচর সহানুভূতিশীল তাহাদেরও অনেকেরই মনে যথেষ্ট সংশয় জাগিয়াছে, এইরূপ কার্যকলাপ সত্য সত্যই শিক্ষকগণের মর্যাদাসঙ্গত কিনা। শিক্ষকের মর্যাদার প্রকৃত ভিত্তি কোথায়?

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে মনুষ্যসমাজের বহুবিধ স্তরায়ন লক্ষিত হয় বিষয়টি ব্যাপক ও জটিল। স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে ইহার পর্যালোচনা সম্ভবপর নয়। অনাবশ্যকও বটে। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক স্তর-বিন্যাসের বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলতঃ তিনটি ছক আমরা দেখিতে পাই। প্রথম উল্লেখ করা যাইতে পারে, জাতিভেদের (Caste) উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজের কথা। আমাদের সনাতন হিন্দুসমাজই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে সামাজিক মর্যাদা জাতিগত এবং জীবিকাও জাতি অনুসারে নির্দিষ্ট। শিক্ষক শ্রেণীবর্গ ব্রাহ্মণের পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, সম্পত্তি ও অধিকারের অস্তিত্ব বা অভাবের ভিত্তিতে, ইহাদের ন্যূনাধিক্য অনুসারে, সকলের নীচে ক্রীতদাস (Serf) হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের উপরে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় (Nobility) পর্যন্ত—মধ্যযুগের ইউরোপে যেরূপ ঘটিয়াছিল—তেমনি ধরণের সামাজিক স্তরভেদ। ইহাতে একের সহিত অন্য স্তরের ব্যবধান জাতিভেদের মত অলঙ্ঘনীয় না হইলেও দুরতিক্রমনীয় ছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর (Estate) জীবনধারণের পথ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই মধ্যযুগের সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও আচারের ছিল আত্যন্তিক প্রভাব, তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠনই ছিল শিক্ষার পরিধি, ধর্মযাজকই ছিল শিক্ষক. শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ ছিল মুষ্টিমেয়ের বিশেষ অধিকার; সুতরাং শিক্ষকগণ ছিলেন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। পরবর্তী পুঁজিবাদী সমাজের স্তরভেদ আর্থিক বনিয়াদের উপর স্থাপিত। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর (Class) উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহাদের নিজ নিজ আর্থিক আয় ও সঙ্গতিই হইতেছে ইহাদের আপেক্ষিক মান ও মর্যাদার সব চাইতে বড় মাপকাঠি। ফলে স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষক অধোগতি লাভ করিয়া জনৈক ইংরাজী লেখকের ভাষায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে "member of the undifferentiated horde that walk briskly from subway to office." শিক্ষার গুরুত্ব আজ নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈশ্যসমাজের নিক্তিতে শিক্ষকের ওজন তাহাতে বাড়ে নাই। বাসী (শ্রদ্ধার ?) ফুলের মালা এখনও তাহার গলায় ঝুলান আছে বটে, কিন্তু তার 'ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।'

উপর্যুক্ত ত্রিবিধ স্তরবিন্যাসই আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে জট পাকাইয়া আছে। কিন্তু প্রথম দুইটির মূল

সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া গিয়াছে। উভয়কে ছাপাইয়া তৃতীয়টিই ইদানীং অত্যন্ত প্রবল। কার্যতঃ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সমাজের সহিত আমাদের এখনকার সমাজের মূলগত আর কোন পার্থক্য নাই। অতএব আমাদের দেশের শিক্ষকদের সম্যক্ মর্যাদা দানের জন্য, সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাদের বেতনবৃদ্ধি। আমাদের শিক্ষকদের বেতনের হার দুই একটি নিতান্ত অনুন্নত দেশ ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে ন্যূনতম। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী চাপরাসী, পিওন, আর্দালীর মজুরী হইতেও কম। বহু মাধ্যমিক স্কুল আছে যেখানে শিক্ষকদের বেতন এত সামান্য যে তাহা অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য। বিদেশে কোথায়ও কোথায়ও শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন আইন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেলায় এইরূপ কোন কিছু অদ্যাপি করা হয় নাই। যে সব অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়মিত সরকারী অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে, সেখানকার শিক্ষকদের জন্য সরকার কর্তৃক হালে উচ্চতর বেতন মঞ্জুর করা হইয়াছে। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে তাহা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। এই সামান্য আনুকূল্যটুকুও কিন্তু শিক্ষকের অনায়াসলভ্য হয় নাই।

শিক্ষকের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনার একটি উজ্জ্বল চিত্র নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটিতে পাওয়া যাইবে।

"Both in real wealth and in relative position the American elementary school teacher ranks well in comparison with his colleagues in other lands. He usually has a car, a television, and a comfortable home with central heating, modern bathrooms, and a kitchen filled with gadgets. He travels extensively, dresses well, and can afford occasionally to attend the operatheatre, and concerts. He is definitely middle-class in outlook and origin and is accepted in nearly every segment —of American society—with the possible exception of tiny minorities at both extremes of wealth and poverty—as a respected equal." ১

আমাদের দেশে ইহা রূপকথার মতই শুনাইবে; কিন্তু প্রকৃতই ইহা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনিম্ন স্তরের শিক্ষকেরই কথা। সমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি ছাড়িয়াও দেই, তথাপি এই লক্ষ্য আমাদের সামনে রাখিতেই হইবে যে, "They (teachers) should be paid enough to live on a standard of respectability and comfort that good service requires, on a par with other professional people, and with due regard for the need for additional preparation." ২ ইহা শিক্ষাবিদদের সর্বসম্মত মত এবং অধুনা সকল অগ্রগামী দেশেরই গৃহীত আদর্শ। বলা বাহুল্য যে যতদিন আমাদের দেশের শিক্ষকের বেতন এই মানে উন্নীত না হইবে, ততদিন সমাজে তাহাকে অবজ্ঞার পাত্র হইয়াই থাকতে হইবে।

শিক্ষকের মর্যাদা প্রসঙ্গে লণ্ডন ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন খ্যাতনামা অধ্যাপক,৩ বেতনের উপরই

১। The Year Book of Education, 1953 (published in association with the University of London Institute of Education and Teachers College Columbia University) পৃ: ২২

২। H. R. Douglass and C. Creider, American Public Education, পৃ: ৩৯৮

৩। লণ্ডন বিশ্বিদ্যালয়ের N. Hans ও J. A. Lauwerys এবং কলাম্বিয়া বিশ্বিদ্যালয়ের Robert King Hall.

সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্য কয়েকটি বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর যথেষ্ট জোরও দিয়াছেন। যথা চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা; নিয়োগের বিধি ও পদ্ধতি; কাজের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সর্ত; এবং পরিশেষে শিক্ষকের ঐক্য ও সংগঠন; নিম্নে যথাক্রমে বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

ভাবী উন্নতি সম্ভাবনা:—শিক্ষকতা কাজে পদোন্নতি শীঘ্র ও সহজে হয় না। সেজন্যই আরও বিশেষ করিয়া দরকার যে শিক্ষকের বেতনের হার এমন সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে একদিকে গুণ ও যোগ্যতার এবং অপরদিকে বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং তিনের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। পশ্চিম বাংলায় সরকারী ও সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের অনুমোদিত বেতনের হারে এই নীতি পূরাপুরি অনুসরণ করা হয় নাই। বিশেষতঃ বহাল হইবার পর কোন শিক্ষকের যোগ্যতা বাড়িলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার বেতন বাড়াইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ ত্রুটি ও অসঙ্গতি আরও অনেক আছে।

সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত বেতনের হার অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়। শিক্ষকেরা যাহাতে চাকরি করিতে করিতে নানাভাবে নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, সেজন্য বিবিধ শিক্ষাব্যবস্থাও (In-service training) সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করা প্রয়োজন। Summer School, Vacation Course ইত্যাদি যে যে উপায়ে শিক্ষকের অবকাশ সময়ে এই শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, তাহার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্কুলের ছুটি ছাড়া অন্য সময়েও উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য পূরা বেতনে ছুটি (Study Leave) মঞ্জুর করা দরকার। এইরূপ নানা উপায়ে ক্রমোন্নতির সোপান রচনা করিয়া শিক্ষকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে আমাদের দেশে এ যাবৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা না থাকাতে, শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে যাহারা গুণী ও উচ্চাভিলাষী তাহারা শিক্ষক হইতে নারাজ। তাহাদের কেহ কেহ যদি অনন্যোপায় হইয়া শিক্ষকতা গ্রহণও করে, তাহা সাময়িক মাত্র। সচরাচর সুযোগ পাইলেই তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায়। এই সব কারণে লোকের কাছে বৃত্তিটি ক্রমশঃই হেয় প্রতিপন্ন হইতেছে এবং শিক্ষকের মর্যাদা উত্তরোত্তর ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

নিয়োগের নিয়ম পদ্ধতি: স্বাধীন ব্যবসায় বা পেশা যেখানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য উপজীবিদের সাধারণতঃ লোকের কাছে যাইতে হয় না। নিজ প্রয়োজনে লোকেরাই তাহাদের কাছে আসে, সেসব কাজে স্বভাবতঃই সম্ভ্রম বেশী। অতীতকালে এক সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রথারই সমধিক প্রচলন ছিল এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ও তখন ছিল বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এখন অবশ্য রীতিটি সম্পূর্ণ অচলনীয়। আজ শিক্ষককে চাকরীজীবিই হইতে হইবে। কোন চাকরিতে চাকুরিয়া সংগ্রহের (Recruitment) জন্য কি নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, চাকরিটির সামাজিক মর্যাদা তাহার সহিতও জড়িত। আমাদের দেশে শিক্ষকের নিয়োগের ভার সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত। এই কাজে তাহাদের বিশেষ কোন পারদর্শিতা নাই, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অযোগ্যতাই বিদ্যমান। অথচ নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত বা পরামর্শ গ্রহণের কোন বিধি বা বন্দোবস্ত নাই। ফলে অজ্ঞতার জন্যই হউক বা স্বজনপোষণের জন্যই হউক অনেক অযোগ্য শিক্ষকের নিয়োগ হয়। যোগ্য শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়া নিজেকে বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করে। এমনি করিয়া বিদ্যালয়গুলিতে সুযোগ্য স্বাধীনচেতা শিক্ষকের স্থলে একদল আত্মমর্যাদাহীন তাঁবেদারের সৃষ্টি হয়। এইরূপ পরিস্থিতি সমগ্র শিক্ষক সমাজেরই মর্যাদা হানিকর। অবিলম্বে নিরপেক্ষ

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্বাচন এবং যাহাতে তাঁহাদের নির্বাচিত প্রার্থীকে গুরুতর কারণ ব্যতীত এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদের বিনা অনুমতিতে পরিচালক সমিতি অগ্রাহ্য করিতে না পারে. তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নিয়োগ-পদ্ধতির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের গুণাবলী আরও সুচারুরূপে বিহিত এবং একটি নিম্নতম সীমা স্থিরীকৃত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটের ও প্রাথমিক পাঠশালায় নন্-ম্যাট্রিকের বাহুল্য এবং উভয়েতেই শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতা, এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সহজে দূর হইবার নয়। অথচ না হইলেও শিক্ষকতার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।

চাকরির নিরাপত্তা : চাকরিতে নিরাপত্তা না থাকিলে. চাকুরিয়ার পক্ষে আত্মসম্মান বজায় রাখা অসম্ভব। দুঃখের বিষয় আমাদের বেসরকারী স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষককেই এই দুর্ভাগ্য পোহাইতে হয়। চাকরিতে যোগ দিয়াও তাহারা স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। অনেক সময় তাহাদের চাকরির মেয়াদ কোন না কোন কারণে বা অজুহাতে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকের মধ্যে লিখিত চুক্তি সম্পাদনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, দস্তুরও নাই। সুতরাং, স্থায়িত্বলাভের পরও শিক্ষকগণের পরিচালক সমিতির সদস্যদের মেজাজ মর্জি বুঝিয়া এবং তাহাদের তোয়াজ করিয়া চলিতে হয়। সমিতির প্রভাবশালী সম্পাদক বা সভাপতির দৌরাত্ম্যে বা খামখেয়ালিতে শিক্ষক চাকরি হারাইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দ্বিতীয়তঃ, পুলিস রিপোর্টের ভিত্তিতে বা অপর কোন অজ্ঞেয় কারণে সরকারী আদেশে শিক্ষকের নিয়োগ নামঞ্জুর হয় এবং পুরাতন শিক্ষকদেরও পদচ্যুতি ঘটে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্পদিন পরে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল কর্তৃপক্ষ কমিউনিজমের জুজুর ভয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিসের অনুমোদন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের এই অপচেষ্টা জনমতের চাপে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। আমাদের দেশে কিন্তু স্বাধীনতা লাভ ও ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও এই দুর্নীতি অব্যাহতই আছে।

শিক্ষকেরা আজ এইরূপে দুইদিক হইতে মার খাইতেছে। চাকরির জীবনে কাজের কোন স্থিরতা ত নাইই; উপরন্তু অবসরগ্রহণের পর তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হয় আদৌ কোন সংস্থান নাই নতুবা বর্তমানে যাহা আছে তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। অথচ এই দুর্মূল্যের দিনে সমান্য আয় হইতে তাহাদের নিজেদের ও ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য নাই। একাধিক সরকার নিযুক্ত কমিশনের সুপারিস সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দুই একটি প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোথায়ও উত্তর-বেতন (pension)। ভবিষ্য-নিধি (Provident Fund) ও জীবন বীমা (Life Insurance), ত্রিবিধ হিতকর ব্যবস্থার (Triple Benefit schme) সূচনা করা হয় নাই।

চাকরির সর্ত ও পরিবেশ : নিরাপত্তার দিক ছাড়া, অন্য দিকেও শিক্ষকতা চাকরির সর্ত ও পরিবেশ যেরূপ সম্মান-জনক হওয়া উচিত, আমাদের দেশে সেরূপ নহে। অর্থাভাবে সকল শিক্ষককেই গৃহ-শিক্ষকতার গ্লানি স্বীকার করিতে হয়। নিজস্ব কাজে পরিচালক সমিতির অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ সহিতে হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাহাদের সত্যিকারের কোন হাত নাই। শিক্ষার নীতি নির্ধারণে তাহাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ নাই। নাগরিক হিসাবে মতামত প্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা বৃটিশ রাজত্বেও ছিল, অন্য প্রদেশের কথা সঠিক জানি না, অন্ততঃ পশ্চিম বাংলায় আজ তাহাও নানা কারণে বিপন্ন। ফলে শিক্ষক আজ আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র এবং শিক্ষকতা বৃত্তি (Profession) মর্যাদাভ্রষ্ট হইয়া প্রায় দাসত্বের সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

ইংরাজ শাসনের সময়ে রচিত আমাদের একটি বহু পুরাতন সংহিতা (School Code) আছে। ইহাতে

শিক্ষকদের স্বার্থ ও সম্মান যথোচিত স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় নাই। তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলায় অনতিকাল পূর্ব পর্যন্ত ইহাই বলবৎ ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ গোড়ায় একটি নূতন খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই। পরে সরকারের কুক্ষিগত পর্ষৎ হইতে সরকারের অনুমত যে নূতন কোডটি চালু করা হইয়াছে, উহা পূর্বেরই প্রায় পুনরাবৃত্তি, থোড়বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। অতএব শিক্ষকের অবস্থা যথা পূর্বম্ তথা পরম্ই আছে।

শিক্ষকগণের একতা ও সংগঠন : নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অন্যান্য উপজীবিগণের মত শিক্ষকবৃন্দেরও ঐক্য ও সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। উনিশ ও বিশ শতকে ইংলণ্ডে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ক্রমাগত মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম মূল কারণ তাহাদের ইউনিয়নগুলির প্রভাব ও অক্লান্ত চেষ্টা। ফরাসী দেশে শিক্ষকতা প্রধানতঃ দেশের সরকারী কৃত্যকেরই (Civil Service) অঙ্গ বিশেষ এবং সেজন্য শিক্ষকদের সুখসুবিধা ও মানমর্যাদা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ। তথাপি সেখানে শিক্ষকেরা নিজেদের স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র সংঘ গঠন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। বস্তুতঃ সকল অগ্রসর দেশেই আজ শিক্ষক ইউনিয়নগুলির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশের শিক্ষক সংঘগুলিরও কর্তব্য যথাসম্ভব শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলির ন্যায় একদিকে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং অপর দিকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, এই দ্বিবিধ কার্যধারার অনুসরণ করা। এই দুইটি কার্যক্রমের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধও আছে। প্রথমটির জন্য দ্বিতীয়টি অতিশয় আবশ্যক এবং দ্বিতীয়টি সুসম্পন্ন হইলে প্রথমটিও সহজসাধ্য হইবে। বর্তমানে শিক্ষা সংস্কারের নামে আমাদের দেশে যেরূপ সরকারী অব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে আমাদের শিক্ষকসংঘগুলির করণীয়ও যথেষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় উহাদের এই সকল গঠনমূলক কাজে তেমন উৎসাহ ও আগ্রহ নাই।

অপর পক্ষে শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমাদের সমাজ যেরূপ উদাসীন ও রাষ্ট্র স্বীয় দায়িত্ব যেভাবে এড়াইয়া চলিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ কর্তব্য পালনের পথে শিক্ষকেরা তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এ যাবৎ সরকারের নিকট হইতে তাহারা অনেক আশ্বাসই পাইয়াছে, জাতি গঠনে যে তাহারা শীর্ষস্থানীয়, nation-builder প্রভৃতি গালভরা কথা রাষ্ট্রনায়কদের মুখে অনেক শুনিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য, কাজের বেলায় এই দিনদরিয়া মেকাজের বিশেষ কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাইতেছে না। যেমন পাঁজিতে জলের কথা লেখা থাকে কিন্তু নিংড়াইলে পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সরকারী তরফে অদ্যাবধি কেবল টালবাহানাই চলিয়াছে। শিক্ষকের মর্যাদা যেরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেদিকে গভর্ণমেণ্টের যত না লক্ষ্য কি করিয়া অল্প সহজ উপায়ে তাহাদের তুষ্টি সাধন করা যাইতে পারে সেই দিকেই যেন তাহাদের তৎপরতা বেশি।

সকলেরই বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে স্তোকবাক্যে আর শিক্ষকদের ভুলাইয়া রাখা যাইবে না। কথায় কখনও চিড়া ভিজে না। প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দেওয়া নিতান্তই বৃথা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সব মামুলি যুক্তি তাহাদের কানে শৃগালের মুখে বায়সের প্রশস্তির মতই শুনায়। শিক্ষক-দিবস পালন করিয়া এবং তদুপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া শিক্ষকদের সঞ্চিত বিক্ষোভ নিবৃত্ত করা যাইবে না। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু কৃষ্টির দিকে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির ঐক্য গঠনে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়ীকরণে স্পষ্ট হইতে

স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষকদের হক পাওনা ফাঁকি দিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজই হাসিল করা যায় না।

বিগত ১৯৫৮ সাল হইতে শিক্ষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। একটি অভিজ্ঞান-পত্র সহ ৫০০৲ টাকা রাষ্ট্রপতি স্বয়ং স্বহস্তে প্রতি বৎসর মনোনীত শিক্ষকদের দিয়া আসিতেছেন। অন্যূন ২০ বৎসর কাল যাহারা একনিষ্ঠভাবে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারাই এই পুরস্কার লাভের অধিকারী অবহেলিত শিক্ষক সমাজের গৌরব ও মর্যাদাবৃদ্ধিই নাকি ইহার অন্যতম, এমন কি মুখ্য, উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রভবনের জাঁকজমকের মধ্যে রাষ্ট্রপতির করকমল হইতে পারিতোষিক গ্রহণ সামান্য শিক্ষকের পক্ষে কল্পনাতীত সৌভাগ্য বই কি?

দুঃখের বিষয় কোন গোষ্ঠীর জনকয়েককে বিশেষ সমাদর দেখাইয়া সমগ্র গোষ্ঠীটির মর্যাদা বাড়ান যায় না। রামচন্দ্র গুহককে আলিঙ্গন দান করিয়া চণ্ডাল সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতা ঘুচাইতে পারেন নাই। বৃটিশ শাসনে বশংবদ রাজভক্তদের রায় সাহেব, খান সাহেব ইত্যাদি খেতাব বিলির রেওয়াজটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যেমন গাজনের জন্য সামান্য একটু খমিরেই কাজ চলে, তেমনি গুটিকয়েককে খাতির ও খয়রাৎ করিয়া সমস্ত জাতিটাকে প্রলুব্ধ ও মেরুদণ্ডহীন করিবার কূটচাল বিদেশী শাসনে স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু স্বাধীন দেশে ইহার আবশ্যকতা কি? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ত খেতাব বিলি নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই জানি। অন্যথা দলীয় স্বার্থে ইহার অপব্যবহার অপরিহার্য। ঐতিহাসিক কারণে ইংলণ্ডে অবশ্য এই কুপ্রথাটির এখনও চলতি আছে কিন্তু যেহেতু সেখানে দুইটি সমকক্ষ রাজনীতিক দল বিদ্যমান থাকিয়া সর্বদাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে, সেজন্য সেখানে ইহার কুফল ততটা ফলিতে পারে না। কিন্তু যে দেশে কোন না কোন কারণে একই পার্টি একাদিক্রমে রাষ্ট্র-শাসন করিবার সুযোগ পায়, সে দেশে এইরূপ নীতির অনুসরণ নিঃসন্দেহে অতিশয় আপত্তিকর। সরকারী ইনাম স্বাধীনোত্তর ভারতে যথারীতি প্রথমে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে এই নিয়মের কেন পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের অভিনব ব্যবস্থাটি যদি অভি-সন্ধিমূলক রাজনৈতিক চালই না হইবে, তবে যোগ্যতা নিরূপনের ভার শাসনকর্তারা নিজের হাতেই বা কেন রাখিবেন? প্রধানতঃ বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা কমিটির উপর সম্পূর্ণ বিচারের ভার ন্যস্ত করিলেই ত তাঁহাদের সদুদ্দেশ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। এই কেন্দ্রীয় কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক উপকমিটিও অনুরূপভাবে গঠন করা চলিতে পারিত। যাহা হউক, পুরস্কার-প্রাপ্ত ভাগ্যবান শিক্ষকেরা ক্ষুধার মুখে চুষি-কাঠি পাইয়া শান্ত হইয়াছেন কিনা জানি না। কৌলীন্য-গর্বে তাঁহারা সহকর্মী বন্ধুদের হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন কিনা, তাহাও বলিতে পারিব না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষক-সমাজ যে ফাঁদে পড়ে নাই, তাহাদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ধর্মঘট, কর্মবিরতি ইত্যাদি আচরণ আইন সম্মত হইলেও গ্লানিদায়ক এবং সমাজের ক্ষতিকর। কিন্তু সমালোচকদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই অস্ত্রগুলি প্রয়োগ না করিয়া পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকেরা তাহাদের অধিকারের রাজ্যে সূচ্যাগ্রভূমি পর্যন্ত দখল করিতে পারে নাই। যুক্তরাজ্যের পরিবর্তন-বিরোধী সমাজেও আজ শিক্ষক সম্প্রদায় এই পথেরই আশ্রয় লইয়াছে। সরকার বিমুখ হইলে, পুঁজি-বাদী সমাজে বেতনভোগী কোন সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট সিদ্ধির নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে।

একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের আলোচ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কারণ এইরূপ

সমাজে বিভিন্ন বৃত্তির আপেক্ষিক মূল্যায়ন টান-যোগানের জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে না। উহাদের নিজ নিজ সামাজিক উপকারিতার যোগে রাষ্ট্রদ্বারা তাহা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং আন্দোলনে ও সংগ্রামে শিক্ষকদের শক্তির অপচয়ের কোন কারণ ঘটে না। সমাজের নব রূপায়নে স্বীয় যোগ্য মর্যাদা লাভ করিয়া তাহারা শিক্ষাদান ও জ্ঞানচর্চাতে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে।

ভারতকে সমাজবাদী কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বহুদিন পূর্বেই গৃহীত হইয়াছে। বামপন্থীরা অবশ্য তাহাদের আন্তরিকতায় সন্দিহান। আমরা রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্যে যাইতে চাই না; কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কথায় ও কাজে এত বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে যে, সহজেই মনে হয় আদর্শটা তাহাদের যতটা প্রচারের ততটা আচারের নয়। অন্ততঃ আমরা যে সমাজতন্ত্রের দিকে মোটেই অগ্রসর হইতেছি না, বরং বিপরীত মুখেই চলিয়াছি, এ বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সম্প্রতি মহলানবিশ কমিটির বিশ্লেষণে এই সত্যটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে ধনীর ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের ক্রমাধিক্য এবং অপর দিকে দারিদ্র্যের দুঃসহ বিড়ম্বনা বৃদ্ধির মধ্যে এই রূঢ় সত্যটি ত আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কবে যে সমাজবাদী কল্যাণরাষ্ট্র আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, দেবাঃ ন জানন্তি। সুতরাং অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়কে আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াই স্বীয় মর্যাদা লাভ করিতে হইবে। ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য বটে কিন্তু অপরাধ নয়।

রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা
শুধু মাত্র ১০৲ টাকা দিয়েও শুরু করা যায়

★ কেবলমাত্র ১০৲ দিয়ে রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট খোলা যায় অথবা এর গুণিতক ৫০০৲ পর্যন্ত, ৪৬ অথবা ৮৬ মাসের জন্য।
★ মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তি ৪৬ মাসে ৫০০৲ টাকায় এবং ৮৬ মাসে ১০০০৲ টাকায় পরিণত হবে।
★ একক বা যৌথভাবে রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট খোলা যায়।

আই. পি. গোয়েঙ্কা
চেয়ারম্যান

আর. বি. শাহ্
জেনারেল ম্যানেজার

দি ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : কলিকাতা
ASP/UCO-4/64

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
গোল্ডেন

আমলা

হেয়ার অয়েল

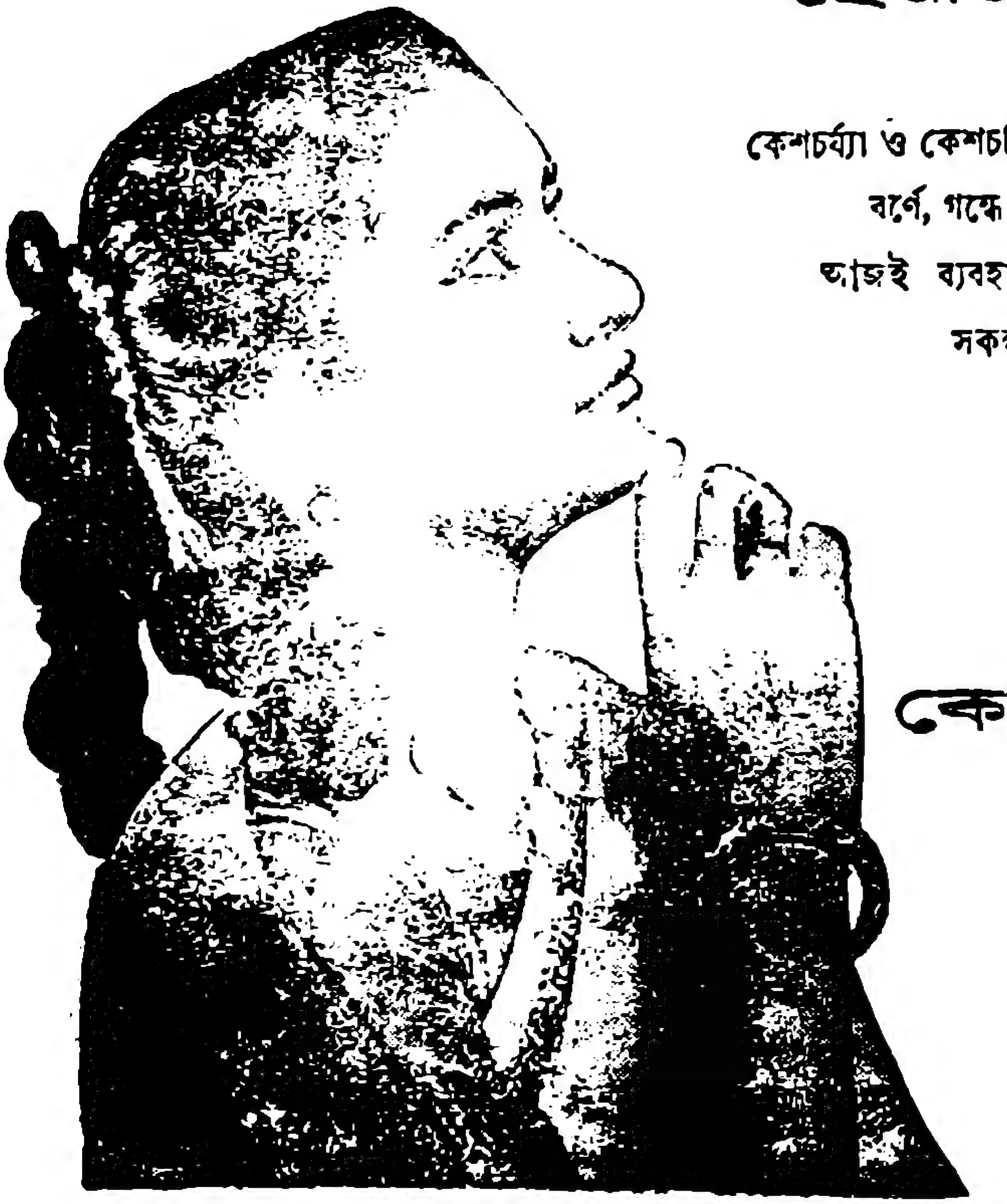

কেশচর্য্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।
আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন।
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে
পাওয়া যায়।

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

পরিকল্পনা ও জনমত

ধীরেশ ভট্টাচার্য

সাধারণ মানুষের কাছে এখন অর্থনীতির বাঁধা বুলি শোনানো নিরর্থক। যখন বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষেরই অভাব, তখন মানুষ যে পরিকল্পনার কথা বিমুগ্ধ হইয়া শুনিবে না, বরং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এই বিক্ষুব্ধ জনমত সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশনকে পর্যাপ্ত ভাবাইয়া তুলিয়াছে! আগামী পরিকল্পনাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবার জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফলে পরিকল্পনার আকারে যে পরিবর্তন দেখা দিবে তাহার কিছু কিছু আভাস এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সত্যই কি কোনো গুরুতর পরিবর্তনের প্রয়োজন? জনমতের বিক্ষোভ দেখিয়া যদি সরকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করেন, কিংবা অযৌক্তিক কোনো পরিবর্তনের ব্যবস্থা আমদানী করেন, তবে জনগণ কি তাহাতে উপকৃত হইবে? বর্তমান সংকট-মুহূর্তে এই প্রশ্নের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সব চেয়ে বড় অভিযোগ—গত তেরো বৎসর ধরিয়া পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, তবু সাধারণ ব্যবহার্য জিনিষ, যথা, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদির অভাব যেন ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হইয়া থাকে যে পরিকল্পনার ফলে সরকারী উদ্যোগে যে-সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা সকলেই কেমন যেন নির্জীব। তাহাদের সাহায্যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটিতেছে না। এই দুইটি অভিযোগ পরস্পর-সম্পর্কিত, কিন্তু কোনোটিকেই পরিকল্পনার বিরোধী বলিয়া মনে করা যায় না। সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি জিনিষ অতি পরিচিত, কিন্তু ঐ সব জিনিষের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আরও যে কত জিনিষের প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে তাহাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। সেইজন্য অনেক সময়ে এমন বহু সরকারী প্রকল্পকে তাহাদের নিরর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষেও যাহাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য! ইস্পাত কিংবা রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করে না বটে, অথচ এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে তাহার পরোক্ষ প্রভাবে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পায়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বস্তুর এই পারস্পরিক সম্পর্ককে অনুধাবন করিতে পারে না বলিয়া সময়ে সময়ে এমন জিনিষ চাহিয়া বসে যাহা সহজে পাওয়া যায় না, যাহার জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে দেশে যে-সব প্রয়োজনীয় শিল্পের সৃষ্টি হইতেছে, আজ তাহাদের প্রভাব আমাদের চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এই সকল শিল্পের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং ইহাদের বাদ দিয়া নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্য দ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হইত, এরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই।

নিত্যব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে পূর্ব-প্রস্তুতি যে-ধরণের হওয়া আবশ্যক, আমাদের পরিকল্পনায় তাহার অভাব ছিল কি? সেচের ব্যবস্থা, সার তৈরির কারখানা, ভাল বীজ সরবরাহ, ইত্যাদি প্রকল্প লইয়াই তো

পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। তবে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কি যুক্তিযুক্ত? পরিকল্পনায় মৌলিক কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন কি দেখা দিয়াছে?

আর্থিক উন্নতির সহায়ক যে-সকল প্রকল্প আমাদের প্রথম দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হইতে পারে না, শিক্ষিত জনমতের কাছে এই উপলব্ধিকে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহাতে অবশ্য বর্তমানের সমস্যা মিটিবে না, কিন্তু আমরা যে ভুল পথে অগ্রসর হই নাই এই বিশ্বাস সৃষ্টি হইলে সমালোচনার তীব্রতা খানিকটা হ্রাস পাইবে। তখন যুক্তির আলোকে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ বিচার করিয়া দেখা সম্ভব হইবে, কেন অসংখ্য নূতন শিল্প দেশে গড়িয়া ওঠা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তাহার ফলে উপকৃত হইতে পারিতেছে না সেই প্রশ্নের মূলে যাওয়া সম্ভব হইবে।

দুই

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রকল্পকেই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে না করিলে সকল প্রকল্পকে সমান উদ্যোগে কার্যকরী করার ব্যবস্থাও সরকারী কর্মবিভাগে থাকা প্রয়োজন। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের যে-অভাবে আজ আমরা প্রত্যেকেই পীড়িত, তাহার কারণ এই নয় যে এই সকল দ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না, পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল প্রকল্প সরকারী উদ্যোগের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভ করে নাই। যেমন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০ কোটি টন পর্যন্ত বাড়াইবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ছিল, কিন্তু উদ্যোগের অভাবে উৎপাদন ৮ কোটি টনও হইতেছে না। সুতরাং পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনগণের মনে যদি ক্ষোভ থাকে, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা প্রকৃতপক্ষে সরকারী কর্মনীতির বিরুদ্ধেই ক্ষোভ, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কিংবা মূলনীতির বিরুদ্ধে নয়। বাস্তবে যে-প্রশ্ন আজ সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা এই, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সকল প্রকল্প সরকারী কর্মনীতিতে সমান গুরুত্ব লাভ করে না কেন? বিশেষ করিয়া কৃষি, শিল্প কিংবা সমবায়ের পরিকল্পনাসমূহে সরকারী কর্মোদ্যোগের অভাব দেখা যায় কেন? সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটামুটি পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন অথচ কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অথবা সমবায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় কেন?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সরকারী কর্মবিভাগ সমূহ এখনও পর্যন্ত উৎপাদনকে নিজেদের অভীষ্ট বলিয়া মনে করিবার নীতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কৃষিদপ্তরের কার্যাবলীর বিচার যে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির মানদণ্ডে হইবে, অন্য কোনো মাপকাঠিতে ইহার বিচার চলিতে পারে না, এই ধরণের মনোভাব সরকারী কর্মসংস্থায় আজও বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্বে এই সকল কর্মবিভাগ যে-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। উৎপাদনের কাজ প্রধানতঃ সরকারী দপ্তরসমূহের বাহিরেই চলিতে থাকিবে এবং সরকার অল্পবিস্তর নির্দেশাদি দিয়াই তাহার দায়িত্ব পালন করিবে, ইহাই ছিল সেই যুগের সরকারী নীতি। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এই ধরনের নীতির অবিলম্বে পুনর্বিচার প্রয়োজন। সরকারী কর্মবিভাগসমূহকে উৎপাদনের দায়িত্ব আরও প্রত্যক্ষ আকারে অর্পণ না করিলে এবং সেই দায়িত্বের বিচার-বিবেচনার ব্যবস্থা সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত না করিলে পরিকল্পনার বর্তমান ত্রুটি সংশোধিত হইবে না।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনকে আমাদের পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই দাবী সর্বসম্মত। কিন্তু ইহার এমন ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে না যাহাতে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত সাম্য বিনষ্ট হয়—আমাদের শুধু অন্নবস্ত্রেরই প্রয়োজন, অথচ অন্নবস্ত্র পাইবার জন্য যন্ত্রপাতি, কিংবা যন্ত্রপাতি গড়িবার জন্য ইস্পাতের প্রয়োজন নাই, এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয় পরিকল্পনার গড়নে এমন কোনো মারাত্মক ত্রুটি ছিল না যাহাতে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার প্রয়োজন আছে। সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন সরকারী কর্মবিভাগসমূহে এমন মনোবৃত্তির সৃষ্টি করা যাহাতে পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপায়ণে কোনো অযথা শৈথিল্যের আবির্ভাব না ঘটে।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—চণ্ডিদাস বলেছিলেন। কিন্তু "সবার উপর" কি? এই যে বিপুল বিশ্ব চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দিকের পরে দিক্, স্তরের পরে স্তর, এর শীর্ষ দেশে কি মানুষই তার আসন পেয়েছে? এই যে দেশ-কাল, উপরে-নীচে, ডাইনে-বায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে আমাদের দৃষ্টি-সীমার বাইরে, আমাদের কল্পনা-চক্রবালের অতীতে—এই ভৌতিকর অসীমের বুকের উপর কি মানুষই স্থাপন করেছে তার রাজ সিংহাসন? পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন ও বিতর্ক করেছেন, কলহ ও কোলাহল করেছেন, কিন্তু আজো এর জবাব পাওয়া যায়নি। কেউ বলছেন, মানুষ বরেণ্য; কেউ প্রতিবাদ করে বলছেন, বরেণ্য তো নয়ই বরং নগণ্য। "সবার উপর" ইত্যাদি নিছক আত্মপ্রীতি বই আর কিছু নয়। সত্যি সত্যি মানুষ যাই হোক্, একথা বললে প্রতিবাদ হবে না যে মানুষের কাছে অন্ততঃ মানুষই "সবার উপরে"। মানুষের চোখে মানুষ সবার চাইতে সত্য, সবার চাইতে উপরে। "তাহার উপরে নাই"—মানুষের চোখে, মানুষের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যমণি; মানুষের সৌরজগত ঘুরছে মানুষকে কেন্দ্র করে; মানবিক চিন্তায়, আকাঙ্খায়, জ্ঞানে, মানুষই বিশ্ব-গতির কেন্দ্র-বিন্দু। আজকে Astronomy বা Astro-physics মানুষকে যতো ছোট যতো অকিঞ্চিৎকর করেই দেখাক্ না কেন, মানুষকে নিয়েই মানুষের প্রয়োজন; মানুষকে নিয়েই মানুষের যত সম্পর্ক ও যতো বিরোধ; মানুষকে জড়িয়েই মানুষের যত সুখ, যতো দুঃখ, যতো আনন্দ, যতো বেদনা। মানুষকে ছেড়ে মানুষের চলে না। মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে চিনতে হবে; তবেই মানুষের সাহচর্য থেকে কল্যাণকে আহরণ করা যাবে; মানুষের সঙ্গে সমাজ গড়া সম্ভব হবে, পরিবার ও গোষ্ঠী রচনা করা মনোরম হয়ে উঠবে। তাই Pope একদিন যখন বলেছিলেন "The proper study of mankind is man." তখন জীবন সম্বন্ধে যথার্থ বাণীই তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল। এরও পূর্বে Protagoras একটা বিখ্যাত উক্তি করে গেছেন—'man is the measure of all things.' এ উক্তিকে কেউ উপহাস করেছেন, কেউ উপেক্ষা করেছেন; কিন্তু মানব জীবনের গোপনতম এবং যথার্থতম কথাটিই কি এঁরা বলে যাননি? মানুষকে না বুঝলে মানুষের সমাজ ব্যর্থ হবে, পরিবার বিফল হবে, তার শিক্ষা নিরর্থক হবে, তার সংগ্রাম নিরানন্দ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যুগে যুগে মানুষকে জানবার, বুঝবার প্রয়াস মানুষ করেছে। মানুষের পিছনে যে জমাট অন্ধকার তাকে বিদারণ করে অনুসন্ধানের আলো ফেলেছে মানুষ; মানুষের জন্ম ও অতীতকে বুঝবে বলে।

তিনলক্ষ বছর হয়েছে মানুষ পৃথিবীর বুকের উপর দেখা দিয়েছে; এই তিনলক্ষ বছরের ইতিহাস জানতে মানুষ কতো অপরিসীম পরিশ্রম করেছে তার ঠিক নেই। মাটির বুক চিরে, পাথরকে গুড়িয়ে, গাছে, গুহায়, পর্বতে, বনে, তল্লাস করে করে মানুষ তার তথ্য খোঁজ করেছে; নদী ডিঙিয়ে,

সাগর পেরিয়ে দেশ-কালকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, চিরে ফুঁড়ে, মানুষ তার জান্‌বার, বুঝবার প্রয়োজন মিটিয়াছে। তারপর কতো কল্পনা, কতো অনুমান, কতো মননের সাহায্য নিয়ে মানুষ তার সিদ্ধান্তকে গঠন করেছে; তার জ্ঞানের সৌধকে বানিয়েছে। তাতেই কি ক্ষান্তি আছে! যাকে গড়েছে, তাকে বারবার ভাঙতে হয়েছে; যাকে যত্নে রচনা করেছে, তাকেই নতুন জ্ঞানের তাগিদে আবার আরো নিবিড়তর যত্নে নির্মূল করেছে।

মানুষের জীবনকে মনোরম করতে গিয়ে, জীবন-যাপনকে সুন্দর সুসহ করবার প্রয়োজনে, এমনি করে ভাঙাগড়া ও সৃজন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ জ্ঞান আহরণ করেছে মানুষকে ভালো ক'রে বুঝবার জন্য। সে বোঝা আজও শেষ হয়নি; আজও তার মানুষকে জানা বাকী রয়ে গেছে; মানুষের সুখ-দুঃখের গহন রাজ্যের গোপন তত্ত্বটি আজো মানুষ সত্য করে পুরোপুরি জানতে পারেনি। লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে জীবন আরো জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে; মানুষের জীবন-তত্ত্ব আরো সূক্ষ্মতর, আরো গহনতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষের জীবনকে বুঝতে গিয়ে মানুষ আজ দেখেছে, মানুষের জীবন একটা খণ্ডিত, পৃথক বস্তু নয়। জীবন হাজার হাজার দিকে তার ডালপালা ছড়িয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে; অগণ্য সূক্ষ্ম ও স্থূল তন্তুতে তন্তুতে মানুষের জীবন চারদিকের জটিল জীবনের সঙ্গে গাঁথা; মানুষকে ঘিরে যে অন্তহীন দেশকালের বিস্তার, তার সঙ্গে মানুষের যোগ নিবিড় ও দুশ্ছেদ্য। দেশে-কালে মানুষ একক নয়; চারদিককার সংখ্যাহীন নামহীন ও গোত্রহীন বহুর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ জটিল ও বিচিত্র। মানুষের জীবনকে বুঝাতে হলে বিচ্ছিন্ন করে বুঝলে চলবে না; তাকে একক সত্তা হিসেবে জানলে তাকে কিছুই জানা হবে না। মানুষকে বুঝতে হলে তার পারিপার্শ্বিককে বুঝতে হবে; তার চারিপাশের দিগ-দিগন্তময় দৃশ্য ও অদৃশ্য সত্তার সঙ্গে তার যে গভীর যোগ, সেই সর্বাঙ্গীন যোগে তাকে দেখলে তবেই তাকে সম্পূর্ণ দেখা হবে। "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায়" মানুষের বিহার ও বিস্তার, সেইখানে সেই পরম সংযুক্ততায় এবং সম্পূর্ণ বিস্তৃতি ও সম্বন্ধের মধ্যে মানবজীবনের গতিকে, ছন্দকে ধরতে হবে। তবেই মানব-জীবনের সংকোচ ও প্রসার, উত্থান ও পতনের বিচিত্র ও বিবিধ ইতিহাসকে গোচর করা যাবে। কারণ মানুষ—জীবনের ছন্দ ও বিশ্বলোকের গতির ছন্দ দুই নয়, এক ও অভিন্ন। যে তালে সমস্ত নিখিল ঘুরছে, ছুটছে, বদলে যাচ্ছে ও বিকাশ পাচ্ছে, সেই তালেই মানুষের বাইরের ও ভিতরের জীবন দুই-ই ছন্দিত ও আবর্তিত হচ্ছে। বিশ্ববীণার সবগুলো তার একই পর্দায় বাঁধা রয়েছে, একই সুরে তারা সবাই মিলে অস্তিত্বের এই বিচিত্র সঙ্গীত বাজাচ্ছে। উপনিষদের ঋষি বল্লেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" তার মানে এই একই কথা। আলাদা কিছু নেই পৃথিবীতে, সবার সঙ্গে সবার যোগ অন্তরঙ্গ। এক-কে জানতে হলে অপরকে জানতে হবেই।

জীবনকে দেখতে হবে বিশ্বের সঙ্গে এক করে, বুঝতে হবে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে। তাই মানুষকে জানতে হলে, জানতে হবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ছোটো বড়ো সবাইকে। জানতে হবে বিশাল ও বিচিত্র প্রাণীজগৎকে এবং জানতে হবে তৃণলতাশাল্মলীকে এবং জানতে হবে বিপুল জড় প্রকৃতিকে। মানুষের বিকাশের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে তৃণ-প্রাণী হ'তে সুরু ক'রে সূর্যতারাচন্দ্র পর্যন্ত সকলে। মানুষের ইতিহাস মানেই হচ্ছে আমাদের এই নগণ্য গ্রহটীর প্রত্যেকটী তৃণতরু ও কীট-পতঙ্গের ইতিহাস, কারণ এরা মানুষ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে বিকশিত হয়েছে। তাই মানুষের ইতিহাসকে সন্ধান কর্তে গিয়ে মানুষকে আজ সন্ধান করতে হচ্ছে তৃণ-তরু, প্রাণীজগৎ, ও মাটী পাথরের জন্মকথা। এক কথায়, সমস্ত সৌরজগৎকে তার আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবন-কথা সহ দৃষ্টির

সামনে ধরতে হবে। সবাইর জন্মকথা ও জীবনকথা জানলে মানুষেরও কথা জানা যাবে, সকলের পরিচয়েই মানুষের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করবে। এই অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখাই জীবনকে সত্যিকরে দেখা, একথা যুগে যুগেই মানুষ উপলব্ধি করেছে। বহুদেশে ও বহুকালে মানুষ এই সমগ্র দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে দেখবার প্রয়াস করেছে; কিন্তু চোখের সামনে 'সমগ্র' ধরা দেয় নাই; দেশ ও কালের দ্বারা মানুষের দর্শন খণ্ডিত হয়েছে; যুগানুযায়ী ও কালানুযায়ী সীমাকে লঙ্ঘন করে মানুষের জ্ঞান সৃষ্টিরাজ্যের সমগ্রতাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে নাই। সৃষ্টি হয়েছে জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান রচনা করেছে মানুষ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান। কিন্তু কোন বিজ্ঞান বা কোন দর্শনই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা আজো বলতে পারেনি। এক এক যুগের ও এক এক কালের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যতটুকু দেখেছে, ততটুকুই বলে গেছে। আজ বিংশশতকে এসেও মানুষ জটিল জীবনতত্ত্বকে বুঝতে চাচ্ছে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে; আজো বিজ্ঞানে, দর্শনে প্রাথমিক প্রয়াসের যুগকে মানুষ ছাড়িয়ে বেশীদূর এগুতে পারেনি। আজো চলেছে নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান ও অনুমানের পালা, আজো তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়নি, তত্ত্বরচনা যে কবে সম্পূর্ণ হবে কে জানে। তবুও যে সামান্য তথ্য আজ পর্য্যন্ত জমেছে বিংশশতকের ভাণ্ডারে তাকেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় মানুষ আজো তত্ত্ব সংগঠনের (theory construction) নিত্য নব নব সাধনা করেই চলেছে। তাই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করবার নব নব প্রণালী ও নব নব দর্শন বের করেও মানুষ তৃপ্তি পাচ্ছে না। কতো দৃষ্টিতে কতো মহাজন এই বিরাট বিশ্বকে ও আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখেছেন, তার সংখ্যা নেই। নানা মত ও জীবনতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যায় সমাজ আজো কণ্টকিত হয়ে আছে। দিন যতো কাটবে নব নব মনীষা নবতর তত্ত্ব ও নবতম দর্শনের সৃজন করে মানুষকে দেবে। কোন্ ছন্দে যে বিশ্ব ছন্দিত হয়ে উঠেছে, কোন্ ক্রমে, কোন্ পথে যে এই কোমলে-কঠিনে বিচিত্র জলস্থল আকাশ বিবর্তিত হয়ে উঠেছে, তার ইতিহাসের মর্মকথা আজো অজ্ঞাত রয়েছে। ইতিহাসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা যে কি সে নিয়ে তর্কের অবসান নেই আজো। তবু বহু ব্যাখ্যার মধ্যে, ১৯শ শতকের একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯শ শতকের আদিতে যে মনীষী বিশ্বজগৎকে আর একবার সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন তার নাম হেগেল। হেগেল জগৎ-বিবর্তনের ইতিহাসকে যে রীতিতে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, তা অভিনব। তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যানের কতকগুলি মৌলিক বিশিষ্টতা আছে, যার জন্য আজো জগতের বহু মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিকে তাঁর দর্শন আকর্ষণ করে। বিশেষ করে আজকার জগতে দেখতে পাচ্ছি, নতুন করে হেগেল দর্শনের পুনর্জন্ম বা resurrection বর্তমান শতাব্দীতে সুরু হয়েছে। তাই হেগেলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন আজকেও আছে।

১৭৭০ সনে হেগেলের জন্ম হয়, এবং ১৮৩১ সনে ৬১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ৪২ বছরের বয়সে (১৮১২-১৬ সনে) তার তর্ক বিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র "Science of Logic" নামে বই দুই অংশে বের হয়। একে বৃহত্তর ন্যায়শাস্ত্র Larger Logic বলা হয়ে থাকে। প্রথম ভাগ ১৮১২-১৩ বের হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮১৬তে বের হয়। পর বছরেই দর্শন বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ (১৮১৭) তাঁর "Encyclopaedia of the Philosophical Sciences নামে বিখ্যাত বই বের হয়। বিশ্বকোষের Encyclopaedia র প্রথম অংশে ন্যায়শাস্ত্র "Logic" নাম দিয়ে আবার তাঁর ন্যায়তত্ত্ব Logic সম্বন্ধে মতামত লেখেন।*

* Logic প্রথম সংস্করণে ১২০ পাতা মাত্র লেখা হয়েছিল; পরে আর দুটো সংস্করণে (১৮২৭ ও ১৮৩০) বাড়িয়ে ২২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত করা হয়।

হেগেল দর্শনের মূল তত্ত্ব এই দুখানা বইতেই রয়েছে ; হেগেল দর্শনের ভিত্তি ন্যায়শাস্ত্র। সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্র বললে যে ধারণা হয়, হেগেলের ন্যায়শাস্ত্র সে বস্তু মোটেও নয়। ধাপের পর ধাপ ক'রে নিখিল বিশ্বের বিকাশের মূল তত্ত্বগুলিকে হেগেল একটা বিশাল ও ব্যাপক দর্শনতত্ত্বে system এ গেঁথে তুলেছেন। মানুষের মানুষের চিন্তাজগতের পরিণতি হয় যে সূত্র গুলিকে ধরে, জড় পৃথিবীরও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে চলেছে যে রীতিকে অবলম্বন করে, চিন্তাজগৎ ও জড়জগতের সেই সমস্ত মৌলিক আইন বা তত্ত্বগুলোকে তিনি আবিষ্কার করে ধরে দিয়েছেন তাঁর এই ন্যায়শাস্ত্রে।

হেগেলের মতে দর্শন শাস্ত্রেরও একটা ছক-কাটা পরিষ্কার গঠন আছে। দর্শন কেবলিধরা-ছোঁয়া-যায় না এমন কতকগুলো চিন্তার কুয়াশা মাত্র নয়। জ্যামিতির যেমন একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও সহজ আকৃতি আছে, দর্শনেরও তেমনি রয়েছে একটা সুবোধ্য চেহারা বা সুগঠিত দেহ। দর্শন শাস্ত্রের সেই কাঠামো হচ্ছে হেগেলীয় ন্যায়তত্ত্ব দর্শন বিচারের মূল নীতি বা পদ্ধতিতত্ত্ব Methodologyকে হেগেল সংক্ষেপে বোঝাতে চেয়ে একটা স্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা এই ন্যায়শাস্ত্রে করেছেন।

উইলিয়াম ওয়ালেস (William Wallace) একজন হেগেলীয় ব্যাখ্যাতা (Interpeter) তিনি বলছেন :

"This is the work which is the real foundation of the Hegelian philosophy. Its aim is the systematic re-organisation of the Common-Wealth of thought, It gives not a criticism, like Kant ; not a principle, like Fichte ; not a bird's eye view of the fields of nature & history like Schilling ; it attempts the hard work of reconstructing, step by step, into totality the fragments of the organism of intelligence. It is scholasticism, if scholasticism means an absolute and all embracing system..."

(Introduction to the 'Logic of Hegel')

এঁর মতে হেগেলীয় ন্যায়তত্ত্ব হোলো পূর্ণ তত্ত্ববিদ্যা, শুধু সমালোচনা বা নীতি, নয়। "Systematic reorganisation of the Commonwealth of thought"—মানুষের চিন্তারাজ্যের সমস্ত ক্রিয়া ও কর্মপ্রণালীকে নতুন ক'রে বিশ্লেষণ করে তার একটা বিজ্ঞান এই ন্যায়শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। "Organism of Intelligence." মানুষের বুদ্ধি বা মনন শক্তির সবগুলো টুকরো বা প্রকাশভঙ্গীকে একটা ব্যাপক ("all embracing") ও সনাতন সমগ্রতায় (system বা 'totality') বেঁধে তোলা হয়েছে এই বইএ।

Hegel নিজেও বলেছেন, জ্যামিতির মতন দর্শনেরও একটা বিধিবদ্ধ ধারা আছে একে স্পষ্টরূপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক আকার দিয়ে সহজবোধ্য করা আমার উদ্দেশ্য।*

হেগেলের ন্যায়তত্ত্বকে দর্শন শাস্ত্র বা তত্ত্ব বিদ্যা নাম দিলেও ক্ষতি নেই। হেগেল নিজেই তাঁর ন্যায়শাস্ত্রকে তত্ত্ববিদ্যা বা Metaphysics নাম দিয়ে গেছেন। বা লজিক ন্যায় হেগেলের কাছে abstract বা বিশুদ্ধ মননক্রিয়ার বিজ্ঞান।

"Logic is the science of the Pure Idea" হেগেলের মতে 'মনন'ই (thought) মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করেছে ; পশুদের অনুভূতি (feeling) আছে ; কিন্তু তাদের "মনন" (thought) নেই।

"It is in knowing what he is and what he does, that man is distinguished from the

* Philosophy, like geometry is teachable and must no lessthan geometry have a regular structure......my provinee Is to discover that scienlific form, or to aid in the fromation of it" (Quoted by Wallace, Intro pp xiv)

brutes" (P 34, Wallace, Logic of Hegel) চিন্তা বা মননের অপরিসীম ক্ষমতা; চিন্তা পৃথিবীতে প্রলয় আনতে, বদলে দিতে পারে হবহু। চিন্তা বলতে কেবল প্রত্যেক মানুষ যে ব্যক্তিগত ভাবে মনন করে তাকেই বোঝায় না। মনন বলতে হেগেল কেবল "Subjective Thought" বোঝেন না। মনন "Objective" ও বটে। Hegel হচ্ছেন বিজ্ঞান-বাদী বা আধ্যাত্মবাদী। তাঁর দর্শনকে Absolute Idealism বলা হয়েছে—এই জন্যে যে Thoughtকে তাঁর দর্শন বিশ্বের মূল সত্তা বা Prius (Schelling'র ভাষায়) বলে নির্ধারণ করেছে। হেগেল Thought বলতে খণ্ডিত ও টুকরো চিন্তা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বোঝাতে চান না। 'Thought' মানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, আকার নেই যার, রূপ ও সীমা নেই যার। আমাদের সকল খণ্ডিত, ছোটখাট চিন্তাগুলোর পিছনে যে abstract, অখণ্ড, জ্ঞান আছে, যাকে বলা যায় universiality—সেই শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে হেগেল Thought বলে বোঝেন। Logic সেই বিশুদ্ধ বিশ্বজ্ঞান নিয়ে কারবার করে, তাই একে সাধারণ নীতিশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র না বলে বলা উচিত metaphysics. হেগেল বলেন:

"Logic therefore coincides with metaphysicis, the science of things set and held in thoughts,—thoughts accredited able to express the essential reality of things" (p 45 Logic of Hegel, Art 24.)

এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা Absolute বা Reason সকল দ্বন্দ্বের অতীত এবং সমস্ত subjectivity ও objectivityর পরপারে তার স্থিতি। জার্মান দার্শনিক Schelling তাঁর 'Authentic Exposition' নামক পুঁথিতে হেগেলের আগেই এই দ্বন্দ্বাতীত Absolute এর ইঙ্গিতও নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। তবে বিজ্ঞান যে সকল subjective-objective দ্বন্দ্বের ওপারে একথা Schilling শুধু নির্দেশ করে ও স্বীকার করে নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু হেগেল তাকে বোঝাবার জন্য একটা বিস্তৃত বিজ্ঞান (Science) গঠন করা দরকার বোধ করেছেন। এই বিজ্ঞানই (Science) হেগেলের বিখ্যাত Logic, Schelling যাকে Reason বা Absolute বলেছেন, তাকে Hegel নাম দিয়েছেন 'Idea' কিংবা, কখনো, কখনো 'Logos', এই Logos শব্দ থেকেই Hegel তার জ্ঞানতত্ত্ব বা চৈতন্যতত্ত্বকে নাম দিয়েছেন 'Logic', তাঁর দর্শনকেও তাই Eardman নাম দিয়েছেন 'Panlogism' কারণ চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান (Logos) ছাড়া বিশ্বে আর কোন সত্তা নেই, হেগেলের মতে। হেগেলীয় দর্শনের এই কথাই হলো মূল কথা এবং Logicই এই দর্শনের মূলতত্ত্ব।

হেগেলীয় Logic আমাদের দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান করে। বিশ্বের সর্বত্র সকল স্থানেই এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিকশিত হয়ে আছে; কাজেই 'science' এর একমাত্র সমস্যাই হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রকাশকে উপলব্ধি করা ও স্বীকার করা। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি দুটো বিষয় অমরা জানতে পারি:

(১) প্রথমতঃ জ্ঞান কি (What is reason)

(২) দ্বিতীয়তঃ সকল ক্ষেত্রে সর্বত্র যে জ্ঞানের প্রকাশ, সেই জ্ঞানকে কোন্ কৌশলে বা কোন্ প্রণালীতে জানা যাবে (How to find reason)

হেগেলের Logic এই দুই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে ও দুই সমস্যারই সমাধান করেছে; প্রথম সমস্যার সমাধান Logic করেছে, কারণ Logic দেখিয়েছে পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত জ্ঞান কি ভাবে অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড জ্ঞানে যেয়ে পূর্ণতা পায়। দ্বিতীয়তঃ হেগেলীয় Logic জ্ঞানের বিকাশকে বুঝবার একটা methodও নির্দ্ধারণ করেছে এবং তাঁর লজিক শাস্ত্র একটা Theory of methodও বটে। এই কারণে হেগেলীয় Logic শাস্ত্রই হেগেলীয় মতে চরম ও পরম দর্শন শাস্ত্র 'real philosophia prima.'

কাজেই আমরা দেখলাম, হেগেলীয় logic এর দুটো দিক রয়েছে, এক বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ এবং দ্বিতীয়, Logicএর methodology-এই methodology নিয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা এবং এই methodology নিয়েই বর্ত্তমান জগতে নূতন ক'রে আবার বিতর্ক উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ১৯ শতকে হেগেল দাবী করে গেছেন, যে method তিনি তাঁর Logicএ নিরূপণ করে গেছেন, সেই methodই সকল প্রকার জ্ঞানানুসন্ধানের একমাত্র অস্ত্র। আজকালও হেগেলীয় মতবাদের এমন ভক্ত আছেন যারা বলেন জীবনতত্ত্বের ও জগৎতত্ত্বের সকল ক্ষেত্রেই এই হেগেলীয় methodই শেষ কথা ও চরম তত্ত্ব, আজ এবং চিরকাল। দর্শনে, মনোবিদ্যায়, পদার্থবিদ্যায়, অঙ্কশাস্ত্রে, প্রাণিবিদ্যায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে—এক কথায় মানুষ-জীবনের সকল কর্মে, সকল চিন্তায়, ও সকল চেষ্টায় এই হেগেলীয় 'method'কেই গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজন যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে অদ্যকার পৃথিবীতে এমন অবস্থা-চক্র সৃষ্ট হয়েছে যে একমাত্র এই হেগেলীয় নীতিকেই জগতের সকল কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেই মেনে নিতে হয়। না নিলে চলবে না, মানে, না নিলে এই পৃথিবীর, তথা, মানব জাতির কোন সমস্যারই গ্রন্থিমোচন সম্ভব হবে না। পরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুশ্ছেদ্য জটপাকিয়ে উঠবে এবং জটিল হতে জটিলতর সঙ্কটের পথে একদিন সমাজ ও মানব-জাতি দুরবস্থার 'অন্ধংতমঃ' তে প্রবেশ করবে।

এমন যে হেগেলীয় method, তার নাম হচ্ছে 'Dialcetic method" এই Dialectic কে নিয়ে আজ চিন্তা জগতের কোথাও কোথাও নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ মনে করছেন Dialectic ই এযুগের সকল সঙ্কটের চূড়ান্ত নিরসন করবে। বিগত যুদ্ধের পরে জগতের সকল ক্ষেত্রে যে আলোড়ন-বিলোড়ন সুরু হয়েছে, এ খবর সকলেরই জানা আছে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে দর্শনে, বিজ্ঞানে, এক কথায় মানুষের কৃষ্টিতে আজ যে নিদারুণ টর্ণেডোর ঝাপ্টা চারদিক থেকে লাগছে তার আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য চিন্তানায়ক ও কর্মচালকদের আজ উদ্বেগের সীমা পরিসীমা নেই, আজ ক'য়েকশ' বছর ধরে 'পাশ্চাত্য সভ্যতা" নামে যে পরমোজ্জ্বল, আশ্চর্য্য কৃষ্টিটা পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আজকে হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়ে সে অচল ও মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' আজ জীবন মরণের সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে; crisis এর পর crisis এসে তাকে শ্বাসরোধ করে মারবার উপক্রম করেছে, আজকে তাই প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠেছে, বিতর্ক ও কোলাহল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে কেউ কেউ বলছেন Dialectic সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধাই হচ্ছে এ সঙ্কটের মূল কারণ এবং একমাত্র Dialecticএর যাদু কাঠিই জগতের সকল জটিল জটকে খুলতে পারবে ও সকল কঠিন সঙ্কটকে নিরসন কর্তে পার্ব্বে। Dialecticই হচ্ছে সেই magician's wand যা' এ যুগের ও তথা সকল অনাগত যুগের সব মুশকিলকে আসান কর্তে পারবে। প্রায় সোয়াশ' বছর আগেকার মরচে-ধরা Dialecticকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে বের করে এনে এঁরা বলছেন যে এই বিস্মৃত-প্রায় methodই বিংশ শতকের অমোঘ যুগ-প্রয়োজন। বর্ত্তমান কাল একে চায়, ভাবীকাল ও এই ডায়েলেকটিক্‌কেই চায়, সসাগরা ধরণী এরই সোনার কাটির ছোঁওয়ার প্রতীক্ষায় ঘুমিয়ে আছে; এরই ছোঁওয়া লেগে একদিন বিশ্বসংসারের ঘুমন্ত জীবন জেগে উঠবে ও চোখ মেলে চাইবে জলে স্থলে আকাশে নূতন জীবনের জন্মোৎসব আনবে এই Dialectic'র মায়া, বাইরে-ভিতরে সর্ব্বত্র জাগরণের বসন্ত-মুঞ্জরণ সূচনা কর্ব্বে এই ডায়ালেকটিকের অলস্ত সূর্য্যোদয়। এই ডায়ালেকটিক্‌কে কেন্দ্র করে আজকে অনেক কবি হয়ে উঠেছেন দার্শনিক এবং অনেক দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন romantic; অধিকন্তু সর্ব্ব সাধারণ সবাই হয়ে উঠেছেন prophet. (ক্রমশঃ)

ভাবী সমাজের ভাবনা

শচীন্দ্রনাথ বসু

পাহাড়ের চূড়া থেকে যে বরফের তাল নিচের দিকে গড়ায় তার গতি ও আকৃতি যেমন শেষের দিকে অনেক দ্রুত বাড়ে আগের তুলনায়, মানুষের প্রগতিরও সেই অবস্থা। বহু লক্ষ বছর অতি ধীরে অগ্রসর হয়ে আজ সে প্রতি দিন নতুন ও বিরাট সম্ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছে। বিজ্ঞানের বহুমুখী অবিশ্বাস্য আবিষ্কারই এর এক মাত্র হেতু নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারণেও সমাজের চেহারা বদলাচ্ছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি গত যুদ্ধের আগের কুড়ি বছরের সঙ্গে পরের কুড়ি বছরের তুলনা করেন তা হলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সহজ ঘরোয়া দৃষ্টান্ত মিলবে আমাদের পোশাকে, যেমন এ যুগে ধুতির ব্যবহারাল্পতায়।

আগে যাই থেকে থাক, আজ পশ্চিমের দেশগুলি পুবের অগ্রগামী মানুষের বিবিধ সৃষ্টি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে। তা ছাড়া, পশ্চিমের অনুকরণেই আজ পুবের সমাজও গড়ে উঠছে। সুতরাং আমরা প্রধানত পাশ্চাত্ত্য সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখব।

পশ্চিমের লোক (এবং পণ্ডিতরাও) পুবের বহুবিধ কুসংস্কারকে ঘৃণা পরিহাস করে এসেছে, আজও করে। অথচ তারাও বহু বছর অদ্ভুত সংস্কার আঁকড়ে থেকেছে; পৃথিবীর সৃষ্টি যিশুর জন্মের মাত্র হাজার চারেক বছর আগের ঘটনা এ কথা মানতে তাদের যুক্তিতে বাধে নি, যদিও প্রাচ্য পুরাণে তা বহু কল্প আগের কথা। হীনতর প্রাণীর থেকে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও বিজ্ঞান প্রাচ্য বিশ্বাসকেই সমর্থন করেছে। কিন্তু পুব পশ্চিমের আপেক্ষিক উৎকর্ষ নিয়ে তর্ক এ রচনার উদ্দেশ্য নয়; পূর্বোক্ত কুসংস্কারগুলি আজ শিক্ষিত সমাজে প্রায় অবলুপ্ত—এক হয়তো গোঁড়া বাইবেল-ধর্মীদের মধ্যে ছাড়া। যে বিষয়টি নিয়ে এ যুগে সবে বহুর মনে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব জেগেছে তা হল ঈশ্বরবাদ।

পশ্চিমের গর্ব যে তারাই প্রথম প্রাচীন বহু দেবদেবী বর্জন করে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছে, ইহুদীদের থেকে শুরু করে। এক ঈশ্বরের প্রথম উল্লেখ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু দাবিটা যদি সত্যও হয় এ যুগে অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগছে যে বহুর তুলনায় একের বিশেষ গুণ কোথায়! অবশ্য পৃথিবীর সৃষ্টি তারিখ বা ক্রমবিকাশ-বাদ প্রমাণ করা যত সহজ, ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা তা নয়, কারণ না-ধর্মী উক্তির প্রমাণ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আজ অনেকে বলছে যে যে জিনিসের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি নেই, বিশ্বের স্বভাব বুঝতে যার প্রয়োজন নেই, তাতে বিশ্বাস করবার দরকার নেই; এরা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী না হলেও বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে থাকতে চায়। বহু দেবতার থেকে যেমন মানুষ এক কালে মুক্তি পেয়েছে তেমনি এক ঈশ্বরের থেকেও তার মুক্তি আসবে। দ্বিতীয় ধাপটি প্রথম ধাপের মতই স্বাভাবিক—যে মানুষ বহু লক্ষ বছর আগে আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ দেখে ভয়ে কেঁপেছিল,

মনে মনে সৃষ্টি করেছিল অমানুষিক দেবতা, এত কাল পরে সে প্রথম ভয়মুক্ত হবে।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনে মৃত্যুর পরে তার সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এ কথাও মানুষ ভাবতে পারে নি, সুতরাং সে সৃষ্টি করেছে অমর আত্মা এবং পরলোক। এই আত্মার চরিত্র সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে দার্শনিকদের মধ্যে তর্ক ও আলোচনা চলেছে, কিন্তু অস্তিত্ব নিয়ে কেউ বড় সন্দেহ প্রকাশ করে নি। অবশ্য গ্রীসের এপিকিউরাস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখেছেন, "দেহের মত আত্মাও মর। দেহের বাইরে ভাবনা বোধ অনুভূতি বা অস্তিত্ব কিছু নেই।" এ যুগের দার্শনিক হিউম ও সান্তায়ানাও আত্মাকে অস্বীকার করেছেন।

মোপার্স লিখেছেন, "প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই আমার বিশ্বাস।" এই ধরনের বিশ্বাস বর্তমান কালে সাধারণ সমাজের মধ্যে বাড়ছে—অদূর ভবিষ্যতে অমর আত্মার মৃত্যু বন্ধ করা যাবে না মনে হয়। বলা বাহুল্য, আত্মার পক্ষে বিজ্ঞানের কোনও নজির নেই।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিয়ে সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য, এক মহান সুন্দর আদর্শও অনেকের কাছে আবশ্যিক মনে হয়েছে ; এমন কি বিজ্ঞানীরাও বহু দিন ধরে এই বিশ্বাসের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই রোমান্টিকরা প্রজাপতির রং দেখেছে, বিছার কাঁটা দেখে নি। মহারথী অ্যারিস্টটল উদ্দেশ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু সে কালের গ্রীসেই বিরুদ্ধবাদী ভাবুকেরও অভাব ছিল না। ডেমক্রিটাস ও আনাক্সাগোরাস উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক জগতে বিশ্বাসী ছিলেন। এপিকিউরাসের যে বাক্যটি উপরে উদ্ধৃত করেছি তার পরেই তিনি লিখছেন, "জীবন কোনও ঐশ্বরিক শিল্পীর পরিকল্পনা নয়, যান্ত্রিক বিশ্বের এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র তা ; মহাশূন্যে পরমাণুর যে চলাচল তার আকস্মিক পরিণতি এই বিশ্ব।" পরে বিভিন্ন ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে এই বিশ্বাস বহু দিন মানুষের মন অধিকার করে থেকেছে যে সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে কোনও এক আদর্শ পূরণের দিকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যের মুখে এ ধারণা আজ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দেশপ্রেমিকতাকেও এত কাল প্রায় ঈশ্বরের পাশে আসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ কালে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন জাগছে। উৎকট ধর্মান্ধতা যেমন যুগে যুগে সর্বত্র বহু লোকের বহু ক্ষতি করেছে তেমনি স্বাদেশিকতার ও স্বাজাতিকতার আতিশয্যও একের পর এক যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, আজও নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে—যেমন দেশ বিভাগে, যার ফলে নতুন সীমান্তের দু পাশে নতুন করে উৎসারিত হচ্ছে ঘৃণা, সীমারক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের পকেট খালি করে কিনতে হচ্ছে বন্দুক। যে দেশের পরিধি এক মাইল মাত্র তারও চাই মারণাস্ত্র স্থলে জলে আকাশে। এই সব কারণে সম্প্রতি রাজনীতিক নেতারাও অত্যধিক দেশ-পূজার দোষ গাইছেন, এবং বিভিন্ন দেশের সংযোগে ফেডারেশান বা অন্য শ্রেণীর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মনোযোগ পড়েছে। তাতে অনেক 'কঠিন' কলহ রাতারাতি মিটে যেতে পারে। শিক্ষিত তরুণরা মানুষের মধ্যে শুধু একটি জাতির পক্ষপাতী, তা হল মানুষ জাতি—বিজ্ঞানের ভাষায় হোমো সেপিয়েন্স। কোন্ গোষ্ঠী কোন্ কালে কোন্ বিশেষ ভূখণ্ডের অধিবাসী এই প্রশ্ন মানবেতিহাসের বিরাট পটভূমিতে এদের কাছে মেকী মনে হয়। নিরর্থক ঠেকে আজ এই ভ্রমণের যুগে পদে পদে পাসপোর্ট ভিসা শুল্ক বিভাগীয় জ্বালাতন। এই মনোভাব বাড়তে বাধ্য।

সব আদর্শই যদি ভুয়ো প্রমাণ হয়, সব মূর্তিরই যদি খড় বেরিয়ে যায়, তবে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? ডস্টয়েভস্কি লিখেছিলেন যদি ঈশ্বর না থাকে তবে সবই চলতে পারে, কোনও বাধা নিষেধ নেই। অর্থাৎ তা হলে পাপ পুণ্যের প্রশ্নও আর থাকে না।

এই যে পুরনো আদর্শ ভেঙে পড়ছে, চিরকালীন মূল্যগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে, তার পরিবর্তে কিন্তু নতুন আশ্রয় মিলছে না, সৃষ্টি

হচ্ছে শূন্যতা। এই শূন্যতা মানুষের পক্ষে অতি বেদনাদায়ক, ভাবুকদের মধ্যে এই বেদনা মূর্তি পেয়েছে এ যুগের দর্শন existentialism তত্ত্বে (এই শব্দটির উপযুক্ত বাংলা আমি পাই নি—অনেকে লেখেন 'অস্তিত্ববাদ', কিন্তু আমার কানে তা শোনায় যেন existence-ism)। যারা এই দর্শনকে বুঝতে চেষ্টা করে নি তাদের পক্ষ থেকে এর উপর অনেক নির্বোধ রসিকতা বর্ষিত হয়েছে—তাদের ধারণা existentialist-রা Beat বংশেরই আধপাগলা এক সংস্করণ, এরা স্নান করে না, এক মুখ দাড়ি নিয়ে প্যারিসের কাফেতে দিন কাটায়।…

সাধারণ লোকের পক্ষে এই দর্শন বোঝা সবচেয়ে সহজ সার্ত্র ও কামু-র বই পড়ে, যদিও কামু বলতেন তিনি ঐ দলের নন। যে মানুষের চোখ থেকে সব ঠুলি খসে পড়েছে, জগৎ সংসারের নগ্ন নিরর্থক খাপছাড়া (absurd) চেহারাটা যার কাছে পরিষ্কার ধরা পড়েছে, তার সমস্যা আলোচনা করেছেন কামু। Absurd কেন? কারণ মানুষের মনে যে দুর্নিবার আকুতি তার সঙ্গে মেলে না জগতের ; সেখানে অকারণ পাপ, অকারণ বেদনা। মানুষ যা কিছু বানায় বহু যত্নে তার কোনওটারই শেষ পর্যন্ত কোনও অর্থ হয় না, সুতরাং জীবন হয়ে দাঁড়ায় বোঝা। তবে কি আত্মহত্যা? না, এক মাত্র পথ হল আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে জগতের বেয়াড়া নিয়মকে তুচ্ছ করা—বহু কষ্টে পাথরটি পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে তুলতে হবে, যদিও জানি কাজটা অর্থহীন, জানি আবার তা গড়িয়ে পড়বে নিচে।…

সার্ত্রও নৈরাশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি, তিনি বরাবর বলে এসেছেন existentialism আশাবাদী দর্শন ; আশা মানুষের নিজের মধ্যে, সব মায়াবন্ধন কেটে যাওয়ার ফলে তার যে স্বাধীনতা বেড়েছে সেই স্বাধীনতার মধ্যে। মানুষ এক মাত্র নিজের কাছে দায়ী, সে নিজেই নিজেকে গড়বে। সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে (নাম Les Mots, অর্থাৎ 'কথা' বা 'শব্দ'), সেই সম্পর্কে এক ফরাসী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপে Nausea-র মত নৈরাশ্য-মূলক উপন্যাসের রচয়িতা সার্ত্র বলেছেন যে জীবনে তিনি বরাবর সুখী থেকেছেন। জগতে এত দারিদ্র্য, দ্বেষ, অত্যাচার যে এখন মানুষের দার্শনিক ভাগ্য-সমস্যা নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? এই খাপছাড়া মানুষের অসঙ্গতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আসবে তখনই যখন এই সব প্রত্যক্ষ সমস্যা মিটবে। Nausea-র existentialist জগতে বাঁচবার জন্য মানুষকে তখন নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে হবে।

এই সম্পর্কে তিনি বর্তমানের অগ্রগণ্য নতুনপন্থী লেখক রোব্-গ্রিএ ও স্যামুএল বেকেট-এর প্রতি অভিযোগ করে বলেছেন যে এঁদের লেখায় আজকের প্রত্যক্ষ সমস্যার ছায়া নেই, তা বুর্জোয়া সমাজের উদ্দেশ্যে রচিত (সার্ত্র যে সাম্য-বাদী তা সকলেই জানেন), অথবা শেষ পর্যন্ত হতাশাবাদী। ফরাসী সাহিত্য জগতে New Novel নামক যে ঢেউ এসেছে, রোব্-গ্রিএ তার মধ্যে প্রধান। এই দলের আর কয়েকজন মিশেল বুতর, ক্লোদ সিমঁ, নাতালি সারোৎ, মার্গেরিৎ দুরা ও রোবের প্যাঁজে। সে কালের নীতি এ কালে অচল, মানুষের পক্ষে তা বাধা মাত্র, এই সুর বাজে এঁদের রচনায়।

নাটকের জগতে theatre of the absurd আর একটি সাম্প্রতিক ঢেউ। বেকেট রচিত Waiting for Godot এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ; এ নাটকে কিছুই ঘটে না, শুধু জগতের খাপছাড়া চেহারা ফুটে ওঠে। তবু তা দেখতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে লোক আসে, এমন কি আমেরিকার মত বস্তুবাদী, আশাবাদী দেশে। এ শুধু হুজুগ নয়—নতুন যুগের নতুন সমাজের ভাবধারার সঙ্গে নিশ্চয় কিছু সংগতি আছে এ ধরণের রচনায়। বেকেট-এর দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে। ইয়োরোপের নবনাট্যে আর দুটি উজ্জ্বল নাম রুমানিয়া-জাত প্যারিসবাসী অ্যজেন ইয়োনেস্কো ও জার্মেনির বের্টোল্ট ব্রেশ্ট ; ইনি অবশ্য আর বেঁচে নেই। ফ্রান্ৎস কাফ্কা-র বইগুলি নিয়েও ছায়াচিত্র নাটক তৈরি হচ্ছে, ইয়োরোপের

সর্বত্র কাফ্‌কা-র প্রচার ও প্রভাব বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। খাপছাড়া জগতে মানুষের অসহায় বন্দী চেহারা তাঁর মত সুন্দর আর কে ফুটিয়েছে? তাঁকেও existentialist বলা চলে, যদিও সার্ত্র-র মত আশার রেখা তিনি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান নি।

সুতরাং যে ধর্ম ক্রমেই সাধারণ সমাজে প্রবেশ করছে তাকে বলা চলে carpe diem, বা 'বেঁচে নাও দু দিন বই তো নয়' (এ ধর্ম যাদের কাছে খুব বেশী পাশ্চাত্ত্য বা বস্তুবাদী মনে হবে তাদের মনে রাখা দরকার ভারতীয় লোকায়ত দর্শন এবং চার্বাক, অজিত কেশকম্বলিন্, জয়রাশি ইত্যাদির বাণী)। ধর্ম, পরলোক, নীতি, রাজনীতি, স্বদেশ, স্বজাতি ইত্যাদি নিয়ে এই যুগধর্ম আর তত মাথা ঘামায় না, তার বিদ্রোহ মেকী মনগড়া বাধা নিষেধ আর প্রাগৈতিহাসিক ট্যাবুর বিরুদ্ধে। টপ্‌লেস নিয়ে পশ্চিম জগতে যে এত মাতামাতি তা হুজুগ বা নোংরামি মাত্র নয়, তার মধ্যেও কিছুটা অন্তত এই লক্ষণ দেখা যায়। গরম কালে পোশাকের প্রয়োজন নেই, দেহের উন্মোচন অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত নয়—সেটাই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর। অনেকটা এই মনোবৃত্তির থেকেই নর নারীর যৌন আচরণেও পশ্চিমের সমাজ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে আগের চেয়ে দ্রুত। উপযুক্ত বাসা বা পয়সার অভাবে যত দিন বিয়ে করা সম্ভব নয়, তত দিন সেক্সকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে এমন কথা এ যুগের ছেলে মেয়েরা মনে করে না।

আদর্শ ও নীতির জগতে এত বড় বিপ্লব এর আগে আর ঘটে নি। এই নতুন তরুণ সমাজের আলোচনায় কিছু দিন আগে Encounter পত্রিকায় আর্থার কোএস্‌লার লিখেছিলেন, "ঠিক যেমন তরুণ ইংরেজরা তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যিক গৌরবের কানাকড়িও দাম দেয় না, তেমনি জার্মেনি, ইটালি ও ফ্রান্সের তরুণরা স্বাজাত্যিকতা, দেশসীমান্ত ও গোষ্ঠীগত শত্রুতার তোয়াক্কা করে না…এক কথায় ইয়োরোপে স্বাজাত্যিকতা মরেছে, নানা রকম আদর্শবাদ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, দারিদ্র্য বিদায় নিচ্ছে।"

এইখানে দারিদ্র্য কথাটি অর্থপূর্ণ। সমাজের চেহারা যে অর্থতন্ত্রের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত তা বুঝতে হলে মার্ক্‌সবাদী হওয়ার দরকার করে না, চোখ খুলে রাখলেই চলে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাচ্ছল্য আজ দিনে দিনে বাড়ছে, প্রাচ্যের অবনত দেশ নানা কারণে এবং প্রধানত জনসংখ্যার চাপে পিছিয়ে পড়াতে পৃথিবীর দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে চলেছে। অথচ ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার তুলনায় পৃথিবীর জনসংখ্যায় এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অংশ অনেক বেশী। আজ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ৩০০ কোটি, তা দ্বিগুণ হতে ৪০ বছরও লাগবে না। ইতিপূর্বে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে লেগেছে যথাক্রমে ৬০, ১০০, ২০০ ও ১৬০০ বছর—এর থেকে বোঝা যাবে সংখ্যার চাপ কতবড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে (তৎসত্ত্বেও এখনও অনেকে জোরগলায় বলেন যে শুধু আরও চাষ আরও সার ইত্যাদি দিয়েই সমস্যা মেটানো যায়)। যাই হক, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হল যে বিত্তশালী পশ্চিমের নতুন সমাজ কি আর্থিক সাচ্ছল্য পেরিয়ে পুবে শিকড় ছড়াতে পারবে? এমন কি মানব জাতির অধিকাংশ হয়তো শেষ পর্যন্ত সচ্ছল সংখ্যালঘুদেরই টেনে নামাবে নিজের স্তরে। উপরে যে দার্শনিক ও কৃষ্টিগত বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে তখন কে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে? শুধু অন্নচিন্তা আশ্রয়চিন্তায় দিন যাবে হয়তো।…

কিন্তু এ রচনা অপেক্ষাকৃত অদূর ভবিষ্যতের সমাজকে নিয়ে। দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে গভীর জলে পড়তে হয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের সংসারকে প্রায় রাতারাতি বদলে দিচ্ছে, এবং বিজ্ঞানের প্রগতি আজ পড়ন্ত তুষার পিণ্ডের মতই বেড়ে চলেছে। রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে, অথবা মগজে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগিয়ে প্রাণীর স্বভাব আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে। দেহকোষের মধ্যস্থিত নিউক্লেয়িক অ্যাসিড (DNA) আজ যে তার আণবিক গঠন সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করেছে তাতে হেরেডিটির রহস্য পরিষ্কার হয়েছে, ফলে হয়তো একদা মানুষ নিজের খুশি মত ছাঁচ বানিয়ে মানুষ তৈরি করবে। তখনই বা সমাজের চেহারা কেমন হতে পারে আপাতত এই জল্পনার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।…

দেবযানী কাহিনী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সেই সব ভোর মনে পড়ে।
পোহাতী তারার ভোর, তা-ই নাম ছিল সে তারার,
আজ তার নাম জানি, মানে জানি সব ইশারার
জানি, সে কখন মন ভাঙে, মন গড়ে।

সেই সব ভোরে কোনো মানেই ছিল না।
জানতাম, মেটে ঘরে ভোর আসবেই
বেড়ার বাসক-গন্ধ হাওয়ার শাড়িতে তার বোনা
নীলচে হাওয়ার গন্ধে নীলচে তারার চোখে ভোর
আভা আসবেই ঘরে যদিও তা উজ্জ্বল আলোর
এমনি আশ্বিন-মাস, যে আশ্বিন নেই।

'আসিনি তো', বলবে সে-রূপসী এখন :
'কোনোদিন এর আগে আসিনি তো এই ঘরে আর!'
বলবে সে দেবযানী-তারা।
শুনছে এখন তার-নাম-জানা ভাঙা-ভাঙা মন,
বলছে এখন মনে, পুরাতন ভরা মনে পাবে বলে সাড়া—
নীলচে দেয়ালে না কি, ভোর নয়, ছিল অন্ধকার।

হয়তো বা তা-ই। এই ঘরই তোমার সেই কূপ,
তোমারই কান্নার রঙে অন্ধকার ইঁটের দেয়াল
আলোতে উজ্জ্বল তুমি পাতাল-উত্থিতা অপরূপ—
পাতালে যে বাড়িয়েছি হাত তা-ও হল কতো কাল!

কালো অন্ধকারে : দিনেশ দাস

সমুদ্র পাখির মত বিক্ষুব্ধ সাগর এক পার হয়ে এসে
কোথায় নামব বল?
এখানেও গাঢ় অন্ধকার
আকাশ কি ভয়ে কালো হ'ল?
তার ছায়া পড়ে গাছে পাতায় পাতায়
ফুলে, ঘাসে জমে অন্ধকার।

ঝড়ের সংকেত কোনোখানে!
সেই ঝড়ে তামাক গুঁড়োর মত ধুলো ওড়ে :
কালো হাওয়া বেদনার চেয়ে কালো, যন্ত্রণার চেয়েও গভীর
থোবা থোবা অন্ধকার ব'য়ে ব'য়ে আনে।

নিঃশব্দ তমসা নামে সুমন্ত বিস্তীর্ণ এক দিগন্তের' পরে,
আমার এ শূন্যমন ভ'রে যায় ধোঁয়া অন্ধকারে :
আতঙ্কে সমস্ত আলো নিভে গেছে অতর্কিতে—
আমার মনের মত আঁধারেরও আদি-অন্ত নেই,
পৃথিবীর সব কান্না ডুবে গেছে রাত্রির নাড়ীতে।

আর এক আশ্রয়ের জন্য : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাটির নিচে ইঁদুর
হাওয়া ছাড়া আলো ছাড়াই বাঁচে।
মাটির নিচে যোজন জুড়ে তাদের রাস্তা, তাদের ঘরবাড়ি—
খায় দায় সন্তানের জন্ম দেয়
লক্ষ কোটি ইঁদুর।

প্রভু! আমরা কবে ইঁদুর জন্ম নেব,
এর পরে আর কবে!
[জন্মদিন, ১৩৭১]

যুগ যুগান্ত : গোপাল ভৌমিক

কি করেছি তবে এতকাল ধরে
তাড়িয়ে মশা ও মাছি
বলতেই যদি না দাও আমাকে
তুমি আছ আমি আছি
এবং ভূগোলে সব দেশ আছে
যারা খুব কাছাকাছি
ব্রহ্ম মালয় সুরিনাম সহ
কেনিয়া ও মালাগাছি।

বাধে না যাদের কোলে তুলে নিতে
খুশিতে ঠেলতে দূরে
চপল প্রেমিক হতে পারে তারা,
পিতল সোনায় মুড়ে
কুড়াতেও পারে হয়তো বাহবা
সাময়িক মোহাবেশে
চিনে নিতে তাকে ইতিহাস-মন
জয়ী হবে নাকি শেষে !

তবু ভুল করি, প্রেমের বনামে
বিষের পেয়ালা হাতে
ভ্রাতার মুখে তা তুলে দিতে গিয়ে
ধরা পড়ি হাতে নাতে।
নিজের সে পাপ স্বীকার করি না,
বলি ওরা দোষী, ওরা।
বধির ঢ়ুকান শুনতে পায় না
চলেছে কালের ঘোড়া।

নিজের কবিতার উদ্দেশ্যে : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অকার পালকগুলো, কেন সব ফিরে ফিরে আসে
অন্ধ এক যাতনার নিরুপায় অবাক মন্দিরে !
সেখানে সমস্ত স্মৃতি ভগ্নপ্রায়, চিন্তার আড়ালে
পাখীরা নিহত সব অনামিক ব্যাধের শিবিরে।
একটু অপেক্ষমান সান্নিধ্যের স্বস্তির নিবিড়ে
যদি যেতে পারতাম ! চুলের ফিতের প্রলোভনে
যেমন জমায় ছোট মেয়েটিও পয়সা কৌটায়
এবং রথের মেলা জগলেই কেমন সহজে
ইপ্সিত বস্তুর দিকে আনন্দিত উর্দ্ধশ্বাসে ধায় !

সময়, সময়হীন ; মেলেনা নির্দ্দিষ্ট অবসর,
প্রক্ষিপ্ত ঢেউয়ের পর ঢেউগুলি বুকে আছড়ায়
যেন দীর্ঘ নদীতীর প্লাবনে জলের সমাবেশে
বুক ভাঙে গ্রাম ভাঙে, ভাঙে তীর ; ক্ষুব্ধ মোহনায়
অজস্র ধারায় ছোটে কিংবা ভাসে গোপন আক্রোশে।
এখন সময় নেই, এখন কেবল রুদ্ধশ্বাস
ভীষণ তাড়িত বেগ, আশাভঙ্গে অত্যন্ত করুণ
বিপর্যস্ত দিনলিপি, প্রেম স্বপ্ন সুস্থ মানসতা
সজ্জিত শবের মতো যেন শুয়ে আছে আচ্ছাদনে।

একটু অপেক্ষমান সান্নিধ্যের স্বস্তির নিবিড়ে
যদি যেতে পারতাম ! সময়ের স্তূপ থেকে কিছু
হিরকখচিত রত্ন বুকে নিয়ে সাজাতাম ঘর !
অকার পালকগুলি, তোমরা কেন বা বারে-বারে
ফিরে-ফিরে এসে যাচ্ছ, চতুর্দিকে সেখানে কেবল
পরিখা, বৈরীর চোখ ছত্রখান ভগ্ন অস্ত্রগুলি ;
কোথায় খুঁজব ফের যৌবনের চম্পক অঙ্গুলি !

আমার ঈশ্বর ও তুমি : কৃষ্ণ ধর

আমার ঈশ্বর আমি, অন্য কোনো ঈশ্বর মানিনা
না-জীবনে, না-মৃত্যুতে মনে হয় না অস্তিত্বের মূলে
আমি ছাড়া অন্য কোনো খেলোয়াড় কাজ করে গেছে
এতদিন, তোমার বিশ্বাস থাকে ক্ষতি নেই, থাকুক সম্মতি
পৃথিবীতে এবম্বিধ আরও বহু ঈশ্বরের প্রতিমা রয়েছে
আমার ঈশ্বর শুধু এই-আমি, অন্য কোনো ঈশ্বর মানিনা

সেদিন রাস্তার মোড়ে ঈশ্বরের মতো একটি লোক
বহুবার ব্যবহৃত কথা দিয়ে ভয়ানক চমক দেখাল
মনে হয়েছিল যেন তার সেই মুখোসের চিত্রিত আড়ালে
বাস করে কদাকার সূক্ষ্ম শয়তান, বহুরূপী ঈশ্বরের দেখা
পেয়েছি অনেকদিন মানুষের কান্নার সলিলে, আর নয়
ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা, এইবার শেষ কথা বলো।

তুমি আর পালিয়োনা, থেকোনা আড়ালে
পথ দিয়ে যেতে যেতে বহুদিন তোমার উষ্ণীষ
দেখিয়াছি ঝলসিত রৌদ্রের ভিতরে উজ্জ্বলতা
তোমার গভীর চোখ পৃথিবীকে অনন্ত সুন্দর
করে রাখে প্রতিদিন, অনেক অনেক গভীরতা
তাতে দেখি, মনে হয় এতদিন পর দেখিয়াছি
আকাঙ্খিত আমার প্রতিমা, তুমি প্রতিমা আমার।

লোহার দরজা : দুর্গাদাস সরকার

কেউ যদি খুলে দিত বন্ধ এই লোহার দরজা
তাহলে জানাই যেত, আছে আরো কত দেখা বাকী।
বাইরের লোকজন বোঝেনি ত'—জীবনের ফাঁকি
লুকানো কোথায় আছে? আর তুমি নিজেও বল যা'
সহজ কথায়—জানি, অর্থ তার নয় কিন্তু সোজা।
তবু একদিন এসে কী যে দেখে তুমিই একাকী—
অশ্রুমূর্তি, ভিন্ন ফুল, কাগজ-কলম, টুকিটাকি
দিয়ে সাজিয়ে টেবিল—চলে গেছ। আমি শুধু বোঝা

যেন আমার নিজের। দস্তখতে যা কিছু পাঠাই
জানি তাতে শূন্য কতো সমার্থক শব্দের তূণীর!
যেমন নোতুন ঘুড়ি কাটা গেলে পুরনো লাটাই
হাতে থাকে, ঠিক তেমনি ঘুরে ঘুরে জীবনটা স্থির!
লোহার দরজা যদি ভেঙে যায়, দেখা যাবে চোখে
রাজপথে লোকগুলি কেঁদে মরে আমাদেরি শোকে !!

অপেক্ষা : মঞ্জুর দাশগুপ্ত

কার অভাবে করধৃত ফুলমালা বিপন্ন এমন
তুমি কাকে দিতে চাও? রৌদ্রের কী গাঢ় অসম্মতি!
আকাশে মেঘেরা জমে সমুদ্রের ইতস্ততঃ দ্বীপ;
সে কি বলেছিল তবে ভেজাবে না বৃষ্টিতে চরণ?

সমস্ত আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো, গাছের তলায়
তুমি কি ভিজবে স্থির? কি দ্রুত মিলিয়ে তোলো আলো—
নৌকোর লণ্ঠন যেন দূরে গিয়ে আঁধারে হারালো—,
এখনো কি দীর্ঘ চোখে আলো কাঁপবে রাতের ছায়ায়?

কি তীব্র চীৎকারে বাজে অকস্মাৎ স্টিমারের বাঁশি
যাত্রা শুরু—ভালোবাসা কেবিনের ভিতরে শায়িত
সুনিশ্চিত চলে যাবে অন্য কোনো দূরের বন্দরে
ফুলে ওঠে—ফুলে ওঠে সুতরাং তীব্র জলরাশি।

তাহলে কি বৃক্ষমূলে অথবা কি গংগার শরীরে
করধৃত ফুলমালা রেখে যাবে—ফেলে যাবে ধীরে।

নীরবতা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু চরাচর ব্যাপ্ত নীরবতা আর চরাচর
ব্যাপ্ত নীরবতা।

কেন এত অর্থবহ নীরবতা এত অর্থহর
ক্লান্ত নীরবতা।

আমার সকল কথা মুছে যায় আমার সকল
হৃদয়বারতা।

লীন হয়ে যায় ওই শব্দহীনতায় অচঞ্চল
শব্দহীনতায় ম্লান শব্দহীনতায় অবিকল
নিঃশব্দ আমার যত কথা।

প্রিয়তমা : শান্তি লাহিড়ী

খুঁজে খুঁজে পড়ি পুরানো পত্রাবলী,
হাতে হাত নেই, কেউ নেই কাছাকাছি,
যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি
"এখনো বাঁচিয়া আছি।"
নুড়ি কুড়ানোর স্বভাব এখনো মরেনি প্রিয়া
সাগরের বনকাউবীথিকার পারে
এখনো দাঁড়িয়ে ; দূর—
দিয়ে বয়ে যায় সাতটি সমুদ্দুর।

"তুমি ভালো আছ ? আমি ভালো আছি।"
সব ভালো আছে তবু,
মনে হয় যেন কেউ ভালো নেই, কিছু ভালো নেই
ভালো লাগছেনা কিছু,
অর্জনের কষ্টিপাথরে যাচাই না হোক প্রেম,
শূন্যতা দিয়ে বেঁচে থাকবনা, দূরে থাকবনা মরে,
ভালো থাক, ভালো প্রিয়তমা থাক ভালো,

তবু প্রান্তরে এখনো দাঁড়ানো যাবে।

যুগান্তর : নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমরা সবাই আজ ক্রুশবিদ্ধ—এ যুগের গুপ্ত শ্মশানে,
অথচ বিশ্বাসহীন জুডাসের মত পায়ের তলে
ভূমি নেই ; স্বল্প মূল্যে আত্মবিক্রীত
নিরস্ত্র জীবন যুদ্ধে পরাজিত আহত সৈনিক। প্রাণে মনে,
বিনষ্টির অন্ধকার। একটু আকাশ নেই। যেন রসাতলে
আমরা ডুবছি সব। মুক্ত বারাব্বাসেরা স্পর্ধিত
ক্ষমাহীন প্রতিবাদে চারিদিকে তুলেছে ধিক্কার।
কারণ ভালোয় মন্দে জীবনটা তাদের দুভাগে
বিভক্ত ; মুক্তি পেলে গিয়ে তাই জুয়ার আড্ডায়
মাঝখানে বসে অতি সহজেই প্রথাবদ্ধ জীবনের মানে
খুঁজে পায়। আমাদের জন্মাবধি আবদ্ধ দুয়ার।

কী যেন হারিয়ে গেছে—অথচ তা দীপ্ত দায় ভাগে
পাবার কথা যে ছিল ; অন্ততঃ সন্তানে
পুনরুদ্ধারের আশা নির্মূল হয়নি আজো ভেবে
বহুদূর চলে এসে দেখেছি নিজেই নিজ হাতে
আত্মঘাতী অন্ধকারকে নিয়েছি হৃদয়ে ;
সময়ের দুঃস্থ হাত অতঃপর আমাকে কী দেবে ?
পৃথিবী পুরোনো হলে আমরা তবু সন্নিহিত জলে
মুখ দেখে পরিতুষ্ট, মরেছি যে কবে অপঘাতে
সে কথাও ভুলে গেছি। হাত ধুয়ে সযত্নে নির্ভয়ে
নামমাত্র মূল্যে আমরা নিজেকেই শৃঙ্খলিত করেছি অতলে।

ক্রুশবিদ্ধ হতে গিয়ে দেখেছি সে যন্ত্রণা নিঃশেষে
বিশ্বাসবিহীন এক ঘাতকের বেশে
দাঁড়িয়েছে—: আমার চোখের সামনে কী শোকাশ্রুজলে।
অথচ সে আমারই তো ছদ্মবেশ—বিশ্বাসহন্তার,—
ঘাতকের। ষড়যন্ত্রী সভ্যতার স্তূপে
আগুন জ্বালিয়ে দেবো তাও সাধ্য নেই ; চুপে চুপে
পালিয়ে বেড়াই তবু চারিদিকে জঘন্য প্রচার।

পথে নেমে মনে হলো : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে এই মাত্র, আর সারাপথ
আরো অপরূপ শীর্ণ শান্ত পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে,
পথের উপরে আরো স্থিরভাবে শুয়েছে জগৎ
বাস্তব সুস্বপ্ন দেখবে আশ্বাস পেয়েছে।

যেন নিসর্গের কোলে মানুষের ভিটা
শাশ্বত হয়েছে, আর পাশের বাড়িটা
অসংলগ্ন দেখাবে না, পৃথিবীর যেখানে-যে-রোগী
স্থিরভাবে
সময়ের সঙ্গে সহযোগী
প্রকৃতির বিছানায় তিনদিন তিন রাত্রি ঘুমাবে।

যেন জীবনের পাশে ব্যক্তিগত জীবনসাধনা
সঙ্গত হয়েছে আরো, অশ্বত্থ ও মালতীর চারা ;
কারা ছিলো, কে এসেছে, কালকে আসবে কারা-কারা ;
যেন তুমি ছাড়া কেউ এ-কবিতা লিখতে পারতো না।

বিজয়া : মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বিসর্জন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট সিঁদুর শরতে
মণ্ডপে উড়ন্ত কিছু ঘুরঘুরে পোকার মজলিশ
এবং প্রণামরত শরীরেরা ভিতরে ভিতরে খুলে দেয়
দশমীর চন্দ্রোদয়ে ক্ষিপ্ত মহাদেশ
অদূরে গঙ্গায় কিছু কাঠ খড় রক্তশূন্য পার্বতী, গণেশ

সংঘারাম : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নির্মুক্ত সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ নেই বলে, নাকি
অজ্ঞতায় ঝাপসা হয় চোখ !

চাপ চাপ অন্ধকার দু'হাতে সবাই যতো বুকে
চেপে বসে বারবার, নিশ্বাস ফুরায়। মিছে শোক,
পিছল পায়ের মাটি, নিশ্বাসের নেই কোনো ঘাঁটি,
এক কালে ছিল স্থির বিন্দু—স্বতঃ সিদ্ধ জ্যামিতিক ;
আজ নেই, ডুবে গেছে উন্মেষের প্রবল বন্যায় ;
চেতনার সংঘারামে শ্রমণ শ্রমণী ছোটে অমোঘ ইচ্ছায়
বাকি যারা তারা প্রথাসিদ্ধ নাম জপে, এবং অসুখে
ভোগে, ভাবে উৎকণ্ঠার কাল—আপতিক।

মরণের সংস্থা নেই, তাবলে তো মৃত্যু আছে, আছে
মহামারী, অগ্ন্যুৎপাত যুদ্ধ বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি,
যতোই তাবিজ বাঁধো, জলপড়া খাও, রাখো শিয়রের কাছে
ধর্মগ্রন্থ ; উত্তল বিকেল ঠেলে প্রজাপতি হাওয়ার প্রকৃতি
অস্বীকার করো ; তবু স্থিতি নয় ; স্থির লক্ষ্য আজ নেই আর,
পেয়ারার গাছে ফল যদিও ফলেই পেয়ারার।

এবং আণব যুগে পা দিলেও মানবতা স্থির
তুমি খুঁজে পায়নি আজো, পাবে কবে ! ক্লান্ত পৃথিবীর
হয়তো দুর্দিন, তবু আরো নব উন্মেষের কাল,
ভিন্নতর মূল্যবোধে জীবন যদিও নাজেহাল।

জীবনের জয় : শান্তশীল দাশ

জীবনের জয় হবে —আজো শুনি দু'একটি মানুষ
বলে আর প্রত্যয়ের ভিৎ গ'ড়ে দাঁড়িয়ে সরবে
শোনায় সে দীপ্ত বাণী এদিকে ওদিকে চারদিকে —
যেখানে অসংখ্য প্রাণে মৃত্যুর আতঙ্ক অহরহ।

যে-জীবন স্বল্পতম মূল্যে আজ পণ্য হয়ে গেছে,
হিংসা বিদ্বেষের বলি নিত্য হয় লক্ষ লক্ষ প্রাণ ;
হাহাকার দিকে দিকে ; সেখানে সে প্রেতভূমি পরে
জীবনের গান-গাওয়া ! এরা কারা, এরা কি বাতুল !

তবু এই গান কেন আনমনা করে তোলে মন !
অবিচার, অনাচার, অসংখ্য অন্যায়-দিয়ে-ঘেরা
এ-জীবন, আর এই অপমৃত্যু বিকৃত ভীষণ,
এর মাঝে জীবনের স্বপ্ন আনে। সেই স্বপ্ন দেখি

আমিও-যে কী আশ্চর্য ! সে-স্বপ্ন আমার মনে মনে
কখন যে রূপ নেয় ; আমিও যে গড়ি অন্যমনা
সে এক সুন্দর দিন, সে এক সুন্দর রাত, আর
গুণ গুণ গান গাই— সেই গান জীবনের গান।

জীবনের জয় হবে—আমারও যে কণ্ঠে জাগে সুর,
আমিও যে স্বপ্ন দেখি আগামী দিনের কী মধুর !

দিনযাপন : মানস রায়চৌধুরী

ধুলোর উপর দিয়ে দিন চলে যাবে
চলে যাবে মার্চের দুপুর
আমাদের কথা দেওয়া, চেয়ে থাকা মুহূর্তের ডাকঘরে স্মৃতি
ভারাতুর
চিঠিপত্র কোনদিন যথেষ্ট হবেনা।
হবে না তোমার চুলবাঁধা
পৃথিবীর নারকোল, সমুদ্রের ম্যাকারেল জাহাজ, মেলট্রেন
গতি বাধা
অনির্দেশ চলে যাবে, ডুবে যাবে জানি
জানি কি কখন আমাদের
মশারীর মাঝখানে হারিকেন নিভে যাবে জ্যোৎস্না লেগে,
সহসা ছাদের
মাঝামাঝি গল্পগাছা, কথাকওয়া, অতি-সঙ্গোপন
সঙ্গোপন পূর্ণতার চাঁদ
নিয়ে যাবে সেই সব খেলা, বাঁশি শৈশবের কৈশোরের যথার্থ
আহ্লাদ।

যথেষ্ট আহ্লাদ নেই, তবু দিন যাবে
দিন যাবে আঁচলে তোমার
লৌকিক চোখের জল, চাবি, ফর্দ, বাজারের গার্হস্থ্যের ভার
হবে নাকি লঘু কোনদিন ?
কোনদিন বিনম্র কৌতুকে
হাঁড়ি কুড়ি, রন্ধনব্যঞ্জনভরা ভাঁড়ারের অন্ধকারে ঢুকে
একটি দেশলাই জ্বেলে তুমি কি পারোনা
পারোনা আমূল অধিকারে
চিহ্নহীনতায় মুছে ফিরে যেতে বহুপ্রসারিত সেই বকুলতলার
শিশিরে আপ্লুত ছিন্ন করতলে, উষার সুদূরে
সুদূরে অর্গলহীন দীপ্ত চলে যেতে
দিন চলে যাবে ধুলো, জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে নিষ্প্রদীপ শূন্য
ধানক্ষেতে।

স্বপ্নের ভিতর সুনীল বসু

যুদ্ধের ভিতরে কবে পেয়ে গেছি আশ্চর্য তোমাকে
এখনও মনে পড়ছে কথাগুলি হাসি ভাঙা চুম্বনের মিহি শব্দে
অথচ অলীক প্রেম কিছুই রাখে না চিহ্ন অশ্রুচিহ্ন ছাড়া
মুখে মুখ ঘসা স্মৃতি ছাড়া, রক্তের কার্ণিশে স্তনের
আলাপ ছাড়া
রক্তে মুহুর্মুহু তীব্র ভালোবাসা বিস্ফোরণ অগ্নিকাণ্ড ছাড়া

চতুর্দিকে কামানের প্রচণ্ড গম্ভীর শব্দ, মৃত্যুর মিছিল
সদ্য প্রসূতির শিশু ফেলে যাওয়া, নগরীর অট্টালিকা
শূন্য করে যাওয়া
জননীর স্তন মুখে জাতকের মৃত্যু, স্নায়ুতে সাড় নেই,
ধোঁয়া ও কুয়াশা
তবু তারই মধ্যে স্বপ্ন, চলমান ধাতব শকটে অন্ধকারে ফুটেছিল
গ্রীষ্ম প্রধান এদেশে, যুদ্ধের ভীষণ দিনে ছিন্ন মানুষের মিছিল

কোকিলের ডাক শুনে বুঝতে পারলুম বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
কমলালেবু জলের মত সস্তা অন্যদিকে মৃত্যু, বারুদের কটু গন্ধ
বিধ্বস্ত মাটির বুকে ক্লান্ত পদশব্দ ভাগ্য শুধু পাশা খেলে
অথচ শীতের মধ্যে তোমার উত্তপ্ত প্রেমে আগুন পোহানো।

ট্রেন : পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রকৃত মরার আগে মৃত্যু আজ প্রতি ঘরে ঘরে
ঘুমে কিংবা জাগরণে, দিনে কিংবা গভীর রাত্রিতে
সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়ে, অতর্কিতে অথবা জানিয়ে
যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে স্বদেশে বিদেশে
পাতা ঝরিবার কোনো প্রয়োজন নাই
প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই
প্রস্তুত হবার কোনো প্রয়োজন নাই
যে কোনো মুহূর্তে দ্বিধাহীন
যে কোনো মুহূর্তে শব্দহীন
ধুলোয় লুটোতে পারে স্কন্ধহীন কবন্ধ আমার।

হায়! আমি সময়ের হাতে যেন খেলিবার বল
দুদণ্ড দাঁড়াতে চাই স্থির হয়ে প্রান্তরের বুকে
দু'দণ্ড দাঁড়িয়েছিল পিতামহগণ
দু'দণ্ড দাঁড়িয়েছিল পিতামহিগণ
নিয়তির পায়ে পায়ে কখনো শূন্যেতে আর্তনাদ—
কখনো মাটির বুকে মুখ থুবড়ে রক্তাক্ত চীৎকার
এরকম অসহায় ছিল কি সে পিতামহ
তোমার আমার!

পাতা ঝরিবার বেলা বিরামবিহীন অন্ধকারে······
ট্রেন যায় শব্দহীন। স্টেশনের কিনারে কিনারে
অপেক্ষিত আমাদের শব
এর পরে মরুভূমি ·····যাদুমন্ত্রে আমরা নীরব।
লাইনগুলি সত্রাসে উধাও
ডালপালা পাতা উড়ে যায়
অনন্ত ঘুমের দেশে ট্রেন ধায়
ট্রেন চলে যায়······

পার্কের দুপুর : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পার্কে একা ঘাস চিবোয় হারানো দুপুরে
কোন ঘোড়া—জল কোনখানে নেই
দুস্তত চোখের সেই হাতছানি ছাড়া—
সমস্ত শরীরে আছে যৌবনের সব উপশিরা,
তোমারই আকাশ বলো, সূর্যবৃত্ত, তোমারই গাছের
পাতার ভঙ্গিমা ; তুমি আমি মিলে এমন নির্জনে
পারি না কিছুই করতে, মাঝখানে সুসভ্য দেয়াল
কলেজের, ছায়া পড়ছে ; ব্যর্থতার ভ্রমর কাজল
কান ঘেঁষে চলে গেল, কেন অতিরিক্ত কিছু নেই—
আর্কিমিডিসের জল অপরিমিতির গাঢ়তায়
অপ্রয়োজনের মধ্যে হেলাফেলা, প্রেম কিংবা প্রেমিক শরীর
ফুরিয়ে যাওয়ার আগে—আকাশের দূরাগত ঐ হংসমালা
আজ বৃষ্টি হবে ; ঘাস, ঘোড়ারা সতেজ,
তোমার ভেতরে ফুটছে আগুনের কোনো তপ্তধারা
জানাবে আমাকে?

কলসীতে ফিরে : শিশির কুমার দাশ

বহুদিন পরে আজ : মনে নাই কতদিন হল
আবার এসেছি ফিরে সেই ভাঙা পুলটির পাশে
ধানের সবুজ ঢেউএ কৈশোরের পরিচিত হাওয়া
মনে হয় ব্যথা পায় হেঁটে গেলে ঘাসে ।

মনে হয় পরিচিত যে সারস ছবিটির মত
নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা যাকে জানিতাম আমি
সে আজ এখানে নাই, বেঁচে আছে তারই ত' সন্ততি
ওর চোখে মিশে আছে অতি পুরাতন সেই চাওয়া ।

এই আলো, এই সন্ধ্যা, বিষণ্ণতা, অশ্রান্ত ঝিল্লীর
এত ডাক—এ সবের সঙ্গে শুধু মিশে আছে সেই
আমার অসংখ্য সুখ, সুখের উত্তাপ, গোধূলির
মতন নির্জন দুঃখ, অন্ধকার ছড়ানো বিষাদ—

সে সবের মাঝখানে আমি আজ দাঁড়ায়ে অস্থির
আমার দুধারে খেলে এত ঢেউ, আমার শরীরে
নীরবে আঘাত করে, চারিদিকে শব্দময়ী আমার প্রাচীন
ইচ্ছা করে নিয়ে যাই এত জল কলসীতে ভরে ।

নিরুত্তাপ : অরবিন্দ গুহ

বতাসে হাজার ঢেউ তুলোছলে, কেন তুলেছিলে ।
আরেকবার বিবেচনা ক'রে দেখো, হাজার-হাজার
ঢেউ কেন, অসম্ভব সুখ, কেন তিলে-তিলে
যাবতীয় মেঘমালা ছিঁড়ে দিলে, কেন অন্ধকার ।

আমার প্রার্থনা মনে-মনে রাখা ভালো । শুদ্ধ জল
যেমন সশব্দে যায় তেমনি চ'লে যাক । প্রার্থনা যে
ব্যর্থ হয়ে গেল না সমূলে, তা কি কম ? কোলাহল,
কোলাহল পড়ে গেল শরীরের রক্তের সমাজে ।

টবের উন্মাদ ফুলে লাল বারান্দার দিনগুলি
আচ্ছাদিত হয়ে আছে । নতুন ঋতুর শব্দ আসে ।
কিন্তু সব অভ্যর্থনা নিরুত্তাপ, বিস্বাদ, মামুলি—
সব ভাষা মুছে যায় দু-একটি প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসে ।

কী ভাবে কবিতা লিখি : অফুরন্ত মিলে বা অমিলে ?
বাতাসে হাজার ঢেউ তুলেছিলে, কেন তুলেছিলে ।

এই মধ্যবেলা : শোভন সোম

সমস্ত বিশ্বাস কেন টলে উঠলো এই মধ্যবেলা
বড়ো অকস্মাত
চতুর্দিকে বড়ো অন্ধকার
যেন সব একই মুখ, অন্ধকারে চেহারার হেরফের নেই
সমস্ত বিশ্বাস কেন চূর্ণ হলো এই মধ্যবেলা !

বিমুগ্ধ শৈশবে কেউ ফিরে যেতে পারে
ছায়ার মতন স্নিগ্ধ প্রসারিত করতলে বিশ্বাসের কাছে…
স্মৃতির বিবর্ণ ছবি যন্ত্রণার কাঁটা
অপ্রেমের দাহে বুক পোড়ে
সমস্ত বিশ্বাস কেন নিবে গেলো এই মধ্যবেলা !

সতত অস্থির দৃশ্য, কোনো প্রেম প্রতিষ্ঠিত নয়
প্রতিবিম্বে সুখী নই, চতুর্দিকে বিশদ বিষাদ
সমস্ত বিশ্বাস টলে উঠলো যেন বড়ো অকস্মাৎ
কোনখানে স্বপ্ন নেই, পরিব্যাপ্ত রূঢ় বর্তমান
অস্থির দৃশ্যের মধ্যে ডুবে মগ্ন নিরাধার সংসারে প্রবাসী
আমাকে ঝরিয়ে দিয়ে পাপড়ির মতন যায় দিন যায় দিন…

পালিত ময়ূরের সঙ্গে কথোপকথন

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তাহ'লে কি ঘর ছেড়ে দেবো,
পালিত ময়ূর, তুমি বলো।
ঐ শিরোতাজ, ঐ রোদসী চাঁপার নিচে
তোমার পেখম—সব ছেড়ে চলে যাবো।
এখনও তো সব চোখে ভাসে—
রুপোর কাঁটার মতো আমার উঠোন,
বাড়ির ছাতের কাছে পাড়ার আকাশ,
মেঘ আসে যায়, তুমি
ঘুমের পালকগুলি একটি তোড়ার মধ্যে
বাদরে জাগাও।
যব পেকে ওঠে কোন্ রঙিন বিকেলে······
কালো পাথরের মতো নিটোল মেয়েরা
শোভন অন্নের কাছে ভাগ নিতে যায়,
আমিও কোথাও
কাছের উঠোন থেকে
দেখি, দূর কর্ণিকাগারের
ঝোপের আড়ালে এক নওল কিশোর
মহিষ তাড়াতে গিয়ে চপল্ ট্রেণের দিকে
চোখ মেলে থাকে।
তাহ'লে কি ছেড়ে যেতে হবে, পালিত ময়ূর,
এই তৃণমূল, এই নবীন শ্যামলী,
তোমার কেকার ডাকে জেগে-ওঠা বাহির ভিতর
সব ছেড়ে যেতে হবে!

স্বপ্নসংস্কার : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চোখ থেকে সরে গেছে নিদ্রার সান্ত্বনা।
এখন ঘুমের মধ্যে সদা-আধোজাগরিত ক্লেশ
আধোজাগরিত অন্ধকার নক্ষত্রের ব্রতে আলোকে
টুকরো করে আকাশ ভাঙেনা।
বয়সের মধ্যে যত স্বপ্ন ছিল তারা কি এখন
বনের সবুজে শুধু ব্যাধের নিরংশা ফিরে পেল?
আমি অনেক বসন্তে বৈধ ওই বৃক্ষদের শিরায় শিরায়
ফুটে ওঠা ফুলের সংস্কারগুলি, প্রেম থেকে দূরে
নিয়ে যেতে যেতে দেখি মন্দিরের আগে
সব পাপড়ি ঝরে গেছে : হাতে শুধু মনোনীত
ব্যক্তিবিশেষের গ্লানি, যার শেষ বিস্ফোরণ
স্বৈরিণীর কণ্ঠে পড়ে ব্যর্থ মাল্যে বিবাহের ভুল।

চোখ থেকে সরে গেছে নিদ্রার সান্ত্বনা;
মানুষের চোখে আজ স্বপ্ন নেই, স্বপ্নের ভিতর কোনো
এক-ঘুম সকাল নেই,
তাই অন্ধকার আজকাল রমণীর সঙ্গ বিনা আর জাগতে
পারেনা।
মাটিতে এখন সূর্য থেকে মৃত্যুর দূরত্ব বেশী নয় ব'লে
কবির যৌবন শুধু ভেঙে যায় নিঃসঙ্গ পয়ারে।
তবু প্রেম শব্দ নয়, দুঃখের দূরত্বে গড়া নবসংগঠন নয়

চিন্তার সাম্রাজ্য ভেঙে যেখানে নিয়তি পারে চিনে
নিতে ঘুম।

এক বোবা হরিণী ও দুটি মুখর অতিথি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

স্বরবিদ্ধ নিতান্ত হরিণী
বুক তার শিলালিপি
নির্দয় শানিত ছুরি বোবা কথা
সেখানে ক্ষোদিত।
আক্রান্ত রাত্রির মধ্যে অসহায়া
নরম পালক যেন শুশ্রূষার হাত খুঁজে ফেরে।
নিবিড় কথার ঢেউ অন্ধকারে ভাঙে চারিধারে
রাতের স্তব্ধতা ঘেরে কুয়াশার মতো কণ্ঠমূলে।
সৌন্দর্য—বুকের মধ্যে পাহাড়ের নিচে নত—
অনারব্ধ অস্ফুট অবোধ
ব্যথার পাষাণে পিষ্ট
বড়ো হতে চায়।
দুগ্ধ ফেননিভ সদ্য গোবৎসের মতো নাবালিকা
কথার সংসারে. কোণে. কাঙাল সে, নিতান্ত হরিণী
স্বপ্ন ছাখে—
যেন সে মুখরা,
শব্দের খইয়ের মধ্যে কাঁপে ঠোঁট
কথার দংশনে সুখী!
বেতার তরঙ্গে যেন সুরের ফেনার মধ্যে নবজাতা
দেবী সে, ভীনাস কিংবা জলপরী।
এই সব অসহ স্বপ্নের কাছে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে
অসম্ভব মুখগুলি ব্যাকুল দৃষ্টির মধ্যে গেঁথে নিতে নিতে
বজবজে গঙ্গার স্নিগ্ধ সব ঢেউ যখন নিদ্রিত
জানালার ফ্রেমের মধ্যে অপলক
অনারব্ধ জন্ম এক—
হঠাৎ চীৎকার হয়ে ডাকে ডাকে ডাকে
'সরব বন্ধুরা যেন
সরব বন্ধুরা যেন
সরব বন্ধুরা যেন ফিরে আসে দ্বিতীয় বৈশাখে'

সীতাহরণ পালা: ১৩৭১ সুনন্দা দাশগুপ্ত

অতীতের কোন পারে
উদিত হলেন প্রভাতসূর্য রক্তিম মহিমায়।
অমেয়শক্তি বিহঙ্গমের উত্তাল দুই পক্ষের বিধুনন
অন্তরীক্ষ শিহরিত হল মুক্তির এষণায়।

সহসা স্তব্ধ বীর জটায়ুর সূর্য পরিক্রমা,
গতির আবেগে অসহ ছন্দপাত।
লালসামত্ত রক্ষ রাবণ
উত্তাল সেই বিশাল ডানায় করেছে অস্ত্রাঘাত।
দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত ধরার কন্যা জানকীর ক্রন্দন।
কোন শুভক্ষণে হলকর্ষণে জন্ম হয়েছে যার,
পদ্মরেণুর মতন ধূলায় আকীর্ণ যার তনুর শুভ্র দ্যুতি—
লুণ্ঠিত হল সরমকুণ্ঠা তার।
আদিত্যদেব মুখ লুকালেন ঘন কালিমার কলঙ্ক আবরণে।

শতাব্দীপারে আবার সূর্যোদয়
তমিস্রাজাল বিদীর্ণ করে এক অনন্তযানে
হাজারকণ্ঠে মুখরিত হল সঙ্কল্পের বাণী
লালকেল্লার উন্নত চূড়া শোভমান আজ ত্রিবর্ণ পতাকায়।

তবু মহাকাল রচনা করেন হতাশামসিন কলঙ্ক লেখনীতে
পুরোনোকালের সেই চেনা ইতিহাস—
এখনো কাঁদিছে ধরিত্রীসুতা জনমদুখিনী সীতা।
এখনো চলেছে আঁধারচারীর ক্লেদাক্ত উল্লাস।
সোনালীফসলে শরতের ক্ষেত আলোকের হাসি হাসে
তারই মাঝখানে মৃত্যুযজ্ঞে বীভৎস সমারোহ।

কুহকমন্ত্রে বিষজর্জর সোনার বাংলা দেশ।
স্তব্ধ জটায়ু। রাঘবেন্দ্রের দুচোখে মৃত্যুমোহ।

চৈত্রের উৎসব মোহিত চট্টোপাধ্যায়

এই তিক্ত মাঠে নয়, দ্যাখো ঐ দূরে
খুলে গেছে সম্রাটের হেম বাতায়ন।
ঐখানে খেলা কর, ওখানে ময়ূর
ভবন দুয়ারে নাচে। ততোধিক সুখে
আমরা অধীর নৃত্যে খেলা করে যাব।

নূপুর এনেছ সাথে ? না হলেও কোন
ক্ষতি নেই, চল ঐ সাগরের কাছে
জলের তরঙ্গ কিছু দুখানি চরণে
বেঁধে নেবে। দেহ অতিশয় নগ্ন রেখ,
বসনে অসীম ভক্তি যদি ভাবো, গাঢ়
চন্দ্রের নিভৃত জ্যোৎস্না মুক্ত অবয়বে
শিথিল জড়ায়ে নেবে। অন্ধকার যেই
প্রবল ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়
নৃত্য শুরু হবে ঐ সম্রাটের হেম
বাতায়ন পার্শ্বে, গাঢ় চৈত্রের উৎসবে।

প্রেম রহস্য : শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

ভাল যদি বাসো মন নীরবে থেকো,
প্রণয় মধুর অতি গোপনে রেখো।
প্রেমের আনন খানি,
চাও সদা তুমি জানি,
"দূর হতে দূরে" তা'রে দেখিতে শেখো,
"না পেয়ে পাওয়া" নিয়ে রচনা লেখো।

মায়ার উজান বহে—প্রেম প্লাবনে,
মোহের বিজলী ছটা চমকে মনে :
এ'রাবে জীবনে এসে,
ব্যথা হানে ভালবেসে :
মরীচিকা চোরা বালি চাহিয়া দেখো,
অতলে হারায়ে গেলে কে দেবে ঠেকো।

তুমি কি আমার-ও চেয়ে বড়ো ?'
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভোররাতে বেজেছে সানাই
শূন্যঘর—অপস্রিয়মান
আঁধারে চাঁদের স্পর্শ পাই—
এলে কি অঘ্রাণ ?

সারাদিন নিরন্তর হাসি
স্বপ্নে – জাগরণে :
আমায় বলেছে 'ভালোবাসি'
ব্যর্থ, মনে-মনে।

জন্মদিনে নিমন্ত্রণ পাই
যেন উপচার করি জড়ো
ভোররাতে বেজেছে সানাই :
'তুমি কি আমার-ও চেয়ে বড়ো ?'

কুয়োতলায় : অনিরুদ্ধ কর

নির্মম নির্মম মেঘ উড়ে যায় নিশ্চিন্ত আলোয়,

কুয়ার ভিতরে ছবি ভিজে ওঠে বিষণ্ণ আঁধারে ;
যে এখন ছায়া ফেলে জল নিল তার ছবিখানি
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরল ঊর্ধ্বগামী জলপাত্র থেকে—
এই সব ছবি রোজ জলে ডুবে আত্মহত্যা করে,

জলের ভিতরে এইসব কষ্টকর মৃত্যুদৃশ্য
ঘিরে রাখে কুয়ার দেয়াল, কেননা পাখির মত
এইসব নির্মমতা পরীর মতন উড়বে মেঘ
ও নিশ্চিন্ত আলো বাতাসের ঢেউয়ের চূড়ায় ভেসে,

তুমি যে গর্বের জন্য চোখের অজস্র দৃষ্টি নষ্ট
করেছিলে—কুয়ার দেয়াল ছাড়া—সে-কথা এখন
পৃথিবীতে অন্য কোন মানুষ জানবে না !

রূপচর্চায়

কে,হোড়ের প্রসাধনী

কে, হোড় এণ্ড কোং
কলিকাতা-১৪

কনক সেণ্ট

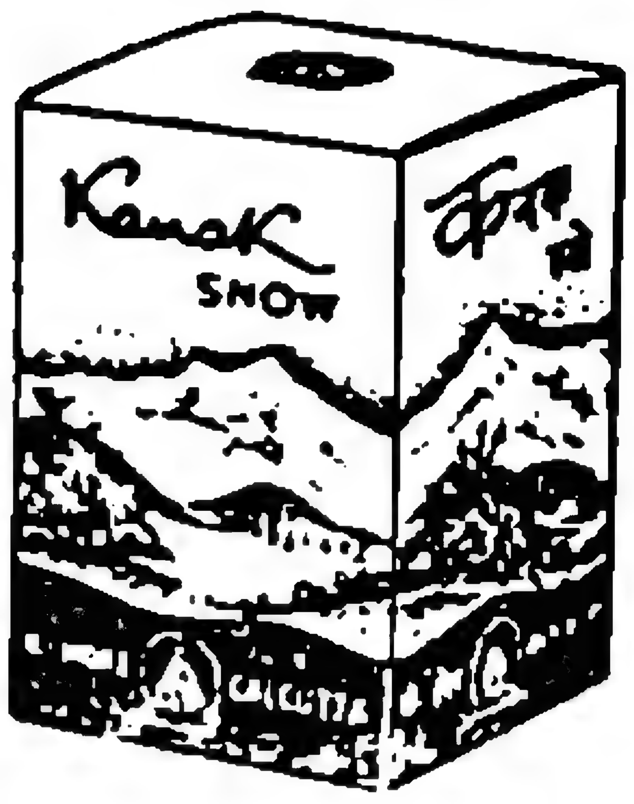

কনক স্নো

কনক টয়লেট পাউডার

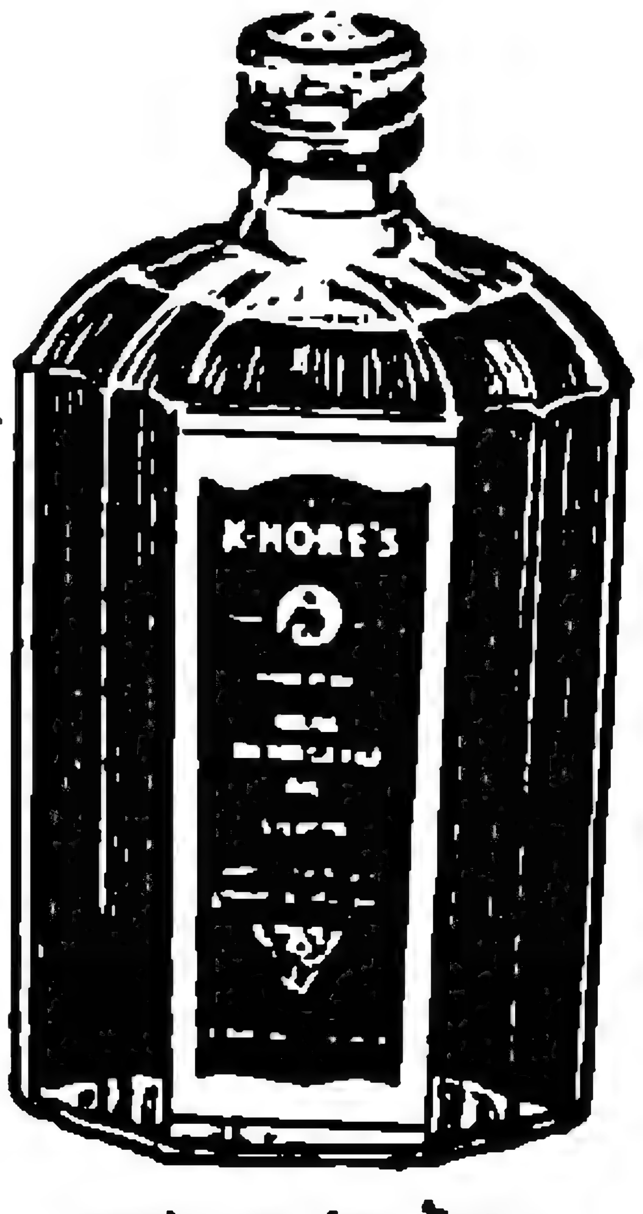

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

আশাপূর্ণা দেবী

না, ম্যানসন নয়।

মাঝারি মাপের একটা দোতলা ছিল, কিছুদিন হলো বাড়ীর মালিক দুইয়ের উপর আর দুটো তলা তুলে বাড়ীটাকে দিব্যি ফ্ল্যাটবাড়ী-বানিয়ে ফেলেছে। মাতা কন্যা জায়া কারো একটা নামে নাম রেখেছে "মায়া ভবন

বাড়ীটা যখন তৈরী হয়েছিল তখন চারতলার কোনো পরিকল্পনা ছিলনা। কাজেই চারতলার ভিতও ছিলনা। কিন্তু বাড়ীর নীচেয় গাঁথা ভিত নতুন করে মজবুৎ হলো কি করে, সে প্রশ্ন করবার লোক কোথাও নেই। কাজেই প্রশ্নও নেই। চার দুগুণে আটটা ফ্লাট থেকে যে বত্রিশ শো টাকা ভাড়া উঠছে সেটাই আসল।

কিন্তু ওটা এ গল্পের আসল নয়। আসল হচ্ছে সিঁড়ি। ফ্ল্যাট বাড়ীর সিঁড়ি একটাই। কাজেই চারতলা থেকে একতলা অবধি যে, গতিবিধির একটা ইতিহাস আছে, তার মধ্যে চোখেচোখির ইতিহাসও থাকবেই। থাকতে বাধ্য।

অবিশ্যি সিঁড়িটাকে যদি 'পথ' ভাবা যেত, বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু এ সব সিঁড়ি পথ মাত্র হলেও ঠিক পথ ভাবা হয় না। চারটে দেয়ালের ঘেরের মধ্যে আর কংক্রীটের ছাতের নীচেয় দাঁড়িয়ে 'এটা পথ' এমন দার্শনিক চিন্তা ঠিক দানা বাঁধে না। কাজেই সিঁড়িতে কিছু কর্তব্য থেকে যায়।

মুখচেনা ব্যক্তিদের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে, 'এই যে ভাল তো' ? —ভঙ্গী করতেই হয়। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি দেখলে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেও হয়।···

তবে সবাই কি করে ?

তা করেনা।

যেমন চারতলার পশ্চিম ধারের ফ্ল্যাটের প্রবীর।···তার ভাব ভঙ্গীতে ধরবার উপায় নেই সিঁড়িটা রাস্তা ছাড়া আর কিছু !·· স্রেফ পাবলিক রাস্তা !

বৃদ্ধ কি মহিলা, শিশু কি তরুণী, সুন্দরী কি অসুন্দরী, এসব দিকে তাকিয়েও দেখেনা প্রবীর। টকাটক্ করে চারতলা থেকে নীচে নামে। সাধারণতঃ গাড়ীর চাবিটা হাতে থাকে, সেটা লুফতে লুফতে যায়।···নীচে নেমে চলে যায়, পাশের গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে—ছোট্ট গাড়ী ; বোঁ করে বেরিয়ে যায়।

ফিরতি মুখে উল্টোপিঠ।

দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটটা একটা মানুষ কেন নিয়ে রেখেছে, সেটা কল্পনার বিষয়। কারণ এতটা লাক্সারি এযুগে বিস্ময়কর। যারা ভাগ্যবান, নিজেদের প্রাসাদ অট্টালিকা আছে, তারা ও তো সব ঘর বিকিয়ে দিয়ে নিজেরা দালানে পার্টিশান দিয়ে ঘর বানিয়ে বাস করে।

কাজেই 'চারতলার এধারের ফ্ল্যাটে মোটে একজন !'—

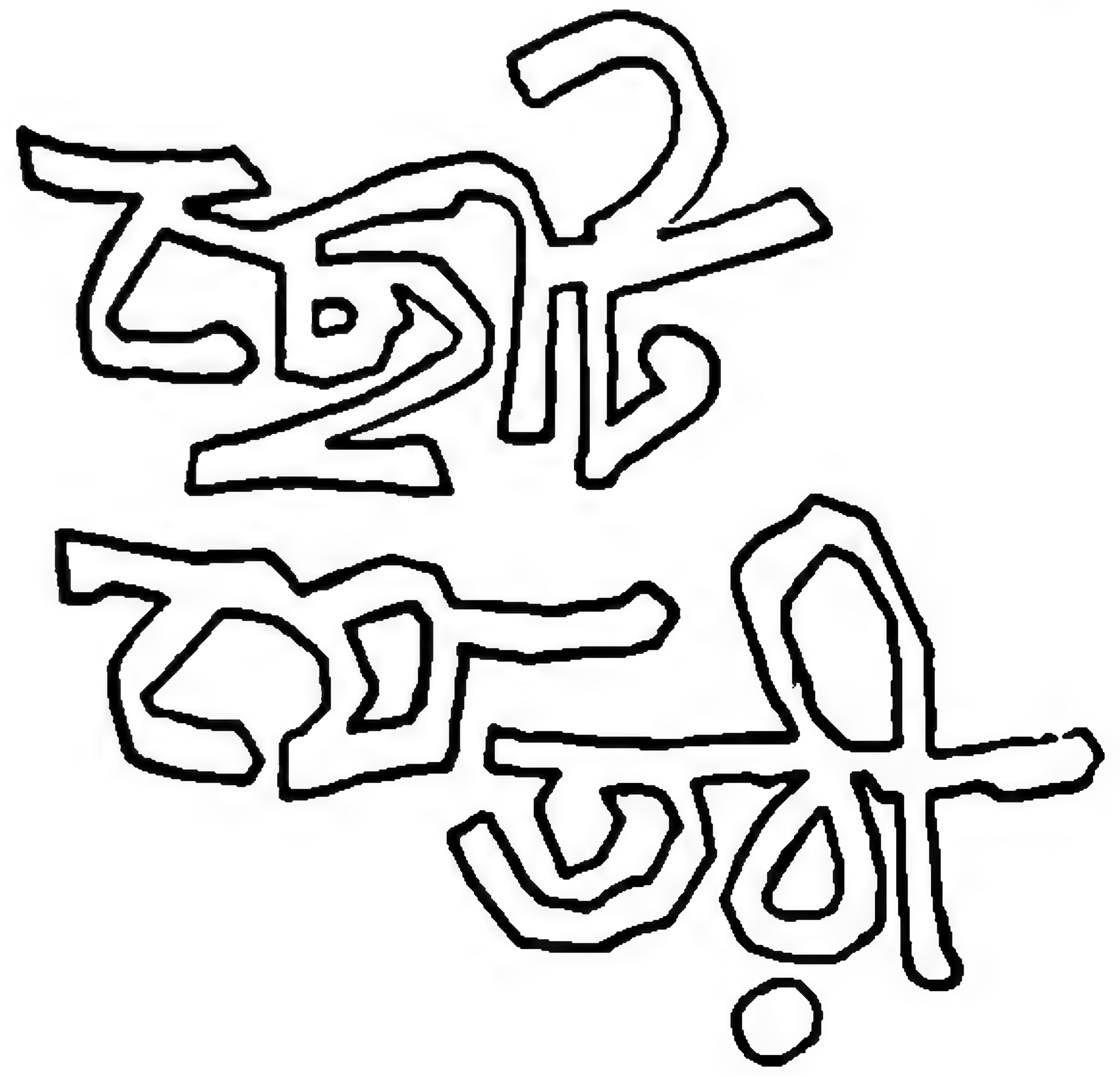

এ বিষয় প্রকাশ করে সকলেই, আপন আপন ঘরেই করে। কারণ কোনো ফ্ল্যাটের সঙ্গে কোনো ফ্ল্যাটের আসা যাওয়া নেই।

কেন নেই সেটাই আশ্চর্য্য !

পাড়ার লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা, এতো ছিল। চিরকালই ছিল। এরাও সেই পাড়ার লোকই তো ?

ভাবলে তাই। তবু কেউ কাউকে পড়শী ভাবেনা। অথচ এই সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের অনেকেরই পুরনো পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে এমন ভাব ভালবাসা আছে যে, এখনো তারা এখান পর্যন্ত ছুটে ছুটে আসে। আড্ডা দেয়, চা খায়, ভাত, পৈতে, বিয়েতে নেমন্তন্ন করে।

অথচ এখানে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু এ ফ্ল্যাটের এরা শুধু নিজেদের জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে বর দেখছে, তত্ত্ব আসা দেখছে, শাঁখ উলুর শব্দ ধরে ধরে অনুমান করে নিচ্ছে কখন দধিমঙ্গল হচ্ছে। কখন কলাতলায় নাওয়া কখন বা জলসওয়া, কখন গায়ে হলুদ।

অবশ্য যাদের কৌতূহল আছে।

যাদের তা নেই তারা তাকিয়েও দেখে না।

শুধু তাদের ছেলেপুলেরা ভোজ রান্নার গন্ধে একটু উদাস উদাস হয়ে যায়, খেতে বসে বলে 'রুটি শক্ত, তরকারি ঝাল।'

চারশোটাকা বাড়ী ভাড়া দেয় বলেই যে খুব একটা বড়লোক সবাই, তা নয়। দিতে বাধ্য হয়, তাই দেয়।

তা' ওই বাড়ীওলার কাছেই—যা আদানে না হোক্ প্রদানে বাধ্যতা।

পড়শীর সঙ্গে আদান প্রদানে কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। যার গাড়ী আছে সে যে বৃষ্টির দিনে, বা বাস ট্রামের ধর্মঘটের দিনে, পড়শীকে গাড়ী অফার করবে, এ সৌজন্য স্বপ্নেও ভাববার হেতু নেই !

কিন্তু তিনতলার পূর্বধারের ফ্ল্যাটের বন্দনা হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত কথা বলে বসলো।

অফিসের বেলায়—

বৃষ্টি পড়ছিল জোর এবং রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে ছিল প্রচুর।

একই সময় দু'জনে নীচে নামলো। প্রবীর আর বন্দনা। আর শাড়ী বাঁচিয়ে পথে নামা সম্ভব কিনা পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে বন্দনা সশব্দ স্বাগতোক্তি করে, 'এমন অসভ্য পাড়ায় বাস, এই রকম অসুবিধের দিনেও গাড়ীবানেরা গাড়ীহীনেদের একবার গাড়ী অফার করেনা !'

প্রবীরের কান ঘেঁসেই এই স্বগতোক্তি।

কিন্তু-প্রবীরের কাণে যে ঢুকেছে কথাটা-তা মনে হয়না। যথারীতি চাবি নাচাতে নাচাতে গ্যারেজে চলে যায় সে।'

তীব্র রোষে একবার তার এই স্বচ্ছন্দ গতিবিধির দিকে তাকিয়ে বলে 'অভদ্র !' তারপর হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকে সেই লবণ সমুদ্রের দিকে। এর ওপর দিয়ে কি কোনো ট্যাক্সী হঠাৎ দেবদূতের মত এসে দাঁড়াবে ?

না, ট্যাক্সী এলনা।

দেবদূতের মত এসে দাঁড়ালো আগের সেই—'অভদ্র' লোকটা তার ছোট্ট গাড়ীটি নিয়ে। গাড়ীর দরজা খুলে ধরে বললো, 'উঠুন !'

উঠুন !

যেন ওঠবারই কথা ছিল।

যেন ওর জন্তেই গাড়ী বার করতে গিয়েছিল প্রবীর।

বন্দনা ভুরু তুলে বললো, 'উঠবো মানে ?

'উঠবেন মানে ?'

প্রবীর বললো, 'কথাটার মধ্যে মানে বোঝাবার কিছু আছে না কি ?'

'নিশ্চয়! সহসা আমি কেন আপনার গাড়ী চড়তে যাবো!'

বন্দনা যদিও পাড়ার লোকের অভদ্রতার সমালোচনা করছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল অভদ্রতা করলো সে নিজেই।

প্রবীর কিন্তু রাগ করে কটু উত্তর দিলনা। হেসে বললো, 'দুটো কারণে চড়তে যাবেন। প্রথম আজ বৃষ্টি বলে, দ্বিতীয় আপনি আমার প্রতিবেশিনী বলে!'

এ এমন একটা বয়েস, যে বাকযুদ্ধটাই আকর্ষনীয়। তাই বন্দনা আবার কথা বাড়ায়।

'ও: প্রতিবেশিনী বলে! তা নিজে থেকে এ চেতনা এসেছিল তাতো মনে হয় না। প্রতিবেশীনীর মন্তব্য কানে যেতেই—'

'ধরুন তাই। কিন্তু নির্বোধদের তো অপরেই চেতনা করিয়ে দেয়। উঠুন, অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে!'

মন জিনিসটা এমনই দুর্বোধ্য।

যে বন্দনা এই অগাধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, একটা ঠ্যালাগাড়ীও তুলে নিয়ে ঠেলে ঠেলে যেত তো বাঁচতাম বাবা! এবং এই লোকটারই অভদ্রতার প্রতি জলন্ত কটাক্ষপাত করছিল, সে এখন এই সসম্ভ্রম আবেদনে কর্ণপাত করতে চায় না।

অফিসের বেলার উল্লেখে তীব্র স্বরে বলে ওঠে 'আপনাকে' নিশ্চয়ই আমি ধরে রাখিনি? বেলা হয়ে গেছে চলে যান।

'উঁহু, আপনাকে নিয়েই যাব।'

'না।'

'না! স্রেফ সোজা না বলে দিলেন? আপনি দেখছি ঠিকই বলেছেন। এ পাড়ার বাসিন্দারা ভদ্রতার ধার একটু কম ধারে।'

'বেশ আমি অভদ্র। হলো তো?'

প্রবীর হেসে উঠে বলে, 'হলো মানে কি? আমি যা ধরি তা ছাড়ি না বুঝলেন। না উঠলে হয় তো—'

'হয় তো কি?'

'না থাক। রেগে যাবেন। মানে বলছিলাম ব্যাপারটা একটি নারী হরণের মত দেখতে হয়, এই কি চান আপনি?'

'আ:! আপনি যে দেখছি যা মুখে আসছে তাই বলছেন?'

'আপনি বলাচ্ছেন। চলুন, রাস্তার লোক এই বাক্‌যুদ্ধ তাকিয়ে দেখতো, যদি আজ তেমন লোক থাকতো। উঠে পড়ে ঝগড়া করুন যত পারেন। এখান থেকে রাইটার্স বিল্ডিং অনেকখানি রাস্তা!'

বন্দনা চমকে বলে, 'আমি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাবো, একথা আপনাকে কে বললে!'

'রোজ যান দেখতে পাই।'

'কোথা থেকে দেখতে পান শুনি!' অবাক হয়ে বলে বন্দনা।

'সেই মহাতীর্থ থেকেই। কারণ আমারও গন্তব্যস্থল ওইটাই।'

'বা: আমি তো কই—'

'দেখতে পান না, এই তো? সেই জনারণ্যের মধ্যে আমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণী চোখে পড়বে এটাই বা ভাবছেন কেন? কিন্তু না, জীবনে এই প্রথম লেট করাচ্ছেন আপনি আমায়।'

বন্দনা হিংসুটে গলায় বলে, 'হুঁ:। আপনাদের আবার লেট! অফিসার মানুষ!'

'এ খবরটা আবার কে দিল?'

'দিল আমার সাধারণ বুদ্ধি। গাড়ী চড়ে কি আর কেরাণীরা অফিস করতে যায়?'

'আচ্ছা কেরাণী এবং অফিসারের আচরণের পার্থক্য

নিয়ে আলোচনা পরে হবে, দয়া করে উঠে আমায় কৃতার্থ করুন।'

বন্দনা যেন রাগ করেই অতএব ঝপকরে উঠে পড়ে। অবশ্য সেই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যতটা ঝপ্ করে সম্ভব।

এই হল প্রথম দিনের ইতিহাস।

তারপর ইতিহাসের নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হতে থাকে। নতুন অথচ সেই চিরপুরাতন।

ঠিক পরদিনের ঘটনাটা এই। এই প্রথম সিঁড়িতে থমকে দাঁড়ায় প্রবীর। তিনতলার পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাটটার দিকে তাকায়, তারপর স্বভাব বিরুদ্ধ মৃদু গতিতে নামতে থাকে।

একমিনিট পরেই পিছনে অস্ফুট একটা ধ্বনি!

তারপর—'আপনিও এই সময় বেরোন?'

প্রবীর পাশ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু জায়গা ছেড়ে দিয়ে হেসে বলে, 'সরকারি কলে পিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি সকলেরই প্রায় একই।'

দু'জনে নামে।

প্রবীর বলে 'গাড়ীটা এখানে আনবো, না, আপনিই কষ্ট করে গ্যারেজ অবধি যাবেন?'

বন্দনা অবাকভাবে বলে, 'তার মানে?'

'ইস্ আপনার দেখছি সব কিছুর মানে খোঁজাই একটা রোগ! মানে, দয়া করে আমার খেলার গাড়ীটিকে ধন্য করবেন।'

'না না কেন?' বন্দনা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। 'আজ তো বৃষ্টি নেই?'

'নাই বা থাকলো! বাসে ভীড় তো আছে?'

বন্দনা ভুরু তুলে বলে, 'সে তো এ যাবৎকালই ছিল!'

'এ যাবৎকাল বোধবুদ্ধি ছিল না, দৃষ্টিশক্তি ছিলনা, দুঃসাহস ছিলনা—।

'দুঃসাহস!'

'না তো কি! হঠাৎ যদি কোনো দিন বলে বসতাম, শুনুন, আমাদের দু'জনেরই তো গন্তব্যস্থল এক, আসুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। নিশ্চয় পুলিশ ডাকতেন!

'এখন আর সে ভয় নেই?'

'মনে হচ্ছেনা। কিন্তু দোহাই আজও আর লেট করিয়ে দেবেন না।'

অতঃপর কথা বলতে বলতে গ্যারেজের দিকেই।

বাস ট্রামের সেই দুঃসহ নারকীয় ভীড়ের কথা স্মরণ করে; গাড়ীর মধ্যেকার আরামের আসনটা স্বর্গ বলে মনে হয় বন্দনার। আর, স্বর্গ ছেড়ে কে চায় নরকে যেতে?

গাড়ীর সেই স্বর্গীয় সিট থেকে ক্রমশঃই আর এক স্বর্গীয় বস্তুর সন্ধান পায় বন্দনা। এবং প্রবীরও।

ক্রমশঃ প্রবীর জানতে পারে বন্দনার বাবা আছেন, তবে বাইরে কাজ করেন, বন্দনার মাকে এখানে থাকতে হয় ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার জন্যে, কিছুদিন থেকে এক মেয়ের অফিসের জন্যেও।

চার পাচটি ভাইবোন বন্দনার।

অবশ্য সে-ই বড়।

বন্দনা জানতে পারে, প্রবীর ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন, দিদি জামাইবাবুর কাছে মানুষ, এখন বড় হয়েছে বলে আর অবস্থা হয়েছে বলেও, দিদিই বলে কয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'নইলে বৌ এনে রাখবি কোথায়? আমার সংসারে এনে ঢোকালে বৌয়ের মান আর মন কোনোটাই থাকবে না!'

প্রবীর হেসে বলেছে, 'দিদির গাছে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!'

বন্দনার মুখে এসেছিল, 'সুখের তো অবধি নেই, গেজেটেড্ অফিসার, নিজস্ব ফ্ল্যাট, নিজস্ব গাড়ী, কাঁঠাল পাড়তে বিলম্ব কিসের?' বলল না। কথাটা গাঁইয়া হবে মনে হল।..

তা' ক্রমশ: অলিখিত ভাবে স্থিরিকৃত হয়ে গেছে পরবর্তী ঘটনাটা কি ঘটবে…এখন শুধু দু'পক্ষের অভিভাবকের কাছে বলাবলি। পূজোর ছুটিতে বন্দনার বাবা আসবেন. তখনই কথা পাকা হবে।

অর্থাৎ পাকা খবরটা তাঁকে জানানো হবে।

ইতিমধ্যে বন্দনা মাঝে মাঝেই চারতলায় উঠে গিয়ে প্রবীরের ফ্ল্যাটটা দেখে দেখে আসে। কোনখানে কোন কোন ফার্নিচার আবশ্যক তা নিয়ে আলোচনা করে। এবং যাবার সময় মিষ্টি হেসে বলে, 'নেমে যেতে হচ্ছে।'

নেমে যেতে হয়, তবে একটা মজার খেলা আবিষ্কার করেছে ওরা। 'টরে টক্কা'র নিয়মে একটা সাঙ্কেতিক ভাষা ধরে প্রবীর ঘরের মেজেয় নানাবিধ শব্দ করে, বন্দনা ছাতের সেই শব্দের পাঠোদ্ধার করে।

প্রবীর যা বলতে চেয়েছিল, তা কাগজে লিখে রাখে। বন্দনা যা বুঝেছে, কাগজে লেখে। পরদিন গাড়ীতে সেই নিয়ে হাসাহাসি।

বন্দনার ছোটভাই বলে, 'ওপরের লোকটা আজকাল এত শব্দ করে, পড়া হয় না!'

বন্দনা বলে 'যা বলেছিস। মাতাল টাতাল হয়েছে বোধ হয়।'

বন্দনার মা বলেন, 'ফ্ল্যাট বাড়ী। কাউকে তো কিছু বলবার জো নেই। ওপরের ওরা বাঙালী না, অবাঙালী তাও জানি না। বাঙালী হলে বলে দেখা যেত।'

বন্দনা বলে, 'বাঙালী-হলেই বুঝি একেবারে চূড়ান্ত ভদ্র হবে!…দরকার নেই বলে।'

না, এখন কিছু বলার দরকার নেই।

একেবারে পরম আর চরম কথাটাই বলবে। শুধু বাবার ছুটির অপেক্ষা।

এখন শুধু এক সঙ্গে অফিসে যাওয়া! একসঙ্গে অফিস থেকে ফেরা। টিফিনে একত্রে দুজনে কোথাও বসে খাওয়া।…

ম্যানসনের সামনে গাড়ী থেকে নামে ওঠেনা. গ্যারেজের সামনেই সব!

মনে করে ম্যানসনের কেউ দেখতে পায় না। যে রকম হাস্যকর বোকামী নতুন প্রেমে পড়ারা করেই থাকে! তবে যা হয়—ম্যানসনের সবাই জানে, সবাই দেখতে পায়, সবাই 'তিনতলা আর চারতলা' নিয়ে হাসাহাসি করে।

কিন্তু কেউ কারো চৌকাঠ ডিঙোয় না বলে খবরটা পল্লবিত হয় না, প্রকাশিতও হয় না। আর আশ্চর্য্য এই, বন্দনার মার কানে আসে না।

বন্দনার মা শুধু দেখছেন তাঁর মেয়ের আজকাল কাজ বড্ড বেড়েছে, প্রায়ই অফিস থেকে ফিরতে দেরী হচ্ছে।

ট্রাম বাসের জন্য দেরী হচ্ছে এটা বলে না বন্দনা। কি দরকার বাবা! ওসব কথা যত না উত্থাপন করা যায়! মা যখন জানেন না!

প্রবীর বলে, 'তোমার বাবার ছুটি কবে?'

বন্দনা হেসে বলে, 'তর সইছেনা বুঝি? ছুটি হবে মহালয়ার দিন থেকে।'

প্রবীর বলে. 'বিয়েটা এর মধ্যে সেরে ফেলতে পারলে এই ছুটিতে আমরা দুজনে বেড়াতে যেতে পারতাম!'

বন্দনা বলে, 'দূর বেড়ানো! আমি বলে ওই চারতলার ফ্ল্যাটটিকে কাশ্মীর সদৃশ জ্ঞান করে দিন গুনছি কবে ওখানে যাবো!'

'ওটা ছেড়ে তক্ষুণি আবার চলে যেতে ইচ্ছে করবে?'

'বিয়ের বাজারটা তাহলে করে ফেলা হোক?'

বন্দনা বলে. 'না সেটা চোখে লাগবে। মা বলবে কেন কি বৃত্তান্ত।'

'যার কাছ থেকে এখনো লুকিয়ে রেখেছ ?'

'যার প্রকৃতিটাই এমন যে, যার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে হয় না. জগতের সমস্ত রহস্যই তাঁর কাছ থেকে লুকোনো থাকে।'

'বাবা ?'

'বাবা ?' বন্দনা হেসে ওঠে। 'বাবা আবার ঠিক তার উল্টো। বাবার চোখ থেকে জগতের কিছুই এড়ায় না ?'

'বাবা এবারে যেন আর দিন ফুরোচ্ছে না।'

তারপর মহালয়া আসে।

বন্দনা বলে 'কাল বাবা আসবেন।'

প্রবীর বলে' তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব করতে যাবার সময়, ধুতি পাঞ্জাবী পরে যাবো না এই রাজবেশ ?'

'ধুতি পাঞ্জাবী, ধুতি পাঞ্জাবী ! বাবা বলেন কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় পোষাক না পরাটা অসভ্যতা।'

'এটা কি অনুষ্ঠান ?'

'নিশ্চয় ! প্রস্তাবটা অনুষ্ঠান নয় ?'

'ক'টার গাড়ীতে আসছেন ?'

'সকাল আটটা !'

'চলনা-দু'জনেই স্টেশনে যাই—'প্রবীর হেসে বলে, 'তা হলে প্রস্তাবের কাজটা এগিয়ে থাকবে। তোমার বাবার তো বলেছ কোনো কিছুই চোখ এড়ায় না।'

বন্দনা এ প্রস্তাবে উৎসাহ বোধ করে।

বলে 'যাবে ? সত্যি যাবে ?'

'বাধাকি ? কাল তো ছুটি !'

সারারাত বন্দনা মিনিট গোণ। সকাল বেলা বলে' 'মা বাবাকে আনতে যাচ্ছি—'

মা খুসি হয়। বলে 'বেশ যা ! তোরা তো এখন ছেলেই ! এ তো আর আমরা নয়।'

বন্দনা অপেক্ষা করে !

কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করবে বন্দনা ?

আটটা বেজে গেলে ? ট্রেন এসে গেলে ? অস্থির হয়ে চারতলায় ওঠে বন্দনা। আর অবাক হয়ে দেখে প্রবীরের দরজায় তালা। আর তালার গায়ে একটুকরো কাগজ আটকানো।

লেখা কাগজ !

সম্বোধন নেই। শুধু লেখা, মাঝরাত্রে চলে যেতে হচ্ছে. বলে যেতে পারলাম না। এই মাত্র খবর পেলাম জামাইবাবু মারা গেছেন !'

বন্দনা পাথর হয়ে যায় !

তারপর আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে একটা ট্যাক্সী ধরে। একা যাবে বাবাকে আনতে !

তারপর ?

তারপর—তার তিনদিন পর প্রবীর আসে। জীবনে এই প্রথম বন্দনাদের দরজায় কলিংবেল টেপে।

বন্দনাই দরজা খোলে।

কদিন ধরে স্বেচ্ছায় এ কাজটার ভার নিয়েছে বন্দনা। দরজা খুলে দেয়। আস্তে বলে, 'এ দুদিন বোধহয় আসতে পারলে না।'

'না !'

বন্দনা আরো আস্তে বলে, 'এখন তোমার মন খারাপ, এখন থাক। বাবা তো লক্ষ্মীপূজো পর্য্যন্ত আছেন। একটু সুস্থির হয়ে এসো !'.

প্রবীরের হাতে গাড়ীর চাবি ছিল, তবু প্রবীর সেটা লুকচ্ছিল না।

অদ্ভুত শান্ত দেখাচ্ছিল প্রবীরকে।

সেই শান্ত চেহারার প্রবীর বলে, 'তোমার বাবার কাছে কোনো-দিনও আর আসা হবে না, সেই কথাটাই বলতে এলাম বন্দনা। জামাইবাবু রোজগার করতেন প্রচুর, খরচ করতেন অত্যধিক! এখন দেখা যাচ্ছে অনেকখানিটা ঋণ, পাঁচটি নাবালক ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি তিনি। হ্যাঁ অবশ্য—' যেন একটু হাসলো প্রবীর, 'একটি বিধবা স্ত্রীকে তুলে যাচ্ছিলাম। আমার চারতলার ওই দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটটাতেই তাদের এনে তুলতে হবে। সেখানে আর কোথায় তোমার জায়গা হবে বল?'

বন্দনা অদ্ভুত গলায় বলে, 'জায়গা হবে না!'

'কই আর!' প্রবীর তেমনি হাসির মত করে বলে, 'অনুমান তো শুধু ফ্ল্যাটেই হবে না? রাজকীয় ভাবে মানুষ হয়েছে ভাগে ভাগ্নীরা। আমি তো জানি! আমি তো একদা তার ভাগ পেয়েছি!

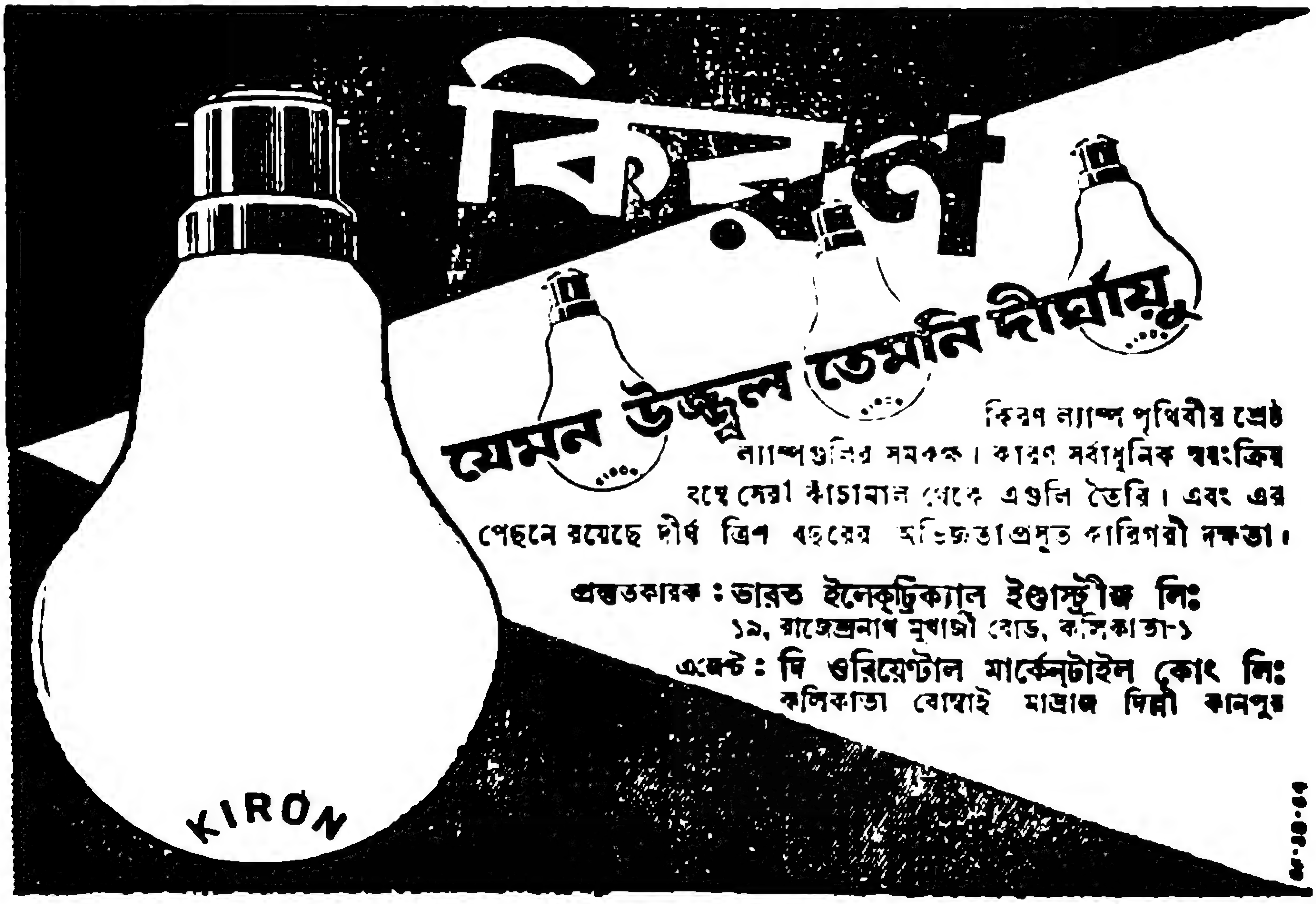

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

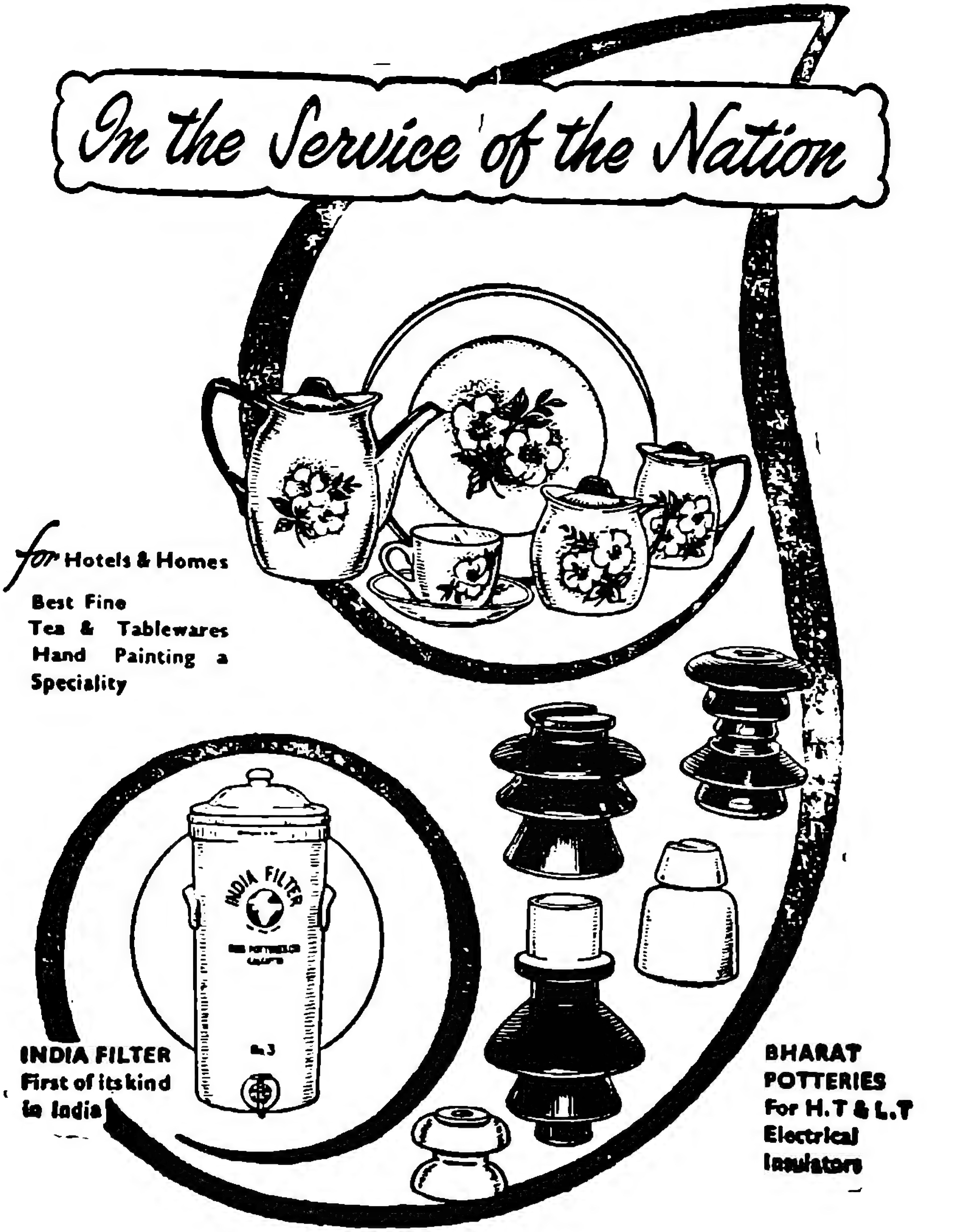

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED

91, DHARAMTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole selling Agents for crockery & Water Filters

M/s Commercial Concern

17, Old China Bazer St, Calcutta

পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে
যারা চরকা কাটে তাঁত বোনে,

আজ পূজার আনন্দ-দিনে
সেই গরীব ভাই-বোনদের হাতের
তৈরী

খাদি

কিনে তাদের মুখেও
হাসি ফুটিয়ে তুলতে
অনুরোধ করি !

●

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সূতিখাদির উপর ৫% এবং রেশম খাদির উপর ২০% রিবেট দেওয়া হইতেছে।

অভয় আশ্রম
বিরাটী, কলিকাতা-৫১

শচীন্দ্রনাথ বসু রচিত

প্রাগিতিহাসের মানুষ

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে প্রথম সার্থক বই

দশ লক্ষ বছর আগের বানরোপম আদি মানুষ কি করে আজকের এই উন্নত প্রাণীটিতে পরিণত হল তার বিচিত্র কাহিনী। প্রথমে পৃথিবীর ইতিহাস এবং প্রাণীর ক্রমবিকাশ (ডারুইনতত্ত্ব) সংক্ষেপে আলোচনা করে লেখক পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সুরু পর্যন্ত মানুষের ক্রমপরিণতি বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ কালে শুধু তার চেহারা বদলায় নি, বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে তার সমাজ গড়ে উঠেছে, তার মানবিক ধ্যান ধারণা মূর্তি পেয়েছে। সুতরাং কেবল প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব নয়, সমাজবিদ্যা সম্বন্ধেও অপরিহার্য এই বই।

বিজ্ঞানকে সাহিত্যের রূপে পরিবেশন করেছেন বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক লেখক।

প্রায় ৫০ খানি চিত্র, ৩০০ পৃষ্ঠা। দাম আট টাকা।

"গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া বহু প্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। অনেক তথ্য একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে ; ভাষাও স্বচ্ছ ও সরস। বাঙালী পাঠকের চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করি।"
— অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

এই লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ

শনিবারের সন্ধ্যায়

"একজন অত্যন্ত শক্তিমান বিশিষ্ট লেখক···প্রত্যেকটি গল্পেই নিটোল গল্প আছে। তবু গল্পগুলি শুধুই কাহিনী-নির্ভর নয়···স্রষ্ট চরিত্রের মনের গভীর প্রত্যন্তের অন্ধকার উদ্ঘাটনই তাঁর লক্ষ্য।" — আনন্দ বাজার পত্রিকা

ভাল কাগজে এ্যান্টিক হরফে ছাপা। দাম ছয় টাকা।

ফার্মা কে এল্ মুখোপাধ্যায়
৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

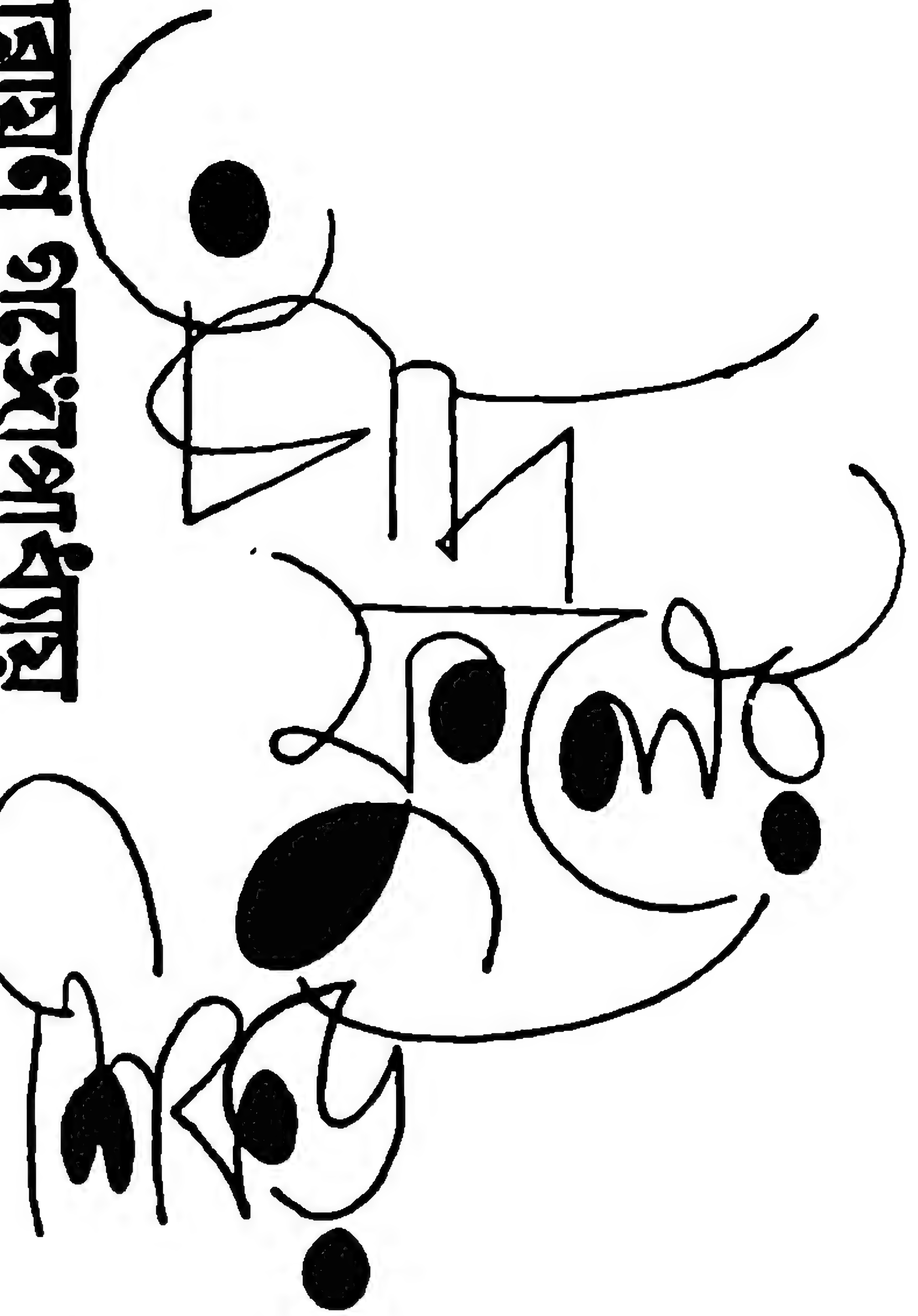

সেই লোকটা বেদে। কেমন অদ্ভুত একটা টানে অনর্গল কথা কইছিল তার মায়ের সঙ্গে, আর মেয়েটি কান পেতে শুনছিল। লোকটার গলার স্বর গম্ভীর অথচ মিষ্টি—যেন মেঘের ডাক আর নদীর জলের শব্দ একসঙ্গে মিশে আছে। শুনতে শুনতে যেন ঘুম জড়িয়ে আসে, মনে হয় ও মন্ত্র জানে—ইচ্ছে করলে নিদালি ছড়িয়ে দিয়ে, এখুনি, এই সকালবেলাতেই, সমস্ত শহরটাকে স্বপ্নের জগতে পাঠিয়ে দিতে পারে।

মেয়েটি কাছেই বসে রয়েছে, কিন্তু লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছে—বেদের ঝুলি থেকে সেই ময়লা কাপড়ের গন্ধ, জড়ি-বুটি শেকড়-বাকড়ের গন্ধ। ওর ভেতরে সাপের ওষুধ আছে, বাঁজা বৌয়ের সন্তান কোলে পাওয়ার মাদুলি আছে, বার মুখো স্বামীকে ঘরে ফেরাবার জড়িবুটি আছে। আরো যে কী কী আছে কেউ জানে না। বেদের ঝুলি মেয়েটির কাছে চিরদিন রূপকথার জগৎ, ভয়, বিস্ময় আর বিশ্বাস দিয়ে ভরা।

বেদেটা মার সঙ্গে কথা কইছে—মাত্র কয়েক হাত দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার গলায় নিশ্চয় কাচের মালা আছে, তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি হাওয়ায় যে তার রুক্ষ চুল খস্ খস্ করে উড়ছে তার অস্পষ্ট আওয়াজটাও মেয়েটির তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম অনুভূতিকে এড়িয়ে যাচ্ছে না। অথচ মেয়েটি তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সে অন্ধ। আর তাই নিয়েই লোকটা কথা কইছে মায়ের সঙ্গে। মা-র স্বর কান্নায় ভরে রয়েছে। আজ ছ' বছর ধরেও কান্নাটা থামল না।

মা বলছিলেন, যদি অন্ধ হয়েই জন্মাত, তা হলে তো আর দুঃখু ছিল না, বাবা। ভাবতুম—ভগবান চোখ না দিয়েই ওকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বারো বছর বয়েসে ওই যে টাইফয়েড্ হল, তাতেই তো সর্বনাশ করে গেল!

—আহা-হা!—জিভে টাকরায় মিশিয়ে সহানুভূতির শব্দ করল লোকটা। একটু থেমে বললে, এমন সোনার চেহারা, এমন পটলচেরা চোখ—এ যে সাক্ষাৎ ভগবতীর রূপ। এখন থেকে সারা জিন্দ্‌গী অন্ধ হয়ে থাকবে, তা-ও কি হয়!

—তাই তো হল, বাবা। চিকিৎসা তো কম করাই নি। দেখতেই তো পাচ্ছ, আমরা বড়ো লোক নই—উনি আদালতে চাকরি করেন, জমি থেকে যা অল্প-সল্প ধান-পান আসে। তবু ধার-দেনা করেও হাজার টাকা খরচ করেছি, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছি, নামজাদা সব ডাক্তার দেখিয়েছি। কেউ এতটুকু ভরসা দিলে না। সবাই বললে, চোখের ভেতর কী সব শুকিয়ে-টুকিয়ে গেছে, কোনোদিন আর ভালো হবে না।

—ডাক্তারদের কথা ছোড়ে দ্যান্ মা! দু-চার সত্তর আংরেজি পড়ে, মাটিয়া কালেজমে দো-চারটে মড়া কাটে, ব্যাস ভাবে দুনিয়ার সব জেনে গেছে। খালি টাকা লিবার যম। ভগবানে ভরসা রাখেন মা জননী, আপনার মেয়ের চোখ ভালো হয়ে যাবে।

—ভালো হয়ে যাবে? আশায় চঞ্চল হয়ে উঠেই মা-র স্বর আবার নিবে গেল: কিন্তু আজ বারো বছর ধরে কিছুই তো হল না। তোমার মত তো আরো দুজন এসে গেছে এর আগে, তাবিজ দিলে, ওবুধ দিয়ে গেল, কিন্তু কোথায় কী! আমার আর কারুর ওপর বিশ্বাস হয় না।

—বিশোয়াস ছেড়ে দিতে নেই মা, ধরে রাখতে হয়। বিশোয়াসে কৃষ্ণ মিলে। যারা ওবুধ দিয়েছিল, তারা বিলকুল বাজে লোক। বেদিয়া বেদিয়া অনেকেই বোলে মা কিন্তু ধামা-কুলা-চুচনি বানালে আর ছুরি-কাঁচি বিক্রী করলেই কি বেদিয়া হোয়?—তেমনি গম্ভীর আর ভরা, তেমনি নিদালি লাগানো গলায় লোকটা বলে চলল: তা হোলে তো সব ডোম আর সব ফিরিওলাই বেদিয়া। আমরা হচ্ছি জাত বেদিয়া, হাজার বছরের পেশা, মন্তর-তন্তর, শিকড়-বাকড় সব মা বিষহরী নিজের হাতে আমাদের ঝোলায় ভরে দিয়েছেন। আমার ওবুধ একবার পরখ করেন, তারপর যা বলার বলবেন।

এর আগেও যে দুজন এসেছিল তারাও এমনি করেই কথা বলেছিল, মা বিশ্বাস করেছিলেন, ওবুধ নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই হয় নি। কিছু যে হবে না মেয়েটিও সে-কথা জানে। বাবা ছ'বছর আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা-র আশার শেষ নেই। তার অন্ধতার কথা বলতে বলতে মা-র গলায় কান্না ভেঙে পড়ে, কপাল চাপড়ে বললেন, 'আমার এই হতভাগা মেয়েটার গতি কী হবে!' কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মেয়েটি আর কোনো কথা ভাবে না, ভাবতেও ভুলে গেছে। একটা গভীর শান্ত অন্ধকারে কয়েকটি অনুভূতিকে সুতীক্ষ্ণ সচেতন করে নিয়ে, একটি নিরুত্তাপ নির্বেদের মধ্যে বাস করছে সে। মা-র চোখের জলে তার চোখ আর ভিজে ওঠে না—ভবিষ্যতে তার কী হবে এ নিয়ে কোনো কথাও সে ভাবতে চায় না। অভ্যাসে কথাগুলো শোনে, অভ্যাসেই চুপ করে বসে থাকে।

কিন্তু এই বেদের গলার স্বর ঝুলির গন্ধটা চেনা, তার কাচ আর কড়ির মালার শব্দ, হাওয়ায় হাওয়ায় তার রুক্ষ চুলের মৃদু খসখসে আওয়াজটুকু—সব চেনা। ঠিক এই কথাগুলোই অন্যভাবে অন্যলোকে বলে গেছে। শুধু চেনা নয় এই গলার স্বরটা—যেখানে মেঘের ডাক আর নদীর জলের শব্দ এক সঙ্গে মিশে আছে।

মা বললেন, তুমি ওবুধ দেবে, বাবা?

কেন দেব না মা? এই তো আমার কাজ। তার আগে একটু পানি পিলান, ভারী তিয়াস লাগছে।

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, বোসো বাবা—বোসো। জল আমি এনে দিচ্ছি।

মা চলে গেলেন—মেয়েটি সেই খানেই দাওয়ায় বসে রইল। বরাবর এই খানেই বসে থাকে—এই খানেই বসে বসে তার সকাল কাটে, দুপুর গড়ায়, সন্ধ্যা নামে, রাত আসে। ফুলের গন্ধে, মাটির গন্ধে, পাখির ডাকে, হাওয়ার ছোঁয়ায়, রোদের তাপে, সকাল থেকে রাতের প্রত্যেকটা ধাপ সে বুঝতে পারে। এখানে বসে থাকাই বলতে গেলে তার একমাত্র কাজ।

কিন্তু আজ শুধু সে বসার জন্যেই বসে নেই। এই

লোকটা যেন এখানে তাকে ধরে রেখেছে। মেয়েটি জানে—তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জানে—লোকটা এখন এক দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে। তার কাচ আর কড়ির মালা প্রায় নড়ছে না, শুধু বাতাসে তার রুক্ষ চুল খস খস করছে. উঠোনের যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেই খানটিতেই স্থির হয়ে রয়েছে সে।

জীবনে এই প্রথম, এই আঠারো বছর বয়সে, একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করল মেয়েটি। যেন কোথা থেকে শীতের বাতাস এসে তাকে ছুঁয়ে গেল, যেন তার কপালে কোথা থেকে বৃষ্টির একটা ঠাণ্ডা বিন্দু নেমে এল। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠল তার।

লোকটার বয়েস কত? বুড়ো? না-বুড়ো নয়, বুড়ো মানুষের গলার স্বর এ-রকম হয় না। খুব ছেলে মানুষ? না—সে তো হতেই পারে না। খুব সম্ভব বয়সে কাকার মতোই হবে—হয়তো ত্রিশ হয়তো বত্রিশ। চেহারাটা কি রকম? এইটেই মেয়েটি ভাবতে পারল না। মেঘের ডাক, নদীর শব্দ, শীতের হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে যে একাকার হয়ে গেছে, তার বারো বছর বয়েস পর্যন্ত চেনা কোনো মানুষের সঙ্গেই সে তাকে মিলিয়ে নিতে পারছে না।

মা ফিরে এলেন।

জল নাও বাবা।

লোকটার গলায় কৃতজ্ঞ বিস্ময় ফুটে উঠল: আবার মিঠাই কেন নিয়ে এলেন মা? একটু পানি হলেই আমার হয়ে যেত।

—শুধু মুখে কি এই দুপুরবেলা গেরস্ত বাড়িতে জল খেতে আছে, বাবা? ঘরের তৈরী দুটো নারকেলের নাড়ু নিয়ে এলুম তোমার জন্যে।

—আপনি ভাগ্যমতী মা—রাজরাণী! আপনার দিল্ খুব বড়ো আছে। মেয়ের চোখ আপনার ভালো হয়ে যাবে।

—সেই আশীর্বাদই করো বাছা এবার বোধ হয় মা-র চোখে আঁচল উঠল।

লোকটা খাচ্ছে, মেয়েটি তার আওয়াজ পেল, চক চক করে সে এক এক ঘটি জল খেল, তারও। আহা, কী তেষ্টাই পেয়েছিল। বারান্দায় বসেও মেয়েটি বুঝতে পারছিল আজ ভাদ্র মাসের এই দুপুরটা আগুনের মতো তেতে উঠেছে, অসম্ভব গরম, বাতাসে রোদের ধার। এর মধ্যেও বিশ্রাম নেই—ঝুলি-ঝোলা কাঁধে করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে নিশ্চয় লিচু গাছটার ঘন কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। লোকটা এইবারে বসল বলে মনে হল। কড়ির আর কাচের মালায় অনেক বেশি শব্দ হল পরণের কাপড় জামা অনেক বেশি আওয়াজ করল, সেই আশ্চর্য গলার আওয়াজটা অনেকখানি নীচু থেকে উঠে এল।

—কখনো সুন্দরবনে গেছেন মা?

মা বললেন, না বাবা, সেখানে কী করে যাব?

—সে ভারী তাজ্জব জায়গা, মা। গহীন নদী, গহীন জঙ্গল। সুঁদরী গাছ, গোল পাতা, ঝোপ ঝাড়, নোনা পানি ঘিঁষে হোগলার বন। কত 'হরণ' ঘুরছে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে দাঁতাল্ শূয়ার, পানিতে ইয়া বড়া বড়া মগর ভাসছে—

—মগর কী বাবা?—মা কৌতূহলী হচ্ছেন।

—মগর সমঝাতে পারলেন না? কুম্ভীর—আপনারা যাকে কুম্ভীর বোলেন।—লোকটা হাসল বলে মনে হল: আর মা বনের ভেতর—কী বলব, এখানে ওখানে বসে আছেন যমরাজা—আদমখোর শের। চুপ্‌সে ঘাড়ে এসে পড়ল, মুখে করে কোথায় নিয়ে চলে গেল, এক কৌয়াতক জানতে পারল না!

মা শিউরে উঠলেন: কী সর্বনাশ, সেখানে যাও নাকি তোমরা?

—আমরা যে বেদিয়া, মা। সব ঠাঁই যেতে হয় আমাদের।

ওখান থেকে আমরা নাগ-নাগিন ধরে আনি শেরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গহীন বন থেকে নিয়ে আসি ওষুধের শিকড়।

কী সর্বনাশ, প্রাণও তো যেতে পারে।

বেদিয়ার কিছু হোয় না, না। শের কাঠুরিয়াকে ধরে, মৌ-ওয়ালাকে ছুঁড়ে, শিকারীর কাঁধে ঝুলে পড়ে। কিন্তু বেদিয়াকে কিছু বোলে না, বিষহরী মা তাদের রক্ষা করেন।

তোমরা কি সারা দুনিয়াই ঘুরে বেড়াও বাবা?

এই তো আমাদের কাজ, মা। তাই তো আমরা বেদিয়া। কত পাহাড়, কত নদী, কত জঙ্গল, কত অদনী। আমরা ঘুরে বেড়াই, দুচোখ ভরে দুনিয়াকে দেখি—মা বিষহরীর হুকুমে লোককে ওষুধ দিই, সকলের ভালো করি। আমাদের কি কোথাও বসে থাকলে চলে?

কিন্তু মেয়েটি সুন্দর বনের স্বপ্ন দেখছিল। এ সব কথাও নতুন নয়, সুন্দর বনের বাঘ কুমিরের গল্প সে জানে বাবাও বই পড়ে পড়ে শুনিয়েছেন। তবু—তবু এমন করে কেউ বলে নি। এই বলার ভেতরে বনের শব্দ আছে, গহিন জলের গর্জন আছে, বাঘের ডাক আছে, আর সমস্ত মনকে উধাও করা অদ্ভুত একটা জাদু আছে।

মেয়েটির সর্বাঙ্গ আবার শিরশির করে উঠল। সেই হিমেল-হাওয়ার ছোঁয়া, কপালে আবার শীতল বৃষ্টির বিন্দু। হঠাৎ মনে হল, তার চোখ দিয়ে জল আসতে চাইছে।

লোকটা তেমনি করে বলে চলল, একবার মা গেলেন সেই পূর্ণিয়া জিলায়। বর্ষার মাঠ-ময়দান—চারিদিকে পানি, একদম সাগর বলে মালুম হচ্ছে। একটা উঁচু ডাঙায় উঠে দেখি—আই বাপ! চারিদিকে খালি সাঁপ আর সাঁপ—হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার। চিতি, বোড়া, কেউটিয়া, পাতরাজ, গোক্ষুর, গোহমা, কেন্ন এই বড়া বড়া চেমনা হিলহিল করছে। সাপ নিয়ে তো কাম-কারবার করি কিন্তু দেখে শিরে চক্কর লেগে গেল। কিন্তু মা বিষহরী সাথে আছেন মা—কী বোলবে বেদিয়াকে? সব সরে গেল, আমি সিধা হেঁটে চলে গেলাম ভেতর দিয়ে।

মা দমবন্ধ করে শুনছিলেন। কথা বলতে পারলেন না।

দুনিয়া অনেক দেখলাম মা, আরো ঢের দেখব। যত দেখি, আঁখির পিয়াস আর মিটে না। জিন্দিগী ভরে দেখে যাব, তুফানের দরিয়ায় নাও নিয়ে পাড়ি দেব, আদম খোর শেরের নজর ফাঁকি দিয়ে গাছগাছাড়ি তুলে আনব লোককে ভালো করব, ওষুধ দেব। এই তো আমাদের কাজ মা—এই জন্যেই তো আমরা বেদিয়া।

মেয়েটার বুকের ভেতর অদ্ভুত যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে একটা। এতদিন নিজের কথা সে ভাবে নি, সে অন্ধ হয়ে গেছে তার জন্যে কোনো দুঃখ কোনো শোক তার ছিল না; মা কেঁদেছেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, সে শুধু অভ্যাসে সব কথাগুলো শুনে গেছে। কিন্তু আজ এই লোকটার গলার স্বরে—সমুদ্রের শব্দে, বনের আওয়াজে, সাপের শিসে, বাঘের ডাকে, দু'চোখ ভরে তার কান্না আসছে।

কোথা থেকে এল এই লোকটা - এ তার কী হল!

তা যাক বাবা, পরের ভালো যখন করে বেড়াও, তখন আমার মেয়েটাকেও দেখেশুনে একটা ওষুধ দাও। ভরসা আমার বড়ো নেই, ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে তবু যদি কিছু হয়, যদি –

মা আর বলতে পারলেন না। গলা বুজে এল।

ভগবানে বিশোয়াস রাখেন মা, মা বিষহরীর ওপর বিশোয়াস রাখেন। ওষুধ আমি দিচ্ছি। এ হলো চাঁদ ফুলের শিকড়, আমাবস্যার রাতে কাল-নাগিনীর মাথার মণির আলো-লেগে এর ফুল ফুটে। দুনিয়া থেকে চাঁদের আলো যায় নিবে গেল, এই ফুলের শিকড়ে চোখে তার কাল-নাগিনের মাণিকের আলো জ্বলে উঠে। আমার কথা মানেন মা—এমন ভগবতীর মতো রূপ আপনার মেয়ের—পদ্মের

মতো চোখ মেলে চাইবে। তখন পাঁচশিকে খরচ করে মা বিষহরীর পুজো দেবেন—ব্যস্‌!

সেই নিদালি নামছে মনের ওপর—মেয়েটার চেতনা লোকটার গলার স্বরে আস্তে আস্তে ডুবে আসছে। এখনি যেন তার চোখে সাপের মাথার মণির আলোপড়ল যেন এখনি তার এতদিনের অন্ধকার কেটে যাবে অমাবস্যার সব আবরণ সরে গিয়ে জ্যোৎস্নার জোয়ার বয়ে যাবে!

শিকড় বেটে ওষুধ চোখের পাতায় ওষুধ দিলেন মা। অফিস থেকে ফিরে এসে বাবা তা দেখলেন।

ও আবার কী দিয়েছ?

বেদের কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছি—মা বললেন, লোকটা ভালো আর এমন সুন্দর করে কথা বলে—

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, সুন্দর করে কথা বলাই ওদের পেশা। নইলে তোমাদের ঠকাবে কী করে?

ভাখো, ডাক্তারেরা তো কিছু করতে পারল না, যদি কোনো দৈব ওষুধ—

বাবা বললেন, রাখো তোমার দৈব ওষুধ। এই বেদে-গুলোর কাজই হল, পুরুষেরা বাড়ী না থাকলে মেয়েদের কাছে এসে হাজির হওয়া, আর তাদের ভুজং ভাজং দিয়ে যা তা গছানো। তা কত গেল?

মা বললেন, বেশি নয়, মোটে দু টাকা।

—দু টাকা বুঝি আকাশ থেকে পড়ে? স্রেফ জলেই গেল।

মা বললেন, না—তুমি জানো না। এ লোকটা সে-রকম নয়।

বাবা সে কথার জবাব দিলেন না। দুম দুম করে চলে গেলেন সামনে থেকে।

বাবার কথাই ঠিক। চাঁদ ফুলের শিকড় একদিন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সাপের মাথার মণি মেয়েটার চোখে আলো দিল না। শরৎ গেল, শীত গেল, বসন্ত এল, দাওয়ার নিজের জায়গাটিতে বসে সব টের পেল মেয়েটি; শিউলি ফুটে ফুটে ফুরিয়ে গেল, গাছের পাতা ঝরল, দক্ষিণের হাওয়ায় ভরে গেল—বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনল আঁজলা আঁজলা ভাঁট ফুলের গন্ধ।

চোখের আলো ফুটল না, কিন্তু মনের চোখ ফুটল। সেই যে আঠারো বছরের শরীরে তার শীতের ছোঁয়ার মতো কী লেগেছিল, সেই যে কী এক ফোঁটা জলের মতো ঝরে পড়েছিল তার কপালে, আর সমুদ্রের শব্দ, নদীর শব্দ, বনের শব্দ, সাপের শিস্‌, বাঘের ডাক—সব মিলে সেই যে স্বপ্ন মেশা নিদালি এনে দিয়েছিল, সে আর কোনোদিন মেয়েটি ভুলতে পারল না।

আরো কিছুদিন গেল। গরম হাওয়ায় পৃথিবী জ্বলে পুড়ে গেলে, রোদের সঙ্গে চাঁপা ফুলের গন্ধ মিশলে, তারপর পোড়া ধুলোয় আকাশ ভাঙা বৃষ্টি নামলে—লোকটার জন্যে বসে থাকতে থাকতে মেয়েটা আর পারল না। ওই দাওয়ায় আরো অনেকদিন, অনেক বছর পর্যন্ত বসে থাকাই যার নিয়তি হয়ে গিয়েছিল, সেই লোকটার বন-সমুদ্র-মেঘ মেশানো গলার স্বর, তাকে আর এক পৃথিবীর খবর দিলে।

তখন একদিন অনেক রাতে, এক পশলা বৃষ্টি থেমে গেলে, বাড়ীর সবাই অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেলে, মেয়েটি চাঁদ ফুলের শিকড় থেকে সাপের মাথার মণি জ্বলা মনের চোখ নিয়ে—না জেনেই সেদিকে এগিয়ে গেল যেখানে অথই জলের পুকুরটা বর্ষায় টই-টম্বুর। সাঁতার সে জানত না, কিন্তু মনের ভেতরে যার নাগমণি জ্বলছে, তার সাঁতার জানা না জানার কী আসে যায়!

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন !

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

একটি ছোট গল্প

নবেন্দু ঘোষ

সেদিন উকীল দেবকুমার গুহের মক্কেলহীন বৈঠকখানায় আমাদের রবিবাসরীয় সকালবেলার আড্ডাটি দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ের পর যখন দিব্যি জমে উঠেছে তখন 'কালান্তর' দৈনিকের সাব-এডিটর অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, আজ বিকেলে শশীবাবুর বাড়ীতে যাচ্ছতো ?

দেবকুমার গুহ বলল, শশীবাবু'র বাবা'র আজ শ্রাদ্ধ-তাই না ?

—হ্যাঁ-তুমি যাবে না ?

—না ভাই, আমায় নেমন্তন্ন করেননি শশীবাবু।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর একটি ছোট্ট কামরায় হেডক্লার্ক নামে অভিহিত আমি, বিনয় বোস, বললাম, আমাকেও নেমন্তন্ন করেনি– অবশ্য তেমন আলাপও নেই আমার সঙ্গে। ভরত গুপ্তকে নিশ্চয়—

ভরত গুপ্ত মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই আমি নিমন্ত্রিত। কিন্তু নিশ্চয়ই আমি যাবনা –

আমরা তিনজনে তাকালাম তার দিকে।

দেবকুমার গুহ জিজ্ঞেস করল, কেন হে ?

ভরত গুপ্ত বলল, শ্রাদ্ধবাসরে গেলে আমার মন বরাবর খারাপ হয়ে যেত—হয়ত মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায় বলে। কিন্তু তবু আমি কেউ নেমন্তন্ন করলে আগে যেতাম। কিন্তু বন্ধ করেছি আট বছর আগে—বিজন মিস্তিরের শ্রাদ্ধবাসরে যোগ দেবার পর থেকে সেই শেষবার –

অবিনাশ চাটুজ্জে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, কেন মাষ্টার, কি হয়েছিল সেখানে ? আর বিজন মিস্তিরই বা কে ?

ভরত গুপ্ত পকেট থেকে বিড়ি বের করে বলল, তাহলে তো একটা গল্প করতে হয়—

দেবকুমার গুহ হো হো শব্দে হেসে উঠল। আমারও হাসতে ইচ্ছে করল কিন্তু ভরত গুপ্তের ললাটে ভ্রূকুটি-তিলক দেখে থেমে গেলাম।

ভরত গুপ্ত প্রশ্ন করল, উকীল হাসলে কেন ?

দেবকুমার গুহ বলল, হাসলাম এই ভেবে যে তুমি গল্প বলার সুযোগের জন্য যেন ওৎ পেতে থাকো—

—তাতে দোষ কি ?

—না না দোষ হবে কেন ?

আমি ভরত গুপ্তের মেজাজ বুঝতে পেরে তাকে একটু প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে বললাম, আরে আমাদের ভরত গুপ্তের গল্পগুলো কাগজে বেরোলে ওর খুব নাম হত –

ভরত গুপ্ত সতেজে বলল, আমি নামের কাঙাল নই-শুধু তোমাদের শোনাতে পারলেই আমি তৃপ্ত—

বললাম, তুমি বিনয়ী বটে।

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, খোশামোদ নয়, তোমার মধ্যে সত্যিকারের লেখক-সত্তা আছে—তোমার লেখা এবার ছাপাও –

ভরত গুপ্ত পূর্ব্ববৎ বলল, ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখে আজ জনপ্রিয় হ'য়ে এবং প্রচুর উপার্জন করে কালকে কালসিন্ধুর অতলে তলিয়ে যেতে আমি রাজী নই বন্ধুগণ। কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে কয়েকঘন্টার জন্য পাঠকদের

একটু চিমটি কেটে বা সুড়সুড়ি দিয়েই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন থেকে আমাকে ভগবান রক্ষা করুন।

দেবকুমার গুহের ওকালতীবুদ্ধি এতক্ষণে ভরত গুপ্তের অভিমান সম্পর্কে সচেতন হল। সে বলল, আচ্ছা বাবা, না ছাপালে তোমার লেখা; আমাদের শুনিয়ে শুনিয়েই তোমার লেখক জীবনের পরমার্থ লাভ কর। নাও এবার শুরু কর—

—না।

—কেন হে?

ভরত গুপ্ত আওড়াল,

> ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি
>
> সহে চতুরানন।
>
> অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা
>
> লিখ মা লিখ॥

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, ধ্বনিতে সংস্কৃত মনে হচ্ছে, অর্থও কিছু কিছু যেন বুঝতে পারছি—তবু বল—অর্থার্থ?

ভরত গুপ্ত বলল, অন্য যা কিছু দুঃখ দেবার তুমি দিও, আমি সহ্য করে যাব। কিন্তু হে চতুরানন আমার কপালে যেন অরসিক জনের কাছে রস নিবেদন করার দুঃখ দিও না।

অবিনাশ চাটুজ্জে হাতজোড় করে কপট ভঙ্গীতে বলল, হে রসিকবর, হে ভরত গুপ্ত, আমরা অনুতপ্ত, তোমার বক্রোক্তির এবার ইতি হোক, তুমি আশ্বস্ত হয়ে শ্রবণ কর যে তোমার গল্প শোনার জন্য আমরা তিনজন কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠেছি।

ভরত গুপ্তের ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে হাসি ঝিলিক মারল। সে বলল, তথাস্তু। দাঁড়াও, আগে বিড়িটা ধরিয়ে নিই। বিড়ি ধরিয়ে ভরত গুপ্ত দু' তিন মিনিট নেশার আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে রইল এবং আমরা তার গল্পারম্ভের আবহ-সৃষ্টির জন্য নিঃশব্দ হয়ে রইলাম।

হঠাৎ বিড়িটা অ্যাশট্রেতে ফেলে ভরতগুপ্ত সোজা হয়ে বসল, বলল, তাহলে শোন—

গল্পের শুরু আর শেষ পাটনাতে। সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। একটি বেসরকারী অফিসে কেরাণীগিরি করতে গেছি। প্রথমে হোটেলে থাকতাম, স্টেশনের কাছাকাছি। ক্রমে শহরের অনেকের সঙ্গে আলাপ হল, ফলে সময় কাটাবার জন্য বাঙ্গালীদের ক্লাবে গিয়েও বসতে লাগলাম। হয়ত হাসবে তোমরা, তবু বলছি—সেই সব ক্লাবের লোকেরা আমার মধ্যে একদিন একজন সুদক্ষ অভিনেতাকে খুঁজে পেল এবং একবছর বাদেই আমি পাটনার সমাজে রীতিমত খ্যাতিমান হয়ে উঠলাম। আমাকে নিয়ে ক্লাবগুলোর মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল—আমি কিছুদিন সেই কাড়াকাড়িতে প্রথমে গর্ব ও পরে তিক্ততা বোধ করে অবশেষে কদমকুঁয়ার একটি ক্লাবের সদস্য হয়ে সেই প্রতিযোগিতার অবসান ঘটালাম।

সেই ক্লাবেরই, নিশিকান্ত বসুর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। শান্ত প্রকৃতির, মিতভাষী, সৎ মানুষটি, ক্লাবের উৎসাহী সভ্য। বিয়ে থা করেনি, করবে বলেও মনে হয় না। সে-ই আমাকে হোটেল থেকে একদিন জোর করে টেনে বের করল।

"হোটেলে মানুষ থাকে নাকি মশাই—আরে দূর দূর—" নিশিকান্ত নিজেই আমার মালপত্তর টেনে বের করল।

নিশিকান্তের আস্তানা কদমকুঁয়ার কাছাকাছি, সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে, একটা মস্ত বড় বাগানের গায়ে। বেশীর ভাগই আমগাছ সেই বাগানে, তাছাড়া বট, অশথ, কিছু বাঁশ, অনেকগুলো শিউলি ও বকুল ফুলের গাছ আর জানাঅজানা নানা লতাপাতার ভীড়। খুব পুরোন ছোট্ট একটা বাংলো-মত বাড়ী খাপড়ার ছাউনি-দেওয়া। ছোট ছোট তিনটি কামরা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর আর বাথরুম। ভাড়া

যৎসামান্ত। সেখানে নিশিকান্ত তার বিনয় নামক এক দর্জি বন্ধুর সঙ্গে থাকে। বিনয় নাটক সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন কিন্তু নিশিকান্তের খাতিরে সে দরকার পড়লেই বিনা প্রতিবাদে কাটা সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

নিশিকান্তের আস্তানা আমার খুব ভালো লাগল। চমৎকার নিরিবিলি জায়গা, বেশ পড়াশোনা করা যাবে। সেই মস্ত বড় বাগানের মধ্যে দিব্যি বেড়ানো যায়, নানা পাখীর কাকলিতে মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। খাওয়ার অসুবিধেও হল না এতটুকু, নিশিকান্তের কাছে রাম দেও নামে একটি বেহারী ছোকরা আছে—সে একাধারে ভৃত্য ও পাচক এবং নিশিকান্তের দাপটে সে সুক্ত পর্যন্ত চমৎকার রাঁধে।

সেই বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পরই লক্ষ করলাম একটি ছেলেকে। বছর সাতেক বয়স। রোগামত, গায়ের রং ফুটফুটে। টিকোলো নাক। চোখ দুটি ছোট হলেও খুব উজ্জ্বল, মাথার চুল কোঁকড়ানো, পরনে ধবধবে ফর্সা হাফপ্যান্ট আর হাফ-শার্ট। রোজ অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় চা নিয়ে বসতাম আমি আর প্রায়ই লক্ষ্য করতাম যে ছেলেটি সেই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একা একা। ছেলেটি যে বাঙালী তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি তার মুখের লাবণ্য দেখে। কিন্তু ছেলেটির ওই একা একা ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হতে লাগল। ঐ প্রায়-জঙ্গল বাগানটাতে কি ছেলেটার ঘুরে বেড়াতে ভয় করে না?

একদিন তাকে দেখতে পেয়েই আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হল।

ছেলেটি একটি গাছের ডালের দিকে তাকিয়েছিল, আমার পায়ের শব্দে চমকে ঘুরে তাকাল।

"তুমি বাঙালী—তাই না খোকা?"

ছেলেটি মিষ্টি হেসে মাথা ঝাঁকাল, বলল, "হ্যাঁ—আপনি ঐ বাড়ীটাতে থাকেন, না?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

'আপনার ভয় করে না?'

হেসে বললাম, 'তোমার ভয় করে না এই বাগানে ঘুরে বেড়াতে?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, 'বাঃ দিনের বেলা ভয় করবে কেন? আমি তো রাতের কথা জিজ্ঞেস করছি—'

আমি বললাম, "না, আমার দিনে-রাতে কোন সময়েই ভয় করে না। তাছাড়া, আমরা এখানে চারজন ব্যাটাছেলে এক সঙ্গে থাকি, ভয়ের কি আছে?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, "তা ঠিক—"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি একা একা বাগানে ঘুরে বেড়াও কেন বলত?"

"আমার ভালো লাগে—" ছেলেটি বলল সলজ্জ হেসে, "এখানে কত পাখী, কত ফুল, কত প্রজাপতি—"

"কেন? তোমার খেলতে ভালো লাগে না? তোমার বন্ধু বান্ধব নেই?"

"আছে। কিন্তু ওরা যে বাগানে আসতেই চায় না—"

বুঝলাম যে বন্ধুদের সঙ্গাপেক্ষাও এই বাগান তার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়।

"যাই—" বলেই হঠাৎ ছেলেটি দৌড় দিল তীরবেগে। একবার সে ফিরেও তাকাল না।

হঠাৎ দেবকুমার গুহ প্রশ্ন করল, এই ছেলেটিরই নাম বুঝি বিজন মিত্তির?

ভরত গুপ্ত কটমট করে তাকাল, পালটা প্রশ্ন করে বলল, আমি কি তাই বলেছি?

—না—তা নয়—

—তাহলে চুপ করে শোনো, মাঝপথে ঢুকো না।

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, উকীল যে—জেরা না করলে শান্তি পায়না।

ভরত গুপ্ত উচ্চকণ্ঠে বলল, তা বললে চলবে কেন? রসের স্বাদ পেতে হলে ধৈর্য বজায় রাখতে হবে—

আমি বললাম, এটা ডেমোক্রেসীর যুগ এবং মেজরিটির ধৈর্য অক্ষুণ্ণ আছে, সুতরাং তুমিও ধৈর্যধারণ করে আবার কথকতা শুরু কর।

—তথাস্তু—তাহলে শোন—

ছেলেটির নাম দেবতোষ, ডাক নাম দেবু। তার সঙ্গে পরেও দেখা হতে লাগল।

একদিন দেখি যে সে একটা কঞ্চির তৈরি ধনুকে কঞ্চির তীর লাগিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওকি করছ দেবতোষবাবু?"

দেবু আমার দিকে তাকাল, তার দু'চোখ চকচক্ করছে। সে মিষ্টি হেসে বলল, "আকাশের দিকে তীর ছুঁড়ছি।"

"কেন? আকাশ কি দোষ করল?"

"বাঃ— দোষ করবে কেন? আমি তীর ছুঁড়ছি যাতে আকাশ ফুঁড়ে তীরটা ওপরে, ওপরে, অনেক ওপরে উঠে চাঁদে গিয়ে ঠেকে—"

"তাতে লাভ?"

"এমনি—" বলেই দেবু লজ্জা পেয়ে গেল মনে হল। যেন সে অকারণে চাঁদে তীর পাঠানোর কোনো অর্থ নেই বলে উপলব্ধি করল।

আমি হেসে বললাম, "চাঁদ কত দূরে তা জানো দেবু?"

"না তো।"

"বত্রিশ হাজার মাইল।"

বত্রিশ হাজার মাইল জিনিস্টা তাকে বোঝাতেই তার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।

"আচ্ছা চাঁদে কি আছে? চাঁদে কি মানুষ আছে?"

তখনো চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা আজকের দিনের মত আরম্ভ হয়নি আর আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও খুব সমৃদ্ধ ছিল না, তবু আমার ভাসা-ভাসা যেটুকু জানা ছিল তাই দেবুকে বোঝালাম। লক্ষ্য করলাম যে তার কৌতূহল অসীম। তারপর থেকে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হত আর সে আমায় জিজ্ঞেস করত গ্রহ নক্ষত্র ও এই রহস্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে, এই পৃথিবীর নানা বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষ ও জন্তু জানোয়ারদের কথা। গল্প করতে করতে আমি তাকে আমাদের বাসার বাইরের বারান্দায় বসিয়ে তার কৌতূহল যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করতাম। বহুদূরের নীহারিকাপুঞ্জ আর ছায়াপথে ঘুরে বেড়াতাম আমরা; মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের কক্ষপথে দু'এক মিনিটেই চক্কর মেরে আসতাম। মহাকাশের অন্তহীনতা থেকে শ্যেনগতিতে পৃথিবীর ওপরে নেমে এসে এলোমেলো বেড়িয়ে বেড়াতাম। গ্রীসের 'ইউলিসিসের ডাহাজ' নামক দ্বীপের কথা বলতে বলতে পারস্যের প্রাচীন সহর পার্সিপোলিসের কথা বলতাম যেখানে জারাক্সাসে'র প্রাসাদ-তোরণের গায়ে পক্ষ-যুক্ত বৃষ-মূর্তি আছে। বলতাম কি করে মোঙ্গোলরা শীতকালে আগুনে-তাতানো ইঁটের ওপর কম্বল বিছিয়ে শোয়, বলতাম বলিভিয়ার টিয়া—হুকা—নাকো সহরের ধ্বংসস্তূপের কথা আর হাইতুরু দ্বীপের কথা যেখানে শুধু বিচিত্রবর্ণের পাখীরাই থাকে। কঙ্গো গিরিগুহার ভ্যান জিলের হৃদ, জাভা'র পুতুলনাচ, বুড়ো বুদ্ধের প্রাচার, আফ্রিকা, আরিজোনা ও তুর্কিস্থানের মরুভূমির গল্প শোনাতাম। ভারত-মহাসাগরের সেচিলিস দ্বীপ যেখানে সূর্যাস্তের রঙে আর জ্যোৎস্নারাতে মহাসাগরের তরঙ্গ-সঙ্গীতে অবাস্তব এক জগত নেমে আসে সেই বর্ণনা শোনাতে শোনাতে দেবুকে আমি আলাস্কার হাত ধরে নিয়ে যেতাম যেখানে জঙ্গলে কাঠবিড়ালেরা ভূগর্ভে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোয়। তারপর যেতাম ট্রিনিদাদ দ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ বনে যেখানে ডালে ডালে অজস্র পেঁচো বিদূষকেরা ঝোলে আর সমুদ্রের জলে পাইয়ে মাছেরা গান গায়। আর যেতাম পেসকাদোর

দ্বীপপুঞ্জে যেখানে ওখানে পাখীদের ছানা আর ডিমগুলো খাবার জন্য গভীর রাতে জলসিংহেরা একের পর এক উঠে আসে।

"সত্যি কাকু? সত্যি?" দেবু প্রশ্ন করত মাঝে মাঝে। তার দু'চোখে বিস্ময় পুঞ্জীভূত হয়ে উপচে পড়তে চাইত।

আমি বলতাম, "এই সব কিছুই দেখতে হবে, কি বল?"

দেবু মাথা নাড়ত, তার চোখের বিস্ময় মিলিয়ে যেত, সেখানে আমার কাছে শোনা সেই সব মরুভূমি, দ্বীপ, পাখী আর গ্রহনক্ষত্রদের ছায়া ছায়াছবির মত যেন বারবার সরে সরে যেত। মনে মনে সেই সব বিচিত্র দেশ ও মহাকাশে বেড়াতে বেড়াতে দেবু মাথা নাড়ত আর বলত, "যাব কাকু আমি যাব—আচ্ছা কাকু কালই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়?"

আমি তর্জনী তুলে বলতাম, "উঁহু—তা খুব সুবিধের হবে না। লেখা পড়া শেষ না করে বেরোবার উপায় নেই—"

"তাহলে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে—"

"হোক দেরি কিন্তু ফুরিয়ে তো যাবে না।

"হুঁ—"

এই ভাবেই আমাদের সখ্য বেড়ে চলল। প্রতি দিনের অন্তে একটি কৌতূহলী বালকের মনোলোকে নতুন নতুন সত্যের বীজ বপন করাটা যেন আমার কাছে এক মধুর নেশা হয়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যের অন্ধকার উঁকি মারতেই দেবু বাড়ী ফিরে যেত আর আমি তাকে পরের দিন আবার কি বলব তারই খসড়া করতাম মনে মনে। এমনিভাবে মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল—তারপর একদিন—

"কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না"—অবিনাশ চাটুজ্জে একটু নড়ে বলল।

ভরত গুপ্ত প্রশ্ন করল, "বল কি বুঝতে পারছ না?"

"এই ছেলেটির নাম দেবতোষ?"

"নিশ্চয়—আমি তার নাম তো আশুতোষ বা মনোতোষ বলিনি।"

"তা ঠিক—আমি নামের ব্যাপারে সন্দেহ করিনি।"

দেবকুমার গুহ বলল, "তাহলে আবার টুকলে কেন হে?"

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, "আমি জানতে চাইছি যে দেবতোষই কি এই গল্পের নায়ক?"

ভরত গুপ্ত গম্ভীর মুখে বলল, "সব গল্পেই নায়ক থাকেনা, সব গল্পেই নায়কেরা নিয়ন্ত্রণ করে না। কতকগুলো গল্পে শুধু একদল চরিত্র থাকে এবং তাদের জীবনপ্রবাহের সম্মিলিত স্রোতাবর্তে একটি জীবনসত্য প্রমাণিত হলেই গল্প শেষ হয়।"

দেবকুমার গুহ বলল, "সাধু—কিন্তু দেবতোষের সঙ্গে বিজন মিস্তিরের শ্রাদ্ধের কি সম্পর্ক?"

ভরত গুপ্ত বিরক্ত হয়ে বলল, "তা যথাসময়েই জানতে পারবে।"

আমি বললাম, "আহা, এখন বলতে কি কোনো দোষ আছে?"

ভরত গুপ্ত বলল, "আছে। না-বলার দরুণ যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে তা লুপ্ত হবে।"

বললাম, "কিন্তু একজায়গায় তো কৌতূহলের শেষ করতেই হবে?"

"নিশ্চয়—কিন্তু তার জন্যে আমাকে অনবরত টুকলে কি করে তা শেষ হবে?"

অবিনাশ চাটুজ্জে হেসে বলল, "আমি আর টুকব না—কথা দিলাম—ওয়ার্ড অফ অনার—"

আমি বললাম, "প্রসন্নচিত্তে আবার কথকতা শুরু কর হে ভরত গুপ্ত—"

ভরত গুপ্ত গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, "বেশ এ যাত্রা মাফ করে দিলাম। এবার শৃণ্বন্তু বন্ধুগণ—"

সব কিছুরই নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। রস-শাস্ত্রেরও। সেই ব্যাকরণ-সম্মত সময়েই গল্পের কথা বা ঘটনাকে উল্লেখ করা উচিত, নতুবা তার ষোলআনা ফল ফলেনা। সেই কারণেই দেবতোষের পরিচয় এতক্ষণ দিইনি। কিন্তু এবার সময় হয়েছে, তোমরা মধুচক্রে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করেছ। এই যে দেবতোষ তারই বাবার নাম বিজন মিত্তির এবং বিজন মিত্তিরের শ্রাদ্ধবাসরেই এই গল্পের শীর্ষবিন্দু নিহিত আছে। বিজন মিত্তির হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়াটা এ যুগের একটি প্রধান ব্যাধি ও প্রায় অতি-সাধারণ ঘটনা। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে—জীবনের সেই বহু-জটিল অগ্রগতির চাপে হৃদয় নামক যন্ত্রটি অনেকেরই বিকল হয়ে যাচ্ছে। নদীতে জল বেশী হলে যেমন দুকূলপ্লাবী বন্যার সৃষ্টি হয় মনের নদীতে প্লাবন এলেও তেমনি হয়—ধ্বংসের জলধারা হৃদয়ের দুকূলকে ডুবিয়ে চৈতন্যের শিখাটিকে নিভিয়ে দেয়। কিন্তু না—এবার আপ্তবাক্যের ইতি করি, নইলে তোমরা আমায় নিশ্চয়ই 'স্যাডিস্ট' বা মর্ষণকামী বলবে।

দেবতোষের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগেই কিন্তু আমি তার বাবা বিজন মিত্তিরের নাম শুনেছিলাম। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চেহারা গোলগাল। ভদ্রলোক একটি প্রথম শ্রেণীর উকিল, স্থানীয় বাঙালী সমাজে বেশ সুপরিচিত এবং নানা প্রতিষ্ঠানে ও উৎসবে তিনি অকাতরে আর্থিক সাহায্যও করে থাকেন। বিদেশ ঘুরে এসেছেন একবার কিন্তু পুরোপুরি সাহেব হয়ে যাননি, ভারতীয় তথা বাঙালী সংস্কৃতির যা কিছু ভালো তা তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তার বাড়ীর ভেতরকার কার্ণিচার থেকে শুরু করে অন্যান্য গৃহসজ্জাতেও তাঁর সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়েছিল।

হ্যাঁ, আমি একবার নিশিকান্তের সঙ্গে বিজন মিত্তিরের বাড়ী গিয়েছিলাম। ক্লাবের চাঁদার জন্য। নিশিকান্ত তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল।

"বটে! ভাল অভিনয় করেন! তাহলে তো আপনি একজন রসিক লোক—আরে মশাই, আমিও যদি আপনাদের মত অভিনয় করতে পারতাম"—বিজন মিত্তির বলেছিলেন।

নিশিকান্ত সহাস্যে বলেছিল, "করতে পারবেন না কেন? এতো আনন্দের কথা মিত্তির মশাই—আমরা এবার আপনাকে পার্ট দেব।"

বিজন মিত্তির উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন। তাঁর সেই হাসির মধ্যেই তাঁর সত্যিকারের পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন। সেই প্রাণখোলা হাসি একটু থামিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ক্ষেপেছেন মশাই—জীবনে দু'তিনবার সেই কলেজ-জীবনে অভিনয় করেছি বটে কিন্তু তা শুধু কাটা সৈনিকের ভূমিকায় এবং তাও ভালো করে কর্তে পারিনি"—বলেই তিনি আবার হেসে উঠেছিলেন। সেই উচ্চগ্রামের হাসি।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম আমরা।

"কি হল? এত শব্দ করে হাসছ কেন?"

আমরা ঘুরে তাকিয়েছিলাম।

দরজার গোড়ায় একটি সুন্দরী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল তখন। তার চেহারার মধ্যে একটা বিচিত্র মাদকতা ছিল, আর ছিল একটা বিলিতিয়ানার আভাস—চুল-বাঁধার ভঙ্গীতে, ঠোঁটের রঙে, ব্লাউজের কাটে।

বিজন মিত্তির সহাস্যে বলেছিলেন, "এসো সুরভি, এসো—'সাজাহান' নাটকে সাজাহান কিংবা ঔরংজেব করতে পারব কি না সেই কথা ভেবে হাসছিলাম—ভালো কথা, তুমি এঁদের চেন তো? ইনি নিশিকান্ত আর ইনি—"

সুরভি দেবীকে দেখে মনে মনে প্রশংসা করেছিলাম সেদিন। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা আর ভারী চঞ্চল ও উজ্জ্বল তাঁর চোখ দুটি। তাকালে চোখ ফেরাতে সময় লাগে।

বাইরে একটা মোটরগাড়ী থামার শব্দ হয়েছিল ঠিক সেই সময়।

সুরভি দেবী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "মিঃ গুপ্তের গাড়ী না?"

বিজন মিত্তির বলেছিলেন "হুঁ"—

লঘু পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল, তারপরেই বিজন মিত্তিরের সমবয়সী একজন সুদর্শন লোক ঘরে ঢুকেছিল। তার পরণে স্যুট, চোখে মুখে ছিমছাম বিলিতিয়ানার প্রলেপ।

"আয় অজয়"—বিজন মিত্তির সহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

আমরা অনুমানে বুঝেছিলাম যে সেই ভদ্রলোক মিঃ অজয় গুপ্ত ব্যারিস্টার। বিজনবাবু আমাদের অনুমানকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্যই যেন অজয় গুপ্তের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিঃ গুপ্ত বিজন মিত্তিরের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী। স্কুল, কলেজ এবং আইন পরীক্ষা পর্যন্ত একসঙ্গে ওঠবোস করেছেন। তারপর সাতআট বছর তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বছর দুই আগে অজয় গুপ্ত পাটনা বারে যোগ দেওয়ার ফলে আবার দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হয়েছে। এই দু'বছরেই গুপ্ত সাহেবের প্র্যাকটিস আশাতীতভাবে জমে উঠেছে।

বিজন মিত্তির আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "বুঝলেন আমার এই বন্ধুটির অনেক গুণ-ও শুধু আদালতে'র কামরাতেই যে হাততালি পায় তা নয়, আপনাদের এ্যামেচার বা পাবলিক স্টেজে নামিয়ে দিলেও সমান হাততালি পায়—"

অজয় গুপ্ত হেসে বলেছিলেন, "ইউ আর নট ট্রাইং টু পুল মাই লেগ্‌স্ বিজন—আর ইউ?"

আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম।

বিজন মিত্তির বলেছিলেন, "আমি সত্যি কথা বলছি। অজয় আমার মত কাটা-সৈনিক নয়-ও সাজত ওথেলো, মার্ক এন্টনি, রোমিও—এই অজয় এঁদের একটু ওথেলো থেকে শুনিয়ে দে'না—"

অজয় গুপ্ত হেসে বলেছিলেন, "তুই আমার অতীতের কথা বলছিস—ওসব আজকাল ভুলে গেছি—এখন শুধু পিনাল কোড টোড থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাতে পারি, কিন্তু তা কি ওঁদের ভাল লাগবে?"

আমরা আবার হেসেছিলাম। সুরভি দেবীও হেসেছিলেন এবং সবার হাসি ছাপিয়ে বিজন মিত্তিরের হাসি ঘর কাঁপিয়ে তুলেছিল।

বিজন মিত্তির কাটা-সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই যে রসের স্বাদ পেয়েছিলেন বোধ হয় তারই প্রেরণায় আমাদের ক্লাবে মাসে দু'মাসে একবার করে রবিবারের সন্ধ্যায় হাজির হতেন। আমাদের রিহার্সাল চলত। হয় 'দেবলাদেবী' কিংবা 'মিশর-কুমারী' কিংবা 'পথের শেষে'। বিজন মিত্তির বসে বসে চুরুট টানতেন, মাঝে মাঝে দু'চারটে মন্তব্য করে আমাদের হাসাতেন তারপর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েই উঠে পড়তেন। প্রত্যেক নাটক মঞ্চস্থ হবার সময় তিনি যথাসাধ্য চাঁদা দিতেন আমাদের, উৎসাহ যোগাতেন।

দিন কেটে চলল। দিনরাতের জপমালা ঘুরিয়ে চলল আমাদের জীবন ও পৃথিবী। আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও অভাব এড়িয়ে নানা উপলক্ষ্য বেছে নিয়ে বাঁশ দড়ি ও তেরপলের সাহায্যে আমাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহের চতুঃপার্শ্বস্থ বিশাল রঙ্গমঞ্চটির অনুকরণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশবৎ রঙ্গমঞ্চ খাড়া করে তাতে 'মানবজীবনের বহু বিচিত্র ও অন্তহীন নাট্যাবলী থেকে আমাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী নাটক মঞ্চস্থ করতাম। মহানিশা, প্রফুল্ল, সীতা, কালিন্দী, মন্ত্রশক্তি, মেবার-পতন—আমাদের রঙ্গমঞ্চে অতীত ও বর্তমান একই ভঙ্গীতে জীবন্ত হয়ে উঠত। আর এমনি করেই তিন বছর কেটে গেল।

খেয়াল ছিল না যে এই তিন বছরে বিজন মিত্তিরের ক্লাবে এসে চুরুট টানতে টানতে হাস্য পরিহাস করার অভ্যেসটি কখন থেমে গেছে। মাঝে একবার কাণে এসেছিল যে তাঁর টাইফয়েড হয়েছে। ভদ্রতাবশতঃ যখন একদিন নিশিকান্তকে বললাম যে একবার দেখে আসা উচিত তখন সে জানাল যে তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। তাই আর যাওয়া হ'ল না।

এর মাস কয়েকবাদে একদিন কথায় বিনয় বলল, "বিজন মিত্তিরের বড় খারাপ সময় যাচ্ছে—"

আমি তাকালাম তার দিকে, "তার মানে?"

বিনয় বলল, "ছ'মাসের বিল পড়ে ছিল আমার—সেই টাইফয়েড থেকে ওঠার পর থেকেই মিত্তির মশাই-এর পসার মন্দা হয়ে পড়েছে—"

"সে কি ভাই? এমন হল কেন?"

"তার কি জবাব দেওয়া যায় ভরতবাবু? আসলে জীবনে এক অবস্থা কি চিরকাল থাকে—আপনাদের সংস্কৃতে আছে না—সুখ আর দুঃখ নাকি চাকার মত?"

"কিন্তু মিঃ গুপ্ত তো শুনেছি অনেক কেস দিয়ে সাহায্য করেন তাঁর বন্ধুকে?"

বিনয় মাথা নেড়ে বলল, "তা করতেন, এখনো হয়ত করেন কিন্তু সে সব কেসেই হেরে যান মিত্তির মশাই—ফলে মিঃ গুপ্ত বোধ হয় আর তেমন সাহস পান না, আর এমনি নতুন মক্কেল তো দূরের কথা, পুরোণ মক্কেলরাও একে একে কেটে পড়ছে—"

"সে কি কথা!" মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার

বিনয় কাটা-সৈনিকের পার্ট করলেও নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং নায়কোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে কপালে ডান হাতটা দু'তিনবার ঠুকে বলল, "কপাল মশাই, কপাল। আমার মনে হয় যে অসুখের ফলে মিত্তির মশাই-এর বুদ্ধি একটু কমে গেছে—অন্ততঃ ওকালতী বুদ্ধিটা। তবে হ্যাঁ, লোকটার বন্ধুভাগ্য খুব জোরালো, মিঃ গুপ্ত হাল ছাড়েন নি—হয়ত তাঁর চেষ্টায় আবার দাঁড়িয়ে যাবেন—"

আমি বললাম, "একটু সাহেব-মার্কা লোক অজয় গুপ্ত কিন্তু হৃদয়বান লোক—"

বিনয় বলল, "তাই শুনি—বন্ধুর এই অবস্থাতেও তাঁর বন্ধুত্বে চিড় খায়নি—এখন তাঁর পসার তো আরো বেড়েছে তবু ঠিক আগের মতই সময় করে আসেন, বন্ধুর খোঁজখবর নেন। অবশ্য মিঃ গুপ্তের ঝামেলা খুব কম—তিনি অকৃতদার এবং সেই জন্যেই বোধ হয় বন্ধুর জন্য তিনি কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারেন। আমার বিল এবং বাজারের অনেক পাওনাই কদিন আগে মিটিয়ে দিয়েছেন মিত্তির মশাই—আমরা অনুমান করছি যে এসবই মিঃ গুপ্তের জন্যই সম্ভব হয়েছে—"

দিনের পর রাত আসে। চাকা ঘুরছে কোথাও। তারই ছন্দে আলো আর ছায়া, হাসি আর কান্না, সুখ আর দুঃখ, জন্ম আর মৃত্যু আবর্তিত হচ্ছে। বিজন মিত্তির সুখে ছিলেন, এখন দুঃখে আছেন। কিন্তু চাকা তো থেমে থাকে না, বিজন মিত্তিরের এ দুঃখও একদিন বিগত হবে, নিশ্চয়ই আবার তাঁর জীবনে সুখের জোয়ার হাস্যোচ্ছল শব্দ করে ফিরে আসবে। এমনি ভেবে ভালো লাগল।

মাস কয়েক বাদে। আমরা তখন পুজোর জন্য দু'টি নাটকের মহলা চালাচ্ছি। 'দুই পুরুষ' আর 'পাণ্ডব-গৌরব।' কি এক ছুটি উপলক্ষে সেদিন দুপুর থেকেই আমরা হারুদা'দের হল-ঘরে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম চা গিলে 'এনার্জি'কে অব্যাহত রাখছি। প্রায় সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ আমাদের নাটকের সবচেয়ে নাটকীয় দৃশ্যগুলোও ম্লান হয়ে গেল।

হঠাৎ বিজন মিত্তির এসে ঢুকলেন আমাদের রিহার্সাল ঘরে। মুখে চুরুট জ্বলছে।

"অনেকদিন আসিনি ভায়ারা—তাই এলাম—"

[শেষাংশ ৫৫৭ পৃষ্ঠায়]

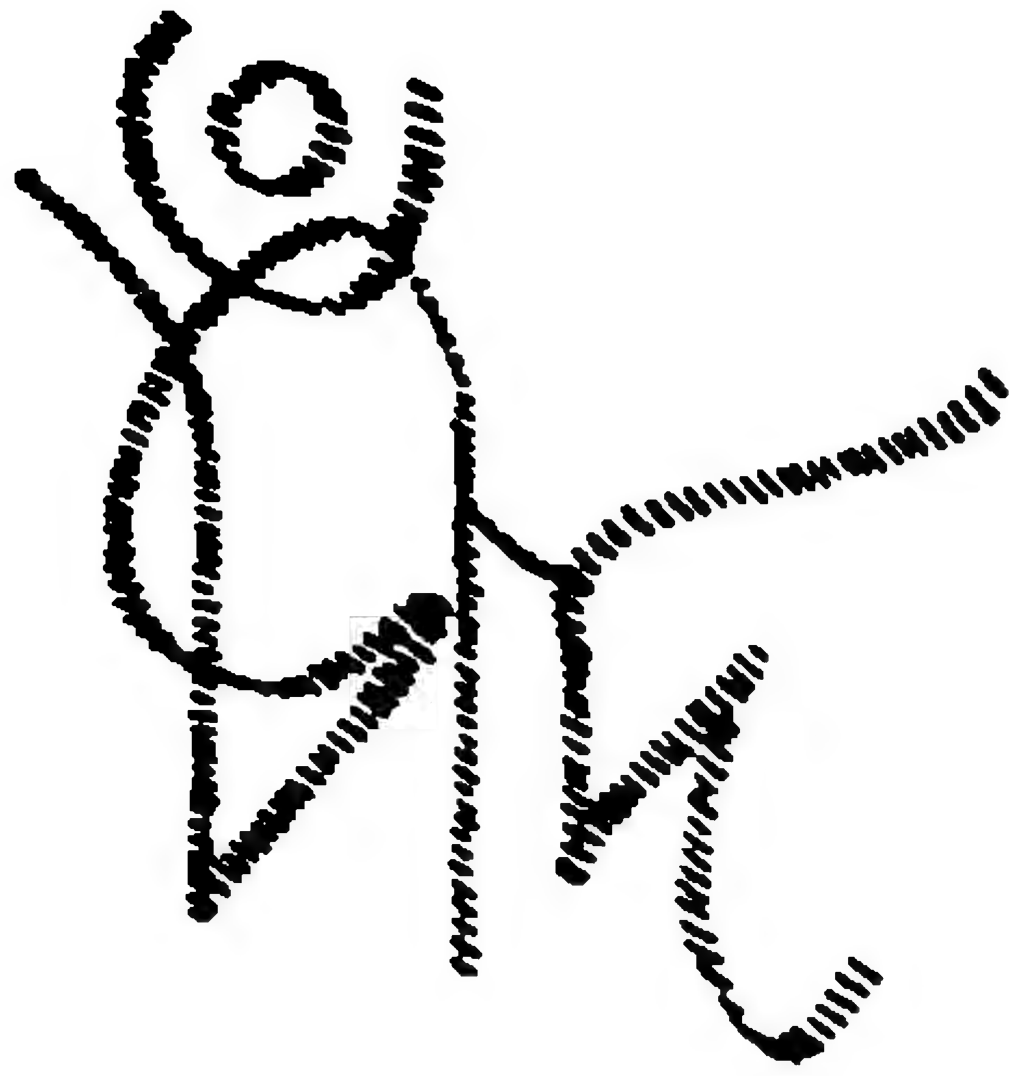

সুচরিতাসু,

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে হঠাৎ এই চিঠিটা পেয়ে তুমি খুবই আশ্চর্য হবে হয়ত। তিন বৎসর,—ভেবে দেখলে সময়টা দীর্ঘই বটে, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি. কেমন করে যে এই সময়টা আমার এখানে কেটে গেল. ভেবেই পাই না। একটা অফিস থেকে আর একটা অফিস, এমনি করে সারাটা দাক্ষিণাত্য আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে এলো। তিনটা বৎসর যেন শুধু ট্রেন বদল করতে করতেই গেল কেটে।

যাক্‌, শুনে সুখী হবে, সম্প্রতি ট্রেন বদলের পালা বোধহয় শেষ হ'ল। বোম্বের একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছি আমি, অফিসের পাশের ফ্লাটেই আমার ঘর।

আমার ঘরের একটা দেয়াল একেবারে কাঁচেরই বল্‌তে পার। আর তার কাঁচের পাল্লাটা সরিয়ে দিলেই সেটা একটা বিরাট জানালায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। জানলার ধারে একটা কৌচে আমি বসি —আর ভাবি। হাঁ, ভাবি বই কি। একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, টাকাগুলো কিভাবে খাটালে আয়তনে বেড়ে যায়, কিভাবে ব্যয়টা কমালে আয়টা বেশি হয়, এসব যথেষ্ট ভাবতে হয় বই কি।

আজ, এখন, একটা বেশ মজা হয়েছে। রাত প্রায় বারোটা,—ঘুমটা হঠাৎ গেল ভেঙে। চেয়ে দেখি. শুয়ে আছি জানলার ধারে সেই কৌচটাতেই। আর জানলাটাও রয়েছে খোলা, আকাশটা আলোয় আলো—অবারিত জ্যোৎস্নার প্লাবন। তোমায় মনে পড়েছে···তিন বৎসর আগে দেখা একটা ছবি। তোমারই ঘরের জানালায় বসে ছিলে। শুক্লা সন্ধ্যার রাত। চুলগুলি এলিয়ে দিয়েছ আঁচলটা লুটাচ্ছে পায়ের তলায়, ডান হাতের ওপর মাথাটা একটু হেলিয়ে তুমি চুপ করে চেয়ে আছ আকাশে। নিজেকে ভুলে গিয়েছিলে তুমি তখন, দেখতে পাওনি তুমি কী সুন্দর! তুমি নিজেই

অবিশ্রান্ত লিখে চল্‌বার পর হঠাৎ এক সময়ে সামনের জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুলে ফেলল নীলিমা, কালো আকাশটা রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত ঝুলে আছে! আলো নেই। সামনের ফুল বাগানটা কালো হয়ে ঘুমুচ্ছে, জানালার কাছে বেঁকে একটা গাছের পত্রবিরল শুক্‌নো ডাল।

কলমটা রেখে দিলো। ভালো লাগছে না নীলিমার। এই কঠিন অন্ধকার। অপসারিত ক'রে এখন যদি জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে যেত এখানে. তাহলে ভারী সুন্দর হতো, ফুল বাগানটা স্বপ্নে জেগে উঠত আর নীলিমা লেখবার টেবিলটা ছেড়ে উন্মুক্ত জানলায় এসে বসত চুলগুলি এলিয়ে দিত, আঁচলটাকে লুটিয়ে পড়তে দিত, আর ডানহাতটার ওপর মাথাটা একটু কাৎ করে রেখে সারা শরীরটাকে শিথিল আলস্যে ভরিয়ে দিত!

কিন্তু আলো নেই, আকাশটা কালো, বোধহয় কোন কৃষ্ণপক্ষের রাত, টেবিল থেকে লেখবার সরঞ্জাম একটু সরিয়ে দিয়ে সুমিত্রর চিঠিটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলে নীলিমা। আর একবার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলে সে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানতে না। তোমার দু'গাছি চুড়ি পরা হাত দুখানি কী চমৎকার তোমার কালো চুলের অরণ্য কী গম্ভীর আর কী রহস্যময়! আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিলাম, বসেছিলাম তোমার পাশে, তুমি ত বাধা দেওনি। বলেছিলে,—

"মিতা!"—

আমি উত্তর দিতে পারিনি! তুমি হয়ত মৃদু একটু হেসেছিলে, বলেছিলে, "রাগ করো না সুমিত, আজ থেকে তুমি হলে আমার "মিতা।"

আমার মনে আছে, আমি উচ্ছ্বসিত সমুদ্র দেখেছি। দেখেছি অন্তহীন রহস্যগভীর জ্যোতির্নীল মহাসাগরের রূপ! আর দেখেছি বলেই একদিন তোমার নাম দিয়েছিলাম, "নীল"। তুমি উচ্ছ্বসিত হেসে উঠেছিলে এর উত্তরে মনে আছে।

তুমি রাগ করো না, আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। তোমাদের বাসায় ছোট্ট ফুল বাগানটায় আমরা বেড়াতাম। আচ্ছা, সেই অপরাজিতার মণ্ডপটা এখনও আছে ত? মনে আছে, একদিন ওর তলায় দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আমার মাথায় ঝরে পড়ল একটা ফুল। আজ জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই অপরাজিতার মণ্ডপের তলায় গিয়ে দাঁড়াই তাহলে আমার ওপর এখন আর একটা ফুলও কি ঝরে পড়বে না?

ইতি তোমার "মিতা"

চিঠি শুদ্ধ হাতখানা টেবিলের ওপর নেমে এলো। এ পাশে ও পাশে দরকারী খাতাপত্র গুলো ছড়িয়ে আছে। বিগত অধিবেশনের যে রিপোর্টটা লেখা হচ্ছিল প্রবাসী সেক্রেটারী মিঃ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে সেটা এখোনো শেষ হয়নি। মিস্ লতিকা রায় এক মাসের ছুটি চেয়েছেন তাঁর বিবাহের জন্য, তাঁর মঞ্জুর পত্র ছোট লেখবার প্যাডটার প্রথমপৃষ্ঠায় অর্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে আছে। মিঃ ও মিসেস নাগ ম্যানেজিং কমিটি থেকে অবসর নিতে চান, সে খবরটাও কাগজে কলমে প্রেসিডেণ্টকে জানাতে হবে। স্কুল থেকে এবার বোধ হয় দুই ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাবে, সে খবরটাও সঠিক জানা হল না। স্কুলের সঙ্গে কিছু কিছু কলেজের ক্লাস খোলবার চেষ্টা চলছে তা নিয়ে অনেক লেখালিখি অনেক পরিশ্রম সম্পূর্ণ বাকী। ও নীলিমার আজ অনেক কাজ।

— অনেক কাজ।

মিতা এই বিরাট কাজের ফাঁকে একবার তোমায় দেখে আসতে ইচ্ছা করছে। তুমি শুয়ে আছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাথার চুলগুলি ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছে, তোমার বুকের মাঝে নরম জ্যোৎস্না খেলা করছে,—তোমার মোটা মোটা আঙ্গুলের ফাঁকে চুরুটটা আপনা আপনি নিভে যাচ্ছে। আর তুমি চুপ চাপ চেয়ে আছ।

"ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্"-রুদ্ধ দরজায় করাঘাত বেজে উঠল।

"কেরে!"

"আমি গো দিদিমণি দরজা খুলুন।"

"ও, ঝি? কী বলছিস্"—দরজাটা খুলে দিলে।

"এই দেখুন গো দিদিমণি কে এসেছে।"

একটি মেয়ে, মাথায় ছোট্ট একটু ঘোমটা। নীলিমা খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর সহাস্যে বলে উঠল, "আরে তুমি, কমলা! তোমাকে যে চেনাই যায় না। বিয়ে হলো কবে তোমার? ভালো আছ ত? ঘরে এসো।" কমলা ধীর পায় ঘরে এলো। পুরনো ছাত্রী। সিঁথিতে তার সিঁদুর, হাতে তার শাঁখা। আমি ওকে বলেছি,—"কমলা, আর যাই করো নিজেকে বিসর্জন দিও না,—নিজেকে শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যক্তিত্বে উত্তরোত্তর দৃঢ় করে তোলো।" কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি ওকে ভুল বলেছি। না না দরকার নেই। কি হবে শুধু এই নিরস্ত্র এম্বরাজ্যের মধ্য দিয়ে পদচারণা করে? তার চেয়ে ওরা বিয়ে করুক। ওদের যেন কারুর ছুটির জন্য মঞ্জুর পত্র লিখতে না হয়, কোন সেক্রেটারীকে রিপোর্ট না পাঠাতে হয়, কোন প্রেসিডেণ্টকে

যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখতে না হয়,—তার চেয়ে ওরা বিয়ে করুক।

ফোনটা ঝনুঝনু করে বেজে উঠল। মিস্ লতিকা রায়। তার ছুটির মঞ্জুর-পত্র এখনো পান নি তিনি আজ ছয়-ছয়টা দিন ঘোরাঘুরি করেও। কালই তাকে রওনা হতে হবে নাকি দার্জিলিঙ, সেখানেই বিয়ে হবে ওদের। নীলিমাদি যেন দয়া করে ও কাজটা আজ রাত্রেই শেষ করে রাখেন। কাল সকালেই তিনি আসবেন নীলিমাদি'র কাছে।

ওদরজা দিয়ে ঝি আবার এলো। হাতে একটা ক্ষুদ্র কাগজ। সেক্রেটারী-বাবুর বাসা থেকে চাকর দিয়ে গেল কাগজের টুকরোটা এইমাত্র। নীলিমা হাতে নিলো। সেক্রেটারী মিঃ চৌধুরী আজ কলকাতায় ফিরেছেন। অনেক-দিন স্কুলের খবরাখবর পান না তিনি। কাল যেন মিস্ নীলিমাদেবী রিপোর্টটা দয়া করে অতি অবশ্য দাখিল করেন। সর্বনাশ, এরই মধ্যে! এখনও যে অনেক কাজ বাকী! টেবিলের আলোটা আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে নীলিমা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। আজ তাকে সব কাজ শেষ করতে হবেই।

হাতের কাজগুলো যখন শেষ হলো, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। নীলিমা মুখ তুললে, হাতটা আড়ষ্ট আর শক্ত হয়ে গেছে,—ঠিক যেন একটা যন্ত্র।

রাত নয়টা,—আকাশটা কালো। টেবিলের একপাশে সুমিতের চিঠিটা পড়ে আছে। ওকে একটা উত্তর দিতে হবে, অন্তত দেওয়া উচিত।

শুনছ, মিতা, ভারী ক্লান্ত লাগছে নিজেকে এখন। ভারী ক্লান্ত। একটা দিনের কথা মনে পড়ছে আমার। 'এম-এ'-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছি বলে তুমি এসেছিলে অভিনন্দন জানাতে। সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। আমার এই ঘরখানাতেই তুমি এসেছিলে। বলেছিলে একটি অতি সাধারণ কথা,—নর যা' চিরকাল নারীকে বলে এসেছে। আর তারি উত্তরে ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ আমি অনর্গল হেসে উঠেছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে সেদিন ভয়ানক হাস্যকর ঠেকেছিল। তোমায় বোধহয় একটু তিরস্কারও করেছিলাম। আর তারই পরে তুমি অকস্মাৎ সরে গেলে আমার কাছ থেকে।

আকাশটা এখনও কালো। টেবিলে লেখ্‌বার প্যাড্‌টা খোলা। লিখ্‌বো নাকি এখন একখানা চিঠি সুমিতকে? পরে হয়ত সময়ই হবে না। হাতটা কেমন আড়ষ্ট আর শক্ত হয়ে আছে,—একটা বিকল যন্ত্রের মত। এ যন্ত্র থেকে কি উত্তর বেরুবে এখন? তার চেয়ে চিঠিটা সে মনে মনে ভেবে রাখুক, কাল সকালে সময় করে তাড়াতাড়ি লিখে দিলেই চলবে। কিন্তু কী লিখ্‌বে সে?

মিতা, তোমার সংবাদ পেলাম। জানতে চেয়েছ, আজ তুমি যদি আমার বাগানটার সেই অপরাজিতার মণ্ডপের তলায় এসে দাঁড়াও, একটি ফুল তোমার ওপর ঝরে পড়্‌বে কিনা। চুপি চুপি জানিয়ে রাখি,—পড়্‌বে···সেদিন কোন কাজে একটা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এমারজেন্সী ঘরে হঠাৎ একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ে গেল। একটা লোক গাড়ি চাপা পড়েছে বুঝি,—তাকে ঘিরে অনেকগুলি ডাক্তার, আর সেই আহত লোকটি অসহ্য বেদনায় নীল হয়ে গেছে।···তুমি আমায় নাম দিয়েছ 'নীল', ঠিকই নাম তুমি আমার দিয়েছ মিতা, আমি নীল, আমি নীল আমি।

"ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌" দরজায় শব্দ।

এবার নীলিমা একটু বিরক্ত হল। দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী, ঝি, কী বলছিস?"

"বলি, তুমি খাওয়া দাওয়া আজ করবে না দিদিমণি? নতুন ঠাকুরটা সেই থেকে খালি গজ গজ করছে।"

একটু থামলে নীলিমা বললে, "চল, যাচ্ছি। আর দেখ্‌, ঝি, ঋণ্টুটাকে দিয়ে ঐ জানলার পাশে টেবিলটা সরিয়ে রেখে ক্যাম্পখাটটা পাতিয়ে রাখ্‌ত। আমি আজ ওখানে শোব।"

"আচ্ছা, সে আমি রাখছি, তুমি এখন যাও ত, কিছু মুখে দিয়ে এসো।"

নীলিমা একটু দাঁড়ালো, তারপরে নীচে নেমে এলো খাবার ঘরে। এই ঘরটা একেবারে রাস্তার ধারে। কলকাতার গতি স্পন্দন বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায় এখান থেকে। ট্রাম আর বাস আর মোটর, সর্বক্ষণ একটা একঘেয়ে শব্দ রাস্তাটায়।···আশ্চর্য, এমন কি পাশের কোন বাড়িতে কেউ গান গাইছে? কেমন একটা গানের সুর ভেসে আসছে না? নীলিমা কান পাতলো। ঐ আবার একটা ট্রাম এলো বুঝি রাস্তায়,—তারই ঘর্ ঘর্ শব্দ। নীলিমা উৎকর্ণ হয়ে রইল। ট্রামটা চলে গেল, রাস্তাটা নীরব। পাশের বাড়ির গানটা স্পষ্ট হয়ে এবার ভেসে এলো। কে যেন গাইছে গুরুদেবের সেই বিখ্যাত গানটা:—"কী বেদনা মোর জান, সে কি জানো, ওগো মিতা মোর অনেক দূরের মিতা! আমার ভবনদ্বারে রোপণ করিলে যারে,

সজল হাওয়ায় করুণ পরাণে
সে মালতী বিকশিতা
ওগো সে-কি তুমি জানো?
তুমি যার সুর······"

আর শোনা গেল না, একটা ট্রাম না বাস এসে পড়ল বুঝি আবার, তারই প্রচণ্ড আর্তনাদ, আর কিছু নয়।

খাওয়ার পর ধীর পায়ে ওপরে এলো নীলিমা। ওর ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে ঝি কার সঙ্গে কথা বলছে। নীলিমা এগিয়ে এলো।

"কে—রে, ঝি?"

"এই যে দিদিমণি। চিনতে পারছ না, আমাদের সেই ঠাকুর, দেশ থেকে ফিরে এসেছে।"

"ও, কবে এলে ঠাকুর? ভালো আছো ত?

ঠাকুর প্রণামে নুয়ে এলো, বললে, "হ্যাঁ, দিদিমণি।"

পুরণো পাচক ব্রাহ্মণ। সঙ্গে ফুটফুটে একটা ছোট্ট ছেলে, তার দিকে তাকিয়ে নীলিমা বলে উঠল,—"এটি কে ঠাকুর?"

"ওটি দিদিমণি, আমার ছেলে। দেশ থেকে এসেছে আমার সঙ্গে, আবার পরশু দিনই ওর কাকার সঙ্গে ফিরে যাবে।"

সুন্দর ছেলেটি, নীলিমার বেশ লাগল।

"তোমার নাম কি খোকা?"

খোকন লজ্জায় নুয়ে পড়ে, কি যে বলে বোঝা যায় না। নীলিমা হঠাৎ ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলে, "লেবেঞ্চুস নেবে খোকা, লেবেঞ্চুস? ছবি দেখবে, ছবি?"

অল্পক্ষণ তারপরই অবাধ্য খোকা বশ হয়। ঠাকুর আর ঝি দরজা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে, নীলিমার কোল ঘেঁসে খোকা বসেছে একহাতে তার এক বাক্স লজেন্স—আর নীলিমা দেখাচ্ছে তাকে ছবি। একটা ফাইল বের করেছে নীলিমা—তার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর ছবি। খোকা উৎসুক দুটি চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর।

"এটা কি, এটা?"—একটা ছবি খোকার খুব ভাল লেগে গেল হঠাৎ।

"এটা?"—নীলিমা ছবিটা ভালো করে মেলে ধরলে।

ম্যাডনার ছবি। কবে যে নীলিমা এটা কী ভাবে ফাইলে রেখে দিয়েছিল কে জানে?···হঠাৎ খোকাকে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে খোকাকে এগিয়ে দিলে তার বাপের কাছে।

জানালার ধারে ঝি বিছানা করে রেখে দিয়েছে। ওপাশে টেবিলটা রাখা হয়েছে সরিয়ে—সেই টেবিলটা। একরাশ বই খাতা-পত্র তার ওপর। ওঃ সুমিতের চিঠিটা লেখা হল না এখোনো, উত্তরও দেওয়া হল না তাকে। আর কবে সময় হয়ে উঠবে কে জানে, এখনই লিখবে নাকি সে চিঠিটা?—নীলিমা দরজার কাছে এসে ঠাকুরকে ডাক দিল।

"কি দিদিমণি?"

"তোমার যাবার পথে কি কোন ডাকবাক্স পড়বে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আরেকটু বসো ঠাকুর, তোমায় একখানা চিঠি লিখে দিয়ে দিচ্ছি,—বেশ জরুরী চিঠি।"

"বেশ ত। দিদিমণি আমি আর একটু বসছি।"

"হ্যাঁ, একটু বসো। চিঠিটা তোমার কাছেই দিয়ে দেই, কালকের ডাকেই চিঠিটা চলে যাক।"

"আচ্ছা।"

নীলিমা ফিরে এলো টেবিলে। আকাশটা কালো।...তুমি কি এখানে আবার একবারটি আসতে পারো না, মিতা ? তাহলে কিন্তু বেশ হয়।

অনেক-অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

"রিং-রিং-রিং-রিং !"—টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

"হ্যালো ! কে ?"

স্কুল বোর্ডিং থেকে মেট্রন মিসেস্ চপলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। নীলিমা রিসিভারটা ঠিক করে ধরলে,—"ও: আপনি ? কি খবর ?...কি বলছেন সুখবর ?...এবারে আমাদের শিপ্রা সেন থার্ড স্ট্যাণ্ড করেছে ? হ্যাঁ, আমি ত কানাঘুষা শুনেছিলাম বটে। আর অলকা মিত্র ?... ফিফথ ?...অথচ দেখুন ক্লাসে অলকাই বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে।...যাক, সুখবর নিশ্চয়ই, খবরটা প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন ? ভালই করেছেন।...ভাল কথা, সেক্রেটারী আজ কলকাতায় ফিরেছেন খবর পেলাম।...কি বলছেন...শিপ্রার বাবা রায় বাহাদুর মি: সেন আমায় এর জন্য অভিনন্দন জানাবেন ?...স্পেশাল টি পার্টি ? তাই নাকি ?...যাক, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।..."

শিপ্রা সেন আর অলকা মিত্র। নীলিমার সম্পূর্ণ নিজের হাতে-গড়া দুটি ছাত্রী। ওরা মেধাবী, উজ্জ্বল ওদের ভবিষ্যৎ—দেশ ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। নীলিমা যখন এমনি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে 'স্ট্যাণ্ড' করত, তখন একদিন মেধাবী নীলিমার কাছ থেকেও দেশ অনেক কিছু আশা করেছিল।

নীলিমা শিক্ষয়িত্রী। দেশের ভবিষ্যৎ বলতে গেলে ওদেরই হাতে। ওদেরি হাত দিয়ে বেরুবে শত সহস্র অলকা মিত্র আর শিপ্রা সেন, নীলিমাকে তাই হতে হবে কর্মকঠোর, হতে হবে নিয়মানুবর্তী, হতে হবে যন্ত্রের মতো শক্ত।

"দিদিমণি ?"

"কে ? ও, ঠাকুর ? তুমি যাওনি এখনো ? ওহো, এখনও ত চিঠিটা লিখে দিলাম না তোমায়। একটু দাঁড়াও পাঁচ মিনিট। আমি এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।"

নীলিমা প্যাডটা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বসল। সুমিতকে আজ একটা উত্তর না দিলে আর হয়ত সময় করে দেওয়াই হবে না। নীলিমাকে হতে হবে নিয়মানুবর্তী। লিখলো..."সুমিত তোমার চিঠি পেলাম। একটা সুখবর তোমায় জানাই। কিছুদিন হলো আমি প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়েছি। শুধু তাই নয়, 'বি-টি'ও নেওয়া গেছে সম্প্রতি এবং এতেও ফার্স্ট ক্লাশ। এর ওপর হয়ত কর্তৃপক্ষ আমাকে ইউরোপও পাঠাতে পারেন সু উচ্চ একটা ডিপ্লোমার জন্য। স্কুলের সঙ্গে কলেজও খোলার কথা হচ্ছে কি না !

তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছ, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আমার হাতে সময় বড় অল্প। আমাদের বাড়িটার সামান্য একটু পরিবর্তন করা গেছে-গেলো বছর বাবা মারা যাবার পর। হ্যাঁ, বাবা আর বছর মারা গেছেন এবং তারই ফলে এখন ব্যাঙ্কের একটা মোটা অ্যাকাউন্ট জমে আছে আমার জন্য।

আমার স্কুল থেকে এবার দুটি মেয়ে বিশ্ববিভালয়ে 'স্ট্যাণ্ড' করেছে, ইতিপূর্বে এ স্কুলে এ ব্যাপার আর ঘটে নি। সকলে বলছে কৃতিত্বটা নাকি আমার। তোমার কি মনে হয় ?...যাই হোক, বেশ ভালো লাগছে আমার এই জীবনটাকে, প্রচুর

উৎসাহ পাচ্ছি। এর পরে হয়ত আমায় আরও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। অনেকগুলো পার্টির আভাষ পাচ্ছি। তাই তাড়াতাড়ি তোমার উত্তর দিয়ে দিলাম। কিছু মনে করো না, বড় ব্যস্ত, ইতি—নীলিমা।,

চিঠিটা একটা খামে পুরে ঠিকানা লিখলো, তারপর তুলে দিলে ঠাকুরের হাতে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এলো জানালার ধারে ক্যাম্পখাটের ওপর পাতা বিছানার কাছে।

আকাশটা কালো। রাত কত কে জানে। নীলিমা এখনই শুয়ে পড়বে। কাল আবার অনেক কাজ। সেক্রেটারীবাবুর বাড়িতে যেতে হবে একবার, তারপরে মিঃ ও মিসেস্ নাগের বাড়ি, তারপরে প্রেসিডেন্ট, আর তারপরে স্কুল। ওঃ মরবার ও ফুরসৎ নেই যে! নীলিমা বড়ো ব্যস্ত।……

শেষ রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠল, কালো আকাশের যবনিকা উঠে গেছে। চাঁদ এলো নীলিমার-জানালায়-নীলিমার ঘরে। সামনের ফুল বাগান স্বপ্নিল। আর নীলিমা ঘুমিয়ে আছে তার বিছানায়, জানালার পাশে। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, আঁচলটা শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার ডান হাত খানার ওপর মাথাটা একটু কাৎ হয়ে পড়েছে, সারা শরীরটা শিথিল আলস্যে ভরিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে ঘুমন্ত মুখ খানি ফেরানো। চুপিচুপি চাঁদ উঠল, সরে গেল, হেলে পড়ল, ডুবে গেল। নীলিমা টেরও পেলো না।

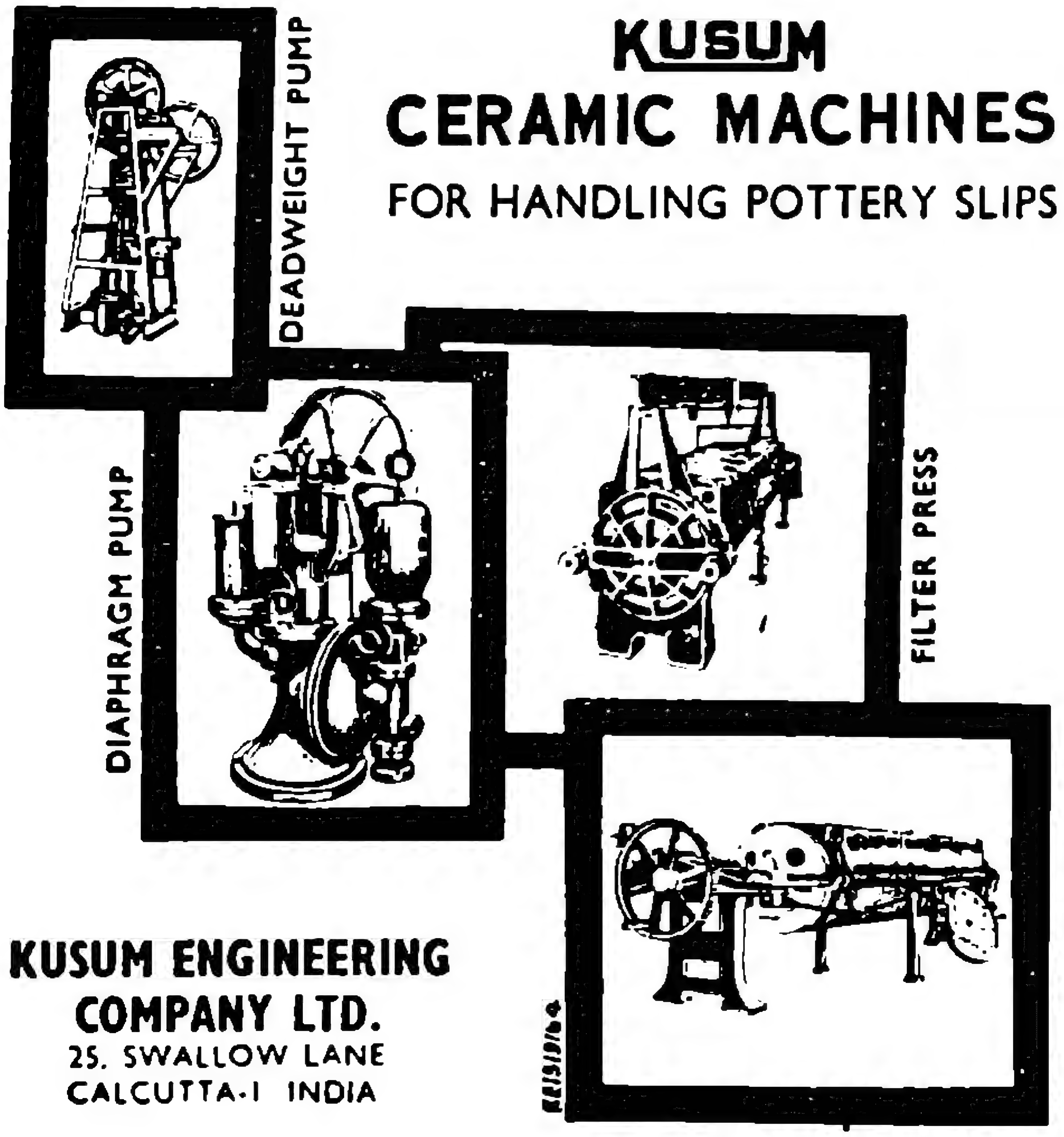

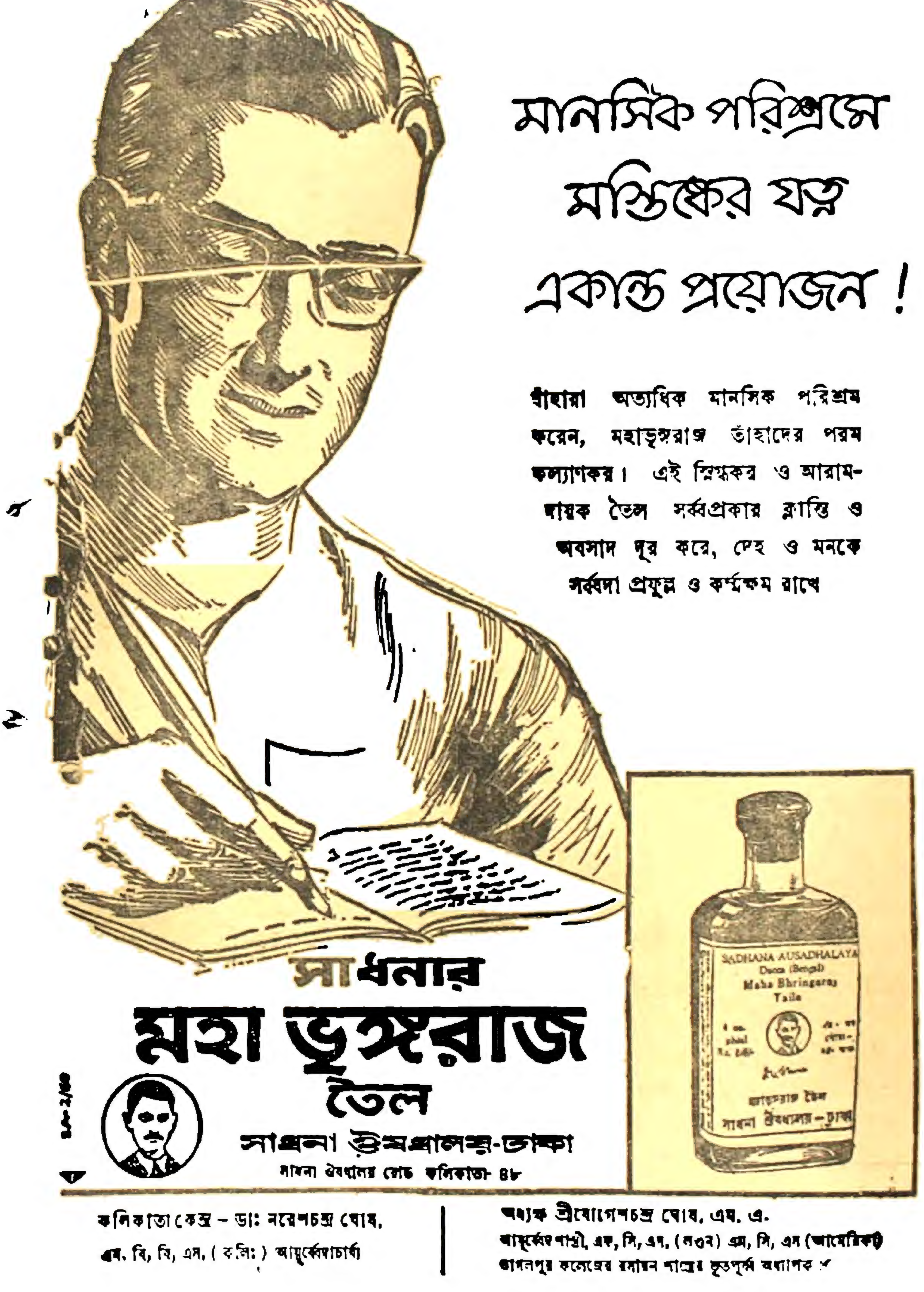
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

INDUSTRIES CORPORATION OF BENGAL LTD.
60/1, HAZRA ROAD
CALCUTTA-19

DYERS AND BLEACHERS
OF
KNITTED FABRICS

SHIVMONI & CO.
PIPE MERCHANTS

29. STRAND ROAD,
CALCUTTA-1

বেলাভূমি

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

ঝাউয়ের পাতায় পাতায় বাতাস দোল দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটি শব্দও ছড়িয়ে পড়ছিল—আমরা শোনা না-শোনার মধ্যিখানে মন রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম। ছিলাম অনেকক্ষণ। কারণ মাঝ-দুপুরের সমুদ্রতীরের মতনই আমাদের মনের ভেতরে কেমন এক নির্জন নৈঃশব্দ্য খাঁ খাঁ করে যাচ্ছে। শুকনো বালিয়াড়িতে তখন বাতাস ঝাপটা মেরে যাচ্ছিল।

এখন সময় কত? আমরা ঘড়ি দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ যার যার হাতঘড়ি যেন ভয়ের বস্তু; তাকালেই ওরা বলবে সময় চলে যাচ্ছে, দেখ। অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এবং তখন নিশ্চয় ঘড়ির কথামতন আমরা সময়ের হিসেব করতে বসতাম।...কখন সে গিয়েছে, এখন ক-টা বাজে। অতএব একটি ব্যবকলনের ব্যাপার। অঙ্কটি নিখুঁত করে কষার পর যখন ফল বেরতো—সেই ফল অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের সংখ্যাটি তখন আমাদের সকলকে ভাবিয়ে তুলত। তখন নিশ্চয় আমরা কেউ কেউ বিমর্ষ হতাম। কারণ সে যে গিয়েছে, সেই কখন, সকাল ফুটবার খানিক বাদে—তারপর সে আর ফিরে আসে নি।

ঘড়ি আমরা দেখছি না। কিন্তু আমাদের মাথার ওপর আকাশ রয়েছে। সেখানে কোন্ ভোরে যেন সূর্য উঠেছিল। তারপর একে একে এক আধ ইঞ্চি করে করে সূর্য দিগন্তের মোহ কাটিয়ে উঠে আসছিল। তার সামনে বিশাল নীল সাগর। ঘন নীল। একটি কিশোরী, হয়তো বা যুবতীর মতন সে এই নীলের রাজ্যটি পাড়ি দেবে। জলে নেমে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে সে থৈ থেকে অথৈ জলের দিকে এগিয়ে যাবে। সাঁতরাবে··সাঁতার কাটবে—নীল জলে মুখ গুঁজে সে দু'টি প্রশস্ত হাতে-জল কেটে ছুটবে ওপারের দিকে। কারণ ওপারের অজানা রহস্য সম্ভবত তাকে ডাকে, নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে: আয়··আয়··· আয়··

না, আমরা ঘড়ি দেখছি না। দেখছি না ভয়ে। আকাশ দেখছি না, দেখছি না ভয়ে। কারণ ওখানে বিশাল একটি নীল অঙ্গন আছে, আর আছে সূর্য; এই মুহূর্তে যাকে আমরা যুবতী মেয়ে বলে ধরে নিয়েছি।

জগ, আমাদের পাঁচ বন্ধুর একজন, আসল নাম জগৎ—সে এতক্ষণে একটি সিগারেট ধরাল। আমরা জানতাম না। যেন ঝাউ গাছের নীচের ছায়ায় বসে আমরা সকলে তন্দ্রার আরাধনা করছিলাম। এমন সময় ফস্ করে যে শব্দটি হ'ল সম্ভবত তা জলের নয়, এ-কথা ভেবে নিয়ে আমরা চমকে তাকিয়ে এক টুকরো উজ্জ্বল আলো দেখলাম। তাকালাম সকলে, কথা বলিনি কেউ। আমরা জগতের সিগ্রেট খাওয়া দেখছিলাম।

জগৎ পর পর ক-টি টান দিয়েছিল সিগ্রেটে। না গিলে গলগল করে কয়েক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ও সিগ্রেটের টুকরোটি ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর সব কটি বন্ধুর মুখ দেখে সে ভীষণ বিরক্তের অব্যয় প্রকাশ করল। যেন আমাদের এই অপেক্ষা, ভাবনায় ভাবিত হওয়া কি দুশ্চিন্তা অর্থহীন। যে গিয়াছে সে আসুক না-আসুক আমাদের এই গায়ে পড়া মাসি-দরদের কোনো মানেই নেই।

মানে সত্যিই থাকত না, যদি না আমরা তাকে দেখতাম। চিনতাম। সর্বোপরি যদি না সেই একটি দিন স্মৃতি হয়ে আমাদের মনে বেঁচে থাকত। ওই একটি দিনই এখন,

আমাদের সকলের কাছে সম্ভবত গোটা জীবনের মতন মনে হচ্ছিল।

পাঁচটি হাতঘড়ির শব্দ বাজছিল আমরা শুনছি। মাথার ওপরে আকাশ আছে আগে দেখেছি, এখন অনুভব করছি তবু তাকাতে পারছিলাম না। সামনের প্রশস্ত বালুবেলা তারপর সীমাহীন আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র আমাদের চোখ এবং মন কেড়ে নিয়েছিল। চোখ বুজলে অন্ধকার, মেললে কেবল সমুদ্র আর বলিয়াড়ি চোখে পড়ছিল আমাদের। ঝাউগাছের নীচের ছায়াটুকুও মাঝে মাঝে দেখতে হচ্ছিল আমাদের, কারণ আমরা বীথির তলায় বসে সাগরে চোখ রেখে ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলাম। আমাদের দেখা বন্দরা, ঘড়ি বা সূর্য না হওয়া সত্ত্বেও সময় সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করছিল, করে যাচ্ছিল।

গোটা সাগরবেলা আমাদের সামনে। বসে থাকা অনেক সময়ের মধ্যে আমরা কি করেছি? কিছু না। মোটা দানার বালুবেলায় যত স্বর ছিল, ঢেউ ছিল, বাতাসে ওড়া বালিতে অনেক পদচিহ্ন ঢেকে ফেলা সত্ত্বেও যা এখনও অর্দ্ধ জাগরিত তার সবকিছু যেন আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত এলাকাটা ধু ধু করছে। দুপুরের চড়া রোদে অভ্রের টুকরোর মতন বালিকণা ঝিকমিক করছিল। সেই ঝিকমিকে দ্যুতির আভা এত প্রখর যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রোদ যেন লোভীর মতন ওই দ্যুতি প্রসারিত জিহ্বায় চেটে নিচ্ছে।

'আমায় একটা সিগ্রেট দে…'কাঞ্চন তার ডানগালে ঝুলে পড়া ক-টি লম্বা চুল ডান কানের পাশে গুঁজে দিতে দিতে বাঁ হাত মেলে ধরেছে জগতের সামনে। 'এতক্ষণ ফেরা উচিৎ ছিল।' গুটনো ফু'পার একটি টানটান করে মেলে দিল কাঞ্চন। 'বাস্তবিক খানিক আগেও ভাবা যায়নি এত দেরি হবে।'

'আমি তো বুঝতে পারছি না কিছুই।' প্রদোষ গায়ের আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল। 'আমরা শালা যেন পিঞ্জরে পড়েছি। অথচ এর কোনো মানেই হয় না….'

'তুই চুপ কর।' ভব, যার পোশাকী নাম ভবানীশঙ্কর সে কুপিত গলায় ধমক দিল। 'সেই কখন থেকে তুই বকবক করে যাচ্ছিস। লাইক এ হার্টলেস বীষ্ট! দয়া মায়া মমতা যদি না থাকে, তবে সেটা কি মানুষ? না। জন্তু।…'

'শুধুই দয়া মায়া..? আহা!' জগ ভবানীর দিক তাকিয়ে জিভে অদ্ভুত শব্দ করল। 'প্রেম বললি না ভাই ভব। কোন মহাপুরুষ যেন বলেছিল, প্রেম আছে বলেই মানুষ মানুষ, সে অমানুষ না।' জগ হাসছিল, 'আর একবার সেই মধুময় বাণীটি শোনা না ভাই… ।'

আমরা কি তবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি? হাঁা, উঠেছি। কারণ সমুদ্রকে সাক্ষী করে আমরা যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। পণ করেছিলাম আমরা একসঙ্গেই। না জেনেও। নইলে, এখন এবং অনেকক্ষণ ধরেই গোটা সমুদ্র-পার জনশূন্য। কেউ নেই কোথাও। কেবল আমরা, আমরা পাঁচবন্ধু তার ফিরে আসা দেখব দেখব করে অনেকক্ষণ রোদে ঘুরেছি। অ-নেকক্ষণই। খানিক আগেও রোদে তেতে গিয়ে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, যেখানে সাগরের উত্তাল ঢেউ সগর্জনে আছড়ে পড়ছিল বালির ওপর। আমাদের পায়ের পাতার ওপর লোনা নীল জলের ঢেউ অনেক সময় ধরে মাথা কুটেছিল। সে গর্জনের শব্দ এত প্রচণ্ড যে আমরা কে কোন কথা বলছিলাম, তা সঠিক শোনা যায় নি।

জল থেকে উঠে এসে ঝিনুক কুড়োতে লেগে গিয়েছিলাম আমরা। বালির ওপর আঁকা ঢেউরেখা ধরে ধরে আমরা অজান্তে অনেকদূর এলাম। অনেকদূর। কোঁচরে কোঁচরে তখন স্তূপীকৃত ঝিনুক জমেছে। মনের অগোচরে আমরা পাঁচবন্ধু এই বোঝা কেন যে তুলে নিয়েছিলাম তা ভাবি নি। পরে, যেমন খেয়ালে সঞ্চয় করেছিলাম ঠিক তেমনি খেয়ালেই সব ছড়িয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হবার পর আমরা দূরের এই ঝাউ-বনের ছায়ায় এসে বসেছি। প্রখর রৌদ্রতাপ এবং ক্লান্তি আমাদের এখানে এনেছে।

এখানে আমরা খুব নিরিবিলির মধ্যে বসে আছি। ছায়ায়

বসে রোদে-পোড়া বিশাল সাগরবেলা দেখছিলাম। অদূরে পতাকা-পীঠ। সিমেন্ট করা বেদীর ওপরে লম্বা একটি লোহার পোষ্ট। তার মাথায় আমাদের জাতীয় পতাকা। কাঁটাতার দিয়ে জায়গাটুকু ঘিরে রাখা হয়েছে ; বেদীর চার-পাশে গোল করে কিছু ফুলের চাষ করা হয়েছিল সম্ভবতঃ, এখন সেখানে কেবল মরা মরা গাছগুলোই আছে। পতাকা-পীঠ ছাড়িয়ে নীচের সেই রাস্তা। যে পথে একদা ভোর ভোর সকালে, দু' রিক্শায় পাঁচজন মানুষ আর সামানে মিলে আমরা সাগর-পারের ওই হোটেল-পাড়ায় এসে পৌঁছেছিলাম। এ-পাশে পতাকা-পীঠ, রাস্তাটা সামান্য বেঁকে যেখানে সোজা হয়েছে, তার ডানপাশে পুলিশের আউট-পোষ্ট। পরে সারি সারি ক-টি খড়ের ছাউনীঅলা বাড়ি – কম খরচের হোটেল। আরও সামান্য পথ এগিয়ে এলে দালান কোঠার সারি। প্রশস্ত রাস্তার গোটা ডানপাশ জুড়ে অগুন্তি কোঠাবাড়ি। ভদ্রলোকদের হোটেল। রাস্তার এ-পাশে গজ কয়েক বালিবিছানো জায়গা। তারপর সাগর। সমুদ্র। বিশাল নীল জলধি। পারাপার-হীন। যার শেষ নেই।

কিছুক্ষণ আমরা কথা বলেছিলাম। মস্করা বিদ্রূপ করেছি। এ ওর দিকে পারলে কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। কারণ আমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। ক্ষিদের টান তখন পেটে মোচড় মারছিল।

না, আমরা কেউ দুপুরের অন্ন গ্রহণ করি নি। সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও না। কারণ আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার ফিরে আসাটি দেখতে না পারলে আমাদের অরুচি ঘুচত না। একদিন দু'দিন করতে করতে আমরা এই নিয়ম মেনে নিয়েছিলাম যে, সে ফিরে এলে তবে আমরা অন্ন গ্রহণ করব। অজান্তেই আমরা এমন পণ কখন করে ফেলেছিলাম জানা নেই। অথচ আজ, আমাদের ধৈর্য বাঁধ মানছে না কিছুতে। সে এখনও ফিরে এল না—আমরা সমুদ্রের দিকে অসহায় চোখগুলি মেলে রেখেছিলাম।

আমরা আবার কথা ভুলেছিলাম। সবাই নির্বাক। মাথার ওপর চোখ তুলছি না। হাতঘড়ি দেখছি না কারণ আমাদের সকলের মনে কেমন এক শংকা বাস করে যাচ্ছিল। এবং সম্ভবতঃ আমি ভাবছিলাম, এই শংকা পরিবেশের জন্যে। আমরা এমন জায়গায় বসে আছি, যেখানে জনমনিষ্যি নেই। বন কি বনানী অথবা অরণ্যও বলা চলে, কারণ হোটেল-পাড়া থেকে অনেকটা দূরে এই ঝাউবীথি। ঝাউবন। ঘন ঘন অনেক গাছ। কোনো কোনোটা গায়ে গায়ে লেগে আছে। বীথির সীমা অল্প নয়। ফলে আমাদের পেছনে ছায়া ঘন হতে হতে অন্ধকার হয়েছে। সামনে কেবল বিশাল বালিয়াড়ি আর সমুদ্র আছে। অদূরে ক'টি সাম্পান ধরনের নৌকা উবু করে রাখা। তার পিঠে কড়া রোদ চকচক করছে।

কিছুই আমাদের জানা ছিল না। আমরা এক ভোর ভোর সকালে 'সাগর শোভা' হোটেলে এসে উঠেছিলাম। একদিন দেখলাম এই মেয়েটিকে। সম্ভবত পরের দিন। গোটা সাগর সৈকতে একটি অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠেছিল। নীচু স্বরে লোকেরা অন্তরঙ্গের সঙ্গে ফিসফাস করে কি যেন বলছিল। কেউ কেউ আচমকা হল্লা করে উঠেছে। দূর থেকে কেউ কি সব মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে যাচ্ছিল। সকলের চোখ ওই এক দিকে। গোটা সাগর পারের ভিড়ের চোখ ওই একটি মেয়ের ওপর নিবদ্ধ। একটি চাপা হর্ষের ভাব আমরা লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু কিছুই জানা ছিল না আমাদের। কিছু না। এবং আমরা ভেবেও পাচ্ছিলাম না, কেন এই হর্ষ।

হোটেলের দিক থেকে আসছিল মেয়েটি। মোটা বুটিঅলা বাথটাওয়েলের লম্বা একটি ফুলহাতা গাউন তার পরনে। চুল টানটান করে বাঁধা। তার ওপরে শক্ত করে একটি ছোট ফাঁক-অলা নেট বেঁধেছে। পায়ে কিছু ছিল না। খোলা মুখ এবং পায়ের রঙ কালো। আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না, এত মানুষের দৃষ্টি এই মেয়েটির ওপর কেন পড়েছে। সে সুন্দরী

নয়, চেহেরায় স্বাস্থ্যে দর্শনীয় এমন কিছু ছিল না যে, তার ওপর থেকে চোখ সরবে না।

সে এগিয়ে আসছিল সমুদ্রের দিকে। একা নয়, সঙ্গে তিনজন লোক। এক সুবেশ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসছিল পেছনে। দু'পাশে দু'জন নুলিয়া। মিশকালো তাদের গায়ের রঙ। সাগর পারে ভিড়-করা অনেক জোড়া দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের চারজোড়া দৃষ্টিও যুক্ত হ'ল। আমরা তাকে আসতে দেখছিলাম। অবাক এবং বিস্মিত চোখে।

ওরা এগিয়ে আসছিল। ভিড় দু'ভাগে ভাগ হয়ে ওদের রাস্তা করে দিয়েছে। নানা মন্তব্য, ফিসফাস গুঞ্জন চাপা টিটকিরি, সিটি, এখানে ওখানে জটলা, চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা। মেয়েটি কোনোদিকে তাকায় নি। কোনোদিকে না। সে সোজা চলে এসেছিল। এসে থামল শুকনো এবং ভেজা বালির রেখার কাছাকাছি। আর আচমকাই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে সে গায়ের গাউনটা খুলে ফেলেছিল। মধ্যবয়সী সুবেশ ভদ্রলোকের হাতে সেটি তুলে দিচ্ছিল হাসিমুখে। তার সারা মুখে জয়ের গর্ব।

রঙ কালো, তবু দেহসৌন্দর্য তার ছিল। আর সে সৌন্দর্যটুকু সকলেই দেখতে পাচ্ছিল। কারণ তার পরনে সুইমিং কস্ট্যুম। কোমরের নীচে আটসাঁটো একটি জাঙিয়া। বক্ষে অদ্ভুত ধরনের একটি বাক্ষোবাসমাত্র। সারা শরীরের আর কোথাও বস্ত্র ছিল না। কোথাও না। দু' মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যে সে আমাদের বোবা প্রতিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি বড় ঢেউয়ের ওপারে। দু'পাশে দু'জন নুলিয়া তাকে অনুসরণ করেছে।

তখনও আমরা বোকার মতনই তাকিয়ে ছিলাম। এতক্ষণ যে অতৃপ্ত চোখেরা মেয়েটিকে দেখছিল, বালির সীমানা ছাড়িয়ে এখন সে-সকল চোখ জলে নেমেছে। সমুদ্রে। কারণ, মেয়েটি এখন জলে। কাছে না, বেশ অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। এবং দেখতে দেখতে, আমরা দেখলাম, শতখানের ফুট দূরে যাবার পরও সে ফিরছে না। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দূর থেকে মনে হচ্ছিল তিনটি কাৎলা মাছ মাথা জাগিয়ে জল কেটে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তিনটি মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম তখনও। ঢেউয়েরা ওই তিনটি মাথাকে কখনও তুলে ধরছে। কখনও লুকোচ্ছিল।

জগৎ খপ করে আমার হাত চেপে ধরেছিল। ওর হাতের প্রচণ্ড শক্তি আমি অনুভব করে যন্ত্রণার অব্যয় প্রকাশ করবার আগেই জগর কথা শুনতে পেলাম। 'অরু…' জগর গলা কাঁপছিল। তার মুখের অভিব্যক্তি কেমন হয়েছিল জানবার কথা নয়। কারণ সমুদ্র থেকে আমরা কেউ চোখ তুলতে পারছিলাম না। পরে, জগ কি বলছে জানি না। শুনি নি। কারণ কটি বিশাল ঢেউ পর পর এমন উচ্চগ্রাম শব্দের সঙ্গে পারে ভেঙে পড়েছিল যে, আমাদের শ্রবণশক্তি দু' মুহূর্তের জন্য বধির হয়ে থাকল।

তিন তিনটি কালো মাথা বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে। সমুদ্রের এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, কাণ্ডই বলা চলে যে, যেখানে সে পার পায়, আবহাওয়া শান্ত থাকলেও সেখানে চলে তার তাণ্ডব গর্জন। অনেকটা জায়গা জুড়ে তার ঢেউ নাচতে থাকে। সে ঢেউ উত্তাল উত্তরঙ্গ। অথচ আশ্চর্য, এই সীমাটুকু অতিক্রম করে গেলে শান্ত সমুদ্র পাওয়া যাবে। ভূগোলে মহাঢাল-এর কথা পড়েছি। এখন ভাবতে পারছিলাম শান্ত সাগরের যত তর্জন গর্জন তা ওই মহাঢালটুকুর ওপর। মেয়েটি, আশ্চর্য, দুপাশে দু'জন নুলিয়া নিয়ে মহাঢালের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। আরও পরে ওই তিনটি বিন্দু আমাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার যে, যতক্ষণ মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছিল, সে সিন্ধুর বিশাল বুকে লীন হয়ে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত গোটা সাগরবেলা স্তব্ধ। কথা বলছিল না একটি প্রাণীও। কেবল সেই একতারাটি বেজে যাচ্ছিল অদূরে। স্বপ্নের মতন

খানিক সময় কাটলে আমরা তার সঙ্গে একটি ভগ্নকণ্ঠের গানও শুনতে পেলাম। এতক্ষণ যারা স্থাণুর মতন দাঁড়িয়েছিল, এবার সে-চাক ভেঙেছে। লোকেরা চলাফেরা করছিল। কথাও বলছে। ভোর ভোর সকালে যারা স্নানে নেমেছিল, জল ছেড়ে তারা বালির ওপরে উঠে এসেছিল কখন। এখন আবার সাগর-স্নানে নেমে পড়েছে অগুন্তি লোক। ঢেউয়ে ঢেউয়ে আথালি পাথালি খাচ্ছিল অনেকে। শ্রান্ত হলে, শুকনো বালির ওপর সটান শুয়ে ওরা মেয়েটির কথা বলাবলি করছিল।

'দুঃসাহস!' মধ্যবয়স্কা এক মহিলা তার সঙ্গী ভদ্রলোককে বলছিল। 'মেয়েছেলের অত সাহস ভাল না।' ভদ্রলোক সম্ভবত স্বামী।

'তা ঠিক।' চুলে পাক-ধরা ভদ্রলোকটি হাতের লাঠি দিয়ে বালি খোঁচাচ্ছিল অন্যমনস্কভাবে। সঙ্গী মহিলার দিকে তাকাল এতক্ষণে। স্মিত একটু হাসির আভা তার মুখে। 'তবু তো সাহস আছে। আর পাঁচটা বাঙ্গালী মেয়ের মতন…'

'থাম থাম,' মহিলা তার পানের রঙে রঙানো ঠোঁট উলটে ফেলেছেন। ভুরু বেঁকে গিয়েছে। 'প্রশংসা আর ধরে না যে বড়।' খুব দ্রুতভাবে পান চিবোচ্ছিল মহিলা। 'তোমার ওই এক বাই; কুমারী মেয়েছেলে দেখলে …'

'আহ্, মনু!' ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছে। 'তোমার মুখে কি কিছুই আর আটকায় না?'

'না—।' মহিলা কাঁধের ওপর থেকে চাবির গোছা বাঁধা আঁচল টেনে নিয়েছে আচমকা। অযথাই গিট শক্ত করে আঁচলটি যথাস্থানে রাখল।' 'কেন আটকাবে? ক-দিন থেকে তোমার মুখে কেবল ওই মেয়েটির কথা। তবু যদি দেখতে সুন্দর হ'ত। কি ছিরি···যেন গাবগাছ থেকে নেমে এসেছে।…'

'ছিঃ!' ভদ্রলোকের মুখটি ঘৃণায় বেঁকে গিয়েছে। 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ…'

আমরা অনমনাভাবে হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম গোটা সাগরপার ভরে গিয়েছে মানুষে মানুষে। এই ভিড় আগে থোক-বাঁধা ছিল। এখন ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন বিচ্ছিন্নভাব। কোথাও জোড়া জোড়া বসেছে। কোথাও গোল হয়ে ছোটবড় একাধিক মানুষের জটলা। কেউ বা একলা শুকনো বালির ওপর ভেজা শরীর নিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

'আমার ঠাকুমা বলতেন বয়সের কাকটাও দেখতে সুন্দরী।' এক মহিলা খুব হাসছিলেন। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। পাশে দু'জন বাঙালী যুবক। তিনজনে মুখো-মুখি বসে আছে। 'বুঝলে সুমন, কথাটা সত্যি। তা নইলে ওই কুৎসিৎ মেয়েটা তোমাদের মজাত না…'

'ন্-না-না-না……' সুমন নামক যুবকটির কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। 'মজে যাবার প্রশ্ন তুলছ কেন শংকরী? আমরা অন্য দিকটা দেখছি…'

হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করে চিকণ গলায় হেসে উঠল শংকরী নামের সেই সুন্দরী যুবতী। 'তাই নাকি? অন্য দিক?' হাসতে হাসতে সরে এল যুবতী, সুমনের হাত ধরে ফেলেছে, 'কোন দিক, কোন দিক? বল না সুমন, প্লীজ…' যেন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে চাইছিল মেয়েটি।

দু'টি যুবকই থতমত। মেয়েটি তখনও হেসে যাচ্ছে।

ওদের মধ্যে দ্বিতীয় যুবক, যার নামটি উচ্চারিত হয়নি তার মুখে বিরক্তি।_ 'একে কিন্তু ভালগারিজম ছাড়া কিছু বলে না।' যুবকটি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

আচমকা হাসি থেমে গেল। 'কী বললে নবেন্দু ভালগার?' শংকরীর চোখে বিদ্যুৎ। তার ফর্সা সুন্দর চলচলে মুখটি লাল হয়ে এসেছে। 'বাঃ বাঃ!' শংকরীর ওষ্ঠ বেঁকে গিয়েছে। 'চমৎকার যুক্তি। নিজেরা ভালগারী করে আমার ওপর চাপাচ্ছ? আমার হাসিটা ভালগার। আর কুৎসিৎ ওই মেয়েটার নগ্ন শরীরের দিকে জুলজুল করে তাকানোকে কী বলে নবেন্দু, কী…'

ওপাশে চিৎকার। কটি যুবক ভীষণ তর্কে মশগুল। একজন বাজি রাখতে চাইলে, বাকি ক-জন সম্মত হয়েছে।

'কত ?'

'দশ।'

'ধ্যাৎ, দশটাকা একটা বাজি নাকি ? আজকাল মেলার ছেলেরা দশটাকার জুয়া খেলে।'

'তবে পঁচিশ রইল।'

'লেখাপড়ি হয়ে যাক।'

'নো, নেভার। একজন থার্ড ম্যানের কাছে ক্যাশ ডিপজিট কর। তুমি শালা কথার মারপ্যাচ জানো। বিশ্বাস নেই।'

'তাই সই।' বিজয় গর্বে একজন মাথা তুলেছে। 'তোরা আমায় বাপ চেনাবি, অ্যাঁ। এ্যামেচার থিয়েটার লাইনে নাইটী অমন বাবা কতজন সাজে। আসলে পরের ব-এর আকার তুলে নিয়ে একটা হ্রস্ব উকার লাগাতে হয়।'

'স্বাৎ শুওর।' কে একজন থাবড়া মারল। 'মহিলার সম্মান রেখে কথা বলতে শেখ নি এখনও···। আমি চিনি ওদের। খড়্গপুরের লোক। ভদ্রলোক মুক্তির আসল বাবা···'

'এর মধ্যেই বাওয়া···' একজন তুড়ি মেরে আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে, হাঁটু নাচাতে লাগল। 'খবরাখবর জবর নিয়েছিস তো সৌম্যেন ?'

একতারাটি তখনও বাজছে। এক অন্ধ ভিখিরি, সামনে কাপড় পেতে বসে একমনে একতারার সঙ্গে গান গেয়ে যাচ্ছে। বাউলের গান। পাতা কাপড়ের ওপর কিছু খুচরা পয়সা ছড়ানো।

রোদ তেতে উঠেছে ততক্ষণে। আমরা সারা সৈকত ঘুরে, ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসলাম। জগ আর প্রদোষ সিগ্রেট টানছিল।

'দেখনাই ফিগার।'

'এমন নিটোল খোড়া আমি দেখি নি। কাঁচা বাদামের দানার মতন মসৃণ।'

'কস্ট্যুমে কি মানিয়েছে রে, আহা! ভোলা যায় না।'

'রঙটাই যা আবলুষের মতন।'

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে···'

'মেঘলা দিনে দেখেছিলাম

আমরা, সত্যি আমরা সমুদ্র পারের জনারণ্যে মিশে গিয়েছিলাম। অবাক হওয়ার পরিমাণ বেশি ছিল আমাদের। কারণ আমরা নতুন। সেদিন মেয়েটি যতক্ষণ না ফিরল, ততক্ষণ আমরা উঠিনি। কেউ না। ভুলে গিয়েছিলাম, আমরা সাগর জলে স্নানের আনন্দ লুফতে এসেছি অত দূর দেশ থেকে।

মেয়েটি যখন ফিরল, বেলা তখন বারোটা। আমরা হিসেব করে দেখলাম, চার ঘণ্টা সে দৃষ্টির অগোচরে ছিল। সাগরবেলার ভিড় ততক্ষণে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

পারে পৌঁছলে, একজন নুলিয়া মেয়েটিকে পাঁজাকোল করে এনে বালির ওপর শুইয়ে দিল। একটি নিটোল যুবতী শরীর আমাদের চোখের সামনে, শুকনো বালির ওপর শুয়ে ক্লান্ত চোখে আকাশ দেখছিল। ওর বক্ষোদেশ দ্রুত ওঠানামা করছে আমরা দেখছিলাম।

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ আমরা ঘুমোই নি। ঘুমোতে পারি নি। অবেলায় স্নান খাওয়া হয়েছিল। দুপুরে একটু গড়াতে গিয়ে হ'ল না। কারণ মেয়েটির কথা বারবার আমাদের অন্যমনস্ক করছিল। তার সারা শরীর, তার ভাঁজ, পেশী, মাংসল অমাংসল জায়গা, নাক, মুখ, চিবুক, গলা, পোষাক সব যেন আমরা দেখতে পারছিলাম।

শুধু প্রথম দিনই না। প্রত্যহ এই একই কাণ্ড ঘটছিল। এবং রোজ সকালে বেশি ভিড় জমতে থাকল। দুপুরটা কেবল সাগরবেলার খানিক সময়ের অবসর। বিকেলে কোনো কোনোদিন মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে

আসত। সাগরবেলায় ঘুরে বেড়াত। তখন তার অন্য পোষাক। কদাচ শাড়ি পরে, বেশির ভাগ দিনে সালোয়ার পাঞ্জাবী। তার শরীর স্বাস্থ্য এমনই যে যে-কোনো পোশাকেই তাকে বিজয়িনী বলে মনে হ'তে লাগল।

মাত্র ক-দিনের মধ্যেই আমরা অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আমরা কথা বলতাম কম। হলুদায় কম মিশেছি। স্নানের সময় কখনও বেশি হৈ-চৈ করি নি। এবং পারলে, প্রয়োজনে, অনেকের এক-আধটু ছোটপাটো কাজকর্ম করে দিতাম। ফলে পুরী হোটেলের জগন্নাথবাবু, ব্যারনের মলয় দত্ত, স্বর্গ-বিতান-এর বুড়ো বোস সাহেব এমনি অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছে। সকালে বিকেলে দেখা হ'লে কুশল শুধোন ওঁরা। দু'একদিন চায়ে নেমন্তন্ন করেছেন।

বোস-সাহেব এক্স-মিলিটারী ম্যান। ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ধারণা সকল রোগের মূল কারণই মন। মুক্ত পবিত্র-মনের মানুষ অসুখে ভোগে না। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মগজ কাজ করে। সাইকোলজি। 'ইট্স অ্যাবনরমাল সাইকোলজি।' বোস সাহেব সেই সাঁতারু মেয়ে মুক্তি সমাদ্দারের প্রসঙ্গ তুলেছিল। 'দেয়ার ইজ সামথিং অ্যাবনর-মাল। এর পেছনে একটা যুক্তি আছে। ইতিহাস আছে। পারহ্যাপ্স্ শী মে বি সিনিক। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করার প্রেরণার মধ্যেও অ্যাবনরম্যালিটি থাকে।'

কে যেন আর একদিন বলছিল, 'এ-এক ধরনের এসকে-পিজম।'

'আর কিছু না, এই নিরাবরণ শরীর দেখানোর মধ্যেই আসল কথাটা লুকিয়ে আছে। ইটস্ নাথিং বাট দি রিঅ্যাক-শান অব অ্যান্‌ফুলফিলড ডিজায়ার…'

'কে জানে বাবা, নুলিয়া দু'টোর সঙ্গে কোনো ব্যাপার আছে কিনা।'

'এর নাম আত্মপীড়ন। ফ্রয়েডের মতে…'

'গোটা ব্যাপারটাই চরম অ্যাবনরমাল…'

কে একজন সেদিন বিকেলে সঙ্গীকে বোঝাচ্ছিলেন হেরিডিটি না থাকলে এসব দুঃসাধ্য কাজ করা যায় না। রেসের ঘোড়ার মতন। বাঙালী হ'লে কি হবে, একটা মিষ্টি ব্যাপার আছে। মেয়েটির শরীরে নুলিয়ার রক্ত না থেকে পারে না।

প্রথমটায় আমরা প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তার প্রকাশ ছিল কম। কিন্তু ভবানী এর মধ্যে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল মেয়েটিকে নিয়ে। প্রদোষ স্বপ্নের ঘোরে 'মুক্তি' বলে চেঁচাতে শুরু করেছে। মেয়েটির দেহ-সৌষ্ঠবের কথা মনে পড়লে আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম। কিন্তু একদিন, অজান্তেই আমাদের সকলের মন বিষিয়ে উঠেছিল। আমি আলাপ করতে গিয়েছিলাম। মেয়েটি উপেক্ষা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল আমাকে। এবং সেদিনই আমি এসে বলেছিলাম: লোকে বলছে। আমার কথা নয়; যা রটে তার কিছুও তো অন্ততঃ সত্য।

ওরা সবাই, আমার চারবন্ধু সায় দিয়েছিল। বাস্তবিক হপ্তা দুই ওই একই ব্যাপার দেখে দেখে, সাগরপারের সমস্ত মানুষের মুখ-নির্গত-বিষ আমাদের মনকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। ওর এই যাওয়ার পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে, তা খারাপ, কুৎসিৎ একথা ধরে নিয়েছিলাম আমরা।

আজ সকালে, কে এসে আগে খবর দিয়েছিল, আমাদের সাগররাণী (ওই নামটি ছড়িয়েছে ততদিনে) রোজ যতদূরে যায়, তার চেয়েও বেশি দূরে যাবে। নাকি দেড় গুণ। কাজে কাজেই সকাল থেকে, সেই ভোর ভোর সকালে এখানে চাপা উত্তেজনা। কেমন এক গুপ্ততা ছিল। হোটেল পাড়ার লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দূর দূর থেকেও এসেছিল অনেকে। অন্ধ বাউল পর্যন্ত কাপড় বিছিয়ে বসে পড়েছে। একতারা বাজাচ্ছিল।

মেয়েটি আজ, আজ সকাল সাতটায় সমুদ্রে নেমেছিল।

অনেকক্ষণ আমরা প্রচণ্ড ক্ষিদে সয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছি। শেষে জগ উঠে দাঁড়াল। 'সত্যি আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, কোথাকার কোন এক মেয়ে, সে সাগর সাঁতরাচ্ছে আর তার জন্যে আমাদের চোখে ঘুম নেই, এর মধ্যে আমি নেই....'

'আমিও—' প্রদোষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছে। 'তবু যদি দেখতে সুন্দর হ'ত। কদাকার কুৎসিৎ একটা মেয়ের জন্যে উপোষ থাকাটা দুর্বলতা।'

'তা ছাড়া, স্বভাব চরিত্রটাই বা কি?' কাঞ্চন উঠতে উঠতে বলছিল। পৃথিবীর এত লোকের দৃষ্টির বাইরে এমন দু'টি শক্ত-সমর্থ নুলিয়াকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ আমি বুঝি। ইয়ুন-টিয়ুন এলিস ফেন্সিস্ বাবা আমার পড়া কিছু আছে

আমার তখন আর একজনের কথা মনে পড়ছিল। পুরী হোটেলের বুড়ো দত্তবাবু সেদিন অদ্ভুত এক যুক্তি দেখিয়েছেন। সে কথা মিথ্যা, এমন প্রমাণ নেই। অতএব আমিও উঠলাম। এবং সকলে উঠলে, অগত্যা ভবানী বেচারাকেও উঠতে হ'ল। যেন এতক্ষণে আমাদের মোহ ভাঙল।

'ইস, তিনটে বাজে ..' এই প্রথম সময়ের কথা আমরা জানলাম।

'তিনটে!' প্রদোষ অবাক।

'বেলা গড়িয়ে গেছে দেখছিস না....' কাঞ্চন বলল।

ওরাল এক্‌জামিনেশনের ছাত্রের মতন মৌখিক অঙ্কটা চট্ করে কষে ফেলেছিলাম আমি। 'তার মানে আট ঘণ্টা!'

'আট!...' জগ থেমে দাঁড়াল। এবং আমরা সবাই থেমে দাঁড়িয়েছি।

রোদ পড়ে এসেছে। ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস অধিক সরব। বাতাস সামান্য চড়েছে। বালিয়াড়ি জ্বলছে তখনও। অভ্রের মতন বালিকণার দ্যুতি অত প্রখর ও উজ্জ্বল নেই। সমুদ্রও যেন অধিক উত্তাল হয়ে উঠেছে। তার উত্তরঙ্গ ঢেউ পারে আছড়ে পড়ে ঝম ঝম প্রচণ্ড শব্দে বুঁদ করে রেখেছে এই গোটা প্রান্তর। জলে যেন নীলের ভাবটাও সামান্য চড়েছে।

এই অবেলায় আর স্নান কেন, কেনই বা খাওয়া? বরং আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি থাকি। মেয়েটি ফিরে আসুক। ক্লান্ত হয়ে ফিরুক। তার নেতিয়ে-পড়া শরীরটাকে নুলিয়ারা তপ্ত বালির ওপরে শুইয়ে দিক। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে সে শ্রান্ত চোখে দেখতে থাক আকাশ এই আমাদের কামনা।

বেলা পড়েছে, শূন্য বেলাভূমিতে একটি দু'টি লোককে দেখতে পেলাম আমরা। দিবানিদ্রা সেরে উঠেছে অনেকে। এরই মধ্যে। হোটেলের বারান্দাগুলিতে একটি দু'টি মাথা জমছিল। সাগর বলাকার দল উড়ছে। সায়াহ্ন এল, ওরা থেকে থেকে বিষণ্ণ ডাক ডাকছিল। কোথাও চিল কেঁদে যাচ্ছে আমরা শুনতে পেলাম।

না আমরা দাঁড়াই নি। এক দু'বার পতাকা-পীঠের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম একটি দু'টি রিকশা আসছে। পুলিশ আউটপোস্টের পাশ কাটিয়ে রিকশাগুলো যাত্রীসহ হোটেলপাড়ার দিকে যাচ্ছে। আউটপোস্টের সামনে দু'জন পুলিশ।

যেখানে নুলিয়াদের মাছধরা নৌকাগুলো কচ্ছপের মতন পিঠ তুলে উপুড় হয়ে আছে, তার পাশ কাটিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম। অতি মন্থর পা আমাদের। ভীরু মন। অনাহারজনিত দুর্বলতা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। এতক্ষণে আমরা পাঁচবন্ধু পাঁচটি সিগারেট ধরালাম। আমাদের চোখ তখনও সমুদ্রে ছিল। কারণ প্রতি মুহূর্তে আমরা আশা করছিলাম, মেয়েটি এবার আসবে। ফিরে আসবে। মহা-চালের ওপারে তিনটি কালো বিন্দু আবিষ্কারের রোখ চেপেছিল আমাদের মনে।

যেখান থেকে সে যাত্রা করত, রোজ সকালে, সেখানে আসতে যতটুকু সময়, তা পার হ'লে আমরা দেখছিলাম, বেলাভূমির জনসংখ্যা বেড়েছে। রোদের তপ্ততা মরে এসেছিল। সাগর থেকে সামান্য হিমেলভাব বয়ে আনছে হাওয়া,

উড়ন্ত সাগরবলাকারা বিদগ্ধ ডাক ডাকছে। বালিকণার সেই চকচকে ভাবটি আর নেই। সাগর জলের গাঢ়তা আমাদের চোখে পড়ছিল।

বুড়ো সাহেবকে আসতে দেখলাম। অল্প খর্বকায়, ঈষৎ কৃশ। ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট পরা, গায়ে অধিক ঢিলে ধরণের কোট, হাতে লাঠি। বরাবর সে যেমন আপন মনে বিড়বিড় করে, তেমনি নিজের মনে কথা বলছিল সে। শংকরী-সুমন-সৌমেন হাসছে। ওরা এমনভাবে বসেছে যেন তাস খেলবে। পুরী হোটেলের খদ্দের দত্তবাবু তার নাতনীর হাত ধরে ঘুরে ঘুরে বায়ু-সেবন করছে। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রেই যিনি হেরিডিটিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চান সেই অনন্ত মল্লিক আর দু'জন বন্ধু নিয়ে বসে বক্তৃতা করছিল। বোস সাহেবের স্ত্রী তার তিন ছেলের বৌ নিয়ে পায়ের পাতা ডোবা জলে নেমেছে। বাজি ধরা ছোকরার দলটি ঘুরঘুর করছে। আঁচলে চাবি-বাঁধা সেই ভদ্রমহিলা গাল ভরে পান নিয়ে স্বামীকে সঙ্গদান করছে। অন্ধ বুড়ো বাউলের একতারা বাজছে। ভগ্নকণ্ঠে সে গাইছিল: 'ভবের খেলা বড়ই চমৎকার—আজ খেলছ, কাল হাসছ...তারপরেতে হায় গো হরি সকল অন্ধকার...'

'ডু ইউ নো, হোয়ার ইজ সী?,' বুড়ো সাহেব এক এক করে শুধোচ্ছিল। যাকে পাচ্ছে তাকেই।

'হু?'

'সী। আই মিন দ্যাট ইয়ুথফুল ইয়ং গার্ল...সিম্বল অব ভিগার এণ্ড হেল্‌থ্‌।' বলে মাথা নীচু করছিল সাহেব। তার মাথাটা সর্বদা কাঁপে। 'সী ওয়াণ্টস টু কনকোয়ার '

'নট রিটার্নড'

'নট ইয়েট...নান অব দেম্‌?'

'নো।'

'আই নো দি স্টোরী'—সাহেব আর দাঁড়ায় না। এগিয়ে যায়। আর এক জনকে শুধোয়।

দত্তবাবু বলতেন, পাবলিসিটি। সমুদ্র না হাতি। আসলে দেখ গে, ভাঁটায় গিয়ে কোথাও বসে আছে। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এসে একটা স্টাণ্ট দেবে। এখন সেই দত্তবাবু অসীমের আহ্বান বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

অ্যামেচার থিয়েটারের ছোকরাটি বাজি হেরে মনমরা হয়ে বসে আছে। বোস সাহেব তার শিশু নাতনীকে বলছিলেন, বড় হ'য়ে তাকে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাতে হবে...।

বিকেলের মতনই কেমন বিষণ্ণতা আজ সারা বেলাভূমিতে থই থই করছে। কথা বলছে, কেউ বলছে না-তবু আজকের সকল মানুষের চোখ সম্ভবত আমাদের মতনই তার ফিরে আসার দৃশ্যটি দেখবার জন্যে উদগ্রীব।

সূর্যাস্তের দৃশ্যটি কেউ আর আনন্দের চোখে দেখতে পারল না। কারণ, খানিক আগে দু' জোড়া সাম্পান সাগর পথে যাত্রা করেছে। আটজন নুলিয়া ছিল তাতে। দেখতে দেখতে সাম্পান দু'টি অদৃশ্য হয়ে এল। ততক্ষণে অন্ধকার প্রায় নামে নামে...

বোস সাহেব বলছিলেন, সাইকোলজি বিষয়টিই বড় জটিল। অ্যাবনরমাল সাইকোলজি আরও কঠিন ব্যাপার...

ভব সিগ্রেট টানতে টানতে বলছিল, 'অরু, আমরা একটা বিরাট ভুল করেছি।'

'এডভেঞ্চার নেই বলেই বাঙালী জাতের সর্বনাশ হচ্ছে...' কে বলছিল পাশ থেকে।

'অসীম মানেই ঈশ্বর।' দত্তবাবুর বক্তৃতা চলছে। 'তাঁর ডাক আমরা ক-জন শুনি?'...

আজ বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। কারণ সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমেছিল। গোটা বেলাভূমি অন্ধকার। হোটেল পাড়ার সামনের রাস্তার আলোর দ্যুতি এতদূর আসে না। সমুদ্র কালো হতে হতে অন্ধকারে মিশে গেল। অত্যন্ত কাছের ব্যক্তিটি ভিন্ন আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। দৃষ্টি হারিয়ে বেলাভূমি অন্ধ। খোলা কানে কেবল শোনা যাচ্ছিল বৃদ্ধ

বাউলের ভাঙাগলার গানের সঙ্গে একতারা বাজছে। সাগর তরঙ্গেরা মাঝে মাঝে এত প্রচণ্ড শব্দে পারে আছড়ে পড়ছিল যে গান কথা খেদ কলরোল দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ সব ঢেকে যাচ্ছিল।

অনেক রাত্রে সাম্পান দু'টি ফিরে এল। আকাশে তখন চাঁদ। সমগ্র বেলাভূমি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুক্তির বাবা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। দু'টি অচৈতন্য নুলিয়ার দেহ পাওয়া গেছে। মেয়েটি, মুক্তি নামের মেয়েটি কেবল নিখোঁজ।

খানিকক্ষণ পরে আমরা ফিরছিলাম। গোটা বেলাভূমির অনেক মানুষ। কারো মুখে কথা নেই। আমার মনে হচ্ছিল সৎকার শেষে শ্মশানবন্ধুরা ফিরছে। হেঁটমুখে। চাঁদ নেই, তবু কেমন একটি অস্পষ্ট আলো আছে। অন্ধ বৃদ্ধ বাউলের কণ্ঠ একতারার সঙ্গে একটি পদ বারবার গাইছিল: তারপরেতে, তারপরেতে হায় গো হরি···

অন্ধকারে বোস সাহেবের গলা: পৃথিবীর সকল ক্ষণজন্মাই অ্যাবনরমাল সাইকোলজির পেসেন্ট হয়···। দত্তবাবু বলছিলেন, 'এত অল্পবয়সে অসীমের ডাক শোনা ক'জনের ভাগ্যে জোটে!' 'আহা, বাঁচলে দশজনের একজন হ'ত গো।' ···আমি জানতাম সমুদ্র ওকে ডাকত। 'কালোর মধ্যেও কী নাক মুখ ছিল, আহা!' অনেক পেছনে বাউলের গান শোনা যাচ্ছিল: তারপরেতে হায় গো হরি সকল অন্ধকার। বুড়ো সাহেব অন্ধকারে আচমকা হেসে উঠেছিল: আই নো দি হোল স্টোরি···

আমরা হেঁটমুখে, দলবেঁধে ফিরে যাচ্ছিলাম হোটেল পাড়ার দিকে।

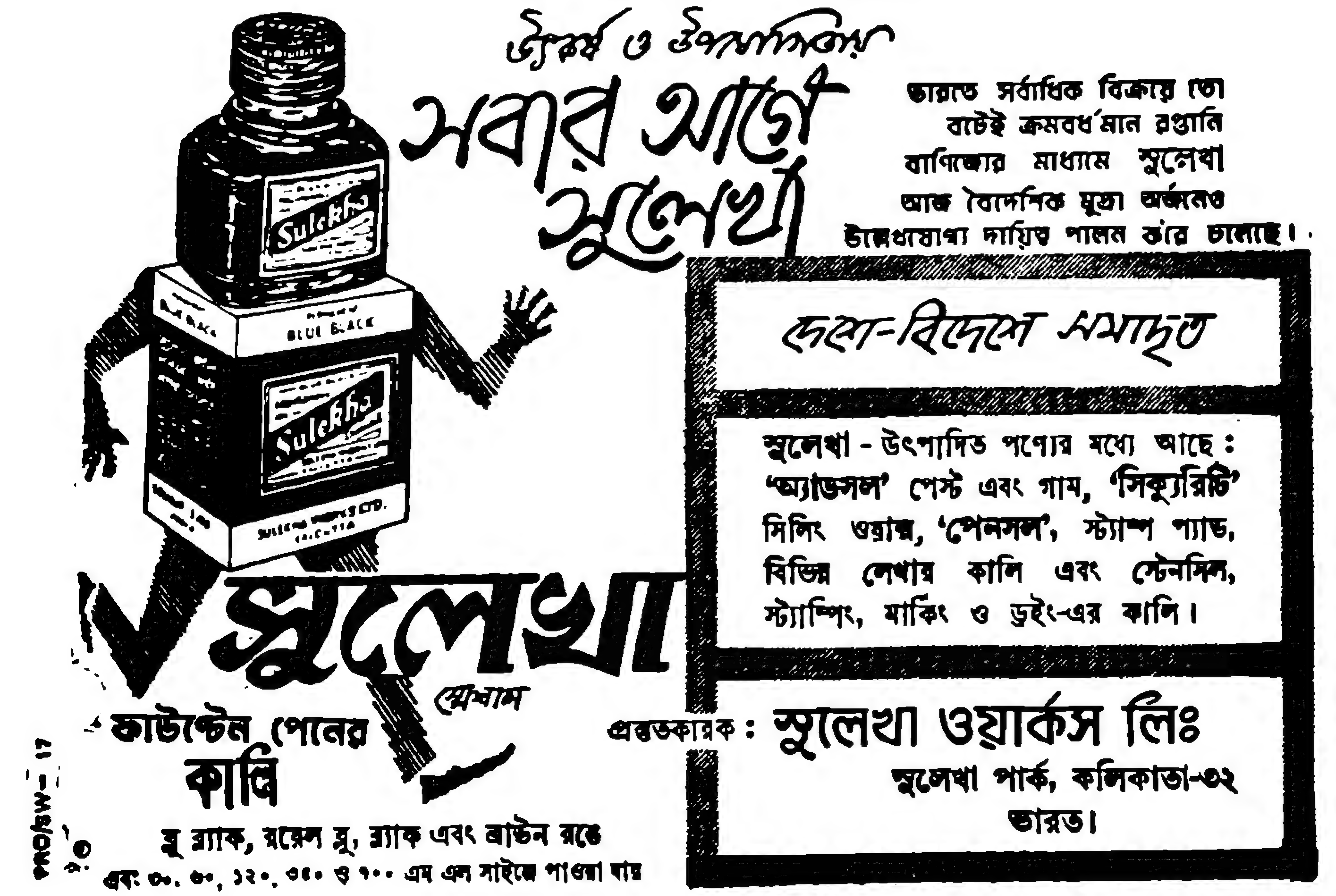

ডানায় রোদের গন্ধ

মিহির মুখোপাধ্যায়

কোনদিন নিঝুম দুপুরে কখনো ঘুঘুর ডাক শুনলে আমার গয়ারামের কথা মনে পড়ে যায়। গয়ারাম বলতো—বড় উদাস পক্খি, ডাক শুনলে মনটা ক্যামন হইয়া যায়। পাখিকে গয়ারাম বলতো—পক্খি।

যে ছোট শহরে আমাদের ছোটবেলা কেটেছে, সেই মহকুমা শহরের একপাশে একটা নোংরা বস্তিতে মাঝে মাঝে এসে থাকত গয়ারাম। সেখানে তার নিজের একটা আস্তানা ছিল। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতো কে জানে। বছরে দু'বার কি তিনবার রথের মেলা, রাসপূর্ণিমার মেলা কিম্বা পৌষ-সংক্রান্তির দু'একদিন পরে আমাদের বাড়ি আসতো গয়ারাম। আমার বড়দিকে ডাকত—দিদিভাই। বড়দির কাছে মাঝে মাঝে গয়ারাম কিছু টাকা-পয়সা জমা রেখে যেত।

এতদিন পরে আজও এই মস্ত শহরের পথে কোন পাখিওয়ালাকে দেখলে আমি যেন সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলির কাছে ফিরে যাই।

মাথায় লাল গামছা, আধময়লা ডোরাকাটা সার্ট, ময়লা পায়জামা কিম্বা ধুতি। কাঁধে বাঁশের সঙ্গে কয়েকটা করে পাখির খাঁচা। গয়ারাম এসে ডাক দিত—ও খুকিদিদি, খুকাবাবু দ্যাখবা আস, কত রঙ্-বেরঙের পক্খি আন্ছি, কত রকমারি—

আমি আর মেজদি পড়ি কি মরি করে ছুটতাম। সাত-আটটা পাখির খাঁচায় কত রঙের রকমারি পাখি। কোন খাঁচায় লাল ঠোঁট, সবুজ ডানা টিয়ে পাখি। কোনটায় কয়েকটা চন্দনা কিম্বা একঝাঁক মুনিয়া। খুব অস্থির পাখিগুলি একবারও একটু সময়ের জন্য চুপ করে থাকতে দেখিনি। সব সময় ঘুরছে, ফিরছে। এই উপরে, এই নীচে, এই ওপাশে আবার এপাশে। ডানা ঝাপটাচ্ছে, খাঁচার গায়ে ঠোকরাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে ঘুরে ঘুরে বোধহয় বাইরে আসার পথ খোঁজে ওরা। তবে খাঁচার পাখি বেশি ডাকে না। মাঝে মাঝে ডাকে বটে, কিন্তু গাছের পাখিরা যেমন ডাকে তেমন নয়। বড়দি বলতো—খাঁচার পাখিরা তেমন করে ডাকতে পারে না, ওরা ডাকে না, কাঁদে, আমরা ওদের কান্নাকে গান ভেবে ভুল করি।

মেজদি' হেসে হেসে বলতো—ঠিক যেমন আমরা অনেকের গানকে কান্না ভেবে ভুল করি। চোখ পাকিয়ে তাকাত বড়দি' আর মেজদি' হাসতে হাসতে ছুটে পালাত। আমি কিন্তু হাসতুম না। কীর্তন কিম্বা ভক্তিমূলক গান গাইবার সময় ভাবে বিভোর হয়ে বড়দি' নাকি সুরে কান্নার মত একটা শব্দ বার করতো। মেজদি' আর ছোটকাকা এই নিয়ে বড়দিকে—

যাকগে সে কথা। আমাদের ছোটবেলার সেই মহকুমা শহর। যার একপাশে একটা নদী ছিল। নদীর কিনারায়

হাট-বাজার, খেয়াঘাট আর খেয়াঘাটের প্রান্তে ছিল একটা নোঙ্‌রা বস্তি। ভালমন্দ পাঁচমিশালি লোকের আস্তানা। শহরে এসে গয়ারাম এই বস্তিতে থাকত।

একবার আমি আর পল্টু অনেক পথ ঘুরে ঘুরে গয়ারামের ঘরে গিয়েছিলাম। গোলপাতার ছাউনি, দরমার বেড়া, নিচু দরজা। কেমন আবছা অন্ধকার। গোটা পনের ছোট-বড় খাঁচায় নানা রঙের পাখী। ময়না, টিয়া, মুনিয়া, তিতির। পাখির ময়লা, ছেঁড়া পালক আর কেমন একটা পচা গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে আছে। দরজার মুখে দাঁড়াতেই ভক করে নাকে এল গন্ধটা।

নাক কুচকে বল্‌লো পল্টু—ইস্ মদের গন্ধ। গয়াটা মদ খায়।

ভর দুপুরে মদ খেয়ে দড়ির খাটিয়ার ওপর তালগোল পাকিয়ে শুয়ে ভোস্ ভোস্ করে ঘুমুচ্ছিল গয়ারাম। পল্টুর ডাকাডাকিতে একটু নাল্‌চে, ঘোলাটে চোখ মেলে একটুকাল তাকিয়ে রইল। যেন চিন্‌তে পারেনি। তারপর একটু হাসল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল, মস্ত হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিল। শেষে আবার হাসি হাসি মুখে বল্‌লো—খুকাবাবুরা পক্ষি নিবার চাও, কুনটা নিবা দ্যাখো।

পল্টুর সখ ছিল একটা ময়না পাখির। গয়ারাম দাম চাইল পাঁচসিকে।

সেই সস্তা-গণ্ডার দিনে যে সময় আমরা পঞ্চম জর্জের মুণ্ডু আঁকা একটা তামার পয়সা দিয়ে তিনখানা খোয়া বিস্কুট কিম্বা একমুঠো কমলা লজেন্স পেতাম, কেনাকাটার সেই সত্য যুগে একটা পুচকে পাখির দাম পাঁচসিকে শুনে আমার চোখতো কপালে উঠ্‌ল। আর পল্টু জামা-প্যাণ্টের পকেট খুঁজে আনা ছয়েক পয়সা বেরকরে গয়ারামের সামনে ধরে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। নোনাফলের বিচির মত কালোকালো দাঁত বার করে খিত্‌খিত্‌ শব্দে হাসল গয়ারাম —ইটা তুমরা কি কইবার চাও, ছয়গণ্ডা পয়সা দিয়া পক্ষি নিবার চাও।

আবার কালো কালো দাঁত খিত্‌খিত্‌ হাসির সঙ্গে বিটকেল গন্ধ।

পলটু কি যেন বোঝাতে গেল। গয়ারাম হাসির চোটে থামিয়ে দিল। নেশাখোরের হাসি একবার শুরু হলে থামানো মুস্কিল। হঠাৎ আমাদের পেছনে মেয়েলি গলা শুনে হাসিটা যেন গিলে ফেল্‌লে গয়ারাম। শান দেওয়া ছুরির মত সরু গলা, বেশ উচু পর্দায় বাঁধা—পোলাপান মানুষ, পাখি পুষবার সখ নিছে, তুই অমুন করস ক্যান, গয়া।

দরজার মুখে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বড়দির বয়সী হবে, আটোসাটো গড়ন, কুচকুচে কালো রঙ, লাল ডুরে শাড়ি, খয়েরী ব্লাউজ আর সারা গায়ে ঝক্‌ঝকে রুপোর গয়না। হাতে মানতাশা, গলায় মটরমালা, কানপাশা নাকফুল। চোখে বোধহয় খুব সরু করে কাজল টেনেছে, পানের রসে ঠোঁট লাল। লাল গামছায় বাঁধা ভাতের পুটুলি মাটিতে নামিয়ে রাখল। সাদা রুপোর গয়নায় কালো মেয়েটিকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আর একটি কথা না বলে খাটিয়া থেকে নেমে খেতে বসল গয়ারাম। কলাইকরা ছোট একটা গামলায় ঠাসা ভাত, ভাতের পাশে একটু ডাল, কিসের একটা তরকারি, কয়েক টুকরো কাঁচা পেঁয়াজ, একটু নুন, কাঁচা লঙ্কা।

চারপাশে পাখিরা ময়লা, ছেঁড়া পালক আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে মাটিতে উবু হয়ে বসে গোগ্রাসে গিল্‌ছে গয়ারাম। কচ্‌কচ করে পেঁয়াজ চিবুচ্ছে। আমার কেমন ঘেন্না করছিল।

—তুমরা কি খাবা দাদাবাবুরা—মেয়েটি এবার সোজা সুজি আমাদের দিকে তাকাল, ধারালো চাউনি, ঠোঁটে একফোঁটা হাসি—জলবাতাসা খাবা, ভাল বাতাসা আছে আইনা দিই, কেমুন।

গয়ারাম গরগর করে উঠ্‌ল—তুই কি কইতাছস্, বামুনের

পোলারে জলদিবার চাস, আক্কেল নাই। জিব কাটল মেয়েটি—ওই ছাখো ভুইলা যাই, ডাব খাবা, ডাব আইনা দিই, কেমুন—বল্‌তে বল্‌তে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গয়ারাম একগাল হাসল—ওইটা একটা পাগল, উয়ার নাম পরী, উয়ার বাপ কইছে—একটু থেমে খানিকটা পেঁয়াজ চিবুল, তারপর আবার হাসি হাসি মুখ তুলে বললো—উয়ার বাপ কইছে, পাঁচ কুড়ি ট্যাহা পাইলে বিয়া দিবো। অখন কথা হইলো, আমরার হাতে ট্যাহা বাসি হয় না, খালি আলতু ফালতু খরচা—মুখ উঁচু করে পেতলের ঘটি থেকে অনেকটা জল খেল, তারপর একটু দম নিয়ে আবার বললো—ওই পক্‌খি উড়ার মত ট্যাহাগুলান্‌ পাখ মেইলা উড়াল ছায়, তাই তুমরার দিদির ঠাই ট্যাহা রাইখা আসি।

মনে পড়ল, মাঝে মাঝে বড়দিদির কাছে টাকা জমা রাখে গয়ারাম। ওই কালো মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য টাকা জমাচ্ছে। পল্টু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ভালবাসার ব্যাপারটা আমরা তখন কিছু কিছু বুঝ্‌তে শিখেছি। গয়ারামের হাতে টাকা বাসি হয় না।

পাখি বেচে দু'চার টাকা যা জোটে মদ খেয়ে জুয়ো খেলে কিম্বা কোন ফালতু কাজে উড়ে যায়। তাই কোন পালা-পার্বনের মেলায় কিম্বা শহরের হাটে মওকামতো মোটা টাকা হাতে এলে তাড়াতাড়ি বড়দিদির কাছে জমা রেখে আসে গয়ারাম। ভালবাসার টানে টাকা জমায়। পাঁচকুড়ি টাকা জমলে শাদা রূপোর গয়না পরা ওই কালো মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হবে।

ভালবাসার গোলমেলে ব্যপারে গয়ারামও জড়িয়ে পড়েছে ভেবে আমার বেশ মজা লাগছিল। পল্টুও বোধহয় হাসি লুকোবার জন্য একটু সামনে ঝুঁকে, দুই হাটুতে হাত রেখে খুব মন দিয়ে ময়নার বাচ্চা দেখ্‌তে দেখতে জিজ্ঞেস করল—তোর কত টাকা জমেছে রে গয়া?

ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়েছে, দাওয়ার বইরে মুখ ধুয়ে ঘরে এসে খাটিয়ার নিচে পেতলের ঘটিটা রাখল গয়ারাম, তারপর কোঁচার খুটে হাত মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লো—তা, দু'কুড়ি, হা দু'কুড়ি পাঁচ ট্যাহার মতো হইবো।

—কতদিনে জমল টাকাটা?

একটু ভেবে জবাবদিল গায়ারাম—গেল সনের আগের সন থিকা জমতাছে।

—বলিস কিরে?—পল্টু সোজ হয়ে দাঁড়াল—দু'বছরের বেশি, তিন বছর হতে চল্‌লো, এতদিনে মাত্তর পয়তাল্লিশ টাকা, তাহলে একশো টাকা জমাতে তুই তো বুড়ো হয়ে যাবি। একটা বিড়ি ধরিয়ে বললো গয়ারাম—তা কি করবার পারি কও তুমরা, দিন রাইত ট্যাহার ধান্দায় ঘুইরা মরি, ট্যাহা ট্যাহা কওরে ভাই, ট্যাহার মত বন্ধু নাই, ভাইবা ছাহো বন-বাদাড় ঘুইরা পক্‌খি ধরি, খাটুনি পোষায় না, তার জন্যি তো ময়নাটার দাম পাঁচ সিক্কা চাইছি—পল্টু আবার করুণ চোখে তাকাল। একবার গয়ার দিকে আরেকবার পাখিটার দিকে।

ফুসফুস করে বিড়ি টানছে গয়ারাম, মাঝে মাঝে গলার ভেতর থেকে খিত্‌খিত্‌ শব্দ অর্থাৎ মজা দেখবার মত অল্প অল্প হাসির ভাব। কিন্তু একটা পয়সা কম বলছে না।

কথার প্যাঁচে ঘুরে ফিরে সেই একই দাম। ভারি পয়সা চিনেছে গয়াটা। কাজ নেই বাবা পাখি কিনে। আর কোনদিন ওর কাছ থেকে পাখি নেব না। আমার মা এমনি-তেই খাঁচার মধ্যে পাখি আটকে রাখা বিশেষ পছন্দ করেন না। একবার মা আর আমি খাঁচাভর্তি একঝাঁক মুনিয়া পাখি ছেড়ে দিয়েছিলাম। পাখিগুলি ছিল মেজদির। গয়ারাম এনে দিয়েছিল। কিজন্য জানিনা, কয়েকদিন পরেই দেখি একটা দু'টো করে মরে রয়েছে খাঁচার মধ্যে। রাত্তির বেলা কখন মরে থাকত। আর সকালে উঠে দেখতাম লাল লাল পিপড়েরা ছেকে ধরেছে। দু'তিন দিনে চার পাঁচটা পাখি মরে যেতেই মা খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। অন্য পাখিগুলি

পালিয়ে বাঁচল। মেজদি ভীষণ চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করেছিল। মায়ের একধমকে চুপ করে গেল। আমার খুব আনন্দ। সামান্ত ঝগড়ার ছুতো করে যখন-তখন আমার ঘুড়ি, লাটিম পুকুরের জলে ফেলে দিত মেজদি।

আজ বোধহয় মেজদি'র খুশি হবার পালা। ছুটির দিন। দুপুরে ভাত খাবার পর যখন অঙ্ক কষার কথা। সে সময় পলটুর সঙ্গে চুপি চুপি এখানে এসেছি পাখি কেনার জন্ত। এ ব্যাপার মা টের পেলে যে কি অবস্থা হবে, ভাবতেও পারছি না। পল্টুকে বাড়ি ফেরার জন্ত তাড়া দিলুম।

এমন সময় দু'হাতে দুটো ডাব নিয়ে সেই মেয়েটি ফিরে এল। সারা মুখে ঘাম, হেসে হেসে বললো—ছুরি দিয়া তুমরা মুখ খুইলা লও, জলে ছোয়া লাগবো ভাইবা মুখ খুইলা আনি নাই।

পরিপাটি করে কাটা ডাব, কিন্তু মুখ খোলা নয়। পলটু খুব উৎসাহের সঙ্গে ডাবের মুখ খুলতে বসল। আমার পকেট থেকে লাটিম বার করে নিল। লাটিমের লোহার ছুঁচলো দিকটা দিয়ে অবাক কৌশলে ফুটো করল। মুখ উঁচু করে খাবার সময় আমাদের জামা ভিজল, প্যাণ্ট ভিজল। জল খেয়ে আর শেষ করতে পারি না। আমরা দু'জনেই হাঁফাতে লাগলুম। পরী হেসে কুটিকুটি।

শেষ পর্য্যন্ত ময়নার বাচ্চাটাও পাওয়া গেল। এক পয়সাও ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না ময়ার। পরীর ধমকে খিত্-খিত হাসি বন্ধ করে, মিনমিনে স্বরে—যা ভাল বোঝস্ কর—বলে একদম চুপ মেরে গেল। পরীই দাম ঠিক করে দিল, বারো আনা। ছয় আনা পয়সা হাতে হাতে দিয়ে দিল পলটু। বাকি ছ'আনা পরে দেবে। খাঁচাশুদ্ধ পাখিটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। ময়ারাম সঙ্গে সঙ্গে এসে অনেকটা দূর এগিয়ে দিল আমাদের। অনেক গল্প শোনাল। নানা পাখির কথা। নানা জাতের পাখির গল্প। কোন পাখি বছরের কোন সময় ঘর বাঁধে, ডিম দেয়। কাদের স্বভাব কি রকম, কেমন করে ধরা যায়। চাতক আর নাকুটি, জলপিপি আর জল-ময়ূরের তফাত কি। কাদের নাম লালমোহন আর কারাই বা হীরেমোহন।

এমনি চেনা-অচেনা অনেক পাখির অদ্ভুত সব গল্প শোনাল। একজাতের পাখির নাম বললো—গগনভেড়। ময়ারামের উচ্চারণ ভালো না। ওটা বোধহয় গগনভেড় নয়, গগনভেরী। ভারী ভালো লাগল নামটা। নিশ্চয়ই আকাশের খুব উঁচুতে উড়ে উড়ে ভেরীর মত আওয়াজ করে ডাকে।

ফেরার সময় আমরা অন্তপথে আসছিলাম। বাজারের পথে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়।

তাড়াতাড়ি ফেরার জন্ত একটা কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে মাঠের ওপর দিয়ে এলাম।

মাঠের পর বাঁশবাগান। একদিকে বাঁশের বন আরেক-দিকে ধানক্ষেত, কিছুদূরে নদী। বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় শুনতে পেলাম, কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে। কোন চৈত্রের শেষ দুপুরে ছায়া ছায়া মাটির রাস্তায় শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে যেতে যেতে ঘুঘুর ডাক যে শোনেনি তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না, সেদিন কেমন অদ্ভুত বিস্ময় মনে হয়েছিল।

আমি একটুকাল দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলাম। বাঁশ-বাগানের ভেতর কোথায় যেন একটু থেমে থেমে ডাকছিল ঘুঘুটা। আমাকে থামতে দেখে ওরাও থামল।

ঘুঘুর ডাক শুনে বললো ময়ারাম—বড় উদাস পঙ্খি, ডাক শুনলে মনটা কেমন হইয়া যায়। আবার যেতে যেতে আমি বললুম—আমকে একজোড়া ঘুঘু এনে দিবি।

ময়ারাম তখন ঘুঘুর বিবরণ শুরু করল। নেশার জন্ত কিনা বুঝলাম না, একটু বেশিরকম বকবক করছিল। ঘুঘুর জাত নাকি তিনরকম। আমরা যাদের চিনি, সেগুলো হচ্ছে তিলে ঘুঘু। পায়রার মত গড়ন, আকারে ছোট। আরো

দু'জাতের ঘুঘু আছে। জন-বসতির কাছাকছি বেশি থাকে না। আকারে তিলে-ঘুঘুর চেয়ে বড়। তাদের নাম, রাম-ঘুঘু আর শ্যাম-ঘুঘু।

নাম শুনে আমি আর পল্টু খুব হেসেছিলাম। হাসতে হাসতে বলেছিল পল্টু—তপুকে একজোড়া রাম-ঘুঘু এনে দিস গয়া, সেই ভাল হবে, মাসীমা তা'হলে ওর পিঠে ছাতার বাট ভাঙবে, খুব মজা হবে।

সেদিনের পর অনেককাল আর গয়ারামের সঙ্গে দেখা হয় নি। বছর-বছর আমরা বড় হয়েছি। যুদ্ধ, দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষের দিনগুলির মধ্যে আমাদের বয়স বেড়েছে।

এদিকে বড়দি'র বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে গয়ারামের খোঁজ করেছিল বড়দি'। তার কাছে আর টাকা রাখতে আসেনি গয়ারাম। যে ক'টা টাকা রেখেছিল, তাও আর ফেরত নিয়ে যায় নি। কি যে হ'ল মানুষটার, কোন পাত্তাই নেই।

একবছর পরে ফিরে এল বড়দি। জামাইবাবু এসে পৌছে দিয়ে আবার কাজের জায়গায় চলে গেলেন। বড়দি বোধ হয় থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেল।

ভারী সুন্দর হয়েছে বড়দি'। কেমন ভারিক্কি চেহারা, রঙটা যেন আরো ফরসা, আরো উজ্জ্বল। এক গা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর।

আমাকে খালি ফরমাস করে—কাঁচা আম নিয়ে আয়, কচি শশা আন, তেঁতুল আন।

ভাত খেতে চায় না, যত রাজ্যের বাজে জিনিস খাবে। খালি চিবুতে ইচ্ছে করে বড়দি'র। খেতে বসে শুধু সজনে ডাঁটা চিবুবে।

একদিন আমাকে বল্লো—আখ আনতে পারিস, আখ চিবুতে ইচ্ছে করে।

—এখন আখ পাব কোথায়, এটাতো আখের সময় নয়—আমি চলে যাচ্ছিলাম।

বড়দি' আবার ডাক দিল—এই শোন্ তোর চামড়ার বেল্টটা দেখি—

নতুন চামড়ার বেল্টটা হাতে নিয়ে গন্ধ শুকে বল্লো—আঃ, কি চমৎকার গন্ধ!

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেটা চিবুতে শুরু করল।

—এই এই করিস কি—আমি হাউমাউ করে উঠলাম—স্থাখদিকি, নতুন বেল্টটায় দাঁতের দাগ করে দিলি—

—কি করব, সুন্দর গন্ধটা—বড়দি' হাসতে লাগল।

ওর কাণ্ড দেখে আমি হতভম্ব। হল কি দিদিটার! মাথা খারাপ হ'ল নাকি!

পল্টু গোপনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল। ব্যাপার শুনে আমি অবাক। পল্টু অনেক কিছু জানে দেখলাম। মুচকি হেসে বললো—হয়, হয়, এসময় ওরকম হয়েই থাকে, বুঝ্লি—

—তাই বলে চামড়া খাবে কেন?—আমার কথা শুনে খুব অবজ্ঞার ভাব দেখাল—তুই কিছুই জানিস না, দেখছি, এক এক জনের এক এক রকম হয়, কেউ উনুনের পোড়ামাটি খায়, কেউ চামড়া চিবোয়—পল্টু বিজ্ঞের মত বোঝাল—আমার নতুন কাকিমা, নতুন কাপড়ের গন্ধ শুক্‌তো আর চিবুতো, ক'দিন তার জ্বালায় নতুন কাপড়, নতুন জামা-প্যান্ট কিছু রাখা যেত না।

কয়েকটা দিন পর। এক সকালে মেজদি' এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙাল—এই তপু, ওঠ ওঠ শিগগির দেখবি আয়, গয়ারাম এসেছে।

তখন সবে রোদ উঠেছে। এতদিন পর এত ভোরে নতুন কি পাখি আনল গয়ারাম। তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে এলাম। কিন্তু বোধহয় না এলেই ভাল হত। সিঁড়ির ধাপে বসেছিল গয়ারাম।

চোখ-মুখ বসে গেছে। এলোমেলো একমাথা চুল। ময়লা ছেঁড়া জামা, পায়জামা।

কোন খাঁচা নেই, পাখি নেই। শুধু পাশে একটা মোটা বাঁশের লাঠি। হঠাৎ চোখে পড়ল, সিঁড়ির ধাপের ওপর পায়জামার ডান পা'টা কেমন নেতিয়ে রয়েছে। বা' পাটা যেমন ছিল, তেমনি আছে। পায়জামার নিচের দিকটা ধুলোমাখা। কালো ফাটাফাটা পায়ের পাতা, আঙুলে বড় বড় নখ, নখের ভেতর ময়লা। কিন্তু ডানদিকে এসব কিছু নেই। হাটুর উপর থেকেই কেমন খাপছাড়াভাবে ঝুলে রয়েছে পায়জামাটা। মুখ নিচু করে বসেছিল গয়ারাম।

—একি তোর এমন হ'ল কি করে?—বড়দির কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। একটুকাল অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। সিঁথির সিঁদুর আর গয়নার দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললে,

—দিদিভাই তুমরার বিয়া হইয়া গ্যাছে, জানবার পারি নাই।

—তুই কোথায় ছিলি এতদিন, তোর খোঁজে কতবার লোক পাঠিয়েছি, তোর এরকম হ'ল কি করে?

বড়দির জিজ্ঞাসার জবাবে বললো গয়ারাম—গাছে উঠছিলাম, পকখির ছাও ধরবার লগি, ডাল ভাইঙ্গা পইরা গেছি।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়, থেমে থেমে, একটু একটু করে ঘটনাটা বললো গয়ারাম।

কোন এক জমিদারের বুলবুলির লড়াই দেখার সখ। তার বাগান বাড়িতে নানা জাতের পাখি পোষার ব্যবস্থা। গয়ারামকে ডেকে হুকুম দিলেন, কয়েকজোড়া সিপাহী বুলবুলির বাচ্চা এনে দেবার জন্য। বাচ্চা পাখি তালিম দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার সুবিধে বেশি। এক একজোড়া পাখির দাম দেবেন এককুড়ি টাকা। এত দামের লোভ কখনো সামনে আসেনি। গয়ারাম প্রায় ক্ষেপে উঠল। টাকার ভীষণ দরকার। টাকা না হলে বিয়ে হবে না। পাঁচ কুড়ি টাকা না পেলে পরীর বাপ মেয়ে দেবে না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, বয়স বেড়ে যাচ্ছে। পাঁচ কুড়ি টাকা জমাতে বোধ হয় বুড়ো হয়ে যেতে হবে। পল্টুর সেদিনের কথায় কি ভয় পেয়েছিল গয়ারাম?

নয়তো টাকার লোভে পাগল হল কেন?

খুঁজে খুঁজে ঝুটিওয়ালা সিপাহী বুলবুলির বাসা বার করল। বেশ জঙ্গল। কাছে-পিঠে জন-মানুষের বসতি নেই। তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা কাঠ-বাদাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মনে হ'ল উপরে পাখির বাসা আছে। নিচ থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। কাঠ-বাদাম গাছের তলায় কয়েকটা পাখির খাঁচা আর পোটলা-পুটলি নামিয়ে রাখল গয়ারাম। বৈশাখের বিকেলে যেমন বাতাস ওঠে। কখনো জোরে, কখনো আস্তে, তেমনি হাওয়া দিচ্ছিল। গাছে গাছে অনেক পাখি। নানা জাতের নানা রঙের। তখন সন্ধ্যার মুখে পাখিরা ঘরে ফিরছিল। গয়ারাম তাদের ঘর ভাঙ্গার জন্য গাছে উঠল। সেই বৈশাখের বিকেলে, পড়ন্ত রোদ আর মাতাল হাওয়ার মধ্যে গাছে ওঠার সময় কিসের ভাবনায় অন্যমনা হয়ে কোন নরম ডালে পা রেখেছিল গয়ারাম, আজ আর মনেও নেই। হঠাৎ ভয় পেয়ে পাখিরা উড়ে পালিয়েছিল। তাদের চীৎকার শুনতে শুনতে দুই হাতের মুঠোয় কয়েক গোছা ছেঁড়া পাতা নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কার কথা, কিসের কথা ভেবেছিল গয়ারাম, এখন আর স্পষ্ট করে মনে করতে পারবে না, গুছিয়ে বলতেও পারবে না। তারপর একসময় যখন তার জ্ঞান হল, স্মৃতি এল, ব্যথার বোধ জাগল, তখন সে পঙ্গু, রক্তমাংসের পিণ্ড একটা। স্মৃতি, বোধ, চিন্তা, চেতনা—সমস্ত ধূসর অস্পষ্ট আকারহীন। পরের দিন কারা যেন তাকে সেই গাছতলায় দেখতে পেয়ে খাটিয়ায় তুলে কাঁধে করে শবযাত্রার মত অনেক দূরের একটা গাঁয়ে নিয়ে

এল। কতদূরে, কোথায় নিয়ে এল কিছুই তেমন ভাল করে মনে নেই।

শুধু মানুষের কাঁধে চেপে খাটিয়ায় দুলতে দুলতে যাবার সময় অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত মনে হয়েছিল, তাকে বুঝি শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে বৈশাখের রোদে পুড়তে পুড়তে আবছায়ার মত মনে হয়েছিল বোধহয় সে চিতায় শুয়ে জ্বলছে।

তারপর কয়েকটা দিন কখনো নৌকোয়, কখনো গরুর গাড়ি করে কারা যেন তাকে তিরিশ মাইল দূরের জেলা-শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন প্রায় শেষ অবস্থা। হাসপাতালের ব্যবস্থাও তেমন কিছু ভাল ছিল না। কিন্তু বেঁচে গেল গয়ারাম। যদিও এভাবে সে বাঁচতে চায়নি, বেঁচে থাকারও কোন প্রয়োজন ছিল না।

তবু কয়েক মাস পরে একটা পা খুইয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল গায়ারাম।

হাতে একটা পয়সা নেই, থাকার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কিছুদিন ধরে পেটের ধান্দায় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার সময় মনে পড়ল বড়দির কাছে দুই কুড়ি পাঁচটা টাকা জমা আছে।

সেই টাকাটা নিতে এসেছে। টাকা নিয়ে ব্যবসা করবে।

—কিসের ব্যবসা করবি?—জিজ্ঞেস করল বড়দি'।

—মুই খাঁচা বুনবার পারি, পকখির খাঁচা বানামু—

এখন আর পাখির ব্যবসা নয়, কোন দিন আর পাখি ধরতে পারবে না গয়ারাম। এখন শুধু পাখির খাঁচা বানিয়ে হাটবাজারে বিক্রি করবে।

পল্টু বেয়াড়ার মত প্রশ্ন করল—তুই যে বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছিলি, তার কি হ'ল?

গয়ারামের গলার ভেতর খিত্‌খিত্‌ শব্দের সঙ্গে তার শুকনো কুত্‌সিত মুখের বিকৃত হাসিটা ঠিক কান্নার মত দেখাল। হাসি থামলে পর জামার হাতায় চোখ মুখ মুছে বললো—ল্যাংড়া পোলার ধারে কুন বাপ তার মাইয়া দিবার চায় কও তুমরা।

টাকাটা নিয়ে সেই লাঠিতে ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল গয়ারাম।

কয়েকমাস পরে রাসপূর্ণিমার মেলায় আমি আর পল্টু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার সময় একজায়গায় দেখি আট-দশটা পাখির খাঁচা সাজিয়ে বসে আছে গয়ারাম।

পল্টু বলেছিল—গয়ারাম নিজেই এখন খাঁচার পাখির মত এক জায়গায় আটকে গেছে, বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর কোনদিন পাখি ধরতে পারবে না।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

সমুদ্র

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সুসময়ের সমুদ্র না হলেও চেঞ্জারের অভাব ছিল না। সারিবদ্ধ হোটেলগুলো জমজমাট। সন্ধ্যার পর ঝলমল করে বাতি জ্বলে উঠছে। সকালে দুপুরে টোপর পরে নুলিয়ার দল সদ্য আগত যাত্রীদের ঢেউভাঙা শেখাচ্ছে। সখের স্নান, সখের সাগরতীর, বালির বিছানা। বিছানায় গা গড়িমসি করে বালি আঁচড়াচ্ছে কেউ কেউ, ঝিনুক দিয়ে টোপর ভরছে। আহা কী সুন্দর একটা পাথর পেয়েছি সুভাষ, হাতের মুঠো চোখের সামনে তুলে ধরে যাদুমুঠি খুলে দেওয়ার মতো দেখাচ্ছে, ফক্কা ; কিচ্ছু নেই। তারপর খিলখিল হাসি। সাগর যেভাবে ঢেউ ভেঙে আছড়ে পড়ে হাসতে চায়, অনেকটা সেই নকল করা হাসি। আবার হয়ত হু হু বাতাস এসে সবুজ শাড়ীটা খসিয়ে নিয়ে গেল গা থেকে। ট্রাউজার পরা সঙ্গী ভদ্রলোক, চোখ ইশারা করলেন, কি হচ্ছে তোমার ? আশেপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই, ডোন্ট বি সিলি রাহু। মেয়েটি যেন ওড়না উড়িয়ে দিয়েছিল আকাশে, গুটিয়ে নিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপর ভদ্রলোকের কানে কানে মুখ এনে বলল, হাওয়াটা যেন তোমারই মতো দুষ্টু। তখন খুব বড় মতো একটা ঢেউ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল, ভেঙে পড়ল ফেনা ছড়িয়ে ; মেয়েটাও সেই ঢেউয়ের মতো বালির উপর পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আচমকাই থেমে অভিমান পুষ্ট গলায় বলল, তুমি কি সত্যি সত্যি রাগ করছ সুভাষ ?

না না রাগ করব কেন ! তবে কি জান—সুভাষ খানিকটা সহজ করে নেবে ভেবেছিল রাহুকে, দেখল রাহু তার সমস্ত কাঁপানো চুলের গোছা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছে। চোখের তারায় অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ। সামনে অনবরত ঢেউ : ভাঙছে-ভাঙছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে। ঢেউ আর শব্দ। যেন নাভিকুণ্ড থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছে। সুভাষ কি বলবে ভেবেছিল, ভুলে গেল। রাহু শান্ত হয়ে বসেছে দেখে ওর কাছে উঠে এসে বসল।

সুভাষ বলল, আমি বুঝি দুষ্টু ?

রাহু একপলক চোখ ঘুরিয়ে দেখল সুভাষকে, তারপর চকিতেই আবার উঠে পড়ে বালির উপর হুমড়ি খেয়ে খেয়ে ছুটতে লাগল।

ও কি ? হচ্ছে কি রাহু ? এটা তোমার কলকাতা নয় ......ধমকের সুরে বলল সুভাষ। কিন্তু বাতাসের স্রোতে তখন গলা ডুবে গেল। অসহায় ভাবে ও দেখল রাহু আবার সেই বিবস্ত্র পরীর মতো হালকা ডানায় আঁচল উড়িয়ে ভাসতে ভাসতে অনেকদূর চলে যাচ্ছে। কেমন নির্বোধ মনে হচ্ছে এসময়! রাহুর চপলতার কাছে নিজেকে বড় নগণ্য মনে হল।

সুভাষ আশে পাশে তাকাল। এবং এ সময় সে হয়ত বা অকারণেই কুৎসিতভাবে আঁৎকে উঠল। ও দেখল, লোলচর্মসার এক বৃদ্ধ অত্যন্ত নিকটে বসে সুভাষের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে যথা ঝিনুকের অসারতা। স্ফীত শিরা উপশিরায় সমস্ত দেহ বাঁধা পড়ে আছে। পাথরের মূর্তির মতো নিস্তব্ধতা সর্বদেহে।

সুভাষ বিড় বিড় করে বলল, হাসছেন যে ?

আশে পাশে আবারও তাকিয়ে দেখল অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে কি না বৃদ্ধ ভদ্রলোক ; কিন্তু তেমন কিছু মনে

না হওয়ায় আবার প্রশ্ন করল, হাসছেন যে? আপনাকে তো চিনি না।

আমিও তোমাদের হোটেলেই উঠেছি বাবা। গলার স্বর জড়ান মনে হল ভদ্রলোকের। তোমাদের তো তের, আমার ছ নম্বর ঘর। আবার বলল বৃদ্ধটি।

থাকবেন বুঝি কিছু দিন? স্বভাব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল। লোকটার দৃষ্টিতে সেই অসারতা আবার ওকে আচ্ছন্ন করে দিল। দূরে অন্ধকারে গর্জন গর্জন করতে ঢেউ এগোচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে। বিপরীত দিকে আলো সাজান হোটেলের সারি। রাস্তায় ঘন্টি বাজিয়ে একসঙ্গে পরপর, কয়েকটা রিকসা পেরিয়ে গেল। সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা যোগ সূত্র বাধা আছে মনে হল ওর।

বালির চালে অগণিত লোকের ভীড়। রাণু কোথায়! বড্ড বাড়াবাড়ি করছে রাণু! আজ একটু ধমকে সাবধান করে দিতে হবে ওকে। চীৎকার করে রাণুর নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু সাহস হল না। ভদ্রতার খাতিরে বৃদ্ধটির কাছে ও বিদায় চেয়ে উঠতে চেষ্টা করল।

চলে যাচ্ছ বাবা? আর একটু ঢেউ দেখবে না?

স্বভাব বলল, শরীরটা তেমন ভাল নয় আজ। আপনিই দেখুন। হোটেলেতো আছেনই; আলাপ করা যাবে না-হয় অন্য সময়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢেউয়ের দিকেই তাকিয়েছিলেন, পাশের লাঠিটাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিলেন। তারপর আবার সেই অদ্ভুত রহস্যময় ভাবে হেসে উঠলেন।

স্বভাব খানিকটা সাহস করে এগিয়ে এল এবার, হাসছেন কেন তখন থেকে?

এমনিই হাসছি বাবা। আমার এখন কোন্ কথা মনে হচ্ছে জানো?

স্বভাব কৌতুকে তাকিয়ে রইল।

মনে হচ্ছে, ঢেউয়ের চেহারাটা অনেকটা ঠিক রাণুর মতো। রাণুই তো! রাণু না কি যেন নাম ওর?

মানে? কি বলতে চান আপনি? শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্বভাব। এতক্ষণ তবে ওদের দুজনকেই লোলুপ ভাবে লক্ষ্য করেছে বৃদ্ধটি। এমন নির্লজ্জ লোক আপনি। মনে মনে ক্রোধ সংবরণ করল পর মুহূর্তেই।

বৃদ্ধটি অমায়িকভাবে হাসবার চেষ্টা করছেন এবারও। রাগ করো না বাবা! তোমাদের খুব ভাল লাগল এতক্ষণ। তাই বললাম।

না না রাগ কেন, বসে বসে এই সবই লক্ষ্য করুন। যত সব—

অপেক্ষা করল না স্বভাব। বালির উপর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। অফুরন্ত উত্তাল বাতাসের ঝাপটা লাগছে চোখে মুখে। পুঞ্জীভূত ঢেউয়ের ফেনা হু হু করে বালি চাটতে চাটতে ছুটে আসছে। আবার বালির ছিদ্রের মধ্যে মিলিয়ে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এত নিখুঁত ভাবে ঢেউয়ের চেহারা নজরে পড়ছিল না স্বভাবের। কানের পাশে চিন চিন করে অদ্ভুত একটা অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে আনছিল। এটা কেমন শালীনতা রাণুর! হাজার হাজার লোকের সামনে খিল খিল করে ভেঙে পড়া। আশ্চর্য! এতটুকু যদি বিবেক থাকে ওর। আজ ওকে খোলাখুলি বুঝিয়ে দিতে হবে অবস্থাটা।

বালির উপর ঝাঁকা বসিয়ে চীনেবাদাম বিক্রি করছে ব্যাপারী। একটু ওপর দিকে রাস্তার পারে ঝিনুকের কাজ, শামুক-কড়ি-শঙ্খ, পুঁতির মালা, সাপের চামড়া। ভাঁড় দোলাতে দোলাতে চমচমঅলা চলে যাচ্ছে। স্বভাব একটু দ্রুতভাবে হাঁটবার চেষ্টা করল। সকালে জুতোর দোকানে কী যে এক ছেলেমানুষিই করেছিল রাণু, এখনো ওর মনে পড়ছে। সব কিছুরই মাত্রা থাকে। রাণু কি শেষ পর্যন্ত মাত্রা-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল! গুচ্ছ গুচ্ছ লোক বসে আছে

বালির উপর। রাণু কোথায়? ফিরে আবার বুড়োটার কাছেই চলেই গেল নাতো! সুভাষ থমকে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের বেগ প্রায় পায়ের উপর চলে এসেছিল। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে পালিয়ে বাঁচল সুভাষ।

তারপর অসহায় ভাবে আরো বহুক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াল সুভাষ। কখনো কখনো অন্ধকারে ঢেউয়ের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুমান করবার চেষ্টা করল। অন্ধকারেই মাছ ধরবার জন্য জেলেদের অনবরত গুণ টানা লক্ষ্য করল। পায়ের নীচে একটা কাঁকড়া পড়ল বোধ হয়। বালির ভিতর আরো কিছুটা চেপে ধরল ও।

জুতোর মধ্যে বালি ঢুকেছে বেশ কিছু। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। তবুও অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এক সময় হোটেলেই ফিরে এল।

রঙীন মানুষের আসর বসেছে গাড়ি বারান্দায়। উপরে নিয়ন জ্বলছে। দুনিয়ার মুখে শোনা গল্প আর দশজনকে শোনাতে বসেছে একজন।

কি দাদা, এরই মধ্যে ফিরে এলেন?

সুভাষ বুঝতে পারল, ওকেই লক্ষ্য করে কে একজন বলছে।

স্মিত ভাবে হাসল সুভাষ। তারপর উঠে এল দোতলায়।

ঘর খোলা। অথচ অন্ধকার। তবে কি ফিরে এসেছে রাণু! সুভাষ ওর নাম ধরে ডাকল। এবং যা আশা করেছিল তাই। রাণু ফিরে এসেছে।

অন্ধকার যে? বাতি জ্বালবে না? শুধাল সুভাষ।

না। বাধা দিল রাণু। অন্ধকারই ভাল।

খানিকটা গম্ভীর মনে হল রাণুকে। সুভাষ কথা বলল না। সামনের দরজা খোলা। দরজার পর এক চিলতে বন্ধ অফিসের মতো বারান্দা। বারান্দায় বসে বহুদূর চোখ যায়। দূরে দূরে মানুষ গুলিকে বালির বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড সব ঢেউগুলিকে তীরে এসে আছড়ে পড়তে দেখা যায়। এখানেই রাণু বসেছিল এতক্ষণ। সুভাষ কিছুটা আশ্বস্ত হল।

তবু ভাল। সেই থেকে খুঁজতে খুঁজতে আমার পা দুটোই ক্ষয়ে গেছে। রাণু এবারও কোন উত্তর করল না কথার।

সুভাষ জুতো জামা খুলে বেশ কিছুটা হালকা হয়ে নিল। তারপর রাণুর পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল। তুমি রাগ করেছ রাণু?

হাঁ করেছি। এবার চুপ করে একটু বোস।

খুব রাগ? কৌতুকে প্রশ্ন করল সুভাষ।

এমন সময় হঠাৎই চঞ্চল হয়ে রাণু বলল, দেখ দেখ বুড়ো অন্ধটাকে ধরে আনছে কেমন। অন্ধলোকও সমুদ্র দেখতে আসে।

সুভাষ দেখল। এবং আরো বেশি আশ্চর্য হল ও। সেই বৃদ্ধটি না! লোকটি কি তবে অন্ধ নাকি!

অন্ধ না হলে অমন ভাবে ধরে ধরে আনে কেউ। রাণু বলল যুক্তি দেখিয়ে। তবু ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। অন্ধই যদি হবে তবে সমুদ্র দেখবে কি করে? কি লোভে ও আসবে এখানে। সব জিনিষকে নিয়ে অমন রসিকতা তোমার ভাল নয় রাণু। ছিঃছিঃ লোকটা যদি শুনতে পায়!

সত্যি সত্যি সুভাষের কষ্ট হচ্ছিল বৃদ্ধটির জন্য। অমন ভাবে ওকে কটু কথায় আঘাত করে আসা ঠিক হয় নি ওখানে। কিন্তু, কি করে ও বুঝবে তখন। অমন ঝিনুক ঘলা চোখের দৃষ্টি। বয়সের স্রোতেও তো হতে পারে। তেমন কিছুই মনে করেছিল ও। জানো, লোকটা আমাদের ছ' নম্বরেই উঠেছে।

রাণু বলল, জানি।

অবাক হয়ে সুভাষ তাকাল। হোটেলের সব লোককেই

চেন দেখছি ! বলতে বলতে চেয়ার খানা রাণুর মুখ বরাবর টেনে আনল। আর কাকে কাকে চেন ?

তোমার কি দরকার তাতে ? মুখের সামনে বসলে কেন ! সমুদ্রটা মশাই এদিকে নয়, ওদিকে। ওদিকে তাকাও। রাণু আঙুল তুলে দেখাল।

সুভাষ দেখল শান্ত শিথিল এই রাণুর চেহারা। সমুদ্রের চেহারার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। এতটুকু চটুলতা খুঁজে পেল না রাণুর চোখে। অথচ ঐ অন্ধ বুড়োটার কথা গুলো ওর মনে পড়ে গেলে চাপা ভাবেও হাসবার চেষ্টা করল।

রাণু বলল, সরে বোস. নয়ত বলছি আমি উঠে যাব।

সুভাষ বলল, বুড়োটা তোমাকে কি বলে জানো ?

আমাকে ! অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রাণু।

হুঁ হুঁ, মহাদেবী তোমাকেই। তোমাকে ও সমুদ্র বলে। আর আমাকে বলে দুর্লিদা।

খুব কাব্য করতে শিখেছ আজকাল। সরে বোস। ঢেউ দেখতে পাচ্ছি না।

সমুদ্র কখনো নিজের ঢেউ নিজে দেখে না। ঢেউ দেখত আমরা, অভাজনরা।

বেশ তো তাই না হয় দেখ না বাপু এখন ঘুরে বোস।

সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে ? ভাল বলছ রাণু। সমুদ্রকে সামনে বসিয়ে পিছন ফিরে বসব বলতে চাও !

সুভাষ হাত বাড়িয়ে রাণুকে কাছে টানবার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝতে পারল অন্ধকার ছাড়া এতটুকু বস্তুও নেই সামনে। রাণু ঝড়ের মতো পলকেই সরে গেছে। ঝড় নয়, ঢেউয়ের মতো। গম্ভীর ভাবে ফেঁপে ফুলতে ফুলতে কেমন যেন মিলিয়ে গেল। অথচ এতটুকু শব্দও পেল না সুভাষ। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল। রেলিং ধরে সামনের আকাশের দিকে চোখ পাতল। জল জল করে নক্ষত্র জলছে। অসীম শূন্যতার সমস্ত ভুবন এখন স্তব্ধ। এখনো সাগর বেলার চেয়ারদের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। সারারাত হয়ত পড়ে থাকবে কেউ কেউ। মোদো মাতালের মতো ঝিমন্ত সাগর ছুঁয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে সমস্ত রাত কাটিয়ে দেবে।

সুভাষ নীচে হোটেলের দরজার দিকে তাকাল। বৃদ্ধকে হাতে ধরে নিয়ে আসছে কে যেন। আহা. বেচারা।

টুক করে বাতি জ্বালাল রাণু। পলকেই আলো এসে লাফিয়ে পড়ল ঘরে। সুভাষ রাণুর দিকে তাকিয়ে রইল। তোয়ালে সাবান নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছে ও। রাণু চলে গেলে সুভাষ উঠে এসে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল আবার। তারপর বারান্দায় এসে সমুদ্রের দিকে চোখ পেতে বসে রইল।

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে উথলে উঠে—বালির উপর গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে ঢেউয়ের চেহারাটা খুব স্পষ্ট হয়ে না এলেও অনুমানে প্রতিটি জলের ভাঁজও যেন দেখতে পাচ্ছিল সুভাষ। চোখ বুজল। সেই একই চেহারা। মুচড়ে মুচড়ে অজগর সাপের মতো কাতরাচ্ছে সমুদ্র। ঐ, আসছে আসছে আবার আসছে, ভেঙে পড়ল। অবার ফিরতে শুরু করল কি ! চোখ বুজেই দেখতে লাগল সুভাষ। সঙ্গে সঙ্গে ওর বৃদ্ধটির কথা মনে পড়ল। মরা ঝিনুকের মতো চোখের তারা মেলে ও এই ভাবেই কি দেখতে পায়।

আশ্চর্য ! নিখুঁত ভাবে দেখতে পাচ্ছে সুভাষ। এমন কি চোখ মেলে থাকলেও বুঝি এত নিখুঁত ভাবে এখন দেখতে পেত না ও। অন্ধদের সমুদ্র দেখায় বাধা কি তা হলে। শব্দ থেকে জলের চেহারাটা ঠিক ঠিক ধরা যাচ্ছে। সুভাষ চোখ বুজেই দেখতে লাগল। আশ্চর্য আভিজাত্যর ভরা এই শব্দ। যেন নিকটে কোথাও অভূতপূর্ব এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চোখ বুজে ছাড়া এ ঘটনাকে আঁচ করা অসম্ভব। শব্দের এমন আশ্চর্য যাদুশক্তি, সুভাষ সম্মোহিত হতে লাগল। অন্ধ বৃদ্ধটির কথা বার বার এ সময় ওর মনে পড়ছে। শব্দই অন্ধটির সম্বল। শব্দের অনুভূতিতেই চেহারা আসে বস্তুর। তবে কি রাণুকেও এই ভাবেই নিখুঁত

ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন উনি। রাণুর খিল খিল হাসি, রাণুর পায়ের শব্দ! শাড়ীর শব্দ। ইচ্ছে হল' বৃদ্ধটির পাশে বসে এই মুহূর্তে ও শুধায়, রাণুর চোখ দুটো কেমন বলুন তো? কিংবা রাণুর পিঠে যে কাল পুরুষের মতো এক সারি তিল আছে তাও কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন। কিংবা অঙ্গবাসহীন রাণুকে?

গলা শুকিয়ে আসছিল সুভাষের। অবারিত দাম্ভিক শব্দ এসে সমস্ত অনুভূতি ওর আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। অদ্ভুত ধরণের এক রোমাঞ্চে ওর সমস্ত অনুভূতি ভরে যাচ্ছিল। তবু চোখ খুলল না সুভাষ। চেয়ারের হাতলে বাহু ছড়িয়ে এলিয়ে রইল ও। এই সময় হঠাৎ ও সমুদ্র ও আকাশের মিলন রেখাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করল। স্পষ্ট ও দেখতে পাচ্ছে না তো। বহুদূরে নুলিয়ারা ভাসতে ভাসতে চলে যায়। এখনো এই রাত্রির অন্ধকারেও যেন চলে যাচ্ছে। কাঠের ভেলা ঢেউয়ের নীচে এক একবার করে তলিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে ঢেউয়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে প্রায় আকাশে। কিন্তু সীমারেখাটা কি রকম? কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। বহুভাবে কল্পনা করল, বহুভাবে দেখবার চেষ্টা করল সুভাষ। অনেকটা সরল রেখার মতো কি? কিংবা ঢেউয়ের জন্য সীমারেখাটা বন্ধুর, উঁচু নীচু? আকাশের রঙ ঢেউয়ের রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে কি? তা হলে সীমারেখা বলে কিছুই কি নেই? স্পষ্টত কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছিল না সুভাষ, ফলে কেমন এক অস্বস্তি হতে লাগল ওর। চোখ খুলব কি? না, চোখ খুলল না সুভাষ। নুলিয়ারা ঢেউয়ের মতোই এক একবার লাফিয়ে উঠছে শূন্যে আবার পাতালে নেমে যাচ্ছে। যেন নাচতে নাচতে ঢেউয়ের উপর দিয়ে মাছ ধরতে চলেছে ওরা। একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার নুলিয়া হাজার হাজার কাঠের ভেলা। অর্ধ বৃত্তের মতো প্রকাণ্ড একটা পরিধি নিয়ে ভেলা সাজিয়েছে ওরা। জলের অতল অবধি ছড়িয়ে গেছে জালের কাঠি। নিশ্চয়ই অতি প্রকাণ্ড একটা মাছ উঠবে এবার।

মনে পড়ল আদিম বন্য মানুষেরাও এই ভাবে বনে জঙ্গলে শীকার করতে নামত। অর্ধ বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ হয়ে বন্য মানুষের তাণ্ডব শুরু হত। হাতে বল্লম পাথরের তীর কাঠি, লাঠি, মশাল বন্য জন্তু ভয়ে পালাতে গিয়ে হয়ত বা শীকার হল। নুলিয়ারাও শীকার খুঁজছে। তাই তাণ্ডব এত। প্রকাণ্ড একটা মাছ এনো নুলিয়া! অস্ফুট গলায় যেন বলল সুভাষ। দুধ দেব, ভাত দেব আর দেব ঝিনুকের বিজয় হার; প্রকাণ্ড, সমুদ্রের তলাকার সব চেয়ে বড় মাছটিকে ধরে আনো দেখি নুলিয়া। না না, চোখ আমি খুলব না। সমুদ্রের মাছখানা ডাঙায় এনে তোল আগে, তারপর আমি ছুটে যাব।

সত্যি সত্যি সুভাষের ভয় হচ্ছিল, চোখ খুললে এই মুহূর্তে যদি সব নুলিয়াগুলো পালিয়ে যায়। দিগন্ত ছড়ান অর্ধ-চন্দ্রাকার নুলিয়ার দল এক নিমেষেই যদি উবে যায়। তবে কিস্বপ্ন দেখছে সুভাষ। তাই যদি হয় মন্দ কি! চোখ বুজলে এত সুন্দর দেখা যায় কে জানত আগে। অন্ধলোকটা দৃষ্টি ছাড়াই এসেছে এখানে; না জানি ও কত সুন্দর দৃশ্য দেখছে সমুদ্রের। মুহূর্তের জন্য খানিকটা ঈর্ষা জাগল সুভাষের। কিন্তু ও সামলে উঠে আবার নুলিয়াদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

নুলিয়ারা তাণ্ডব সুরু করেছে জলে। ওদের ভেলাগুলোর সঙ্গে আঘাত খেয়ে ফেনায় ফেনায় একাকার হয়ে উঠছে নোনা জল। দুধ বরণ ফেনা। আকাশের মেঘের মতো হালকা শ্বেত বরণ। হৃদয় যেন ভরে যাচ্ছিল সুভাষের। কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর মনে হল ফেনাগুলো কৃষকায় হয়ে আসছে। কালো কালো এক একটা পাথরের মতো নিষ্ঠুর শক্তকায় হয়ে উঠছে। এবং আকাশ আর সমুদ্রের কোন সীমারেখা নেই তখন; কেবল গম্ভীর একটা আর্তনাদের মতো

শব্দ। ওটা আকাশের শব্দ না সমুদ্রের? পার্থক্য ধরতে পারছিল না স্বভাব। নুলিয়ারা জাল টানছে; তবে কি ওরা মাছটাকে ধরতে পেরেছে এবার। ধরে আনো নুলিয়া, আনো আনো, ডাঙায় তুলে আনো।

ঢেউগুলো কালো কালো সাপের মতো মোচড়াচ্ছে এখন। ফণা মেলে ধরছে, ছড়ান, চক্কর কাটা ফণা; কিন্তু অন্ধকার যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। অন্ধকারেই ঢেউয়ের চেহারা অমন দেখাচ্ছে কি! ধরতে পারছে না স্বভাব।

মনে হ'ল নুলিয়ারা তীরের খুব নিকটে এসে গেছে এবার। হ্যাঁ, ঐ তো জাল টানছে। টানো, টানো নুলিয়া, নিয়ে আসো সমুদ্রের তলাকার সবচেয়ে বড় আর বুড়ো মাছটাকে।

কি রকম হবে চেহারা তার। করাত মাছের মতো ধারাল করাত থাকবে, কিন্তু মস্ত একটা কুঁজ? কিংবা উপরের কঠিন আবরণে শেওলা জমেছে তার। তীরে তুলে আনলে মস্ত একটা পাথরের মতো আলিশান মনে হবে কি! দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিপুল হবে বুঝি। স্বভাব মনে মনে মাছটার আকৃতি আর পরিধি মাপতে লাগল।

নুলিয়ারা জাল টানছে। হাতের গুলি গুলি মাংস পেশি ফুলে ফুলে উঠছে ওদের। মুখের ভাঁজে অদ্ভুত সব রেখার ছাপ ফুটে উঠছে। কাঠের ভেলা গুলো নেমে যাচ্ছে জলের গভীরে, আবার জল থেকে লাফিয়ে উঠছে। কিন্তু, যেন একটা কি ধরা পড়েছে জালে! তুমি কি এখনো বুঝতে পারো নি নুলিয়া? স্বভাব যেন প্রশ্ন করল।

নুলিয়াদের এতটুকু সময় ছিল না তখন। ভারী জালের বোঝায় কাঠের ভেলা যেন উপচে পড়ছে। তবু এতটুকু ক্লান্ত নয় ওরা। স্বভাবকে ওরা তুলে দেখাবে সামুদ্রিক জন্তটাকে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল স্বভাব। নুলিয়াদের কিছু কিছু ডাঙায় উঠে পড়েছে। কিছু কিছু কাঁধে করে ভেলা তুলে আনছে ডাঙার উপর। অর্ধ বৃত্তাকারে জল ঘিরে রেখেছে আর সবাই। পালাবে কি করে মাছটা। বৃত্তটা ক্রমশ নুলিয়াদের চাপে পড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল। ছোট, আরো ছোট হয়ে আসছে। আরো ছোট। আরো নুলিয়া উঠে আসছে ডাঙায়। আরো, আরো জাল গুটিয়ে যাচ্ছে। পালাবে কি করে ও! উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগল স্বভাব।

ক্রমশই সমস্ত জাল গুটিয়ে এল। আর সমস্ত নুলিয়া এক সঙ্গে টানতে টানতে বিপুল আকৃতির কি যেন একটা উপরে তুলে আনল। কি ওটা! অদ্ভুত দর্শন জীবটাকে ঠিক বুঝতে পারছিল না স্বভাব। কালো টোপর মাথায় পরা নুলিয়া সর্দারকে ও শুধাল, হাঁ। হে কি উঠেছে জালে?

নুলিয়া সর্দার বলল, চিনতে পারছেন না শংখ যে।

অত বড় শংখ! পুরো হোটেল বাড়িটার মতো বিপুল আকৃতি যে। অত বড় শংখ হয় কখনো? শুধাল স্বভাব।

নিশ্চয়ই হয়। দেখছেন না শংখের মতো শক্ত আর মুখের কাছে কতগুলি খাঁজ খাঁজ বৃত্ত। দেখুন এই যে এর মুখ।

স্বভাব দেখল। বিরাট গহ্বর। ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুচ্ছে। শংখেরই শব্দ। তবে আরো বেশি বিশুদ্ধ, আরো বেশি গম্ভীর।

নুলিয়া সর্দার বলল, যান না, ভিতরে যান। দেখে আসুন। কত সব বিচিত্র মণিমাণিক্য জ্বলছে, নিভছে, দেখতে দেখতে চোখ আপনার ভরে যাবে।

স্বভাব শংখের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকে অজস্র রঙের খেলার মধ্যে হারিয়ে গেল। সত্যি সত্যি মণিমাণিক্যের গা থেকে আভা বিচ্ছুরণ হচ্ছে। অজস্র আলোর তীর। সূঁচের মতো চোখে মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। পায়ের নীচে নরম কারুকাজ করা বালির স্তর। খানিকক্ষণ এদিক ওদিকে হেঁটে বেড়াল স্বভাব। অসংখ্য

কুঠরী দেখতে পেল। অসংখ্য তোরণ। কিন্তু সমস্ত কুঠরী-গুলো প্রাণ শূন্য খা খা করছে। কুঠরীর পর কুঠরী পেরিয়ে এগিয়ে গেল স্বভাব। গান গাইতে ইচ্ছে হল, চীৎকার করে প্রতিধ্বনি শুনতে চাইল। চীৎকার করে উঠল স্বভাব, রাণু।

সঙ্গে সঙ্গে অজস্র চীৎকার, রাণু রাণু করে সমস্ত কুঠরী যেন ভরে গেল। স্বভাবের মনে হল, রাণুকে সঙ্গে না এনে মস্ত বড় ভুল করেছে ও। রাণু এখন সঙ্গে থাকলে লুকোচুরি খেলতে পারত ও। হুটোপাটি করে এদিক ওদিক যেমন ইচ্ছে ছুটে ছুটে বেড়াতে পারত। একটাও জনমানব কাছে নেই। অন্ধ বৃদ্ধলোকটিও ঢুকতে পারে নি এখানে। রাণু লক্ষ্মীটি আমার, একবার তুমি শত শত টুকরো হয়ে হেসে ওঠ না এবার। না না, এতটুকু রাগ করব না আমি। এখানে তুমি, যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবে ছুটে বেড়াও, গায়ের কাপড় উড়িয়ে দাও, ফুটফুটে পরীর মতো নগ্নতায় ভেসে যাও এতটুকু রাগ করব না আমি। রাণু লক্ষ্মীটি আমার।

এমন সময় স্বভাব আরো বেশি বিস্মিত হয়ে দেখল, শংখের মুখ দিয়ে রাণু আসছে। হালকা আকাশী রঙের শাড়ী পরেছে রাণু। চোখে গভীর করে কাজল মেখেছে, কপালের টিপ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে যেন। সিঁথিটা বড় চওড়া হয়ে গেছে আজ। তা হোক সিঁথির লাল দাগটা অদ্ভুত সুন্দর লাগছে স্বভাবের। চুলগুলি অমন ছড়িয়ে দিয়েছে কেন রাণু; পিঠ বেয়ে ঢেউ নেমেছে চুলের। অফুরন্ত যৌবন যেন মুঠো মুঠো করে নিয়ে এসেছে রাণু।

স্বভাব বলল, এসো, তোমার কথা ভাবছিলাম এতক্ষণ।

আর এর কথা? পিছনে আঙুল তুলে দেখাল রাণু। চিনতে পারছ?

স্বভাব দেখল সেই বৃদ্ধটি। আপনি? আপনিও এসেছেন।

রাণু তখন অবাধ ভাবে হাজার হাজার টুকরো হয়ে হেসে উঠল। আকাশী রঙের শাড়ীটাকে মেঘের মতো উড়িয়ে দিল।

অন্ধ ভদ্রলোক বললেন সমুদ্রকে কি দু হাত দিয়ে ধরে রাখা যায় বাবা, পারবে না।

স্বভাব বলল, আপনি কেন এখানে? আপনাকে তো ডাকি নি আমি।

ভদ্রলোক বললেন, আমি এলেই দোষ বুঝি? কিন্তু ওরা। আঙুল তুলে দেখালেন উনি।

স্বভাব দেখল শংখের শক্ত আবরণটা কোথায় হারিয়ে গেছে। এতটুকু আব্রু নেই কোথাও। আর চতুর্দিকে নুলিয়ারা কালো কালো টোপর পরে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। সবাই উদগ্র হয়ে স্বভাব আর রাণুর দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠল ওর। ফিস ফিস করে বলল, রাণু তুমি এখন স্থির হও। দোহাই লক্ষ্মীটি অমন করে তুমি হেসে উঠো না। দেখছ না ওরা কেমন জ্বল জ্বল করে দেখছে তোমাকে।

তাই বুঝি। রাণু তখন খিল খিল করে হেসে উঠে নুলিয়াদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলতে লাগল।

ভাগ্যিস এত সব শব্দ হয় চতুর্দিকে তাই না আমি বুঝতে পারি, দেখতে পাই; তাই না স্বভাব? চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বৃদ্ধটি।

স্বভাবের তখন চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল। বালির বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে আছড়াতে ইচ্ছে হ'ল। হায় হায়, এ কেমন অবুঝ রাণু। এতটুকু কি শালীন হতে পারে না ও। রাণু রাণু, চীৎকার করে উঠতে গিয়ে স্বভাব বুঝতে পারল, সমস্ত ঘটনাটাই কেমন যেন সাজান, মিথ্যা। আসলে এতক্ষণ ও অন্ধ সেজে চোখ বুজে এই সব দৃশ্য দেখছিল। ফলে কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল ও। পুরোপুরি দৃষ্টি মেলে তাকাল স্বভাব।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। আর সেই আলোর নীচে প্রসাধন সারছে রাণু। চোখে কাজল মাখছে। ঘাড়ের পাশে মসৃণ পাউডারের গুঁড়ো দেখা

যাচ্ছে। পিঠের দিকে হালকা স্ট্রাপ দুটো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে।

কি মশাই ঘুমিয়ে উঠলে তো? শুধাল রাণু।

সুভাষ বলল, হুঁ। শুধু ঘুমই নি রাণু, একটা স্বপ্নও দেখলাম।

রাণু ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, আমাকে তো?

সুভাষ বলল, হুঁ। তোমাকেই। তোমাকে আর সেই অন্ধ বুড়োটাকে।

আহা, বেচারীর জন্য কষ্ট হয়। রাণুর গলায় কাতরতা ফুটে উঠল। চোখ নেই, তবু ওর সাধ মরে নি। সাগরের কাছে ছুটে এসেছে।

সুভাষ একটু কঠোর হবার চেষ্টা করল। তা হোক রাণু। ওর কাছে আর যেও না তুমি। আমার কেমন খারাপ লাগে লোকটাকে। অমন ঘসা ঝিনুকের মতো চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

রাণু নামে একটি মেয়েকে গিলে খাওয়ার রহস্য। তাও বুঝতে পার না বাপু। খিল খিল করে ভেঙে পড়ল রাণু।

সুভাষ দেখল, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই পাক খেয়ে খেয়ে রাণু গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। কলকাতার আলো বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে রাণুকে কোনদিন এমনভাবে উচ্ছল হতে দেখে নি সুভাষ। আশ্চর্য, রাণুর এই উচ্ছলতা কিভাবে ও চেপে রেখেছিল এতদিন। কলকাতার ট্রাম, বাস, ভিড়……একে একে গোটা কলকাতাটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুভাষের মনে হল সমুদ্রটা ওদের জন্য নয়। অন্য কেউ আসবে এখানে। অন্য যাত্রী, অন্য চেহারা। জীবনের অনেকগুলি ভুলের মতো আজও ও ভুল করেছে রাণুকে নিয়ে সাগরে এসে।

বলল, রাণু, কালই আমি কলকাতা ফিরে যাব ঠিক করেছি। এখানকার চেয়ে কলকাতার ট্রাম-বাস, ফুটপাথ, ডালহাউসী অনেক বেশি নিশ্চিন্তের।

রাণু বলল, অন্ধ লোককে এত ভয়! আর যারা চোখ মেলে থাকে তাদের জন্যে তো বললে না কিছু?

অন্ধ বলেই ভয় রাণু। যাক গে, এসব তুমি বুঝবে না এ নে। কালই আমরা ফিরে যাব কলকাতায়। সকালে উঠে গোছগাছ করে নিও।

রাণু বলল, বাতিটা এবার নিভিয়ে দাও দেখি। কালকের কথা কাল ভাবব।

সুভাষ ভীতভাবে বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল দেয়ালগুলো। এখন আবার গর্জন ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছে না সুভাষ। সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাসের মতো গর্জন পাকিয়ে পাকিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। দীর্ঘশ্বাসটা সমুদ্রের না রাণুর, কিছুক্ষণ পর সন্দেহ হওয়ায় অন্ধকারের মধ্যে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে রইল সুভাষ।

অনেকক্ষণ পর রাণুর গলা শুনতে পেলো সুভাষ। রাণু বলছে, ঝিনুক ডুবোবে না সমুদ্রে। এসো। ভয় কি সুভাষ, এসো। ঢেউয়ে তোমার এত ভয়।

রাণুর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যেন সত্যি সত্যি সমুদ্রই ওকে আহ্বান করছে।

সুভাষ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। বিষধর সাপের মতো সশব্দ নিশ্বাস ফেলছে রাণু। পান চিবোনর গন্ধ পাচ্ছে ও। কুম পাফ পাউডারের গন্ধ, আর খুব স্তিমিতভাবে অঙ্গবাসের গন্ধ। গন্ধ আর শব্দ।

সুভাষ অসহায়ভাবে বলল, কোথায়, কোন খানে তুমি রাণু, আমি যে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আঁধারে।

রাণু বলল, তুমি বড় ভীতু হে দুনিয়া। গন্ধ আর শব্দ দিয়ে ধরতে পার না কিছু। এসো এসো, এই দিকে, এই খানে।

রাণু নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আরো জোরে জোরে শব্দ করতে লাগল। সুপুরি এলাচ আর কুমকুমের গন্ধে সারা ঘর আরো তীব্র হয়ে ভরে যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল সুভাষ।

আন্তরিক প্রতিবিম্ব

সত্যেন্দ্র আচার্য

আমি দর্পণে আমার মুখ দেখলাম।

যখন ও বলেছিল, আমার মুখ সম্রাটের মত।

আমি দর্পণে আমার হাসি দেখলাম।

যখন ও বলেছিল, আমি ওর চোখের ওপর হাসলে আমার চোখ খুব সুন্দর হয়ে ওঠে।

ও আমার প্রশংসা করল। বলল, আমি সুন্দর। বলিষ্ঠ। আমার চোখ হাসি, আমার গুণাবলীর অকৃপণ প্রশংসা করলে, আমার ভালবাসার সমাদর দিলে, একদিন দর্পণে আমার ছায়া দেখলাম।

তখন আমার মনে হয়েছিল, এতদিন যে প্রতিবিম্ব আমার চোখের ওপর আয়নায় দেখেছি, আজ তার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আমি কুৎসীত, কদর্য, দুঃখময় চেহারার অতিপরিচিত আটপৌরে একজন ভদ্রলোক। আর আমারি চেহারার প্রতিবিম্ব নিয়ে যে লোকটা আমারি চোখের ওপর আয়নার ভেতর দাঁড়িয়ে, অবয়বে কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও, আসলে অই ছায়ার সঙ্গে আমার অনেক প্রভেদ আছে। কোন মৌল মিল খুঁজে পাচ্ছি না চোখের ওপর।

তখন আমি ওর হাসি দেখলাম।
আমার ঠোঁটের সঙ্গে প্রতিবিম্বের হাসি মেলালাম।
তখন আমি ওর মুখশ্রী দেখলাম।
আমার মুখের সঙ্গে ওর মুখের মিল খুঁজলাম।

আমার প্রতিবিম্বের মত যে লোকটা আয়নার ভেতর দাঁড়িয়েছিল, সে লোকটা, সে সুখী লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলল। ওর সঙ্গে আলাপ করল।

ধন্যবাদ। সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে ওর চোখের ওপর হাসল মেয়েটি। ওর ঘাড়-ছুঁই চুল দুলল। ওর শাড়ির আঁচল হাওয়ায় খসে মাটির ওপর লুটোলে ও খানিক পরে বুকের ওপর তুলল।

প্রতিবিম্ব ওর চোখে তাকিয়েছে। বলল, আপনার-বাবার কথা আমি শুনেছি। খুব খ্যাতি ছিল তাঁর।

যেন অনেকখানি কুঁকড়ে গেল মেয়েটি। ঠিক যেন উত্তর দিতে পারছিল না। তখন ও বলল, আপনার লেখা আমি পড়েছি। ও যেন প্রথম আলাপ থেকে পরিচয়ের আরেকটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল। বলে হাসল।

আমি এতদূর থেকে একক দেখছিলাম, আয়নার ভেতর আমারি মতন অবিকল প্রতিবিম্বটাকে। অবলীলায় মেয়েটিকে আমি দেখলাম। সুষম। সুন্দর চেহারার মেয়েটি। যেন ঠিক এমনি একটি মেয়েকে কোনকালে আমি চিনতাম। খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। যেন ঠিক এমনি একটি মেয়ে আমার প্রশংসা করলে, আমার ভালবাসার সমাদর দিলে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আয়নার আমার আন্তরিক প্রতিচ্ছায়া দেখেছিলাম।

অথচ আজ অই প্রতিবিম্ব থেকে, আয়না থেকে এখন কতদূরে দাঁড়িয়ে। আমারি ছায়ার মত যে প্রতিবিম্ব এখন আয়নায় আমার চোখের ওপর, সেই প্রতিবিম্বের সঙ্গে মেয়েটি কথা বলছিল।

ও প্রতিবিম্বকে বলল, আপনার মত একজন নামী লেখকের সঙ্গে আজ পরিচয়ের সুযোগ ঘটল বলে আমি গর্বিত।

স্বাভাবিক। প্রতিবিম্ব দুষ্টু-গলায় হাসল।

ও এবার অন্তকথায় গেল। বলল, এতদিনের পরিচয়, আমার সম্বন্ধে কিছু জানবার আপনার কৌতূহল নেই? ও চাইল একটু বাঁকা করে।

না।

কেন?

কৌতূহল যাদের ভূষণ সে দলে আমি পড়িনা। পুরুষ আমি। প্রতিবিম্ব হাসিতে শ্লেষ মেশাল।

ও আশ্চর্য প্রশ্ন করল এবার। কোন মেয়ের জন্যে আপনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন কখনো?

আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস অত সস্তা নয়।

ও হাসল। আপনাকে খুসী করবার মত তীক্ষ্ণ প্রতিভা আমার নেই, আপনার লেখার প্রশংসা করবার মত যথেষ্ট প্রবৃত্তির ঘাটতি আছে আমার, তবু যখন এত দিনের পরিচয়—আসবেন না মাঝে মাঝে।

দেখব চেষ্টা করে। হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিল ও।

মেয়েটি হাসল। চেষ্টাতেই তো মানুষ বড় হয়।

লোভ দেখাচ্ছেন? তাহলে নিশ্চয়ই যাব কিন্তু।

ও লজ্জায় হাসল। নখ দিয়ে শাড়ির আচল খুঁটল।

প্রতিবিম্ব আরো কাছে সরে এল। বলল, বড় হওয়ার ব্যাপারে লোভের আমার অন্ত নেই। হাসল। বলল, তাছাড়া অনুমতি যখন হইলই—সুযোগ তবে ছাড়ি কেন। কী বল? প্রতিবিম্ব অবিশ্বাস্যভাবে 'অপনি' থেকে 'তুমি'-তে এসে নামল।

ও হেসে চলে গিয়েছিল। প্রায় পালিয়ে গিয়েছিল।

পরেরদিন সকালে ঘুম ভাংলো অনেক সকালে। বিছানা থেকেই বাইরে তাকিয়ে দময়ন্তীর মনে হল খুব করুণ সকালটা। তারপর সূর্য উঠল। এবং সকালে সোনালী রোদ এসে চুপি চুপি কখন ঘরের অনেক খানি ভিজিয়ে দিল। ক্রমশঃ ঘাসের ওপর এবং অদূরের গাছের পাতায় চোখরেখে মনে হল সকালের চেয়ে সূর্য এখন সতেজ এবং সজীব। একটু আগের কৃষ্ণচূড়ায় এখন সোনারোদে উজ্জ্বল এবং রাঙিয়েছে ফুলগুলোকে।

আর ভাবল না দময়ন্তী। কার্পেটের চটিপরে লনের ওপর এসে দাঁড়াল। রোদ্দুরের ওপর। খোলা হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া ছিল। রোদ ভাল লাগল। দু' একটা চুল হাওয়ায় ঠিক কানের ওপরে এবং পাশে কাঁপছিল।

অবাক হয়েছে দময়ন্তী, অবাক গলায় বলেছে, আরে আপনি?

আাখনা, এই ত সকাল না হতেই চলে এলাম কেমন। প্রতিবিম্ব বলল। সকালের রোদ মাড়িয়ে লনের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছ, খুব ভাল লাগছিল দেখতে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুরি করে দেখেছি কিন্তু।

ও তাকাল। খুব লাজুক চোখে তাকাল। চোরের চাইতে ডাকাতকে বেশী ভয় আমার। ও হাসল।

প্রতিবিম্ব বলল, তবুও বলব, খুব সুন্দর লাগছিল তোমাকে। তোমার চোখে ডাকাত চোর, যাই হইনা কেন দুঃখ আমার যে ভগবান আমায় কালিদাস করেননি, নাহলে একটা উপমা ছুড়ে দিতাম এ মুহূর্তে উপমা কালিদাসস্য। কিন্তু এই ভাল লাগাটা একান্তই আমার এখন।

যেন অভিযোগের গলাতেই দময়ন্তী বলল, বড় যেন দেরী করে এলে। এমন জানলে অনেক আগেই ডেকে আনতাম। প্রশংসার দিনগুলো ভাগে আরো বাড়ত। ও প্রতিবিম্বের হাত ধরল। "ওপরে চল" ও যেতে যেতে ঘাসের ওপর থামল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে নিয়ে তুমি একটা গল্প লিখবে বল!

লাভ?

খালি তুমি লাভ লোকসান নিয়েই ব্যস্ত। হাসল।

ওরা ওপরে এসে দাঁড়াল। দময়ন্তী বলল, লোকসান মানেই ত দুঃখ। না?

প্রতিবিম্ব তাকিয়েছে। হাত ধরেছে ওর।

আমি সুখ চাইনা। ও ব্যস্ত গলায় বলল।

কিন্তু দুঃখ ত তোমাদের জন্যে নয় দময়ন্তী। প্রতিবিম্ব বলেছে, এতদিন ধরে দেখলাম ত এই জগৎটাকে। এই ফুল, পাখি, আকাশ। অথচ দুঃখকেই যেন বড় বেশী করে চিনলাম। সুখ চায়না, আমার চোখে এই বোধ হয় প্রথম তুমিই নজীর হয়ে রইলে। প্রতিবিম্ব এবারে ওর হাত ছেড়ে দিয়েছে। বলছে, এই ঐশ্বর্য বেঁচে আছে তোমাদের, তোমার মা বেঁচে আছেন, লন, ফুল, তবে তোমার দুঃখ এত কিসের? শুধু মরেছেন তোমার বাবা।

ও তাকাতে পারছিল না।

এই তোমার বাবার ঘর?

হ্যাঁ। ওরা এ ঘরে এসে দাঁড়াল।

এ ঘরে তোমার বাবা মরেছেন।

হুঁ।

আত্মহত্যা করেছিলেন।

ও চুপ করে থাকল।

আর এই বুঝি সেই বাবার দুঃখ?

ও কথা বলছিল না।

তোমার বাবা দুঃখ শেষ করে যেতে পারেন নি।

না। ও মুখ তুলল।

দুঃখের শেষ নাই। অনন্ত কালের মত। বিপুল।

ও কথা বলল না।

ওর বাবার জীর্ণ জীবনের কাহিনীভরা ডাইরীর বিবর্ণ পাতাগুলো নাড়াচাড়া করল প্রতিবিম্ব। বলল, তোমার বাবা মৃত্যু চেয়েছিলেন, বাঁচার অর্থ শিখতে চাননি।

ও তাকাল না।

প্রতিবিম্ব ওর হাত ধরেছে। দময়ন্তী, ডেকেছে শান্ত গলায়।

তাকাল ও। বল।

তোমাকে নিয়ে লিখব।

না। ও মাথা নিচু করল।

ঘরে তাকাল প্রতিবিম্ব। এ ঘরে কেউ আসেনা। বহু-দিনের বন্ধ ঘর। এ ঘর কেউ খোলেনা। একটা লোকের বিষম দুঃখ এ ঘরে জমা আছে বলে। মৃত্যু, বদ্ধ মৃত্যু সেই দুঃখকে সব সময় পাহারা রেখেছে বলে। শুধু অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা রাখা আছে টেবিলের এককোণে। ঠিক ফটোর নিচে। ফটোতে বাবা কত দাম্ভিক। অথচ অই বিবর্ণ, ছেঁড়া পাতার ভেতর অই দম্ভপূর্ণ লোকটার দুঃখ কত অসহায়। এই বলিষ্ঠ, অহমিকাপূর্ণ খ্যাতিমান লোকটার দুঃখ কতবার পড়বার চেষ্টা করেছে দময়ন্তী। চোখে জল এসে গেছে। অই দাম্ভিক লোকটার হাহাকার কান্না হয়ে কলম দিয়ে ঝরে ঝরে পাতার ওপর পাথর হয়ে আছে।

প্রতিবিম্ব বলল, এঘরে এলে তোমার মাকে খুব বেশি করে মনে পড়ে।

মাথা তুলতে পারছিল না ও। কোন কথা বলল না।

প্রতিবিম্ব বলল, কোথায় যেন পড়েছিলাম, ঠিক মনে নেই।

মাথা তুলল দময়ন্তী। তাকাল।

অসমাপ্ত ডাইরীর পাতাগুলো অন্যমনস্ক নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, জানো দময়ন্তী, কোথায় জানি পড়েছিলাম: একবার এক দাম্ভিক সম্রাট নাবিকের ছদ্মবেশে সমুদ্র পরি-ক্রমায় বেরিয়ে পড়ল দ্বীপে দ্বীপে ভালবাসা খুঁজতে। সব দ্বীপ, সব বন্দর ঘুরে ঘুরে অবশেষে একদিন ফিরে এল নিজের ঘরে। ভালবাসা খুঁজে পেলনা সে। সেই থেকে সে রোজ চোখ খুলত না রাত্তিরে। আকাশ দেখত না। তারা। জ্যোৎস্না। কিছু না। শূন্য হৃদয় নিয়ে অসহায় হাহাকারের ভেতর ঘুমিয়ে যেত এক সময়। এক রাত্তির সে ঘুমোল না। বহু চেষ্টা করে জেগে থাকল। খুব ভয়ে ভয়ে সে আকাশ দেখল। দেখে চীৎকার করে উঠল। পৃথিবীর কোথাও না,

অতি দূরে, আকাশের এককোণে শুকতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলচে। ভালবাসার মত। সে খুব চীৎকার করে কাঁদল। মাটীর ওপর ভালবাসা নেই বলে। কাঁদতে কাঁদতে সে একদিন অন্ধ হয়ে গেল। সেদিন থেকে আর কেউ কান্না শোনেনি তার।—অথচ লোকটা সম্রাট ছিল।

গল্প থামিয়ে প্রতিবিম্ব সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ মুছল দময়ন্তী। প্রতিবিম্ব কাছে টেনেছে। ঘাড়ের পাশে মুখ রেখেছে।

ও এবার শিশুর মত কেঁদে ফেলল।

প্রতিবিম্ব ওকে জড়িয়ে ধরল বুকের ভেতর। তোমাকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি দময়ন্তী।—এক সময় প্রতিবিম্ব ঘরে ফিরল।

মধ্যাহ্ন সূর্য একসময় ক্লান্ত হয়ে বিকেলে এসে দাঁড়াল। সোনার মতন গোধূলিতে আকাশ ভরল। তারপর সব সোনা মরে গেলে রাত এল। রাত বড় হল। জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। ও রাত্তিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। সে রাত্তিরে দময়ন্তী তারা দেখল। ঘুম এল না। স ফিরল অনেক রাত্তির করে। ক্লাব থেকে। পৌঁছে দিয়ে গেছে স্বার বন্ধু। বাবার বন্ধু ছিল সে। স্বার ঘৃণিত মুখ ওর চোখের ওপর ভাসল। অন্ধ প্রহরের ভেতর দিয়ে ও নির্ঘুমের রাত কাটিয়ে দিল নাবিকের মত।

প্রতিবিম্ব জেগে থাকল সে রাত্তিরে, শেষ রাত্তিরে তারা দেখবে বলে।

একদিন বাড়ি ফিরে আমি খুব চীৎকার করলাম। আমার ঘরের ভেতর আমার মুখোমুখি বিরাট আয়নাটা কে ভেঙে রেখেছে বলে। আমি বাড়ির তোলপাড় করলাম। খুব বকাবকি করলাম। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলে হত্যা পর্যন্ত করব বলে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিছুতেই আমি চুপ হতে পারছিলাম না।

সব সেদিন ঘুমোলে, স্তব্ধ বাড়ির ভেতর নীরবে আমি সুখ স্মৃতির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যে আয়না আমাকে সুখ দিত। যে প্রতিবিম্বের ভেতর আমার সম্রাটের অবয়ব খুঁজতাম। আমি তৃপ্তি পেতাম।

না, অন্ধকারে আমার মুখ দেখা যায় না। খুব কালো আর ঝাপসা, খুব অস্বাভাবিক যেন একটা ভৌতিক প্রতিবিম্ব আমার চোখের ওপর। সেই ভগ্ন কাচের ভেতর আমার মুখ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তেরছা তেরছা কিছু বঙ্কিম রেখা আমার মুখের সম্রাটত্বকে বিকৃত করেছে।

সেই ভগ্ন প্রতিবিম্ব বলল, আমার অনেক কথাই না বলাই থেকে গেল দময়ন্তী। লোভী করে ডেকে এনেছিলে, আজ শোক দিয়ে ঠেলে দিচ্ছ।

ও তাকাল।

সেই ভগ্ন প্রতিবিম্ব বলল, আমি আর তোমার সুখের ঘরে অশুভ চিহ্ন হয়ে দাঁড়াব না। অথচ, একদিন কিন্তু আমারি কাছে মরতে চেয়েছিলে। আজ প্রেমের চাইতে ঐশ্বর্য অনেক বড় হয়ে উঠেছে তোমার চোখের ওপর।

প্রতিবিম্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মুখ থেকে সমাজের কথা শুনল। সম্মানের কথা শুনল। আধুনিকতার রূপ দেখল। ওর মুখে অশোক রায়ের পদমর্যাদা এবং বিত্তের গল্প শুনল।

প্রতিবিম্ব বলল, সত্যি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? কথাগুলো খুব যেন কান্নার ভেজা বলে মনে হল দময়ন্তীর।

দময়ন্তী বলল, হ্যাঁ।

তাতে তুমি সুখী তো? খুব অস্পষ্ট শোনাল কথাগুলো।

হ্যাঁ। ও মাথা নিচু করল। এ আমার অপরাধ নয়।

খুব যেন ভয় পাচ্ছ দময়ন্তী। হাসল প্রতিবিম্ব। পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে তবু কেমন পৃথিবীর ওপর আলাদা হয়ে বেঁচে আছ। তোমার মুখ আমার রক্তের ওপর এঁকে রাখব। যদিও আজ আর তোমার ওপর আমার কোন অধিকার নেই।

ঠাট্টা করছ?

সে স্পর্দ্ধা কি আমার নেই ?

তোমার লেখার ভেতর নিশ্চয়ই এমন বেঁচে থাকব। স্মিত হাসল ও।

লেখা আমার ব্যবসা, কিন্তু তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা আমার নেই। ইজ্জত আছে আমার।

আলো তুমি তেমনিই রয়ে গেলে। কিছুই বদলাল না।

তুমি কিন্তু মত বদলে গেলে আমার চোখের ওপর।

নাকি ? ও ঘাড় বেঁকাল। ঘাড়ের ওপর চুলগুলো রুক্ষ দেখাচ্ছিল।

এত ভাল করে আগে কখনো দেখিনি বোধহয়। আজ যেন খুব সুন্দর হয়ে উঠেছ। যেন অ-নে-ক দিন পরে দেখছি তোমাকে। প্রতিবিম্ব চুল, শাদা ঘাড় দেখল।

আবার অন্য কথায় গেল দময়ন্তী। বলল, কাল তোমার একটা লেখা পড়েছি।

ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই। প্রতিবিম্ব তাকিয়েছে।

না। খুব খারাপ লাগল। যন্ত্রণা আমার ভাল লাগে না। তোমার লেখার ভেতর শুধু বেদনা থাকে। হাহাকার। দময়ন্তী গলার স্বরে অস্পষ্টতা আনল।

হাওয়ায় ওর চুল উড়ছিল। শাড়ির আঁচল কাঁপছিল। একটা নীরবতা ঘরের শূন্যতাকে আরো গভীর করে তুলছিল।

প্রতিবিম্ব দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস ফেলেছে ঘরের ভেতর। "তোমাদের সুখ আমি দেখে যাব মাঝে মাঝে। তোমার বাবার দুঃখ দেখে যাব।"

ও কেঁদে ফেলল। বলেছে, বাবার শূন্য পাতাগুলোর পাশে আমার বেদনাকে সাজিয়ে দিতে পার না? তুমি লেখক তো! ও চোখের জল মুছল না। বলল, তোমার চোখের ওপর আমি মরে গেলাম তুমি দেখলে না। আমাকে বাঁচাবার জন্যে কী করেছ তুমি ?

প্রতিবিম্ব ওকে দেখল। চোখ। ভুরু। ও কাঁদছিল। বলল, আমার কলম আর কখনো কাঁদবেনা। এই দুঃখের ঘরে আর কোন দিনই আসবনা আমি। প্রতিবিম্ব ওর চোখের জল মুছিয়েছে। "লেখক হতে আমি চাইনা দময়ন্তী।"

আমি প্রতিশ্রুত, আমি দুঃখ আঁকব না। নিরলস আনন্দ নিয়ে এই নিত্যকালের পৃথিবী থেকে একদিন চলে যাব। তবুও চোখ বুজলে বড় বেশী জলজল করে জ্বলে। আমি চোখ বুজোই না।

অথচ আয়নাটা আমি কবেই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে।

MURARKA

Makers of High Class Paints, Varnishes, Enamels, Zinc Oxide Dry, Red Lead.

THE MURARKA PAINT & VARNISH WORKS Private Ltd.

(ESTABLISHED—1921)

4E, Dalhousie Sq., 29, Stephen House,
Calcutta.

Telephone { 23 7126 / 28-7627

Telegram : "VARNISH"

সেতু কাঙ্খা সমুদ্র

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন সমুদ্রের ওপর দিয়ে রাশি রাশি পাখি উড়ে গেল। তাদের লম্বা লম্বা ডানার ছায়া পড়ল আমাদের সমুদ্রতটের বাড়িটার গায়ে। আমাদের সেই বিশাল অট্টালিকাটির রঙ ছিল কালো কিংবা ধূসর। থামের কোন রঙই হয়ত ছিলনা। অট্টালিকা কতদিন ধরে যে সেই সমুদ্রতটের ওপর কালো রঙ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানি না। আমাদের একটি ঘড়ি ছিল-সেটার বয়েস আমার অনুমানে ধরে না। শার্সি জানলার মোটা মোটা কাঁচের অংশগুলো ময়লা ও লোনা জলের হাওয়া লেগে লেগে ঘষা হয়ে গেছে।

নির্জন বাড়িটার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমি এই সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাওয়া দেখছিলাম। পাখি দেখার জন্য বাড়ির ছাদের ওপর থেকে নিচে নেমে এলাম। বাড়ির প্রাঙ্গন শেষ হলেই সেই দেউড়ি। বড় দরজার পাল্লায় লোহার বুটি মারা। লোহার বুটিতে জংধরা, হলেও দরজার ভারী কমেনি। দেউড়ি উঁচু, বিস্তৃত, গম্বুজাকৃতি খেলানের থাম বরাবর সরু একটি শিকে-এর সাহায্যে আটকানো বাক্স-আকৃতি একটি ঝুলন আলো। এ আলো কতদিন যে জ্বলেনি! আমি কোনদিন এটা জ্বলতে দেখি নি।

দেউড়ি দরজা শেষ হলেই বালি বালি অজস্র বালি আর অভ্রকুচির মত নানান, চিকচিকে প্রান্তর। বালুকা উড়ছিল। ঘূর্ণি লাগছিল আমার।

পিছন থেকে ছুন্নি বুড়ি আমায় ডাক দিচ্ছিল—কন্তু তুমি ঘরকে এস। তোমার তরে খাবার রেখেছি। সমুদ্দুরে যেও না। চোখে বালি লাগবে। কন্তু, কন্তু—উ!

ছুন্নি বুড়ি ডাক দিয়ে আমার পিছন পিছন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমি সামনের দিকে ছুটছিলাম। নারিকেলের ছায়ার ভিতর দিয়ে আমি ছুটছিলাম। অজস্র পাখি তখন সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। নীল জলের স্রোতের ওপর হাজার হাজার ডানার কাতরানি শোনা যাচ্ছে। সমুদ্রের শব্দ ডাক ও পাখির চীৎকার—কোনোটা কখনও জোরে অন্যটা হয়ত স্তিমিত হয়ে আসছে। আমি ছুটছিলাম। তখন হাওয়ার ঘূর্ণিতে বালুকা লাগছিল হাঁটুতে গালে। কানে চুলের মধ্যে কিড়কিড় করে বালুকা ঢুকছিল। ছুন্নি বুড়ির ডাক আর পেলাম না। ছুন্নি আমাকে কারণে অকারণে বাধা দেয়। ছুন্নির বাধা নিষেধ অবহেলা করে তবুও আমি মাঝে মাঝে ছুটে আসি। আজ এখন আমি ছুন্নির কথাগুলোর প্রমান খুঁজে পেলাম। বালুর ঝড় খেলাধুলো হয়ে আমার চোখে মুখে লাগছিল। আমি ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম কখনও।

চোখ বন্ধ ও খোলা অবস্থায় মাঝে মাঝে আমি সমুদ্রকে দেখে নিচ্ছিলাম। স্রোত ছুটে ছুটে আসছিল। পাখিরা ছুটে যাচ্ছিল। আকাশ ও সমুদ্রকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে যাচ্ছিল। তখন ব্রীজের ওপর ট্রেনটা শব্দ করে করে আসছে। একদিকে মান্ডাপাম ও অন্যদিকে পামবান ষ্টেশন দুটি। মাঝখান দিয়ে এই সেতু রামেশ্বর দ্বীপটিকে যোগ করে রেখেছে। এই

দ্বীপেই পামবান ষ্টেশনের নিকটবর্তী সমুদ্রতটএ আমি দাঁড়িয়ে থাকি প্রায়ই। অজস্র পাখির আনাগোনা দেখি। সেতুর ওপর দিয়ে শব্দ করে করে ট্রেন চলে যায় দেখতে পাই। আমার জামাকাপড় ছেঁড়া ঝলমল করছে। রঙিন জামাকাপড় উড়ছে।

পাখিরা নেমে গেছে; চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে আমি একটা ভাঙা নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে পড়লাম। উপুড় হয়ে নৌকোটা পড়ে আছে বালুর ওপর। কাঠের ফাঁকে এক পা গলিয়ে চিবুকটা নৌকোর কাঠে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা শকুনি শুয়ে আছে। হয়ত মারা যাবে কিংবা রোগ-এ ভুগছে।

শকুনিটা হয়ত মারা যাবে। আমি তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেলাম। ওটা তখন ডানায় ভর দিয়ে ওপরে ওঠবার বৃথা চেষ্টা করছিল।

মুমূর্ষু শকুনিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম। পিছন থেকে কে আমার হাত চেপে ধরল। তাকিয়ে দেখলাম ছুন্নি এসে গেছে। চীৎকার করছে - এসব কি হচ্ছে তোমার ফন্তু! চল পিসিমির বাড়িতে দেখি কি শাস্তি হয়।

ছুন্নি আমাকে নিয়ে চলে গেল। ওপরের ঘরে শিকল তুলে রেখে দিল আমাকে। আমি কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে সমুদ্রের ঝড় শুনতে পেলাম। সমুদ্র গর্জন করছে, জলের তুফান বাজছে।

সেতুর ওপর ট্রেন চলে যাওয়ার গম্ভীর শব্দ শুনতে পাই। ট্রেনের শব্দ ছাড়াও আরো একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে আমার ভাল লাগে। ট্রেন চলাচল ছাড়াও এখানে একটি খেয়া পারাপার করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। সিংহলের কাছে মানার দ্বীপের তালাইমানার ও রামেশ্বর দ্বীপের ধনুষ্কোটির কাছে যাতায়াতের জন্য এই খেয়াপথটি ব্যবহৃত হয়। সেতুর মাঝখান থেকে কিছুটা করে অংশ ভেঙ্গে গিয়ে, দুপাশে ওপর দিকে উঠে গিয়ে এই খেয়া পারাপারের পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। খেয়া পারের সময় এই সেতুটা মাঝখান থেকে ভেঙে, দুপাশে ওপরের দিকে উঠে যেত। আমার খুব অদ্ভুত লাগত এই সেতুটির ক্রিয়াকলাপ। আমি ভেবেছিলাম বড় হলে ওই সেতুটার কণ্টোল রুমে কাজ নেব।

এতদিন ভাবতাম বুড়িটা আমাকে খাওয়ায়, একটু আধটু আদর টাদর করে। এখন বুঝছি সে আমাকে শাসনও করে মাঝে মাঝে। যেনি করে সে আমাকে সামান্য সামান্য শাসনও করতে লাগল।

আমি বাবা ও মাকে ছেলেবেলায় হারিয়েছি। বাবা মারা গিয়েছিল। মা অসুখের যন্ত্রণায় কোথায় চলে গিয়েছিল জানিনা। আমি কেবল ছুন্নিকেই চিনতাম। ছুন্নি আমাকে শাসন ও ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে, গল্প বলে, আমাকে খাবার দেয়।

আমি সমুদ্রের ধারে বেশীক্ষণ সময় কাটিয়ে দিতাম। জেলেদের নৌকোর মাঝখানে বসে বসে সমুদ্রে চাঁদের আলোর ঝাড়লণ্ঠন দেখতাম। আকাশের একটিমাত্র আলোর রেকাবের প্রতিবিম্বকে সমুদ্রের মাঝখানে লক্ষ লক্ষ শব্দ ক'রে তখন ভাঙা চোরা চলত। আমি ছুন্নির আত্মীয়দের মাছধরা দেখবার জন্য এখানে অপেক্ষা করে থাকতাম। যখন মোটা মোটা কাছি ও নারকেল দড়ির জাল দিয়ে মাছগুলো জেলেরা ধরে নিয়ে আসত—দেখতাম। আমাদের বাড়ির রঙ ছিল ধূসর কিংবা কালো থাম খেলান খুব মোটা উঁচু ও শক্ত সমর্থ। বড় বড় কয়েকখানি ঘর, ঝাড় লণ্ঠন অকেজো হয়ে থাকা। দেউড়ির আলোটা চিরকাল ধরে ঝুলত, বাইরের দরজাটাই যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের ছিল। এছাড়া ঘরের মধ্যে কার্পেট বিছানো ও অয়েল পেন্টিং করা ছবি ঝুলত। আমার এসব কিছুই ভাল লাগত না। আমি সব সময় এই সমুদ্রের ধারে নারিকেলের ছায়ায় বসে থাকতাম। সেতুর দিকে তাকিয়ে দেখতাম-কেমন করে ট্রেনটা শব্দ করতে করতে চলে যায়। স্রোত শুনতাম সারাদিন। ট্রেন চলে যাওয়া ছাড়াও

সেতুর আর একটি কাজ ছিল-দুপাশ থেকে ভেঙে, হাঁ করে, জাহাজ পারাপার করা। আমার চোখ নিবদ্ধ হয়ে থাকত সব সময় এইদিকে।

আমি ভাবতাম এত বড় বাড়িতে চিরদিন থাকতে পারবনা। আমি সমুদ্রের ধারে ছোট, খুঁড়েঘর তৈরী করে থাকব। জেলেদের সঙ্গে মিশে মাছ ধরবো। নৌকোয় উঠে হারিয়ে যাব দূর সমুদ্রে।

নৌকোর ধারে যেতে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সমুদ্রের বুকে সেই আকাশের প্রতিচ্ছবি। আমি একেবারে থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নৌকোর ভিতরে একটা ভাঙা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে হাওয়া প্রবেশ করে সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে। নৌকোটা, কাত হয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে ঝোলা ঘাগরা পরা সুন্দর মেয়েটি। ঘাগরার রঙ সবুজ। নাকে নোলক কানে মাকড়ি পরা মেয়েটি ওখানেই লুকিয়ে আছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে একটি স্থির অথচ কম্পিত জীবন্ত এক গিরগিটির দিকে।

মেয়েটি তাকিয়ে আছে গিরগিটির দিকে, আমি মেয়েটির দিকে। গিরগিটির চোখ গলা বাড়িয়ে ধরেছে সমুদ্রের দিকে। আমি নিষ্পলক, মেয়েটির চোখ করুণ পিছন থেকে তাকিয়ে আছে ছুন্নির চোখ। ফন্তু ফন্তু—! এখানে কি করছ!

আমি ছুন্নির কথা শুনলাম না। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ছুন্নি আমার কান মুচড়ে দিল, আমাকে মারল। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আবার ঘরে বন্দী থাকতে হ'ল। কয়েকদিন ঘরে আটক থাকলাম। ছুন্নি আমাকে খেতে দিয়ে যেত। রাত্রে আমায় কাছে নিয়ে শুয়ে থাকত। মাঝে মাঝে ছুন্নি গল্প করতে গিয়ে কাঁদত। আমি তার কান্নার নোনা স্বাদ পেতাম। এক একদিন ছুন্নি ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমোতাম। ছুন্নির গল্প ও কান্নার কারণ আমি অনেক কিছু বুঝতাম না।

এরপর থেকে আমি একটি স্বপ্ন দেখতাম প্রায়ই—সেই মেয়েটিকে। তার চোখ বড় বড় সুন্দর। মোম বাতির মত তার হাত পার গড়ন পেটন। আমি তাকে কাছে জড়িয়ে নিয়ে খেলা করছি। প্রায়ই সেই স্বপ্নটা দেখতাম। স্বপ্নে কথা বলতাম। হাত পার গড়ন দেখতে পেতাম। মেয়েটিকে একবার দেখে যতটা না স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলাম, স্বপ্নে তার অবয়ব ও দেহের স্বাদ স্পষ্ট বুঝতে পারতাম।

কিছুদিন পরে ছুন্নি দূর গাঁয়ে তার আত্মীয়র বাড়ি চলে গেল। যাবার আগে আমায় রান্না করে দিয়ে গেল। বলল এই রান্না রইল। খিদে পেলে খাবে। জল রইল তৃষ্ণা পেলে গড়িয়ে খেও। আমি দিনকতকের ভিতর ফিরে আসছি। কিন্তু যেন সমুদ্রের ধারে যেওনা। মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশবেনা। ওই পুলটার ধারে যেওনা একদম।

এই দিনকতক আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়ালাম। পথে প্রান্তরে ঘুরলাম—সেতুটার কাছে একদিন মাত্র গেলাম। দেড় মাইলের মত লম্বা সেতু। ট্রেনটিকে কাছ থেকে দেখলাম চলে গেল। সিগন্যাল ডেঞ্জার হয়ে গেল। জাহাজ পার হবার জন্য সারচার ব্রীজের মাঝখানটা ভেঙে দুপাশের কিছু অংশ ওপরে উঠে গেল-হাঁ করল। তখন সেতুর চেহারাটা দেখে আমার হাসি পেল। এ আবার কি পুল বানিয়েছে! দেখলাম জাহাজ পার হয়ে গেল সেতুর তলা দিয়ে। আবার সেটা আগেকার মত জুড়ে গেল। আমি সেতুর দিকে আর কোনদিন গেলাম না। কিন্তু সমুদ্রের দিকে যেতে বাধা থাকা সত্ত্বেও আমি যেতে ছাড়লাম না।

ছুন্নি কিছুদিন ধরে আর আসতে পারল না। আত্মীয়র বাড়িতেই রয়ে গেল। ওখানেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি খবর পেলাম সন্ধ্যার সময়। তখন আকাশ সমুদ্রের রঙ নিয়ে মুখোমুখি বসে আছে। স্রোতের শব্দ পাচ্ছি আমি অবিরাম। আমার খাবার ফুরিয়ে আসছিল। আশা ছিঁড়ে যাচ্ছিল সব। ছুন্নি ছাড়া আমি পৃথিবীতে

আর দ্বিতীয় কাকেও জানি না। ছুন্নি ছাড়া গোটা বাড়িটা বেশী ক'রে অন্ধকার হয়ে এল। ছুন্নি কতদিনে সেরে উঠবে! কে জানে! তারজন্য আমি এখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি ছুন্নির চোখের জলের স্বাদ পেলাম সমুদ্রের জলে। ছুন্নির যাবতীয় কথাবার্তা শুনতে পেলাম এখানে বসে বসে। এমনভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলাম যেন ছুন্নি এ-পথ দিয়েই আসবে।

এমন সময় আমার সঙ্গে দেখা হল মুন্নার। বহুদিন পর এই মুন্নাকে দেখলাম—তার চেহারা কেমন হয়ে গেছে। সে ঝলমলে শাড়ি পরেছে। সে আগে ঘাগ্‌রা পরত আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ঝলমলে কুর্তা, দোপাট্টা। মুন্নার জামায় জরির বিভিন্ন কাজ থাকত। আজকাল শাড়ি পরছে। পায়ে রূপোর তোড়া। বালু মাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে সে আমাকে কয়েকটি গোপন পথ দেখাল। যে পথ দিয়ে সে এখানে আসে। মুন্না আসে লুকিয়ে।

মুন্না প্রথম কয়েকদিন কথা বলল অল্প। পরে তার কথাবার্তা বাড়ল। মুন্না তার বাড়ির কথা বলল না, তার পরিচয় দিল না। কেবল বলল তার বাড়ি যাবার কয়েকটি পথ আছে দুর্গম। তাও সমুদ্রের চড়া বরাবর যেতে হয় অনেকখানি। আমি দেখলাম মুন্নার চোখের দিকে, তার আঙুলের নখের দিকে। সেই আগেকার মেয়েটির মত মিল আছে হয়ত। চেহারা আলাদা। আগেকার মেয়েটির নাম আমার জানা নেই। মুন্না তার থেকেও চালাক, একটু গম্ভীর হাসে অল্প। বেশীক্ষণ গম্ভীর থাকে। বারে বারে পায়ের দিকে তাকায়। নখের দিকে চোখ রাখে। পায়ের তোড়া বাজায়। রকমারি রিবনে বাঁধা চুলের বেণী সাপের মত হিলিবিলি দোলে।

আমি হাসছিলাম, মুন্না হাসছিল। মুন্না ছুটতে গিয়ে বালুর ওপর শাড়ি আটকে পড়ল। রোদ্দুরে সমুদ্রতীর ঝলসানো। মুন্নার গায়ে মুখে বালু ঢুকে গেল। তার দিকে চেয়ে আমি হেসে ফেললাম। মুন্নার চোখে জল। কাঠের ওপর সে হোঁচট খেয়ে পড়েছে। আমি তাকে ধরে তুললাম। এই যেন প্রথম আমি গায়ে হাত দিলাম, স্পর্শ করলাম মুন্নাকে। মুন্নার গায়ে হাত দেবার পর মুন্না আমি দুজনেই গম্ভীর হয়ে তাকালাম। মুন্না বার বার লজ্জা পেতে লাগল। আমি তার উন্নত বুকের অংশ দেখতাম। দাড়িম্ব দেখলাম।

আমি কেবল মিল খুঁজছিলাম। সেই আগেকার মেয়েটি যার চোখে ছিল অদ্ভুত কৌতুহল সাহস আনন্দ। এই মুন্নার চোখে আছে গাম্ভীর্য ভালবাসা ও দূরের চাউনী। মুন্না সেই মেয়েটি ও ছুন্নি বুড়ি সবার চোখের জলের স্বাদ; রক্তের স্বাদ আমি পেয়েছি—লোনা। কিন্তু ছুন্নির চোখ দুটী খারাপ হ'য়ে এসেছিল। ভেড়ার পেটের তলাকার মত রঙ হ'য়ে আসছিল ছুন্নির চোখ দুটো। সেই মেয়েটি ও মুন্নার আঙুলের নখ ঝিনুকের মত, নাভিদেশ শাঁখের মুখের মত। আমি ভাবছিলাম আমাদের রক্তে সবায়ের রক্তে কি সেই লোনা স্বাদ রয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে কি আমাদের কোন যোগ আছে। আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছিলাম। বার বার আমার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল। ছেলেবেলায় যে সমুদ্রকে আমি বেশীক্ষণ সময় দেখতাম এখন মুন্নার দিকেই সেই বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

মুন্না আমায় তার বংশ পরিচয় দিতে ভয় পেল। আমার বাড়িটা দূর থেকে দেখে সে ভয় পেল। সে আমাদের বাড়িতে এল না। শুধু আমার খাবার ফুরিয়ে গেলে কয়েকদিন সে আমাকে খাইয়ে গেল। কোঁচড় ভরে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে খাইয়ে গেল। খাওয়া হ'য়ে গেলই সে চলে যেত। আমি ভাবতাম মুন্নার কোন ঘর নেই হয়ত। মুন্না হয়ত খাবারের দোকানে চাকুরি করে। আমাদের বিরাট ঘরগুলো যেন কেমন। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন মায়ের অসুখের কথা চিন্তা করে। মা অসুখের যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে কোথাও চলে গিয়েছেন বাবাকে না জানিয়ে। আর কোনদিন ফেরেন নি। মুন্না আমার বংশ পরিচয় জানতে চাইল না। সে

বাড়িটা একদিন দূর থেকে দেখে চমকে উঠল। জানি না কেন সে আসতে চাইল না।

দিনকতক পর ছুরি ফিরে এল। তখন সে আরো কুঁজো হ'য়ে গিয়েছে। চোখ আরো ঢুকে গিয়েছে। ফিরে এসে আমাকে প্রথম চোটে খুব ভালবাসল। তারপর আস্তে আস্তে তার ভালবাসা আমার ওপর খরচ করতে লাগল। ছুরি আমাকে এমনভাবে ভালবাসতে লাগল যেন আমি কিছুতেই না অধীর হয়ে তার ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ি বা ভালবাসার চোটে তাকে কিছু না জিজ্ঞেস করে ফেলি। তবুও বলব ছুরি আমাকে খুব ভালবাসত।

আমি মুন্নাকে সমুদ্রের ধারে ছোট ভাঙ্গা নৌকোর কাছে এসে দেখা দিতাম। সেখান থেকে আমরা নানান জায়গা ঘুরে ঝিনুক শঙ্খ কুড়িয়ে সেতুর ধার পর্যন্ত ঘুরে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরতাম। পরদিনও দেখলাম সমুদ্রের আলোর প্রতিভাসে মুন্না দাঁড়িয়ে। এবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার বংশ পরিচয়। আমি তাকে সেদিন কিছুই বলতে পারলাম না। বললাম পরে বলব।

বাড়ি ফিরে এসে ছুরিকে জিজ্ঞেস করলাম।

ছুরী বলল-তোমার বাবা এই অঞ্চলে জমিদার ছিল। সব বিক্রি করে দিয়েছিলেন বেঁচে থাকতে থাকতেই। তিনি মারা যাবার আগে তোমাকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন নাকি আমি তোমায় মানুষ করব। করতেই হবে। এ যেন জোরের কথা। তোমার বাবা মারা গেলেন বিষ খেয়ে। মারা যাবার আগে তিনি তোমার মায়ের যাবতীয় স্মৃতি দক্ষিণের ঘরে পুরে তালা বন্ধ ক'রে গেছেন। বলেছেন ফস্ত যেন কোনদিন ও ঘরে না যায়। আর একটিমাত্র ছবি তোমার বাবার ঘরে টাঙান আছে। ছবিটা সাদা। এ ছবিটা তোমার মায়ের। তোমার বাবা উল্টে বাঁধিয়ে রেখে গেছেন। তোমার মা খারাপ মেয়েমানুষ ছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর তোমার মা অন্য পুরুষ ধরে বেরিয়ে গেল। তুমি তখন দোলায় দুলছিলে। খুব ছোট্টটি। সমুদ্রের তুফান উঠেছিল। তার কিছুদিন পরেই তোমার বাবা বিষ খেয়ে মারা গেলেন।

ছুরি সে রাত্রেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল।

অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বলল—তুমি আজকাল ওই মুন্নার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন। অতকরে মুন্নার সঙ্গে তোমার মেলামেশা উচিত নয়।

সে রাত্রেই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম দূরে। এক পাহাড়ী অঞ্চলে।

সেই মুন্না, মেয়েটি, ছুরি বুড়ি, কালো রঙের বাড়ি, সমুদ্র ও পাষাণ সেতুর স্মৃতি নিয়ে আমি চলে গেলাম অনেক দূরে। সেখানে গেলে নিজের সব কিছু অন্ততঃ ভুলে থাকতে পারা যায় সেই নির্জনতার মধ্যে মানুষ সব ভুলে গিয়ে নিজেকে বিচার করবার সুযোগ পায়। নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে।

সেই অন্ধকার অরণ্য ও একটি লোকালয়হীন জায়গায় থেকে আমি যা যা ভুলতে চেয়েছিলাম তার কিছুই ভুলতে না পারায় আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম। এই সমুদ্রের স্মৃতি টুকরো টুকরো হ'য়ে আমাকে গ্রাস করতে লাগল। কয়েকটি অসুস্থ ঢেউ আমার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। আমি সমুদ্রের স্বাদ ও গন্ধ পেলাম। দুঃখ ও অনুশোচনা করলাম—আমি বংশ পরিচয় দিতে পারলাম না বলে।

বেশ কিছুদিন ধরে সেই পাহাড়ি জায়গায় গান বাজনা ক'রে আমার দিন কাটতে লাগল। কিছু পয়সা রোজগার হ'ল।

অবশেষে একদিন ফিরতে হল বাড়িতে। নিঃসঙ্গ সহায় সম্বলহীন জীবন।

সমুদ্র আজো আছে। সেই সেতুটা ফাঁক হ'য়ে তেমনি ক'রে জাহাজ পার ক'রে দেয়। আমার আর হাসি পায় না।

ট্রেন চলে যাওয়া দেখলে আনন্দ পাই। সে আনন্দ আগেকার মত নয়। যান্ত্রিক কৌশল জানবার আগ্রহ বাড়ে।

সমুদ্র আছে। নারিকেলের ছায়ার মধ্যে সেই কালো রঙের বাড়িটিও আছে। কিন্তু নেই সেই ছুন্নি।

সামনের বড় দরজাটা খোলা। সমুদ্রের বাতাসও তাকে হুহাট ক'রে ঘুমতে পারে নি। বাড়ি ঢুকতেই কুলুঙ্গির ভিতর একটা চিঠি চোখে পড়ল। ছুন্নির লেখা।

কস্তু !,

আমার মৃত্যুর সময় তুমি আমার কাছে থাকলে না এটা আমার দুঃখ নয়। দুঃখ হ'ল তুমি এখন কোথায় আছ, কি রকম আছো। আমি যে তোমার জন্যেই এতদিন বসেছিলাম। মরণকে তোমার জন্যেই চলে যেতে বলেছিলাম। আজ তুমি নেই। আমি শূন্য ঘর ফেলে চলে যাচ্ছি। এখন তুমি নিশ্চয় অনেক বড় হয়ে গেছ। তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দিয়ে মারা গেছেন। তোমার মা বংশের কুলাঙ্গার ছিল। সে আমার আর তোমাদের দুটো সংসারকেই নষ্ট করে দিয়ে চলে গেছে। তোমার মায়ের নাম ছিল চিরো। চিরো চিরদিনের মত বেরিয়ে গেছে। তার শোক-এ তোমার বাবা মারা গেছেন। আমি তোমার ভার নিয়েছিলাম। এ ভার আমি ছাড়তে পারিনি। কেন না চিরো দুটো বংশের মুখে কালি দিয়ে সরে পড়েছিল। চিরো ছিল আমার মেয়ে। আমি তোমার দিদিমা। তোমায় এতদিন বলি-নি।

আর একটি কথা-মুন্নার সঙ্গে তুমি কোন দিন মিশবে না। মুন্নার বংশ পরিচয় ভাল নয়। তোমার মাকে তুমি কোনদিন খুঁজতে যেও না। তুমি চলে যাবার পর মুন্না কয়েকদিন সমুদ্রের ধারে তোমাকে খুঁজেছিল। আমি ওকে দেখতে পারি না। তুমি সাবধানে থাকবে। আমি চল্লাম শেষ যাত্রা।

শেষ যাত্রায় মানে শব যাত্রায় বুড়ি চলে গেছে। চিঠি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। ছুন্নি ছাড়া এ বাড়ি বিস্বাদ। তবুও আমার মনে হল ছুন্নি যেন তার আত্মীয় বাড়ি গেছে। বুড়ির মৃত্যু হয় নি। কয়েকদিন কাটলেই সে ফিরে আসবে। আমি সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম। যেন ঐ সমুদ্রের ওপর দিয়েই সে আসবে।

কিন্তু যত দিন চলে যেতেলাগল ভাবলাম দুঃখ শোক যত পুরানো হয় ততই কষ্টের ও দুঃখজনক। বুড়ি আর ফিরল না বলে ভাবলাম হয়ত সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই মৃত্যু সংবাদ যতই পুরনো হ য়ে গেল ততই ভাবলাম বুড়ি হয়ত আর আসতে পারবে না। বুড়ি কোনদিন আর ফিরবে না। চিরোর সব শেষ। সুতরাং আমি কি করব। আমি বড় একা। সমুদ্রে ঝড় উঠল। কাঁদলাম। বাবার ঘরে শুয়ে শুয়ে আমার দিবারাত্র কাটতে লাগল। চিরোর যাবতীয় সব কিছু দক্ষিণের ঘরে পোরা। চিরোর ঘরখানা বাইরে থেকে দেখে ভীত হলাম। ভাবলাম এটা যেন চিরোর কবরখানা তৈরী হচ্ছে।

সেতুর ওপর ট্রেনটা উঠলে সেই শব্দ আমার শুনতে ভাল লাগে। আমি সেই শব্দ শুনতে ভালবাসি। ট্রেনটা সেতুর ওপর উঠুক, ঝড়ের পাগলামি বাড়বে. ট্রেনটা বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঝড় খাবে। ও আমার শরীরে নেশা ধরিয়ে দিত।

আমার মধ্যে কয়েকটি বাসনা ছিল তা নষ্ট হ'য়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেলাম ও কষ্ট সহ্য করতে শিখলাম বলে, বুড়ির মৃত্যু দেখলাম বলে, জীবনের ওপর আমার ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়ছিল, ঘন হচ্ছিল। আমি মানুষের গন্ধ নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠছিলাম হাওয়ার মধ্যে নিজের জীবনের অস্তিত্ব খুঁজছিলাম অথচ তখন কিছুতেই জানতে পারিনি যে আমি কতবড় হয়ে গেছি। অথচ আমার ধারণা ছিল সেই মুন্নার মত, আমি মুন্নার মতই আছি। আমার মন ও দেহটা দুটো আলাদা আলাদা চেহারা তৈরী করছিল।

সেতুটার দিকে প্রায়ই যেতাম। ওখানের কন্ট্রোল রুমেই আমার চাকরি হ'ল। সেতুটাই আমায় চাকরি দিয়ে দিল। আমি দিবারাত্র এই সেতুর যান্ত্রিক কৌশল জানবার জন্য আগ্রহে এটাকে চেপে ধরলাম। চাকরির জন্যে নয় অভিজ্ঞতার জন্য।

৩৭৪০ ফিটের মত লম্বা এই সেতুটির ওপর ঝড়ের প্রাবল্য হেতু ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এ্যানিমোমিটারের সাহায্যে এই পামবান ভাইডাক্ট পরিচালিত হয়। বায়ু চাপ এর আধিক্য হলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। এ কারণে এখানকার যান্ত্রিক ব্যাবস্থা এমনি সুষ্ঠু যে সিগন্যাল চালক নিজের ইচ্ছায় সিগন্যাল ফেলতে সক্ষম হবে না। বায়ু চাপ-এর আধিক্য হ'লে সিগন্যাল সর্বদা ডেঞ্জার থাকবে।

আমার কাছে এই সেতুর যান্ত্রিক কৌশল এত চমৎকার মনে হয়েছিল। আমি এই ব্রীজের চাকরি নিয়ে থেকে গেলাম। মাঝে মাঝে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবতাম হয়ত তুমি ও অন্যান্য সকলে ফিরে আসবে। মুন্না ফিরে আসবে। কিন্তু কেউই এলনা। কয়েকদিন কুয়াশা জমে রইল সমুদ্র তীরে, আমার বাড়ি, সমুদ্রতট অস্পষ্ট হ'য়ে রইল।

কোন মোটরলঞ্চ বা নৌকো জাহাজ এসে পড়লে দুটি ষ্টেশনের কেবিনে ফোন ক'রে জানিয়ে দিয়ে সিগন্যাল ডেঞ্জার ক'রে পুলটা খুলবার জন্য ওপরে লোকজন পাঠিয়ে দিতে হ'ত।

সেতুটা আমায় চাকরি দিলে কিন্তু তবুও আমার কোথায় এক অসহ্য যন্ত্রণা রয়ে গেল। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বাকি সময়টা মানুষের স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একদিন দেখা হ'ল আর একটি মেয়ের সঙ্গে। তার শরীর ছিলছিলে. রোগা, ফর্সা। সে সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছিল। বলল আমার শরীর খুব অসুস্থ। নিকটের এক হোটেলে এসে উঠেছি। আমার কেউ নেই। অথচ শরীরটা এত অসুস্থ যে সারান দরকার। আমি তার চেহারার মধ্যে মুন্নার চেহারার ছাপ রয়েছে দেখলাম।

পথে আসতে আসতে সে বলল আমার নাম মুনমুন।

কিন্তু আমার মনে হ'ল বারবার—সে যেন মুন্না মুন্না।

মুনমুন বাড়িটা দেখে এবার আশ্চর্য হ'ল না। শুধু চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মুনমুন এবার বলল ফন্তু তুমি কি আমায় থাকতে দেবে। আমার কাছে বাড়িটা স্যানাটেরিয়ামের কাজ করবে।

মুনমুনের শরীর অসুস্থ। জামা কাপড় পরে চোখে সুর্মা লাগিয়ে মুনমুন তার অসুস্থতাকে ঢাকতে চাইছে। আমি দেখছিলাম মুনমুনের পাতলা কাগজের মত রক্তহীন ফর্সা দেহটা কাঁপছে।

আমি ভাবছিলাম সমুদ্র আমাকে সব সময় কাছে টানছে। সমুদ্রের মধ্যে আমার এক অপূর্ব মায়া আছে। সমুদ্রের কালো গভীর স্রোত আমায় টানছে সর্বদা। আমি সমুদ্রের লোনা স্বাদ পাচ্ছিলাম। ঝিনুক ও শঙ্খ দেখছিলাম। আমি ভাবছিলাম সমুদ্রটার জলে কোন অসুখের রঙ দেখা যাচ্ছে। সেই অসুখের রঙ চাপা পড়ে যাচ্ছে স্রোতের আবরণে।

মুনমুন আমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে এ বাড়িতে উঠল। মুনমুন আমি আলাদা আলাদা ঘরে থাকলাম। মুনমুন খুব অল্প কথাবার্তা কলে। বেশীক্ষণ সময় সে চেয়ে থাকে এ বাড়িটার বিভিন্ন জিনিসপত্র ঘরের কারুকার্য ও ছবিগুলোর দিকে। মাঝে মাঝে কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ও সেতুর ওপর ট্রেন চলাচল প্রভৃতি দেখতে থাকে।

মুনমুন আমায় চাকরীর কথা জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম ওই সেতুটার মাঝখান থেকে কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়ে দুপাশে উঠে যায়, ভেঙে যাওয়া সেতুটা তারপর

তল' দিয়ে জাহাজ নৌকা পার হ'য়ে গেলে ওটাকে কাছে এনে আগেকার মত করে নেওয়া হয় ট্রেন চলাচলের সুবিধা মত।

ঝুনঝুন বলল, যদি সে সময় ট্রেন এসে পড়ে।

আমি বললাম না, সিগন্যাল তখন ডেঞ্জার থাকে।

ঝুনঝুন আবার বলল, অত হাওয়ায় সেতুর ওপর ট্রেন যায় কি ক'রে।

হাওয়া বেশী হ'লে ট্রেন যাওয়ায় অসুবিধা আছে। বিপজ্জনক।

ঝুনঝুন বলল, তাহলে কি করে জানছ যে হাওয়া বেড়ে গেছে ট্রেনের পক্ষে বিপজ্জনক!

ওটা আফসে ডেঞ্জার হ'য়ে যায়। সিগন্যালার ইচ্ছে করেও সিগন্যাল ফেলতে পারবে না।

ঝুনঝুন হাসল খিল খিল ক'রে। তারপর আবার অসুস্থ বোধ করল।

আমি ঝুনঝুনের শরীর দেখছিলাম। ওকে ডাক্তার দেখাব কি ভাবছিলাম।

ঝুনঝুন ভয় পেয়ে গেল। না না না ডাক্তার নয়। যদি ওরা কিছু জিজ্ঞেস করে বসে। আমার কোন রোগ নেই। আমি ভাল হয়ে যাব। বাড়িটা তোমার যেন স্যানাটোরিয়াম।

আমি ঝুনঝুনকে এ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম। ঝুনঝুনের জন্যে আলাদা ঘর ঠিক হয়েছিল। ঝুনঝুন ক্রমশ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। আমি ওকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই। না জানানর জন্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিলাম। আমি বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম। সে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছিল চারিদিকে। সব ঘর দেখান হ'য়ে গেলে আমি ঝুনঝুন তালাবন্ধ ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঝুনঝুন জিজ্ঞেস করল এটা কি ঘর। বললাম এ ঘরের বিষয় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। এটা আমার মায়ের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ঝুমি বলে গেছে বাবার নাকি বারণ আমি কোনদিন এটা দেখতে পাব না।

ঝুনঝুন হাসল খিলখিল করে। জানি ফস্ত!

কি করে জানলে তুমি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই।

ঝুনঝুন হাসল। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালাম।

ঝুনঝুন ক্রমশ আমার ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছিল। আমি ঝুনঝুনের অসুস্থতার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ঝুনঝুন আমার ঘনিষ্ঠতার জন্যে তাকিয়ে ছিল। আমি ঝুনঝুনের ঘনিষ্ঠ হওয়া চাই না। ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে তাকে জানিয়ে দিতে চাই একটা কথা।

ঝুনঝুন ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা কিছু বুঝলনা। অথচ ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে আমার কোন কথাবার্তা শুনতে চাইল না। ঝুনঝুন আমি কেউই কারো কথা বলতে পারছিলাম না। সকলেই ভাবছিলাম ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এলে আমরা হয়ত তা প্রকাশ করব। কিন্তু আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না কখন আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এসেছিল। অথচ এই ঘনিষ্ঠতা জানবার অনেক আগেই আমরা উভয়ে ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। ভালবেসে ফেলেছিলাম।

ঝুনঝুন জানে তার কথাটাই সত্যি। আমি ভাবি হয়ত আমারটাই ঠিক। ঝুনঝুন ও আমার কথাবার্তার মধ্যে হয়ত অনেক পার্থক্য জড়িয়ে আছে। হয়ত কেউ আঘাত খেয়ে যাব। তাই কেউ কাউকেও প্রকাশ করলাম না।

ঝুনঝুন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে কালো রঙের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি সমুদ্রের গন্ধ নেবার জন্যে আকুল হই। অমি ঝিনুক কড়ি শঙ্খের দিকে তাকিয়ে ঝুনঝুনের পরিচয় খুঁজি। সমুদ্রের নোনা স্বাদ নিয়ে ঝুনঝুনের স্বাদ একাকার করি।

আমি জানি সমুদ্রের রূপের মধ্যে কেমন অদ্ভুত এক অসুখের রং আছে। সমুদ্রের কালো গভীর দুটি ঘূর্ণি সর্বদা আমায় টানছে। আমি নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করছি কিন্তু বারবার সেই কালো দুটো গভীর ঘূর্ণি আমাকে টানছে। ঝিনুক কড়ি ও শঙ্খ আমার কাছে শব্দ করছে।

আমি জানালা কপাট বন্ধ করলেও সেই সমুদ্রের নোনা হাওয়া শব্দ ক'রে ছুটে আসে। আমার ঘরের কাঁচের সার্সিতে ছাপ দিয়ে যায়। আমার দেহে নোনা ছড়িয়ে দেয়।

আমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি সমুদ্র আমার এত কাছে এসে গেছে আমি কোনোদিন তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারব না। আমি সমুদ্রের শব্দ পেতে থাকব। সমুদ্রের গর্জন, নোনা স্বাদ সমুদ্রের রূপ এসব অবহেলা ক'রে সরিয়ে রাখতে পারব না।

ঘরের ভিতর থেকে চিত্রোর যাবতীয় স্মৃতি মুছে গেছে। চিত্রোর স্মৃতি এখন দক্ষিণের তালাবন্ধ ঘরে হাঁপিয়ে মরছে। বাবার ঘরে একমাত্র একখানি ছবি চিত্রোর—যা উল্টো ক'রে বাঁধিয়ে রেখে গেছে বাবা। বাবা এটা 'নিষ্ঠুরের মত', লোকজনকে জানাতে চেয়েছে। চিত্রোর ছবিখানা ঝিনুক দিয়ে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান। আমি একদিন এ ছবিটার ওপর আক্রমণ চালালাম। মুনমুন অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিল। ছবিটা সরিয়ে রাখতে সে হেসে উঠল। ছবিটা ভেঙে ফেলতে নষ্ট করে দিতে মুনমুন আঘাত পেল। আমি মুনমুনকে তার এই হাসি ও আঘাত খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। মুনমুন বলল কোন কারণ নেই। তারপর স্থির হ'য়ে বলল ফক্স এটা ত তোমার মায়ের ছবি ছিল—তাই না। আমি বললাম তুমি কি ক'রে জানলে। মুনমুন স্থির হ'য়ে গেল। অসুস্থ হ'ল আবার।

মুনমুন আমি দুজনেই কিছু বলতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু দুজনেই কিছু বলতে না পেরে থেমে গেলাম। আর থেমে যাবার পর এলাম একটি ঘরে। সেই ঘর পার হ'য়ে চোর কুঠুরি দিয়ে আরো একটি ঘর, আরো একটি ঘর। অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে আসতে আসতে আমাদের ভয় করছিল। মুনমুন কাঁপছিল। তবুও আমরা আরো কয়েকটা ঘর পেরিয়ে এসে হাজির হলাম ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘরে। এখানের জানালা দিয়ে সমুদ্র ও সেতুটাকে দেখা যায়। আকাশের রঙ মেঘে তখন সমুদ্র কাঁপছে। ঝড় উঠেছে বাইরে। আমি মুনমুন দেখলাম ট্রেনটা ঝড় জলের ভিতর সেতুর কাছে এসে বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেনটা ঝড় জলের তুফানে আটকে গেছে এ দৃশ্য আমি মুনমুন দেখতে লাগলাম বহুক্ষণ ধরে। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার হাত পা সারারাত মুনমুনের দেহের ওপর ছিল।

পরদিন ঘুম ভাঙার পর দেখলাম মুনমুনের চোখের কোল বসে গিয়েছে। গালে দাগ, জামা ছেঁড়া, দেহটা পড়ে আছে। আমি মুনমুন অসুস্থ হয়ে রইলাম। মুনমুন আমি দুজনেই অসুস্থতা থেকে সুস্থ হবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সেতুর ওপর ট্রেনের বিপর্যস্ত হওয়ার দৃশ্য দেখার পর মুনমুন আরো লোভী হয়ে উঠেছিল। আমরা সেই দৃশ্যটা দেখার জন্য ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলে যেতাম। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর আবার আমরা সেরে উঠতাম।

সমুদ্রের গর্জন আমার শরীরের চারপাশে ঘিরে ধরল আমি সমুদ্রতটে সর্বদা কড়ি শঙ্খ ও ঝিনুকের মেলা দেখলাম। ভাবলাম সমুদ্রের নোনাটা আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। আমি ভাবতাম সমুদ্রের গভীর দুটি ঘূর্ণি স্রোত, কালো, আমাকে সর্বদা টানছে। আমি কিছুতেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারব না।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ছুরি বুড়ির কথা আমার মনে হত। আমি ভাবতাম বুড়ি কেন আমাকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করত।

মুনমুন আমি দুজনেই সেই অন্ধকার ঘরে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়তাম। সেখান থেকে সেতুর ওপর ট্রেনের ঝড় জলের মধ্যে বিপর্যস্ত হওয়ার দৃশ্য দেখতাম।

কিছুদিন ধরে মুনমুন একটা স্বপ্ন দেখছে। সারচার সেতুটা মাঝখান থেকে কিছুটা করে অংশ ভেঙে ওপর দিকে উঠে যায়। জাহাজ পার করে দেবার পর সেতুটা আবার

জুড়েছে। মুনমুনের স্বপ্নটা আমার আছে যেমন ছেলেবেলার মত। মুনমুনের স্বপ্ন তার নিজের কাছে বড় আদরের। আমি যে সেতুর স্বপ্ন দেখে চাকরি পেলাম মুনমুন সেটাকে শরীরে জড়িয়ে নিলে। সেতুটা আমায় চাকরি দিলে। মুনমুনকে দিয়ে গেল আদর। অনেক আদর।

আমি মুনমুনের অনেক কথা বুঝিনা। মুনমুন আমার অনেক কথা বোঝে না। এখানেই মুনমুন আমি আলাদা। আমি ভেবেছিলাম সেতুর কন্ট্রোলরুমে চাকরি নিয়ে অনেক পয়সা ক'রে গয়না গড়িয়ে দেব মুনমুনকে। তা হল না। মুনমুন আমার কাছ থেকে সেতুটার ইতিহাস জেনে নিয়ে সেতুর, স্বপ্নটা নিয়ে যেন অনেকটা সফল হ'য়ে গেল মনে হল।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মুনমুনের চারপাশে অনেক ছেলে-মেয়ে বউ ভীড় ক'রে আছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম শঙ্খধ্বনি করল কেউ। কেউ উঠে পালাল। কেউ হাসল। কেউ বলল—আমাদের নাকি সন্তান হয়েছে।

আমি যেন আঘাত খেলাম। এ আমার পাপ। আমার মুনমুনের পাপ হয়েছে। আমি ভাবলাম আমি আর একবার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। যেমন ক'রে আমার বংশ পরিচয় জানবার পর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম কয়েকবছর। এ আমাদের দোষ হয়েছে। আমি জ্বলতে লাগলাম। সারাটা শরীরে কষ্ট অনুভব করলাম।

এই কষ্ট অনুভব করতে করতে দূরে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করতে গিয়ে আবার আমি সমুদ্রের গর্জন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাতাসের ঝাপটানিতে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু বিস্মৃত হতে চাইলাম। কিন্তু, আমি ভাবলাম এই সমুদ্র কড়ি শঙ্খ ঝিনুক সর্বদা আমাকে কিছু একটা স্মরণ করিয়ে দেবে আমি সমুদ্র কড়ি শঙ্খ ঝিনুকের মায়া ত্যাগ করতে পারব না।

আমি মুনমুন সমুদ্রের ধারে কড়ি শঙ্খ ঝিনুক কুড়িয়ে জড়ো করলাম আমাদের ছেলেবেলাকার মত।

সেতুটা আমায় চাকরি দিয়ে গেল। আর মুনমুনকে দিয়ে গেল আদর। সারা জীবনের এক আদর।

আমি মুনমুন দুর্যোগের সময় মাঝে মাঝে সেতুর ওপর ট্রেনের বিপর্যয় হওয়ার দৃশ্য দেখতে চাই। এ দৃশ্য দেখতে আমাদের দুজনের খুব ভাল লাগে।

আমি মুনমুনের বাচ্চা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকি। মুনমুনের সঙ্গে আজকাল বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় না। কিছুদিন ধরে আমি মুনমুনের বাচ্চাটিকে দূর থেকে লক্ষ্য করতে লাগলাম, তার শরীর, চোখ মুখ সবকিছু। আমি মুনমুনের থেকে বাচ্চাটির প্রতি বেশী অনুরক্ত হলাম। আমি দেখলাম সমুদ্রের কালো দুটি ঘূর্ণি আমাকে আজো টানছে। সমুদ্রের নোনা আমার দেহের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেছে। কড়ি শঙ্খ ঝিনুকের শব্দ চারিদিকে শব্দ করছে। আমি ভাবলাম সমুদ্রের একটা বিপুল শক্তি রয়েছে। চারিদিকের সবকিছু জড়িয়ে এক করে দেবার শক্তি আছে। কিছুদিন ধরে সমুদ্র শঙ্খ সেতু একটা দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে জড়িয়ে রইল। ক্রমশঃ দূরের কিছুটা অংশ ফাঁকা হল, আরো কিছুটা অংশ রোদ্দুরে নীল ও খয়েরী হ'য়ে এল। জলে ভিজল, রোদ্দুরে ঝলমলে হয়ে উঠল। দূরের স্রোত যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সেটা আমার দৃষ্টিশক্তিতে ধরা পড়ল। কাছের স্রোত পুথুল হংস বলাকার মত। সমুদ্র সেতু শঙ্খের অনেক রকম অবস্থার দৃশ্য আমার দৃষ্টি গোচর হল। কুয়াসা, মেঘ, রৌদ্র ছায়া বর্ণচ্ছটা বর্ণালী, স্নিগ্ধতা সবই যেন আস্তে আস্তে ব'য়ে গে'ল এক এক ক'রে। আমি ভাবলাম বাচ্চাটা বড় হ'য়ে উঠছে এখনই হয়ত মুনমুনকে সবকিছু গোপন কথা খুলে বলা ভাল। তাতে সেও সন্দেহমুক্ত হবে আর আমিও। সমুদ্রের ওপর একে একে বড় জল মেঘ ও রৌদ্র, আলো ছায়া ও সমুদ্রের রঙিন কতকগুলি অবস্থাকে আমি নীরবে ক্ষয়ে যেতে দিলাম। মুনমুনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। সারাদিনে দুটি কি একটি কথা হয়। বাকি সময়টা আমি চাকরি করি,

অন্যমনস্ক থাকি। আর মাঝে মাঝে আমি এই বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখি সমুদ্রের প্রতি এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার মাথায় শরীরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আমি দেখি সেই বাচ্চাটিও ঝিনুক ও শঙ্খের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছে। সমুদ্রের শব্দ থেমে এসেছে যেন।

অবশেষে আমি একদিন বলেছিলাম ঝুনঝুনকে—। বলেছিলাম ঝুনঝুন আজ যে তুমি একজনের 'মা' হয়ে বসে আছ—তা তুমি কি জান তোমার নিজের মায়ের পরিচয়।

ঝুনঝুন বলেছিল জানি আমার মা যে তোমার বড় চেনা গো!

এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সমুদ্রকে বড় করুণ ভালবাসার বস্তু মনে হত। মনে হত কি যেন সব একাকার হয়ে গিয়ে পাপবোধ বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের। এই সেতু শঙ্খ সমুদ্র সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আমি কাঁদতাম ঝুনঝুনের কাছে নয়—অন্ধকারে আড়ালে। ঝুনঝুনও কাঁদত আমার কাছে নয়-গোপনে। আমি ঝুনঝুন কাকেও ধরা দিতে চাইনি, বহুকাল ধরে আমরা কেউ কাউকে ধরা দিলাম না। তবে বুঝলাম যে এই ঝুনঝুন আমি আমাদের দুটো ক'রে দেহ আবিষ্কার করে নিয়েছি। একটি দেহ আমাদের মিলনের ভালবাসার যেটা সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আর একটি দেহ ভাবছে। ঝুনঝুনের একটি দেহ মিলনের, সন্তানকে মানুষ করবার জন্য এবং অপরটি কেবল ভাবছে। আমার একটি দেহ মিলনের অন্যটি অন্যমনস্ক ভাবছে।

আমাদের এই মিলনের দেহ ছাড়া বাকি এই অন্যমনস্কতার দুটো চেহারাকে আমরা কিছুতেই চিনতাম না। আমরা একজন আর একজনের কান্না শুনতে পেতাম না।

আমরা বুঝতাম আমাদের এই দেহটার দুটো চেহারা আলাদা আলাদা হ'য়ে ঘুরছে সেটা কিছুতেই ধরা পড়ছে না। অথচ সেই অনেকদিন আগেকার শরীরকে চিনতাম না বলেই আমরা হিমসিম খেয়ে যেতাম।

আমাদের মিলনের পর, বিশ্রাম কিংবা সন্তানকে ভালবাসার পর কিংবা সেতুর শঙ্খ সমুদ্রের শেষ রঙ উজাড় হ'য়ে যাবার পর আমরা অন্যমনস্কতায় আলাদা চেহারা নিতাম। অন্যমনস্কতায় সেই ছোট ছোট গাছ ভর্তি ছোট রঙিন অস্পষ্ট পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হতাম। আমরা চিরোর কাছে। আমি যে পথ দিয়ে চিরোর কাছে হাজির হতাম ঝুনঝুন সে পথ দিয়ে নয় অন্য পথে যেত। আমি মাঝে মাঝে ওর পথ অনুসরণ করবার চেষ্টা করলেও মাঝপথে প্রায়ই হারিয়ে যেতাম। ঝুনঝুন প্রতিবারেই তার পথ বদলাতো আমি বা ঝুনঝুন পরিচিত কিংবা নতুন, রঙিন অস্পষ্ট ছোট পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চিরোর স্তনপান ক'রে আসতাম। কিন্তু আমরা সর্বদা যাওয়া এবং আসার অদ্ভুত বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করতাম বারবার। আমরা কেউ কাউকেও ধরা দিতাম না।

উৎসবে উষা সেলাই কলই শ্রেষ্ঠ উপহার

উৎসব উপলক্ষে সর্বদেশেই প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। উপহার হিসেবে উষা সেলাই কলের একটা বিশেষত্ব আছে। উষার ৫টি মডেলের প্রতিটি কারুকার্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। আধুনিক উষাকলে সেলাই করে আপনার অবসর আনন্দে ভরপুর করে তুলুন।

শ্রেষ্ঠ মেশিনে সেলাই করুন—

উষা

কলে সেলাই করুন

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

JEM/6/480

কান্না

বিজনকুমার ঘোষ

সুদীর্ঘ কাল পর দেখা। পুরীর সী বীচে।

আমি প্রথমে দেখতে পাইনি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রাণভরে সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছিলাম। আর আড্ডা দিচ্ছিলাম। অমিয় বলল, এ্যাই তোকে যেন কে ডাকছে। ফিরে তাকিয়েই দেখি বড়বৌদি। এই সুদীর্ঘ কাল পর, তা প্রায় বছর বারো হবে, বড়বৌদি কালো বৌদির কথা স্মরণে থাকলেও তাদের মুখের আদল ভুলে যাবার কথা। কিন্তু দু'জনের মুখেই এমন কয়েকটি বিশেষত্ব আছে যে তা কিছুতেই হারাবার নয়। লোলচর্মসার বৃদ্ধা হলেও বলে দেওয়া যায় এ কালো বৌদি, ও বড়বৌদি। তা প্রায় সেই অবস্থাতেই পৌঁছে গেছেন বৈ কি। চেহারার দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক দিয়েও। আগে চেতলার বাসায় যখন ছিলাম তখন দু' বৌদির মুখে সিনেমার গল্প যেন খই ফুটত। এখন পুরীতে এসেছেন যখন বুঝতেই হবে ধর্মকর্মে মন বসেছে।

বন্ধুদের বললাম, এরা আমার আত্মীয়া হন। তোরা থাক, আমি একটু আসি—

বড়বৌদি বললেন, সেকি, সেজদা. কোথায় উঠেছেন?

—কোথায় আবার উঠব—আমি বললাম, বন্ধুদের সঙ্গে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি।

—নিজেরাই বুঝি রেঁধেবেড়ে খান?

হ্যাঁ, তা বৈ কি—

—দেখেছ কাণ্ড—বড়বৌদি বললেন। চলুন আমাদের সাথে থাকবেন। কয়টি তো বন্ধু। জুটেছে ভাল—।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। কেননা, চেতলা বাসার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নিজেরা রেঁধে খাই এ কথা বলা ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল, অন্যে রেঁধে দেয়! বললাম, থাক থাক, ওসব হাঙ্গামায় পড়বেন না। বন্ধুরা রাজী হবে না—

—কেন রাজী হবে না? কালো বৌদি চোখ পাকিয়ে উঠলেন: আমরা ছোট জাত নাকি যে আমাদের হাতে খেতে দোষ হয়?

আমি হেসে ফেললাম।

—সেজন্য নয় বৌদি। ওরা একটু হৈ হল্লা পছন্দ করে, ঘরে বড় কেউ থাকলে তেমন জমবে না তাই।

—তাহলে আপনি চলুন না সেজদা?—বড়বৌদি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

—তা কি করে হয়?—আমি বিব্রত বোধ করলাম: সবাই একসঙ্গে এসেছি. এখন কি আলাদা থাকতে পারি?

—তাহলে এবেলাটা থাকবেন চলুন?

কালো বৌদি ফোড়ং কাটলেন, অবশ্য গরীবের বাড়ীতে যদি না আপত্তি থাকে।

মনে মনে ভাবলাম, এদের হাতে যখন একবার পড়েছি

তখন আর এড়ানো যাবে না। চেতলার বাসার অভিজ্ঞতা আছে। বললাম, আচ্ছা চলুন।

—মা কেমন আছেন? -যেতে যেতে বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভাল।

—বাবা?

—বাবা দেশে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাই।

—সেজদা আপনি বিয়ে করেছেন?—কালোবৌদির চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল হঠাৎ। আমি কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। লজ্জিত বোধ করলাম। একটু পর উনি-ই বললেন, বড্ড পর হয়ে গেছেন আজকাল, একটা নেমন্তন্ন চিঠি দিয়েও পুঁছলেন না।

—সবার-ই বিয়ে হবে কেবল আমার রেণু-ই বড়বৌদির কণ্ঠস্বর কেমন করুণ শোনাল এবার।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রেণুর কি এখনো বিয়ে হয় নি?

—তবে আর বলছি কেন?—বড়বৌদি মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমি মনে মনে একবার হো-হো করে হেসে উঠলাম। রেণুর এখনো বিয়ে হয় নি! বেশ মজার কথা যাই হোক। তবু নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বড়বৌদির পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।

—কোথায় আছে রেণু?—জিজ্ঞাসা করলাম।

—বাসায় রেখে এসেছি চলুন।

এইবার হাসির কথাটা খুলে বলি।

হ্যাঁ, হাসির-ই ব্যাপার বটে। সেই কবে এক কালে চেতলার ভাড়াটে ছিলাম, তখনো হেসেছি, আজও হাসছি। এমন দীর্ঘস্থায়ী হাসি বোধ হয় আর কেউ কখনো হাসে নি।

আবার ভগ্নীপতি অন্যত্র বদলী হয়ে গেলে আমরা পাঁচ ভাই চেতলা রোডের এক বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসি। বাড়িতে আমরা বাদে আরো দু'ঘর ভাড়াটে ছিল। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের মাথার ওপর যিনি থাকেন তিনি বড়বৌদি। চেহারায়, বয়সে সব কিছুতে তাঁকে বড় বড় মনে হয় তাই বড় বৌদি। স্বামী আর একমাত্র মেয়ে রেণুকে নিয়ে তাঁর সংসার। আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটে হচ্ছেন কালোবৌদি আর তাঁর স্বামী নরেশদা। গায়ের রং কালো দেখে কালোবৌদি নামটা আমি-ই ঠাট্টা করে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে কালোবৌদি দাঁড়িয়ে গেছে।

দু'বাড়ির ভিতর আত্মীয়তাও রয়েছে প্রচুর। বড়বৌদির স্বামী কালোবৌদির নিজের দাদা। তাই বড় বৌদি তাঁরও বৌদি। আর এই দুই বাড়ি মিলিয়ে তাঁদের একটি মাত্র সন্তান, রেণু। রেণুর বয়েস সতের আঠার হবে। দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবতী, স্নিগ্ধ চেহারা রেণুর। বেশ মিষ্টি মুখশ্রী। তবে অতিরিক্ত ধরণের লাজুক। যতটুকু লজ্জা মেয়েদের অঙ্গের ভূষণ, মনে হত তার চেয়েও বাড়াবাড়ি রকমের বেশী। দিনে রাতে কখনো দেখা যেত না রেণুকে। পাছে দেখা হয় সেইজন্যে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। ছাদে উঠবার সিঁড়িতে বারান্দায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে এমন ভাবে মাথা নিচু করে চলে যেত যেন দেখে ফেলে মস্ত বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছে।

তবে বড়বৌদি কালোবৌদি দু'জনেই সম্পূর্ণ অন্যধরণের। দু'জনেই খুব আলাপী। যাওয়া মাত্র নিজে সেধে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। বুঝিয়ে দিলেন, এ বাড়ির কোথায় সুবিধে, কোথায় অসুবিধে লুকোনো আছে। আমাদের ঘরের তিন দিকে জানালা নেই, একদিকে ছোট দুটো জানালা। তাই আলো-বাতাস ভীষণ কম। বাড়িতে এত গুলো ভাড়াটে, কল পায়খানা-বাথরুম মোটে একটি করে। মানিয়ে চলতে হবে সবার সঙ্গে।

আমি বললাম, বাড়িওলাকে বললে ?

—হ্যাঁ, তবেই হয়েছে—বড়বৌদি বললেন, দেখুন না, আমাদের ঘরে ছাদ দিয়ে জল পড়ছে আজ দু'বছর ধরে, আর দু'বছর বাড়িওলা কেবল-ই বলে আসছে সিমেণ্ট পেলেই সারিয়ে দেবে। তা আজো দিয়েছে, কালও দিয়েছে—

—ভাড়াটেরা এতে থাকে ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন থাকবে ? যতদিন না পায় থাকে, ভাল বাসা পেলেই চলে যায়। আপনাদের এ ঘরে তো লোক কেবলি আসছে যাচ্ছে। দেখা যাক, আপনারা ক'দিন থকেন।

বললাম, আপনারা যান না কেন ?

—আমাদের কি সে সুবিধে আছে। আর ভাড়াটেদের অবস্থা সব জায়গাতেই সমান। তাছাড়া—

এই পর্যন্ত বলে বড়বৌদি থামলেন। আমি চোখের দিকে তাকালাম।

—তাছাড়া এটা আমার শ্বশুরের বাড়ি। শেষ বয়সে শ্বশুর দেনার দায়ে বিক্রী করে গেছেন। তাই ভাড়াটে হলেও তার ভিটেতেই থাকতে চাই।

কালোবৌদি বললেন, দেখবেন এ পাড়ায় বাড়িওলাকে কেউ জানে না। সবাই বলে, রায় বাহাদুরের বাড়ি। ওই জন্যেই তো আছি—

—আপনার বাবা বুঝি রায় বাহাদুর ছিলেন ?

—হ্যাঁ। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছিলেন। —কালোবৌদি একটু হাসলেন। সে হাসিটা অন্য ধরণের।

মনে মনে ভাবলাম, ইংরেজ আমলের ডাকসাইটে রায় বাহাদুরের বাড়ির ভাড়াটে আমরা। রায় বাহাদুরের মেয়ে, পুত্রবধূর সঙ্গে দিব্যি কথা বলছি। একটুও বুক কাঁপছে না।

পরদিনই রায় বাহাদুরের বংশধরদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখলাম। আমার দুই দাদা খেয়ে দেয়ে অফিস চলে গেলেন। ছোট দুই ভাই, ওরাও ইস্কুলে চলে গেল। আমি বেকার, তাই বাড়ি পাহারা দেবার ভার আমার ওপর। দুপুরে জানালা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম নতুন বাসার কাণ্ড-কারখানা।

উঠোনের মাঝখানে এঁটো বাসনের পাহাড়। দুই ননদ-ভাজে মাজতে মাজতে এক মনে সদ্য দেখা কোন সিনেমার গল্প করে চলেছেন। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম অমুক কুমারের কি রকম অভিনয়, তমুক দেবীর প্রেম নিবেদনের চেষ্টা শাস্ত্রসম্মত কিনা—ইত্যাদি। হঠাৎ সিনেমার গল্প থেমে গেল। শুনতে পেলাম কালোবৌদি বলছেন, আমাদের রেণুর অমন বিয়ে হয় না বৌদি ?

—কেমন বিয়ে আবার ?

—ওই যে সিনেমায় যেমন ভাব করে বিয়ে হল।

—হ্যাঁ, আমার তাতে আপত্তি নেই—বড়বৌদি বললেন, নায়কের মত অমন চেহারা, বিলেত ফেরৎ ডাক্তারের সাথে প্রেম করে বিয়ে করবে তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে সেই যে একটা সিনেমায় দেখেছিলাম, বড়লোকের মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় গরীবের ঘরে গেল ওতে আমার সায় নেই। একটা মাত্র মেয়ে—ও কেন কষ্ট করবে ?

কালোবৌদি বললেন, হাজার হলেও রায় বাহাদুরের নাতনি ! আমাদের না হয় পোড়া কপাল, তাই বলে ও দুঃখু করতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

বুঝলাম, রেণুর বিয়ের আলোচনা। বাঙ্গালী ঘরের সতের আঠার বছরের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এ ছাড়া আর কি উপাদেয় আলোচনা হতে পারে ?

মাঝে মাঝে রায় বাহাদুরের স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় কথাবার্তায় সাধারণ গর্বের ভাব প্রকাশ পেলেও দুই বৌদিই ছিলেন অতি মাত্রায় সরল। বস্তুত, তাদের সরলতা আমাকে মুগ্ধ করত। কলকাতায় পাশের বাড়ির লোক পাশের বাড়ির খবর রাখে না। কিন্তু এদের মনোভাব তার বিপরীত। খবর নেবার থেকে দেবার তাগিদটাই বেশী

লক্ষ্য করতাম। আর সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রেণুর বিয়ে। কোন্ সিনেমার নায়কের মত বর হলে রেণুর পাশে মানায়, কি রকম টাকা পয়সা থাকলে রেণুর জীবনটা হেসে খেলে গড়িয়ে যায়, তার আলোচনাতেই দিনের বারো আনা ভাগ কেটে যেত। এমন কি ক'টা ছেলেপুলে হলে রেণুর রূপ চলে যাবে না অথচ শরীরের বাঁধুনিও অটুট থাকবে তারও হিসেব দাখিল করতেন কালোবৌদি। কেন ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনবেন না? দু' বাড়ি জড়িয়ে ওই একটা মাত্র মেয়ে রেণু। তার ওপর রায় বাহাদুরের নাতনী। সে রকম ভাগ্য হলে এতদিনে রাজরাণী হয়ে বসতে পারত! গল্পের বইতে, সিনেমায় গরীবের মেয়ের রাতারাতি বড়লোক হতে দেখা যায় অনেক। একটু চেষ্টা করে দেখলে রেণুর ভাগ্যে কি আর অমন হতে পারে না?

সেদিন দুপুরে একা একা বসেছিলাম। বড়বৌদি হাসতে হাসতে এলেন।

—জানেন সেজদা, আজ রেণুকে দেখতে আসবে।

—তাই নাকি? —আমি বললাম, তাহলে তো সুখবর। ছেলে কি করে?

অমনি কোথা থেকে কালোবৌদি ছুটে এসে ছেলের গুণ-কীর্তন আরম্ভ করে দিলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে বড়বৌদি; আবার বড়বৌদিকে থামিয়ে দিয়ে কালোবৌদি গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। ছেলের অশেষ গুণ। তবে বোঝাই দুষ্কর। দু'জনের উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে যেটুকু সার পদার্থ গ্রহণ করতে পারলাম তার অর্থ হচ্ছে: ছেলের নাম মৃনাল সোম। স্কুল ফাইনাল পাশ। দেখতে রাজপুত্রের মত। যাদবপুরে নিজের বাড়ি আছে—ইত্যাদি।

আমি বললাম, বেশ বেশ। পনের দাবী খুব একটা হাকায়নি তো।

—না না। ওই তো একমাত্র ভরসা। মেয়ে পছন্দ হলে শাঁখা সিঁদুরেই নিতে রাজি। শত হলেও আজকালকার ছেলে তো।

তারপর আরম্ভ হলে সাজগোজ।

বলতে গেলে দুপুর থেকেই সারা বাড়িতে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। সাজ সাজ রব। এমন কি ভাবী বরের সঙ্গে কি রকম ইয়ারকি দিলে মানায় তারও একটা মৌখিক মহড়া হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় বর এল। সেই সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব। বড়বৌদি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি না হলে নাকি ভাবী বিয়ের আসর সরগরম হবে না।

আহা, এই নাকি রাজপুত্রের মত চেহারা! বন্ধুগুলিও তেমনি জুটেছে। যেন রকবাজি করতে করতে উঠে এল। যদি কলকাতায় বাড়ি থাকে তো তার পক্ষে এসব অঙ্গের ভূষন। রেণুর জন্য সত্যি দুঃখ হতে লাগল। বেচারা একেই লাজুকলতা, তার উপর ফক্কর ছোকরাদের পাল্লায় পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবার মত অবস্থা। এর জন্য আমি বড়বৌদিকেই দোষ দেব।

—আহা ন্যাকা মেয়ে, মুখ তোল না? ওই তো তোর বর সামনে বসে রয়েছে।—কালোবৌদির মন্তব্য।

সুযোগ পেয়ে ছোকরাগুলি লাফিয়ে ওঠে।

—নিশ্চয়ই, এবার থেকে আমরা বৌদি ডাকব। মাইরি বৌদি বেশ ভালই দেখতে।

আরেকজন ধমক দিয়ে উঠল, এ্যাই পেঁচো, চুপ কর শা—

কথাবার্তা শুনে উঠে আসতে ইচ্ছে হল। তবু অভদ্রতা হবে ভেবে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর এর জের চলল সাত দিন ধরে। সারা বাড়ি অস্থির হয়ে পড়ল। ভাবখানা এই যেন পাকা দেখা হয়ে গেছে। কি কি খাওয়ানো হবে, ক'জন বরযাত্রী আসবে। তারই হিসেব করতে বাকী আর এরকম সর্বগুণযুক্ত বর নাকি হাজারে একটা মিলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ঝড়ের আগে যেমন স্তব্ধতা, তেমনি কিছুক্ষণ শান্ত থেকে বাড়িটা আবার ফেটে পড়ত রাগে দুঃখে। এমন বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে। রাজপুত্রের মত দেখতে না ছাই! টাকা থাকলেই মনটা বড় হয় না। কপালে থাকলে রেণুর এর চেয়েও অনেক ভাল ঘরে বিয়ে হবে।

আশ্চর্য হলাম। এই একজনকে এত তাড়াতাড়ি আকাশে উঠিয়ে আবার নিচে নামানো হল কিসের জন্যে? পরে বড়বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। ছেলের পছন্দ হয়েছিল মেয়ে দেখে। কিন্তু বাবাই বেঁকে বসল। বারশো টাকা পণ দিতে হবে। বড়বৌদি আটশো পর্যন্ত উঠেছিলেন। এবং তার ফলেই নাকি বিয়ে নাকচ হয়ে যায়।

আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম।

কিছুদিন পর আবার আরেকটি সম্বন্ধ এল! এবার নাকি আরো ভাল। কলকাতার উপর ছেলের বাড়ি নেই বটে তবে প্রত্যেক দিন এখানে কমপক্ষে চারটি ট্যাক্সি ভাড়া খাটে। তাদের অনেক আয়। ছেলে এবার আই, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। রং কালো হলেও রেণুর পাশে বেমানান নয়।

ভাবী শ্বশুর এসে একদিন মেয়েকে দেখে গেলেন। এবার ছেলে নিজেই দেখতে আসবে। নির্দিষ্ট দিনে দেখি বড়বৌদি কালোবৌদি সেজেগুজে সিনেমা দেখতে চলেছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেকি, আজনা আসবে?

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? আপনি তো আছেন।

—আমার থাকাতে কি হবে?—তারপর হেসে বললাম, ও, দাদারা বুঝি আজ সামলাবেন।

—না, তারাও আজ অফিস থেকে দেরী করে ফিরবেন।

—তাহলে?

দুই বৌদির মুখে যেন হাসি আর ধরে না।

—রেণু ঘরে থাকল, আর ছেলেও একলা দেখতে আসবে। তারপর বুঝলেন না?—কোন্ সিনেমাতে যেন এরকম দেখিয়েছিল বড়বৌদি?

বড়বৌদি বললেন, প্রেমের পথে।

—ঠিক বলেছেন। ওতে এমনি করে ভাব হয়েছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার পরে সিনেমা থেকে ফিরে এসে আমার মুখে ব্যাপারটা শুনে হতাশ হয়ে বসলেন দু'জনে। আরাধ্য 'ভাবটি' তাদের মনোমত গড়ে ওঠেনি রেণুর একগুঁয়েমীর ফলে। ছেলে ঠিকই এসেছিল। নিচের ঘরে বসিয়ে রেখে দোতলায় রেণুকে ডাকতে যাই। ছেলের নাম শুনে রেণু দড়াম করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। অগত্যা ছেলের সঙ্গে আমি বর্ধমানের ধানের দর নিয়ে আলোচনা করি। পয়সা খরচ করে পাশের দোকান থেকে চা মিষ্টি এনে খাওয়াই।

বহুদর্শী কালোবৌদি মন্তব্য করলেন, প্রথম প্রথম ওরকম লজ্জা সবারই হয়। আমাদেরও হয়েছিল। পরে সেরে যায়। তাই না বৌদি?

এর পরেও রেণুর ভাবী শ্বশুর আসতে লাগলেন প্রায়ই। যথারীতি আলোচনা উঠতে লাগল উচ্চগ্রামে। এমন কি মেরাপ বাঁধবার লেকেরা পর্যন্ত এসে দেখে গেল ছাদ। ভাবলাম, এবার বুঝি বিয়ে না হয়ে যায় না। কিন্তু হঠাৎ একদিন চুপচাপ। বড় বিমর্ষ দেখাতে লাগল বাড়িটাকে। এবার বৌদিদের পক্ষ থেকেই গররাজি। বড়বৌদি বললেন, জেনে শুনে কেন অমন ঘরে বিয়ে দিতে যাব? ও কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

—আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল?

—হবে আবার কি? ছেলে ফেল করেছে।

—এই মাত্র?

—আর ছেলের ঠাকুমার কি যেন অসুখ। হাসপাতালে থাকে। এখন আপনিই বলুন, দশটা পাঁচটা না, একটা মাত্র মেয়ে। ঠিক করেছি কি না?

সায়দি, ঠিক করেছেন বৈ কি।

রত্নমকে একই দৃশ্যের বারবার প্রদর্শনী। আশ্চর্য, এতে কোন বৌদির-ই ক্লান্তি লাগত না। যে কয় বছর আমরা চেতলায় ছিলাম, দেখতাম প্রায় প্রত্যেক মাসেই এমনি ছুটো একটা হুজুগ লেগেই থাকত। প্রথম প্রথম নিমন্ত্রনের লোভে উৎসাহিত হতাম। পরে বিরক্ত-ই বোধ করতাম। এ যেন একটা বিলাস। আশ্চর্য, কোনবার একটু এদিক ওদিকও হত না। প্রথমে ছেলের প্রশংশায় মুখরিত হত সারা বাড়ি। তারপর একটু চুপচাপ। দম নিয়ে আবার আরম্ভ হত উচ্চ কণ্ঠে ছেলে পক্ষের নিন্দে। একবার এ পক্ষের, একবার ও পক্ষের খুঁৎ ধরতে টরতে বছরের পর বছর বয়ে যেত চেতলা রোডের বাসায়। রায়বাহাদুরের নাতনীর আর গতি হত না।

এরপর আমরা বাসা বদল করে বাগবাজারে চলে যাই। তখন স্বাভাবিক ভাবেই বৌদিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ পড়ে যায়। আসবার সময় অবশ্য রেণুর জন্যে ভাল ছেলের খোঁজ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না। আমি কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেতাম রেণুর বিয়ের সম্বন্ধ জোয়ারের জলের মত আসছে, আবার ভাঁটার টানে ফিরে যাচ্ছে।

তবু এত বছর পরেও যে একটা মেয়ের জীবনে সেই একই নিয়মে পুরোনো খেলাই চলেছে এটা আমার কাছে অসম্ভবই মনে হল। এ কি অদৃশ্য বড়যন্ত্র, না অন্য কিছু? অথচ রেণুর বিয়ে হতে বাধা কোথায়? মোটামুটি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী। লাজুক, নম্র। তার ওপর রায়বাহাদুরে একমাত্র নাতনী হওয়ায় বাপ-মা সাধ্যের অতিরিক্তই খরচ করতে রাজি। তাহলে? কি জানি, কে সুতো ধরে কি উদ্দেশ্যে নাচায়?

বড়বৌদি একটা বাড়ির কাছে এসে বললেন, এই যে সেজদা এসে গেছি। ওখানে জল আছে, পা'টা ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসুন, চা করে দিচ্ছি।

চা খেতে খেতে গল্প উঠল। সেই আদি অকৃত্রিম রেণুর বিয়ের। বড়বৌদি কৰিৎকর্মা আছেন। পুরীতে পূণ্য করতে এসেও রেণুর বিয়ের চিন্তায় অস্থির। এর ভিতরেই ওর জন্যে ভাল একটা সম্বন্ধ জোগাড় করে ফেলেছেন। ছেলে কলকাতায় কি এক কোম্পানীতে কাজ করে—ইত্যাদি।

কিন্তু আমি রেণুর কথাই ভাবছিলাম। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল ভারী। এত বছরে চেহারায় কি কোন পরিবর্তন এসেছে, না এখনো সেই লজ্জাবতী লতাই আছে? সুযোগ এসে গেল হঠাৎ। কালোবৌদি আবার অতিরিক্ত চা-খোর। এক কাপ চায়ে তার কুলোয় না। এই সময় বলে উঠলেন, রেণু দেখ তো, কেটলীতে আর চা আছে কিনা?

রেণু উত্তর দিল, হ্যাঁ, আছে।

—তাহলে নিয়ে আয়।

রেণুকে দেখলাম এবার। সটান ঘরে ঢুকে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রোগা হয়ে যাওয়ায় দেহটা তাল-গাছের মত লম্বা দেখাতে লাগল। সুন্দর মুখের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে গেছে। বরং হাড় উঠে গিয়ে সারা মুখ জুড়ে বিশ্রী পাকা পাকা ভাব। বয়েস? তা তিরিশের কাছাকাছি বৈকি। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম ওর ব্যবহারে। আমাকে দেখে ওর লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু তা তো হলই না, দিব্যি পাল্লা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আর বৌদিদের সঙ্গে যতক্ষণ আমার ওর সম্বন্ধের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে লাগল ও ততক্ষণ হাসতেই থাকল। ছেলের গুণপনার কথা শুনে ও নিজেই শুধু হাসছে না, ওর নাক মুখ চোখ সর্বাঙ্গ-ই যেন ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠছে খিল খিল করে।

কালোবৌদি মুখ ঝাম্টা দিলেন, আ মর মুখপুড়ি! বিয়ে হবার নাম নেই, তার আবার হাসি—

বড়বৌদি বললেন, যা রেণু, ছুটো চাল বেশী করে ধুয়ে রাখ। সেজদা আজ আমাদের এখানে খাবে।

রেণু চলে গেল। একটু পরে দুই বৌদিও উঠে গেলেন। আমি একা একা বসে ভাবতে লাগলাম, এই নির্লজ্জ হাসির অর্থ কি? একি বিদ্রূপের হাসি, না কান্নারই নামান্তর।

ভুল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগষ্ট মাসের এক সকালবেলায় বিধুভূষণ নামক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক অফিসে যাওয়ার জন্য কলেজ ষ্ট্রীটের এক বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাস্তা গিলতে গিলতে দোতলা বাসগুলো একটার পর একটা আসছিল। বিধুভূষণ সকলের মতো হাত তুলছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত বোঝাই ছিল বলে বাসগুলো থামল না। ড্রাইভার হাত নেড়ে পরের বাস্-এ ইংগীত করে গেল। এইভাবে পর পর তিনবার।

বিধুভূষণ একবার আড়চোখে দেখে নিলেন এখানকার পুরনো বাস স্টপটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। না, সে রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। হাতে সময় ছিল। তিনি নিশ্চিন্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে একটা বাস থামল। 'নামতে দিন আগে— হাঁকল কণ্ডাক্টর। সে দিকে কান না দিয়ে বিধুভূষণ সকলের সঙ্গে একজোটে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপ খেলেন। কে নামল, কে উঠল তা তিনি বুঝলেন না, কিন্তু বাস্‌টা ছেড়ে দেওয়ার পর বুঝলেন যে তিনি উঠতে পারেননি। দু'তিনজন লোক হৈ হৈ করে বাসটার পিছনে ছুটল। তিনি সেরকম কিছু না করে সতর্কভাবে হাতঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আবছাভাবে তার মনে হ'ল একটা মোটা মতো লোক তার সামনে পা-দানীটা আড়াল করে ছিল— নইলে তিনি উঠতে পারতেন।

পরের বাসটাও এসে থামল। 'নামতে দিন আগে—' কণ্ডাক্টর হাঁকল। সকলে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপ খেল। সেই ভিড়ে বিধুভূষণ ইঁদুরের মতো দ্রুত চেষ্টায় একটা গর্ত খুঁড়ে নিলেন। এবারে হ্যাণ্ডেলটা ধরতে পারলেন তিনি। কিন্তু পা-দানীতে পা রাখতে পারলেন না। বাসটা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি হ্যাণ্ডেল ছাড়লেন, এবং বুঝলেন এবারও তিনি উঠতে পারেন নি। এবারও তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কেননা ঘড়িতে এখনো সতেরো মিনিট সময় আছে। কিন্তু এবার তার স্পষ্ট মনে হ'ল, একটা মোটা মতো লোক—পাঞ্জাবী পরা, ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো ছোটো করে ছাটা—তার পথ আটকে ছিল। তিনি দু একবার চোখ বুলিয়ে লোকটাকে খুঁজলেন, সম্ভবতঃ লোকটা উঠে গেছে। তিনি বিরক্তিকর ভিড় থেকে চোখ তুলে ল্যাম্পপোস্টে লটকানো চৌকো বাক্সের গায়ে একটা সিনেমার পোষ্টার দেখতে লাগলেন। 'এই তো আমাদের জাতীয় চরিত্র'—ভাবলেন তিনি 'মানুষের পথ আটকে রাখা, নিজে উঠে যাওয়া—এইসব—'।

পরের বাসটা আসতে দেখে এবার সতর্ক হলেন। এ এ বাসটাও থামল। 'নামতে দিন আগে—' হাঁকল কণ্ডাক্টর। এবার তিনি ঢেউয়ে গা ছাড়লেন না। আগে থেকে সতর্ক ছিলেন বলে শক্ত থেকে কৌশলে তিনি হ্যাণ্ডেল ধরলেন। বার বার তিনবার। এইবার তিনি পা-দানীতে পা রাখলেন।

কিন্তু নিয়তি। টের পেলেন কে যেন পিছন থেকে

তার কোমর ধরেছে। লোকটা টাল খাচ্ছে—তার নিঃশ্বাস বিধুভূষণের ঘাড়ের ওপর পড়ছিল। 'আমি পড়ে যাচ্ছি যে, ওমশাই—' বিধুভূষণ আর্তকণ্ঠে বললেন 'আমার কোমরটা ছেড়ে দিন।' বিধুভূষণকে অবশেষে নামতে হয়। লোকটাই টেনে নামায় তাকে।

কখনো যা করেন না—এমনিতেই ভীতু, শান্তপ্রকৃতির বিধুভূষণ হঠাৎ তাই করলেন। 'এটা কি হ'ল?' বলে লোকটার মুখোমুখী দাঁড়ালেন। দেখলেন এই সেই লোক—পরণে পাঞ্জাবী, মাথার চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা—চর্বির পাহাড়। কোনো উত্তর দিল না লোকটা, বিধুভূষণের দিকে চেয়েও দেখল না। অলসভাবে পান চিবোচ্ছিল। আধখোলা চোখদুটো দেখে হঠাৎ মনে হয় লোকটা ঘুমিয়ে আছে।

এত বেগে গিয়েছিলেন বিধুভূষণ যে তিনি তার পুরোনো হাঁপানীর চাপটা অনুভব করলেন। তাঁর গলা আটকে আসছিল এবং হাত পা কাঁপছিল। মনে পড়ল তাঁর প্রেশার সম্প্রতি দুশ'র খুব কাছাকাছি গিয়েছিল—কোনোরকম উত্তেজনা ডাক্তারের বারণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। রাস্তাঘাটে হাঙ্গামা উত্তেজনা তিনি সবসময়ে এড়িয়ে চলেন—তা ছাড়া তাঁর ভয় আছে হঠাৎ করোনারীর অ্যাটাক হতে পারে। দুম করে মরে যেতে তিনি চান না।

বিধুভূষণ সরে এলেন। লোকটার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তিনি দাঁড়িয়ে দেখলেন পর পর তিনখানা একই নম্বরের বাস আসছে। তিনি সাবধানে লোকটাকে দূর থেকে একবার দেখে নিলেন। আশ্চর্য! বিধুভূষণের মনে হল তাঁর কোনো কথাই লোকটার কানে যায়নি। লোকটা বিধুভূষণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে তাকাল—কিন্তু বিধুভূষণকে দেখল বলে মনে হলনা। যেন বিধুভূষণের দেহ ভেদ করে লোকটার দৃষ্টি সরে গেল। কোথাও বাধা পেলনা। নির্বিকার লোকটির দিকে বিধুভূষণ তাকিয়ে রইলেন আশ্চর্য!

তৃতীয় বাসটাতে জায়গা পেলেন বিধুভূষণ। যদিও ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল তবু ভিতরে ঢুকতে পারলেন এবং রড ধরে দাঁড়ালেন। তাঁর অফিস পার্ক ষ্ট্রীটে, ডালহৌসীতে বাসটা খালি হয়ে গেলে পার্কষ্ট্রীট পর্যন্ত বসে যাওয়া যাবে। ঘড়ি দেখলেন বিধুভূষণ—প্রায় কুড়ি মিনিট কিংবা তারও কিছু বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তা হোক! আঠারো বছরের পুরানো পোষা চাকরী তার—এটুকু খাতির তিনি পেতে পারেন—পা'ন ও।

ডালহৌসীতে বাসটা খালি হতে শুরু করল। ঠিক বিধুভূষণের সামনের সিট থেকে দু'জনই উঠে গেল—তাদের যাওয়ার জায়গাটা করে দিতে গিয়ে একটু কাৎ হলেন বিধুভূষণ। জানালার ধারের সিট বিধুভূষণের প্রিয়। লোকদুটো বেরিয়ে যাওয়া এবং বিধুভূষণের বসবার চেষ্টা করার ভিতরে যেটুকু সময়ের এবং দূরত্বের ব্যবধান ছিল তারই এক ফাঁক দিয়ে কি করে যে তা বিধুভূষণ বুঝলেন না—একটা মোটা মতো লোক ঢুকে গেল এবং জানালার ধারে বসে পড়ল। বিধুভূষণ তাকিয়ে দু'চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। আশ্চর্য! এ সেই লোকটা—মোটা মতো, পাঞ্জাবী পরা, ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা! মুহূর্তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল লোকটা জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল বিধুভূষণের দিকে ফিরেও তাকাল না। কার পাছার ধাক্কা খেয়ে বিধুভূষণ লোকটার পাশেই বসে পড়লেন।

তা হলে এ সব কি হচ্ছে! বিধুভূষণ চোখ বুজে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন। ছেলেবেলায় লজিকে চান্স আর প্রব্যাবিলিটির যে কথা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করে দেখলেন। কিছুই মনে পড়ল না। একবার সন্তর্পণে চোখ খুলে দেখলেন লোকটা তেমনি অন্যমনস্ক বাইরের

দিকে তাকিয়ে আছে। বিধুভূষণ যে পাশে আছেন তা জানে বলে মনে হল না। বিধুভূষণ লক্ষ্য করলেন লোকটা মুখের বাঁ পাশে ঠিক চোখের কাছেই একটা লালচে আঁচিল রয়েছে।

তারপর ময়দানের খোলা হাওয়া লাগতেই বিধুভূষণের একটু ঢুলুনি এল। বার কয়েক ঝুঁকে পড়ল মাথা। নিজেকে এইভাবে ঘুমিয়ে নিতে দেন তিনি। জানেন, ঠিক স্টপেজে গাড়ী থামালেই তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে। এর কোনদিন অন্যথা হয় নি। এর সঙ্গে পাভলভের কণ্ডিশনড রিফ্লেক্সের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা বিধুভূষণ ভেবে দেখেন নি। কণ্ডিশনড রিফ্লেক্সের কথা আবছা ভাবে শুনেছেন তিনি। একটা কুকুরকে নিয়ে এই ধরণের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কুকুরের সঙ্গেই আজ পর্য্যন্ত তিনি নিজের সাযুজ্য খুঁজে পান নি।

আজও ঠিক স্টপেজে ঘুম ভাঙল এবং বিধুভূষণ ভাতঘুম থেকে জেগে উঠে আজকের যাবতীয় ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ঘাড়ে মাথায় ময়দানের খোলা বাতাস লাগছিল। ভারী খুশী হয়ে উঠলেন তিনি।

অফিসে গিয়েই তিনি একগ্লাশ জল খান। আজও খেলেন। হাজিরা খাতায় সই করলেন হাতঘড়ি দেখে। ঠিক পঁচিশ মিনিট লেট। তাই লিখে দিলেন। তারপর চক্রবর্তীর মুখোমুখি একই টেবিলে বসলেন বিধুভূষণ। চক্রবর্তী মাথা গুঁজে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটা ফাইল খুলে দেখছিল যা সে কখনো করে না। চক্রবর্তী মুখতুলেই খুব নীচু গলায় বলল 'আজই লেট করলেন!'

'কেন! আজ কী?' জিজ্ঞেস করেন বিধুভূষণ।

'আজ নতুন ম্যানেজার চার্জ্জ নিয়েছে যে! বসে অফিসের লোক একটু কড়া ধাতের।'

হাসলেন বিধুভূষণ। সে হাসিতে আত্মপ্রত্যয় ছিল— চক্রবর্তী আড়চোখে দেখল।

দিনটা যেমন খারাপ যাবে বলে প্রথমটায় মনে হয়েছিল বিধুভূষণের তেমনটা হলনা। লাঞ্চ পর্য্যন্ত বেশ কেটে গেল। বাকীটাও যাবে—এই ভেবে তিনি দু'টি কলা, দু'খানা বিস্কুট ও এক কাপ চায়ের টিফিন সেরে এসে চেয়ারে বসতেই বেয়ারা একটা চিরকুট নিয়ে এল। তাতে লেখা 'ব্যাপারটা জরুরী। তাড়াতাড়ি আসুন।' নীচে অস্পষ্ট সই। তার নীচে লেখা—'ম্যানেজার।' একটু ভড়কে গেলেন বিধুভূষণ। গত আঠারো বছরে তিনি তিন-বার মাত্র ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে তার মুখোমুখী হয়েছেন —তার মধ্যেও প্রথমবার সেই ইণ্টারভিউয়ের সময়। দেখলেন চিরকুটটাতে সই ছাড়া আর বাদবাকী অংশ সুন্দর বংহরফে টাইপ করা। বুঝলেন—নতুন ম্যানেজার কাজের লোক—কোনো বিষয় অস্পষ্ট রাখতে চান না। বেয়ারার মুখে মেলাব পাঠালেও হ'ত—কিন্তু তা তিনি করেন নি।

বিধুভূষণ কাউকে কিছু বললেন না। ব্যাপারটা গোপন রেখে তিনি দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে এলেন। তিন-তলায় মাত্র দুখানা ঘর—একখানা কমিটি রুম, অন্যটি ম্যানেজারের। দুটিই এয়ারকণ্ডিশন করা—দরজার কাছে দাঁড়িয়েও সেই ঠাণ্ডা ভাব টের পাওয়া যায়। বিধুভূষণের প্রায় শীত ধরে গেল।

নিজের নামধাম লিখে একটা চিরকুট ভিতরে পাঠানোর পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। দু'জন লোক—স্যুটপরা—ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর তাঁর ডাক পড়ল। বিধুভূষণ প্রকাণ্ড দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। দরজাটা তার পিছনে আবার নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

সবকিছুই প্রকাণ্ড দেখলেন বিধুভূষণ। প্রকাণ্ড জানালা, প্রকাণ্ড পেলমেট, প্রকাণ্ড টেবিল—সবকিছুই খুব চকচকে ঝকঝকে। দেখলেন আরো অনেক আসবাব

রয়েছে যার নাম তাঁর জানা নেই। এত কিছুর ভিতরে লোকটাকে চোখেই পড়ে না।

লোকটা—নতুন ম্যানেজার—কিন্তু মুখ তুলল না, বিধু-ভূষণের নামধাম লেখা চিরকুটটার দিকে চোখ রেখে বলল 'আপনি ব্যাঙ্কিঙের কিছু জানেন?'

বিধুভূষণকে কেউ একবার শূন্যে তুলেই নামিয়ে দিল—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার ওজনটা চুরি করে নিল। নিজেকে খুব হাল্কা অনুভব করলেন বিধুভূষণ—পাছে পাখার বাতাসে উড়ে যান সেই ভয়ে সামনের চেয়ারের পিছনটা চেপে ধরতেই তাঁর খেয়াল হ'ল—এই ঘরে পাখা নেই।

চেয়ারটা চেপে ধরতে গেলে কোনো শব্দ হয়ে থাকবে। ম্যানেজার তাঁর অন্যমনস্ক চোখ তুলে বিধুভূষণকে দেখলেন। আবার একে না-দেখাও বলা যায়। সে দৃষ্টি বিধুভূষণকে ভেদ করে গেল। কোনোখানে বাধা পেলনা। কিন্তু বিধুভূষণ দেখলেন বাঁ চোখের পাশে সেই লালচে আঁচিল—মাথার চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা, চর্বির পাহাড়। কি করে সম্ভব হ'ল! আশ্চর্য!

'স্যার…। বিধুভূষণ বললেন।

'আমাদের কাজের সঙ্গে ব্যাঙ্কিঙের যোগাযোগ বেশী। আমার মনে হয়, আপনার ব্যাঙ্কিংটা শিখে নিতে হবে।' ম্যানেজার বললেন 'আপনার বয়স কত?'

'আজ্ঞে?, বিধুভূষণ কোনোরকমে মাথা ঠিক রেখে বললেন 'তেতাল্লিশ।'

'তা এমন আর বেশী কি? এই বয়সেও অনেকে শেখে।' ম্যানেজারকে একটু চিন্তিত দেখাল 'কিন্তু আপনাকে আরো বুড়ো দেখায়। ধরুন পঞ্চাশ টঞ্চাশ!' একটু হাসলেন ম্যানেজার 'সার্টিফিকেটের বয়স তা হলে তেতাল্লিশ?'

'মানে, আমার আসল বয়সও…

'ঠিক আছে।' হাত তুলে বিধুভূষণকে থামালেন ম্যানেজার 'কয়েকটা বই আপনাকে পড়তে হবে।' ম্যানেজার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিধুভূষণকে দেখেও দেখলেন না। কিন্তু চোখ দুটো বিধুভূষণের দিকেই রাখা আছে।

'স্যার….'বিধুভূষণ প্রায় স্খলিত কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলেন 'বাসের সেই ব্যাপারটা '

'আপনাকে একটা অফিসিয়াল পরীক্ষাতেও পাশ করতে হবে।' বিধুভূষণের কথায় কান না দিয়ে ম্যানেজার বললেন।

'…ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত।' বিধুভূষণ তাঁর কথা শেষ করেন।

'কোন ব্যাপারটা?' ভ্রূ কোঁচকালেন ম্যানেজার।

'কলেজ স্ট্রীটে পৌনে দশটা—না, দশটা বাজতে সতেরো মিনিটের সময়…

'কি হয়েছিল?,

বিধুভূষণ অসহায়ভাবে মেঝের কার্পেটের দিকে চোখ রেখে বললেন 'ব্যবহারটা খুবই খারাপ হয়েছিল স্যার—আমি স্বীকার করছি; আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'কখন? কোথায়?'

'কলেজ স্ট্রীটে স্যার, পৌনে দশটায়—না, দশটা বাজতে সতেরো মিনিটের সময়…'

'পৌনে দশটা। কলেজ স্ট্রীট!' ম্যানেজারকে খুব অন্য-মনস্ক দেখাল 'কিন্তু আমি তো অনেক আগে অফিসে এসেছি! সাড়ে ন'টায়।' বলেই সকৌতুকে বিধুভূষণের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হাসলেন ম্যানেজার 'আপনি আমাকে পেলেন কোথায়? আর আমার ফ্ল্যাট তো বালিগঞ্জে।'

বিধুভূষণ কথা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তার মনে, হচ্ছিল এর উত্তরে উপযুক্ত যে কথাগুলো বলা যায় সেগুলো তাঁর মাথার চারপাশে বাতাসের ভিতরে বিজবিজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই দু'একটা ধরবার জন্য তিনি মাথা

ঝাঁকালেন, কান চুলকোলেন, হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর মতো বাতাসে ঝাপটা মারলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো 'ভুল স্যার···সবই ভুল···'

'ক্রেজী!' হাসলেন ম্যানেজার 'কিন্তু ব্যাকিংটা ভুললে চলবে না। মনে থাকবে?'

অসহায় বিধুভূষণ মাথা নাড়লেন—থাকবে।

'আর দেখছি—আপনি আজ পঁচিশ মিনিট লেট!' বলে সোনার চেনে বাঁধা গাড়ীর চাবিটা বোঁ করে ঘোরালেন ম্যানেজার। বিধুভূষণের মনে পড়ল ম্যানেজারের গাড়ী আছে—অফিস থেকেই গাড়ী দেওয়া হয়। চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতেই ম্যানেজার বললেন 'এ রকম যেন আর না হয়।'

কি না-হওয়ার জন্য বলছেন ম্যানেজার, তা না বুঝেই বিধুভূষণ মাথা নাড়লেন—হবে না।

'আপনি আসুন তাহলে···' ম্যানেজার বললেন, তাঁর হাতে তখনো চাবিটা ঘুরছে, তিনি অস্ফুট গলায় বললেন 'পোনে দশটা! কলেজ স্ট্রীট!'

বিধুভূষণ ফিরে আসছিলেন, কি একটা শব্দে পিছন ফিরে দেখলেন ম্যানেজারের হাত থেকে চাবিটা ছিটকে প্রথমে গ্লাসটপ টেবিলের ধারে লেগে মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। অন্যমনস্ক ম্যানেজার সেটা তুলতে নীচু হতেই ভীষণ চমকে উঠলেন বিধুভূষণ। তাঁর মনে হ'ল ম্যানেজারের পিছন দিকটা কলকব্জায় ভরা। রেডিওর পিছনের ঢাকনাটা খুলে ফেললে ভেতরটা যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনি। মনে হ'ল কোমরে একটা প্লাগ লাগানো আছে—যার তার কোনো গুপ্ত প্লাগ-পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে। বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়ালেন বিধুভূষণ। এক পলকের ভুল সংশোধন করে ম্যানেজার আবার সোজা হয়ে বসেছেন তখন, গম্ভীরমুখ, চোখ অন্যমনস্ক। ধীরে বললেন 'আপনি আসুন।'

বিধুভূষণ কিছুই বললেন না। তাঁর মনে হ'ল তিনি এক অদৃশ্য বেতার সংকেত পেলেন, ম্যানেজারের দূরমনস্ক চোখ যেন বলল 'কি করা যাবে বলুন, চাবিটা পড়ে গেছে—সুতরাং সেটা কুড়িয়ে নেওয়াই নিয়ম। একটু ভুল হয়ে গেছে—আপনি আমার কলকব্জা দেখে ফেলেছেন। কিন্তু আমার কি করার ছিল?'

বিধুভূষণ একটু ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু ম্যানেজারের পিছন দিকটা আর দেখা গেল না। এবার উনি খুব সতর্ক। বিধুভূষণকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন 'কি ব্যাপার?'

'কিছু না স্যার!' বিধুভূষণ খানিকটা দুঃসাহসে ভর করে হাসলেন 'আপনার পিছনটা···'

'আমার পিছনটা····! ম্যানেজার হাঁ করে বিধুভূষণকে দেখতে লাগলেন।

'আজ্ঞে, আমি দেখে ফেলেছি। দুষ্টু ছেলের মতো মুখ করলেন বিধুভূষণ।

'কি দেখেছেন?' প্রশ্ন করলেন ম্যানেজার।

'আপনার পিছনে···' বলতে গেলেন বিধুভূষণ।

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ম্যানেজার 'কি? কাঁকড়া বিছে? আরশোলা?' উঠে দাঁড়ালেন ম্যানাজার।

বিধুভূষণ দেখলেন না, কলকব্জা কিছুই নেই। পাঞ্জাবীর সাদা পিঠ দেখা যাচ্ছে। এ কি চোখে দেখবার ভুল! নিজের চোখ কচলালেন বিধুভূষণ। কোনক্রমে বললেন 'ভুল স্যার···সবই ভুল···'

মুহূর্তেই ম্যানেজারের ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দু'হাতে পাঞ্জাবীর পিছন দিকটা ঝাড়বার চেষ্টা করেছিলেন। হঠাৎ বিধুভূষণের কথা শুনে তিনি—যেন আরশোলা বা কাঁকড়া বিছে খুঁজে না পেয়ে—ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বললেন 'নাউ গেট ইওরসেল্‌ফ্‌ আউট! ইউ···ইউ···!'

বিধুভূষণ নিঃশব্দে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন। আসতে

আসতে শুনলেন ম্যানেজার চাপা রাগের গলায় বলছেন 'কলেজ স্ট্রীট···পৌনে দশটা···আমার পিছনটা···কাঁকড়া বিছে···আরশোলা। এর মানে কি?'

'ভুল···স্যার···সবই ভুল···' বিধুভূষণ মনে মনে বললেন। বাইরে এসে করিডোর ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। চাকরীটা বোধহয় আর রাখা গেল না। কিন্তু কেন? কেন? কোথায় ভুল হচ্ছে।

নিজের সিটে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরেই সেকশন ইনচার্জ-এর একটা চিরকুট পেলেন বিধুভূষণ। তাতে লেখা ম্যানেজারের আদেশ মত আপনাকে জানানো হচ্ছে যে ম্যানেজার মনে করেন আপনি আজ খুব সুস্থ ন'ন। আপনাকে অফিস ছেড়ে যাওয়ার এবং বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আজ এখন আপনার ছুটি।' নীচে অস্পষ্ট সই। তার নীচে লেখা 'সেকশন ইনচার্জ।'

মুহূর্তেই খুশী হয়ে উঠলেন বিধুভূষণ। গত আঠেরো বছর চাকরীতে এই প্রথম তিনি একা ওপওয়ালার ইচ্ছেয় ছুটি পেয়েছেন। কাউকে কিছু বললে না বিধুভূষণ, চক্রবর্তীকেও না। তাড়াতাড়ি ফাইলে কাগজপত্র বেঁধে ছেঁধে রাখলেন। আশ্চর্য! তাঁর বিশ্রাম দরকার। কথাটা তাঁর নিজেরও অনেকবার মনে হয়েছে। আশ্চর্য!

বেরিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ। বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ধরলেন। পিছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বললেন 'কলেজ স্ট্রীট—না, না, কলেজ রো···'

ট্যাক্সি দ্রুত চলল। হু হু করে হাওয়া লাগছিল বিধুভূষণের চোখে মুখে। মুহূর্তেই তন্দ্রাটা ফিরে আসতে চাইছে টের পেয়ে যেন আধোঘুমের ভিতর হাসলেন বিধুভূষণ। অনেক কিছুর শখ ছিল তাঁর। নিজের এমনি একটা গাড়ী থাকলে এমনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অফিসে আসতে পারতেন তিনি, ঘুমিয়ে-যেতেও পারতেন। না, কিছুই হয়না। নিজের মনোমত কখনোই হয় না। কিন্তু কেন?

সামান্য চোখ খুলে তিনি বাইরের দিকটা দেখলেন। খানিকক্ষণ দেখেই চমকে উঠলেন তিনি—এ তো রেড রোড। আশ্চর্য! এ রাস্তায় তো তাঁর আসবার কথা নয়। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি 'এটা কি হল, অ ট্যাক্সি ড্রাইভার? 'এটা তো রেড রোড···ধর্মতলা যে···' ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ঘোরাতেই খানিকটা থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বিধুভূষণ বললেন 'ভুল স্যার··· সবই ভুল···' তিনি চোখ বুজে ফেললেন। কেন না ততক্ষণে তিনি ট্যাক্সিড্রাইভারের বাঁ চোখের পাশে লালচে আঁচিলটা দেখে ফেলেছেন, সেই পুলিশদের মতো ছোটো করে ছাঁটা চুল, পরণে পাঞ্জাবী। আশ্চর্য! আর কিছুই দেখতে চাইলেন না বিধুভূষণ। শুধু আর একবার বিড় বিড় করলেন 'ভুল স্যার···'

ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে নিলে অনেক্ষণ পর আর একবার অতি সন্তর্পণে চোখ খুললেন বিধুভূষণ। টেলিভিশন তিনি কখনো দেখেন নি। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল সামনের উইণ্ডস্ক্রিণ জুড়ে ছবি ভেসে উঠেছে অচেনা পথ-ঘাট অচেনা গাছ, অদেখা বাড়ী ঘর, লোকজন। এ কি বিদেশ! এত সহজে বিদেশ! এত অল্প সময়ে! না কি টেলিভিশন! মোটা ফর্সা ম্যানাজারের কাঁধের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ সেই টেলিভিশন দেখে তিনি আর একবার বলবার চেষ্টা করলেন 'ভুল স্যার···সবই ভুল···' ম্যানেজার—এখন ড্রাইভার—তাকে লক্ষ্যই করল না।

চোখ বুজে হঠাৎ পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ।

কলেজ রো তে নেমে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিলেন তিনি। ভাড়াটা সরাসরি ম্যানেজারে। হাতে দিতে একটু লজ্জা করছিল তাঁর। ম্যানেজার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ও করল না তাঁর দিকেও তাকাল না। এমন কি ভাড়ার একটাকা কুড়ি

(শেষাংশ ৫২৬ পৃষ্ঠায়)

হীরকের একটি স্মরণীয় বিকেল

নীলিমা দাশগুপ্ত

উনিশ শো একত্রিশ সাল। হেমন্তকাল। সময়টা দুপুরের শেষ।

কলকাতার বিশিষ্ট ধনী কুমুদকান্ত মুখার্জীর ছেলে হীরক মুখার্জী অজয় দাসের সঙ্গে গলির ভেতর দিয়ে চলেছে। এঁদোগলি, জীর্ণগলি, কানাগলি, যতো গলির গলি তস্য গলি দিয়ে হীরককে নিয়ে চলেছে অজয়। হীরকের মনে হচ্ছিলো, ওরা যেন কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলছে। শহর কলকাতার বুকে, এমন ধরণের অসহায় গলি বিরাজ করছে, যেখানে আলো বাতাসের এক ফোঁটা দাক্ষিণ্যও পৌঁছোয় না, না দেখলে হীরকের তা প্রত্যয় হতো না। অজয়ের নির্দেশমতো নীরবে হীরক অনুসরণ করে চলেছে তাকে। বাসের রাস্তা ফেলে এসেছে অনেক দূরে। ট্রাম লাইন আরো দূরে। নীরবতা ভঙ্গ করলো সাইকেলের একটা ঘন্টাধ্বনি। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে দ্রুত চলে গেলো একটি মানুষ। ওদের পাশ ঘেঁষে যাবার সময়, মানুষটি শব্দ করে দেশলাই ঘষে সিগারেট ধরালো তারপর দিব্যি শিস দিতে দিতে চলে গেলো হনহনিয়ে। দেশলাইয়ের টুকরো আলোতে লোকটির মুখের চেহারা চোখে পড়লো হীরকের, বিশেষকরে চিবুকের আধুলি মাপের জড়ুলটি।

গলি পেরিয়ে, শ্রীহীন নোনাধরা মাঝারি পাকাবাড়ির একটা নড়বড়ে দরজা ঠেলে ওরা দুজনে ভেতরে ঢুকলো। দরজার মাথায় রংচটা একটা টিনের সাইন বোর্ড নজরে পড়লো হীরকের। তাতে লেখা আছে, এখানে সুলভে টাইপ রাইটিং শেখানো হয়। কোনো অক্ষরেরই পুরো অস্তিত্ব নেই, তবু পড়া যায়। শ্যাওলাধরা কলতলা দিয়ে প্রবেশ পথ। দুবার পা হড়কে, অজয়ের কাঁধে ভর দিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে হীরক উঠলো। ডান দিকের একটা ঘরে টাইপ মেশিনের বোতামের কোরাস শব্দ হচ্ছে। সেটা পার হয়ে, আরো একটা তালাবন্ধ ছোটোঘর পার হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠতে লাগলো।

সিঁড়ির প্রায় অর্দ্ধেকটাই গভীর অন্ধকারে ঘেরা। দেয়ালে দেয়ালে ফাটল। বাইরের দেওয়ালটায় অসংখ্য অশ্বত্থের চারা যেন ষড়যন্ত্র করে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। সিঁড়ির এ পাশ ঘেঁষে গেলেও পাতার ছোঁয়া লাগে আর কেমন একটা ছমছমানি শুরু হয় শরীরে। অজয় হীরকের একটা হাত শক্ত করে ধরে ওপরে উঠছে। উত্তেজনায় শিরাতে স্নায়ুতে যেন টান ধরেছে হীরকের।

সাবধানে সিঁড়ি পার হয়ে, দোতলার সামনের ঘরটিতে ওরা ঢুকলো। ঘরখানি বড় বেশ। অনেকটা হলঘরের মতো। পড়ন্ত বেলায় ঘরের চার দেওয়ালের দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে বুঝি। কিন্তু তা নয়। দেওয়ালের আস্তর উঠে যাওয়ায়, এই বিভ্রম হয় সকলের।

ঘরে ঢোকা মাত্র, ঘরের সকলেই মুখ তুলে ঔৎসুক্যের চোখে দীপ্তিমান নবাগত ছেলেটির দিকে একচোখ তাকালো। কিন্তু, কোনো প্রশ্ন বা কোনোরকম সম্ভাষণ না করে, যে যার কাজে লেগে গেলো আবার।

শুধু একজন, যেন অটল সংকল্পের প্রতিমূর্তি, স্থির সূক্ষ্ম চোখে চশমার ফাঁক দিয়ে সোজাসুজি চেয়ে রইলেন হীরকের মুখের দিকে। চেহারা বটে! যেমন টকটকে রং তেমনি দীর্ঘছন্দ মজবুত চেহারা। নাক-চোখ-মুখ নিখুঁত। কেবল নিচের ঠোঁটটা সামান্য মোটা। অজয় হীরকের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো— কালোদা। কালোদার নাম অজানা নয় হীরকের। একাধিকবার শুনেছে অজয়ের কাছে। কিন্তু এই মুহূর্তে হীরকের মনে হলো, এই যদি কালোদা, তবে গোরাদা কে?

পরে অবশ্য জেনেছিলো হীরক, কালোদার কালো নামটা কালিদাসের অপভ্রংশ। সূক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টি মিলিয়ে সহজ সোজা দৃষ্টি ফিরে এলো কালোদার। অজয় বুঝলো হীরককে দেখে কালোদা খুশি হয়েছেন।

কালোদা চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে হাসিমুখে ডাকলেন, "এসো হীরক, ভেতরে চলে এসো।...অজয়! পথে বেরিয়ে এগিয়ে একটু দেখো তো, বিজয়রা পথ ভুল করলেন নাকি? সম্ভবতঃ গলির গোলমাল হয়ে গেছে।

অজয় চলে গেলো।

"এসো হীরক, বসো—" এমন গলায় কালোদা আহ্বান করলেন যেন সকাল বিকাল হীরককে দেখছেন। ভেতরে এলো হীরক। কালোদা সমাদরে নিজের পাশে বসালেন হীরককে। কালোদার সান্নিধ্যই হীরকের মনে যেন কোনো উষ্ণ অনুভবের মতো শক্তি সঞ্চার করলো। গলা নামিয়ে কালোদা বললেন, "তোমার দাক্ষিণ্যে আমাদের পার্টির বিরাট একটা ব্যয়বহুল অংশ নির্বাহ হচ্ছে। আমাদের দলপতি নির্দেশ দিয়াছেন, তোমাকে ডাকিয়ে এনে নিজের মুখে ধন্যবাদ জানাতে। তাই অজয়কে দিয়ে তোমাকে আজ ডাকিয়ে এনেছি। পার্টির সকলের হয়ে আমি তোমাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি হীরক।"

খুশিতে হীরক টগবগিয়ে উঠলো। বিরাট ব্যক্তিত্ব যার সেই কালোদা, যিনি নাকি দলপতির ডানহাত, তিনি ওর মতো যুবকের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলছেন, আনন্দের উত্তেজনায় নোনাধরা বাড়ির চেহেরা সম্পূর্ণ যেন মুছে গেলো হীরকের চোখের সামনে থেকে। একটা নতুন ধরণের বৈচিত্র্যের আস্বাদ ও যেন সমস্ত দেহ ও মন দিয়ে অনুভব করতে লাগলো।

কালোদা হীরকের হাতে ছোট আকারের হাতে লেখা একটা পুস্তিকা দিয়ে বললেন, "তুমি এ বইখানা মন দিয়ে আগাগোড়া একবার পড়ে নাও হীরক। আমাদের সমস্ত নিয়ম কানুন, সাধারণ আদেশ নির্দেশ সমস্ত এটাতে পাবে। আমি ততোক্ষণ এদিকের কাজ কিছু মিটিয়ে নি।...হ্যাঁ, সুবীর! এবার তুমি শুরু কর—"

হীরক বইয়ের সামনের পাতা খুলে লেখার ওপর চোখ মেললো বটে, কিন্তু চোখের চেয়ে কানকে সজাগ রাখলো বেশী। কালোদা যে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সুবীর বললেন, হীরক এক পলক দেখে নিয়েছে তাকে। বীরত্ব প্রকাশের তার বয়েস হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মুখের ভাব অত্যন্ত বালক সুলভ। আশায় উদ্দীপ্ত বিশাল দুটি চোখ টান করে, সার্টের হাতা গুটিয়ে, দাঁড়ানোর ঋজু ভংগীতে একটা স্পর্দ্ধা ফুটিয়ে তুললে হবে কী, সুকুমার মুখে কোনো মুখোস আঁটতে পারেনি, মুখের চেহারা একেবারে অনাবৃত। ডানহাতে ধরা আছে গ্যারিবল্ডির একখানা বই। সুবীরের পরের আচরণে অর্থাৎ ওর বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গিমায় সুবীরকে আরো বেশী ছেলেমানুষ মনে হলো হীরকের। সুবীর বললো,—

—নবযুগের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পথভুল করা আমাদের কিছুতেই চলবেনা। দুশো বছরের যে রাজত্ব আমাদের

ক্লীব করে রেখেছে, সভ্যতার নাম দিয়ে—শিক্ষার নাম দিয়ে—নিঃশেষে জোঁকের মতো রক্ত শুষে নিয়ে, মেরুদণ্ডহীন কংকালসার জড়দগব জীব করে ছেড়েছে ও ছাড়ছে, আমাদের সেই দুশো বছরের কলংকিত ইতিহাস, আমাদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলে, নতুন ইতিহাস আমরা তৈরী করে যাবো। ভারতের অসাড় প্রাণে সাড়া আনবো আমরা। আমাদের জীবন ধারণের পুরাতন মূল্যকে নাকচ করে নতুন মূল্য দিয়ে যাবো। জাগিয়ে দিয়ে যাবো দেশাত্মবোধ ভারতের সবার মধ্যে। ইংরাজের বজ্রমুঠির কবল থেকে ছিনিয়ে আনবোই আমরা ভারতবর্ষকে। আমাদের আগামী দিনের ভাই বোনের জন্য তৈরী করে রেখে যাবো সহজ চলার পথ। সে পথ প্রস্তুতির জন্য উৎসর্গ করতে হবে আমাদের তাজা রক্ত। একথা মনে রাখবো আমরা আলস্যে ঔদাসীন্যে ঘরের কোণে বসে ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকলে হবেনা, নালিশ জানালে হবে না, তর্জন-গর্জন করলেও হবে না। আমাদের নিজেদেরকে তৈরী করে নিতে হবে আমাদের সেই সহজ চলার পথ। ভারতবাসী যে অসীম শক্তিধর তার প্রমান শীঘ্রই পাবে ইংরাজেরা। মুমূর্ষু হয়েও কোনোমতে বেঁচে থাকার সংকোচ থেকে আমাদের আগামী ভাই বোনেদের মুক্তি দিয়ে যাবো আমরা।··· নতুন প্রভাতের রক্তরাঙ্গা সূর্যের আমন্ত্রণ আমরা পেয়েছি।—সুবীর থামলো। "বাঃ বেশ বলেছো সুবীর, ওতেই চলবে—" কালোদা উঠে সুবীরের পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলেন। এরপর যাকে ডাকলেন কালোদা তাকে হীরক অল্প চেনে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, নৌকোতে একদিন অজয়ের সঙ্গে দেখেছিলো একে। ক্ষীণকায় রোগাটে লক্ষ্মীছাড়া চেহারা। সর্বাগ্রে চোখে পড়ে ওর কোটরে ঢোকা উগ্র দুটো চোখ তারপরই চোখে পড়ে জীর্ণ মলিন পোষাক। ছেলেটি যে নিতান্ত দুস্থ তা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না। কালোদা একটু সরে বসে নীহারের সঙ্গে এত নিচুগলায় কথা বলতে লাগলেন, হীরক উৎকর্ণ হয়েও একবর্ণ শুনতে পেলো না। কিছুক্ষণ শুধু চোয়ালনড়া দেখলো কালোদার। অগত্যা কানের কাজ কমিয়ে হীরক চোখের কাজ বাড়ালো।

ঘরের সর্বত্র ধূলি ধূসরতা। মেঝেয় বসা লোক কটির কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে।···আরে! ঐ তো সেই জড়ুল-লাঞ্ছিত ছেলেটি। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো যে—। কী কাণ্ড! অজয় নিশ্চয়ই চেনে ওকে, কিন্তু একটি কথাও তো বলেনি তখন। হীরক অবাক মানলো।

হীরক গুণে দেখলে, ওকে নিয়ে মোট উনিশজন। এক কালোদা ছাড়া আর সকলেই বয়েসে যুবক। আঠারো থেকে বাইশের ঊর্দ্ধে কেউ নেই বলেই মনে হলো হীরকের। ঘরের পশ্চিম কোণে দুটি যুবক হ্যাণ্ডেলের পেছনে কালি ডুবিয়ে বড় বড় বালি কাগজে ফস্ ফস্ করে একমনে কী যেন লিখে যাচ্ছে। তার অল্প কিছু দূরে, ভাঙা বার্ণিশ-চটা একটা টেবিলের ওপর বেশ বড় আকারের কলাই করা গামলা একটা তার ভেতর যে তরল পদার্থ আছে, খুব সম্ভব সেটা উগ্র কোনো এ্যাসিড। ওখানেও দুটি যুবক দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে কলাইকরা দুটো চামচ দিয়ে গামলার ভেতর তুলো ভিজোচ্ছে। ঘরের উত্তর কোণে হাতল ভাঙা একটা চেয়ার। হাতে আঁকা একটা ম্যাপ তার পেছনে লটকানো। ম্যাপটা যে কোন দেশের বা কোন বিভাগের তা নজর করে দেখেও হীরক ঠাওর করতে পারলো না। সেখানে দশটি যুবক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে আর মাঝে মাঝে নোটবইতে টুকে নিচ্ছে। দক্ষিণ দিকেও দুটি যুবক বসা। ছোটো ছোটো সাদা কাগজে তারা কিছু লিখছে, কিন্তু কোনো লেখা পড়ছে না। যুবক দুটিকে তাদের সামনে রাখা একটি রঙীন কাচের বাটিতে বারে বারে কলম ডুবোতে দেখছে হীরক কিন্তু কাগজের বুকে একটি আঁচড়ও ফুটতে দেখলোনা।

সকলের কার্যকলাপেই হীরক অবাক হচ্ছে। সব কিছুই কেমন যেন রহস্যজালে ঘেরা। কালোদার স্বরগ্রাম হঠাৎ একটু উঠেছে। দু একটা ছাড়া ছাড়া কথা শুনে ফেললো হীরক।

—ঠিক! এইরকম চোখ খোলা রেখো—তারপর,

—তোমার কথা সাচ্চা তো নীহার, সনাক্ত ওরা কিছুতেই করতে পারবে না—নীহারের উত্তর কানে এলোনা হীরকের কিন্তু কালোদার ধারালো দৃষ্টি চোখে পড়লো। যেন দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করে নিচ্ছেন কালোদা, নীহারের কথা ভাঁওতা না সত্যি। তারপর আবার,—বেশ, তোমার খবর যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, আর সে জিনিষটি যদি হস্তগত করতে পারো, তাহলে তোমাকে আমাদের পার্মানেন্ট সভ্য করে নেওয়া হবে। তোমার খরচ বাবদ প্রতিমাসে তুমি ত্রিশ টাকা করে পাবে পার্টি থেকে। এরপর নীহার স্তিমিত নিষ্প্রভ গলায় কালোদাকে খুব সম্ভব ওর আজকের অনাহারের কথা বললো। কালোদা মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ কোনায় বসা দুটি যুবকের একটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সতীশ, তুমি চটপট একগ্লাশ গরম চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এসোতো। নিচে অফিস ঘরে সদানন্দর কাছ থেকে কয়েক আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে যাও। সতীশ কলম ছেড়ে সসব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো। রং স্থুল কালো সতীশের। কিন্তু চেহারাখানা যেন পাথরে খোদাই করা। আর তার আশ্চর্য সাদা চোখের কালো মণি-দুটো যেন একটা অস্থির ব্যগ্রতায় জ্বলছে। সতীশের পায়ের শব্দ মেলাবার আগেই সিঁড়িতে মিলিত পায়ের শব্দ শোনা গেলো। অত্যন্ত উদগ্রীব চোখে দরজার দিকে তাকালেন কালোদা। ঘরে ঢুকলেন লেডিস ছাতা হাতে দোহারা চেহারার একজন আধবয়েসী বিধবা মহিলা, অজয়, আর তার-পর যে তরুণীটি প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকলো, তাকে দেখে হীরকের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। যেমন আশ্চর্য রূপ তেমনি আশ্চর্য তার প্রাণচঞ্চলতা। যেন পাহাড়ী ঝর্ণার আবেগ নিয়ে ঘরে ঢুকলো সে। লাফিয়ে ঢোকার মধ্যেও যেন ছন্দ আছে, প্রাণ আছে। আর চোখদুটির যেন তুলনাই হয়না। যেন উজ্জ্বল দুটি দীপশিখা, পরিচ্ছন্ন তেজ নিয়ে জ্বলছে। বদখত চুন বালিখসা এই ভাঙা বাড়িতে আর এই গম্ভীর পরিবেশে মেয়েটি যেন একেবারেই বেমানান। বিহ্বল বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে হীরক পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সচেতন হলো বিধবা মহিলাটির অস্বচ্ছ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে। "আচ্ছা কালোদা, এই বয়সেই কী তোমার ভীমরতিতে ধরলো! অজয় বেচারীকে আবার কেন আমার খোঁজে পাঠিয়েছিলে? আজ সারাটা দিন অজয়ের ওপর দিয়ে কী কমধানি ধকল গেলো? মহিলাটি ভর্ৎসনার কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন কালোদাকে।

কালোদা বললেন, "নির্দিষ্ট সময় যখন পেরিয়ে গেছে, অজয়কে পাঠাবো না, বলো কী বিজয়া? আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম, তোমার ছদ্মবেশ ধরা পড়েছে আর তুমিও আটক হয়েছো বাগদার পাশের সেলে।"

—ছদ্মবেশ-কথাটা শুনে, হীরক চোখ বড় করে বিধবা মহিলাটির আপাদ মস্তক বার কয়েক দেখলো।

গায়ের মটকা চাদরটা ঝুপ করে একপাশে নামিয়ে রেখে বিজয়াদি উত্তর দিলেন, "হুঁ…ছদ্মবেশ ধরবে! সে মায়ের পেটে এখনো, তোমার মতো তো এখনো ঘোড়া হতে পারিনি, .. প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এ বাড়ির দূরত্বটা মনে করে দেখো একবার –"

কালোদা সকৌতুকে তাকালেন, "বাস্তবিক বিজয়া তোমাকে তো এবেশে ভারি চমৎকার মানিয়েছে হে—"

"অতএব এখন থেকে আমি এই থান ধুতিই পরতে থাকি, তুমি ছাড়া স্বয়ং ঈশ্বরও এ কথা আমাকে বলতে পারতেন না—'

কালোদা হাসিমুখে চুপ করে গেলেন। অজয়ের অধৈর্য কণ্ঠস্বর শোনা গেলো,

"বিজয়াদি! তোমরা বাপু পরে বোঝাপড়া করো, আমার তো আবার অনেককে পৌঁছোনোর ব্যাপার রয়ে গেছে—। কালোদা, তুমি কী পুতুলকে কিছু নির্দেশ দেবে?"

কালোদা পুতুলের দিকে তাকালেন, "আজ কত উঠলো পুতুল?"

পাহাড়ী ঝর্ণা যেন পাথর চাপা পড়ে নিজের গতি বেগ নিয়ে ফুলে ফেঁপে অস্থির হয়ে উঠেছিলো, পাথর সরে গেছে, ঝর ঝর করে প্রবাহিত হলো এখন।

"কালোদা! 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'—বই থেকে একথা এখন কেটে বাদ দিয়ে দাও. সারা বিকেল ঘুরে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা চাঁদা উঠেছে—"

কালোদা কিছু বলবার আগেই দাঁতে দাঁত চেপে ঝাঁঝিয়ে উঠলো অজয়. "রূপ নিয়ে তো অহংকারের শেষ নেই দেখছি, নিজেকে আরো কত দামী মনে কর তুমি?" আশ্চর্য! অজয়ের এই চাবুকমারা কটু উদ্গীরণে পুতুল কিন্তু একটুও চটলো না। সৌন্দর্যে শ্রীতে আরো লীলাময়ী হয়ে মধুর কলনাদে হেসে উঠলো,

"আমার দাম তুমি যদি বুঝতেই পারতে অজয়দা, তাহলে চা-রুটি চিবিয়ে তোমার আর দিন কাটাতে হতো না, বাড়ির চাট্টি গরম গরম ভাত দুবেলা তোমার কপালে জুটতো—" পুতুলের ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট অজয়ের মতো অত কাটখোট্টা মানুষের মুখও মুহূর্তে আরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু অদম্য চেষ্টায় মুখের সে চেহারা তখুনি মেরামত করে নিলো অজয়। অসহিষ্ণু চোখে আগের চেয়ে আরো কঠিন নির্মম স্বরে ধমকে উঠলো পুতুলকে, "কী অকাজের কথা শুরু করেছো পুতুল—" কথার শেষে কিন্তু কঠিন সুরটা আদৌ বজায় রইলোনা অজয়ের, বরং নিরুপায়ের একটা লাজুক হাসি মুখে ছড়ালো। আর সেটাকে আড়াল করবার জন্য দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে দেয়ালের দিকে।

হীরক সবিস্ময়ে অজয়ের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখছিলো। চকিতে পুতুলের মুখের ওপরও ছোট্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো একটা। দেখলো, কৌতুক চোখে অজয়ের নীরব বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করছে পুতুল।

—অজয়ের মতো শ্রীহীন কালো চেহারার এমন একটা কাঠখোট্টা লোককে এই রূপের ঝরণা ভালবাসে! এই অপরূপার হৃদয়ের গোপনদুর্গে অজয়ের আসন পাতা!—এ এক পরম বিস্ময় হীরকের কাছে।—এমন একটি রূপের ঝরণার মধ্যে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায়।···

এতক্ষণে, পুতুলের হীরকের দিকে চোখ পড়লো। একজন নবাগতর সামনে এতটা চপলতা ঠিক হয়নি বুঝে, ওর পক্ষে যতখানি সম্ভব মুখে গাম্ভীর্যের পালিশ চড়ালো, "কালোদা! আজ একজায়গায় কী ফ্যাসাদেই না পড়েছিলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন,—আপনার টাইপ রাইটিং এর স্পীড কত?—নাও ঠেলা. টাইপের ট জানিনে আমি, স্পীড—টীডের ব্যাপারের আমি কী জানি? ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করছি, ভাবছি, কী বলবো ··দশ না বিশ···"
ঘরের সকলেই হেসে উঠলো।

"শেষকালে কী দশ বিশই বলে এলে নাকি?" কালোদা বললেন।

"না, মা সরস্বতীর পুজো বাবদ চাঁদা চাইতে গেছি. মা—ই বোধ হয় তখন জিভে ভর করলেন, ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো ত্রিশ। তা শুনে ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে নেড়ে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বললেন,—ভাল অফিসে যদি চাকরী পেতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু আরো অনেক স্পীড তুলতে হবে। তারপর বললেন, টাইপরাইটিং স্কুলে আবার সরস্বতী পুজো কী? বাণী মায়ের বন্দনা তো শুধু স্কুলে কলেজেই হয়। আমি বললুম,—বলেন কী! এখনই তো ভক্তির সঙ্গে সত্যিকারের পুজো করা দরকার। স্কুলে কলেজে ছেলেমানুষ গলায় কোরাস গান শুনিয়েই, মাকে খুশি করাও যায়, পাশের সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। আর সার্টিফিকেট

খানা বগলদাবা করতে পারলেই আমাদের মোক্ষলাভ। আগেকার বিদ্যেটুকু বিলকুল ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই আমাদের। কিন্তু টাইপরাইটিং এর স্পীডের বেলায় তো তা চলবেনা, ভাল অফিসে কাজ পেতে হলে আমার তো আরো অনেক স্পীড তুলতে হবে, কেমন কিনা আপনিই বলুন? তাতে জ্ঞানদায়িনীর আশীর্বাদ না পেলে, চলে?…ভদ্রলোক তো তাঁর মুখের কথা আমার গলায় শুনে, গদ গদ হয়ে একেবারে পাঁচটা টাকাই চাঁদা দিয়ে বসলেন। আমিও টাকাটি ব্যাগে পুরে, সরস্বতী পুজোর প্রসাদ নেবার জন্য বারে বারে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলে আসনুম"। আবার অনেকের চাপা হাসি শোনা গেলো।

পুতুল আবার বললো, "হ্যা, ভাল কথা কালোদা, আমি কিন্তু যার কাছেই চাঁদা পেয়েছি, তাকেই প্রসাদ নেবার নেমন্তন্ন করে এসেছে, যদি সত্যি সত্যি কেউ চলে আসেন—"

কালোদা বললেন, "সে ও একটা কথা বটে।…ওহে অজয়, টাইপরাইটিং এর ঘরে খুব সাধারণ ভাবে একটু পুজোর আয়োজন করলে কেমন হয়—"

"কোনা দরকার নেই—"ভুরু কুঁচকে নীরসগলায় উত্তর দিলো অজয়, "-গলির এই চক্রব্যূহ ভেদ করে এ বাড়ি কেউ খুঁজে বার করতে পারবেন না"।

কালোদা পুরোনো কথায় এলেন "পুতুল, টাকা কী সদানন্দর হাতে দিয়ে দিয়েছো?"

"হ্যা। সদানন্দদার হাতে টাকা জমা করে দিয়ে তবে তো আমি ওপরে উঠলাম।"

"বেশ তাহলে এখন তোমার ছুটি। অজয়! তুমি পৌঁছে দিয়ে এসো পুতুলকে আর নীহারকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। বড় রাস্তা পর্যন্ত নীহারকে এগিয়ে দিয়ে তারপর তোমরা চ'লে যেও।"

বিজয়াদি মৃদুগলায় বললেন, "আজ এখানে আর নেই এলো অজয়, আজ ওর প্রচুর স্ট্রেন হয়েছে।"

"না, অজয়কে তো আসতেই হবে—" কালোদাকে চিন্তামগ্ন মনে হলো, "বাঘাদার নির্দেশ ওর জানা চাই, অবশ্য কাল সকালেও সেটা জানলে চলে. কিন্তু হীরককেও তো কিছুটা এগিয়ে দিতে হবে—"

বিজয়াদি বললেন, "হীরক তো এখনি সঙ্গে যেতে পারে—"

"না। ওর সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি।…আচ্ছা নীহার, তুমি আজ এসো। দু-চার দিনের মধ্যেই বোধহয় আবার প্রয়োজন হবে তোমাকে। অজয়ের মারফৎ সে সংবাদ তোমাকে পৌঁছে দেবো।"

নীহারের মুখে বিমর্ষ ছায়া পড়লো। নিতান্ত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো সে। হীরক দেখলো, আগেকার নিস্তেজ ভাব নীহারের এখন নেই, চা-বিস্কুট খেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। নীহারের ভঙ্গি কালোদার দৃষ্টি এড়ালোনা। তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন নীহারের দিকে, অন্তস্থল পর্যন্ত যেন খুটিয়ে দেখে নিচ্ছেন। নীহার মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কালোদা পুতুলকে বললেন, "তোমার ব্যাগে টাকাপয়সা কিছু আছে?"

"আছে, গোটা দুই টাকা—"

"তার থেকে একটা টাকা নীহারকে দাও তো—"

পুতুল বিনা প্রতিবাদে, ব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করে নীহারের দিকে এগিয়ে ধরলো। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে তখুনি পকেটে পুরলো নীহার। ওর টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন বটে কিন্তু ওর অনিচ্ছা প্রকাশ সেজন্য নয়। দলপতি বাঘাদা সাংঘাতিক একটা চার্জে ধরা পড়েছেন। প্রেসিডেন্সি জেলের অত কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও কী করে যে অত ঘন ঘন আদেশ নির্দেশ পাঠান—কোনো ঠাওরই ও এ পর্যন্ত করতে পারলোনা নীহার। ভেবেছিলো, সেই রহস্যের উদ্ঘাটন আজ বিজয়াদির কথা থেকে হবে, কিন্তু হলোনা। তাছাড়া, এদের অনেকদিন ধরে নীরব একটা প্রস্তুতি চলেছে, তার সম্বন্ধেও আজ কিছু আঁচ করতে চেয়েছিলো নীহার, তাও হলোনা।

ওকে যে এখন ইচ্ছে-করেই কালোদা এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, সেটুকুই বোঝার বুদ্ধি ওর আছে। অথচ ওর চেয়ে অনেকে বেশী আনকোরা এই হীরক।—

জুতোয় বিশ্রী একটা ঘষ্‌ ঘষ্‌ শব্দ জাগিয়ে উঠে দাঁড়ালো গোমড়ামুখে এক ঝলক তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে—হীরকের দিকে একবার সরীসৃপ দৃষ্টিতে চেয়ে অজয় ও পুতুলের পেছন পেছন বেরিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে রূপান্তর হয়েছে বিজয়াদির। আঁচল দিয়ে জলে মুখটা মুছে, মাথাটা ঝেড়ে ফেলতেই, পঁয়তাল্লিশ থেকে একেবারে পাঁচিশে নেমে এসেছেন। হীরকের এই প্রথম আগমন, এদের সকলের কাণ্ডকারখানা যত দেখছে তত অবাক মানছে। যেন ওর মনটা এক বিস্ময় থেকে আরেক বিস্ময়ে লাফিয়েই চলেছে।…

বিজয়াদি বেঁটে মেয়ে ছাতাটি খুললেন। তার ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে রুমাল দিয়ে বাঁধা ছোট একটি পোটলা বার করলেন। রুমালের গিঁট খুলতে হীরক দেখলো, জবাফুল, সিঁদুর চর্চিত বেলপাতা ও পেঁড়ার প্রসাদ সমেত ঠিক কালীবাড়ির ছোট্ট সরার মতো একখানি সরা। বিজয়াদি চোখ নিচু করে, ফুল বেলপাতা সরিয়ে সরায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন। হীরকের চোখের দৃষ্টি স্থির। সরা থেকে ছোট্ট একটুখানি ভাঁজকরা একটা কাগজ বিজয়াদি হাতে তুললেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের পুরিয়া, যা ডাক্তাররা বানিয়ে দেন, তার চার ভাগের এক ভাগের চেয়েও বোধকরি ছোটো। আস্তে আস্তে কাগজের ভাঁজ খুললেন বিজয়াদি। কাগজটি অত্যন্ত পাতলা আর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন ইঞ্চির বেশী হবে না। কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে কালোদা পশ্চিম দিকের জানলার কাছে উঠে গেলেন।

টেবিলের ওপর কলাইকরা গামলায় তুলো ভিজোচ্ছিলো যে ছেলেদুটি, তাদের মধ্যে একটি সাদাটে মুখে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো বিজয়াদির কাছে। "বিজয়াদি গান্ কটন সাকসেসফুল হচ্ছেনা. প্রপোরশনে নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে। কালোদা টের পেলে তো খেয়ে ফেলে দেবেন একেবারে—"

বিজয়াদি বললেন, "সে কী বরুণ, আগে কেন বলোনি? অজয় এতক্ষণ ছিলো, দেখে দিতে পারতো। এতগুলি দামী জিনিষ লোকসান…ওমা অজয়! তুমি এখুনি ফিরে এলে কী করে?" অজয় ঠোঁট খুলবার আগেই দ্রুত চাপা গলায় বিজয়াদি বলে উঠলেন, "পরে কথা হবে, কালোদা ক্ষুদ্র লিপির অক্ষর উদ্ধারে ব্যস্ত, তুমি এই ফাঁকে চট্ করে বরুণদের কাজটা একটু দেখে এসো তো গান্‌কটন্ নাকি সাকসেসফুল হচ্ছে না।

অজয় চোখ দিয়ে বরুণকে এক পশ্‌লা আগুন ছুঁড়ে নীরবে টেবিলের কাছে চলে গেলো।

অদৃশ্য কালি দিয়ে যে ছেলে দুটি সাদা কাগজে লিখছিলো, তারা এবার বিজয়াদির কাছে এসে কাগজগুলি বিজয়াদির হাতে দিলো। বিজয়াদি একটা একটা কাগজ তুলে নিয়ে চোখের সামনে থেকে দূরে ধরে দেখতে লাগলেন। অনেক সময় একশো টাকা নোটের জালছাপটা লোকে যে ভাবে দেখে নেয়, অনেকটা সেইরকম। সব ক'টি কাগজ দেখে দিয়ে বিজয়াদি খুশি মুখে রায় দিলেন—ঠিক আছে। যুবকদুটি নিঃশ্বাস ফেলে হাসলো একটু।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ছোটো ছোটো পা ফেলে কালোদা ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। বসেও গম্ভীর হয়ে রইলেন। কালোদার মুখের চেহারা দেখে মনে হলো পত্রসমাচার কুশল নয়।

উদ্বিগ্ন গলায় বিজয়াদি শুধোলেন, "কী ব্যাপার কালোদা, কোনো অশুভ কিছু—"

"না, তেমন কিছু নয়—" সামনের দেয়ালের দিকে ঈষৎ চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেমে থেমে কথাগুলি বললেন কালোদা, "আমাদের অভিযানের সময় আরো পিছিয়ে দিয়েছেন বাঘাদা, প্রায় মাস পাঁচেক। আমাদের পরিকল্পনার খসড়া আরো

নিখুঁত ভাবে তৈরী হওয়া চাই, আর দায়িত্বের গুরুভার যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তাদের আরো সচেতন ভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। তা এ এক পক্ষে ভালই হলো, প্রস্তুতির আরো সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া আরো কটা জায়গা থেকে নিট্ খবরের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন বাঘাদা···তা···। ওহে শোনো তোমরা। তোমাদের চাট টোকা বন্ধ বন্ধ রাখো এখন, তোমাদের ঘাঁটি হয়তো বদলে যেতে পারে···।'

শেষের কথাটা কালোদা বললেন, ঘরের উত্তর কোনে দাঁড়ানো দশটি যুবককে উদ্দেশ্য করে। তারা লেখা বন্ধ রেখে কান খাড়া করে কালোদার কথা শুনছিলো। এবার নোটবই বন্ধ করে পকেটে পুরলো। কিন্তু সকলের মুখই হয়ে উঠলো আষাঢ়ের মতো। অর্থাৎ বিলম্বটা তাদের মনঃপূত নয়।

অজয় আরো মুহ্যমান। টেবিলের কাছ থেকেই কান পেতে কালোদার কথা শুনছিলো। কাছে এসে নিতান্ত ক্ষুণ্ণগলায় বললো, "একেবারে পঁচাত্তর দেরী !···"

কালোদা এতই চিন্তা মগ্ন ছিলেন, অজয়ের উপস্থিতি এতক্ষণ টেরই পান নি। চমকে মুখ তুলে অজয়কে সামনে দেখেই প্রশ্ন করলেন, "সে কী অজয়! এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? পুতুলকে পৌঁছে দিয়ে আসোনি?"

"না—" অজয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

"বলো কী অজয়, এমন আচরণ তো তোমার কাছ থেকে কখনো আশা করিনি আমি!"

"আর যা আদেশ করবেন সব পালবো কিন্তু পুতুলের আনা নেওয়ার ভার আজ থেকে আর কারোর ওপর দিন, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না—" "কী হলো হে? রাস্তার মধ্যে রাগারাগি করে লোকহাসিয়ে শেষকালে চলে এলে? ক্রোধ রিপুর অতটা প্রশ্রয় দেয়া কী ভাল?"

উত্তেজিত অজয়ের কানে কালোদার কথা বোধহয় পৌঁছোলোই না। নিজের কথার জের টেনে বলে চললো, "রূপের গরবে একেবারে মটর মটর করছে। তখন যে বললো, সারা বিকেলে ঘুরে মাত্র পঞ্চাশ টাকা চাঁদা আদায় হলো, তার আসল মানে হলো এই—মাত্র এক বিকেলেই আমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা তুললাম, তোমরা সকলে দেখো আমার ক্ষমতা—। তখন তো বেখেয়ালে আপনি ওকে বাহবা দিতে ভুলে গেছেন, তার মাশুল আমার কাছ থেকে তুললো।"

কালোদা হাসি চাপলেন, "কী হলো তাই বলোনা খুলে?"

"নীহারকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে ডেকে বলাহচ্ছে, অজয়দা, তুমি তো তিনদিনে চারটাকা চাঁদা তুলেছো, সে হিসেবে একবেলায় আমার পঞ্চাশ টাকা—,খুব একটা কম হয়নি কী বল? সেই থেকে আমার আবার মন খরাপ হয়ে আছে, একশোটা টাকা কেন তুলতে পারলাম না।···

···আচ্ছা, এ কথায় কার না রাগ হয় বলুন? জবাবে আমিও বললুম,—ভগবান তোমাদের মেয়েদের কত ছলাকলা কত একস্ট্রা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে তুমি তো অন্ততঃ যথেষ্ট সচেতন, তবে আবার ন্যাকামী কেন? তেজ দেখিয়ে নীহারকে ডেকে নিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলে গেলো। যাকগে···মরুকগে, আমি ওসব তেজকে পরোয়া করি থোড়াই ···যেতে দিন ওসব কথা, বাঘাদার চিঠিখানা আমি একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারো।" কালোদা কাগজের টুকরোটা অজয়ের হাতে দিয়ে নিঃশব্দে একবার বিজয়াদির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। অজয়ের সেটা চোখে পড়ে গেলো, সেই সঙ্গে বিজয়াদির চোখের কৌতুকব্যাঞ্জনাটুকুও। বিজয়াদির উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলো সে। চিঠি পড়ার অছিলায় দ্রুত উঠে গেলো পশ্চিম দিকের জানালার কাছে।

"হীরক!···" কালোদার এত গভীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর

শোনার জন্য যেন প্রস্তুত ছিলোনা হীরক। কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করতে দেরীও হলোনা তার। মুখ তুলে সোজা চোখে তাকাল, "বলুন—"

কালোদা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হীরকের দিকে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। এই নীরব পর্যবেক্ষণের দরুণ ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করলো হীরক, কিন্তু চোখ নামালোনা।

"আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে তুমি আজ নাম স্বাক্ষরিত করবে?"

"না—"

মুখের ওপর দ্রুত এমন নেতিবাচক শব্দ একেবারেই আশা করেননি কালোদা। এক মুহূর্তের জন্য কালোদার চোখে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই তা নিভে গেলো। ভুরুর মাঝখানে কুঞ্চনটা জেগে রইলো শুধু। চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন হীরকের ঝকঝকে চোখের নির্ভীক দৃষ্টির দিকে। "তুমি কী প্রস্তুত নও হীরক?" কালোদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হীরকের মুখের ওপর পড়েই রইলো। সামান্য নড়ে চড়ে হীরক আরো আঁটো হয়ে বসলো। বললো, "আপনাদের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে আমার কিছু প্রতিবাদ আছে। নির্বিকারে এবং নির্বিচারে তা মানতে আমি রাজি নই। মীমাংসার এটাই একমাত্র পথ কিনা, এ নিয়ে আরো তলিয়ে ভেবে দেখবো আমি। তবে, প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর না করেও, গত একবছর ধরে নিজেকে মনে প্রাণে এ পার্টির একজন সভ্য বলেই মনে করি—" শুধু হীরকের কথাই নয়, কথার ভেতরে যেন একটা ঔদ্ধত্যের সুরও ছিলো। হলঘরের সবাই হীরকের স্পর্দ্ধায় মিহি গুঞ্জন তুললো। —যাঁর ভয়ে সকলে তটস্থ, তাঁর মুখের ওপর কিনা—

কালোদা কিন্তু উজ্জ্বল মুখে হেসে উঠলেন।

"ভেরি গুড। তোমার সাহস প্রশংসনীয় হীরক। কিন্তু কানুন কী পাল্টায়? পাল্টায় না। বেশ, আরো পক্ষকাল সময় দিলাম তোমাকে। নিজের মনকে আরো ক'টা দিন দেখে নাও তুমি।...আচ্ছা, আজ তোমার ছুটি। হীরকের কাঁধে শক্ত করে একবার হাত রাখলেন কালোদা, তারপর নামিয়ে নিলেন।...অজয়! তুমি এগিয়ে দিয়ে এসো হীরককে। আর শোনো—" অজয়কে নিয়ে ঘরের একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলেন কালোদা।

বড় বড় পা ফেলে গলির পথ নীরবে পার হলো হীরক অজয়। রাস্তায় পা দিয়েই হীরক পদক্ষেপ ছোটো করলো, "অজয়বাবু!" অজয় যে আত্মমগ্ন ছিলো, তা তার সচমক সাড়াতে বোঝা গেলো।

"কী ভাবছেন?" নিজের প্রশ্ন থামিয়ে হীরক জিজ্ঞেস করলো। নিরুত্তরে অজয় হাসলো একটু। হীরক উত্তরের জন্য কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করে বললো, "অর্থাৎ যা ভাবছেন, তা আমাকে বলা চলে না—এইতো?"

অজয় নিঃশব্দে আবারও হাসলো। কোনো জবাব দিলো না।

সামান্য বিরতি। ভেতরের অস্থির তাগিদে হীরক আবার ডাকলো, "অজয়বাবু—"

চোখে প্রশ্ন রাখলো অজয়।

"আচ্ছা, আমি যদি কয়েকটা প্রশ্ন করি, তার উত্তর পাবো?"

চলতে চলতে অজয় হীরকের দিকে একবার তাকালো "প্রশ্ন না শুনেই কেমন করে কবুল করি বলুন?"

"তা অবশ্য। তবে জবাব যদি দেন, সত্যি দেবেন, বানিয়ে বলবেন না—" অজয় এবার শব্দ করে হাসলো। "আপনার একটা প্রশ্ন তো এই, জেলে আটক বাবাদার লিখিত আদেশ মাকালীর মির্মাল্যের ভেতর এলো কী করে?" হীরক হাসিমুখে বললো, "ঠিক তাই।"

এক মুহূর্ত সুতীব্র চিন্তা করলো অজয়। "এ সংবাদ আপনাকে জানতে আমার আপত্তি নেই।—বাবাদার শুধু এক বিধবা দিদি আছেন, তিনি মাসে একবার করে ভাইয়ের

সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছেন। সেই পারমিটখানা নিয়ে বিজয়াদিই দিদি সেজে যান আর কি—"

"ওরা যদি এনকোয়ারি করেন বাঘাদার দিদির কাছে গিয়ে ?"

"তা কী আর করেন না—" অজয় হাসলো।

অর্থাৎ সবদিক আঁট ঘাট বেঁধেই এ কাজ হচ্ছে।

"আর ঐ মাকালীর নির্মাল্যের ভেতর থেকে বাঘাদার চিঠি বার হলো, ওর অর্থ কী ?"

'মা কালীর নির্মাল্য নিয়েই বাঘাদার দিদি প্রতিবার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। সাক্ষাতের সময় যে সার্জেণ্ট সামনে থাকে, পূজোর ফুলবেলপাতা সার্চ করার কথা সে ভাবতেই পারে না। আমাদের এখানকার খবর কিম্বা কোনো প্রশ্ন ছোট্ট একটা কাগজে খুবে খুবে করে লিখে, সেই সঙ্গে আর একটা কাগজও বাঘাদার উত্তর লেখার জন্য, আপনি তো কাগজের আকার দেখেছেন, ঐ ছোট্ট দুটো কাগজ যতখানি ভাঁজ করা যায় ভাঁজ করে, দুটো আস্ত বেলপাতার মাঝখানে রেখে, বেলপাতার ধারগুলো আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়। বিজয়াদি অর্থাৎ বাঘাদার দিদি গরাদের এপাশ থেকেই ভাইয়ের কপালের সামনে—নির্মাল্যের সরাটা তুলে ধরে বাঘাদার কপাল সিঁদুর চর্চিত করেন তারপর ঐ জোড়া বেলপাতা ও একটা জবাফুল ভাইয়ের মাথায় ঠেকিয়ে তাঁদের হাতে দেন, সেই ফাঁকে, আগের বারের সাদা কাগজের টুকরোটা, যেটা নাকি উত্তর লিখে ছোট্ট ভাঁজ করে আঙুলের ফাঁকে রেখেছেন বাঘাদা, সেটি টুক্ করে ফুল-বেলপাতা ভর্তি নির্মাল্যের সরার মধ্যে ফেলেছেন।" কথা শেষ করে অজয় হাসলো, "নির্মাল্যের ভেতর বাঘাদার চিঠির রহস্য এবার পরিষ্কার হলো তো ?"

হীরক চমৎকৃত। মুগ্ধ বিস্ময়ে বললো, "তা হলো—"

মিনিট তিনেক চুপচাপ চলার পর, অজয় বললো, "আমি ঐ একটাই অনুমান করেছিলাম, কৈ আপনার কী প্রশ্ন তা তো বললেন না ?"

হীরককে ইতঃস্তত: করতে দেখা গেলো।

"কৈ, বলুন ?" অজয় তাড়া দিলো।

সামান্য দ্বিধার পর বলেই ফেললো হীরক, "কালোদা কী বিজয়াদির কেউ হন ?"

অজয়ের মেজাজ দখলের বাইরে চলে গেলো হঠাৎ। ভ্রূভঙ্গি করে তপ্তগলায় বললো, "এ কৌতূহল আপনার শুধু অহেতুকই নয়, এ অত্যন্ত অন্যায়, এর উত্তর আমি আপনাকে দেব না।—"

অজয়ের মেজাজে হীরকও ক্ষেপে গেলো। সমান গলায় বললো, "আপনার দম্ভের উত্তাপও কম নয় অজয়বাবু, নিজের চানা বোঝাটাকেই সর্বদা যথেষ্ট মনে করবেন না—" আরো কিছু ঝাঁঝালো কথা হীরকের ঠোঁটের প্রান্তে এসে ঝুলতে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলালো হীরক।

অজয় মনে মনে বিচলিত বোধ করতে লাগলো। বিচলিত ও সহজে হয় না। হতোও না এখন, যদি না আসার আগে সিঁড়ির মুখে ডেকে নিয়ে কালোদা ওকে গুটিকয়েক কথা না বলতেন,—ওহে অজয়! এ যে একেবারে সেরা ইস্পাত! যেমন মনের শক্তি তেমনি ব্যক্তিত্ব, একে আমাদের চাই। পনেরোটা দিন বেশ করে তালিম দাও হে ওকে। ওর বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছে একটা, সেই ঝড়ই ওকে এনে দেবে আমাদের মধ্যে।—কালোদার কথা মনে পড়তেই নিজেকে সংযত করে নিলো অজয়। আবহাওয়াটাকে তরল করার জন্য উঁচু গলায় হেসে উঠলো, "আমার মস্ত আবার ফিলে গেলেন, হীরকবাবু!" হীরকের উত্তেজনা তখনো কমে নি। সেই আগের স্বরেই বললো, "তানা হলে পুতুলদেবীর তুচ্ছ একটা কথায় তাঁকে রাস্তার মাঝখানে সন্ধ্যের মুখে ছেড়ে আসতে পারতেন না।—"

তখনো রাস্তার আলো জ্বালা শুরু হয়নি, ঐ প্রায়ান্ধকারে

অজয় চোখ বিস্ফারিত করে হীরকের মুখের চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করলো একটু। তারপর সহজ গলাতেই বললো, "আপনি পুতুলের সঙ্গে আলাপ করতে চান, চলুন আজই নিয়ে যাই আপনাকে পুতুলের কাছে—"

হীরক হেসে ফেললো, "আপনি অতি যাচ্ছেতাই হৃদয়হীন লোক অজয়বাবু—" "আহা হীরকবাবু, আপনি অত লাল হচ্ছেন কেন? পুতুলের নিরাপদে পৌছানো নিয়ে আপনি বিশেষ চিন্তিত, উৎকণ্ঠাটা আপনার স্নায়ুর ওপর একেবারে চেপে বসেছে…তাই বলছিলুম, নিজের চোখে দেখেই না হয় আসুন—" হীরক আবার হাসলো, "আপনি কী চিন্তিত নন?"

"না।" একান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর অজয়ের।

পাশাপাশি নীরবে চললো দুজনে। হীরককে একেবারে গুম হয়ে যেতে দেখে, কিছুক্ষণ পর অজয় সহাস্যে বললো, "এখনো কী পুতুলের নিরাপত্তার কথা ভাবছেন নাকি হীরকবাবু?"

হীরকের মুখে হঠাৎ একঝলক রক্ত উঠে এলো, কণ্ঠস্বরকে পুরোপুরি মোলায়েম রাখতে চেষ্টা করেও পারলোনা, ইষৎরুক্ষ গলায় বললো, "আমি খামোখা ভাবতে যাবো কেন পুতুলদেবীর কথা? আমরা তো বাইরের লোক। যে ভেতরের, তার যদি মন উচাটন না হয়, তার যদি হৃদয় বলে বালাই না থাকে—"

হো-হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো অজয়, "যাক্, পুতুল ভাগ্যবতী সন্দেহ নেই, আর একটি ভক্তের সংখ্যা বাড়লো…হীরকবাবু! মানুষ খামোখাই অকারণ ভাবনা ভাবে। শুধু ভাবে নয়, ভেবে ভেবে অস্থির হয়। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দি, আমাদের এই পুতুল কিন্তু খোকেদের পুতুল নয়—" তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বর একেবারে পাল্টে দৃঢ়-গম্ভীর সংযত গলায় বললো, "আমরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতা মুক্তিকামী সৈনিক, আমরা বিপ্লবী, আমরা যোদ্ধা। পৃথিবীর রূপ-রস-আনন্দ-আলোর আমাদের জন্য নয়। শুধু মাত্র একটি সাধনাতেই আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

[ভুল ৫১৪ পৃষ্ঠার পর]

পয়সা গুণেও নিল না। বিধুভূষণই বিনীতভাবে নমস্কার করলেন তাঁকে।

ট্যাক্সিটা চলে গেল। সেইদিকে চেয়ে রইলেন বিধুভূষণ। আশ্চর্য!

বাড়ীতে ঢুকতেই একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। বড় দুই ছেলেমেয়ে ছুটে এলো গিন্নী নেমে এলেন হাঁফাতে হাঁফাতে 'কি গো, কি হয়েছে তোমার? শরীর টরীর…?'

মৃদু হেসে বরাভয়ের ভঙ্গীতে হাত তুলে তাদের নিরস্ত করলেন বিধুভূষণ 'কিছু হয়নি।'

'তা হলে অফিস?'

'ছুটি হয়ে গেল আজ।'

'কেন গো?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিধুভূষণ 'একজন কেরানী মারা গে'ল হঠাৎ। তাই…' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আমাকে বিরক্ত কোরোনা কেউ। আমি একটু ঘুমোবো।' বলে সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে এলেন বিধুভূষণ। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলেন।

কি করে, কোন পথে গেলে লোকটাকে এড়ানো যায়—তা বিধুভূষণ ভেবে পেলেন না। চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবেন! কিন্তু সেটা কেমন দেখাবে? তা ছাড়া তাঁর ছেলেমেয়েরাও বড় হয়নি—বুড়ো মা বাবাকে টাকা পাঠাতে হয়—গিন্নীকে নিয়ে তাঁর সাধআহ্লাদ এখোনো মেটেনি। কি করবেন বিধুভূষণ?

অনেক ভেবে টেবে দেখলেন বিধুভূষণ। তাঁর মনে হল এ ব্যাপারটা কাউকে জানিয়ে দিলে হয়। কাকে জানাতে হবে তার কিছুই তিনি জানেন না। তবু আবছাভাবে তাঁর মনে হ'ল এব্যাপারে একটা যুক্তিপূর্ণ অভিযোগ তিনি খাড়া করতে পারেন।

কিছুই জানেন না বিধুভূষণ কাকে জানাবেন—কি জানাবেন—এবং কি ভাবে জানাবেন তবু তিনি গোটা দুই ফুলস্ক্যাপ কাগজ তাঁর ছেলের লম্বা খাতা থেকে ছিঁড়ে নিলেন। তারপর কলম বাগিয়ে বসলেন তিনি।

পাঠ লিখলেন: 'মান্যবরেষু।

তারপর লিখলেন: আমার একটি অভিযোগ আছে…

তারপর কি লিখবেন ভেবে না পেয়ে কলম কামড়ে ধরে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোথায় কি একটা গোলমাল রয়েছে, ষড়যন্ত্র রয়েছে যা কিছুতেই ধরতে পারছেন না তিনি। উঠে খানিকক্ষণ পাইচারী করলেন। আবার বসলেন খানিকটা আঁকিবুকি করলেন কাগজটার ওপর। আরো কাগজ ছিঁড়ালন খাতা থেকে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ।

ঘুম ভাঙল গিন্নীর ডাকে। ধড়মড় করে উঠে দেখলেন অন্ধকার হয়ে এসেছে। দরজা খুলে দিতেই গিন্নী বল.লন 'এত ঘুম!' ধেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিধুভূষণ হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল এতক্ষণ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। স্বপ্ন দেখেছেন যে একটা স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে এই যে সেই ঘুম ভাঙাটাও আসলে স্বপ্নের ভিতরেই ঘটেছে—তারপর আরো একবার ঘুম ভাঙল তাঁর মনে হ'ল আগের জেগে ওঠাটাই স্বপ্ন ছিল। এই ভাবে একটার পর একটা স্বপ্ন ভাঙছিল তাঁর আর মনে হচ্ছিল আগের স্বপ্নটাই ছিল স্বপ্ন আগের ঘুমটাই ছিল ঘুম। স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন তার ভিতরে স্বপ্ন এবং প্রতিটি স্বপ্নই ঘুম ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন। এই ভাবে ঘুমের ভিতরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন এবং তারও ভিতরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কতদূর তলিয়ে গিয়েছিলেন বিধুভূষণ? ভেবেই উত্তেজিত হলেন বিধুভূষণ রক্তচাপ বেড়ে গেল গিন্নীকে বললেন 'আমায় একটা রাম চিমটি কাটো ত'! প্রথম প্রথম যেমন কাটতে!'

'কেন গো?'

'বুঝতে পারছিনা জেগে আছি কিনা।'

'আহা।' গিন্নী বললেন।

'ভাখোনা!'

গিন্নী ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসিটা চমৎকার দু' পাশে দুটি ছোটো ছোট আক্কেল দাঁত দেখা যায়—এখনো বুকের ভিতর তোলপাড় করে ওঠে বিধুভূষণের। তিনি দুই ব্যাগ্র হাত বাড়িয়ে দিতেই গিন্নী ছুটে পালালেন।

বিধুভূষণ হাই তুললেন। লাইট জ্বাললেন। তারপর চুপচাপ টেবিলের ওপর অভিযোগ পত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন 'মান্যবরেষু আমার একটি অভিযোগ আছে....' বাস্, আর কিছু লেখা নেই।

গিন্নী চা নিয়ে এলেন কিছুক্ষণ পর। চায়ের কাপটা রেখে সদ্য বাঁধা খোঁপাটা ঠিক ঠাক করতে করতে হঠাৎ বললেন 'ওঃ' তোমায় বলতে ভুলে গেছি। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন তোমায় খুঁজতে একটা লোক এসেছিল।

চায়ের কাপটা প্রায় উল্টে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন বিধুভূষণ 'কে?'

গিন্নী হেসে বললেন 'কে যেন চিনি না। একটা চিরকুট দিয়ে গেছে।'

'কেমন চেহারা লোকটার?' রুদ্ধশ্বাসে বললেন বিধুভূষণ।

'তেমন লক্ষ্য করিনি তো! তবে বেশ সুন্দর চেহারা ফর্সা, মোটাসোটা, ছোটো করে ছাঁটা চুল।'

'পুলিশদের মতো?'

'না, পুলিশ টুলিশ মনে হল না তো?'

'আহা' পুলিশ কে বলছে! বলছি চুলটা কি পুলিশদের মতো?'

'কি জানি বাপু!' বাসালো ঠোঁট উল্টে বললেন গিন্নী। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করলেন না বিধুভূষণ, জিজ্ঞেস করলেন বাঁ চোখের পাশে একটা লালচে আঁচিল ছিল? মনে করে ভাখো তো'?'

গিন্নী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন 'ঠিক মনে পড়ছে না 'তবে হ'তে পারে। চোখ দুটো যেন কেমন বাপু এমন হাঁ করে দেখছিল! মনে হচ্ছিল কোথায় যেন.......'

'ম্যানেজার....' প্রায় আর্তকণ্ঠে বললেন বিধুভূষণ।

'কে? কার কথা বলছ!'

জবাব দিলেন না বিধুভূষণ, হঠাৎ দু' হাত বাড়িয়ে বললেন 'কই দেখি!'

চমকে দু' হাত পিছিয়ে গেলেন গিন্নী বললেন 'কি চাইছ? তোমার লজ্জা সরম...'

'আঃহা ওসব নয়, চিরকুটটা দেখি!'

'ওঃ!' যেন খানিকটা হতাশ হলেন গিন্নী। আঁচলের গেরো খুলে চিরকুটটা দিলেন বিধুভূষণের হাতে। চলে যেতে যেতে প্রায় হতাশ অস্ফুট গলায় বললেন 'কি যে হয়েছে তোমার...'

চিরকুটটা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিধুভূষণ। ঝকঝকে টাইপ করা ছোট্ট একটু চিঠি 'এতদ্বারা শ্রীবিধুভূষণ সরকারকে জানানো যাইতেছে যে আমরা তাহার অভিযোগ পত্রটির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি...'

তাড়াতাড়ি আবার টেবিল হাতড়ে দেখলেন বিধুভূষণ—অভিযোগ পত্রটা তখনো লেখাই হয়নি, শুধু পাঠটুকু লেখা আছে: 'মান্যবরেষু, আমার একটি অভিযোগ আছে...।'

আস্তে আস্তে আবছাভাবে বুঝলেন বিধুভূষণ—এই অদ্ভুত খানাতল্লাসী থেকে তাঁর কোনো রেহাই নেই। আবছাভাবে তিনি ম্যানেজারের পিছনের সেই কলকব্জা, প্লাগ ও গুপ্ত প্লাগ পয়েন্ট, বেতার সংকেত ও টেলিভিশনের অর্থ ধরতে পারলেন।

হতাশভাবে বসে রইলেন বিধুভূষণ। না, তাঁর আর কিছুই করবার নেই।

Phone :
Factory : 55-2371
Office : 22-6312
Residence : 55-6361

SREE MA TYPE FOUNDRY

Quality Printing Types & Wooden Press
Furniture Manufacturer

259, RABINDRA SARANI
CALCUTTA-5

Champion
VACUUM
FLASKS
guarantee performance
full 24 hours

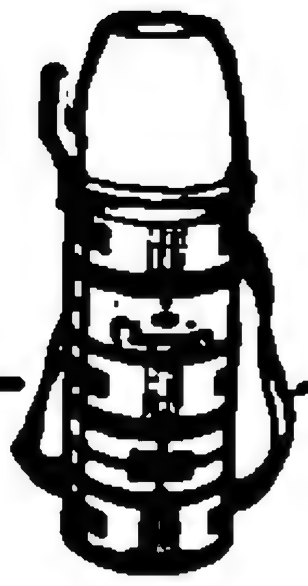

HIRJI & CO.(P) LTD.
20, Pollock Street, Calcutta-1.
106, Tantanpura Street, Bombay-9.

PRO/HPL-28

সিঁদুরের দাগ

দিব্যেন্দু পালিত

দুপুরের দিকে পর পর ক'বার বাথরুমে গেল হিরণ্য।

পাহাড়ী বর্ষার এই এক অসুবিধে। মেঘ-গর্জন শুরু হলো কি হলো না, পাকস্থলীতে তার প্রতিধ্বনি শুরু হতে দেরি হয় না। প্রি-কশন নিলে ভালো, না নিলে অবস্থা হয় হিরণ্যের মতো। মাথায় ব্যথা, পেট কামড়ানো, পায়ের শিরায় খিঁচধরা—মানে, দস্তুরমতো রেন-সিকনেস।

তার ওপর বৃষ্টি চলছে ক'দিন এক নাগাড়ে। কখনো ঝিরঝিরি, কখনো বা জোরে। মাঝে মাঝে 'থামছি' ভাব করে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। থেমেও থামে না। বাজার এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই বৃষ্টিতে নিজে যাওয়া তো দূরের কথা, বাহাদুরকে পাঠাতেও ভরসা হয় না। তখন তার ফিরে আসার অনিশ্চিতি সম্পর্কে ভাবতে হয়।

এই একঘেঁয়েমীও তো অসহ্য। আর কিছু না হোক, রসনার তৃপ্তির জন্যও প্রয়োজন কিছু বৈচিত্র্যের। সমতলের জীব, শহরে থেকে থেকে রুচিমাফিক ভালোমন্দ খাওয়ার অভ্যাস জন্মেছে। ইচ্ছে মতন উদরের তৃপ্তি সাধন করার জো এখানে নেই। ভরসা, জান বাহাদুরের মোরগবাহিনী; অগত্যা কোণঠাসা হতে হয়েছে তাদেরই। সাধারণ ত্রাহি ত্রাহি ভাব, নিহতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মরক্ষার করুণ প্রতিবাদ ও দাবি মাঝে মাঝে বিষণ্ণ করে তোলে।

কট্টর মাংসাশী হ'লে হবে কি, হিরণ্যের প্রাণেও দয়া মায়া আছে।

সেই সুবাদে গত সন্ধ্যায় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জান বাহাদুরকে পাঠিয়েছিল দূরের বাজারে। দু'হাতে দু'টি বড় রুই, কাতলা ঝুলিয়ে ফিরে এল। তারপর যথারীতি গুরুপাক। চাকর গুণ আছে, ভাতের ফ্যান গালতে না-পারুক, কোর্মা কালিয়ায় সে একজন দক্ষ শিল্পী। বাহাদুরের মধ্যেও পেয়েছে বিশ্বস্ত অনুচর, মেমসাব-অন্ত প্রাণ!

ঐ কঠিন শরীর, পেটানো স্বাস্থ্যের মধ্যে এত কোমলতা থাকে কি ক'রে!

চেহারায় পুরুষালি, অথচ হাবভাব দেখে অর্ধনারীশ্বর ব'লে ভ্রম হতে পারে। তেমনি বোঝে চাকর মনের খবর।

গামলায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে একটু ওদিকে তাকাল চাক কি আর বসে নেই। 'ঘিউ চাহিয়ে মেমসাব?' ঠিক তাই, সঙ্গে সঙ্গে তাক থেকে নেমে এল ঘিয়ের টিন। রাঁধবার সময় চাকর হাতজোড়া, অথচ ঘাড় চুলকোচ্ছে বেয়াড়া রকমের। কোনো সংকোচ দ্বিধার বালাই নেই চাকর; 'বাহাদুর ইজ রেডি ফর টু হেল্প, ইউ।' কথাটা হিরণ্যের। সে উপভোগ করে, ঠাট্টাও করে।

গত রাত্রেই তো লেপের তলায় শুয়ে চাকর পায়ে পা ঘষতে ঘষতে বলেছিল, 'আই বিলিভ ইউ ফিলিং হিজ টাচ্। কর্কশ নয়?"

'কি যে বলো!' নম্রতা চারুর আরও একটি গুণ। 'কর্কশ, কোমল ভাববার সুযোগ দিলে তো! চাকর-বাকর নিয়ে রসিকতা করো না।'

'লুক ডার্লিং।' বলেছিল, হিরণ্য ; 'বউটিকে দেখেছো? সি ইজ প্রেটি ইয়াং। কিন্তু, কেমন যেন আনস্মার্ট! আনলাইক ইউ।'

'বটে!' পায়ের পাতায় শায়া ঢাকতে ঢাকতে চারু বলেছিল, 'আমি কালই চলে যাবো।'

অভিমান আর কি! হাজার হোক বাঙালীর রক্ত তো, কখন কোন কথায় চারুর শিরায় জট পাকাবে, হিরণ্যের তা ভালো করেই জানা আছে। অবশ্য এই ধরণের বাক্য বিনিময় তাদের মধ্যে প্রায়ই হয়ে থাকে। পরিণতি অন্তরঙ্গ নিদ্রায়।

বর্ষায়ও কালিম্পং সুন্দর। কিন্তু সে দিনের বেলায়, রাত্রে নয়। মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে তাই খুব অবাক হয়েছিল হিরণ্য। চারু পাশে নেই।

দরজার ওপাশে চাপ চাপ কালো মেঘ। ভিতরে বেশ শীত। এরই মধ্যে শার্সিতে মুখ চেপে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে চারু।

কিছু দেখছে বলেও তো মনে হয় না।

অন্ধকারে সবকিছু অস্পষ্ট, নিরাকার। অদূরে জলের একটানা শব্দ। কাছেই আছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শীর্ণ জলধারা, বর্ষার জলে পুষ্ট হ'য়ে হয়তো গতি প্রখর হয়েছে। সামনে এক শ' গজ লন, তার ওদিকে ছোট ডেরায় থাকে জান বাহাদুর এবং তার বউ। এখান থেকে সেটাকে ছোট পাহাড়ের মত দেখায়।

অন্ধকারের গাঢ় আকর্ষী শক্তি কি এই মুহূর্তে চারুকে মূক করে দিল! হিরণ্য অনেক কিছুই ভাবতে পারে, কিন্তু চারুর নৈশ অভিব্যক্তি বোঝার মতো মানসিক প্রবৃত্তি তার নেই।

তার পরের ঘটনা। শরীর খারাপের অজুহাতে বিছানায় ফিরে এসে—হিরণ্যের পাশে শুয়ে, সমস্ত রাত জলের শব্দ শুনেছে চারু। কখনো সপিল কখনো বিশৃঙ্খল জলের পতনের শব্দে নিদ্রার জড়তা নেই ; যা আছে তা চারুকে শরীরের ওপর বয়সের আধিপত্য স্মরণ করিয়ে দেয়। শরীর থাকছে না পাশাপাশি বয়স—উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে টিস্যুগুলো ছিঁড়ে আসার উপক্রম। মুহূর্তে একধরণের হ্যাংলামি তাকে পেয়ে বসে। বুকের ওপর এলিয়ে আছে হিরণ্যের ইষদুষ্ণ হাত। চারু ছুঁয়ে দেখল, সে-হাত মড়ার হাতের মতো থসথসে, ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ।

বিকেলের মাঝামাঝি ঝকঝকে রোদ উঠল। মেঘ সরে গিয়ে এই সময় দূরের পাহাড় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বৃষ্টির রেণু মাকড়সার জালের মতো ঝুলে আছে কেয়ারি-করা গাছের ফাঁকে ফাঁকে। তিনদিন পরে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রসন্ন বোধ করে হিরণ্য। আলো সম্পর্কে তার একটা দুর্বলতা আছে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল।

দ্বিতীয় কারণও ছিল। পর পর তিনটে ট্যাবলেট গিলে শারীরিক সুস্থ বোধ করছে এখন। দীনতার লেশমাত্র কোথাও নেই। চুয়াল্লিশ বছর বয়সেই জরা এসে অধিকার করে নেবে তাকে ভাবতেই কেমন লাগে। এই চিন্তায় মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ; মানসিক অবসাদ, অবক্ষয়ের চিন্তা ঢাকবার জন্য স্যুটকেশ টেনে বের করতে হয়। অ্যালকোহল আর কিছু না পারুক, ক্লান্তি দূর করে। জরার মহৌষধি হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকু হিরণ্য দিয়েই থাকে।

বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিরণ্য তাদের আসন্ন প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছিল। কলকাতা এখান থেকে অনেক দূরে। কতো দূরে! কতো মাইল ঠিক খেয়াল

নেই। হঠাৎ ভাবলে দিশেহারা হ'তে হয়। মাইল মাইল পথের দূরত্ব ভাবতে আজকাল স্নায়ুর ওপর বেশ চাপ পড়ে।

অথচ পাঁচ ছয় বছর আগে এমন দিনও ছিল যখন দূরত্বকে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের মতো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল সে। সকালে প্যারীর পথে ভ্রাম্যমান হিরণ্য মুহূর্তের ইচ্ছায় জুরিখে পাড়ি দেবার কথা অনায়াসে ভাবতে পারত। চারু তখন কোথায় ছিল।

ছিল হিরণ্যের কাছে ও পাশে। স্পীডোমিটারে কাঁটা ঘুরতে দেখে সেদিনের চারু আজকের মতো ঝিমিয়ে পড়ত না। বরং বলা যায়, চারু ছিল বলেই হিরণ্য ছিল; চারু পারত বলেই সেদিন হিরণ্যের না পেরে উপায় ছিল না। স্মৃতির মধ্যে হিরণ্য আজ অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছে।

চটি পায়ে নিজেকে হঠাৎ কেমন দুর্বল লাগছে। বয়সের কথা ভেবেই কি! হিরণ্য ঠিক বুঝতে পারে না। আজকাল প্রায়ই এ-রকম হয়।

ছোট একটা হাই তুলে পরিপাটি ক'রে সাজানো বারান্দার চেয়ারে ব'সে পড়ে হিরণ্য। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে সবুজ ঘাসের লন। স্বল্প তাপে বৃষ্টির রেণুগুলো ঘাসের ওপর থেকে মুছে যাচ্ছে ক্রমশ। জানবাহাদুর বেরিয়েছিল খানিক আগে টুকিটাকি চারুর ফরমায়েস ব'য়ে আনতে। সিঁড়ির মুখে হিরণ্যকে সেলাম জানাল। ঢুকে গেল ভিতরে। লনে চ'রে-বেড়ানো মুরগীগুলোকে তাড়িয়ে খোপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল মুংলী, বাহাদুরের বউ। শীতে ওদের কখনোই কাতর দেখায় না, লক্ষ করেছে হিরণ্য। তার ওপর, ছিটেফোঁটা স্বল্পমেয়াদী রৌদ্র কিরণ গায়ে মাখবার জন্যেই সম্ভবত' জামা খুলে ফেলেছে। হিরণ্য তার প্রায় অনাবৃত পিঠের গম-রঙ মাংস যতোক্ষণ পারল চোখ দিয়ে চেখে চেখে দেখল। মুংলী চারুর মতো সুগৌর নয়। তাহ'লে হবে কি, অমন মাজা পিঠ হিরণ্যের বোটামুটি অভিজ্ঞতায় আর কখনো চোখে পড়েছে ব'লে মনে হয় না। চুল রুক্ষ, জটপাকানো বেণীর লাল ফিতেটা ঝুলিয়ে দিয়েছে বুকের ওপর। হিরণ্যকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎই হাসল। কেন হাসল অনেকক্ষণ তার কোন কারণ খুঁজে পেল না হিরণ্য।

বেতের টেবিলের ওপর দুটো ফাইল পড়েছিল। এখানকার কাজ প্রায় শেষ। যাবার আগে কয়েকটা স্টেটমেন্ট সই করতে হবে; কনস্ট্রাকশন এঞ্জিনীয়ারকে দায়িত্বের শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। সে কালকের কথা। এখান থেকে জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে প্লেনে কলকাতা।

কলকাতায় পাহাড় নেই, হিরণ্য ভাবছিল। পাহাড় নেই, আকাশ নেই, কিছু নেই। সারাক্ষণ ছুটতে হয়, নেই-এর পিছনে, এমনই ব্যস্ত, কিন্তু এই নেগেটিভ পসিবিলিটির পিছনে ছুটে ছুটে কি শেষ পর্যন্ত কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়! হিরণ্যের লক্ষ্য কি? হিরণ্য তুমি সারাজীবন ছুটেছো অন্ধের মতো; কিন্তু কিসের পিছনে!

এক ধরণের বিষণ্ণতা হিরণ্যকে ক্রমশ গ্রাস ক'রে ফেলছিল। অথচ, এই দার্শনিকতার কোন অর্থ হয় না। ফাইল বন্ধ ক'রে হিরণ্য চুপচাপ তাকিয়ে থাকে দূরে। ইতস্তত দু'চারজনের যাতায়াত চোখে পড়ে। পেরেম্বুলেটারে লালটুপি-পরা বাচ্চাকে ঠেলে নিয়ে বাংলোর সামনে দিয়ে চ'লে গেল নেপালী আয়া। দু'দিনের ঝাঁক-ধরা বৃষ্টির পর সাময়িক স্বস্তির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। দৃষ্টিটা এক সময় দূরের পাহাড়ের শীর্ষদেশ স্পর্শ ক'রে আটকে যায়।

কিছুটা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল ঠিকই। চায়ের ট্রে হাতে মুংলী সামনে এসে দাঁড়াতে সাড় পেল হিরণ্য। বিকেলের রোদে গাছের বাকলের মতো মুংলীর গায়ের রঙ হিরণ্যের সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলে স্বপ্নের মতো গড়িয়ে যায়। শাড়িটা সাপটে রয়েছে সারা দেহে, দেহের ভাঁজগুলি

বড়বেশি স্পষ্ট। মুংলী হাসছে, অবাক, নির্বাক হাসি। ভীষণ রহস্যময়তার ভিতর তলিয়ে যেতে যেতে হিরণ্য ওর রুক্ষ চুলের মাঝখানে চওড়া সিঁথি, সিঁথিতে গাঢ় রক্তবর্ণ সিন্দুর দেখতে পেল।

চারু! চারু কোথায়! এই মুহূর্তে হঠাৎ চারু সম্পর্কে হিরণ্যের উদ্বিগ্নতার কারণ কি! হঠাৎ কি স্মরণ হলো হিরণ্যের চারু, তার স্ত্রী, অনেকক্ষণ কাছে নেই! বোঝা যায় না।

বিকেলে চায়ের সময় চারু রোজ কাছে থাকে। এ ক'দিন অন্তত ছিল। স্পষ্টই অবাক স্বরে হিরণ্য প্রশ্ন করে, 'মেমসাব কিধর?'

ভিজে চকচকে ঠোঁটের হাসিটুকু মর'ল না। চারুকে গতশ্রী বলা যায় না। তবু, সন্দেহ হয় হিরণ্যের, চারুর হাসি কি কোনদিন অমন সিক্ত মাধুর্য বিচ্ছুরণ করত। মুংলী চলে যেতে হিরণ্য টের পেল এতখানি বিচলিত হওয়া তার পক্ষে উচিত হয়নি। না, হয়নি।

চারু এল একটু পরে। পরিপাটি পোষাক, সম্ভবত এতক্ষণ সে সাজসজ্জায় ব্যস্ত ছিল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর তরতর ক'রে হেঁটে সোজা চ'লে এল সামনে। চারু কি ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে!

'তোমার শরীর এখন কেমন?'

'ভালো।' হিরণ্য ঘাড় নাড়ল। তেমন জোর পেল না। পিছনে বেতের টুকরি হাতে বাহাদুর দাঁড়িয়ে। ভাবলেশহীন, নির্বিকার মুখের পেশিগুলো চকচক করছে। চৌকাঠের ওদিকে মুংলী। হিরণ্য তার শরীরের আধখানা দেখতে পেল। বাকিটা অদৃশ্য

'বাহাদুরকে নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি।' চারু অত্যন্ত স্পষ্ট। হিরণ্যের অনুমতির জন্য প্রার্থনা নয়। চ'লে যাওয়ার অমোঘ শক্তি নিয়ে চারু যেন সত্যি সত্যিই আজ হিরণ্যের মুখোমুখি।

'মুংলী রইল।' চারু বলল, 'কিছু দরকার পড়'লে ওকে ডেকো। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব।'

কিছুক্ষণ, মানে কতোক্ষণ? তার ফিরে-আসার ওপর চারু এত জোরই বা দিতে চায় কেন!

হিরণ্য ঈষৎ ঘাড় হেলালো মাত্র। অর্থাৎ, ঠিক আছে। হিরণ্য কি আগেই জানত চারু আজ বেরোবে, বেরুনোয় তার একান্ত প্রয়োজন!

চায়ের পেয়ালায় আস্তে আস্তে বার কয়েক চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল হিরণ্য। সামনে লন। লনের বাইরে উঁচু-নিচু পাহাড়ী সড়ক ঘুরে ঘুরে নিচে নেমেছে। এত দূর থেকেও একটা বাঁকের মুখে হিরণ্য চারুকে টাল খেতে দেখল। বাহাদুর সঙ্গে আছে, এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ খুব বিশ্বস্ত হয়।

পাহাড়তলীর পথে দুই মূর্তিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে হারিয়ে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হিরণ্য।

চারুর কথা আপাতত না ভাবলেও চলে।

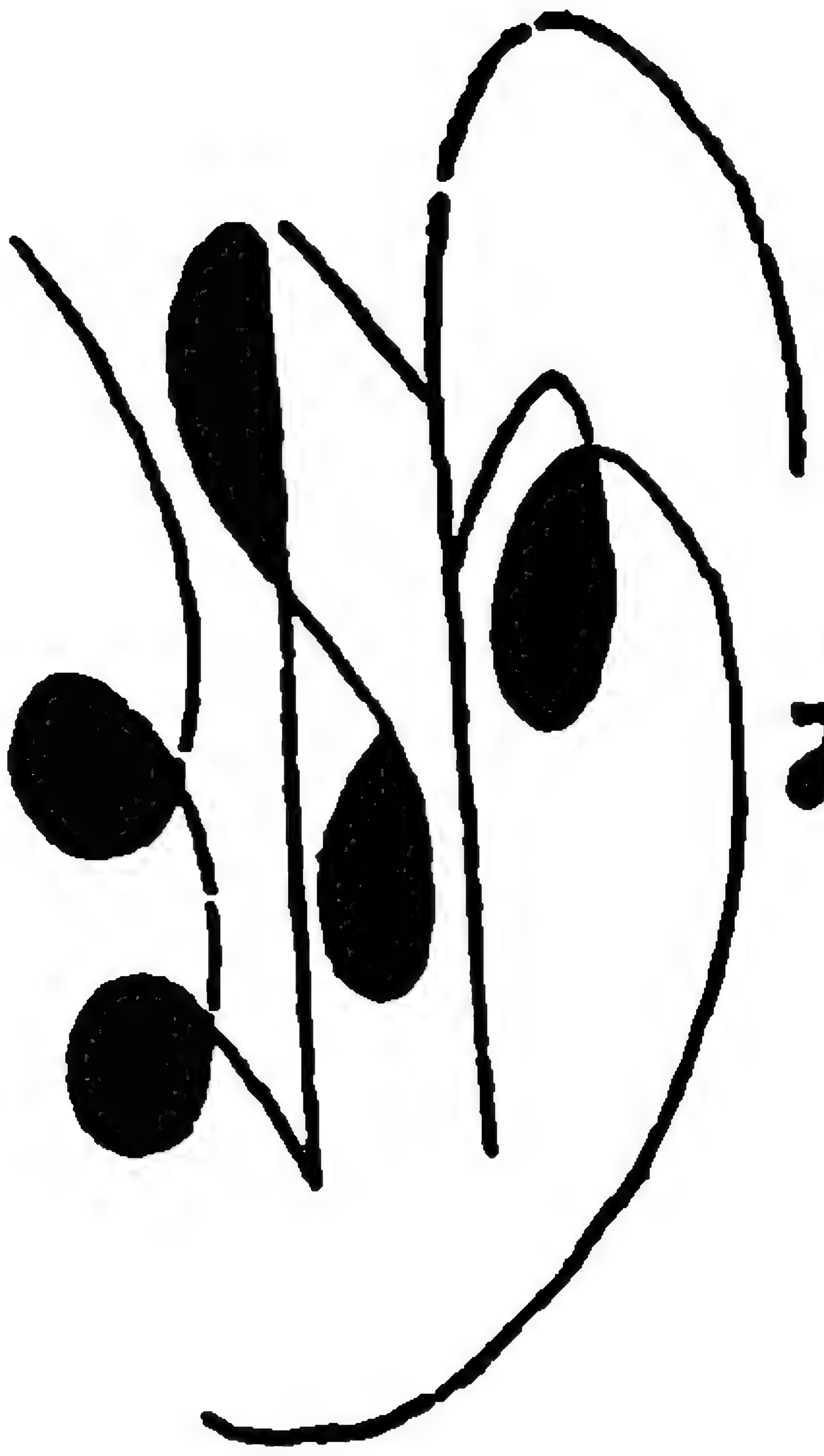

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

শিয়রের জানালাটার ওপর বসে একটা কাক কতক্ষণ ধরেই কা কা করছিল। তারই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শীনুর। একবার চেয়ে দেখলো ও, চারদিক আলোয় ভরে গেছে। কিন্তু লেপের তলা থেকে মুখটা বার করতেই একটা কনকনে হাওয়া এসে ওর মুখে লাগলো। নাঃ, বড্ড শীত। আবার গুটিশুটি মেরে লেপের ভেতর ঢুকে গেল ও।

লেপের ভেতর ঢুকে যাবার পর ওর দুচোখ আবার ঘুমে ঢুলে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ঠিক নেই—হঠাৎ কে যেন ওকে ধরে জোরে নাড়া দিল—"শীনু, এই শীনু, ওঠ—",

"আঃ, বিরক্ত করছ কেন?" জোর করে চোখ মেলে দেখে বড়দি কাছে দাঁড়িয়ে। অমনি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্ল ও "উঃ বড্ড শীত, উঠবোনা যাও—আরো একটু বেলা হোক—"

"বাঃ, উঠবিনা মানে? তোর মাষ্টার মশাই এসেছেন যে—"

"মাষ্টার মশাই?" অবাক বিস্ময়ে চোখ মেলল শীনু। আর তক্ষুণি ওর মনে পড়ে গেল যে আজ থেকে ওর পড়ার মাষ্টার মশাই সকাল বেলায় আসবেন,—সন্ধ্যেবেলা নতুন মাষ্টার মশাই আসছেন গান শেখাতে।

"মাষ্টার মশাই—এসে গেছেন?" তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো শীনু। আর এক ছুটে গেল কলতলায়।

"ওঃ, মেয়ের রকম দেখনা— মাষ্টার মশাই এর নাম শুনলে যেন পাখা গজায়—" গজর গজর করতে লাগলো বড়দি।

চোখে মুখে জল দিতে দিতে শীনু ভাবতে লাগলো মাষ্টার-মশায় পড়ার ঘরে কোন চেয়ারটায় বসেছেন। রোজ সন্ধ্যায় উনি যে চেয়ারটায় বসেন সেটায় এখন বসলে, ওর চোখে রোদ লাগবে। আজ তাহলে শীনুই বসবে ওখানে।

মুখ ধোয়া শেষ করে চটপট চুলে চিরুণী চালাচ্ছিল শীনু। মা এসে বল্লেন,—"শীনু, জলখাবার খেয়ে যাও—"

"এখন থাক না মা, দেরী হয়ে যাবে—"

"কিছু দেরী হবে না,—খেয়ে যাও একেবারে—"

মা চলে যাচ্ছিলেন,—শীনু পেছন থেকে ডেকে বল্ল—"মা, মাষ্টার মশাইকে চা—"

"পাঠিয়ে দিয়েছি—"

খাওয়া শেষ করে শীনু যখন পড়ার ঘরে এলো তখন মাষ্টার মশাইর চা খাওয়া হয়ে গেছে। শীনুরই একটা খাতা টেবিলের ওপর খোলা। কিন্তু মাষ্টার মশাই চেয়ে আছেন বাইরের দিকে। শীনু একবার আড় চোখে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে নিল। কী গম্ভীর আর করুণ ওঁর মুখখানা! আশ্চর্য,

মাষ্টার মশাই কী যে এতো দিনরাত ভাবেন! খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি ওর— ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে উত্তর পায়নি। কী নিয়ে এত ভাবেন উনি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে কতদিন। কিন্তু ওর সব কল্পনাই যেন ওই গম্ভীর করুণ মুখখানাতে বারে বারে বাধা পেয়ে ফিরে এসেছে। আবার ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখে শীলু। মাষ্টার-মশাইর চোখ দুটো লাল আর ফোলা ফোলো। নিশ্চয় অনেক রাত অবধি বই পড়েছেন। সত্যি, কত যে বই পড়েছেন মাষ্টার মশাই—শীলু সারা জন্মেও এত পড়ে উঠতে পারবে না। একবার বড়দার সংগে মাষ্টার মশাইর মেসে গিয়েছিল শীলু। পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়ার খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে। উঃ মাষ্টার মশাইর ঘরটা শুধু বই এ ঠাসা। দেয়ালের আলমারী, তাক, টেবিল, নায় বিছানার ওপর পর্য্যন্ত শুধু বই আর বই।

আশে পাশে কতজনকেই তো দেখে শীলু,—বাবা, বড়দা, জামাই বাবু,—ও বাড়ীর প্রভাস দা,—কিন্তু মাষ্টার মশাই এর মতো এত বই পড়েছেন কী কেউ? নিশ্চয়ই না। এমন কী ওর বন্ধু মিনতির মাষ্টার মশাইও এত বই পড়েন না। সত্যি, মিনতির মাষ্টার মশাইকে দেখলে যা হাসি পায় শীলুর। রোগা, টিঙ্‌টিঙে, নাকটা যেন একটা খড়্গ- ভ্রু দুটো কুঁচকেই আছে। নস্যি টানেন অনবরত,—আর নোংরা রুমাল বার করে নাক ঝাড়েন। তাও যদি পড়াতে পারতেন একরত্তি, কবে কোন কালে নোটবই লিখেছিলেন সেটাই আজো ঝাড়া মুখস্থ চলিয়ে দেন। পড়ার বইএর বাইরে একটা কথাও উনি বলেন না। আর শীলুর মাষ্টার মশাই! এই তো সেদিন ইতিহাস পড়াতে গিয়ে মহেন-জোদারোর কথা এত বল্লেন যে শীলু অবাক হয়ে গেল। মাষ্টার মশাই যেন ওখানকার খুঁটিনাটি সব দেখে এসেছেন। অথচ শীলু জানে ওদের পাঠ্য বইএ এসব কোন কিছুই লেখা নেই। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—"আপনি এত কথা কী করে জানলেন মাষ্টার মশাই?' আর তারপরই মাষ্টার মশাই ওকে এনে দিয়েছিলেন মহেনজোদারোর বিষয়ে লেখা সেই বইটা। কত জিনিষের ছবি তাতে। সব নাকি নানা জায়গার যাদুঘরে রাখা আছে। "বড় হও, আরো কত কী পড়বে—" বল্লেন মাষ্টার মশাই। "আর যদি পারো এখানের যাদুঘরের মহেনজোদারোর কালেকশনটা দেখে এসো, বুঝলে?"

কবে বড় হবে শীলু? ওর ইচ্ছে হয় এক্ষুণি বড় হয়ে যায়—বড়দি মেজদির মতো। অথচ ঠিক ওদের মতো নয়। বড়দিটাতো রান্না বান্না আর খোকনকে নিয়েই ব্যাস্ত। আর মেজদিটা দিনরাত সাজ পোষাক নিয়েই আছে। শীলু কিন্তু বড় হয়ে পড়বে—মাষ্টার মশাই যত বই পড়েছেন সব। মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাই কথা বলতে বলতে থেমে যান। হয়তো ওঁর মনে হয় শীলু এসব কিছুই বুঝতে পারবে না। সেই সব মুহূর্তগুলিতে শীলুর ভীষণ ইচ্ছে করে বড় হয়ে যেতে—যাতে মাষ্টার মশাই সব কথা ওকে মন খুলে বলতে পারেন, মাষ্টার মশাইর প্রতিটি চিন্তা ও মনদিয়ে স্পর্শ করতে পারে। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়ার সময় ওর মনে হয় একটা দিন তো শেষ হোলো। কিন্তু ওর বড়ো হতে আরো কতদিন লাগবে কে জানে—কে জানে কতগুলো ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়তে হবে!

টুক করে পেন্সিলটা পড়ে যায় মাষ্টার মশাইর হাত থেকে। আর শীলুর চমক ভাঙে। মাষ্টার মশাই ওর জ্যামিতিক্ষেত্রার খাতাটা দেখছেন। লাল পেন্সিল দিয়ে প্রতিটি অংকের পাশে ছোট্ট করে টিক্ দিচ্ছেন। খুশীতে শীলুর মনটা ভরে যায়। সবগুলো অংকই ঠিক হয়েছে—কারণ এপর্য্যন্ত একটাতেও ঢ্যারা পড়েনি।

অংকের খাতা সরিয়ে রেখে উনি বল্লেন"—রচনা দিয়েছিলাম, লিখেছ?"

"হ্যা এই যে—" খাতাটা এগিয়ে দেয় শীলু। মাষ্টার

মশাই নিজেই বিষয় বেছে দিয়েছেন। 'আমি বড়ো হয়ে কী হতে চাই—'

মনোযোগ দিয়ে খাতাটা দেখতে থাকেন মাষ্টার মশাই। শীলুর হঠাৎ ভীষণ লজ্জা করতে থাকে। কত কিছুই যে ও লিখেছে! ওর মনের কোণে যত আশা-আকাঙ্খা আছে সব তুলে ধরেছে ও। হয়তে সে সব কথা কাউকেই বলতে পারবে না শীলু। মা, বাবা, বড়দি, মেজদি, বড়দা—কাউকে না। শীলু জানে, ওরা কেউ বুঝতে পারবেনা এসব কথা। কিন্তু মাষ্টার মশাই? ও জানে, মাষ্টারমশাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন ওর সব কথা।

পড়া শেষ করে মাষ্টার মশাই মুখ তুলে তাকালেন। এক পালক চেয়ে দেখলো শীলু। মাষ্টার মশাইর মুখখানা যেন কেমন অবাক অবাক দেখাচ্ছে। একটুখানি চুপ করে থেকে উনি বল্লেন—"তুমি এত কথা কবে থেকে ভাবতে শিখলে শীলু?"

শীলুর মনে হয় হঠাৎ যেন ও মাষ্টার মশাইর অনেকটা কাছে চলে এসেছে। তাই দেখেই মাষ্টার মশাই অবাক হয়ে গেছেন। কিন্তু মাষ্টার মশাই নিজেই তো ওকে কাছে টেনে নিয়েছেন, একটু একটু করে নিজেই তো ওকে ভাবতে শিখিয়েছেন—ওর মনের পাপড়িগুলো এক এক করে খুলে দিয়েছেন!

ওর মনে পড়ে একদিন ফুলওয়ালার কাছ থেকে ও একটা বড়ো শ্বেতপদ্ম কিনেছিল। সেই পদ্মটা রেখেছিল পড়ার টেবিলের ফুলদানীতে। ফুলটা তখনো ভালো করে ফোটেনি। মাষ্টারমশাই দেখে খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—শীলু, আজকের তুমি হচ্ছ ঠিক এই পদ্মটির মতো। কিন্তু তুমি যখন বড়ো হবে—আরো অনেক জানবে বুঝবে—সেদিন তোমার মনের সবগুলো দরজা এক এক করে খুলে যাবে। ঠিক এই পদ্মের পাপড়ির মতো।

আজ কী খুলেছে পাপড়িগুলো? চোখ তুলে চেয়ে দেখে শীলু মাষ্টার মশাই স্নিগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে আছেন।

"তুমি অনেক ভাবতে শিখেছ শীলু,—অনেক—" বলেন মাষ্টার মশাই।

আনন্দে শীলুর চোখের পাতাটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। কী একটা বলতে গিয়েও বলতে পারে না—গলার কী একটা দলা পাকিয়ে যায়।

"আমি জানতাম তুমি সবার মতো নও শীলু,—তুমি বড়ো হবে,—অনেক বড়ো হবে—"

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে শীলু কোনক্রমে বলে—"আমি আপনার মতো হবো মাষ্টার মশাই—"

মুহূর্তে কী যেন একটা ঘটে যায়। মাষ্টার মশাইএর মুখটা হঠাৎ চাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। মাথা নীচু করে থাকেন উনি। শীলুর মনে হয় না জেনে কী একটা অপরাধ করে ফেলেছে ও। তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করে ও। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—"রাগ করলেন মাষ্টার মশাই?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন উনি—"না, রাগ করিনি। কিন্তু তুমি আমার মতো হবে কেন শীলু—তুমি অনেক বড়ো হবে—সত্যিকারের বড়ো—"। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন—"আচ্ছা দেখি বাকী পড়া—"

পড়া শেষ হলে মাষ্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন। আর শীলু হঠাৎ, ওঁকে একটা প্রণাম করে বসলো। মাষ্টার মশাই অবাক হলেন—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। হঠাৎ এভাবে প্রণাম করে ফেলে ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল শীলু। কোনও ক্রমে মুখটা নীচু করে বললো—"আজকের দিনটা আমার মনে থাকবে মাষ্টারমশাই—"

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেলেন মাষ্টারমশাই। কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। বল্লেন—"আমারও মনে থাকবে শীলু—"

একমুহূর্ত দ্বিধা করে পকেট থেকে নিজের পার্কার পেনটা

বার করলেন উনি। তারপর ওটা শীলুর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—"পুরোনো জিনিষ—তবু তুমি এটা রাখো শীলু। যখন অনেক বড়ো হবে হয়তো এটা দেখলে মাষ্টার মশাইর কথা মনে পড়বে।"

উনি চলে গেলে পর শীলু যখন শোবার ঘরে এলো তখনো কলমটা তার হাতের মুঠোয় ধরা। শরীরটা ওর কাঁপছিল—কী যেন একটা ঘটে গেছে—অথচ ঠিক বুঝতে পারছিল না ও। মা বাবা বড়দি সবাই আছেন, অথচ মনে হচ্ছিল ওরা যেন শুধু ছায়া। হঠাৎ যেন শীলু অন্য এক জগতে চলে গিয়েছে সেখানে শুধু সে আর মাষ্টার মশাই। এমন যে হবে সে কী কোনদিন ভাবতে পেরেছিল? সত্যি আজকের সকালটা কী সুন্দর!

স্কুলে বন্ধুদের হৈ-চৈ দিদিমণিদের বকুনি কিছুই যেন শীলুকে স্পর্শ করতে পারলো না। ওর মনে হোল ও যেন একটা নাটক দেখছে—এক্ষুণি যার ড্রপসিন পড়ে যাবে। ওকে অন্যমনস্ক দেখে বন্ধুরা পেছনে লাগলো—উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেল শীলু। ওর বন্ধুরা বুঝবে না.—কেউ বুঝবে না! আর কীই বা বলবে ও। কীযে হয়েছে তা তো নিজেই বুঝতে পারছে না। এক একবার মনে হয়েছে হয়তো সবটাই একটা স্বপ্ন, হয়তো এক্ষুনি ঘুম ভেঙে যাবে ওর। কিন্তু না,—জামার কলারে গোঁজা পার্কার পেনটা তো এখনো বুকের কাছে রয়েছে।

স্কুল থেকে ফেরার পর আর পার্কে গেল না শীলু। মিনতি এসেছিল, রাগ করে চলে গেল বেচারা। কিন্তু শীলুর যেতে ইচ্ছে করছিল না একটুও। ছাতে উঠে ও তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। কী নীল আকাশটা। দু একটা চিল উড়ছে। নীচে তাকালেই চোখে পড়বে বাড়ীগুলো বড্ড গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ভালো লাগে না দেখতে। রেলিং এর ওপর হেলান দিয়ে অলস ভাবে চেয়ে থাকে শীলু। মনে হয় আজ যদি গানের মাষ্টার মশাই না আসেন তো বেশ হয়। কেন জানি আজ কাউকে ওর ভালো লাগছে না।

কতক্ষণ এভাবে তাকিয়েছিল শীলু মনে নেই। হঠাৎ পেছনে ডাক শুনে তাকিয়ে দেখে ঝি সারদা। হাতমুখ নেড়ে সারদা বলে—"শীলুদিদিমনি, শীগগীর নীচে এসো ডাকছে তোমাকে সবাই—"

বিরক্ত হয় শীলু—"না আমি এখন যেতে পারবোনা। বলে দিগে যা।"

"আরে ডাকছে সবাই ভীষণ, এসোই না। কী নাকি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়েছে"

অগত্যা নেমে আসতে হয় শীলুকে। নীচে এসে ও অবাক হয়ে যায়। কী এমন কাণ্ড হোল যাতে মা বাবা বড়দি বড়দা, ও বাড়ীর প্রভাস দা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে অত জোর গলায় কথা বলছেন? ওকে দেখেই বাবা বাদে অন্য সবাই—'শীলু - শীলু—'বলে কলকলিয়ে ওঠে। ভীষণ বিশ্রী লাগে ওর।

সবাই কেন একসংঙ্গে এত জোরে কথা বলছে? দুহাতে কাণ চাপা দিয়ে ও বলে ওঠে—'আচ্ছা মা, সবাই মিলে চেঁচালে শুনবো কী করে বলোতো?"

"যে কথা বলছি—শুনলে তুইও চেঁচাবি, জানিস?" বড়দি বলে।

"আমার তো যা রাগ হচ্ছে, ইচ্ছে করছে ব্যাটাকে ডেকে দিই যা কতক—"এবার বড়দা।

"হয়েছেটা কী তা বলবে তো?" নিজের অজান্তে শীলুও চেঁচিয়ে ওঠে।

"তোমরা চুপ করো তো,—আমি বলছি।" বলেন বাবা। "এদিকে এসো তো শীলু—"

নেমে আসে ও। বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে "কী হয়েছে বাবা?"

'শীলু তোমার মাষ্টার মশাই-এর সম্বন্ধে একটা খবর এই মাত্র প্রভাস এনেছে—"

চমকে ওঠে শীলু। বুকটা কাঁপতে থাকে। একরাশ ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কী হয়েছে—কী হয়েছে মাষ্টার মশাই এর ?"

বাবা কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বড়দি বলে ওঠে—"কী আবার হবে—তোর মাষ্টার মশাই একটা জোচ্চোর—বদমায়েশ—"

বড়দির কথাগুলো যেন হঠাৎ একটা চাবুকের মতো এসে ওকে আঘাত করে। কী আকস্মিক এই আক্রমণ। এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায় শীলু। তার পর চেঁচিয়ে ওঠে—"কী বলছ তুমি বড়দি—কেন মিছে কথা বলছ ?'

"মিছে কথা ?" বড়দি এবার ফুঁসে ওঠে। "বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর প্রভাসকে—জিজ্ঞেস কর বাবা কে—"

অসহায়ভাবে শীলু বাবার দিকে তাকায়—"কী হয়েছে বাবা. বলোনা,—বড়দি কেন অমন করছে ?"

"বলছি আমি—" বাবা সুরু করেন। "এই মাত্র প্রভাস দেখে এলো' তোমার মাষ্টার মশাই অ্যারেষ্টেড হয়েছেন—"

"অ্যারেষ্ট ? কেন ?" শীলুর ভয়টা যেন হঠাৎ কেটে যায়। মাষ্টার মশাইকে পুলিশে ধরেছে—নিশ্চয়ই উনি কোন নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলেন। এক মুহূর্তে শীলু মাষ্টার মশাইকে বসিয়ে দেয় বাঘাযতীন ক্ষুদিরামদের দলে। তারপর বড়দির দিকে চেয়ে বলে—"নিশ্চয়ই মাষ্টার মশাই পলিটিক্স করতেন ? আমি তখনই ভেবেছি—"

"পলিটিক্স না হাতী—জুয়াচুরীর জন্য অ্যারেষ্টেড হয়েছেন তোর মাষ্টার মশাই—"

বড়দির কথাগুলো যেন এক ফুঁয়ে শীলুর মনের সবগুলো বাতি নিভিয়ে দেয়। "না, না বাজে কথা—" কিন্তু ওর প্রতিবাদ যেন আর জোরালো শোনায় না। বাবার দিকে তাকায় ও।

বাবা একটু একটু করে ব্যাপারটা ওকে খুলে বলেন। মাষ্টার মশাই নাকি বি. এ. পাশ নন। শুধু বি. এ. কেন—ম্যাট্রিকটাও নাকি উনি পাশ করেননি। ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে স্কুলে চাকরী করে এসেছেন। এতদিনে ধরা পড়েছে সব।

শীলুর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যায় হঠাৎ। দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই জুয়াচোর ? মাষ্টার মশাই বি. এ. পাশ ন'ন ? এতদিন তাহলে উনি ঠকিয়েছেন সবাইকে,—ঠকিয়েছেন শীলুকে ? শীলুর মনে হয় ওর চারপাশের জগতটা একটা মরুভূমি—কাঁটা গাছে ভরা। হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ও হু হু করে কেঁদে ওঠে।

"কাঁদছিস কেন শীলু—" বাবা ওর পিঠে হাত বোলান—"তোকে আমি এর চেয়ে ঢের ভালো মাষ্টার এনে দেবো—এম. এ. পাশ—"

বড়দা বলে—"সার্টিফিকেটগুলো এবার ভালো করে দেখে নিও বাবা—খোঁজ খবর করে নিও—।" তারপর শীলুর মাথায় মৃদু একটা টোকা মেরে বলে—কাঁদছিস্ কেন বোকা মেয়ে—অনেক ভালো মাষ্টার পাবি তুই ফার্ট ক্লাস মাষ্টার এনে দেবো, কেমন পড়ায় দেখবি ! এই ছাখ, তবু কাঁদে, —কাঁদিস কেন—তোর তো কোন ক্ষতি করতে পারেনি লোকটা !"

চোখ মুছে ফেলে শীলু। তারপর বড়দার হাত হতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। কারুর দিকে তাকায় না ও। তাকাতে পারে না। সবার চোখের আড়ালে যেতে চায় ও—অন্ধকারে।

পড়ার ঘরের টেবিলে এসে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে শীলু। অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঘরটা। কিন্তু আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হয় না। বাবা মা বড়দা—কেউ কী বুঝতে পারবে কতখানি ক্ষতি হয়েছে শীলুর ? নিঃশব্দে ওর চোখের জল বয়ে যায়—বুকের মধ্যে পার্কার পেনটা যেন কাঁটার মতো বিঁধিয়ে ওঠে। কলমটা নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে চায় ও। কিন্তু পারে না। দু হাতে কলমটা শক্ত করে ধরে এবার জোরে কেঁদে ওঠে শীলু।

"আমি গাইতে ভালবাসি—আর ভালবাসি গান শুনতে। সঙ্গীত আমার অন্তরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে, গান বা বাজনা শুনলেই আমার মন নেচে ওঠে—তা সে গান বা সুর যত অচেনাই হোক। সেই জন্যেই ফিলিপ্‌স রেডিওর আশ্চর্য আওয়াজ আমাকে এত মুগ্ধ করে।"

গীতা দত্ত
প্রসিদ্ধ প্লেব্যাক গায়িকা ;
এক অপূর্ব মরমী ভাব এঁর
সব গানই সুললিত আর
সুমধুর করে তোলে।

ফিলিপ্‌স-এর ওপর আস্থা বিশ্বজুড়ে। আর ভারতবর্ষে একমাত্র ফিলিপ্‌সই আপনাকে দিতে পারে : ■ অতুলনীয় 'নভোসোনিক' বৈশিষ্ট্য ■ আধুনিক 'লো-লাইন' ডিজাইন ■ দেশের সর্বত্র নিজস্ব ডীলার - ফিলিপ্‌স কারখানায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় যাঁদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কাজ পাওয়া যায়।

ফিলিপ্‌স
নভোসোনিক
রেডিও
PHILIPS
সেরা জিনিস ★ অজস্র রকমের

JWTPHE 1669

বামপন্থা ও প্রাণীজগৎ

প্র বু দ্ধ চ ট্টো পা ধ্যা য়

মনুষ্যেতর জীবদের প্রতি আমাদের যা মনোভাব, তা হল আগেকার দিনে সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে অভিজাত সম্প্রদায়ের যা মনোভাব ছিল, সেই রকম। সাধারণ মানুষকে হেয়জ্ঞান করা ছিল আগেকার দিনের নিয়ম। রাজাউজীর ছিলেন সাধারণ মানুষের জীবন-মরণের কর্তা—সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন অধিকার বা সুবিধা তার ছিল না। আর প্রভুভক্তি কিংবা উচ্চপদস্থ লোকের জন্ত তার আত্মত্যাগ-এসব নেহাত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হত—একেবারে যেন ধরাকথা—তাই এসবের জন্ত তার কিছু ভাগ্যোন্নতি ঘটত না,—বিশেষ কিছু বাহাদুরী তাকে দেওয়া হত না—ভাবটা এই, যে মনিবের জন্ত নিজের স্বাচ্ছন্দ্যত্যাগ করেছে—জীবনপণে মনিবের সেবা করেছে—এ আর নতুন কথা কী? এত তার কর্তব্য, মনিব তার দিকে অবসর সময়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়েছেন—এই ত হয়ে গেছে তার পুরস্কার, আবার কী চাই?

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মতো বাসিও......"—

জনসাধারণের কাছ থেকে এই রকম একতরফা আনুগত্য খানদানী লোকেদের কাছে ছিল ধরাবাঁধা।

ঈশ্বর আরাধনায় অহেতুক ভক্তি বা প্রেমের স্থান যতই উঁচুতে থাক্—মানুষ-প্রভুর উদ্দেশ্যে যখন হৃদয়ের এই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নিয়োজিত হয়, তখন সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং দেখা গিয়েছে ভক্তের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। দেখা গিয়েছে, যে আখেরে এতে ভক্তের উচ্চতর চরিত্রগঠনের বদলে তার মধ্যে গোলামী মনোবৃত্তিই কায়েম হয়ে গেছে—তার ঐহিক উন্নতির পথ প্রায় লোপ পেয়েছে। আর তার প্রভু বা মনিব? তারও খুব ভাল হয়নি শেষ পর্যন্ত, কারণ স্বাধীন মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে গেলে জাতি যখন পচনশীল স্থিতিশীলতার মাধ্যমে ধ্বংসের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যায় তখন সে এই রকম মনিবদের সঙ্গে নিয়েই যায়।

মানুষের প্রতি ভক্তি ও সেবার আতিশয্যের এই রকম পরিণতি স্ত্রীজাতির ইতিহাসেও দেখা গিয়েছে। স্ত্রীজাতিকে সেবাদাসী করে গড়ে তোলার বিবর্তনজনিত হেতু সেকালে বোধহয় ছিল—তাই আড়ম্বরের সঙ্গে সময়ে সময়ে তার মাতৃমহিমা ঘোষিত হলেও মূলতঃ স্ত্রীজাতি সেকালে কখনও যথার্থ সম্মানের অধিকারিণী ছিল না।

বলছিলুম কী, না,-বিবর্তনের ফলে আমরা এইটুকু মাত্র এগিয়েছি যে আগে জনসাধারণকে যে রকম হীনচক্ষে দেখা হত আজকাল কেবল পশুকুলকে সে ভাবে দেখা হয়। পশুপক্ষীদের বরাৎ এখনও ফেরেনি। কিন্তু সে বেচারীদের ভাগ্য কি কখনও বদলাবে না? দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষের মুক্তি অভিযানে যারা পথিকৃৎ, মানুষকে যারা সবরকম অত্যাচার অবিচার থেকে অব্যাহতি দিতে চায়—সেই বামপন্থীরা এখনও বুঝছে না, যে জীবব্যথাকে অবহেলা করে—অন্যসব কিছু কথা ছেড়ে দিলেও,—ভবিষ্যৎ ইতিহাসের চোখে, ন্যায়ধর্মের বিচারে তারা কতদূর যুক্তিবিবর্জিত প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ জন-

সাধারণের মুক্তির দাবী এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহৃদয়তা— এই দুইই যে একই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব সমাজতন্ত্রী বন্ধুদের যখন জন্তুজানোয়ারদের প্রতি নির্দয়তা নিবারণের প্রয়াসকে তাচ্ছিল্য ও পরিহাস করতে শুনি তখন মন খারাপ হয়ে যায়। পশুনিগ্রহ অব্যাহত রাখলে নিপীড়িত মানুষের যে কী সাহায্য হয়, তা জানিনে।

এ বিষয়ে ধনী পুরাতনপন্থী মহাজনদের তাচ্ছিল্য বরং সহ্য হয়, কারণ এঁদের জীবনদর্শনের সঙ্গে এই তাচ্ছিল্যের মিল আছে, সামঞ্জস্য আছে। এঁদের বৈরিতা দেখে আশা হয়, যে জীবনাদর্শের অন্য অন্য ক্ষেত্রে তাঁরা যেমন হটে গেছেন, এক্ষেত্রেও তাই হবে,—অত্যাচারের দিন ফুরোবে।

কিন্তু যাঁরা উন্নয়নের সৈনিক, যাঁরা সংস্কারক,—তাঁরা যখন অসহযোগিতা করেন, তখন বিলক্ষণ দমে যেতে হয়।

পশুপক্ষীর উপর রোমহর্ষক অত্যাচার নিয়ত চলেছে এখনও; অথচ ক'জন বামপন্থী তাদের পরিত্রাণের বিষয়ে চিন্তা করেন?

জন্তুজানোয়ারদের প্রতি এ ঔদাস্য কেন? তাদের প্রতি বামপন্থীদের কি কোন কর্তব্য নেই!

হয়ত একটা ভুল ধারণা বামপন্থীসমাজে চালু আছে, যে, যারা যত পশুক্লেশ নিবারণে উৎসুক, তারা তত মনুষ্যক্লেশে নির্বিকার; এবং পশুদের কথাতে খুব সম্ভব অনেকের মনে ধনীসংসারে সযত্নে লালিত কুকুরদের কথা ভেসে ওঠে।

অন্যায় প্রতিযোগিতায় পুষ্ট ধনীনন্দনদের ঐশ্বর্যের দম্ভে বিড়ম্বিত মেহনতী জনসাধারণের মানসিকতায় রাগ সঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কুকুর তথা পশুজাতির যৎসামান্য ভাগ্যোদয়—এই কি রাগ প্রকাশের যোগ্য উপলক্ষ্য? বিত্তশালী প্রভুর উপর রাগ করে তার পালিত পশুকুলের প্রতি দ্বেষ বা ঈর্ষা—এত দরিদ্রতম মানুষের পক্ষেও সাজেনা; তবু এই দ্বেষ বা ঈর্ষার মনোবৃত্তি অবচেতনে আছে বলে জনসাধারণের মধ্যে বহুজন' কল্পনাই করতে পারে না যে পশুপক্ষী নিধনে কিংবা তাদের ক্লেশে— হোক না কেন তারা পালিত পশুপক্ষী,—মানুষের মনে দুঃখসঞ্চার হতে পারে কী ভাবে!

প্রকৃত কথা হল, পশুপক্ষী তথা নিম্নস্তরের জীবের সঙ্গে "সর্বহারা"দের অবস্থা তুলনা করার অভ্যাস থেকে জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বঞ্চিত জনতার যে একটা প্রতিযোগিতার ধারণা বামপন্থীদের মধ্যে—তাঁদের নিজের অজান্তেই,—গড়ে উঠেছে, সেটি উদ্ভট, হাস্যকর এবং অচিরাৎ পরিহার্য। প্রতিযোগিতা হয়— প্রায় সমানে সমানে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি পাঁচবছর বয়সের মানবশিশুর যা বিচার বিবেচনার শক্তি আছে—পশুপক্ষীদের মধ্যে তাও বিরল। মানুষের নীচে যে কোন স্তরের জীবের কথাই ধরা যাক না কেন, মানুষের ক্ষমতার থেকে তার ক্ষমতার এত আকাশ পাতাল প্রভেদ যে একজন যুক্তিশীল মানুষের পক্ষে কোন জন্তুজানোয়ারকে তার প্রতিযোগী বলে ধারণা করাই অসম্ভব। অতএব পশুবিশেষের কষ্ট লাঘবে কিংবা তার ক্ষণিক সৌভাগ্যে মানুষের মধ্যে যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—তারও ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া যুক্তিসহ নয়— কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সম্বন্ধ নেই, প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ নেই—আছে কেবল বিবর্তনে এক অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ সত্তার বহুনিম্নসত্তাদের প্রতি যে অনুকম্পা বা সহানুভূতি থাকতে পারে, সেই অনুকম্পা বা সহানুভূতির সম্বন্ধ।

অনেকে যাঁরা কুকুরের তথাকথিত সৌভাগ্যে বিরক্ত, তাঁরা কেবল ধনী ও বিলাসী লোকদের পোষা কুকুরদেরই দেখেছেন, রাস্তায় যে কত নির্দোষ কুকুরদের—তারা 'বেওয়ারিশ' কেবল এই অজুহাতে,—লম্বা লম্বা সাঁড়াশীর সাহায্যে গলাটিপে হিঁচড়ে কয়েদগাড়িতে তুলে বধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেসব তাঁদের নজরে পড়ে না!

তাছাড়া তাঁরা কি জানেন, কুকুরজাতটা মানুষের জন্য কী না করে? বহু অন্ধ আছে, জীবনে তাদের কুকুরই সম্বল।

সেই কুকুরই তার প্রভুকে আস্তে আস্তে তার শিকলির টান দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়—এমন কি অন্ধ মানুষের বিনা সাহায্যে তার মনিবকে ভীড়ের রাস্তা এপার ওপার করায়।

কত দৃষ্টান্ত যে আছে যে কুকুর মানুষের, তার প্রভুর, প্রাণ বাঁচিয়েছে তার আর লেখাজোখা নেই।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সত্য ঘটনা। কুকুর যে কত বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করতে পারে, তার প্রভুভক্তি যে কতটা সহজাত সেসব এর থেকে বোঝা যাবে।

১ এক চাষার ছিল দুই কুকুর। তাদের নিয়ে ক্ষেতে সে কাজ করতে যেত ভোরে আর সন্ধ্যাবেলায় ফিরত। একদিন হল কি, ক্ষেতের কাজে এমন মেহনং করতে হল যে দিনের শেষে লোকটি অসুস্থ বোধ করতে লাগল। তবু কী করে, আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল কিন্তু খুব বেশীদূর যেতে পারল না। খানিকটা দূর গিয়েই মাথাঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, আর পড়বি ত পড়্—যখন সে একটা রেল লাইন পার হচ্ছিল সেই সময় মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে সেই রেল লাইনের উপরেই আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। কুকুর দুটো তখন সঙ্গে ছিল। তাদের প্রভুর এমন সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থা দেখে একটা কুকুর ছুটল রেল লাইন ধরে স্টেশনের দিকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে, আর একটা কুকুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে রয়ে গেল প্রভুর পাশে, তাকে পাহারা দিতে লাগল। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে রেলের ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা যাচ্ছে, ট্রেন আসছে! যে কুকুরটা লাইন ধরে ছুটছিল সে চীৎকার করতে করতে যে দিক দিয়ে রেল আসছিল সেই দিক লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। তার প্রভুকে বাঁচাতেই হবে—তার জন্য ইঞ্জিনের চাকার তলায় যদি তার প্রাণ যায় ত যাক্। বেশ খানিকটা এগিয়ে দেখে সে একেবারে একটা মালবাহী ট্রেনের সামনে এসে পড়ল। এই গাড়িটার বাঁশিই দূর থেকে শোনা গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটা আস্তে আস্তে আসছিল যার জন্য ইঞ্জিন চালক কুকুরটির গলার আওয়াজ শুনতে পায় এবং সন্ধানী আলোতে কুকুরটিকে দেখে তাকে চাপা দেবার ঠিক আগেই ইঞ্জিনটা থামিয়ে ফেলে।

এদিকে ইঞ্জিন থামতেই কুকুরটি তড়াক করে লাফিয়ে ইঞ্জিনের ভিতর উঠল এবং কুঁই কুঁই শব্দ করে, চালকের কাপড় ধরে টেনে নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যে গাড়ি থামিয়ে রাখলে হবে না, ঐদিকে অন্ধকারের মধ্যে তার মনিব রেল লাইনের উপর মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চালক তখন আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে দেখে যে একটা মানুষ লাইনের উপর মড়ার মত পড়ে আছে আর তাকে একটা কুকুর পাহারা দিচ্ছে। এটি সেই কুকুর, যে তার প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন সেই মুমূর্ষু চাষাকে দুই কুকুর সমেত গাড়িতে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার একটা হাসপাতালে লোকটিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। চিকিৎসার ফলে লোকটি ক্রমে সম্পূর্ণ রকমে সেরে উঠেছিল।

একটি কুকুরের কথা অনেকেই শুনেছেন—সে ছিল এক গরীব দিন মজুরের কুকুর। বিলেতের ঘটনা। গরীবের কুকুর সে—কীই বা এমন আদরযত্ন পেত?—তার মনিব নিজের জীবন যুদ্ধেতেই অস্থির। লোকটি কাজ করত এক কয়লার খনিতে—কাজ করতে করতে একদিন সে মারাত্মকভাবে জখম হল। খনি থেকে মুমূর্ষুকে তুলে এনে হাসপাতালের গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছাড়তে যাবে এমন সময় কুকুরটি এসে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল মনিবকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে তার পাশে,—কিছুতেই নামবে না। যাই হোক, গাড়ি ত ছেড়ে দিল ওকে নামাবার বৃথা চেষ্টা কিছুক্ষণ করার পর, তারপরে হাসপাতালে পৌছে সে এক বিপদ। কুকুরটা তার মনিবের সঙ্গে যাবেই যাবে হাসপাতালের ভিতরে। তখন লোকটি ক্ষীণ স্বরে বলল 'জাক্, তুই থাক, কোথাও

যাসনি, আমি আসছি।' জ্যাক্ তক্ষুণি দাঁড়িয়ে গেল আর লোকটিকে তখন হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। সেই যে লোকটি গেল, আর ও পথ দিয়ে ফিরল না। পরের দিন তার মৃতদেহ হাসপাতালের অন্য দরজা দিয়ে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য চলে গেল।

কুকুরটি কিন্তু সেই থেকে হাসপাতালে ঢোকবার জায়গায় ঠায় বসে আছে, কখন তার মনিবকে নিয়ে সকলে ফিরে আসে। অন্য অনেকে তাকে খাবার-দাবারের লোভ দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করল - তা সে খাবারের দিকে সে ফিরেও তাকাল না। কত লোক তাকে নিজের পোষা কুকুর করে নিতে চাইল কিন্তু তাদের সঙ্গেও গেল না। প্রথম প্রথম হাসপাতালের লোকেরা ওকে কিছু কিছু খেতে দিত। কিন্তু কয়েকদিন খাবার পরেও যখন ও দেখল যে তার মনিব আর আসে না, তখন ক্রমে হতাশ হয়ে শেষে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। খাওয়া ছেড়ে দিলে। এই রকম করে না খেয়ে হাসপাতালের দোরে কুকুরটি প্রায় দুহপ্তা বেঁচে ছিল তারপরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার মনিব যে বলে গিয়েছিল যে 'তুই থাক এখানে, কোথাও যাস্‌নি' তা সে কথা তার জীবনের শেষ অবধি রেখেছিল। পুরাণে অগস্ত্য যেমন বিন্ধ্যপর্বতকে বলে গিয়েছিলেন যে 'আমি দক্ষিণে চললুম—যতক্ষণ না আসি তুমি তোমার মাথাটা কিছু নীচু করে থেক' তারপরে আর ফেরেননি,—শিশু নাবিক ক্যাসবিয়াঙ্কা যেমন বাপের কথা—"তুমি এখানে দাঁড়াও, যতক্ষণ না আমি আসি"—রেখেছিল তার জীবন দিয়ে,—জাহাজে ধু ধু করে আগুন জ্বলছে, তার বাপ জাহাজের অন্যত্র মরে পড়ে রয়েছে, জাহাজ বাঁচাবার কোন আশা নেই, তবুও সে নিজের জায়গা ছেড়ে পালায়নি, এ-কাহিনী এসবেরই অনুরূপ। অবিচল নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার কাহিনী।

শুধু কি উপরি বর্ণিত জ্যাক? ফরাসী লেখিকা Ouida-র রচনায় অমর হয়ে আছে যে Dog of the Flanders, ইংরেজ সাহিত্যিক Alfred Olivet লিখিত "Bob son of battle" এর Redwall, স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক প্রবন্ধকার জন ব্রাউন বর্ণিত র‍্যাব—এরা সকলেই যেমন প্রভুভক্ত তেমনি বিক্রমশীল। ভক্তি ও শৌর্য্যের অপূর্ব সমন্বয়ের হাজার হাজার দৃষ্টান্ত কুকুররা দেখিয়ে গেছে দেশে-বিদেশে প্রাচীন কাল হতে। মানুষের জন্য কুকুর মৃত্যুর দরজায় যেতে সদাসর্বদা প্রস্তুত। এত করেও, তার মনিবের, মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী ও অংশভাগী হয়েও, তবু হায়রে কুকুরের বরাৎ,—সে যে "কুকুর" সেই কুকুরই রইল, প্রভুর প্রতি তার কর্তব্যনিষ্ঠা এত সস্তা যে মানুষ, এদেশে অন্ততঃ, সে বিষয়ে বড় একটা কেউ ভেবে দেখারই দরকার মনে করে না। যেমন সেকালে সীতার পতিভক্তির মূল্যের স্বীকৃতি মিলেছিল রামের কথায় যখন লক্ষ্মণের সঙ্গে তুলনা করে রাম পরম তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন—

দেশে দেশে কলত্রানি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।

যদিও লক্ষ্মণ রামের সহোদর ছিলেন না।

স্ত্রীলোকদের পতিকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি এবং পতি-প্রয়োজনে সর্বস্বত্যাগের ঘটনাগুলি সমাজব্যবস্থার ফলে গতানুগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তার মূল্য তেমন কেউ দিত না। সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল তাচ্ছিল্যের মধ্যে,—তেমনি কুকুরের প্রভুভক্তিও গতানুগতিক, অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই তা মামুলী ব্যাপার বলে সকলে মনে করে।

"A dog's life" বলে ইংরিজীতে ত একটা কথাই আছে; তার ভাবার্থ হল—'অত্যন্ত হেয় জীবন, দুর্দশার জীবন'। উপকারী পশু-জীবন মানুষ এই ভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছে।

জন্তুজানোয়ার মানুষের চোখে এতটা নীচ, এতটা অকিঞ্চিৎকর যে পালিত পশুপক্ষীর মৃত্যুতে—তা তারা যতই উপকারী আর কৃতজ্ঞতাভাজন হোক না কেন—শোকোচ্ছ্বাস

অনেকের চোখে নেহাতই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় ; পুত্রশোক, আত্মীয়স্বজনের বিয়োগব্যথা, বন্ধুজনের দুর্ভাগ্যে সন্তাপ.—এসব বোঝা যায়, কিন্তু পোষা জানোয়ারের কষ্টে অশ্রুপাত—এটি নাকি নিছক মাথা খারাপের লক্ষণ বা নিতান্তই ন্যাকামী।

ঠিক কথা, একটা পোষা জানোয়ার মারা গেলে বহু পশু-পক্ষী পাওয়া যাবে পোষবার জন্য, যেমন ১০০।১০৫ বছর আগে দাসদাসীর বিষয়ে ভাবা হত—শুধু দাসদাসীই বা কেন, বিবাহিতা পত্নীর বিষয়েও এই ভাবা হত। একটা দাস লোকসান গেলে বাজারে আরও ঢের বান্দা পাওয়া যাবে,—স্ত্রী মারা গেলে দেশে আরও ঢের সেবাদাসী মিলবে।

আমাদের সভ্যতা এগিয়েছে, বিশেষ করে নীতির দিক দিয়ে অনেক এগিয়েছে এই জন্য যে সমাজে যারা দুর্বল, যারা ভাগ্যবিড়ম্বিত, যারা নিম্নস্তরের—তাদের মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে তাদের স্থান উন্নত হয়েছে, সমষ্টিগতরূপে তারা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সম্মানিত। জন্ম বা দৈবের কারণে তাদের নিম্নস্তরে ফেলে রাখাকে মহা অন্যায় বলে সকলে মেনে নিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, এ হয়েছে বামপন্থী মতাবলম্বী বিপ্লবী ও সংস্কারকদের যুগান্তব্যাপী সাধনা ও আত্মত্যাগের ফলে।

কিন্তু বামপন্থী চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি আসতে পারে না যদি বিধাতাসৃষ্ট মনুষ্যেতর জীবজগৎকে আমরা কষ্ট এবং অত্যাচারের মধ্যে ফেলে রাখি। বামপন্থীরা বোঝেন না কেন যে নিপীড়িত মানুষ আর নিপীড়িত অন্যান্য জীব—ন্যায়ের আদর্শে সকলেই একসূত্রে গ্রথিত। যেখানে আমরা আদালতের সচরাচর নজীর থেকেই জানতে পারি যে নিছক আমাদের জন্য কুকুর লেলিয়ে একটা পোষা বেড়াল মেরে ফেলার জন্য শাস্তি হল কেবল ৬০্ জরিমানা, একটা মোষকে ডাণ্ডা দিয়ে স্রেফ পিটিয়ে বধ করার খেসারত মাত্র ৫০্ জরিমানা, এবং মজা দেখবার জন্য একটা ষাঁড়ের পিঠে ছুটো পেরেক ঠুকে ঠুকে তার শিরদাঁড়া অবধি বসানর সাজা এক মাস জেলেই শেষ, সেখানে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে পালিত প্রাণিজগৎ অত্যাচারের কী বিভীষিকা এবং দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে! তাই পশুপক্ষীর অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টায় আগ্রহী না হলে ন্যায়তঃ কাউকে বামপন্থী তথা সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রবাদীপদবাচ্যভুক্ত করা উচিত নয়। আমাদের জেনে রাখা উচিত বিলাতের শ্রমিক পার্টি পশুকল্যাণ কার্যেও সমধিক উদ্যোগী।

ফোন : ৫৭-৩১২৪

ইষ্টবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস

প্রস্তুতকারক :

কোলাপসিবল্ গেট ষ্টীলের জানালা, গ্রীল, রেলিং, কাঁচের ফ্রেম, নাট ও বোল্ট, স্যাকলস চেইন, ষ্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল কাজের নানাবিধ উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

৪৩।২, আর, এন, গুহ রোড

দম দম

কলিকাতা-২৮

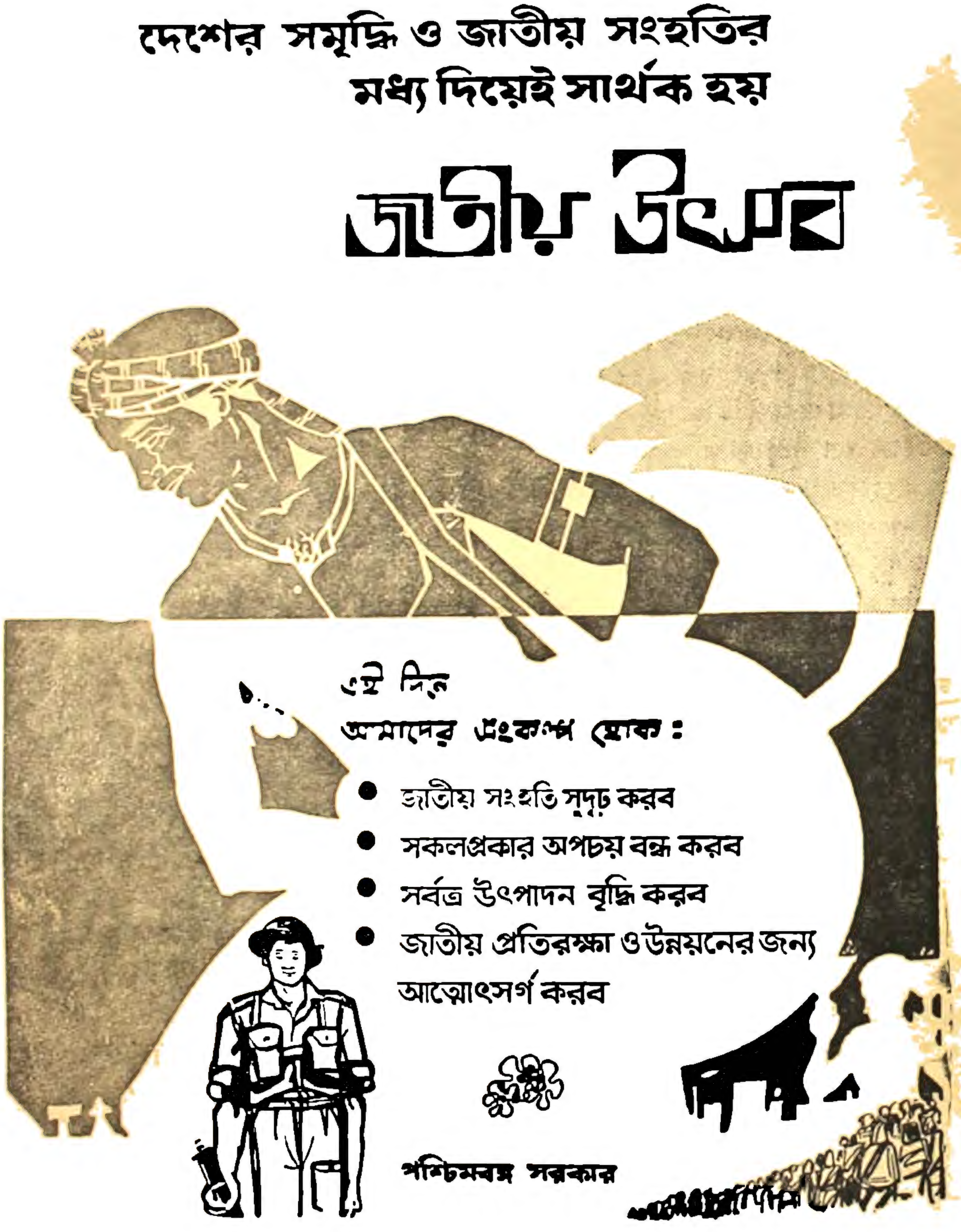
দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির
মধ্য দিয়েই সার্থক হয়
জাতীয় উৎসব
এই দিন
আমাদের সংকল্প হোক :
● জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
● সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করব
● সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
● জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলা ছবির বিবর্তন

অসীম সোম

চলচ্চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা আজকাল প্রমোদ-বিলাসী তরুণ তরুণী থেকে সুরু করে বিদগ্ধ পণ্ডিতমহল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র শোনা যায়। শহরে স্বল্প-শিক্ষিত বেকার ছেলের দল সিনেমাহলের সামনে লাইন দিচ্ছে, সস্তা চটকদারী সিনেমার কাগজ কিনে চলচ্চিত্রশিল্পের খবরাখবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকছে; অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী সচেতন সংস্কৃতিকর্মীদেরও ভাবনা-চিন্তার একটা দিক আজকের সিনেমা। অর্থাৎ সিনেমার ব্যাপ্তি ও বিকাশ নিজস্ব দিক থেকে যেমন হয়েছে, দর্শকদের মধ্যে এর প্রচলনও বেড়েছে অনেক। সিনেমা আজকের সমাজজীবনের একটা অঙ্গ হিসেবে অনেকটা যেন বিচার্য। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতি তথা শিল্পকলার জগতে চলচ্চিত্রের যে একটা স্বকীয় স্থান রয়েছে সেটাও আজকাল সর্বজনস্বীকৃত।

বাংলা দেশে বাঙালীর কাছে চলচ্চিত্রশিল্পের জনপ্রিয়তা বহুকালের। কিন্তু সে স্বীকৃতি ছিল কিছুটা আনন্দদানের মাধ্যম হিসেবে তার সাফল্য, কিছুটা কথাসাহিত্য, নাটক প্রভৃতিকে সিনেমার পর্দায় দেখার আনন্দ। সিনেমা সম্পর্কে ধ্যানধারণটাই অনেকের তখন সেইরকম সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশে অনেককাল পূর্ব থেকেই সিনেমা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার আর্টফর্ম নিয়ে বহু গবেষণা তর্কবিতর্ক চলতে থাকলেও একটা কূপমণ্ডুকতা বাংলা ছবি বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগৎকে কিছু কাল আগে পর্যন্ত পেয়ে বসে ছিল। অবশ্য সে যুগেও সাধারণভাবে হিন্দী বা অন্যভারতীয় ভাষার ছবির তুলনায় বাংলা ছবি বিষয়বস্তুর দিক থেকে উন্নত ছিল। কিন্তু কোনো বিখ্যাত উপন্যাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সিনেমায় তোলার অর্থ যে হুবহু ঘটনাগুলিকে ক্যামেরাবন্ধ করা নয়, এবিষয়ে সে যুগের চলচ্চিত্রকাররা তেমন অবহিত ছিলেন না। অন্তত বুঝতে পেরে থাকলেও তা প্রকাশের চেষ্টা তাঁরা করেন নি।

বাংলাদেশে সাহিত্য-প্রবণতার ব্যাপকতা বহুকালের। বাংলা সংস্কৃতি তথা শিল্পকলার জগতে নেতৃত্বের আসন সাহিত্যের ছিল, কেন না, বাঙালীর মনোভূমিতে সাহিত্য প্রবণতা অন্যান্য সবকিছুর চাইতে ছিল বেশি। তাই চলচ্চিত্র যখন সাহিত্যের ভিত্তিভূমির ওপরে বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, তখন তার বিকাশ মূলত সাহিত্য ভিত্তিক হবে এটাই স্বাভাবিক। এক-আধটা সিনেমাটিক সিম্বল বা ইমেজ সেযুগের ছবিতে মাঝে [illegible] উঁকি দিয়ে গেছে যেগুলি কিছুদিনের মধ্যে clichés পরিণত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্র যে বিশেষ একটা আর্টফর্ম, মন ও মননের প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ এক শক্তিশালী মাধ্যম, শিল্পচর্চা ও রসানুসন্ধানের এক নবাবিষ্কৃত পৃথিবী, এর যে [illegible] নিজস্ব ভাষা ও ব্যাকরণ আছে, মূলত ছবির পর ছবি সাজিয়ে দৃশ্যের অন্তর্লীন বক্তব্য থেকে যে কাহিনী বা চরিত্রকে এই মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হয়, এটা বাংলা ছবির কর্ণধাররা যে বুঝতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ তাঁরা রাখতে পারেন নি; ছবির নিজস্ব গুণ যে তার plasticity, চলচ্চিত্রের visual মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য, ছবির গতিশীলতার যে ধর্ম, তা বাংলা ছবিতে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ছায়াছবির উপস্থাপনে উপন্যাসের কাঠামো, নাটকের সংলাপ, মঞ্চানুগ অভিনয় প্রভৃতি ছবিতে বজায় ছিল।

এ সমস্ত কারণে কুলীন শিল্পরসিকের দরবারে বাংলা সংস্কৃতির আলোচনায় চলচ্চিত্র একরকম অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল কিংবা বলা চলে অধর্তব্য ছিল। অবশ্য বাংলাদেশে মাঝে মাঝে জোরালো বিষয়বস্তু নিয়ে, সমাজচেতনা বা কিছুটা

জীবনবোধ, চিন্তাশীলতা, শিল্পনিষ্ঠা ও রুচি নিয়ে পরিমিত ক্ষমতায় সৎ প্রচেষ্টা হয়েছে। অবশ্য সে প্রয়াস মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া ছবির আংশিক সাফল্যের মূল কারণ ছিল কাহিনীর আবেদন। কাহিনীর উপজীব্য বিষয় ও বক্তব্য এবং প্রমোদের উপকরণ ও আর্থিক সাফল্য ছিল ছবির বিচারের মান। ছবির জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য গড্ডলিকাপ্রবাহের মতো তৈরী অধিকাংশ ছবিতে ছিল অহেতুক নাচগান, অনর্থক হাসিকান্নার দৃশ্য, আর গালভরা নীতিকথা ও আপ্তবাক্য। সহজে সেন্টিমেন্টকে নাড়া দিতে বিরহিণী প্রেমিকার মহত্ব, সন্তানের কল্যাণে মায়ের স্বার্থত্যাগের নানা মহিমান্বিত দৃশ্যাবলী বা স্বামীর জন্য স্ত্রীর সর্বস্ব বিসর্জন—এরকম চোখে জল আনার বহু উপকরণ স্থূলভাবে বাংলা ছবিতে আমদানী করা হত।

কিন্তু জীবন ও জগৎকে দেখার যে সূক্ষ্ম ও বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি ঘটনা ও চরিত্রবিচারে যে স্বকীয় রসদৃষ্টি, বিন্যাস—বিশ্লেষণে উপন্যাস বা নাটকের বাইরে চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব ভাষা, বক্তব্য পরিস্ফুটনে দৃশ্য ও ধ্বনির সমন্বয়ে সৃজনশীল শিল্পীমন যে ভাবে বিশ্বের নানাদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পে সার্থকভাবে কাজ করে নতুন শিল্প-সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, বাংলা চলচ্চিত্রে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না। বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারে উপস্থাপিত করা চলে এমন একটি শিল্প সৃষ্টি বা একজন স্রষ্টার নামও এক দশক আগে করা যেত না।

শিল্পবিচারে বাংলাছবির বিবর্তনের যুগবিভাগ অর্থাৎ এর নবযুগের সূত্রপাত 'পথের পাঁচালী' থেকে করা তাই অবশ্য কর্তব্য। 'পথের পাঁচালী'র কাব্যব্যঞ্জনা, বাস্তবতা, চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ অনুযায়ী চিত্রধর্মিতা, চিত্রকল্প, ডিটেইল সম্পর্কে সচেতনতা, সংলাপ ও ধ্বনির অর্থপূর্ণতা, সম্পাদনা ও আবহসংগীতের ব্যবহারে মাত্রাজ্ঞান, চরিত্র ও প্রকৃতি উপস্থাপনের শিল্পসংযম ও আঙ্গিকসিদ্ধি বাংলা-ছবির জগতে বিপ্লব আনলো। সে ছবি থেকেই চলচ্চিত্র ভাষা বাংলাছবিতে প্রথম স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। অন্যদিকে এর ব্যবসায়িক সাফল্য ও দেশবিদেশে সম্মানপ্রাপ্তি চলচ্চিত্রশিল্পের অচলায়তনে আঘাত হানলো। হাওয়া-বদলের লক্ষণ স্পষ্ট হ'ল; কেননা, এর ফলে পথ প্রশস্ত হল নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও নবাগতের প্রচেষ্টার। বয়সের দিক থেকে সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সমকালীন এবং শিল্পাদর্শের দিক থেকে তাঁর সমগোত্রীয় আরো কয়েকজন নূতন চলচ্চিত্রকার গত সাত আট বছরে দেখা দিলেন বাংলাছবির আসরে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি দিয়ে বাংলা ছবির সৎশিল্পধারার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠলো তাকে বলশালী করে তুলতে সচেষ্ট হলেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, রাজেন তরফদার প্রমুখ কয়েকজন চলচ্চিত্রকার। প্রাচীনপন্থী বা সত্যজিৎ পূর্ববর্তী কয়েকজন চিত্রনির্মাতাও নব্যরীতির সিনেমা সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এই শিল্পমাধ্যমের চর্চায় ব্রতী হলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তপন সিংহ, অজয় কর প্রমুখ কয়েকজন পরিচালক; এ ছাড়া এই নব্যরীতির ধারাপ্রবাহের মধ্যে ছবি করছেন অসিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মৈত্র ও অজিত মৈত্র। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রযোজক মহলেও কিছুটা সাড়া জাগলো। শুধুমাত্র সিনেমার চটুল খবরাখবর, নায়িকার লীলাচাপল্যের নানা ফটোয় পূর্ণ চলচ্চিত্র—সমালোচনা ও গতানুগতিক সাংবাদিকতার পাশাপাশি দেখা দিল শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ চলচ্চিত্র সমালোচনার প্রয়াস; চলচ্চিত্র সমিতি আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠলো। আসল কথা, 'পথের পাঁচালী'র পর বাংলা দেশে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পসচেতনতা সবদিক থেকে বেড়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

সত্যজিত রায়ের 'পথের পাঁচালীর' সাফল্যের পর তাঁর 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'চারুলতা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'

'পরশপাথর', জলসাঘর 'তিনকন্যা', 'মাহানগর', প্রভৃতি ছবিগুলি বাংলা তথা ভারতীয় ছবিকে বিশ্বচলচ্চিত্রের দরবারে একটা সুনির্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনবোধ ও মানবিকতা এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগশৈলীতে বাস্তবের সঙ্গে গীতিময়তার, সমাজ-সচেতনার সঙ্গে কাব্যসুষমার, মানবিক সম্পর্কের তীব্রতার সঙ্গে আন্তর শান্তরসের, বৃহত্তর জীবন-অন্বেষার মধ্যে হার্দ্য গভীরতার যে সম্মিলন ঘটেছে, তা বাংলা ছবির বিশেষ গৌরবের দিক। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকলা 'বিশ্ব-চলচ্চিত্রের এক বিশিষ্ট ধারা হিসেবে বর্তমানে স্বীকৃত ও শিল্প-রসিকদের মধ্যে আলোচিত।

বাংলা ছবির ইতিহাসে তার বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ও নবযুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট হতে হলে কয়েকটি ছবি ও তাদের পরিচালকদের সম্পর্কে দু চার কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাছবি যে সংশিল্পের পর্যায়ে পড়েছে সত্যজিৎ রায়ের পর তার আরেক বিশেষ নিদর্শন ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিটি। 'অযান্ত্রিকে'র পর 'মেঘে ঢাকা তারা' ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ছবি নেই। এঁর 'সুবর্ণরেখা' সম্পর্কে চলচ্চিত্র মহলে উচ্চাশা অনেক। দুঃখের কথা, এছবি অনেকদিন হল তৈরী হ'য়ে থাকলেও এখনও মুক্তিলাভ করেনি। জীবনের যে বলিষ্ঠতা, দৃষ্টিভঙ্গিতে যে স্বকীয়তা ঋত্বিক ঘটকের শিল্পপ্রতিভার এক বিশেষদিক, তা কয়েকটি ছবির ব্যর্থতার পর আবার 'সুবর্ণরেখা'য় প্রকাশ পেয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। সমাজসচেতনা, বাস্তববোধ ও পরিবেশনে পরিমিতিবোধ এবং চরিত্রের আবেগ, দ্বন্দ্ব ও ঘটনার অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রগ্রাহ্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশের মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন মৃণাল সেন তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' ও 'প্রতিনিধি' ছবিতে, রাজেন তরফদার তাঁর 'গঙ্গা' ছবিতে। তবে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদারের শিল্পীজীবনের বিকাশ এই কয়েকবছরের মধ্যেও একটু অসম্পূর্ণ অর্থাৎ ইতিমধ্যেই সার্থক শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি একেবারে মূল্যহীন ছবিও কয়েকখানি করে এঁরা পরিবেশন করেছেন।

প্রাক-সত্যজিৎ পর্বে কাজ শুরু করে ক্রমশ গভীরতর বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে ছবি করে খ্যাতিলাভ করেছেন তপন সিংহ ও অজয় কর। তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' 'ক্ষনিকের অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' 'জতুগৃহ' প্রভৃতি ছবিগুলি গতানুগতিক বাংলা ছবির ধারায় একটু পৃথক ভাবে আলোচিত হবার যোগ্য হলেও, তাঁর ছবিতে কল্পনাদৃষ্টি, ও গভীরতার অভাব দেখা যায় এবং মহৎ শিল্পসৃষ্টির কোনা আবেদন কখনো আনে না। তাঁর উল্লিখিত ছবিগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে যেভাবে বক্তব্যের স্থূলতা বিন্যাস গত গতানুগতিকতা বা প্রকাশের শিথিলতা দেখা যায় তা তাঁর ছবিকে দুর্বল করে দেয়। আমাদের আলোচ্য পর্বের পূর্বে করা উল্লেখযোগ্য ছবি 'জিঘাংসা' থেকে সাম্প্রতিকতম 'অনুল্লেখ্য ছবি 'প্রভাতের রং'-এর মধ্যে অজয় কর কলাকৌশলের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন কয়েকটি ছবি করেছেন, যেমন 'হারানোসুর' 'সপ্তপদী' প্রভৃতি। তাঁর 'সাত পাকে বাঁধা' নিষ্ঠা ও কিছুটা বিচক্ষণতার সঙ্গে তৈরী করা ছবি। অসিত সেন ও প্রভাত মুখার্জী চিত্রবিন্যাসের দক্ষতা ও চলচ্চিত্রশৈলী সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন 'চলাচল' ও, 'পঞ্চতপা' কিংবা 'মমতা' ও 'বিচারক' ছবিতে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রর 'একদিন রাত্রে' বা উৎপল দত্তের 'মেঘ-এর মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে। উৎপল দত্তের 'ঘুমভাঙার গান' এখনও জনসাধারণের কাছে প্রদর্শিত না হলেও, এ ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মতে বাংলা ছবির সমাজসচেতনতা ও বলিষ্ঠ জীবন প্রকাশের এক নূতন সংযোজন হিসেবে এ ছবি সমাদৃত হবে। অগ্রগামী গোষ্ঠী 'হেডমাষ্টার' ছবিতে যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁরা 'ডাকহরকরা' বা 'নিশীথে' ছবিতে পারেন নি। যান্ত্রিক

গোষ্ঠী 'কাচের স্বর্গ' এর মতো পরিচ্ছন্ন কমার্শিয়াল ছবি করে যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন 'পলাতক'-এর মতো স্থূল মেলোড্রামাটিক ছবিতে তাঁদের শিল্পকৃতিত্ব অনেকটা ব্যাহত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে নবশিল্প ভাবনায় উৎসাহী কিছু পরিচালকের দেখা পাওয়া গেছে একালে যারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ছবি থেকেই চলচ্চিত্র-মাধ্যম ও তার শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থাশীল রয়েছেন বলে আশা করা যায়। তবে এখনও অধিকাংশ ছবির নিম্নমান, গতানুগতিক বিষয় বস্তু ও আঙ্গিকে তৈরী ছবির শিল্পব্যর্থতা বা চটুলতা বাংলা ছবির সার্বিক উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। অবশ্য, পূর্বোক্ত অনেক বাংলা ছবির প্রকাশরীতির স্বচ্ছতা, চিত্রকল্প ব্যবহারের চারুতা, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়া ও দৃশ্যরচনার গতিশীলতা, ধ্বনি ও সংলাপের পরিমিতি ও দ্যোতনা ক্যামেরার দৃষ্টিকোন প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে চরিত্রের অভিব্যক্তি ও পরিবেশের তন্নিষ্ঠ প্রকাশ বাংলা ছবির শিল্পরস ও আঙ্গিকগত উন্নতির পরিচায়ক। জীবনের অনেক গভীর উপলব্ধি, ঘটনার অন্তর্লীন অনেক সত্য, চরিত্রের অনেক জটিলতা যে ছবি দিয়ে এই শিল্পমাধ্যমে বলাচলে সত্যজিৎ রায় প্রমুখ কয়েকজন পরিচালক তারস্বাক্ষর একালের বাংলা চলচ্চিত্রে রেখেছেন।

পরিশেষে বলবো আজকের দিনে একটা ছবি নির্মাণের পেছনে বিপুল অর্থব্যয়ের দিনে বাংলা ছবির সীমিত বাজারের কথা স্মরণ রেখে ছবিকে রসোত্তীর্ণ করার চেষ্টার সঙ্গে তার বক্স-অফিসের দিকটাও চিত্রনির্মাতাদের সবসময় ভাবতে হয়। তাই সাধারণ দর্শকের শিল্পসচেতনতা বাড়লে কিংবা বলা যেতে পারে তা বাড়ার মতো অবস্থা গড়ে তুলতে পারলে, চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গীন শিল্পসার্থকতা ও জনপ্রিয়তার মধ্যে ব্যবধানটা কমে আসবে। অর্থাৎ এর দ্বারা গড়পরতা ছবির সাধারণ মানের উন্নতিই তাতে সূচিত হবে। বাংলা ছবির গত ৮।১০ বছরের ইতিহাসে যে বিবর্তন ঘটেছে, শৈল্পিক দিক থেকে তাকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে যদি চিত্র স্রষ্টাদের মানুষ ও জীবন সম্পর্কে গভীরদৃষ্টি, বিচার বিশ্লেষণের সৎসাহস ও শিল্পজ্ঞান থাকে প্রযোজক পরিবেশকদের শিল্পদরদ ও ব্যবসায়িক নিষ্ঠা থাকে এবং সর্বোপরি দর্শকদের থাকে শিল্পসচেতনতা ও চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ।

মুখর মর্মর

বিভা সরকার

আগ্রা দুর্গে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াই মুসম্মন বুরুজএর সামনে। ঘুমন্ত মর্ম্মরে জীবন জাগিয়ে হঠাৎ জীবননাট্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে শূন্য মুসম্মন বুরুজ বা জেসমিন অলিন্দ।

স্তব্ধ হয়ে দিগন্তের পানে চেয়ে বসে আছেন বার্দ্ধক্য জর্জ্জর পুত্র-লাঞ্ছিত মমতাজের চিরবিরহী সম্রাট। মন আজ তাঁর বেদনা পাথারে ডুবে গেছে। সারা বিশ্বে কোথায় পাবেন সান্ত্বনা কার কাছে নামাবেন অন্তরের এ অনমনীয় বেদনার ভার?—পায়ের তলার মাটি কণ্টকে কঙ্করে ছেয়ে গেছে। কোথায় তাঁর জীবন সর্ব্বস্ব মমতাজ?

তিনি তো বহুদিন চলে গিয়ে মুক্তি পেয়েছেন, নইলে, ভায়ে ভায়ে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এ কলঙ্ক তাঁকেও তাঁরই মত অসহায় বেদনায় সইতে হত।

তাজ এর পানে চেয়ে চেয়ে তিনি কি অন্তরের অন্তস্থলে মর্ম্মের মাঝখানটিতে মমতাজেরই প্রিয় সান্নিধ্য মধুর সান্ত্বনার প্রত্যাশা করছেন? কি ভেবে চলেছেন সম্রাট?

—এই মাত্র বছর দুই হল তাঁর প্রিয়তম পুত্র নয়নানন্দ দারার নিদারুণ লাঞ্ছনা তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে? উপায় বা কি ছিল?

সিংহ সেদিন পিঞ্জরাবদ্ধ রোগজর্জ্জর বার্দ্ধক্য পীড়িত। চতুর চূড়ামণি আওরংজীব সব পথ ঘাট বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর তারপর আজ—আজ মাত্র বছর দুই পরেই তপ্ত শেলের মত এসে বিঁধেছে দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর কুলের গৌরব বীর সুলেমান সুকোর হত্যাসংবাদ। তাঁর প্রাণ প্রতীম সিংহশিশু পপীর (আফিমের) বিষে জর্জ্জরিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে নির্ম্মম মিথ্যাচারী পিতৃব্যের চক্রান্তে কুখ্যাত সলীমগড়ের দুর্গকারায়। হৃদয় আজ তাঁর কিছুতেই সান্ত্বনা মানছে না ক্ষমা করছে না। আপন অত্যাচারী পুত্রকে তিনি অভিশম্পাত দিতে চাইছেন আতুর বেদনায়।

ভাগ্য বিড়ম্বিত সম্রাটকে সচকিত করে হঠাৎ বহুদিন গত এক ঘটনা মনে পড়ে গেছে তাঁর। একদা তাঁর যৌবনে এই যমুনা সৈকতেই তাঁর দুই প্রিয় হস্তী সুধাকর ও সুরতসুন্দরকে মত্ত করিয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায় নামিয়ে দর্শক হয়েছিলেন তিনি তাঁর পুত্রদের নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে। মত্ত হস্তীদের মদমত্ততাকেও বুঝি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল উল্লসিত প্রমোদকুলের উল্লাস উচ্ছ্বাস—কলকোলাহল। অকস্মাৎ মদ মত্ত সুধাকর বিভ্রান্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে না পেয়ে ছুটে এল কিশোর আওরংজীবের দিকে। সহজাত কৌতূহলে তিনি হস্তীটির অত্যন্ত কাছে গিয়ে পড়েছিলেন দর্শন ইচ্ছায়। মত্ত হস্তী শুঁড়ে জড়িয়ে আছড়ে ফেল্লো তাঁর অশ্বকে। বিদ্যুৎগতিতে বর্শা হাতে লাফিয়ে নেমে পড়লেন শাহজাদা চাকিতের মধ্যে। দর্শকজনের ভয় ভীত কল কণ্ঠকে ডুবিয়ে বর্শার আঘাত করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন অকুতোভয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ দৃঢ়চেতা চতুর্দ্দশ বর্ষীয় এক নির্ভয় বালক। নির্ম্মম আঘাতে বিমুখ করেছিলেন মত্ত হস্তীকে। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো সভাসদ দর্শক জনেরা মূক প্রশংসায় বালকের এ বীরত্বে। বহুদিন মৃত তাতার চেঙ্গিস সেদিন ধন্য হয়েছিলেন বহুদিনকার আপন বংশধারা মধ্যে আত্মদর্শনে। ছুটে গিয়ে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন পুত্র স্নেহাতুর পিতা আপন পুত্রকে। ব্যাকুল পিতার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে সে কিশোর সেদিন তাঁর কুলকে উজ্জ্বল করে বলেছিলো—"আজ আমার মৃত্যু হলেও অগৌরবের তো কিছু হত না। বাদশাহকেও

মৃত্যুর যবনিকা ঢেকেদেয়—এ মরণ আমায় মৃত্যুহীন করে রাখতো !”

গুণমুগ্ধ পিতা সেই মুহূর্ত্তে বীরপুত্রকে "বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত করতে দ্বিধা করেননি। সেদিন সে পিতার যোগ্য পুত্রের পরিচয় দিয়েছিলো। শৌর্য্যে বীর্যবত্তায় শাহজহানও কি কম ছিলেন ! সত্যই তিনি সিংহজেতা। এমনি করেই কি তিনি যৌবনে সিংহের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি তরবারী হস্তে শিকার-প্রিয় পিতা জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করে ! বিস্ময়ে সচকিত করে !

পিতা পুত্রের মধ্য দিয়ে এমনি করেই বুঝি বারে বারে ফিরে আসেন। আজও যেন এই বহুদিনের বহু দুঃখের দূরত্বের পারে দাঁড়িয়ে সেই উষ্ণ প্রিয় আলিঙ্গন স্পর্শ সম্রাট আপন বক্ষে অনুভব করলেন—দুই চোখ তাঁর দরবিগলিত ধারায় আকুল হয়ে উঠলো। কোথায় হারিয়ে গেল তাঁর কুলোজ্জ্বল সেই বীর পুত্রটি ?

তার পরিবর্ত্তে কে এই স্বার্থান্বেষি নির্ম্মম কুলহন্তা চক্রান্ত-কারী ! তাঁর আপন রক্তধারাকে আজ তিনি বুঝতে পারছেন না। তাই আজ তিনি ব্যর্থ আক্রোশে বিভ্রান্ত হচ্ছেন বিচলিত বিড়ম্বিত হচ্ছেন। সাধ্বী মমতাজের রক্ত যারা এমন করে কলঙ্কিত করল, তাদের জন্য আজ যেন তিনি মমতাজের মৃতআত্মার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দীনতম দীনের মতই এসে দাঁড়িয়েছেন।

আকুল হয়ে তিনি বুঝি বলছেন “ওগো মমতাজ ! তুমি একবার জাগো। থামাও এ ভাতৃঘাতি আত্মদ্রোহ তোমার বিপথগামী সন্তানের। তোমার মুখ, তোমার মাতৃস্নেহাতুর নয়নাশ্রু দারা সে হয়ত এমন করে উপেক্ষা করতে পারত না—চেয়ে দেখো মমতাজ—তোমার বংশ আজ প্রায় নির্বংশ হয়ে গেল ! কি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় দারা গেল, তোমার জীবনানন্দ দারা !—সেই দারার কর্ত্তিত খণ্ডিত মৃতদেহ এই আগ্রার পথে পথে প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে ঘোরানো হল নিদারুণ অসম্মানে। কিন্তু অক্ষম আমি—নখদন্তহীন পঙ্গু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতই বিফল বেদনায় ব্যর্থ আক্রোশে ছটফটালুম। প্রজাকুল কেঁদে আকুল হল কিন্তু কেউ অস্ত্র গ্রহণ করল না, কেউ প্রতিবাদের সাহস করল না, কেউ বিদ্রোহ করল না এ নির্ম্মমতার প্রতিবাদে। এমন ভীরু, এমন মেরুদণ্ডহীন হয়ে গেল কেন তারা ? এই কি বীর প্রসবিনী হিন্দুস্তানের জনতা ?

কি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতায় দারা বন্দীহল। কাপুরুষ মালিক জীবন যাকে দারা আমার কাছ থেকে বাঁচিয়েছিলো একদিন, হাতীর পায়ের তলায় নিদারুণ মৃত্যু থেকে সেই বিশ্বাসঘাতক জীবন পলাতক হতমান প্রিয়তমা নাদীরার মৃত্যুশোকে কাতর মুহ্যমান দারাকে আওরংজীবের লোকের হাতে তুলে দিলে। আর ঠিক একই রকম বিশ্বাস-ঘাতকতায় কাশ্মীররাজ অতিথিবৎসল পৃথ্বীসিংপুত্র কাপুরুষ মেদিনীসিং আপন ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে অতিথিকে (সুলেমান-শুকোকে) প্রাণ ভয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিলে। এমনই হয় ! সময় যখন বিরূপ হয় তখন সবই বিরুদ্ধগামী হয় !

আমার প্রাণ পুতলী দারা—এমন করেই হতমান হৃত গৌরব আপন দুধভায়ের হিংসার আক্রোশে মৃত্যুর তমিস্রায় হারিয়ে গেল ! আতুর মমতায় তোমার মৃত পুত্রদের কন্যা-গুলিকে আজ আমাদের জন্মান্তের সুকৃতি স্বরূপ জহান্-আরা দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছে। এই অনাথ অপগণ্ড গুলোকে সে বুঝতে দিতে চায় না, জানতে দিতে চায় না তাদের দুর্ভাগ্য। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—দু চোখ আমার জলে ভরে ওঠে !

দারার বড় মেয়েটাকে তুমি যদি দেখতে মমতাজ !—সে যেন সেই কিশোর দারা। সেই চোখ, সেই মুখ সেই স্মিত বয়ান। ‘দাদা !’ বলে দৃষ্টি তুলে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে বুকে জড়িয়ে আমি যে দারাকেই ফিরে পাই ! ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই জানে। জানি না কি

আছে এদের অদৃষ্টে। কি করবে জহান-আরা কতটুকু শক্তি তার, কিই বা সাধ্য! শুধু আতুর মমতায় আঁকুপাকুই করতে পারে—তুমি তো জান রাণী দারাকে সে কত স্নেহ করতো, কত শ্রদ্ধা করতো। সে যে একাধারে তার গুরু; আদর্শ পুরুষ শ্রদ্ধার পাত্রছিলো। পাছে আমি ব্যথা পাই তাই ভুলেও জহানআরা আমার সামনে দারার নাম মুখে আনে না—বেদনায় তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। শুধু সেই দিনটি সে ধৈর্য্য ধরতে পারেনি— যেদিন প্রসাদ অলিন্দ থেকে দেখতে পেয়েছিলো দারার দুর্দশা সে ভয়ঙ্কর দিনটিতে। হাহাকার করে ছুটে চলে গিয়েছিল সে আপন মহালে। আমার সামনে সে দাঁড়াতে পারেনি লজ্জার দীনতায় ভায়ের প্রতি ভায়ের এ হৃদয় হীনতায়!

তুমি তো দেখনি মমতাজ—কেমন করে তোমার মৃত্যুর পর এ ভাগ্যতরীর হাল সে তুলে ধরেছিলো। কি নিপুন যোগ্যতায় সে একটির পর একটি তোমার কর্তব্য গভীর মমতায় একান্ত শ্রদ্ধায় পালন করেছিলো। তোমার অবর্ত্তমানে তার প্রথম বড় কাজ—দারা ও সুজার বিবাহ দেওয়া। সে কি সহজ কাজ! তুমি যদি দেখতে মমতাজ! তোমার এ মেয়ের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে যেতে গর্বে ভরে উঠতো তোমার মন। নিজেকে রত্নগর্ভা বলে অহংকার করতে পারতে। কিন্তু সে গর্ব তোমার ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে খেতসর্প আওরংজীব। তার হাতেই বুঝি বংশ নির্বংশ হয়। আমাদের আর কোনও অবলম্বন নেই রাণী! দীনাতিদীন ভিক্ষুও বুঝি আজ আমার চেয়ে সুখী আমার চেয়ে ভাগ্যবান!"

কে এক অপরূপা ধীরে ধীরে কাছে এসে গভীর মমতায় বৃদ্ধ পিতার নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিয়ে স্নেহের সান্ত্বনার প্রলেপ লাগায়—তাঁর ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে।

আবার আমার স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তবের মাটিতে টেনে আনে—দূর মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের কণ্ঠস্বর। সন্ধ্যাবন্দনার অস্তরাগে আকাশে কে যেন প্রদীপটি জ্বালতে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে অসাবধানে।

হায় শাহজাহান্! তোমার সাজানো প্রাসাদেও কি আগুন জ্বলে উঠেছিলো এমনি করেই কারও অসাবধানে?

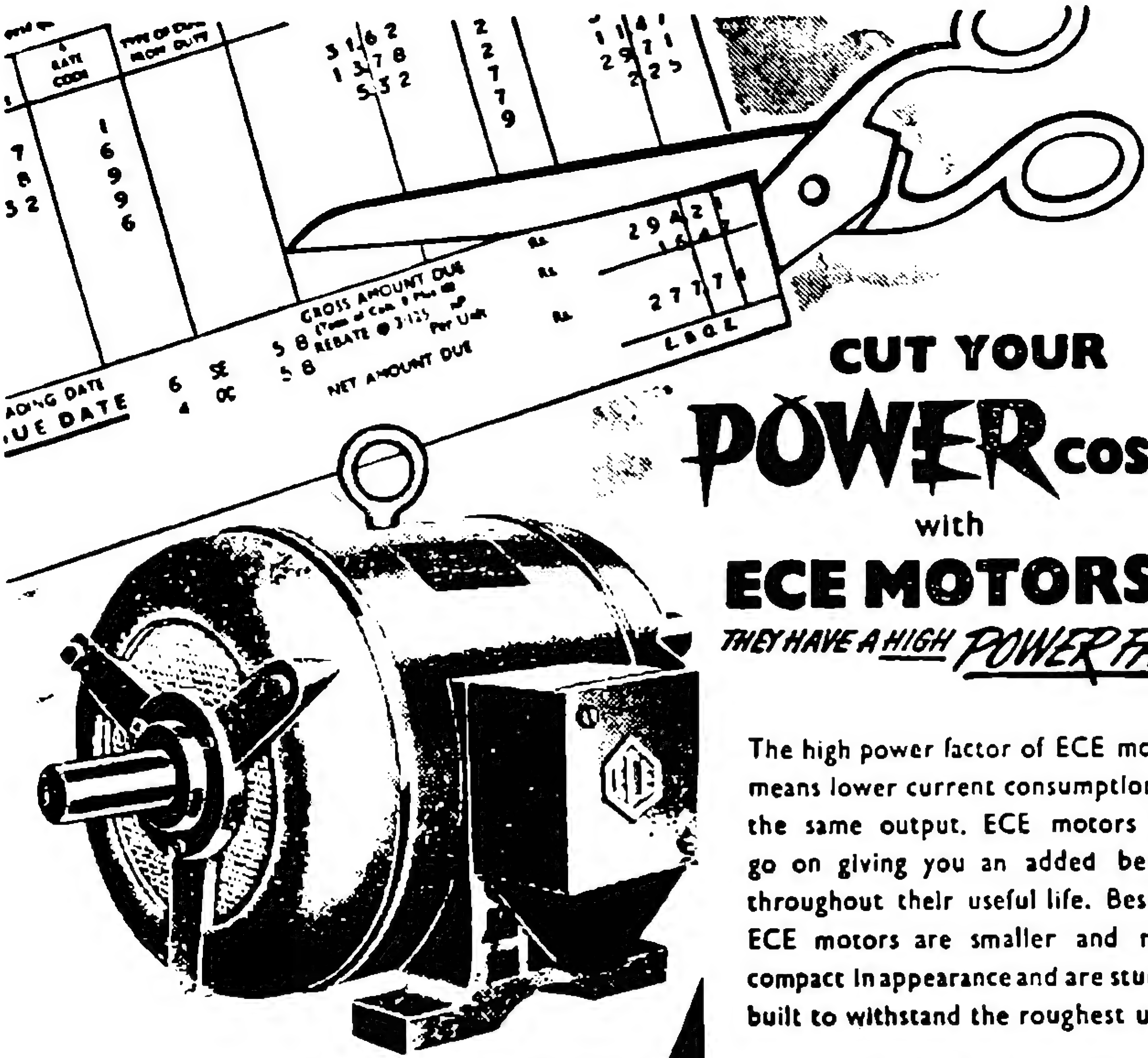

CUT YOUR POWER COST with ECE MOTORS!

THEY HAVE A HIGH POWER FACTOR

The high power factor of ECE motors means lower current consumption for the same output. ECE motors thus go on giving you an added benefit throughout their useful life. Besides, ECE motors are smaller and more compact in appearance and are sturdily built to withstand the roughest use.

1 TO 15 H.P. 400/440 VOLTS
50 CYCLES, 3 PHASE, A.C.

SCREEN PROTECTED SQUIRREL CAGE

FOR EFFICIENCY WITH ECONOMY

CHOOSE AN

ECE **MOTOR**

MANUFACTURERS:

ELECTRIC CONSTRUCTION & EQUIPMENT CO., LTD.

Calcutta. Bombay. Delhi. Madras. Hyderabad.

রবীন্দ্র সঙ্গীতে গায়কী

জয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথ গায়কের স্বাধীনতা একবারে অস্বীকার করেন নাই, যান্ত্রিক ও জীবন্ত কণ্ঠের মধ্যে পার্থক্য তো থাকিবেই।—তিনি বলিয়াছেন—"গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে—অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে—যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে—গায়ক তো গ্রামোফোন নয়।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রীতিনীতি ক্রমেই 'একঘেয়ে' হইয়া উঠিতেছে। ডক্টর কালিদাস নাগ এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—

"এর কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কীর অভাব, যে যেমন ভাবে গাইছে তার নিজস্ব মুদ্রাদোষ শুদ্ধ ঢঙটা শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে সংক্রামিত করছে। প্রয়োজন একটা standardised বা মানানুগত গায়কীর প্রচলন।"

এই রীতিনীতির মানানুগত বিন্যাসের আশা ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

শ্রীদিলীপ কুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে কবির দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। দিলীপ কুমার বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গান যদি গায়ক মূল সুরকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও মেজাজ অনুসারে নিজের ইচ্ছামত গাহে, তাহাতে দোষ কি?

রবীন্দ্রনাথ ইহাতে প্রবল আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি যে সব গান রচনা করি তাতে সুরের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই বলে তোমার ভাল লাগে না। তুমি তার উপরে নিজের ইচ্ছামতো প্রাচুর্য আরোপ ক'রে গাইতে চাও। তারপর যার সেটা কারো ভালো না লাগে তবে তার কপালে কাব্যধ্বংসী ছাপ মেরে গীতরসিক সভা থেকে বরখাস্ত ক'রে দেবার বিধান তোমার। কিন্তু তুমি যেমন বিচারের অধিকারী অন্য ব্যক্তিও তেমনি।"

এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল, অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"রবিকাকাকে বললুম, দেখো আমি তো তোমার গান গাইতে পারি না, তোমার সুর আমার গলায় আসে না, কিন্তু আমার সুরে যদি তোমার গান গাই, তোমার তাতে আপত্তি আছে? রবিকাকা বললেন, না তা আর আপত্তি কী। তবে দেখো গান গুলো আমি লিখেছিলেম, সুরগুলোও দিয়েছি, সেগুলির উপর আমার মমতা আছে, তা নেহাত গাওই যদি তবে তার উপর একটু মায়া-দয়া রেখে গেয়ো।"

তাঁহার জীবিতকালেই এই সুরবিচ্যুতি শুরু হয়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহাকে তাই আক্ষেপ করিতে হয়—"আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় তাই তোমরা করো, প্রতিদিন নিজের গানের আসুরিকতা এত চোখে পড়ে যে, মনে হয় গানটি বোধহয় আমার—রচনা নয়……।"

তাঁহার গানের সুর ও তালের এত বৈচিত্র্য যে, বিশেষজ্ঞ-মণ্ডলীকে সর্বদাই সেগুলির কৌলীন্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কেবল মাত্র গানের তালের ক্ষেত্রেই কবি

কত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন—একাদশী, ঝম্পক, ষষ্ঠী, নবতাল, নব পঞ্চতাল প্রভৃতি সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ কবি প্রবর্তণ করিয়া গিয়েছেন। তাঁহার এই নূতন তালে রচিত গানগুলি গাহিবার সময়ে এই নব ছন্দোবৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। তিনি অসংকোচে বলিয়াছেন—"অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এই জন্যে যত বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদসদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলাগানে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।"

তাল লইয়া কবির দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল, দিনেন্দ্রনাথ নাকি অনুযোগ করিয়াছিলেন। কবি অভিমানে বলিয়াছিলেন—"আমি যে গান তৈরি করি তুই বলিস তার তাল কাশ্মিরী খেমটা।" কাশ্মিরী খেমটা তালে মিশ্র বিভাসে রচিত তাঁহার একটিই গান আছে—"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে।"

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানে সুরের লীলায়ন সীমায়িত, এগুলি কতকটা আবৃত্তি প্রবণ; আবার তাল দিয়া লীলায়িত করিয়া গাহিবার উপযোগী গানও তাঁহার অসংখ্য।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুর তাঁহার নিজের সৃষ্ট নয়—হিন্দী ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরি-টপ্পা ছাড়াও গুজরাটী, মারাঠী, দক্ষিণী বহু ভাষার প্রচলিত গানের সুর অবলম্বনে তিনি বাণী রচনা করিয়াছেন। এ গানগুলিকে ইন্দিরাদেবী 'অর্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীত' আখ্যা দিয়াছেন। এ গানগুলির শুধুমাত্র কথাই রবীন্দ্রনাথের রচনা, কাজেই গান গাহিবার সময়ে সেই কথাগুলির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে যাইতাম ও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গান শোনাইতাম। তিনি আমার হিন্দিগান শুনিয়া সেই গানগুলির অনুকরণে বহু বাংলা গান রচনা করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্তর বাংলাগান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর হিন্দিগানের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। তবে স্বরচিত কতকগুলি গানে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুরদান করেন।"

বিষ্ণুপুরী ও অন্যান্য ঘরোয়ানার বহুগান তিনি সাংকেতিক পরিভাষা মতে 'ভাঙিয়াছেন' অর্থাৎ সে গানের সুর অবলম্বনে কবি বাংলাগান রচনা করিয়াছেন। গায়ক মূল হিন্দী গানের ঢঙে কবির কথাগুলি শুধুমাত্র আবৃত্তি করিলেও তাহা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকিবে না—কবির গীতিরীতিকে তাহাতে ব্যাহত করা হইবে। কীর্তনগানের প্রচলিত সুরে আঁখর দিয়া মাধুর্য বাড়ানো হয়, রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কীর্তন আঁখরবিহীন, সেগুলিতে আঁখর দিলে তাহার মাধুর্য মোটেই বৃদ্ধি পাইবে না।

রবীন্দ্রনাথ 'আঁখর'কে বলিয়াছিলেন 'কথার তান।' কবির গানে কিন্তু এই তান প্রয়োগ লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তান প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"একবার চেষ্টা ক'রেই দেখো না, শুনতে যদি ভাল লাগে ওস্তাদী ঢঙে তান দিয়ে তাঁর গান গাইলে, গাইতে দোষ কি? গানেরও একটা গতি আছে, তাকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে রেখে কি হবে? চলুক না সে নিজের পাখায় ভর দিয়ে।"

এ বিষয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা হিমাংশু কুমার দত্ত অনেকদিন আগে বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয় গায়কী-পদ্ধতির দোষে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর আন্তরিক প্রচেষ্টা যদিও প্রশংসার যোগ্য, তথাপি এই প্রচেষ্টার আতিশয্যের ফলে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণবস্ত

থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন, শুধু প্রাণহীন বাহিরের কাঠামোটির উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের গায়কী অত্যন্ত নীরস মনে হয়।"

রবীন্দ্রসঙ্গীত কিন্তু ইতিমধ্যেই কেমন যেন ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে—এ খুবই দুঃখের কথা। রামপ্রসাদী গানও একই ভঙ্গীর গানের মালিকা—কিন্তু তাহা গাহিতে বাঙালী এখনও ক্লান্ত হয় নাই। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের গানে 'একঘেয়ে' ত্রুটিটি এমন তীব্রভাবে দেখা দিতেছে কেন? রবীন্দ্রসঙ্গীতে গীতিরীতির বৈচিত্র্য আনয়ন করার বিশেষ প্রয়োজন—আর এ বৈচিত্র্য সম্পাদন একমাত্র তান প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব। ইন্দিরাদেবীও শেষবয়সে ইহার অনুকূলে মত দিয়াছিলেন—"এখন সময় এসেছে তাঁর গানে ছোটছোট তান দিয়ে গাইবার। এ ভাবে গাইলে গায়করা গানে স্বাধীনতা পাবে, শ্রোতাদের ভাল লাগবে শুনতে।"

এখানে কিন্তু প্রশ্ন আছে—ওস্তাদী ঢঙে তান দিয়া গাহিলে তাঁহার গানের 'প্রাণ' অর্থাৎ সুররস অক্ষুন্ন থাকিবে তো? তাঁহার গানের যে বিশেষ গীতিরস, যে অলৌকিক আবেদন, যে অতুলনীয় সৌন্দর্য আছে তাহা থাকিবে তো? বারবার একই ঢঙে তাঁহার গান শুনিয়া যে ক্লান্তি আবেশ আনিয়াছে তাহা অবশ্য কাটিয়া যাইবে। তাহা ব্যতীত তাঁহার গানের গীতিরস স্পন্দিত হইয়াছে সুললিত বাণীর কাকলিতে। 'প্রাণ' অর্থে হৃৎযন্ত্রীতে রাগিণী স্পন্দন রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই 'প্রাণ' শুধুমাত্র সুরের আঘাতে সৃষ্ট নয় ভাবাবেগের অশ্রুত উৎক্ষেপণে সৃষ্ট।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইদানীং যে সব হিন্দী ভাষান্তর হইয়াছে সেগুলি তাঁহার কাব্যবাণীর অভাবে পঙ্গু হইয়া আছে। ভাষান্তর করিবার সার্থকতাই বা কি আছে জানি না! মীরার ভজন, তুলসীদাসের ভজন, কবীরের দোহা যদি আমরা মূল হিন্দী ভাষায় গাহিয়া রসাস্বাদন করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা গানগুলি অবাঙালীরা গাহিয়া আনন্দ নিশ্চয়ই পাইবে। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী গীতাঞ্জলির স্বরলিপি করিয়াছিলেন দেবনাগরীতে, কিন্তু তিনি বাংলা কথাই অক্ষত রাখিয়াছেন। ডক্টর আরনল্ড বাকে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি করিয়াছিলেন—তিনিও বাংলা কথাই বজায় রাখিয়াছিলেন। এই ভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সারা বিশ্বে ছড়িয়া পড়ে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পুরাতন রেকর্ডগুলি কবি নিজে শুনিতেন, সে গানগুলির সামান্য সুরবিচ্যুতিতেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কাজে কাজেই সেদিনের রেকর্ডগুলি বিশুদ্ধ সুরসম্মত রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তাঁহার স্বকণ্ঠের গানের রেকর্ডও আছে: যেমন—(১) অন্ধ জনে দেহ আলো; (২) আমি সংসারে মন দিয়েছিনু; (৩) আমারে কে নিবি ভাই; (৪) কণ্ঠে নিলেম গান; (৫) আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে এবং (৬) তবু মনে রেখো।

তাঁহার ও দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠের রেকর্ডগুলিকে বলা চলে আদর্শ রবীন্দ্রসঙ্গীতের চিরকালীন নিদর্শন। এ ছাড়া তাঁহারা অনুমোদিত পুরাতন রেকর্ডগুলি শুনিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী বা গীতিরীতির একটি স্পষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সকল পুরাতন রেকর্ড পুনরায় প্রচার করিলে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীর রূপটির সম্পর্কে আজকালকার গায়কগায়িকাদেরও একটি স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের গানগুলিতে সুরের লীলায়ন কম কিন্তু তাঁহার নিজস্ব সুরের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট এগুলিতে ভাস্বর হইয়া আছে। গীতাঞ্জলির পরবর্তী যুগের গানগুলির স্বরলিপিতে কবি সুর-তালের উল্লেখ করিতেন না। তাঁহার মনে হইয়াছিল এগুলিতে তিনি যথোচিত রাগিণী-নিষ্ঠার পরিচয় দেন নাই। বস্তুতঃ, এ গানগুলিতে একাধিক রাগিণীর লীলায়ন সুপ্রকাশিত।

এই শ্রেণীর কতকগুলি সুপরিচিত গানের নিদর্শন—(১) প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে (ভীমপলশ্রী, মূলতানী ও ভৈরবী-একতালা);

(২) ওগো বধূসুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী (কালিংড়া-রামকেলী, কাহারবা)

(৩) খরবায়ু বয় বেগে (ইমন-ভূপালী, কাহারবা)

(৪) হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে (আশাবরী-ভৈরবী, ঝাঁপতাল) প্রভৃতি।

কবির শেষ প্রচেষ্টা মুক্তবন্ধ ছন্দে ও গদ্যভাষায় গান রচনা। গদ্যভাষায় গান রচনার আশা তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্তরে পোষণ করিতেন। একটি চিঠিতে তিনি বলিয়াছিলেন—"কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?"

কবি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে তাঁহার সে আশাও পূর্ণ হইত। গদ্যছন্দের ও মিলহীন বাক্যের গান তাঁহার বহু আছে। এই শ্রেণীর গান—

দুঃখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক, তোমারে চাহিয়ে—
কোথায় আছি আমি দীন, অতিদীন॥

কেবল গদ্যছন্দেই নয়, একেবারে গদ্যভাষায় রচিত গানও তাঁহার আছে—

আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন—অবসান বেলারে,
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্যভবনে।
সে কি মূক বিরহস্মৃতি গুঞ্জরণে তন্দ্রাহারা ঝিল্লীরবে।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী-বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে।
সে কি অবগুণ্ঠিত প্রেমের কুণ্ঠিতবেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে।
সে কি উদ্ধত অভিমানে উচ্চকিত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীর ঝংকারে॥

নৃত্যনাট্যগুলি অধিকাংশ এই আঙ্গিকে রচিত। সুরের আভাসে কবিতা আবৃত্তিও রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতার মাথায় সুর ও তালের নির্দেশ করা আছে—হতভাগ্যের গান (বিভাস একতালা,) বিদায় (বিভাস), ভগ্নমন্দির (বিভাস)।

নিজের গানের মুখ্যভাষ্যকারও নিজেই ছিলেন কবি। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি নিজের গানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়দান করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষার অঙ্গরূপে সঙ্গীতকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি এই ভাবে সারা জীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মতে—"সঙ্গীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটি বিদ্যাথেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।"

একটি ভেতো গল্প

[৪৫০ পৃষ্ঠার পর]

"আসুন মিঃ মিত্র—আসুন—" নিশিকান্ত সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

কিন্তু আমরা ততক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেছি। বিজন মিত্তির টলছেন মাঝে মাঝে। আমরা মদের মৃদু গন্ধ পাচ্ছি তখন আর বুঝতে পারছি যে মিত্তির মশাইএর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

"কি ভাই, কিসের রিহারস্তাল চলছে—এ ?" বিজন মিত্তির প্রশ্ন করলেন।

নিশিকান্ত বলল, "আজ্ঞে 'পাণ্ডব-গৌরব' ?"

"ডি, এল, রায়, না ?"

"আজ্ঞে না, গিরিশ ঘোষ।"

"গিরিশ ঘোষ তো মদ খেতেন, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হো হো করে হেসে উঠলেন বিজন মিত্তির। সেই প্রাণ খোলা চড়া গলার হাসি। কিন্তু আজ কেমন যেন কষ্ট হল তার সে হাসি শুনে।

বিজন মিত্তির বলে চল্লেন, "বিল্বমঙ্গল নাটকটা তো গিরিশ ঘোষের তাই না নিশিকান্ত ?"

"আজ্ঞে।"

"মনে আছে, এখনো দু'চার লাইন মনে আছে আমার —শুনবে ?

'ভেবে দেখ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন।
ছিলি ব্রাহ্মণকুমার,
এবে বেশ্যা-ক্রীতদাস—'

হঠাৎ থেমে গেলেন বিজন মিত্তির, একটা টাল সামলে নিয়ে বল্লেন, "কিন্তু না, আমি তোমাদের ডিস্টার্ব করতে চাই না—তপোবনে মত্তহস্তী হব না আমি—তোমরা রিহারস্তাল চালিয়ে যাও ক্যারি অন—"

বলতে বলতে আমাদের স্তব্ধতাকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি হলঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের এই চেহারা দেখার জন্য আমরা একেবারেই তৈরি ছিলাম না। আমার কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল।

নিশিকান্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, 'অনেকদিন ধরেই কানাঘুষো শুনছিলাম যে মিত্তির মশাই মদ ধরেছেন—কিন্তু এখন দেখছি যে মদেই ওঁকে ধরেছে—'

নিশিকান্তের কথাটা ঠিকই মনে হল। আমরা সবাই মিত্তির মশাইএর এই অবস্থান্তরে দুঃখ বোধ করলাম।

ক'দিন পরে আমি আর এক দফা দুঃখ পেলাম। সেদিন সকালে সেই আম বাগানে ঘুরছিলাম আমি। শরতের রং চারদিকে। একটা শিউলিগাছের তলায় একরাশ ফুল ছড়িয়ে পড়ে ছিল। আমি কিছু ফুল কুড়োতে কুড়োতে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি যে বিজন মিত্তির বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আমায় দেখতে পেলেন তিনি, এগিয়ে এলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গী দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি এই সকাল বেলাতেই মদ গিলেছেন।

আমি বললাম, "নমস্কার।"

বিজন মিত্তির থমকে দাঁড়ালেন, "কে ? মনে হচ্ছে চিনি চিনি—তুমি কোনো বিদেশিনী ?'

"আজ্ঞে আমি ভরত গুপ্ত।"

"কোন ভরত, রামের ভাই ? কৈকেয়ীর ছেলে ? এ্যাঁ ?" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। সেই প্রাণ খোলা হাসি। কিন্তু আজ মনে হল তা হাসি নয়, শুধু হাসির মত একটা শব্দ।

"আচ্ছা ভাই ভরত গুপ্ত—চলি, বাই বাই'—বলেই বিজন মিত্তির সেখান থেকে দ্রুতপায়ে এবং একটু টলতে টলতে চলে গেলেন।

নিশিকান্তকে এই ঘটনা'র কথা বললাম।

নিশিকান্ত বলল, "শক্তি অন্তর্ধান করলে এমনি হয় ভাই —ভদ্রলোকের প্র্যাকটিস একেবারে শেষ হয়ে গেছে" —

কিন্তু এর চেয়েও নাটকীয় ঘটনা ঘটল প্রায় আটদশমাস বাদে। এর মধ্যে বিজন মিত্তিরের মদ্যাসক্তির কথাটা সমাজে পুরোণ হয়ে এল। মানুষ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল বোধ খুবই ক্ষণস্থায়ী, মানুষ সম্পর্কে মানুষের ঔদাসীন্যই আসলে বড় সত্য। সুতরাং কেউ এ নিয়ে আর চিন্তা করত না। আমিও চিন্তা করতে চাইতাম না, তবে মাঝে মাঝে এড়াতে পারতাম না।

মাঝে মাঝে বিজন মিত্তিরের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছি। সকালে কিংবা বিকেলে। অভাবগ্রস্তের বাড়ী বলে মনে হ'ত না। বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঠিক আগের মতই সোনার চাঁপা, জবা আর সিজন্ ফ্লাওয়ারের মেলা। মাঝে মাঝে সুরভি দেবীকে দেখতে পেয়েছি, দেবতোষকে দেখেছি। তাদের বেশভূষা আগের মতই ছিমছাম। সন্ধ্যের মুখে দেখেছি মি: গুপ্তের গাড়ী পোর্টিকোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক আগেকার মতই। দেখে মনে হত যে বিজন মিত্তির ছাড়া আর কিছুই বদলায় নি।

কিন্তু বিজন মিত্তির যে কতদূর বদলেছিলেন তা টের পেলাম সেদিন রাতে, লনের ধারে।

বেড়িয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় ভীড় দেখে কৌতূহল হল। ভীড় ঠেলে একটু এগোতেই দেখলাম যে লনের রেলিং এর ধারে বিজন মিত্তির মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন।

"মিত্তির মশাই!" আমার মুখ দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই শব্দটা বেরিয়ে গেল।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, "আপনি একে চেনেন?"

বললাম, "হ্যাঁ চিনি—কিন্তু এর—"

লোকটি বলল, "চিন্তা করবেন না, একটু মাত্রাধিক্য হয়েছে বলেই"—

"আমি এঁকে নিয়ে যাচ্ছি – বাড়ী পৌঁছে দেব"—

একটি লোক ফিটন ডেকে আনল ও সবাই ধরাধরি করে বেহুঁশ বিজন মিত্তিরকে গাড়ীতে তুলে দিল।

বাড়ী পৌঁছোতেই চাকরবাকরেরা এসে বিজন মিত্তিরকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল। তখনো তিনি অচৈতন্য।

বিদায় নিয়ে আসবার সময় সুরভি দেবী বললেন, "আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি"—

বললাম, "লজ্জা দেবেন না বৌদি—বরং একটা কথার জবাব দিন।"

"বলুন।"

' উনি কেন এভাবে

সুরভি দেবীর চোখে জল দেখা দিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "হঠাৎ পসারটা পড়ে যেতেই—কত যে বোঝাই কিন্তু কিছুতেই কিছু' – বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন।

সুরভি দেবীর মনের অবস্থা কল্পনা করে সেদিন মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সেদিন রাতে বিনয় ও নিশিকান্তের সঙ্গে অনেক রাত অবধি মিত্তিরদের অবস্থা আলোচনা করেও আমি তাদের চিন্তা থেকে বিরত হতে পারলাম না। তারপর বিনয় ও নিশিকান্ত ঘুমোবার পরও আমার ভাবনা চালু রইল। নিশিকান্তের কথা ঠিক। শক্তি অন্তর্ধান করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। যে গাইতে জানে তার গলার স্বর খারাপ হয়ে গেলে কি হবে? যে নাচতে জানে সে খোঁড়া হয়ে গেলে কি হবে? যার সেতার বাজাতে ভালো লাগে তার ডানহাতের দু'টো আঙুল কাটা গেলে কি হবে?

এরি ক'দিনবাদে হঠাৎ বিনয়ের মুখে খবর পেলাম যে বিজন মিত্তিরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হয়েছে। থ্রম্বসিস। শুনে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ভাবলাম—

দেবকুমার গুহ বাধা দিল, "একটা কথা ভাই ভরত গুপ্ত"—

ভরত গুপ্ত ধীরে ধীরে তাকাল দেবকুমার গুহের দিকে। যেন অনেকদূর থেকে দেখছে সে এমনি তার চাউনিটা। সে বলল, "বল।"

দেবকুমার গুহ বলল, "এই গল্পের বক্তব্য কি?"

ভরত গুপ্ত বলল, "গল্প শেষ করিনি এখনো।"

"একটা লোক কি করে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে মরতে বসল এই কি গল্প?"

আমি বললাম, "আর বাচ্চাটার গল্পই বা অত ফলাও করে তুমি ফাঁদলে কেন? বাপ আর ছেলের আলাদা আলাদা বর্ণনার অর্থ কি?"

ভরত গুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল; জবাব দিল না।

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, "আমি একটিও প্রশ্ন করব না ভাই—কথা দিয়েছি আমি।"

আমি বললাম, "ভরত গুপ্ত একেবারে শুয়ে পড়লে কেন হে?"

দেবকুমার গুহ বলল, "কথক বন্ধু কি রাগ করলে নাকি হে?"

হঠাৎ ভরত গুপ্ত চোখ মেলল এবং আবার সোজা হয়ে বসে কটমট করে তাকাল আমার এবং দেবকুমার গুহের দিকে, তারপর বলল, "মনে হচ্ছে তোমাদের বয়স দশের বেশী নয়—"

"সে কি হে!"

"এ কি অপমান!"

আমরা প্রায় সমস্বরে উপরোক্ত পরিহাস-তরল উক্তিগুলো করলাম।

ভরত গুপ্ত বলল, "বন্ধুগণ, রসাস্বাদনের ব্যাপারে প্রথম শর্ত হচ্ছে নিঃশব্দ হওয়া। কথা বললে কথা-শোনা যায় না।"

দেবকুমার গুহ বলল, "উত্তম হে রসনিধি—আমরা এবার একেবারেই নিঃশব্দ হলাম।"

ভরত গুপ্ত প্রসন্ন হয়ে বলল, "তাহলে শোন—"

বিজন মিত্তিরের কথা এবার থাক। আবার দেবতোষের কথা শুরু করি। আবার একটু পিছিয়ে যাই।

আমার কাছে প্রায় রোজই গল্প শুনত দেবতোষ। তার উজ্জ্বল চোখ দুটোতে আমার কাছে শোনা প্রত্যেকটা আর দেশ-দেশান্তরের ছায়া ছায়াছবির মত একের পর এক প্রতিফলিত হত। আমি তাকে শোনাতাম নানা কথা। যত বিচিত্র কথা আমার জানা ছিল। গ্রীষ্মকালে যেখানে সূর্য অস্তে যায় না আর রাত হয় না সেই বরফের রাজ্য ফিনল্যাণ্ডের কথা। বসন্তে সাউথ সী দ্বীপপুঞ্জের আদুইট দ্বীপের কথা—যেখানে রক্তবর্ণ প্রবালের পাহাড় আছে, শোনাতাম ইয়ারকন্দের কম্বলওয়ালাদের গল্প, সুজাউ গিরিবর্ত্মের কিরঘিজ সৈনিকেরা কি করে পাহাড় খুঁড়ে নুন বের করে, কেন্দ্রী দ্বীপের সর্বোচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বারবাবোসো দুর্গের ধ্বংসস্তূপের কথা যেখানে বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গেই হাজার হাজার লাখ লাখ যাযাবর পাখীদের মেলা বসে।

কিন্তু বছরখানেক কাটতে না কাটতেই আমার সেই গল্প শোনানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দেবতোষের আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে ভাবলাম যে তার বুঝি শরীর খারাপ। আমাদের চাকর রামদেওকে বললাম খোঁজ নিতে। সে খবর দিল যে দেবতোষ ভালই আছে। তাহলে? আসে না কেন? দিনের পর দিন কেটে গেল। তবু আর দেবতোষকে দেখতে পাইনা। ভাবলাম, হয়ত এতদিনে মনোমত খেলার সাথী পেয়েছে সে।

প্রায় মাস আটেক বাদে কিন্তু হঠাৎ একদিন তাকে দেখলাম। সেদিন আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দেখি যে দেবতোষ একটা বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে

দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। অতটুকু ছেলের ওই ধরণের ভঙ্গী আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ঠেকল না।

ডাকলাম, "দেবতোষ—"

সে চমকে ফিরে তাকাল, আমায় দেখে হাসল একটু, কিন্তু তার হাসি আমার কাছে মলিন মনে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি দেবু, আজকাল যে আর আসো না ?"

দেবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "ভালো লাগে না।"

"সেকি, আগে তো ভালো লাগত ?"

"এখন লাগে না।"

"নতুন খেলার সাথী পেয়েছ বুঝি ?"

"আমি তো খেলিনা।"

"খেল না ? তাহলে কি কর বাড়ীতে ?"

"ভাবি।"

"কি ভাবো ?"

"সে অনেক কথা। চলি—" বলেই হঠাৎ দেবতোষ হন হন করে চলতে শুরু করল।

আমি একবার ডাকতে গিয়েই থেমে গেলাম। না থাক্, ছেলেমানুষ, ধাপে ধাপে ওদের মনের আকাশে এখন নানা বর্ণের মেঘ আসবে যাবে। থাক্, ও নিজের খেয়াল খুশী মতই চলাফেরা করুক। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে একটু চিন্তা হল। দেবতোষের মুখে চোখে আর সেই সরল ও মধুর দীপ্তিটুকু যেন কমে গেছে। কেন ?

প্রায় দেড় বছর আর দেখলাম না দেবতোষকে। জীবনের প্রখর স্রোতে ভেসে ভেসে চলি। কে কার খোঁজ রাখে ? সময় কোথায় অত ? কিন্তু দেড় বছর বাদে আবার দেখা হল বাগানের মধ্যে। একটা আমগাছের তলায় সে বসে বসে মাটিতে দাগ কাটছিল একটা আঙ্গুল দিয়ে।

"দেবতোষ !"

দেবতোষ তাকাল আমার দিকে। কিন্তু পরিচয়ের ভাবটা তার মুখে প্রকট হল না। লক্ষ্য করলাম যে দেবতোষ আর একটু লম্বা হয়েছে কিন্তু চোখে মুখে তার সেই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আর নেই। কেমন যেন একটু বোকা বোকা দেখাচ্ছে। আর ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

"কেমন আছ দেবতোষবাবু ?"

"ভাল।"

"তোমার বাবা কেমন ?

"ভাল। তবে মাঝে মাঝে রাতের বেলা চেঁচিয়ে গান গান।"

"গান গাওয়া তো ভালই।"

"মদ খেয়ে গান গাওয়া ভাল ?"

জবাব দিতে গিয়ে থামলাম। উপযুক্ত কথা খুঁজে পেলাম না।

বললাম, "আর তোমার মা কেমন আছেন ?"

দেবতোষ বলল, "ভাল।"

বলেই সে চলতে সুরু করল।

ডাকলাম, "শোন দেবতোষ, এসো আরো খানিক গল্প করি"—

না থেমেই দেবতোষ জবাব দিল, "না।"

তারপর সে চলে গেল। বুঝতে পারলাম যে ছেলেটা বদলে গেছে। বিজন মিত্তিরের মদ খাওয়াটা তার ছেলের মনে ক্ষতসৃষ্টি করেছে।

দেবতোষের সঙ্গে শেষ দেখা হয় আবার দেড় বছর বাদে। সেই বাগানেই। এবার সে আরো ঢ্যাঙ্গা হয়েছে, আরো বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে। সেদিন সে একটা গাছতলায় বসে ছিল। আমি ডাকতেই সেই ফ্যালফ্যাল চাউনি মেলে সে আমার দিকে তাকাল।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, "দেবতোষ, আজ তুমি পালালে চলবে না।"

দেবতোষ গম্ভীর গলায় বলল, 'পালাইনি তো।"

হেসে বললাম, 'ভালো, এবার তোমার কোন ক্লাস হল তাই বল—ক্লাস এইট্ না ?'

"না—ক্লাস সিক্স"—

"সেকি ! তোমার তো"—

"আমি দু'বার ফেল করেছি।"

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেবতোষ কি এত বোকা ছিল ?

তাকিয়ে দেখলাম যে সে মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি ভাবছ দেবতোষ ?"

"এ্যাঁ ! এমনি"—

"সত্যি কথা বল দেবতোষ"—

দেবতোষ এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে, একটু বোকাটে হাসি হেসে বলল, "আমার মেঘ হতে ইচ্ছে করে—সেই কথাই ভাবছিলাম।"

কৌতূহলী হলাম, "মেঘ হতে চাও কেন ?"

"এমনি—ভেসে যাব—দূরে—অনেকদূরে—"

সে সামনের দিকে তাকিয়ে আবার ভাবতে লাগল। আর আমি ভাবতে লাগলাম যে এই ছেলেটি বোধ হয় সেই দেবতোষ নয় যাকে আমি দিনের পর দিন দেশবিদেশের বিচিত্র গল্প শুনিয়েছি।

"দেবতোষ"—

"উঁ ?"

"আবার কি ভাবছ ?"

"ভাবছি না—দেখছি।"

"কি দেখছ ?"

"ঘাস।"

"তাতে কি দেখার আছে ?"

"গরু আর ছাগলেরা তো ঘাস খায়, না ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি যদি গরু আর ছাগল হতাম তাহলে ঘাস খেতাম খুব—আমার খুব ইচ্ছে করে"—

দেবতোষের কথা শুনে আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারলাম না। ছেলেটার যতই বয়স বাড়ছে ততই কেমন যেন—

"চলি।" দেবতোষের গলার আওয়াজ শুনে তাকাতেই দেখি যে সে চলে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছে।

আর ঠিক সেই সময়েই রামদেওকে সঙ্গে নিয়ে দেবতোষদের চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এল সেখানে।

'খোকাবাবু—শিগ্‌গীর বাড়ী চল খোকাবাবু—বা ফিট হয়ে গেছেন'—

দেবতোষ একবার বিমূঢ়ের মত আমার দিকে তাকিয়েই হন্‌হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। চাকরটা তার পেছু নিল।

রামদেও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মিস্তির সাহেব হার্টফেল করে মারা গেছেন হুজুর—নিশিবাবু আপনাকে ডাকছেন"—

নিশিকান্তের সঙ্গে বেরোলাম আমি। পাড়ার লোকেরা বন্ধুরা, বার এসোসিয়েশনের অনেকে এবং আমাদের ক্লাবের ছেলেরা সবাই জড় হল বিজন মিস্তিরের বাড়ীতে। খবর পেতেই অজয় গুপ্ত ছুটে এলেন গাড়ী নিয়ে। ভদ্রলোকের কি কান্না ? ওদিকে বাড়ীর ভেতরে সুরভি দেবীর মূর্চ্ছা একবার ভাঙতেই আবার মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ছেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সব যোগাড় করে বিজন মিস্তিরের শবদেহ ঘাড়ে নিয়ে হরিধ্বনি করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে দেবতোষকেও নিয়ে যাওয়া হল। ছেলেটা কাঁদছে না একটুও, শুধু ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে চলতে চলতে। শ্মশানে গিয়েও তার একই ভাব। যখন বাপের মুখে সে আগুন দিল তখনো সে নিঃশব্দ। ভাবলাম দেবতোষ এখন কি

ভাবছে ? এখনো কি সে ভাবছে যে সে গরু বা ছাগল হ'লে ঘাস খেত ? কিংবা সেকি এখন মেঘ হয়ে আকাশ বেয়ে দূরে দূরান্তরে ভেসে যেতে চাইছে ! চিতার আগুন জ্বলে উঠল। ঘণ্টা চারেক বাদে বিজন মিস্তিরের নশ্বর দেহ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর তখুনি দেবতোষকে একটু বিচলিত দেখেছিলাম। সে কেঁদেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করেনি।

অজয় গুপ্ত বিজন মিস্তিরের আদর্শ বন্ধুর মতই কাজ করলেন, খুব ধুমধাম করে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। শহরের সব গণ্যমান্য লোকদেরই নেমন্তন্ন করা হ'ল। আমাদের তো হাতে ধরে বিশেষ করে নেমন্তন্ন জানালেন—আমরা যে শ্মশানবন্ধু। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই গেলাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অজয় গুপ্তই সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বিজন মিস্তিরের ড্রয়িং-রুমে বিজন মিস্তিরের মস্ত বড় একটা ফটো টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। তাতে মোটা জুঁই ফুলের মালা, তার দু'পাশে ফুলদানে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। সামনে দু'টি ধূপদানে ধূপকাঠি জ্বলছে। দেখে বেশ ভালো লাগল।

যথাসময়ে আমরা গিয়ে খেতে বসলাম। আমার এক পাশে নিশিকান্ত, অন্যপাশে যতীন বোস নামক একজন কনট্র্যাক্টর। লোকটিকে সবাই রসিক বলে থাকে, আমার অবশ্য মনে হ'ত যে তার রসনা একটু অতিমাত্রায় ক্ষুরধার। আমাদের ক্লাবের সেও একজন মেম্বর এবং যে কোনও রকমের সিরিও-কমিক ভূমিকায় তার মত কেউ জমাতে পারেনা।

সবাইকে ডেকে ডেকে এনে বসাচ্ছিলেন অজয় গুপ্ত। আমরা তা লক্ষ্য করছিলাম।

আমি বললাম, "খুব খাটছেন মিঃ গুপ্ত।"

যতীন বোস বলল, "তা তো খাটবেই।"

বললাম, "তা বটে—বিজন মিস্তিরের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। এমন বন্ধুত্ব খুব কম দেখেছি।"

যতীন বোস চাপা গলায় বলল, "আপনার কথা শুনে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে ভরতবাবু—"

"কেন ?"

"আপনি কি কিছু জানেন না ?"

"কি জানব ? কোন্ কথা ?"

"যান মশাই—ন্যাকা সাজবেন না"

যতীন বোসের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখে আমার রাগ হল। আমি আর কথা বললাম না।

ঠিক এমনি সময়ে দেবতোষকে দেখতে পেলাম। ধুতি পাঞ্জাবী পরেছে সে আজ, মাথা মুড়োন। দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল। আহা, ছেলেটা এই বয়সেই বাপ হারাল !

দেবতোষ এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা ফ্যালফ্যাল চাউনি মেলে সবাইকে দেখছিল। এমনি সময়ে অজয় গুপ্ত তাকে দেখতে পেলেন ও তার কাছে গিয়ে বললেন, "দেবু তুমিও বসে পড় বাবা"—

দেবতোষ বলল, "আমি—না কাকাবাবু—আমি এখন—"

অজয় গুপ্ত বললেন, "না না—কথা শোন, রাত হয়ে যাচ্ছে, তুমিও বসে পড়ো—বি এ গুড বয়"—তিনি দেবতোষের হাত ধরে একটি চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

ঠিক সেই সময় গরম গরম লুচি এসে পাতে পড়ল। আমরা খাওয়া শুরু করলাম। দেবতোষও খেতে শুরু করেছে দেখতে পেলাম। খেতে খেতে ছেলেটা ভাবছে মনে হ'ল। কি ভাবছে সে ? মেঘ হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে যাওয়া ? গরু আর ছাগলেরা ঘাস চিবিয়ে যে স্বাদ পায় তার কথা ?

হঠাৎ যতীন বোসের ফিসফিস গলা আমার কানের পাশে ধ্বনিত হল।

"হ্যাঁ মশাই, ওই যে হাড়া-গাধা ছেলেটি খাচ্ছে ওটিই বিজনবাবুর ছেলে, না?"

সংক্ষেপে বললাম, "হ্যাঁ—"

যতীন বোসের গলায় একটা চাপা হাসির মত শব্দ হল. তারপর সে বলল, "খা বাবা খা, তোর মায়ের বৌভাত খা"—

চমকে উঠলাম। যতীন বোসের এই স্থূল ও অশ্লীল উক্তিকে খণ্ডন করার জন্য পাল্টা কথা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। পরিবর্তে আমার চোখের সামনে যেন সব ছেঁড়া ছবিগুলো জোড়া লেগে গেল। দেবতোষের বিবর্তন আর বিজন মিস্ত্রিরের মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই যেন এক সূত্রে গাঁথা মনে হল। হঠাৎ আমার পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।

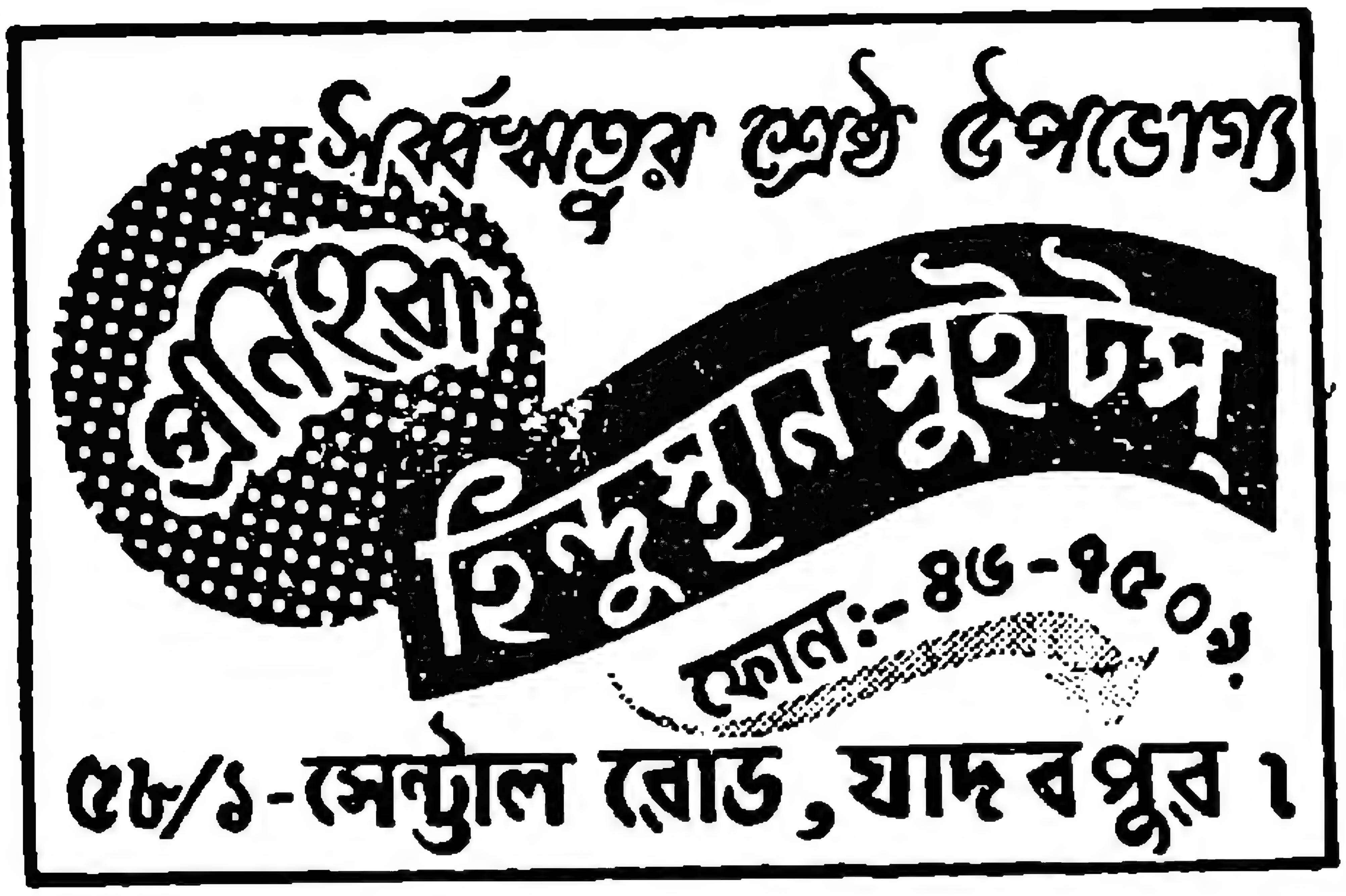

ভ্রম সংশোধন

"জয়শ্রী" আষাঢ় (১৩৭১) সংখ্যায় ১৬৭ পৃ: প্রথম কলম (পংক্তি ৪-৫) 'আদর্শ মানব রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ) মহাশয়ের সহিত শ্রীঅরবিন্দর 'মতভেদ'-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বামিজীর সহিত সাম্প্রতিক সাক্ষাতে জানিতে পারিলাম, শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-পথ ধরিয়া চলা মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইতে পারে মনে করিয়া তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সরাইয়া লইতেছিলেন। শ্রীপ্রমথনাথ তাহার পরেও জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সম্পাদকরূপে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্রব ত্যাগ করার কারণ, শ্রীঅরবিন্দর সহিত 'মতভেদ' নয়, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ত্তমানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কালীচরণ ঘোষ
২৯।৯।৬৪

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনিল রায়ের—দুইটি সময়োপযোগী বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"…সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বজগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তনব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

"… নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

(লেখকের ভূমিকা থেকে)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে : ৩১২, পাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Calcutta Industrial Chemicals & Minerals Co. Private Ltd.

43, DHARAMTOLA STREET,

CALCUTTA-13

Phone :
24-1004
24-1005

Grams :
"GANDHAK"
Calcutta.

Manufacturers of :

Glue : Aluminium, Calcium and Zinc Stearates : Copper, Lead, Cobalt and Manganese Naphthenates : White and Brown Factice, etc.

জয়শ্রী

CALCUTTA UNIVERSITY

২৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩৭১

সম্পাদকীয়

বিজয়ার শুভসম্ভাষণ

জয়শ্রীর সহানুধ্যায়ী পাঠক, গ্রাহক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সহযোগী বন্ধুদের বিজয়ার শুভ সম্ভাষণ জানাই। এবারে পূজার অবকাশে আন্তর্জাতীয় ও জাতীয় জীবনে এমন কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে ভারতের জাতীয় জীবনে। আগামী দিনগুলি ভারতের পক্ষে খুবই সংকটপূর্ণ। এই দুর্যোগের দিনে ভারতবাসী অপরাজেয় মনোবলে, সংহত জাতীয় শক্তিতে এবং সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্ভাব্য সংকটের সম্মুখীন হতে পারবে,—এই কামনা করি।

খাদ্যনীতির জোড়াতালি

গত জুনমাস থেকে খাদ্যসঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধির তীব্র আঘাতে জর্জরিত কেন্দ্রীয় সরকার নূতন খাদ্যনীতির আশ্বাস দিয়ে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত জনসাধারণকে শান্ত করবার চেষ্টা করে আসছেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের সুপারিশগুলি জুন-মাসের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীরা নস্যাৎ করে দিলে দেখা গেলো সেই সম্মেলন থেকে আগামী ফসলের জন্য খাদ্যশস্যের আশু মূল্যস্তর নির্ধারণ, উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্যশস্যের চূড়ান্তমূল্যস্তর নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ এবং খাদ্য-শস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসার জন্য একটি করপোরেশন গঠন—মাত্র এই কটি সিদ্ধান্ত দানা বাঁধলো। এর পরও ষ্টেট ট্রেডিং ও রেশনিং-এর শলাপরামর্শ চলেছে এবং বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সরকারী করায়ত্তে এনে মজুতদার মুনাফাখোরদের কোণঠাসা করার সঙ্কল্প মাঝে মাঝে সরকারী স্তরে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু গত ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে খাদ্যনীতি সংগঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে।

ষ্টেট ট্রেডিং দূরে থাক, আগামী দুই-তিনমাসে খাদ্যসঙ্কট এড়াবার জন্য ন্যূনপক্ষে বড় বড় শহরগুলিতে রেশনিং প্রবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সতর্ক প্রস্তাবও মুখ্যমন্ত্রীরা গ্রাহ্য করে নাই। এবার প্রচুর ফসল হবে, সুতরাং রেশনিং কেন, কালোবাজারী ব্যবসায়ীচক্রের এই সুরে সুর মিলিয়ে কোন কোন মুখ্যমন্ত্রী রেশনিং-এর বিরুদ্ধে ওজর তুলেছেন। রেশনিং-এর পরিমাণ

সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন ... প্রকাশ করার ফলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে ... নাই। কেউ দৈনিক বার আউন্স বলেছেন, কেউ চৌদ্দ, কেউবা আরও বেশী সুপারিশ করেছেন। 'খাদ্য এলাকা' সম্বন্ধেও নানামুনির নানা মত। বাড়তি এলাকার যারা, তারা চেয়েছেন এক একটি বাড়তি এলাকা নিয়ে একটি খাদ্যাঞ্চল হোক এবং সেই অঞ্চলের যেটুকু উদ্বৃত্ত—তার বেশী নয়—সরকারী স্তরে ঘাটতি এলাকায় রপ্তানি হউক। ঘাটতি এলাকার মুখ্যমন্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট বাড়তি এলাকার সঙ্গে জোট বেঁধে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন। প্রচুর মজুদ খাদ্যতহবিল ব্যতিরেকে রেশনিং কার্যকরী করতেও কোন কোন মুখ্যমন্ত্রী ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ফলে গুণ্টুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন পর্যন্ত, যে-সময় মুখ্যমন্ত্রীরা পুনরায় মিলিত হবেন, সকল সিদ্ধান্তই স্থগিত রয়েছে। মুখ্য-মন্ত্রীদের দিল্লীর সাম্প্রতিক আলোচনায় ভারতবর্ষের সামগ্রিক সত্তা গৌণ হয়ে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কেরালায় ঘরোয়াভাবে রেশনিং করা হবে—এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তের বাইরে তারা অগ্রসর হতে পারেন নাই।

পশ্চিম বাংলার সরকারও তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সবেগে পশ্চাদপসরণ সুরু করেছেন। মজুতদারীর ও মূল্য-বৃদ্ধির দিনগুলিতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয়করণের স্তোকবাক্যে সরকার বিক্ষুব্ধ জনতাকে আশ্বস্ত করে নূতন ফসল আমদানীর মুখে মিথ্যার আবরণ অনাবৃত করে সরকার রাষ্ট্রীয়ত্বকরণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। তারা এখন কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং সুরু করার জন্য তৈরী হলেও সরাসরি প্রকিওরমেন্ট থেকে বিরত থাকবেন; চালকলগুলির উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ লেভী করে প্রয়োজনীয় মজুত গঠন করবেন। কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ও অন্যান্য এলাকায় মডিফায়েড রেশনিং-এর ঝুঁকি নেবার জন্য ১০ লক্ষ টন চাল চাই। এই চালের মধ্যে চালকলগুলি থেকে ৬ লক্ষ টন ও রাজ্যবহির্ভূত অঞ্চল থেকে ৪ লক্ষ টন যোগান চাই। কিন্তু চালকলগুলির ওপর লেভী থেকে ৬ লক্ষ টন চাল পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? চাল কলে ধান পৌছাবার আগেই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান সুরঙ্গ পথে কালোবাজারে চালান হবে, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে নিঃসংশয়ে এই অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং, সরাসরি প্রকিওরমেন্ট-নিরপেক্ষ রেশনিং মাঝপথে অচল হয়ে পড়বার গুরুতর সম্ভাবনা থাকবে। অতঃপর, মুনাফাখোর-মজুতদার-চক্রের আঘাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জোড়াতালি দেওয়া খাদ্যনীতি চুরমার হয়ে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্গতির মুখে ঠেলে দেবে।

মজুতদারদের কঠোরতম শাস্তি চাই

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে মুনাফাখোর ও মজুতদারদের কঠোর শাস্তিবিধানের যে আভাস শ্রীশাস্ত্রী দিয়েছিলেন, একটি অর্ডিনান্সের বলে অত্যাবশ্যক দ্রব্য আইন সংশোধন করে, কেন্দ্রীয় সরকার তা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই আইনের বৈশিষ্ট্য ত্বরিত-বিচার, অন্যূন একমাসের কারাবাস ও দুইহাজার টাকা জরিমানার ক্ষেত্রে কোনো আপীলের সুযোগ থাকবে না। গত আগষ্টমাসেও শ্রীশাস্ত্রী মজুতদার-কালোবাজারীচক্রকে পনের দিনের সময় দিয়ে কঠোর শাস্তিবিধানের ভয় দেখিয়েছিলেন। এতো শাসানির পর এই আইন পর্বতে মূষিক প্রসবেরই সামিল। এই আইনের বলে প্রাপ্ত-ক্ষমতা, অনায়াসে ভারত রক্ষা আইন বলেই বহুপূর্বে ব্যবহার করে মজুতদার কালো-বাজারীদের শায়েস্তা করে মূল্যবৃদ্ধিরোধে সরকারী তৎপরতা না দেখিয়ে এ-যাবৎ এদের সঙ্গে সহ-অবস্থান নীতিই সরকার গ্রহণ করে এসেছেন। তাছাড়া নতুন আইনে দণ্ডের কঠোরতার একান্ত অভাব। সুতরাং জনসাধারণ এই আইন প্রনয়ণে আদৌ আশ্বস্ত হতে পারবে না।

চতুর্থ পরিকল্পনার দায়িত্ব

গত ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন, লক্ষ ও কৌশল আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ২১,০০০ কোটি থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় হবে এবং ১৯৬৬-৭১, এই পাঁচ বছরের পর্যায়ে আর্থিক স্থিতির বৃদ্ধির (Growth Rate) পরিমাপ বাৎসরিক শতকরা ৬.৫ হারে নির্ধারিত হবে। সভায় চারটি সাব কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ; ১) সম্পদ সংগ্রহ ২) কৃষি, ৩) শিল্প, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ৪) সমাজসেবা-মূলক উদ্যোগ। কৃষি বাদে অন্য তিনটি কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সদস্য নিযুক্ত হয়েছে।

উন্নয়ন পরিষদের আলোচনা উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দুইটি নূতন কথা বলেছেন ১) সাধারণ মানুষের বঞ্চনা লাঘব করবার জন্য সুতীকল, চিনির কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, ও ওষুধপত্র জাতীয় মৌলিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদক শিল্প, সরকারী ব্যবস্থাপনায় (পাবলিক সেক্টর) গঠন করতে হবে, ২) পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ গঠিত হবে। সর্বক্ষণের জন্য প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা এই পরিষদের সদস্যভুক্ত হবেন। স্থির মূল্যস্তর, বর্দ্ধিত উৎপাদন ও প্রশাসনিক উন্নতির মধ্যে সংহতি স্থাপনের উপরও প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন। এধরণের সংহতির অভাবে পরিকল্পনা বানচাল হবে।

শ্রীশাস্ত্রী তাঁর ভাষণে ভারতবর্ষে পরিকল্পনার উৎস-সন্ধানে পরিকল্পনার ভাগীরথরূপে শ্রীনেহেরুর স্থান নির্দিষ্ট করে বলেছেন সুভাষবাবুর কংগ্রেস সভাপতিত্বের আমলে এই কাজ সুরু হয়। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাঁর হরিপুরা ভাষণে ভারতে পরিকল্পনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তার অব্যবহিত পরেই শ্রীজহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। সে-দিন থেকেই ভারতে পরিকল্পনার মানসিকতার সুরু।

পাবলিক সেক্টরের স্ফীতি ও সোস্যালিজম সমার্থক, এ ধরণের একটি অসতর্ক উক্তিও শ্রীশাস্ত্রী করেছেন। সমাজবাদের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কও যেমন অন্তরঙ্গ, বণ্টনের ব্যবস্থাপানাও তেমনি অনিবার্য। সুতরাং উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার রকম ফেরে সমাজবাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে এ ধরণের ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি করা অত্যন্ত অসমীচীন। সম্পদ ও আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার মধ্যেই সমাজবাদের ভিত্তিভূমি নিহিত রয়েছে,-জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে সে-সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেখা গেলো না। যদিও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী অশোক মেহতাকে বলতে শোনা গেছে ; "If Socialism is our objective, it has to be revealed in the economy."

শ্রীঅশোক মেহতা অবশ্য একটি আশ্বাস দিয়েছেন, চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে কোনো ডেফিসিট্ ফিনানসিং হবে না এবং মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাকেও দাবিয়ে রাখতে হবে। এই সঙ্কল্প অবশ্যই সাধু. কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হবে? অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেছেন কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত তিন হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করতে হবে। এ ছাড়া প্ল্যান বহির্ভূত টাকার দায়ও রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার পরিমাপ তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণ, প্রথম তিনটি পরিকল্পনার পরিমাপের সমষ্টির সমান। এই পরিকল্পনার পরও পূর্ণ কর্মসংস্থান, জীবন মানের উন্নয়ন ও স্বয়ংচালিত আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের মধ্যেও পৌঁছান যাবে না।

প্ল্যানিং কমিশন পরিকল্পনা রূপায়নে বারদফা ত্রুটির উল্লেখ করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় একটি নোট দাখিল করেছিলেন। পরিকল্পনার লক্ষ্যের ও নীতির এই বৈপরীত্যের

ক্রমবৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আত্মসমালোচনা প্রশংসনীয় উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের এবং সরকারের এই দিব্যজ্ঞান আরও কয়েকটি বছর আগে উন্মীলিত হলে, পরিকল্পনার সার্থকতা যাচাইয়ের সুষ্ঠু সুযোগ পাওয়া যেতো, যা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার বিরাট অঙ্ক সাধারণ মানুষের উদ্যম ও উৎসাহের চাইতে আতঙ্কই সৃষ্টি করবে বেশী, যতক্ষণ না তাদের ব্যবহারিক জীবনে বৈষম্য, বঞ্চনা, বেকারী ও দারিদ্র দূর না হচ্ছে।

উড়িষ্যার ছাত্র-বিক্ষোভ

সর্বৈব অরাজনৈতিক কারণে উড়িষ্যায় যে ছাত্র-বিক্ষোভ কিছুকাল পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, অল্পকালের মধ্যেই তা ছাত্র-বিদ্রোহের এবং পরিশেষে সরকারবিরোধী অন্তর্বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে যে বিক্ষোভের সুরু, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়। কটক, পুরী, বালেশ্বর ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, সম্বলপুর জেলায় এই দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। থানা, সরকারী অফিস, মন্ত্রীদের ও শাসক-দলের সদস্যদের এবং সমর্থকদের বাড়ী আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়, নির্বিচার অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া এবং সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। এই আন্দোলনের মুখে পুলিশের গুলিতে অন্তত চারজন নিহত হয়। হাজার হাজার ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিরোধী দলের মধ্যে গোড়ায় সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাদের এবং পরে অন্যান্য দলের সদস্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মন্ত্রীসভা থেকে এদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এস, এস, পির বিরুদ্ধে এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব ও অন্যান্য বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে এই হাঙ্গামায় উস্কানি দেবার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক-দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের পরই উড়িষ্যায় এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। উড়িষ্যায় খণ্ড বিদ্রোহের কারণ নির্ণয়ে যদি এই কমিশন সক্ষম হয় তবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে পুঞ্জীভূত বারুদস্তূপের প্রকৃতিগত অবস্থান জানা যাবে এবং সেই সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির নিরিখে অন্যান্য রাজ্যের সুপ্ত সঙ্কটও অনাবৃত হবে। তবে পরিস্থিতির অনুসন্ধান-নিরপেক্ষ সত্য হল এই যে উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা অমর্যাদার ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে,—তারা শাসনের নৈতিক অধিকারচ্যুত।

দণ্ডকারণ্যের সঙ্কট

দণ্ডকারণ্যের জন্মলগ্ন থেকে যে প্রশাসনিক সঙ্কট এই সংস্থাটির শ্বাসরোধের উপক্রম করেছিল, স্বর্গত সুকুমারের সেনের সভাপতিত্বে তা দূর হয়ে সংস্থাটি পুনর্জন্ম লাভ করে। তারই ফলবর্তী হয়ে যখন প্রখ্যাতনামা প্রাক্তন আই, সি, এস শ্রীশৈবাল কুমার গুপ্ত দণ্ডকারণ্য সংস্থার ভার নিলেন, তখন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদরদীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—অবশেষে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তারা বুঝিবা নূতন জীবনারম্ভের সুযোগ পেলেন। কিন্তু, অল্পকালের মধ্যে এই সুদক্ষ, সৎ ও প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবসর প্রাপ্ত আই. সি, এসকেও হার মেনে বিদায় নিতে হয়েছে। শ্রীগুপ্ত বিদায় নেবার পূর্বে পুনর্বাসন মন্ত্রীর নিকট দণ্ডকারণ্য সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে গেছেন এবং দণ্ডকারণ্যে কৃষিতে যে পুনর্বাসনের যে নীতি অনুসৃত হচ্ছে, সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তার অসারতা সপ্রমাণ করে গেছেন বলে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কোটী কোটী টাকার অপচয়ের পর যদি কৃষিতে পুনর্বাসন অর্থনীতিসম্মত না হয়, তবে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমরা অবিলম্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন দ্বারা শ্রীগুপ্তের অভিযোগের তদন্ত দাবী করছি।

পাকিস্তানে নির্বাচন

মার্শাল আয়ুব হয়তো স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারেন নি যে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে এবং চার বছর সামরিক শাসনে থাকার পরে পাকিস্তানের জনতা এরূপ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় আয়ুব-বিরোধী ধ্বনিতে গর্জে উঠতে পারে। আওয়ামী লীগ, ন্যাসন্যাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিলার মুসলীম লীগ, নিজামে ইসলাম এবং জামাত ইসলাম যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে কনভেনসন লীগপন্থী আয়ুবের বিরুদ্ধে পাক-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জিন্নার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও কনিষ্ঠ সহোদরা মিস ফতেমা জিন্নাকে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। পূর্ব বাংলায় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীদের সমবায়ে গঠিত ন্যাসন্যাল ডিমোক্র্যাটিক ফ্রণ্টও ফতেমা জিন্নাকে সমর্থন জানিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও ভাওয়ালপুর এক ইয়ুনিটের বিরোধী বলে আয়ুবেরও বিরোধী। পাঞ্জাব মোটামুটি আয়ুবের সমর্থক। পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে মিস জিন্না বিরাট সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে গত ১৫ই অক্টোবর থেকে মাত্র ৮ দিন সফরে যে জনসম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন তা' অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব। জনসমুদ্র শব্দটি যে শুধু একটি কাব্যিক উপমা নয়—এবারে ফতেমা জিন্নার নির্বাচনী অভিযানে সেকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিস জিন্না যেখানেই গেছেন লক্ষ লক্ষ জনতা তাকে সমর্থন জানিয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, যেখানে গভর্নার ও সরকারী আমলা-তন্ত্রেরাও, আয়ুবের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার সুরু করেছেন, সেখানে নির্বাচনের ফলাফল যে কি হবে সেকথা বলা যায় না। কিন্তু একটি ডিকটেটোরিয়েল দেশে এরূপ জন-জাগরণের তাৎপর্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় নয়। জয়ে বা পরাজয়ে আয়ুবের ভবিষ্যত যে অন্ধকার এবং পাকিস্তান বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তান যে গুরুতর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তণের সম্মুখীন এবং অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান থেকে যে বৃহৎ ঘটনা আশা করা যায়—সেই ভবিষ্যবাণী করা কষ্টকর নয়। দুর্ভাগ্য আমাদের ওপারের প্রচণ্ড জনজাগরণ সম্বন্ধে এপারে চৈতন্য নেই।

ভারত-সিংহল চুক্তি

সিংহলে ভারতীয়দের দীর্ঘকালব্যাপী অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে গত ২৯শে অক্টোবর দুই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যস্থতায় দিল্লীতে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিংহলে অবস্থিত দশার লক্ষ চল্লিশ হাজার ভারতীয়দের মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার জন সিংহলী নাগরিকরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। আলোচ্য নয় লক্ষ পচাত্তর হাজার জনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৫২৫,০০০ জন ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হবে এবং আগামী ১৫ বছরের মধ্যে তাদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ৩০০,০০০ জন সম্পর্কে মীমাংসার জন্য অদূর ভবিষ্যতে কলম্বোতে দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হবে।

ভারত-সিংহল সম্পর্কে এই সমস্যা দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষত সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষাক্ত করে রেখেছিল। সিংহলে ভারতীয়দের অধিকাংশই তামিলভাষী – এই সমস্যার সমাধানের পর দুই দেশের সম্পর্কে প্রভূত উন্নতি আশা করা যায়। একথা ঠিক এই ব্যবস্থার ফলে যে সোয়া পাঁচ লক্ষ লোক সিংহল থেকে উৎপাটিত হয়ে আগামী পনের বছরে ভারতে ফিরে আসবে তাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। এই নতুন ধরণের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন শুধু মাদ্রাজের সমস্যা হবে না, জাতীয় সমস্যারূপে বিবেচিত হবে, এই প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এবং যদিও এরা সিংহল থেকে তাদের বিষয় সম্পত্তির একটা বড় অংশ অনূ্যন চারহাজার টাকার

—সঙ্গে আনতে পারবেন এবং সিংহলের কর্মসংস্থান সে দেশে থাকাকালীনন ভোগ করতে পারবেন, তবুও উদ্বাস্তু জীবনের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মন্দভাগ্য তাদের বহন করতেই হবে—পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের অবস্থার অভিজ্ঞতাই এ-বিষয়ে যথেষ্ট।

পূর্বপাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেমন, সিংহল, বর্মা প্রভৃতি অঞ্চলের ভারতীয়রাও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থ নীতির বলিস্বরূপ। এদের সাধ্যমত স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ভাষাগত, সম্প্রদায়গত কিম্বা শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা নীতি যেন সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত না করে।

ক্রুশ্চেভের অপসারণ

ক্রুশ্চেভের আকস্মিক অপসারণে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত ও আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ক্রুশ্চেভ কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট জগতের সম্পর্ককে অনেকখানি সহজ করে তুলেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে রাশিয়া যে শান্তিকামী ও সহ-অবস্থানের নীতিতে আস্থাবান তিনি বৃহত্তর বিশ্বে সেই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে বর্তমান বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল। ক্রুশ্চেভ এই সম্পর্ককে শান্তি ও আপোষরফাপন্থী করে তোলার চেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। বর্তমান রুশনেতৃত্বের আশ্বাস সত্বেও একথা বলা যায় যে ক্রুশ্চেভ-নেতৃত্বের অপসারণে বিশ্ব শান্তির ভবিষ্যত অনেকখানি অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং ভারত-চীন সম্পর্কে ভারত রাশিয়ার সহানুভূতিশীল নীতির সহায়তা থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হবে। ভারতের ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ পতনের তাৎপর্য এই যে ভারতকে কঠোরভাবে সতর্ক ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।

পদচ্যুত নিকিতা ক্রুশ্চেভের পক্ষে এইটুকু সান্ত্বনা যে তিনিই প্রথম কম্যুনিষ্ট যার প্রতি অকম্যুনিষ্ট জগতের মন দরদী হয়ে উঠেছিল এবং যার পতনে বৃহত্তর বিশ্ব আন্তরিক-ভাবে দুঃখবোধ করেছে।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ

সমগ্র এসিয়াবাসীর উদ্বেগ ও নিষেধ সত্বেও কম্যুনিষ্ট চীন পারমাণবিক বারুদ বিস্ফোরণ করেছে। চীন যে পারমাণবিক বারুদ বিস্ফোরণ করেছে তা' হাইড্রোজেন বোমার বারুদ নয়,—অ্যাটম বোমার বারুদ। অ্যাটম বোমার বিধ্বংসী-ক্ষমতা সীমাহীন নয় কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার বিনাশ ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা-নেই। অবশ্য, এই অ্যাটম বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতাও এত যে একটি বোমায় হিরোসীমার প্রায় ৭৫ হাজার লোক নিহত হয় এবং আহত হয় সম-পরিমাণ। বর্তমান উন্নত সংস্করণে হিরোসীমা বোমার চেয়ে আড়াইগুণ উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু বোমা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হিরোসীমা বোমার চেয়ে সেই সঙ্গে প্রায় আড়াইগুণ বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে এবং রাশিয়া ও আমেরিকার অস্ত্রাগারে তা' প্রচুর পরিমাণে মজুদ আছে।

চীন মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়াম বিদীর্ণ না করে ইয়ুরেনিয়ামের ২৩৫ ওজনের হালকা পরমাণু বিদীর্ণ করেছে। ইহার অর্থ ভারী ইয়ুরেনিয়াম থেকে হালকা ইয়ুরেনিয়াম বাছাইয়ের জটিল পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্ত চীন গবেষণাগার স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। রি-অ্যাকটারের সাহায্যে কৃত্রিম মৌল প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করা সহজ কিন্তু ইয়ুরেনিয়াম ২৩৫ সংগ্রহকরা ব্যয় সাধ্য ও কষ্টকর। চীন যদি প্লুটোনিয়ামের পরিবর্তে ইয়ুরেনিয়ামের বারুদ ব্যবহার করে থাকে তা' হলে এধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে যে রাশিয়া চীনকে যে পাঁচটি রি-অ্যাকটর দিয়েছে হয় সেগুলির অধিকাংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে, অথবা এদের প্লুটোনিয়াম উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। আরও লক্ষ্যের বিষয় যে চীন এখন হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে সক্ষম হয় নি।

চীন যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তার ফলে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে চীনের কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং এশিয়ার চীন সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলিতে চীনের কূটনৈতিক কর্তৃত্ব প্রবলতর হবে। চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ভারতেও পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক ছাড়া সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে নিজের নির্মিত পরমাণু বোমার কার্যকরী মূল্য খুব বেশি হবে না। সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং বলিষ্ঠ সংকল্পে ভারত আন্তর্জাতীয় ক্ষমতার ভারসাম্য সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হলে চীনের পারমাণবিক হুমকি রোধ করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হবে না। পরমাণু বোমা উৎপাদনের কর্মসূচী গৃহীত হলে ভারতীয় অর্থনীতির উপরে এমন প্রচণ্ড চাপ পড়বে যে ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। পরমাণু বোমা নির্মাণের পরিবর্তে ভারত যদি কঠোর সংকল্পে উন্নয়নমূলক ও সমাজবাদী অর্থনীতির ভিত দ্রুতগতিতে গড়ে তুলে ভারতের দারিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান করে তবে তাই হবে চীনের পরমাণু বিস্ফোরণের যোগ্য উত্তর।

বৃটেনে শ্রমিকদলের জয়

বৃটেনে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে সমাজবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী বৃটিশ লেবার পার্টি ক্ষীণ সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়েছে। লেবার পার্টির আসন সংখ্যা ৩১৭, কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল দলের ৩০৪, উদারনৈতিক দলের বা লিবারেল পার্টির সংখ্যা—অর্থাৎ লেবার পার্টি মাত্র ৪টি আসনের সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রীত্ব গঠন করেছে। নতুন মন্ত্রীসভায় লেবার পার্টির প্রায় এক তৃতীয়াংশ সভ্যকে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই মন্ত্রীত্বের পক্ষে বৃহৎ সিদ্ধান্তের ঝুঁকি নেওয়া সহজসাধ্য হবে না। তবুও নতুন মন্ত্রীসভা প্রবল উৎসাহে নির্বাচনীয় প্রতিশ্রুতি পালনের সংকল্প করেছে। এরূপ নীতির ফলে ভোটদাতাদের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হলে সুযোগমত সময়ে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করে শ্রমিক দল সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারবে।

যুদ্ধের পরের আটলী মন্ত্রীসভার পরে এই প্রথম সমাজবাদী লেবার মন্ত্রীসভা গঠিত হলো। রক্ষণশীল দলের তুলনায় সমাজবাদী শ্রমিক দল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ থেকে, সব সময়েই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের পতনের ফলে আন্তর্জাতীয় রাজনীতির সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৃটেনের শ্রমিক সরকারের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা এবং বৃটেনের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করা উচিত। কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধেও শ্রমিক দলের নীতি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে বলে আশা করা যায়

আমরা সমাজবাদী শ্রমিকনেতা ও বৃটেনের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই।

কায়রোর জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন

অক্টোবর মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী প্রথম যোগদান করলেন। চীনা-আক্রমণের পরে এসিয়া ও আফ্রিকায় ভারতের মর্যাদা কতখানি লাঘব হয়েছে এবারের জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সে কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। জোট নিরপেক্ষতার নীতি নির্ধারণে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান যে চীন নীতি ঘেঁষা বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করেছিলেন সম্মেলনে তা গৃহীত হয়নি, এটা ভারতের পক্ষে অনেকটা মর্যাদাকর। কিন্তু পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য চীনের কাছে আবেদন জানাবার যে প্রস্তাব ভারতের প্রধানমন্ত্রী রেখেছিলেন সে সম্বন্ধে সম্মেলনে সমর্থন-

সূচক মত সৃষ্টি হয় নি। সম্মেলনে অনুপস্থিত থেকেও চীনের অশরীরী কায়া কায়রোর সম্মেলনে উপস্থিত এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক প্রতিনিধির উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মধ্যেগুলির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সাহায্য ও সহযোগিতা বিনিময়ের প্রস্তাবটির মূল্য হবে যদি একে কার্যকরী করা সম্ভব হয়। জোট-নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ও বিবৃতির নৈতিক মূল্যও এইটুকু হবে যে পৃথিবীর রাজনীতি একেবারে দু'টি শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে না। এই জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদানে ভারতের পক্ষে এইটুকু লাভ হয়েছে যে মশর-রাষ্ট্রপতি নাসার এবং যুগোশ্লাভ-প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে শ্রীশাস্ত্রীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে এবং ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রী এই সুযোগে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠির নেতাদের সঙ্গে চেনা-জানার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু একটি কথা সুস্পষ্ট যে ইজরাইল সম্পর্কে সংযুক্ত আরবকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া সত্ত্বেও চীন সম্পর্কে ভারত সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র অথবা অন্যান্য জোট-নিরপেক্ষ এশিয়ান বা আফ্রিকান রাষ্ট্রের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সংহতিই যে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে সহানুভূতি লাভের প্রধান ভিত্তি সেকথা কায়রো সম্মেলন থেকে ভারতীয় নেতৃবর্গের গ্রহণ করা উচিত।

নেহেরু নামাঙ্কিত মুদ্রা

ভারত সরকার নেহেরুর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনে উদ্যোগী হয়ে দল ও নেতাকে রাষ্ট্রের উর্ধে স্থান দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তা ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের দুর্দিনের ইঙ্গিতই বহন করে আনবে। জাতীয় সংগ্রামের অন্যতম পুরোধারূপে ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে শ্রীজহরলাল নেহেরুর অনস্বীকার্য আসন চিহ্নিত হয়ে আছে। এই নজীরে যদি নেহেরু নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করতে হয় তবে জাতীয় সংগ্রামের অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের নামাঙ্কিত মুদ্রাই বা প্রচলন হবে না কেন? কারণ নেহেরুর সমকক্ষ তো বটেই, বিপ্লবীর দুর্জয় সঙ্কল্পে নেহেরুর চাইতেও অনন্য সাধারণ নেতৃত্ব সেদিন জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাদের স্থান ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে। যদি দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে জাতীয় সংগঠনের দায়িত্ব বহন করার জন্যই তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার বোধ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামাঙ্কিত মুদ্রাই বা কেন প্রচলিত হবে না? তাছাড়া, নেহরু-উত্তর ভারতে দেশের সঙ্কট-সঙ্কুল আন্তর্রাষ্ট্রিয় ও বৈষয়িক পরিস্থিতিতে নেহেরু-শাসনের মূল্যায়ন নিয়েও যেখানে গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছে সে-অবস্থায় নেহেরু-নামাঙ্কিত মুদ্রা, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার তাৎপর্যের পরিবর্তে, তার নেতৃত্বের ব্যর্থতার উপাদানের চারপাশে বিতর্কের ঝড় তুলবে।

সব চাইতে গুরুতর প্রশ্ন হল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নামে কোনো মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে যে-সময় প্রস্তাব এসেছিল, স্বয়ং নেহেরুই তখন সঙ্গতভাবেই প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। আজ নেহেরু—উত্তর প্রশাসনিক নেতৃত্ব সে-কথা ভুলে গিয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন, ব্যক্তিপূজার সেই সঙ্কীর্ণ পথে এক-তান্ত্রিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে প্রচণ্ড আঘাত হানবে।

৬. ১১. ৬৪.

ক্রুশ্চেভ-পতন, বিশ্বকম্যুনিজম ও ভারতবর্ষ

সমর গুহ

ক্রুশ্চেভের পতনে অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্ব যেভাবে দুঃখিত, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়েছে তার আগে কোন কম্যুনিষ্ট নেতার পতন, অপসারণ বা মৃত্যুতে কম্যুনিষ্ট জগতের বাইরের বিশ্ব এতখানি মর্মাহত বা চিন্তিত হয়নি। নিঃকিতা ক্রুশ্চেভ প্রথম ভাগ্যবান কম্যুনিষ্ট যিনি অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্বের জনতার মনে অনেকখানি আশা, বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও দরদের স্থান লাভ করেছিলেন। ক্রুশ্চেভ কম্যুনিজমের পক্ষ ছেড়ে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের দিকে সরে যাচ্ছিলেন,—অকম্যুনিষ্ট জগতের কেউ সে কথা ভাবেনি। কিন্তু স্ট্যালিনের অবদানে এবং মাউ-সে-তুঙের যুগে কম্যুনিষ্ট জগত যে বিশ্ববাসীর কাছে এক চরম বিভীষিকার প্রমূর্তি হয়ে উঠেছিল, ক্রুশ্চেভ কম্যুনিজমের সেই ত্রাসের চিত্র সম্পর্কে বহুলাংশে ভীতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট জগতের মধ্যে যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও শত্রুতার কালো-পর্দা ষ্ট্যালিন টানিয়ে দিয়েছিলেন এবং যে পর্দা রক্ষকের কর্তৃত্ব নিয়েছেন এখন মাউ-সে-তুঙ ক্রুশ্চেভ সেই কালো পর্দাকে অনেকখানি হাল্‌কা করে দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

অ-কম্যুনিষ্ট জগতের প্রতিক্রিয়া

সাধারণত মানুষের কাছে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি যে এখন দুর্জ্ঞেয় রহস্যের 'মানুষ খেকো' দেশ নয় এবং কম্যুনিষ্ট দেশের মানুষের কাছে পশ্চিমী দেশগুলিও যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে হত্যা করার জন্য স্বতঃ উদ্যত হয়ে নেই,—ক্রুশ্চেভ কম্যুনিজম ও পশ্চিমী গণতন্ত্রকে বোঝাপড়ার এমন একটি পথে অনেকখানি এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্বের সামনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট জগতের পক্ষে পরস্পরের পাশাপাশি বাস করা সম্ভব। সারা পৃথিবীর বুকে প্রলয়-নৃত্যের আসর জমাবার জন্য যেখানে প্রচুর অংকে পারমাণবিক বিস্ফোরক মজুদ, সেখানে বিশ্ববাসীর মনে এই আশা সৃষ্টি হয়েছিল যে ধ্বংসের দুন্দুভিতে ক্রুশ্চেভ অন্তত নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রথম ঘা' দিবেন না। তাই, কিউবা থেকে পারমাণবিক ঘাটি অপসারণের ঘটনা, যা আপাত-দৃষ্টিতে, ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের পরাজয় ও রাশিয়ার পক্ষে লজ্জাকর পশ্চাদপসরণ বলে বিশ্বের কাছে আখ্যাত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই ঘটনা ক্রুশ্চেভের ললাটে কলঙ্কের কালিমা লেপে দেওয়ার বদলে নৈতিক জয়ের তিলক পরিয়ে দিয়েছিল। আসন্ন বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্তি দিয়ে—দি গ্রেট ডিফেণ্ডার অব পীস—শান্তির মহান রক্ষকের সম্ভাষণ লাভ করেছিলেন ক্রুশ্চেভ বিশ্বের কাছ থেকে। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে রাশিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষা করবে, কম্যুনিজম ও অকম্যুনিজমের মধ্যে বিভীষিকার সম্পর্ক হ্রাস করবে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা ও সহ-অবস্থানের নীতি স্বীকৃত হবে কৃষ্টি-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহযোগিতা ঘনীভূত হবে,—এমনি একটি বিশ্বাসের ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন ক্রুশ্চেভ অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্ববাসীর কাছে। বিশ্বের প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি-রাষ্ট্রের মধ্যে একটির সর্বোচ্চ নায়ক হয়েও ক্রুশ্চেভ যেভাবে সারল্য ও অমায়িকতার মানবিক

অভিব্যক্তিতে নিজেকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তার ফলে ক্রুশ্চেভ বিশ্ববাসীর শুধু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই নয়,—অনেকখানি দরদও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই,—অকম্যুনিষ্ট বিশ্ব ক্রুশ্চেভের আকস্মিক পতনে স্তম্ভিত হয়েছে, বিস্মিত হয়েছে এবং প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে। কোন কম্যুনিষ্ট নেতার জন্য অ-কম্যুনিষ্ট জনসাধারণের এমন বেদনা ও মমতা আগে আর দেখা যায় নি।

কম্যুনিষ্ট জগতের প্রতিক্রিয়া

কম্যুনিষ্ট চীন ও চীনপন্থী মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিও কম আশ্চর্য এবং চিন্তান্বিত হয়নি ক্রুশ্চেভের আকস্মিক অপসারণে গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের রীতি অনুযায়ী রাশিয়ার বা অন্য কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনেতার পতন উপলক্ষে কোন সমালোচনাই হয়নি, কিন্তু ক্রুশ্চেভ পতনে ইয়ুরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে এবং প্রায় সমস্বরে ক্রুশ্চেভ-অপসারণের পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছে। ক্রুশ্চেভের আমলে ষ্ট্যালিনবাদের নৃশংসতা বহুলাংশে দূর হয়েছে, পূর্ব ইয়ুরোপের-রাষ্ট্রগুলির উপরে রাশিয়ার তাবেদারী অনেকাংশে লাঘব হয়েছে, জাতীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ অনেকাংশে পূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পূর্ব ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি সক্ষম হয়েছে, কম্যুনিজম পূর্ব ইয়োরোপে অনেকখানি উদারনৈতিক হয়েছে এবং বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হলে পূর্ব ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলিই যে প্রথম ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে ক্রুশ্চেভের শান্তি ও সহ-অবস্থানের নীতির সঙ্গে সেই আশঙ্কা থেকে তারা অনেকখানি মুক্তি পেয়েছে। পূর্ব ইয়োরোপে এখনও রুশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, —তাই ক্রুশ্চেভের পদচ্যুতিতে ষ্ট্যালিনের ভূত আবার সশরীরী হয়ে পূর্ব ইয়োরোপের কাঁধে চেপে বসে কি না সেই আশঙ্কায় ইয়োরোপীয়ান কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

যে দেশে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই সব রুশপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যেও ক্রুশ্চেভ বিদায়ে এজন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে যে রাশিয়ার এরূপ নীতির ফলে রুশ-চীন দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মর্য্যাদাই যে হ্রাস পাবে শুধু তাই নয়,—এসব দেশের চীনপন্থী উপদলগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠে বর্তমান নেতৃত্বকে দুর্বল করে অপসারিত করার চক্রান্তেও কার্যকরী হয়ে উঠবে। একথা অনস্বীকার্য যে ক্রুশ্চেভ-পতনের লৌকিক অর্থ মাউ-সে-তুঙের কাছে রাশিয়ার নৈতিক আত্মসমর্পণ। অন্তত, ক্রুশ্চেভ-পতনের ফলে বিশ্ব কম্যুনিজমের নেতৃত্বে চীন-প্রাধান্য এবং মাউ-সে-তুঙের নীতি যে প্রবলতর হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিশ্ব কম্যুনিজমের ঐতিহ্য অনুযায়ী ক্রুশ্চেভ-অপসারণের যৌক্তিকতা ও 'বৈপ্লবিক তাৎপর্য' সমস্ত কম্যুনিষ্টরাই হয়তো ভবিষ্যতে স্বীকার করে নেবে এবং কম্যুনিষ্ট ইতিহাস ও চিন্তাধারা থেকে ক্রুশ্চেভও হয়তো ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে ক্রুশ্চেভ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট মহলে যে স্বতস্ফূর্ত ও প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা আন্তরিক ও যথার্থ এবং তা' থেকেই প্রমাণ হয় যে শুধু অকম্যুনিষ্ট নয় কম্যুনিষ্ট মহলেও ক্রুশ্চেভ-বিদায় কিরূপ আলোড়ন ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

কম্যুনিজমের ইতিহাসে ক্রুশ্চেভের অবদান

মার্কস্ ও লেনিনের পরে বিশ্ব কম্যুনিজমের চিন্তা ও পদ্ধতিতে ক্রুশ্চেভের চেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আর অন্য কোন কম্যুনিষ্ট নেতার নেই। ক্রুশ্চেভ মার্কস বা লেনিনের ন্যায় সূক্ষ্ম চিন্তার থিওরিটিসীয়ান বা উচ্চতাত্ত্বিক

দার্শনিক নন। লেনিন বা মাউ-সে তুঙের মত ক্রুশ্চেভ কোন বিপ্লব পরিচালনা করেননি, অথবা ষ্ট্যালিনের স্থায় কোন যুদ্ধ-নায়কত্বের গুরুত্ব অর্জন করতেও সক্ষম হননি তিনি। তবুও নিরপেক্ষ বিচারে এযুগের কম্যুনিষ্ট জগতে ক্রুশ্চেভ সর্বশ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীর মর্যাদা লাভ করবেন।

ইতিহাসের গতি-ধর্মের মৌলিক রূপান্তরের প্রকৃতি অনুধাবন এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দ্বারা যদি বৈপ্লবিক নেতৃত্বের মূল তাৎপর্য নির্ণীত হয় তা' হলে ক্রুশ্চেভ নিঃসন্দেহে এযুগের কম্যুনিষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী। সাম্রাজ্যবাদ এ যুগের পুঁজিবাদেরই এক সম্প্রসারণ,—লেনিনের এই বিশ্লেষণ তাঁর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের এক মৌলিক নিদর্শন। কম্যুনিজমের তাত্ত্বিক নির্দেশ অস্বীকার করে মাও-সে তুঙ শ্রমিক বিপ্লবের পরিবর্তে কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে যে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পথে অগ্রসর হন তা'ও মাউ-সে-তুঙের বৈপ্লবিক নেতৃত্বের মৌলিকতার পরিচায়ক। ক্রুশ্চেভও তেমনি এমন এক কম্যুনিষ্ট বিপ্লবী যিনি মনে করেন যে বর্তমান পারমাণবিক যুগে কম্যুনিজমের নীতি ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

জেম্স ওয়াটের ছোট কেটলীর উৎসে যে দিনে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় সে দিন থেকেই জন্ম হয় যান্ত্রিক সভ্যতার। মানব সভ্যতার সেই যুগান্তকর পর্বান্তকেই মার্ক্স্ আখ্যা দিয়েছিলেন ফিউড্যালিজম থেকে ক্যাপিট্যালিজমের আবির্ভাব রূপে। মিকানিক্যাল পাওয়ার বা যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা ও সভ্যতার কাঠামে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে সেকথা যেমন মার্ক্স বুঝেছিলেন তেমনি পারমাণবিক শক্তি যে মানব সভ্যতায় এক অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় বিপ্লবের সূচনা করেছে তার মৌলিক তাৎপর্য কম্যুনিষ্ট মহলে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছেন ক্রুশ্চেভ। পারমাণবিক শক্তি আজ বিশ্বকে একদিকে নির্মম প্রলয় এবং অপরদিকে অপূর্ব-সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পারমাণবিক প্রলয়ের বুভুক্ষা থেকে বিশ্ব যদি বেঁচে থাকে তা' হলে যান্ত্রিক শক্তি মানব সভ্যতায় যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে পারমাণবিক শক্তি তার চেয়েও অনেক বেশি প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি করবে মানব সভ্যতায়। সমগ্র মানব-সমাজ যথার্থই আজ এক নতুন সভ্যতার সিংহ দুয়ারে প্রবেশ করেছে।

মার্ক্স ও লেনিনের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি অনুযায়ী কম্যুনিষ্টরা মনে করেন যে পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবিতার ফলে যতদিন পর্যন্ত সারা বিশ্বে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্যন্ত বারে বারে যুদ্ধ হয়ে উঠবে অনিবার্য এবং এরূপ যুদ্ধের সুযোগে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সাফল্য অর্জনও সম্ভব হবে। কিন্তু লেনিনের যুগে পারমাণবিক শক্তির জন্ম ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ছিল বৈজ্ঞানিক কল্পনারও বাইরে। আজ পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের অর্থ মহা প্রলয়,—এবং এই প্রলয়ে বিজয়ী বা বিজিতের কোন সীমারেখা থাকবে না। ক্রুশ্চেভের সতর্ক-বাণী অনুযায়ী প্রথম তিন ঘণ্টার পারমাণবিক যুদ্ধে বিশ্বের ত্রিশ কোটী লোক নিহত হবে। পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য অঞ্চলগুলি লক্ষ লক্ষ পম্পাইয়ের মৃত নগরীতে পরিণত হবে এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলও তেজস্ক্রিয়-কণা মিশ্রিত বায়ু প্রবাহের মৃত্যু বন্যা থেকে রেহাই পাবে না। এরূপ পারমাণবিক যুদ্ধের শেষে ক্যাপিট্যালিজম, কম্যুনিজম ও সোস্যালিজমের আদর্শগুলি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্মশান-শিবার মত শুধু আর্তনাদ করতে থাকবে। পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কোন ভিন্নার্থ থাকবে না। এরূপ যুদ্ধের একমাত্র লাভ পৃথিবীর অগ্রণী সভ্যঅঞ্চলের সার্বিক মৃত্যু ও ধ্বংস এবং অনগ্রসর অংশের পঙ্গু ও বিষাক্ত অস্তিত্ব। ক্রুশ্চেভ একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

ক্রুশ্চেভ একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে পারমাণবিক যুগে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার প্রাচীন বা কেতাবী পদ্ধতি অচল।

বিশ্বসংহার পরিহারের পথে খুঁজে বের করতে হবে আজকে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার নতুন পদ্ধতি,—তাই, তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠার তথা 'পীসফুল ট্র্যানজিশন টু সোশ্যালিজমে'র নতুন বৈপ্লবিক পদ্ধতি প্রবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তৎপর হয়েছিলেন কম্যুনিষ্ট জগতে। তাঁর মতে শান্তিরক্ষা হবে কম্যুনিস্টের সর্বোত্তম ষ্ট্র্যাটিজী এবং এই ষ্ট্র্যাটিজীকে সফল করতে হলে প্রয়োজন হবে বিশ্বের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রের সহ-অবস্থান। তাই এই সহ-অবস্থানের নীতি স্বীকৃত হলে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণও অনিবার্য হবে।

ক্রুশ্চেভ ও রাশিয়া যে বিশ্বশান্তির নীতিতে বিশ্বাসী সে কথা অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্বকে বিশ্বাস করাবার জন্যই ক্রুশ্চেভ ষ্ট্যালিনযুগীয় কম্যুনিজমের বিভীষিকাময় মূর্তির রূপান্তর সাধন অপরিহার্য বলে মনে করেন। ষ্ট্যালিন যুগের 'লিকুইডেশন' ও 'পার্জে'র সন্ত্রাসবাদী ঐতিহ্য এবং এক দানবীয় আমলাতন্ত্রের লৌহ-ব্যূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে ক্রুশ্চেভ ডি-ষ্ট্যালিনাইজেশন বা ষ্ট্যালিন-বর্জন নীতি অনুসরণ করেছেন তার ফলেই অকম্যুনিষ্ট বিশ্বের কাছে তিনি এই প্রতীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ক্রুশ্চেভ যথার্থই শান্তি ও সহ অবস্থান নীতির অনুসারী।

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশ ও দ্বা-বিংশ অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ যে ডি-ষ্ট্যালিনাইজেশন নীতি এবং বিশ্বশান্তি, সহ অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বিশ্ব কম্যুনিজমের কাছে তুলে ধরেন তার জন্য তিনি ভাবী ইতিহাসের চোখে কম্যুনিষ্ট বিশ্বের এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলে আখ্যা লাভ করবেন। তিনি কম্যুনিজমের চিন্তা ও পদ্ধতিতে যে নতুন গতিধর্মের প্রবর্তন করেছেন এবং কম্যুনিজমের মনোলিথিক প্রতিচ্ছবিতে আজ যে ভাবে বহু-মুখী গতি সৃষ্টি হয়েছে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রুশ্চেভকে পদচ্যুত করেও রোধ করা সম্ভব হবে না।

ক্রুশ্চেভবাদ বনাম মাওবাদ

পরমাণু-যুগ ও পারমাণবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ক্রুশ্চেভের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি তোলেন মাও-সে-তুঙ। মাও-সে-তুঙ বলেন যে পারমাণবিক যুগেও লেনিনের যুদ্ধের অনিবার্যতাবাদের তত্ত্ব অভ্রান্ত। তাই, চীনা কম্যুনিষ্টদের মতে পারমাণবিক যুদ্ধের পরেও পৃথিবীতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার মত সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকবে। মাও-সে-তুঙ মনে করেন যে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে কম্যুনিষ্ট শিবিরের শক্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিশ্ব-কম্যুনিজমের বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে তা হলে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট শিবিরই জয়যুক্ত হবে এজন্য মাও-সে-তুঙ মার্কিন রাষ্ট্রকে 'পেপার টাইগার' বলে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি, কিন্তু এই ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে ক্রুশ্চেভ বলেন, "দিস পেপার টাইগার হ্যাজ এ নিউক্লিয়ার টিথ"—অর্থাৎ এই 'কাগজী বাঘের পারমাণবিক দাঁত রয়েছে'।

মাও-সে-তুঙ পারমাণবিক যুগের বৈশিষ্টকে স্বীকার করেন না বলেই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ক্রুশ্চেভের শান্তিবাদী পদ্ধতিকে স্বীকার না করে বরং এই মতবাদকে শোধনবাদ বা 'রিভিশনিজম' আখ্যা দিয়ে ক্রুশ্চেভ বিরোধী হয়ে প্রচণ্ড অভিযান সুরু করেন। মাও-সে তুঙ বলেন যে সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির নামে ক্রুশ্চেভ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। প্রত্যুত্তরে ক্রুশ্চেভ বলেন, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ আজ সর্বশ্রেণীর বিশ্বজনমতের কাছে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক সমর্থন হারিয়েছে। তাই, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন বা উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য দিতে কম্যুনিষ্টরা পশ্চাদপদ

হবে না। কিন্তু মাও-সে-তুঙ শুধু জাতীয় সংগ্রাম বা উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামেই নয়—বিশ্বের সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মপন্থার ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবকে প্রোৎসাহন ও সাহায্যদানের পক্ষপাতী এবং এই নীতিটিকেই তিনি 'ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাস ষ্ট্রাগল' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ক্রুশ্চেভ মনে করেছিলেন যে আন্তর্জাতীয় শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে 'সশস্ত্র বিপ্লবের' কর্মসূচীকে বিশ্ব-কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিরূপে প্রাধান্য দেওয়া হলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং এই যুদ্ধে একদিকে যেমন পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা তেমনি আরেক দিকে রাশিয়া ও পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সর্বনাশা ধ্বংস হবে সুনিশ্চিত। এই ভয়াবহ পরিণতিকে রোধ করার জন্য ক্রুশ্চেভ সোভিয়েৎ ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদকেও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং এজন্যেই ১৯৬০ সাল থেকে চীনকে সকল প্রকার সাহায্যদানের নীতিও প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। মাও-সে-তুঙের যুদ্ধের অনিবার্যতাবাদ প্রসূত নীতি ও পদ্ধতিকে রোধ করার জন্য বিশ্ব কম্যুনিজমে বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিয়েও ক্রুশ্চেভ বিশ্বকম্যুনিষ্ট সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন আগামী ডিসেম্বরে। সোভিয়েৎ-চীন বিতর্ক, সংঘাত ও মতানৈক্য যখন এরূপ চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছে ঠিক সেই সময়ে পতন ঘটলো ক্রুশ্চেভের।

ক্রুশ্চেভের পতনে মাও-সে-তুঙের জয়

রুশ-চীন দ্বন্দ্বের এমন এক চরম পর্বে ক্রুশ্চেভ অপসারিত হয়েছেন যার ফলে বৃহত্তর বিশ্বের কাছে এবং কম্যুনিষ্ট জগতেও এই ধারণাই সৃষ্টি হবে যে ক্রুশ্চেভের পতনে মাও-বাদেরই জয় হলো এবং এখন থেকে বিশ্বকম্যুনিষ্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হলো চীনের প্রাধান্য। যান্ত্রিক ও পারমাণবিক শক্তিতে প্রভূত বলিয়ান রাশিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তিতে এখনও প্রধান কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হবে বটে কিন্তু নৈতিক ও আইডিয়োলজিক্যাল ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট জগতে চীনের প্রভাব ক্রুশ্চেভ-পতনের সঙ্গে রাশিয়াকে অতিক্রম করে যাওয়ার সুযোগ পেলো।

বর্তমান রুশ নায়কেরা একথা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিভিন্ন অভিযোগের পুঞ্জীভূত পরিণাম রূপে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কন্যার জামাতাকে ইজভেসতিয়ার সম্পাদক মনোনয়ন, বিভিন্ন আন্তর্জাতীয় দায়িত্বে তাঁকে কর্তৃত্ব দান, কৃষি বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁকে অর্পণের ইচ্ছা, পশ্চিম জার্মান সরকারের সঙ্গে কন্যা জামাতার মাধ্যমে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা, প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান দান, শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় অবহেলা, কৃষি উৎপাদনে অব্যবস্থা, আন্তর্জাতীয় সম্মেলনে ক্রুশ্চেভের অশালীন আচরণ, কিউবাকে ক্ষেপণাস্ত্র দান, রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনে সর্বোচ্চ প্রেসিডিয়ামকে উপেক্ষা, পার্টির যৌথ নেতৃত্বকে অস্বীকার করে পুনরায় ব্যক্তি-নেতৃত্ব বা পার্সোন্যালিটি কাল্টের প্রবর্তন, রুশ চীন আদর্শ নৈতিক দ্বন্দ্বকে মাও-সে তুঙ বনাম ক্রুশ্চেভের সংঘাতে পরিণত করে বিশ্বকম্যুনিষ্ট আন্দোলনে বিচ্ছেদ ঘটান, ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে চীন রুশ তাত্ত্বিক আলোচনায় উপস্থিত চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ, ভারত চীন সীমান্তসংঘাত কালে ভুল নীতি অনুসরণ ইত্যাদি প্রায় উনত্রিশ দফা অভিযোগ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এগুলি পশ্চাৎ চিন্তার পরিণাম। এই অভিযোগগুলি যথাসময়ে তোলা হয় নি এবং ক্রুশ্চেভ নীতি ও পদ্ধতির সংশোধন

করারও চেষ্টা করা হয়নি। ষ্ট্যালিন পদ্ধতির পরিবর্তনের পরে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল ক্রুশ্চেভের আমলে, সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিশ্বাস্য নয় যে যথাসময়ে এই অভিযোগগুলি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিবেচনা এবং সংশোধনের জন্য উত্থাপন করার সুযোগ ছিল না। ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের মধ্যে রুশ-চীন তথা বিশ্ব কম্যুনিজমের অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি অভিযোগ মাত্র—এরূপ একটি মনোভাব ব্যক্তকরার যে প্রয়াস রুশ নায়কদের বক্তব্য ও বিজ্ঞপ্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা'ও যথার্থ বলে গ্রহণীয় নয়। রুশ-চীন দ্বন্দ্বের চরম পর্বে, চরম সন্ধিক্ষণে এবং ক্রুশ্চেভ কর্তৃক আহুত বিশ্বকম্যুনিষ্ট সম্মেলনের প্রাক্কালে ক্রুশ্চেভের অপসারণ যে চীনের অভিযোগের সামনে রুশ-নেতৃত্বের মাথা নত-করার সামিল বলে প্রতিভাত হবে সেকথা আগে থেকে না বোঝার মত দূরদৃষ্টিহীনতার দুর্বলতা রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের উপরে আরোপ করা যায় না।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং ক্রুশ্চেভের পতন অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে মাওসে-তুঙের মন তুষ্টি করে রুশ চীন-ফাটলকে তথা বিশ্ব কম্যুনিজমের অন্তর্দ্বন্দ্বকে চরম বিচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই চীনের চক্ষুশূল নিকিতা ক্রুশ্চেভকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রুশ্চেভের পতনের মূলে যে রুশ-চীন দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই মুখ্য কারণ এবং চীনের সঙ্গে আপোষ করে চীনকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যই যে ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের মূল লক্ষ্য—এই সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবেই করা যায়। তাই, ক্রুশ্চেভের পতন ঘটে চীন কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঠিক আগের দিন। চীন কর্তৃক পরমাণু বিস্ফোরণের উদ্যোগ, প্রস্তুতি ও বিস্ফোরণের সময়ও রাশিয়ার অজানা ছিল না। কারণ, রাশিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত বিজ্ঞানাগার ও রি-অ্যাক্টারের সাহায্যেই চীন পারমাণবিক জ্বালানী উপাদানে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব কম্যুনিজমের ভাবী গতি

চীনের কাছে আত্মসমর্পণের ফলে রাশিয়া চীন ও বিশ্বের চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট মহলে মর্যাদা হারাবে এবং রুশ সমর্থক কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠির আস্থা ও শ্রদ্ধা রাশিয়ার প্রতি বিশেষভাবে শিথিল হবে। রাশিয়া চীনের উপরে এখন আর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না, যাদের উপরে রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল সেই সব কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেও রুশ প্রাধান্য হ্রাস পাবে। চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নৈতিক পরাজয় এবং প্রাধান্য হ্রাসের গুরুতর ঝুঁকি নিয়েও রাশিয়া চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কম্যুনিষ্ট কন্ট্রাডিকশন দূর করে আবার মনোলিথিক বিশ্বকম্যুনিজমের ঐক্যিক মূর্তি স্থাপনে বিশেষ চেষ্টা করবে।

চীন-নেতৃত্বও এই নৈতিক জয়ের পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। রাশিয়ার সাহায্যেই চীন শিল্পব্যবস্থায় অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। চীনের প্রতিটি প্রধান যন্ত্রশিল্প ও কারখানা রাশিয়ার অবদান। স্থল-জল বিমান বাহিনীর সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রও চীন লাভ করেছে রাশিয়ার কাছ থেকে। চীনের বিরাট বিমান বহর রাশিয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত। একমাত্র রাশিয়া থেকেই চীন বৈদেশিক পুঁজির সাহায্য লাভ করেছে। ১৯৬০ সালের পরে রুশ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এবং হাজার হাজার রুশ কারিগর চীন থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় চীনের অনেক কারখানা এখন অর্দ্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অনেক ব্রীজ অসম্পূর্ণ রয়েছে, ইস্পাত শিল্পেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে এবং চীনের অর্থনীতি গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই ক্ষতি সংশোধন করে রুশ সাহায্যে চীনা অর্থনীতিকে 'টেক-অফ ষ্টেজে' পৌছে দেবার জন্য এবং বর্তমান নৈতিক জয়ের পরিবেশটি চীনা প্রাধান্য বিস্তারের

কাজে ব্যবহার করার জন্য চীনও হয়তো অনেকখানি অর্থ-নৈতিক একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করে আপোষরক্ষার মনোভাব নিয়ে বর্তমান রুশ নেতৃত্বের দিকে হাত বাড়াবে।

ক্রুশ্চেভ পতনের ফলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আপাতত রুশ-চীন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে এবং বিশ্ব কম্যুনিজমের ফাটল রোধ হবে ও বিশ্ব কম্যুনিষ্ট ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই ঐক্য কি স্থায়ী হবে? বিশ্ব কম্যুনিজমে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতীয় সম্পর্ক ও বৈষয়িক উন্নতিতে যে অসমান পর্যায়ে অবস্থিত রয়েছে, রুশ-চীন সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সংঘাতের ইন্ধন রয়েছে এবং পূর্ব ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে জাতীয় স্বার্থের প্রবল আবেদন রয়েছে,—সেই সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্থায়ীভাবে বিশ্ব কম্যুনিজমের ঐকিক মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব নয়। সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হলেও ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্ট কণ্ট্রাডিকশনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে চিরতরে নিষ্ক্রিয় করা আর সম্ভব হবে না।

রুশ-চীন সমঝোতায় সম্ভাবনার ফলে চীনের বৈপ্লবিক কর্মসূচী এবং রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মধ্যে একটি আপোষ-রফার ফলে বিশ্ব কম্যুনিজম যে অনেকাংশে আক্রমণ-শীল হয়ে আংশিক ভাবে শক্ত পন্থার অনুসারী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব বিশ্ব-যুদ্ধ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে ষ্ট্যালিনবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার নীতি পরিহার করে চলবে বলে মনে করার যথার্থ কারণ রয়েছে। আন্তর্জাতীয় মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠার বিরাট মূল্য দিয়েও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি চীনের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে ব্যর্থ হয় তা হলে রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের আয়ুও স্বল্পকাল স্থায়ী হবে এবং তার ফলে হয় প্রবলাকারে ক্রুশ্চেভবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে অথবা ষ্ট্যালিনবাদের মারাত্মক পুনরাবির্ভাবের পথে মাও সে-তুঙের যুদ্ধের অনিবার্যতাবাদের স্বীকৃতির ফলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। বর্তমান রুশ-নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভকে হটিয়ে আজ এক তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রুশ-ভারত-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যত

ভারত সম্পর্কে রুশনীতির কোন পরিবর্তন হবে না বলে যত আশ্বাসই দেওয়া হোক না কেন যে কারণে, যে অবস্থায় এবং উদ্দেশ্যে ক্রুশ্চেভের পতন ঘটনা হয়েছে তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতবর্ষকে সামরিক এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাহায্যদান সম্পর্কে রুশ-নীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কাশ্মীর সম্পর্কে রুশনীতি হয়তো অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু মিগ বিমান নির্মাণ ও বোকারো ইস্পাত কারখানা ইত্যাদি নির্মাণের কাজে সাহায্যদানের নীতি সম্পর্কে রুশ-অঙ্গীকার আপাতত দীর্ঘসূত্রতার জটে আবদ্ধ হয়ে বাস্তবে প্রায় অকেজো হয়ে যাবে। কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়া উচিত কি না,—সেই প্রশ্ন আবার সক্রিয় হয়ে রাশিয়াকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলবে। পশ্চাদপদ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রশ্নকে প্রাধান্য না দিয়ে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সাহায্যদান সঙ্গত কি না সেই বিতর্কও প্রবল আকারে দেখা দেবে। যেহেতু রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের আশু লক্ষ্য হবে রুশ-চীন ঐক্য স্থাপন, সেজন্যেই চীনকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে রাশিয়া ভারত সম্পর্কে আপাতত ধীরে-চলার দীর্ঘসূত্রী নীতি গ্রহণ করবে।

রাশিয়া কর্তৃক অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম দান ও বিমান কারখানা নির্মাণের প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভারত সরকারের কর্তব্য হবে, পরিবর্তিত অবস্থায় বৃটিশ লেবার সরকারের সঙ্গে সামরিক সাহায্যের জন্য সংযোগ স্থাপন করা।

ভারতকে বিমুখ করে মার্কিন গোষ্ঠির দুয়ারে ঠেলে দেওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্য রুশ-চীন মৈত্রী এবং চীনকে পুনরায় অর্থ নৈতিক সাহায্যদানের নীতি গ্রহণের

পূর্বে রাশিয়া চীনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে হিমালয় সীমান্তে চীনের কোন সম্ভাব্য হামলার কার্যক্রমকে রোধ করার চেষ্টা করবে এবং সেই সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ-সম্পর্কে ভারত-চীন আলোচনা পুনরায় আরম্ভের ক্ষেত্র রচনা করার চেষ্টাও করবে। কিন্তু এই চেষ্টায় রাশিয়া কতখানি সফল হবে তা সংশয়ের বিষয়। চীনের 'বিপ্লব সম্প্রসারণে'র নিকটবর্তী এবং প্রশস্ত ক্ষেত্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এই অঞ্চলে চীনা কার্যক্রম সফল করার জন্য ভারতকে পঙ্গু ও নিষ্প্রভ করে রাখা এবং নৈতিক শক্তির ক্ষেত্রে পরাজিত করা চীনের পক্ষে অপরিহার্য।

আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে, চীনকে রাষ্ট্র সংঘে স্থান দেওয়ার এবং নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে শরিক করার চেষ্টায় রুশনেতৃত্ব আগ্রহ দেখাবে এবং আন্তর্জাতীয় কম্যুনিজমের পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিও পুনরায় চালু করার চেষ্টা করবে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যত

ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের মৃত্যু যে আসন্ন এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই উপদলের ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা যে আবার নতুন করে শুরু হবে সেকথাও সুনিশ্চিত। ক্রুশ্চেভ-পতন এবং বর্তমান রুশ-নেতৃত্বের চীনা তোষণ নীতির ফলে ভারতের কম্যুনিষ্ট মহলে চীনাপন্থীদের শক্তি বাড়বে এবং ভারতীয় কম্যুনিজমের উপরে বাম-বাদের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করবে। যদি রুশ-চীন ঐক্য স্থাপিত হয়, তা হলে ভারতের কম্যুনিষ্ট উপদল দুইটির মধ্যেও অনিবার্যভাবেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য, সাংগঠনিক ঐক্য স্থাপিত হলেও নেতৃত্ব ও মতবাদের কোন্দল থেকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট মহল দীর্ঘদিন নিষ্কৃতি পাবে না। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা ভারতীয় কম্যুনিজমকে সশস্ত্র বিপ্লবের তেলেঙ্গানা তথা 'ভারতীয়-ইয়ানান' গঠনের কর্মসূচীর দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে, পক্ষান্তরে রুশপন্থীরা পার্লামেন্টারী কম্যুনিজমকে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে। কিন্তু চীনের কাছে কার্যত রাশিয়ার নৈতিক আত্মসমর্পণের ফলে এশিয়াতে চীনপন্থী কম্যুনিজম স্বভাবতই সকল দেশের কম্যুনিষ্ট মহলে প্রাধান্য লাভ করবে। ক্রুশ্চেভ-পতন এবং রুশ-চীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ফলে একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা সশস্ত্র বিপ্লবের 'ইয়ানান পদ্ধতি'র দিকে এগিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতীয় সম্পর্কে ভারতের সংকট

ক্রুশ্চেভ-পতনের ফলে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রবল মার্কিনমুখী চাপ পড়বে এবং ভারতীয় কম্যুনিজমের বামমুখী নীতি এবং চীনের কার্যক্রম এই চাপকে মার্কিন সহায়ক করে তুলবে। স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজবাদ যে ভারতের লক্ষ্য সেই ভারতের পক্ষে ক্রুশ্চেভ-পতন এক গুরুতর ঘটনা। আত্মনির্ভরতা, সংহতি ও বৈষয়িক উন্নয়নের ও মূল্যমান রক্ষার কঠোর জাতীয় কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি,—বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

২

প্রায় একশ বছর আগে কার্ল মার্কস্ নামক একজন হেগেল-শিষ্য হেগেলীয় ন্যায়শাস্ত্রকে (Logic) এই পৃথিবীর চিন্তারাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে ঘোষণা করেন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ছয় হাজার বছরের বেশী হয়নি, একথা আমরা সবাই জানি। এই ছয় হাজার বছরে মানুষের প্রতিভা যা কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে সে সবই আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকে। কিন্তু মার্কস্-এর বিচারে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিস্ময়ের বস্তু (wonder) হচ্ছে হেগেলীয় ন্যায়ের এই দীর্ঘ অবহেলিত ডায়লেক্টিক বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতি। মার্কস্ এসে হেগেলের ন্যায়শাস্ত্র থেকে তাঁর শুধু ডায়লেকটিক নীতিকেই চয়ন করে নিয়ে তাকে জড়বাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন—চিন্তারাজ্যে একটা অভিনব বর্ণসঙ্কর ঘটালেন। তাঁর সংগঠনী বা Eclctic প্রতিভার ম্যাজিকে দুইটি বিরোধী বস্তু (incompatible) মিলে এক আশ্চর্য মিশ্র-পদার্থকে সৃষ্টি করল। হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে জড়বাদের এই অপ্রাকৃত মিলনের ফলে, উনিশ শতকের সমাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই অদৃষ্টপূর্ব 'ডায়লেকটিক জড়বাদ' ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। উনিশশতক কিম্বা বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নবজাতক নিতান্ত অযত্নে বর্ধিত হয়েছে; দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক মহলে এই ডায়লেটিক জড়বাদ না উদ্রেক করতে পেরেছে কৌতূহল, না আকর্ষণ করতে পেরেছে তাঁদের প্রতিক্রিয় দৃষ্টিকে। কিন্তু ১৯১৭ সনের পর থেকে ডায়লেকটিক্ জড়বাদকে দার্শনিক মর্য্যাদা দেবার একটা চেষ্টা সর্বদাই চলেছে; একে প্রচারের (propaganda) জোরে, অর্থের প্রভাবে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার একনিষ্ঠ সাধনা আমরা গত কয়েক বছর থেকে বিশেষভাবে দেখতে পাই। অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে কেবলি প্রচার ও ক্ষমতার বলেই আজকের এই নতুন জড়বাদ শিক্ষিত সমাজের অংশ-বিশেষকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। এই নবজড়বাদের গায়ে ডায়লেকটিকের অলঙ্কার পরানোতে এর সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব বহু পরিমাণে বেড়েছে। কেবল তাই নয়, সমাজক্ষেত্রে ডায়লেকটিকের প্রয়োগ এই অস্ত্রকে দান করেছে এক ক্ষুরধার ব্যবহারোপযোগিতা practicality) যার ফলে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতেও এর সহজ ও effec ive প্রয়োগ সম্ভব বলে দাঁড় করানো গেছে। কাজেই অনেকের কাছেই সৌন্দর্য ও কার্যকারিত্ব, এই দুই দিক থেকে এর আবেদন চমৎকারি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এযুগে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র রাজত্ব চলেছে এবং "বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি" আজকের দিনের শিক্ষিতলোকের মনোহরণ করেছে. একথা সবাই মেনে নেবে। কিন্তু এই "বৈজ্ঞানিকতা"র যুগেও একটা প্রবল প্র্যাগমেটিক মনোবৃত্তি মানুষের মনের উপর আজও রাজত্ব করছে। বিজ্ঞান জোরগলায় সবাইকে

শেখাচ্ছে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে বিষয়মুখ সত্যকে (objective truth) অনুসন্ধান ও শ্রদ্ধা করতে ; বিজ্ঞান বলছে, নির্লিপ্ত (disinterested) চিত্তবৃত্তি ছাড়া আসল তথ্য ও সত্যকে খুঁজে বের করা যাবে না। অনুসন্ধিৎসুর ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা জাতিগত রুচি যদি এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তবে বিষয়মুখতা (objectivity) মারা পড়বে। এবং সত্যকে পাওয়া যাবে না। 'হিরন্ময়েন পাত্রেণ' সত্যের মুখ ঢাকাই থেকে যাবে। ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের হিসাব সত্যানুসন্ধানের মধ্যে এনে ফেললে, সে বিজ্ঞান হবে না, আর যাই হোক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানের এত কড়া দাবি সত্ত্বেও মানুষ তার ভালোমন্দের হিসাবকে ছাড়তে পারেনি আজও। মানুষের আত্মস্থিতির সহজাত প্রেরণা মানুষকে নিতান্ত প্র্যাগমেটিক করে তোলে দিনরাত্রির প্রতি মুহূর্তে। বহু লোকই প্রেয়কে চায় ও শ্রেয়কে সন্ধান করে। নিজের ভালোকে মানুষ অজ্ঞাতেও খুঁজে বেড়ায়— এটাই হচ্ছে মানুষের দেহমনের সুগভীর চাওয়া। এই চাওয়ার রঙে তার সব কাজ, সব চিন্তা রঙীন হয়ে ওঠে, "বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির" কড়া তাগিদ মাথার উপরে থাকা সত্ত্বেও।

ডায়লেকটিক জড়বাদের একটা কার্যকরী প্রয়োগ মার্কস অতি সুন্দর রকমে করেছেন—বর্তমান যুগের আর্থিক সঙ্কটের সমাধানের উপায় হিসেবে। পুঁজি-তন্ত্র সমাজে বিরুদ্ধ দুই শ্রেণীর স্বার্থের ঠোকাঠুকি ক্রমেই প্রবল হবে এবং এই লড়াইতে শ্রমিকরাই শেষ পর্যন্ত অপরপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করবে। ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে এবং সমস্ত অতীত ও বর্তমান এই নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। বীজ যেমন করে ফলে এসে নিশ্চিত পরিণতি পেয়ে থাকে, তেমনি করে জড়, চেতন, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ সকলেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতি অনুসারে (Dialectically) চলেছে তাদের এই একমাত্র ও অদ্বিতীয় পরিণতির দিকে। মার্কস্ প্রচার করেছেন, ধাপের পর ধাপ বেয়ে সমাজ, সভ্যতা সব-কিছু শ্রমিক-প্রাধান্যের দিকে পরিণত হচ্ছে। কাজেই যাদের আদর্শ শ্রমিক-তন্ত্র সমাজ, তাদের কল্পনাগত ভবিষ্যৎকে এই নীতি (method) দার্শনিক সমর্থন দিচ্ছে বলে তারা সহজভাবে ও সাগ্রহে এই পুরোনো নীতিকেই কবর থেকে তুলেছেন, এই বিংশ শতকেও। এখানে নূতন দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদীদের (dialecticians) প্র্যাগমেটিক চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং কার্যকারিতারই আকর্ষণ প্রবল হয়েছে। আজকার দিনে ডায়লেকটিকের প্রসারের অন্যতম কারণ এই নীতির কার্যকর ব্যবহার (use)। যুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে সঙ্কট লেগেই রয়েছে ; পরিবারে, বিবাহে, ব্যবসাবাণিজ্যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে—সর্বত্রই সংঘর্ষ, সমস্যা ও মানুষের দুঃখ-বেদনা স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছে। এই সমস্যা-জর্জর যুগে মনোমত ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও মনোরম করে দেখাতে পারে, এমন কোন দার্শনিক নীতি যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়, তবে সঙ্কট-জর্জর ক্লান্ত মানুষ তাকে আদর করতে স্বতঃই উন্মুখ হয়। এমন কি, যদি সে নীতি একটা ন্যায়-কল্পও (logical fiction) হয় তবু তার অযৌক্তিকতা চোখে ধরা পড়ে না, কারণ চোখে তখন ব্যক্তি-গত রুচি, পছন্দ ও আদর্শানুরাগের রঙ্ লেগেছে। জগৎকে কামনার রঙে রঙীন দেখতে মানুষের ভালো লাগে। ডায়-লেকটিকের প্রতি নতুন অনুরাগের এটি দ্বিতীয় কারণ বলা যেতে পারে।

এখন ডায়লেকটিক জড়বাদের বাহন এই ডায়লেকটিক বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এর স্বরূপ কি। বিষয়টি দর্শনশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের রাজ্যে পড়ে এবং নিতান্ত জটিল বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কাজেই খানিকটা চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার হবেই এবং abstract

আলোচনাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। আর এ-যুগে কোন্ বিজ্ঞান, কোন্ দর্শনই বা বিমূর্ত (abstrac.) হয়ে না পড়ছে দিনেরপর দিন ? অঙ্ক থেকে শুরু করে নব-বাস্তববাদ (New Realism) পর্যন্ত সবাই অবাস্তব ছায়ালোকে উত্তীর্ণ করেছে নিজ নিজ আলোচনাকে।

হেগেল নিজেই বলেছেন, তাঁর ডায়লেকটিক বা দ্বন্দ্ব সমন্বয় নীতি দর্শনকে নূতন করে রূপ দিয়েছে এবং এই নীতিই দর্শন-বিচারের একমাত্র সত্যিকারের নীতি। তিনি বলেন, তাঁর (Logic)' পুঁথিতে তিনি জগৎকে দান করেছেন :

—"a new treatment of philosophy on a method which, will, as I hope, yet be recognised as the only genuine method identical with the content" (Preface to Encyclopaedia, Wallace, Logic xv)

ডায়লেকটিক নীতির আবিষ্কারক হেগেল নন, ফিশ্‌টে (Fichte)। হেগেলও বার বার স্বীকার করেছেন যে ফিশ্‌টে (১৭৬২-১৮০৪) এই পদ্ধতি (method) আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য ফিশ্‌টে-ও পুরোপুরি একেলা ডায়লেকটিক আবিষ্কার করেন নি। প্রাচীন যুগ থেকেই একাধিক রূপে এই নীতি চলে আসছে; বহু দার্শনিক মনীষী এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তবে ফিশ্‌টের বাহাদুরী হচ্ছে একে নতুন ঢঙে নতুন ব্যবহারে লাগানো। একে নতুন রূপ ও অর্থদান করে ফিশ্‌টে এর দার্শনিক অভিনবত্ব বাড়িয়েছেন। তারপরে ফিশ্‌টেকে অনুসরণ করে এই ডায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন শেলিং (Schelling) (১৭৭৫-১৮৫৪) তার বিখ্যাত বই "System of Transcendantal Idealism"-এ। ফিশ্‌টে-র পরে আরেকজন দার্শনিক এই নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর নাম, শ্লাইয়েরমাখের (Schleir macher) (১৭৬৮-১৮৩৪)। তাঁর 'Lectures'-এ ডায়লেকটিক পদ্ধতির তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন তাঁর দর্শনে। এদের সবারই আগে কান্ট (Kant) (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর "Critique of Pure Reason" (১৭৮১) নামক বিখ্যাত বই-এর "Transcendental Dialectic" নামক বিভাগে ডায়লেকটিক পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই সকলের আগে ডায়লেকটিক-কে সত্যি সত্যি আধুনিক অর্থে দার্শনিক বিচারে লাগিয়েছেন। যে পরিচ্ছেদে কান্ট এই ডায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন তার নাম "Antinomies of Pure Reason"। হেগেল নিজেও কান্ট-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে সম্মান দিয়েছেন :

"In modern times it was, more than any other, Kant who resuscitated the name of Dialectic and restored it to post of hon He did it as we have seen, by working out the antinomies of reason" (Logic, p149 : ed. Wallace)

এই সব আধুনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদী (dialectician) ছাড়া প্রাচীনকালেও ডায়লেকটিক-এর ব্যবহার কেউ কেউ করেছেন। সক্রেটিসকে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতির (Dialectic method) জন্মদাতা, কেউ কেউ বলে থাকেন। সক্রেটিস বিচার বা বিতর্কের সময়ে প্রতিপক্ষকে এই ডায়লেকটিক নীতি অবলম্বন করেই কোণঠাসা করতেন। বিশেষ করে সোফিষ্টদের (Sophist) সঙ্গে তর্কে তিনি তাঁদের যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এবং অনুসরণ করে এমন সিদ্ধান্তে তাঁদের উপস্থিত করে দিতেন যে তাঁরা দেখতেন, তাঁদের পূর্বমতের একেবারে বিপরীত মত তাঁরা স্বীকার করে বসেছেন। সক্রেটিসের ডায়লেকটিক আমাদের পরিচিত, বর্তমানযুগের ডায়ালেকটিক মোটেই নয়। হেগেল সক্রেটিসের নীতিকে আত্মমুখ ('Subjective') বলে আখ্যাত

করেছেন।• একে কেউ কেউ "negative dialectio বা ঋণাত্মক ডায়লেকটিক আখ্যাও দিয়ে থাকেন।

সক্রেটিসের পরে এলেন প্লটো। এই প্লটো-ই প্রাচীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডায়লেকটিক" নীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। আমাদের খণ্ডবুদ্ধির সৃষ্ট সকল ধারণাই সীমাবদ্ধ এবং "বহুকে" বুঝতে হলে পরিণামে সেই "একে" দিয়েই পৌঁছতে হবে—এই তত্ত্বটি প্লেটো ডায়ালেকটিক নীতির সাহায্যেই প্রমাণ করেছেন। প্লেটোকে হেগেলও ডায়লেকটিকের উদ্ভাবয়িতার মর্যাদা দিয়েছেন।

প্লেটোর ডায়ালেকটিককে হেগেল বিষয়মুখ ডায়লেকটিক ('Objective Dialectic") আখ্যা দান করেছেন। প্লেটোকেই বৈজ্ঞানিক ধরণের ডায়ালেকটিক সৃজন করবার কৃতিত্ব হেগেল দান করেছেন। আর বলেছেন, প্লেটোর বিশাল চিন্তা এই ডায়ালেটিককে বিপুল ও বিস্ময়কর আকারে প্রয়োগ করেছে •

কাজেই দেখা যাচ্ছে সক্রেটিস থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত অনেক দার্শনিকই ডায়ালেকটিককে ব্যবহার করেছেন এবং এই ধরণের নীতি জগতে নতুন নয় মোটেই। তবে হেগেলের কৃতিত্ব হচ্ছে, এক নতুন রূপ ও নতুন অর্থদান করে, বিস্তৃতভাবে বিশ্বের ছোটো-বড়ো সকল পরিবর্তনের উপর একে প্রয়োগ করা। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ডায়লেকটিককে ছাঁচের মতো ক'রে ব্যবহার করে হেগেলের প্রতিভা দর্শন, ইতিহাস ও ধর্ম—সব কিছুই ঢেলে তৈয়ার করেছেন। চিন্তারাজ্যে তখন এমন এক যুগ এসেছিল, যখন হেগেলের প্রভাব দর্শনের রাজ্যকে অভিভূত করেছিল। হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী এক সময় পশ্চিম ইউরোপের সকল চিন্তাধারাকেই হেগেলীয় রঙে রাঙিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু হেগেলের মৃত্যুর পরে হেগেলীয় দর্শনের বিকাশ নানা বিচিত্রপথে নানা অচিন্ত্যরূপ গ্রহণ করল। হেগেলের সত্যিকার মতবাদ কি, তা নিয়ে মতদ্বৈধ হতে হতে হেগেলীয় সম্প্রদায় শেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে লোপ পাবার উপক্রম হলো। হেগেল পরবর্তী এই আলোড়ন থেকেই শেষে ডায়ালেকটিক জড়বাদ জন্ম নিয়ে নূতন সমাজ-দর্শন হিসেবে স্থান দাবী করছিল। এই কারণে হেগেলের পরের যুগে তাঁর দর্শনের ইতিহাস আমাদের মোটামুটি জানতে হবে।

হেগেল-পরবর্তী হেগেল দর্শন

১৯ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর ধরে হেগেলের দর্শন অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের উপর একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছিল। এর কারণ যাই হোক না কেন, এটুকু বলা চলে যে এই মতবাদ তখনকার যুগের সাম্প্রতিক প্রয়োজনকে মেটাতে পেরেছিল। হেগেলীয়গণ এই বলে গর্ব করেছেন যে, হেগেল দর্শন, ধর্ম ও সমাজের শক্ত ভিত্ গেঁথে দিয়ে গেছেন; কিম্বা আরও সত্য ভাবে বলা যায়, আবার ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ

• Socratis, as we should expeet from the general character of his philosophising, has the dialectical element in a 'predominantly subjective shape, that of Irony" (Hegel, Logic, p149 : ed. Wallace)

• "Dialectic, it may be added, is no novelty in philosophy. Among the ancients Plato is termed the inventor of Dialectic, aud his right to the name rests on the fact that Platonic philosoply first gave the free, scietific and thus at the same, time the *objective* form to Dialectic,......

• In his more strictly scientific dialogues Plato employs the Dialectical method to show the finitude of all hard and fast terms of understanding. Thus in the Parmenides he deduces the many from the One and shows nevertheles that the many cannot but define itself as the one. In this grand style did Plato treat Dialectic" (Hegel, Sogic, p 149 : ed. Wallance)

হেগেলের আগের যুগে দর্শন-ধর্ম-ও-সমাজ-জীবনের গাঁথুনি ও ভিত্ ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ, কাণ্ট (Kant) দর্শনের ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিলেন, যেদিন তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বের পিছনে যে পরাসত্তা রয়েছে তাকে জানার উপায় মানুষের নেই। সেদিন তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics বা ontology) সমাধি হয়ে গেল; কারণ, অজ্ঞেয় তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা বা বিচার করার কিছুই নেই এবং তত্ত্ববিদ্যা বলে কোনো শাস্ত্রেরও কোনো মানে হয় না! হেগেল এসে বললেন, কিন্তু পরমসত্তাকে (Absolute) জানা যায় এবং তাকে জানবার নীতি হচ্ছে ডায়ালেকটিক। তাঁর লজিক দিল তত্ত্ববিদ্যার একটা বিজ্ঞান-ভিত্তি (Foundation Science)। কাজেই হেগেলের প্রথম কৃতিত্ব হলো দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিকে পুনরুদ্ধার করা। দ্বিতীয়তঃ, কাণ্ট ধর্মকে প্রায় নীতি-শাস্ত্রমাত্রে দাঁড় করিয়েছিলেন। হেগেল এমন একটা ধর্ম-দর্শন (Philosophy of Religion) দিয়ে গেলেন, যার ফলে ধর্ম একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Foundation) পেয়ে গেল। এটা হেল হেগেলের দ্বিতীয় দান ও কৃতিত্ব। তৃতীয়তঃ, কাণ্ট ব্যক্তিকেই বড়ো করে গিয়েছিলেন। তাঁর Law বা আইন সংক্রান্ত মতে ব্যক্তিকে প্রাধান্য এবং নীতি (morality) সংক্রান্ত মতবাদেও ব্যক্তিগত বিবেককেই বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। হেগেল কিন্তু নীতিক্ষেত্রেও আবার সমষ্টিকে বড়ো করলেন এবং নীতির একটা মৌলিক ও যৌগিক (organic) ভিত্তি ফিরিয়ে আনলেন। একে হেগেলের তৃতীয় দান বলা হয়েছে। এই তিন কারণে হেগেলের দর্শনকে Restoration philosophy আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

হেগেলীয়গণ মনে করতেন যে, হেগেল-দর্শন মানুষের জ্ঞানে ও জীবনে যে শক্ত-পোক্ত ইমারত গড়ে দিয়েছে, তার কোনো কালে বিনাশ নেই, কারণ এর গাঁথুনী পাকা ও ভিত্তি দৃঢ়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হেগেলীয়দের এই ধারণা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলো। হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রবল ঝড় এসে হানা দিল এবং দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে হেগেল দর্শনের শক্ত বনিয়াদও যেন প্রবল ভূমিকম্পে ভেঙে পড়লো। হেগেলের জীবিতাবস্থারই এ ঝড়ের সূচনা হয়েছিল এবং হেগেলও এর আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর 'Logic' বইখানার ওপর আক্রমণ শুরু হয় তাঁরই জীবিতকালে এবং এসব সমালোচনার জবাব হেগেল আংশিকভাবে দিয়েও গিয়েছিলেন।* ১৮২৯ সন থেকেই হেগেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে।

এর কিছুদিন পরেই হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় মতবাদের বিরুদ্ধে তুমুল অভিযান শুরু হয়। এই অভিযান বিশেষভাবে ক'জন লোককে অবলম্বন করে দিনের পর দিন তীব্রতর ও বিক্ষোভময় হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান দার্শনিকগণ এই যুগে হেগেল-দর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশে যুক্তি, তর্ক ও বিচারের বন্যা প্রবাহিত করেন। কিন্তু এই রকম আক্রান্ত হয়ে হেগেলীয়গণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। একদিকে যেমন ভাইসে (Weisse), ফিশ্‌টে প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ (monist,) বাকম্যান (Bachmann) গুন্থের (Gunther) প্রমুখ দ্বৈতবাদিগণ Dualist) এবং গ্রবিশ (Grobisch) প্রমুখ হার্বার্টপন্থিগণ (Herbertian) হেগেলের দার্শনিক ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে গশেল Goschel প্রমুখ হেগেলীয়গণও আবার নতুন

---

* Hulsemann "On the Hegelian Theory or Absolute Knowledge and Modern Pantheism (1829) নামে একখানা বই লেখেন। পরে আরেকখানা বই লেখেন: On the Science of Life" (1831). Schubart ও Carganicoর বই "On Phliosophy in General and Hegel's Ency clopædia in Particular" (1829) এবং Hulsemann'এর উপরোক্ত দুখানা বইয়ের জবাব হেগেল নিজেই দিয়েছিলেন।

করে হেগেলকে সমর্থন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। হেগেল-বিরোধীদের (Anti-Hegelian) কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন ফিশ্‌টে প্রতিষ্ঠিত Zeitschrift কাগজখানা, তেমনি হেগেলীয় মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল "Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik" নামে কাগজখানা।

হেগেল দর্শন সমর্থন করে প্রথমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন গশেল (Goschel)। হ্বাইসেকে জবাব দিতে গিয়ে তিনি "Monism of Thought" (1832) নামে বই বের করলেন। রোজেনক্রান্ট্‌স্ (Rosenkranz), গ্যাবলের (Gabler) হাইনরিক্‌স (Hinrichs) ইত্যাদিও হ্বাইসেকে প্রত্যুত্তর দিলেন। মিশেলেট (Michelet) সমালোচনা করলেন ফিশ্‌টেকে; জুলিয়াস শালের (Julius Schaller 1810-68) চারদিকের সব রকম আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যাপকভাবে হাত দিলেন তাঁর "Philosoply of our Time" 1837-এতে।

কিন্তু প্রতিপক্ষগণ হেগেলের বিরুদ্ধে যে দারুণ ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ করেছিলেন তার কোলাহলে হেগেলপন্থীদের এই ক'টা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল। এর পরে হেগেলীয়দের নিজেদের ভিতরেই মতভেদ দেখা দিল নানা বিষয়ে। ফলে হেগেলের বিরুদ্ধদলের প্রাধান্য ও প্রাবল্যই তর্কক্ষেত্রে কায়েমি হয়ে রইল। গৃহবিবাদ ও পরে গৃহবিচ্ছেদ এসে হেগেল-দর্শনকে 'মহতী বিনষ্টি'র পথে এগিয়ে দিল।

আগে বলা হয়েছে যে, হেগেল-দর্শন 'দর্শনকে' বাঁচিয়েছে, ধর্মকে ভিত্তি দান করেছে ও সমাজকেও উদ্ধার করেছে; এবং এই ত্রিবিধ দানের জন্য হেগেলদর্শনকে Restroation Philos phy বলা হয়ে থাকে। হেগেলের মৃত্যুর পরে তাঁর দর্শন, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সকল মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। উপরোক্ত হেগেল-বিরোধীগণ (Anti-Hegelian) হেগেলকে দর্শনের দিক থেকে আঘাত করেছেন। তাঁর ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা (metaphysic)—যা দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ—তাকে আক্রমণ করে হেগেল-দর্শনের বনিয়াদকে মুমূর্ষু করা তোলা হয়েছে এইসব প্রতিপক্ষের বিতর্কে।

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, উপরে যাদের কথা লেখা হয়েছে তাঁরা হেগেলের বিরুদ্ধপক্ষ। হেগেলের দর্শনকে এবং দর্শনের মূলনীতিগুলোকেই তাঁরা আক্রমণ করেছেন। এঁরা হেগেলীয় দলের বাইরের লোক, কাজেই হেগেলকে অগ্রাহ্য করা এঁদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এর পরে যে ঘটনা ঘটল তা আশার অতীত ও কল্পনারও বাইরে। এবার হেগেলের সমর্থক বা দলের লোকদের নিজেদের ভিতরেই মতানৈক্য শুরু হয়ে হেগেলীয় বা Hegelian নামক দর্শনের অস্তিত্ব লোপ পাবার মত হয়ে দাঁড়াল। এতদিন বাইরে থেকে আক্রমণ হয়েছে, আজ ভিতর থেকেই ফাটল দেখা দিল। হেগেলের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এমনটা ঘটবে এবং হেগেলদর্শনের এমন শোচনীয় পরিণাম দেখা দেবে, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ তাই ঘটল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল; তেমনি হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেগেল-সম্প্রদায়ও আত্মকলহে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। কে কে হেগেলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কার মত ও ব্যাখ্যা হেগেলের সত্যিকারের মত, তাই নিয়ে বিতর্ক উত্তাল হয়ে উঠলো। সবাই নিজের মতকে আসল হেগেলীয় দর্শন বলে চালাতে সুরু করলো। এই নিয়ে ঝগড়া ও তীব্র বিদ্বেষের অন্ত রইল না। ফলে দাঁড়াল এই যে, হেগেল-দর্শনের নানারকম বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়ে হয়ে শেষটায় হেগেল-বাদই (Hegelism) লোপ পেয়ে গেল।

যে বিষয় নিয়ে হেগেলীয়দের মধ্যে এই শোচনীয় আত্মকলহের সূত্রপাত হয়েছিলো সে হচ্ছে হেগেলের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত। প্রথম তর্ক সুরু হলো আত্মার ব্যক্তিগত

অমরত্ব নিয়ে (Immortality of the Soul)। সমস্ত হেগেল-সম্প্রদায় এ-তর্কে দুই দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

লুডভিগ্. এ. ফয়েরবাক্ (১৮০৪-৭২) এ-সম্বন্ধে প্রথম বই বের করলেন : "Thoughts on Death and Immortality" (1831) এই বইয়ে তিনি সর্বেশ্বরবাদের Pantheism) স্থিতিভূমি থেকে বললেন, মৃত্যু হল সসীমের অসীমে বিলীন হয়ে যাওয়া ; কাজেই মৃত্যুর পরে কোনো আত্মার আলাদা অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব। পরে "History of Modern Philosophy (১৮৩৪) বইয়েও এই মত প্রচার করেছিলেন।

এর পর ফ্রিড্রিশ রিখ্টার কয়েকখানা বই লিখলেন : (১) The Doctrine of the Last Things (১৮৩৩) ও (২) The New Doctrine of Immortality (১৮৩৩)। রিখ্টার বললেন, হেগেলীয় মতবাদ মানলে মৃত্যুর পরেও আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা মানা চলে না। যাঁরা মরণের পরেও বেঁচে থাকার কথা বলেন তাঁরা নিতান্তই অহংসর্বস্ব (Egoist)।

আসল তর্কটা হচ্ছে এই নিয়ে যে, হেগেলীয় দর্শনের নীতি অনুসারে আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত হতে পারে কিনা। ফয়েরবাকের বই বেরুবার পরে হেগেলীয়দের মধ্যে তেমন আলোড়ন হয় নি, তর্ক উঠেছিল মাত্র। কিন্তু রিখ্টার দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে নামবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা খুব জোরালো হয়ে লোকের চোখের সামনে এল এবং তর্কটা প্রবল হয়ে দেখা দিল। এই দুজনে হেগেলীয় আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে মত প্রচার করবার পরে অপরাপর হেগেলীয়গণ এই তর্কে যোগ দিলেন।

১৮৩৪ সালে রিখ্টার-এর জবাবে গশেল প্রবন্ধ লিখলেন বার্লিনের ইয়ারবুকের (Berliner Jahrbucher)-এর জানুয়ারী সংখ্যায় এবং ঐ দিন থেকেই হেগেলীয়দের সম্প্রদায় দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এর পরে গশেল "On the Proofs of Immortality" (১৮৩৫) নামে বই বের করে বিস্তৃত যুক্তি-বিচারের সাহায্যে অমরত্বের সমর্থন করলেন।

কে. কনর‍্যাডি (K. Conradi) একজন হেগেলীয়। তিনিও অমরত্বকে সমর্থন করে বই লেখেন "Immortality and Eternal Life" (১৮৩৭)।

লোকের মন সেদিন এই তর্কে এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল যে, চারদিক থেকে নানা প্রবন্ধ, বই পুস্তিকা ইত্যাদি বের হয়ে চিন্তারাজ্যে বিষম আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। এই তর্ককে উপলক্ষ্য করে হেগেলীয় দল দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো— যে দুইভাগকে পরে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী (Left ও Right) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ফয়েরবাক, রিখ্টার ব্লাসে ইত্যাদিরা বামমার্গীয় ভূমি থেকে অমরত্বকে আক্রমণ করলেন এবং অন্যদিকে গশেল কনর‍্যাডি ইত্যাদিরা অমরত্বকে সমর্থন করে দক্ষিণ মার্গীয় ভূমি থেকে হেগেলকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাঁরা হেগেলীয় নন্ এমন সব দার্শনিকও এই তর্কে যোগ দিয়েছিলেন। যেমন হ্বাইসে অমরত্বকে সমর্থন করেছিলেন রিখ্টার-এর বিরুদ্ধে এবং ফিশ্টে আবার অমরত্বের বিপক্ষে ছিলেন।

(ক্রমশ :)

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশবিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

ধলেশ্বরী

ধারাবাহিক উপন্যাস

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

এক

শব্দটা শুনতে পেয়েছিল ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা হুইসলের ক্ষীণ অথচ টানা শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাড়াময় কলরব উঠল। ধলেশ্বরীর পার-ঘেঁষা গাঁওয়ে এক তীব্র ত্রস্ত ব্যস্ততা। যেন অন্ধকার এলাকার ঘরে ঘরে ডিব্বা কুপি পিদ্দিম আর লণ্ঠনবাতি জ্বালিয়ে ওরা অপেক্ষা করছিল। ডাক শোনার অপেক্ষা। অনেক সহের পরীক্ষা নিয়ে প্রায়-হতাশ পাড়ার রক্তে এখন আগুন জ্বালিয়ে দিল এই ভোঁ রব। ধুপধাপ হুদ্দাড় লোক ছুটছে, বিশাল একটি হৈ-চৈয়ে গোটা পাড়া কানা। জনমনিষ্যিরা ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে এখন, কীই বা করা উচিত। অতএব থেইহারা বিভ্রান্তের মতন ছুটাছুটি লেগেছে। তড়িঘড়ির অন্ত নেই।

ডাকের অপেক্ষায় পহর গুণছিল শিবচরণও। জাহাজ আসে সাঁঝ গাঢ় হ'লে। চারাবাড়ি ভিড়বার আগে ডাক দেয়, সেই ডাক তৈয়ার হবার জানান। কিন্তু আজ সাঁঝ গড়িয়েও কয়েক পহর কাটল। অন্ধকার গাঢ় ঘন হয়ে নামল, ডাক আর আসে না।

ডাক আসে না, ঘণ্টাখানেক আগে তাই পাড়ার মাঝি-মাল্লারা ভিড় করছিল শিবচরণের দাওয়ায়। ব্যাপার কী। জাহাজের বিলম্বের হেতুটা কোথায়? আশংকা, উদ্বেগ, হতাশা ছিল, এক এক করে তা প্রকাশ পেল। কোম্পানীকে গালাগাল করছিল অনেকে, কেউবা ভাগ্যের দোহাই ছাড়ছিল। মধ্যিখানে লণ্ঠন সামনে নিয়ে বসে চুপচাপ সব শুনে গেল শিবচরণ। শেষে সবাইকে হাত তুলে থামিয়ে দিল। 'চুপ মার; চুপ, চুপ।' শিবচরণের গলা গম্ভীর, মন সংশয়াচ্ছন্ন: 'অর একখান পরান আছে কি নাই, তাইলে! বিকল হইয়া গ্যালে আহনের জো আচে নাকি?'

'তা হয়…' একসঙ্গে সকলে একমত হ'ল শিবচরণের সঙ্গে।

'ম্যাশিন কলকব্জা আর চাক্কার মলি হইল গ্যা এক। ঠেকের পা হইলেই আইব; না আইয়া যাইব কুথায়? ঘরে যাও তুমরা, কান পাইত্যা থাইকো ডাক শুনবার পাইবা…'

সেই ডাক ওরা শুনতে পেল এতক্ষণে। রাত এখন পয়লা পহর অতিক্রম করেছে।

অপেক্ষায় থেকে থেকে ঝিমুনি আসছিল শিবচরণের। খানিক আগে বিপিনকে ডেকে সজাগ থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। শেষে, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ নয়নতারাকে বলেছে পাত পাড়তে, ভাত বাড়তে।

নয়নতারা গা করে নি প্রথমে। সে জানে, পেটে ভাত পড়লে বুড়োর দিক থাকবে না। গরম ভাতের মৌজে ঢুলবে। ঘুমোবে। অসময়ে জাহাজ এলে, ডেকে তোলা যাবে না শিবচরণকে। 'এট্টুন সবুর করলে হয় না—' নয়নতারা

সোজাসুজি কথাটা পাড়ে নি, ঘুরিয়ে বলেছে। 'জাহাজ যদি আইয়া পড়ে…'

'আহক' শিবচরণ দাওয়ায় বসে হুকা টানছিল, নয়নতারার কথা শুনে উত্তপ্ত হ'ল। কল্কি তুলে হুকা নামিয়ে রাখল দুয়ার ঠেসান দিয়ে। 'আইলে আইবো দুই ফর রাইতে আমার কেরায়া যাওনের কাম নাই।'

আর কথা বলে নি নয়ন। আঙিনায় পাতা খেজুর পাটির বিছানা থেকে সে উঠেছে। পাটি গুটোতে গুটোতে দেখেছে শিবচরণকে। এবং হতাশ হয়ে পড়েছে নয়ন। তার খুশী খুশী মন এখন আন্ধার। তুমি যাইবা না যাইবা না… তাইলে কী হইব, কী নয়নের বিষণ্ণ মনে সংশয় এবং উদ্বেগ ভর করছিল।

অনিচ্ছাসত্তেও উঠল নয়নতারা। ভাত নামিয়ে রেখেছিল আগে। উনুনের বেগুন এখন ঘু ঘু ডাক দিচ্ছে। নয়ন তড়িঘড়ি ছুটল পাকঘরের হেঁসেলের দিকে।

হুকা রেখে শিবচরণ এগিয়ে এগিয়ে এল আঙিনা ছাড়িয়ে পুবে। অন্ধকার থমথম করছে চারদিকে। নীচে ধলেশ্বরীর ডাক। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও শিবচরণ গাঙের বুকে চোখ রাখল। ধলেশ্বরী বইছে; বয়ে যাচ্ছে। তার ঘোলা জলের তীব্র স্রোত থেকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক চেকনাই বেরোচ্ছিল। দূরের গাঁও, চকতেলের বাঁক এখন অন্ধকারে মিশ খেয়ে গেছে। শিবচরণ কেমন অন্যমনা হ'ল তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। অভিভূতের মতন অবস্থা শিবচরণের। তার মনে হচ্ছিল ধলেশ্বরীর উদাস হাসির আড়ালে কেউ কাঁদছে। সেই কান্নার সুরটি তার চেনা। খুব বেশি করেই চেনা।

হাঁইপিড়ে করছিল নয়নতারা, শব্দশুনে তন্ময়তা কাটল শিবচরণের। আগে ভেবেছিল ঘাটে নামবে। হাত পা মুখে জল দিয়ে আসবে। কিন্তু এখন আর সে উৎসাহ নেই তার। সটান এসে সে দাওয়ায় উঠল। খেতে বসে পালির জলে হাত ভিজিয়ে আলগোছে সে হাত বুলিয়ে নিল নিজের মুখে।

ভাতের কাসি এগিয়ে দিয়ে সবেমাত্র নয়ন বেগুনের বাটি তুলেছে এমন সময় আচমকা সেই ডাক। সেই ভোঁ রব। ইষ্টিমারের অস্পষ্ট টানা হুইসল। চমকে উঠেছিল নয়ন, আর একটু হলে বেগুনের বাটি মেঝেয় গড়াত। কোনরকমে সে নিজেকে সামলাতে পারল। বাটি নামিয়ে তাকাল সামনের বাধাহীন শূন্য আঙিনায়। ঠিক আঙিনাও নয়, নয়নতারার দৃষ্টি উঠানের ভীরু অন্ধকার ছাড়িয়ে ধলেশ্বরীতে পড়ল। তার দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে বয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরী। আঙিনাটুকু মাত্র ব্যবধান, তারপরেই ধলেশ্বরীর কিনার। পারটা খাড়া, জলের শীর্ষদেশ থেকে ফুট দশেক কি এগারো উঁচুতে এই পাড়া। কোথাও সারিবাধা, কোথাও খাপছাড়া গায়ে গায়ে লাগানো অনেক বাড়ি।

মাছধরা জাত নয়, তবুও মাঝি। জেলেপাড়াও বলে অনেকে। কিন্তু আসলে এঁরা অন্য জীবিকার মানুষ। নদীতে বিলে কি বাঁওড়ে জাল ফেলে রুপালি মাছ ধরে কাঁচা পয়সা কামাইয়ের ফন্দি ফিকির কি নেশা নেই এঁদের—এরা কেরায়াখাটা মাল্লার দল। সমস্ত বৎসর ধরে ছইবাঁধা নৌকা নিয়ে এরা ভাড়া খাটে, যাত্রী আনানেওয়া করে; কখনও কাছেপিঠে কিংবা কখনও বা দু' চারদিনের জন্য দূরদেশে চলে যায় ভাড়া নিয়ে। জমি নেই, জিরাত নেই, চাষবাসের বালাইও না, ওদের ভরসা ও সম্বল একটি করে নৌকা। এই নৌকাই তাদের সারা বছরের অন্ন জোগায়।

সবে কাঁচকলা সিদ্ধ ভাত এক গরাস মুখে তুলেছিল শিবচরণ ভোঁ বাজল তখনই। গরাসটা চট করে গিলতে গিয়ে বিষম খেল একটা। পালির জল গলায় ঢালতে ঢালতে শুনতে পেল গোটা পাড়া জুড়ে ওঠা আচমকা কলরব। পালি নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল শিবচরণ 'ইস্টিমার আইল রে বিপনা—লগি বৈঠা ল…'

'উঠতি গো খুড়া…' বিপিনের সচিৎকার গলা শোনা গেল, 'তুমার হইল নি?'

গলা শোনা গেল, দেখা যাচ্ছিল না বিপিনকে। দেখা যাওয়ার কথাও নয়। শিবচরণের ঘরের বাঁ-হাতি সামান্য পেছন দিকে বিপিনের ঘর, আঙিনা। বিপিনের বউ সরমা তখন সবেমাত্র উজানী জিওল মাছের ব্যাঞ্জনা সম্বরা দিচ্ছিল। বিপিন তার আড়াই বছরের মেয়ের সঙ্গে বকবক করতে পাক শেষ হবার অপেক্ষা করছিল। এমন সময় সিটি আর খুড়ার ডাক তার কানে এল। আর লহমায় উঠে দাঁড়াল বিপিন। কোল থেকে কচি মেয়েটাকে ঝটকা মেরে ছুঁড়ে দেবার মতন সরিয়ে দিয়ে এক লাফ এগিয়ে এল, 'অ খুড়া, আইয়া গেল নাকি সাচাই?'

'হ।'

'তয় আহ জলদি

থালা রেখে হাত ঝেড়ে উঠে পড়ল শিবচরণ।

কাণ্ডটা লহমায় ঘটে গেল। নয়নতারা যেন বোঝা না-বোঝার মধ্যিখানে ছিল। এতক্ষণে আঁচ করতে পারল শিবচরণ উঠে যাচ্ছে, বাড়া ভাত ফেলে। হাত বাড়িয়ে নয়ন শিবচরণের পরনের আটহাতি ধুতি চেপে ধরল। 'কর কি, কর কি গো, বাড়া ভাত ফ্যালাইয়া যায় না দুই গরাস খাইয়া না গেলে মাথা খাইবা আমার।'

কিন্তু বিধিমুক্তি শোনার অবসর কোথায় শিবচরণের। এক ঝটকায় নয়নতারাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল দরজার কাছে। ঝাঁপের ওপর থেকে হ্যাঁচকা টানে গামছা নামিয়ে এনে ত্বরিতে মাথায় বেঁধে ফেলল। হাত বৈঠাটা মাচানের তলা থেকে সরসর টেনে নিয়ে নাওঘাটার বরাবর দিল একটা দৌড়।

সরমা দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। অভুক্ত অবস্থায় বিপিনকে সে যেতে দেবে না কিছুতেই। 'কই যে-বেহুন হইয়া গেছে আমার, তা নি কথা কানে লয়…'

বিপিন জবাব দিচ্ছিল না। যেন কোনো দরকারী দ্রব্য হারিয়েছে তাই কুপি হাতে সারা ঘর সে আঁতিপাতি খুঁজছে, ভীষণ ব্যস্তভাবে। তার ত্রস্ত হাত লেগে মাচানের ওপর থেকে দু'টো মাটির হাঁড়ি মেঝেয় পড়ে ভাঙল। সশব্দে। সেই শব্দ, পিতার এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং মায়ের বেপরোয়া ভাব দেখে বাচ্চা মেয়েটা আচমকা কেঁদে উঠল।

'কামের সুমে দরকারি জিনিস পাওয়া যাইব না। আমার ঘরবাইর এক হইয়া গেছে…' বিপিন ধরা গলায় গজর গজর করছিল। সে ভীষণ বিরক্ত এবং মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এমন বিরক্ত যে, আড়াই বছরের অতি আহ্লাদী মেয়ের কান্না পর্যন্ত সে সহ্য করতে না পেরে, উত্তেজিত অবস্থায় আচমকা ধমক দিল, 'হেই মাইয়া! রাও করবি না কইতাচি— গলা টিপ্যা মাইরা ফেলামু

'ষাট-ষাট ' সরমা দরজা ছেড়ে এসে মেয়ে তুলে নিল কোলে। 'রাগ হইলে নি মানুষের আক্কেল থাকে। মুখে লাগাম লাগাইও কইলাম

'হয় লাগামু…'

'জাহাজ চাড়াবাড়ি ছাড়াইল অখন অত তড়িঘড়ি করনের কাম কী তুমার? মুখে দুই গরাস দিয়্যা যাইতে কই, তা নি কথা শোনে মানুষটা…' সরমা আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে, আগলে থাকে।

'আইয়া খামু নি।' এতক্ষণে নিখোঁজ হারানো দ্রব্যটি খুঁজে পায় বিপিন। থলিয়াটা কখন যেন সে ট্যাঁকেই গুঁজে রেখেছিল। এখন আবিষ্কার করতে অল্প প্রসন্নতা ফুটল তার মুখে, 'দুই ফ-র রাইতের আগেই আইয়া খামু।'

'না'। সরমার গলা শক্ত কঠিন। সে আরও সামান্য পিছিয়ে ভাল করে দরজা আগলাল। 'দূরে পাল্লার ক্ষেরায় হইলে করবা কী? খাইবা কুথায়?'

'দূরে পালায় যামু না।'

'হ' যাইবা না ; তুমারে য্যান আমি চিনি ন্যা।' সরমা মেয়েকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে দু' হাত প্রসারিত করে দাঁড়াল। 'এক যুট মুখে তুল্যা গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইব না···'

কিন্তু তবু কথা শুনল না বিপিন। সরমাকে ঠেলে দিয়ে সে উঠানে নেমে এল। পাক-ঘরের ছচি কোণ থেকে দু'খানা লগি কাঁধে নিয়ে সে এক ছুটে আঙ্গিনা পার হয়ে গেল।

একলা নয় বিপিন, অন্ধকারে দেউলী মাঝিপাড়ার অনেক লোক নাওঘাটার দিকে ছুটেছে। এরই মধ্যে নৌকায় উঠে পড়েছে অনেকে। কেউ পোতা লগি তুলে নোঙর ছাড়ছে। আবার কেউবা আসছে। পিল পিল করে গোটা নাওঘাটা। উত্তেজনা কলরোল হল্লা ! যে কলরোল দূর থেকে ভেসে আসা স্টিমারের অস্পষ্ট হুইস্‌লের শব্দে খানিক আগে মাঝি-পাড়ায় জেগেছিল, সেই কলরব ব্যস্ততা উত্তেজনা যেন একটা মুহূর্তের মধ্যে ঝোড়ো বাতাসের মতন উদ্দাম গতিতে ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ধলেশ্বরীর কিনারে, দেউলীর মাঝি-পাড়ার নাও-ঘাটায়।

এ জায়গাটা প্রায় সমতল। এখানে খাড়া নয় ধলেশ্বরীর কিনার। এই প্রান্তর নদীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে ধলেশ্বরীর জলে। ঘাটার এখানে ওখানে হিজল, জল-ডুমুর, ছাইতান আর বড়ই গাছের জংলাঝাড়ি। তার নীচে জমাট হয়ে থাকা থাকা অন্ধকারে থোক থোক জোনাক পোকা দপদপ করে হলদে-নীলচে আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কাছে-পিঠের কোন বাদাড়ে শিয়াল ডাকছিল। সাব-খাওয়া ঝিলকোট ও কাঁদছে।

দেখতে দেখতে দু'কুড়িরও বেশি লণ্ঠন নেমে এল এখানে। সবার হাতে হাতে লণ্ঠন দুলছে। গোটা নাওঘাটার অন্ধকার যেন লাল সরমে মুখ লুকলো। আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল সমস্ত এলাকাটা। ধলেশ্বরীর শান্ত ছোট ঢেউ একের পর এক ছুটে আসছে পারের দিকে। পারের নরম আঠাতুল্য কাদামতন মাটি বেয়ে গড়াতে গড়াতে উঠে এসে আবার নেমে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ছলাৎ···ছলাৎ···ছলাৎ। পারে লগি-বাঁধা নৌকাগুলো এই ঢেউয়ে নেশাড়ে মানুষের মতন দুলছে, ঢুলছে।

ছুটে এসে বিপিন ঘাটে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গলা ছাড়ল বিপিন, 'খুড়া আইচ নি গো···'

'হ আইচি···' শিবচরণ রাও করল জোর গলায়। 'এই ঠেঁ

গোটা ঘাটটায় জন-মনুষ্যে গিজগিজ করছিল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি-প্রচণ্ড ব্যস্ততা। দু' মুহূর্ত ধরে অন্ধকার নাওঘাটা যেন পরাণ ফিরে পেয়েছিল। দেখতে দেখতে ব্যস্ত লণ্ঠনগুলো মুহূর্তেকে এক এক করে নৌকোয় উঠে গেল। সব নৌকার বাঁধন খুলে লগি তুলে আলোসহ অনেক নৌকা ভেসে পড়ল গাঙ ধলেশ্বরীর জলে।

শেষ নাওটি ঘাট ছেড়ে চলে গেছে, আবার অন্ধকার নামল এখানে। হিজল ছাইতান বড়ই গাছের নীচে ঘন অন্ধকার জমাট হয়ে আসছিল-পোড়া পাতিলের তলার মতন। খানিক আগে কালিঝুল পড়া চিমনির ফাঁক দিয়ে অনেক লণ্ঠনের যে কিম্পন আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল নাওঘাটা আবার তা মরে গেল। ছোট অশান্ত ঢেউয়ের খেলা আর দেখা যাচ্ছে না। লজ্জাবতী জোনাকের দল ঘোমটা সরিয়ে আবার জলা-নেভার খেলায় মেতেছে। গোটা ঘাটে কেবল সেই একটি শব্দই জেগে থাকল। সে শব্দ ঢেউয়ের ছলাৎ··· ছলাৎ··· ছলাৎ

বৈঠার ছপছপানি, লগি ঠেলার শব্দ, হালের মোচড়ের আওয়াজ দেখতে দেখতে দূরে সরে যেতে থাকল। যেতে যেতে, লণ্ঠনের আলোগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ঘাটের কলরোল যেন ভুরায় তুলে স্রোতস্বিনী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খানিক এসে সব নৌকার বৈঠা উঠল। নৌকা তখন স্রোতের মুখে পড়েছে. টানে আপনি ভেসে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লার দল এই অবসরে তৈরী হয়ে নিচ্ছিল। হালে বসেছে একজন, বাকি সব লগি বৈঠা রশি বাদাম ঠিক করছে। ঝাড়ামোছা করে নিচ্ছে ছই-ছাপ্পড় পাটাতন আর চরাট। স্রোতের টানে ততক্ষণে বিনা-বাওয়া নৌকাগুলো তরতর করে ছুটে চলেছে এলাসিনের জাহাজ ঘাটার দিকে।

বৈঠা তুলে, চরাটে এল বিপিন। হাত নামিয়ে দিল ধলেশ্বরীর জলে। জলের ছেঁচা মারছিল, গলুই ধোরে। বোয়া হ'লে হাঁটু মুড়ে আগ-গলুই মুখে নিয়ে করজোড়ে বসল বিপিন। পাঁচ-পীরের বন্দনা করে সে নমস্কার করল। শেষে উঠে এসে পাটাতন সিজিল করল। আগ নৌকার তিন নম্বর ডগরা থেকে বাদাম তুলে গাছিতে বাঁধল। তারপর চলে এল পিছ নৌকায়। ওখানে অন্ধকারে বসে রয়েছে শিবচরণ। হাল ধরে।

খুড়ায় খাইয়া আইবার পারচে নি?' ছই ছাড়িয়ে তেসরা নম্বর ডগরার পাটাতন তুলছিল বিপিন।

'না।' শব্দ করে হালে একটা মোচড় দিয়ে রাও করল শিবচরণ। একটু বাঁ দিকে আগ-গলুই সরে গিয়ে নৌকাটা আড়াআড়ি হ'ল সামান্য। 'তর খুড়ি ছাড়বই না—এক গরাস মুখে নিচিলাম—পালির জল চাইল্যা গিল্যা ফ্যালাইলাম। ভাইগ্যে নাই…' শিবচরণ শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তার কও ক্যান…' ডগরার জমা জলের মধ্যে নেমে সেঁউতি তুলে নিল বিপিন। দু' সেঁউতি জল ছেঁচল। 'হালার কোম্পানীর মা-বাপ নাইক্যা খুড়া। ঠিক সুমে আইব না। আমরা হালার হরিমটর খাইয়া নাও চালামু…।' বিপিন অত্যন্ত দ্রুতভাবে জল ছেঁচতে শুরু করল। আবার থামল বিপিন। 'এমুন সুমে ডাক দিল না, মাথা খারাপ হইয়া গেচিল।' খানিক থম্ ধরে থেকে কি ভাবল বিপিন, শেষে ধরা গলায় বলল 'বেহুঁশ হইয়া না। খুড়া মাইয়াডারে ধমক দিয়্যা কান্দাইলাম।'

'ক্যা কান্দাইলি ক্যা?'

'মেজাদ বিগড়াইয়া গেচিল গা। মাইয়ার মায় আগল জুইড়া খাড়াইচিন কয়, চাড়াবাড়ি ছাড়াইল, তর সয় না তুমার? অই শুইন্যা না হালার রক্ত মাথায় উইঠ্যা গেল।'

শিবচরণের দিকে তাকাতে গিয়েছিল বিপিন, এমন সময় আচমকা ষ্টিমারের সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে এখানে পড়ল। সরতে সরতে আলোটা গেল নদীর বাঁ-পারের দিকে, আবার ঘুরে এল ডানদিকে-শেষে নদীময় ঘুরতে লাগল তীব্র সতেজ আলোর রোশনাই।

ঝলক এসে পড়তে লহমায় মুখ ঘুরিয়ে নিল বিপিন। পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আলোটা ভয়ানক তীব্র, প্রখর। চোখে লাগলে খানিক সময় দুনিয়া অন্ধকার করে রাখে। দেখা যায় না কিছুই। ষ্টিমার যে অনেক কাছে এসেছে আলোর তীব্রতা থেকে তা ধরতে পারছিল সকলে।

আগুপিছু অনেকগুলো নৌকা ভাসছিল। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল স্রোতের টানে। সার্চ লাইট পড়তে হঠাৎ গোটা নদীতে ছড়িয়ে পড়া নৌকাগুলোতে কলরব উঠল। ষ্টিমারের সচল চাকার ঘূর্ণনে ধলেশ্বরীর জল মথিত করার একটা গুরুগম্ভীর শব্দ কানে শুনতে পারছিল ওরা। নৌকার দোলনে অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছিল না জাহাজের দূরত্ব কমে আসছে। ঢেউগুলো বড় হয়ে আসছে ক্রমশ। সবাই এক সঙ্গে পেছনে তাকাল। চোঙ থেকে ওঠা ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। দেখতে দেখতে কাছে-আসা ষ্টিমারের ভেতরকার বিজলী বাতির রোশনাইও দেখা যাচ্ছিল।

'.. আইল, আইল; জাহাজ আইয়া গেল গা …' গোটা গাঙ জুড়ে সচিৎকার কলরব উঠল। এতক্ষণ যারা নৌকার

তোয়াজে ব্যস্ত ছিল বা তৈয়ার হয়ে নিচ্ছিল, হাত বৈঠা নিয়ে ছুটে এল যার যার নৌকার আগ-গলুইয়ের চরাটে। প্রাণপণে বৈঠা টানতে লেগে গেল সকলে।

এলাসিনের জহাজ-ঘাটার আলোও চোখে পড়ছিল। দূর থেকে এতক্ষণ বিন্দু বিন্দু আলোর ফোঁটার মতন দেখাচ্ছিল বাতির মালা, যেন আকাশের তারা অথবা জোনাকির দল জ্বলছে আর নিভছে। এখন যেন ওরা নিভতে ভুলে গিয়ে স্থির হয়েছে ওরা আলোগুলোকে আর জোনাকি বলে ভুল হচ্ছে না এখন।

আগুপিছু অনেকগুলো নৌকা। স্রোত আর বৈঠার টানে খাপছাড়া অগোছালভাবে সব তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রতিযোগিতাই যেন। কে আগে যাবে, আগে গিয়ে কে জাহাজ ঘাটার কাছাকাছি মনোমতন জায়গায় নৌকা বাঁধতে পারবে এ তারই প্রতিযোগিতা। জাহাজঘাটা বরাবর নদীর ধারে সারি বেঁধে ভিড়াবে অগণন নৌকা। বালিবহুল পারে লগি পুতে নৌকা বাঁধা হবে। এবং তারপর প্রত্যেকটি মাঝিমাল্লা প্রতিটি যাত্রির প্রতি শ্যেন দৃষ্টিতে নজর রাখবে। তাকিয়ে থাকবে তৃষিত চাতকের মতন।

এখন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময়। ভরা ভাদর সামনে। গাঙ ধলেশ্বরীর রূপ এখন আলাদা। কানায় কানায় ভরো ভরো হয়েছে, পার ছাপিয়ে বানের জল ঢুকেছে মাঠে ময়দানে, ক্ষেতে খামারে; ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী চড়া চত্বর, জমি জিরাতে এখন জল আর জল। চর নেই চড়া নেই—গহীন ধলেশ্বরীর বুকছাপা ঘোলা জলের তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে; পাক আর ঘূর্ণির চক্র এখানে ওখানে লাট খাচ্ছে।

ধলেশ্বরী এখন পাগল, পুরা উন্মাদ। অস্থির উদ্দাম তার গতি। সে এখন ভয়ানক ভয়ঙ্কর। তীব্র জল কল্লোলে তার সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর ক্ষুধা। ধ্বংসের এক বিচিত্র উল্লাসে মেতে বীভৎস হাসির আতঙ্ক ছড়িয়ে দুর্বিনীতভাবে সে বয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও সামান্য-জেগে-থাকা পার ভাঙছে ঝুপঝাপ করে। মাটির চাঙার নেমে আসছে। ক্ষেত খামার তলিয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরীর জলে। ঘরবাড়ি, গাছগাছালি মনুষ্য পশুর হিসাব কিতাব নাই।

এলাসিনের জাহাজ ঘাটাও ডুবুডুবু প্রায়।

ডাইনে জল, বাঁয়ে জল; টেউরিয়া-ব্যাত্তরাইলের বিল উপচে বাড়তি জলের তীব্র স্রোত পেছনে। ঘোলা পাক খাওয়া জলের অদ্ভুত মত্ততায় এলংজানির যে সরু মোল্লার খাল, হিঙ্গানগরের পাশ বয়ে চকতৈল ছুঁয়ে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাৎ করেছে তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। ডুবে গেছে মোল্লার খাল। হিঙ্গানগর, ছিলামপুর দেউলী-সাইঠান এক, একাকার।

জাহাজ-ঘাটা এখন রবরবা, সরগরম। মিঠাই মণ্ডার দোকানগুলোতে নানা ধরণের বাত্তি জ্বলছে। ডে-লাইট, হ্যাজাক-বাত্তি, গ্যাসের লাইট, ঝাড় লণ্ঠন - হরেক আলোর রোশনাই। সারাদিনের পর বিক্রী পাট্টার মওকা আসছে। আসছে স্টীমার, সিরাজগঞ্জের জাহাজ। অনেক যাত্রী বয়ে, পোড়াবাড়ি চাড়াবাড়ি ছাড়িয়ে এসে এলাসিনের ঘাটে ভিড়বে, আর্ঘনের উজানী টাটকিনির তুল্য ঝুড়িতে ঝুড়িতে লোক নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে। মণ্ডা কিনবে, মিঠাই কিনবে তারপর যে যার মতন নৌকা ধরে ছেড়ে যাবে এই বন্দর। দোকানগুলো তাই আলোর রোশনাইয়ে সেজেছে, যেন মেলায় আসা সুন্দর যৌবনবতী কন্যা।

সকালে স্টীমার যাবে নারায়ণগঞ্জ থেকে। লোক আসে লোক যায়; এলাসিনের জাহাজ ঘাটা ভোর ভোর সকালে জেগে ওঠে। কিন্তু দিনের আলোয় নেশা নেই, চমক নেই, আলাদা মজাদার রোশনাইও না। যতক্ষণ থাকে স্টীমারটা ততক্ষণই যা কলরব, হৈ-চৈ। তারপর ছুই পর পড়ালে, ঝিমুনো জাহাজের চোঙা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে

থাকে। সুখানীরা সজাগ হয়। সিঁটি পড়ে ঘন ঘন। তারপর রওনা হলেন গিয়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজ। খানিক সময় ধরে তখন আবার গুলজার হয় জাহাজঘাটা। ষ্টিমার ছেড়ে গেলে আগের মতই আবার স্তব্ধ নিঃসাড় চুপ। গোটা বন্দর তখন মুমূর্ষু রোগীর মতনই যেন ঝিমোতে থাকে।

সকালের জাহাজের রূপ নেই, ঢং নেই, ঠমকও না। এল কি গেল তার মধ্যেও গরজের বালাই নেই কোনো মনিষ্যির। থাকবেই বা কেন নারায়ণগঞ্জের জাহাজে দশ-বিশ-এর ওপর যাত্রী আসে না কখনও। যারাও আসে তারা কলরব করতে জানে না। যেন আসতে হয় বলেই আসা যেতে হয় বলেই যাওয়া। কিন্তু সিরাজগঞ্জের জাহাজ বয়ে আনে অনেক অনেক যাত্রী। লোক লস্করে ঘাটাখান গিজগিজ করে, মাথায় মাথায় একাকার। তাই সিঁটি শোনার পর থেকেই সাজ সাজ রব। মাঝিরা নৌকা ভাসায় জলে কুলীরা গামছা বেঁধে নেয় কোমরে মাথায়; দোকান-পসার গুলজার। সেই আরম্ভ। তারপর যতক্ষণ থাকে ষ্টিমার এক অদ্ভুত নেশা আর বিচিত্র কলরোলে মাতিয়ে রাখে এ-জায়গাটাকে। আসা থেকে যাওয়া পর্যন্ত এক বিচিত্র প্রাণস্পন্দন। তারপর এখানকার জনমনিষ্যি ছেড়ে যাওয়া জাহাজের পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সহসা তাকাতে পারে না কেউ এ-ওর মুখের দিকে; যেন বুক থেকে কলিজা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল সিরাজগঞ্জের জাহাজ।

ছোট দ্বীপের মতন কেবল যেন মাথাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে এলাসিনের বন্দর। পেছনে থলথল করছে টেউরা-ব্যাতরাইলের বিল উপচানো ঘোলা জল। আর মাঝি মাল্লাদের নৌকাগুলো জাহাজ-ঘাটার পেছনে অর্ধ-বৃত্তাকারে সারি বেঁধে লেগেছে আগুপিছু না—সব সারি বাঁধা। যেন যাত্রীরা সব নৌকা ঘুরে দরদস্তুর করতে পারে।

সেউলী মাঝিপাড়ার যে নৌকার দলটি ভেসে আসছিল অন্ধকার ধলেশ্বরীর বুক বেয়ে স্রোতের টানে ত্বরায় এসে তারা এক এক করে ভিড়ল।

হাতের বৈঠা রেখে লগি তুলল বিপিন। দাঁড়াল সোজা হ'য়ে। টান। লগির ঠেলা দিয়ে নৌকার গতি সামলে নিয়ে শ্রান্ত গলায় ডাকল বিপিন।

'কও'···

কথা কইল না বিপিন। নীলদাঁড়া টান করে দাঁড়িয়ে, খালি গায়ের বুকের প্রশস্ত এবং চওড়া ছাতি মেলে জোরে নিশ্বাস নিয়ে জাহাজ-ঘাটার ওপর আগে সোজা তাকাল বিপিন, পরে ঘাড়-ঘুরিয়ে মন্থরগতিতে আসা ইষ্টিমারের দিকে।

'কী জানি কইচিস; অ-বিপিন ছইয়ের ওপরে পিছগলুই থেকে শিবচরণের রাও ভেসে এল। শিবচরণ উঠে দাঁড়িয়েছে।

'জাহাজ···' বিপিন জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেনে টেনে নাম উচ্চারণ করল। তারপর চুপচাপ।

জাহাজ-ঘাটার দোকান-পসারের অনেক হ্যাজাক, ডে-লাইট, গ্যাসবাতি আর লণ্ঠনের আলোর কিছু মলিন অংশ সারিবাঁধা ভিড়ানো নৌকাগুলোর ওপর আবছাভাবে পড়েছিল। এ-রোশনাইয়ে পুরা মনিষ্যি চোখে পড়ে না—গা গতরটাই খালি মালুমে ঠাহর করা যায়। শিবচরণ দেখল, এক সারিতে কয়েক কুড়ি নৌকা ভিড়েছে। সেউলী, মাইঠ্যান টেউরা। রূপসী ছিলামপুর আর বেতরাইলের মাঝিপাড়া ভেঙে পড়েছে এলাসিনের জাহাজঘাটায়। কলরব আর উল্লাস। জন-মনিষ্যি গিজগিজ করে বানের ঘোলা জলের স্রোত গাঙ-বিল এক করে জিগির ছেড়ে বয়ে যায়—কুলিরা মাথায় ফেটি বেঁধে দৌড়ায়—মিঠাইয়ের দোকানে ব্যস্ততা। যেন গোটা ঘাটা টানা গলায় বলে যাচ্ছিল আইল, আইল, সিরাজগঞ্জের জাহাজ আইস্যা গেল....

খালি থক্ থক্ পারে সর সর করে উঠে গিয়েছিল নাও; বিপিন আঠহাতি ধুতি খাটো করে কোমরে গুঁজে নেমে

পড়ল। আগ-গলুয়ের পাশে পিঠ লাগিয়ে ঠেলে নামাল নৌকাটাকে। তারপর কেওড়া-ফসকায় রসি বাঁধল লগিতে।

লণ্ঠনটা আগ গলুইয়ের চরাটে রেখেছে বিপিন। কালি-পড়া চিমনির ফাঁক গলে পড়া অল্প হলদে আলোর শিবচরণ মুখটা দেখতে পেল বিপিনের। ঘাম জমেছে মুখে। তেল তেল ভাব লেগে রয়েছে। লণ্ঠনের আলো ও-মুখে পড়ে চেকনাই দিচ্ছিল। পিছল পিছল মুখ। ওই মুখ দেখে শিবচরণ কেমন আনমনা হয়ে গেল। হঠাৎই যেন কয়েক বছর আগের দিনে চলে যেতে পারল সে।

'খুড়া···' খাটো গলায় ডাকল বিপিন।

'কিছু কইবা?'

'হয়··।' মুখ গলা মুছে নিয়ে বিপিন গামছাটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল প্রায় আক্রোশের সঙ্গে। এগিয়ে এল ছইয়ের দিকে! ছইয়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল, 'আগোাইয়া আহ দেহি

বিপিনের গলা কাঁপছিল, মুখে চাপা স্বরের কথা। শিবচরণ কিছু ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু একটা কিছু ঘটেছে তা বুঝল। 'কিসের য্যান গন্ধ পাই বিপিন।' ছইয়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল শিবচরণ। কান পাতল।

'হালায় আইচে, খুড়া···' দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল বিপিন। 'হুমুন্দির পুতে দেইখ্যা গেল···'

'কার কথা কও?'

'ব্যাত্তয়াইলের মুকুন্দ দাসে···'

'মুকুইন্দ্যা···' চমকে উঠল শিবচরণ। আচমকা তার গলা থেকে কথা পিছলে গেল। রক্তেও বান ডেকে উঠেছে যেন। খপ্ করে শিবচরণ ছইয়ের বাতা চেপে ধরল ভীষণ উত্তেজনায়। গলা কাঁপছিল, গা গতরও থরথর করছে— 'তারে তুই সাচাই দেখচস্ বিপন্যা···'

'হয়।' ঢোক গিলল বিপিন। এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবচরণের বাতা-ধরা হাতটা ভীষণ আক্রোশে চেপে ধরে ফেলল। যেন গুড়িয়ে ফেলবে।' তুমি কও খুড়া, হুকুম ছাড় একবার; আমি হালার পুতের চান্দিখান্ লগির পাড়ে দুই খান কইয়া দেই।'

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম ছাড়তে পারল না, শিবচরণ। রাগে আক্রোশে লোভে কালনাগিনীর তুল্য সে ফুঁসছিল। রক্তে ঝড় উঠেছে। চোয়াল শক্ত পাথর হয়ে আসছিল। মাথার মধ্যে যেন চৈতি বাওর ঘুরপাক খাচ্ছে, কান দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছিল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা অস্পষ্ট···

'চুপ মাইরা থাইকো না; রাও কর···' বিপিন মাত্র একটা কথার জন্য ধৈর্যের টুটি চেপে অপেক্ষা করছে; কথাটা পেলেই বউরা বাঁশের নতুন লগি নিয়ে সে লাফিয়ে পড়বে। এবং মুহূর্তেকে একটা লাস নিয়ে গোটা লগিটা ধলেশ্বরীর ঘোলা জলের পাক-খাওয়া স্রোতে গিয়ে ছিটকে পড়বে। কেউ বুঝবে না, জানবে না কি হল। কেবল সারা জাহাজ-ঘাটার মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার খানিক জেগে থাকবে। তারপর সব ঠিক। যেমন আছে জাহাজ-ঘাটা তেমনি থাকবে।

'উ একলা আহে নাই ক্যা বিপন্যা, লগে মানুষ আচে মনে লয়···'

'থাহুক; মাইনষের কথা কইয়া তুমি আমারে ভড়কাইবার পারবা না খুড়া। আমার বাপে অ্যামন পুত্তরের জনম দ্যায় নাই আমারে · হুকুমডা ছাড় কইলাম···

শিবচরণ তবু চুপ। সে জানে, এতদিন পড়ে যখন মুকুন্দ দাসে এসেছে জাহাজ-ঘাটায়, সে খালি হাতে আসে নি। কারণ তার জানা আছে, দেউলীর বাঘে কুড়িখান মাস ধরে ওৎ পেতে আছে। ধরলে কবুতরের মতন ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে তাকে। জেনেও যখন মুকুন্দ এসেছে, তখন ধরে নিতে পারা যায়, সঙ্গে সে লোক এনেছে; লাঠিয়াল। বিপিনকে সে হুকুম দিলে এখনই একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে এখানে।

'খু—ড়া···' বিপিন প্রায় হুঙ্কার ছাড়তে গিয়েছিল। এমন সময় সহস্রেক আলোর রোশনাই নিয়ে স্টীমারের সার্চ লাইটের তীব্র আলোর ঝলক এসে পড়ল ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে সিটির টানা শব্দটাও বেজে উঠল বঁ···অ···অ....অ....

জাহাজ ঘাটের চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়েছে। এবার পারে লাগবে। . (ক্রমশঃ)

বিষণ্ণ স্মৃতির বেলা — স্নেহাকর ভট্টাচার্য

বিষণ্ণ স্মৃতির বেলা নিয়ে আসে আসন্ন গোধূলি।
অস্পষ্ট মুখের ছায়া ফিরে আসে পুরনো ক্ষতের মুখ খুলে যায়
বলে
তোমাকে প্রথম পাওয়া মনে হয় পুনরায় পাওয়া ;
পুনরায় পাওয়া মানে আমি কী আবার
স্মৃতির শিকার হবো ? ছড়ানো চুলের গন্ধ অবসন্ন বাহুতে
আমার
স্তনের কোমল শিহরণ
ফোটায় বিষাক্ত ফুল নির্জন চিন্তার মাঠ জুড়ে।
গভীর মাধুরী থেকে দুচোখ সাঁতার কেটে চলে যায় ; দূরে
নিয়ন-নীলিমা জলে ফুটপাতে দু আনার মায়াবী পশরা
রঙিন বেলুন ভেঁপু মুগ্ধ জনতার ভিড়ে আমার অমল
ভালোবাসা
কবেকার হারানো বালক
রাস্তার পঙ্গু ও বোবা ছেলেটার মত
আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রিয়তমা স্থির হও তুমি—
কেননা তোমাকে নয় অস্তিত্বের কাছে
তিনবার অস্বীকার করেছি নিজেকে। তাই জানো না এখন
আলিঙ্গনে আমাকে বাহুতে বেঁধে তুমি
কত অবাস্তব মানুষের ব্যথা রেখেছো জড়ায়ে। তবু তুমি
দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো একদিন অনেক নক্ষত্র মরে গেলে

প্রথম স্বরুর মত স্মৃতিহীন এসে
খুশিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি
তোমার নয়নে ডুবে যাবো

গুণিনের বীণা — বাসুদেব দেব

তিমির সঙ্কুল রাত্রি গান্ধারীর মতো এলোকেশী,
খুঁজে ফেরে মৃত সন্তানের মুখ। পরিচিত নিথর
নক্ষত্রেরা নিপতিত, শত্রুরা সকলে ছদ্মবেশী,
বন্ধুরা পুতুল মাত্র, ঘরে নিঃসঙ্গতা, পথে ভিড়।
নিসর্গ দুর্যোগ-ঘন, বাসস্থান গুপ্ত জতুগৃহ।
'এখন কোথায় যাবো ?—প্রতিধ্বনি নিষ্ঠুর নিস্পৃহ।

ফিরিওয়ালার মতো সারাদিন সূর্য নগরীর
অলিগলি হেঁটে গিয়ে নিঃস্বতায় অন্ধকারে ডোবে,
নটিনী তিমিরময়ী, লক্ষ্যহীন পথের অস্থির
শিকার বিকার বকে' শেষকালে হাসপাতালে শোবে।
হৃদয় মৃগয়াকামী, গন্তব্য যে কোথায় জানি না।
বধিরের বড়ো শখ শুনতে সেই গুণিনের বীণা

রাত্রির নাটকে — প্রভাকর মাঝি

রাত্রির নাটকে আমি প্রতীক্ষায় বিস্মৃত নায়ক।
চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত লাভাস্রোত অস্থিরতাময়
কাঠঠোকরার মত ঠুকরে খাচ্ছে শান্তিকে এখন—
কে তুমি উত্তুরে হাওয়া, হু হু করে উঠলে এ সময় ?
সময় খুঁড়িয়ে হাঁটচে। চতুরালি ধরতে পারি তার।
ঝিঁঝির ঝিঁঝিট শুনচি। ঘুমোবে না ওরা ? এক রাশ
হানাদার অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে ঢুকল এসে ঘরে,
নিয়নের মেলোয়েম আলোকেও করে শেষে গ্রাস।
ক্রমশ : তলিয়ে যাচ্ছি। নেই আলো। স্মৃতিভ্রংশ। প্রেম।
মুখচোরা টাইমপিসটা মওকা পেয়ে জানায় ধিক্কার।
মনে হচ্ছে পৃথিবীতে অন্য কোনো অনুভূতি নেই
সীমান্তের দুই রক্ষী অস্থিরতা আর অন্ধকার।
অমল জ্যোৎস্নার হাসি তুমি যেমনি নিয়ে এলে ঠোঁটে
পলাতক অন্ধকারে নব্যগ্যের নীল পর্দা ওঠে।

অন্যান্য কথা বল   গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমাকে এখন অন্যান্য কথা বল।
অর্থাৎ কল্যাণের, শান্তির, সৌন্দর্যের কথা।
এই সবই আমি এখন শুনব এবং শুনতে চাই।
প্রেম, ভালবাসার জন্য যে সব আকাংখা,
মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের যে সব আগ্রহ—
সেই সব কথা শুনবার জন্যই হৃদয়, বন্দী বিহংগের মত,
বহুদিন থেকে একাকী ছটফট করছে!

পৃথিবী হেলাফেলার একটা ক্যাম্বিশের বল নয় যে
যখন খুশী তাকে যুদ্ধের মাঠে ছুঁড়ে দেওয়া যায়!
শান্তির জন্য এখনো আমাদের অনেক, অনেকদূর
এগিয়ে যেতে হবে।
মানুষকে মানুষ হিসেবেই আরো গভীর, গভীরভাবে বুঝতে
হবে।

এই আকাশ প্রান্তর, সমুদ্রের মতই
এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ—
মানুষের রক্তের ভিতরে সবই রয়েছে, রয়েছেই।
সে সব আহরণ না করার তৃপ্তি এবং কৈফিয়ৎ কি?

একবার বাগানের ঐ ফুটন্ত ফুলগুলির দিকে,
আরেকবার দুনিয়ার শিশুদের দিকে তাকাও।
সকল নারীকেই তোমার জননীর পাশাপাশি
অবনত শ্রদ্ধায় পুষ্পার্ঘ নিবেদন কর।
এবং দেখো, আরো প্রত্যক্ষ কর:
স্বর্গের দেবীরা এই মাটির পৃথিবীতেই বসবাস করেন।
আমি সকল নারীর কথাই বলছি—সকল নারীই আমাদের
মা, মা।
সকল পুরুষের কথাও বলছি—তারা আমাদের ভাই, সহোদর
ভাই।
নিজের মা, ভাই কি সন্তানকে কে কবে হত্যা করে, করেছে?
ইতিহাসের পংককুণ্ডে যে এক-আধটা শব পাওয়া যায়—
কখনো তারা ইতিহাস নয়, ইতিহাস নয়।

আমাকে এখন অটুট বিশ্বাসের কথা বল।
আমি এখন নিঃসংশয় হ'তে,
জীবনের অনন্ত সৌন্দর্যে মগ্ন নিবিষ্ট হ'তে চাই।
আমি জেনেছি, জেনেছি—সৌন্দর্যই কল্যাণ
এবং এই কল্যাণের পথেই একমাত্র আসতে পারে—শান্তি।
এই শান্তির জন্য যতদূর এগিয়ে যেতে হয় চল, যাব।
বস্তুত, ভালবাসাই একমাত্র ঐশ্বর্য—
এ জীবনে যা অবিনশ্বর!

হৈমন্তী   রত্নেশ্বর হাজরা

তুমি বলেছিলে, যুদ্ধ থেমে গেছে—লড়াই নেই আর
সিঁদ কেটে ঘর ভ'রেছে যুবতী গাভিন ইদুঁর,
তুমি বলেছিলে, জলপাই-পাকা রাত কুয়াশার
চলো খামারের গন্ধে বুকের নন্দিতপুর
ভ'রে তুলি, সব যুদ্ধ থেমে গেছে—লড়াই নেই আর।

তুমি বলেছিলে……। অথচ থইথই কাজল সাগরেরা
উঠোন পায়ে ক'রে বিদেহী জুজুদের সফল অভিসার
ভয়ের হাত-ধরা ভূগোলে অনিকেত দিনের চলাফেরা
কালের নাগাসাকি এখনো কথা কয়, সুয়েজে বারবার
ভিয়েতে সাইপ্রাসে লাওসে কোরিয়ায় দাবাড়ে দৈত্যেরা,
অথচ বলেছিলে, যুদ্ধ থেমে গেছে—লড়াই নেই আর।

আমরা ইতিহাসে হামেশা মুখোমুখি—ঝড়ের মুখোমুখি
রুক্ষ পাহাড়ের শিখরে যেন এক তরুণ দেওদার
অস্তি নাস্তির সীমানা ছুঁয়ে থাকা নিজের মুখোমুখি।
অথচ বলেছিলে, যুদ্ধ থেমে গেছে—লড়াই নেই আর।

জোয়ার

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিজন কুমার ঘোষ

এক

এদিকটা বড় নির্জন, বড় নিঃশব্দ। সহসা মানুষজনের সাড়া পাওয়া যায় না। একটি মাত্র বড় রাস্তা এ অঞ্চলের। ঐ একটি মাত্র বড় রাস্তা বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে বেরিয়ে কসবার ভিতর দিয়ে হালতুর শরীরের প্রধান ধমনী হয়ে যাদবপুর স্টেশনের দিকে চলে গেছে। মটর গাড়ির সাক্ষাৎ এখানে কালেভদ্রে পাওয়া যায়। শহরে যারা হাঁফিয়ে ওঠে, সেই সব ক্লান্ত মানুষদের মাঝে মধ্যে দেখা যায় এ অঞ্চলের পড়ন্ত বড়লোকের বাগান বাড়িতে। তখনি হালতুতে যেন সাড়া পড়ে যায়। পাখিরা দূরে উড়ে পালায়। গ্রামোফোনে কোন আধুনিক ফিল্মের গান বাজতে থাকে। হৈ-চৈ—কলকণ্ঠ। নতুন নতুন শাড়ি—নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ। পানাপুকুরের জলে ঘন ঘন ঢেউ। কচি জামরুল পেয়ারা গাছের ছায়ায় অশান্ত ভিড়। পরদিন পড়ন্ত বড়লোকের ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে পোড়া কাঠ, ইটের উনুন, ওভালটিনের শূন্য টিন, সেপটিপিন, ডিমের খোসা, কলাপাতা। কেউ কেউ তাদের আপদ ভাবে। বলে, সুখের পায়রা। উপমা দেয়, কমলবনে মাতাল হাতি। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে—নির্জনতার ভিতরে অবাঞ্ছিত ঝড় তুলে বিদায় নেয়। কেউ কেউ তাদের আবার স্বর্গের দূত ভাবে—ভাবে অপ্সরা। ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে তাদের অশান্ত চোখ ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দেয়। বাতাসে বিলিতি প্রসাধন দ্রব্যের উগ্র ছোঁয়া পুলকিত নাকে এসে লাগে। সকালের প্রথম রোদ তাদের বহুমূল্য শাড়িতে লেগে দশ দিকে দশ রং নিয়ে ঠিকরে পড়ে। এই যে পুরোন বড়লোকের বাড়ি, এলোমেলো কলাগাছের ঝাড়, অবিন্যস্ত ঘাস, লেবুগাছের ক্রম-প্রসারমান ডাল, আম জাম বকুলের অন্ধকার ছায়া, তক্ষক-ডাকা পুকুর ঘাট—এর মধ্যে স্বর্গের অপ্সরাদের সোনার পদ-পাত বড় ক্ষণস্থায়ী আর ভঙ্গুর। কেননা, কেন্দ্রচ্যুত তারার মতন সূর্যদেব পশ্চিম সমুদ্রের জলে অবগাহন করতে বেগে নামতে থাকেন। বিকেলে যখন পেছনের ক্যারিয়ারে ডেগ কড়াই হাতা খুন্তি নিয়ে নীল রঙের বড় মটরখানা শহরের দিকে হারিয়ে যেতে থাকে তখন কারো কারো শূন্য বুকের প্রান্তর থেকে করুণ দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে। দিন গেলে, আবার সুখের পায়রারা কবে আসবে।

সত্যিই, হালতু জায়গাটা বড় নির্জন। আর সেইজন্যেই জায়গাটা খুব সুন্দর। আজ থেকে ছ' বছর আগে পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসে পছন্দ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রায়। মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায় চার বিঘে জমি কেনেন। রামলালের বাজার ছাড়িয়ে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে বড় রাস্তার ধারে এই জমিটা। বলতে গেলে জলের দর। অনেকে তখন ভয় দেখিয়েছিল। বলেছিল, ডাকাতের রাজ্য। শহরে-বন্দরে ডাকাতি করে, রাত্রি হলে এইখানে এসে আশ্রয় নেয়; পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বনে-জঙ্গলে মশার মত মিশে থাকে। তাছাড়া বর্ষা হলে সাঁতার না জানলে ডুবে মরতে হয় পথে ঘাটে। ভাঙা দোকান-পসার

নেই। কলকাতার ডবল দরে বিক্রী হয়। সাপের ভয়। যাতায়াতের অসুবিধে। হাসপাতাল দূরের কথা ভাল একটা ডাক্তারখানা পর্যন্ত নেই। কিন্তু সুরেনবাবু শুভাকাঙ্খীদের কথায় মুচকি হেসেছিলেন। তারা গোপনে বলাবলি করেছিল, পাগল। লোকটা বিষয়-আসয় খুইয়ে পাগল হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে এইবার মজাটি টের পাবে।

পূর্ণশশী দেবী প্রতিবাদ করেছিলেন। অবিশ্যি মৃদুকণ্ঠে। যে টাকাটা খরচ হচ্ছে সেই টাকায় এর চাইতে অনেক ভাল জমি পাওয়া যায়। সেখানে ইলেট্রিকের আলো, কলের জল, পিচ বাঁধানো রাস্তা, স্কুল কলেজ, হাট-বাজার—সবই আছে কাছে পিঠে। অবিশ্যি ঐ টাকায় ওখানে চার বিঘে হয় না ঠিকই, কিন্তু ছ' সাত কাঠা তো হয়। আর তিনজনের সংসারে তা এমন কি কম? কিন্তু এবারেও সুরেনবাবু ওই ভাবে মুচকি হেসেছিলেন। এতগুলি সুবিধে ডিঙিয়ে ওই অসুবিধের রাজ্য দেখতে গেলেন এক সকালে। ঠিকই তার পর দিনই ধা করে কিনে ফেললেন জমিটা চোখের পলকে। যেন হারিয়ে যাচ্ছিল; যেন মূল্যবান সম্পত্তিটা আর কেউ কিনে নিচ্ছিল।

জমিটা কেনবার পরেই ওখানে বাস করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন সুরেনবাবু। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে তো বাস করা যায় না। বাড়ি ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডের এক ভাড়াটে বাড়িতে। খান তিনেক ঘর কোন মতে তৈরী হতেই চলে এলেন। পূর্ণশশী দেবীর মনে হল জমজমাট রাজ্যপাট ছেড়ে বুঝি বা বনবাসে এলেন।

ওই চার বিঘা জমিতে একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর মাত্র ছিল। নানা ধরণের পানাও ছিল তাতে। পুকুরের চার পাশে নারকোল আর সুপুরীর গাছ ছিল দুই হাত পর পর। তাছাড়া আরো অনেক রকমের ফলের গাছ, যেমন আম কাঁঠাল জাম জামরুল সফেদা; ফুলের মধ্যে মধুফুল করবী কৃষ্ণচূড়া গন্ধরাজ যুঁই—এসবও ছিল। সারাদিন ওই সব গাছ গাছালি ছায়া দিয়ে দিয়ে চার বিঘা জমিকে শীতল রাখে। সারারাত ফুলেরা ঐ এলাকার বাতাসকে মদ খাওয়াবার ভার নেয়। তবে এসব আর কেউ লক্ষ্য না করুক, সুরেনবাবু ঠিকই করেছিলেন। শুভাকাঙ্খীরা এবারও উপদেশ দিতে এসেছিল, ঘাস কাটা কল কিনুন রায় মশাই। আজে বাজে গাছগুলো কেটে ফেলুন। তারপর সব এক লাইনে লাগান। বড্ড জট পাকিয়ে রেখেছে জায়গাটা। কিন্তু এবারও সুরেনবাবু ওদের কথায় মুচকি হেসেছেন। একটা গাছের গায়েও হাত দেননি। কণ্ট্রাক্টরকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন ভাবে বাড়ি তৈরী করতে যাতে গাছের ক্ষতি না হয়। দরকার হলে বরং বাড়ির সেপটাকে বদলে নিতে বলেছেন। তবে পুকুর থেকে পানাগুলো তুলে ফেলেছিলেন। পুকুরটাকে গভীর করবার জন্যে কিছু মাটিও উঠিয়েছিলেন। তারপর পুরোন পুকুরের মাটি সার হিসেবে ব্যবহার করেছেন ফুলগাছের গোড়ায়।

বাড়িটা ছোটর ওপর মন্দ নয়। একতলার চারখানা ঘর। দোতলায় দু' খানা। দোতলার ঘরের সামনে মস্ত বড় রেলিং দেওয়া বারান্দা। দোতলার একটি ঘরকে লাইব্রেরী বানিয়েছেন। অন্যটি আলোকের পড়ার ঘর। রঙের মধ্যেও সুরেনবাবু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। ভেতরটা সাদা, বাইরেটা ঘন নীল। দরজা জানালা সবুজ। রেলিং খয়েরী। বাড়িটা তৈরী হলে কিছু ইঁট বেঁচেছিল। সেগুলো এবং সেই সঙ্গে কিছু মোটা শক্ত কাঁটাতার কিনে চার বিঘা জমিটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর চলেছিল বন মহোৎসবের পালা। সত্যি, এমন অরণ্যপ্রেমিক দেখা যায় না এ যুগে। গ্লোব নার্সারীর দামী দামী দিশি বিলিতি ফল ফুলের গাছ মাথা তুলতে ও ডালপালা বিস্তার করতে থাকল ঋতুতে ঋতুতে।

• • • •

এই বাড়িটাকে পূর্ণশশী দেবীর অভিশপ্ত পুরীর মত মনে

হয়। দূর থেকে গাছপালার ভিতর নীল রঙের বাড়িটাকে দেখলে বুকের মধ্যে হু-হু করে। সেই রাক্ষসীর কথা মনে হয়, আশ্রয় দেবার নাম করে যে নদীর ওপার থেকে লেবু ছিঁড়ে এনে নিদারুণ আপ্যায়ন করেছিল। এ-ও তেমনি। জমজমাট স্টেশন রোড থেকে ফল ফুল গাছপালার মায়া দেখিয়ে টেনে এনেছে সেই রাক্ষসী। প্রথমেই নিদারুণ আপ্যায়ন করেছে বাড়ির বুড়ো ভালমানুষ কর্তার সঙ্গে। তারপর একে একে আগুনের হাঁ বিস্তার করবে আলোকের দিকে—পূর্ণশশীর দিকে। পূর্ণশশী দেবী নিজের জন্তে একটুও ভয় পান না। নিজেকে বহুদিন থেকেই আপদ ভাবছেন। এই পৃথিবীতে ঘোর অবাঞ্ছিত মনে করছেন নিজেকে। দুঃখ সইবার শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু সেই শক্তি তাঁর মোটেই কাম্য নয়। এই শক্তি দুঃখকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেয়। তাঁর যত ভয় আলোককে নিয়ে। মহব্বতপুরের রায় বংশের শেষ জীবিত ধারা। এই শেষ জীবিত ধারার কথা মনে হলেই বুকটা হু-হু করে। ইচ্ছে হয় আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে, সেই নিরুপায় লোকটা যেমন রাক্ষসীর বাড়ি থেকে অন্ধকার মাঠে দৌড় দিয়েছিল, সেই ভাবে দৌড়ে স্টেশন রোডের বাড়িতে পৌঁছে যায়। যেন সেখানে মৃত্যু নেই। যেন সেখানে মৃত্যু এসে ইলেকট্রিকের আলো দেখে, কলঘরে জলের শব্দ শুনে, মানুষজনের অফুরন্ত সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। পূর্ণশশী দেবীর সেই রকমই বিশ্বাস।

মৃত্যুর মাস তিনেক আগে সুরেনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হয় বাড়িটার একটা নাম দরকার। এ ব্যাপারে তিনি আলোকের মত নিয়েছিলেন। 'পুলক-পূর্ণিমা ভিলা'। বৌবাজারের এক পাথরের দোকান থেকে শ্বেত-পাথরের ওপর ঘন নীল রঙে বাঁকা ভাবে লিখিয়ে এনেছিলেন। কি গভীর মমতা ছিল তার! রাজমিস্ত্রী যেদিন গেটের পাশে মাধবীলতার কুঞ্জ একটা বাঁশে ঠেস দিয়ে রেখে সিমেন্ট দিয়ে 'পুলক-পূর্ণিমা ভিলা' আটকে দিচ্ছিল, তিনি প্রায় সারাক্ষণ একটা চেয়ার পেতে পাশে বসেছিলেন। পূর্ণশশী দেবী লক্ষ্য করেছেন প্রায় সারাক্ষণই তিনি দুধের মত সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছেছেন।

মনে পড়ে মহব্বতপুরের রায় বাড়ির বৌ হয়ে যখন আসেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র পনের বছর। এখনকার তুলনায় বলতে গেলে খুকি। বাপের বাড়ি ছিল সামান্য ঘর। তাদের না ছিল টাকা পয়সা, না ছিল অন্য কিছু যা নিয়ে আত্মীয়তার গর্ব করা চলে। বলতে গেলে বিয়ে হয়েছে রূপের জোরে আর তথাকথিত কৌলিন্যের খাতিরে। প্রথম প্রথম খুব ভয় করেছিল। মহব্বতপুরের রায় বাড়ি—জমিদার বাড়ি। কিন্তু পূর্ণশশী দেবী নিখুঁত ভাবে মিশে গিয়েছিলেন এই বাড়ির উদার আবহাওয়ার মধ্যে, যেমন ভাবে ফুলের মধ্যে সুগন্ধ মিশে থাকে। শ্বশুরমশাই ধীরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বাড়ির কর্তা। কত বড় জমিদারের বাড়ি। কত চাকর-বাকর, লোকজনে পরিপূর্ণ। গমগম করত তিনতলা বাড়িটা। বাড়ির ছাদে উঠলে বা বারান্দায় দাঁড়ালে পদ্মানদী দেখা যেত। কত রকমের রঙিন পাল নিয়ে বড় বড় নৌকোগুলি গোয়ালন্দের দিকে ভেসে যেত সারা দুপুর। বাড়ির খিড়কি দুয়ার দিয়ে ছোট একটা পথ ছিল, সেটা সোজা পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। সেই পথের দু'ধারে ঘন বাবলা গাছের সারি। ছোটবেলায় আলোক কলকাতা থেকে বেড়িয়ে গিয়ে ওই রাস্তাটার নামকরণ করেছিল, ধীরেন্দ্রনাথ রায় রোড। চলে আসবার কিছু আগে পূর্ণশশী দেবী একটির পর একটি বাবলা গাছকে পদ্মায় তলিয়ে যেতে দেখেছিলেন। দুরন্ত জল বাড়ির খুব কাছে এসে ধমক দিতে শুরু করেছিল। ফুলের বাগান ছিল মস্ত বড় ঢেউ খেলান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ফুল বাগানের পাশেই মালীদের ঘর। জগন্নাথ নামে এক মালী ছিল—মেদিনীপুরের লোক। রোজ বিকেল বেলায় গা ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতেন জগন্নাথ একটা মস্ত বড় কাঁচি দিয়ে ফুল গাছের অবাধ্য ডালপালাগুলিকে ছেটে দিচ্ছে।

পূর্ণশশী দেবীর বুকটা হু-হু করে এইখানে এসে। পনের বছর বয়সে মহব্বতপুরের রায়বাড়িতে একটা বীজের মত উড়ে এসে পড়েছিলেন। কালে কালে সেই বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে তিনটে ডাল বেরিয়ে আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল। তিনটে ডালের নাম পুলক, পূর্ণিমা, আলোক। জগন্নাথের মত কোন্ এক বিপুল মালী এসে তাদের চিরকালের মত ছেঁটে দিয়ে গেছে। বাকী আছে এক আলোক। পূর্ণশশী দেবীর তাই ভয়। আলোক ও অনেকটা বাপের মতই। গাছ-পালার, নির্জনতার, নিস্তব্ধতার আকর্ষণ বাপের মতই প্রবল। তিনি বিদায় নিলে পূর্ণশশী দেবী বাড়িটা বিক্রী করে আবার ষ্টেশন রোডের বাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ইলেকট্রিকের আলো, কলের শব্দ, মানুষ-জনের অফুরন্ত সাড়া দুঃখকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু সম্ভব হল না আলোকের জন্য। বাপের মতই অসম্ভব জেদী আর জীব বিশেষের মত গোঁ। পূর্ণশশী দেবী এক নাগাড়ে বেশীদিন শহরে থাকেননি। মহব্বতপুর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছেন। মাস খানেকও হয়ত পুরো কোন বার থাকেননি। কেননা, রায়বাবুরা পছন্দ করতেন না শহর। বলতেন, শহরের যা কিছু সুখ সুবিধে সে তো আমরা বাড়িতেই মজুদ রেখেছি। সত্যিই, তখন মহব্বতপুরের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি চলত। ডায়নামো ছিল। ঘরে ঘরে আলো, পাখা, রেডিও—সবই ছিল। রায়বাবুরা বলতেন, শহরে বড় ভিড় আর চিৎকার আর অকারণ উত্তেজনা। কিন্তু সেই উত্তেজনাহীন মহব্বতপুর ছেড়ে এসে কিছুদিন ষ্টেশন রোডে বাস করতেই পূর্ণশশীদেবী বুঝতে পারলেন জীবনের অনেকখানি সময় গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গেছে। ডায়নামো থাকলেও গ্রাম গ্রামই। কলকাতার সঙ্গে মহব্বতপুরের কোন তুলনাই হতে পারে না। পাকাপাকিভাবে কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম এবং স্থূল পার্থক্যগুলি যেন এক লহমায় বুঝে ফেললেন পূর্ণশশী দেবী। কেন যে রায়বাড়ির কর্তারা আর্থিক সামর্থ্য এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এতদিন শহরে আসতে চাননি বুঝতে পারেন না। শহর কখনই বিষাদ হতে জানে না। মনকে কখনও একলা রাখতে বা দুঃখ ডেকে আনতে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে গ্রামে বাস করতে হলে মনের সেই প্রবৃত্তি দরকার যা উত্তেজনার পরপারে নিয়ে যায়। এবং পূর্ণশশী দেবী মনে করেন রায়বাড়ির প্রত্যেকের মধ্যে এই দুর্লভ আত্মসন্তুষ্টির গুণটি পুরোমাত্রায় ছিল। তাঁরা কখনো বিষাদ হতে জানতেন না বা সুখের মধ্যে ডুবে থেকে দুঃখের বলকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কোন আধুনিক কায়দায় লুফতে পারতেন না। তাদের লাইব্রেরী ঘরে ছিল প্রশান্তি, বিষয়-আসয়ে চুলচেরা হিসেব, শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগ, চায়ের পেয়ালায় বৈঠকী আমেজ এবং বিলাসিতার সূক্ষ্ম কারুকাজ। ঠিক যেন উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যের শেষ রশ্মি। এরই মধ্যে পূর্ণশশী দেবী বিকশিত হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ণতা এসেছিল কি জীবনে? তাঁর অবস্থা অনেকটা সেই হতভাগ্য বাঘের মত, যে নাকি প্রথম রক্তের স্বাদ পেয়েছিল। ষ্টেশন রোডের আলো-ঝলমল বাড়িতে এসে রক্তের মধ্যে সেই বাঘের অবস্থা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। গোলাপের প্রতি ভ্রমরের মতন—শহরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ক্ষণে ক্ষণে ধাবিত হল। এখন তাঁর মনে হয় কি করে এতগুলি দিন, এতগুলি বছর নিরালা মহব্বতপুরে কাটিয়ে দিতে পারলেন? সেখানে ঢেউ নেই—স্পন্দন নেই। রায়বাড়ির কর্তাদের স্থিতধী হবার অনেক কিছু উপকরণ ছিল। যেমন লাইব্রেরী, হিসেবনিকেশ, বৈঠকখানা, বিলাসিতা। কিন্তু পূর্ণশশীদেবীর কি ছিল? লাইব্রেরীতে তিনি যেতেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হত। কর্তারা হাতের কাছে দরকারী বইটা না পেয়ে ধাপ্পা হয়ে উঠতেন। সুতরাং তিনি আর সেদিকে যেতেন না। আর বিষয়-আসয়, হিসেব-নিকেশের তিনি কি বোঝেন? বৈঠকখানার উচ্চ কলকণ্ঠের মধ্যে রায়বাড়ির কোন বৌ প্রবেশ করে রসভঙ্গ ঘটিয়েছেন—এমন কথা ইতিহাসে

শোনে নি। অতবড় বাড়িতে একান্ত সঙ্গীসাথী বলতে কেউ ছিল না যার সঙ্গে মনের কথা বলা যায়। এক দেওর ছিল। তাঁকে বিয়ে দিলে পূর্ণশশী দেবী একজন সঙ্গী পেতেন। কিন্তু সেই দেওর এমন পাগল ছিল যে কাজকর্ম ফেলে রাতদিন লাইব্রেরী ঘরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। বলত, বই আমার বউ। সেই দেওর বেশী দিন বাঁচে নি। বিয়ের ছ' বছরের মধ্যেই হঠাৎ কলেরা হয়ে মারা যায়। সে বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে পূর্ণশশী দেবী লাইব্রেরীঘরে গিয়ে তাঁকে জোর করে তুলে আনতেন। তাঁর সঙ্গে খুনসুটি করেও কিছু সময় কাটত। মাত্র ছ' বছর। রায়বাড়ির ওপর যেন ভগবানের চরম আক্রোশ। কিছুতেই সুখ সহ্য করতে পারেন না। সুখের উৎসমুখগুলিকে মৃত্যু দিয়ে বুজিয়ে দিতে ভালবাসেন।

অথচ স্টেশন রোডের রূপ আলাদা, রং আলাদা, স্বাদ আলাদা। মৃত্যু এখানে চোরের মত ঘুরে বেড়ায়। মহব্বতপুরের মত ডঙ্কা বাজিয়ে দস্যুর বেশে প্রবেশ করে না। প্রাণের সুখে গল্প করার মত এত মানুষ একসঙ্গে পাওয়া পূর্ণশশী দেবীর ভাগ্যে ঘটেনি। পাশের বাড়ির সুন্দর সুন্দর বৌরা তাঁকে বড়মা ডাকে। পাড়ার ছেলেরা জ্যেঠিমা বলে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে সিগারেট ফেলে দৌড়ে পালায়। পাড়ার হরিসভায় গেলে সবাই ব্যস্ত হয়ে কথক ঠাকুরের কাছে আসন পেতে দেয়। কুশল প্রশ্ন করে। ঠাকুর চাকর—অনুগৃহীতদের কাছেই এতকাল সম্মান পেয়ে এসেছেন। কিন্তু পূর্ণশশীদেবীর তাতে মন ভরে নি। পাড়া প্রতিবেশীর কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া তাঁর অনেক দিনের সাধ। মহব্বতপুরে অবশ্য পাড়া প্রতিবেশী বলে পদার্থ ছিল, কিন্তু তাদের কোনদিন চাক্ষুষ দেখেন নি। তাদের চোখে মহব্বতপুরের রায়বাড়ি রূপকথার দেশ। রায়বাড়ির ঢেউ খেলান উঁচু পাঁচিল, ফল ফুলের বিশাল বাগান, ডায়নামোর ঘর্ঘর শব্দে তাদের মনে যুগপৎ ভয় ও সম্ভ্রম সৃষ্টি করত। পূর্ণশশী দেবী অনেকবার চেষ্টা করেছেন এই মিথ্যে ভয় ও সম্ভ্রম ভেঙে দিতে। কিন্তু পারেন নি। তারা আসতে চাইত না, কাছে ঘেঁসত না। এলেও কথা কইত এমন ভঙ্গীতে যেন ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করছে। পূর্ণশশী দেবীর খুব বিরক্ত লাগত। কি নিম্নস্তরের মানুষ এরা! কি করে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয় জানে না। ওই ধরণের প্রতিবেশী নিয়ে পূর্ণশশী দেবীর মন ভরেনি কোনদিন। তাই স্টেশন রোডের বাড়িতে এসে মুক্তির স্বাদ পেলেন প্রথম।

তারপর বাড়ির কর্তা যখন চলে গেলেন, তখনও একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। ইচ্ছে ছিল উপযুক্ত দামে হাসনুর বাড়ি বেঁচে দিয়ে আবার স্টেশন রোডের কোলাহলে ফিরে আসেন। কিন্তু আলোক ওর বাপ ঠাকুর্দার প্রধান ধারাটিকে এইভাবে রক্তের মধ্যে পুষে রাখবে ভাবতে পারেননি পূর্ণশশী দেবী। কিছুতেই বেচতে দিল না। রায়বাড়ির ছেলেরা কম কথা কয়। কিন্তু সেই অল্প কথার মধ্যেই তাদের চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। আর পূর্ণশশী দেবীরা রায়বাড়িতে চিরকাল সলজ্জ হাসি হেসে ইচ্ছেটাকে গোপন রাখেন। অথবা বলা যায়, গোপন করতেই ভালবাসেন। এবারও তার অন্যথা হল না। পূর্ণশশী দেবী দুঃখিত অন্তরে বনবাসেই রয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষে

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয় তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা স্পেশাল

ফাউণ্টেন পেনের কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এবং ৩০, ৬০, ১২০ ও ৭০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

PRO/SW—17

ম্যাক্স ওয়েবার ও তাঁর চিন্তাধারা

সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে ম্যাক্সওয়েবার অতিপরিচিত না হলেও পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত। বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতাত্ত্বিক মহলে ওয়েবার অনেককেই সামাজিক অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ট্যালকট পারসনস্ প্রমুখ আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের অনুবাদের ফলে ইংরাজী শিক্ষিত জগত তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পীকরণের উপযুক্ত ও সহায়ক সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন, যাঁরা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে অর্থনৈতিক বা সামগ্রিক সমাজ-পরিবর্তনের মৌলিক উপাদান বলে মনে করেন, এক কথায়, অর্থনৈতিক উন্নতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আজ যাঁরা করছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রেরণার উৎস হলেন এই জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁর 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' সমাজবিজ্ঞানে একদিকে যেমন বিতর্কের ঝড় বহন করে এনেছে তেমনি অন্যদিকে পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারণ অনুসন্ধানে আলোকসম্পাত করেছে।

ওয়েবারের চিন্তাধারার পূর্ণ উপলব্ধি সহজসাধ্য নয়। তিনি উপরোক্ত বইটিতে যে প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তা হল ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রেফরমেশনের পরে প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস যে মানসিক পরিবেশ ও চারিত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করবার জন্য ওয়েবার যে আলোচনা-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যে ভাবে তাঁর বক্তব্যগুলিকে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে বিশেষিত করেছিলেন তার ফলে অনেক সময় পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে অনেকে জানেন না যে The Protestant Ethic, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা নয়; এর প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিনি তাঁর অন্যান্য লেখার মাধ্যমে, বিভিন্ন সময়, প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। আজ পর্যন্ত ওয়েবারের চিন্তাধারার বহু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোন সমালোচকই তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (methodology), তাঁর ধর্মের সমাজতত্ত্ব (Sociology of religion) এবং তাঁর সাধারণ সমাজতত্ত্বের পটভূমিকায় তাঁর অবদান বিচার করতে সক্ষম হননি। এই জন্য তাঁদের সমালোচনায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগত ত্রুটী থেকে গেছে। ওয়েবারের চিন্তাধারার আলোচনায় তাই তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকা আবশ্যক।

Protestant Ethic-এ ওয়েবার মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে ধর্মবিশ্বাস কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পরবর্তিকালে এই প্রবন্ধগুলি একটি বই আকারে সঙ্কলিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ওয়েবারের এই রচনাটি তাঁর পরিকল্পিত গবেষণার ভূমিকা-

যায়। এই রচনাগুলি প্রকাশিত হবার পর ওয়েবার প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে অন্যান্য সমস্যার উপর মনোনিবেশ করেন। প্রটেস্টান্টিজম এর উপর তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন তার একটা কারণ হল যে তাঁর বন্ধু ধর্মতত্ত্ববিদ্ আর্নস্ট ট্রোলেট্‌স প্রায় একই বিষয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই 'The Social Teachings of the Christian Churches and Sects' ওয়েবারের গবেষণার পরিপূরক বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ওয়েবারের রচনায় দু'টি প্রধান ধারণা—Protestant Ethic ও Capitalist spirit—সম্বন্ধে স্বচ্ছতার অভাব প্রায় প্রত্যেক সমালোচকের লেখায় পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করে অনেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে প্রটেস্টান্টিজম এর আগমনের বহু পূর্বেই ক্যাপিটালিজম্ এর জন্ম হয়েছিল। এ সব তথ্যের ব্যাখ্যা যে নির্ভুল নয় এ কথা বাদ দিলেও সমালোচকদের Capitalist spirit সম্বন্ধে ওয়েবারের বিশ্লেষণ যে পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হয়নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য তথা পৃথিবীর ইতিহাসের পর্যালোচনায় ওয়েবারের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল তা হল আধুনিককালে পশ্চিমের দেশগুলিতে জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ততার (rationality) যে প্রাধান্য দেখা যায় তার মূল কোথায়? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আধুনিক ও মধ্যযুগের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক ব্যবহারের বা কার্য্যকলাপের ভিত্তি হল এই যৌক্তিকতা বা র‍্যাশানালিটি, পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক ঐতিহ্যবাদ বা ট্রাডিশানালিজম। আধুনিককালের 'ক্যাপিটালিষ্ট স্পিরিট' হল যুক্তিবাদী, এই র‍্যাশনাল স্পিরিট প্রতিফলিত হয় এই যুগের বৃহদায়তন শিল্পীকরণে, উৎপাদনের জন্য বৃহদায়তন শ্রমিক সমাবেশে এবং আধুনিক ব্যবসায় ও হিসাব রক্ষা পদ্ধতিতে। কোন কোন সমালোচক এই ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিট ও ধনলিপ্সাকে পৃথকভাবে না দেখে ওয়েবারের ধারণার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিট সম্বন্ধে ওয়েবারের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।*

ওয়েবারের ধারণায় ক্যাপিটালিষ্ট স্পিরিটের একটি প্রধান লক্ষণ হল অধ্যবসায়। এই স্পিরিটের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের উপজীবিকায় কঠোর পরিশ্রম করে কোন বাধ্যবাধকতার জন্য নয় কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে। এই প্রসঙ্গে ওয়েবার লিখেছেন; "It is an obligation which the indivi-

* "The impulse to acquisition, pursuit of gain, of money, of the greatest possible amount of money, has in itself nothing to do with capitalism. This impulse exists and has existed among writers, physicians, coachmen, artists, prostitutes, dishonest officials, soldiers, nobles ...One may say that it has been common to all sorts and conditions of men at all times and in all countries of the earth, wherever the objective possibility of it is or has been given. It should be taught in the kindergarten of cultural history that this naive idea of capitalism must be given up once and for all. Unlimited greed for gain is not in the least identical with capitalism, and is still less its spirit. Capitalism may even be identical with the restraint, or at least a rational tempering of this irrational impulse. But capitalism is identical with the pursuit of profit, and for ever *renewed* profit by means of continuous, rational, capitalist enterprise."

dual is supposed to feel and does feel towards the content of his occupational activity, no matter in what it consists.'[১]

এই প্রকার র‍্যাশানাল ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিট এর সঙ্গে যদি 'ট্রাডিশানাল' অর্থনৈতিক মনোবৃত্তির তুলনা করা যায় তাহলে ওয়েবারের বক্তব্য হয়ত আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। অর্থনীতিতে ট্রাডিশানালিজম্‌এর উদাহরণ হল যখন শ্রমিকেরা মজুরীবৃদ্ধির ফলে তাদের পরিশ্রম হ্রাস করে অথবা পরিশ্রমের নির্দ্ধারিত সময়ে কম কাজ করে অথবা নূতন পদ্ধতি গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। অন্যত্র ওয়েবার এই 'র‍্যাশানাল' ও 'ট্রাডিশানাল' অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপের দুটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ওয়েবারের মতে সর্বযুগে ও সভ্যতায় মানুষ লাভের অন্বেষণে ফটকা বা স্পেকুলেশনের আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন ভাবে, যেমন মুদ্রা ব্যবসায় ও লেনদেন, যুদ্ধ, বিপ্লব ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের অর্থ সাহায্য, এবং উপনিবেশিক শোষণ। অন্যদিকে র‍্যাশানাল অর্থনীতির অন্তর্গত কার্য্যকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: উৎপাদনক্ষম কার্য্যে ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, নির্দ্ধারিত মান অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যসমূহে স্পেকুলেশন ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় প্রকারের কার্যকলাপ আধুনিক কালের র‍্যাশানাল ক্যাপিটালিজম-এর বৈশিষ্ট।

ওয়েবারের মতে প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ ক্যাপিটালিষ্ট স্পিরিটের একটি উৎস। বিশেষ করে ক্যালভিনের ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদের মধ্যে এই স্পিরিটের অঙ্কুর তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিটের উৎস সন্ধানে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করবার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়গুলি ক্যাথলিকদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর ছিল। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ওয়েবারের একজন ছাত্র প্রমাণ করেছিলেন যে প্রটেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের অপেক্ষা প্রয়োগিক ও উপজীবিকা সংক্রান্ত শিক্ষাগ্রহণে অধিকতর ইচ্ছুক। তৃতীয়তঃ প্রটেস্টান্টরা যে যে দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করেছে সে সব দেশে তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে নিজেদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্যাথলিকরা সম অবস্থায় ঐ প্রকার সাফল্য বা উদ্যম প্রদর্শন করতে পারেনি।

ওয়েবারের ক্যালভিনিজম ও ক্যাপিটালিজম-এর-বিশ্লেষণ সম্পর্কে অনেকের বক্তব্য হল যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর ক্যালভিন মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা ও রচনার উপর ভিত্তি করে তাঁর বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন। ক্যালভিনের চিন্তার প্রভাব প্রমাণিত হবে তার সমসাময়িক সমাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়; একমাত্র পরবর্তী যুগে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। এই সাধারণ সত্যটি সমালোচকদের বোধগম্য হয়নি। ক্যালভিনের রচিত ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্যাখ্যাগুলির উপর মনোনিবেশ করলে ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিটের সৃষ্টিতে তার অবদান সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ক্যালভিন ক্যাথলিক চার্চের পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, ধর্ম ও চিন্তা জগতে একাধিপত্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-বিরোধী অন্যান্য বৈশিষ্টগুলির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার 'প্রিডেস্টিনেশন-তত্ত্ব এবং পরিশ্রমের তত্ত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে যে মানসিক ও চারিত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিল তার পরিবেশে ক্যাপিটালিজম এর সহায়ক মনোবৃত্তির জন্ম হয়েছিল। এই সম্বন্ধে ওয়েবারের সূক্ষ্ম আলোচনা সমাজবিজ্ঞানে তার শ্রেষ্ঠ অবদান। ক্যালভিনের চিন্তার আর একটি দিকের প্রতি ওয়েবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার মতে ক্যালভিন খ্রীষ্টির সমাজে সুদ গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ

করে ক্যাপিটালিজম-এর অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিলেন। কোন কোন সমালোচক এই মতের যাথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে এর সমালোচনা করতে পারেননি। অন্যদিকে এই মতের স্বপক্ষে যে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা এই সম্পর্কে সব সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়েছে। অধ্যাপক বেঞ্জামিন নেলসন তাঁর "The Idea of Usury" গ্রন্থে ক্যালভিনের রচনা ও চিঠিপত্র থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে এবং সুদ গ্রহণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের মতবাদ পর্য্যালোচনা করে ওয়েবারের উক্তির যাথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

ওয়েবারের বক্তব্য এই নয় যে ক্যালভিন প্রমুখ প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজকেরা ক্যাপিটালিজম্-এর প্রসারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী অথবা তাঁরা এই প্রথার গুণাবলী সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ওয়েবারের মতে ক্যাপিটালিস্ট স্পিরিটের সৃষ্টিতে তাঁদের অবদান পরোক্ষ এবং অনিচ্ছাকৃত। ক্যালভিনের 'প্রিডেস্টিনেশন' তত্ত্ব অনুযায়ী ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই মানবজাতির একটি অংশ পরিত্রাণের অধিকারী এবং অন্য অংশ অভিশপ্ত। মানুষের নিজের শক্তি অথবা চার্চ ও তার পুরোহিত সম্প্রদায়ের আশ্বাসবাণীর উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে না। মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। সুতরাং পরিত্রাণের নিশ্চয়তাও তার নেই। ইউরোপে ক্যালভিনিজম্-এর প্রসার থেকে ওয়েবার অনুমান করতে পেরেছিলেন যে সে যুগে সাধারণ মানুষ এই শিক্ষার ফলে নিজের পরিত্রাণ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং এই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ক্যালভিনের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষ যদিও পাপে নিমগ্ন ও কোন গুণ তার নেই, তাহলেও জাগতিক জীবনের জন্য সে কতকগুলি শক্তির অধিকারী। যেহেতু এই শক্তিগুলি এবং এই জগত ঈশ্বরের দান, মানুষের কর্তব্য হল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এই শক্তিগুলি প্রয়োগ করা এবং ঈশ্বরের গৌরবার্থে এই জাগতিক জীবন যাপন করা। এই পরিশ্রম ও জাগতিক জীবনে সাফল্যের মধ্যেই তাই সাধারণ মানুষ পরিত্রাণ সম্বন্ধে আশ্বাস অনুসন্ধান করেছিল। ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে এবং পেশায় ঈশ্বরের গৌরবার্থে কঠোর পরিশ্রমলব্ধ সাফল্যের মধ্যে পিউরিটান বিশ্বাসী পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করবার প্রয়াস পেয়েছিল। প্রটেস্টান্ট মূল্যবোধে জাগতিক জীবনের যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যকলাপ ধর্মীয় পবিত্রতার পর্য্যায়ে উন্নীত হবার মূলে রয়েছে ক্যালভিনিজম্-এর উপরোক্ত উপাদানগুলি।

পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়েবারের এই চিন্তাধারার আলোচনায় কতকগুলি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই বলা হয়েছে যে ওয়েবারের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমাজতত্ত্বের পটভূমিকায় তাঁর চিন্তাধারা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ওয়েবার ধর্ম বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে কোন অনড় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা করেননি। ধর্মীয় উৎসকে তিনি একমাত্র কারণরূপে উপস্থাপিত করেননি; এবং ক্যাপিটালিজম্-এর কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই রচনায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়েবার চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না; তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্যের শিল্পীকরণের মত একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার একাধিক উৎস বর্তমান। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই আলোচ্য বস্তুর সীমিত পরিধি লক্ষ্য না করে ধরে নিয়েছেন যে ওয়েবার প্রটেস্টান্ট মূল্যবোধ সমূহকে শিল্পীকরণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির একমাত্র কারণ বলে গণ্য করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ওয়েবারের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছিল "আইডিয়াল-টিপিকাল"। এই পদ্ধতিতে আলোচ্য ঐতিহাসিক ঘটনার বা পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাস্তবতার গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে ধারণামূলক কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করা

হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে কোন ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক ঘটনার সামগ্রিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায়। ওয়েবার এই "আইডিয়াল টাইপ" পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর অনুসন্ধানে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রটেস্টান্ট-ধর্মবিশ্বাস ও ভাবধারা তাঁর আলোচনায় ক্যালভিনিসম্, পিউরিটানিসম্, পায়েটিসম্, মেথডিসম্ এবং আনাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্যালভিনের প্রিডেস্টিনেশন তত্ত্বের বিশ্লেষণ ওয়েবারের রচনায় এই পদ্ধতির প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ। ওয়েবারের মতে আইডিয়াল টাইপ বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ধারণামূলক কাঠামো প্রস্তুত করা এবং ঐ পরিস্থিতির মৌলিক ভাবধারাকে পরিস্ফুট করে তোলা। পাশ্চাত্যের শিল্পীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনায় ওয়েবারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনার মৌলিক ভাবধারা উপলব্ধি করা। সুতরাং বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের খুটিনাটি নজির দেখিয়ে ওয়েবারের চিন্তাধারার বিচার সঙ্গত সমালোচনা নয়।

তৃতীয়, ওয়েবারের চিন্তাধারার ব্যাপক ও সামগ্রিক ধারণা সহজ নয়। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে কজন ওয়েবারের 'Ancient Judaism' যত্নসহকারে পড়েছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অথচ প্রাচীন ইহুদী ধর্মের এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যতীত Protestant Ethic এর পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কজন সমালোচক তাঁর পশ্চিম ইউরোপের শহরাঞ্চলের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সঙ্গে পরিচিত এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। Protestant Ethic ব্যতীত তাঁর Ancient Judaism Religions of India এবং The Religion of China ধর্মের সমাজতত্ত্বে ও বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান। ওয়েবারের মূল চিন্তার পর্যালোচনা ও সমালোচনার জন্য এই রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ সমালোচকের Protestant Ethic ভিন্ন অন্যান্য রচনাগুলি পাঠ করে ওয়েবারের সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার ধৈর্য্য নেই।

পুস্তক পরিচয়

বাংলার লোকসাহিত্য – দ্বিতীয় খণ্ড-ছড়া
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য—ক্যালকাটা বুক হাউস
মূল্য বার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ও প্রখ্যাতনামা গবেষক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘদিন বাংলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে আসছেন। প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড সুধীজনের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়েছে। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে বিরাট এবং আয়াসসাধ্য পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটি তারই দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে ছড়াই সবচেয়ে বিপুল পরিমিত, সবচেয়ে বহুল প্রচারিত, সবচেয়ে জনপ্রিয় অথচ সবচেয়ে অবহেলিত উপাদান। দোলনার গান, ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, সাধারণ ছড়া, ব্রতের ছড়া প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ছড়া রচনায় অগণ্য অজ্ঞাতনাম লোক কবি যুগে যুগে যে স্বতোস্ফূর্ত সৃষ্টি কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা সন্তান-সন্ততি ক্রমে লোকমুখে নিত্য আবৃত ও পরিবর্তিত হতে হতে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে প্রসারিত ও জাতি মানসে সংস্থিত হয়েছে অথবা দৈবক্রমে বহু মহৎ রচনাও কালক্রমে বিস্মৃত হয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সব ছড়ার মধ্যে কিভাবে জাতির জীবনের নানা বিচূর্ণ সংস্কার, নানা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান আশ্চর্য রূপদৃষ্টি, প্রকৃতি প্রেম, জীবন রস রসিকতার পরিচয় বিধৃত রয়েছে কিভাবে শিশুর সজীব সবুজ চেতনা লোক,-শিশুর মায়ের আনন্দ লোক, সমাজের বহুবিচিত্র সম্পর্কের রহস্যময় অভিব্যক্তি, আদিম মানুষের ভ্রান্তবিশ্বাস, পশুপক্ষী লতার নিবিড় সান্নিধ্যের চিহ্ন জড়িয়ে আছে তার পরিচয় পেতে হলে বাংলা ছড়ার এই বিপুলতম সংকলন ও বিস্তৃততম আলোচনা গ্রন্থের সংস্পর্শে আসতে হবে। ভবিষ্যতে যারা ছড়ার উপরে সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজনে, প্রাচীন সামাজিক অবলুপ্ত কাঠামোর স্বরূপ আবিষ্কারে, ইতিহাসের উপাদান সন্ধানে, আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ-নির্ণয়ে, প্রাচীন বাংলার জীবজন্তু গাছপালার অন্তরঙ্গ রূপচিত্রণের সংগ্রহের জন্যে গবেষণা করবেন তাঁদের কাছে এই সব অবলুপ্তপ্রায় ছড়ার মূল্য অপরিসীম হয়ে উঠবে। সুতরাং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে জাতি যখন কেন্দ্র-বিচ্যুত ও ভিন্নতর সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হতে চলেছে তখন এই সব অলিখিত সাহিত্যের সংকলনের অশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তাঁর এই বিরাট প্রয়াসের জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদ ভাজন। বহুজনের শ্রমসাধ্য এই প্রয়াসে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত যে সব সংগ্রাহক এই কাজে সাহায্য করেছেন আমরা এই সুযোগে তাঁদেরও অভিনন্দিত করি।

এই রকম একখানি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থের আলোচনার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে ডঃ ভট্টাচার্য কিছু অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন প্রবন্ধটিতে যে রস-রচনার রীতি অবলম্বন ক'রে সার্থক হয়েছিলেন বর্তমান গ্রন্থেও ডঃ ভট্টাচার্য অনেকাংশে সেই রীতিই অনুসরণ

করেছেন। কিন্তু অনুরূপ বিপুল আয়তন গবেষণা গ্রন্থে এই রীতির ব্যাপক অনুসরণ সমীচীন হয়েছে কিনা সন্দেহ। উপরন্তু কোথাও কোথাও উদ্ধৃত ছড়ার বিস্তৃত পর্যালোচনায় তার ভাবতাৎপর্য ঠিকমত পরিস্ফুট হয়েছে মনে হলো না। মনে হয়, আলোচনার যোগ্য বা আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু ছড়া নিয়ে প্রতিটি বিভাগে বিষয়টি বিশ্লেষণ ক'রে, তার পরে সেই সব প্রাদেশিক পাঠভেদ ও অন্যান্য ছড়াগুলি সংকলন করে দিলে আলোচনা রসনিবিড় হতো। যাই হোক, ডঃ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রদর্শিত রসালোচনার রীতির সঙ্গে গবেষকসুলভ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মনঃসমীক্ষণ রীতির সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন আঞ্চলিক পাঠের রূপভেদের কারণ নির্ণয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও উন্মোচনী দৃষ্টি বহুক্ষেত্রে পরবর্তী গবেষকের পথপ্রদর্শক হবে। ছড়াগুলির শ্রেণী বিন্যাসেও তিনি যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের যে সব নিগূঢ় রহস্য বাংলাদেশের জনমনে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে পারিবারিক ছড়া সমূহের বিষয় বস্তুর যে সম্পর্ক রয়েছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। যদিও এবিষয়ে তাঁর আলোচনা আরো সুষ্ঠু হবার অবকাশ আছে। বিভিন্ন বিষয়ক ছড়া সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য ইতস্ততঃ যে সব মন্তব্য করেছেন তার কিছু কিছু আমাদের আপত্তিকর মনে হয়েছে। শিশুর হাসির ছড়া, কুকুর কাক প্রভৃতি পরিচিত পশু পাখীর ছড়ার স্বল্পতা সম্পর্কে ও তার কারণ সম্পর্কে তিনি যে উক্তি করেছেন তা প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে। তাঁর সংগ্রহে এমন ছড়া দুর্লভ বলেই এমন ছড়া বাংলাদেশে অল্প রচিত হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিকর এবং এ জাতীয় ছড়া রচিত না হওয়ার পিছনে বিষয়গুলির নিত্যপরিচিতি ও কদর্যতার যে যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন তাও যুক্তিহীন। শিশুদের কাছে এই সব পরিচিত প্রাণীরাই অশেষ কৌতূহলের কারণ এবং এই সব নিয়ে অতীতেও যেমন অজস্র ছড়া রচিত হয়েছিল বর্তমানেও প্রচুর সাহিত্যিক ছড়া রচিত হচ্ছে ও হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলেও আমরা ডঃ ভট্টাচার্যের বিপরীত সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি।

সপ্তম অধ্যায়ের 'অতিপ্রাকৃত' নামাকরণ পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। এই অধ্যায়ে ছড়ার জগৎ ও ব্রতকথার জগৎ একত্র মিশেছে। এই দুই পর্যায়ের বিষয়ের মৈত্রী সম্পর্কে তাঁর আলোচনা আরো সুষ্ঠু ও বিস্তারিত হওয়া উচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব ব্রত কথার রূপ যে এক এবং প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে —একথা আদৌ সত্য নয়। এবিষয়ে আরো বিস্তারিত অনুসন্ধান এ সম্পর্কে আরো বহু নূতন বিষয়ে আলোকপাতে সমর্থ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস

এই গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন অষ্টম অধ্যায়ের সাহিত্যিক ছড়া। অথচ এই অংশটিতেই ত্বরিত সৃষ্টির অপূর্ণতা দেখা গেল। আলোচনার যোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনবহিতি ও অল্প আলোচনা ও উপেক্ষণীয় ব্যক্তিদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে যে ভারসাম্যের অভাব এই প্রবন্ধে দেখা গেছে তা এ গ্রন্থের গৌরব-হানি করবে। এই অংশে খাঁটি ছড়ার লক্ষণ ও সাহিত্যিক ছড়ার লক্ষণ বিচার করে সাহিত্যিক ছড়ার নানা গুণগত বিচার ও পর্যায় ভাগে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। এই অধ্যায়টি পুনর্লিখিত হলে এই পর্যায় ভেদ আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

এই বিশাল গ্রন্থের রচনায় লেখক যে অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন আমরা আবার তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই রকম বিরাট প্রয়াসে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক আমরা তারই দু একটি এখানে সংশোধনের প্রত্যাশায় নির্দেশ করলাম কেননা এই মহাগ্রন্থে জাতির একটি মহৎ পরিচয়

বিস্তৃত। প্রায় সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠায় এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব যারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় পরিকল্পিত প্রচ্ছদ, বিষয়ের গুরুত্ব ও গৌরবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

অমুক্ত বসু

লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য : দুটি বই

Studies in Indian Folk Culture Edited by Sankar Sen Gupta & K. D Upadhayaya Ph. D. Indian Publications Calcutta Rs. 12/-

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দেখা যায় যারা নিরক্ষর তারা অশিক্ষিত। ভারতবর্ষ তেমন নয় বরং ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে ততখানি আশ্রয় পায়নি, যতখানি রয়েছে চাষীমজুরদের প্রাণের মর্মমূলে, 'তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। জানত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে।' যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার মাধ্যমে যে লোকশিক্ষার বিপুল আয়োজন হয়েছিল তাতে মার্জিত হয়েছিল বলেই ভারতীয় লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। যুগযুগ ধরে এই সব সঞ্চিত সম্পদ ব্যাপকতায় বিপুলতায় শিল্পগৌরবে পৃথিবীর লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে কত অমূল্য তা আমরা তখনই অনুভব করি যখনই দেখি এক একজন ইউরোপীয় মনীষী দুরূহ অধ্যবসায়ে এদেশের ভাষা ও জীবনযাত্রা আয়ত্ত করে গ্রামে গ্রামে পর্যটন করে জনতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে এই সব সম্পদের আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও প্রচারে অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ভারতীয় মনীষীরাও এদিকে কেউ অগ্রসর হননি এমন নয়। তবু আজও এবিষয়ে কর্মীর অভাব রয়েছে গবেষণার বিপুল অবকাশ রয়েছে। সবার উপরে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব অক্লান্তকর্মী সাধকেরা আলো গবেষণা করে চলেছেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও তাদের আবিষ্কৃত তথ্যের পরিচয় সাধন দুরূহ ছিল। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক Folklore পত্রিকাখানি এই অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে। তার পরিণাম যে কতখানি সুফলপ্রসূ হতে পারে তার উজ্জ্বল নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি সেই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির তিনটি মূলধারা লোকসংগীত, লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য। এই তিন পর্যায়ে সম্পাদকদ্বয় এই গ্রন্থকে বিভক্ত করেছেন। এবং এই সব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অধিকারীদের রচিত প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন রচিত হয়েছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যে তথ্যের গৌরবে সর্বোপরি ভাবপ্রকাশের সহজ নিপুণ পারিপাট্যে প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতার সংকলন হওয়ায় যে ত্রুটি অনিবার্য অর্থাৎ বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে একটি পরিকল্পিত পারম্পর্যের অভাব অবশ্য সম্পাদকদ্বয় এড়াতে পারেন নি। আরো একটি ত্রুটির কথা এই প্রসঙ্গে বলে নিই। অনেক প্রবন্ধেই লেখকেরা লোকসাহিত্য ও লৌকিকসাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য রাখেন নি। বলাবাহুল্য লৌকিক সাহিত্য অশিক্ষিত জনতার জন্য শিক্ষিত লোকের রচনা (যেমন বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্য) এবং লোকসাহিত্য অশিক্ষিত মানুষের স্বতস্ফূর্ত প্রতিভার দান (যেমন মৈমনসিংহ-গীতিকা)।

(শেষাংশ ৬২১ পৃষ্ঠায়)

মেলাতলা

আর্য দেব

গুপীনাথের মেলা। বছর ঘুরে একই সময়ে মেলা বসেছে। দোকানীরা পরস্পর চেনাজানা। নিজের নিজের বসার জায়গা তাদের চিরকালের জন্যে যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তবু রঙ পাল্টে যাচ্ছে, ফিকে হয়ে যাচ্ছে, জাঁকজমক কমে যাচ্ছে ক্রমশই। দোকানী দয়ারাম তাই বলে: ইবার মেলাতে তেমন ভিড় দেখছি না ভাই··· জীবন উত্তর দেয়: তা আর করে কী বলো—তিন বছর ফসল নাই মাঠে ত মেলায় আসবে কে। খালিহাতে ফিরতে লজ্জা লাগবে—তাই ঘরে বইসে আছে।

দিনকাল পাল্টেছে বৈকি! আগেকার দিনে চৈত্রের ধুলো আর গরমের মধ্যেও রঙের হাট বসতো মেলায়। অনেকগুলো নাগরদোলা, কাঠঘোড়া, ম্যাজিক, সার্কাসপার্টি বসতো এদিকে-ওদিকে, আর রাস্তার দুধারে ঝলমল করতো কলকাতার নামজাদা দোকানের স্টল।

জীবন বললো: তখনকার দিনকালই আলাদা ছেল—তখন জমিদারী ছেল, জমিদার ছেল—আর এখন ···· ফটিক জুড়ে দিল: এখন জমিদারের বাড়িই ভাঙছে—গতবছর মাগলা অন্দরমহল গ্রাস করলেন, ইবছর জলসাঘর, তার আগে হাতীশাল, ঘোড়াশাল ভাঙছে। সব ভাঙছে, সব ভাঙবে। অথচ আগে কী ছেল:···

আগে কী ছিল তা এ অঞ্চলে সবাই জানে। আগে জমিদারের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। এখান থেকে তিন-চার মাইল দূর দিয়ে যে প্রাচীন রেলপথটি যাচ্ছে—সেখানে, শোনা যায়, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জমিদারের এক ঘোড়া কাটা পড়ে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার—জমিদারের ঘোড়া কাটা পড়েছে—কী হয় কে জানে। পরদিনই দেখা গেল জমিদারের গোটা দশেক হাতী লাইনের ওপর বাঁধা আর হাতীগুলো থাকার ফলে ট্রেন থেমে গেল, তারপর গার্ড আর ড্রাইভারকে জমিদারের পাইক পিচমোড়া করে বেঁধে···

কাজেই তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনা হয় না।

জীবন, দয়ারাম সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে। এ অঞ্চলের লোক নয় বলে ওদের অনেক ভোর থাকতে আসতে হয়েছে। এখানকার লোক পক্কা। এ-বছরই প্রথম দোকান বসিয়েছে পক্কা—প্ল্যাস্টিকের খেলনা-পাতি, চুড়ি, হরেকরকম মনোহারী জিনিষের দোকান। পক্কার শত্তেক দোষ থাকলেও ওকে সবাই মান্য করে, ভক্তি করে—আহা, লোকটা সরল, ভাল মানুষ!

আর গুপীনাথের মেলায় ত মানুষেরই জয়গান করেছেন ভগবান—যে-মানুষ গুপীনাথের পুজো দিচ্ছে বছরের পর বছর যে-মানুষ আর এক মানুষ গোবিন্দ ঘোষকে স্মরণ করছে এই মেলায়। সেই যে গল্প আছে—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এ অঞ্চলে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার সময় একজনের বাড়িতে ভোজন করতেন। ভোজনান্তে অনুচর গোবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে মুখশুদ্ধি চাইলে রোজই গোবিন্দ এখান-সেখান থেকে মুখশুদ্ধি সংগ্রহ করে আনতো। একদিন কিন্তু সে খানিকটা মুখশুদ্ধি সঞ্চয় করে রেখেছিল, পরের দিন মহাপ্রভুকে তা থেকে দিতেই তিনি বললেন: গোবিন্দ, তোমার যখন সঞ্চয়ের অভ্যাস রয়েছে তখন তুমি সংসারী হও।

গোবিন্দ বিবাহ করলো। গঙ্গায় স্নান করার সময় একদিন একটা কাঠ এসে তার পায়ে ঠেকলো। যথাবিধি সেই

কাঠে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি গড়িয়ে পুজো করতে লাগলো গোবিন্দ। এদিকে যথারীতি তার সন্তান হয় কিন্তু একটি সন্তানও বাঁচে না। গোবিন্দ শোকার্ত হওয়ায় ভগবান বললেন: গোবিন্দ, তোর ছেলে তোর মৃত্যুর পর তোকে কদিনই বা জল দেবে, আমি তোকে চিরদিন জল দেব।

সেই জলই লোকে দিয়ে চলেছে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর। পঙ্কার বাপ দিয়েছে, ঠাকুর্দা দিয়েছে, তার বাবা সবাই পুজো করেছে গুপীনাথকে আর জল দিয়েছে গোবিন্দ ঘোষের সমাজবাড়িতে।

ওদিকে ম্যাজিকের খেলা সুরু হয়েছে—তাই টিন বাজিয়ে কে ডাকছে ডুম্ ডুম্ ডুম্—গলা কেটে জোড়া লাগবে, মরা মানুষ কথা বলবে। ওপাশে ঠাকুরদালানে ঢাক বাজছে—টপ, টপ, টপ। আর সকলের ওপরে আইসক্রিমওলার তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে বেড়াচ্ছে। চর এলাকার চারদিকই রুক্ষ। মাঝে মাঝে কয়েকটা গাছ, আমবাগান। ওদিকে গঙ্গা। গঙ্গার পারে ঝোপঝাড়। ভালমানুষ পঙ্কাও দেখতে পাচ্ছে—অনেক রঙিন শাড়ি ওদিক পানে গেল—হ্যাঁ, ঐ ঝোপের দিকেই গেল। আশ্চর্য, মেলাতলাতে একটু আব্রু নেই কোথাও, মেয়েদের যে কি মুশকিল পঙ্কা জানে। পঙ্কার শুকনো শরীরটা যেন কেমন-কেমন করে। মেলা ভাঙলে চারদিক যা নোংরা হয়—ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে পঙ্কার।

পঙ্কা এদিক-ওদিক তাকায়। ওপাশটায় উঁচু পাড়ের জন্যে গঙ্গা চোখে পড়ে না। চারিদিকে রোদের দাপট। যেখানে গাছের ছায়া সেখানেই ভিড়, দোকানপত্তর, সেখানেই মেলা। ঐ ভিড়ের মধ্যে থেকেই ধোঁয়া উঠছে। মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে সবাই হবিষ্যান্ন তৈরি করছে। বুড়ো বৈষ্ণব, বুড়ী বৈষ্ণবী, রসকলি-আঁকা যুবতী বৈষ্ণবী—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সকলেরই চোখ মুখ লাল হয়ে উঠছে।

পঙ্কার ইচ্ছে করছিল—দোকান উঠিয়ে দিয়ে এবারও অন্যবারের মত ভিড়ের গায়ে গা মিশোয়, মিষ্টি গন্ধ শুঁকে বেড়ায় চুলের, অযাচিত উপকার করে দেয় এর-ওর-তার। কিন্তু এখন তা কি সম্ভব। তখন ওর চাকরি ছিল—পোস্ট-পিওনের চাকরি। তা সেটাও গেল—আর যাবে নাই বা কেন! হিমুর বউয়ের চিঠি, মেজকর্তার মেয়ের বরের চিঠি সব যদি ও খুলে পড়ে আর সব কথা যদি এর-ওর মুখ দিয়ে চাউর হয়ে যায় তাহলে ওর চাকরি থাকে কী করে! অতএব মেজকর্তার কলমের এক খোঁচায়····· পঙ্কা শুনতে পেল—বনমালী ময়রার দোকান থেকে ছ্যাঁ করে তেলেভাজা কিংবা জিলিপিভাজার শব্দ ভেসে আসছে। যত ভিড় ওখানেই! তা নয়, পঙ্কার দোকানেও লোক এল: হ্যাঁ গো, তোমার এ-চুড়ির দাম কত?

কোনটা চাই তোমার?

উ যে পাতলা জলের মত—

পঙ্কা ভাবলো—মেয়েটির পছন্দ আছে দেখছি, সেরা চুড়িগুলোই পছন্দ করেছে—লতাপাতার সুন্দর কাজ-করা প্লাস্টিকের চুড়ি!

আহা, বলো না গো কত দাম—হাঁ করে আছো কেন?

পঙ্কা হাসলো: হাঁ পছন্দ আছে বটে!

মেয়েটির সঙ্গে কেউ নেই। দামটা অনেক কমিয়ে বললেও মেয়েটি মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল খরখর করে। আর পঙ্কার মনে হল তার বুকের মধ্যে ঐ চরের বালি ভরে দিল কে যেন! মুখে বালি, চোখে বালি, সর্বাঙ্গে বালি, বালির সমুদ্রে সে ভাসছে—সমুদ্র নয়, মরুভূমির মাথায় জলছে দীপ্ত সূর্য—আর ওর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙিন মরীচিকা, ধরতে যায় ধরতে পারে না, ছুঁতে গেলে উবে যায়। অথচ পঙ্কা এই মেলার উপাখ্যানটি মনেপ্রাণে বুঝেছিল—কী হবে বিয়ে করে!—ছেলেমেয়ে হবে বছর বছর, খেতে পাবে না—মরে গেলে জলও দেবে না একটু, তার চেয়ে এই বেশ আছি, মেলায় মেলায় ঘুরছি, ভিড়ের সঙ্গে গা ঘষছি, ঘামছি—নানান রঙ, নানান লোক দুচোখ ভরে দেখছি। গুপীনাথের স্মরণে

মনে মনে প্রণাম জানালো পঞ্চা : ঠাকুর পাপ নিও না, এই বেশ আছি, বেশ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, বাঁধন নেই হাল্কা হাল্কা দিনগুলো ভালই কাটছে। সঞ্চয় আমি করি না, সঞ্চয় আমি বুঝি না—যদি বলো, দোকান দিয়েছি কেন—ত সে-ও আমার ভেলা ভাসানোর খেলা, কোথাও আমি দাঁড়িয়ে নেই।

শুধু কি এই মেলা—আরো কত মেলায় ঘুরেছে, ঘোরে পঞ্চা। এখানকার দশ পনেরো মাইলের মধ্যে কত যে মেলা হয়। পারুলিয়ার ওখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমার মা শীতলার মেলা হয়। এত মেয়েছেলেও যায় সেখানে, পুরুষের চেয়ে মেয়ের ভিড়। মেয়েদের হাতে হাতে দুধের ঘটি—দুধ ঢালবে মায়ের থানে। আর পুরুষদের ছাখো—বলিদেওয়া মুণ্ডহীন ভেড়া লাঠিতে বেঁধে দুজন দুজন করে বয়ে নিয়ে চলেছে। একজন আবার ভেড়াটার গলায় হাতচাপা দিয়ে রেখেছে—রক্ত বেরোতে দেবে না।...

আরো উত্তরে যাও, আরো শুকনো আবহাওয়ার মধ্যে, কিংবা ওদিকে জঙ্গলের মধ্যে। ওদিকে কামাখ্যাতলায় একটা বিরাট নিমগাছকে পুজো করা হয়। লক্ষ বলি হয়ে গেছে ওখানে। তারপর ওদিকে আছে বুড়োশিবের মেলা—কোথায় নেই মেলা! যত রুক্ষ পরিবেশ, তত মেলার ধুম!

এদিকেও জঙ্গলের মত চারদিক। বড় বড় গাছ আর ছোট ছোট ঝোপে চারদিক অন্ধকার। রিফুজি না এলে জঙ্গল হয়েই ত থাকতো। রাস্তার দুপাশে আউসের জমি, উঁচু ডাঙা জমি। তার পাশে পাশে খেজুর গাছ, বাবলাগাছ রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কিছুদিন আগেও এখানে বাঘ বেরোত। জঙ্গলের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়ি নিয়ে গ্রাম। রুক্ষ খটখট করছে চারদিক। বৃষ্টি ভরসা, আকাশ ভরসা, প্রকৃতি ভরসা। গরমে পুকুর শুকিয়ে থাকে। গভীর না হলে টিউবওয়েলে জল ওঠে না, জল উঠলেও খুব বেশিদিন থাকে না, কল খারাপ হয়ে যায়। এই রুক্ষ আবহাওয়ায় যে কটি মেলা হয় তার প্রত্যেকটিতেই বলির ছড়াছড়ি, রক্তের ছড়াছড়ি। ব্যতিক্রম শুধু বলিহীন এই বৈষ্ণবদের মেলা। পঞ্চার ভাল লাগে। সুন্দর তিলক-আঁকা চকচকে মুখ, রসকলি-আঁকা যুবতীর ভঙ্গিমা—পুজোর মধ্যে সমর্পণের প্রসন্ন বিশ্বাস অন্তর ভরে রাখে। শোক নয়, দুঃখ নয়—গোবিন্দ তার শোক ভুলেছে, বছরের পর বছর মানুষ তাকে স্মরণ করছে, তাকে ভালবাসছে—আর বছরের পর বছর পঞ্চা নানারঙের মেলা দেখে যাচ্ছে।

এখনো লোক আসছে দলে দলে। সবাই শঙ্খনি বাজাচ্ছে আর হরিনাম করছে। সবাই এসে থেমে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। মিশে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে সবাই। পঞ্চার ইচ্ছে করে ঐরকম দলের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে—কিন্তু সে তা পারে না, পারছে না এবার। দোকানে ওকে থাকতে হবে, বিক্রি-বাটা করতে হবে। বুড়ী মা-টাকে খেতে দিতে হবে, আর নিজেকেও খেতে হবে ত। কিন্তু একার এই সংসারটাও কেমন-যেন ভাল লাগে না। ওর সমবয়সী বন্ধুদেরও বিয়ে হয়ে গেল। ঐ ত ভিড়ের মধ্যে একটা নতুন বউ আলতো আলতো রাঙা পা ফেলে বড় ঘোমটা টেনে চলেছে। বেচারী ভাল করে দেখতেও পারছে না এদিক-সেদিক। কিন্তু...গুপীনাথের উপাখ্যানটা আবার মনে পড়লো পঞ্চার। পরকালে কি আর এ-সব সঙ্গে যাবে, কিন্তু ইহকাল, ইহকালের এই শরীর, এই মন—ভাবতে ভাবতে গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠলো পঞ্চার। সত্যই কি ভেসে বেড়ানো যায় চিরকাল, পঞ্চা কি সঞ্চয়ে অভ্যস্ত হয় নি?—মনে মনে চিন্তা করলো পঞ্চা। ঐ ত ভিড় জমছে ওখানে। কী ওখানে? না, না, বাঁদর নাচ নয়, ভালুক নাচ নয়—যে-ইরানী মেয়েটা চুড়িকাঁচি বেচছিল, সে ও-সব গুটিয়ে নাচ ধরেছে। পঞ্চা পরিষ্কার দেখতে পেল সেই টকটকে লাল মুখের ইরানী মেয়েটাই বটে! ওপাশে বসে ওর নাচের তালে তালে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে একটি লোক। কে লোকটা—ওর স্বামী, না বন্ধু, না কেউ না?

পঙ্কার আবার কেমন একলা একলা মনে হতে লাগলো নিজেকে। এই ভিড়, শব্দ, গন্ধ কেন যেন ওর কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে পঙ্কা চমকে ওঠে। ঐ ত সেই সকালে-দেখা মেয়েটি। নির্বিকারচিত্তে বেগুনভাজা খাচ্ছে, ওর পাশে বসে আছে একটি লোক—তার হাতে দু ভাঁড় চা। পঙ্কার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো। সত্যিই ত ইহকালটাকে কি ভোলা যায়? পঙ্কার আবার পিওনের চাকরিটার কথা মনে পড়লো। হিনুর বৌ লিখেছিল—। হ্যাঁ, সেই নীল খামটা! খুলে পড়ে ভাল করে জুড়তে পারে নি বলেই ত হিনু ধরতে পারলো! হাঁ, হিনুর বৌ কণা, কি সুন্দর নাম, কণা—কণা লিখেছিল ভৈরবীর সেই বাপের বাড়ি থেকে—খড়ি নদীর পাশে হয়ত একটা মাটকোঠা বাড়ির ওপরের ঘরে বসে লিখেছিল: তুমি কবে আসিবে, তোমার জন্য সব সময় মন কেমন করে, তুমি না থাকায় ভালমত ঘুম হয় না—ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর ওদের গ্রামের মেজকর্তার ছেলের বৌ মেজকর্তার ছেলে বিজনকে লিখেছিল হাসপাতাল থেকে—ওর নাকি টি. বি. হয়েছিল—লিখেছিল: ভেবেছিলাম বিয়ের পর ছেলে হবে, কিন্তু তার বদলে যে-রোগ হল তাতে ভাঙা শরীরে আর কিছু হবে কিনা কে জানে।

অথচ সে জানতোনা যে বিজনের আর একজন মেয়েমানুষ ছিল। পঙ্কা নিজের মনে হাসে—ওরা যাকে প্রেমিকা বলে, গাঁয়ে তাকেই মেয়েমানুষ বলে। সে লিখতো কলকাতা থেকে: এবার কলকাতা এলে অনেক সিনেমা দেখবো কিন্তু—আর সেই চিঠিই ত কাল হল পঙ্কার। কথাটা মেজকর্তার কানে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড—শেষে চাকরিটা গেল পঙ্কারই, অথচ বিজনের কিছুই হল না যদিও আসল দোষ তারই।

পঙ্কার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ওদিক থেকে হৈ হৈ শব্দ উঠলো একটা। ধর্, ধর্ মার্ মার্ রব। কী ব্যাপার? মুখে মুখে হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে এল খবরটা।

আরে ওপাশ দিয়ে যে-বউটা যাচ্ছিল না তার মনের মানুষের সঙ্গে সে-হল গোপীপুরের বিশ্বম্ভর মণ্ডলের বউ।

তা হল কী?

আরে ঐ বউটাই ত দুবছর আগে এই মেলা থেইকে হাইরেছিল। বিশ্বম্ভর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিইছিল। সুন্দর, শক্ত বউ, মুখে হাসি মিলোয় না, ফুলের মত হাসে—তা ও জানতো না ওর সবকিছু ছলাকলা, ওর বুকে বিষ, চোখে বিষ। লোকে বইললো—ও কোন মনের মানুষের সঙ্গে পাইলেছে, সে কথা বিশ্বাস করে নি বিশ্বম্ভর। বইললো: হাঁ, ওর দেশের থেকে এক খুড়াতো ভাই আসতো বটে কিন্তু ওকে অবিশ্বাস করাও পাপ—তা আজ সেই ছেলেটার সঙ্গে ওকে দেইখে ওর মাথা গরম হয়ে গেল। বউটার চুলের মুঠি ধরে টানে, আর সেই ছেলেটা ওকে মারে আর কি—এখন বোধ হয় সালিশ বসেছে।

আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল পঙ্কা। বটগাছে ওদিকটায় ফর্সা মতন একটি বউ বুক চাপড়াচ্ছে, হাত-পা-মাথা নাড়ছে।

পঙ্কা ভাবলো—ইহকালের আনন্দ, শরীরমনের আনন্দ নিয়েই পাগল ওরা। একটা মজার কথা মনে পড়লো পঙ্কার। পাশের গাঁয়ের হাটে ভিনগাঁয়ের চুরি-করা এক গরু বেচতে এসেছিল একটা লোক—আসল মালিক তক্কে তক্কে ছিল, সময় বুঝে এসে হাজির—তারপর সাক্ষী সাবুদ প্রমাণ কই! এ বলে প্রমাণ হাতের লাঠি, ও বলে প্রমাণ মুখের কথা। শেষ পর্যন্ত আসল মালিক বললো—গরুর নীচের পাটির একটা দাঁত ভাঙা—গরুর মুখ খুলিয়ে মিলে গেল। তারপর চোরকে কি মার, কি মার!

পঙ্কার চোখ থেকে থেকে মেলার মধ্যে ঘুরে যায়, হয়ত মনটাও। চোখের শক্তি আর কতটুকু, দৃষ্টিই বা কতদূর

যাবে। তবে মাঝে মাঝে যেন দেখা যাচ্ছে সেই মেয়েটিকে। মনে হল নাগরদোলায় অন্য আর একটি লোকের সঙ্গে উঠে বসেছে। নাগরদোলা ঘুরছে বন্ বন্ বন্—আর পঙ্কার সারা শরীরে ঝিম ধরে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ঈর্ষার মোচড়, কেমন উথালপাথল করতে লাগলো পঙ্কার। যত সব বদমায়েস লোকগুলো মেয়েটির পিছু ধরেছে—নির্লজ্জ কুকুরের মত ঘুরঘুর করছে পেছন পেছন। পঙ্কার সর্বাঙ্গ রাগে রি রি করে উঠলো।

বেলা পড়ে আসছে। গঙ্গার ওপারে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। মেলাও ভেঙে গেল বলে। ঐ ত নানাবয়সের নানা আকারের পুরুষ, মেয়ে গুটি গুটি ফিরে চলেছে। কারুর হাত জিনিষে বোঝাই, কারুর মুখ চলছে সমানে—চালছোলাভাজা চিবোচ্ছে। এরা এখন চরের বালি পেরিয়ে মাঠে পড়বে—কোনখানে চষাজমি, চষাজমির ওপরেই পথের রেখা পড়েছে। চষাজমিগুলোর পরেই ছাড়িগঙ্গা। ছাড়িগঙ্গার অল্প জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে অনেকে ওপারে চলে যাবে, যারা যাবে না তারা নাবাল জমিটার ধার দিয়ে ভাঙা নীল-কুঠির পাশ দিয়ে দূর-দূর গ্রামে চলে যাবে। যারা গঙ্গা পেরিয়ে এসেছে তারা নৌকা চড়ে ওপারে যাবে—সেখান থেকে হাঁটাপথে রেলস্টেশন-তারপর ট্রেনে করে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়বে। বছরের পর বছর পঙ্কা এই দেখে আসছে—সকাল বিকেলে রঙবেরঙের পিঁপড়ের সারির মত লোক আসে যায় আলপথ দিয়ে।

গুপীনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সমস্ত জিনিষপত্র গুটিয়ে ফেললো পঙ্কা। ওদিকে জীবন, দয়ারামরাও যাবার জন্যে তৈরী, কেউ কেউ চলেও গেছে। ওপাশে কারা হ্যাজাক জালিয়েছে। শুক্লাপক্ষের রাত্রিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে হ্যাজাকের আলো। অন্যদিকে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছিল। এগিয়ে যাচ্ছিল পঙ্কা। গুপীনাথের উপাখ্যানটা ওর মনে পড়ছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছিল না ও, ওর সারা মনটাই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গে অস্বস্তি, রগ দপদপ করছে, চোখ জ্বালা করছে—ওর জ্বর হয়েছে ?—পায়ে হাত দিয়ে পঙ্কা কিছুই বুঝতে পারল না। জ্বর ওর মনে। এই রাত্তিরে শেষ সময়েও ওদিকে কবি গানের আসর বসেছে। কবির লড়াই চলছে। হো-হো-হি-হি হাসির শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। পঙ্কা ওদিক ঘেঁষলো না। চরের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া অল্প অল্প ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। ওর মনে হল ওর শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সবটা জুড়োচ্ছে না। যেন চলতে চলতে বাবলাকাঁটায় আটকে গেছে কাপড়। ছাড়াতে গেলে আরো জড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথায়। পঙ্কা স্মরণ করলো গুপীনাথকে। বাবা গুপীনাথ, আমার মনে পাপ নেই—তবে এত কষ্ট কেন আমার।

খানিকদূর যেতেই অনেক জোনাকি দেখলো পঙ্কা গাছের ডালে ডালে। পেছনে মেলাতলায় এখনো জায়গায় জায়গায় আলো চোখে পড়ে। কোনটা মিটমিট করছে কোনটা দপদপ করছে। হঠাৎ পঙ্কা থমকে দাঁড়ালো—গাছের ছায়ার মধ্যে শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ হল। শব্দটা এগিয়ে এল ওর কাছে। ওর খুব কাছে পৌঁছাতেই পঙ্কা দেখলো সকালের সেই মেয়েটি। মেয়েটির নিঃশ্বাস পড়ছিল জোরে জোরে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো পঙ্কাকে : উ লোকটা আমার পিছু ধইরেছে...

পঙ্কার মাথাটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো : কোথায় সে লোক দেখি একবার ..

ঠিক বোঝা গেল না—হয়ত একটা পুরুষের মূর্তি ছায়ার ছায়ায় জঙ্গলে জঙ্গলে মিশে মিশে উধাও হয়ে গেল।

মেয়েটা এবার খিলখিল করে হাসলো। আর পঞ্চার হাড়ে হাড়ে ঠোকর লেগে ঠকঠক করতে লাগলো। মেয়েটার মাথা থেকে সুবাস বেরোচ্ছে—গন্ধটা পঞ্চার রক্তে যেন তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। চলতে-ফিরতে মেয়েটার হাতের চুড়ি বাজছে—আর চমকে চমকে উঠছে পঞ্চা। কিন্তু এ-সব ও পেলো কোত্থেকে—সকালে ত কিছুই ছিল না!

পঞ্চা জিগ্যেস করলো: ও ওকে চিনলো কী করে?

মেয়েটি আবার হাসতে হাসতে বললো: সকালে একটা লোক আমাকে খাবার খাওয়ালো, তার কাছ থেকে পাইলে ওদিক পানে যেতেই ই লোকটা কইলো তর হাত খালি, চুড়ি পর—চুড়ি পরলাম, কইলো নাগরদোলা চড়, চড়লাম—এখন সাঁঝবেলায় বলে—

মেয়েটি থমকে থেমে গেল। আর ঈর্ষার একটা গরম স্রোত বয়ে গেল পঞ্চার বুকের মধ্যে দিয়ে। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো ওর। ওর মনে হল-মেয়েটা তাহলে এক মজার খেলা খেলেছে সারাদিন। পাঁচজনের সঙ্গে ঘুরে এখন পঞ্চার আশ্রয়! কিন্তু পঞ্চাকে ও বিশ্বাস করলো কী করে? না, লোক চেনে ওরা, চোখমুখ হাবভাব দেখলেই কে কী তা ওরা বুঝতে পারে।

পঞ্চা বললো: কুথায় যাবি?

মেয়েটি বললো: ই শ্মশানের কুকুরগুলার কাছ থেকে দূরে যাবো—চলো এখন তুমার সঙ্গে যাই, তারপর এক সময় বাড়ি চইলে যাবো—পঞ্চার মনে হল তাকেও এক মজার খেলায় পেয়েছে। একে একে সিঁড়ি টপকে যাচ্ছে মেয়েটি। পঞ্চাও একটা ধাপ। আড়চোখে তাকাচ্ছিল মেয়েটি আর মুচকি হাসছিল। আচ্ছা, এই খেলাটা যদি খেলা না হয়ে সত্যি হয়, তাহলে, তাহলে—পঞ্চা এমনতর অনেক সম্ভাবনার কথা তোলপাড় করছিল নিজের মনে।

মনে মনে বললো—হেই ভগবান, আমার কি ভেলা ভাসানোর খেলা শেষ হল?—এবছর দোকান দিয়েছিলাম, সামনের বছর আরো বড় দোকান দেব; আমি ত সঞ্চয় শিখেছি—আমার কি ভেলা ভাসানোর খেলা শেষ হল আমি কি চড়ায় ঠেকলাম—তাই হোক, তাই হোক।

ওরা দুজনে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
গোল্ডেন
আমলা

হেয়ার অয়েল

কেশচর্য্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।
আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন।
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে
পাওয়া যায়।

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

পুস্তক পরিচয়

(৬১২ পৃষ্ঠার পর)

ধারণার এই অস্পষ্টতার জন্যে অনেক প্রবন্ধ রচনার মৌল উদ্দেশ্যই প্রতিহত হয়েছে।

তবু কোনো একক গ্রন্থের মধ্যে ভারতের সামগ্রিক লোক-সংস্কৃতির পরিচয় দানের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সর্বজনের আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। সম্পাদক আক্ষেপ করেছেন আয়তনের পরিসরের অল্পতায় প্রতিটি প্রদেশের উপরে এক একটি প্রবন্ধ সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়নি। এটি পাঠকেরও আক্ষেপের হেতু হবে। তবু যতখানি করা গেছে তার জন্যে তাঁরা প্রশংসাভাজন।

সূচনায় একটি মূল্যবান নিবন্ধে ডঃ কে. ডি. উপাধ্যায় ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণার আবহমানের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। লোকসংগীতের উপর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়টি সম্ভবত অধ্যাপক লুসি ও রোডরিগস্-এর। 'গোয়ার লোকসংগীত: দুরপদ' শীর্ষক এই উন্মোচনী প্রবন্ধে গোয়ার এই লোকগীতি-গুলির আশ্চর্য মাধুর্য নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো স্থানীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত মাস্তোর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, কখনো গোয়ানীজদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কখনো নৈসর্গিক ঐশ্বর্যের পটভূমিকায়, কখনো সমাজমুখী কবিচিত্তের প্রকৃতি নির্ভরে এত সরস, এত হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন যে প্রবন্ধটি শেষ ক'রে যেন সংগীতগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের তৃপ্তি অনুভব করা যায়। শ্রীযুক্ত বি. রামারাজুর তেলেগু লোকসংগীত একাধারে তেলেগু লোকসাহিত্যের গবেষণার ইতিহাস এবং তেলেগু লোকগীতির পরিচিতিও বটে। শ্রীমতী বিজয়া রাঘবন, শ্রীযুক্ত আর সি. মেহতা এবং শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনগুপ্তের প্রবন্ধ তিনটি লোকসংগীতের স্বরূপ, তার রক্ষণের প্রয়োজন এবং এবিষয়ে গবেষকদের নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে সন্নিবেশিত।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ লোকশিল্প অংশের প্রবন্ধ-গুলিই বোধহয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এ পর্যায়ে পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে কোনো বিশ্লেষণী বা নূতন কোনো গবেষণার চিহ্ন নজরে পড়ল না। অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধটি যাদুঘরের মাধ্যমে লোকশিল্পের গবেষণার নানা দিক সম্পর্কে পাঠক মনে নানা চিন্তার উদ্রেক করবে। শ্রীযুক্ত এইচ এম. উপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিতে ভারতীয় যাদুঘর সমূহের মধ্যে কোথায় কিভাবে লোকশিল্পের নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে সে সম্পর্কে অসম্পূর্ণ হলেও বিস্তারিত তথ্য থাকায় ভাবী গবেষকদের সহায়ক হবে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব রচিত প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা-দেশের মুখ্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রমুখের উপরে লোকশিল্পের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধটি আরো বিস্তারিত এবং চিত্রাদিসমন্বিত হলে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক হতো।

লোকসাহিত্য অধ্যায়ে বিদগ্ধজনের উপযোগী সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি সুপ্রাচীন কাল থেকে যে প্রাকৃত জনের জন্য প্রাকৃত ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় বিপুল সাহিত্য সম্ভার রচিত হয়েছিল ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে তার মূল্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই জাতের সাহিত্যকে লোকসাহিত্য বলা হবে কিনা সেই মৌলিক প্রশ্ন আমরা আগেই উত্থাপন করেছি। জনগণের জন্য রচিত সাহিত্য লোকসাহিত্য নয়, জনগণের দ্বারা রচিত সাহিত্যই যথার্থ লোকসাহিত্য। সেই দৃষ্টিকোণে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যে নূতন অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই। ওড়িয়া গণসাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ এবং বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে এখনো বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী দাশের প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে এবং অসমীয়া ভাষার উপরে রচিত প্রবন্ধ পড়ে মনে হলো আসলে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা

গণসাহিত্যের একই ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত বলে একরূপ এবং পরিপূরক সুতরাং উড়িষ্যা, আসাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার গবেষকদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করে সম্মবদ্ধভাবে কাজ করা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং সহায়ক হবে। মারাঠী গুজরাট এবং কাশ্মীর সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ তিনটি নানা তথ্যে মূল্যবান এবং আগ্রহী পাঠকদের পরিতৃপ্তির কারণ হবে।

জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও নবমূল্যায়নের মুহূর্তে এই জাতীয় একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি আরো বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করে সম্পাদক তাঁর পূর্বপরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবেন সেই প্রত্যাশায় রইলাম। বইটির অঙ্গসজ্জা ছাপা ও বাঁধাই উচ্চ রুচিসম্পন্ন। সুবীর সেনের প্রচ্ছদ প্রশংসার দাবী রাখে।

অম্বুজ বসু

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তনব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ইহুদী সাহিত্যের পুনরুন্মেষ ও আলকিৎ ব্লাম

ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

সুদূর সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশী ইহুদী জাতির ইতিহাস পৃথিবীর ঐতিহাসিক ধারায় এক চির ছন্নছাড়া জাতির ইতিবৃত্ত। ওল্ড টেষ্টামেন্ট দিয়ে এ জাতির রাজা, সমাজ ও সাহিত্যের সুরু আর খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেই এদের একতাবদ্ধ রাষ্ট্রের শেষ। তারপর থেকে নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডহীন, বাস্তুহারা এক-ব্রহ্মে-বিশ্বাসী আব্রাহামের সন্তানরা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশে দেশে ঘর খুঁজে নিয়েছে পবিত্র ভূমি প্যালেস্তাইনের অধিকারচ্যুত হয়ে। নানা রাষ্ট্রে, নানা পরিবেশে, নানা ভাষাভাষীতে বিভক্ত ইহুদী জাতি, তবু তাদের স্বকীয়তা একনিষ্ঠভাবে বজায় রেখেছে আড়াই হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে। যার ফলে ইহুদী সাহিত্য একমাত্র হিব্রু ভাষায় সীমাবদ্ধ না থেকে নানাভাবে দেশে দেশে দিকে দিকে জার্মাণ, ফরাসী রুশ, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, রুমানীয়, চেক, পোলিশ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। বলতে গেলে, ইউরোপে এমন ভাষা খুব কমই আছে যার লেখক তালিকায় একজনও ইহুদীর নাম নেই।

ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের ধারণা ন্যায়ের দেবতা জিহোভা লামেদ ভভ্ ইত্যাদি ছত্রিশ জন ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষকে সৃষ্টি রক্ষার ভার দিয়েছেন। তাঁরা স্তম্ভরূপে পৃথিবীকে ধারণ করে আসছেন। পরমেশ্বর জিহোভা মানুষের দৃষ্টির অতীত; তাঁর মন্দির মানুষের হাতে গড়া নয়। তিনি অদৃশ্য থেকেই ন্যায়ের অনুশাসনে প্রিয় মানসপুত্র আব্রাহামের সন্তান সন্ততিকে সর্বদা রক্ষা করছেন। সাধারণত যে কোন জাতির মন্দির ও দেবমূর্ত্তি কোন কারণে ধ্বংসীভূত হলে সেই ক্ষেত্রে আর দেবতার অধিষ্ঠান নেই বলে মনে করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা এই সংস্কার থেকে মুক্ত। তাদের ঈশ্বর বিশ্ব পরিব্যপ্ত। নিয়মিত ধর্মশাস্ত্র পাঠ এবং তদনুযায়ী জীবন-যাপনই ভগবৎ সেবার মূল কথা। এই পরিবেশ-নিরপেক্ষ মুক্ত বিশ্বাস সারা জগতে ছড়িয়ে পড়া ইহুদী জাতিকে মনের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে, যদিও দেশ ভেদে ভাষা, পোষাক ইত্যাদির যথেষ্ট বিভিন্নতা রয়েছে। এ এক অদ্ভুত মানুষ গোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব ভূমি, রাষ্ট্র, রাজশক্তি এমন কি ধর্মস্থান পর্য্যন্ত নেই। (কারণ, জেরুজালেমের ধর্মমন্দির ৭০ খৃষ্টাব্দেই ধ্বংসীভূত হয়েছে।) ইহুদী জাতির এই মানসিক বন্ধন, এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী একনিষ্ঠ ঐক্য কোন বিশেষ নেতা বা ধর্ম্মযাজকের প্রয়োজন অনুভব করেনি কোনদিন। স্বতঃ-প্রবৃত্ত মানুষ নিজেরাই এই ঐক্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। ইহুদী ভবিষ্যৎ বক্তা এজেকিয়েল, আমোস প্রভৃতি সলোমন ও তৎপরবর্তী ইহুদী রাজাদের শাসন যুগে (খৃঃ পূর্ব্ব ১০০০—৭২১) ধনী সভাসদ ও স্বার্থপর পুরোহিতদের নানা লোভ, বিলাস, শোষণ ইত্যাদি জনিত পাপের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এই সব পাপের শাস্তি স্বরূপ ইহুদী জাতি রাজ্যহারা হবে, যুগে যুগে ধ্বংসের মুখে পড়বে

যতদিন পর্য্যন্ত তারা নিজেদের সংশোধন করতে না পারে এই অভিশাপ এ জাতি আজও ভোলেনি. বিশেষ ক'রে হিটলারের সেমিটিক ধ্বংসী আর্য্যোন্মত্ততা তাদের সেই অভিশাপের পরিণাম বার বার মনে করিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি আব্রাহাম-পুত্রকে শিউরে উঠতে বাধ্য করেছে।

অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে সেই অভিশাপের অবসান ঘটলো বহুযুগ পরে আবার সার্বভৌম ইহুদী রাজ্য ইস্রায়েল স্থাপিত হয়ে। নবজাগ্রত জাতি আবার ভগবান জিহোভার নামে দেশে-বিদেশে ইহুদীদের ডাক দিলো। আবার ইহুদী জাতি ভূমি, রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সাথে সাথে ঘটেছে অনিবার্য্য মানস অভিব্যক্তির পরিণতিতে হিব্রু ভাষায় ইস্রায়েলের সাহিত্যের পুনরুন্মেষ। নতুন চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ জাতির আধুনিক সাহিত্যের গতি হঠাৎ বহু পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত পার হয়ে সমসাময়িক সাহিত্যধারার পাশাপাশি প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যসেবী দীর্ঘকাল ধরে এই পরিণতির স্বপ্ন সফল করার জন্যসর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করে এসেছেন পরাধীন মাতৃভূমি প্যালেস্তাইনের মাটি আঁকড়ে ধরে, আবিগ্‌দর ব্রাম তাদের মধ্যে অগ্রতম।

আবিগ্‌দর ব্রাম দেশভক্ত ইহুদী। পূর্বপুরুষ যোজেফ সুপ্রাচীন যুগে যে পবিত্র ভূমিকে ইহুদীদের ভগবৎ-প্রদত্ত বাসস্থান বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন সেই প্যালেস্তাইনের এক গ্রামে ১৮৯৬ সালে তাঁর জন্ম। একাধারে কবি, গল্পকার, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক ব্রাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে প্যালেস্তাইনের হিব্রু পত্রিকা "হৈনূসিথ" এর সাংবাদিক ও কিছুদিন পরেই যুগ্ম-সম্পাদকের পদে বৃত হন। তারপর থেকে ১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত আমৃত্যু তিনি এই কাজের মধ্য দিয়ে দেশ ও সাহিত্য সেবা করে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর শেষ জীবনে তাকে সর্ব্বাধিক সাহায্য করেছিলেন যোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী এস্তা ব্রাম।

শেক্‌পীয়র-চিত্রিত ইহুদী মহাজন শাইলক চরিত্র থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহু ঘটনা ও লোকশ্রুতি পরম্পরায় ইহুদী জাতি সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও নিন্দনীয় হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন বলে পরিচিত, সারা ইউরোপে, এশিয়ায়, আমেরিকায় ছড়িয়ে থেকে ইহুদীরা তাই সব সমাজেই পৃথক, অমিশ্রিত তাই বলে এ জাতির মানবতাবোধ বা হৃদয়ের কোমলবৃত্তির উন্মেষ হয়নি মনে করলে নিশ্চয়ই অবিচার করা হবে। পৃথিবীর নানা ভাষায়ই ইহুদী সাহিত্যকার আছেন। কিন্তু ইহুদী জাতির একান্ত নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি যা শুধু মাত্র হিব্রু ভাষায় রচিত তার সংখ্যা বা উৎকর্ষ নিতান্ত কম নয়। বিশেষ করে স্বাধীন ইস্রায়েলে নতুন করে সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা পরিপূর্ণভাবে আধুনিক সাহিত্যের সমস্ত গুণগুলির অধিকারী। ব্যবসায়ই তাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য বলে সাধারণের ধারণা। কিন্তু আবিগ্‌দর ব্রামের রচনা এ ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ব্রাম রোমান্টিক কবি। তার কবিতার সংখ্যা অল্প কিন্তু উৎকর্ষের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব অনেক। তার শেষ উপন্যাস "পেরেজ স্কোয়ারের পথে", যার জন্যে তিনি ১৯৫৯ সালে ইহুদী সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ (Congress of Jewish Culture) থেকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন, তা বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে প্রথম শ্রেণীতে স্থানলাভের যোগ্যতা রাখে বললে অত্যুক্তি হয় না। সমসাময়িক হাঙ্গেরিয় ইহুদী-লেখক এলি ভীজেল ও ফরাসী ইহুদী সাহিত্যকার মরিস সাক্স-এর সাহিত্যাদর্শ থেকে ব্রামের রচনার ধারা অনেক ভিন্নমুখী। ইস্রায়েলে উপরোক্ত সাহিত্যসেবীরাও বহুল পরিচিত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত। হিটলারের মারণ যজ্ঞশালা আউশভিৎসের যমপুরী থেকে যে কজন প্রাণ নিয়ে পালাতে

পেয়েছেন এলি ভীজেল তাদের মধ্যে একজন। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার, মনুষ্যত্বের অবমাননা, এই পূর্ব ইউরোপীয় হাঙ্গেরীবাসী ইহুদীকে যে চরম অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কবি অনুদার মানবতার তীব্র সমালোচক, কিন্তু তা বলে ঐশ্বরিক আশীর্বাদকেও তিনি তুচ্ছ করেন নি। সামগ্রিকভাবে এক বিশেষ গোষ্ঠীর অনুদার চিন্তা যে বিশ্বজনীন নয়, তা তিনি বার বার বলেছেন। অপরপক্ষে ফরাসী দেশে অজস্র ঐশ্বর্য্য বিলাসে লালিত, পিকাসো, ককতো' মিলো Milhaud), রাদিগে'র মত মহারথীদের সঙ্গে একাসনে বসেও কবি মরিস্ সাক্স তাঁর কবিতায় মানবজীবনের কুৎসিৎ দিকটাকে এড়াতে পারেন নি। তাঁর রচনায় খুব কঠোর ও রূঢ় ভাবে মানুষের প্রবৃত্তি-দানবের দিকটা প্রকাশ পেয়েছে।

আলফিৎ ব্লাম এই দুই লেখকের দুটি বিপরীত দিকের কোনটাই সমর্থন করেন নি। তাঁর জীবনে প্রচুর রূঢ় দুঃখময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বে, তিনি দুঃখ বা ঘৃণা কোনটাকেই চিরন্তন বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর কবিতা যে রোমান্টিক আদর্শে সুরু হয়েছিল, শেষ জীবনের রচনাতেই সেই একই সুর লক্ষ্য করা যায়।

আলফিৎ ব্লামের দুটি কবিতা

১

সে রাতের, —সেই কিছু-বলা-আর-কিছু-না বলা রাতের
মায়াজাল থেকে আমি তোমায় ছিনিয়ে এনেছিলাম।
আমি প্রসন্ন দিনের আলোয় তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম।
বিশ্বাস করো, সেই শিশু সুলভ আচরণের মধ্যেও
তোমার স্বচ্ছতা একটি সম্পূর্ণ ভাষা হয়ে
কিছু-বোঝা আর-কিছু না-বোঝার আবর্তে
রেখেছে আমায়।

তবে আর বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই।

তুমি বোসো গাছের ছায়ায়,
জুলাই মাসের রোদে—সোনা রোদে,
আকাশে উড়ন্ত পাখী ডানামেলে লিখে যাক্ সোনার আখর,
তোমার ওপর দিয়ে, আমার ওপর দিয়ে।
আমি বসে থাকি চুপচাপ তোমার পাশেই।
এর চেয়ে সহজ, সুন্দর আর কিছু নেই।

তবু এই কাল গোণা-পথ টেনে নিয়ে যায়
কোথায়—কোথায়?
সেই রাতে—সেই কিছু-বলা আর কিছু-না-বলার রাতে?

২

আমি তোমায় নিয়ে যে কী করবো জানি না,
আমি ভেবে পাই না, বুঝতে পারি না।
তোমাকে আগুন-রাঙা মখমলে আবরণে
জড়িয়ে রাখবো, যাতে কেউ দেখতে না পায়?
কাঠের আড়াল দেবো?
আমার চোখের তারায় বন্দী ক'রে
তারপর সেই চোখ বন্ধ ক'রে দেবো?
কিংবা রাখবো দুটো হাতের আড়ালে,
না হয় মাটির মধ্যে লুকিয়ে
আমার একান্ত নিজস্ব তোমার অস্তিত্ব?
নাকি শুধু কথা করে রেখে দেবো?
অথবা • 'হানিনা'র মত লেখায় ভরা ভূর্জপত্রে
জড়িয়ে রাখবো, যেন জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের
শেষ মুহূর্তেও আমি তোমার আলো আর কথা
দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করি?

'লাশোন ভভে'র পবিত্র ধারায় জন্ম তোমার
ওগো বধু,
তুমি আমার হাতের স্পর্শ আর চোখের আলো হয়ে থাকো!

• (ইহুদী প্রাচীন শাস্ত্রে গল্প আছে, সম্রাট হাড্রিয়ানের সময় ইহুদী শহীদ হানিনা পবিত্র লেখায় ভরা ভূর্জপত্রে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল। তার শবদাহের সময় পবিত্র শব্দগুলো আকাশে উড়ে গিয়েছিল চিরস্থায়ী হয়ে।)

বিশ্বাবর্ত

সঙ্কটের আবর্ত

একমাস সময়কালের মধ্যে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী ঘটনার দ্রুত গতিবেগে সারা পৃথিবী প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এই ঘটনাবলীর পারম্পর্য পৃথিবীতে শান্তির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করেছে কিম্বা অপসারিত করেছে, তা নিয়ে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন বিতর্ক উঠেছে এবং আগামী দিনগুলিতে ঘটনার পরিণতি কোনদিকে সঞ্চারিত হবে সারা পৃথিবী শঙ্কাকুল দৃষ্টি নিয়ে তা লক্ষ্য করবে। পৃথিবীতে নিত্য-নূতন ঘটনা নানা আবর্তের সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথ রচনা করে যাবে, সে কোনো বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নয়। কারণ এই অনির্দেশ্য ঘটনাস্রোতের আভাস-ইঙ্গিত ইতিহাসের পরিচিত পশ্চাৎপট থেকেই উৎসারিত হয়ে এসে থাকে। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে আপাত-পশ্চাৎপটে যার রেখাঙ্কন নেই। যা নিতান্তই আকস্মিক। সুতরাং তার আলোড়নও অনিবার্যভাবেই প্রবল ও প্রচণ্ড। গত একমাসের মধ্যে ঘটনার আলোড়ন এই প্রকার দুরন্ত স্বাক্ষরও রেখে গেছে।

কি কি ঘটনা ঘটেছে, এই সময়ের ব্যবধানে? গত ৫ই অক্টোবর থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত কায়রোতে ৪৭টি রাষ্ট্রের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দিকচক্রে নিঃশেষিত হবার পূর্বেই সোভিয়েট রুশের রাজনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল ১৫ই অক্টোবর ষ্টালিনের রুশের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের অধিকারী নিকিতা ক্রুশ্চেভের আকস্মিক অপসারণে। অবশ্য তার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গত ১২ই অক্টোবর একই মহাকাশগামী যানে তিনজন যাত্রীকে সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশযাত্রায় উৎক্ষিপ্ত করে সবেমাত্র যখন সোভিয়েট রুশের বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার এই নবতম পদক্ষেপে পৃথিবীর স-সম্ভ্রম বিস্ময় সেদিকে উৎসারিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের মত অবিশ্বাস্য সংবাদ সর্বত্র আতঙ্কের শিহরণ এনে দিয়ে যায়, বুঝিবা ষ্টালিনের আমলের মৃত্যুর গহ্বরের হিমশীতল দিনগুলি আবার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করবে! অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল মাও-সে তুঙের দেশ কম্যুনিষ্ট চীন ও তার অনুচরবৃন্দ। ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের উল্লাসধ্বনি বিঘোষিত করেই যেন তার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর, ত্রস্ত পৃথিবীর বুকে কম্যুনিষ্ট চীন সিনকিয়াং প্রদেশের লপ্ নর মরুপ্রান্তরে প্রথম আনবিক বোমা বিস্ফোরিত করে শান্তির পথে মৃত্যুবাণ ছড়িয়ে গেল। একই সময়ে এই ডামাডোলের মধ্যে ১৫ই অক্টোবরের ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের স্থলবর্তী হয়ে জয়ী শ্রমিক দলের নেতা হারল্ড উইলসন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীত্ব পদে বৃত হন। প্রগতির কাঁটা কোথাও এগুলো, কোথাও বা শান্তির কাঁটা পিছিয়ে গেল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমিত ক্ষেত্রেও সংঘাতের ভূমিকা এই অবসরে আরও প্রসারিত হয়েছে। গত ২০শে অক্টোবর মালয়ের পশ্চিম উপকূলে মালাক্কা-জোহোর তীর-ভূমি এলাকায় ইন্দোনেশীয় গরিলা অবতরণ করে মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। ইতিপূর্বে পন্টিয়ান ও লাবিসে দুইবার ইন্দোনেশীয় সৈন্য অবতরণ করেছে এবং এ পর্যন্ত এদের মোট সংখ্যা ২৫৬ জন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মালয়েশিয়ার ওপর ইন্দোনেশিয়ার এই ছদ্ম আক্রমণ রাষ্ট্রসংঘে নিন্দিত হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎ নামে সম্প্রতি রাষ্ট্রপ্রধানদের পদগুলিতে সামরিকবাহিনীর স্থলে বেসামরিক পদাধিকারী নিয়োজিত হলেও, সেখানকার সঙ্কটও

আবার তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তার প্রমাণ গত ১লা নভেম্বর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম পতনের এই বার্ষিকী দিবসে ভিয়েৎকং গরিলারা সায়গন থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরবর্তী ভিয়েৎনামে সর্ববৃহৎ মার্কিনী বোমারু ঘাটির ওপর অতর্কিত আক্রমণে বিমান বহরের প্রায় অর্ধেক ঘায়েল করে দিয়েছে। কাম্বোডিয়া-ভিয়েৎনাম সংঘাতও সরব হয়ে উঠেছে। তার ফলে কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় মার্কিনী বোমারুগুলি বোমা বর্ষণ করেছে এবং একটি মার্কিনী বোমারুও ঘায়েল হয়েছে। কাম্বোডিয়া থেকে মার্কিনী নাগরিকরা অপসারিত হয়েছে এবং পিকিং কাম্বোডিয়ার উপর আক্রমণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে হয়তো মার্কিনী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরই কাম্বোডিয়া সম্পর্কে নূতন কোনো সিদ্ধান্ত আমেরিকা গ্রহণ করবে। ৩রা নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক ভোটগ্রহণ এই সময়কার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার উপর আগামী দিনের—যুদ্ধ না শান্তি—এই সঙ্কটের গতি ও পরিণতি বহুলাংশে নির্ভর করবে।

কায়রোয় কি হল ?

১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে প্রথম জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে ২৫টি রাষ্ট্রের এবং সরকারের প্রধানেরা সমবেত হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করেছিলেন। নেহেরু ছিলেন সম্মেলনের মূলাধার। কায়রোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে পশ্চাদপটের গুরুতর পরিবর্তন, সম্মেলনের আলোচনা, পলিটিক্যাল কমিটির বৈঠকে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সম্মেলনে চূড়ান্ত বিবৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এবার সম্মেলনে উপস্থিতরাষ্ট্রপ্রধান এবং গভর্ণমেন্টের প্রধানদের সংখ্যা ৪৭, অতিরিক্ত দশজন দর্শক-প্রতিনিধি। বেলগ্রেডের সমকালে চল্লিশটির বেশী দেশ উপনিবেশ শাসনের অধীনে থাকলেও, কায়রোর সময় মাত্র গোটা ছয়েক দেশ স্বাধীনতার অপেক্ষায় রয়েছে। বেলগ্রেডে আরব-বহির্ভূত আফ্রিকার পাঁচটি রাষ্ট্র উপস্থিত থাকলেও, এবার তাদের উপস্থিতির সংখ্যা ২। আর যদি আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মোটসংখ্যা বিচার করা হয়, কায়রোর সমাবেশের শতকরা ৫০ ভাগই আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা গঠিত।

নন্-এলাইমেন্টের বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠেছে বললেন নাসের, তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে। নন্-এলাইনমেন্ট কাকে বলে, নাসের ও টিটো তা বলবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। বললেন নন-এলাইমেন্ট দুই শিবির থেকে সুযোগ আদায় নয়, কিম্বা বিশ্ব-সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানও নয়। নিরাকার ব্রহ্মের মতই নন-এলাইনমেন্ট নিরালম্ব হয়ে রইলো কায়রো সম্মেলনে। শিবির-নিরপেক্ষ নন্-এলাইনমেন্টের মধ্যে যে নতুন জোটের পত্তন হয়েছে, কায়রো সম্মেলনে তা আর একবার সুস্পষ্ট হলো সম্মেলনের মূল বিতর্কের মধ্য দিয়ে, যে বিতর্কের একদিকে ভারতবর্ষ, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া ও অপরদিকে ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, মালি, আলজেরিয়া, কাম্বোডিয়া, গিনি কিউবা। বিতর্কটি সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান না উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইন্দোনেশিয়ার জোট সরাসরি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরোধিতা করেছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ নির্মূল না করলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অচল। কম্যুনিষ্ট চীন, সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকলেও ইন্দোনেশিয়া ও তার সমর্থক অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কম্যুনিষ্ট চীনের কণ্ঠস্বরে কায়রোর বৈঠক মুখর হয়ে উঠেছিল এবং কম্যুনিষ্ট চীনের দীর্ঘায়িত ছায়া সম্মেলনের জোট-নিরপেক্ষতা বা নন্-এলাইনমেন্টকে কলুষিত করে দিয়ে গেছে।

কায়রোর পলিটিক্যাল কমিটিতে চীনা-জোট সম্মেলনের

আদর্শগত স্থত্রটিকে দখল করবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে বহুলাংশে সফলও হয়েছে। কারণ সম্মেলনের শেষ প্রস্তাবে বেলগ্রেডের সুর পরিবর্তিত হয়ে বিশ্বশান্তির লক্ষ্য স্থানচ্যুত করে—উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই প্রস্তাবের কেন্দ্র-বিন্দু দখল করেছে। অথচ, ১৯৬১ বেলগ্রেডে সেদিন বলা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং উপনিবেশবাদও অন্তর্হিত হচ্ছে, তারপর বহু দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রস্তাব ছিল. শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হতেই পারে না, যতদিন পর্যন্ত অসমান রাষ্ট্রের অবস্থান থাকবে। এই প্রস্তাব যোগ আনা গৃহীত না হলেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভারতীয় পঞ্চশীল, যা কায়রোতে দশশীলে পরিণতি পেয়েছে, অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে নাই সম্মেলন থেকে। ইন্দোনেশিয়া একটি সর্ত-জুড়ে দেবার ফলে "peacceful co-existenso cannot fully materialiso throughout the world without the abolition of imperi.lism, col ni.lism and neo-colonisliem." অথচ, সহ-অবস্থানের তাৎপর্যই হলো বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণসহাবস্থান চাই।

পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং জোট-নিরপেক্ষ এলাকাকে পারমাণবিক অস্ত্র-বর্জিত এলাকারূপে ঘোষণা করার প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হলেও, পরবর্তী সময়ে চীনা পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কায়রোর নন্-এলাইনদের দুই একটি কণ্ঠে ছাড়া কোনো প্রতিবাদ শোনা গেল না। এমন কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসন্ন চীনা-বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্ত প্রতিবাদের ভাষায় যে বলিষ্ঠ আহ্বান জানালেন, এক সাইপ্রাসের মাকারিয়সের ক্ষীণ কণ্ঠ ছাড়া, কোনো সমর্থনের সাড়াই জাগাতে পারলো না। এই একটি মাত্র ঘটনা নন্-এলাইণ্ডদের প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। চীনের ছায়া যেখানে কণ্ঠরোধ করতে পারে চীনের কায়া সেখানে এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকাংশকেই যন্ত্রের মত পরিচালিত করবে, নিঃসন্দেহে সে-কথা অনুমান করা চলে। আর ভারতের নিঃসঙ্গতাও চমকে উঠতে হয়। ভারত-চীন সংঘাতে ভারত যে প্রায় নিঃসঙ্গ চীনা আনবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করবার জন্ত শাস্ত্রীর প্রস্তাবে নিরুত্তর কায়রো সম্মেলন সে-কথাই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলো।

ক্রুশ্চেভ বিতাড়ন কেন?

ক্রুশ্চেভ কেন অকস্মাৎ বিতাড়িত হলেন তার কোনো সরকারী কৈফিয়ত এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের ফলে যে উদ্বেগের আলোড়ন উঠেছে, সে-সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। এই উদ্বেগ চীনাপন্থী ছাড়া অন্যান্য কম্যুনিষ্ট মহলেও যেমন, পশ্চিমী ও নিরপেক্ষ দেশগুলিতেও তেমনি প্রবল। দলে দলে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদল মস্কো পৌছে ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের কারণ অনুসন্ধান করছে। কোনো কোনো দেশের পার্টি মহল থেকে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টিকে হুঁশিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে, ক্রুশ্চেভকে খর্ব ও অপদস্থ করার চেষ্টা না হয়। কেউ কেউ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছেন। কেউবা ক্রুশ্চেভকে বিবৃতি দেবার সুযোগ দাবী করেছেন। একদিকে যেমন ক্রুশ্চেভের ছবি, নাম, বক্তৃতাবলী ও তার সহকারীদের অপসারিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রাভদার পৃষ্ঠায় পরোক্ষে ক্রুশ্চেভ-বিরোধী অভিযানও গোড়ায় সুরু হয়েছিল। এই ঘটনার পর প্রাভদায় ক্রুশ্চেভকে "harebrained scheming... hasty decision and actions div ced from reality, bragging and phrasemongering, armchair method" ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হল। ক্রুশ্চেভের আয়োজিত আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলন সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টায় প্রাভদা জানালো, এই সম্মেলনে 'problems of peace', এবং "National

independence" আলোচিত হবে, কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নয়। কিন্তু ইদানীং স্বর বদলেছে। ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের বিরুদ্ধে মুখর সমালোচনার মুখে প্রাভদার পৃষ্ঠায় ক্রেমলিনের নূতন নেতৃত্বের স্বর পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেলো। গত ১লা নবেম্বর প্রাভদায় ঘোষিত হয়েছে : গুপ্ত পুলিসের দিনে ফিরে যাওয়া হবে না এবং সাধারণ মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হবে। তাছাড়া ক্রেমলিনের অনুসৃত যুদ্ধ-বিরোধী ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিও অপরিবর্তিত থাকবে ; "the improvement and development of rel.tions with all capitalist countries." । কম্যুনিষ্ট চীনকেও, নাম অনুল্লেখ রেখে, এই সংখ্যায় আক্রমণ করে, সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলন আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রুশ্চেভের সময়ে মহাকাশ অভিযান এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের প্রশংসা করেও কোনো কোনো বিষয়ে ক্রুশ্চেভের সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠবে, রুশ নীতি যদি অপরিবর্তিত থাকে, যে কথা পুনঃ পুনঃ নূতন নেতৃত্ব ঘোষণা করছেন, সেক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ অপসারিত হলো কেন ? ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, ক্রমবর্ধমান ক্ষমতালিপ্সা, আত্মীয়-পোষণ, পার্টির প্রিসিডিয়মের সঙ্গে পরামর্শ না করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিভাগীয় নির্দেশ দান, পশ্চিম জার্মানীতে আসন্ন সফর, চীনের সহিত চরম বিরোধে মত্ততা, ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদনে প্রসারতা ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে সঙ্কোচন প্রভৃতি অভিযোগ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, শোনা যায় এবং পার্টি প্রিসিডিয়ামের অন্য দশজন সহকর্মীর সঙ্গে তার মতান্তরও প্রবল হয়ে ওঠে। তাই কৌশলে গত ১লা অক্টোবর ক্রুশ্চেভকে কৃষ্ণসাগরে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে প্রিসিডিয়াম প্রস্তুত হতে থাকেন। ১৩ই অক্টোবর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত ফরাসী মন্ত্রী গ্যাষ্টন প্যালেওয়াস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ রেখে মস্কোয় ফিরবার জরুরী তাগিদ পেয়ে সেখানে ফিরে ক্রুশ্চেভ প্রিসিডিয়ামের জরুরী সভার সম্মুখীন হন এই সভায় পরাজিত ক্রুশ্চেভ, পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। ১৯৫৭ সালেও ম্যালেনকভ-মলোটভ চক্রের সঙ্গে সংঘাতে প্রিসিডিয়ামে ৭-৪ ভোটে ক্রুশ্চেভ পরাজিত হন। তারপরই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, যার পরিণতিতে ম্যালেনকভ-মলোটভ চক্র পরাস্ত, অপমানিত ও বিতাড়িত হয়। সেবার জেনারেল জুকভের বিমানবহর দলে দলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মস্কো এনে হাজির করে দেয়। সেবার ম্যালেনকভ-মলোটভ বিতাড়নে ক্রুশ্চেভের প্রধান সহায় ছিল সুসলভ। এবার চাকা ঘুরলো। প্রিসিডিয়ামের সভার পরদিনই সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠক বসবার আয়োজন সম্পূর্ণই ছিল এবং সে-সভায় এবার সুসলভ ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ক্রুশ্চেভের স্থলবর্তী পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদে ব্রেজনেভ নিযুক্ত হলেন। পরের দিন মাইকোয়ানের সভাপতিত্বে সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রিসিডিয়াম ক্রুশ্চেভকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করে কসিজিনকে প্রধান-মন্ত্রীর পদে উন্নীত করে।

ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নে সুসলভ অগ্রবর্তী হলেও, কিম্বা ব্রেজনেভ, কসিজিন, বা পডগর্নী তার সহায়ক হলেও, সামরিক বাহিনী, গুপ্তপুলিশবাহিনী কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত শক্তিশালী-গোষ্ঠি, সর্বোপরি পার্টি – এদের সমবেত চাপ ক্রুশ্চেভ-বিতাড়নের ভূমিকা রচনা করেছে। ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট জীবন থেকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন, প্যারিসের লা মোঁদ পত্রিকায় তার অভিনব অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে : Yesterday he wus everything, to day he is nothing.'

কিন্তু চীনের সঙ্গে অতঃপর সোভিয়েটের কি সম্পর্ক

হবে? ক্রুশ্চেভ-বিতাড়ন রুশ-চীন দ্বন্দ্বে মাও-সে-তুঙের বিস্ময়কর জয়। সুতরাং, প্রাভদার ১লা নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে চীনের সমালোচনা সত্ত্বেও, মস্কোর নীতি পিকিং-এর সঙ্গে সমঝোতার দিকে প্রসারিত হবেই। মস্কো-পিকিং সম্পর্কের ঝোঁকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চেভ-পন্থীদেরও বিদায় নিতে হবে। ব্রেজনেভ-কোসিজিনের যৌথ নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভ-পন্থায় লালিত, পালিত ও বর্ধিত। সুসলভ রূপান্তরিত ষ্টালিনপন্থী। খাঁটি ক্রুশ্চেভপন্থী কিনা তা অস্পষ্ট। সুতরাং ক্রুশ্চেভপন্থা থেকে সোভিয়েট নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চেভপন্থী ব্রেজনেভ কোসিজিন নেতৃত্বের পরিবর্তনও আশাকরা যায় বৈকি?

উইলসন কি করবেন?

তের বছরের রক্ষণশীল শাসনের পর গত ১৫ই অকটোবরের নির্বাচনে মাত্র চার ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করে শ্রমিক নেতা হ্যারল্ড উইলসন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। পার্লামেন্টের ৬৩০ জন সদস্যের মধ্যে শ্রমিক দলের ৩১৭ জন, রক্ষণশীল দলের ৩০৪ জন ও লিবারেল দলের ৯ জন। শ্রমিকদল ৫৬টি মোট নূতন আসনে জয়ী হয়ে শতকরা ৪৪.২ ভোট পেয়েছে, রক্ষণশীলরা মোট ৫৮টি আসন খুইয়ে শতকরা ৪৩.৪ ভোট পেয়েছে এবং লিবারেল দল দুইটি বেশী আসন পেয়ে শতকরা ১১.২ ভোট পেয়েছে। কম্যুনিষ্টদের আসন শূন্য, ভোটের সংখ্যা শতকরা .২। বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রান্তিক সংখ্যাধিক্য নিয়ে শ্রমিকদলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়িত করার পথে দুস্তর বিঘ্ন থাকলেও উইলসন দমবার পাত্র নয়। তার প্রতিশ্রুত প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে পরিবর্তনের সূচী নিয়ে উইলসন অগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য উইলসনের এই প্রান্তিক সংখ্যাধিক্যের নজীরও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রয়েছে। ১৮৪· সালে হুইগদের (লিবারেল) রক্ষণশীলদের (টোরি) চাইতে দুই ভোটের সংখ্যাধিক্য ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে এটলীর শ্রমিক সরকারের সংখ্যাধিক্য ছিল ৬ এবং ১৯৫১-৫৫তে রক্ষণশীলদের সংখ্যাধিক্য ছিল ২০। এবার রক্ষণশীলদের ১০০ সংখ্যাধিক্য মুছে দিয়ে শ্রমিকদলের ভোটের সংখ্যাধিক্য হয়েছে। সুতরাং ৯৫০ সালে যেমন আঠার মাসের মধ্যেই পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এটলীর শ্রমিক সরকারকে, উইলসনকেও অল্প-সময়ের ব্যবধানেই পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে। সেদিন ৪ ভোটের সংখ্যাধিক্যকে নিশ্চিত সংখ্যাধিক্যে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই আগামী দিনে উইলসনকে চলতে হবে।

তাই উইলসন কাল বিলম্ব না করেই কাজে নেমে পড়েছেন এবং প্রায় একশ জন সদস্যদের মধ্যে প্রশাসনের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম প্রস্তাব করে উইলসন নিঃসন্দেহে সরকার পরিচালনায় নূতন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। উইলসনের যেন সবুর সয় না, এই মুহূর্তে নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতিগুলি একটি একটি করে রূপ দিতে হবে এবং ইংলণ্ডের আর্থিক পরিস্থিতিরও অবিলম্বে উন্নতি সাধন করতে হবে! নির্বাচনে দলীয় পরাজয়ের পর ডগলাস-হোম জিনিসপত্র গুছিয়ে তখনও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট ত্যাগ করেন নাই, ইতিমধ্যেই উইলসন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েই ডাউনিং ষ্ট্রীটে হাজির হয়েছেন। ডগলাস-হোম ডাউনিং ষ্ট্রীটের খিড়কীর দরজা দিয়ে উইলসনের অসাক্ষাতে অত্র বিদায় নিলেন। এই ঘটনাটি উইলসনের সক্ষম, তৎপরতা ও জাতীয় জীবনে নবায়নের মানসিকতা মূর্ত করে তুলেছে।

ইস্পাতের পুনঃ জাতীয়করণ, ভাড়া নিয়ন্ত্রণের পুনঃ প্রয়োগ ও জমি নিয়ে ফাটকাবাজী বন্ধ করার জন্য ভূমি কমিশন প্রভৃতি আইনের খসড়া অনতিবিলম্বে উইলসনকে পার্লামেন্টে আনতে হবে। বিজ্ঞান, আর্থিক

পরিকল্পনা কিম্বা উৎপাদনের জন্য পৃথক মন্ত্রীদপ্তর গঠন করে এ-বিষয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন উইলসনের পক্ষে কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু উপরোক্ত আইন রচনার সময় তাঁকে রক্ষণশীল ও লিবারেলদের যুক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। লিবারেল নেতা জো গ্রিমণ্ড সরাসরি বলেছেন লিবারেল দল ইস্পাতের পুন: জাতীয়করণের ঘোরতর বিরোধিতা করবে।

উইলসনের সামনে আর একটি পরীক্ষা উদ্যত হয়ে আছে। ব্রিটেনের ব্যালেন্স-অফ-পেমেণ্টে-ঘাটতির ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ব্রিটেনের আপাতসমৃদ্ধির পেছনে কালোছায়ার মত বিপদ-সঙ্কেত জ্ঞাপক। পশ্চিম ইউরোপে ব্রিটেনের আর্থিক বৃদ্ধির হার (Growth rate) সব চাইতে কম। বছরে শতকরা ৪ ভাগ হারে আর্থিক বৃদ্ধির অনিবার্যতা রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল উভয়েই স্বীকার করেছেন। এ-বছর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যালেন্স-অফ-পেমেণ্টে-র ঘাটতি প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘাটতি পূরণের জন্য উইলসন প্রতি পাউণ্ডে তিন শিলিং অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ধার্য করেছেন, যদিও তার ফলে কমনওয়েলথের শতকরা ১১ ভাগ বাণিজ্য বিঘ্নিত হবে এবং ইংলণ্ডের বাজারে তাদের শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের দর বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য আমেরিকা, একটা এবং ই, ই, সির বাণিজ্যও বিঘ্নিত হবে। বছরে ১০০ মিলিয়ান পাউণ্ড ব্যালান্স-অব-পেমেণ্টে-র ঘাটতির ঝুঁকি নিয়ে উইলসন অনন্যোপায়। এই বিপদের সামনেও উইলসন ডিভ্যালুয়েসনের ন্যায় কোনো শঙ্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে ব্রিটেনের আর্থিক পরিস্থিতির উপর সকলের আস্থা অটুট রয়েছে। উইলসন-সরকার আয়ের উন্নতির জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন, পরোক্ষ ট্যাক্স ক্ষেত্রবিশেষে হ্রাস করে। সেই সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করেছেন, প্রতিযোগিতা থেকে ব্রিটিশ শিল্পকে প্রশ্রয় দেবার জন্য এ-কাজ করা হয় নাই।

বিশ্বে ব্রিটেনের প্রভাবের পরিমাণ সম্বন্ধেও উইলসনের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ। "Britain will have just as much influence in the world as we can earn and deserve." উইলসনের সরকার কতটা সোস্যালিষ্ট হবে, সে প্রশ্ন চার ভোটের সংখ্যাধিক্য আপাতত অবান্তর করে দিয়েছে। ব্রিটেনের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি পালনের দৃঢ় ও দ্রুত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যদি উইলসন আগামী দিনে শ্রমিক সরকারের স্থায়িত্বের ভূমিকা রচনা করতে পারে, তবেই সোস্যালিজমের ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডে সুনিশ্চিত হতে পারে। আপাতত, উইলসনের চেষ্টা সেদিকেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩. ১১. ৬৪

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুন
ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন

“কোন বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে কোন অংশের মনোভাব যত কঠোরই হোক না কেন, দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের কোন সময়েই এই কথাটা ভোলা উচিত নয় যে, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তাঁরা ভারতীয় এবং এক জাতি এক দেশ এই অপরিবর্তনীয় কাঠামোর মধ্যেই সমস্ত বিরোধ ও বিভেদের মীমাংসা করতে হবে। এই একতার মনোভাব ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য, আসুন আমরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি।”

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
প্রধান মন্ত্রী

আমাদের লক্ষ্য সোজা ও পরিষ্কার—সকলের জন্য স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত ক'রে শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলাই হ'ল আমাদের লক্ষ্য।
চলুন আমরা একসঙ্গে এগিয়ে চলি, সহিষ্ণুতা, সাহস, সংকল্প ও শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি জাতি হিসেবে কাজ করি।

জয় হিন্দ

ঐক্যবদ্ধ থাকুন, স্বাধীনতা অটুট রাখুন

DA-64 P7 (Beng.)

CENTRAL LIBRARY UNIV

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭১

সম্পাদকীয়

শাস্ত্রীর অসময়োপযোগী লণ্ডন সফর

বৃটেনের সদ্য ক্ষমতারূঢ় শ্রমিক দলের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের আবশ্যকতা সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রথম লণ্ডন সফর অসময়োপযোগী, অমর্য্যাদাকর ও কার্য্যত অসফল হয়েছে। বৃটেনের শ্রমিকদল যে সময়ে ষ্টার্লিংয়ের মানরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত ও অর্থনৈতিক সংকট মোচনে চিন্তান্বিত এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আলোচ্য সূচী প্রস্তুতির জন্য তৎপর ঠিক সেই সময়টিতে শ্রীশাস্ত্রীর লণ্ডন যাত্রার যে কি প্রয়োজন হল তা আপাতত দুর্বোধ্য।

লণ্ডন বিমানবন্দরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত ছিলেন না, এবং কমনওয়েলথ সেক্রেটারীও বিমান প্রতীক্ষালয়ে শ্রীশাস্ত্রীর বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরে এসে মাননীয় ভারতীয় অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীশাস্ত্রী তিন দিন লণ্ডনে ছিলেন এবং তার মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বৃটিশ পার্লামেন্টে সম্ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান করা হয়নি, তবুও তিনি কেন যে সেখানে শুধু দর্শকরূপে উপস্থিত রইলেন সেকথাও সুবোধ্য নয়। রাণী মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে একজন সাধারণ অতিথির মত 'ভিজিটারস বুকে' নিজের নাম দস্তখত করাও ভারতের ৪৪ কোটি জনতার প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে মর্য্যাদাকর হয়নি। উইলসনের সঙ্গে বৈঠকের পরে শ্রীশাস্ত্রী পৃথকভাবে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন যুক্ত বিবৃতিও প্রকাশিত হয় নি।

লণ্ডন সফরকালে শ্রীশাস্ত্রী বারবার এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন যে তিনি কোনরূপ সাহায্য চাওয়ার জন্য লণ্ডন যান নি—বিশ্ব শান্তি ও সহযোগিতা, চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পাক-ভারত সম্পর্কের বিষয় নিয়ে তিনি উইলসনের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেখানে গিয়েছেন। আলোচনার ফলাফল কি হয়েছে তা জানা যায়নি, কারণ

তিন ঘণ্টার সাক্ষাৎকারে এরূপ বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন গুরুতর মতবিনিময় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে সম্ভব নয় তা, সহজবোধ্য। কিন্তু পাক-ভারত সম্পর্কের নামে কাশ্মীর সমস্যা,—যে সমস্যা ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যারূপেই ভারত সরকার গণ্য করেন বলে ব্যক্ত করেছেন এবং যে সমস্যাটি কমনওয়েলথ বৈঠকে স্থান পাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণমাচারী ভারতে তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন সেই সমস্যাটি নিজেই যেচে কেন যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লণ্ডন ছুটে গেলেন তা'ও দুর্বোধ্য।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে আন্তর্জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং অ-পারমাণবিক দেশগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থায় সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতি অর্জনের প্রয়াসেই কি শ্রীশাস্ত্রী লণ্ডন যাত্রা? কিন্তু শাস্ত্রীজীর লণ্ডন সফরের যদি এটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা' হলে একই সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন বিদেশ যাত্রা সূচী তৈরী করে শাস্ত্রীজীর, মস্কো, ওয়াশিংটন ও লণ্ডন সফর করে ভারতীয় বক্তব্য প্রধান পারমাণবিক শক্তির ত্রয়ী-নেতৃত্বের নিকট উপস্থিত করা উচিত ছিল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসনের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠান মোটেই যুক্তি-যুক্ত হয়নি। চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সুরক্ষার প্রশ্নে এক গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেছে। এবং এ জন্য আন্তর্জাতীয় রক্ষাকবচ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতীয় প্রয়াসে উদ্যোগী হওয়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল।

ক্রুশ্চেভের পতনের পরে রুশ-ভারত সম্পর্কে অনেকখানি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তাই, সামরিক সাহায্যাদির জন্য ভারতের পক্ষে বৃটেনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবনের বৃটেন ভ্রমণ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে এবং এরূপ সফরে কূটনৈতিক তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু শ্রীচ্যবনের প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী কেন এত তাড়াহুড়া করে লণ্ডন গেলেন তা' মোটেই বোধ গম্য নয় বিশেষতঃ বৃটেনের পক্ষে এই অসময়ে।

শাস্ত্রীজীর এরূপ অতি-ব্যস্ত লণ্ডন সফরের সঙ্গে কি ভারতীয় জনতাকে একথা মনে করতে হবে যে বাহ্যত শাস্ত্রীজী লণ্ডন সফরের যে কারণ বর্ণনা করেছেন তার চেয়েও কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। এককভাবে চীন অথবা পাক-চীন সংযুক্তভাবে কি ভারতের উপরে হামলা করতে উদ্যত হয়েছে? সে জন্যেই কি শাস্ত্রীজী লণ্ডন গিয়েছিলেন? এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিলেও শাস্ত্রীজীর পক্ষে শুধু লণ্ডন সফর করা কূটনৈতিক হয়নি।

নাগা সমস্যার সমাধানে মৌল সংকট

কয়েক মাস ধরে জয়প্রকাশ-চালিহা-স্কটের ত্রিমূর্তী দৌত্যের প্রয়াস সত্বেও নাগাভূমির সমস্যা সমাধানের মূল প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। নাগাভূমি একটি ভারতীয় রাজ্য কিনা এবং নাগারা একটি ভারতীয় অঙ্গ-জাতি কিনা সেই মূল প্রশ্নের উত্থাপনে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার বার্তালাপে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম নাগাভূমির দাবীতে বিদ্রোহী নাগারা এখনও অটল রয়েছে এবং বার্তালাপের সুযোগে নিজেদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে বিদ্রোহী শক্তিকে শক্তিশালী করছে। স্বাধীন নাগাভূমির দাবী এখন শুধু বিদ্রোহী নাগাদেরই বক্তব্য নয়—এই দাবীর প্রতি অনেকাংশে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ নাগাভূমির রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে ভারতীয় সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষেও সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী নেতা ফিজোর গৃহস্বামী মিঃ মাইকেল

স্কট নানা বক্তব্যের মধ্যে নাগাদের স্বাতন্ত্র্যের কথাটি সর্বদাই কূটনৈতিক ভাষায় সজীব করে রেখেছেন। বিদ্রোহী নাগাদের সম্পর্কে ঔদার্যপূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার ব্যক্ত করলেও বিদ্রোহী নাগাদের একাংশ যে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গেরিলা সংগ্রামের কৌশল শিক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানে প্রবেশ করছে এ পর্যন্ত শ্রীজয়প্রকাশ অথবা মাইকেল স্কট সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি অথবা শান্তি-সর্ত-ভঙ্গকারী এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বিদ্রোহী পক্ষকে কোনভাবে সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

সম্প্রতি বিরোধীদলের এগার জন সদস্য নাগাভূমির রাজ্য বিধান সভা থেকে পদত্যাগ করে এই দাবী উত্থাপন করেছেন যে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে বার্তালাপের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমান আইন সভার অস্তিত্ব অর্থহীন। এরূপ পদত্যাগের পশ্চাতে যে বিদ্রোহী পক্ষের হাত রয়েছে এবং ইহা যে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগী নাগাদলের গুরুত্বকে খর্ব করে নাগাভূমির একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি অর্জনে বিদ্রোহী পক্ষের কূটনৈতিক প্রয়াস, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় কিন্তু যে নাগা দল অত্যন্ত চরম অবস্থার মধ্যেও ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করতে দ্বিধা বোধ করেনি তাদের মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে খর্ব করার চেষ্টাকে অনৈতিক বলে ভারত সরকারের অগ্রাহ্য করা কর্তব্য। নাগাভূমিতে এক দলের পরিবর্ত অপর দলকে ক্ষমতারূঢ় করা নয়,—সংহত নাগা জাতির সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সংহতি বিধানই হবে শান্তি প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

ভারতীয়দের সঙ্গে নাগা জাতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এক গৌরবময় ঐতিহ্যের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আজাদ হিন্দ অভিযানের সময়ে। নাগাভূমিতে নেতাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং আজাদ হিন্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে একযোগে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বৃহত্তর ভারতীয়তার সঙ্গে নাগা জাতির যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সেকথা স্মরণ করার কোন প্রয়োজন ভারত সরকার বা শান্তি দৌত্যের কোন নেতাই অনুভব করেন নি এ এক লজ্জাজনক সঙ্কীর্ণতা। কোহিমা ও নাগাভূমির অন্যান্য অঞ্চলে আজাদ হিন্দের আত্মত্যাগী সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে নাগা জাতির অবদানের কোন স্মারণিক প্রতিষ্ঠার কোন চৈতন্যও দেখা যায় নি। বিদ্রোহীনাগা নেতা ফিজোর নেতাজীর প্রতি আনুগত্যজ্ঞাপন এবং নাগাভূমির ঘরে ঘরে নেতাজীর প্রতিকৃতি রক্ষার ঘটনাগুলি সুবিদিত। তথাপি দিল্লী কর্তৃপক্ষের নেতাজী-বিরোধী রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ফলে নেতাজী ও নাগাভূমিতে আবেগ স্নাত ঐতিহ্যকে রক্ষা করে নাগাদের মধ্যে ভারতীয়তা বোধ সঞ্জীবিত করারও দায়িত্ব পালনে ভারত সরকার অগ্রণী হয়নি। নাগাদের বর্তমান বৈরী মনোভাব ভারত সরকারের সেই কর্তব্যচ্যুতির একটি শোচনীয় পরিণতি।

নাগাভূমির শান্তিদৌত্য ভারতবাসীর মনে অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। এরূপ সংশয় নিরসনের জন্য অবিলম্বে একটি লোকসভা কমিশনের নাগাভূমি পরিদর্শনে যাও1 কর্তব্য এবং সেই সঙ্গে আগামী ২৩শে জানুয়ারী সাড়ম্বরে কোহিমাতে নেতাজী জয়ন্তী উদযাপন এবং স্থায়ীভাবে নাগাভূমিতে আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য স্থাপনে ভারত সরকারের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন।

সেউলিয়া খাদ্যনীতি

৭ই নভেম্বর গুন্টুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে সরকারী খাদ্য নীতি নির্ধারিত হওয়ার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, প্রস্তাবিত বৈঠক ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবী রেখে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়ম ম্যানিলায় বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সম্মেলনে

পাড়ি দিলেন। গুণ্টুর ত্যাগের পূর্বে এ, আই, সি, সি অধিবেশনে যে-সময় খাদ্য সম্পর্কে একটি ছেলেমাতুষী প্রস্তাবের ওপর খাদ্যমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—যে প্রস্তাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা কিম্বা খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন নীতি সম্পর্কে কোনো উল্লেখই ছিল না, যে প্রস্তাবে কেবলমাত্র উৎপাদকের জন্য মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ার এবং ফুড গ্রেণ করপোরেশন গঠিত হওয়ায় সরকারী স্তুতি ভিন্ন আর কিছু ছিল না—সে সময় খাদ্যসঙ্কটের দাবানলে কেরল দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে এবং কেরলের বিপন্ন রাজ্যপাল বিমানে খাদ্য-সরবরাহ করে কেরলকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রের নিকট আর্ত আবেদন জানিয়েছেন। কেরলে ১লা নভেম্বর থেকে ইনফরম্যাল রেশনিং শুরু হয়েছে। অর্থাৎ নামকোওয়াস্তে রেশনিং ; কার্ডধারীদের দৈনিক ছয় আউন্স চাউল ও ৬ আউন্স গম দেবার সাধুসঙ্কল্প মাত্র। ৭ই নভেম্বর নয়া দিল্লীতে সংবাদ প্রকাশিত হল কেরলে সঙ্কট-মোচনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৬২০০০ টন চাউল দ্রুত পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অবিলম্বে অন্ধ্র ও মাদ্রাজ থেকে ১২,০০০ টন, উড়িষ্যা থেকে ১০,০০০ টন, মাদ্রাজ থেকে কুরুচাই চাউল ২০,০০০ টন অন্ধ্র থেকে সিদ্ধ চাউল ৫০০০ টন। এগুলি অঙ্কের হিসাব দেখিয়েও কেরলে খাদ্য-দাঙ্গা রোধ করা গেল না কারণ প্রতিশ্রুত চাউল আদৌ কেরলে গিয়ে পৌছায় নাই। এ-বিষয়ে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ সব চাইতে প্রবল। মহীশূরে গুন্টুর অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বেই অন্ন-বিভ্রম খাদ্যদাঙ্গা হয়ে গেছে।

গুণ্টুর সম্মেলনে এই দুর্দৈবের কোনো রেখাপাত হয়ে থাকুক, আণবিক বোমার আলোচনার মত্ততার আড়ালে সরকারী খাদ্যনীতির পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেলো। কেরলের ও দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্যসঙ্কটের পরই রেশনিং ও স্টেট ট্রেডিং সম্পর্কে সরকারী দৃঢ়তা শিথিল হয়ে খাদ্যের কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উদ্যোগী হয়েছে। তারই পরিণতি গত ১৮ই নভেম্বরের জাতীয় খাদ্য-নীতির পরিকল্পনায়।

১৮ই নভেম্বরের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন, জাতীয় খাদ্যনীতির শিরোপা নিয়ে উদ্ভূত নীতি, আসলে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের জোড়াতালি দেওয়া নীতি। এই নীতির সূত্র কয়টি (১) কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের জন্য ১৯৬৫ সালে ২০ লক্ষ টন চাউল সংগৃহীত হবে (২) ৫ থেকে ১০ লক্ষ টনের চাউলের একটি মজুদ ভাণ্ডার গঠিত হবে (৩) প্রশাসনিক ভিত্তিতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে খাদ্য সরবরাহ করা হবে। মিহিদানা ও মোটা দানার উভয় জাতীয় শস্যের সরবরাহ এই ব্যবস্থার আওতায় আসবে (৪) প্রতিটি রাজ্য এক একটি পৃথক খাদ্যাঞ্চলরূপে পরিগণিত হবে। (৫) কলকাতায় পূর্ণ রেশনিং চালু হবে। বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ-এ ইনফরমাল রেশনিংই চালু থাকবে। (৬) মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে রাজ্যের প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রিত বণ্টন চালু হতে পারে, (৭) পি, এল ৪৮০ আইন অনুযায়ী আমেরিকা থেকে আড়াই লক্ষ টন চাউল আমদানী হবে, প্রয়োজনবোধে আরও আড়াই লক্ষ টন চাউল নগদ-মূল্যে ক্রয় করা হবে।

উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত বিশলক্ষ টন চাউলে মজুদ ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করা এবং ঘাটতি অঞ্চলে যোগান দেওয়া হবে। অন্ধ্রের ৮ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশের ৪ লক্ষ টন, উড়িষ্যার ৩ লক্ষ টন, মাদ্রাজের ২লক্ষ টন, পাঞ্জাবের আড়াই লক্ষ টন ও উত্তর প্রদেশের কিছু পরিমাণ চাউল বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় তহবিলে সংগ্রহের আনুমানিক পরিমাণ। অন্ধ্রের সংগ্রহ রাজ্য সরকারের ও অন্যান্য রাজ্যের সংগ্রহ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। মোটাদানার শস্য উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহের উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী ব্যবস্থায় ভিন্ন রাজ্যে রপ্তানীর জন্য চিহ্নিত থাকবে। মার্চ মাসের পর পর্যন্ত ছোলার আন্তঃরাজ্য সরবরাহ অবাধ থাকবে। কিন্তু

তার পূর্বে ঢোলায় নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ নির্দিষ্ট হয়েছে। ডাল ও তেলের সরবরাহ ও নির্বাধ থাকবে। গম সরবরাহের নীতি মার্চ মাসে নির্ধারিত হবে।

খাদ্যনীতির এই গোঁজামিল অনায়াসে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলির শৈথিল্য ও মুনাফালুঠেরাদের কারসাজী বানচাল করে দিতে পারে। গত জুনমাসে খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের পর অন্ধ্র ও মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সংগ্রহ বন্ধ হয়েছিল। তারপর অক্টোবর থেকে ব্যবসায়ীদের কেরলে চাউল পাঠান বন্ধ করে অন্ধ্র সরকার চাউল পাঠাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরিণতিতে কেরলের দাঙ্গা। দেখা যায় নূতন নীতিতে সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সংগ্রহের ব্যবস্থাও চালু থাকবে। সুতরাং বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত দখলে কালোটাকার কারসাজী, সরকারী প্রকিওরমেন্টের হিসাব অনায়াসেই বানচাল করে দেবে। পূর্ণাঙ্গ রেশনিং-এর বিপদ এইখানে। অথচ প্রচুর উৎপাদনের দোহাই দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং-এর দিকে পদক্ষেপ না করলে আগামী দিনে সমূহ বিপদ আছে। কারণ যদিও খাদ্যশস্যের ঘাটতি মাত্র শতকরা ছয় ভাগ, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরে খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা তেইশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। রেশনিং, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহ, উৎপাদকের ও ক্রেতার জন্য উৎপাদনের মূল্যস্তর নির্ধারণ, মজুত ভাণ্ডার গঠন, এই কয়েকটি মৌলিক নীতির স্থির-প্রয়োগ ব্যতিরেকে খাদ্যনীতি অসম্পূর্ণ, অযৌক্তিক ও দেউলিয়া সপ্রমাণ হতে বাধ্য। কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রেও বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে যাবে, যদি না চাউলের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত কালো টাকার আওতার বাইরে রাখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ

পশ্চিম বঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ রাজ্যের উন্নয়ন ও প্ল্যানিং বোর্ড পরিকল্পনা কমিশনের মঞ্জুরী-সাপেক্ষে ৬১৭·৩৮ টাকা চূড়ান্তভাবে ধার্য করেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দ ছিল ১৫৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৩১৯ কোটি টাকা। পশ্চিম বঙ্গে কৃষিকে সর্বাগ্রাধিকার দিবার নীতি গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দ ৩৭ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম তিন বছরে মাত্র ৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চতুর্থ বছরে আরও ৯ কোটি টাকা ব্যয় হবার সম্ভাবনা থাকলেও অবশিষ্ট একবছরে ১৯ কোটি টাকা ব্যয় করা কৃষি দপ্তরের পক্ষে অসম্ভব। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিখাতে বরাদ্দ হয়েছে ৬২টি কোটি টাকা, যদিও কৃষিদপ্তর ৭২ কোটি টাকা মঞ্জুরী চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তরের অযোগ্যতা তৃতীয় পরিকল্পনার আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে, যদিও খাদ্যমন্ত্রী পাট চাষের জমির দুই লক্ষ একর থেকে বার লক্ষ একরে এবং একর প্রতি ২·৬ গাঁট থেকে ৩ গাঁটে বৃদ্ধি কৃষিদপ্তরের যোগ্যতার নজীররূপে উল্লেখ করতে কখনই ক্ষান্ত হন না! সুতরাং কৃষি অগ্রাধিকার পেলেও, কৃষির সুষ্ঠু প্রয়োগ অগ্রাধিকার পাবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারীকে কৃষি কমিশনারে উন্নীত করে দপ্তরের অগ্রাধিকার অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু চাষ এবং চাষী, দপ্তরের চাইতে বহুদূরে রয়ে গেছে।

বিদ্যুতের বরাদ্দ এবার সব চাইতে বেশী। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুতের যুগ্ম বরাদ্দ ৬৩·৮৫ কোটি টাকার স্থলে চতুর্থতে ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার ৯৬ কোটিই ব্যয় হবে সানতালদিহি বিদ্যুৎ প্রকল্পে এবং ৪২ কোটি এই প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ চলাচলের ব্যবস্থাপনার জন্য। গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ, ক্ষুদ্র শিল্পে বিদ্যুৎ নিয়োগ এবং বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস করার উপর বিদ্যুৎখাতে ব্যয়ের সার্থকতা নির্ভর করবে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে বরাদ্দ ৩১·৬৮ কোটি টাকা, সেচে ২৭ কোটি টাকা।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ছাঁটাইয়ের খড়্গ সব চাইতে বড় আঘাত দিয়েছে। শিক্ষাখাতে ১২০ কোটি টাকার বরাদ্দ দাবীকে খর্ব করে প্রথমবার ৪৯ কোটি টাকা ও শেষে ৬০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়-বরাদ্দেও ৯৫ কোটি টাকার দাবীকে ৫২ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে রাজ্যের অংশ ৩১ কোটি টাকা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসে সমাজ উন্নয়ন-মূলক দাবিগুলি অবহেলিত হবে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করবে। এই ব্যয়-বরাদ্দের কতটা কেন্দ্র দেবে, রাজ্যই বা কতটা দেবে, এবং কি সূত্রেই বা রাজ্যের দেয় সংগৃহীত হবে—সে-সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্রের ভিত্তিতেই পরিকল্পনার মূল্যায়ন হবে। ব্যয়ের লক্ষ্যের পেছনে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার দীর্ঘশ্বাস কি পরিমাণ পুঞ্জীভূত হবে সেটাই প্রকৃত মূল্যায়নের নিরিখ।

আয়করের খড়্গ

আয়করের ব্যাপক অনুসন্ধান-অভিযানের ফলে এক পশ্চিম বঙ্গেই নাকি ১৫,০০০ আয়কর ফাঁকিদাতার খোঁজ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কলকাতাতেই ১০,০০০ জন। এদের চার বছরের আয়কর আদায়যোগ্য; তার পরিমাণ হবে পাঁচকোটি। আরও সতর্ক-অনুসন্ধান করলে এই ট্যাক্সের পরিমাণ আরও বহুগুণ বাড়বে সন্দেহ নাই। গত মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে আয়করদাতার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার। আগামী মার্চের মধ্যে তাদের সংখ্যা আরও একলক্ষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গে আদায়ী আয়করের পরিমাণও সেই অনুপাতে প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই করের পরিমাণ ৬০-৬১ সালের ৭৩ কোটি ১৯৬৩-৬৪র ১৩৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ৬৩-৬৫তে এই সংখ্যা ১৫০ কোটির সীমা অতিক্রম করবে। সেক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষে আদায়ী আয়করের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে আদায় হবে। অথচ আয়কর বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুতর বৈষম্য হয়ে গেছে। কারণ ফাইনান্স কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বন্টনযোগ্য করের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ আদায়ের স্থানের সংগৃহীত আয়করের ভিত্তিতে এবং শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টিত হয়ে থাকে। চতুর্থ ফাইনান্স কমিশনের কাছে পশ্চিমবাংলার প্রতি এই অবিচারের প্রতিকার আমরা দাবী করি।

পাক-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রক্ত-সংকেত

পাকিস্থানের জনসাধারণ যে আয়ুব শাহীর ডিকটেটারী শাসনের বিরোধী, প্রাথমিক নির্বাচনে পাক-জনতা সেকথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যৌথ গণতন্ত্রী নির্বাচনে মিঃ আয়ুব তথা কনভেনশনপন্থী মুসলীম লীগ যদি দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করতেন তা'হলে পাক-নির্বাচনের প্রথম পর্বেই মিঃ আয়ুব চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হতেন। কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি দেখিয়ে যৌথগণতন্ত্রী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় না-করাবার সুযোগ গ্রহণ করেই আয়ুব-পন্থীরা বাগাড়ম্বর সহকারে একথা বলেছেন যে আয়ুব সমর্থকরা প্রাথমিক নির্বাচনে ৮০ শতাংশ আসন পেয়েছেন। পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষ দাবী করেছেন যে পূর্ববঙ্গে মিস জিন্নার সমর্থকরা ৮০ শতাংশের বেশী এবং পশ্চিম পাকিস্থানে ন্যূনপক্ষে ৬০ শতাংশ আসন লাভ করেছেন। বিরোধী পক্ষ দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল এবং নির্বাচনের পরে পূর্ববঙ্গে বিজয়ী প্রার্থীর তালিকা এবং সমগ্র পাকিস্তানে মিস্ জিন্না-ভিত্তিক বিরোধী পক্ষের বিজয়ী যৌথ গণতন্ত্রীদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। স্থানচ্যুত আওয়ামী পার্টির সম্পাদক মহম্মদ ওসমানী এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন যে মিস জিন্নার সমর্থকেরা ৮০,০০০ যৌথ গণতন্ত্রীর আসনের মধ্যে অন্তত পক্ষে ৬৩,০০০ আসন লাভ করেছেন। মিঃ আয়ুব

ও মিস জিন্নার পক্ষ থেকে বিদয়াপেশের যে দাবী উত্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে অতিরঞ্জন সত্ত্বেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আয়ুব-বিরোধী পক্ষ ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসন লাভ করেছেন। যদি সরকার পক্ষ থেকে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করা হয় এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে যদি পাক-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা' হলে একথা সুনিশ্চিত বলে ধরা যায় যে মিঃ আয়ুবের পরাজয় অবধারিত।

কিন্তু সামরিক উত্থানের মাধ্যমে যে সামরিক জেনারেল পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করে নিজের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি 'মনগড়া' সংবিধান রচনা করেছেন, তিনি কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধী পক্ষের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন? যদি বা রাজনীতি পরিত্যাগ অথবা আত্মত্যাগের কোন সদিচ্ছা মিঃ আয়ুবের মনে উদয় হয়েও থাকে তবুও নিতান্ত আত্মরক্ষার বাস্তব প্রশ্নেও মিঃ আয়ুবের পক্ষে ক্ষমতা মিস জিন্নার হাতে হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিস জিন্নার হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা যায় তা' হলে মিঃ আয়ুবকে হয় মীর্জা ইস্কান্দারের পথা অনুসরণ করে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হবে অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত ১৯৫৬ সালের পাক-সংবিধান ধ্বংসের জন্য মিঃ আয়ুবকে দেশদ্রোহীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই, আয়ুবের সামনে আজ শুধু রাজনৈতিক অস্তিত্ব নয়, ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চরম প্রশ্নও গুরুতর হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের মঞ্চ-নিয়ন্ত্রিত নাটক যে শেষ পর্যন্ত একটি গুরুতর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হবে একথা মিঃ আয়ুব কল্পনা করতে পারেন নি। সামরিক শাসনকালে চরমভাবে নিপীড়িত রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে যে ঐক্যবদ্ধভাবে মিঃ আয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে একথা তিনি ভাবতে পারেন নি। পাকিস্তানের সমস্ত পরিচিত রাজনৈতিক নেতা সামরিক আইন বলে নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই আয়ুব মনে করেছিলেন যে বিরোধী দলের পক্ষে কোন যোগ্য প্রার্থী খুঁজিয়াও সম্ভব হবে না। তাই এক কোটি টাকার ওয়ার্কস প্রোগ্রাম দ্বারা প্রতিপালিত ৮০,০০০ বর্তমান মৌলগণতন্ত্রীদের ভোটে তিনি অনায়াসেই জয়লাভ করতে পারবেন এবং তারপরে মিঃ আয়ুবের 'ডিকটেটারী শাসনের কুখ্যাতিও দূর হবে।

মিস জিন্না যে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন একথা আয়ুব স্বপ্নেও ভাবেননি এবং পাকিস্তানের মত গোঁড়া মুসলীম দেশে একজন নারী প্রার্থী যে জনসমর্থন লাভে সক্ষম হবেন তাও ছিল আয়ুবের গণনার বাইরে। মিস জিন্নাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে যে আয়ুববিরোধী গণ উত্থান এমন প্রবল আকারে সৃষ্টি হতে পারে তা দেখে এবং একটি ডিকটেটর শাসিত দেশে এরূপ গণবিক্ষোভের তাৎপর্য কি সে কথা অনুধাবন করে আয়ুব এতটা বেসামাল ও উদ্বিগ্ন হয়েছেন যে অত্যন্ত বিকৃতরুচির পরিচয় দিয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী মিস-জিন্নাকে অশালীন ভাষায় গালি দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি, স্পষ্টাক্ষরে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে জনতা যদি নির্বোধের মত মিস জিন্নাকে ভোট দেয় তা' হলে পাকিস্তানে অনিবার্যভাবে 'আরেকটি বিপ্লব' ঘটবে এবং সেই বিপ্লবে 'স্বাস্থ্য-কেন্দ্রিক ও অকৃতজ্ঞ রাজনীতিকদের প্রতি কঠোর নীতি গৃহীত হবে। পরিশেষে সমস্ত গণতান্ত্রিক নীতি বিসর্জন দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে তিনি একথা জানিয়ে দিয়েছেন 'বিরোধী পক্ষের কাছে মাথা নত করার মত দুর্বল লোক তিনি নন।'

মিঃ আয়ুব কিভাবে ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রাখবেন? মিস জিন্নাকে পাক সংবিধানের একটি ধারার সুযোগ নিয়ে 'ক্লীণ আউট' করার প্রবল চেষ্টা তিনি করেছিলেন কিন্তু পশ্চিম পাক গভর্ণর মালিক আমীর খানের প্রবল বাধায় তা' করা সম্ভব হয়নি। এখন সরকারী ক্ষমতার সুযোগ

নিয়ে তিনি ৮০,০০০ মৌল গণতন্ত্রীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হুমকি দেখিয়ে বা ঘুষ দিয়ে এবং নানারূপ নির্বাচনী কৌশল প্রয়োগ করে নির্বাচনে জয়ের চেষ্টা করছেন। যদি এই পন্থায় তিনি সফল না হন তা' হলে কোনো জাতীয় জরুরী অবস্থা সৃষ্টি করে নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করে আবার সামরিক আইনজারী করবেন অথবা নতুনভাবে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করবেন। শেষ পন্থা সম্বন্ধে অবশ্য তিনি খুব সুনিশ্চিত নন—কারণ মিসরের নাসার ও নাগীবের ঘটনার কথা মিঃ আয়ুবের অজানা নয়।

পাকিস্তান আজ এক চরম রাষ্ট্রীয় সংকটের সম্মুখীন। একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পাক-ভারত সীমান্ত গুরুতরভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং এই সক্রিয়তা সংঘাতের ক্ষেত্রেও পরিণত হতে পারে। পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। জয় বা পরাজয় উভয় অবস্থাতেই আয়ুবশাহী এক চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে রক্তাক্ত গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে পাক-ভারত সম্পর্কও গুরুতর আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করার কারণ রয়েছে। ভারতের পক্ষে পাক-সীমান্তে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ভারত দরদী বিজ্ঞানী হ্যালডেনের দেহান্তর

প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হ্যালডেন ৭২ বৎসরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুবনেশ্বরে দেহত্যাগ করেছেন। অধ্যাপক হ্যালডেন শুধু জীব বিজ্ঞানেই নয়—অংকশাস্ত্র, সাহিত্য এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে ছাত্র জীবনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন। তিনি ক্যাম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বহু ছাত্র জীববিদ্যার গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়। তিনি সংখ্যাতত্ত্ব, অংকশাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানে অনেক মৌলিক গবেষণা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন এবং বিজ্ঞান জগতে নিজের অবদান রেখে যান।

অতি উচ্চমানের বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব অর্জন সত্ত্বেও চিন্তা ও আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টি সম্পন্ন। গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্বন্ধে অধ্যাপক হ্যালডেনের মনোভাব সুবিদিত।

১৯৫৬ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। ভারতের প্রতি অনুরাগের জন্য তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং এই দেশকেই তাঁর বাসস্থান ও গবেষণা কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করেন। তিনি পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্রকাশন ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন। ইহার পরে একই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গের কাজ ছেড়ে তিনি ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যা সরকারের গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মৃত্যুর আগে অধ্যাপক হ্যালডেন নিজের মৃত দেহ নিয়ে কোনরূপ অনুষ্ঠান করার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে এই নির্দেশ দিয়ে যান যে তাঁর মৃত দেহ যেন গবেষণা কাজের জন্য অন্ধ্রের কাকিনাদার মেডিক্যাল কলেজে দেওয়া হয়। এই মহান বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গেও অন্তরে ছিলেন বিপ্লবধর্মী ও মানব প্রেমিক। মৃত্যুর মাধ্যমেও তিনি তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভারতবাসী এই মহৎ প্রাণ ভারতদরদী বিজ্ঞানীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কবি কামিনী রায়

(১৮৬৪-১৯৩৩)

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের মধ্যে কামিনী রায় একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র আচরিত কৃত্রিম ক্লাসিক ধারা থেকে বাংলা কাব্য ক্রমশ রোমান্টিক গীতিধর্মিতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে যুগের কোনো কোনো কবির কাব্যে এই দ্বৈতচারণা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তাঁরা যেমন মধুসূদন-হেমচন্দ্রের কাব্যসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের অভিনব ভাবসাধনার অমোঘ আকর্ষণও তাঁরা অতিক্রম করতে পারেন নি। কবি কামিনী রায়ও এই দুই কাব্যধারার দ্বারা আন্দোলিত হয়েছিলেন। এই যুগের বাংলাকাব্যে দ্বৈতচেতনার বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে তাঁর মনোজীবন লালিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্য "আলো ও ছায়ার" (১৮৮৯) ভূমিকা লিখেছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র যে তাঁর কাব্যের ভূমিকা লিখেছিলেন তাই নয়, হেমচন্দ্রের কাব্যসংস্কারকেও তিনি কোনোদিনই ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, অথচ রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নূতন কাব্যধারাকেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এ প্রভাবকে একই সঙ্গে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর যুগপৎ আকর্ষণ মনে হতে পারে। কিন্তু এই পর্বের বাংলাকাব্যের এই ছিল সাধারণ লক্ষণ। কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রঙ ক্রমশ মিলিয়ে আসছিল, অথচ সর্ববন্ধনমুক্ত রোমান্টিক কল্পনা তখনো কুণ্ঠিত, অর্ধব্যক্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত! বিহারীলালের পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসমকালীন কবিরা এই ভাবসন্ধিলগ্নেরই মানস-সন্ততি।

কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি হেমচন্দ্রের সপ্রশংস মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা। যাহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।...বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা, এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি।" হেমচন্দ্রের এই মন্তব্যের 'আজকালের ছাঁচে ঢালা'—অংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবত হেমচন্দ্র রবীন্দ্র-প্রভাবিত অভিনব কাব্যসাধনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'আলো ও ছায়া' কাব্যপ্রকাশের এক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য (১৮৯০) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ এই সময় একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। হেমচন্দ্রের কাব্যসংস্কারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিলেও রবীন্দ্রপ্রভাবিত কাব্যসাধনারও যে কিছু প্রভাব 'আলো ও ছায়া'য় পড়েছে, হেমচন্দ্রের মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'আলো ও ছায়া'র কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিষণ্ণতার সুর লক্ষ্য করা যায়। এই সুরের অন্তরালের মধ্যে কামিনী

রায়ের অন্তর্জীবনের একটি গভীর ইঙ্গিত নিহিত আছে। এ বিষণ্ণতাকে কোনো শোকজনিত বিষাদ বলা যায় না, জীবনের কোনো গুরুতর অভিজ্ঞতাও কবিচিত্তকে বিষণ্ণ করে তোলে নি। এই কাব্য তাঁর বিবাহের পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাই এই বিষণ্ণতাকে একজাতীয় রোমান্টিক বিষণ্ণতা বললেও ভুল হবে না। বিষণ্ণতা রোমান্টিক কবিদের চিন্তা-চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রোমান্টিক কবিদের কাব্যের উন্মেষলগ্নে একটি সুলভ ভাবালুতা ও অস্বচ্ছ মনোবিলাস থাকে। কায়াহীন অশরীরী ভাবনার স্ফুট অস্ফুট বাষ্পরাশি মানসদিগন্তে বিচরণ করে। রোমান্টিক কবিদের মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে কার্লাইল পরিহাস করে বলেছিলেন Wertherism। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের প্রাথমিক পর্বটিকেও বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন ভাবাতিরেকের পর্ব বলা যায়। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'শৈশবসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যকে এক হিসাবে 'ভগ্নহৃদয়ের পর্ব' বলা যায়। 'ভগ্নহৃদয়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা তখন এমন একটা সন্ধিস্থলে—যেখান থেকে সত্যের আলো স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই।...আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখ দুঃখও স্বপ্নের সুখ দুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার মতো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল,—তাই আপন মনে তিলে তাল হয়ে উঠত।"[১]

কামিনী রায়ের এই শ্রেণীর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'ভগ্নহৃদয়ের পর্ব' বলা যায়। 'আলো ও ছায়া' নামটিও সম্ভবত এই অর্থেই সার্থক। বাংলাকাব্যের এই পর্বে বিষণ্ণ সুর নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে : "These sentiments were echoed in the early poems of Michael, Hemchandra, NabinChandra, Biharilal, Akshoy Boral, Adharlal Sen, Kamini Ray, Saralabala Dasi, Priyambada Devi and Rabindranath Tagore. All of them, in their early compositions, were dominated by a morbid melancholy, an unreality and a kind of wertherism which was altogether a new current in our poetry."[২]

'আলো ও ছায়া' কাব্যের প্রথম কবিতা 'আঁধারে'। এই কবিতার প্রথমেই কবি বলেছেন :

আঁধারের কীটাণু আমরা
    দুদণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট
    জীবন ও মরণের মেলা।

হৃদয়ের অবরুদ্ধ ভাব প্রকাশ ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে উঠেছে। নিজের হৃদয়-রহস্যের দিকে চেয়ে বিস্ময় জেগেছে, কিন্তু এখনো কবি পথ খুঁজে পান নি। তাই 'দুঃখ পথে' কবিতায় বেদনার্ত কবি বলেছেন :

এই আমি — এই আমি ?
হায়! হায়! এই আমি ?
আপনারে নারি চিনিবারে,
মলিন মুমূর্ষু প্রাণ   লুটাইছে সিক্ত হয়ে
আপনারি শোণিতের ধারে!

'আলো ও ছায়া'র 'সুখ' কবিতাটি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই কবিতায় কবিমানসের একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা

১. 'জীবনস্মৃতি'তে উদ্ধৃত ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রের কিয়দংশ। শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৃ ৯৯।

২. Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry : Introduction—H. M. Dasgupta.

যায়। কবিতাটির রচনাকাল জুন, ১৮৮০। বলাবাহুল্য কবিতাটির মধ্যে মহৎ ভাব ও আন্তরিকতা যতই থাক না কেন, অভিজ্ঞতা ছিল না। বিষণ্ণতার ঘনান্ধকার চারদিকে বিস্তৃত :

বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ,
নবভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন
যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

এক আদর্শবাদের মধ্য দিয়ে কবি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, পরহিতব্রত ও স্বার্থত্যাগের মন্ত্রে কবি তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছেন :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কবির এই দুঃখের মূলে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি নীতিকথা সংযোগ করতে পেরেছেন। দুঃখের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে কবিতাটির নীতিমূলক উপসংহারের প্রয়োজন হতো না।

২

শুধু পরহিতব্রত ও স্বার্থত্যাগই নয়, দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর প্রেমও কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশপ্রেম এ যুগের বাংলা কাব্যের একটি প্রধান সুর। 'মা আমার' কবিতায় কবি বলেছেন :

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?

এই সুর শুধু প্রথম কাব্যেরই নয়, কামিনী রায়ের সমগ্র কাব্য জীবনেরই মর্মবাণী।

'আলো ও ছায়া' কাব্যের মধ্যে 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ', 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক'—কবিতা তিনটি কবিমানস ও কবিকৃতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তিনটি কবিতার বিষয়বস্তুই বাণভট্টের 'কাদম্বরী' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন কবিকথাকে কবি নবরূপ দিয়েছেন। 'কাদম্বরী' কাব্যে প্রেমের যে মহিমান্বিত মূর্তি আছে, তাকেই কবি নবীন মন্ত্রে আরতি করেছেন :

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ওনা আর—
কানে কানে কে কহিল তার
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' কামিনী রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রাচীন কবিমনীষাকে তিনি যেন নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্যে প্রণয়গাথার অভাব নেই। কিন্তু মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক আখ্যায়িকার এমন একটি বিরল বৈশিষ্ট্য আছে যা সহজেই বিস্ময়মুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কঠিন প্রণয়ব্রতের দুষ্কর তপস্যা এই আখ্যায়িকাটিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের মহিমা কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

ভালবাস যারে,
ভাল তারে বাস সতি, বিরহে মিলনে,
চিরকাল মরণের এপারে ওপারে।
প্রণয়ের পথ ইহ দুঃখ সমাকুল,
কঠিন প্রণয়ব্রত, তপস্যা দুষ্কর।
তারপর বিশ্বদেব প্রেমের আকর—
প্রণয়ের মনোরথ পূরিবে তোমার।
কার সাধ্য করে ভিন্ন প্রণয়িযুগলে?
কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

কামিনী রায়ের প্রেম কবিতায় সংযত-স্নিগ্ধ ভাবলাবণ্য আছে। নারীব্যক্তিত্বের বিচিত্র উদ্বোধনের সঙ্গে পরিশীলিত রুচি ও আতিশয্যহীন হৃদয়াবেগ যুক্ত হয়ে তাঁর প্রেম কবিতা-

গুলিকে উচিন্মিত করে তুলেছে। মহাশ্বেতার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকাহিনীকে তিনি অতি সহজেই আপন হৃদয়রাগে রঞ্জিত করেছেন।

'আলো ও ছায়া' কাব্যে কয়েকটি প্রেম কবিতাও সঙ্কলিত হয়েছে। 'সে কি?', 'মুগ্ধ প্রণয়', 'প্রণয়ে ব্যথা' প্রভৃতি কবিতাকে রোমান্টিক প্রেম বললে ভুল হবে না। 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতায় প্রেম-বেদনার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে :

কেন যন্ত্রণার কথা কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার?
কেন কণ্টকের কূপ প্রণয়ের পথে?

'সে কি?' কবিতায় কবি সুস্পষ্টভাবেই তার প্রেমচেতনার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেমের এক উচিন্মিত উদার মহতী মূর্তি রূপায়িত হয়েছে :

আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উবেল উচ্ছ্বাস,
দুধারে সংযম-বেলা ঊর্ধ্বে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান....
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি ধরণীর পাশ।

'আলো ও ছায়া' শুধু-কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যই নয়, এই কাব্যে তাঁর প্রতিভার মূল সুত্রগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুরগুলিই পরবর্তীকালে বিচিত্র ভাবানুষঙ্গের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে।

'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩) কাব্যে ১৮৮১-১৯১৩ পর্যন্ত কবিতার সঙ্কলন। এর অনেকগুলি কবিতা 'আলো ও ছায়ার' যুগে রচিত হয়েছিল। পুরনো কবিতাগুলির সঙ্গে কিছু নূতন কবিতা যোগ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই এই কাব্যে কোনো নূতন সুরের বিকাশ ঘটে নি। 'আকাঙ্খা' কবিতায় কবির অভিপ্রায়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি শুধু স্বপ্নের কারাগারে আবদ্ধ থাকতে চান না, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ব্রতচারণাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা :

যাই করি কিছু যেন করি
স্বপন না ভাল লাগে আর,
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক জীবন আমার।

কোনো কোনো প্রেমকবিতা হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র স্পন্দনে আন্দোলিত হয়েছে। 'আমাদের কেহ তুমি নও' কবিতায় কবি বলেছেন :

আমাদের অশান্ত হৃদয়
তৃষাব্যাকুলতা ভরা, আবর্ত তরঙ্গময়,
নিরাশা ঝটিকা বহে, অশ্রুজলে নদী হয় ;
আমাদের উন্মত্ত প্রণয়
দিতে চায় নিতে চায় ত্রিভুবন সমুদয়—
নেহারি জাগে কি ঘৃণা? কিবা মনে লাগে ভয়?

'মাল্য ও নির্মাল্য'-এর কয়েকটি কবিতায় পরিণত ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এখন বিবাহিত—সংসারজীবনে প্রবেশ করেছেন। 'আলো ও ছায়া' কাব্যের অস্পষ্ট নীহারিকার জগৎ অন্তর্হিত হয়েছে! মাল্য এখানে নির্মাল্যে পরিণত হয়েছে—

পড়ে গিয়ে যদি কাছে পাই
তবে পড়ি তাতে দুঃখ নাই।
কিন্তু কেন সাথে নাহি রও?
এবে দুঃখে অভিভূত প্রাণ
নাহি বুঝি তোমার বিধান,
জানি শুধু, পিতা শুধু হও।

প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি এখন গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। উচ্ছ্বাসের ফেনস্ফীত ভঙ্গি এখানে পরিত্যক্ত

হয়েছে। এক প্রশান্ত উপলব্ধি ও অনুত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলেছেন :

সঙ্গীত গগন পূর্ণ
বুঝিতে না পারি ভাষা,
দুটি কথা বুঝি শুধু—
সৌন্দর্য ও ভালবাসা।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে একটি প্রধান লক্ষণ পুরাণকে নবরূপ দান করা। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র পুরাণকাহিনীকে যুগজীবনের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে পুরাণ ও ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্রকে অভিনব ভাবৈশ্বর্যে মণ্ডিত করেছেন। 'পৌরাণিকী' কাব্যে (১৮৯৭) কামিনী রায় রামায়ণ-মহাভারতের চারটি কাহিনীকে নবরূপ দিয়েছেন। 'একলব্য', 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ', 'রামের প্রতি অহল্যা' ও 'যযাতি-দেবযানী' কবিতাচতুষ্টয়ে কামিনী রায়ের যথার্থ কবি-শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'যযাতি-দেবযানী' কবিতাটিই শ্রেষ্ঠ। এখানে দেবযানীর চরিত্রটি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। অভিমান-ক্ষুব্ধা দেবযানীর আত্মসমালোচনায় নাটকীয়তা ও কাব্যধর্মিতার বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছে :

বড় ক্ষোভ প্রাণে,
শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু, আত্মসুখদানে,
তোমারে করেছে সুখী, ধন্য আপনারে
যশস্বিনী জননীরে। আমি বারে বারে
নিজেরে জিজ্ঞাসি, কেন আমার সন্তান
পারে নাই সাধিতে এ ব্রত মহান?
অসহিষ্ণু দেবযানী আত্মসুখ লাগি
ফিরিয়াছে চিরদিন; অপরের লাগি
কি কবে দিয়াছি ছাড়ি? কি দিয়াছে বলি
প্রেমের চরণে? শুধু আপনারে ছলি
শুদ্ধি সংযমের নামে পুষি অভিমান
ফিরিয়াছে অসন্তোষে, রোষে ভরি প্রাণ;
শুনায়ে কঠোরা বাণী দিয়া অভিশাপ,
বাড়ায়েছে চারিদিকে অপ্রেম সন্তাপ।

'পৌরাণিকী' কাব্যে যে নাটকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তা 'অম্বা' (১৯১৫) কাব্যনাট্য ও 'সিতিমা' (১৯১৬) গদ্য-নাটিকায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। কবি হিসাবেই কামিনী রায়ের পরিচয়, তিনি যে অন্তত একখানিও সার্থক নাটক রচনা করেছিলেন এ কথা নাট্যসমালোচকেরাও বিস্মৃত হয়েছেন। 'অম্বা' কাব্যসংলাপে রচিত পঞ্চমাঙ্ক নাটক। নাটকখানি পূর্বাপর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। মধুসূদন পর্যন্তও নাট্য-সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন : "অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনো-রঞ্জন করিতে পারি।"[৩] অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো নাট্যকার তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। 'অম্বা' নাটকে কামিনী রায়ের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র অম্বার ভূমিকাটি বজ্রাগ্নিরেখায় আঁকা হয়েছে। অম্বা মনস্বিনী, পিতাকে সে রাজকার্যে পরামর্শ দেয়। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটেছে। অম্বা কাহিনী অবলম্বন করে একাধিক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ—এই দুই খ্যাতনামা নাট্যকার "ভীষ্ম" নাটকের মধ্যে এই কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভীষ্ম ও অম্বার কল্পিত অনুরাগকাহিনী নিয়ে অতিরিক্ত রোমান্স করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের অম্বা

৩ মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণকুমারী নাটক।

চরিত্রও অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কামিনী রায়ের অম্বা চরিত্রটি এই সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত। "স্বা মনস্বিনী, ব্যক্তিত্বময়ী—কিন্তু কোথায়ও তার চরিত্রে উগ্রতা বা পরুষতা প্রকাশিত হয়নি। অম্বা-ভীষ্ম সম্পর্ক নিয়েও সুলভ রোমান্স সৃষ্টির অপপ্রচেষ্টা করেন নি। সর্বত্রই শিল্পীর সংযম রক্ষিত হয়েছে।

'সিতিমা' গদ্য নাটিকা। 'অম্বা' নাটকে যে কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, 'সিতিমা' নাটকে তা অনুপস্থিত। তার প্রধান কারণ এই যে, কাব্যসংলাপ রচনায় যেমন তাঁর অধিকার ছিল স্বাভাবিক, গদ্যসংলাপ রচনায় তেমন ছিল না। প্রেমের মহিমাই নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। প্রেম প্রতিদান চায় না, আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই প্রেমের পরিপূর্ণতা। সিতিমা রাজান্তঃপুরের নর্তকী, কুমার উজ্জ্বল সিংহকে সে ভালবাসে। তাকে সে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে দুর্নাম থেকে মুক্ত করে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 'সিতিমা' নাটক হিসাবে দুর্বল হলেও কবির প্রেমানুভূতির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। একদা মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক আখ্যায়িকায় কবি যে কথা বলেছেন, 'সিতিমা' নাটিকায় তারই আর এক দিকের প্রকাশ।

'গুঞ্জন' (১৯২১) কাব্যগ্রন্থে শিশু ও শিশুর মায়ের ভাষায় অনেকগুলি কবিতা রচিত হয়েছে। দেশপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি ও নীতিনিষ্ঠা এই কবিতাগুলির মূলসুর। ছোট ছেলের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন:

হাজার হাজার মানুষ মরে
তবে কেন লড়াই করে?
মারামারি কাটাকাটি
সেত ভাল নয়।
প্রাণটা যে দেয় দেশের তরে
মারে, মরে ভালই করে,
পরে দেশটা লুটে খাবে
তাকি প্রাণে সয়?

নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নে নষ্টপ্রায় ১৮৯৩ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রচিত কবিতাগুলি 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে মুখ্যত কবির সামাজিক মনই আত্মপ্রকাশ করেছে। কারাগারে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তাঁদের আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন:

মতে বা চিন্তায়
নাও যদি দিতে পারি পরিপূর্ণ সায়
তবু তব হৃদয়ের মহত্ত্বের স্বাদ
লভিয়াছি, অমৃত সে করি ধন্যবাদ।

কামিনী রায়ের দেশপ্রেমের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না। গুপ্তকবির মতো 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—তাঁর আদর্শ ছিল না। এক বৃহত্তর মানবতাবাদ তাঁর দেশপ্রেমকে কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল:

স্বদেশীরে ভালবাসি, বিদেশীরে তাই
নাহি মোর অপ্রীতি বিদ্বেষ,
মানব সর্বত্র দুঃখী মানবের ভাই
সর্বত্র দারিদ্র্য পাপ ক্লেশ।

তাই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন, "ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে ধরায় দেবতা নহিলে নয়।"

কামিনী রায় ছিলেন সে যুগের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। নারী জাগরণের যুগে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে নারী জাগরণের যে বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে, তা তিনি রূপ দিয়েছেন—নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'ঠাকুরমার চিঠি'তে নাতবৌকে উপদেশ দেওয়ার ছলে সরল ভাবে নারীর কর্তব্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। তিনি দৃপ্তভঙ্গিতে নারীকে বৃহত্তর কর্তব্যের ক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন—

বিনা পুত্র পতি
করিবার নাহি কিছু? নিজ পুত্র হিতে

সহস্র পুত্রের কথা না হয় ভাবিতে ?
যে দেশ আমার দেশ তাহার কল্যাণ
শুধু গৃহকোণে থাকি যদি করি ধ্যান,
তাহাই যথেষ্ট হবে ?

৪

গার্হস্থ্যজীবন, ও পারিবারিক জীবনের শোক অবলম্বন করে যে যুগের কবিরা কাব্য রচনা করেছেন, দাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্যরস, প্রিয়জন বিয়োগ প্রভৃতি বিষয় সে যুগের কাব্যে নানাভাবে গুঞ্জরিত হয়েছে। কামিনী রায়ের কাব্যে এই শ্রেণীর কবিতা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বাঙালীর গৃহজীবনের মধ্যে তখন সুখ, শান্তি ও আনন্দ ছিল। রোমান্স রসের পরম অভ্যুদয় লগ্নে শুধু দূরের দিগন্তই তাঁদের আহ্বান জানায় নি, কাছের জগতও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। কামিনী রায়ের কাব্যেও এই ভাবটি নানাভাবে ধরা দিয়েছে।

'অশোকসঙ্গীত' (১৯১৪) কাব্য পুত্র অশোকের অকাল মৃত্যুতে রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' ও 'আলেখ্য' কাব্যের কিছু কবিতা গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরীর' সনেট-গুচ্ছ স্ত্রীবিয়োগের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। প্রিয়জনের বিয়োগে এ যুগের অনেক কবিই শোকগাথা রচনা করেছেন। পতি পুত্রের মৃত্যুতে মহিলা কবিরাও তাঁদের শোকোচ্ছ্বাসকে রূপ দিয়েছেন। গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭) কাব্য, মানকুমারী বসুর কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' কাব্য (১৯০০) পতিবিয়োগ বেদনার আন্তরিক শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। পুত্রের মৃত্যুতে রচিত কামিনীরায়ের 'অশোক সঙ্গীত' কাব্য সন্তানশোকাতুরা জননীর হৃদয়বেদনায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে :

ডেকেছি প্রত্যূষে নিত্য "ওঠরে অশোক"
প্রতি কাজে, "অশোকরে—ও অশোক" ধ্বনি
ছিল মোর, শ্রান্তশির উপাধানে রাখি।
ডেকেছি, "অশোক আয়, কি পড়ার ঝোঁক !
অনেক যে হল রাত।" দিবস রজনী
কেমনে কাটিবে এবে, তোমারে না ডাকি।

'জীবনপথে' (১৯৩০) কাব্যে কামিনী রায়ের সনেটগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। সনেটরচনার শিল্পকৌশলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সঙ্কলনটির মধ্যে তিনটি অংশ—সহযাত্রা, একলা ও ঝরাফুল। 'সহযাত্রা' দাম্পত্য প্রেমের কবিতার সঙ্কলন। এই অংশের পঁচিশটি কবিতায় সুখতৃপ্ত দাম্পত্যজীবন ও প্রেমমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে :

কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়
চলেছি কেন সে চিন্তা ? কি হইবে জানি
কতখানি স্বপ্ন আর সত্য কতখানি ?

জীবনের আদ্যোপান্ত জাগরণ নয়,
সমস্তই নহে স্বপ্ন। তাও যদি হয়
ক্ষতি কি ? একান্তে হেথা মোরা দুটি প্রাণী
পরস্পরে পরিতৃপ্ত সর্বদুঃখ গ্লানি
মুছে গেছে প্রেমস্পর্শে, ঘুচে গেছে ভয়।

কখনো কখনো প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। 'শ্রাবণের কংসাবতী'র তরঙ্গধারা কবির হৃদয়াবেগের প্রতীক হয়ে উঠেছে :

নহ স্থির ; নহ শান্ত, হে বিপুলা নদী,
চলিয়াছ অহরহ স্ফীত বুকে ভরি
গ্রহণের বহনের অতিরিক্ত দান ;
সেও যে বিষম ব্যথা দিতে পার যদি
পথে আর যাত্রা শেষে, সর্বস্বান্ত করি
আপনারে এ বেদনা হবে অবসান।

'একলা' পতিবিয়োগবেদনা উপলক্ষে রচিত কবিতাগুচ্ছ। এখানে সতেরটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে কামিনী রায়ের বিবাহ হয়। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হওয়ার

পর তিনি ইংরেজিতে এক বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় কেদারনাথের মৃত্যু হয়। তার চার বছর পর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকেরও মৃত্যু হয়। এই দুটি মর্মান্তিক আঘাত কামিনী রায়ের অনেকগুলি সনেটের উৎস মূল। পতিবিয়োগবেদনা এক সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত শোকানুভূতির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে :

তুমি নাই এ চিন্তায় যে অসহ শোক,
তার মত মর্মঘাতী কিছু নাই আর ;
বলে যাও তুমি আছ, করিছ স্মরণ
অতীতে অতীত-তাপ, নবীন আলোক
দেখাইছে গত দুঃখ মঙ্গল-আকার
দেখাইছে অমৃতের সোপান মরণ।

এইভাবে তীব্র শোকানুভূতি এক প্রশান্ত উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। 'অশোকসঙ্গীত' কবিতাগুচ্ছে বাৎসল্যরস ও পুত্রবিয়োগ বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। দাম্পত্য প্রেম ও বাৎসল্যরসের কাব্য হিসাবে 'জীবনপথে' বাংলাকাব্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

৫

কবি-সমালোচক মোহিতলাল কামিনী রায় সম্পর্কে বলেছেন : "পুরাতন ও পরিবর্তনের যুগের সন্ধিস্থলে যেমন রঙ্গলাল, তেমনি পরিবর্তন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে আমরা কামিনী রায়কে পাই। পরিবর্তন যুগের কবিতার দুইটি লক্ষণ প্রধান ; (১) ভাষা ও ভাব দুইই বাহুল্যপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময় ; (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে কবিগণের সমপ্রাণতা ; সমাজেরই মুখপাত্রস্বরূপ তাঁহারা উচ্চ কল্পনা ও উন্নত আদর্শের চর্চা করেন। আধুনিক যুগের কাব্যপ্রেরণা অন্যরূপ ; কবিরা নিজেদের স্বপ্নভাব ও অভাব, আকুলতা ও অতৃপ্তিকেই প্রকাশ করেন, জগতের সব কিছুকেই মনের রঙে রঙীন করিয়া সুন্দর দেখেন—এ বিষয়ে সর্বসাধারণের সহিত তাঁহাদের ভাবের বা ভাবুকতার যোগ নাই। কামিনী রায়ের কবিতায় এই আত্মভাবের প্রাধান্য আছে, সে যেন তাঁহার প্রাণের কথা ; কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে সে প্রাণের মিল নাই দেখিয়া তিনি দুঃখ পান ; অর্থাৎ তাঁহার কবিতার ভাব অতিশয় ব্যক্তিগত হইলেও তিনি সমাজ বা জাতি সাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। পরবর্তীযুগে এইরূপ ব্যক্তিগতভাবের কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, —সে কল্পনা আরও আত্মভাব প্রধান। কিন্তু এ কবির কল্পনা ততটা মুক্ত ও স্বাধীন নয়, ইঁহার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি-পূজা বা সৌন্দর্যপ্রীতি অপেক্ষা নর নারীর চারিত্রিক সংযম-সুষমাই গৌরবান্বিত হইয়াছে। কামিনী রায়ের ভাষাও অতিশয় সংযত ও পরিমিত।"[৪]

কামিনী রায়ের কবিতা যথার্থই 'পরিবর্তন যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী।' কিন্তু কামিনী রায়ের সঙ্গে রঙ্গলালের ভূমিকার তুলনা করলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। কল্পনার নভোচারিতা ও ভাষার সংকেতগূঢ় দূরস্পর্শিতা না থাকলেও কবিতার আঙ্গিক রচনায় তিনি মূলত রবীন্দ্রানুসারী। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবহমান পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচনায় তিনি শিল্প-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সনেটগুলির সংযম ও সুষমা প্রশংসনীয়। 'জীবনপথে' বাংলা কাব্যের বিশিষ্ট সনেট সঙ্কলন। 'দীপ ও ধূপ' কাব্যের অন্তর্গত 'বরিশালের মাঝির গান' কবিতাটি বরিশালের গ্রাম্য ভাষায় রচিত। "গান যে মোরে বোলায় মোরে গান যে মোরে বোলায়" কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ কান্তকবির অনুরূপ কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে সুমার্জিত শিল্পকৌশলেও পরিচয় থাকলেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরচনায় তিনি হেমচন্দ্রের অনুবর্তী—রবীন্দ্রপ্রবর্তিত আধুনিক মাত্রাবৃত্তছন্দ ব্যবহার করতে পারেন নি।

কামিনী রায়ের দুটি পদ্যাংশ উদ্ধার করলেই, তার কবি

৪, কাব্য-মঞ্জুষা [illegible], পৃঃ ৫০-৫৩

(শেষাংশ ৭০৫ পৃষ্ঠায়)

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

(৩)

এর পরেই আবার তর্কের ধারা অন্য খাতে বইতে সুরু করলো। অমরত্বের প্রশ্ন ছেড়ে হেগেলীয়দের বিচারবুদ্ধি এবার কিছুদিন পরেই খ্রীস্টতত্ত্বে ("Christology") উপর আত্মনিয়োগ করল। ফ্রাইড্রিশ স্ট্রাউস (David Freidrich Strauss, ১৮০৮-৭৪) নামক বিখ্যাত হেগেলীয় তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত বই "The Life of Jesus Critically Treated" (১৮৩৫-৩৬) বের করলেন। স্ট্রাউস বাইবেলকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমালোচনা করে বললেন, বাইবেল ইতিহাস নয়; বাইবেলের যত গল্প এ সব সত্য ঘটনার কাহিনী নয়। তাছাড়া বাইবেলের ঘটনাগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী এত কিছু আছে যে ওগুলো সত্য হতেই পারে না। বিশেষতঃ, যে সব আশ্চর্য ও অপ্রাকৃত ঘটনা (miracle) বাইবেলে আছে, সেগুলো দার্শনিক (হেগেলীয়) যুক্তিতে সমর্থন করা চলে না। উইলহেম ফাট্‌কে (Wilhem Vatke. ১৮০৬-৮২) এরপর বই বের করলেন "Biblical Theology" (১৮৩৫) এবং God-man-এর ধারণাকে আক্রমণ করলেন। পরে ফয়েরবাক তার সব চেয়ে বিখ্যাত বই "Essence of Christianity" (১৮৪১) লিখলেন। এই বইতে ফয়েরবাক নাস্তিকতার সমর্থন করে, ধর্ম যে মানুষের কল্পনার সৃজন—এই তত্ত্ব প্রচার করলেন। ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) আলাদা কিছু শাস্ত্র নয়, এ হলো নৃতত্ত্ব (anthropology)-রই নামান্তর। মানুষের ইচ্ছারই বিগ্রহ-মূর্তি হল ঈশ্বর। ফয়েরবাক পূর্বে ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) এখন মত বদলে দেখা দিলেন নিরীশ্বরবাদী (Atheist) হয়ে। তাঁর History of Philosophy-তে (১৮৩৩) যে মূর্তি দেখতে পাই, সে রূপ আজ বিপরীত মুখে বদল হয়ে গেছে। তখন ফয়েরবাক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সর্বেশ্বরবাদ-এর (Pantheism-এর) আর আজ "Essence of Christianity"তে স্তুতিপাঠ চলল নিরীশ্বরবাদের Atheism-এর)। স্ট্রাউস নতুন বই লিখলেন "The Christian Doctrine of Faith in its Development and in its Conflict with Modern Science." (১৮৪১-৪২)। এই বইখানারও স্থান তাঁর বিখ্যাত Life of Jesus-এর পরেই। এই বইতে স্ট্রাউস হেগেলকে পুরাপুরি সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) বলে দাঁড় করালেন। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর চিন্তাগুলো ব্যতিরিক্ত আর কোনো ঈশ্বর নেই এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো laws of nature) কে ছেড়ে আর কোনো প্রকাশ ঈশ্বরের নেই। এই তত্ত্বই স্ট্রাউসের মতে হেগেলের একমাত্র সত্যিকার মত।

এদিকে স্ট্রাউস প্রমুখ হেগেলীয়গণ যখন বাইবেলের উপর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন ব্রুনো-বাউয়ের (Bruno Bauer), গ্যাবলার (Gabler), গশেল (Goschel), কনরাডি (Conradi) প্রমুখ হেগেলীয়গণও স্ট্রাউস এবং তাঁর দলের মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে লিখতে সুরু করলেন। ব্রুনো বাউয়ের (১৮০৯-৮২)

প্রথম স্ট্রাউসের "Life of Jesus" নামক বইয়ের প্রতিবাদ ও সমালোচনা লিখলেন "Berliner Jahrbucher" ১৮৩৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যায়। তারপরে তাঁর নতুন কাগজ "Zeitschrift fur Speculative Theologie" ১৮৩৬-৩৮) হয়ে দাঁড়াল এই স্ট্রাউস বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় পত্রিকা। তাঁর Critique of the Evangelical Narratives of the Synoptics (১৮৪১-২) বইতে তিনি স্ট্রাউসের "Life of Jesus"-এর জবাব দিয়েছেন।

গ্যাবলার (Gabler) তাঁর Latin Inaugural Address-এ (১৮৩৬) স্ট্রাউসের প্রতিবাদ করলেন। গশেল (Goschel) লিখলেন তাঁর "Contributions to the Speculative Theology" (১৮৩৮), শালের (Schaller) যীশুখ্রীস্টের সমর্থনে লিখলেন The Historical Christ and Philosophy (১৮৩৮)। কনরাডি লিখলেন Christ in the Present, Past and Future (১৮৩৯)।

এইভাবে একদিকে স্ট্রাউসের দল এবং অন্যদিকে গশেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ হেগেলীয় মতের ব্যাখ্যান ও অপব্যাখ্যানের সাহায্যে খ্রীস্টতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় যুযুধান হয়ে উঠল। হেগেল সম্প্রদায় এই দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। স্ট্রাউস ১৮৩৭ সালে এক লেখায় রহস্য করে লিখেছিলেন যে হেগেলীয় সম্প্রদায় ফরাসী পার্লামেন্টেরই মতো দুই দল হয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং এর বাম দিকে আছেন স্ট্রাউস স্বয়ং ও দক্ষিণে রয়েছেন গশেল, গ্যাবলার, ব্রুনো-বাউয়ের। অবশ্য রোসেনক্রানৎস্ (Rosenkrans) এই দুই দলের মধ্য প্রদেশে রয়েছেন। এ-কথাও স্ট্রাউস বলেছিলেন—যদিও রোসেনক্রানৎস্ নিজে এ মন্তব্যকে স্বীকার করেন নি কোন দিন। কী ভাবনাতেই স্ট্রাউস এই দক্ষিণ-বাম (Right Left) ভাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত দার্শনিক সমাজে এই শ্রেণীবিভাগ ও এই নামকরণই চলে আসছে চিরদিন।

কিন্তু এখানেই হেগেলীয় সমাজের দুর্গতি শেষ হয়নি। দক্ষিণ-বাম দ্বন্দ্বেই আত্মকলহ সমাপ্ত হয়নি; কিছুদিনের মধ্যেই আবার বাম-মার্গে (Left) অন্তর্বিরোধ শুরু হল। দক্ষিণ ও বাম মার্গের ঝগড়ার আসল বিরোধ ছিল হেগেলীয়দের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের। স্ট্রাউস, ফয়েরবাক সর্বেশ্বরবাদকে হেগেলীয় বলে চালাচ্ছিলেন। পরে ক্রমশ আবার ফয়েরবাক ও ব্রুনো বাউয়ের দল ছেড়ে নতুন রূপ ধারণ করলেন। এর পরে সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) ছেড়ে ধরলেন নিরীশ্বরবাদের (Atheism) নবতর রূপ।* সর্বেশ্বরবাদ হল নিরীশ্বরবাদের একেবারে বিপরীত রূপ।

স্ট্রাউস-এর সর্বেশ্বরবাদের (The Epiphany of the Eternal Personality of the Spirit, 1841 by Strauss) বিপরীত বিকাশ আমরা দেখতে পাই ফয়েরবাক ও ব্রুনো বাউয়ের-এর নিরীশ্বরবাদে। ফয়েরবাকের মতের পরিবর্তন ঘনঘন হয়েছে। "History of Modern Philosophy" (১৮৩৪) বই-তে তাঁর সর্বেশ্বরবাদ ও স্পিনোজাপ্রীতি প্রবল। "The Description and History of the Philosophy of Leibnitz (১৮৩৭) বই-তে এ তাঁর মতের হুবহু বদল হয়েছে। এখানে স্পিনোজার বিপরীত মতের প্রাবল্য এবং Divinity-র বিরুদ্ধতা স্পষ্ট। এর পরে "Pierre Bayle" (১৮৩৮) বই-এ নিরীশ্বরবাদের পরিষ্কার সমর্থন ও খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধতা দেখতে পাই। এরপরে Essence of Christianity তে (১৮৪১) মানবতাই যে ধর্ম এ-মত দেখা যায়। মানুষের অন্তরের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই মূর্তিমন্ত হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর সৃষ্ট হয়েছে। সর্বশেষে "An Estimate of the Work: The Essence of

* 'Pantheism in the Hegelian Left is represented primarily by Strasus, while Feurbach and Bruno-Bauer represent the Dialectical opposite of Pantheism. (Erdmann, III, p 70)

Christianity" (১৮৪১) বইতে নিজেকে স্পষ্ট হেগেলের বিরুদ্ধবাদী বলে প্রকাশ করেন। তাঁর বর্তমান মত যে হেগেলের মতেরই পরিণতি নয়, একথা তীব্রভাবে তিনি বলেছেন তাঁর এই বইতে।

তারপর ব্রুনো-বাউয়ের ও ফয়েরবাকেরই মতো একই নিরীশ্বরবাদের সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি; এঁকে স্ট্রাউস অবশ্য দক্ষিণপন্থীদের (Rightist) বলে ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রুনো-বাউয়ের বাম-মার্গী (Leftist)। ইনি হেগেলকে নিরীশ্বরবাদী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর "The Trumpets of the Judgement Day on Hegel the Atheist and Anti-Christ," (১৮৪১) এবং "Hegel's Theory of Religion and Art Judged from the Stand-point of Faith" (১৮৪২)—এই দুইখানা বইতে হেগেলকে ১৮ শতকের নিরীশ্বরবাদীদের সহতীর্থ বলে দাঁড় করানো হয়েছে।

এই সময়ে ম্যাক্স স্টির্নের (Max Stirner) বলে একব্যক্তি লিখলেন "The Only One and his Property" (১৮৪৪) নামে এক বই এবং ফ্রাইড্রিশ্ ডাউমের (১৮০০-৭৫) লিখলেন "Anthropologism and Criticism of the Present" (১৮৪৪)। এঁরা দুজনেই ফয়েরবাক ও ব্রুনো-বাউয়েরকে আক্রমণ করলেন এই বলে যে ফয়েরবাক ও বাউয়ের দুজনেই প্রকারান্তরে ধর্মকেই ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ একজন (বাউয়ের) আত্মসম্বিৎ "Self-consciousness' ও অন্যজন (ফয়েরবাক) মানুষকে (Man') ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। ডাউমের বললেন, এরা মানুষের পূজা প্রবর্তন করছেন, প্রকৃতির (Nature-এর) নয়। কাজেই দেখা গেল যে হেগেলীয় বাম-মার্গও অচিরে দুই বিরুদ্ধ দলে বিদীর্ণ হয়ে গেল। একদিকে স্ট্রাউস প্রমুখ সর্বেশ্বরবাদী এবং অন্য দিকে ফয়েরবাক, ব্রুনো-বাওয়ের, স্টির্নের প্রমুখ নিরীশ্বরবাদী। এই দুই দলে হেগেলীয় সম্প্রদায় চিরদিনের তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে (১৮৩০-১৮৫০) হেগেলের দর্শন নানা মতে ও সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং পরস্পর আত্মকলহ ও তর্ক-বিতর্কের ফলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিল। মাত্র কয়েকটা বছর আগে যে দর্শনকে সবাই মনে করত চিরকালের, অপরিবর্তনীয় সত্য, হেগেলের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল যে তা একান্ত ভঙ্গুর ও নশ্বর। হেগেল একদিন নিজেও মনে করেছিলেন যে, তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দর্শন দিয়ে গেলেন; হেগেলীয়গণও নিঃসন্দিগ্ধ মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে হেগেল-বাদ জীবনের সকল সমস্যার শেষ মীমাংসা ও সমাধান। হেগেলের 'ন্যায়' তাঁর অপরূপ ও অভিনব ডায়লেকটিক নীতি একদিন বহু দার্শনিকের মনোহরণ করেছিল। দেখা গেল কয়েক বছরের মধ্যেই হেগেলের সেই 'ন্যায়' ও নীতি' যে একপেশে, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটী-দুষ্ট হেগেলীয়গণই নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করলেন। কোনো একটি সূত্র (formula) বা একটি মাত্র নীতিকে (method) যাঁরা চরম এবং একান্ত করে আঁকড়ে ধরেন, তাঁরা যে কত ভ্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের পরিণতিই তার চিরস্থায়ী প্রমাণ।*

* "For a glance back at the movements after Hegel's death seems to show that in the first Lustrum his metaphysical restoration, in the second his rehabilitation of dogma and in the third his maintenance of the idea of moral organism, had been proved by anti-Hegelians, Hegelians and ultra-Hegelians to be worthless, and therefore his whole system and all his efforts had proved to be nothing but a brilliant meteor without substance whatever.

'That where the carcase was, the eagles should have gathered together was natural. Thus, during the process of dissolution which has been described, but especially after it seemed to be completed, lengthy works appeared and are still appearing, which demonstrate the absolute worthlessness of the Hegelian system, and describe it as a Just Nemesis for its overweaning pride, that at the present day people no longer concern themselves about it." (Erdmann, vol III, p 100).

কিছুকালের জন্ত তীব্র চমক দেখিয়ে হেগেলবাদ ক্ষণিকের উল্কার মতই নিভে গেল। হেগেলীয়, অ-হেগেলীয় সবাই ভেবে নিলেন এর অস্তিম সংস্কার করে ঘরে ফিরবেন। কিন্তু কথার মানে এই নয় যে, হেগেলের মতবাদী লোক আর দর্শনশাস্ত্রে কেউ রইলেন না বা ভবিষ্যতেও কেউ থাকবেন না। হেগেলবাদের ভাঙনের (dissolution) যুগেও অনেক হেগেলীয় বেঁচে ছিলেন এবং অনেক বই-ও বেরুচ্ছিল হেগেল-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও সমর্থন করে। একথা সবাই স্বীকার করবে যে চিন্তারাজ্যে কোনো মৌলিক চিন্তাই চিরদিনের তরে বিনষ্ট হয়ে যায় না। গাছ মরে গেলেও তার সকল বীজ লোপ পায় না। বীজ থেকে নতুন জন্মের সূত্রপাত অহরহই হতে থাকে। চিন্তা-জগতেও এই বিধি প্রবল। কোন প্রাণবান চিন্তা যদি কোনো প্রতিভার উর্বর ক্ষেত্র থেকে জন্ম নেয়, তবে সেই প্রাণবান চিন্তার জীবনকাল ফুরিয়ে গেলেও তার প্রভাব সমূলে লোপ পেয়ে যায় না। চিন্তা জগতে এমন একটা ধারাবাহিকতা (continuity) রয়েছে চিরকাল, যাতে করে সত্যিকারের চিন্তা বা মননের কখনও "মহতী বিনষ্টিঃ" হয় না। প্রভাবশালী মননের সূক্ষ্ম সত্তা নানা আকারে, নানা রঙে, ও নানা বেশে বেঁচে থাকে এবং ভবিষ্যতের দিকে নিজের—দৃশ্য না হলেও অদৃশ্য—প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। দার্শনিক জগতেও পূর্বাচার্যদের বই পড়ে তাঁদের থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি বা তাঁদের দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হননি, এমন চিন্তানায়ক পৃথিবীতে অন্তত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন বলে কেউ জানে না। কাজেই হেগেলের মতো প্রতিভার প্রভাব সমূলে ও নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে, একথা অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। হেগেলবাদের মৃত্যু যদি হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তবে তার মানে এমন নয় যে হেগেলের মতবাদ জগতের আর কোনো লোকের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করেনি কিম্বা কাউকে প্রভাবিত করেনি। কান্ট (Kant), রাইনহোল্ড (Reinhold), ফিস্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling) এবং হেগেল—এঁদের মধ্যে এমন একটা সরল পারম্পর্য আছে যে, পরবর্তীগণ প্রত্যেকে পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে পূর্ববর্তী দর্শনকে অনেকাংশে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। হেগেলের পরবর্তীরাও হেগেলের দর্শন থেকে অনেক কিছু নেবার মত সত্য পেয়েছেন। হেগেল জগতে এমন একটা দৃষ্টি দান দিয়ে গেছেন, যার প্রভাব আজো আছে এবং আগামীকালেও থাকবে। হেগেলের দর্শনে সত্যের আলো বহুল পরিমাণে উদ্ভাসিত হয়েছে, একথা শত্রুও স্বীকার করবে। কিন্তু যারা হেগেলবাদকে ও হেগেলীয় পদ্ধতিকে (method) দর্শনের শেষ কথা বলে মনে করেন ও প্রচার করেন, তাঁদের চোখের দৃষ্টি ঐতিহাসিক তো নয়ই, বরং তাকে নিতান্ত একদেশদর্শী বলা চলে। উনিশ শতকে যারা হেগেলকে সূর্য বলে অভিবাদন করেছিলেন, একদিন তাঁরাই কিছুকাল পরে আবিষ্কার করলেন যে তাঁদের এতদিনকার সূর্য্য কেবলি গগনের উল্কামাত্র ("a brilliant meteor without substance whatever." হেগেলবাদে সত্য আছে, কিন্তু সে একান্ত ও চরম সত্য নয়। জীবনব্যাপী তিমিরকে বিদূরিত করে চিরদিনের তরে দিবালোক রচনা করবে এমন আলো হেগেলতত্ত্বে নেই। সুতরাং যে দম্ভ ('overweening pride) একদিন হেগেলীয়দের মনে বাসা বেঁধেছিলো, তার নির্দয় প্রতিক্রিয়া এসে অচিরে হেগেলবাদকে গলা টিপে মারল। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দেখা দিয়েছিল নিয়তি (Nemesis) এবং হেগেলীয়-পরবর্তী গোষ্ঠীর অস্পষ্ট অন্ধকারে হেগেলবাদকে জাগিয়ে রাখবার ক্ষীণ চেষ্টাকে বিফল করে হেগেলীয়-দর্শন নীরবেই নিভে গেল। আর্ডম্যান (Erdmann) নিজেও একজন হেগেল-ভক্ত। তিনিও বলছেন:

"At present many obstinate-minded persons have concluded from the fact that the Hegelian system was once more being slain, that it was still living, and from the fact that a thick book again appeared, which dealt with it alone, that people are after all still talking about it." (p. 101, vol III)

হেগেলবাদ মরে গেল একথা সত্য। কিন্তু আগেই বলেছি, এ মৃত্যু নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়। আগামীকালেও হেগেলবাদ অনেক দার্শনিকের চিত্ত ও বুদ্ধিকে দোলা দিয়েছে এবং ইংলণ্ডে নতুন হেগেলীয় সম্প্রদায় হেগেল-দর্শনকে রূপান্তরিত করে নিয়ে এক নব দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছেন। সে উনিশ শতকের শেষভাগে হেগেলের মৃত্যুর অনেক পরে।

আমরা দেখতে পেয়েছি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই হেগেলের দর্শন বিস্মৃতির তলে ডুবে গিয়েছিল। এমন কি "হেগেলীয়" নামটাও একটা ঘৃণা ও লজ্জার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগে যাঁরা নিজেদের "হেগেলীয়" বলতে গর্ববোধ করতেন তাঁরা ঐ নামে পরিচিত হতে বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন *।

কাজেই হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে হেগেলীয় দর্শনের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় 'ন্যায়' (Logic) ও ডায়লেকটিক পদ্ধতি-ও (Dialectic Method) সমাধিস্থ হয়েছিল। যে ডায়লেকটিক একদিন সকল সমস্যার সমাধানে একমাত্র যাদু-দণ্ড বলে গৃহীত হয়েছিল, ১৯ শতকেই তাকে নিতান্ত অকেজো বলে বর্জন করা হ'ল একথা ভাবতে আজকের দিনের বহুলোকের বিস্ময় বোধ হবে সন্দেহ নেই। কারণ আজকে আবার দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক হাওয়ার উল্টোমুখী গতি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুরানো ডায়লেকটিককেই কবর থেকে তুলে আবার মন্ত্রপূত করে কাজে লাগাবার সর্তক চেষ্টা শুরু হয়েছে। অনেক মনই আজকে আবার উল্টো স্রোতে উজান বেয়ে অতীতের মুখে চলেছে। ডায়লেকটিককে নাকি নতুন করে শেখে ফেলবার বুঝতে হবে এবং ভক্তি করতে হবে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমাজে, প্রকৃতিতে সর্বত্র সকল গুপ্তধনের মণিকোঠার রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করবে এই নতুন করে-পাওয়া পুরোনো যাদু দণ্ড। দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজতত্ত্ব, জ্যামিতি – সবাই কেবল অন্ধকারে হাতড়ে মরবে যতদিন না এই ডগমাটিক এর যাদুকে কাজে লাগাতে শেখে। মানুষের মনে এ এক নতুন মোহমুদ্গর চেপে এসেছে; মধ্যযুগীয় ম্যাজিক-প্রীতির এ এক আধুনিক রূপায়ন বই আর কিছু নয়। সহজ পন্থা, মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাকের উপর মানুষের লোভের অন্ত নেই কোনো দিনই; মানুষ লজিক চায় না, চায় ম্যাজিক—সোজা রাস্তায় হাতে হাতে ফল। ডায়লেকটিক-প্রীতির একমাত্র উৎস মানুষের এই ফর্মুলার উপর ভক্তি; বাঁধা গতের দুর্বার আকর্ষণ! এই নিশ্চিন্ত ফর্মুলা প্রীতি এই বৈজ্ঞানিক যুগেরও বহু মনকে গ্রাস করেছে নতুন করে। তারই ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজকে বিংশ শতকেও, যে ডায়লেকটিক একদা কবরের অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁড়ে বার করে রাজ সিংহাসন দান করা হচ্ছে। এর কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাই বলছিলাম, যারা দর্শনের ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাঁরা আজকে ভাববেন: "বড়ো বিস্ময় লাগে।"

আসল কথা হ'ল হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে ডায়লেকটিক পদ্ধতি (Dialectic Method) বর্জিত হয়েছিল হেগেলীয় সমাজে। ডায়লেকটিক কথাটা নানা জনে নানা অর্থে ও নানা কালে ব্যবহার করেছেন। সক্রেটিস থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত বহুলোকই যে ডায়লেকটিককে গ্রহণ করেছেন একথা হেগেলও বলে গেছেন। তবে আসল কথা হ'ল এই

* "The number of these increased to such an extent that not only did the larger public get accustomed to conclude from the tombstone that death and burial had taken place; but even amongst those who had previously called themselves Hegelians, the aversion to calling themselves by this name grew upon them more and more, and assertions were openly made that the Hegelian School and even the doctrine which had been promulgated in it, no longer existed." (Erdmann, III, p Ioo)

যে অন্যদের ডায়লেকটিক ও হেগেলের ডায়লেকটিকের মধ্যে আসমান জমীন পার্থক্য রয়েছে। পূর্বগামীরা সবাই নানা বিভিন্ন অর্থে একে ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ করে হেগেল একেবারে স্বতন্ত্র ও পৃথক অর্থে একে ব্যবহার করেছেন। হেগেলের ডায়লেকটিক নানা ত্রুটিতে পূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট। কিন্তু প্লেটো অ্যারিস্টটল কান্টের সঙ্গে হেগেলের ডায়লেকটিকের কোথাও কোনও সত্যিকার মিল বা সাদৃশ্য নেই; তবুও হেগেল এঁদের সকলকেই প্রায় "হেগেলীয়" বলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। ট্রেণ্ডেলেনবুর্গ (Trendelenburg ১৮০২-৭২ নামক উনিশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের এই অযৌক্তিক চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হেগেল এদের গায়ের জোরে "হেগেলীয়" বানিয়েছেন ("proceeds unhistorically and turns them into Hegelians")। কাজেই হেগেল প্লেটো ইত্যাদির ডায়লেকটিককে নিয়ে উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ প্রকাশ করলেও, আসলে হেগেলের নিজের ডায়লেকটিক একেবারে অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। এই যুক্তিবিরুদ্ধ ও অবাস্তব ডায়লেকটিককে এই কারণে উনিশ শতকের সকল দার্শনিক অগ্রাহ্য করেছিলেন। জে এচ ফিখটে (J. H. Fichte, ১৭৯৭-১৮৭০), সি, জে, ব্রানিস (C. J. Braniss, ১৭৯২-১৮৭৩) সি. এফ. বাক্‌ম্যান (C. F. Buckmann: ১৭৮২-১৮৭৯ ড্রুবিশ (Drobisch: ১৮০২), ৎসিমারম্যান (Zimerman) প্রমুখ হার্বার্টপন্থী দার্শনিক এবং হার্টম্যান (Hartmann), চ্যালিবাউস (Chalybaus), উলরিচি (Ulrici), ট্রেনডেলেনবুর্গ (Trendelenburg) প্রমুখ সকলেই ডায়লেকটিককে একেবারেই অবাস্তব বলে বিদায় দিয়েছেন। এমন কি ফয়েরবাক স্ট্রাউস ও গ্যাবলার পর্যন্ত ডায়লেকটিককে বর্জন করেছিলেন। নীচের উক্তি হতে তদানীন্তন অবস্থা আরও পরিষ্কার হবে:

"The Dialectic method passed into entire oblivion in the disputes which have been characterised. Strauss never employed it in his writings and if he reminds us of the dialectics of Hegel, he at the same time also hinted that the solution of contradictions was not the chief thing. On the other side Gabler seeks to escape the reproach that the Hegelian God was just the Hegelian method by pronouncing it to be of secondary importance." (Erdmann III, p 84)

হেগেলীয় দর্শনের ইতিহাসকে বুঝতে হবে যদি ডায়লেকটিককে বুঝতে হয়। কারণ হেগেল-তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই ডায়লেকটিক পদ্ধতিকে ভিত্তি করে। ডায়লেকটিককে ভালো করে বুঝবার জন্যই আমরা হেগেলীয় দর্শনের পরিণতি ও ইতিহাসকে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, কারণ হেগেলই আমাদের শিখিয়েছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজন। আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে ডায়লেকটিকও হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, আজ হতে একশ বছর আগে। একদিন ডায়লেকটিক অযৌক্তিক ও কাল্পনিক বলে বর্জিত হয়েছিল, একথা জানবার আজ প্রয়োজন আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলবেন যে একদিন বর্জিত হয়েছিল - একথার কোনই নিগূঢ় অর্থ নেই। একদিন কোনো এক যুগের লোকেরা যদি কোনো তত্ত্বের মর্ম না-ই উপলব্ধি করতে পেরে থাকে তবে অন্য যুগে অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সহায়ে সেই তত্ত্ব আদৃত হবে না, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। ডায়লেকটিকের মর্ম ও সুগভীর অর্থ ১৯-শতকের কোনো কোনো লোক বুঝতে না পেরে যদি একে বর্জন করে থাকেন এবং পরবর্তী যুগে যদি দার্শনিকগণ একে সত্য বলে বুঝতে পেরে আদর করে থাকেন, তবে একথা প্রমাণ হয় না যে ডায়লেকটিক নীতিটাই ভুল।

পূর্বোক্ত কথার জবাবে আমরা বলব যে, পূর্ব যুগের পণ্ডিতরা ডায়লেকটিককে বর্জন করেছিলেন এই কারণেই যে ডায়লেকটিক নীতি ভুল বলা চলে না বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ যে সব যুক্তিতে ও কারণে ডায়লেকটিককে অসত্য

বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন, সেই সব কারণ ও যুক্তিগুলো আজো যদি অব্যাহত থাকে ও সত্য বলে প্রমাণ হয় তবে ডায়লেকটিক নীতিকে পুনশ্চ গ্রহণ করার দার্শনিক যুক্তিযুক্ততা থাকে না। তারপরে ডায়লেকটিক নীতি সম্বন্ধে, এর সত্যতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-ভাবেও আলোচনা করে দেখতে হবে যে এ-নীতি নিজস্ব গুণে (on its own merit) ধোপে টেকে কিনা। ডায়লেকটিক-কে যারা অব্যর্থ দার্শনিক নীতি বলে মনে করেন তাঁদের দেখতে হবে যে বর্তমান যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমর্থন ডায়লেকটিক নীতি পেতে পারে। ডায়লেকটিক নীতি নিয়ে বহু আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়ে গেছে; কিন্তু যে সব যুক্তি ও কারণের জন্য ডায়লেকটিক নিতান্ত কাল্পনিক ও অসত্য বলে যুগে যুগে বর্জিত হয়ে এসেছে, তার সঠিক জবাব ডায়লেকটিক সমর্থকরা আজো দেন নি; যুক্তি তর্ককে এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ভুল ব্যাখ্যা করে প্রবলতর ভাষা প্রয়োগ করেই এঁরা নিজেদেরকে খালাস মনে করেছেন। কাজেই ডায়লেকটিকের নিজস্ব merit বা সত্যতাও আমরা পরখ করে দেখব, একথাও ঠিক। কিন্তু দার্শনিকগণ এক-যোগে ডায়লেকটিককে বয়কট করেছিলেন কেন সে তত্ত্ব এবং খবরটিও আমাদের জেনে রাখতে হবে।

ফয়েরবাকের উত্তরাধিকা —ডায়লেকটিকের পুনর্জন্ম

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন হেগেলীয়, অহেগেলীয়, দক্ষিণ হেগেলীয় ও বাম হেগেলীয় এবং বিদ্রোহী হেগেলীয় ও নিরীশ্বরবাদী হেগেলীয় ইত্যাদি দল উপদলের কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসুরা সবাই আবহাওয়াকে তিক্ততায় ও কোলাহলে ভরে তুলেছিল, সেই যুদ্ধ কোলাহলের অন্তরালে ডায়লেকটিক জড়বাদের বীজ অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। স্ট্রাউস একদিকে সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দখিনা হাওয়ার প্রবাহ ছোটাচ্ছিলেন; অন্যদিকে ফয়েরবাক ও ব্রুনো বাউয়ের সেই দখিনা বাতাসে তৃপ্ত না হতে পেরে নিরীশ্বরবাদের (Atheism) ঝড় তুলেছিলেন। জর্মান দেশ এবং নিজেরা দোলা খাচ্ছিলেন সেই ঝড়ে। সেই অতীত দিনে ফয়েরবাকের বামমার্গীয় ঝড় কতো মানুষের চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল সে খবর আজকের দিনে তুচ্ছ; কিন্তু সেই তর্ক মুখর অশান্ত যুগে একটি দোলনশীল চঞ্চল চিত্ত যে সেই ঝড়ের দোলায় বিপুল বেগে আন্দোলিত হচ্ছিল, এ-খবর আজকের যুগে তাচ্ছিল্য করবার মত নয়। নিরীশ্বরবাদের যে নূতন মদ ফয়েরবাক প্রমুখ বিদ্রোহীরা তখন পথে ঘাটে বিলোচ্ছিলেন, সেই মদের নেশায় এক প্রতিভাশালী যুবকের মন সেইদিন ধীরে ধীরে রাঙিয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। তাঁর নাম মার্ক্স।

তেইশ বছর বয়সে লেখা মার্ক্স-এর ডক্টরেট গবেষণাপত্র দেখা যায় তিনি হেগেলীয় দর্শনের নেশায় মশগুল রয়েছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফয়েরবাকের বাম-মার্গীয় বাহুতে তাঁর মন বাঁধা পড়ে যায় এবং ১৮৪৩ সনেই দেখতে পাই ইনি ফয়েরবাকের প্রতিভামুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছেন এবং নিরীশ্বর-বাদের উগ্র সমর্থক হয়ে রণাঙ্গনের প্রান্তদেশে পদচারণ করছেন। ১৮৬৩ সনে ৩০শে অক্টোবর মার্ক্স এক পত্রে ফয়েরবাককে প্রায় যুগাবতার বলে সম্বোধন করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তিনি লিখছেন:

> "No one in the world can be better fitted than you to do this, for you are the exact opposite of Schelling. The perfectly sound idea which Schelling formulated in his youth (we must recognise the good there is in our opponents), for whose realisatian he had no quality except imagination,...this idea became transformed in you into truth, into reality, into something endowed with a virile serionsness. That is why Schelling is an anticipatory caricature of youself,......*I therefore regard you as the adversary of Schelling the necessary adversary, endowed with plenipotentiary powers by their Majesties, Nature and History.* Your struggle against him is the struggle of philosophy itself against a distortion of philosophy."

এখানে "perfectly sound idea"-টি আর কিছুই নয়, —জড়বাদ। তারুণ্যের অপরিমিত উৎসাহে মার্কস ধরে নিয়েছেন শেলিং যৌবনে জড়বাদী ছিলেন। অবশ্য গুরু ফয়েরবাক নিজেই মার্কসের এই ভুল নির্দেশ করেছিলেন জবাবে।

আমরা দেখতে পেয়েছি ফয়েরবাক ১৮৩০ থেকে ১৮৩৮ সনের মধ্যে দ্রুত বর্ণ পরিবর্তন করে এমন ভাবে বদলেছেন যে তাঁর শেষ মূর্তির সঙ্গে আগের কোনো মূর্তিরই সাদৃশ্যই নেই। "Thought on Death and Immortality" (১৮৩১ এবং "History of Modern Philosophy" (১৮৩৪) তে তিনি হেগেলবাদ থেকে স্পিনোজাবাদে পাড়ি দিয়ে এসেছেন। স্পিনোজাপ্রীতি হল তার দ্বিতীয় স্তর। তারপরেই The Description and History of the Philosophy of Leibnitz (১৮৩৭), Pierre Bayle (১৮৩৮) ও Essence of Christianity (১৮৪১)-তে তিনি সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দ্যুলোক ছেড়ে নিরীশ্বরবাদের (Atheism) মর্তলোকে এসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই হল তাঁর তৃতীয় স্তর। তারপরে ১৮৪২ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত যে সব বই তিনি লিখেছেন, তাতে তিনি হেগেল-বিদ্বেষী ও প্রকৃতি-পূজারী হয়ে দেখা দিয়েছেন। সর্বশেষে তাঁর দর্শন আত্মসর্বস্বতার সিঁড়ি বেয়ে এসে উন্নীত হয়েছে "Man is what he eats" নামক বাস্তবতার দর্শনে। একে তার চতুর্থ পরিণতি বলা যায়।

মার্কস-এর সঙ্গে তাঁর গুরু ফয়েরবাকের এ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। মার্কসও কত রূপ ও বেশ পরিবর্তন করে সর্বশেষে ডায়ালেকটিক জড়বাদের দ্যুলোকে এসে নির্বিকল্প স্থিতি লাভ করেছেন। দেখা যায় ১৮৪০-এর কিছু আগে তিনি হেগেল-ভক্ত আদর্শবাদী ১৮৪২-এর কাছাকাছি কাল থেকে তিনি হেগেলকে বর্জন করে হয়েছেন ফয়েরবাখীয় নিরীশ্বরবাদী। এটি তার দ্বিতীয় স্তর। ১৮৪৪ সালেও মার্কস্ তাঁর যে বই বের করেন বাউয়ের-ভ্রাতৃদ্বয়কে (Edger Bauer ও Bruno Bauer) আক্রমণ করে তাতেও তিনি ফয়েরবাককে তদানীন্তন দার্শনিক রাজ্যের চরম পরিণতি বলে সম্মান দিয়েছেন। তিনি তখন Reinischer Zeitung নামক কাগজের সম্পাদক। ঐ কাগজ উঠে গেলে ১৮৪৪ সালে প্যারীতে গিয়ে পরে "The Holy Family : against Bruno-Bauer & Co" নামক বই লেখেন। এতে তিনি বলেন যে ফয়েরবাকের মানবতাবাদ (humanism) জন্ম নিয়েছে হেগেল-এর সর্বেশ্বরবাদ ও ব্রুনো বাউয়ের-এর নিরীশ্বরবাদ (Atheism)—এই দুইয়ের গঙ্গা যমুনা-সঙ্গম থেকে। এই পর্যন্তও ফয়েরবাকের প্রতি তাঁর শিষ্যোচিত আনুগত্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরই মার্কস্ তৃতীয় ভূমিতে আরোহণ করেছেন। কারণ ১৮৪৪ সনেই (বসন্ত কালে) তাঁর বিখ্যাত "Eleven Theses on Feurbach" নামক সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলো তিনি রচনা করেন। ১৮৪৫ সনে মার্কস যেখানে এসে পৌঁছলেন ঐ স্থানকে চৌমোহনী বললে দোষ হয় না। এখানে এসেই তিনি ফয়েরবাক থেকে নিজের পার্থক্য সূচনা করেন এবং এখানে দাঁড়িয়েই তিনি স্বকীয় পথ ও স্বতন্ত্র লক্ষ্যকে বেছে নেন। এই ভিত্তিভূমি থেকে মার্কস্ তার ভবিষ্যৎ দর্শনকে কল্পলোকের মাল মশলা দিয়ে রূপ দিতে সুরু করেন। এইখানে সমাজ-দর্শনের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন আভাসে, তারই সমগ্র রূপ ও পরিণত বিকাশ আমরা দেখতে পাই "Poverty of Philosophy" (১৮৪৭) এবং "Critique of Political Economy"র মুখবন্ধে (Preface-এ, ১৮৫৯)। ঐ তত্ত্বেরই প্রয়োগ দেখা যায় বিখ্যাত Manifesto-তে (১৮৪৮) এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই Capital এ (১৮৬৭ ও ১৮৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ)। কাজেই "Eleven Theses on Feurbach"-এ সূত্রাকারে যে তত্ত্বের ইঙ্গিত ১৮৪৫ সনে পাওয়া যায় তাকেই পরে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ডায়ালেকটিক জড়বাদ'—তাঁর "Critique of Political Economy"র মুখবন্ধে।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধলেশ্বরী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

দুই

চৈত্র পূজার রাত্রিতে কালীকাচ নাচের জিগিরের মতন গোটা জাহাজ ঘাটায় উল্লাস যেন ফেটে পড়ল। ..জাহাজ আইচে ·· আইয়া গ্যাচে সিরাজগঞ্জের জাহাজ। ফ্ল্যাটের তিন কাছি দূরে এসে চাকা থেমে গেল। ঘন্টি বাজছে—। আড়কাঠি আর সারেঙরা চেঁচায়—রেলিঙ থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক যাত্রীর মাথা ওদের মুখ খুশী খুশী ··

হৈ চৈ হল্লোড় উঠেছে জাহাজ ঘাটাতেও। দোকান, পসারে, ফ্ল্যাটের ধারে কাছে আর গাঙের কিনার জুড়ে অপেক্ষা করছিল কুলিরা, দলে দলে; আচমকা চাকে ঢিল পড়া বল্লার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল ওরা। চেঁচাতে সুরু করে দিয়েছে। আনন্দ গোঁসাইয়ের হোটেলের সেই বাচ্চা ছেলেটা হাঁক পাড়তে শুরু করেছে: এই যি বামুনের বিশুদ্ধ হো - টে—ল···

সামনে খুশীর এক মস্ত মেলা লেগেছে। দোকান দোকানের হ্যাজাক, ডেলাইট আর গ্যাসবাতির আলোয় গোটা জাহাজঘাটা আলো। যাত্রী আর কুলীদের ডাকাডাকি, দোকানীদের খদ্দের ডাকার আয়োজন, আর থেমে থাকা ষ্টীমারের চাকার আচমকা ঘূর্ণনের শব্দে কানে তালা লাগার জো। জাহাজ সরে আসছে, মুখ নয়, ফ্ল্যাটের দিকে পাশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুখানি জোর গলায় কাউকে ধমকাচ্ছিল। পারে লাগার ঘন্টি থেকে থেকে বাজছে ঠুনঠুন···ঠুন··· ঠুন···। ওখানে আলোর রোশনাই আর চেকনাই, পেছনে অন্ধকার। দেউলীর ডুবুডুবু সরকার বাড়ি আর দেখা যাচ্ছে না, এ-দিকে এসাসিনের ডেভিড কোম্পানীর বিশাল পাট-কলের লম্বা লম্বা গুদামের সারি ঢেকে রয়েছে ঘন কালো আঁধারে, দুই গাঁওয়ের ফাঁকে টেউর‍্যা ব্যাতরাইল তক বিস্তৃত বিলের ঘোলা জল নজরে পড়ে না, অন্ধকার আর জল এক একাকার। যেন পেছনের সব মরে আছে, জেগে আছে শুধু সামনের এই জাহাজ ঘাটা।

এতক্ষণ দূরের বড় বড় ঢেউ ছোট হতে হতে কমজোরী দোলায় দোলাচ্ছিল সারিবাঁধা কেরায়া নাওয়ের বহর। জাহাজ ঘাটার কাছে আসাতে, বড় ঢেউরা পরের পর আসছে। ধাক্কা মারছে নাওয়ের ডগরার বাইরে। আর কাতকুত খাওয়া কুমারী কন্যার মতন লাফাতে সুরু করেছে কেরায়া নাওয়ের সারি। ছাপড়ে ঝুলনো লইনেরা রাধা-চক্কর দিতে চাইছে যেন।

আবার সেই জিগির। জাহাজ ঘাটায় লেগেছে। মাঝি মাল্লারা এবার দৌড় মারল ঘাটার পানে।

চরাট থেকে লণ্ঠনবাত্তি তুলে নিয়ে ছইয়ের বাতায় আংটা গুঁজে দিল বিপিন। বড়িতে কোমর বাঁধা গামছা খুলে নিয়ে মাথায় বেঁধে নিল, ধুতি মালকোছা মেরেছে, এবার লাফ দেবে পারে। এমন সময় শিবচরণের গলা। লহমায় ঘুরে দাঁড়াল বিপিন।

'মাথা গরম করিস না বিপন্যা, হালার পুতে যায় কহানে দেইখ্যা আহন চাই।' তখনও গলা কাঁপছে শিবচরণের। দাঁতে দাঁত ঘসা লাগছিল। 'মনে লয়, সুমুন্দির ছাওয়ে কাইজ্যা লাগাইব আইজ...'

'কাইজ্যা! ..' বিপিন কথাটা এমনভাবে বলল, যেন তাচ্ছিল্য করছে। 'আরে থও তুমার কাইজ্যা। নাওয়ে লগি আছে না নয়া তিনখান? পার পাইব নাকি, কও না ..'

'আগ বাড়াইয়া কিছু কওনের কাম নাই।' শিবচরণ নাওের ডগরার পাটাতন তুলল, মাথা নামিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ডগরার মধ্যে। 'ঝামেলা না কইরা কিরায়া লইও খ্যান...'

'হ, লমু', বিপিন এক লাফে পারে নেমে এল। তারপর ঘাটার দিকে মেরেছে জোর দৌড়।

জাহাজ পারে লাগল এইমাত্র। সিঁড়ি নেমে আসবে এক্ষুনি। আর দেখতে দেখতে সচল চ্যাল্লার অনেক পায়ের তুল্য কিলবিল করে নেমে আসবে পাসিন্দরের স্রোত।

বিপিন চলে গেল, নাওয়ে এখন শিবচরণ একলা। এক-মাল্লা থাকে পাহারাদারিতে বাকি সব ঘাটায় ছোটে। পাসিন্দর ডাকে, কিরায়াদার যাচ্ছে—আগেভাগে ধরে নিতে চায় দুরপাল্লার ভাড়া। দূর পাল্লা, জামুরকি, ছুরণ্ডী কি মির্জাপুর অথবা নাগরপুরের আশপাশের মানুষ। দূরের কিরায়ার নগদ-নগদাই কামাই অনেক। চড়নদার বদমেজাজী হলে আড়াই কি তিন, খুশ-মেজাজী পাসিন্দররা পাঁচ টাকার পাত্তি বাড়িয়ে দেয়, বলে: 'কি গো কৈবর্তের পুত, আরও কি চাই?'

'আজ্ঞে!', কিরায়াদার বিগলিত। 'কি যে কন কত্তা, নুঠা ভইরা কিরায়া দিয়া জিগান আরও নি লাগে?—না, লাগে না। বইনাদ চড়নদারের কাছে নি চাওনের জো আছে, কইয়্যার আগেই যে আপনেগো কিরপা হয় কত্তা।' এইটুকু বলে থেমে যেতে হয়। বুড়াখুড়া মাল্লা হ'লে কথার পিঠে ফং করে শ্বাস ছাড়ে, বলে, 'দিনকালের গতিক সুবিধার না। বাজারে আগুন জ্বলে কত্তা। কামে কামলায় আর জুৎ নাই —কী দিন আচিস কত্তা, এহন যত খান তত লাগে।....'

মাটির তাওয়ায় তুষ আর মুইখ্যা সাজানোই ছিল, আগুন দেওয়াটাই কেবল বাকি। খান কয়েক টিকা তুলে নিয়ে শিবচরণ আইলস্যা আনল। চড়নদার চরাটে পা দেবার আগে এক আধ ছিলিম তামাক খেয়ে নিতে হবে। না খেলে জুৎ আসবে না শরীল গতিকে। দূরপাল্লার কিরায় পেলে সারা রাত বসে থাকতে হবে হালে। বিপিন কখনও লগি ধরবে, গুন টানবে; উ টান পথ হ'লে আগ গলুইয়ের চরাটে বসে বৈঠা টেনে যাবে। পোলাডা ঘুমায় না, ঢুলে না। কিন্তু শিবচরন পারে না আর। বয়স হয়েছে, জুয়ানকালের তাগদ কোথায়? তাই রাতের পহর আর বিন-মৌজে কাটে না। ঢুলুনি আসে, আঠার তুল্য ঘুম চোখের পাতা টেনে জোড়া লাগাতে চায়।

আইলস্যা থেকে আঁচ উঠছিল, শিবচরণ পিছ-ছইয়ের অন্দর বাতা থেকে আংটা খুলে ঝোলানো হুকা-কল্কি আনল হাত বাড়িয়ে। কল্কি খুলে নিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছিল আনমনা-ভাবে। কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছে। তামাকের বদলে ঝাড়া গুল ঠেসে নিচ্ছে—অনেক পরে ধরতে পারল শিবচরণ। বাস্তবিক হঠাৎ যেন কিছু হয়ে গেছে, মন উড়ু উড়ু—শরীরের কোথাও যেন পোড়ার তুল্য জ্বালা জ্বলছে—ধরতে পারছিল না শিবচরণ।

ইস্টীমার এখন চুপচাপ। বেঁড়িপদের স্বভাব ভুলে গিয়ে বাধ্য অনুগতের মতন সে জ্যাটে ভিড়ছে। চাকা নিথর। খালসা-দিঘির বিল-উপচানো ঘোলা জলের তীব্র স্রোত গর্জে যাচ্ছে। দূরে, মধ্য ধলেশ্বরীর দিক থেকে কানা-দেওয়ার ডাকের মতন টানা জিগির ছড়িয়ে প ছিল। শিবচরণের মনে হ'ল, এ পৃথিবীতে মাটি বলে বুঝি কিছু নেই; গাঁও

গেরাম-গঞ্জ ডুবে গেছে জলের অতল তলায়। আকাশ বাতাস জুড়ে কেবল যেন জেগে আছে গাঙ ধলেশ্বরীর শোসানি, গর্জানি, ফোঁপানী…রাক্ষসী শিবচরণ মনে মনে বলল, গোটা পৃথিবী খাইয়াও ষ্যান নাওদরা প্যাটের খিদা মেটে না।

খিদা…! লহমায় প্রায় নুয়ে পড়া শিরদাঁড়া টানটান করে সোজা হয়ে বসল শিবচরণ। নিশ্বাস বন্ধ করল। এই একটি কথা যেন তার রক্তে আচমকা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তীব্র আগুন। ভীষণ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। 'শয়তান…' দাঁতে দাঁত ঘষছিল শিবচরণ। রক্তজবার মতন চোখ তুলে অন্ধকার ধলেশ্বরী দেখছিল। যেন পারলে, শক্ত মুঠিতে টুটি চেপে ধরে চিরকালের মতন ওর গর্জন থামিয়ে দিত।

অন্ধকারেও চোখ জ্বালা করছিল, শিবচরণ পাতা বন্ধ করে অন্ধ হ'ল। স্মৃতিরোমী মন পুড়ছে, তপ্ত চোখের কোণ ভিজে উঠল, বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে যায়…বন্ধ চোখের অন্ধকারে ফেলে আসা একটি অতীত রাত্রিকে ধরতে পারল সে। তখন ভরা বরষা। ভাদ্দুরে ধলেশ্বরী পর্বত প্রমাণ হা করে গাঁ-গেরাম-মাঠ-মাঠালি আর ক্ষেতখামার গ্রাস করছে। টেউর‍্যার মোল্লাপাড়া গেছে, আগে দেউলীর কোল গিলে ফেলেছিল রাক্ষসী, চর-নসিমের শেষ মাটি পর্যন্ত বেপাত্তা। কিরায়ার চড়া মরশুম পড়েছিল, গোটা একটা পরিবার নাওয়ে তুলে দুরপাল্লার কিরায়ায় গিয়েছিল শিবচরণ আর বিপিন। মোটা কিরায়া নিয়ে ফিরে এল একদিন বাদ মধ্যরাত্রে। কিন্তু নাও ভিড়াবে কোথায়? ঘাটা নেই। দেউলী মাঝি-পাড়ার এক কুড়ি বছর বয়সের নাও-ঘাটা মুছে গিয়েছে। পার খাড়াই। এবং হঠাৎ, হঠাৎই বাদাম-চড়ানো নাওয়ের অন্ধকার পিছ গলুই থেকে পরিত্রাহি আর্ত চিৎকার ভেসে এল। '…বিপন্নারে…' সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশাল এক চিৎখিঁর মারল শিবচরণ। সেই প্রচণ্ড, ফেটে পড়া বোমার মতন চিৎকার অন্ধকার ধলেশ্বরীর খাড়াই পারে আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল গাঙয়ের বিস্তৃত বুকের ওপর। উত্তরে মধ্যগাঙ থেকে ধলেশ্বরীর অট্টহাসি ভেসে এল রে…এ…এ। আলগা হাল, বাদাম চড়ানো নাওটা দু'জন বিভ্রান্ত মাঝির অন্যমনস্কার সুযোগে একটা চরকি-পাক খেল।

ঘটনাটা ঘটল একটা মুহূর্তের মধ্যে। '…খুড়া….', ত্রাসান্বিত গলায় সচিৎকার প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ছিলামুক্ত তীরের তুল্য লহমায় পিছ গলুইয়ে ছুটে এসে একহাতে শিবচরণকে জাপটে ধরল, অন্যহাতের শক্ত মুঠিতে ধরে ফেলেছিল বিন-মালিক হালের বেঁকে-যাওয়া বাঁট। গোটা গাঙ জুড়ে তখন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শিবচরণের হাউ হাউ আকুল কান্না।

ক্ষ্যাপা বাতাসের ঝাপটায় আকুল নৌকাকে আয়ত্বে এনে ফেলল, বিপিন। সচাং করে বাঁট ঘুরিয়ে সোজা সরল করে নিল হাল। তারপর বুকের ওপর ভেঙে পড়া শিবচরণের দেহ নিয়ে বসে পড়ল চরাটের ওপর। কান্না থামছে না। শিবচরণ কপাল চাপড়াচ্ছিল ঘনঘন।

'বেসামাল হও ক্যান খুড়া, আগে দেইখ্যা লই—অরা আছে, ঠিক আছে…' বিপিন তার কড়া পড়া শক্ত হাতটি মোলায়েম করে বুলোচ্ছিল শিবচরণের বিশাল পিঠে। 'এট্টুন জিরান গ্যাও খুড়া, চুপ মার…'

'না চুপ মারবার পারি না আমি' শিবচরণের আর্ত কান্নার বেগ চড়ায় উঠতে থাকে। 'মিছা বুঝ দিসস্থারে বিপনা…অরা নাই…নাই….নাই…'

'খু…ড়া—' শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্ষিপ্তের মতন প্রচণ্ড এক ধমক দিল বিপিন। মধ্যরাত্রির গাঙ ধলেশ্বরীর বুকে সেই উদাত্ত স্বর গমগম করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক সজোর ঝটকায় শিবচরণকে সরিয়ে দিয়ে টান টান হ'য়ে দাঁড়াল বিপিন। তার মুখ বেঁকে এসেছে। ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি চেতিয়ে সোজা তাকাল বিপিন। দূরের খাড়া পারের দিকে।

ছিটকে কাৎ হ'য়ে পড়ে গিয়েছিল শিবচরণ। নিমেষে কী যেন ঘটে গেল সে বুঝতে পারছিল না। ঠাহরে এল না। শিবচরণ নাটাফলের মুলো চোখ তুলে তাকাল বিপিনের দিকে। একটা দৈত্যের মতন সামনে দাঁড়িয়ে আছে মরদের বাচ্চা।

'তুমি ···', ঢোক গিলল বিপিন, বদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ল। 'তুমি হইচ হও বেসামাল, আমারে তুমি কাঁচা ডাইলের লাথান ভাল ক্যান। আগে দেখবার দ্যাও আমারে···'

না ঘাট নেই, ঘাটা নেই। সাবেক-কালের সেই দেউলীর মাঝিপাড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গিয়েছে ধলেশ্বরীর গর্ভে। প্রখর স্রোতধারা আহত বাঘের মতন গর্জন তুলে আছড়ে পড়ছে খাড়াই পারে। ঝুপঝাপ মাটি পড়ছে—দিগন্ত সজাগ করা শব্দ তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বিশাল বন। ক্ষ্যাপা বাঘের গর্জানির তুল্য রাক্ষসী ধলেশ্বরী ফুঁসছে। সুখের মতন, শান্তির ছায়ার মতন, মায়ের কোলের মতন সেই গ্রাম আর নেই। বিপিনের সমস্ত বুক মুচড়ে উঠল। গলা পেরিয়ে উঠে আসছিল কান্নার দলা। না: দাঁড়াল না বিপিন। শক্ত হয়ে হালে বসল। মোড় ফেরাতে লাগল নাওয়ের।

অনেকক্ষণ ধরে বাদামে বাতাস লাগা নাও ঘুরল। ঘুরে ঘুরে খুঁজল পারে ভিড়বার মতন একটু ঠাঁই। কিন্তু কোথায়? খাড়াই পার ঘেঁষে যে স্রোত বইছে, মুহূর্তেকের ভুলে যদি তার মুখে নৌকা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দুই মাল্লাসহ গোটা নাওটা লুফে নিয়ে আছাড় মারবে খাড়াই পারের মাটিতে। তারপর সব চুরমার।

গোটা একটা প্রহর কেটে গেল, বিপিন উঠল না। তাকে দৈত্যিতে পেয়েছে। নাও সে ভিড়াবেই।

কখন থেকে যেন মেঘ জমতে শুরু করেছিল আকাশে। ক্রমে তা গোটা আকাশ ছেয়ে নিল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘনঘন। শেষে বৃষ্টি। অঝোর ধারার বাদলা। শিবচরণকে ঠেলে দিয়েছিল ছইয়ের ভেতরে। বিপিন মাথাল মাথায় দিয়ে ঠায় বসে থাকল হালে। তার অতন্দ্র চোখ দু'টি পারে ভিড়বার মতন একটু মাটি চাইছে।

মাটি পেয়েছিল ওরা। সমস্ত রাতের সন্ধান ব্যর্থ করে নি দু'টি মাঝির তীব্র চেষ্টাকে। বাদলা নামার আগে বাদাম নামিয়ে নিয়েছিল বিপিন। শেষে স্রোতের একধার ধরল, ভাঁটায় যাচ্ছিল। সুযোগ পেলে বাদিকের কাওন ক্ষেতের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল কিরায়া নাওয়ের মাগ গলুই। তীব্র গতি নাওটা সরসর করে অসংখ্য কাওনের ডাঁটি পিষে আটকে গেল বালি-থকথক অল্প চড়ামতন জায়গায়।

গোটা একটা বর্ষণ মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছিল। বিপিনের গা-গতর ভিজে একসা। তবু গামছা খুলে গা-গতর মুছল না বিপিন। হাল ছেড়ে এগিয়ে এল পিছ-ছইয়ের মুখে। মাথা নিচু করে দেখল, কালিঝুল পড়া লণ্ঠনের কালি-মতন একটু আলো রয়েছে ভেতরে। তার সামনে বসে শিবচরণ। দু' হাঁটুর ওপর হাত যুড়ে কোলের অন্ধকারে মুখ রেখে অস্পষ্ট ফোঁপানি কান্না কেঁদে চলেছে সে।

আস্তে এগিয়ে গেল বিপিন। কাছেই। 'খুড়া ···', একটা হাতও তুলে দিয়েছিল বিপিন শিবচরণের পিঠে।

'এঁ···' চমকে উঠে অদ্ভুত শব্দ করল শিবচরণ। মাথা তুলল না।

'আইস্যা গেচি। নাও ভিড়াইচি এলংজানির মুখে ··'

শিবচরণ রাও করল না, তাকাল না।

'কই, আইস্যা গেচি। গাওখান তুল।'

'না।' ধরা ভাঙা গলায় জবাব দিল শিবচরণ।

'ই-কথা কয় না খুড়া। খুড়িমায় পথ চাইয়্যা রইচে, তুমার হলধইরা—'

'হলধর!'

'হ। খাটা-হুইডা হাত তুইল্যা পুলায় ডাকে, বা-বা-বা-'

আচমকা শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেল শিবচরণ। কে যেন আসছে নাওয়ের দিকে। বিপিন? শিবচরণ শুধোতে গিয়েছিল, তার আগেই পার থেকে ভেসে এল গলার স্বর, 'নাওয়ে ক্যারা আছ গো?'

'আমি…'

'কুন পাড়ার মাল্লা?'

'দেউলীর।' হুকা কল্কি রেখে উঠে দাঁড়াল শিবচরণ। 'আমি শিব, শিবচরণ কৈ বত্তি…' লণ্ঠনটা তুলে নিল শিবচরণ। কিন্তু আর কথা আসছে না। ছইয়ের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল শিবচরণ। মনুষ্য মূর্তিটা চট করে সরে গেল অন্ধকারে। তারপর চোঁচা দৌড়।

'ক্যারা রে, ক্যারা, তুই ক্যারা…' শিবচরণ ত্বরিতে ছইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে ছিটকে এল আগ-গলুইয়ে। লণ্ঠনটা তুলে ধরল মাথার ওপর, তারপর জোর গলায় ডাক ছাড়ল। কিন্তু কেউ নেই, কেউ না। তবে কে? আচমকা মনে পড়ল মুকুন্দ দাসের নাম। তবে কি সত্যি মুকুন্দ? হ্যাঁ তাই। নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল শিবচরণের। 'ডাইকা পলাইয়া যাস কোন শালিকের পুত রে? আয়, বাপের পুলা হইলে আও-গাইয়া আয় দেহি ছাত্তিখান মাপি একবার…'

কিন্তু মিছাই ডাক। সে আর এল না, সাড়া দিল না। তার বদলে, আশেপাশের নাও-মাল্লারা ছুটে এল। 'কারে কও, কারে কও খুড়া…' দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ডাক ছেড়েছে দেউলীর বাঘে, এড়িয়ে যাবার জো আছে নাকি কারো। হাত বৈঠা, লগি খুঁটি যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে এসেছে। অনন্ত পরাণ, মধু, শইচা, গণেশ, মথুর, কুইশা, কোকিলা, যায় যাইধ্যান চক-ত্তেলের মাঝিমাল্লার দল। 'পলাইল ক্যারা শিবখুড়া?'

তুলে ধরা হাতের লণ্ঠন নামিয়ে রাখল শিবচরণ। মুখ গম্ভীর, গোমড়া। কী বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। কারণ শিবচরণ জানে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত বাগডাঁসা। কোনক্রমে মুখ ফসকে নামটা বেরিয়ে গেলে জিগির ছেড়ে ওরা ছুটবে জাহাজ-ঘাটার দিকে। লোকটাকে পেলে ওরা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে।…তবে কি মিছা কথা বলবে? বলবে নাকি পেতিচোরের জানান? না। কাঁধের ওপর থেকে গামছা টেনে কোমরে বাঁধল সে। জান গেলেও মিছা কথা বলবে না সে।

পারের মাটিতে বেশ বড়সড় জটলা জমেছে। অনেক মাল্লার ভিড়। ওরা চেঁচাচ্ছে, জানতে চাইছে, ডেকে পালিয়ে গেল কোন শয়তানের ছাও।

নিশ্বাস বন্ধ করল শিবচরণ। ছাতি চেতিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তাইলে শুন, নামটা কই তুমাগো, যে হালার পুতে আইচিল তারে চিনবার পারবা তুমরা। সে হালা ব্যাতরাইলের মুকুইন্দ্যায়…'

কথা নয়, যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে। আচমকা একটা জিগির উঠল। ক্ষ্যাপা দলটা বাঘের মতন ছুটে যায় আর কি।

'খাড়ও…।' গমগমে গম্ভীর গলায় হুকুম ছাড়ল দেউলীর বাঘে। 'আগ বাড়াইয়া কিছু করনের কাম নাই। বিপক্ষায় তকে তক্কে আছে। তুমরা নজর রাইখো। মনে লয় বান্দরের ছাওয়ে লাইঠ্যাল আনচে।' ভীষণ আক্রোশে শিবচরণ নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'লাইঠ্যাল!' মনমোহনের বড় ছেলে অনন্ত এগিয়ে এল সামনে। 'কী কইলা খুড়া? লাইঠ্যাল—লাইঠ্যাল আনচে? হালার কুত্তার বাচ্চার এত বড় আস্পদ্দা!' ক্ষ্যাপা শুওরের মতন গোঁ গোঁ করছিল অনন্ত। 'অর ধেঁটিখান আইজ ছিঁড়া ফ্যালামু আমি।'

'মার, মার শালারে…' উত্তেজিত গোটা ভিড়টা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। দু' একজন সরে-ছিটকে গিয়েছিল জাহাজ-ঘাটার পানে।

'হেই মাঝির পুতরা, আমি শিবচরণ কথা কই, শুন। আগের থনে যা-তা খারাপ কইয়ো না তুমরা।'

'কী কথা কইতাছ তুমি শিবখুড়া?' ভিড় ঠেলে উত্তেজিত পরাণ এগিয়ে এল সামনে। 'দুষমনরে হাতের কাছে পাইয়া ছাইড়া দিতে কও? পুরানা ঘা-ডা কইলাম এহনও থকথক করে খুড়া, শুকায় নাই ক্যা। ঘর থিক্যা আমাগো মাইয়্যা টাইন্যা লইয়া গেল শয়তানে—হৈমর সেই অপমানখান '

হৈম —। ভীষণ যন্ত্রণার মতন কথাটা অক্ষুটে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আচমকা শিবচরণ তার বিশাল থাবা দিয়ে প্রবল আক্রোশে নিজের রোমশ বুকের মাংস খাবলা দিয়ে চেপে ধরল। যেন পারলে সে-মাংস নিজেই ছিঁড়ে নেবে। পরাণ খালি একটা কথার কথাই কয় নাই, একটা তপ্ত লোহার শলাকা বুঝি বুকে চেপে ধরেছে। দাঁতে দাঁত চাপল শিবচরণ। নিশ্বাস বন্ধ। দু' চোখের কোল বেয়ে ততক্ষণে নেমে এসেছে তপ্ত অশ্রু। দেউলী মাঝিপাড়ার হিংস্র বাঘটা মাত্র একটা কথার ঘায়ে কুঁকড়ে এসেছে।

অল্পক্ষণ সব চুপচাপ। ঘাটার ঠেস-খাওয়া নাওয়ের আগ-গলুইয়ের চরাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাথরের মূর্তি, নীচে ভিজা পারে অসংখ্য মাল্লার ভিড়। ওরা তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে। 'হয়', অনেক পরে কথা কইল শিবচরণ, তার চোয়াল শক্ত দৃঢ়। 'ভুলি নাই ক্যা সে কথা। মনে আছে আমার…'

'তয় হকুমডা দাও খুড়া…'

'না—।'

'খুড়া!'

'বিপদ্দারে আইবার দাও আগে। খবর লই…'

খবর এনেছে বিপিন, সেই সঙ্গে কৈরাম্দারও। শিবচরণ দেখল, গোটা জাহাজঘাটার ভিড় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নাও-ঘাটায়। পালিশ্বর আর পালিশ্বর। মাথায় মাথায় ছয় লাপ। আর সেই সঙ্গে অনেক, অজস্র মানুষের কলকণ্ঠ।

পাকঘরের শচিকোণের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল নয়ন। সামনে হাত কয় মাত্র জায়গা। ছোট একটা মন্দটের জঙ্গল, তারপর গাঙ-ধলেশ্বরীর খাড়া পার। বর্ষার উদ্দাম ধলেশ্বরী হাঁকডাকে পৃথিবী কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে। যেন অসংখ্য বর্শাবিদ্ধ আহত শুওরেরা কাৎরায়, চেঁচায়। সেই ভয়াবহ স্বর এত প্রবল যে অল্প দূর থেকে ভেসে আসা কোনো মানুষের কথা পর্যন্ত বোঝবার জো নেই।

ষ্টিমার আসছে, নয়ন দেখছিল। শিবচরণ বেরিয়ে গেল ঝাঁক ঝাঁক লণ্ঠন ছুটে নেমে গিয়েছিল নাওঘাটায়, দেখতে দেখতে নদীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল আলোগুলো; ইষ্টিমারের জোরালো আলো নদী জুড়ে ঘুরল। তারপর, জাহাজ এগিয়ে গেল এদাসিনের ঘাটার দিকে। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নয়ন।

ফিরে আসতে পারত নয়নতারা কিন্তু ফিরল না। এখান থেকে গাঙ ধলেশ্বরীর জল দেখতে পাচ্ছিল সে। অন্ধকার নদীর জলকে যেন আলকাতরা করে তুলেছে। কঠিন আন্ধারের মধ্যে এক-আধটা সাদা সূক্ষ্ম সুতার মতন রোশনি, ফুটছিল থেকে থেকে। দূরের কোনো মালদারী নাও থেকে টানা সুরের গান ভেসে আসছিল:

…আউলা ক্যাশে কাকই দিমু
সিঁদুর মাথুম সিথায়
সাইজা গুইজা থাকুম বইয়া লো সই
নাগর লইয়া আয়…

চমকে উঠল নয়ন। মাল্লাটা বুঝি তার মনের কথা জেনে গান বেঁধেছে।

অনেকক্ষণ তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল নয়ন। দেখা যায় না, গান থেকে সে ধরে নিতে পারছিল, ভাঁটার টানে

ভেসে চলেছে দূরের মালদারী নাও। কাছ থেকে সে স্বর সরে যেতে যেতে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু না গেলেও ওই গান যেন নয়নের মন চুরি করে নিয়ে গেছে। কেমন বিমনা হয়ে পড়েছে নয়ন। বর্ষার গাঙ পারের মাটি ভেঙে নিচ্ছিল, ঝুপঝাপ খসে পড়ছিল মাটির চাপড়। আর সঙ্গে কলকল করে উঠছিল গাঙের জল। ওই শব্দ বারবার নাড়া দিচ্ছিল নয়নতারার আচ্ছন্ন মনকে। নাও কি ভিড়ল, এল নাকি তার মনের মানুষ! জাহাজ এসে গেছে

অনেক পরে ফিরে এল নয়ন। শূন্য উঠান, শূন্য ঘর। গাঙ-ছোঁয়া বাতাসের ঝাপটা উঠানের কোণের দিকের পাইগা গাছের পাতায় দোল দিয়ে যাচ্ছে। বরইতলায় থমথম করছিল ঘন আন্ধার। নয়ন উঠান পেরিয়ে এল বারান্দার দিকে। পাকঘরের ঝাপ খোলা রয়েছে এখনও। বারান্দায় ঠাঁইপিঁড়ি পড়ে রয়েছে তেমনি। কাঁসিতে ভাত, বাটিতে বেগুন। মানুষটা দুইডা গরাস মুখে তুলবার সময় পেল না। মনটা আনচান করছিল নয়নের। কিছু ভাল লাগছে না। যেন কোথাও কিছু ফেলে এসেছে। সে বস্তুটা কী? মন। সে মনকে নয়ন কোথায় ফেলে এল! গাঙের জলে? না। মলটের জঙ্গলে? না। তয় কুথায়, কুথায়, কুথায়

কুকুর ডাকছিল কে থাও শুনতে পেল নয়ন। গোঁসাই পাড়ার কুত্তারা ভুখছে দূর থেকে সে ডাক ভেসে আসছিল। রেবতীর পোয়াতী-বউ কাঁদছে, রেবতী ধমকাচ্ছে বুঝি। মাল্লারা সব কিরায়ায় চলে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে বাকি পুষ্যিরা খাওয়া খাস্তি করতে ব্যস্ত। আর মাত্র খানিকক্ষণ। নয়ন জানে আর মাত্র খানিক সময়। তারপর গোটা মাঝি-পাড়ার সকল ঘরের লণ্ঠন কুপি ডিব্বা কি পিদ্দিম নিবে যাবে। দেখতে দেখতে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়বে জন-মনিষ্যিরা। আর তখন, তখনই আসবে সে। নামটা মনে মনে বলল নয়ন। একবার দুবার তিনবার। এ-নামের এমন আশ্চর্যি যাদু যে নয়নের মন প্রাণ বুক সব ভরে যায়। চোখে ঘুম থাকে না, পেটে ক্ষিদার বালাই পর্যন্ত উধাও।

পাতা পিঁড়ি টেনে নয়ন বারান্দার কোণার দিকে বসল। ভুয়া বেয়ে লতার মতন নেমে থাকল তার পা দু'খানা। আর মাত্র খানিকক্ষণ সময়। সিরাজগঞ্জের পুরনো যাত্রী নামিয়ে দেবে জাহাজ ঘাটায়। নয়া পাসিন্দররা চড়বে জাহাজে… ভোঁ বাজবে আবার। চাকা ঘুরবে, ধীরে ধীরে ঘাট ছেড়ে চলে আসবে দূরে, তারপর আলোর ঝলকানি মেরে, চাকায় জল ঠেলে ত্যান যাত্রা করবেন চারাবাড়ির দিকে। এ-পাড়ার মাঝি মাল্লারা দূরদূরের কিরায়া নিয়ে গাও ছেড়ে পাড়ি দেবে। শিবচরণও যাবে। তার এখানে আসবে আর এক মানুষ। নয়নের দুই চোখে যে রঙের সুরমা মাখিয়ে দিয়েছে, সেই ডানপিটে জোয়ান মানুষটা।

বসে থাকতে থাকতেই হাসি পেল নয়নতারার। শিবচরণ মানুষটাকে অন্য নামে ডাকে। না, মুখোমুখি না আড়ালে আবডালে কেবল। এবং সে নাম কেবল নয়নই জানে — আর কেউ নয়। মগা। শিবচরণ বলে, উডা মনিষ্যি না, খাটাস। বাপের নাম রাখল না, জাইতের অপমান করল — আর শ্যাসকালে - এই পর্যন্তই, আর কিছু বলে না শিবচরণ। গাঙের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস চোখে, ঘনঘন হুকা টানতে থাকে। নয়ন জানে, শিবচরণ আর কিছু বলবে না। বললে আর একজন দুঃখ পাবে, বুড়ায় জানে সে কথাডা।

'তুমারে বুড়ায় খুব ভালবাসে…' নয়ন বলছিল একদিন। ঘরে শিবচরণ নেই। কিরায়ায় গিয়েছিল। জাহাজ চারা-বাড়ির পথে ফিরে যাবার পর এসেছিল সে। আগে শিয়ালের হুকা দিয়েছিল, পরে বরইগাছটা ধরে জোরে এক ঝাঁকানি। এই তার আসার জানান। নয়ন খুব আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে সন্তর্পণে দরজা খুলে দিয়েছিল, রোজ দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে পড়ে মানুষটা। প্রথমে নীচু স্বরে

কথা বলে, রাত্ত বাড়লে কথা জোর হয়। ঘর ছেড়ে ওরা বেরিয়ে আসে বারান্দায়। 'বুড়ায় থাইক্যা থাইক্যাই নাম লয় তুমার।'

'লউক, ওই কথায় চিড়া ভিগাইবার পারব না।'

'অমুন কথা কয় না···'

'আমি কই। হালার কিপকটে দিনরাইত লাইগ্যা আচে আমার মাগগে। কাম করবার দিব না। আপ্যরে, ঠুঁটা জগন্নাথ বানাইবার চায় ··'

'মিছা কথা।' বাধা দিল নয়ন। 'হ্যার পরাণডা হইল গাঃ গাডের লাখান। চিনবা। পার না

'তুমিই চিন, আমার চিন্তা কাম নাই

'ভুগার কথা না, সচাই কই। জাইত ধম্ম মাননা তুমি, নাওয়ে যাওনের নামে জর আছে তুমার শরীলে। তুমার বাপ দাদা নি মাছ ধরছে, নাকি লাঙ্গল ধরছিল হাতে —বেজাতী কাম কর বইল্যা বুড়ায় ··'

'মাল্লার কাম আমার পুষায় না।'

'এ্যার লিগাই তুমারে খাটাস কয় বুড়ায়···' মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল নয়ন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল গা-ঘেঁষে বসা মানুষটার কোলের উপর। আর জোয়ান মানুষটা তার দুই শক্ত বাহুতে···

'ছোট খুড়ি···'

কে! চমকে উঠল নয়ন; তাকাল। ঘোর কাটা চোখে দেখছিল, শূন্য আঙিনায় সে একাকী। পাশে কেউ নাই। গোটা উঠানময় বাতাস আর অন্ধকার নাচছে। গোঁয়ার ধলেশ্বরীর দিক জাগানো গোঁ গোঁ শব্দ যেন আরও প্রচণ্ড আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

ক্ষীণ গলার ডাক শুনেছিল নয়ন, চোখ মেলে দেখতে পেল না কাউকে। তার চোখ অন্ধকারে ডাক দেওয়া মানুষটির হদিস খুঁজছিল। 'কে··· ?'

'আমি।' বারান্দার পাশ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বিপিনের বউ সরমা। 'অমুন পাগলের লাখান হাস কী দেইখ্যা ছোটখুড়ি ?'

'হাসি!' নয়ন অবাক হয়। 'না বউ, হাসি নাই। একলা বইয়া বইয়া ভাবছিলাম; হাসুম ক্যা ?'

'আমি দেখচি।' সরমা আরও সামনে এসে দাঁড়াল। তুলার পাশে রাখা লণ্ঠনের নিবি আলোয় নয়ন দেখল, সরমার কোলে ঘুমন্ত মেয়ে। বউটার মুখ ভারভার। 'মনডা বুঝিন ভাল নাই ছোটখুড়ি ?'

'মন···· !' অস্ফুট গলায় বলল নয়ন। আর কিছু নয়। তার বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক করছিল তখনও। কথা না বলে অল্প বিরক্ত মন নিয়ে নয়ন উঠল, খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে দিল বারান্দায়। নিজে বসল, সরমাকে বসাল। লণ্ঠনের আলোয় কাছাকাছি দুটি মানুষ। সম্পর্কটাই কেবল ছোটবড়র—আসলে, বিপিনের বউ সরমা নয়নের বড়দির সমান। এ-ঘরে যেদিন এল নয়ন, বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও সরমা তাকে ছোটখুড়িই বলেছিল। এখনও বলে। শিবচরণের আগে-পক্ষের বউকে সরমা দেখে নি। বিপিন তাকে বড়খুড়ি বলত বলে শুনেছে। সেই সুবাদে বড়খুড়ার ছোটবউ হ'য়েছে ছোটখুড়ি। বিপিনও নয়নকে ঐ-নামে ডাকে। কেরায়া ফিরৎ আগে এখানে আসে বিপিন। রোজ উঠোনে পা দেবার আগেই দরাজ গলায় হাঁক ছাড়ে ছোটখুড়ি, অ ছোটখুড়ি···! ডাক শুনে লাজ পায় আঠার বছর বয়সের নতুন ছোটখুড়িটি। মাথার কাপড় যতটা পারে টেনে নেয়, নিঃশব্দে নেমে এসে দাঁড়ায় উঠানে।

কাঁধের ওপর থেকে মেয়েটাকে কোলে শুইয়ে নিয়েছে সরমা। আস্তে আস্তে চাপড় মারছিল।

'রাইত এখন কুন পহর হইল গো বউ···'

'তা অনেক হইল। ইস্টিমার আইল অনেক দেরীতে। এহনও পাটা ছাড়ে নাই মনে লয়।

ছাড়ে নাই ? অত্যন্ত অধৈর্যের মতন মনে মনে কথাটা

বলল নয়ন। যেন তার মনে হচ্ছিল, সিরাজগঞ্জের জাহাজ ফিরে যেতে যেতে রাত শেষ প্রহরে গিয়ে দাঁড়াবে। এখানে একটি তৃষাতুর দৃষ্টি নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকবে ধলেশ্বরীর কিনারের দিকে। সারারাত সে চোখের পাতা একটিবারের জন্যেও এক হবে না। উৎকর্ণ মন অবশ হবার সুযোগ পাবে না। কারণ সে আসবে। রোজ আসে। এলাসিনের ঘাটা থেকে রওনা হয়ে চারাবাড়ির দিকে যাবে জাহাজ। অনেকদূর যাবে, আর তখনই আর একটি না ঘুমনো মানুষের ডিঙি নাও গভীর রাত্রির জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে ভিড়বে ছইতান তলার ঘাটে। তারপর··তারপর—নয়ন সমস্ত শরীর দিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এ-দিকটা অন্য কোনো শব্দ নেই। পাইন্না গাছের পাতা ছুঁয়ে দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকড়া মাটা বড়ই গাছের ছোট ডালপালা নড়ছে—আর ধলেশ্বরী এমন ফুঁসন ফুঁসছে যেন শেষ-চৈত্রের উত্তর আকাশের কোণ থেকে কানা দেওয়ারা অবিরত ডেকে চলেছে। সামনে লণ্ঠন নিয়ে বসে আছে সরমা আর নয়ন। কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ।

না, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। জানান পাওয়া গেল আচমকাই। গোটা দিগর কাঁপিয়ে আচমকা বেজে উঠল জাহাজের সিটি ভোঁ—ওঁ—ওঁ ওঁ। বিকট বিশাল শব্দটা অল্প দূরের এই দেউলী মাঝিপাড়ার ঘরে ঘরে ডাক পৌঁছে দিল। যেন বলল, যাই—যা—আ—ই।

'যায়··' সরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কথার সঙ্গে সঙ্গে।

'হয়····' নয়নের আনমনা জবাব।

আবার চুপচাপ।

ততক্ষণে স্টীমারের সচল চাকায় জল খণ্ডিত করার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। এবং সে শব্দ ক্রমশই বাড়ছে। দূরে থেকেও শুনতে পারছিল ওরা।

'মাইয়ারে শোওয়াইবা না?····' সরমার দিকে তাকাল নয়নতারা।

সরমা চুপ। জবাব দিচ্ছিল না। ও তাকিয়ে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তারী বিশাল গাঙের দিকে। ক্লান্ত বিষণ্ণের মতন।

'বউ··· !'

'উ···' সরমা যেন চমকে উঠল।

ঘুমাইবা না?'

'নাঃ,' যেন কথা নয়, সরমা বুঝি তার হৃদয় নিঙড়ানো বেদনা এবং শূন্যতা ছুঁড়ে দিয়েছে। দিয়ে ও শূন্য এবং ভাসাভাসা চাউনিকে ফিরিয়ে আনল; এখানে। 'মনে সোয়াস্তি নাই ছোটখুড়ি ।' নিবু নিবু লণ্ঠনের আলোয় সরমা তার কোলের মেয়েকে দেখছিল 'মাইয়ার বাপে না খাইয়া কিরায়ায় গেল গ'। একটা গরাসও মুখে তুলবার পারে নি। বাড়া ভাত পইড়্যা রইচে····' আবার থেমে গেল সরমা। উদ্গত অশ্রুকে বুঝি থামাতে চাইছিল। ঢোঁক গিলল সরমা, নিশ্বাস চেপে চোখও বুঁজে থাকল খানিক। পরে তাকিয়েছে, বদ্ধ নিশ্বাস ছেড়েছে, 'শ্যাতক পাপ করচিলাম খুড়ি গত জন্মে। নইলে যেমুন ঘরে জন্মাইলাম তেমুন ঘরেই বিয়্যা—আমাগো নি সোয়ামীরে কাচে পাওনের জো আচে···'

'না, নাই। মাঝির ঘরের বউগো সতীন লইয়া জীবন। একদিকে ঘরের জন, আর একদিকে কী জান নি?'

'নাও ' অস্ফুট গলায় বলল সরমা।

গুরুগম্ভীর শব্দটা এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। রাক্ষসী ধলেশ্বরীর দিগর জাগানো ডাক বুঝি ঢাকা পড়ে আসছে। সারাটা দিন ধরে দাপিয়েছে, একরোখা শুওরের তুল্য গোঁ গোঁ করেছে গাঙ ধলেশ্বরী। সিরাজগঞ্জের জাহাজ যেন আসা এবং যাওয়ার সময় তাকে ধমকে নরম করে।

শুধু শব্দ না, জাহাজের মস্ত বড় সার্চ লাইটের তীব্র আলোটা এইমাত্র নয়নের দুয়ার আলোকিত করে সরে গেল।

ওই যায়···ওই যায়···আনন্দ মাঝির বাইরবাড়ি ছাড়িয়ে, পুব কৈবর্তর পুব দুয়ারী ঘরের পেছনের বুড়া হাইতান গাছের মাথা ছুঁয়ে টেউর‍্যার দিকে চলে গেল আলোটা। নয়ন দেখল গোটা পাড়া নিঝুম ঘুমে অচৈতন্য। কোথায় যেন ঝিঁ ঝিঁ ডেকে উঠল। বুঝি আলোয় বিভ্রান্ত কটি কানা-কুয়াও ভয় পাওয়া গলায় ডেকে উঠল কুব···কুব···কুব ·· কুব···

···সে আসবে···নয়ন ভাবল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রোমাঞ্চ-অনুভব যেন ভালাভুলায় জল ঢেলে দেবার মতন নিভে গেল পাশে বসা সরমাকে দেখে।···তুমি যাও, যাও বউ, আর বইস্যা থাইক্যা আমার মনডারে তুমি কালাকালা কইরো না। না পারি কাউরে কইবার····না ··

দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। অনেকদূর চলে গেছে। ক্ষ্যাপা ধলেশ্বরীর ভয়াল জলধারাকে চাকায় মথিত করে চারাবাড়ির পানে এগিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের জাহাজ। আর খানিক পরে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।

কোথায় যেন ভীষণ রকমের এক শব্দ হ'ল। নিবু নিবু লণ্ঠনের সামনে বসা দু'জন মানুষ চমকে উঠল। তাকাল এ-দিক ও-দিক। কিন্তু দেখা গেল না কিছুই। কেবল বুঝতে পারল ওরা, দেউলী গ্রামের আরও একটা বিশাল মাটির চাঙাড় ধলেশ্বরী তার গ্রাসে পুরল।

নদী ডাকছে। বাতাসে আরও জোর। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে অনেক। বুড়াতলার ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ থেকে পহর-জাগা কাকের ডাক শোনা গেল খানিক। সাঁ সাঁ করে কয়েকটা ঝাপটা মেরে গেল দমকা বাতাস।

'খুড়ি···'

'উঁ···'

'একখান কথা জিগামু তুমারে··· ?'

'কও।'

'আইচ্ছা....' সরমা থামল। তাকাল নয়নের দিকে। 'তুমার মনডা পুইরা খাক হইয়া যায়, না গো ছোটখুড়ি ? ...'

কথা নয়, সরমা যেন জ্যোতির পার মেরেছে নয়নের বুকে। আচমকা। সে পারে দিশেহারা হয়ে পড়ল নয়ন। আঘাতের তীব্র কামড় চাপতে ও দম বন্ধ করল। চোখ বুঁজল। না না না—মাথা নাড়ছিল নয়ন। অনেক পরে তাকাল। 'না বউ....না—'

'আমারে কও ছোটখুড়ি। দুঃখ মনে পুইস্যা রাইখ্যা তুষের লাখান জইল্যা মইরো না···'

'ব-উ···' সরমা দু' হাতে কান চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল। ক্ষিপ্তের মতন।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীতে বনফুল : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

কোন কাজে দিন কয় হল দিল্লীতে এসেছি।

জনৈক পরিচিত সাহিত্য রসিক বন্ধু আমায় জানালেন : দিল্লীতে বনফুল এসেছেন, কাল সন্ধ্যায় মোতিবাগে একটি ঘরোয়া বৈঠকে তিনি আসতে রাজি হয়েছেন। আপনি আসছেন ত? বন্ধুর অনুরোধ নয়, 'বনফুল' এই দুটি শব্দ আমার মনের তারে কেমন একটা বিধুর মূর্ছনা এনে দিল। মনে মনে আমি অনেক আগে, অনেক দূরের দিনে চলে গেলাম। অস্ফুট উচ্চারণ করলাম : বনফুল, বনফুল দিল্লীতে বনফুল।

জীবনের ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, আগরতলার পাহাড়ঘেরা সেই নীল নির্জন দিনগুলি। বছর চল্লিশ আগের কথা। বয়স তখন হদ্দ দশ বারো। বনে বনে ঘুরে বেড়াই। কখন প্রজাপতির পিছনে ছুটে বেড়াই কখন বুনো ফুল তুলে খাই। তখনই প্রথম দেখেছিলাম বনফুলের অনির্বচনীয় রূপ। এমন রঙিন অরাজকতা, বিচিত্র ফুলের রকমারি রঙ, একটি রঙের বিচিত্র 'শেড্' আগে বা পরে কোথাও দেখিনি। সে বিগত দিনের সুর আর ফিরিয়ে আনা যায় না; আজ আমরা কলের মানুষ, একই ছাঁচে ঢালা, একই মাপে গড়া—আর মানুষ নও, যান্ত্রিক মাণবক। হৃদয়হীন, বিবেক বর্জিত চিন্তা লেশশূন্য—অবিচ্ছিন্ন গড্ডালিকা। আগরতলার সেই আরণ্যক আর্কেডিয়ার জীবন ঠিক বোঝানো যায় না, ওটা অনুভবের জিনিষ। ছোট্ট বয়সে আমি কি ভাবতে পারতুম? কে যেন আমাকে ভাবিয়ে দিতেন সে এক অপূর্ব উদ্গতি—মন যেন দেহ ছেড়ে অনেক অনেক উঁচুতে—তারা-ছোঁয়া শূন্যে উঠে যেত। নিসর্গ শোভার সঙ্গে একটা বিরল দৈবত স্পর্শ ওতপ্রোত মিশে আমার সমগ্র চৈতন্যকে গভীর ভাবে নাড়া দিত। বন্ধুদের প্রীতির মাধুর্য তাতেই যেন লুকোনো ছিল। সে আবেগের কথা নয়। দিল্লীতে বনফুল—আমাকে কেমন বিমনা করে তুলল।

দিল্লীতে বনফুল কিন্তু অভাবনীয়।

শিউলি, টগর, জুঁই, বেল, চাঁপা, কামিনীর দিল্লীতে ঠাঁই নেই; দিল্লীতে ওরাই বনফুল। রাজধানীর পথে ঘাটে পার্কে রাজকীয় উদ্যানের আনাচে কানাচে কচিৎ কদাচিৎ তাদের দেখা মিলতে পারে। আজ আবার কোথা থেকে দিল্লীতে বনফুল এল? মনের মধ্যে ব্যথার মোচড় অনুভব করলাম। না, দিল্লীতে সত্যিই বনফুলের স্থান নেই। দিল্লীর বেল জুঁই বোধ হয় মনে মনে আমার গিন্নীর মতো প্রার্থনা করে : ঠাকুর, আসচে জন্মে যেন বড়লোকের বৌ হই। দিল্লীর বেল জুঁই আসচে জন্মে ডালিয়া জিনিয়া ফ্লকস্, হোলিহকস্ হয়ে জন্মাতে চায়। গন্ধবিহীন বিদেশী রূপসী ফুলে দিল্লী আজ ফুলময়। বিদেশী ফুলের সমাজে দেশী নেটিভ ফুল কল্কে পায় না।

স্মৃতির অতলে ডুবে গেলুম। প্রায় বালক বয়সেই পারিবারিক ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখিয়েছি। তখন সবে দুঃসহ আঠার বছরে পা দিয়েছি। হঠাৎ হুকুম হল জনপাঁচেক পলাতক বিপ্লবীকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে হবে। সকাল দশটায় রওনা হয়ে পাহাড় ভেঙে চলেছি ত চলেছিই। সকলের সঙ্গেই রিভলবার আছে, সন্তর্পনে চলছি। অনেক দূরে যেতে হবে। মাইল দশেক চলার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলুম

আমরা পথ ভুল করেছি। কে যেন মনের মধ্যে বলে যেতে লাগল এ পথে গেলে বিপদ হবে। আমরা নতুন পথ ধরলাম। বয়সে আমিই সবচেয়ে ছোট। ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। সে কথা সহকর্মীদের বলা যায় না। সংকোচ লজ্জা তা একই সঙ্গে টুঁটি চেপে ধরেছে। বিপ্লবী হটে যাবে, সে কখনও হয়না। ছাতি শুকিয়ে এসেছে, কী করব ভাবছি। আমাদের দলে যিনি প্রবীন তিনি বললেন, চলো একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। তাঁর কথায় দম ফিরে পেলাম। একটা বনফুল তুলে চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেকের বেশী নয়। স্বপ্নে কে যেন আমাকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল খাইয়ে দিল। জেগে উঠে দেখি আমার কোন ক্লান্তি শ্রান্তি নেই—আমি যেন আর এক নতুন মানুষ। সেও বনফুল এও, বনফুল!

পরের দিন সন্ধ্যায় মোতিবাগে নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলাম। চৈত্র মাস, দিল্লীতে তখনও জেঁকে ঘর্ম পড়েনি। ছাতের ওপর আমরা জড় হয়েছি। সাহিত্যিক 'বনফুল'—শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়কে আগে কখনও দেখিনি। উপন্যাস, গল্প, কবিতা কিছু কিছু পড়েছি। এও শুনেছি তিনি ডাক্তার, ভাগলপুরে থাকেন—প্রবাসী বাঙালী। এমনিতেই প্রবাসী বাঙালীর ওপর বাঙালীর টান একটু বেশী। তার ওপর আমার দিদিও ভাগলপুরে অনেকদিন ছিলেন; তাঁর কাছে বনফুলের অনেক গল্প শুনেছি। তাঁকে দেখবো, তাঁর গলার স্বর শুনবো—মনে খুবই আগ্রহ। দেখলাম, দেখে মনে হল সাম্প্রতিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে তিনি যেন এগোতে পারছেন না। এযুগে তিনি যেন বেখাপ্পা, বেমানান। চার দিকে অর্থ লোলুপ সমাজ, চোর-জুয়াচোর—বিলাস ও ব্যাভিচারে ভরা—আজকের দিল্লী আর ভারতবর্ষ। ঈপ্সিত লাভের স্বাধীনতা দীর্ঘ পনেরব ছর পরেও ভারতের আর্থিক ও আত্মিক চেহারায় নতুন মূল্যমান আনেনি।

'বনফুল' গোটা দুই কবিতা ও গল্প পড়ে শোনালেন। তাতে পুরোন কথাই নতুন করে আবৃত্তি করলেন। বললেন, দুর্নীতি আর মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পড়ার শেষে আলোচনা শুরু হল। সভার মধ্যে কে একজন বললেন: আপনারা সবাই যদি বক্তৃতা দেন, উপদেশ দেন ভালো হতে আর ভালো করতে—তবে আমরা যারা সাধারণ তারা দাঁড়াই কোথা? মন্ত্রী থেকে মিনিষ্টার সবাই আজ সবাক, শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজানো যায়?

আমি বললাম, পুরনো যুগ শেষ হয়েছে কিন্তু নতুন যুগের নতুন মূল্যমান আপনারা কেন উপস্থাপিত করছেন না? চিরায়ত সাহিত্যের সার্থক বাণী আপনাদের লেখায় নতুন অর্থে নতুন সংকল্পে কেন ফুটে উঠছে না? আগের চেয়ে আজকের সফল সাহিত্যিকরা ঢের বেশী সম্পন্ন। তাঁরাও কি ঠিক পথে চলছেন? মনে হয় আজকের লেখকও সিনেমার রূপালি পর্দার দিকে চোখ রেখে সাহিত্য রচনা করছেন। পাঠকের রুচি গড়তে হলে, তার মানসিক পুনর্বাসন করতে হলে লেখকের নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। তা তাঁরা নিচ্ছেন কৈ? আজকে সিনেমা ও তারকার যুগ। সাহিত্যিক কেমন যেন পিছিয়ে পড়ছেন।

মনে পড়ছে, সরকার সেউলী ক্যাম্প থেকে পাবনার বেলকুচিতে আমায় অন্তরায়িত করলেন। পুলিশের দারোগা ভালোমানুষ। বাড়িতে আমায় নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। তাঁর মেয়ের বয়স বারো কি তের, মেয়ের পরনের শাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—এ শাড়ীর নাম কি বলুন ত? বললুম—জানিনে। তিনিই বলে দিলেন খাণ্ডাওলা শাড়ী। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

দিল্লী শহর নয়, গ্রামও নয়—শহরতলী। মতান্তরে পাঞ্জাবী উপনিবেশ। যুগের উতল হাওয়া পাঞ্জাবীদেরই হাওয়া। এখানে বনফুলের বোটানি আর সাহিত্যিক বনফুলের সহ-অবস্থান

সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের নতুন ভোরে এগিয়ে যাবার পথ দেখতে পাইনে বলেই, অতীতে পিছিয়ে যেতে হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মিলে যাচ্ছি। ছোটো নৌকো। নানা লোকে ভরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন 'ফুলদোমে' চলেছে। হিটলারের তখন পড়তা। প্রাকৃত সাধারণ হিটলা'কে নিয়ে সকাল বিকেল আওগুবি গল্প ফাঁদে। নৌকোর জোর-গলায় সেই আলোচনাই হচ্ছিল। তেমন একজন আমাকে বললে: "বাবু ভাইনারা তো কিছুই চা'য় না; হিটলার খালি ইংরাজরে বোইলা দিছে আমি ভারতবর্ষ আর দিল্লীখান চাই।" আমি একটু থতমত খেলাম; তার বক্তব্যের ধার ভালই লাগল। মুচকি হেসে বললাম: "মিঞা, ভারতবর্ষখান আর দিল্লীখান কি ভিন্ন স্থান?" উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের সাম্প্রতিক দিল্লী সম্পর্কে আমার হতাশা দেখলে সেই-ই সেদিনের আমার মতো মুচকি হাসত।

স্বাধীনতার পনের বছর পরেও দিল্লীকে ভারতের রাজধানী বলে মেনে নিতে বুদ্ধি ও বোধিতে বাধে। দিল্লী ভারতের নয়, ভারতীয় নয়—কেমন এক আজব দেশ। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও জ্ঞানগরিমা দিল্লীর অনাবৃত প্রবমান কটাহে—তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে। নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—এমন কি দিল্লী honest উর্বশীও নয়। যা-কিছু সুন্দর, শুভ, জীবনপ্রদ—দিল্লীর রিক্ত প্রাঙ্গনে তার অঙ্কুর এখনও দেখা দেয়নি।

বনফুল দেবতার পায়ে, প্রিয়ের হাতে দেবার জন্য। দিল্লীতে সে বনফুলের ঠাঁই নেই।

বিষণ্ণ শীতের ঋতু

ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই

বিষণ্ণ শীতের ঋতু নিরুত্তাপ হৃদয়ের মর্মভেদী হতাশা বাড়িয়ে
মরশুমী ফুলের অলঙ্কারে সেজে সুন্দরীর মত চেয়ে থাকে।
অধৈর্যে বিক্ষত মন যেন কোন বালির পাহাড়ে শেষ বাসা বেঁধেছিল

তাও ভেসে গেছে কবে হেমন্তের অকাল প্লাবনে;
সর্বস্ব হারিয়ে আমি অবোধ শিশুর মত ক্ষীণ অভিঘাতে
নিবিড় নির্জনতাকে ভেঙে ফেলি ক্রন্দনে চীৎকারে।

বিগত আশ্বিনে আমি যাকে ভালোবাসবো ব'লে বেরিয়েছি পথে

তার দেখা পাইনি আজও; ওষ্ঠ কাঁপে সর্বঅঙ্গ কেঁপে কেঁপে ওঠে;

ক্লান্তি ও শীতের মধ্যে নিতান্ত নির্বোধ ব'লে তাই
হেঁটে ফিরি গান গেয়ে কোন ফিরিওয়ালার মত।
যারা এই পথে আগে ফিরি ক'রে চলে গেছে তাদের হৃদয়,
তারা আর ফিরবে না এই পথে ঘনশ্যাম তৃণকে মাড়িয়ে...
সমস্ত প্রশ্নের শেষ— সমস্ত সন্দেহগুলি ক্ষয় হয়ে গেলে
মনে হয় আমাকেও আরও দূর যেতে হবে দুর্জয় বিলাসে,
আগামী বসন্তে প্রাণে উত্তাপেরা জন্ম নেবে ঘনিষ্ঠ আশ্লেষে
সেই আশা আমাদের জীর্ণতম চতুর্দোলা চড়ে।

সন্ত্রাস

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পাহারা দেবার ছলে কতকাল জেগে থাকব, আর
এই রৌদ্র শস্যক্ষেত্র গ্রীষ্ম বনভূমি
পর্যবেক্ষণের দিকে তাকাতে পারি না,
তোমার বাহিরে বড় নির্মম সোপান।

অথচ আমার দিকে প্রধান প্রহরী রেখে যাব
খুলে দেব, তার কোনো সম্ভার ছিল না,
আমি যে তোমার মধ্যে প্রথম হবার নিমন্ত্রণে
ক্ষিপ্ত হবো, তারও কোনো বৈরাগ্য দিলে না।

কতকাল জেগে থেকে নিদ্রিতের আলস্য পোহাই,
ক্রমশ কোথায় যেন নিভৃত সন্ত্রাসে
তোলপাড় শুরু হয়, অনেকেই কুড়িয়ে নিয়েছে
অথচ আমাকে শুধু নিদ্রাময় টেবিল দিয়েছ।

রেখারিক্ত

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃৎপিণ্ড জাগায়ে রাখে সারাদিনমান—
দুঃস্বপ্ন জাগায়ে রাখে রাতে।
সারাদেহভরা তীক্ষ্ণ সহস্র প্রোথিত
লক্ষ তারকার অন্তর্ধান
লিখে রাখে, এক লক্ষ বকুল ঝরার অন্তর্ঘাতে
ভোর হয়ে রয়।

কেঁপে ওঠে পদধ্বনি, অন্তহীন বিদায় নিশান
বেলুনের মতো চলে উড়ে,
পিছনে পিছনে চলে আবেগার্দ্র নিশ্চল নয়ান—
পিছনে পিছনে চলে প্রগল্‌ভ স্নায়ুর অভিমান—

অয়ি বররুচি রমণীর
হে প্রিয়দর্শিনী তীব্র ঠোঁটের আহ্লাদে
নাভিমূলাবধি মোরে তীব্র স্নেহে নিয়েছিলি শুষে।
সে কথা কি মনে পড়ে? সে কথা কারই বা মনে রয়।
হে প্রিয়দর্শিনী তোর দশনভূষাতে
সকল শোণিত মোর ধন্য হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়।
অপিচ বিকল্পে তার রসাত্মক সুখোষ্ণ কণুষে
পেতে দিলি অনন্ত শয়ান।
হে প্রিয়দর্শিনী তোর যামিনীজাগর আঁখিপাতে
আমার ঘরের তলে একদিন ঘটেছে প্রলয়—
আমার হৃদয়তলে একদিন ঘটেছে প্রলয়—

সাতশ যোজন দীর্ঘ দেবদারুবীথিকা গেছে পুড়ে।
সাতশ যোজন দিগলয়
বেদাক্ত পিঙ্গল।
শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ছাই উড়ে যায়, শুধু অবিরল
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আর পুঞ্জ পুঞ্জ দর্ভাগ্র অতীত
উড়ে যায়, শুধু রেখাহারা যত দৃশ্য সব দ্রুত পবমান,
শুধু রেখারিক্ত এক তাবচ্ছবি—নিহতসংবিৎ—
অপাব্রয়মান।
আর আমার অকৃতস্থ নিশ্চল দেয়ালচক্র জুড়ে
পদধ্বনি বেজে যায় সারাদিনমান—
কণ্ঠস্বর জেগে রয় রাতে।

মনোরমা শুধু নাম

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চোর-ধরা মস্ত সাহসের কথা, আমাকে শিরোপা দেবে সেই
মনোরমা,
দেবে সে অনেক কিছু ফরমায়েসের সুখ...চৌকিদার রোগা
ডিগডিগে
ভীষণ হাঁপায়, থাকে জোড় হাতে—
আমি ভিজিলেন্স পার্টির নেতা বলে
প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধানত দৃষ্টি ছিল, ভারী বর্শা, লাঠি, টাঙ্গি
ইত্যাদি ইত্যাদি
আমাদের সঙ্গে থাকে—টর্চের সুতীক্ষ্ণ আলো অন্ধকার
ছিন্ন করে দিলে
সিনেমার তারকার চেয়েও সুন্দর মুখ ব্যক্ত হয়ে যায়,
তেমনি সব অন্ধকার ছিন্ন করি···
মনোরমা প্রিয়তমা ছিল সে কি মনে, শুধু মনে
ও কি তীক্ষ্ণ বাঁশি শুনে চমকে ওঠে নি ক' শেষরাতে
যখন চোরের জন্যে ঘুরছি আমি, হাতে সেই ইঁদুরের খাঁচা,
লাফাই বেয়াল হয়ে, খাপদ হুকার
নিত্যনিয়মিত রাখি নিজের গলায়; আমরা আদাড়েবাদাড়ে
ঝোপঝাড়ে লাঠি মারি, লাঠি ঠুকে চলি নিরলস,
যেন মনোরমাকেই আগলিয়ে রেখেছি
সমস্ত যৌবন জুড়ে উৎসুক পাহারা····
পদচ্যুত আমি আজ, চোর ধরা হয় নি সম্ভব—
মনোরমা শুধুমাত্র নাম এক ভাবাবেগহীন।

মুখোশটা খুলে রাখ

দর্শন সেন

এসো মিতা, চলে এসো, একটুকু প্রাণ খুলে হাসি।
বুদ্ধির দান চেলে চালিয়াতী কবিনামে কয়েদী-জীবন
ক্লান্তি ভীষণ তাই মনে প্রাণে খুঁজছি এখন
ঝিঁঝি-বিঝি লতাপাতা, পাখী ডাক, রাখালিয়া বাঁশী।

মুখোশটা খুলে রাখ, খানিকটা দম নিয়ে নাও।
ধোকা দিতে পারবে না, মহাকাল সাংঘাতিক 'স্পাই'।
নকল গাম্ভীর্যটাকে তাই এতো সাজিয়েও কোন লাভ নাই।
শুধু 'রাখ ঢাকো' ভাব, এই বুঝি ধরা পড়ে যাও।
সে তো জানো অন্তরে, যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ নখরে

এ-কালের বিবেকের গায়
কি হিংস্র ভীষণ আঁচড়ায়।
প্রাণ খুলে কাঁদতেও তবু কেন এতো লজ্জা করে।

না না মিতা, চলে এসো, আজীবন এ মুখোশ পরে
জীবন্মৃতের মত বাঁচবোনা, বাঁচবোনা মৃত মানুষরে।
বরং হৃদয়ে ডুবি—যে হৃদয়ে সহজের সুর
চলো খুঁজে ফিরি মাঠ বন, নদনদী, ভাটিয়ালী গানের দুপুর।

জাপানী আড্ডা

আল মাহমুদ

নির্ভয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন যদি করা যেতো তবে
বলতাম, হে ঈশ্বর, আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে
যে বৃদ্ধ জাপানী থাকে এদিকের বন্দর তল্লাটে
মহান সুনাম তার, সমুদ্রের কেচ্ছার গৌরবে
বাজার বিজয়ী ব্যক্তি। সদাহাস্য রঙিন পোশাকে
নোগুচির মতো লাগে ; মদমাংসে সমান তাপস।
তরুণতিমির মতো সাগরের এ উচ্ছলতাকে
কি রূপে আয়ত্ত হলো, নেই যার তেমন বয়স ?

ছুটিবারে আসে তার সমুদ্রের বান্ধবেরা সব
বুড়ো নাবিকের দল, মথা ভর্তি খাটো পাকা চুল
রেলিংয়ের কাছে বসে ক'টা তৃপ্ত সমুদ্র পাথর
বানিজ্যের গল্প করে, যেনো স্প্রীংয়ে নিপ্পনী পুতুল
দম পেয়ে করে যায় আজেবাজে মিষ্টি কলরব
জাহাজী ভাষায় আঁকে এশিয়ার বিচিত্র ভূগোল।

গান করো, গান শুনি

অম্বুজ বসু

গান করো, গান শুনি। সারাদিন একলা শুয়ে
ওষুধের শিশি গুণছি। মনটাও ওষুধের মতো
তিতো তিতো হয়ে গেল। রোগীর শুশ্রূষা যদি তোমাদের ব্রত
হয় তবে কাছে এসো, শিয়রে একটু খানি নুয়ে
কপালে হাতটা রাখো, গান গাও। বহুদিন হলো
শুনিনি তোমার গান—আজকের মেঘলা দিনটাকে
বিবর্ণ পাণ্ডুর লাগে, বৃষ্টি নেই, রোদ ও নেই আকাশের বাঁকে,
শরীরের আমেজ নেই, বাতাসটা বিশ্রী ঘোলো ঘোলো।

সেদিন বর্ষণ ছিল যেদিন তোমার ঘরে গিয়ে
প্রথম গান শুনি ; বুঝি মৃদঙ্গ সঙ্গত ছিল সাথে।
আশ্চর্য উত্তাল রাত—কে আমার আত্মাকে ছিনিয়ে
রিক্সার ঠুনঠুন শব্দে কোলকাতার গলিতে গলিতে মাঝরাতে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। ঘুরে ঘুরে ফিরেছি কখন
মনে নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে সে রাতের মন।

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জোয়ার

উপন্যাস

গতবারের পর

বিজন কুমার ঘোষ

॥ দুই ॥

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আলোকের। মনে পড়ল, আজ রবিবার। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এই ঘরে ঘুমুলে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। কেন না, এই ঘরে প্রচুর জানালা, জানালায় কাচ। যেন জানালা দিয়েই ঘরখানা তৈরী হয়েছে। সূর্যের আলো দেবদারু শিরীষের ফাঁক দিয়ে এই ঘরে প্রথমে উঁকি দেয়। আজ রবিবার—আলোক মনে মনে উচ্চারণ করল। অনেক ভেবে চিন্তে এই ঘর বাবা তৈরী করেছেন। এই বাড়ি, ওই বাগান, শান বাঁধান পুকুর ঘাট—সবই বাবার। এই সুন্দর বাড়ীতে বাবা মাত্র দু'বছর ছিলেন। রায় বাড়ির ওপর ভগবানের কি আক্রোশ। আমি সেই রায় বাড়ির ছেলে। আমার ওপরেও সমান আক্রোশ। ভাবতে ভাবতে আলোক নিজেকে জড়িয়ে ধরল প্রবল বেগে। যেন নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা। প্রথম সূর্যের আলোয়, এপ্রিলের ভোরে, গাছপালার নির্জনতায় নিজেকে সেইরকমই অভাবনীয় কিছু মনে হয়।

আর বিছানায় থাকা গেল না। উঠে পড়ল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে দেখতে পেল মা আহ্নিকে বসেছেন। কথা বলল না। বাথরুমে টিউবওয়েলের হাতলে হাত রাখতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল সে একটা জড় মাংস পিণ্ড। একটুও শক্তি নেই। ফলে বৃথাই হাতল টিপল এতক্ষণ, জল এক ফোঁটাও বেরুল না। শেষে বিরক্ত হয়ে পুকুর ঘাটে এসে বসল। ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে মিষ্টি। পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। নারকেল গাছের পাতায় শন্ শন্ আওয়াজ। হালতুর সমস্ত পাখি এসে চারবিঘা জমিতে বাসা বেঁধেছে। তাদের মিলিত কিচির মিচির শব্দ পল্লব কাঁপিয়ে আকাশে উঠছে। আলোক দেখতে পেল কলাগাছের ঝাড়ের পেছনে সূর্যটা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেল। তাকিয়ে দেখল মা। এই দিকেই আসছেন।

—কিরে, চুপ করে বসে আছিস যে?

—এমনি।

—শরীরটা ভাল নেই?

—আছে।

—তুই কেয়াকে নিমন্ত্রণ করবি বলেছিলি আজ, আমি কিন্তু সব জোগাড় করে রেখেছি।

—কেয়া আসবে না।

—কেন?

—আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।

—নিমন্ত্রণ করে বারণ করলে অভদ্রতা হয় যে রে?

—হোক্‌গে। ওকে আমাদের বাড়িতে আনতে পারব না।

—কেন রে? কেয়া তো খুব ভাল মেয়ে। গত বছর আলাপ হয়েছিল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম পর্যন্ত করল।

—আর তাতেই তুমি গলে গেলে। না মা, ওসব শহুরে মেয়ে আমাদের হালতুতে আসুক, এ আমি চাই না।

'শহুরে' এই কথাটায় পুলকিত হলেন পূর্ণশশী দেবী। আলোক যেন অজান্তে তাঁকেও কেয়ার দলে ফেলে দিচ্ছে। বললেন, শহরে তো তুই বারো আনা সময় কাটাস।

—হলেই বা। সেটা তো প্রয়োজনে।

—দেখিস, ওই চার আনা সখও একদিন শহর দখল করবে।

—[illegible] মনে হয় তত্তই……।

পাগল! পূর্ণশশী দেবী হাসলেন! বললেন কেয়া আজ [illegible] পাড়াতেই থাকত।

—ও [illegible] নিন্দে করত।

—আমি নিন্দে কম করি?

কিন্তু উত্তর দিল না আলোক। পূর্ণশশী দেবী বুঝলেন, এ [illegible] রক্তের ধারা। কম কথা বলা ওদের স্বভাব। আর জীব বিশেষের মত গোঁ। বুঝলেন, আজ রবিবার হালটু ছেড়ে এক পা-ও নড়বে না। সারা দুপুর বনে জঙ্গলে বাচ্চা ছেলের মত ঘুরে বেড়াবে। বন্ধ হবে [illegible] আজ। তখন গা' থেকে সত্যিই তার বিশ্রী গন্ধ বেরুতে থাকবে। পূর্ণশশী দেবী আকাশে সময় বুঝে গৃহকর্মের সঙ্গে দ্রুত পা' [illegible]।

আলোক অলসভঙ্গীতে বসেই রইল। সূর্য সুযোগ পেয়ে বেশ অনেক খানি উঠে এসেছে। জলের ওপর সাঁতার কাটছে। নিতাই এল এইসময় চা ও খাবার নিয়ে। তাকিয়ে দেখল কেক, আর কিছু হালুয়া। কেক খেতে ইচ্ছে করল না। পুকুরের জলে মুখ ধুতে গেল। চোখে মুখে ঘাড়ে গলায় ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিতেই গত রাত্রে ঘুমের মধ্যে যে শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, তা যেন ফের ফিরে পেল। [illegible] কাছ দিয়ে রুপালি পেট দেখিয়ে এক ঝাঁক পুঁটি মাছ গভীর জলের দিকে চলে গেল। চা, হালুয়া, খাবার পর শরীরে আর এক পশলা শক্তি ভর করল। বেশ বুঝতে পারছে আলোক: শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে সকালের হালকা বাতাসের মত। হঠাৎ কিছু একটা করতে ইচ্ছে হল। নিতাইকে ডাক দিয়ে নিড়ানিটা চেয়ে নিল। পূর্ব দিকে বেড়ার গায়ে ফুলগাছ লাগানো হয়েছে রকমের রকমের।

পুকুরের পার দিয়ে সেই দিকে গেল। পরশুদিনের ঝড়ে [illegible] ডালটা নুয়ে পড়েছে একধারে। ডালটা ঠিক করে দিল আলোক। গোবরমিশানো [illegible] থেকে তিনটে সবুজ পাতা বেরিয়েছে। [illegible] বিস্ময়ে লক্ষ্য করল। ওদিকে রজনীগন্ধার সবুজ শিষগুলি [illegible] দুলছে। আলোক হঠাৎ একটি শিষ [illegible] হেলিয়ে তপ্ত মুখের ওপর [illegible], ঠোঁটের ওপর। কেয়া [illegible] করে রেখেছিলেন। কিন্তু আলোক [illegible] এই [illegible] মধ্যে এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ও এসে [illegible] অথচ আলোক কেয়াকে ভালবাসে [illegible] খানিকক্ষণ [illegible] একবার মাত্র [illegible] অবগাহনের মত কেয়া এসেছিল [illegible] ওই সময়টুকুর মধ্যে [illegible] বিরাক্ত [illegible] পেয়েছিল [illegible] ঠোঁটে [illegible] চোখের [illegible] লক্ষ্য করে [illegible] ছিল আলোক। তারপর আর কখনো [illegible] নিস্তব্ধতার [illegible] কেয়া [illegible] এসেছিল [illegible] আলোকের [illegible] [illegible] ওপর [illegible] শিষটিকে [illegible] [illegible] [illegible] পৃথিবীর [illegible] এ [illegible] [illegible] কাছে [illegible] [illegible] যদি থাকেও, [illegible] [illegible] এমন কোন [illegible] [illegible] হয়, কিম্বা গাছের ডালে [illegible] কোন প্রাণী [illegible] গলা জড়িয়ে ধরে। আর একজনের কাছে বনবাসী নকল

রোদের বাইরে পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে কি না জানা। [illegible] থাকলেও তা বনমালী নস্কর রোডের মতই ছায়া [illegible] বিস্তার [illegible] হাতছানি দেয়। তাকে বিদায় দিতে [illegible] বাসিন্দিকেও ভালবাসে — [illegible] নিচে [illegible] কেমন [illegible] হয় [illegible] দিনে [illegible] সেইখানে [illegible] সেই [illegible] সমস্ত [illegible] উত্তাপ, [illegible] ফেলতে ইচ্ছে হয়।

রোদ তেতে উঠেছে এইবার। গাছের [illegible] [illegible] উত্তর পারে [illegible] গাছের [illegible] দেখতে পেল দুটি [illegible] পাখি। [illegible] ভারী [illegible] ওদের [illegible] যা [illegible] কি [illegible] ডুমুরের [illegible] তৈরী সবুজ [illegible] একটু একটু হাওয়ায় [illegible] তিনটে [illegible] গায়ে এখনো [illegible] [illegible] ভয়ে [illegible] হয়ে গেল। [illegible] হাত দিয়ে তুলে নিল। কি নরম! যেন [illegible] তিনটে [illegible] করছে। [illegible] কাছে [illegible] অতিথি। [illegible] [illegible] আলোক [illegible] কেউ [illegible] [illegible] না [illegible] থাকে [illegible] তাহলে [illegible] [illegible] পড়ে, [illegible] প্রতিবেশীর [illegible] নতুন [illegible] সেই [illegible] [illegible] একদিন। [illegible]

[illegible] পৃথিবীতে প্রচুর [illegible] আছে, সেইজন্যে [illegible] সব মানুষের [illegible] [illegible] অবিরত। কিন্তু [illegible] [illegible] স্বীকার [illegible] পৃথিবীতে [illegible] এসেছিলেন একদিন; [illegible] কিছুদিনের [illegible] পৃথিবীটা [illegible] [illegible] সকালে [illegible] [illegible] চমকে [illegible] পৃথিবীতে [illegible] — এই [illegible] চিন্তায় [illegible] পৃথিবী [illegible] — এটা বিষাক্ত চিন্তা। [illegible] মানুষ এসে অনেক উপকার করেছে [illegible] [illegible] আমাদের চোখ [illegible] [illegible] ভালবাসে। [illegible] এসে [illegible] করবে — এই [illegible] [illegible] সেকি! [illegible] ওই সব [illegible] মানুষেরা এসে পৃথিবীকে [illegible] তাহলে [illegible] তিনটে [illegible] প্রতিজ্ঞা [illegible] [illegible] দেবো না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নতুন [illegible] [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাচ্ছে। [illegible]

মমতায় শিমূলতুলোগুলোকে পাতার বাসায় রেখে দিল। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখল দুটি শালিখ পাখি, ওদের মা-বাবা : আলোককে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। পৃথিবীর এই সব স্নিগ্ধ মা-বাবার চোখের সামনে কি করে নোংরা চিন্তা প্রশ্রয় দিতে পারে, ভেবে দুঃখিত হল আলোক। আর কখনো শ্মশানে যাবার কথা তুলবে না, প্রতিজ্ঞা করল।

রোদের উত্তাপ বাড়ছে। সুরেলা দেওয়াল ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ কানে ভেসে এল। গুনল। এগারোটা। ছুটির দিনে এগারোটা বেলা কিছুই না। আরো কিছুক্ষণ বাগানে কাটানো যাবে বেশ। এই সময় সূর্যটা এক খণ্ড বড় কালো মেঘে চাপা পড়ে গেল। খুশি হল আলোক। এই রকম মৃদু আলোর মধ্যে গাছপালার রং আরো সবুজ হয়ে যায়। মেঘের তলে চাপা পড়ার দরুণ তাপটা তত লাগছে না। তাছাড়া হাওয়া উঠল জোর। গাছপালার মধ্যে কি রকম শন শন আওয়াজ উঠছে। কলমী লতাগুলি স্রোতের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা খালি রিকশা চলে গেল বালিগঞ্জের দিকে। বাগান জুড়ে নানান রকমের গন্ধ মিশে অদ্ভুত করে তুলেছে জায়গাটা। ফজলী আমগুলি বেশ বড় শক্ত হয়েছে। পাকতে এখনো ঢের দেরী। পাশাপাশি দুটো লিচু গাছ। মাথার ওপর একটা ছেঁড়া জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল আলোক কিছুদিন আগে। তার নিচে আধ পাকা লিচু। এখনো পুরো লাল হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই বাদুড়ের উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। আলোক ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা খালি টিন আর কিছু শক্ত দড়ি নিয়ে এল। টিনের উল্টো দিকে সরু ফুটো করে তার মধ্যে একটা কাঠ সুতো দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দিল। তারপর পরণের লুঙ্গিখানায় মালকোচা দিয়ে সেটাকে নিয়ে গাছের ওপর উঠতে লাগল। ততক্ষণে নিতাই এসে গেছে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল পাগলা দাদাবাবুর কাণ্ড। মিনিট তিনেক পরেই লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ল।

—এই ভাবে রোজ রাত্তিরবেলায় টানবি, বুঝলি?

মাথা কাৎ করল নিতাই।

—দেখছিস না, বাদুড়ে খেয়ে আঁটি ফেলেছে—

নিতাই দেখতে লাগল গাছের নিচে আধখাওয়া লিচু। হঠাৎ নিতাই পুকুরের দিকে তাকাল। গতকাল বিকেলে ডুব দিতে গিয়ে একটা বড় মাছ ঘাই মেরেছিল পায়ে। অনেক মাছ হয়েছে। বলে উঠল, দাদাবাবু জালটা নিয়ে আসি?

—যা নিয়ে আয়

গতমাসে একটা খ্যাপলা জাল কিনেছিল আলোক ক্যানিং স্ট্রীট থেকে। সেটাকে গাবের জলে ভিজিয়ে কালো কুচকুচে করে পাকানো হয়েছে। সম্মতি পেতেই নিতাই নাচতে নাচতে ছুটে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জালটা নিয়ে ফিরে এল, আর এক হাতে খালই।

আলোক বলল, দাঁড়া, খ্যাপলটা আমি ফেলব। এই বলে জালটা পাকা জেলের মত দুই হাতে জড়িয়ে পুকুরের পূর্বদিকে চলে গেল। হাঁটুজলে সন্তর্পণে নেমে সেটা ছুঁড়ে দিল। ঠিক গোল ভাবে পড়ল না। অনেকটা ভারতবর্ষের পুরোন ম্যাপের মত চেহারা। তবু জালে টান হল। জালটা টানতে টানতে নিতাই এর সঙ্গে চোখাচোখি হল। হাসল। নিতাই ভাবল, ছুটির দিনে পাগলা দাদাবাবুর চেহারা কি রকম হয়ে যায়! রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে বর্ণ হয়ে গেছে। চুলগুলি উসকো খুসকো। আবার জাল টানছে, ঠিক যেন জেলের ছেলে। আবার কালকেই অন্যরকম রূপ দেখতে পাবে। কথা খুব কম বলবে। যেটুকু বলবে, খুব ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। চুল আঁচড়াবে প্রায় আধ ঘণ্টা টাইম লাগবে। একেক দিন একেক রকমের স্যুট। কত বাহারের নেকটাই। মাধবীলতার

পেট দিয়ে যখন রিকশায় উঠে বসবে, তখন আর চেনাই যাবে না। কাছে যেতে ভয় করবে। একটা কথা দু'বার জিজ্ঞাসা করলেই ইংরাজীতে ধমক দিয়ে উঠবে। অথচ অফিস ফেরৎ সন্ধ্যে বেলায় তাঁর আর এক রূপ। বিকেলে আলো থাকলে ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে আমতলায় মাদুর পেতে শুয়ে পড়বে। নিতাই চা করে আনলে মুখে রুচবে না পাগলা বাবুর। রায়গঞ্জের বাজারের কাছে লক্ষ্মুর চায়ের দোকান আছে ভাঙা বিচ্ছিরী আর নোংরা, সেখানে বসে হাঁটুর কাছে লুঙ্গি তুলে মাটির ভাঁড়ে চা খাবে। হাসিও পায়, রাগও ধরে। এমন পাগলাবাবু নিতাই জীবনে দেখেনি।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল আলোক। জালটা ভীষণ ভারী ভারী লাগছে। কাদা বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই একসঙ্গে অনেকগুলি রূপোর পাত ঝিকমিক করে উঠল। নিতাই থালই নিয়ে ছুটে এল। তিনটে বেশ বড় রায়েক, কতগুলি চাঁদা পুঁটি আর গোটা চারেক পোনার বাচ্চা।

—কিরে দেখলি কেমন ধরলাম! তুই পারিস?

খুশি হয়ে মস্তবড় ঘাড় কাৎ করে তড়বড়ে থালইতে মাছগুলি তুলতে লেগে গেছে নিতাই। আঙুল তুলে ঘাটের পাশটা দেখাল, উই হোথা বড় মাছ আছে দাদাবাবু—

—নাঃ, আর ধরবনা। জালটা নিয়ে যা। রাধার মাকে ভাল করে রাঁধতে বলিস বুঝলি, পেঁয়াজ টেঁয়াজ দিয়ে।

ঘাটের উঁচু পৈঠা থেকে ডাইভ দিল জেট প্লেনের মত। খুব নিচুতে নেমে ডুব সাঁতার দিয়ে পুকুরের মাঝখানে ভেসে উঠল। আঃ, কী আরাম! আলোকের মনে হল পৃথিবীতে ওর চাইতে সুখি এখন আর কেউ নেই। নীল আকাশে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। জলের ওপর তার ছায়া। জলের ওপর ছোট ছোট ঢেউ—আলোকের গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে অবিরাম। পুকুরের ধার ঘেঁসে দুই হাত পর পর নারকেল গাছ। এখন বেশ বড় সড় হয়েছে। কচি কচি পাতা। তাদের ঝিলিত ছায়া—তাদের ঝিলিত, শন্ শন্ শব্দ আলোকের মনে বিচিত্র সুরপ্রবাহ সৃষ্টি করল হঠাৎ। বুকটা কেন যেন দুলে উঠল আবেগে। এলোমেলো সাঁতার কাটতে লাগল—একবার এদিকে একবার ওদিকে। রৌদ্র-ঝলকিত অথবা মেঘ বর্ণের গগন থেকে অবিরাম সুরের ঝরণাধারা নেমে আসছে। কত গন্ধের, বর্ণের, স্বাদের সুর একসঙ্গে আলোকের বুকের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। ভিতরটা তোলপাড় করছে—মহাসমুদ্রে প্রবল ঝড়ের মত। কিছুতেই নিজেকে সহ্য করতে পারছে না আলোক। এলোপাথাড়ি সাঁতার দিচ্ছে। একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘাটে ফিরে এল। শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে এখন, বেশ স্নিগ্ধ। ভাবল, আজ এখানে মিনতি এলে বেশ হত। এখানে আসবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও। এই রকম সানাইবাজা ছুটির দুপুরে মিনতির কথা মনে পড়ে। ও এখানে এলে লিচু গাছে টিন বাঁধা দেখে কি বাদুরেরা অথবা হাতের তালুতে শিমূল তুলো দেখে একটুও হাসত না বা নাক সিঁটকোত না। অথবা আলোককে বদ্ধ পাগলও ভাবত না। মিনতি নারকেল গাছে ছাওয়া এই গভীর পুকুরের মতন। স্নিগ্ধতা দিতে জানে, শান্তি দিতে জানে। কখনো ঢেউ তুলতে জানে না। এই বাড়ির গাছপালার সঙ্গে, নির্জনতার সঙ্গে, বনফুলের সঙ্গে, মিনতির এক আশ্চর্য মিল আছে। মাকে গিয়ে বলবে নাকি, মা তোমার বৌ কেয়া হতে পারবে না। রায়-বাড়ির বৌ হবার যোগ্যতা ওর নেই। কিন্তু এই বাড়ির পুকুরের জলের মত স্নিগ্ধ এক মেয়ে আছে। তার নাম মিনতি। তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহলে—নিজের মনে হেসে উঠল। কেউ দেখছে নাকি? সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল। বেলা অনেক হয়েছে। খিদে পেয়েছে দারুণ। তবু জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। বকুল ফুলের গন্ধে ঘাটটা ম-ম করছে। মাথার ওপর কাঠঠোকরা

রোদ্দুর। বেবেরা হিমালয়ের দেশে পৌঁছে গেছে। অহংকারী প্রজাপতিরা উড়াউড়ি করছে বাগানে। হালদুর এই চারদিকে জমিতে ঘুণ ফুটেছে—বহু দূর থেকে রঙীন বালিতে ডুব দেওয়া প্রাণগুলি তার খবর পেয়েছে। হঠাৎ কি রকম যেন কর্ক কর্ক আওয়াজ। তাকিয়ে দেখল আলোক মাথার ওপর দিয়ে বনটিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে টুকটুকে পাকা লঙ্কার মত ঠোঁট নিয়ে। পাঁচিলের কাছে কলাবনের ভিতর সজনে গাছে ভীষণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বসে পড়ল। যেন ওদের অফিস টাইম। যেন ওদেরও লেট হবার ভয়। সবাই আলোকের অতিথি। ঐ টিয়াপাখিগুলি, পাতার বাসার তিনটে শিমূল তুলো, এই রঙীন প্রজাপতিগুলি—সব অতিথি হতে দৌড়ে এসেছে। বাবার ওপর পুনরায় কৃতজ্ঞ হল আলোক। বাবা জানতেন, একদিন এই বাড়ির আলোকিত বাগানে সেরা সেরা সুন্দর, সুন্দর প্রাণগুলি আশ্রয় নেবে,—অতিথি হবে। অথচ মা কেন যে স্টেশন রোডের নির্বোধ কোলাহলের মধ্যে ফিরে যেতে চান, বুঝতে পারে না আলোক।

[illegible]

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দোতলায় উঠে দেখল ঘরটা তাকাদের মতই অগোছালো। মা যে ঘরে এসেছেন বুঝতে পারল বিছানার নতুন চাদর দেখে। কিন্তু সব জানালাগুলিই খোলা ছিল। ফলে হুড়মুড় করে বাতাস ঢুকে দাপাদাপি করেছে সারা সকাল। গেলাসের ঢাকনাটি মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। নতুন ক্যালেণ্ডারটা ছিঁড়ে গেছে এবং বেশীর ভাগ দরকারী কাগজপত্রই জানালার পাশে বাসা করেছে। আলোক বুঝতে পারল অনেক দূর থেকে ঘুম নামক এক প্রকার অদৃশ্য বালাপোষ দিয়ে, কিন্তু বিপুল বিস্তারের মত অবাধ লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। চোখের পাতার ভার আড়িস পাড়তে যাচ্ছে। কিন্তু এমন দিনে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। তাই টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। রবিঠাকুরের কবিতার বই, জীবনানন্দ সেই সঙ্গে কিছু আধুনিক ইংরেজ কবির, আর পাশে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। আলোক [illegible] তাকিয়ে দেখল এখন তাঁর কবিতার মধ্যে [illegible] অনিবার্য ঘুম এড়ান যাবে। [illegible] কয়েক বই তুলল নিয়ে গেল বেতকভাবে যেটা [illegible] চোখে এল [illegible]

[illegible]

[illegible]

দুপুর তখনো [illegible] দরজায় টোকা [illegible]

মুখোমুখি দু'জন। ফিয়ঁসে! চৌরঙ্গীপাড়ার [illegible] অভিজাত রেস্তোরাঁ। এখানে আসতে হলে পাঁচবারি পকেটের নোটগুলি টিপে দেখতে হয় সেগুলি যথাস্থানে আছে কি না। সামনে টেবিলের একদিকে আলোক, অন্য দিকে কেয়া। যেখানে ওরা প্রায়ই আসে। বয়গুলো [illegible] যেন উঠতে বসতে আভূমি সেলাম ঠোকে। টিপস্ পায় মোটা। সন্ধ্যাগুলি বেশ কাটে এখানে। তারার মত একটি দুটি আলো জ্বলে উঠলেই পরিচিত কলকাতা শহরকে সুন্দরী সোনালী মেয়ের মত রহস্যময়ী হয়ে উঠতে দেখা যায়। ওই টেবিলের পাশে বসে আলোক এখানে কেয়া রোজ তা দেখে। ওদের ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে যেন ইশারা করে সুন্দরী সোনালী [illegible] প্রান্তে [illegible] উত্তেজনার সাগরে ঝাঁপ দেবার জন্যে। তাই এই জায়গা চোখে [illegible] এই জায়গার [illegible] চলে। [illegible] বিচিত্র [illegible] [illegible] টেবিলের ওপর কিছু [illegible] ছিল। [illegible] কেয়া বলল, কাল তোমার ওখানে গেছিলাম [illegible] চমকিত হল আলোক, হ্যাঁ।—[illegible] কথাটা যেন বেরিয়ে গেল: ভুলে গিয়েছিলাম। [illegible] কথা বোলো।

—আলোক জানে হাশতুর সীমানার মধ্যে পেলে বিধে কথাটা এমন বন্দুকের কিছুতেই বেরোতে পারত না। কিন্তু এই চায়ের সকেটে সবই সম্ভব।

কাচ ভেঙে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল কেয়া, তুমি হাসালে। এতে আবার ক্ষমা চাইবার কি আছে!

—বাঃ! এটা অভদ্রতা হল না?

—না মোটেই না। ওই জঙ্গলের মধ্যে যেতে হয়নি, আমি বেঁচে গেছি।

—সেটা আমি জানতাম।

—তাহলে জেনেশুনে ভুল কর কেন?

—আর করব না।—একটু ভেবে নিয়ে: তুমি তাহলে accept করলে কেন?

আবার সেই রকম হাসি। এবার গলায় সহানুভূতির সুর, আচ্ছা, তুমি ওখানে থাক কি করে বল তো? একটা মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। খালি বন জঙ্গল। মশা।

—তোমার ভাল লাগে?

—লাগে বলেই তো আছি। গলা খাঁকারি দিল আলোক।

কেয়ার সেইয়া বলতে ইচ্ছে হল কিন্তু আলোকের দিকে তাকিয়ে পারল না। তাজা ঘিয়ের মত রং। চাপা ঠোঁট। তীক্ষ্ণ নাসা। চোখের মণিতে বুদ্ধির দীপ্তি। ব্রাউন কালারের নেকটাই উড়ছে পত পত করে। পিওর বৃটিশ ফার্মের এক্সিকিউটিভ অফিসার। হাজার টাকা মাসে ইনকাম। চোস্ত ইংরেজি বুলি। এমন মানুষকে সেইয়া বলতে বাধে। কেয়ার সাধ্যি নেই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ওখানে তোমাকে একদম মানায় না। তুমি কলকাতায় চলে এসো না, আমাদের এলগিন রোডের প্লটে—

—না।

—আচ্ছা ভাড়া দিয়েই না হয়—

—উঁহু। বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়াই—পড়নি?

—খানিকটা ফুৎ করে হেসে নিল আলোক: আমি বেশ আছি আছি। গিলতে ইচ্ছে না করে ওগো না—

—অমনি রাগ হল বাবুর।

—না, রাগ নয়। তারপর কি মনে করে ডেকে আনলে?

—এমনি। সময়টা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

—কাজের ক্ষতি হয় যে—

—হোক গে।

—তুমি বোধ হয় জান না, অফিস প্রেম করবার জন্যে মাইনে দেয় না।

—মাইনের [illegible]

—তাছাড়া তুমি অফিসে গেলে আমার কেমন যেন লজ্জা করে—।

—লজ্জা! নারীর ভূষণ!

—মানে—তুমি অফিসে গেলে সবাই ফিস-ফিস করে, রায়বাবু [illegible] রাখে।

—[illegible] রায়বাবু [illegible]

—যারা নতুন এসেছে, তাদের [illegible] রায়বাবু বলে। তবে যারা পুরোন, বুড়ো-হাবড়া [illegible] আছে, তারা [illegible]

—আমার রায়বাবুকে ভাল লাগে [illegible]

—[illegible]

আনমনে বলল [illegible] গেছে হাট হয়ে। [illegible] সারি সারি [illegible]

—সুন্দর সুন্দর। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। টেবিলের অন্যদিকে কেয়া। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল আলোক। যেন একটা তাজা গোলাপ। না, আগুনের শিখা। পুড়িয়ে মারবে। তিলে তিলে। তবু কি আশ্চর্য! সব জানে আলোক, কিন্তু তবু লেভেল ক্রসিং পেরোতেই হয়। শুধু কি চাকরীর জন্যে? কেয়ার জন্যেও। কেয়া আলোকের মনের একটি প্রধান অভাব পূরণ করে। যদিও জানে আগুনের শিখা। সব ভস্ম করে দেবে। তবু এক্ষেক সময় পুড়তেও ভাল লাগে।

কেয়া বলল, কি ভাবছ?

সচকিত হয়ে উঠল আলোক। সামলে নিয়ে বলল, জান, কাল অনেকগুলো মাছ ধরলাম আমাদের পুকুরে। জাল দিয়ে—

গোলাপ পাপড়ির মত ঠোঁট বাঁকাল কেয়া, ওসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি কি জেলে নাকি? খালি আজেবাজে সময় নষ্ট। দিন দিন কি হচ্ছ বল তো?

—বিশ্বাস কর, আমারো বলতে ভাল লাগে না।— আলোক একটু হাসল: তবে কি না, যখন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কথা ফুরিয়ে যায়, তখন এই সব বাজে কথা ছাড়া উপায় কি বল?

কেয়া উজ্জ্বল হয়ে একটু যেন এগিয়ে আসে।

—আচ্ছা, কেন বল তো এমনি হয়? আমারো মাঝে মাঝে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোন কথা থাকে না।

—তাই বুঝি আজ অফিসে এসেছিলে?

—হুঁ।—ঘাড় কাৎ করে স্বীকার করল।

আমি কি তোমার ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করে দিতে পারি— মনে মনে বলল আলোক। তুমি কি আমার পার? তুমি তো আমার সামনে বসে আছ, তবু কথা খুঁজে না পেয়ে অবান্তর মাছের গল্প শোনাতে গেলাম কেন? কেয়ার কাছে তার দাম কতটুকু? না, তুমিও পূরণ করতে পার না, আমারও ক্ষমতা নেই। অথচ তুমি অভিজাত এলগিন রোড নিবাসী লীডিং বার-এ্যাট-ল' শ্রীরামবেন্দ্র নাথ মিত্রের মেয়ে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী—খবরের কাগজে যে রকম লেখে—ইত্যাদি। আর আমি? আমারও বংশ মর্যাদা আছে। বৃটিশ কার্বের এক্সিকিউটিভ অফিসার। বিলেত যাওয়ার কথা হচ্ছে। বাইরে থেকে মনে হয় কি মসৃণ ভরাট আমাদের জীবন। অথচ আমাদের দুই জনের মনেই অতি গোপনে শূন্যতা বাসা বেঁধে আছে। আমরা তার হাত থেকে মুক্তি পাই না। আমরা অবিরাম ক্ষতবিক্ষত হই। তাই মাঝে মাঝে মুক্তি পেতে ততোধিক শূন্য কথার ভেলা ভাসাই।

অথচ আশ্চর্য। লেভেল ক্রসিংএর ওধারে আলোকের আরেক জীবন আছে। কেয়া তার খবর রাখে না। সেখানে পাখির গান, জলের শব্দ, বৃক্ষরাজির মর্মরিত ছায়া বাতাসের মতন মুহূর্তে শূন্যস্থান ভরাট করে দেয়। আলোকের কাছে সেই জীবন ক্ষুধার অন্নের মত, তৃষ্ণার জলের মত।

আলোক যখন এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল তখন হঠাৎ কেয়া সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে কতগুলি দুঃখজনক ইংরেজী শব্দ। বয়গুলো তাকাল। অনেক সাহেব মেম এসেছিল। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টিও বাদ গেল না। আলোক রাগত ভাবে বলল, হাউ সিলি!

কেয়া কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হল না।

—বড্ড ভুল হয়ে গেছল। কি বল তো?

—বারে, আমি কি করে জানব।

—কাল আমার জন্মদিন।

—কাল আমার ছুটি।

—তবে তো খুব ভাল। তোমার নেমন্তন্ন রইল।

—জানই তো ছুটির দিনে কোথাও বেরোই না।

—একটা দিন তো শুধু। কি এমন ক্ষতি হবে তোমার?

—তোমারও তো কোন ক্ষতি হবে না। অনেক বন্ধু-বান্ধবীই তো মজুত রয়েছে।

— তা হোক, তোমার আসা চাই। —অনুরাগে গাঢ় শোনাল কেয়ার স্বর : তোমার স্বাদই আলাদা।

স্বাদ! আমার স্বাদ। আলোকের স্বাদ। কেমন তা কে জানে। হয়ত একটু আলাদা ধরণের। হাজার হাজার মানুষের ভিতর সেটুকুই আমার বিশেষত্ব। আমি হারিয়ে যাইনি। আমার বৈশিষ্ট্য। কেমন অহঙ্কারী অহঙ্কারী দেখাল আলোকের মুখখানা।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে বড় ?

—দেখি। আলোক যেন আরেকটু যাচিয়ে দেখতে চায়।

—দেখি না। যেতেই হবে। মুনা তোমার কথা খুব বলছিল। না গেলে রাগ করবে।

আলোক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখল। দেখাদেখি কেয়াও ভুলের বিচি ঘড়িটা দেখল। আটটা। কিছুই হয়নি শহরের। সবে জমজমাট হচ্ছে। তবু টেবিলের পাশে মানুষ নত বসে থাকতে ভাল লাগল না। বলল, চল— ওঠা যাক।

উঠে দাঁড়াল কেয়া। বয় বার বার সেলাম জানাল। বিল পেমেন্ট করে গটমট করে নিচে নেমে এল।—ট্যাক্সি— মরাল-গ্রীবা বাহু তুলে চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে দিল চকিতে। অন্ধকারে আত্মগোপন করল দু জনে পাশাপাশি। ঘন-নিবদ্ধ। অভিজ্ঞ পাঞ্জাবী ড্রাইভার মুচকি হেসে ময়দানের দিকে উধাও করে দিতে চাইল। একটু ইতস্তত করে শেষে আলোটাও নিভিয়ে দিল। এবার ঘন অন্ধকার। কেন না, এই রকম পরিবেশে সাহেবেরা এবং তাদের কিঁয়াসেরা খুশি হয়। ফলে যাবার সময় ন্যায্য ভাড়ার পরেও কিছু বাড়তি মেলে।

কেয়া খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এসেছে।

—রাগ করলে আলোক।

—রাগের কি কারণ হল ?

—চুপ করে রয়েছ যে।

—এমনি।

—আমি একটা কথা বলি ?

—বল।

—রাগ করবে না ?

—না।

—যখন কিরকোতে ছিলুম, তুমি মাছ ধরার গল্প করছিলে তখন আমি তোমাকে গেঁইয়া ভেবেছিলুম।

—সত্যি আমি কি গেঁইয়া ?

—না।—আরো ঘনিষ্ঠ হল, আরো লজ্জিত।

— বিশ্বাস কর, আমি নিজেই জানি না আমার ভিতর কত খানি শহর কতখানি পাড়াগাঁ বাস করছে।

আলোকের দক্ষিণ বাহুমূলে মুখ ঠেকাল কেয়া। আলোক ওর একখানা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, এক মুঠো সুগন্ধ যুঁই ফুলের মত।

—আমার মনের কথাই বলেছ। আমি কোন দিন দেশের বাড়িতে যাইনি। চিরকাল এলগিন রোডের বাড়িতেই মানুষ। তবু বুঝতে পারলাম না 'শহুরে' কি বস্তু। আলোক তুমি কি বুঝেছ ?

— না কেয়া।

— অথচ দেখ, গেঁয়োমিটা ঠিক বুঝতে পারি। আমার পিসিমা জ্যেঠিমা যখন দেশ থেকে আসেন মস্তবড় পানের বাটা নিয়ে কিংবা আমাদের বুড়ি ঝি—ওরা যে ভাবে হাসে কাঁদে কথা বলে, বিশ্বাস কর, আমিও অনেক সময় সেইভাবে হাসি কাঁদি কথা বলি। তবে খুব গোপনে। বুঝতেই পারে না কেউ। বলনা, এই বুঝতে না দেওয়াটাই কি 'শহুরে' ?

অন্ধকারে গম্ভীর হল আলোক। ভাবতে লাগল। চারদিকে গঙ্গার পবিত্র বাতাস- হু-হু। ভীষণ গরমের পর এখন ভীষণ ভাল লাগছে। উইণ্ড স্ক্রীন খোলা। একসঙ্গে প্রচুর বাতাস চুলের মধ্যে কানের মধ্যে—জামার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পথ না পেয়ে কিলবিল করছে। কেয়ার গা

থেকে বিলিতি প্রসাধনের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছে। কে বেশী শহুরে। আমি না কেয়া? কে বেশী গেঁয়ো? কেয়া না আমি? অন্ধকার ময়দান। ট্যাক্সিটা রেড রোড ধরে এলোমেলো ছুটছে। কখনো জোরে কখনো আস্তে। দূরে নিওন আলোর মধ্যে ব্যস্ত শহর জ্বলছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। এতক্ষণে এই ট্যাক্সির মধ্যে পুরনো প্রশ্ন ফিরিয়ে এল। আলোক যেন একটু স্বস্তি পেল। কেননা, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না কখনো। তবু বার বার আসে। বার বার হয়রান করে। হঠাৎ এক সার মটর বেরিয়ে গেল হর্ণ দিয়ে। বিরক্ত লাগল কানে। পথের পাশে মিটমিটে গ্যাসের আলো জ্বলছে। বড় রোমান্টিক আলো! স্নিগ্ধ। হু-হু বাতাস। বড় আস্তে কথা বলতে ইচ্ছে হয় এখন।

—কেয়া তুমি কি আমাকে ভালবাস?

—হুঁ।

—খুব ভালবাস?

—খু-উ-ব।

—আমি কি তোমাকে ভালবাসি?

—কি জানি।

—তুমি বুঝতে পার না?

—সে কথা বলার সময় তো এখনো আসেনি।

দুই হাতে প্রবল আকর্ষণে আলোকের মাথাটা কাছে এনে চুমু দিল। খোলা বাতাসের মধ্যে মৃদু মধুর শব্দ উঠল। যেন দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইল তুমি যা বলেছ তা ঠিক। এবার কেয়ার পালা।

—আলোক, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

—হ্যাঁ, কেয়া।

—সবার চাইতে, পৃথিবীর সব থেকে—

—হ্যাঁ। সবার চাইতে, বেশী ভালবাসি। পৃথিবীর সব থেকে।

—আমি কি তোমাকে ভালবাসি?

—ভালবাস।

—তুমি এত সহজভাবে বলতে পারলে? যদি না বাসি?

—আমি একটু গেঁইয়া তো—

কেয়ার দেহমন উদ্দাম হল অনুশোচনায়। অবিরাম-মুষলধারে বৃষ্টি নামল যেন। যেন বর্ষার রাত্রের মত সমস্ত অস্তিত্ব মুছে দিতে চাইল। জীবনের কলরব মুছে ফেলে হৃদয় দিয়ে শুধু অনুভবের পালা।

—আলোক?

—বল।

—তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া নেই তো আজ?

—না।

—মেট্রোতে একটা ভাল ছবি এসেছে।

—কি ছবি?

—দুইট বার্ড অব ইউথ। ভাল লেখকের।

—তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে খুব?

—হুঁ। তুমি যদি পাশে থাক।

—তাহলে চল।

—চল। সময়টা ভাল কাটবে।

—ট্যাক্সিটা থমকে দাঁড়াল, স্টার্ট নিল, বাঁক ঘুরল তারপর মেট্রোর দিকে উড়ে চলল। সময়টা ভালই কাটবে। বোঝা যায় অতিরিক্ত সময় নিয়ে কেয়া উদ্‌ভ্রান্ত। [illegible] কথা মনে পড়ল, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত। অফিসে [illegible] কাজ ছিল। সেইজন্যে সময়কে ভুলতে পেরেছিল। [illegible] পর ফাইল। বার বার নোট দেওয়া। ঘন ঘন [illegible] প্রাকারের ডাক। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং। রায় সাহেবের চেম্বারে সাবঅর্ডিনেটদের কম্পিত পদক্ষেপ। ভুল হলে ইংরেজীতে চাপা অনুযোগ। বেশ ছিল। হঠাৎ কেয়া গিয়ে হাজির। আমরা সময়কে হত্যা করি না, সময়-ই আমাদের হত্যা করে। এই যে এতক্ষণ ফিরপোতে বসেছিলাম

এই যে এলোমেলো কথা, যার কোন মানে হয় না—বললাম. উদভ্রান্ত হয়ে শেষে ট্যাক্সিতে ঘুরলাম, আবার নিছক সময় কাটাতে সুইট বার্ড অব ইয়ুথ দেখতে যাচ্ছি—এসবের কি অর্থ হয়? চরম উদ্দেশ্যহীনতা ছাড়া আর কি আছে? আমি যদি বিয়ে করতাম তাহলে হয়ত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হত। কেন, বৌকে সঙ্গ দিতে। তা যদি না হয়, তাহলে এই সব অর্থহীন বাউণ্ডুলেপনা করা। ফিরকোতে খাবার খাব, মেট্রোতে ইংরেজী ছবি দেখব, ট্যাক্সি চড়ে ঘুরব। আর মাঝে মাঝে সেই সব পুরোন কথায় নতুন করে শান দেব। আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস। ছাড়া আর কি পথ আছে? একবারও প্রশ্ন তুলব না পৃথিবীতে আজো মহান প্রেম বেঁচে রয়েছে কি না।……মনে পড়ে, আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত—ক্লান্ত করে—

আমরা সময়ের পালকাটা হয়ে পড়ে আছি। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'—মিথ্যে কথা।

কে জানে, হয়ত এর-ই আরেক নাম 'শহরে'।

[ক্রমশঃ]

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষা	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

বয়স যাই হোক

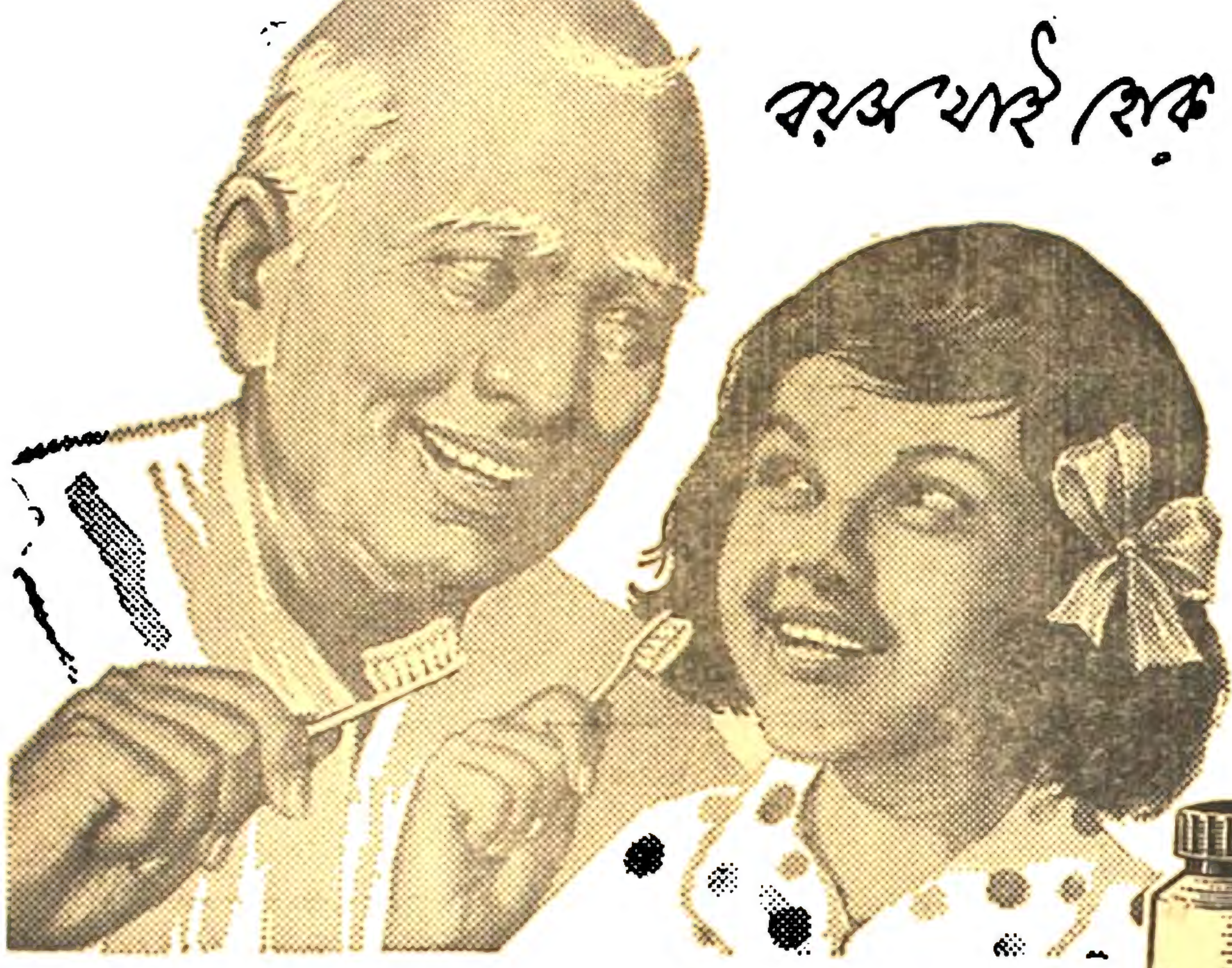

নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন। নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

নিম-এর তুলনা নেই।

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ কলিকাতা—২৯।

মাদমোয়াজেল প্যার্ল

গী দ্য মোপাসাঁ

অনুবাদক : সুধীরকান্ত গুপ্ত

সত্যিই কি অদ্ভুত খেয়াল হয়েছিল আমার সেদিন রাত্রে যেদিন মাদমোয়াজেল প্যার্লকে রাণী বলে পছন্দ করেছিলাম।

প্রত্যেক বছর আমি আমার বর্ষীয়ান বন্ধু সাঁতালের বাড়ীতে যাই এপিফেনির উৎসবে যোগ দিতে। তিনি আমার বাবার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার বাবা আমায় সেখানে নিয়ে যেতেন। সেই থেকে আমি সেখানে যাই এবং যতদিন সাঁতাল এই পৃথিবীতে থাকবেন ততদিন যাবও।

এই সাঁতাল পরিবারের জীবন-যাত্রা ছিল বিচিত্র রকমের। পারিতে থেকেও মনে হ'ত যেন তাঁরা গ্রাস, ইভতো অথবা পঁ-আ-মুসঁ-তেই বাস করছেন।

মানমন্দিরের কাছে ছোট একটা বাগানের ভেতর তাঁদের বাড়ীটা ছিল। জায়গাটা সহর থেকে একটু দূরেই। মাঝে মাঝে তাঁদের সহরে যাবার জন্য দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বের হ'তে হ'ত সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনবার জন্য। রান্নাঘরের চাবি থাকত মাদমোয়াজেল প্যার্লের কাছে আর জামা-কাপড়ের চাবি থাকত গৃহকর্ত্রীর কাছে। মাদমোয়াজেল প্যার্ল পূর্বাহ্নেই সতর্ক ক'রে দিতেন যে চিনি শেষ হ'য়ে আসছে, টিনের খাবার শেষ আর কফির থলিও প্রায় শূন্য।.... দুর্ভিক্ষের পূর্বেই সতর্কিত হয়ে মাদাম সাঁতাল অবশিষ্ট রসদ-সামগ্রী পরীক্ষা করে দেখতেন এবং একটা পকেট নোট-বইতে টুকে রাখতেন। অনেকগুলো অঙ্ক লেখা হয়ে গেলে লম্বা একটা হিসেব করতে হ'ত, তারপর মাদমোয়াজেল প্যার্লের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতেন। শেষে স্থির হ'ত নুন, চিনি, চাল, কফি, জ্যাম, ডিম চিংড়িমাছ এবং নুন দেয়া সেদ্ধ মাছ প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিস তিনমাসের জন্য কিনে মজুত রাখা হবে। নির্দিষ্ট দিনে মাদাম সাঁতাল এবং মাদমোয়াজেল প্যার্ল ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে সওদা করতে বের হতেন। চলে যেতেন পুল পেরিয়ে প্রকাণ্ড মুদীর দোকানটাতে। ফিরে আসতেন পরিশ্রান্ত এবং উত্তেজিত হয়ে। গাড়ীর ছাতেও থাকত প্যাকেট আর থলির গাদা—দেখে মনে হত যেন বাড়ী বদলানো হচ্ছে।...

সাঁতালরা স্যান্ নদীর ওপারের জায়গাটিকে বলতেন "নয়া অঞ্চল।" এই অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বসতি। উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন কাটায় তারা। রাত্রে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে পয়সা ওড়ায়।....

মসিও সাঁতালের দৈনিক কাগজ অনুমোদন করলে তাঁর মেয়েরা অবশ্য মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে যেত। তরুণী যুগলের ভেতর একজনের বয়স উনিশ অপরজনের সতের। সুশ্রী, দীর্ঘকায়া উদ্ভিন্নযৌবনা দুটী তরুণী। সযত্নে লালিত পালিত—এত যত্নে পালিত যে দুটী সুশ্রী পুতুল বলে তারা নজর এড়িয়ে যায়। সাঁতালের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার বা তাদের দিকে মনোযোগ দেবার কথা কখন মনেও হয়নি। এত শুচি শুভ্র বলে মনে হত তাদের, যে আলাপ করতে বা অভিবাদন জানাতেও ভয় হ'ত।...

মসিও সাঁতাল একজন চমৎকার মানুষ—পণ্ডিত, দিল-

খোলা এবং অমায়িক। সর্বাগ্রে তিনি চাইতেন বিশ্রাম আর শান্তি। তাই সমস্ত পরিবারটাই যেন মমিতে পরিণত হয়েছিল এবং জীবন যাত্রার ধারা হয়ে এসেছিল গতিহীন ·· নিশ্চল।....

মঁসিও সাঁতাল ছিলেন ভাবপ্রবণ মানুষ। মানুষের সঙ্গে বিশেষ মেশেননি বলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন এবং অতি সামান্য ব্যাপারেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন এবং কষ্ট পেতেন।

প্রতিবেশীদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গেই একটু মেলামেশা করতেন। সৌজন্যের খাতিরে দূরবর্তী অঞ্চলের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও বছরে দু' তিনবার দেখা করতে যেতেন।

আমি পনেরই আগাষ্ট এবং এপিফেনির দিন তাঁদের বাড়ীতে যেতাম। ক্যাথলিকদের যেমন ইষ্টারের উৎসব অপরিহার্য তেমনি আমার কাছেও ঐ দুটি উৎসবে যোগদান অপরিহার্য ছিল। পনেরই আগাষ্টের উৎসবে তাঁরা কয়েক-জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতেন বটে কিন্তু এপিফেনির দিন আমি একাই থাকতাম বহিরাগত অতিথি।

অন্যান্য বছরের মত সেবারও আমি এপিফেনির উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। প্রথানুযায়ী মঁসিও সাঁতাল মাদাম এবং মাদমোয়াজেল প্যার্লকে চুমু খেলাম। মাদমোয়াজেল লুইজ এবং পোলিনকেও নত হয়ে অভিবাদন করলাম। তাঁরা আমায় শহরের জীবন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিছু প্রশ্ন করলেন। স্থূলাঙ্গী মাদাম সাঁতালের সমস্ত কল্পনাকে আমার কাছে চৌকো পাথরের মত মনে হ'ত। যে কোন রাজনৈতিক আলোচনা তিনি এই বলে শেষ করতেন—"ও ক্ষেত্রে সবই খারাপ হবে—যেমন বীজ পুঁতেছ তেমনি গাছ হবে।"

কেন জানিনা মাদাম সাঁতালের চিন্তাবলী আমার কল্পনায় চৌকো বলে মনে হ'ত। যা কিছু তিনি বলতেন সে সমস্তই আমার মনে সুসমঞ্জস চতুষ্কোণযুক্ত একটি প্রকাণ্ড চৌকোর রূপ নিত। আবার অনেকের চিন্তাবলী মনে হ'ত চলন্ত গোল রিং ব'লে। যেই তারা কথা বলতে সুরু করতেন অমনি মনে হ'ত কথাগুলো যেন রিং এর মত গড়িয়ে চলেছে ···একসঙ্গে দশটা···কখনও বিশটা···ছোট বড় গোল রিং-গুলি দিগন্ত পর্যন্ত গড়িয়ে যেত।····আবার কারও চিন্তাবলী তীক্ষ্ণ বলে মনে হ'ত।···

যাই হোক, আমরা যথারীতি খেতে বসলাম এবং আহার-পর্ব শেষও হ'ল কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু আলোচনা হ'ল না।

আহারের শেষের দিকে মিষ্টিমুখ করবার জন্য এপিফেনির কেক আনা হল। প্রতি বছরই মঁসিও সাঁতাল রাজা নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিবারই তাঁর এই দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে অথবা এটা একটা পারিবারিক প্রথা কিনা জানিনা তবে প্রতিবারই তাঁর মিষ্টির ভাগে অবশ্যম্ভাবীরূপে শিম পাওয়া গিয়েছে এবং মাদাম সাঁতালকে রাণী ব'লে ঘোষণা করেছেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কেক খাবার সময় যখন কোন একটা শক্ত জিনিসে আমার একটি দাঁত প্রায় ভাঙবার উপক্রম হয়েছিল।·· ধীরে ধীরে জিনিসটা মুখ থেকে বের করে দেখলাম - চীনেমাটির একটা খুদে পুতুল···একটা শিমের চেয়ে বড় না। বিস্ময়ে বলে উঠলাম "আ!" প্রত্যেকে আমার দিকে চাইল এবং মঁসিও সাঁতাল হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—এইতো গাসতঁ! এইতো গাসতঁ! রাজা দীর্ঘ-জীবী হোন! রাজা দীর্ঘজীবী হোন!"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল- "রাজা দীর্ঘজীবী হোন!"।

আমার কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল—যেমন অনেক সময়ে অকারণেই বোকা ব'নে গেলে অনেকের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে হয়ে ওঠে।··চীনেমাটির খুদে পুতুলটি দু' আঙুলে ধরে নিচে মেঝের দিকে চেয়ে রইলাম।···কি করব

যা বলব বুঝতে না পেরে হাসতে চেষ্টা করলাম। এমন সময় সাঁতাল চেঁচিয়ে বললেন—"এখন রাণী পছন্দ করতে হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এক মুহূর্তের ভেতরে ভাবনা-চিন্তা আমার মনে খেলে গেল।... সাঁতাল-কন্যাদ্বয়ের একটিকে কি আমায় গছিয়ে দেবার মতলব?...অথবা আমার কাকে পছন্দ তা বলাবার জন্য এটা একটা পন্থা? অভিভাবকদের তরফ থেকে সম্ভাব্য বিবাহের জন্য একটা গোপন সতর্ক প্রচেষ্টা?...যে বাড়ীতেই বিবাহ-যোগ্যা কুমারী মেয়ে রয়েছে সেখানেই রয়েছে সর্বদা বিয়ের চিন্তা...এবং এর জন্য অভিভাবকরা ছলনা বা যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হন না।...

এত সাদৃশ্য তরুণীযুগলের ভেতরে এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমায় নির্বাচন করতে হবে এই প্রচণ্ড ভয় আর লজ্জায় অভিভূত হয়ে গেলাম। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে পছন্দ করা দু'-ফোঁটা জলবিন্দু থেকে পছন্দ করারই সামিল।...অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুকৌশলে আমায় যে বিয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ভেবে শঙ্কিত হলাম এবং ভুয়ো রাজকীয় সম্মানের কথা ভেবে আঁতকে উঠলাম।

সহসা একটা প্রেরণার বশে প্রতীক-পুতুলটি আমি মাদমোয়াজেল প্যার্লের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। প্রথমে একটু বিস্মিত হলেও পরে সবাই আমার লজ্জা এবং বিবেচনার জন্য প্রচণ্ড করতালি দিয়ে প্রশংসা জানালেন। তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন—"রাণী দীর্ঘজীবী হোন! রাণী দীর্ঘজীবী হোন!"

বৃদ্ধা মহিলা হতভম্ব হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তোৎলাতে লাগলেন—"না, না, অনুরোধ করছি আমায় নয়...আমায় নয়!"

জীবনে এই প্রথম আমি মাদমোয়াজেল প্যার্লের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম এবং বিস্মিত হ'লাম তিনি কে এই ভেবে।...কারুকার্যশোভিত পুরোণ চেয়ারকে যেমন আমরা বিশেষ দৃষ্টিতে না দেখেই তাতে শৈশব থেকে বসতে অভ্যস্ত তেমনিভাবে আমি মাদমোয়াজেল প্যার্লকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম।...কিন্তু একদিন যখন সূর্যের রশ্মি চেয়ারের ওপর এসে পড়ে কেন জানিনা আমরা হঠাৎ বলে উঠি—"এই আসবাবটি কেটি আকর্ষণীয় বস্তু" এবং আমরা আবিষ্কার করি যে ঐ চেয়ারের কাঠে কাজ করেছে একজন শিল্পী এবং চেয়ারের আচ্ছাদনটিও চমৎকার।

আমি কখনও মাদমোয়াজেল প্যার্লের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিনি। তিনি সাঁতাল-পরিবারের একজন—বাস্ এই জানি।...শীর্ণকায়া দীর্ঘাঙ্গী মহিলা এবং সর্বদা চেষ্টা করেন অন্তরালে থাকতে। কিন্তু এই পরিবারে কোনমতেই তিনি তুচ্ছ ব্যক্তি নন। তাঁর সঙ্গে সবাই বন্ধুর মত ব্যবহার করে এমন কি গৃহকর্ত্রীর চাইতেও ভাল ব্যবহার করে কিন্তু তবুও ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মত নয়। এমন কয়েকটি তুচ্ছ ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আগে কখনও করিনি। মাদাম সাঁতাল ভদ্রমহিলাকে ডাকতেন "প্যার্ল" বলে, মেয়েরা ডাকত "মাদমোয়াজেল প্যার্ল" এবং মঁসিও সাঁতাল বোধহয় একটু বেশী সম্ভ্রম করে ডাকতেন "মাদমোয়াজেল"। আমি তাঁকে দেখতে লাগলাম—কত বয়স হবে তার? চল্লিশ? হ্যাঁ চল্লিশ। আমি বিস্মিত হলাম লক্ষ্য করে যে তিনি বৃদ্ধা না হলেও সাজসজ্জায় বৃদ্ধা বলে নিজেকে জাহির করতেন। অতি হাস্যকরভাবে কেশ-বিন্যাস করতেন, সাজ-পোষাক পরতেন কিন্তু তবুও তিনি হাস্যকর নন কারণ তাঁর ভেতর রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে এক সহজ স্বাভাবিক লাবণ্য।...সত্যিই কি বিচিত্র নারী! আর আশ্চর্য আমিও তাঁকে কখনও ভাল করে লক্ষ্য করিনি। বিচ্ছিরি সেকেলে ধরণের চুল কোঁকড়ান দেখতে অদ্ভুত লাগত। এই ম্যাডোনা-সদৃশ কেশদামের নীচে রয়েছে প্রশস্ত প্রশান্ত ললাট...তার ওপর দেখা যাচ্ছে দুটি গভীর রেখা—দীর্ঘকালের বেদনার রেখা।...দুটি সুন্দর আয়ত আঁখিতে কত লাজ, ভয়, নম্রতা রয়েছে বালিকাসুলভ বিস্ময়, যৌবনের অনুভূতি...আর রয়েছে প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা—যা

তাঁর আঁখিদুটিকে করেছে কমনীয়। মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ হলেও ক্লান্তি অথবা জীবনের প্রবল ভাবাবেগও শুকিয়ে যায়নি বরং তাতে রয়েছে নির্মলতা আর বিচক্ষণতার ছাপ।

কি সুন্দর মুখখানি। কি চমৎকার দাঁতগুলি! কিন্তু মনে হয় যেন হাসতে সাহস করেন না। হঠাৎ তাঁকে মাদাম সাঁতালের সঙ্গে তুলনা করে দেখলাম। নিশ্চয়! মাদমোয়াজেল প্যার্ল শতগুণে ভাল ··অনেক বেশী উদার, মার্জিত এবং সম্ভ্রান্ত।···

তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। গেলাসে সাম্পান ঢালা হচ্ছিল। আমি রাণীর দিকে গেলাসটা বাড়িয়ে দিলাম তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে। দেখতে পেলাম তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢাকতে চাইছিলেন। যেই তিনি স্বচ্ছ মদের গেলাসে ঠোঁট ভেজালেন অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল—"রাণী পান করছেন। রাণী পান করছেন আরক্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখখানি গলা আটকে গেল। সবাই হাসতে লাগল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে বাড়ীর সবাই তাঁকে খুব ভালবাসে।

নৈশ-ভোজের পর মঁসিও সাঁতাল আমার হাত ধরলেন। রাত্রে আহারের পর তাঁর ধূমপানের পবিত্র সময়। একা থাকলে রাস্তায় চলে যান চুরুট খেতে আর যদি কেউ সঙ্গে থাকে তবে ওপরে চলে যান এবং চুরুট খেতে খেতে বিলিয়ার্ড খেলেন।···

সেদিন রাত্রে এপিফেনি উৎসব উপলক্ষে বিলিয়ার্ড-কক্ষটিতেও আগুন জ্বালান হয়েছিল। আমার বর্ষীয়ান বন্ধু সরু একটা বিলিয়ার্ড-দণ্ড তুলে নিয়ে সেটা সাদা চক দিয়ে বেশ যত্ন করে ঘষতে লাগলেন—তারপর আমার হাতে দিয়ে বললেন—"নে শুরু কর।"

আমার বয়স পঁচিশ হ'লেও অতি শৈশবকাল থেকেই আমায় দেখেছেন বলে "তুই-তোকারি" করে কথা কইতেন।

আমি খেলতে শুরু করলাম। কয়েকবার সফল হলাম আবার কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্টও হলাম।—কিন্তু মাদমোয়াজেল প্যার্লের চিন্তা মাথায় ঘুরছিল বলে হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—'মঁসিও সাঁতাল! মাদমোয়াজেল প্যার্ল কি আপনার আত্মীয়া?"

বিস্মিত হয়ে খেলা বন্ধ করে তিনি আমার দিকে চাইলেন।

"—কি রকম, তুই জানিস না? মাদমোয়াজেল প্যার্লের কাহিনী তুই জানিস না?"

"আজ্ঞে না।"

"তোর বাবা তোকে কখনও বলেন নি?"

"না।"

"বাঃ। কি অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।"

একটু থেমে আবার বললেন—"তুই যদি জানতিস কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে আজকে এই এপিফেনির দিনেই আমায় জিজ্ঞেস করছিস।"

"কেন?'

"কেন? শোন। আজকের ঠিক এই এপিফেনির দিন থেকে একচল্লিশ বছর আগের কথা। আমরা তখন রুই-ল্যা-ভরে-র উঁচু জায়গাটাতে থাকতাম। কিন্তু দাঁড়া, আগে বাড়ীটার ব্যাখ্যা করে নি যাতে ভাল করে বুঝতে পারিস।"

রুই সহরটা পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে নীচে সামনের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দেখা যেত। আমাদের বাড়ীটা পাহাড়ের গায়ে ছিল। পুরোন দেয়ালের সাহায্যে ছাতের সমান উঁচুতে একটি চমৎকার বাগানও করা হয়েছিল। বাড়ীটা ছিল সহরের ভেতরে রাস্তার ওপর আর বাগানটা ছিল সমতল ভূমি থেকে উঁচুতে। এই বাগান থেকে বেরিয়ে সহরে যাবার জন্য প্রশস্ত দেয়ালের ভেতরে গুপ্ত-সিঁড়ির শেষপ্রান্তে একটা দরজাও ছিল—যেমন উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই দরজার সামনেই একটা রাস্তা

ছিল। দরজার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা লাগানো ছিল যাতে চাষারা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে সোজা ঐ পথ দিয়েই আসতে পারে ঘুরে অন্য পথ দিয়ে না এসে। এখন বুঝতে পারছিস জায়গাটা?

সেবছর এপিফেনির এক সপ্তাহ আগে থেকেই সমানে বরফ পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর পরমায়ু শেষ হয়ে এল।—আমরা উঁচু জায়গা থেকে সমতলভূমির দিকে চাইলাম। –বিশাল সহরটি বরফে একদম সাদা হয়ে গিয়েছে আর বার্নিসের মত চক্‌চক্ করছে এই দৃশ্য দেখে অন্তরাত্মা হিম হয়ে গেল।—মনে হচ্ছিল ভগবান যেন পৃথিবীটাকে গুটিয়ে চিলেকোঠায় পুরোন পৃথিবীর সঙ্গে রেখে দেবেন। সত্যিই কী করুণ দৃশ্য।

আমাদের পরিবারটা বেশ বড়ই ছিল। আমার মা, বাবা, কাকা, কাকীমা, আমার দুই ভাই এবং চারটি খুরতুত বোন। মেয়েরা সবাই বেশ সুশ্রীই ছিল। আমি সবচেয়ে ছোটটিকে বিয়ে করেছিলাম। এখন সেই পরিবারের ভেতর আমি, আমার স্ত্রী এবং শ্যালিকা ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। আমার শ্যালিকা এখন মার্সাইতে থাকেন। সত্যিই পরিবারের লোকেরা কিরকমভাবে ঝরে পড়ল — ভাবলেও শিউরে উঠি। তখন আমার বয়স ছিল পনের, এখন ছাপ্পান্ন।

আমরা মহানন্দে এপিফেনির উৎসব করছিলাম। আমরা যখন বৈঠকখানা ঘরে নৈশ-ভোজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন আমার বড় ভাই জাক বলল—"দশমিনিট ধরে সমতল ভূমিতে একটা কুকুর চেঁচাচ্ছে, বেচারী বোধ হয় পথ হারিয়েছে।" তার কথা শেষ হতে না-হতেই বাগানের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। –এই ঘণ্টার আওয়াজটা ছিল গীর্জার ঘণ্টার মত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং মৃত ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।—সবাই শিউরে উঠলাম।—আমার বাবা চাকরকে গিয়ে-দেখে আসতে বললেন।

আমরা নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবং যে রাশি রাশি বরফ সমস্ত সমতল ভূমিটা ছেয়ে ফেলছিল সেই কথা ভাবতে লাগলাম। এমন সময় চাকরটা এসে বলল যে সে কিচ্ছু দেখতে পায়নি।

কুকুরটা অবিরাম ডেকেই চলেছিল এবং আওয়াজটা ঠিক একই জায়গা থেকে আসছিল আমরা সবাই টেবিলের কাছে গিয়ে বসলাম। সবাই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম —বিশেষ করে আমরা ছোটরা।

রোষ্ট পর্যন্ত ভালভাবেই কাটল কিন্তু ঠিক তার পরেই পরপর তিনবার ঘণ্টাটি সজোরে বেজে উঠল—শব্দটির স্থায়ীত্বকাল একটু দীর্ঘ মনে হল। আমাদের আঙুলের ডগা পর্যন্ত কেঁপে উঠল—শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল।—আমরা কাঁটা চামচ শূন্যে তুলে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে একটা অস্বস্তিকর ভয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম।

শেষে আমার মা বলে উঠলেন—"আশ্চর্য! তাদের ফিরে আসতে এত দেরী হচ্ছে। বাপ্তিস্ত তুমি একা যেওনা—ভদ্রলোকদের ভেতর কেউ তোমার সঙ্গে যাবেন। আমার কাকা ফ্রাঁসোয়া উঠে দাঁড়ালেন। হারকিউলিসের মত বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট গর্বও আছে। ভয় বলে তিনি কিছু জানতেন না। আমার বাবা তাঁকে বললেন—

"একটা বন্দুক সঙ্গে নে। ওটা কি বস্তু আমরা জানিনা তো।" কিন্তু আমার কাকা শুধু একটা ছড়ি নিয়ে চাকরটাকে সঙ্গে করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন। আমরা সবাই ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় কাঁপতে লাগলাম—খেতে বা কথা বলতেও পারছিলাম না।…মা আমাদের আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন—"দেখবে যে কোন ভিখিরি বা পথিক বরফের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে' প্রথমবার ঘণ্টা বাজিয়ে যখন দেখল যে তৎক্ষণাৎ কেউ দরজা খুলল না

তখন আবার পথ খুঁজতে বেরিয়েছিল কিন্তু খুঁজে না পেয়ে আবার আমাদের দরজাতেই ফিরে এসেছে।"

মনে হল আমার কাকা একঘণ্টা হল বাইরে গিয়েছেন। ফিরে এসে রাগে ফেটে পড়লেন - শপথ করলেন—"হায় ভগবান! কিছু না। কোন এক রসিকলোক রসিকতা করেছে।—হতভাগা কুকুরটা দেয়াল থেকে একশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। বন্দুকটা সঙ্গে থাকলে মেরে ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

আমরা আবার খেতে শুরু করলাম। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা মিটে যায়নি—একটা কিছু ঘটবে - এখনই ঘণ্টাটা আবার বেজে উঠবে।—যেই এপিফেনির কেকটা কাটা হল অমনি ঘণ্টাটা আবার বেজে উঠল। সবাই একসঙ্গে উঠে পড়লাম। আমার কাকা সাম্পান খাচ্ছিলেন, তিনি ভীষণ রেগে বলে উঠলেন যে কুকুরটাকে মেরেই ফেলবেন। তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে আমার মা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বাধা দিলেন। আমার বাবা শান্তপ্রকৃতির মানুষ হলেও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন বলে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তিনি বললেন যে নিজে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসবেন।

আমার ভায়েদের বয়স ছিল আঠের থেকে কুড়ির ভেতরে। তারা সবাই যে যার বন্দুক নিতে গেল। আমায় কেউ লক্ষ্য করল না বলে সেই সুযোগে একটা ছোট বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে রইলাম।

আমরা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাবা আর কাকা বাপ্‌তিস্তের সঙ্গে আগে আগে যাচ্ছিলেন। বাপ্‌তিস্তের হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। আমার দুই ভাই জাক্‌ আর পোল্‌ তাঁদের অনুসরণ করছিল। আমার মা তাঁর বোন এবং আমার খুড়তুত বোনদের সঙ্গে বাড়ীর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সহস্র মিনতি সত্ত্বেও আমি সবার শেষে ছুটলাম।

এক ঘণ্টা ধরে আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে। ঝাউ-গাছগুলি এই শুভ্র আবরণের ভারে নুয়ে পড়েছে। ভারী সাদা পোষাক পরা এই গাছগুলিকে বিরাট পিরামিডের মত মনে হচ্ছিল। এত গাঢ় তুষারপাত হচ্ছিল যে সামনের দশ-হাত দূরের জিনিষও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু আমাদের সামনে লণ্ঠনের আলোটা একদম পরিষ্কার ছিল।

আমরা যখন দেয়ালের ভেতরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম তখন সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমায় অনুসরণ করছে এবং আমার কাঁধ ধরে আমায় তুলে নিয়ে নিয়ে যাবে।—পেছনে ফিরে চাইবার ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সমস্ত বাগানটা অতিক্রম করতে হবে বলে সাহস করলাম না। নিচের দরজাটা খোলবার শব্দ শুনতে পেলাম এবং তারপরেই আমার কাকার গলার আওয়াজ পেলাম—"হায় ভগবান! সে চলে গিয়েছে। এবার যদি তার ছায়াও দেখতে পাই তাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবনা।"

নিচের সমতলভূমিকে দেখলে কষ্ট হয়—দেখলে না বলে বরং বলা উচিত অনুভব করলে—কারণ দেখা যায় না · দেখা যায় উপরে, নিচে, সামনে, ডানে, বাঁয়ে শুধু অন্তহীন বরফের আবরণ

আমার কাকা বললেন—"ঐ তো কুকুরটা চেঁচাচ্ছে··· দেখাচ্ছি আমার লক্ষ্য কেমন অব্যর্থ! আমার বাবা অতি স্নেহপরায়ন মানুষ ছিলেন, তিনি বললেন—"বরং বেচারীকে নিয়ে আসা যাক, ক্ষুধার্ত হয়ে চেঁচাচ্ছে। হতভাগ্য জন্তুটা সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে···যেন অসহায় মানুষের মত চেঁচাচ্ছে চলে এস।"

···অবিরাম তুষারপাত হচ্ছিল। আমরা এই পুরু তুষার-আস্তরণের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম ঠাণ্ডা এবং নরম তুষারের ভেতরে আমাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল····এগিয়ে যাবার জন্য পা-টা অনেকখানি ওপরে তুলতে হচ্ছিল। এগোতে এগোতে কুকুরের ডাকটা বেশ পরিষ্কার আর স্পষ্ট

শুনতে পেলাম। আমার কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—"এইতো এখানে।"

—কুকুরটা দেখতে অদ্ভুত এবং ভীতিপ্রদ।—বড় বড় লোমে ভরা প্রকাণ্ড কালো কুকুর—মাথাটি নেকড়ের মত—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল।—

আমার কাকা বললেন—"অদ্ভুত তো! এগোচ্ছেও না। পেছোচ্ছেও না। আমার মনে হয় গুলী করা উচিত।"

আমার বাবা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"না এটাকে নিয়ে যেতে হবে।" আমার কাকা বলে উঠলেন—"আরে! কুকুরটা একা নয়—পাশে কি একটা যেন রয়েছে।"

আমরা সাবধানে এগোতে লাগলাম। কুকুরটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসল। দৃষ্টিতে তার হিংস্রতা নেই বরং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে খুশীই হয়েছে মনে হল। আমার বাবা সোজা গিয়ে তাকে আদর করতে লাগলেন আর কুকুরটাও তাঁর হাত চাটতে লাগল।—

দেখা গেল কুকুটা একটা খেলনার মত গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এবং গাড়ীটা চার পাঁচটা উলের আবরণ দিয়ে ঢাকা রয়েছে।—সতর্কভাবে আবরণগুলি তুলে লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল একটি শিশু ঘুমোচ্ছে।—আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার বাবা প্রথমে প্রকৃতিস্থ হলেন এবং আনন্দিত হয়ে গাড়ীর ছাদের ওপর হাত বাড়িয়ে বললেন—"হতভাগ্য পরিত্যক্ত শিশু! তুই আমাদের কাছে থাকবি!"

তারপার তিনি নিজের মনেই বলে উঠলেন—"প্রেম-জাত সন্তান! বেচারী মা! আজকে এই এপিফেনির রাত্রে দেবশিশুর কথা স্মরণ করে আমাদের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করতে এসেছিলেন।"—এই বলে তিনি একটু থামলেন—তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে আকাশের চারিদিকে চারবার চেঁচিয়ে বললেন—"আমরা একে গ্রহণ করলাম!"—তারপর তাঁর ভায়ের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন—"ফ্রাঁসোয়া! কুকুরটাকে যদি গুলী করতে!—"

আমার কাকা কোন জবাব না দিয়ে মস্ত বড় একটা ক্রুশ চিহ্ন করলেন। যতই বাগাড়ম্বর করুণ না কেন কাকা একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন।....

কুকুটাকে খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং সে আমাদের অনুসরণ করছিল। গাড়ীটাকে অনেক কষ্টে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসা হল। গাড়ী থেকে ঘুমন্ত শিশুকে তুলে নেওয়া হল। তার বয়স ছ' সপ্তাহ হবে। যে কাপড় দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল তার ভেতর দশ হজার ফ্রাঁ পাওয়া গেল।...টাকাটা বাবা শিশুর বিয়ের যৌতুকের জন্য রেখে দিলেন। বোঝা গেল শিশুটি কোন গরীবের সন্তান নয়।....

শিশুটির সম্বন্ধে আমাদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিলনা। কিন্তু আমরা কোনদিন তার পরিচয় জানতে পারিনি—এমন কি কুকুরটাকেও কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। আমাদের দেশে সে ছিল বহিরাগত।...

যাই হোক, যিনি আমাদের দরজার ঘণ্টা তিনবার বাজিয়ে ছিলেন তিনি আমার বাবাকে বিলক্ষণ জানতেন বলেই এই কাণ্ড করেছিলেন।...

ছ' সপ্তাহের বয়েসে কি করে মাদমোয়াজেল পার্ল সাঁতাল পরিবারে এলেন এই হল তার কাহিনী।...মাদমোয়াজেল পার্ল নামটা তাঁকে পরে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার সময় তাঁর নামকরণ হয় মারি সিমন ক্ল্যার'—ক্ল্যার হল তার পদবী।

...আমরা সবাই আবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলাম।

আমি রাজা হয়েছিলাম এবং মাদমোয়াজেল প্যার্লকে রাণী নির্বাচিত করেছিলাম—ঠিক তুই যেমন করেছিস এই কয়েক মিনিট আগে।...সেদিন তিনি এই সম্মানকে কোন সন্দেহের চোখে দেখেননি।...

আমাদের পরিবারেই শিশুটি মানুষ হতে লাগল। বয়সের সাথে তিনিও বড় হয়ে উঠলেন।...বাধ্য, বিনম্রী এবং স্বভাবটি হল তাঁর ভারি মিষ্টি। আমরা সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতাম

এবং আমার মা বাধা না দিলে তিনি নষ্ট হয়ে যেতেন। আমার মা সামাজিক শৃঙ্খলা এবং বিভেদ মানতেন। তিনি ক্ল্যারের সঙ্গে নিজের সন্তানের মত ব্যবহার করতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু আমাদের পরিবারে তাঁর স্থান এবং আমাদের সাথে ব্যবধানের একটা সীমারেখা টেনে দিতে চাইলেন। তাই যেই শিশুটির বোঝবার মত বয়স হল তখন তাকে তার কাহিনী বলা হল এবং ধীরে ধীরে সস্নেহে তার মনের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল যে সাঁতাল-পরিবারে সে একজন আশ্রিতা —বহিরাগতা।...

বিস্ময়কর বুদ্ধি এবং সহজাত প্রবৃত্তির ফলে ক্ল্যার তাঁর নিজের অবস্থার কথার বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের পরিবারে তাঁর যে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল নিজের কৌশলে এবং মাধুর্য দিয়ে তা এমনভাবে রক্ষা করে চললেন যে প্রায়ই বাবার চোখে জল আসত। ছোট্ট সুশ্রী মেয়েটির গভীর কৃতজ্ঞতা আর ভয়মিশ্রিত ভক্তি দেখে আমার মা তাঁকে "আমার মেয়ে" বলে ডাকতে লাগলেন। কখনও খুব ভাল কাজ করলে মা চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিয়ে আবেগ-ভরে বলতেন— সত্যিই মেয়েটি একটি মুক্তো একেবারে খাঁটি মুক্তো!'

সেই থেকে ক্ল্যারের নাম আমাদের কাছে হল "মাদ্‌মোয়াজেল প্যার্ল।"

মঁসিও সাঁতাল থামলেন। তিনি বিলিয়ার্ড-টেবিলের ওপর বসেছিলেন, পা-দুটো ঝুলছিল। বাঁ হাত দিয়ে একটা বল নিয়ে খেলছিলেন আর ডান হাত দিয়ে যে ন্যাকড়াটা দিয়ে স্লেটের বোর্ডের ওপর খেলার ফলাফল মোছা হ'ত সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

তিনি আত্মস্মৃতিতে লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে আরক্ত বদনে নিম্ন-কণ্ঠে স্বগতভাবে বলে যাচ্ছিলেন।—যেন পুরাণ জিনিষগুলোর ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বিগতকালের ঘটনাবলী তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল। যেমন আমরা যখন আমাদের পুরান বাড়ির বাগানে বেড়াই তখন প্রতিটি গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রতিটি জিনিস প্রতি পদক্ষেপে অতীত জীবনের কোন তুচ্ছ ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়...এবং এই ঘটনাবলীর একটি মধুর ও তুচ্ছতম ঘটনাই হয় আমাদের জীবনের পরমতম সারবস্তু।

আমি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে নিষ্ক্রিয় বিলিয়ার্ড-দণ্ডটির ওপর দুই হাত দিয়ে ভর করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। এক মিনিট পর তিনি আবার সুরু করলেন –

"সত্যিই, আঠের বছর বয়সের সময় তিনি সুন্দরীই ছিলেন ...লাবণ্যময়ী এবং নিখুঁত... আঃ সুন্দরী। সুন্দরী সুন্দরী এবং লক্ষ্মী দয়ালু এবং বিমোহিনী তরুণী। তাঁর চোখ দুটি ছিল নীল... স্বচ্ছ... ও-রকম আর কখনও দেখিনি।....

আবার তিনি থামলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তিনি বিয়ে করলেন না কেন!" তিনি যেন আমায় জবাব না দিয়ে অপসৃয়মান 'বিয়ে' কথাটিকে উদ্দেশ করে বললেন—

"কেন? কেন? তিনি করেন নি।... তিনি করেননি। তিরিশ হাজার ফ্রাঁ বিয়ের যৌতুকের জন্য তাঁর কাছে ছিল এবং অনেকবার তাঁকে বিয়ের কথা বলাও হয়েছে কিন্তু তিনি সম্মত হন নি। আমি যখন আমার খুড়তুত বোন সারলোত্তকে বিয়ে তখন তাঁকে বেশ বিষণ্ণ মনে হয়েছিল। ছ'বছর ধরে আমার স্ত্রী বাগদত্তা ছিলেন।'

আমি মঁসিও সাঁতালের দিকে চাইলাম এবং মনে হল তাঁর অন্তরাত্মার ভাষা বুঝতে পারলাম।...আমি যেন এক সৎ ন্যায়পরায়ণ এবং শোকার্ত হৃদয়ের আবরণ ভেদ করে দেখতে পেলাম মূক অনাবিষ্কৃত একটি হৃদয় যাকে কেউ জানে না...এমন কি তারাও নয় যারা এরই জন্য নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করছে।....

হঠাৎ কৌতূহল দমন করতে না পেরে দুঃসাহস করে বলেই ফেললাম:

"মঁসিও সাঁতাল, আপনার ওঁকে বিয়ে করা উচিত ছিল।"

"কাকে বিয়ে করা উচিত ছিল ?"

"মাদমোয়াজেল প্যার্লকে।"

"কেন ?"

"কারণ আপনি আপনার খুড়তুত বোনের চাইতে তাঁকে ঢের বেশী ভালবাসতেন।" তিনি আমার দিকে চাইলেন .. উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি...অদ্ভুত গোল চোখদুটি তোৎলাতে লাগলেন—

"আমি তাঁকে ভালবাসতাম আমি !...কেমন করে ? .. কে বললে তোকে ?"

"কেন, পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর জন্যই আপনি বিয়ে করতে দেরী করছিলেন এবং আপনার খুড়তুত বোনকেও ছ' বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।"

বাঁ হাতের বলটা ছেড়ে দিয়ে চক মোছবার ন্যাকড়াটা দিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ---অদ্ভুতভাবে কাঁদতে লাগলেন একসঙ্গে চোখ, নাক ও মুখে চাপ দিলে স্পঞ্জ যেমন করে কাঁদে। ঐ চক মোছবার ন্যাকড়ার ভেতরেই কাশলেন, থুতু ফেললেন আবার ওটা দিয়েই নাক-চোখ মুছলেন মুখমণ্ডলের সমস্ত বিবর থেকেই জলস্রোত প্রবাহিত হতে লাগল এবং গলা থেকে গলা পরিষ্কার করবার মত আওয়াজ হতে লাগল।...

হতভম্ব এবং লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল আমার···কি বলব বা কি করব বুঝতে পারছিলাম না।

হঠাৎ সিঁড়িতে মাদাম সাঁতালের গলা শোনা গেল— "তোমাদের এখনও ধূমপান শেষ হ'লনা ?"

আমি দরজা খুলে চেঁচিয়ে বললাম—"হ্যাঁ আমরা এখখুনি যাচ্ছি।"

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর কনুই ধরে বললাম —"মসিও সাঁতাল। বন্ধু সাঁতাল। শুনুন. আপনার স্ত্রী ডাকছেন, আপনি শান্ত হোন....তাড়াতাড়ি শান্ত হোন ··· নিচে নামতে হবে. শান্ত হোন।"

তিনি তোৎলাতে লাগলেন —"হ্যাঁ ··হ্যাঁ আমি আসছি। বেচারী। আমি আসছি ওকে বল্ আমি যাচ্ছি।"

যে ন্যাকড়াটা দিয়ে তিন বছর ধরে স্লেট মোছা হচ্ছিল সেটা দিয়ে তিনি সচেতনভাবেই মুখ মুছতে লাগলেন। তারপর যখন বেরিয়ে এলেন দেখা গেল মুখটা অর্ধেক সাদা আর অর্ধেক লাল – কপাল, নাক, গালদুটি আর থুতনিটা সাদা ফোলা চোখ দুটো তখনও জলে ভর্তি।···

আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে আস্তে বললাম—"মাপ করবেন, মসিও সাঁতাল··· আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে সত্যিই আমি খুব দুঃখিত।....কিন্তু আমি জানতাম না। আপনি বুঝতে পারছেন···"

তিনি আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন –"হ্যাঁ···হ্যাঁ কখনও কখনও সঙ্কট মুহূর্ত আসে

তারপর তিনি মুখটা জলের বেসিনে ডুবিয়ে দিলেন। যখন মুখ তুললেন তখনও কারও সামনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যায় না। একটা চাতুরী আমার মাথায় এল। তিনি যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখছিলেন তখন আমি বললাম—"ঠিক আছে. বলব যে আপনার চোখে একটা ধুলোর কণা গিয়েছে তাহলে সবার সামনেই ইচ্ছে করলে যত খুশী কাঁদতে পারবেন।"

নিজের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নিচে নামলেন।

সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কেউ বালির কণা খুঁজে পেলেন না। তাঁরা বললেন যে একবার এইরকম এক ঘটনায় ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়েছিল।

আমি মাদমোয়াজেল প্যার্লের কাছে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে দেখলাম —এক তীব্র কৌতূহলের জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং এই কৌতূহলই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

সত্যিই তিনি সুশ্রী ছিলেন – বড় বড় সুন্দর চোখদুটিতে শান্তভাব পুরোপুরি খোলা···মনে হচ্ছিল যেন কখনও আর বন্ধ করবেন না। - তাঁর পোষাকটি ছিল হাস্যকর --বৃদ্ধা

মহিলার বিচ্ছিরি পোষাক পরেছিলেন কিন্তু তাহলেও তাতে তাঁর স্বাভাবিক লাবণ্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।—

মনে হল যা সঁও সাঁওতালের মত তাঁরও অন্তরাত্মার ভাষা আমি বুঝতে পারলাম। তিনি মসিও সাঁওতালকে ভাল বাসতেন কি না এবং সে দুর্ভের দুঃসহ যন্ত্রণার কোন বাহ্য-প্রকাশ নেই অথচ যা রাত্রে নির্জন অন্ধকার কক্ষে সহসা প্রকট হয়ে পড়ে তেমনি যন্ত্রণায় তিনিও মসিও সাঁওতালের মত দীর্ঘকাল ধরে দগ্ধ হয়েছেন কি না জানবার জন্য তীব্র আকাঙ্খা হল।

আমি তাঁর দিকে চাইলাম। দেখতে পেলাম কাঁচুলীর নিচে হৃদস্পন্দন...এবং সন্দেহ হল এই অমায়িক সরল সত্তাটিও সিল্ক উপাধানের ভেতরে প্রতি রাত্রে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে কি না এবং বিছানায় শুয়ে জরাক্রান্ত রোগীর মত ছটফট করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে কি না।

শিশুরা যেমন রত্নালংকার ভেঙ্গে ভেতরটা দেখে আমিও ঠিক তেমনি ভাবে ফিস্ ফিস্ করে তাঁকে বললাম—"আপনি যদি মসিও সাঁওতালকে কাঁদতে দেখতেন তবে আপনার ও তাঁর প্রতি করুণা হত।"

চমকে উঠে বললেন তিনি—"কি? তিনি কাঁদছিলেন?"

"হ্যাঁ, তিনি কাঁদছিলেন।"

"কিন্তু কেন?"

"আপনার জন্য"

"আমার জন্য?"

হ্যাঁ। আমায় বলছিলেন আগে আপনাকে তিনি কত ভালবাসতেন এবং কত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে ছেড়ে তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।"....

তাঁর বিবর্ণ মুখখানি যেন ঈষৎ দীর্ঘতর হ'ল। শান্ত সদা বিস্ফারিত আঁখি দুটি সহসা বন্ধ হয়ে গেল—এত আকস্মিক ভাবে যে মনে হল যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল চেয়ার থেকে স্খলিত কাপড়ের মত মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন...ধীরে ধীরে কোন অতলে তলিয়ে গেলেন।....

আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম—"মা-মোয়াজেল প্যার্ল অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। সাহায্য করুন। সাহায্য করুন।"

মাদাম সাঁওতাল এবং তাঁর মেয়েরা ছুটে এলেন! তাঁরা যখন জল, তোয়ালে এবং ভিনিগার আনতে গেলেন সেই সুযোগে টুপিটা হাতে নিয়ে চম্পট দিলাম—দুঃখ এবং অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত মনে দীর্ঘপদক্ষেপে কম্পিতহৃদয়ে চলতে লাগলাম।

এখন মাঝে মাঝে আমি আনন্দ অনুভব করি এবং মনে হয় আমি যা করেছিলাম তার প্রয়োজন ছিল এবং তা প্রশংসার যোগ্যও বটে। ভেবেছি—"আমি যা করেছি তা ঠিক? না অন্যায়?" তাঁদের অন্তরাত্মায় সেই জিনিসটি ছিল শুরু হতে সীসের গুলীর মত। এখন কি তাঁরা আরও সুখী হবেন না? নতুন করে আবার বেদনা সুরু হবার সময় অতীত হয়ে গিয়েছে আবার মধুর সুখস্মৃতি বলে মনে হবার সময় এখনও অনাগত।

হয়তো আগামী বসন্তকালের একটি সন্ধ্যায় যখন গাছের ডালের ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো ঘাসের ওপর তাঁদের পায়ের কাছে লুটোপুটি খাবে তখন তাঁরা নীরব বেদনার কথা স্মরণ করে পরস্পর পরস্পরের হাতে হাত মেলাবেন।....সেই ক্ষণিক করস্পর্শ শিরায় শিরায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ জাগাবে...মৃত আত্মা দুটি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। সেই মাদকতার ক্ষণিক দিব্যানুভূতি, সেই উন্মাদনা একটিমাত্র বক্ষঃস্পন্দনেই প্রেমিকযুগলের কাছে বয়ে আনে যে সুখানুভূতি অপরে তা সারা জীবন ধরেও পায়না।

পুস্তক পরিচয়

অন্তর-সন্ধানে একটি স্মরণীয় উপন্যাস

দ্বিতীয় অন্তর

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬১

পৃষ্ঠা : ৪০০

মূল্য : ৯.৫০

এক

··· মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকেই বলা চলে। তাঁর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় মনের অস্তিত্ব যে ছিল না তা বলা চলে না। কিন্তু একটি সুগঠিত জীবনজিজ্ঞাসার ভিত্তিভূমিতে মন তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, মনকে বৈজ্ঞানিক-সন্ধিৎসায় এবং জীবন-পরীক্ষার রসায়নাগারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই। রবীন্দ্রনাথের পরও বাংলা উপন্যাসের একটি [উল্লেখযোগ্য অংশ মানবমনের রহস্য-জিজ্ঞাসায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। এমনকি, আধুনিক উপন্যাসে ফ্রয়েডকে অতিক্রম করে নবতর মনোবিজ্ঞানের পথ অনুসরণ করার চেষ্টা চলছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদারের পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে বিমল কর, অসীম রায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ মনের গহনে তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলছেন।

আলোচ্য উপন্যাসটিতেও একটি প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া নারীর মানবিক রাজ্যের আলো ছায়ার লীলাচাঞ্চল্য প্রশংসনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। মেয়েটির নাম কৃষ্ণা। নামে কৃষ্ণা, কিন্তু অন্তরে প্রদীপ্তা। আর জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বে আশ্চর্যভাবে জীবনময়ী। দুঃখের অগ্নিতে শুচিস্নিগ্ধা; বেদনার বিভায় বিকশিতা। জীবনের অর্থ অন্বেষণে নিত্য সচলা. ব্যক্তিত্বে অটল, অথচ অন্তরে চিরনবীনা। বঞ্চনায় দীর্ণা, আবার প্রাপ্তিতে পূর্ণা।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে একটি মনের রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে সঞ্চরণ করতে হয়, আশ্চর্য এক জীবন-জিজ্ঞাসায় অন্তর মথিত হয়। জীবনের গহন-গভীরতা যেন আরও অতলস্পর্শী হয়, কিন্তু জীবনে জাগে জীবন। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা অতিক্রমণের একটি দুর্বার প্রেরণা পাওয়া যায়।

দুই

লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের জেন অস্টেনের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছে করে। নারী-মনের প্রতিটি কম্পন, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন' যেন লেখক কান পেতে শুনছেন। মন দিয়ে দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

উপন্যাসটি আদ্যন্ত নায়িকা কৃষ্ণার জবানীতে ব্যক্ত। পুরুষ লেখকের পক্ষে নারীহৃদয়ের এমন সহৃদয় পর্যবেক্ষণ

বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, তিনি জেন অস্টেনের কৃতিত্বকেও অতিক্রম করে গেছেন। মহিলা ঔপন্যাসিক অস্টেনের পক্ষে নারীমনের আনন্দ বেদনা অনুধাবন যত স্বাভাবিক, কোন পুরুষ লেখকের পক্ষে তা ততখানি দুরূহ। কিন্তু এই দুঃসাধ্য কার্যে শচীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তির স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন। এখানেই অস্টেনের সঙ্গে তাঁর তুলনীয়তা এবং অতুলনীয়তা।

তিন

কলকাতাবাসী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বড় মেয়ে কৃষ্ণা। এরা পাঁচ বোন, দু' ভাই। মেজো অলকা, তারপরে ভাই বিমল। তারপর আবার তিনবোন অমিতা, সুনীরা এবং ক্ষমা। সবার কনিষ্ঠ ভাই অমল।

এদের বাবা দৃঢ়চেতা, উদ্যোগী পুরুষ। নিজের ভাগ্য নিজে গঠন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাঁর সব পুত্র-কন্যার। অথচ তিনি খুব রাশভারী নন। নন। স্নেহপ্রবণ এবং উদারহৃদয়। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আধুনিক—'মেয়েদের উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে তারপর বিয়ে দিবো।' কৃষ্ণার মা'ও তার বাবারই প্রতিরূপ। স্নেহময়ী, উদার, স্বামীগত-প্রাণা। স্বামীর ইচ্ছাই তাঁর কাছে শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়নি, তাঁর উদারতা অটুট থেকেছে। ভারতীয় মাতার এক আদর্শ মূর্তি ; আদর্শ হলেও সংসারপরিচালনে বাস্তব, পরিবারের মধ্যে শক্তির কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ এরকম কল্যাণী নারীর উদ্দেশেই বলেছেন—'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।'

এই পরিবারে বর্ধিতা কৃষ্ণার আত্মকথন 'দ্বিতীয় অন্তর' উপন্যাসটি। কৃষ্ণার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত হল দুই পুরুষ অরিন্দম আর হরিশচন্দ্র। প্রেমের পরিমণ্ডলে জাত হল ত্রি-কৌণিক দ্বন্দ্ব (Triangular conflict)। জীবন-সমুদ্রে তা থেকে উদ্ভূত হল বিষামৃত।' প্রেমের অমৃত-যন্ত্রণা। প্রেম পারাবারের চির-প্রতীক্ষিত বিরহ। সেই বিরহ সীমাহীন, পরিমাণহীন, অব্যক্ত আনন্দ এবং অনির্বাচ্য বেদনার সুরমূর্ছনায় বিষণ্ণ-মধুর। উপন্যাসের অন্তে এসে তাই নায়িকা কৃষ্ণার এ উপলব্ধি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ পৃথিবীর কঠিন অভিজ্ঞতাসম্ভূত—'এ নিগূঢ় বিরহের বুঝি শেষ নেই, দেশ-দেশান্তরে, গ্রহ-গ্রহান্তরে, কাল-কালান্তরে এর পরিব্যাপ্তি। এ সুর যাকে ছুঁয়েছে, তার অন্তর্লীন আনন্দেরও অবধি নেই! দুবিরহ বিষাদেরও শেষ নেই!' এ বিরহেরই আরেক নাম দুকূলপ্লাবী প্রেম—এরই নাম অমৃত-যন্ত্রণা। তাই নিরন্তর ব্যাকুল হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয়—'এ কী ক্রন্দন বাজিল অন্তর-মাঝে, বিধুর-অন্তর ব্যাকুলতা!' এই অন্তর-ব্যাকুলতার ক্রমবিবর্তনকে লেখক সংগীতের মত পর্যায়-বিন্যস্ত করেছেন আলাপ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এবং রেশ এই সুর-সাধনায় উপন্যাসটি কখনো মন্থরগতি কখনো দ্রুত ধাবমান। কখনো মন্দ্রমুখর, কখনো বা শান্ত-বিষণ্ণ। গানের সমে এসে যেন সেই ব্যাকুলতা নিঃসীম প্রেম-পারাবারে লীন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট রয়েছে একটি বিলম্বিত রেশ, একটি স্নাতর সূক্ষ্ম আলোক-রেখা। সেই আলোক-রেখাও শেষ পর্যন্ত অতলান্ত বারিধিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। সে বারিধি বাইরে তরঙ্গ-চঞ্চল, অন্তরে অক্ষুব্ধ ; প্রশান্ত। বাইরে তার এক অন্তর, ভেতরে তার অন্য অন্তর—'দ্বিতীয় অন্তর'। এই দ্বিতীয় অন্তর সন্ধানের জন্যেই তো কৃষ্ণার জীবনাভিসার। এই দ্বিতীয় অন্তরকে কিন্তু অর্ধ-চেতন Sub-conscious) মন বললে ভুল করা হবে। পরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মানুষের যে অন্তরের কাজ-কারবার, তাই হ'ল তার সাধারণ বা প্রথম অন্তর। কিন্তু মানুষে মানুষে তবু দেখা যায় নানা পার্থক্য, প্রতিটি মানুষ আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে আপনার সত্তাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। কিন্তু এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মূল কোথায়? তার প্রকাশই বা কেমন করে? মানুষ যখন পরিবেশকে

স্বীকার করে নিয়েও তার বাহ্যিক প্রভাব থেকে স্বয়ং বিমুক্ত হয়, অবসরের নির্জনতায় আত্মসমীক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখনই তার দ্বিতীয় অন্তরের প্রকাশ। আর এখানেই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মূল। অন্য কথায়, সমাজ বা গোষ্ঠী-চৈতন্যকে মানুষের প্রথম অন্তর এবং তার ব্যক্তি-চৈতন্যকে দ্বিতীয় অন্তর বলেই বোধ হয় এখানে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবন যেহেতু সরল রেখায় চলেনা, জ্যামিতিক নিয়ম হুবহু মেনে চলেনা, সেইহেতু তার প্রথম অন্তরেও আশ্চর্য জটিলতায় দ্বিতীয় অন্তর ক্রিয়া করে, তার মধ্যেই দ্বিতীয় অন্তরের উপাদান পরিদৃশ্যমান হতে হতে মিলিয়ে যায়। আবার দ্বিতীয় অন্তরও সময় সময় তার গহনা-গুহা ত্যাগ করে উপরের স্তরে ভাসমান হয়ে উঠে জীবন সমুদ্রে প্রলয়-মন্থনের আবির্ভাব ঘটায়। এই ঘনীভূত জীবন-পরিকল্পনাতেই উপন্যাসটির তত্ত্ব সত্যের কিরণ-স্নানে ধন্য হয়েছে।

চার

কলকাতার কলেজে পাঠরত এবং হোস্টেলবাসী অরিন্দম কৃষ্ণার ভাই বিমলের সমবয়সী। প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র দুজনেই। ভিন্ন কলেজে পড়লেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল অল্প সময়েই। অরিন্দমের সঙ্গে এদের একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। সেই সূত্রে এদের বাড়িতে যাতায়াত। প্রথম যখন এ বাড়িতে আসে তখন তার বয়স আঠারো। কৃষ্ণার বয়স তখন বাইশ, অলকার কুড়ি, অসিতার ষোল, সুধীরার চৌদ্দ, ক্ষমার বারো, অমলের দশ। যথাসময়ে কৃষ্ণা বাংলায় এম. এ পাশ করলো, গান-বাজনাতেও তার দক্ষতা প্রশংসনীয়। অলকা ইংরেজী-সাহিত্যে গবেষণায় নিরতা হল। কিন্তু এদের সবার মধ্যেই অরিন্দমকে নিয়ে নানা জল্পনা চলতো। কেউ বলতো সে হবে ইঞ্জিনীয়র, কেউ বলতো ডাক্তার, কেউ বলতো অধ্যাপক, কেউ বলতো লেখক, কেউ বা বলতো গায়ক। কৃষ্ণা, অলকা, বিমল, তাকে নাম ধরেই ডাকতো। অসিতা-প্রমুখ ছোটোরা ডাকতো অরুদা। বড়োরা বলতো সংক্ষেপে অরু। কিন্তু লক্ষণীয়, অরু কখনো এদের কোন সম্বোধনেই ডাকেনি, কাউকেই কোন সম্বোধন সে করেনি।

এমন সময় এবাড়িতে একদিন বিয়ের বাঁশী বেজে উঠলো। না বড় মেয়ের বিয়ে নয়। মেজো মেয়ে অলকার। বীরাট প্রবাসী ধনীসন্তান হরিশচন্দ্র এসে একদিন আকস্মিকভাবেই অলকার সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই অনিমেষের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। কৃষ্ণার মা-বাবা ভদ্রতার হরিশকে অনেক অনুনয় করেছিলেন কৃষ্ণাকে গ্রহণ করার জন্য। তাঁর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ, কৃষ্ণার সাতাশ। কিন্তু তিনি বলেন, তাঁর বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, আর বিয়ে করার তাঁর ইচ্ছেও নেই। সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি কৃষ্ণার যোগ্য নন।

অলকার বিয়ের রাতে অস্বাভাবিকভাবে অরু কৃষ্ণার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসার কথা তাকে জানায়। সে বলে, সে তার কাছ থেকে দিদির স্নেহ চায়না, চায় প্রিয়ার ভালোবাসা। অথচ এ পর্যন্ত সবাই জেনে এসেছে তথা মনে করে এসেছে, অরু এখানে যার পদধ্বনি শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে, যার দর্শনে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়, সে হল ক্ষমা। ক্ষমা অবশ্য অরুকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভালোবাসা পরিণয়বন্ধনে মুক্তি পেলোনা। তার বিয়ে হল মলয়ের সঙ্গে এবং স্বামীর সঙ্গে তার মনের মিল হল না। মলয় পেলনা ক্ষমার দ্বিতীয় অন্তরের স্পর্শ। সে অন্তর যার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল সে আবার দ্বিতীয় অন্তর নিবেদন করে বসে আছে তার চাইতে বয়সে বড় আরেকজনের কাছে। মানুষের আন্তর জীবনের এই স্বাধিকারকে খণ্ডিত করবে কে? আর এ থেকে উপজাত প্রচণ্ড বিক্ষোভেরই বা সমাধান পাওয়া যাবে কোথায়?

এদিকে কৃষ্ণার দ্বিতীয় অন্তর সূর্যমুখীর মত যে সূর্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে, সে তো অরিন্দম নয়। খুব সূক্ষ্মভাবে

লেখক দেখিয়েছেন, সে রাজ্যের অধীশ্বর হরিশচন্দ্র। অথচ এই হরিশই এককালে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হরিশের মনেও কৃষ্ণার স্থান ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, সুচারু শিল্প-চাতুর্যে লেখক আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

এদিকে একে একে চারবোনের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কৃষ্ণা আজও অনূঢ়া। আজ সে বত্রিশে পা দিয়ে নিজের দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছে। সে কি তবে নিগৃহীত, সে কি তবে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই প্রতীক্ষা করে থাকবে। এদিকে অবিনয় আর তার সম্পর্কে বাড়ির সবাই এবং পরিচিতদের অনেকেই নানা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। ভাই বিমল এবং তার স্ত্রীও অসহনীয় ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর বিমল অপমান করে অক্রূরকে এ বাড়ি থেকে প্রায় বিতাড়িতই করেছে বলা চলে। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং হৃদয়-বেদনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তার আত্মস্বীকার মাধ্যমেই লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

অক্রূর চলে গেছে পিতার কর্মস্থল ডিংরীতে—এলাহাবাদের কাছাকাছি। তার বাবা পরলোক গমন করেছেন। তাই আজ সে নিঃসঙ্গ জীবনে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিয়েছে।

এরপর কৃষ্ণাকে দেখি শিক্ষকতার কাজে নানা স্থানে ভ্রাম্যমাণা। কখনো দেখি অক্রূর প্রবাসগৃহে, কখনো হরিশের গুরুদেবের বেদ-প্রয়াগের আশ্রমে। অনুভব করি, হরিশের প্রতি তার অনুরাগ নিবিড় শ্রদ্ধা আর আত্মনিবেদনে পরিপ্লুত, অক্রূর প্রতি তার ভালোবাসা দুর্বার প্রশ্রয়ে লালিত। কিংবা তার প্রতি অক্রূর অনুরাগ সস্নেহ স্বীকৃতিতে সম্মানিত। কোনটি যে অধিকতর প্রবল, কোন্‌টি যে তার পক্ষে চিরকালের সম্পদ তা নিয়েই তো তার জীবন সমস্যা।

বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তার আর হল না কোথাও। তার চিন্তায় যা তার অকল্পনীয় উদারতার জগতে উত্তীর্ণা। তার মায়ের আশিস এবং অনুমতিতে সে চললো আবার অক্রূর আবাসে, তার ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করতে, তাকে আশ্রয় করতে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে হরিশের বিয়ে পাকাপাকি হয়েও শেষ অবধি ভেঙ্গে গেল। মা তাই তাকে শেষে বললেন অক্রূর কাছেই চলে যেতে। বিবাহ হোক, আর নাই হোক, লোকে যা বলে বলুক তাতেও তাঁর কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু এবার যখন সে আবার অক্রূর আবাসে গেল তখন অক্রূ ব্যক্তিগত প্রেমের পথ অতিক্রম করে বিশ্বলোকের পথে তার চেতনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে। অক্রূর ক্ষেত্রে তাই দ্বিতীয় অন্তর অনুসন্ধান এইভাবেই শেষ পর্যন্ত পরিণাম লাভ করলো। এই প্রেম রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-সংস্পর্শী প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রেমে মিশ্রিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। একথার গূঢ়ার্থ এই, সাধারণ প্রেম শুধু ভালোবাসাতেই তুষ্ট। কিন্তু অক্রূর প্রেম এখানে ভালোবাসাকে অতিক্রম করে সমাজ তথা মানবকল্যাণের দিগন্তে যাত্রা করেছে।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাকে হরিশের সান্নিধ্যেই দেখি। কিন্তু তার হৃদয়রহস্য উন্মোচনের নিগূঢ় প্রক্রিয়াতে লেখক বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এতে মনোবিশ্লেষণ আছে, সুতীক্ষ্ণ আত্মস্বীকা আছে। আছে অবচেতনার আলোছায়া, আছে চেতনাপ্রবাহের (Stream of consciousness) সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবচেতনার প্রকাশে ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্ব অতিক্রান্ত হয়ে একটি অন্তর্গূঢ় জীবনভাবনার বলিষ্ঠতা মূর্তিলাভ করেছে। আর সব কিছু কৃষ্ণার জীবন-বোধের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে। মনোবিশ্লেষণের এমন বলিষ্ঠ এবং জীবনচঞ্চল প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে অলভ্য না হলেও বিরল।

পাঁচ

এ ছাড়া, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগের কথা স্মরণ না করলে আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে।

হরিশ এবং তাঁর গুরুদেবের সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মবোধের চিত্রটি অত্যন্ত মনোরম। গুরুদেবের ধর্মচেতনার কর্মমূলক কল্যাণের কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। এই প্রেরণাতেই হরিশ মানব-কল্যাণমূলক ধর্মের প্রচারে লেখনী-ধারণ করেছেন। হরিশ অনেকটা শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের মহিমের সঙ্গে তুলনীয়, আর অরিন্দমের মধ্যেও গৃহদাহের সুরেশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু এ দুটি চরিত্রের পরিকল্পনা মহিম এবং সুরেশের চাইতেও অগ্রসর, অধিকতর স্পষ্ট।

আধুনিক ভারতে ধর্মের গোঁড়ামি দূর করার জন্যে গুরুদেবের আলোচনা মূল্যবান। তিনি বলেছেন উদার ধর্মবোধের কথা, ধর্মান্ধতার কথা নয়। বলেছেন একটি সাধারণ পালনীয় পদ্ধতির (Common ethics) কথা।

কৃষ্ণার দুঃখময় জীবন পর্যবেক্ষণ করতে করতে তার মাতার সর্বসংস্কার মুক্তির ঘটনাও স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। তাই উপন্যাসের শেষের দিকে এই মহিমময়ী নারীর মৃত্যু একটি সুতীব্র বেদনার রেশ রেখে যায়।

অরুর প্রতি অনুরক্তা ক্ষমা, লতা, গ্রাম্য নিম্নবর্ণের তরুণী সোনিয়া—প্রভৃতি চরিত্র সুকৌশলে অঙ্কিত। বিশেষতঃ লতা চরিত্রের রহস্যময়তা এবং দুঃখদীর্ণ ভালোবাসা চিত্রণে লেখক প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অরুর অরণ্য আবাসের পশুশালার মধ্যে একটি সাপের অবতারণা করে লেখক অতি নিপুণ ব্যঞ্জনাধর্মের আভাস দিয়েছেন। এ সাপটি কি মনেরই প্রতিচ্ছায়া নয়? তাই কৃষ্ণা সাপটিকে দেখামাত্র আনন্দিত হয়। রাত্রিতে ঘুম হয় না, মনে হয় এই বুঝি ওর বিষাক্ত স্পর্শে সমস্ত চুরমার হয়ে যায়। সাপের প্রতীকের সাহায্যে কৃষ্ণার মানসিক দ্বন্দ্বের মনোরম বিশ্লেষণে লেখক অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

'দ্বিতীয় অন্তর' উপন্যাসের এই গভীর জীবনবোধ মননশীল পাঠকদের কাছে একদিন অবশ্যই মর্যাদা পাবে। কিন্তু আজকের যুগের তরল আনন্দপ্রয়াসী অগণিত পাঠকের কাছে হয়তো এ গ্রন্থের আবেদন পৌঁছবে না। তাই উপন্যাসটি তথাকথিত জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলেও আমাদের মনে হয় না। তবে বাংলার সিরিয়াস সাহিত্যরসিকদের কর্তব্য শচীন্দ্রনাথের মত বলিষ্ঠ লেখককে তাঁর যথোচিত মর্যাদা দেওয়া।

ছয়

দু একটি কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা যেতে পারে। এ উপন্যাসের পটভূমি এবং চরিত্রায়ন উচ্চবিত্ত সমাজের পরিধিতে। অনূঢ়া মেয়ের সমস্যা তাই এখানে শুধু মানসিক তথা আত্মিক। কিন্তু আজকের সমাজে আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের সমস্যা যে আরো কতখানি জটিল এবং আবিল হয়ে উঠেছে, তার পরিমাপ করবে কে? সমাজের ঐ অবহেলিত দিকের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। শচীন্দ্রনাথের মতো শক্তিমান লেখকের পক্ষেই এ সমস্যারও নিপুণ শিল্পায়ন সম্ভব, চলচ্চিত্র-নির্ভর অর্থগৃধ্নু সাহিত্যিকের পক্ষে নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এ শ্রেণীর একটি বিশ্লেষণমূলক উপন্যাসে যে নাটকীয় পন্থায় হরিশ তাঁর ভাই অনিমেষের ভাবী বধূকে আবিষ্কার করেছেন তাতে একদিকে অবিশ্বাস্যতার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে অলৌকিকতার স্পর্শে উপন্যাসের বাস্তব জীবনপ্রচ্ছদ ক্ষুণ্ণ হয়। এমন একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকর্মে এধরণের অসঙ্গতি না থাকলে খুবই তৃপ্তি লাভ করতাম।

'দ্বিতীয় অন্তর' উপন্যাসের লেখকের বেশ কটি উপন্যাস, উপন্যাসোপম বড় গল্প, ছোট গল্পসংকলন আছে দেখলাম। কিন্তু অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আলোচ্য উপন্যাসটিই বর্তমান সমালোচক কর্তৃক পঠিত

শচীন্দ্রনাথের প্রথম বই। এর প্রধান কারণ, তিনি খুব জনপ্রিয় নন। সম্ভবতঃ প্রচারবিমুখ। তবে 'দ্বিতীয় অন্তর' তাঁর অন্য উপন্যাসগুলি পড়বার প্রেরণা জাগালো; পূর্বকথিত সংকোচের লজ্জা দূর করতে আহ্বান জানালো। এখানেই বোধ করি শচীন্দ্রনাথের একটি মহৎ কৃতিত্ব। বাক্‌-সাহিত্যের কর্তৃপক্ষকে এই শ্রেণীর একটি অবাণিজ্যিক উপন্যাস প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখানোর জন্য সাধুবাদ না জানিয়ে পারা গেল না। কারণ রম্যরচনার প্রকাশক আজ অগণ্য, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যপ্রকাশের উৎসাহ খুবই পরিমিত।

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

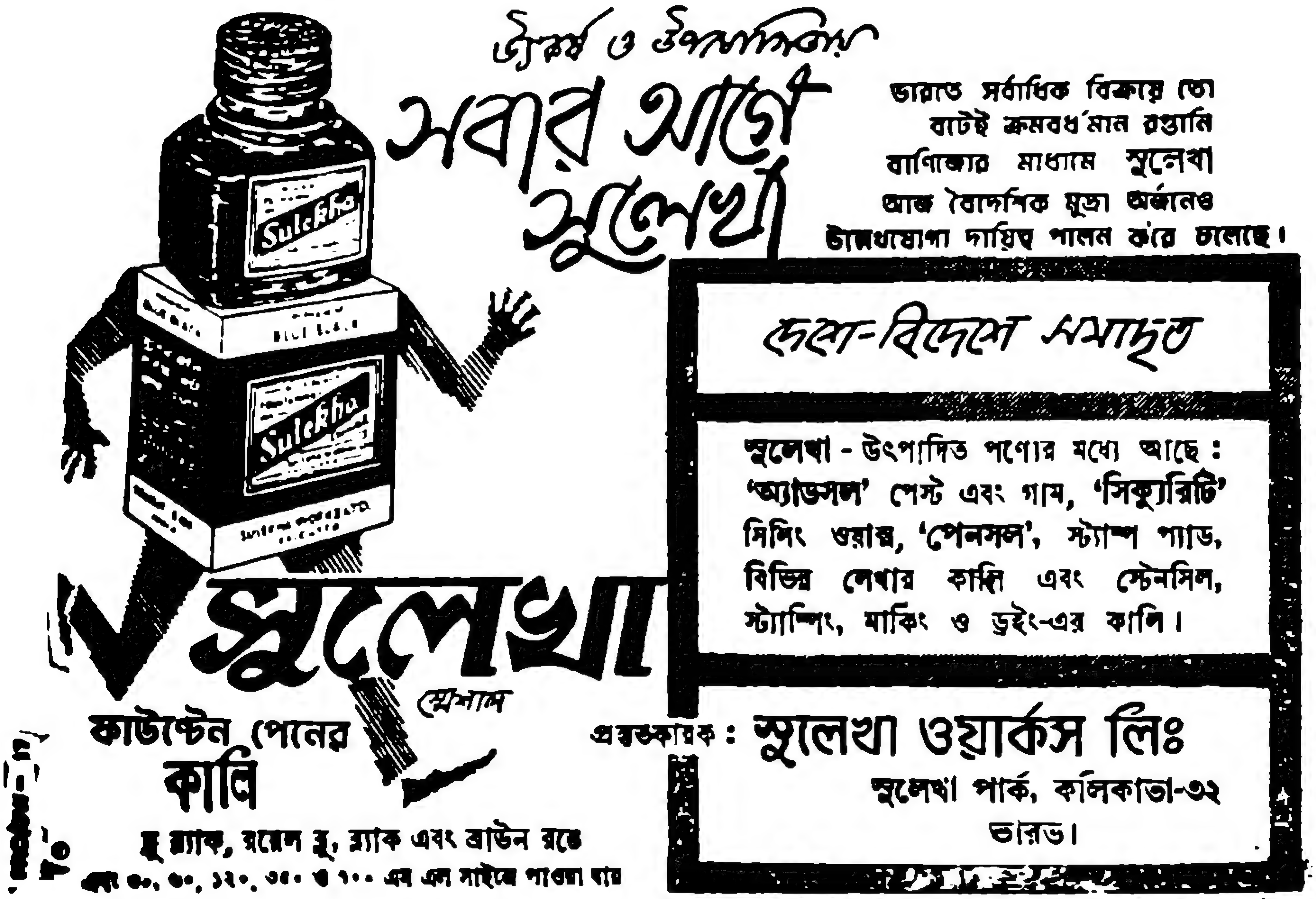

বিশ্বাবর্ত

আমেরিকার নির্বাচন

আমেরিকার দুঃস্বপ্ন ব্যারী গোল্ডওয়াটার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে শুধু গোল্ডওয়াটারই হতমান হন নাই, সমগ্র রিপাবলিকান দল সর্বস্তরের নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়ে মার্কিনী রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় (bi-partisan) পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। জনসন ও ডেমোক্রাট দলের বিস্ময়কর ভোটের জোয়ার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রতিনিধি সভা ও সেনেটে বিপুল সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছে। জনসন ও গোল্ডওয়াটারের ভোটের ব্যবধান দেড় কোটির বেশী - রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইতিপূর্বে যা কখনও ঘটে নাই। প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬১'৪ ভোট পেয়ে জনসন ১৯২০তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওয়ারেন হার্ডিং-এর শতকরা ৬০'৪ ভোট কিম্বা ১৯৩৬ এ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের ৬০'৮ ভোটের রেকর্ডকে হার মানিয়েছেন। তাছাড়া ওয়াশিংটনের কোলাম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ও চুয়াল্লিশটি রাজ্য জনসন দখল করেছেন এবং সেই সঙ্গে ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন ৪৮৬। ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেলেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে গোল্ডওয়াটারের ইলেকটোরাল ভোট মাত্র বাহান্ন এবং তাকে সায় দিয়েছে, তার নিজ রাজ্য এরিজোনা এবং ঘোর দক্ষিণাঞ্চলের অপর পাঁচটি রাজ্য। ডেমক্র্যাট দল ২৫টি রাজ্যের গভর্ণর পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৭টি রাজ্য দখল করেছে, সেনেটের ৩৫টি আসনের প্রতিযোগিতায় ২৮টি আসনে তারা জয়ী হয়েছেন এবং প্রতিনিধি সভায় গত সভার তুলনায় রিপাবলিকানদের চাইতে ৩ টি বেশী আসন আয়ত্তে এনেছে। পুরাতন সেনেটের ৬৬-৩৪ সংখ্যাধিক্যের তুলনায় নতুন সেনেটে ডেমক্র্যাটদের সংখ্যাধিক্য ৬৮-৩২ ; প্রতিনিধি সভায় পুরাতন ২৫৭-১৭৮-এর তুলনায় নতুন সভায় ডেমক্র্যাটদের সংখ্যাধিক্যের হার ২৯৫-১৪০। বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। রাজ্যের আইন পরিষদগুলির মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে ডেমক্র্যাটদের পুরোপুরি দখলে ছিল ২৬টি, রিপাবলিকানদের ১৮টি, অবশিষ্টগুলি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। কিন্তু নির্বাচনের পর ডেমক্র্যাটদের অবিমিশ্র অধিকার ৩৪টি রাজ্যের আইন পরিষদে বিস্তৃত হয়েছে এবং রিপাবলিকানদের হ্রাস পেয়ে পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। রাজ্যের রিপাবলিকান গভর্ণর জয়ী হলেও আইন পরিষদে ডেমক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠের বন্দী – এমন নজীরও রয়েছে। এবারকার নির্বাচনের পর মিচিগানের গভর্ণর রোমনী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গোল্ডওয়াটারকে অস্বীকার করে এই রিপাবলিকান গভর্ণরটি জয়ী হলেও রাজ্যের আইন-পরিষদে সম্পূর্ণরূপে ডেমক্র্যাটদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে। নির্বাচনোত্তর দ্বি-দলীয় রাজনীতির অন্তিমশয্যার করুণ রেখাঙ্কন জনসনের নিজ রাজ্য টেক্সাস-এ যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা আরও কোথাও দেখা যায় না। এই রাজ্যের প্রতিনিধি সভায় ১৮০টি ডেমক্র্যাট সদস্যের পাশে মাত্র একজন রিপাবলিকান জয়ী হয়েছেন, অবশিষ্ট সকল রিপাবলিকানই ধরাশায়ী হয়েছেন। ফ্রাঙ্ক কাহন নামক এই রিপাবলিকান সদস্যটিকে আর্তস্বরে বলতে শোনা গেছে "I make the two-party system in Texas"— "টেক্সাসে দ্বি-দলীয় রাজনীতির আমিই বাহক।"

রিপাবলিকান দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের সূচনা হয়েছিল গত জুলাই মাসে রিপাবলিকান দলের সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে রাষ্ট্রপতিপদের জন্য গোল্ডওয়াটারের

মনোনয়নে। উগ্রপন্থী গোল্ডওয়াটার ও তার সমর্থকবৃন্দ রিপাবলিকান দলের কাঠামোতে স্ক্যানটন্, নিক্সন, রকফেলার, ক্যাবটলজ্ প্রভৃতি উদারপন্থীদের প্রভাব খর্ব করে, দলের নেতৃত্ব করায়ত্ত করে ফেলে। সেদিন উগ্রপন্থীদের প্রতিভূ গোল্ডওয়াটার শুধু মনোনয়নই পেলো না—তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্ক্যানটন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। দলের নির্বাচনী নীতি নির্ধারণে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের দায়িত্ব বেসামরিক প্রশাসকদের হাত থেকে সামরিক প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত করে এবং নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার সম্বলিত আইনের প্রয়োগকে খর্ব করে এই উগ্রপন্থী রিপাবলিকানরা আমেরিকায় এবং বাইরে আতঙ্ক ও উদ্বেগের শিহরণ এনে দিয়েছিল। দলের মনোনয়ন গ্রহণ করে গোল্ডওয়াটারের সেই বক্তৃতায়—"Extremism in the defence of liberty is no vice and moderation in the defence of Justice is no virtue"—গোল্ডওয়াটারের ফ্যাসীবাদী জঙ্গী মনোভাব মূর্ত হয়ে, তাকে যুদ্ধবাজ ও চরম প্রতিক্রিয়াশীলরূপে চিহ্নিত করে রেখে গেলো।

সেদিন থেকেই আমেরিকার সমাজজীবনের শান্তিকামী শুভবুদ্ধি গোল্ডওয়াটারের বিরুদ্ধে জনসনের পশ্চাতে সংহত হতে শুরু করে। সেই শক্তি-সংহতিতে উদারপন্থী রিপাবলিকানরাও যোগ দিতে দ্বিধা করে নাই। স্ক্যানটন-লজ-রকফেলার গোষ্ঠি সরাসরি গোল্ডওয়াটারের- বিরোধিতাই করে। বিভিন্ন রাজ্যের অনেক প্রভাবশালী গভর্ণররাও গোল্ডওয়াটারের বিরোধিতা করে নিজের জয় সুনিশ্চিত করেছে। মিচিগানের গভর্ণর জর্জ রোমনীর জয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রাজ্যে জনসন গোল্ডওয়াটারের চাইতে দশ লক্ষ ভোটে জয়ী হলেও, গোল্ডওয়াটারের দলের গভর্ণর পদপ্রার্থী রোমনী তার প্রতিদ্বন্দ্বী জনসন-দলের প্রার্থীকে তিন লক্ষ ভোটে পরাজিত করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকানরা গোল্ডওয়াটারকে ভোট দেয় নাই যদিও গভর্ণর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকেই সমর্থন করেছে। রোড আইল্যাণ্ড এও জনসন শতকরা ৮০.৯ ভাগ ভোট পেলেও গভর্ণরের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী জন চাফী শতকরা ৬১.৩ ভাগ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যে জনসন শতকরা ৭৮ ভাগ ভোট পেয়েছেন এবং তারই পাশাপাশি নিগ্রো রিপাবলিকান প্রার্থী এডওয়ার্ড ব্রুক রাজ্যের এটর্ণী জেনারেল পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সেনেটের নির্বাচনে নিউইয়র্কে রবার্ট কেনেডির নিকট কেনেথ কিটিন-কের পরাজয় এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই রাজ্যের দুইটি আইন পরিষদেই ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রিপাবলিকান দলের বিপর্যয়ের আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। নিউইয়র্কের বিধান পরিষদের স্পীকার উদারপন্থী রিপাবলিকান জোসেফ, এফ কারলিনো অখ্যাত ডেমোক্র্যাটের নিকট পরাজিত হয়ে উদারপন্থী রিপাবলিকানদের উভয় সঙ্কট সখেদে বর্ণনা করে বলেছেন The Pro-Goldwater people were angry because I did not suppot him strongly. The anti-Goldwater people were angry because I did say I supported the national ticket."

জনসনের লাওস-ভিয়েটনাম নীতির তীব্র সমালোচনা দিয়ে গোল্ডওয়াটার তার নির্বাচনী অভিযান শুরু করলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই জনসন ও ডেমোক্র্যাটদের চরিত্র-হননের এবং নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার-বিরোধী প্রচারের উপরই তার পরবর্তীকালের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। গোল্ডওয়াটার শ্বেতাঙ্গদের প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের উপর বহুলাংশে নির্ভরও করেছিল। গোল্ডওয়াটার সমর্থকরা ভেবেছিল, দক্ষিণী রাজ্যগুলির প্রচলিত নিগ্রো বিদ্বেষে সিভিল রাইটস বিল ইন্ধন যুগিয়ে তাদের ডেমোক্র্যাট-সত্তাকে অভিভূত করে গোল্ডওয়াটারের সমর্থনে অনিবার্যভাবে প্ররোচিত করবে। দক্ষিণী রাজ্যগুলির প্রচলিত সমর্থন, কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও তার শহরতলীর 'অন্তর্লীন'

রক্ষণশীল ভোট ও শ্বেতাঙ্গদের প্রচ্ছন্ন নিগ্রো বিরোধিতা—এই সমর্থনের ভরসাতেই গোল্ডওয়াটারের নির্বাচনী আয়োজন। একমাত্র পাঁচটি দক্ষিণী রাজ্য ও নিজ রাজ্য আরিজোনা ছাড়া গোল্ডওয়াটার সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এ-ঘটনা সত্য গোল্ডওয়াটারের পূর্বে, গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্মিলনের পর কোনো রিপাবলিকানই মিসিসিপি, আলাবামা কিম্বা সাউথ ক্যারোলিনায় জয়ী হতে পারে নাই, জর্জিয়ায় তো কোনো সময়েই নয়। তেমনি ভেরমণ্টে জনসনই সর্বপ্রথম জয়ী ডেমোক্র্যাট। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, মধ্য-পশ্চিমে, পূবে সর্বত্র জনসনের রথ রিপাবলিকানদের ছারখার করে দিয়ে গেছে। গোল্ডওয়াটারের সাধের 'whitelash' কিম্বা 'backlash'-এর কোনো পদচিহ্নই কোথাও পাওয়া গেল না।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও জন কেনেডির অনুসৃত সামাজিক-আর্থিক নীতি থেকে এবং আমেরিকার দ্বি দলীয় পররাষ্ট্রনীতি থেকে বিচ্যুতির জন্য গোল্ডওয়াটারইজমের সর্বাত্মক চেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতায় স্যান ফ্রানসিসকো সম্মেলনের যুদ্ধবাদী আতঙ্কের শিহরণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তাই এক চীন ছাড়া সকল দেশেরই শুভেচ্ছা জনসনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে।

রিপাবলিকান দলের ভবিষ্যৎ কি? যে পার্টি আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের এক দশক আগে উত্তরাঞ্চলে দাস-প্রথা বিরোধী দলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, লিঙ্কনের নেতৃত্বে যে দল আমেরিকায় মানবীয় অধিকারের দাবীতে দাসপ্রথাক্লিষ্ট দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সেই রিপাবলিকান দলের প্রার্থী নিগ্রো-অধিকারের বিরোধিতায় অগ্রণী হয়ে এল। ফলে শতকরা ৯০ জন নিগ্রো ভোটার জনসনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর গোল্ডওয়াটার নিগ্রো বিরোধী দক্ষিণী ডেমক্র্যাটদের কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি দখল করেছে, যেমন আলাবামা, মিসিসিপি ও সাউথ ক্যারোলিনা – ১৮৭০ সনের পর যেসব রাজ্য কোনো দিন রিপাবলিকানদের ভোট দেয় নাই। ক্যাথলিকরা রিপাবলিকানদের বিমুখ করেছে। আমেরিকার প্রথম ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট কেনেডী যেখানে শতকরা ৬৩ ভাগ ক্যাথলিক ভোট পেয়েছিলেন জনসনের ভাগ সেখানে শতকরা ৭২ জনে দাঁড়িয়েছে।

এই সর্বাত্মক বিপর্যয় সত্ত্বেও নির্বাচনের পর গোল্ডওয়াটারের কণ্ঠে কোনো অনুশোচনা নেই, আত্মসমালোচনা নেই। উন্মাদের প্রলাপের মত গোল্ডওয়াটার বলেছেন "I don't feel the conservative cause has been hurt···I can't think of any major mistake that we made." অপরপক্ষে পরাজয়ের জন্য দলীয় সতীর্থদের উপর দোষারোপ করে তাকে বলতে শোনা গেল: "My defeat to some degree···was occasioned by Republicans···who would not vote for the·· or work, I should say—for the top of the ticket··" এ-হেন গোল্ডওয়াটারের বজ্রমুষ্টি থেকে রিপাবলিকান দলের কাঠামোকে পরিত্রাণ না করলে এ-দলের মুক্তি নাই। অন্যথায় আগামী ১৯৬৬ সালের মধ্য-পর্যায়ের নির্বাচনেও রিপাবলিকান দল আরও লাঞ্ছিত হবে। এ-ছাড়া রিপাবলিকান দলের প্রকৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণাও পরিবর্তন করানো প্রয়োজন। বর্তমানে এ দল ধনী ও স্বার্থসম্পন্নদের আশ্রয়স্থলরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। আইসেন হাওয়ার তাই বলেছেন এই পরিচিতির পরিবর্তন ঘটাবার সময় এসেছে: "···for correcting the false image of Republicanism which far too long has confused so many of our citizens and led them to think of it as a political doctrine primarily for the rich and privileged."

চীন-সোভিয়েট সম্পর্কের গতি

গত নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর সমাবেশে চৌ-এন-লাই-এর উপস্থিতি চীন সোভিয়েট সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন সূচিত করেছে কিনা সে-সম্পর্কে কোনো

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনও বহুদূরের ঘটনা হলেও, ১৯৬৩ সালের জুলাইয়ের পর চৌ-এর মস্কো গমন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রুশ্চেভ-অপসারণে চীনের পক্ষে সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্যতম অন্তরায় যে দূর হয়েছে সে স্বীকৃতি চীনা-প্রচারেই বিবৃত হয়েছিল, 'the difficulties that have temporarily appeared between China and the Soviet Union……are, after all, only a historical episode"…সোভিয়েতের পক্ষ থেকেও এই স্বীকৃতি পাওয়া যায়, চৌর উপস্থিতিতে মস্কোতে ব্রেজনেভের একটি বক্তৃতায়, objective conditions for strengthened (Communist) unity now exist. কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রেজনেভ তার নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী বক্তৃতায় চীনকে খুশী করার মত কিছু বলে নাই। তার বক্তৃতার (১) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (২) বিশ্ব-কম্যুনিষ্ট সম্মেলন (৩) ১৯৬৩-এর মস্কো আনবিক অস্ত্র পরীক্ষা আংশিক বন্ধের চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা (৪) মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার জনমানসের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবের অভিব্যক্তি (৫) আনবিক অস্ত্র প্রস্তুতির উদ্যোগ ও তার ব্যাপ্তির নিষ্প্রয়োজনীয়তা এবং সোভিয়েত আনবিক সম্ভারের সাহায্যে সাম্যবাদী দেশগুলিকে রক্ষার উপযোগিতা—এই মন্তব্যগুলিতে যখন সভা করতালিমুখর হয়ে উঠেছিল যে সময় চৌ-এন-লাই-এর কঠিন নীরবতায় তার অননুমোদন সরব হয়ে উঠেছিল। মস্কো-চীনের দ্বন্দ্ব আরও অভিব্যক্ত হয়েছিল সভায় অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলবানিয়ার অনুপস্থিতিতে। চৌ অবশ্য স্টালিনের অবজ্ঞাত সমাধির উপর পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেও এই দ্বন্দ্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নাই।

এতো বৈপরীত্য সত্ত্বেও সোভিয়েতের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে চৌ-এর দীর্ঘ গোপন বৈঠক হয়েছে এবং চীন-সোভিয়েত আলোচনার আরও পর্যায় অনুসৃত হবার আশ্বাসও পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে ১৫ই ডিসেম্বরের আহুত ২৬টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈঠক স্থগিত হয়েছে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের এই পালা-বদলের মধ্যে হাওয়া-বদলের সম্ভাবনা কতটা নিহিত আছে, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আরও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দেশে পালা-বদলের অনিবার্য অনুসরণেই হাওয়া-বদলের পালা চলে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কে তার ব্যতিক্রম হবে, নূতন নজীর না তৈরী হওয়া পর্যন্ত হলফ করে এ-কথা বলা মুস্কিল।

কঙ্গোতে বেলজিয়ান সৈন্য

কঙ্গোর বিদ্রোহী এলাকা স্টানলিভ্যালীতে বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী প্রায় এক হাজার শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধারকল্পে গত ২৪শে নভেম্বর মার্কিণ বিমানবহরের সাহায্যে স্টানলীভ্যালি বিমান বন্দরে বেলজিয়ান ছত্রী সৈন্য অবতরণ করে। স্টানলী ভ্যালী। বিদ্রোহীদের অস্ত্রপ্রেরণা উৎস চীনও হতে পারে, সোভিয়েতও হতে পারে। শোম্বে অভিযোগ করেছে, তাদের হাতে চীনের অস্ত্রশস্ত্র দেখা গেছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে শোম্বের পুনরাবির্ভাব এবং কঙ্গোতে প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভূমিকা রচনায় লিওপোল্ডভিল সরকারের সহায়তা অনিবার্যভাবেই বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছে। ষ্টানলীভ্যালীর ছত্রীবাহিনী অভিযানের বিরুদ্ধে মস্কোতে এবং ব্রুসলসে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল পিকিং-এর বিপুল বিক্ষোভ সমাবেশে স্বয়ং মাও-সে-তুং উপস্থিত থেকে এই ছত্রী-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভারত সরকারও সঙ্গতভাবেই এই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলতে হয় মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার ছত্রী অভিযানের বিরুদ্ধেও কঠোর প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল, ভারতবর্ষের — পক্ষ থেকে। ভবিষ্যতে সংঘাতের অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা নিয়ে কঙ্গোর রাজনীতি অগ্রসর হবে। যদি না বৈদেশিক বৈষয়িক স্বার্থের টানা-পোড়েন থেকে অবিলম্বে কঙ্গো মুক্ত না হয়।

৮।১২।৬৪

(কামিনী রায় ৬৪৮ পৃষ্ঠা হইতে)

প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটিত হবে। হেমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ 'আলো ও ছায়া'তে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম।"[৫] অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না।"[৬] কামিনী রায় হেমচন্দ্রকে তাঁর 'মানস পিতা' বলেছেন। হেমচন্দ্রের কবিতার স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ প্রভৃতি স্পর্শ ও বলিষ্ঠ সুর ও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নবযুগের কাব্যাদর্শকে তিনি আচরণীয় মনে করেন নি কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনি সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছিলেন – ভাবে ও ও ভাষায় সেই অসামান্য কাব্য প্রেরণার স্পর্শ লেগেছিল। কামিনী রায় তাই মিশ্র মানসের কবি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'আলো ও ছায়া' কাব্যের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। নবযুগের বাংলা কাব্যের তিনটি বিশিষ্ট সুরই তিনি এই তরুণীকবির কাব্যে লক্ষ্য করেছিলেন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল, (ক) কল্পনার ঐশ্বর্য ও বিশালতা (খ) আত্মনিষ্ঠতা ও (গ) জীবনসমালোচনার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। কবির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের সপ্রশংস অভিমতকে আবার স্মরণ করি:

It is a work of great talent and greater promise, and is of unique interest as carrying one of the three elements of the neo-romantic poetry further than any other Bengali poem. In point of natural magic, or transfiguration of subjective egoism, the lyrics are nowhere beside Babu Rabindranath Tagore's Song of Sunset, and as regards the creative imagination unfolding deathless visions of sublimity or Beauty the finely imaginative pieces of this volume…are eclipsed in the blaze of the Valmikir Jaya and the Sarada-Mangala. But in other element, the objective criticism of life, the previous works are meagre beside Miss Sen's poetry."[৭]

৫. মন্মথ নাথ ঘোষের নিকট লিখিত পত্র. আশ্বিন, বিচিত্রা ১৩৩২

৬. পূর্বোক্ত পত্র।

৭. New Essays in Criticism, Page 101.

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীগোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কল্পশ্রী

পৌষ

১৩৭১

এই সংখ্যার
কয়েকটি
মূল্যবান
রচনা

২৩শে জানুয়ারী বা
তার আগে
প্রকাশিত হবে।

নেতাজী সংখ্যা

●

সুভাষচন্দ্র ও জাপান

জাপানীভাষায় জাপান ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে প্রকাশিত, ভারতে অপরিচিত একটি বই। এই বইর একটি অধ্যায় এই প্রথম বাঙলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হবে।

নেতাজী সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য ও ইঙ্গিতে রচনাটি সমৃদ্ধ থাকবে।

●

লীলা রায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ভূমিকা

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের, অমূল্য গ্রন্থ, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড' কেন্দ্র করে সারগর্ভ সময়োপযোগী রচনা

●

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সমর গুহ

●

সুভাষচন্দ্র: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙলার ভূমিকা

কালীচরণ ঘোষ

●

এ ছাড়া বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীন সম্পর্কে লেখা

দাম: একটাকা পঁচিশ পয়সা

সডাক, দুই টাকা

কার্যালয়: তিনশ বারো গাঙ্গুলীবাগান, নাকতলা

কলকাতা - ৪৭

ফোন: ৪৬-৪১১৬

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৩৭১

হে নেতাজী লহ নমস্কার

হে নেতাজী, লহ নমস্কার
তব জন্ম-জয়ন্তীর উৎসব-বাসরে
জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে তব বিজয়-ঝঙ্কার
মাঠে মাঠে চাষী
সুদূর গ্রামান্তবাসী
শোষিত মজুর আর ঘরে ঘরে বঞ্চিতের দল
পথে ও প্রান্তরে
কারখানা, বস্তিতে, নগরে
উচ্চকিত তারা আজ আশায় চঞ্চল
অধীর উল্লাসে বলে "নেতাজীর জয়"।
হে বিজয়ী জনতার নেতা,
অন্তরে অন্তরে তব কালজয়ী আসন অক্ষয়।

একদিন শুভক্ষণে
বিদারিয়া কালের তিমির যবনিকা
এলে যবে পৃথিবীর শ্যামল প্রাঙ্গনে
বিধাতা আপন হাতে পরাল দুঃখের টিকা
তোমার ললাটে।

জীবনের বাঁকে বাঁকে
সেই থেকে দুর্বার ভৈরবের মত
স্বেচ্ছায় বরিলে তুমি দুঃসহ ত্যাগ, দুঃখব্রত
দগ্ধ করি আপনার সুখ আশা ভোগ লালসায়
শুনাইলে মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী।

মৃত যারা, তাহাদেরে দিলে আনি
নব প্রাণ, দীপ্ত আশা।
বন্ধন-পাণ্ডুর ম্লান মূঢ় মুখে দিলে আনি বিদ্রোহের ভাষা—
যারা, যুগান্ত যুগান্ত ধরি নিদ্রিত, নির্ব্বাক
তারাও গর্জিয়া ওঠে দূরে থেকে শুনি তব ডাক।
মুহ্যমান জনতারে ডেকে বলেছিলে
"স্বার্থমত্ত এ নিখিলে
রুধিরাক্ত সংগ্রামের পথ ছাড়া অন্য পথ নাই
সেই পথে অবিশ্রান্ত আগে চলো, আগে চলো ভাই
অন্যায়ের সাথে
সন্ধি নহে, নহে কভু দুর্ব্বল আপোষ।"

সেদিন বোঝেনি কেহ, কেহবা করেছে সংশয়
কেহ বা পেয়েছে ভয়,
কেহ বা করেছে শুধু রোষ,
নিন্দা-ক্ষতি কলংকের দুর্দিন আঁধার
তোমারে ঘিরেছে বার বার
মেঘ, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, হে অপরাজিত
তব দুর্ধর্ষ-গরিমার কাছে তুচ্ছ, হয়েছে স্তিমিত।
মুক্তির সন্ধানী চির পথচারি ভারত-পথিক,
ঝাঁপ দিলে অজ্ঞাত সাগরে একদিন,
দুর্দ্ধর্ষ নির্ভীক।

তারপরে প্রাচ্যের দিগন্তে তব আকস্মিক ভাস্বর উদয়
—সংগ্রামী ভারত-আত্মা
দেখা দিল তোমা মাঝে দীপ্ত জ্যোতির্ময়।
সোনানে-ইম্ফলে-ব্রহ্মে পর্বতে প্রান্তরে
জাগ্রত "আজাদ হিন্দ"
'দিল্লী চলো'—মুখরিত পথে যাত্রা করে।
তোমার বিদ্যুৎ-স্পর্শে ঘরে ঘরে জাগে নরনারী
রক্তের স্বাক্ষর-আঁকা মৃত্যুপথে
ভীড় করে আসে সারি সারি।
তারপরে একদিন অন্ধকার সমুদ্রের তলে
সীমাহীন রহস্যের মতো
ডুব দিলে মরণের ছলে।

হেথা আজ বেদনায় সীমা নাই
চারিদিকে পুড়ে ছারখার
ছন্নছাড়া ঘরহারা নরনারী পথে পথে করে হাহাকার
'মিথ্যা' আজ গেরুয়ার শুভ্র আবরণে
অহিংসা, প্রেমের নামে বিভ্রান্ত করিছে জনে জনে
শক্তি দম্ভ, অর্থলোভ অহরহ উঠিতেছে ফুলে
অশ্রুর জোয়ার উঠে দুলে
বঞ্চিতে বঞ্চনা করি ভোগের প্রাসাদ ওঠে গড়ে
শোষণ সহস্রশীর্ষ পাকে পাকে কুণ্ডলীয়া ধরে।

এরি মাঝে জনতার চিত্ত আজ কাঁদে
পথ চেয়ে আছে কবে রুদ্র বজ্রনাদে
তোমার কণ্ঠের ধ্বনি দিগন্তে মন্দ্রিত হবে
সে লগ্ন আসিবে কবে
সুদুর্গম পথে তুমি বিজয়ীর বেশে
হে সারথি, নিয়ে যাবে কণ্টকিত ক্লান্ত যাত্রা শেষে।

সে উষার লাগি
ঘরে ঘরে সংগ্রামীরা রহিয়াছে জাগি
চক্রবালে থাকে থাক অন্ধকার—
ঝড়ঝঞ্ঝা মাঝে আজি, হে, নেতাজী,
দুর্গমের যাত্রীদের লহ নমস্কার। *

অমিয় রায়

---

* জয়শ্রী, ১৩৫৫ সালের মাঘ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযান

জেনারেল কাওয়াবে

[বার্মাফ্রন্টের যুদ্ধকালীন জাপ অধিনায়ক]

[যুদ্ধকালীন বার্মাফ্রন্টের জাপ অধিনায়ক জেনারেল কাওয়াবে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার পট-ভূমিতে নেতাজী সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শাহ নাওয়াজ কমিটি কর্তৃক নেতাজী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সময় জাপ-সরকার এই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিলি করেন. কিন্তু এই বইটি এখনও ইংরেজী বা কোন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত হয়নি। জয়শ্রীর সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম সদস্য শ্রীসমর গুহ জাপান ভ্রমণকালে জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে নেতাজী প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকালে জেনারেল এই বইটির একটি কপি শ্রীগুহকে দেন এবং ঐ বইটি অনুবাদের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। এই বইটি অনুদিত করে নিয়মিতভাবে জয়শ্রীতে প্রকাশের ব্যবস্থার ইচ্ছা আছে। নেতাজী-জয়ন্তী উপলক্ষে জেনারেল কাওয়াবের বইটির একটি বিশেষ অধ্যায় প্রকাশ করা হলো। মূল জাপানী ভাষা থেকে এই অধ্যায়টির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন শ্রীবারীন বর্ধন। এই রচনার অনেক স্থানে নেতাজীকে 'চন্দ্র বোস' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নেতাজী জাপানে 'চন্দ্র বোস' বলেই পরিচিত। জঃ সঃ]

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে চন্দ্র বোসের অস্থায়ী আজাদ সরকারের দপ্তর রেঙ্গুনে এগিয়ে এলো। ইম্ফল অভিযানের প্রস্তুতির জন্য তখন সমগ্র বার্মা ফ্রন্টে ব্যাপক কর্মতৎপরতা সুরু হয়ে গেছে। ওদিকে আকিয়াবের উত্তরে পশ্চিম সীমান্তে শত্রুর প্রতি-আক্রমণ রোধ করার জন্য ৫৫তম ডিভিশন প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত। উপরন্তু শত্রুপক্ষ দিনের পর দিন শক্তিবৃদ্ধি করে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ইম্ফল অভিযানের প্রস্তুতির সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা শত্রুপক্ষকে এই ফ্রন্টে বাধা দেওয়ার এবং ব্যস্ত রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলাম। শত্রুপক্ষ এই সীমান্তে আমাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল, তাই শত্রু-তৎপরতাকে রোধার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাংলার সীমান্তে ঠেলে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

শত্রুপক্ষের বিমানশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব ছিল না এবং তার সঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনীর যুদ্ধফ্রন্ট শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের সামনে উন্মুক্ত ছিল। বড় বড় রাজ-

পথগুলি পথের দুই দিকের এলাকা, সেতু, জলপথ, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এমনকি সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জেলে নৌকোগুলির উপরে পর্যন্ত বিশেষ ভাবে এরূপ বিমান আক্রমণে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ইম্ফাল অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল যথাসম্ভব গোপনে। জাপানের দুইটি আর্মী হেড কোয়ার্টার ও কয়েক ডিভিশন সেনাবাহিনী বার্মা সীমান্তে অগ্রবর্তী অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলো।

জাপবাহিনীর তুলনায় আই-এন-এ বাহিনী ইম্ফাল অভিযানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এগিয়ে চলছিল সীমান্তের দিকে। কিন্তু এই অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল,—কারণ আই-এন-এ বাহিনীর পক্ষে সন্তোষজনক সাহায্য পাওয়ার বদলে, আই-এন-এ বাহিনীকে বরং সর্বভাবে বার্মা আর্মীকে সাহায্য করতে হচ্ছিল। চন্দ্র বোসের প্রধান লক্ষ ছিল জাপ বাহিনীর পাশে থেকে ভারতের মুক্তি অভিযানে সীমান্তের প্রথম লাইনে গিয়ে দাঁড়ান এবং একই সঙ্গে দুই বাহিনীকে নিজের কম্যাণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করা। তিনি চেয়েছিলেন যে ইম্ফল অভিযান নিজেই পরিচালনা করবেন, এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন এবং সুদৃঢ়ভাবে ভারতের মুক্তি অভিযানে অগ্রণী হবেন। কিন্তু জাপ আর্মীর ষ্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার জন্য চন্দ্র বোসের এই দাবী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর যুক্তির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্র বোসের এই অভিমত আর্মী ষ্ট্র্যাটেজিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জাপ আর্মী হেড কোয়ার্টার এবং সাউদার্ণ কম্যাণ্ডকে সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হয়েছে। এজন্য আগের বছর সাউদার্ণ ইনভেশন কম্যাণ্ডকে পুনর্গঠিত করা হয়। এছাড়াও কেন্দ্র থেকে ফৌজ এনে এই আক্রমণকারী বাহিনীকে জোরদার করা হয় এবং জেনারেল যোশিদার নতুন নেতৃত্বে ইন্দো-জাপান যৌথ উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলে। সাউদার্ণ ইনভেশন আর্মীর প্রধান অংশ ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংগঠনের ব্যাপারে রচিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ডিভিশনাল কম্যাণ্ডের হাতে অর্পণ করে এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে অগ্রসর হয়ে আসে। ভবিষ্যতে কিভাবে এই সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হবে সেদিকেও সাউদার্ণ কম্যাণ্ড লক্ষ্য রাখে। চেয়ারম্যান বোসের প্রভাবে গঠিত আই-এন-এর সঙ্গে, বার্মা অধিকারের পরে, জাপ আর্মীর একত্রে সংগঠিত হওয়ার সময় বা অবকাশ ছিল না। সেজন্যেও আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার প্রয়োজন হয়।

ইম্ফাল অভিযানের প্রস্তুতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভবিষ্যত বোঝাপড়া ও মৈত্রীর নীতি নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে জাপান, বার্মা ও ভারতীয় জেনারেলরা ষ্টাফ কাউন্সিলের বৈঠকে মিলিত হয়। এই বৈঠকে চেয়ারম্যান বোস অনেক সময়েই পর্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত থাকতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। জাপানী চীফ অব দি ষ্টাফ এবং বার্মার দেশরক্ষা মন্ত্রীও এই বৈঠকে যোগ দিতেন। এই বৈঠকে ইন্দো-জাপান সম্পর্কে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—প্রথমত, আই-এন-এ বাহিনীকে সোনান থেকে বর্মায় আনা এবং তারপর এই বাহিনীর সীমান্ত যাত্রার সমস্যা, দ্বিতীয়ত, বর্মায় অবস্থানকালে আই-এন-এ বাহিনীর অবস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়ত, মনিপুর সীমান্ত অতিক্রমের পরে ভারত সরকার ও জাপ বাহিনীর আইনগত সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা। ঘটনাক্রমে জাপ-বাহিনীর পরিকল্পিত অভিযান বিলম্বিত হওয়ায় আই-এন-এর আক্রমণ ও অভিযান,—আধুনিক যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী, অনেক সময় সীমান্তের পথে অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে মন্থর হয়েছে। কিন্তু চন্দ্র বোস যিনি তাঁর সরকারের মুক্তি অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করেন,—অনেক সময়ে এজন্য অসন্তোষও প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়ত, আই-এন এ বাহিনীকে বার্মায় অবস্থানের জন্য বার্মা সরকার ও জনতার উপরে নির্ভর করতে হয়েছে—বিলম্ব এ কারণেও ঘটেছে। থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বিপুল চন্দ্র

বোসকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছেন কিন্তু আই-এন-এ কে থাইল্যাণ্ডে ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিতে রাজী হন নি। বার্মার প্রধানমন্ত্রী বামোর সঙ্গে চন্দ্র বসুর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও, বার্মার প্রধানমন্ত্রী সব সময়েই বার্মায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যার কথা উল্লেখ করতেন। বার্মার জনসাধারণের মধ্যে একটি ভারত-বিরোধী মনোভাবও ছিল। জাপ বাহিনীর পক্ষে তাই এসব কথাও বিবেচনা করতে হয়েছে।

একথা আমার মনে আছে যে মণিপুর দখলের পরে শাসনতান্ত্রিক নীতি কি হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছান খুব কষ্টকর হয়েছিল। কিন্তু অভিযানকারী বাহিনী ও বর্মী বাহিনীর মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভিযান সুরু করার আগে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করা প্রয়োজন ছিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপ আর্মী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পক্ষকে সমর্থন করেছিল একজন্য যে জাপ বাহিনী অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও মণিপুরের মুক্ত অঞ্চল ভারতীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হবে এবং এই অঞ্চলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। পুলিস কর্তৃত্ব ছাড়াও এই অঞ্চলে ভারতীয় সরকার সকল প্রকার কর্তৃত্ব, এমন কি রসদ সংগ্রহাদির কর্তৃত্বও, গ্রহণ করবে,- এটাই ছিল জাপ সরকারের সিদ্ধান্ত। জাপ বাহিনী ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে সহমত হয় এবং বাইরের ও ভিতরের দিক থেকে এমনভাবে সহযোগিতার নীতি নির্ণয় করে, যাতে ভারত অভিযানের কার্যক্রম সফল হয়। ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক এবং জাপানী ১৫তম আর্মী আডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে এই চুক্তি বিধিবদ্ধ হয়। এ ব্যাপারেও কিছুটা মতানৈক্য ঘটেছিল দখলকারী বাহিনী ও ভারত সরকারের যুক্ত দায়িত্বে গঠিত যৌথ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে হবে তা' নিয়ে প্রধানত মতভেদ হয়। ভারতীয় পক্ষ বোসকে অধিনায়ক মনোনীত করে, কিন্তু বর্মী বাহিনী এই প্রস্তাবে আপত্তি করে। তারা নিজেদের অধিনায়কত্ব আলাদা রাখতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বর্মী বাহিনী এ সম্পর্কে আর জোর দেয় নি।

ঠিক যেরকম আশা করা গিয়েছিল, ভারতীয় সরকার মণিপুর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরিকল্পনা রচনা করেছিল। জল, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি -ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ভারতীয়েরা ব্যবস্থা করেছিল। কৃষির বীজ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল সাউদার্ণ ইনভেশন কম্যাণ্ড। এরূপ অসামরিক কাজের জন্য নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও সামরিক সরকারের পক্ষে বেশ একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছিল।

ভারত অভিযানের পথে অনেক অস্বাভাবিক বাধা বিপত্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তবুও অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল দ্রুতবেগে, মার্চ মাসের গোড়ার দিকেই ১৫তম আর্মীর নেতৃত্বে তিন ডিভিশন সেনা চিন্দুইন নদীর বাম পাশে ষ্ট্র্যাটেজিক স্থান দখল করে নেয়। দক্ষিণ দিকের ৩১শ ডিভিশন ইম্ফালের উত্তরে কোহিমার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে। ১৫তম ডিভিশন পূর্বদিক থেকে আক্রমণের ব্যবস্থা করে। এক সপ্তাহ আগেই ৩৩তম ডিভিশন চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে ইম্ফালের দিকে সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে যায় এবং মণিপুরের দিকে মুখোমুখি হয়ে আক্রমণের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

চেয়ারম্যান বোসের নেতৃত্বে আই-এন এ, জাপ আর্মীর সঙ্গে সহযোগিতায়, অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। আই-এন-এর একাংশ ৩৩তম ডিভিশনের সঙ্গে ইতিমধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ফেলে। আই-এন-এ বাহিনীর প্রধান কর্ণেল কীয়ানী ১৫তম ডিভিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিঙ্গাপুর থেকে বার্মার পথে আই-এন-এ যাতে দ্রুত সীমান্তে পৌঁছতে পারে তারও ব্যবস্থা করেন তিনি।

রেঙ্গুনের পথে যে সমস্ত বাহিনী সীমান্ত পথে অগ্রসর হতো এবং যারা সীমান্ত অভিযানে অংশ গ্রহণ করতো চেয়ারম্যান বোস নিজে তাদের তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করতেন। এরূপ তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের সময়ে একস্থানে নিম্নোক্ত ঘটনাটি ঘটে। একটি ঘাঁটিতে বোসের সামরিক বাহিনী ইন্সপেকশন এবং প্রাণবন্ত ভাষণ শেষ হয়েছে—তার পরেই অফিসার ও ফৌজসহ সমস্ত সেনাবাহিনী এমন করে ধ্বনি দিল যে মনে হলো যেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তারা বললো: চলো দেহলী, চলো দেহলী। নেতাজী সহস্র সাল জিন্দাবাদ। ঠিক এই সময়ে যখন আই-এন-এ বাহিনী তাঁর সম্মুখে গর্বভরে মার্চ করে যাচ্ছিল,—বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি হলো। একের পরে একে শত্রুপক্ষের বিমান দ্রুতবেগে আই-এন-এ বাহিনীর উপর দিয়ে উড়ে গেল একদল বর্মী অফিসার যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, চিৎকার করে প্রায় যেন গড়াতে গড়াতে ছুটে গিয়ে পালিয়ে গেল। জাপানী সেনাধ্যক্ষেরা কর্তব্য সম্বন্ধে হতচকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু চেয়ারম্যান বোসের দিকে তাকিয়ে তারা দেখলো যে তিনি অবিচলিতভাবে সেনা-বাহিনীকে নির্দেশ করে যাচ্ছেন। তিনি সমস্ত সেনাবাহিনীকে স্থানত্যাগের আদেশ দিলেন এবং সমস্ত অধস্তন সেনানায়ক ও সেনাবাহিনীর স্থানত্যাগের পরে নিজে এমন মনোভাব প্রকাশ করলেন যেন আর্মী ইনস্পেকশনের পরে তিনি নিয়মিত ভাবে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। এই ঘটনার পরেও কি ভারতীয় স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্ব তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে সেকথাই ভেবেছি।

অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযান এগিয়ে চললো,—চিন্দুইন নদীর বিপদসংকুল অতিক্রমও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলো। অভিযানকারী বাহিনীর প্রথম সারি বীরত্বের সঙ্গে ভারত—বার্মা সীমান্তের কঠিন বাধার সম্মুখীন হলো। বস্তুতঃ, সে দিনটি ছিল ১৯৪৪ সালের ১৫ই মার্চ এবং সময় রাত্রি সাড়ে ন'টা।

এই অভিযানের প্রায় একমাস আগে, ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে ভারতীয় বাহিনীতে লেঃ কর্ণেল সেগলের নেতৃত্বে 'হাকা' ও 'ফুইয়ারাম' এলাকায় ভারত বার্মা সীমান্তে পশ্চিম দিকে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। পরিকল্পনার চেয়ে কিছুটা বিলম্ব হলেও চেয়ারম্যান বোসের অধিনায়কত্বে ভারতীয় বাহিনী এসে সমবেত হলো ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে। প্রধান জাপ বাহিনী পার্বত্য অঞ্চল, কীট পতঙ্গ ও শত্রুপক্ষের প্রবল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলছিল। ২২শে মার্চ ভারত-বার্মা সীমান্তে এই বাহিনী আঘাত হানলো এবং উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে ইম্ফাল ঘেরাও করে ফেললো।

ভারত-বার্মা সীমান্তে অভিযান পরিচালনায় বিলম্ব ঘটলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারের সুযোগ করে দিতেন। তাই চন্দ্র বোস ২০শে মার্চ রেঙ্গুন থেকে এই অভিযানের কথা বেতারে ঘোষণা করে দিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে, তাঁর মিত্র ও শত্রু, সবাই এই ঘোষণায় বিস্মিত হয়ে গেল। কারণ, এই ভাষণে তাঁর আত্মবিশ্বাস আগুনের মত তিনি ছড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন। এখানে আমি তাঁর সমস্ত ভাষণটি উদ্ধৃত করবো এবং আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তর্পণ করবো তাঁর স্মৃতির প্রতি। তাঁর ভাষণটি অনুরূপ:

"আই-এন এ বাহিনী অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের নেতৃত্বে এবং জাপানী ইম্পিরিয়েল আর্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তার পবিত্র অভিযান সুরু করেছে এবং ভারত ও জাপ সেনা-বাহিনীর যৌথ অভিযান ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এই মুহূর্তে আজ ভারতীয় বাহিনী স্পর্শ করলো এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও আজ আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন।"

"১৮৫৭ সালের গৌরবময় সংগ্রামে যদিও বৃটিশ আক্রমণে ভারতীয় বাহিনী পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু চূড়ান্তভাবে ভারতবর্ষকে আত্মিক দিক থেকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয় তার পরে। অমানুষিক অত্যাচার এবং বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয়দের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়েরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ পরিচালনা করছেন, নিরুপদ্রব প্রতিবাদের চেয়ে এই কর্মপন্থা শ্রেষ্ঠতর এবং এর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর স্বাধীনতা সফলে দ্রুত সংগ্রাম পরিচালনার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে সমস্ত রকম শান্তি পূর্ণ উপায়ে ভারতীয় নেতৃবর্গ বৃটিশরাজের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কোন প্রয়াসই সার্থক হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাবার জন্য ইংল্যাণ্ড ভারতের উপরে কর্তৃত্ব ক্রমশ বিস্তার করে। চরম শোষণ ও বর্বর নির্যাতনের পথে ইংল্যাণ্ড এখন ভারতকে বৃহৎ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভারতে অষ্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান, চীনা ও নিগ্রো সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। দরিদ্র ভারতবাসীর উপরে এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এখন গোটা দেশকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর অন্যদিকে আজ দেখা যাচ্ছে ভারতের সর্ব প্রান্তে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল।

"যুদ্ধের বিমান থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য মহাত্মা গান্ধী ইংরেজকে ভারত ত্যাগের এবং ভারতীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড তার প্রত্যুত্তর জানায়, মহাত্মা গান্ধী ও অগণিত ভারতবাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারে কস্তুরবার প্রয়াণে বৃটিশ সরকারের অমানুষিকতাই প্রমাণিত হয়। আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা একথা বলতে পারি যে আমরা ভারতের অভ্যন্তরের সংগ্রামীদের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই উদ্দেশ্যেই আমরা ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেছি। যুদ্ধ-বন্দীদের ভিতর থেকে ভারতীয় ফৌজদের নিয়ে আমরা ভারতীয় বাহিনী পুনর্গঠিত করেছি। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার গঠন করেছি। এই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে এবং ১৯৪৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরাকান সীমান্তে এই বাহিনী ভারত অভিযান সুরু করেছে। জাপ-ভারতীয় বাহিনীর যৌথ বিজয় অভিযানের উপরে পূর্ণ আস্থা রেখে আমি একথা জানাচ্ছি যে দিল্লীর পথে ভারতীয় বাহিনী এরই মধ্যে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। জাপ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার বিনা সর্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের কর্তৃত্ব এই সরকারের হাতে অর্পণ করেছে। বর্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি অভিযানের আঘাত হানবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠেছে এবং জাপ বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে মিত্র শক্তিকে পরাজিত করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বৈদেশিক সেনাবাহিনী ভারতের বুক থেকে বিতাড়িত না করা যাবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আসবে না, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাও আসবে না এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদেরও অবসান ঘটবে না। যতদিন পর্যন্ত না পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হবে ততদিন অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

"ভারতের অভ্যন্তরে দেশবাসীর কাজ হবে বিনাশমূলক কাজ করে ইঙ্গ-মার্কিনের যুদ্ধব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করা, যাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযানের সাফল্য ত্বরান্বিত হতে পারে। ভারতের যে সমস্ত এলাকা শত্রুর কবলমুক্ত করা হয়েছে সেই সমস্ত এলাকার শাসনের ভার গ্রহণ করেছে অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার। ভারতের

অভ্যন্তরে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে বিমান ক্ষেত্র, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা বাহিনী, অস্ত্র ও গোলা বারুদের কারখানা, পোর্ট ও বন্দর এবং সামরিক ঘাঁটি থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। যে সমস্ত এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে সেই সমস্ত এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্যও দেশবাসীকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীবৃন্দ, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরম মুহূর্ত আজ সমাগত। আজ আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করুন। এই বসন্তকালের অভিযানকে সফল করার জন্য ভারতবাসীরা সর্বভাবে এবং সমগ্রভাবে নিজেদের কর্তব্য সমাপন করবে,—আমি এই বিশ্বাস করি।" জয়হিন্দ! ইতি

সুভাষচন্দ্র বোস

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান, আই-এন-এ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দপ্তর।

চন্দ্র বোসের আহ্বানে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্ত অঞ্চল সম্বন্ধে এই নীতি ঘোষণা করেন "আই এন-এ অভিযান কালে যে সকল ভারতীয় এলাকা তাদের আয়ত্বে আসবে সেইসব এলাকার শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে।" জাপ সরকারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তোজো আরও বলেন "শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে সমগ্র ভারতবর্ষ ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হবে।" জাপ প্রধানমন্ত্রী একথাও ব্যক্ত করেন অনন্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আই-এন-এ শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই বাহিনী ক্রমশ মুক্ত অঞ্চলের পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপেক্ষা করবে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে আন্তর্জাতীয় রাজনীতির উপরে গভীর প্রভাব বিস্তারলাভ করবে।…

জাপ ইম্পিরিয়েল সরকারের এরূপ ভারতীয় নীতি ঘোষণার পরে চন্দ্র বোস সঙ্গে সঙ্গেই জাপ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন: "ভারত অভিযান আরম্ভ করে আমরা মুক্ত এলাকায় নতুন সরকার গঠন করবো এবং বিদেশী অধীন এলকা ও স্বাধীন এলাকার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ সুরু করবো। আই-এন-এ এবং আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাবার নীতি সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করার জন্য ভারতীয়েরা আন্তরিকভাবে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছে কৃতজ্ঞ।"

এই দুই ব্যক্তিত্বের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে একথাই বোঝা যায় যে এই ভারত অভিযান যুদ্ধের ষ্ট্র্যাটিজীর দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু যুদ্ধের সূচনায় জাপান যে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার নীতি ঘোষণা করে, তোজোর ঘোষণা শত্রু পক্ষের বিরোধী প্রচার ব্যর্থ করে সেই নীতির সাফল্য সূচনা করে। এই নীতি থেকে একথাই বোঝা যায় যে সামরিক বাহিনী ও চন্দ্র বোসের সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এপ্রিলের সূচনাতেই ৬ই তারিখে ৩১ তম ডিভিশন উত্তর কোহিমার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করে নিলো এবং ১৫ তম ডিভিশন উত্তর দিক থেকে ইম্ফলের উপরে আঘাত হানলো। আই-এন-এ জেনারেল কিয়ানী--পূর্ব দিক থেকে এবং ৩৩ তম ডিভিশন দক্ষিণ দিক থেকে ইম্ফল ঘিরে ফেললো। এই পরিস্থিতিতে মনে হলো মণিপুর এলাকা দখল যেন আসন্ন।

চন্দ্র বোস এই সময়ে তার দ্বিতীয় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। এটা হলো তাঁর প্রচার অভিযান। ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর সরকারের কি নীতি হবে এবং দেশ শাসনের সাধারণ নীতি কি হবে সে সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে চন্দ্র বোস বললেন: "আমাদের লক্ষ্য হলো ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে আংলো-অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনীকে বিতাড়িত করে ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী একটি স্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করা। এই ভাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ

সরকার একদিকে সামরিক শক্তিতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির অভিযান চালিয়ে যাবে এবং অন্যদিকে মুক্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের কাজ সুরু করবে। এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারই ভারতবাসীর এক মাত্র আইনসঙ্গত সরকার। মুক্ত অঞ্চলের অস্থায়ী সরকার ও আই-এন-এ-র উপরে যে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে তা' সুসম্পন্ন করার জন্য এর শাসন ভার পরিচালনায় ভারতীয় জনতার কাছ থেকে সর্ব প্রকার সহযোগিতা আজাদ হিন্দ সরকার দাবী করে।" .....

জাপ বাহিনী ও আই-এন-এর মধ্যে সৌহার্দের কথা এবং ভারতবর্ষের উপরে যে অধিকার বিস্তারের কোন আকাঙ্খা জাপ সরকারের নেই সেই শুভেচ্ছার বাণী ঘোষণা করে অভিযানকারী বাহিনী ভারতীয় জনতার কাছে সর্ব্ব-প্রকার সহায়তাদানের আহ্বান জানায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সুবিধার জন্য মুক্ত অঞ্চলে সাময়িক ভাবে জাপানী মুদ্রা চালু করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হলেও এই নীতি স্বীকৃত হয় যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ হিন্দ সরকারের মুদ্রা জাপ মুদ্রাকে প্রতিস্থাপিত করবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেই আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্ণেল চ্যাটার্জীকে চন্দ্র বোস মুক্ত অঞ্চলের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত করেন। চন্দ্র বোসের পরেই বার্মার প্রধানমন্ত্রী বামো আই এন-এ বাহিনী বীরত্বের সুখ্যাতি করে এবং ভারত অভিযানের আন্তর্জাতীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক বেতার ভাষণ দেন। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানকে এই বলে অভিনন্দিত করেন যে এই সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে ভারত ও বার্মার যৌথ সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রামের ফলে বার্মার মাটিতে জাপান, বার্মা ও ভারতীয় বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার এক ইতিহাস রচিত হবে।

এই সময়ে চন্দ্র বোসের ব্যবহারের জন্য জাপ সরকার একটি বিমান দান করেন। ৫ই এপ্রিল চন্দ্র বোস তাঁর সরকারী দপ্তর রেঙ্গুন থেকে মেমিয়োতে স্থানান্তরিত করেন কারণ তাঁর ইচ্ছে ছিল যে তিনি নিজে যুদ্ধ সীমান্তে গিয়ে আই-এন-এ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন। এই সময়ে জাপ সরকার কর্তৃক মুক্ত এলাকায় ভারতীয় সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন দেখা দেয়। এই বিষয়ে বোসের মনোভাব ছিল অত্যন্ত সততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। বোসের অভিমত নির্ণয়ের পরে স্থির হয় যে ইম্ফাল অভিযান সফল হলে এবং বোসের সরকার ইম্ফালে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সরকারের আন্তর্জাতীয় স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হবে। এই সঙ্গে একথাও স্থির হয় যে বোস যতদিন পর্যন্ত দিল্লী পৌঁছে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন না করবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং বোসের নির্ভীক চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা তাঁর সরকারী নীতি অনুসরণ করে চলবো।

এই সময়ে এই অভিযানের রিপোর্ট টোকিয়োতে পৌঁছানোর সঙ্গে ভারত অভিযানের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটলো। ৮ই এপ্রিল জাপানী হেড কোয়ার্টার ঘোষণা করলো: ৬ই এপ্রিল আমরা কোহিমার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করেছি। ইম্ফল ও ডিমাপুরের রাস্তার নতুন রিক্রুট ও আই-এন-এর সাহায্যে দখল করা হয়েছে। কালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।"

এই ঘোষণায় এক বিপুল উল্লাস সৃষ্টি হলো। এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল মন্থর। ভারতের অভ্যন্তরে আই-এন-এ বাহিনীর প্রবেশের সংবাদে এবং সাফল্যে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আজাদ হিন্দ সরকার এবং জাপানী জনসাধারণ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ইম্ফাল অভিযানের গতি লক্ষ্য করতে লাগলো।

এই সময়ে বার্মা সীমান্তে শত্রু পক্ষের বিমান বাহিনীর আবির্ভাব বার্মা বাহিনীর উপরে এক মানসিক আঘাত হানলো। বার্মা বাহিনীর হাতে তখন পর্যন্ত সামরিক সম্ভার

ছিল না এবং এই বিমান বাহিনীকে এক মাসের মধ্যেও ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। শত্রু পক্ষের এই বিমান বহর সবার মধ্যেই এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। কিন্তু এই অবস্থায়ও চন্দ্র বোসের সংকল্প ছিল অবিকম্প। এরূপ নির্ভীকতার উৎস যে ছিল তাঁর অন্তরের গভীরতায়, ভীরু প্রকৃতির লোকেরাও সেকথা উপলব্ধি করতে পারতো। আর্মী, নৌ-বাহিনী ও বিমান ঘাঁটিতে শত্রু পক্ষের দিন-রাত্র আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য মণিপুর-ইম্ফাল উপত্যকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এক-দিকে আত্মরক্ষার এবং সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের পক্ষ থেকে সুদৃঢ় করা হলো। শত্রুপক্ষ বিমানের সাহায্যে তাদের ঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধি করে ফেলে এবং মণিপুর ইম্ফালের প্রায় অরক্ষিত অঞ্চলকে একটি কঠিন দুর্গে পরিণত করে। এই অবস্থায় আমাদের সামরিক বাহিনীকে অস্বাভা-বিকভাবে বর্দ্ধিত শত্রুপক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি করতে হয়। কিন্তু এরূপ লড়াইয়ের জন্য তখন আমাদের প্রয়োজনীয় সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ছিল না। যুদ্ধ ক্রমশ একটি স্থিতাবস্থায় এসে পৌঁছে। ঠিক এই সময়ে যুদ্ধের গতিকে ছাপিয়েও বর্ষাকালীন চরম বিপদ এসে উপস্থিত হয়। থেকে থেকে প্রবল বর্ষণ আমাদের সরবরাহের রাস্তা বিনষ্ট করে দেয়, সৈন্যদের যুদ্ধের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তার ফলে সাময়িকের মত আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ রাখতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আই-এন এ এবং এই বাহিনীর সভ্যেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

এই সময়ে যে সমস্ত সেনা শত্রু পক্ষের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিল তারা আই-এন-এ-র কর্ণেল কিয়ানীর কাছে ফিরে আসে। কিয়ানী তখন পালেল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করছিলেন। চন্দ্র বোস, যিনি সব সময়েই সীমান্তের অগ্রণী এলাকায় নিজে যাওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন, —এই সময়ে তিনি নিজে সামরিক অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে সাউদার্ন কম্যাণ্ডের ইসোদার পরিবর্তে নিজে সীমান্তের অগ্রবর্তী অঞ্চলে যান এবং জাপ বাহিনীকে আক্রমণ চালিয়ে যাবার জন্য এক দৃঢ় কণ্ঠে নতুন করে আহ্বান জানান। এই সময়ে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্বে অনেক পরিবর্তন করা হয় এবং অভিযানের কৌশলেও অদল বদল করা হয়। সমস্ত রকম ব্যবস্থাসহ নতুনভাবে প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করা হয়। সীমান্তের সেনাবাহিনী সরবরাহের ব্যবস্থা রক্ষাসহ সামরিক পারদর্শিতার এক নিদর্শন স্থাপন করে এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যান্তও সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু এসত্ত্বেও বিজয়ের দেবী আমাদের পক্ষ ছেড়ে তখন চলে গেছেন।

যে মাসে অবিচ্ছিন্ন বর্ষায় সিক্ত সৈন্য বাহিনীর অবস্থা তখন শোচনীয়। চন্দ্র বোস রেঙ্গুন হেড কোয়ার্টার থেকে সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে করমর্দন করেন। কিন্তু কর্ণেল কিয়ানীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর দুরবস্থার কথা বারবার তাঁর চোখে ভেসে উঠতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে জাপানের সাউদার্ন আর্মীর আত্ম সমর্পণ এবং ইম্ফাল-মণিপুরের যুদ্ধের ঘটনাবলী সংক্রান্ত টেলিগ্রাম, একের পরে এক বোসের কাছে আসতে থাকে। এই সময়ের সমস্ত পরিস্থিতি চন্দ্র বোস সুদৃঢ় ধীরতার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করে চলেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার কল্পনাও তিনি আগে করতে পারেন নি। তবু তাঁর মনোভাব ছিল এই যে যদি একটি হাতও অক্ষত থাকে তবে সেই হাত দিয়েই আঘাত করতে হবে এবং শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগ পর্য্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর বক্তব্য ছিল তখন : "এই অভি-যানের উপরে ভারত ও জাপানের ভাগ্য নির্ভর করছে। একটি ঘোড়া, একটি সৈন্য নিয়েও যদি এগুতে হয় তবু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।" চন্দ্র বোসের 'মনের' অবস্থা ছিল তখন এমনি। তিনি তখনও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণের নানা রকম পরিকল্পনা তৈরী করে চলেছেন।

রিলিওস্থান আর্মী কম্যাণ্ডার সে সময়ে কম্যাণ্ডার চন্দ্র

বোসের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন নারী বাহিনীসহ আরেকবার সীমান্তের রণক্ষেত্র পরিদর্শন করে ফিরে এসেছেন। তিনি দাবী করেন যে সমস্ত আই-এন-এ বাহিনী এখনও রিজার্ভ রয়েছে তাদের অবিলম্বে সীমান্তে পাঠান হোক। তাঁর ললাটে তখন স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সুদৃঢ় সংকল্প-রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আপ-রিজিওন্যাল আর্মীর পক্ষে তখন দুঃখ বোধ করা ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর ছিল না।

ইম্ফাল অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র বোসের সরকারের কাজকর্ম অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। অস্থায়ী সরকার স্থাপনের সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য চন্দ্র-বোস তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর কাজকর্মের ক্ষেত্র তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এই অঞ্চলটি ছিল প্রধানত রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমের কেন্দ্র। দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ছিল ভারতের মুক্ত অঞ্চল। অঞ্চলের প্রধান সমস্যা ছিল সংগঠন ও প্রশাসন বিভাগের সুবন্দোবস্ত করা। তৃতীয় লক্ষ্য ছিল শত্রু অধিকৃত অঞ্চল—যা' দখল করবার জন্য আই এন এ প্রস্তুত হচ্ছিলো। এই সমস্ত কাজকর্মই এক একটি মন্ত্রী দপ্তরের উপরে ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন তিনি।

ক্যাবিনেটের প্রথম দপ্তরের নাম ছিল পূর্ব এশিয়া কমিটি। এই দপ্তরের কাজ ছিল সাধারণ জন সমাবেশ, এবং ব্যাপক-ভাবে ও পূর্ণোদ্যমে অর্থ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। এই দপ্তরের উপরে পুনর্গঠন, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ এবং মহিলা বিভাগের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল। সরবরাহ দপ্তরকেও বিশেষভাবে বিস্তৃত করা হয় এবং ভবিষ্যৎ ফিনান্স, মোবিলাই-জেশন ও সর বরাহের বিশেষ দায়িত্বও দেওয়া হয় এই কমিটির উপরে।

দ্বিতীয় দপ্তরের নাম ছিল মুক্ত অঞ্চল কমিটি। পুনর্গঠন ও প্রশাসনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এই কমিটিকে এবং এই দপ্তরের লোকজন মুক্ত অঞ্চলে কাজ সুরু করার জন্য সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলো। এই দপ্তরটিকে বিশেষ মন্ত্রী ও সুনির্বাচিত পরামর্শ দাতাদের সমবায়ে সংগঠিত করা হয়েছিল।

তৃতীয় দপ্তরের নাম ছিল ক্যাবিনেটের ওয়ার কমিটি। এই দপ্তরের উপরে শাসন, বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনা, এবং প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এই তিনটি দপ্তরকেই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও সন্নিবিষ্ট করা হয়ে ছিল এবং এই ভাবে চন্দ্র বোস নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। এমন কি কেউ আছে যে চন্দ্র বোসের এই সমস্ত পরিকল্পনাকে এক স্বপ্নলোকের কাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে পারে? তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রচিত।

এরূপ ব্যবস্থা সত্বেও ক্রমশ শেষের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। শত্রুপক্ষ দিনাপুর ও কোহিমা থেকে আক্রমণ সুরু করলো। এবং আমাদের পক্ষে অবস্থা খারাপের দিকে গেলো। সৈনিকেরা স্থানীয় রোগে দলে দলে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সময়ে আঞ্চলিক কম্যাণ্ডের বহু অফিসারকে স্থানান্তরিত করা হলো। চেয়ারম্যান বোস রিজিওনাল কম্যাণ্ডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। কিন্তু ৬ই জুলাই ইম্ফাল অভিযান স্থগিত রাখার কথা ঘোষিত হলো। আই-এন-এর সহায়তায় চার মাস যে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তার গতি বিপরীতমুখী হয়ে গেলো। দীর্ঘ প্রত্যাশা ও ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত সুভাষ চন্দ্র বোসের মুক্তি অভিযান শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গেলো। ইম্ফাল অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চন্দ্র বোস সমস্ত আই-এন এ কে ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মান্দালয়ের দিকে সরে আসতে তিনি বাধ্য হলেন।

এই সময়ে চন্দ্র বোসের মনের অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব নয়।—কিন্তু বৃহত্তর যুদ্ধের ঘটনাবলীর জন্যই তাঁর আশা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই রয়ে গেলো।

কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতেই তিনি গান্ধীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দিয়ে তাঁকে জানালেন যে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা সবাই ভারতের সেবক এবং যতদিন পর্য্যন্ত একজন ইংরেজও ভারতের বুকে অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এই সময়ে শুধু ইম্ফাল অঞ্চলেই দুর্ভাগ্য এগিয়ে এলো না,—জাপানী সৈন্যদের মধ্যে মনোবলের অভাব দেখা দিলো এবং সাইপান অঞ্চল থেকে জাপ বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে তোজো মন্ত্রী সভার পদত্যাগের সংবাদও এলো। একই সময়ে জুন মাসে ইয়োরোপ থেকে ফরাসী উপকূলে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের অবতরণ, দ্বিতীয় রণাঙ্গণ প্রসার এবং জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে রুশ আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির সংবাদও এসে পৌছিলো। এমনি যখন চারিদিকের সংকটময় পরিস্থিতি তখনও চন্দ্র বোসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণায় বিন্দু মাত্র নৈরাশ্যও দেখা দেয়নি। জাপানের নতুন সরকারের পক্ষ থেকে চন্দ্র বোসকে সহযোগিতাদানের আশ্বাস জানিয়ে বার্তা পাঠান হলো।

এই দুঃসময়ের মধ্যেও চন্দ্র বোস বার্মা সরকারের এক বছরের স্বাধীনতা পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি টি পার্টির আয়োজন করলেন। এরূপ টি পার্টির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিলো জাপানের মনোভাব অনুধাবনে চন্দ্র বোসের একটি কূটনৈতিক কার্যক্রম। এই সময়ে পূর্বে তিনি রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। ইম্ফল অভিযান স্থগিত রাখার ফলে, ভারত সীমান্তে আত্মত্যাগের সুযোগ না পেয়ে তিনি যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বামোর সম্বর্দ্ধনা সভা, চন্দ্র বোস, – যিনি সংযুক্ত বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, বস্তুত তাঁর বিদায় সভায় পরিণত হলো। সদ্য রোগশয্যা থেকে উঠে এলেও চালচলনে তাঁর আশ্চর্য সজীবতা দেখে একথা সে সময়েও বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি কিছু দিন আগেও রুগ্ন ছিলেন। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও এরূপ সময়ে পর্যন্ত তাঁর চোখ মুখে এক দৃঢ়তাপূর্ণ প্রত্যয় ফুটে উঠেছিল।

আগে তিনি সৌজন্যপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা সভাদি বর্জন করতেন কিন্তু এই পশ্চাদাপসরণের সময়ে জাপানী হেডকোয়ার্টারের কম্যাণ্ডদের একটি টি-পার্টিতে আপ্যায়িত করে রুগ্ন ও আহত আই-এন-এ সৈন্যদের যে জাপ-হসপিটালে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সভায় বার্মার প্রধানমন্ত্রী বামোকেও সহযোগী অতিথি রূপে আমন্ত্রণ করা হয়। আই-এন-এর যে সমস্ত রুগ্ন সৈনিক আরোগ্য লাভ করে এই সভায় যোগদান করে তিনি তাদের মাল্যভূষিত করেন এবং তাদের কাছে তিনি তাঁর ভাবী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বিদায়ের সময়েও এই ব্যক্তিটির আন্তরিকতা জাপ পক্ষের উপস্থিত সমস্ত অফিসারের মধ্যে এক গভীর ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। এই ভাবে যে সমস্ত জাপ অধিনায়ক ভারত সীমান্তে কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পরিচয় দেন তিনি তাদের সবাইকেই বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভায় আপ্যায়িত করেন। তাঁর এরূপ আচরণ জাপ আর্মীর মনে এক গভীর রেখাপাত করে।

•   •   •   •   •

ইম্ফাল অভিযানের শোচনীয় পরিণতি চন্দ্র বোসের আগ্নেয়গিরি-সদৃশ হৃদয়ের উপরে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু মণিপুরের উপত্যকায় যে হাজার হাজার মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে এবং এই অভিযান পরিচালনায় যে উচ্চ মূল্য দেওয়া হয়েছে তা 'ভারত' ও জাপানের ভবিষ্যত শান্তি ও সহযোগিতার এক মৈত্রী বন্ধনে পরিণত হয়েছে। মণিপুরের উপত্যকায় যে অগণিত মানুষের ভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে তাদের আত্মা চিরকাল বরেণ্য হয়ে থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায়

লীলা রায়

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের History of the Freedom Movement in India পুস্তকটী রচনার পশ্চাতপট জানবার পর থেকেই তিনখণ্ডে সমাপ্ত এই পুস্তকটীর প্রকাশের জন্য ভারতবর্ষের বহু শত ব্যক্তির সহিত সাগ্রহে অপেক্ষা করেছে এই লেখিকাও। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে এই তৃতীয় খণ্ডে যার আলোচনাকাল—১৯১৯—১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমাপ্তি পর্যন্ত। আমাদের অনেকের পক্ষে, এই বৎসরগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণের কাল—অতএব সমসাময়িক।

পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে ৮২০ পৃষ্ঠার এই বইটীতে এই শতাব্দীর ২য় দশক থেকে একশতাব্দীর চতুর্থাংশের কিছু বেশী সময় জুড়ে নানা বিভিন্নমুখী লক্ষ্য ও পরস্পরবিরুদ্ধ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রথ চল্‌তে চল্‌তে কোন এক অশুভক্ষণে কক্ষচ্যুত হয়ে স্থির লক্ষ্যে না পৌঁছে ভুলে এক অভিশপ্ত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ালো, তার ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন বিদগ্ধ গ্রন্থকার ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বিচার দিয়ে তো বটেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের মমতাপূর্ণ হৃদয় ও অন্তর্দৃষ্টি, যিনি গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার উপর বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার প্রভাবকে বিচার করে দ্বিধাহীন সাহসের সহিত তাঁর রায় দিয়েছেন। এ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধাচরণ এবং দেশবাসীর এক ক্ষমতাশীল অংশের দ্বারা সম্পূর্ণ ভুল বোঝবার ঝুঁকিও নিতে হয়েছে তাঁকে, এ সবগুলিই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষে অপরিহার্য হলেও বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে এই গুণগুলির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষা অভাবই লক্ষ্য করতে হয় অধিক। গণতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহ এটা গৌরবের নয় বরং এই লক্ষণ একতন্ত্রের অনুকূল ও পরিপোষক। একক প্রচেষ্টায় এই বৃহৎ গ্রন্থটী রচনা ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সুদুর্লভ তথ্য সংগ্রহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিসহ নির্বাধ রায় দেবার জন্য শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। ভারত ইতিহাসের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের তিনি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। ভারতেতিহাসের এক অতি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সঠিকভাবে জানবার বোঝবার এবং পথ খুঁজে পাবার পক্ষে ডাঃ মজুমদারের তিন খণ্ডে রচিত বইটীকে তারা কৃতজ্ঞচিত্তে অপরিহার্য বলে স্বীকার করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বইটীর আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা ;

(১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধিক ধারা—এবং এই শেষ অধ্যায়ের প্রধান ধারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং তার সফলতা ও বিফলতা।

(২) এই ধারার সমান্তরালে ভারতের বিপ্লবী মানস ও সাধনা, যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আই এন্ এ সংগঠন।

(৩) এই উভয় ধারার পারস্পরিক মূল্যায়নে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বিচার।

(৪) দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার স্বরূপ।

প্রথম আলোচ্য বিষয়টী সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রারম্ভেই বলেছেন যে ধর্মগুরু ও সক্রিয় রাজনৈতিক এক আধারে এই বিপরীত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটবার ফল—গান্ধিজীর দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বহু দুর্বোধ্য মত, পথ এবং কার্যক্রম। এই মূল্যায়ন দ্বারা বিগত কয়েক বৎসরের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিচার করলে স্বাধীনতা ইতিহাসের বহু জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচিত হবে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সুস্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহ সত্যাশ্রয়ী। গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে ঐতিহাসিক বিচার করবে কোনো জননেতাকে—তিনি যত শ্রদ্ধেয় ও সাধু চরিত্রেরই হোন্ না কেন—তাঁর প্রকাশ্যে ঘোষিত মত ও অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর যুক্তিনির্ভরতা দ্বারা,—বিশ্বাস, ব্যক্তিগত আনুগত্য বা শ্রদ্ধা-ভালবাসার দ্বারা নয়। এই কোষ্ঠি পাথর নির্বাচন সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

"As the author of this volume, I am only concerned with the part he played in the struggle for India's freedom from the British yoke···namely as a politician and statesman leading a great political organisation which was not intended to be a humanitarian association or World Peace Society, but had been formed for a definite political object, namely, to achieve India's freedom from political bondage···looked at strictly from this point of view, the popular image of Gandhi cannot be reconciled with what he actually was."

উপরোক্ত মন্তব্যের সহিত বহু দেশকর্মী ও দেশপ্রেমিকেরা একমত হবেন। ১৯১৯ এর পর থেকে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিস্ময়কর অল্পসময়ের মধ্যে অহিংস পথ অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও একটি সংগ্রামী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছিল বিপুল গণসমর্থনের ফলে, যার শক্তি ও সম্ভাবনা ছিল অমিত। জনসাধারণের সুপ্ত চেতনা ও শক্তিকে নিঃসন্দেহ এই নূতন নেতৃত্ব বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে বহু দুর্গম অভিযানের অসমসাহসী অভিযাত্রী করে তুলেছিল। গান্ধিজী এই সংগ্রামে ব্যবহার করেছিলেন—অহিংস অসহযোগ ও নিরস্ত্র আইন অমান্য রূপ দুটি হাতিয়ার, তিনি যার নামকরণ করেছেন সত্যাগ্রহ। জনসাধারণের মনে একটী ধারণা আছে এবং নিজেদের স্বার্থে নিরন্তর প্রচারের দ্বারা তাকে দৃঢ়মূল করবার প্রয়াস, বর্তমান শাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা করে থাকেন, যে এই সত্যাগ্রহের অস্ত্র ব্যবহার করেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে এবং এই অভিনব অস্ত্রই আগামী দিনে বিশ্বের সর্বত্র পরাধীন জনতার রক্তপাতহীন সংগ্রামের প্রধানতম হাতিয়ার হবে। গ্রন্থকার গান্ধিজীর বহু উক্তি ও কার্যানুষ্ঠান উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে গান্ধিজীর প্রধান ও প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ নয় কিন্তু বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেসকে গড়ে তোলা। এমন কি এক সময়ে খিলাফৎ আন্দোলনের সফলতার জন্য তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পর্যন্ত স্থগিত রাখতে রাজী হয়েছিলেন।

"To the Mussalmans, Swaraj means, *as it must mean* India's ablity to deal effectively with the Khilafat question···it is impossible

(শেষাংশ ৭৮০ পৃষ্ঠায়)

ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র

ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

"সুভাষ এসেছে." শশাঙ্ক বলে উঠল।

"কে সুভাষ?" জানতে চাইলাম।

"সুভাষ আমাদেরই একজন, গেল বছর কটক থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হয়েছে।"

প্রায় তখুনিই হেমন্তের প্রবেশ, তার পিছনে ফর্সা এক তরুণ, চোখে চশমা।

'এই যে সুভাষ,' শশাঙ্ক বলল।

এগিয়ে এসে সুভাষ আমার দুটো হাত চেপে ধরল, যেন আমার বিষয়ে সে অনেক কথাই জানে, আমি যতটা না জানি তার কথা।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকিয়ে থাকল, মুখভরা হাসিতে উজ্জ্বল তার মুখ—বয়সের তুলনায় বেমানায় যেন গম্ভীর লাগত সে মুখ।

রাত দশটা তখন বেজে গেছে, তখনকার দিনে ওই সময়েই কলকাতার বন্ধুদের নিয়ে বরিশাল এক্সপ্রেস পৌঁছত এসে।

দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হবার দিন কতক পরে গভর্ণমেণ্ট বিলডিং হোস্টেলে আমার ঘরে একদিন সকালে উপস্থিত হলেন অত্যন্ত তরুণ চেহারার এক ভদ্রলোক—অস্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, খালি গায়ে ধুতির খুঁট জড়ানো। জর্জ এলিয়টের "চ্যানিংস" বইটার মধ্যে ডুবে গিয়াছিলাম আমি—সেটা হাতে নিয়ে উঠে বসলাম। আগন্তুক বইটা হাত থেকে নিলেন, খানিক বাদে জিগ্গেস করলেন, "উপন্যাস কেন পড়?"

অপরিচিতের মুখে এমন প্রশ্ন আকস্মিক না? আঁচ করলাম চেহারা দেখে—নির্ঘাৎ অধ্যাপক হবেন। অত্যন্ত বিনীত ভাবেই আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "ক্ষতি কি?"

যে আলোচনার সূত্রপাত করলেন তিনি, খুব যে তাতে তাঁর উৎসাহ ছিল মনে হল না।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তাঁর পাশাপাশি আমিও পা চালালাম। নিয়ে গেলেন ওল্ড বিলডিং হোস্টেলে তাঁর ঘরে, আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর বন্ধু শ্রীগুরুদাস গুপ্তের সঙ্গে।

তাঁর নাম জানতে পারলাম—ডাঃ যুগল কিশোর আঢ্য, রেকর্ড রেজাল্ট নিয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে সবে এম-বি পাশ করেছেন। দৌলতপুর কলেজে এসেছেন বোটানির অধ্যাপক আর রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার হয়ে। আর, তাঁর বন্ধু পরের স্টীমারেই নড়াল চলেছেন সেখানকার কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক পদে যোগ দিতে।

পরে জানলাম ডাঃ আঢ্য এবং প্রফেসর গুপ্ত দুজনেই ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জির বন্ধু। সুরেশ দা তখন লেগেছেন বিভিন্ন কলেজ থেকে ছেলে ধরার কাজে—বাছা বাছা ভাল ছেলেই। তাঁর ডেরা ছিল অবশ্য কলকাতা। তবে তাঁর শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল কটকে, গিরীশ ব্যানার্জির নেতৃত্বে; আর কৃষ্ণনগরে, তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিল হেমন্ত সরকার। হেমন্ত স্বয়ং গিরীশবাবুর নেক নজরে পড়ে গিয়েছিল একবার কটক গিয়ে। তখনকার দিনে সুরেশদার সবচেয়ে অপরিহার্য সহকারী ও বন্ধু ছিলেন গিরীশদা, উত্তরকালে যেমন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ।

সুরেশদাই তাঁর এই কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে যুগলদাকে

দৌলতপুরে পাঠান। গোধূলির আগেই সাধারণত যুগলদা আমায় নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ভৈরবের তীর বরাবর রাস্তাটা ধরে। কয়েক দিন চ'ল ধর্ম ও রাজনীতি ঘেঁষা আলোচনা; তারপর হঠাৎ যুগলদা একদিন বলে বসলেন, "তুমি কি মাখন সেনের সঙ্গে মিশেছ ?"—আমি একটু অবাক হলাম তাঁর সঠিক এই অনুমান দেখে, কিন্তু মুখে বললাম "কেন, বলুন তো ?",

"তোমার ভাবনা-চিন্তার ধরণ দেখে মনে হয়।" বাস্তবিকই আমি তার আগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—মাখনবাবু সেই দলের নেতা হলেন ৺ পুলিন বিহারী দাসের দ্বীপান্তরের পর ! কিন্তু পরে, মাখন বাবু যখন গোটা সংগঠনকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে জুড়ে দেবার চেষ্টায় মাতলেন, নরেন সেন প্রমুখ সমিতির অন্যান্য নেতারা তীব্র প্রতিবাদ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার যে রূপটি মাখন বাবু আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা' আমার মনে গভীর রেখাপাত করলেও মাখনবাবুর রাজনীতি যে বাস্তব রূপটি পরিগ্রহ করছিল তা' আদৌ পছন্দ হয়নি আমার। সত্যি বলতে কি, আমি দৌলতপুরে চ'লে গিয়েছিলাম নিজের মনমতো একটা কিছু করবার সঙ্কল্প নিয়েই। আর শিক্ষানবীশ থাকবার ধৈর্য ছিল না তখন। এমনি সময়ে পেলাম আমি যুগলদার সঙ্গ।

সে-যুগের অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার জোরেই আমি যথেষ্ট বিনীত অথচ অকপট চিত্তে যুগলদার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। জানতে চাই, "আপনার কর্মসূচীর কী উদ্দেশ্য ?"

"দেশকে আমি স্বাধীন দেখতে চাই।"

"পন্থা ?"

"ঠিক জানা নেই। তবে সুরেশ বলে, আমাদের বেদান্ত প্রচার করা উচিত, স্বামীজী (বিবেকানন্দ) যেমনটি শিখিয়েছেন। গোটা জগৎই বেদান্ত ধর্মকে মেনে নেবে। তখন আর আমাদের স্বাধীনতা-লাভের জন্য আলাদা প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনই থাকবে না। বেদান্ত-ধর্মাবলম্বী ইংরেজ আপনা-থেকে চ'লে যাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে।"

আমার মুখে অবিশ্বাসের হাসিটা যেমন চাপা থাকেনি, যুগলদারও সেটা চোখ এড়ায়নি।

"তোমার আমার বিশ্বাসে তফাৎ কম। কাজেই, এস, হাতে কলমে কিছু কাজে নামা যাক।

পরের দিন সন্ধ্যা থেকেই আমরা দুজন খেয়া নৌকায় চ'লে যেতাম নদীর ওপারে। প্রথম দিনেই সেনহাটির গ্রামের পথে পেয়ে গেলাম ভাল মানুষ বুদ্ধিমান চেহারার এক স্কুলের ছাত্র। তার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা ব'লে তাকে বলে এলাম কলেজে এসে আমাদের দু'জনার কারো সঙ্গে যেন দেখা করে। যুগলদা অধ্যাপক শুনে তখুনি সে রাজি হ'য়ে গেল।

আরো কিছু কথাবার্তার পর হরিপদ বিষ্ণু—সেদিনের স্কুলের ছাত্রটি—রাজি হ'ল স্থানীয় স্কুল থেকে যত পারে ভাল ভাল ছেলে জোগাড় করে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে। দেখতে দেখতে বেশ ছোটখাট একটা দল জুটে গেল। যুগলদার সহকর্মী একজন অধ্যাপক পরিহাস করে এদের ডাকতে লাগলেন JUGAL'S ROUND HEADS নামে। দলের চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে গিয়েছিল নামটি। ইতিমধ্যে, যুগলদার সঙ্গে পরিচয়ের কয়েক দিন বাদেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক—বয়োভারের চেয়েও ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ বেশ-খানিক কুঁজো-হয়ে যাওয়া চেহারা—যুগলদার চাইতে ও অদ্ভুত রকমে এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। সে বর্ণনা উহ্য রাখি, কারণ ভূমিকা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। পয়তাল্লিশ বছরের এই প্রৌঢ় হলেন সেদিনের সুপরিচিত গণ-শিক্ষার প্রচারক ৺ শশীভূষণ রায় চৌধুরী, বাড়ি তেঘরা, ২৪ পরগণা। সবে তিনি আমাদের কলেজে এসেছেন হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে। তাঁর কিছু আগে এসেছেন কলকাতা অনুশীলন সমিতি

(শেষাংশ ৭৭১ পৃষ্ঠায়)

বিপ্লবীর ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র

কালীচরণ ঘোষ

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, কোনও দেশ চিরকাল বিদেশী কোনো রাষ্ট্রীয় শাসনের আমলে থাকে নাই। অতিশীঘ্রই হ'ক বা দীর্ঘকাল পরেই হ'ক একদিন জাতির চেতনায় এটা কাঁটার মত ফুটেছে, তাকে জাগিয়ে তুলেছে; প্রেরণা জুগিয়েছে, নতুন পথের সন্ধানে মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল করে তুলেছে। তখন "মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল, সবল দুর্ব্বল সে কি ভাবিবে।" কৃচ্ছ্র-সাধন, মরণ-পণ তখন এক একজন আত্মভোলাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গিয়ে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে পথে আবার নতুন পথিক এসেছে; আবার তেমনি করে আত্ম-লোপ করেছে দেশের স্বাধীনতার জয়যাত্রার এক একখানি রক্ত রঞ্জিত পাথর বসিয়ে অনুগামীদের পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছে।

সকল স্বাধীনতা সংগ্রামের এই এক ইতিহাস। দেশ ভেদে, যোদ্ধৃবর্গের শক্তির তারতম্যে, সেনাপতিদের বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার প্রয়োগ কৃতিত্বের ওপর পদ্ধার কিছু ইতর-বিশেষ হয়েছে। সংগ্রাম স্বল্প বা দীর্ঘকাল স্থায়ী, দুই যুযুৎসুর পারস্পরিক শক্তির বিচারে নিষ্পত্তি লাভ করেছে। পররক্ত-শোষণকারী কোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় বিতাড়ি ক'রে চলে গেছে, এটা ইতিহাসে সন্ধান মেলে না! শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে কচিৎ কোনো রাষ্ট্র বিজিত দুর্ব্বল রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দান করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে।

মঙ্গলাকাঙ্খী চিন্তানায়কদের মনে পরাধীনতার গ্লানি—আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রিক অবনতি, বেদনা দিয়েছে। আলাপ আলোচনায় হয় ত নিজ লেখার মাধ্যমে তাঁরা মনের তিক্ততা প্রকাশ করেছেন। বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদ চিন্তার ভাব কথাবার্ত্তায় প্রকাশ করে ফেলেছেন। তা'র বেশী তাঁরা আর কিছু করেন নি। তাঁরা ভাবুক; কর্মক্ষেত্র অপর দিকে বিরাট হ'লেও রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামধর্ম্মী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নি। যাঁরা বিদেশীর সহিত সহ-যোগিতা করেছেন হয় ত তার কোনো কাজের দ্বিতর অথচ সসম্ভ্রম প্রতিবাদ বিনয় সহকারে অনুমতি লাভ করে রাজ-দরবারে পেশ করেছেন, তাঁদের কথা আমার এ আলোচনার মধ্যে আনার প্রয়োজন নেই।

দর্শন শাস্ত্রের মতে চিন্তার একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। স্থূল জগতের ওপরও তার প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। স্বাধীনতার চিন্তা শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, যথাকালে রূপ পরি-গ্রহ করে এবং সে রূপ নানা ভঙ্গিমায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করে।

বাঙ্গলার তথা ভারতের ক্ষেত্রে এই ধারার তারতম্য হয় নি। যিনি চিন্তায় জ্ঞানে, আচার আচরণে, শিক্ষা দীক্ষায় ঋষি, ভারতের মুক্তির সংগ্রামে পরোক্ষ এবং কিছুটা প্রত্যক্ষ অংশভাগী, সমরক্ষেত্রের বাইরে থেকে সকল বিষয় নিষ্কাম নিরপেক্ষভাবে দেখেছেন, ভারতের জাতীয় সংগ্রাম প্রস্তুতি সম্বন্ধে সৈনিক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ) মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করছি:

"বিংশ শতকের প্রারম্ভ এক মহাযুগ সন্ধিক্ষণ। সে

সহিষ্ণু মহান্ এই জন্য যে—কালশক্তি অথবা যুগদেবতা কোন এক সীমিত দেশে, স্তরে, পর্ব্বে বা ভূমিকায় তাঁর আরব্ধ বিপ্লব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

"ভারতের ইতিহাসে মুখ্যতঃ মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে বিপ্লব-শক্তি জাগৃতির সূচনা হইয়া থাকিলেও, তার ব্যাপ্তি কোন প্রদেশ বিশেষের গণ্ডী মানিয়া লয় নাই।

"কেবল তাহাই নয়—সে শক্তি জাগৃতি নানা রূপে, নানা ছন্দে সারা ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

"মানবগোষ্ঠীর অথবা সমাজের স্তর বিশেষেই উহা সীমাবদ্ধ; সাধারণতঃ গণজাগরণই এর রূপ এবং বিপ্লবই (সহিংস-অহিংস) এর ছন্দ।

"আবার রাষ্ট্রিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক কোন পর্ব্ব বিশেষেই ইহা নিঃশেষিত হয় নাই। মানুষের পূর্ণ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বাঙ্গীন, সার্ব্বজনীন মুক্তিই এর প্রেরণা মূল ছিল।"

"কাজেই, সে লক্ষ্যের অনুরোধে এর ভূমিকা বদলও হইয়াছে।

"প্রতি ভূমিকায় যে কর্ম্ম, সেটিকে যদি বলা যায় 'সাধনা' বা 'সেবা' তবে সেবা মুখ্যতঃ চতুর্বিধ:—

(১) বিশেষতঃ কায়িক শ্রমের দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্য-সম্বৃত নিষ্ঠা দ্বারা সেবা;

(২) ভোগ্য উৎপাদন কুশলতা এবং বণ্টন সুনিষ্ঠতা দ্বারা সেবা;

(৩) তেজঃ বা ওজঃ শক্তি দ্বারা 'যোগক্ষেময়া' সেবা;

(৪) তপঃ, ত্যাগ ও মেধাশক্তির দ্বারা সেবা।

"গীতায় ভগবান্ এই চতুর্বিধ সেবাকে 'চাতুর্বর্ণ্যম্' আখ্যা দিয়াছেন।

● ● ● ●

"বিংশ শতকের প্রারম্ভে যে শক্তি সম্বিৎ-জাগৃতি, সেটি চাহিয়াছিল এই চতুরঙ্গ চরিতার্থতাকেই, তার চাইতে অবম বা ন্যূন কিছু সিদ্ধি নয়।

"ঋষির ধ্যানে এই চরিতার্থতা হইল পূর্ণ যোগ-সমন্বয়।

"কবির মানসে ইহা মহা মহিমান্বিত মহা মানবতা।

"সাধকের ইহা উপনিষদ্ স্বারাজ্য সিদ্ধি।

"যে বা যারা পরাধীন, পরবশ, শৃঙ্খলিত, তাদের আকূতিতে ইহা পূর্ণ স্বরাজ।

"যুগ প্রবর্ত্তনের আগেই ঋষি বঙ্কিম ইহা ধ্যানে পাইয়াছিলেন তাঁর 'আনন্দমঠে'; আর—এর অমোঘ মন্ত্রও পাইয়াছিলেন 'বন্দে মাতরম্'।

এই পূর্ণ স্বরাজের উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা।"

(পণ্ডিচেরী - শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পত্রিকা 'বর্ত্তিকা'র নিমিত্ত লিখিত।)

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বসূরীদের মধ্যেও চিন্তার ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। কথোপকথনে বাক্যাংশে স্বাধীন ভারতের চিন্তা রাজা রামমোহন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রেও প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমান শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে রঙ্গলাল (পদ্মিনী উপাখ্যান), ও হেমচন্দ্র (ভারত বিলাপ) সংগ্রাম প্রস্তুতির ইঙ্গিত করে গেছেন। পৌরাণিক কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (পুরু বিক্রম নাটক) স্পষ্টতঃ উৎসাহ দিয়েছেন।

'জাতি বৈর' অর্থাৎ ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে বিদ্বেষভাব তাহা দূর করবার জন্য একদল প্রকাশ্ত চেষ্টা করেছে। আবার একদল ইংরাজের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব্ব করা বা সমূলে উচ্ছেদ কামনা করেছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা পথের অনুসন্ধানে ঘুরে মরেছে। প্রকাশ্য দল আরম্ভ হবার পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'ই জাতীয় ভাবধারার সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় দল প্রারম্ভে প্রকাশ্য সমিতি প্রভৃতি গঠন করলেও ধীরে ধীরে অন্তঃসলিলা হ'য়ে জাতীয় জীবনে ফল্গুধারায় প্রবাহিত হ'য়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'য়েছিল, 'গুপ্ত সমিতি'

অবলম্বনে। বলা বাহুল্য প্রথম যুগের 'সমিতি' গুলি ইংরাজ রাজশক্তির বিরক্তি বা আপত্তিজনক পন্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা—রাজপুরুষরা জানতে পারলে সাজা শাস্তির কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও 'সমিতি'র কার্য্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, হয় ত বন্ধ করে দিতে পারে এই কারণে—গোপন পন্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় ছিল না। এঁরা সরকারকে ভীতি প্রদর্শন, বা আঘাত করবার কথা তখনও চিন্তা করেন নি। এটা আত্মস্থ হবার চেষ্টা মাত্র। জাতীয়তাভাব বৃদ্ধি, স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবোন্মেষ, শরীর চর্চ্চা ও শক্তিলাভ, চরিত্রবত্তা ও সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন প্রভৃতি এই সকল সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইংরাজের সহিত সংঘাত ঘটতে পারে, কিন্তু কোনোরূপ সংঘর্ষের চিন্তা সমিতির কার্য্যক্রমে স্থান পায় নি।

কলিকাতার 'ঠাকুরবাড়ী' বাঙ্গলাদেশকে নানা ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে পথ নির্দ্দেশ করেছে। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয়নি ব'লে একটা মত প্রচলিত আছে। ১৮৭৬ সাল বাঙ্গলা দেশ প্রথম 'গুপ্ত সমিতি'র আবির্ভাব লক্ষ্য করেছে। এটা ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত সমিতি, নাম 'হামচুপামুহাফ'। এর সভ্যগণ 'গোপন' সভায় আলোচিত বিষয় বাহিরে প্রকাশ করবে না, এইটি হ'ল প্রধান নিষেধ। আবার ১৮৭৬ সালেই 'সঞ্জীবনী সভা' গঠিত হয়; উদ্দেশ্য একই। চিরাচরিত সভা থেকে এর লক্ষ্য একটু পৃথক ছিল।

এই কালে রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নামের সঙ্গে গোপন সমিতির গোপনতর পথ-নির্দ্দেশের কথা জড়িত আছে। কলিকাতার দক্ষিণে কোদালিয়া ও মজিলপুর। সুভাষচন্দ্রের পিতৃভূমি, কোদালিয়ার যথাক্রমে চার মাইল উত্তর ও দশ মাইল দক্ষিণে গ্রাম দু'টি অবস্থিত। এঁরা ও কয়েকজন সভ্য বুকের রক্ত সাহায্যে লিখিত শপথ গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে তাঁহারা স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট থাকবেন। এই প্রচেষ্টা আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। লক্ষ্য করবার বিষয় এঁরা দুইজনেই শিক্ষক, 'স্বাধীনতার পথ' নির্দ্দেশক। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার 'আত্মোন্নতি-সমিতি' (১৮৯৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রকৃত 'গুপ্ত সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিনব ভারত সোসাইটি ও মিত্র মেলা। সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়—দামোদর ও গণেশ, রাজশক্তির সহিত সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আসরে অবতীর্ণ হ'লেন। ১৮৯৫ সালে পুণায় প্লেগের উপদ্রব হয় এবং প্লেগ নিবারণে সরকারী উৎপাত পুণাবাসীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। সঙ্গে ইন্ধন দিলেন মহাদেব শিবরাও পরাঞ্জপে আর বাল গঙ্গাধর তিলক—তাঁদের মুখপত্র যথাক্রমে 'কাল' আর 'কেশরী'।

১৮৯৭ সালে ২২ জুন র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যা ও তার ফলস্বরূপ জিঘাংসায় দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব চাপেকার ও মহাদেব বিনায়ক রানাডের ফাঁসি হয়। প্রশ্ন ওঠে, র‍্যাণ্ড হত্যাই সমিতি'র একমাত্র লক্ষ্য বা দুষ্ট ইংরাজ মাত্রের শাসন ও বিদেশী রাজ্যের উচ্ছেদ—মুক্ত লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা এগিয়েছিলেন কি না? 'কাল' পত্রিকা ইংরাজ হত্যায় উৎসাহ দিত।

বাঙ্গলায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালের দোলপূর্ণিমার দিন। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন সমিতিই বাঙ্গলার প্রধান কেন্দ্র, যেটা 'গুপ্ত' রূপে আবির্ভূত না হলেও অনতিকাল পরে গোপনে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এই সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বসু ও প্রমথনাথ মিত্রের (পি মিত্র) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমে শরীর চর্চ্চাই প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং এই লক্ষ্য ধরে আরও নানা সমিতি গড়ে উঠেছে। ব্যায়াম, আত্মরক্ষা, শত্রুকে আক্রমণ, অসমসাহসিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন, বিপন্নের সাহায্য নিয়ে যে সকল সঙ্ঘ সমিতি গড়ে ওঠে তার সঙ্গে সরলাদেবী প্রবর্ত্তিত প্রতাপাদিত্য

উৎসব, বীরাষ্টমী মেলার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ভুললে চলবে না,—প্রকৃত গুপ্ত সমিতি তিলক, অরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে বাঙলার নানাস্থানে স্বতন্ত্র সত্তায় প্রায় একই উদ্দেশ্যে সমিতি গ'ড়ে উঠতে থাকে। বিলাতী সার্কাসের সঙ্গে বোসের (এস্ এন) সার্কাস বাঙালীর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কলিকাতার দক্ষিণে চিংড়িপোতা গ্রামে একটি স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক দলের প্রেরণা এই বাঙালী সার্কাস হতেই পাওয়া যায়। বসু হরিনাভির লোক। এর মূলে ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী। সহকর্মীদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, (এম্ এন্ রায়), সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর বসু প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী যুবক। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও বিকাশ অন্যান্য অনুরূপ সমিতিগুলির আদি পরিচয়ের কিছুটা সন্ধান দিতে পারে।

শরীর চর্চা, সমাজ সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন প্রচেষ্টা, আর্ত ত্রাণ কার্য্য, সংগ্রন্থ পাঠ ও প্রচার, আলোচনা, চরিত্রগঠন চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্যে শক্তি নিয়োজিত করবার পর এঁরা দেখলেন ইংরাজের সঙ্গে লড়তে হ'লে অন্য পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেই সন্ধানে কলিকাতায় এসে তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে সেখানে এরূপ সমিতি ইতঃপূর্ব্বেই গঠিত হয়েছে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলেও কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত সংযোগ রক্ষাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৫) প্রায় সকল সমিতিকে গোপন পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে। তৎপূর্ব্বে ইংরাজপুরুষদের জোরজুলুম নীরবে সহ্য না করে "সন্ধ্যা" পত্রিকার 'ঢিলের বদলে পাটকেল' নীতি গ্রহণ করে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য মারামারি চলছিল। বঙ্গবিভাগ হ'লে সারা বাঙলায় "অনুশীলন" জাতীয় সমিতি চতুর্দিকে কেন্দ্র স্থাপন করে। ইহারই কোনো কোনো অংশ প্রকৃত বিপ্লবাত্মক নীতি, জীবনদান ও গ্রহণ প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়। মুরারীপুকুর বাগানে এই চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে রূপ গ্রহণ করে বিরাট পরিকল্পনায় সেইখানে হাতে খড়ি।

কয়েকজন থেকে শতাধিক সভ্য নিয়ে বহুসংখ্যক 'দল' সৃষ্ট হয়। মূলতঃ অনুশীলন সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অপর সকলের প্রেরণা মূল ছিল। কিন্তু কার্য্যক্রম ও দলীয় নেতাকে অবলম্বন ক'রে শক্তিশালী 'যুগান্তর' দল ১৯০৬ সালে গড়ে ওঠে। "যুগান্তর" পত্রিকার মতের সমর্থকরা মুখ্যতঃ এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

১৯০৭ সালের শেষভাগে বাঙলায় বিপ্লবের প্রকাশ্য রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ছোটলাট বাহাদুরের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয় ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে। তারপর আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়েছে; সফল হয়নি। এই সময় সরকারী বা ধনীর অর্থ লুণ্ঠন দ্বারা মারণাস্ত্র ক্রয় বা প্রস্তুত এবং দলের ব্যয় নির্ব্বাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকা শেখর নগরে প্রথম ডাকাতি হয়। তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর চিংড়িপোতা রেলষ্টেশনে যে ডাকাতি হয়, সেটাই সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে মামলায় নিষ্ফল টানাটানি চলে বহু দিন।

এখন পর্য্যন্ত বিপ্লবী দল বা সরকারী কোনো লোকের প্রাণহরণের প্রশ্ন ওঠেনি, তার প্রচেষ্টা চলছিল মাত্র। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিপ্লবী পক্ষের প্রফুল্ল চক্রবর্তীর প্রাণহানি ঘটে দেওঘরের দিঘিরা পাহাড়ে নিজেদের প্রস্তুত বোমার শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে। তারপর প্রাণ দেন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু; দুইজন ইংরাজ মহিলার প্রাণান্ত হওয়ায়। পত্র-পত্রিকা সাহিত্যের মাধ্যমে মরণের ডাক এসে যুবক সম্প্রদায়কে পাগল করেছে। যুগান্তর ও সন্ধ্যা পত্রিকাদ্বয় এ বিষয়ে সকলকে পিছনে ফেলেছে। আর এসেছে বাঙলার এক লোককবি—যাঁরা গাইলেন, "আয়, ম্যাজি আয় মরিবি কে।"

১৯০৭-০৮ সাল থেকে মরণ ও মারণ এবং লুণ্ঠন যজ্ঞ ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে চলেছে। ১৯০৮ সালে ৩১শে আগষ্ট আলিপুরের জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যাই গভর্ণমেন্টের স্বার্থে ও ইজ্জতে প্রধান আঘাত আনে। এতে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হয়। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতগুলি পুলিশ, উকিল ও গুপ্তচর হত্যা এই সময় সম্ভব হয়েছিল। বহুতর প্রকৃত গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে। জানুয়ারী ৫, ১৯০৯, হঠাৎ গভর্ণমেন্ট (১) অনুশীলন সমিতি, ঢাকা, (২) স্বদেশ বান্ধব সমিতি, বরিশাল, (৩) ব্রতী সমিতি, ফরিদপুর, (৪) সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিংহ, (৫) সাধনা সমাজ, ময়মনসিংহ, ও ১লা মার্চ কলিকাতার যুবক সমিতি ও সাতক্ষীরার ব্রতী সমিতি বে-আইনী ঘোষণা দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এইবার প্রকাশ্য যুদ্ধারম্ভ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। দুই পক্ষেই হতাহত হয়েছে কয়েকজন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙলা কেবল নিজ শক্তির উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকেনি, ইংরাজের শত্রুর সহিত হাত মিলিয়েছিল।

তার পর কিছুকাল একটা আচ্ছন্নভাব দেশকে অধিকার করে। মাঝে মাঝে 'খণ্ড যুদ্ধ' যে হয়নি তা নয়; যা ছিল তাতে গভর্ণমেন্টকে বিব্রত করে তোলা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পরের ধাপ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। এ সময় তিনি বাঙলার হিংসাপন্থীদের সহিত আলাপ আলোচনায় তাঁদের কিছুকাল বিরত থাকবার অনুরোধ করে সফল হয়েছিলেন। ভিতরে আগুন ঠিকই জ্বলছিল, বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

এই অহিংস আন্দোলনের মধ্যে বাঙলায় এক নবীন বিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটে। সরকারী 'নকরী' ছেড়ে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর প্রধান সহকারীরূপে বাঙলার তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এসে উপস্থিত হন। যখন গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল গড়ে উঠল, তখন গভর্ণমেন্ট তাকে ভাল চোখে দেখেনি। দেশবন্ধুর সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও গুপ্ত সমিতির পরামর্শমণ্ডলীর মধ্যে দেশবন্ধুর স্থান সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের অজানা ছিল না। যদিও অহিংসাপন্থী কংগ্রেসেরই মধ্যে, তবুও যারা দেশবন্ধুর সহকারীরূপে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের অধিকাংশ ১৯১৪-১৮ সহিংস ক্রিয়াকলাপের অংশীদার। সুতরাং গভর্ণমেন্ট বিনা বিচারে যথেচ্ছা আটক-বন্দী করে দলকে দুর্ব্বল করে ফেলতে চেষ্টা করে; সুভাষচন্দ্র বাদ পড়েনি। আন্দোলনে কিছু ভাঁটা পড়ে গেল।

এই সময় থেকে সহিংস বিপ্লব সম্পূর্ণ গোপন পথে অগ্রসর হল। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের বেগ হ্রাস হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই বিপ্লবীদল বেপরোয়া হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, যার চরম সার্থকতা ১৯৩০ এপ্রিল ১৮ই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

সুভাষচন্দ্র স্বয়ং বিপ্লবী কি না অর্থাৎ সমগ্র বিপ্লবের সহিত তার সম্পর্ক কি, তা নিয়ে কিছু বাদবিতণ্ডা যে নেই তা নয়। বিশেষ ক'রে বিপ্লবী জীবনে তার গুরুগিরির মর্য্যাদা গ্রহণের জন্য নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কিছু পুরাতন কথার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুভাষচন্দ্র কটক থেকে বিদ্যা শেষ ক'রে কলিকাতা এলে তদানীন্তন রাজনৈতিক দলের যুবক নেতৃস্থানীয় কারও কারও সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতেন। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির পরিমাপের জন্য এই সকল পরিচয়। যে জ্ঞান লাভই হয়ে থাকুক, তাতে সে যে খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ সালে ইংলণ্ড হ'তে ফিরে দেশবন্ধুর নামমাত্র 'চাকরী' করবার পর সুভাষ কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা দাঁড়িয়ে যান। প্রশ্ন ওঠে, বিপ্লবী দলের মধ্যে তাঁর স্থান কোথায় ছিল?

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী দলের সহিত তাঁর আদি সংযোগের কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বে চিংড়িপোতার বিপ্লবী দলের উল্লেখ করা হয়েছে। বিলাত যাবার পূর্ব্বে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে নিজ গ্রাম কোদালিয়ায় গেলে গ্রামের পরিচিতের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানের কথা তাহার কানে আসে। শুনেছিল ক্ষুদ্র গ্রামের বহু যুবক বিনাবিচারে আটকবন্দী ছিল। বিলাত থেকে কলিকাতা ফিরবার তিন চারদিনের মধ্যে পূর্ব্ব ব্যবস্থা-নুযায়ী সে গ্রামের এক পুরাতন বন্ধুকে সঙ্গে করে অতি প্রত্যুষে গোপনে হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেদিন দীর্ঘ আলোচনার পরে ধর্ম্মতলায় ফরোয়ার্ড পত্রিকা অফিসে ("ছুটকামল ম্যানসনে") কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলে। ইতিমধ্যে অপরাপর পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত পরিচয় জমে উঠতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

বিপ্লবী সুভাষের জীবনের আদি ও অকৃত্রিম গুরু নির্দ্দেশ করতে গেলে দস্তুরমত গবেষণার প্রয়োজন। এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বিশেষ অবান্তর বস্তুর অবতারণা-জনিত পাপ হবে বলে মনে হয় না। কৈশোর হ'তে সুভাষ বিদ্রোহী মনের পরিচয় দিয়েছেন। যেন সে উত্তরকালের 'নেতাজী' হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে থাকে। বিলাসের ঘরে থেকেও সে আপনাকে নির্লিপ্ত রেখেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় 'যেন পাঁকাল মাছ'। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দরিদ্র লোকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে, গোপনে নিজে দেহে তা পরীক্ষা করেছে। যৌবনের প্রারম্ভে আবার গোপনে বাড়ী হ'তে দূরে কলেরা রোগীর মধ্যে নির্বিকারভাবে সেবা করে আনন্দ পেয়েছে। গভীর পাঠের মধ্যে সাধু-সন্ধানে বিবাগী হয়ে অপটু রুগ্ন শরীর নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। ইউনিভার্সিটী কোর (Corps) এর মধ্যে ক্যাম্পে কড় খাটায় বিব্রত বোধ ক'রে নি, মহা আনন্দে শ্বেতচর্ম্মাবৃত "গুরুর" দল কালা আদমীর নিকট লক্ষ্যভেদে পরাজিত হয়েছে। ভারতের নিন্দাকারী উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক প্রহারকার্যে (১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৫) যোগসাজসের জন্য কলেজ হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে প্রফুল্ল চিত্তে প্রচার করে দিল যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে আচরিত কাজের জন্য নির্য্যাতন সাজা শাস্তি ভোগের অপূর্ব্ব ভাবের প্রথম পরিচয়ে সে নবতর সূক্ষ্ম মহিমার স্বাদ পেয়েছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও নানা উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে; তা নিষ্প্রয়োজন। কেবল বলতে পারি, গহনবনে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য সিংহ শিশুর কোনো 'গুরু' প্রয়োজন হয় না।

বিপ্লবী দলের মধ্যে পড়ে তাকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়েছে। ১৯২৪-২৫ সালে দলের নেতৃস্থানীয়রা অন্ততঃ প্রধান কয়েকজন অসমসাহসিক কাজে অংশ গ্রহণের গর্ব্বে গৌরবান্বিত। সুভাষের খাতায় সে রকম কোনো মূলধন জমা ছিল না। তাতে সে বিপ্লবী দলের মধ্যে নেতৃত্ব পায়নি কিন্তু এখানে তার একটি অপূর্ব্ব স্থান জুটে গিয়েছিল। প্রচ্ছন্ন দল তাকে অবলম্বন করে নিজেদের সংযোগ রক্ষা করেছে। সুভাষ এদের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশেছে যেটা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। এখানে দলগত নেতৃত্বের পার্থক্য সাধারণ লোকের নিকট ধরা পড়লেও, রাজনীতির গোপন আবর্ত্তে যারা ঘুরেছে, তারা জানে, গভর্ণমেণ্ট ত নিশ্চয়ই জানত যে অনুশীলন সমিতির যোগসূত্রে দেশপ্রিয় নেতা হয়েও দলের নয়, যুগান্তর দলের সুভাষচন্দ্র নেতা না হয়েও দলের একজন প্রধান। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এই ব্যবধান ও বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে; অনুশীলন আর যুগান্তর; "নো চেঞ্জার" আর "প্রো-চেঞ্জার।"

যুগান্তর বিপ্লবী দল সুভাষকে তাদের কাছে টেনে বেঁধে রেখেছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনো বিভণ্ডামূলক প্রতি ব্যাপারে তাকে যুগান্তর দলের নেতাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র বোঝাপড়া করতে হয়েছে। যখন এই প্রভাব তার নিকট বাধাস্বরূপ হয়েছে, তখন সে আপন পথে আপনি চলতে আরম্ভ

করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক তার নিজস্ব সহচর সহকর্মী দিয়ে গঠিত হয়েছে। তখন কোনো নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলে বা তাদের পরামর্শে আর চলেনি ; তার মতকেই প্রাধান্য দিয়ে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে।

পরের অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্র তার আত্ম-পরিচয়ে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর স্থান গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। সে বরাবরই বহির্জ্জগতের রাজনৈতিক কূটনীতি লক্ষ্য করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ বেছে নেবার নির্দ্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় অন্য কোনো নেতার সে দূরদৃষ্টি ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনের সম্ভাবনা বুঝে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যতের রণাঙ্গন স্থির করে নিয়েছিল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবী জার্ম্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, শ্যাম, ব্রহ্ম, মধ্য প্রাচ্য, আফগানিস্তান, তুরস্কতে ছোটখাটো কেন্দ্র রচনা করে স্ব স্ব শক্তিমত ইংরাজের অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। ইংরাজ-শত্রু জার্ম্মানীর সাহায্য তারা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণে এই একটি নেতা নিজেকে ভুলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে বেরিয়ে পড়েছে। ১৯৪১ জানুয়ারী ১৬-১৭ই মধ্যরাত্রে কলিকাতা ছেড়ে জীবশরীরের সহনাতিরিক্ত ক্লেশ বহন করে দেশের স্বাধীনতা লাভের আশায় অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন। জার্ম্মানীতে বসে সম্ভাব্য সংগঠন সমাপন করে সুদূর প্রাচ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ২রা জুন ১৯৪৩ সালে।

ভারতের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, যাকে ইংরাজ রাজশক্তি একদিনের জন্যও কারারুদ্ধ করতে পারেনি, অথচ যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বর্ম্ম-হাতিয়ার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেননি সেই রাসবিহারী বসুর সহিত সুভাষচন্দ্র মণি-কাঞ্চনের সংযোগ প্রমাণ করেছে।

রাসবিহারীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় পূর্ব্বাঞ্চলীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হ'য়েছে এবং তা জগৎকে জানানো হ'য়েছে ১৯৪৩ জুলাই ৫ তারিখে। সুভাষচন্দ্র এখন 'নেতাজী', ২৫ আগষ্ট সেনানায়করূপে তিনি 'ফৌজ'-এর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃক গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম অস্থায়ী সরকার ও মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সংবাদ ২১ অক্টোবর প্রচারিত হয়। পরে ২৯ ডিসেম্বর শত্রু-অধিকার হ'তে সদ্যমুক্ত ভারতের স্বাধীন অংশ আন্দামান বা শহীদ দ্বীপে পদার্পণ করে পরদিন ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। এই দিন দু'শত বছর পর ভারত স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে।

এ সকল ঘটনার বিস্তারিত পরিচয় অনাবশ্যক, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হবে। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে নেতাজী আসছিলেন ভারতের দিকে দুস্তর পথে, মারাত্মক বিপদ মাথায় ক'রে। ব্রহ্ম-ভারত সীমা পার হ'য়ে অধিকৃত ভারতের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রবেশ করে ১৮।১৯ মার্চ্চ ১৯৪৪। যখন ভারতের বক্ষে ভারতের জাতীয় সেনা পদার্পণ করেছে, অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করছে, নেতাজীর আগমন সংবাদ প্রচারিত হ'য়েছে তখন "বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে" জওহরলাল সকলের আগে মুক্ত কৃপাণ হস্তে বাধা দেবার জন্যে ছুটে চলে-ছিলেন। সে আস্ফালনে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল। সে বীরত্ব কোথায় অন্তর্হিত হ'ল যখন কাশ্মীরে রণ দামামা বেজে উঠল ? যখন ভারতের পক্ষে সেনারা সম্পূর্ণ জয়ের পথে, তখন সাধারণ ভয়-বিহ্বল লোকে যা করে সেই ভাবে ছুটে গিয়ে সালিসীর জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে ধর্ণা দিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে কে ? কোথায় গেল সে সাহস যখন চীনারা হিমালয়ের ওপার থেকে কেবল উঁকি মেরেছিল—"কে কোথায় আছ, রক্ষা কর ; হে কৃষ্ণ (মেনন) কি করলে !" বলে ইংরাজ, আমেরিকা, সোভিয়েট রুশের দরজায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল কোন রাষ্ট্রনায়ক ? তখন ত খাপ-খোলা তলোয়ার হাতে শত্রুর আগমন রোধ করার হুঙ্কার শোনা যায় নি। "দাদাকে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না। অতএব নেয় নিগকে, ব্যাটারা ; দখলে রাখতে হ'লে নাজেহাল হবে" অতএব ছেড়ে দাও, নয়ত দিল্লীর প্রাসাদপুটে বাদশাজাদার তন্দ্রায় ব্যাঘাত

হ'তে পারে স্বপ্নে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছিলেন কে ? যখন চীন তিব্বত গ্রাস করেছিল তখন এই মহাবীর সে কাজকে সর্ব্বপ্রথম সমর্থন জানিয়েছিল, যাতে নিজের গায়ে আঁচড় না লাগে। যেমন আত্মীয় প্রেমে ধৃতরাষ্ট্র, দম্ভে দুর্যোধন, বিশ্ব রাজদরবারের বিদূষক, তেমনি রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে শকুনি অবতার। বলতে হয় "তোমার মহিমা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

ইতিহাস একদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করবে, ভারতের বিপ্লবী বীরদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথায়। বালেশ্বর চাষখন্দ যুদ্ধ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কের সংঘর্ষকে আমরা প্রকাশ্য সংগ্রামের গৌরব দান করি। অবশ্য চট্টগ্রামের ঘটনার সঙ্গে অপরগুলি তুলনা করা চলে না। আবার সুভাষচন্দ্রের কার্য্যকলাপ পূর্ব্বের সমস্ত বিপ্লবাত্মক ঘটনাকে যে ম্লান করে ফেলেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আত্মোৎসর্গকারী, মরণ-বিজয়ী বীরের মধ্যে একের অপরের তুলনায় খর্ব্ব করা যায় না। তবে যতীন মুখার্জি, সূর্য্য সেন, ভগৎ সিং, রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র কিছু স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করার দাবী রাখেন। হয়ত বা জপমালায় নামের মত তুলসী চন্দনের দানার মত শেষের দিকে গিয়েছে তত শোভায়, সৌরভে, মহিমায় যেন অধিকতর ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে ইতিহাস নিঃসন্দেহে সুভাষের সহকর্মীদের সম্বন্ধে প্রচার করছে যখন কর্তারা জেলে বসে 'জামাই আদরে' লড়াই করতে করছিলেন, তখন নেতাজী হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে জীবনান্তকারী বিপদের মাঝে অভিমন্যুর মত সিংহবিক্রমে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জাপানের পরাজয় এবং চারিদিকে ঘনায়মান নিরাশার মধ্যেও দ্বিতীয় অন্তর্ধানের প্রাক্কালে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'দিব্যচক্ষে দেখছি, ভারত স্বাধীন হ'তে আর একটুও বিলম্ব নেই।"

নিরপেক্ষ ইতিহাস এখনই বলছে, সুভাষচন্দ্রের প্রেতাত্মা দিল্লীর লালকেল্লাপ্রাকারে ঘুরে বেড়াতে দেখে বিদেশী শত্রু ভয় পেয়েছে, ভেবেছে যে আর নয়, যে ভারতীয় সৈন্যের উপর নির্ভর করে এতদিন ধোঁকা বাজি চলেছে, তাদের আর বিশ্বাস নেই। ভূত তাড়াবার সর্ষেতেই ভূতে বাসা বেঁধেছে। "অতএব পাততাড়ি গোটাও"। নেতাজীর অশরীরী আত্মা তখন জলস্থল ব্যোমের সৈন্যকে প্রভাবিত করেছে। দেশের মধ্যে যত সংগ্রাম হয়েছে, ভারতের জাতীয় সৈন্য (I. N. A.) রণক্ষেত্রে হেরেও শত্রুর মনোরাজ্যে শেষ যুদ্ধে প্রচণ্ড জয়ী হয়েছে। তাই ইংরাজ ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছে। ভারত-সরকারের ফরমায়েসে রচিত ইতিহাস খুব বেশী দিন এ সত্য চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।

বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবের যাহা কিছু মহামহিমান্বিত গরিমা যুবক সুভাষচন্দ্র থেকে ১৯২৮ সনের G. O. C. এবং পরে ১৯৪২ সনের নেতাজীতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' আর নেতাজীর "জয় হিন্দ" আরাব আজ ময়ূর-পুচ্ছধারী কাকের কলরবে কিছু ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। দেশের দুর্গতিও সেই অনুপাতে ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে; চারদিকেতে লাথি মারছে, লরি-বোঝাই 'প্রোটেষ্ট' চলেছে। এমন দিন আসবে যখন কেবল দেশের মধ্যে অশান্তি দমনে বেপরোয়া 'অহিংস' গুলিতে নাগরিক হত্যা করে দেশ রক্ষা করা যাবে না, বিদেশী আক্রমণকারীদের সত্যসত্যই সহিংস শক্তিদ্বারা রোধ করতে হবে; তাকে জয় করতে হবে। নিজের শক্তিহীনতা ঢাকবার জন্যে অহিংসার মাহাত্ম্য প্রচারে দেশ আরও জাহান্নমে যাবে। "ফাদার অফ্ দি "নেশনের" সঙ্গে আবার স্মরণ করতে হবে দামোদর-বালকৃষ্ণ-বাসুদেও চাপেকার ভাইদের। আবার বলতেই হবে, "এস সুদর্শনধারী মুরারে। এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে, এস ভীষণ অসি ধরি।" আর তোমার "নিমিত্তমাত্র" রূপে বীরকুলতিলক ভারতের "সব্যসাচী" বর্গকে পাঠাও যার পূর্ণ প্রতীক 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। সবাই বল "বন্দে মাতরম্"। "জয় হিন্দ"। "জয়তু নেতাজী"। প্রাণখুলে বল সবাই তোমার আসন শূন্য আজি......'

জোয়ার

উপন্যাস
গতবারের পর

বিজয় কুমার ঘোষ

। চার ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে পেল আলোয় আলোময় হয়ে গেছে ঘরখানা। প্রচণ্ড ঘুমিয়েছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। মনে পড়ল, কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। ভাত ঢাকা দেওয়া ছিল এই ঘরে। বহুদিন পর বাবার স্বপ্ন দেখল কাল। মহববতপুরের বাগান, সেই বাড়ি। পদ্মা খুব এগিয়ে আসছে। ধীরেন্দ্র নাথ রায় রোড ভেঙে যাচ্ছে। একটা একটা করে বাবলা গাছ তলিয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে বাবার ফটোর দিকে তাকাল আলোক। শান্ত, সৌম্য মূর্তি। কোনদিন বুঝতে পারেননি একদিন সব তলিয়ে যায়—হারিয়ে যায়। রূপো বাঁধান লাঠিটা দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায়। বাবা রোজ বিকেলে বাগানে বেরোতেন এখন আর পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা যায় না। দু' বছর হল। হাত বাড়িয়ে রেডিওটা খুলে দিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা। তীব্র সুগন্ধ নাকে এসে লাগল। কদম গাছ। সবুজ পাতা ছাপিয়ে অজস্র ফুল। বুড়ো মানুষের সাদা মাথার মতন। যেন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল পাতায় পাতায়। এই গাছটি বাবা লাগাননি। আগেই ছিল। তখন খুব ছোট। কন্ট্রাক্টর কেটে ফেলতে চেয়েছিল গাছটি। এখন অনেক বড় হয়েছে। দোতলার জানালায় ফুলভরা ডাল নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। একটা ফুলের গায়ে হাত রাখল আলোক। বার্নাড শ'য়ের কথা মনে পড়ল যাকে আমি ভালবাসি তার মাথাটা কি ক্যাচ করে কেটে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি? রেডিওতে কান পাতল আবার। কেয়া পাতার নৌকো গড়ে ভাসিয়ে দেব জলে। আজ কেয়ার জন্মদিন। নিমন্ত্রণ। না গেলে নাকি মুনা রাগ করবে। ওরা বাবাকে আদর করে ডাকে মুনা। বাবা—কি সুন্দর শব্দ! শান্ত, সৌম্য, গাম্ভীর্য ঝরে পড়ে এই ডাকে। যদি কাব্যি করে বলা যায়, কেয়াকে নৌকো গড়ে পৃথিবীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন ওর বাবা, না আর কেউ, বিশ্বপিতা, তাহলে এখানে মুনা কথাটা কি বেলো! কি অর্বাচীন!

মৃদু পায়ের শব্দ। মা এই ঘরে এলেন। ছুটির দিনে ছেলেকে কাছে পেতে চেষ্টা করেন। রায়বাড়ির পূর্বতন ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিপুন ভাবে কথা বলেন। প্রথমে নিতাইকে ডেকে এক চোট ধমক দিলেন। তারপর নিজেই ঘরখানা গুছোতে শুরু করলেন। রূপো বাঁধান লাঠিটা মুছে টেবিলে রাখতে গিয়ে মনে মনে নিজের পরাজয় স্বীকার করলেন। অসম্ভব। ফুলের ভিতর থেকে কি তার গন্ধ আলাদা করা যায়? রায়বাড়ির ছেলেরা তাদের গোপন ধারাটিকে এই ভাবে পুষে রাখে। পুলকও এই রকম ছিল। চা এনে নিতাই টিপয়ের ওপর রাখল। ঘর গুছোন শেষ হল। মুখোমুখি বসলেন পূর্ণশশী দেবী।

—মা আজ আমার নেমন্তন্ন আছে।

—কোথায়?

—এলগিন রোডে। কেয়ার জন্মদিন।

—তোকে ডেকে কথা বলল, এত অভদ্রতার পরেও?

—না মা, ও খুশিই হয়েছে। হালচুলে আসবে হয়নি কি না।

আলোক হাসল। চায়ে চুমুক দিয়ে টিপয়ে নামিয়ে রাখল। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পূর্ণশশী দেবী। মেয়েদের মন নাকি বোঝা যায় না; এখন ছেলেদের মনও। কথায় কথায় বলতে এসেছিলেন, এত বড় বাড়ি এত বড় বাগান—সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। একটুও মন টেঁকে না। নতুন মানুষ চাই। নতুন মানুষের সাড়া। আর আমি বুড়ো হয়েছি; কবে ডাক আসে—সেই ক'টা দিন শুধু। বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক। বলতে এসেছিলেন, আমার কোন আপত্তি নেই তোর যদি পছন্দ হয়ে থাকে। কেয়া লক্ষ্মী মেয়ে। এরকম তো কত হয়। স্টেশন রোডে থাকতে নিজেও এরকম কত দেখেছেন। কিন্তু একি কথার ছিরি! কেয়া জঙ্গলে আসতে চায় না। নিমন্ত্রণ করে আলোক উদাসীন হয়ে থাকে। বরং না এলে খুশি হয়। বুঝতে পারেন না পূর্ণশশী দেবী। এ যুগের ছেলেমেয়ের মন পলকা সুতোর মতন।

—মা, বাবার স্বপ্ন দেখলাম কাল রাত্রে।

চমকে উঠলেন পূর্ণশশী দেবী। চোখে চোখ রাখলেন।

—আমি দেখিনি কোনদিন।

—আমি প্রায়ই দেখি।

—পূর্ণিমাকে দেখেছি কয়েকবার। পুলককেও—

—বিশ্বাস কর মা, আমি দাদার কিম্বা দিদির স্বপ্ন একবারও দেখিনি।

—তিনি পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, তাই আমি দেখি না। তা কেমন দেখলিরে তাঁকে এখানে? আগের মতই?—উৎসাহিত হয়ে উঠলেন পূর্ণশশী দেবী। স্মৃতি দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল।

—না মা, মহববতপুরে। দোতলার বারান্দায় সেই বড় ডেক চেয়ারটায় শুয়ে আছেন। বাবার মুখখানা কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছিল। বাবা আমাকে ডাকলেন। আঙুল দিয়ে পদ্মা দেখালেন। পদ্মা তখন হাসাল। একটা একটা করে গাছ পড়ে যাচ্ছিল। বাবা তাই দেখে খুব ভয় পেয়ে সবাইকে ডাকলেন। তারপরে আর মনে নেই।

—বাবুর সঙ্গে তোর কোন কথা হয়নি?

—হ্যাঁ একটু হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে নেই।

পূর্ণশশী দেবী আপন মনে নখ খুঁটতে লাগলেন। এই সব আলোচনাকে ভয় করেন। বিশেষ এই পরিবেশে। সেই রাক্ষসির কথা মনে পড়ে। আশ্রয় দেবার নাম করে যে নদীর ওপার থেকে লেবু ছিঁড়ে এনে নিদারুণ আপ্যায়ন করেছিল। পূর্ণশশী দেবী কাজের নামে বক্তব্য মুলতুবী রেখে অন্য ঘরে দ্রুত চলে গেলেন। আলোক বুঝতে পারল। পায়চারী করতে করতে রেডিওটার দিকে তাকাল। হিন্দী-শিক্ষার আসর। ওই গানটা হলে মন্দ হত না এখন—আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।

আলোকও দুঃখ বোধ করতে লাগল। বুকের ঠিক মাঝখানে দুঃখের তার দিয়ে তৈরী সেতারে কে মূর্চ্ছনা তুলছে অবিরাম। পায়ে পায়ে অস্থিরতা। এক টানে ড্রয়ারটা খুলে ফেলতেই এক গাদা পুরোনো চিঠিপত্রের সঙ্গে অনেকগুলি ফটো বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে কোন কোনটি হলুদ হয়ে গেছে। কোনটি বা পোকায় কেটে ফেলেছে। এই সব ফটো খুব দামী, বাঁধিয়ে রাখতে হবে। আলোক ভাবল। সব কয়টাই মহববতপুরে তোলা। কি সুন্দর পুলকদাদার ছবিটা! এটি বিলেত যাবার আগে তোলা হয়েছিল। জাহাজটারও ছবি আছে সঙ্গে। একখানি বড় গ্রুপ ফটো। দোতলার বারান্দায় তোলা। ওই যে—পূর্ণিমাদিদি দাঁড়িয়ে আছে। কি সুন্দর—রাজরাণীর মত! রায় বাড়ীর সেরা সুন্দরী। তার পাশে বরটা দাঁত বার করে আছে। পাজী বদমাইস লোফার—। বাবা জীবনে দুটি ভুল করেছিলেন। আলোক মনে মনে বাবাকে দোষ দেয়। এক, দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে; দুই, লোহার ব্যবসায়ীর ঘরে দিদিকে বিয়ে দিয়ে। আলোক ভাবে, দাদা বিলেত না গেলে হয়ত আজো

বেঁচে থাকতে পারত। শয়তানের সঙ্গে দিদির বিয়ে না দিলে দিদিও এত সকাল সকাল চলে যেত না।

হঠাৎ আলোক লক্ষ্য করল, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে মূর্চ্ছনাটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। কেমন যেন ভৌতিক নীরবতা। দেওয়ালগুলো, ছাদ, ঘরের মেঝে আপনা প্রথায় এগিয়ে আসছে—বিন্দুতে। ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এসে পড়ল। সর্বনাশ। পালাবার পথ নেই। দেওয়ালগুলো পিষে ফেলবে। আতঙ্কে আলোক চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করতেই দেখতে পেল দরজাটা হাট খোলা। দুমদাম করে দৌড়ে, যেন পিছনে পিছনে মৃত্যু ছুটে আসছে, এমনি ভাবে লাফ দিয়ে বাগানে ছুটে গেল। মা আর নিতাই বেরিয়ে এসেছে। পাগল ছেলে আর পাগলা দাদাবাবুর কাণ্ড দেখে। না, এখন আর শব্দ হয় না; হাসি পায় শুধু। সেই ভাবেই হাসল ওরা। লাফাতে লাফাতে আলোক ঘাটে এসে বসল শুয়ে পড়ল। নীল আকাশটা গাছপালা শুদ্ধ, পাখির কিচির মিচির শুদ্ধ চোখের মধ্যে উঁকি দিল। এখন যেন কিঞ্চিৎ ভাল লাগছে। কি হল, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সব উল্টে পাল্টে গেল। আলোক আবার ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। কেন বাবাকে দেখলাম, বাবলাগাছগুলিকে তলিয়ে যেতে, কি ড্রয়ার খুলে পুলকদাদা পূর্ণিমাদিদির ছবি কেন দেখতে গেলাম? এ সব না দেখলে সকালটা সুন্দর কাটত। আমরা মৃত্যুর কোলে শুয়ে থাকি। মৃত্যু আমাদের মা। জীবন মৃত্যুকে ভুলে থাকে। আমরাও নিশ্চিন্ত হবার ভান করি। কখনো কখনো আমরা জানালায় হঠাৎ কিসের ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠি। আলোক সাতপাঁচ ভাবল। ঘরে গিয়ে ফটোগুলো ফের ড্রয়ারে ভরে রাখল। হঠাৎ কান দুটো উৎকর্ণ হল। লোকজনের সাড়া। কথাবার্তা। তবে কারা এল? সুখের পায়রা? শব্দ লক্ষ্য করে পশ্চিম দিকে বেড়ার কাছে এগিয়ে এল।
৯. সবিস্ময়ে দেখল তিন চারটে মানুষ। হাউওয়ান সার্ট, নর্দমা প্যান্ট। মাপ জোক হচ্ছে। বাড়ি হবে। বুঝি মাথার ওপর এ্যাটম বোমা ভেঙ্গে পড়লেও এতটা দুঃখিত অন্তর হত না। মস্ত বড় হাঁ নিয়ে শহর এগিয়ে আসছে। এত নির্জনতম, নিভৃত প্রান্তর ও তার বিশাল ক্ষুধা থেকে রেহাই পেল না। এখানে বাড়ি উঠবে। মানুষ-জন আসবে। পাখির বদলে নতুন শিশুর অভিযোগ ভরা কান্না ভাসবে বাতাসে। হয়ত এখানকার মানুষরাও একদিন ক্লান্ত, কি ফাঁকা বোধ করবে। তারা মেট্রোতে ইংরেজী বই দেখতে যাবে। ব্রেড রোডে, কি ফিরপোতে অকারণ ভিড় জমাবে। আলোক বুকের মধ্যে জলের শব্দ শুনতে পেল। বাবলাগাছ পতনের শব্দ। ওপরে উঠতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে মার সঙ্গে দেখা। খুব হাসি খুশি মুখ।

— জানিস, পশ্চিমদিকের প্লটটা বিক্রী হয়ে গেছে। খুব বড় লোকে কিনেছে তিনতলা বাড়ি উঠবে

আলোক উত্তরে কিছু বলল না। শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাল

—পূব দিকের প্লটটা তো আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বাড়ি উঠবে। বাড়ুক, মানুষজন বাড়ুক। উন্নতি হোক জায়গাটার।—যেন সামনে কেউ নেই, ফলন্ত জামরুল গাছটাকেই লক্ষ্য করে বলছেন, দেখিস এক ছটাক জমিও পড়ে থাকবে না কলকাতা শহরে মানুষ আঁটছে না। যাক, দুটো প্রাণ খুলে কথা কইতে পারব তখন।

আলোক স্তব্ধ।

—কায়স্থ পাড়ার দিকে যে জমিটা উদ্বাস্তুরা জবরদখল করেছিল, শুনছি নাকি গভর্ণমেন্ট থেকে স্যাংসন করে দেবে। তুই কিছু জানিস নাকি?

আলোক মাথা নাড়ল।

আরও শুনছি রাস্তাটা নাকি পাকা হবে। বাস চলবে।

আলোকের নাকে যুঁইফুলের গন্ধের সঙ্গে ডিজেল তেলের পোড়া গন্ধ এসে লাগল। মুখটা ফেরাল।

পূর্ণশশী দেবী লক্ষ্য করলেন। খোকার ওপর খুব কি অত্যাচার করা হচ্ছে? একদমে অতখানি ভাল নয়। বললেন, রাস্তার ওপারে মস্ত বড় জমিটা এক মাড়োয়ারী কিনে নিয়েছে। কারখানা হবে নাকি। অতটা কিন্তু আমার ভাল লাগে না। বড্ড নোংরা হবে। কি বলিস খোকা?

আলোক অবাক চোখে তাকাল। স্পষ্টই বোঝা যায় যেন হুস্ করে কিন্তু গভীর কূপের মধ্যে পড়ে গেছে। উদ্ধারের আশা নেই।

—কারখানাটা তৈরী হতে একবছর। কিন্তু যবেই হোক, মাগো, কি বিচ্ছিরী শব্দ উঠবে! নোংরা লোকের ভিড় জমবে—

আলোকের এক দৌড়ে বাবার ফটোর কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, তুমি মোটেই দূরদর্শী নও। তোমার সঙ্গে আজকের কিছুই মিলছে না। মিলবে না। কেন এখানে আনলে? তার চেয়ে ষ্টেশন রোডের কোলাহল অনেক ভদ্র ছিল।

আলোকের পা কাঁপছে। এখন ঘরের ভিতর ঢুকলে আবার দেওয়ালগুলো বিন্দুতে এগিয়ে আসবে। জাপানী প্রথা। পৃথিবীটাই জাপানী প্রথায় পর্যবসিত। এখন শুধু শহর এগিয়ে আসছে।

—কিরে, কোথায় চললি? খাবি না?

মাথা নাড়াল। মাধবীলতার গেটটা পেরোতে পেরোতে শুনতে পেল, একি ছেলেরে বাবা! লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চলল! নিতাই দাদাবাবুকে ডেকে আনত। নিতাই ডাকতে এসেছিল। এসে শুধু ধমক খেয়ে ফিরে গেছে। রাস্তার দু'পাশেই বেশ জঙ্গল। সন্ধ্যার পর প্রায়ই এখানে শিয়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। ঘন বাঁশঝাড়। বনকাঁঠালের ছায়া। আলোক ছোটকালে একবার বাবার সঙ্গে বরিশালে বেড়াতে গিয়েছিল। বরিশাল। নদীনালার দেশ। কত বড় বড় খাল। এদিকে তার নাম নদী। পাঁচ ছ'দিন নৌকোতেই ছিল। কি ভালই যে লেগেছিল আলোকের।—এই গাঙে ভাসাইয়া দিছি না পাইলামরে কূল! মাঝিরা গান গাইত গলা খুলে। নৌকোতেই রান্না করত খুব ঝাল রসুন পেঁয়াজ দিয়ে। আলোকের লোভ হত। মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে এক একটা গঞ্জ দেখা যেত। লোকজন হাট-বাজার, চিৎকার। শান্ত নদীর ওপর ওদের অস্পষ্ট কথাগুলি কোথায় মিলিয়ে যেত। নদীর জল তির তির করে কাঁপত শুধু। কোন কোন দিন মেঘ হলে নদীটা কি বিরাট হয়ে যেত! নৌকোটা একটা ছোট্ট মোচার খোলার মতন দুলত। ভয় লাগত ভীষণ। নৌকোটা আবার কখনো ছোট খালের মধ্যে ঢুকে যেত। তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। এক রকমের গাছ দেখিয়ে মাঝিরা প্রায়ই বলত, এর নাম বনকটহর।

রাস্তার পাশে কালভার্টের ওপর বসল আলোক। সামনে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে। বারো-তের বছরের একটি পেট-মোটা মেয়ে ডুবে ডুবে স্নান করছে। চারপাশে ঘন বন। নির্জন। বাঁশের ঝাড়। আমের বাগান। কিছুদিন পর কুড়ুলের শব্দ শোনা যাবে। এক একটি গাছ ভীষণ শব্দ করে পড়ে যাবে। (বুকের মধ্যে আলোক যেন এক্ষুণি কুড়ুলের শব্দ তার কিছুক্ষণ পর পর বিশাল গাছ পতনের আর্তনাদ শুনতে পেল।) কুলি লাইনের ব্যারাক, সকাল বেলায় দৈতে কানে ঘটি মাজার দৃশ্য। চায়ের দোকান; স্বদল-হুদে-সতীশদের (ইংরেজী 'a' এর উচ্চারণে) খাকী জামার পচা গন্ধ......আলোকের নাকে এসে লাগছে। আলোক নাকটা কোথায় সরাবে? হয়ত এতদিনে সেই সব খাল নদী বিলের দেশেও শহরের বিষাক্ত ছোঁয়া লেগেছে। আলোক এই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে এই সব চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইল। রাস্তা দিয়ে একটা রিকশা চলে গেল। অল্প-বয়সী রিকশাওয়ালা অদ্ভুত ভাবে তাকাল। ছেলেমানুষী হচ্ছে না তো? অফিসে আলোকের মাথার ওপর পাখা। এখন সেটি সরানো হচ্ছে। এয়ার কণ্ডিশন হবে। রিভলভিং

চেয়ার—যেদিকে ইচ্ছে ঘুরতে পারে মুহূর্তে। ইলেকট্রিক কলিং বেল। নতুন ধরণের পেপার ওয়েট—তাতে তারিখ-গুলো দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পিছলে পিছলে যায়। কই. একবারও তো তা নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করে না? বরং খুশিই হয়। তাহলে শহর নিয়ে কেন এত চিন্তা? কেন তাহলে রোজ রোজ লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরে যায়? কেয়াকে ভালবাসে? আলোকের টেবিলে যত রাজ্যের সায়েন্স ম্যাগাজিন। আলোক সেগুলি পড়তে ভালবাসে। নতুন নতুন আবিষ্কারগুলি সঠিক জানতে না পারলে অস্বস্তি বোধ করে। আলোকের মত একটা সাধারণ মানুষ আজ মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছে। গাগারিন, পাপোভিচ, গ্লেন, শেফার্ড, কুপার—অনেকগুলি নাম মহাশূন্যে জয়যাত্রার ইতিহাস লিখে রেখেছে! হয়ত চাঁদও জয় করবে। কি অসম্ভব ব্যাপার ছিল একদিন! এখন সব সম্ভব। প্যারিতে নাকি বড়লোক-দের মধ্যে চাঁদে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। তাহলে আলোকের হৃদয় উৎফুল্ল হয় কেন? হ্যাঁ, অফিসে সেক্রেটারি-য়েট টেবিলে সায়েন্স ম্যাগাজিন থাকে. বাড়িতে শ্বেত পাথরের টেবিলে কবিতার বই। কিছুতেই মেলাতে পারে না। লেভেল ক্রসিং-এর ওপারের সঙ্গে এপারের. কেয়ার সঙ্গে মিনতির, গরুর গাড়ির সঙ্গে মটর গাড়ির। মেলাবেন তিনি মেলাবেন। ভাঙা দরজার সঙ্গে কোলাপসিবল্ গেটের। না না—মেলান যায় না যায় না—

রাত আটটার সময় এলগিন রোডে পৌঁছল আলোক। ইতিমধ্যে কমলা ভিলার সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছ কিনেছে দু' ডজন। রাসবিহারীর মোড় থেকে এলি-য়টের ওয়েস্টল্যাণ্ড আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বই পারা-বার. পালাবদল, গেটের মুখে কেয়ার ছোট ভাই অশোক দাঁড়িয়ে ছিল। হাত ধরে নিয়ে গেল তেতালার প্রশস্ত হল-ঘরে। কলকলিয়ে উঠল কেয়া তার বন্ধু বান্ধবী।

—এত দেরী করে এলে? তোমার জন্যেই আমরা বসে আছি।

আলোক নীরবে হাসল।

—সত্যি, এ আপনার ভারী অন্যায় মিঃ রায়।—কেয়ার অনেকগুলি বন্ধু নদীর মতন ঝিলিক দিয়ে উঠল. ডলি, ঝুনঝুন, করবী, লতা, সুদেষ্ণা ইত্যাদি।

উজ্জ্বল আলোয় মস্ত বড় ড্রয়িং রুম ভরে গেছে। বিভিন্ন গন্ধের নদী ঘরটাকে সাগর করে তুলেছে। ঘরের মাঝখানে মেহগিনি-টেবিলে একটা মস্ত বড় কেক প্লেটের ওপর। ওটি কেয়া আজ বিলিতি কায়দায় নিজ হাতে কাটবে। সবাই উতলা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেয়া কাটেনি। আলোক না এলে কাটবে না। ইতিমধ্যে দুনা বার কয়েক খোঁজ নিয়ে গেছেন. আলোক এসেছে কি না। কেয়ার মাও খোঁজ নিয়ে-ছেন। মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, আমার আর একটা পাগল ছেলে! দেওয়াল ঘেঁসে রক্তের মত লাল কার্পেটে পা' ডুবিয়ে বসেছে সবাই। মাঝখানে ফুলের ফসল। ফিকে রঙের দেওয়াল। বড় বড় অয়েল পেন্টিং। মাঝে মাঝে গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত। আধুনিক মাঝে মাঝে নাচ। কথাকলি। ভারতনাট্যম। এই বাড়িতে আরো কয়েকবার এসেছে আলোক। যখনি কেয়ার ফাঁকা লেগেছে, অফিসে গিয়ে জোর করে টেনে এনেছে। সবাই অনুরোধ করাতে আলোক সঞ্চয়িতা থেকে দু'টি কবিতা পাঠ করল। কবিতা পাঠের পর হঠাৎ কেয়ার খেয়াল হল। আলোকের হাতটা ধরে ইতি-পূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়নি তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সুশোভন লাহিড়ী. অপূর্ব সেনগুপ্ত, অমিয় বসু. জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে। প্রত্যেকেই ভদ্র, প্রত্যেকেই বিনয়ী. আলোকের মনে হল, প্রত্যেকেই কেয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী। আর কেয়ার বান্ধবীদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে আলোকের আলাপ ছিল। ছিল না কেবল লিলি বাগচোত্র, বেবী ঘোষ, অপর্ণা তালুকদারের সঙ্গে। এবার হল। কেয়া

আজ মধ্যমণি। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। ডিপ্ খয়েরী রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ। রক্তের মত লাল শাড়ি। ওর কানে দুটো বড় বড় দুল। বড় সূক্ষ্ম কারুকাজ। কেয়া যখন হাসছে তখন সেগুলিও ঝিকমিক করছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আলোকের মনে হল, বিয়ে করলে দোষ কি?

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল ঘরের এক কোণায় নীল রঙের খুব দামী স্যুট পরে এক ভদ্রলোক নিঃশব্দে সিগারেট টানছেন। আলোকের মতই বয়স খুব সুন্দর চেহারা। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে মনে হয়। লক্ষ্য করল, কেয়া ঘরের প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ করাল, কিন্তু সেই ভদ্রলোককে সযত্নে বাদ দিয়ে গেল। মেয়েরা তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যের প্রাচীর তুলে বসে রয়েছেন অত্যন্ত নিস্পৃহ খানা উত্তর। এ ব্যাপারে প্রধান সহায় হাতের একখানা বিলিতি পত্রিকা। সমস্ত মনোযোগ যেন কেড়ে নিয়েছে সেটা। আলোক সোফা ছেড়ে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হল না—

ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

—আই এ্যাম সঞ্জিত মুখার্জী—

হঠাৎ কেয়া এসে গেছে দু'জনের মাঝখানে।

—আই সী, আমি আপনার নাম শুনেছি কেয়ার মুখে।

কেয়ার চোখের মণিদুটো যেন ঈষৎ ভয় পেল। বড় বড় হালকা দুল দুটো একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে ভুবন মোহিনী হাসি হাসল: সত্যি, আমারি ভুল হয়ে গেছে। আলাপ করানো হয়নি। জানো, এঁর নাম আলোক রায়। এক নম্বরের পাড়াগাঁ প্রেমিক—

—আমি শহর প্রেমিক। ইজ ইট রাইট?

—অফ্ কোর্স।—কেয়া মৃদু হেসে উঠল: জানো আলোক ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে ঠিক মিশতে পারে না। চিরকাল বাইরে বাইরে কেটেছে।

আলোক মাথা নাড়াল।

কেয়ার মা এলেন এই সময়।

—এই যে বাবা আলোক, এসেছ? তোমার কথা ভেবে ভেবে কেয়া খুন। তুমি না এলে আসর জমে না বাবা। হ্যাঁ বাবা, শুনলাম তুমি নাকি বিলেত যাচ্ছ?

—সেই রকমই তো শুনছি।—আলোক কৌচের এক পাশে সরে গিয়ে জায়গা দিল। বিশাল বপু নিয়ে কিঞ্চিৎ মুখ বিকৃতি ঘটিয়ে উনি বসলেন।

—হ্যাঁ বাবা, কোম্পানি পাঠাল না তুমি নিজেই যাচ্ছ?

—কোম্পানি।

—হ্যাঁ, সেই ভাল।—উনি খুশি হলেন: নিজের পয়সায় বিলেত যাওয়াতে ক্রেডিট নেই। উনি অভিজ্ঞতার হাসি হাসলেন তা কতদিন থাকতে হবে সেখানে?

—এক বছরও হতে পারে দু'বছরও হতে পারে।

—হ্যাঁ, সেই রকমই কেয়া বলছিল। খুব শিগ্গীর?

—না, খুব শিগ্গীর কোথায়? হতে হতে বছর খানেক তো লাগবে।

উনি যেন খুশি হলেন এ কথায়, আর দুটো দিন দেশে থাকতে পারবে জেনে।

সুগন্ধ খাবারের মৌতাত। সৌখিন উপহারের পাহাড়। কাচ-ভাঙ্গা হাসি। থ্যাঙ্ক য়ু, প্লিজ, কাইণ্ডলি ইত্যাদির সূঁচে সেলাই করা কথাবার্তা কোথাও জোরে কোথাও ধীরে। কেয়া বলেছিল সুশোভন লাহিড়ীর বিলেত যাওয়ার বাসনা চুরমার হয়ে গেছে। অপূর্ব সেনগুপ্ত ফার্স্ট ক্লাশ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নিয়েও এখনো ব্রিটিশ ফার্মে ঢুকতে পারেনি। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য প্রচুর বিদ্যে নিয়েও বে-সরকারী কলেজের নিরামিষ প্রফেসর মাত্র। অমিয় বসুর ভবিষ্যৎ এখনো চড়কের মত বন বন করে ঘুরছে। ঠোঁট উল্টে কেয়া একদিন বলেছিল, অনিশ্চিত। কেয়ার—কেয়াদের এত টাকা তবু আরো নিশ্চিন্তির জন্য ক্রমাগত হয়রানি।

টেবিলের ওপর আলোকের দেওয়া কবিতার বইকে যেন বিদ্রূপ করছে সঞ্জিত মুখার্জীর দামী নেকলেশ। আলোকও ইচ্ছে করলে অমন দামী জিনিস দিতে পারে। কিন্তু কবিতার বইএর মধ্যে মনের একটা সুকুমার বৃত্তি প্রকাশ পায়, প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। দম্ভের বদলে স্নিগ্ধতার আকাঙ্খা। কিন্তু কেয়াদের কাছে তার কতটুকু মূল্য! সঞ্জিত মুখার্জীর নাম কেয়ার মুখে বহুবার শুনেছে। আনমনে কিছু বলেছে, তারপর কি ভেবে হঠাৎ থেমে গেছে। বহুবার। সেই সব টুকরো টুকরো কথাগুলি জোড়া দিলে দাঁড়ায়—সঞ্জিত মুখার্জী ধনী, সঞ্জিত মুখার্জী চঞ্চল, সঞ্জিত মুখার্জীর ফুঁ কুল ভাসিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে—আরো যেন কি কি আছে।

চুলোয় যাক সঞ্জিত মুখার্জী। আজ কেয়ার জন্মদিন। সেটাই বড় কথা। কেয়াকে আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। সর্ব শরীর যেন ঝিকমিক করছে আবার শাড়ি বদলে এল। এবার আরো অপূর্ব। ঈষৎ উত্তেজক পানীয় গেলাসে গেলাসে ঠেকিয়ে কেয়ার স্বাস্থ্যপান করা হল। উৎসাহে শতবর্ষায়ু কামনা করল কেউ কেউ। আলোক মৃদু হেসে কেয়ার মাখনের মত হাতটা তুলে নিয়ে একটু চাপ দিল, হ্যাণ্ডশেকের ভঙ্গীতে। দেখাদেখি সুশোভনবাবু এগিয়ে এসেছেন মৃদু চাপ দিতে। শেষে সবাই। কেয়ার ফরসা হাত রক্ত জমে জমে লাল হয়ে গেল। আলোক লক্ষ্য করল, এগিয়ে এল না শুধু সঞ্জিত মুখার্জী। দর্পভরে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। উজ্জ্বল আলোগুলি নিভিয়ে দেওয়া হল। তার বদলে নীল আলো—স্নিগ্ধ। গ্রামফোনে বিলিতি জাজ্ বাজনা। সঞ্জিত মুখার্জী বিলিতি নাচের কায়দায় পা' ফেলে হঠাৎ এগিয়ে এসে অচম্বিতে লিলি মালহোত্রের হাতখানা তুলে নিল। তুমুল হাসির বন্যা ছুটল। উদ্দাম নৃত্য শুরু। অন্তে জিনিষপত্র সরিয়ে জায়গাটা ফাঁকা করা হল। কনভেণ্টে কেয়ার সহপাঠিনী ছিল লিলি। ভাল নাচত। এর পাশে ভারত নাট্যম—কথাকলি? ঘোর নিরামিষ। কাটলেটের পাশে পুঁই চচ্চড়ি। সুশোভন ম্যাণ্ডোলীন খানা তুলে নিয়েছেন। অমিয় বসু গীটার। অপূর্ব হাতের কাছে কিছু না পেয়ে এক খানা আড়বাঁশী তুলে নিলেন। সবাই উত্তেজনায় সঙ্গত দিতে এগিয়ে এসেছেন। আলোক দুঃখিত হয়ে লক্ষ্য করল কৌচে বসে আছে কেবল ও আর সেই নিরামিষ অধ্যাপক জ্যোতির্ময়। একবার মনে হল যদি কনভেণ্টে পড়ত তাহলে হয়ত বাজনার তালে তালে ঠিক জায়গায় পা' ফেলতে পারত। পিয়ানোর ডালায় কেয়ার আঙুলগুলি ঝড়ের বেগে চলাফেরা করছে। কি সুন্দর কনসার্ট! সঞ্জিত মুখার্জী অন্য জগতের বাসিন্দা এখন। আড় চোখে একটা ঢোক গিলে ওর জাতি নির্ণয় করতে বসল। হ্যাঁ. এরা জুলিয়াস সীজারের জাত। এরা আসে, দেখে, তারপর জয় করে। উত্তেজনা একসময় চরমে পৌছল। আনন্দ তার শিখর স্পর্শ করল। আস্তে আস্তে আলোগুলির তেজ কমে এল একসময়। দেহগুলি অবসাদের স্তূপে পরিণত হয়ে কৌচের কোলে বিশ্রাম লাভ করল। হাউ নাইস-গ্র্যাণ্ড—ম্যাগনিফিসেন্ট—বিউটিফুল—ইত্যাদি শব্দগুলি এক যোগে কলকল করে উঠল। শেষে ক্লান্তি কিছুটা অপনোদন হলে বিরাট ডাইনিং রুমে ডাক এল।

উনি আবার কাছে এলেন।

—হ্যাঁ বাবা, তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না!

—অনেক খেয়েছি মাসিমা।

—কোথায় খেলে? কেয়া, আলোককে আরেকটা চিংড়ির কাটলেট দিয়ে যা। তুমি পছন্দ কর. কেয়া আজ সারা দুপুর বসে বসে বানিয়েছে। তা কেমন হয়েছে বাবা?

—চমৎকার।

—আরেক খানা দেবে?

—না।

—না বাবা, আরেক হাতা পোলাও নিতেই হবে। ওটাও কেয়ার ডিরেকশেনে তৈরী। ইলিশ মাছের পোলাও।

সত্যি, আমার মেয়ে যা হয়েছে একখানা! নিজে একটুও খেতে চায় না। পরকে খাওয়াবার নামে পাগল।

কেয়া একটু লজ্জা পেল। মা কারো কাছে যাচ্ছেন না। ঠায় আলোকের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এটা খাও সেটা খাও। চোখের মণি দিয়ে একবার ইশারা করল। কিন্তু মা বুঝেও যেন বুঝলেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর বিদায় নেবার পালা শুভেচ্ছান্তে হাণ্ডশেক। ভোজসভা খালি। ইংরেজী কবিতায় পড়া শূন্য ব্যাঙ্কোয়েট হলের মত নিস্তব্ধতা। কেয়া বলল, তুমি এখন যাবে না আলোক, আমি দিয়ে আসব। মুনা তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

আলোকের ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তবু এখনি উঠতে ইচ্ছে করছে না। যেন এখনি উত্তেজক আনন্দে ছেদ টানতে মন সরছে না। কেয়া অত্যন্ত আবেগে আলোকের হাতখানা ধরে বাইরে নিয়ে গেল, বারান্দায়। ঘরের ভেতরটা যে কার্নেস তা এখানে দাঁড়ালে বোঝা যায়। ঝিরঝিরে মে মাসের বাতাস। এলগিন রোডের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ধাবমান মটরের সারি। চাঁদ উঠেছে দেখতে পেল। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। কি যেন একটা গাছের ডাল, তার আড়ালে চাঁদটাকে সোনার থালার মত দেখা যাচ্ছে। বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিতেই জ্যোৎস্না হাজির।

—কথা বলছ না কেন আলোক?

—কি কথা বলব?

—তোমার যা ইচ্ছে।

—আজ আমার কোথাও ফাঁকা নেই তুমি পূর্ণ করে দিয়েছ।

—সত্যি বলছ?

—আমি যে গেঁয়ো, তাই সত্যি কথাই বলি।

—কেন আমাকে দুঃখ দাও!—গলার স্বর ঈষৎ গাঢ়।

কেয়া মুখটা উঁচু করে তুলে ধরল চাঁদের দিকে। মুখটা নামিয়ে এনে আলোক আলতো ভাবে চুমু দিল।

—হালো ব্রাইট ইয়ং ম্যান—

চকিতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আলোক সেকালের রায়সাহেব রাঘবেন্দ্রনাথ মিত্র বার-এ্যাট-ল বিশাল চুরুট মুখে বিপুল দেহ নিয়ে এই দিকে আসছেন। আলোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল—

—ও-নো-নো—মোস্ট আনহাইজিনিক ব্যাপার। তার চেয়ে হাণ্ডশেক তো করতে পার। ইট ইজ বেটার—

—ওটাও তো আনহাইজিনিক। স্পর্শদোষ ঘটে।

—তা একটা ঘটে বটে

—এ দিক দিয়ে কিন্তু নমস্কার প্রথাটা বেশ।

—নাহে, ওটাকেও সেণ্ট পার্সেণ্ট কারেক্ট বলতে পারি না। পুজোর পর যখন নোংরাসোকগুলি বুকের সঙ্গে লেপ্টে কোলাকুলি করে—ওঃ, গড

মাথা কাৎ করে আলোককে স্বীকার করতেই হল, বড্ড নোংরা ব্যাপার। কেন না তিনি সেকালের রায়সাহেব অশোপরি বিলেতের বার-এ্যাট-ল

—হরিব্‌ল্‌ গরম। তাই না?

—অসহ্য।—আলোক সাক্ষী দিল।

—ভাবছি হাইকোর্ট বন্ধ হলে একবার কাশ্মীর ট্যুর দিয়ে আসব। ওঃ—কতকাল কন্টিনেণ্টে যাই না! তা কতদিন হবেরে কেয়া?—বলতে বলতে টাই কোট ওয়েস্টকোট খুলে কেয়ার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন—

—তা দু'বছর হবে।—কেয়া একটু হিসেব করে বলল।

—দু'বছর কোথায়, তিন। নাও সিগারেট খাও—

—আমি সিগারেট খাই না।

—হাউ নাইস! কেন, ক্যান্সার হবার ভয়?

—নাঃ। আমার বাবা খাননি কোনদিন। আমিও—

সেকালের রায়সাহেব অট্টহাসি করে উঠলেন। সেকালের

ঝিকঝিকিটা পোকা ফেলে দ্রুত পালিয়ে গেল। বাতাস কাঁপতে লাগল।

—আমি কবে ধরেছি জান? ক্লাশ সিক্সে থাকতে বিড়ি দিয়ে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোমরা সে তুলনায়—

—আঃ মুনা, ওর সহ্য হয় না, তাই বলে তুমি অমন করে বলবে?

—এক্সট্রিমলি সরি। আচ্ছা বলতে পার আলোক তোমাকে কিছু বললেই কেয়া রেগে যায় কেন?

আলোক হাসল।

কেয়া অন্যদিকে তাকাল।

—ও, লজ্জা হচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা,····· তারপর ব্রাইট ইয়ং ম্যান, বিলেত যাওয়া হচ্ছে কবে?

—বছর খানেকের আগে তো নয়ই।

—কেয়া বলছিল নাকি খুব শিগগীর। এই তিন চার মাসের মধ্যে—

—কেয়া তো আমাকে দূরে পাঠাতে পারলেই বাঁচে।

—আহা-হা! —ভাল হবে না বলছি আলোক!

—না না, আজ ঝগড়া-টগড়া নয়। আজ কেয়ার জন্মদিন। মাইণ্ড দ্যাট।

আলোক উঠতে চাইল। সেকালের রায়সাহেব চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, সে কি হে, সবে তো কলির সন্ধ্যে! বোসো বোসো—

—মা একলা আছেন।—আলোকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—তাহলে আটকাব না। যাও। আবার এসো।—গটমট করে যৌবনের হিল্লোল তুলে বেরিয়ে গেলেন রায়-সাহেব। কেয়া বারান্দা থেকে হুকুম দিল, ড্রাইভার, গাড়ি বাহার কর।—আলোকের দিকে ফিরে বলল, আজ আমি ড্রাইভ করব।

—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?

উভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আলোকের হাতে প্রচণ্ড চিমটি কাটল। আলোক ওর হাতটা ধরে একটা কিছু করতে যাবে হঠাৎ ভজহরিকে দেখে ছেড়ে দিল।

ইয়াসুফকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে ইশারা করে ওর জায়গায় গিয়ে বসল কেয়া। আলোক পাশে। উত্তার বেগে ছুটে চলল গাড়ি। মনে মনে তারিফ করল আলোক। পাকা হাত। কিন্তু বালিগঞ্জ লেভেল ক্রসিংএর কাছে এসে স্টিয়ারিং শুদ্ধ কেয়ার হাত কাঁপতে শুরু করে দিল। আলোক বলল, তুমি ফিরে যাও। অনেক রাত হল। আমি একলাই যেতে পারব।

—ছিঃ আলোক, তুমি কি ভাব আমাকে? আমিও যাব—

—চিরদিনের জন্যে রাজী আছ?

—হুঁ।

কি মিষ্টি দেখাল কেয়ার মুখখানা। হে সজিত মুখার্জী, একবার এসে দেখে যাও। তুমি আসতে পার, দেখতে পার, কিন্তু জয় করতে পার না। ড্রইংরুমে উদ্দাম নাচের ছন্দটা যেন আলোক একটু একটু করে ভুলে যেতে পারছে।

মটরটা একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে দিল কসবার দিকে—হালতুর দিকে। দিনের মত জ্যোৎস্না। পথ স্পষ্ট। ইচ্ছে করলে হেডলাইটও নিভিয়ে দেওয়া যায়। কেয়াকে খুশি খুশি দেখাল। নিস্তব্ধতায়, নির্জনতায় মগ্ন চারদিক। মাঝে মাঝে একটি দুটি বেওয়ারিশ কুকুর। হঠাৎ কেয়া এক জায়গায় থেমে পড়ল।

—এটা কি?

—মসজিদ।

—ওটা?

—বাজার।

—তোমরা বুঝি এখান থেকে বাজার কর?

—নিতাই জানে।

—তুমি কি জান ?

—কেয়াকে।

মটরটা আরো একটু এগিয়ে গেল। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। তেঁতুল-বিচি ঘড়িটা একবার দেখল। বারোটা দশ। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া রাত পাখির ডাক সমস্ত প্রান্তরটা নিঝুম। রাস্তার পাশেই ধানের ক্ষেত। ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায়, কি একটা কবিতায় যেন পড়েছিল, চপল ছেলের মত—।

—আলোক চল না একটু বেড়িয়ে আসি ?

—তোমার ভাল লাগছে ?

—ভীষণ—

খুশি হয়ে আলোক মটর থেকে নামল। মটরটা অবাঞ্ছিতের মত রাস্তার পাশে পড়ে রইল। লাল সুরকির রাস্তা ছেড়ে এবার কাঁচা মাটির পথ। ঘাসের মধ্যে সবুজ পুকুর ডুবে আছে। তির তির করছে রূপালি জল। কুঁড়েঘর মাঝে মাঝে। গোয়ালের গরুর অবোধ নীল দৃষ্টি।

—আলোক, একটা কথা বলব ?

—বল।

—যদি আমাকে ভালই বাস—

—তোমাকে ভালবাসি কতদিন কতবার বলেছি কেয়া।

—আবার বলতে গিয়ে খুব কি পুরোন ঠেকছে ?

—না। পুরোন হবার নয়।

—কতদিন এর আয়ু ?

—অনন্তকাল। পৃথিবীতে প্রেম অনন্তকাল বাস করছে।

—আমরা কত তুচ্ছ—

—আমাদের প্রেমও অনন্তে মেশে।

—তোমার ভাষা বুঝি না আলোক—

—আমিও বুঝি না। অনুভব করি।

—আলোক আমাকে কবে বিয়ে করবে ? ইচ্ছে হয় এলগিন রোড ছেড়ে তোমার দেশে বাস করি—এই সুন্দর শান্তির দেশে—

খুব গোপনে আলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেয়া জানে না, যে সবুজ গালিচা মোড়া জমির ওপর দিয়ে ওরা হাঁটছে, যেখান দিয়ে একটু আগে রাতপাখির ডাক ভেসে গেল, সেই জায়গাটা বড়বাজারের এক লোভী মাড়োয়ারী কিনে নিয়েছে। কারখানা হবে। হালতু বাজারের কাছে দেশী মদের সাইন-বোর্ড টাঙাতে পরশুদিন দেখেছে। মাইকের গান তো এখন মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। সব রকম জমির দাম বাড়ছে। দু' গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ। সাপলোক হচ্ছে, বাড়ি উঠছে। এক ইঞ্চি জমিও পড়ে থাকবে না। বাস চলবে। ডিজেল তেলের পোড়া গন্ধ ভাসবে। পাখি-প্রজাপতি উড়ে যাবে অন্যদেশে। হায়, কেয়া এসব জানে না। হাওড়া পোলের তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কেয়া নাবালিকা। এতদিনে এলগিন রোডে ক্লান্তি জমতে শুরু করেছে। তাই এই আকাশ বাতাসের তলায়, ধানের ক্ষেতে, পাখি প্রজাপতির দেশে শান্তি ফিরে পেতে চাইছে। আলোককে বিয়ে করতে চায়।

আশ্চর্য। কেয়া ওকে ফেলে এগিয়ে চলেছে। কখনো নৃত্য দৌড়চ্ছে, জলে ছায়া দেখছে। কখনো ঢেউ। আশ্চর্য, আজ সব ভয়ডর মুছে গেছে। সাপ ব্যাং পোকামাকড়ের ভয়, কি ভূতের ভয়—কিছুই নেই। এমন কি একবার আলোক ওর শাড়িটা না ধরলে ধানের ক্ষেতেই ঢুকে পড়ত। এমনই ছেলেমানুষ আজ। সব ভয় ধুয়ে মুছে গেলে হয়ত মানুষ এমনই সাহসী হয়ে ওঠে। আলোকের সমস্ত ব্যাপারটাই খুব ভাল লাগল। কেয়া একটু একটু করে ফিরে আসছে। রাত দেড়টা এখন। সাবধানীরা এত রাতে সুন্দরী মহিলা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বরাবর মানা করেন। আলোকের কিন্তু এখনো ভয় লাগে না। কেননা মদের দোকানটা এখনো 'ওপেন' হয়নি। হয়ত কল্যাণবাদী রাত্রের

কোন মন্ত্রী-টন্ত্রী ফিতে কেটে 'ওপেন' করবেন। তখনই ভয়ের কারণ ঘটবে। যতদিন না হয় সেই ক'টা দিন শুধু কেয়া আর আলোক ঘুরে বেড়াক, ছুটে মরুক দুপুর রাতে। আলোকের চিরদিন মনে থাকবে নির্জন প্রান্তরে দিনের মত জ্যোৎস্নায়, পাগলের মত বাতাসে দুটি যুবক যুবতী উধাও হতে চেয়েছিল। মনে পড়বে চিরদিন।

আলোক মুগ্ধ কণ্ঠে ডাক দিল, চল এবার বাড়ি ফিরি, অনেক রাত হল।

কেয়ার চোখে অনুনয়।

—আর একটু আলোক, এইখানে একটু বসে যাই—এসো—

আলোকও আর কোন কথা না বাড়িয়ে কেয়ার পাশে বসে পড়ল, ঘাসের ওপর।

(ক্রমশঃ)

অসুবিধে ডেকে আনবেন না

আপনি কি তাই চান? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সের বা পাউণ্ডের ওজনে আপনি যখনই কোন জিনিষপত্র কিনতে চান তখনই আপনি ইচ্ছে ক'রে অসুবিধে ডেকে আনেন।

এগুলি এখন অবৈধ ওজন; যে ব্যবসায়ী এগুলি ব্যবহার করেন তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। পুরাণো এই ওজনে কিনতে গিয়ে আপনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি বরণ করে নেন—আপনার টাকার তুলনায় আপনি কম জিনিষ পান।

কেবলমাত্র কিলোর ওজনে কিনুন

DA 64/372 (Beng.)

সর্বজন প্রিয় স্নিগ্ধ সুরভিত মার্গো সোপ

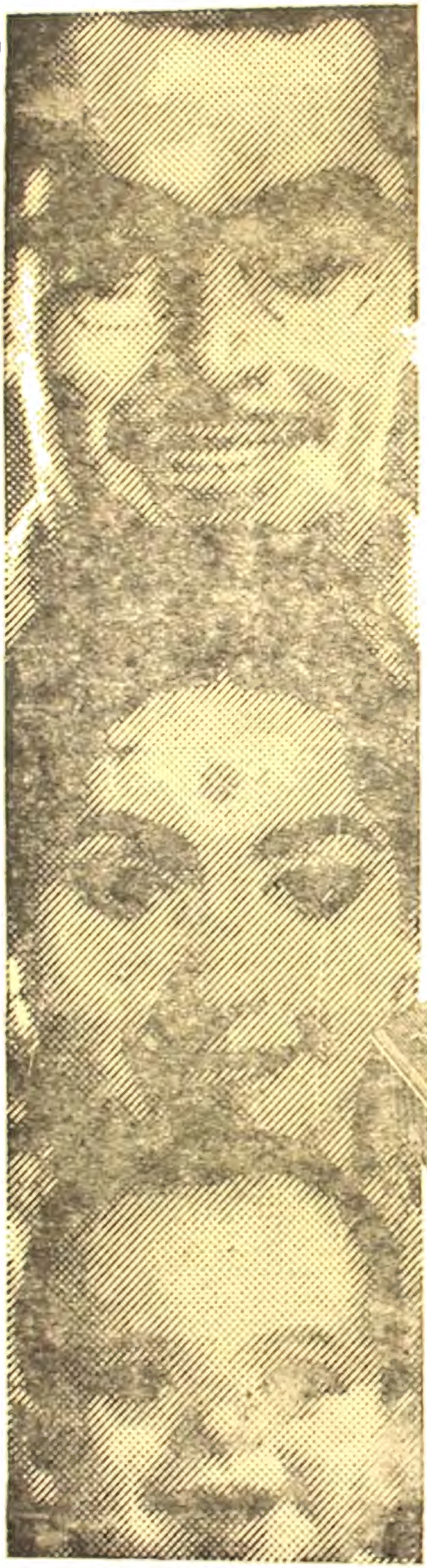

বাড়ির কর্তার পছন্দ মার্গো সোপ। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনায় স্নানের আরাম যেন শতগুণ বেড়ে যায়। শরীর যেমন স্নিগ্ধশুদ্ধ হয়, মনেও তার রেশটুকু লেগে থাকে।

মার্গো সোপ

গিন্নীরও টান মার্গো সোপের উপরেই। হবেই বা না কেন! দেহলাবণ্যের এমন সহায় আর নেই। মার্গো সোপের স্নেহময় স্পর্শে দেহের স্বাভাবিক দীপ্তি ও লাবণ্য অটুট থাকে আর এর মৃদুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ মনকে মাতিয়ে রাখে।

মার্গো সোপের স্নিগ্ধ স্পর্শ শিশুরও প্রিয়। তার কোমল দেহের পক্ষে মার্গো সোপ আদর্শ। মার্গো সোপ দিয়ে স্নান করালে ঘামাচি ইত্যাদি বিরক্তিকর উপসর্গ থেকে শিশু রেহাই পাবে।

প্রস্তুতকারক
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২০

CMC-19 BEN

দক্ষিণ ভারতের জেলে নয় মাস

বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন

দক্ষিণ ভারতের পথে

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল ১৯১৪ সালে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হইবার মাস দুয়েক পূর্বে। পোর্ট ব্লেয়ারের রাজনৈতিক বন্দীদের লইয়া তৎকালীন ভারতসরকার যারপরনাই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হাসপাতালে একজন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছিল, অপর একজন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, একজনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। ধর্মঘট এবং অনশন লাগিয়াই ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সকলপ্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও সকল সংবাদ অব্যাহতভাবে বাহিরে যাইতেছিল। ভারতীয় সাময়িক-পত্রসমূহে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীগণের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল, কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে দেখা দিল বিষম উত্তেজনা, সমগ্র দেশে রাজবন্দীগণের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা দেখা দিল, এমন কি ব্যাপারটা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট পর্যন্ত গড়াইল। ভারত সরকার তৎপর হইয়া ঘটনাস্থলে সাক্ষাৎভাবে অনুসন্ধানের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের দুইজন রাজকর্মচারীকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠাইলেন। এঁদের মধ্যে একজন ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের বড়কর্তা (Director General) স্যার পার্ডি লিউকিন্, এবং অপর জন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচীব স্যার রেজিনাল্ড ক্রাডক। ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীকে জেলের বাহিরে পাঠান হইল, কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই সকল তরুণ বন্দী উল্লাসকরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, "বাধ্যতামূলক খাটুনী মনুষ্যত্বের পক্ষে অবমাননাকর"—এই যুক্তিতে কার্যত্যাগ করিয়া স্বল্পকালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইলেন। এঁদের মধ্যে একটি বালক ব্যারাকে স্বেচ্ছায় কারাগারে রহিয়া গেল। অন্যান্যেরাও কিন্তু খুব বেশীদিন বাহিরে থাকিতে পারিলেন না—পলাইয়া যাইবার মতলব আঁটিতেছিলেন, এই অজুহাতে কিছুদিনের মধ্যেই উঁহাদের সকলকে আবার জেলে পোরা হইল। এই সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিলেন ভারতে ফিরাইয়া লইয়া এদের সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

প্রথমেই প্রেরিত হইলেন সর্বপ্রথম উচ্চমানের বোমার কারিগর শ্রীউল্লাসকর দত্ত। উঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং হয়ত সেজন্যই তাঁহাকে ভারতে পাঠান হইয়াছিল, উপযুক্ত চিকিৎসা এবং অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য। জুন মাসের মাঝামাঝি এক রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রভাতে, ভারত এবং আন্দামানের মধ্যে গমনাগমনকারী একমাত্র অর্ণবপোত 'মহারাজা' যখন নোঙর উঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময়ে, পূর্বাহ্নে কোনরূপ আঁচ না দিয়াই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বর্তমান লেখক সহ ১৮ জনের পরবর্তী দলটীকে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে আদেশ দেওয়া হইল। জাহাজটীর গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হইতে আমরা শুধু এইটুকুই ধারণা করিতে পারিলাম যে আমাদের অব্যবহিত গন্তব্যস্থল মাদ্রাজ পোতাশ্রয়।

আমাদের সকলকেই জাহাজের খোলের ভিতর কয়েদীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জলসীমার স্বল্প ঊর্দ্ধে অবস্থিত জাহাজের এই অংশে

খোলের পাশ দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি নালা বহিয়া গিয়াছিল সর্বপ্রকারের ময়লা বহন করিবার জন্য। এই নালা সকলসময়েই জল এবং ময়লা পরিপূর্ণ থাকিত, দিনে দুইবার একজন ঝাড়ুদার আসিয়া এই নালা পরিষ্কার করিয়া যাইত। নির্মল বায়ু সেবন এবং মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য আমাদের দুইবার জাহাজের ডেকে লইয়া যাওয়া হইত। এই ডেকেই অন্যান্য সময় আমাদের সকল কার্য যথাসম্ভব সমাধা করিতে হইত। জাহাজ বেশী দুলিলে এই নোংরা জল পাটাতনের উপর উপচাইয়া পড়িত, এবং সময়ে সময়ে আমাদের কাপড় চোপড়ও ভিজাইয়া দিত। পাটাতন আবার পরিষ্কারও করা হইত এই জলেই।

এই নৌ যাত্রায় আমাদের পথ্য ছিল, চিড়া, চিনি, তেঁতুল ও ছোলাভাজা। এই রাজকীয় ভোজ্য আমাদিগকে রাজপুতানায় সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগের এই নীতি স্মরণ করাইয়া দিত—

"কভী ঘি ঘানা, কভী মুঠিভর চানা, কভী ওভী মানা"—'কখনও ঘি সহযোগে রাজভোগ, কখনও শুধু এক মুঠো ছোলা, আবার কখনও এটুকুও জুটবে না'—সে কোনো পরিস্থিতিবরণ করিয়া লইবার এই অকুণ্ঠ মনোভাবই যে রাজপুতের মধ্যে সেই বীর্যের সঞ্চয় করিয়াছিল যাহা কখনও পরাজয় মানিয়া লইত না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমরা যদি পুনরায় এই অপরাজেয় সংকল্পের উদ্বোধন করিতে পারি তাহা হইলে চীন পাক ষড়যন্ত্র হইতেও আমাদের ভয় করিবার কিছু থাকিবে না।

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় চলিলেও পীড়ার সময় বিশেষ করে উদরাময়ে, এই পথ্য একেবারে অচল। আমার কপালে এই দুর্ভোগ ছিল। নৌ যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই আমার প্রবল উদরাময় দেখা দিল। এই দুর্ভোগে আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার একজন সহযাত্রী, অভয় দিয়ে বললেন—"কুছ পরোয়া নেহি,—চিনি দিয়ে চিড়া ধোওয়া জল খাবেন, তাতেই সেরে যাবে।' আমার রেশনের চিড়া প্রচুর জলে ভাগ করিয়া ধুইয়া সেই জলটা প্রচুর চিনি সহযোগে পান করিতে দিলেন। এতেই মাদ্রাজ পৌঁছুতে পৌঁছুতে দাস্ত বন্ধ হইয়া গেল, শুধু কিছুটা দুর্বলতা এবং অরুচিভাব রহিয়া গেল।

সময়টা ছিল আষাঢ়ের প্রথমভাগ, কিন্তু কালিদাসের আষাঢ়স্য প্রথমঃ দিবসঃ, কিছুতেই নয়। অসম্ভব গরম। তীরে গেলাম নৌকায়, এবং সেখান হইতে পুলিশের গাড়ীতে মাদ্রাজ সংশোধনাগারে (Penitontiary)। সেখানে পৌঁছুতে তিন ঘটিকা বাজিয়া গেল। যাঁরা চলিলেন, তাঁদের কয়েদীর 'কারবান' হলে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছিল, ক'দিন চিঁড়ে ছোলাভাজা খাবার পর মাদ্রাজের অনভ্যস্ত খাবারও অমৃতোপম বোধ হলো। যদিও সেটা দেশের খাবার। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে আমাদের নিজ নিজ কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সূর্যাস্তের তখনও ঘণ্টাখানেক বাকী। অস্তাচলগামী সূর্যের রশ্মি সোজা এসে ঘরে পড়েছিল, অসহ্য গরম। এমন সময় ভগবানের আশীর্বাদ মতই এলো প্রহরী, বল্লে, জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে বাইরে এসো। কোথায় যেতে হবে কিছুই জানি না, তাহলেও এই অসম্ভব গরম থেকে রেহাই পেয়ে খুবই স্বস্তি বোধ করলাম। ফাটকে একজন ইউরোপীয় সার্জেন্টের পরিচালনাধীন এক দেশী রক্ষীদলের হাতে আমাকে সমর্পণ করা হলো। জেল ফাটক থেকে সোজা চলে গেলাম রেল ষ্টেশনে। প্রহরাধীন কয়েদী সম্পর্কে যেটুকু বাধানিষেধ অপরিহার্য্য সেটা বাদদিয়ে সবরকম সুযোগ সুবিধা আমি এই সার্জেন্টের কাছে পেয়েছিলাম। তার সঙ্গে যে সকল সাময়িক পত্র এবং পুস্তকাদি ছিল, সারাপথ আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে পড়েছে। জেল থেকে যা বরাদ্দ আছে সে নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশী খরচ করেছিল আমার খাওয়ার জন্য, এবং আমার আহার্য্যের কিছুটা এসেছিল

তার নিজের খাবার থেকে। রাত্রিবেলা সে আমার শোবার জন্য তার কম্বল বিছিয়ে দিল। ততক্ষণে আমরা দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বৃক্ষহীন পার্বত্য অঞ্চলে এসে পড়েছি, যেখানে দিনে যেমন গরম রাত্রিবেলা তেমনি শীত। এরই মধ্যে আমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে আরামে শুয়ে রইলাম, আর কম্বলের মালিক এই দারুণ শীতে জানালায় বসে ঝিমুতে লাগলো। আমাদের গন্তব্যস্থান দেখা গেল বেল্লারী। আমরা বেল্লারী পৌঁছলুম তৃতীয়দিন সকাল বেলা। আমাকে সোজা জেলে নিয়ে গেল, এবং আমি কোন রোগবীজ নিয়ে আসিনি সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকদিনের জন্য জেলের বাইরে "কোয়ারেন্টাইন" সেলে রাখা হ'ল।

১। দক্ষিণ ভারতের পথে অনুবৃত্তি

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেড ওয়ার্ডার একটি কম্বল, দুইটি মৃৎপাত্র এবং কাপড় চোপড় নিয়ে এলো। অপরের ব্যবহৃত মৃৎপাত্র ঝুটা, উহা আমি ব্যবহার করিতে পারিনা, এই বলিয়া আমি উহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলাম। একজন যে মৃৎপাত্র একাদিক্রমে ব্যবহার করিয়াছে, স্বাস্থ্যের দিক হইতেও উহা আমাকে দেওয়া বিধেয় নহে। কম্বল এবং কাপড় চোপড় সম্পর্কেও ঐ এক কথাই বলা চলে, এবং এগুলিও না কাচিয়া এবং শোধন না করিয়া কাহাকেও দেওয়া উচিত নহে। বড় জমাদার খবর দিলেন কারারক্ষীকে (জেইলার); তাঁকে আমি আমার অসুবিধার কথা বলিলাম। এর পরে আসিলেন সুপার। এখানে বলা প্রয়োজন যে জেলের কানুনে এই রকম অস্বীকার করাটা একটা বড় রকমের অপরাধ এবং উহার দণ্ড বেত্রদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু এই জেলার সুপার অতিশয় বিবেচক ছিলেন, এবং আমাকে সব নূতন জিনিষ দেওয়া হইল। আমি অধিকারের দাবীতে অন্ন পথ্য পাইতে পারিতাম না, কিন্তু আমার জন্য দুবেলাই ভাতের অনুমতি দিলেন।

বেল্লারী কেন্দ্রীয় জেল

ইংরাজের সেনাবাহিনীর পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দেয় অর্থ নগদ দিতে অক্ষম হইয়া নিজাম সরকার তৎপরিবর্তে যে চারিটি জিলা ইংরেজকে অর্পণ করেন, বেল্লারী উহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে জঙ্গলহীন উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত এই অঞ্চলটি ভারতের শুষ্কতম অঞ্চলগুলির অন্যতম; দিনের বেলায় অসহ্য গরম, রাত্রিতে তেমনি শীত। কৃষি এবং নিত্য ব্যবহার্য্য উভয় প্রকার জলই প্রধানতঃ দুইটি সূত্র হইতে পাওয়া যায়; (১) বর্ষার জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য বিশালকায় জলাধার সমূহ, এবং (২) গভীর কূপ। সহরটা বেশ বড় এবং দীর্ঘ প্রস্থ, উভয়দিকে অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত বিরাট এক জলাধারের চতুপার্শ্বে নির্মিত বলিয়া বোধ হইল। কোথাও স্বাভাবিক বনভূমির কোনও নিদর্শন নাই। জেলের পেছনের দিকে একটি পর্বতশীর্ষে প্রস্তর নির্মিত একটি দুর্গ। পরে জানিয়াছিলাম ইহা দাক্ষিণাত্যের স্বনামধন্য নৃপতি টিপু সুলতান নির্মিত। টিপু বৃটিশের কোনও পরোয়া করিতেন না, এবং একসময়ে উহাদের আতঙ্কের কারণ এবং বড় সমস্যা ছিলেন। তাঁহার সামরিক শক্তিকেও হিসাব করিয়া চলিতে হইত। কারাগারের সবজীবাগে জল-সিঞ্চন করা হইত একটি সুগভীর কূপ হইতে। চর্ম-নির্মিত প্রকাণ্ড এক জলাধার দ্বারা কপিকলের সাহায্যে জল তোলা হইত গোরু বলদের দ্বারা, এবং বাগানে জল লইয়া যাওয়া হইত উন্মুক্ত পয়োপ্রণালী দ্বারা। বন্দীগণের ব্যবহার্য্য জল সংগ্রহ করা হইত কারাভ্যন্তরস্থ অপর একটি কূপ হইতে। জলের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বেল্লারী জেল একটি কেন্দ্রীয় কারাগার ছিল। বাংলার কেন্দ্রীয় কারাগারগুলির মত বৃহৎ নহে, শত শত বন্দীর ব্যবস্থাযুক্ত মাঝারি আয়তনের একটি কারাগার মাত্র। সরকারী গৃহই প্রস্তর নির্মিত। এবং যতদূর মনে পড়ে, একমাত্র দোতলা বাড়ী

ছিল কারারক্ষীর আবাস গৃহ সংযুক্ত অফিসগৃহ। জেলের কর্মচারীগণ অতিশয় ভদ্র ছিলেন। সুপার য্যাংলো ইণ্ডিয়ান, লণ্ডনের উৎকর্ষবিষয়ক আলোচনায় তিনি সকল সময় মুখর থাকিতেন; আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বলিতেন 'সব জান্তা বেন।' কারারক্ষীও অতি সজ্জন ছিলেন; ইনিও য্যাংলো ইণ্ডিয়ান, বাস করিতেন একটি ভারতীয় রমণীকে লইয়া। বড় জমাদার অনর্গল ইংরেজী বলিয়া যাইতে পারিতেন, এবং অত্যন্ত বিবেচক ও ভদ্র ছিলেন। অন্যান্য কর্মচারীদেরও আমি শুধু প্রশংসাই করিতে পারি।

২। বেল্লারী কেন্দ্রীয় জেল অনুবৃত্তি

এই কারাগারের প্রধান শিল্প ছিল পশমের সুতাকাটা, কম্বল বোনা, এবং আভ্যন্তরীন ব্যবহারের জন্য সবজী উৎপাদন। আমার মনে হয় এই জেল হইতেই মাদ্রাজের অধিকাংশ জেলের কম্বল সরবরাহ হইত। আধুনিক পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালিন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ছিল। উত্তরে গঞ্জাম জেলা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যান্ত সমগ্র পূর্ব উপকূল, তারপর উত্তরে দক্ষিণ কানাড়ার সীমাপর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম উপকূল ও নিজাম রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র কেন্দ্রীয় অঞ্চল ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছিল পূর্বতন মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচীন রাজ্য, ফরাসী শাসিত দুর্গ, এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ফরাসী ও পর্তুগীজ অঞ্চল সমূহ। দ্রাবিড় জাতিদের সর্ববৃহৎ এই প্রদেশে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ এবং কানাড়ী দ্রাবিড় জাতির এই চারিটী প্রধান শাখাই বাস করিত। বেল্লারী জেল সমগ্র প্রদেশের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ ছিল, যদিও উহাতে তেলেগু ও কানাড়ীদের কিঞ্চিৎ আধিক্য ছিল। কিন্তু ক্রমিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে ঈর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না।

কোয়ারেন্টাইনের সময় অতীত হইলে যথাবিহিত অনুষ্ঠান সহকারে আমি কারাগারে প্রবেশ লাভ করিলাম। বাংলা এবং পোর্টব্লেয়ারে বন্দীর নম্বর এবং শ্রেণীবিভাগ দণ্ড-ভোগকাল, ফৌজদারী কার্য্যবিধি অর্থাৎ দণ্ডবিধির ধারা ইত্যাদি সম্বলিত একটি কাষ্ঠফলক গলদেশ বেষ্টনকারী একটি লৌহশলাকার সহিত (হাঁসুলি) সংযুক্ত থাকিত; এখানে উহা গলদেশে লম্বিত থাকিত একটি স্থূল কার্পাস সূত্র দ্বারা। জেলে প্রবেশ করিয়াই সর্ব প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস। বিশেষভাবে রন্ধনশালাটী আমার নিকট পরিচ্ছন্নতার আদর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। দরজা জানলাসহ প্রতিটি ছিদ্রপথ সূক্ষ্মতারের জালে আবৃত; বায়ু অবাধে চলাচল করিতে পারে কিন্তু পোকামাকড় ঢুকিবার কোন পথ নাই। দরজার পাশে মাথার চামড়ার টুকরা লাগান কাঠি লইয়া বসিয়া আছে কিছু 'কমজোরী' * পথ ভুলিয়া কোন মক্ষিকা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেই এক আঘাতে উহার প্রাণসংহার করিতেছে। চারিদিক ঝকঝকে তকতকে, কোথাও এতটুকু ময়লাও দেখা যাইতেছে না। যে ব্লকে আমার স্থান হইল সেটী বৃহৎ বৃহৎ একটি প্রাঙ্গনের উভয়পার্শ্বে ছোট ছোট কুঠুরীর দীর্ঘসারি সমুনা সম্মুখে, শেষ প্রান্তে একটি সুদৃশ্য একতলা অট্টালিকা, হাসপাতাল যক্ষ্মারোগীদের জন্য। যক্ষ্মানিবাসের পশ্চাদ্দিকে দেওয়ালের বাহিরে একটু ডানদিকে দেখা যাইতেছে পরবর্তী টীপু সুলতানের দুর্গ। যক্ষ্মানিবাসাভিমুখী রাস্তার একপার্শ্বে বন্দীদের ব্যবহার্য্য জলের নালা। এখানে একটি নূতন ব্যবস্থা পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের গাঢ় দ্রাবণ পরিপূর্ণ দুইটি বৃহৎ হাড়ি। আহারের লাইনে বসিবার পূর্বে প্রত্যেককেই একবার উহাতে হাত ডুবাইয়া লইতে হয়, সম্ভবতঃ বাহির হইতে রোগ সংক্রমণ এড়াইবার জন্য। দিনে তিনবার খাবার

* Invalid

দেওয়া হইত, সকালে একমাত্র "কাঞ্জি" বা চালের 'মাড়ি' দুপুরে এবং বিকালে সিদ্ধচাল অথবা জোয়ারীর একটা ইট * এবং ডাল-সবজী-টকমিশ্রিত একটা তরকারী। একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার। আমার বেল্লারীতে অবস্থানকালে একবার সহায় বিউবোনিক প্লেগ আরম্ভ হইল। কারাগারে রোগ সংক্রমণ নিবারণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসর কয়েক পূর্বে কলিকাতায় টিউবোনিক প্লেগ দেখা দিলে টীকা এবং অন্যান্য উপায়ে উহা অল্পকালের মধ্যেই আয়ত্বে আনা সম্ভব হইয়াছিল। বেল্লারীতে আমাদের টিকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। যদিও ঐসময়ের দশ বৎসরাধিকাল পূর্বেই প্লেগের টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু বাহির হইতে যে কোন দ্রব্য জেলের ভিতরে আনিবার পূর্বেই বিশোধন করা হইত শুনিয়াছিলাম।

আমাকে যে কুঠুরীতে স্থান দেওয়া হইল, উহার আয়তন ১২"×৮" ফিট। জেলের পোষাকের অতিরিক্ত ভৌম-সম্পত্তির মধ্যে আহার এবং পানীয়ের জন্য একটি মাটির সানকি ও ঘাট, এবং রাত্রিবেলা মলমূত্র ত্যাগের জন্য বাঁশের হাতলযুক্ত অতিরিক্ত একটি মৃৎপাত্র। শেষের পাত্রটি প্রত্যেক বন্দীকে প্রত্যহ প্রত্যুষে হাতে করিয়া বাহিরে দরজার পাশে রাখিয়া তারপরে কাজে যাইতে হইত। জেলের 'ভাঙ্গী'রা গোর গোড়া হইতে সেগুলি কুড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া আবার দোরগোড়ায় রাখিয়া যাইত। দিনের কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরে যাইবার সময় সেগুলি বাহির হইতে কুড়াইয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইত। এই কাজটা হইতেও আমাকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল, এমন বিবেচনা সকল দেশে করা হয় না। আমার প্রথম কাজ ছিল একটি সাবেকী প্রথা চরকায় পশমের সূতা কাটা। তৈরী পাঁজে রোজ অর্ধেক আউন্স সূতা কাটিতে হইত, এবং মধ্যাহ্নাহারের পূর্বেই কাজটা হইয়া যাইত। পোর্টব্লেয়ারে বই বাঁধার কাজ কিছু কিছু করিয়াছি শুনিয়া সুপার আমাকে বই বাঁধার কাজ দিলেন। ছুঁচ, সূতা, একটি হাতুড়ি, একটি ছুরি, কাঠের নাইফ-পাইজ, কাঠের ফ্রেম, স্বরচিত-পেপার নাইফ ও ফোল্ডার, এবং একটি কাঁচি, এই সামান্য কয়টা সরঞ্জাম লইয়া আমার বাঁধাইয়ের কাজ সুরু হইল। সুপার তাঁহার নিজের বই হইতে আমাকে পড়িতে দিতেন। বাঁধাইয়ের জন্য যে সকল বই পাইতাম তার মধ্যেও অনেক ভাল ভাল বই থাকিত। "The Debs of Heaven", হেমান কোম্পানীর "Book of knowledge" (1912) Matiphysics সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য পুস্তক বাদেও "Huntris Gehateer Madern" (1906) এবং Dr walt এর Economic products of India (1908) এই দুইটা মূল্যবান পুস্তকও আমি এখানে পাঠ করি। এই—দুইটি পুস্তকই আধুনিক কাল পর্যান্ত সংশোধনক্রমে পুনর্মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন।

সিংহল সহ দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার একটা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে মনে হয়। দক্ষিণের লোকেরা বন্ধুভাবাপন্ন, খোসমেজাজী এবং মিশুক। অনেকেই হিন্দী বলিতে পারে কিছুসংখ্যক লোক ইংরেজীও বলিতে পারে, অন্যান্যরা ভাবভঙ্গিদ্বারা আলাপ জমাইত। একটি দুঃসাহসী যক্ষা-রোগী আমার সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিত। একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিস্কিট প্রভৃতি দুর্লভ সামগ্রী খাওয়াইল। গোদাবরী জেলার বিজয়পত্তনম এবং পেদ্দাম ভেল্লা নামক এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে দেখা করিতেন। তাঁর একটি ছাপাখানা ও বই বাঁধাই এর কারবার ছিল, সুপার এঁকে আমার সঙ্গে কাজ করিবার অনুমতি দেন। বিজয়পত্তনম ঐ সময় একটি বড় সহর ছিল, শুধু নি তে হা, বিজয়গপত্তনম্ এই ঠিকানায় পত্র দিয়া আমি উত্তর

* ভাত এবং জোয়ারি সিদ্ধ চাপ দিয়া থান ইটের আকারে পরিবেশিত হইত।

পাইয়াছিলাম। ইহা হইতে মনে হয় তিনি ঐস্থানের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁর কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। আমরা যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর আর্থিক সঙ্গতি যে প্রচুর নহে এবং অত্যন্ত অনিশ্চিত সেই ধারণা হয়তো এঁর ছিল না। এখানে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের মধ্যে ত্রিবেন্দ্রামের শ্রীনীলকণ্ঠ আইচ রায়ের সহিত আমার পরিচয় আমি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করি। আমার প্রায় সমবয়সী এই যুবকটি প্রথম শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তরুণ সাংবাদিকগণের ছোট্ট একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, স্বাধীনতার বাণী প্রচার করাই ছিল যাহাদের একমাত্র কাজ। এঁরা তিনটি তামিল সাপ্তাহিক পরিচালনা করিতেন, এবং একই গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন হইলেও পরস্পর পরস্পরের এমন কঠোর ও রসালো সমালোচনা করিতেন যে, যে একটি পত্রিকা পাঠ করিত তাহাকে শুধু তামাসা দেখিবার জন্যও আবার দুইখানি পত্রিকাও পড়িতে হইত। শেষ পর্যন্ত সরকারের শ্যেন-দৃষ্টিতে উঁহারা একদিন ধরা পড়িয়া গেলেন, এবং 'আইন ও শৃঙ্খলার' কলে দম পড়িল, নীলকণ্ঠম্ একবৎসর বিনাশ্রমে শ্রীঘরবাসের উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন, আর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর যাঁহার স্মৃতিতে ডাকটিকিট বাহির হইয়াছিল, সেই তামিল কবিসম্রাট সুব্রহ্মণ্য ভারতী পণ্ডিচেরীতে • আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহারই নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। ইহারই মুখে 'ঋক'-এর আবৃত্তি শুনিয়া পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীর কৌতূহল জাগরিত হয়, এবং শাস্ত্রীজী পরবর্তীকালে "সিদ্ধাঞ্জন ভাষ্য" নাম দিয়া ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের একটী ভাষ্য রচনা করেন, শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এঁর আবার একজন সঙ্গী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ আর্য্য। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এই তরুণ স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে নিজের কতকগুলি সংশয় নিরসন করে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনান্তে ইহার প্রতি স্বামীজীর বিদায় বাণী ছিল "Surrender not"—'পরাজয় স্বীকার করো না'। এই বিদায়বাণী এঁকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল যে, ইনি 'Surrender not'-এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সুরেন্দ্রনাথ' এই নাম গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে আর্য্যসমাজে যোগদান করিলে এঁর নামের শেষে 'আর্য্য' এই উপাধি যুক্ত হয়।

নীলকণ্ঠম্ শ্রীঅরবিন্দের একজন অনুরাগী ছিলেন এবং এই অনুরাগের পরিচয় হিসাবে 'কমল নায়কী' এই ছদ্মনামে লিখিতেন। ইহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটী একটা ধারণা পাই। ইনি বাহির হইতে সংবাদ পত্র সংগ্রহ করিতেন, এবং ইহারই নিকট হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ পাই। "এমডেন" * কর্তৃক মাদ্রাজ বন্দরে গুলিবর্ষণ এবং সমসাময়িক সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও এঁরই নিকট পাইতাম। কারাজীবন ইহার নিকট অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং জেলের কারার শালায় প্রস্তুত একটি নকল চাবির সাহায্যে ইনি পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘরে যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তখন জানাজানি হইয়া গেল তিনি প্রায়ই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং আমাকে কারা কর্তৃপক্ষের জেরার সম্মুখীন হইতে হইল। ইনি যে আমার নিকট আসিতেন সেকথা অস্বীকার করার কোন পথ ছিল না। ইনি সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা করিতেন, যুদ্ধ ঘোষণার এবং মাদ্রাজ

• পণ্ডিচেরী ঐ সময়ে ফ্রান্সের অধীন ছিল।

* একটি পলাতক জার্মান ক্রুজার। সুকৌশলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী এড়াইয়া সর্বত্র উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুদিন পরেই ইহা ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়।

বন্দরে গোলাবর্ষণের সংবাদ ইহারই নিকট পাইয়াছিলাম, ইদানীং সর্ব্বদাই বাড়ির কথা আলাপ করিতেন, বাহির হইতে সংবাদ পত্র পাইতেন—কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল তথ্য আমার নিকট পাইলেন। পত্রিকা কিরূপে আসিত এবং অন্যান্য বহু প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমি দিতে পারলাম না। কারারক্ষী ও মুখ্যপ্রহরী একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, হয়ত এই আশঙ্কায় পাছে আমি এমন কিছু ব্যক্ত করিয়া ফেলি যাহাতে উহারা এ ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন।

আমি যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতাম তাহা এর পরও প্রত্যাহৃত হয় নাই এবং পুলিসও আমার জবানবন্দী গ্রহণ করা প্রয়োজন বিবেচনা করে নাই। ইহা হইতে মনে হয় আমার সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের মনে কোন সংশয় জাগে নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হওয়ায় আমার জবানবন্দী সমর্থিত হইয়াছিল এবং হয়ত উহার পলায়নের গুরুত্বও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল।

বেলারী জেলে অবস্থানকালে মাদ্রাজের লাট লর্ড এমটিল এবং সার্জ্জন জেনারেল জেল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। উভয়েই ছিলেন অতিবৃদ্ধ। বাহ্য দৃষ্টিতে কঠোর মনে হইলেও এদের দুজনের সম্পর্কেই আমার ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে রেলপথে ভ্রমণরত এক ব্রিটিশ সৈন্যদলের ৩৩ জন সর্দ্দিগর্ম্মিতে দেহত্যাগ করিলে এই সার্জ্জন জেনারেল পদচ্যুত হন। এঁর যে বিশেষ কোন দায়িত্ব ছিল এ ব্যাপারে তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু উত্তেজিত ব্রিটিশ জনমতকে শান্ত করিবার জন্য একজনের যাওয়া প্রয়োজন ছিল, সেই খাঁড়া পড়িল ইহারই ঘাড়ে।

বেলারী জেলে আমার অবস্থানের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছিল। আমার মুক্তির দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, এবং আলিপুর কেন্দ্রীয় জেল হইতে আমার কারাবাস আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মুক্তির জন্য আমার সেখানেই প্রেরিত হইবার কথা। অবশেষে এই দিনটী আসিল। আমাকে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে বলা হইল। আমার পক্ষে দিনটা অন্যান্য দিন অপেক্ষা উজ্জ্বলতর প্রতিভাত হইল। যে রক্ষীদল আমাকে বাংলায় লইয়া যাইবে, জেল গেটে আমাকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হইল। আমার খাওয়া দাওয়া যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য সুপার নিজ পকেট হইতে রক্ষীদলের কর্ত্তার নিকট পাঁচ টাকার একটী নোট দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আমরা কলকাতার পথে রওনা হইলাম কিন্তু যে সহযাত্রীটিকে পেছনে রাখিয়া গেলাম এবং যাহার কোন সন্ধান আমি আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হই নাই তাঁহার চিন্তায় আমার স্বজন গণের সহিত আশু মিলন সম্ভাবনায় আনন্দ অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া গেল।

ভুল সংশোধন

'জয়শ্রী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'মাদমোয়াজেল প্যার্ন' গল্পের অনুবাদক শ্রীসুধীর কান্ত গুপ্ত। ভুলক্রমে নামটি—'সুধীর কান্ত গুপ্ত' ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

জ. স.

এ্যান্টল
সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য
জীবাণুনাশক
এ্যান্টল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান—সুনিশ্চিত ফল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল দিয়ে নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং কুলকুচো করা বিশেষ ফলপ্রদ।
এ্যান্টল দিয়ে ধোয়া মোছা করলে দেয়াল আর মেঝে জীবাণুমুক্ত থাকে, সংক্রমণের ভয় থাকে না
ANTOL
এ্যান্টল
হাতের কাছে রাখুন
সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরি

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধলেশ্বরী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

তিন

চৈত পূজার খাটনাখাটার আগ মুহূর্তে ধুয়া ছাড়ার তুল্য গোটা জাহাজঘাটা হৈ হৈ করে উঠেছিল। যেন বনপূজার মেলায় জমে ওঠা লাঠিখেলার আসর ভেঙেছে। চারদিকে কেবল জিগির আর কলকনানি-চিৎকার আর তুমুল চেঁচামেচি। বর্ষার নূতন জল গায়ে লাগা অসংখ্য বহুৎ খুশ কইয়ের মতন ছড়িয়ে পড়েছিল পাসিন্দরের ভিড়—সেই ভিড়. যেন ভাঙার মতন জনস্রোত এগিয়ে এসে ভেঙে পড়ল এই নাওঘাটায়।

মাঝিমাল্লারা আগভাগেই তৈয়ার-তড়িবৎ। ছই-ছাপ্পড় ঝাড়পোঁচ হয়ে গেছে। ডগরার আলগা বেসিজিল পাটাতন ঠিকঠাক। চরাট আর গলুইয়ে সস্ত ধোয়ার দাগ, লগি বৈঠা. কাছি. রশি আর বাদাম পর্যন্ত তৈরী। ভাঙা চাকের বল্লার মতন বিক্ষিপ্ত পাসিন্দররা সারা নাও-ঘাটা ঘুরে দরদস্তুর করে—; তারপর ক্ষণমাত্র বিলম্ব। কিরায়াদার নাওয়ে উঠে আসা পর্যন্ত সময় অপেক্ষা। হৈ হল্লা কমে আসে তৎক্ষণে. এলাসিনের জাহাজ-ঘাটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা নাও-বহরের পোঁতা লগির ফক্কা বাঁধন খোলে এক এক করে। বালি থকথক মাটির বুক থেকে লগি তুলে নিয়ে ভেসে পড়ে ওরা। এবার হাওয়া অন্তরকম—যাত্রীরা নিশ্চুপ—কেবল মাঝিমাল্লাদের হাঁকডাকে গোটা ঘাটার ত্রস্ত ব্যস্ততা বোঝা যায়।

নৌকা ভাসে, পারের মায়া কাটিয়ে গাঙের জলে ভেসে পড়ে। এবার ওদের যাত্রা গহীনতার দিকে। বৈঠা আর লগি ফেলার থপথপ ছপছপ শব্দ ওঠে, আচমকা আর্তনাদ করে বেঁকে যায় হালগুলো, ছইয়ের বাতায় ঝোলানো লণ্ঠন দোলে—যেন মনসাপূজার রাত্রিতে প্রদীপ বুকে নিয়ে গাঙের জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য ছোট ভুরার সারি। সরে যেতে যেতে ওদের ব্যবধান বড় হয়. এক থেকে আর একের দূরত্ব বাড়ে—তারপর যে যার পথ বেছে নিয়ে যাত্রা করে দূর কি কাছের পাল্লায়।

উটাপথে. স্রোতের টানে এগিয়ে যাচ্ছিল নৌকাটা। তরতর করে। পেছনের হালে বসেছে শিবচরণ, তার সামনে রাখা আলসা ভরতি আগুন। গ.গণে। বাঁ হাতে ধরেছে হুকার নলচে। তামাক খাচ্ছে শিবচরণ। ভুরুক ভারুক শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

পেছনে শিবচরণ, আগ গলুয়ের চরাটে বিপিন। মাঝখানে ছইয়ের নীচে দূরপাল্লার কেরায়াদারের দল। না, হিঁদু সওয়ারী না. বামুন পাইনার এক মোল্লা সপরিবারে উঠে এসেছে নাওয়ে। সঙ্গে বোরখা ঢাকা বিবি আর দুটি সন্তান। নাওয়ে মালগুজারী তুলে এনে ছইয়ের নীচে ঢুকে পড়েছিল ওরা। এখন মোল্লা নিজেই আবরু টাঙিয়েছে। ছইয়ের মুখ ঢাকা পড়েছে. বাতায় গুঁজে দিয়েছে শাড়ি। ভেতরে

কথা হচ্ছিল যোমাতে বিবিতে—পোলা দুইখান বুঝি খাওনের বায়না তুলেছে।

আঁধার ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ক্রমশই। দিগর আর আগের তুল্য কালি-কলঙ্কিত নেই মেঘলা-সকালের মতন থম ধরে আছে মাথার ওপরের বিশাল আকাশ, অন্ধকার এখন পানা-পচা পাগারের জলের মতন না-কালো, না-সাফসুফ। নদীর জলে সামান্য চেকনাই দিয়েছে। বাতাসের ধাক্কায় মাথা তোলা ঢেউয়ের ভাংনে কই-মাথার অসংখ্য পাথর যেন চকচক করতে শুরু করে দিয়েছে।

পার দূরে না, খানিকমাত্র ব্যবধান রেখে পার ঘেঁসা তীব্র স্রোতের টানে শিবচরণের ছ-মাল্লাই কিরায়া নাওটা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে জলকাটা ফলিমাছের মতন। বিপিন চরাটে বসে বৈঠা নামিয়েছিল, পরে আরও এগিয়ে এসে গলুইয়ের গোড়ায় বসেছে। ডান পা নামানো। সে পায়ে ক্যাওড়া দিয়ে ধরা রয়েছে পাইয়া কাঠের নয়া বৈঠাখান। বৈঠা জল টানছিল। বিপিন সামান্য আনমনা।

এমনি হয়, কী যে যাদু জানে এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা—তাকে ভোলে কোন বাপের পোলার ক্ষমতা। জাহাজের সিটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘাটা যেন কলিজা ধরে টান মারে। ঘাটা ছাড়নের কালে, আশ্চর্য, মনে হয় এলাসিনের জাহাজ ঘাটা বুঝি থাবলা দিয়ে ধরে রেখেছে মানুষের হৃদপিণ্ড। অন্তর জ্বলে; মন চায় না, যেতে মন লয় না—তবু কৈবিত্তি মাঝির ব্যাটা হাতে পাওয়া কিরায়া ছাড়ে কোন ভরসায়? ওই একটিমাত্রই রুজি-রোজগারের পথ। ধলেশ্বরীর অকৃপণ কৃপা, নাওয়ের সাইধ আর মাল্লার মেহনৎ—এই তিনে মিলে কৈবিত্তি মাঝির জীবন আর সংসার।

সোঁতের টান বড় জোরদার। বৈঠা ধরার আগে নাও চলে। অতএব বিপিন তার ঝোলানো পা তুলে নিল। পাইয়া কাঠের নতুন বৈঠাখান চরাটের পাশে, কান্দি-ঘেসে রেখে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার ততক্ষণে অনেক ফিকে এবং তরল হয়ে এসেছে। গোটা আকাশ সজ্মাজা সানকির তলার মতন। শীতকালের আঙিনায় শিউলী ফুল ছড়ানোর মতন তারার ভিড়। মেঘের আভাষও দেখা যাচ্ছিল ইতস্তত। চাঁদও বুঝি উঠে আসছে। এই আলোয় খাড়াই পাড়ের ছবিটি স্পষ্ট করে দেখতে পেল বিপিন। মানুষ তিনেক উঁচু তীর। গোয়ার ধলেশ্বরীর হুমড়ি খেয়ে পড়া স্রোতের ধাক্কায় ঝুপঝাপ খসে পড়ছে মাটি। থেকে থেকে বিরাট বিশাল চাঙার ধ্বসের মতন হুমড়ি খেয়ে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। নেচে উঠছে অশান্ত জল। আর সেই প্রচণ্ড ধাক্কাটা তীব্রগতিতে ছুটে এসে এমন আচমকা ঠেলা মারছিল নাওয়ের তলায়, যেন গোটা নৌকাটাকে সে মালইয়ের তুল্য ছিটকে ফেলে দেবে।

খাড়াই পার ধরে ধীরে ধীরে অনেকটা এগিয়ে এল নাও। সামনে মধ্যপাড়ার খাল। আগে এলাসিনের মজা নদী মইষাখাল। না, সারা বছরে জল না থাকলেও, এখন মইষাখাল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তার কূল ছাপানো জল আউশ ধান পাট আর কাওনের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে। ওখানেও কলকলানি।

সিধে, টানটান দাঁড়িয়ে গায়ের আড়মোড়া ভাঙল বিপিন। হাই ছাড়ল ও টিকয়। যেন আলসেমীর ঝিমুনিকে এই অস্ত্রে সে ঘায়েল করতে চাইছে। জলছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, গোটা দিগর ঘুমন্ত; নাওয়ে কথাবার্তা নাই—আনমনা ভাবটি বিপিনের চোখের পাতা ভারী করে আনছিল। ও চোখ ডলল দু'বার। ছই ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি চালান করে দিল পিছ নাওয়ের হালের দিকে। ওখানে শিবচরণ বসে আছে। কোমরের গামছা খুলে নিয়ে কান সমেত মাথায় ফেট্টি বেঁধেছে শিব, হুঁকা টানছে। মাঝে মাঝে তার ভুরুক টান শোনা যাচ্ছিল।

'খুড়া গো...'বিপিন ছইয়ের মাথায় হাত রাখল।

মুখ থেকে হুকা সরাল শিবচরণ। 'কইবা মনে লয় কিছু।'

'হ।' বিপিন ছইয়ের আব্রুর দিকে তাকাল মাথা নীচু করে। 'কিরায়দার বামুন পাল্লার। কইট্টা হইয়া বায়নের কাম মনে লয়।'

'যাইবার পরে।' বিপিন পরপর আরও কবার হুঁকা টেনে নিল। 'মিঞারে জিগাইয়া লও না

না, জিগাতে হয় নি ; তার আগেই আব্রু দেওয়া ছইয়ের অন্দর থেকে বেরিয়ে এল কিরায়াদার, নাহেদ আলী—গোটা পরগণার ডাকসাইটে আনুর কারবারী। বেঁটে স্বল্প চেহারা মেদবহুল শরীর, গোটা মাথায় চুল নেই বললেই হয়। পরণে লুঙি গায়ে সুলতানী পিরাণ, গলায় প্যাঁচ দেওয়া রয়েছে একখান নতুন গামছা। বিড়ি টানছিল জাহেদ ব্যাপারী। 'মাঝির পুত্তরা মনে লয় ঘাটার হদিস জান না…'

মুখ থেকে হুঁকা সরে গিয়েছিল শিবচরণের। কথাটা ভাল কয় নাই মিঞায়। কিন্তু তার জবাব দেবার আগেই কথা কইল বিপিন। 'ঘাটা আমরা চিনি মিঞাসাহাব। বইনাদ মাল্লা আমরা দেউলীর

'দেউলীর…'কথাটা অস্ফুটে কণ্ঠ ফসকে বেরিয়ে এল, মুখ থেকে বিড়িটাও খসে পড়ল আচমকা—যেন কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে জুড়িয়ে গেছে আইট্টা পরগণার জাঁদরেল আনুর ব্যাপারী জাহেদ আলী।

'হ'। শিবচরণ কাঠি দিয়ে আইলসা খোঁচাল, তাকাল জাহেদ ব্যাপারীর দিকে. ' মিঞাসাহেব ডর খাইলেন নাহি" ?

ডর। নামটা শুনেই হৃদপিণ্ডে কাঁপন উঠেছিল জাহেদের। কিন্তু সে ধরা দেবে না কিছুতে। 'না না, ডর কিয়ের মাজি…জাদেহ তোৎলাচ্ছিল। 'দেউলীর মাজিগো নাম শুনছি-পরগণায় অমুন বায়নদার নাইক্যা'। জাহেদ অকারণ হাসতে চেষ্টা করল। বোকার মতন হাসি, 'বুঝলা নি বড় মাজি, খোদা কসম, আমি বুজবার পারি নাই… ।'

'বেশি বুজনের কাম নাই মিঞাসাহাব'। আগ গলুইয়ের দিক থেকে বিপিন কথা বলল. 'মইস্থাখালের মুখ আইয়া গেচে কুন পথে যাইবেন তাই জিগাই

হয়তো জাহেদ আলী জবাব দিত। কিন্তু কিছু বলার আগেই আব্রু দেওয়া অন্দর থেকে শিশুকণ্ঠের ডাক ভেসে এল. বা-জানকে ডাকছে পোলায়। চিৎকারের গলায়। 'বা-জান ব্যান কেমুন করে গো বাজান, শিগগীর আহ… ।'

বিন্দুতম সময় আর অপেক্ষা নয়। লহমায় দামাল বাতাসের ঝাপটার মতন জাহেদ ব্যাপারী ছিটকে ঢুকে পড়ল ছইয়ের অন্দরে। জাহেদ বুঝি এমনি একটি আশংকাই করছিল। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের বিবিজান বেচাল হয়ে পড়বে। পড়লও তাই।

আব্রু ঢাকা ছইয়ের অন্দর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ভেতরের হুটোপুটি, বাতচা শোনা যাচ্ছিল। দু'টি কিশোর কণ্ঠ ফৎ ফৎ করে কাঁদছে –ব্যাপারীর ধমকানো গলা শোনা যাচ্ছিল।

মইস্যাখালির মোহনায় মুখে এসে হালের বাঁটে টান মারল শিবচরণ। আর সঙ্গে তীব্রগতি নাওটা গোত্তা খাওয়ার মতন গতিতে ত্বরিতে পাক খেয়ে সটান ঢুকে পড়ল খালের চৌহদ্দির মধ্যে।

চাঁদ উঠে এসেছে এরই মধ্যে, রোশনাইয়ে রোশনাইয়ে দিগর হয়লাপ। দূরে মধ্যপাড়ার অস্পষ্ট ছবিটি দেখা যাচ্ছিল। আকাশ ভরা অনেক তারার রোশনী। কালাকালা মেঘের ভিড় লেগেছে ইতস্তত. বাতাসের গতি চড়ার দিকে। বেসামাল হাওয়া এরই মধ্যে ঝাপটা মারছিল ছইয়ের ওপর।

হালে মোচড় দিল শিবচরণ। আবার। স্রোতের টানে মধ্যখাল দিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল কিরায়াদার নাওটা, হালের নির্দেশে এবার সে উত্তরমুখো বেঁকে গিয়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল আধ-ডুবন্ত আমনের ক্ষেতে।

বিপিন কিছু বলবে ভেবেছিল, কিন্তু বলল না। ছইয়ের টঙের থেকে লগি টেনে নিল বিপিন। এখন লগিঠেলা না

পেলে এগোবে না নাও। মাথা-সমান গহীন জলের সীমা অতিক্রম করে আমনের বাড়ি ডগাগুলো মাথা তুলে আছে। ঘনঘিঞ্জি হয়ে। চড়া বাতাসের ঠেলা ধান-ডগার কামড় মাড়িয়ে ঠেলে দিতে পারবে না নাওকে। অতএব লগিই এখন সম্বল।

বার কয়েক লগি মেরেছিল বিপিন। এখন থামল। আক্র ঢাকা অন্দর ছই থেকে ক্লান্ত রুগ্ন কাহিল রমনী কণ্ঠ ভেসে আসছিল। বিবির সঙ্গে কথা বলছে ব্যাপারীও। নীচু গলায়। সোহাগের স্বরে। সাধছেও কিছু বুঝি। 'তুমারে না কইচিলাম আগে'—গলার স্বর থামল ব্যাপারীর। 'লও লও, দুইখান চমচম মুখে তুইল্যা, নিলে শরীলে তাগদ পাইবা।'

চিকন গলা বিবির। সে মিঞার কথা কানে লয় না। 'পুলাগো দাও, অরা না খাইয়া রইচে···আমার খাওনের মন নাই···'

'অর লিগাই কইচিলাম চাড়াবাড়ি থিকা যাই।' জাহেদ অল্প রুষ্ট গলায় বুঝি বলছিল, 'কথাডা কানে লইলা না—দুইড্যা না খাও একখান দাঁতে কাইট্যা দেহ দেহি। পুড়া-বাড়ির চমচম, খুব মোলাম হইব···'

চমচম! কথাটা বারবার মনে পড়ছিল শিবচরণের। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা দেওয়া খিদের আগুনে যেন দমকা বাতাস ঝাপটা মারল। হু হু করে জ্বলে উঠল আগুন। পেটের ভেতর মরা খিদে আইচাই করে ডেকে উঠল। এখন মোচড় মারছে। কিন্তু উপায় নেই। নয়নতারার মুখটি মনে পড়ছিল শিবচরণের। অসময়ে জাহাজের ডাক শুনে নয়নের বাড়া ভাত ফেলে আসতে হয়েছে। খিদের তাড়না চাপার ইচ্ছায় শিবচরণ আবার কলকে টেনে নিল। মনাছি মতন এক ছিলিম তামাক সাজবে সে, টানবে; খিদের মুখে ধোঁয়া দিয়ে তার জ্বলুনি বন্ধ করবে। আইলসা টেনে নিয়েছিল শিবচরণ, কল্কির গুল ঝেড়ে মুখ তুলতে গিয়ে বিপিনকে দেখতে পেল। আগ বাওয়ের চরাটের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপিন। তার চোখ আকাশে। কিছু বলল না শিবচরণ তামাক সাজছিল। সাজানো হ'লে আয়েস করে বসল। পরপর টানল বার কয়েক, গলগলে ধোঁয়া ছেড়ে দেখে, বিপিন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে।

জ্যোৎস্নার অকৃপণ আলোর রোশনীতে ভরে গেছে গোটা প্রান্তর। দূরে উড়াল পাখির মেলা ডানার স্পন্দন প্রাণের চিহ্ন। পাশে নীলবাবার বিলের জল থৈ থৈ করছে। যেন কুটুমের জন্য সাফ চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির আঙিনায়। ধানশীষ মাড়ানো শব্দটা ফুটে রয়েছে; ধলেশ্বরীর দানবী গর্জন এখানে অনেক ফিকে, অনেক লঘু।

হুকার ভুরুক টানে খিদের জ্বলুনি ভাব কমে এলে, শিবচরণ উঠে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে, কপালে রেখার আঁকি-বুঁকি এঁকে সোজা তাকাল সামনে। সামনে হিজানগরের বাঁওর। ওই বাঁওড়ের পাশ কাটিয়ে, আইট্যার মসজিদের কাছ দিয়ে বেরাবুচাইন্যা। তারপর পথটা সোজা। আকাশে চোখ তুলেছিল শিবচরণ। এখন তাকাল বিপিনের দিকে। 'হাওয়া হাওয়া মনে লয় য্যান

'না খুড়া। বাসাত উথল পাথল; দিগের ঠিক নাইক্যা। বাদাম ধরাইলে টান দিবার পারে ..'

'হু।' শিবচরণ বসল। হালে মোচড় দিল একটা—'নালী মটরা দিয়া গেলে কেমুন হয় বিপিন।'

বিপিন···! নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের ভেতরের একটি প্রাণ ভীষণভাবে ঝাঁথকে উঠল। নীচের ঠোঁট প্রাণপণে চেপে ধরল দাঁতে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখের পাতা দু'টিও আর মেলে রাখতে পারল না ফুলজান। তার মনে হ'ল কোনো কথা নয় তপ্ত এক অগ্নি শলাকা যেন আচমকা তার কানের ছিদ্রে কেউ চেপে ধরেছে। অসম্ভব যন্ত্রণা। বুকের নীচের হৃদপিণ্ডটা বুঝি কেউ নখর এবং ক্রূর থাবায় ছিঁড়ে নিয়ে গেল। নাওয়ে বিছানো বালিশের

মধ্যে মুখ গুঁজে ফেলল ফুলজান। আমনের ক্ষেতে বিলি কেটে চলা নাওয়ের ভোলা সরসর শব্দটা যেন চিকন কঞ্চির মতন তার উদলা গায়ের ওপর সজোরে কেউ মারছিল। চোখ বন্ধ আন্ধার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে; সব কেমন এলোমেলো লাগছে ফুলজানের কাছে।

গলার আওয়াজ অনেকক্ষণ থেকেই ফুলজানকে জাগিয়ে তুলছিল বারবার। খুব চেনা দু'টি স্বর, খুব বেশি করে জানা এই কথা আর ডাক। কিন্তু চোখ মেলে দেখার অবকাশ মেলে নি। জাহাজ-ঘাটায় ফুরফুরা আলোর রোশনী ছিল, জাহেদ মিঞা যখন মাঝির সঙ্গে কিরায়ার দরদস্তুর করছিল, সর্বাঙ্গ ঢাকা বোরখার ফাঁক দিয়ে কি জালিখেরা বোরখা কোটরের ফাঁক দিয়ে তখন দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে পারলে লোকটাকে চিনে ফেলতে পারত। কিন্তু তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে বারেকের জন্যও মনে হয় নি—এ তার কোনো আপন মানুষের কণ্ঠস্বর। জাহাজ ঘাটা থেকে নেমে নাওঘাটা। সেখানে আন্ধার আলোর খেলা, কিছু স্পষ্ট না। সেই ছায়া ছায়া আলোর মধ্যে কিরায়া নাওয়ে উঠে এসেছিল ওরা। মিঞার ছইয়ের দু'দিকে শাড়ি টাঙিয়ে আব্রুর আড়াল করল। চিনে নেবার অবকাশ কোথায়?

দেহের ভেতরে মন বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে এ-মুহূর্তে তা যেন গলে যাচ্ছে। জল। কিন্তু না, শক্ত হ'ল ফুলজান। পাশে তার জাহেদ ব্যাপারী—

মানুষটা চালাক বুদ্ধিমান। যে কোনো মুহূর্তে জানান পেতে পারে। আর তা যদি একবার পায়, ব্যাপারী পেয়ে বসবে। ঘুমোবে না সারারাত। ঠায় বসে বসে ঠিক পাহারা দেবে।

সিধে হয়ে বসল ফুলজান। চোখ মুছে নিয়েছিল, মুখ এখন হাসি হাসি।

সম্মুখ এবং পেছন—ছইয়ের দু'টি উন্মুক্ত পথে আব্রুর আড়াল। ভেতরে বাতার সঙ্গে আংটায় ঝোলানো লণ্ঠনটা দুলছে। জাহেদ চমচমের পাতিল খুলে দিয়েছে। ছেলেরা গপাগপ খাচ্ছে। জাহেদ বিড়ি টানছিল। ফুলজানকে তাকাতে দেখে গোঁফের তলায় হাসল। 'দুইখান চমচম খাইলে পারতা…'

মাথা নাড়ল ফুলজান। 'খিদা নাই; খালি জল খাইবার ইচ্ছ্যা করে।'

'শুধা জল খাইলে প্যাট গুলাইব বিবি। দুইড্যা চিড্যা ভিজাইয়া দেই, খাও। শরীল ঠাণ্ডা হইব, ঘুমাইবারও পারবা—'

'তুমি ঘুমাইবা না?'

'না।'

'না ক্যান? ঘুমাও—ইস্টিমারে ঘুরঘুর করলা—বিকালে দেখছিলাম চক্ষু দুইখান লাল হইয়া আছে। পুলাগো লইয়া শুইয়া পড়। রাইত হইছে।'

সামান্যই বাদানুবাদ। অবশেষে বিবিজানের জয়। জাহেদ পাঁচ গরাসে গোটা দশেক সন্দেশ পেটে পুরে বদনার জল খেল। ছেলেদের সরিয়ে দিয়েছিল ফুলজানের দিকে। নিজে পাথালিভাবে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আগ গলুয়ের দিকে ছইয়ের প্রান্তে বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের ভান করছিল ফুলজান। এ কেবল ভানই—ফুলজান জানে, দেউলীর এই দুটি মানুষকে না দেখা পর্যন্ত যেমন তার শান্তি নেই, তেমনি কোনো ফাঁকফুঁকে দেখতে পারলেও তার স্বস্তি ফিরে আসবে না। তবু অপেক্ষা। তবু ভাবনের একটি তীব্র ইচ্ছায় মনটা আঁকুপাঁকু করছিল ফুলজান বিবির। তার চাপা কানের ভেতরে বারবার একটা নাম বাওর-ঘূর্ণির মতন ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাতাসের দাপট যেন ক্রমশই বাড়ছে। গোটা দিগর জুড়ে হা হা করে ঘুরছে ক্ষ্যাপা হাওয়া। ধলেশ্বরীর শব্দ আর ব্যাত্তরাইলের সীমা অতিক্রম করে, হিজানগরের গোঁসাইপাড়া ডিঙিয়ে এতদূর আসতে পারছে না। ধানের প্রান্তর ডিঙিয়ে

নাও এবার হিজানগরের খালের মুখে পড়বে। স্রোত এখানে প্রখর। বাওনা উজানী। অতএব বাদামের আয়োজন। ছইয়ের ওপারের কান্দি ধরে বিপিন পিছ গলুইয়ে চলে এল। সাত নম্বর ডগরার পাটাতন তুলছিল—বাদাম কাছি আর রশি বের করবে। হাওয়া এখন অনুকূল। পালে একবার তুলে দিতে পারলে ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝাপটে উজানী টাটকিনির তুল্য তরতর করে এগিয়ে যাবে।

বাদাম তুলল বিপিন। কাছি রশিও। উঠবে, এমন সময় শিবচরণের ডাক। 'বিপন্থা...'

'কও খুড়া—'

'বামুনপাইল্লা কাচের পথ না। বাসাইলের বিল ছাড়াইয়া হইল গ্যা বুড়ামা গঙ্গা। কাইল সকালের আগে যাইবার পারুম না...'

'হ। বেলা হইয়া যাইব খুড়া'

'যাইঠ্যানের বিনয় গোঁসাইয়ের ভাস্তির শউর বাড়ি বামুনপাইল্লায়। কতবার আইচি, মনে আচে নি তর...'

'হয়—আচে। সিংবড়ি। বড় ভাল খাওয়ায় গো খুড়া—'

জিভে ওষ্ঠ চেটে নিল শিবচরণ, ঢোক গিলল। সিং বাড়ির খাওনের স্বাদটুকু যেন ওখানে সঞ্চিত রয়েছে। খোয়াবের মতন একটু ছবি তার মনে ভাসল। পেটের ভেতরটা মুচড়ে যাচ্ছে। না, তামাকের ধোঁয়া আর ক্ষুধা চাপতে পারছে না।

জোর বাতাসের ঝাপটা ছইয়ের আব্রু ধরে টানাটানি করছিল। ক্ষ্যাপা হাওয়ায় উথাল পাথাল দাফরাচ্ছে শাড়ি দিয়ে বানানো পরদাটা। হেই উঠছে, এই নামছে; ফৎফৎ শব্দ করছে অবিরাম। ফুলজানের দু'খান ডাগর চক্ষুর দৃষ্টি আচমকা পড়ল এ-দিকে। দামাল বাতাসের ঝাপটায় এক নিমেষের জন্যে সরে যাওয়া আব্রুর ফাঁক দিয়ে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল মানুষটাকে। হ্যাঁ, পিছ নাওয়ের ডগরা থেকে বাদাম আর রশি কাছি বের করছে বিপিন। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে ছইয়ের বাইরের পৃথিবী। পেশীবহুল শক্ত আর দীঘল মানুষটার গোটা অবয়ব চোখে পড়তে অন্ধ হ'ল ফুলজান। বুকের কোথাও যেন পুড়তে শুরু করেছে...আল্লা রসুল, প্রাণপণে কাঠ হতে চাইল ফুলজান, নিশ্বাস রুদ্ধ—'তুমি আমারে এইডা কী দেখাইল্যা খোদা হাফিজ...'

"নাওয়ে খাওনের কিছু নি আচে বিপিন...'আর থাকতে না পেরে কথাটা বলে ফেলল শিবচরণ। 'বাড়া ভাত ফ্যালাইয়া আইলাম, এহন হালার প্যাটে মই দিবার লাগচে...'

উঠে দাঁড়িয়েছিল বিপিন, ঘাড় ঘুরিয়ে এখন তাকাল শিবচরণের দিকে. 'প্যাটের আর দুষ কি কও। ঠিক সুমে আমাগো খাওন জুটব না-আইজ মনে করচিলাম খুড়া, জাহাজের যখন দেরি, মনাচ্ছি মতন খাইয়া লমু কিন্তুক...' ফৎ করে নিশ্বাস ফেলল বিপিন—'হালার কোম্পানী আমাগো সাজা দ্যাওনের মতলব আটচে...' বাদাম রশি বগলে চেপে নাওয়ের কান্দিতে পা রাখল বিপিন। আগ নাওয়ে যাবে। 'কাইলক্যার চিড়া আছে। পাক ডগরায়...খাইবা কি দিয়া?'

"হুদাই হুইড্যা চাবাই...' অল্প বিষণ্ণ গলা শিবচরণের। 'খিদার মুখে খারাপ লাগব না। তুমিও দুইড্যা লও না...'

'না' । আগ নাওয়ের দিকে পা বাড়াল বিপিন, 'আমার খিদা নাইক্যা খুড়া।'

কান্দিতে পা ফেলে, হাতে ওপর ছইয়ের বাতা ধরে ধরে আগ নাওয়ের দিকে যায় বিপিন। তার কথা এবং পায়ের শব্দ শুনতে পারছিল ফুলজান। যেন ওই পায়ের শব্দ তার বুকের ধুকপুকুনি। হ্যাঁ, চিনে ফেলেছে ফুলজান। আগ নাওয়ের মাল্লাই কেবল না, হালের বাঁট ধরে বসে থাকা বুড়া মাঝিও তার বড় চেনা। শরীরের কোথাও বুঝি যন্ত্রণা বাড়ছে। চমচমের পাতিলের দিকে তাকাল ফুলজান। দুই

পোলা ছাড়িয়ে জাহেদ মিঞা—আর তার মাথার কাছে রয়েছে পোড়াবাড়ির মিঠা চমচমের বড় পাত্রটা। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই মিঞা জেগে উঠতে পারে। কিন্তু বুড়া মাঝিটা খিস্তায় মরে, আরেকজন গোঁ ধরে রয়েছে। ফুলজানের মনে হচ্ছিল ছোঁ মেরে সে পাতিলটা তুলে নিয়ে ছুটে যায় পিছ গলুইয়ে।

আগ নাওয়ে শব্দ হচ্ছে। ছইয়ের ওপর খস্‌খস্ ধপধপ। জোয়ান মাঝি ওখানে বাদাম বাঁধছে, দড়ি কাছি আর কপিকল সিজিল করে নিচ্ছে। খানিক পরে বাদাম উঠবে গাছিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফলিমাছের মত জল কেটে তরতর করে এগিয়ে যাবে এই মাল্লা নাওখানা।

ফুলজান তার এলোমেলো শাড়ি ঠিক করে নিল। এগিয়ে গেল সামান্য, ছেলেদের ঠিক করে শোয়াবার আছিলায় এক্কপোলা ডিঙিয়ে গিয়ে হাত বাড়াল ফুলজান। চমচমের পাত্রটা সে নেবে। আব্রু পার করে বাইরে ঠেলে দেবে পাতিলটা। বলবে : খাও মাল্লা, খাও ; পুড়াবাড়ির চমচম দিয়্যা কাঁচা চিড়া খাইতে আরাম পাইবা।

অত্যন্ত সন্তর্পণ অগ্রসর। অল্প ঝুঁকে, বাঁ হাতে ভর রেখে ফুলজান শেষ পর্যন্ত পাতিলটা ধরতে পারল। তুলে আনবে, এমন সময় মোচড় দিয়ে উঠল জাহেদ। শাড়ির পাড়ের অল্প অংশ তার নাকে লেগেছে।…হেই হেই…ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল জাহেদালী। না ঘুমোয় নি সে। ঘুমোতে সে পারছিল না। নাও ছাড়ার আগে যদি জানত, এ মাল্লাই নাও দেউলীর তবে উঠত না। এখন হয়েছে তার বিপদ। যেন আচমকা ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙেছে এমন ভঙ্গি করে হাই ছাড়ল জাহেদ ব্যাপারী। 'পাতিল লইয়া করবা কি ফুলজান?'

'খামু…' পাতিল ধরা হাত থরথর করে কাঁপছিল ফুলজানের। বুকের খুটায় বুঝি খাইট্যার ঘা পড়ছে ধুপধাপ।

'খাও,' জাহেদ আবার শুলো, শুয়ে পড়ল। আগেই কইছিলাম দুইখান চমচম খাইলে প্যাট ঠাণ্ডা থাকব।' বালিশে মুখ গুঁজল জাহেদ। 'খাইয়া একটু ঘুমাইয়া লও…'

নিজের জায়গায় এসে বসল ফুলজান। চমচমের পাত্রটা সে নিয়ে এসেছে।

ততক্ষণে বাদাম উঠে পড়েছে গাছিতে। হাওয়ার ধাক্কায় ফুলে ডোঙ্গার তুল্য নাওটা ঢেউয়ে বিলি কেটে তরতর করে ছুটে যাচ্ছে। টানা একটা শব্দ হচ্ছিল কল…ল…ল…ল…ল…। কান পাতল ফুলজান। না, আগ নাও নিস্তব্ধ। মানুষটা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

অন্য কোনো গাঙের মাল্লা-নাও হলে ফুলজান ডেকে তুলত জাহেদকে। বলত মাঝিদের জন্যে। 'অগো দিয়া আও খানকয়। খাইয়া খুশ হইব।' কিন্তু জাহেদ শুনেছে এ নাও দেউলীর। শোনার পর কথাটা বলতে ভরসা পাচ্ছে না ফুলজান।

'ভিজাইয়া দিমু নাকি খুড়া?' বাইরে বিপিনের গলা। খুব কাছে, ছইয়ের ধার ঘেঁষে। ব্যবধান মাত্র একটা আব্রুর। সামান্য একটু নড়লেই বুঝি গায়ে গা লেগে যাবে, হাত বাড়িয়ে, ইচ্ছে করলেই ফুলজান ধরতে পারে বিপিনের হাতখান। নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করল ফুলজান। কিন্তু পারছিল না। তার বুকের মধ্যে তীব্রতম একটি অভীপ্সা কেঁদে মরছিল।

না-না-না—চোখবুঁজে নীচের ঠোঁট প্রাণপণে কামড়ে ধরে মাথা নাড়ছিল, খোদা তায়ালা, আল্লা রসুল, এই ইচ্ছা তুমি আমারে দিও না দিও না। কিন্তু সেই দৃঢ় সংকল্পের বাঁধ অটুট থাকল না। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আর মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

না, সঙ্গে সঙ্গে চমচমের পাতিলটা বের করে দেয় নি ফুলজান। এক নজর তাকিয়ে নিয়েছিল আব্রু-ঘেরা ছইয়ের অন্দরে শোয়া জাহেদ ব্যাপারীর দিকে। ব্যাপারী কাৎ হয়ে শুয়েছে। পিঠ এ-দিকে, মুখ পিছ নাওয়ের দিকে।…এই

সুযোগ, এই মওকা। হঠাৎ, হঠাৎই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কথা কয়ে উঠল। চরম এক উত্তেজনা ঢেউ খেলছিল মনের মধ্যে। কান তপ্ত হয়ে এসেছে। লহমার হেঁচকা টানে ছইয়ের আব্রুর খানিকটা তুলে ফেলেছিল ফুলজান। আর সেই ফাঁক দিয়ে বের করে দিয়েছিল তার পদ্মকলি মুখখানা।

প্রথমে বুঝতে পারে নি বিপিন। উবু হয়ে সে পাক ডগরা থেকে চিড়ার পাত্র তুলছিল। মুখ ওঠাতেই এই কাণ্ড। যেন বিদ্যুৎ চমকের মতনই আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা। তাজ্জব তাজ্জব! তার মুখের কাছে, একান্ত কাছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা একখান অপ্সরীর দুধ-সাদা মুখ। দু' খান ডাগর চক্ষের চাউনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল চক্ষুর পানি।

সহসা বুঝতে পারে নি বিপিন। মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বপন, সত্য দেখা এক টুকরা খোয়াব। অভিভূত বিস্মিত চোখ তার গোলাপ-পাপড়ি অধর থেকে নামছিল না। এমন সময় বুঝি বিদ্যুৎ চমকাল। পাটাতনের ওপর রাখা বিপিনের হাতটা নিথর হয়ে এল বুঝি। তার হাতের ওপর হাত রেখেছে ফুলজান বিবি। মুখটা আরও এগিয়ে আনল। বিপিনের গালে বিবির নাকের ডগা ছুঁয়েছে। মুখ কানের কাছে। 'আমারে চিনবার নি পার দেউলীর মাজি?' কথা যেন বাতাসের হিসহিসানি। চাপা অস্বচ্ছ গলা ফুলজানের।

লহমায় মুখটা সরিয়ে আনল বিপিন। অন্ধ চোখে সে মুহূর্তের জন্য দেখে নিল বিবিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে হা করেছিল বিপিন। বলা হ'ল না, তার আগেই বিবিসাহেবার একখান হাত বিপিনের মুখ চাপা দিয়েছে। 'জোরে কথা কইও না মাজি, হ, আমি তুমাগো হৈম।'

হৈম! বিপিনের শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে বুঝি নরম জলের এক তীব্র স্রোত বয়ে গেল। হৈম…… বুকের কোথাও যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। হৈম……বিপিনের কানের পাশের শিরা দুটো দপ্ দপ্ করতে শুরু করেছে। সহসা কে যেন শক্ত মুঠিতে তার জিভ টেনে ধরেছে। 'তু… তু তুমি…'

'আস্তে কথা কও বিপিনদা—ব্যাপারী ঘুমায় নাই……' ফুলজান চকিতে তার বেআব্রু হাতখানা পরম আদরে বিপিনের মুখে বুলিয়ে নিল। চোখ মোছা সেই ভিজা হাতের অশ্রু ধুয়ে দিল বিপিনের মুখ। 'বাবারে এহন কইও না কিছু। বাসাইলের মোল্লাপাড়ায় আমাগো বাড়ি—তুমি আসই, আইস বিপিনদা—আইস ·…'বিপিনের চোখের সামনে থেকে আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বকসাদা মুখ, কলিজার রক্তে রাঙানো থরথর কাঁপা কন্নার দু টি ওষ্ঠ। 'তুমার পথ চাইয়া থাকুম আমি….'আব্রুর ওপার থেকে বাতাসের গলার স্বর ভেসে এল। সেই সঙ্গে পরাণ নিঙরানো চাপ কান্না।

যেন স্বপ্ন. স্বপ্নই। বিভ্রান্ত বিপিন অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। নিথর হয়ে বসে থাকল। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে পরথম রাইতে দেখা পাতলা খোয়াবের মতন মনে হচ্ছিল। হৈম? নিজেকে, নিজের মনকে শুধলো। শুধলো বার বার। গলা টানটান বিপিনের। চোখ বন্ধ। তবু বোজা চোখের কোন বেয়ে নেমে এল তপ্ত অশ্রুর অবাধ ধারা। হৈম তা হ'লে বেঁচে আছে, আছে! কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরের ঘুমন্ত দৈত্যটা যেন আচমকা লাফিয়ে উঠল। চোয়াল শক্ত হয়ে এল বিপিনের। সমস্ত দেহে যেন ভর করল এক আসুরিক শক্তি। দুই হাতের মুঠি তৎক্ষণে আপন থেকেই বন্ধ হয়ে এসেছে। 'খু…খুন!' পরিত্রাহি গলায় চিৎকার মারল বিপিন। তার পরেই ধপাস করে পাটাতনের উপর পড়ে গেল তার দীঘলকায় বলিষ্ঠ দেহখানা।

(ক্রমশঃ)

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

(৪)

মার্কসের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিস্তৃত আলোচনা তাঁর কোনো বইতেই নেই। নীচের ক'খানা বইতে সংক্ষিপ্ত কিছু কিছু আলোচনা ছড়ানো রয়েছে :

(ক) Eleven Theses on Feurbach (১৮৪৫, বসন্তকাল)

(খ) Poverty of Philosophy-তে (১৮৪৭) ডায়লেকটিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা।

(গ) Critique of Political Economy-র (১৮৫৯) ভূমিকা; এতে মার্কস্ নিজের দর্শনকে প্রথম "ডায়লেকটিক জড়বাদ" নাম দিয়েছেন এবং এই ভূমিকাই তাঁর একমাত্র লেখা যেখানে তাঁর দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মোটামুটি তত্ত্ব কয়টি খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

(ঘ) তাঁর Capital-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা এতে (১৮৭২) মার্কস্ তাঁর নিজের দর্শনের সঙ্গে হেগেলের দর্শনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ডায়লেকটিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

(ঙ) তাঁর 'Capital-এর (১৮৬৭) স্থানে স্থানেও এমন দুই-একটি কথা ছড়ানো আছে যা থেকে তার ডায়লেকটিক ইঙ্গিত কিছুটা পাওয়া যায়।

এই ক'টি সামান্য উক্তি থেকেই মার্কস্-এর দর্শন সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে হয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, মার্কসের সবগুলো উক্তিই hydraর মত বহুমুখী এবং কাজে কাজেই বহুলোক তাদের বহুমুখী ও বহুরূপী ব্যাখ্যাই করেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে তাঁর সত্যিকার মতটি যে কী সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হয়ে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ভক্ত ও অ-ভক্ত—কেউই মার্ক্স-এর আসল তত্ত্বটি সম্বন্ধে একমত হতে পারছেন না—"নাসৌ মুনির্যস্য" ইত্যাদি যে ভাষায় (Phraseology) তাঁর উক্তিগুলো সাজানো, তাতে নানারকম অর্থই সম্ভব। এককালে হেগেলের ব্যাখ্যাতাগণ যেমন নানা বিপরীত অর্থ টেনে টেনে হেগেল সম্প্রদায়কে অগণিত সম্প্রদায়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন, তেমনি মার্ক্স-তত্ত্ব নিয়েও আজকে ভক্ত-অভক্ত সমাজে বিভিন্নতার অন্ত নেই এবং মার্কস্-সম্প্রদায়ও নরম-গরম, দক্ষিণ-বাম ইত্যাদি নানা দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

তবে এ-বিষয়ে মতভেদ নেই যে মার্কস্-এর দর্শনের নাম "ডায়লেকটিক জড়বাদ"; কারণ এ-নাম তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। আর মার্কস্ যে ফয়েরবাকের শিষ্য ও তাঁর দর্শন যে ফয়েরবাকের দার্শনিক চিন্তারই পরিণতি ও পরিবর্তিত রূপ, একথাও সবাই স্বীকার করে থাকেন।

ফয়েরবাক যে বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, উত্তরকালে তারই একটি বীজকে পুষ্পিত পল্লবিত করে মার্কস্ একটি বনস্পতিকে পরিণত করেন। মার্কস্‌কে রূপকার বলতেই হবে। কারণ ফয়ারবাক থেকে যা তিনি আভাসে পেয়েছিলেন, সে ছায়ামূর্তি মাত্র। তাকে তিনি বাস্তব

জগতের কর্মক্ষম আকার দান করে নতুন রূপে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর এই 'নববিধান' প্রাচীন পুরোহিতদের কাছ থেকে অনেক মন্ত্র নিয়ে আত্মপুষ্টি করেছে। হেগেল, ফয়েরবাক, ডারুইন, বাক্‌ল্ (Buckle) প্রমুখ বহু পুরোধা মার্ক্‌সকে অনেক মন্ত্র শিখিয়েছেন এবং এই সব ঋষিদের ঋণেই তাঁর নববেদ ও নববিজ্ঞান দিনে দিনে গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তবে প্রধানত তাঁর ঋণ সব চাইতে বেশী হেগেল ও ফয়েরবাকের কাছে। মার্ক্‌স শিষ্যদের মতে দর্শনশাস্ত্র এতদিন যা ছিল তা আর থাকবে না। এখনকার দর্শন হবে বিজ্ঞানেরই methodology (প্রণালী বিজ্ঞান) মাত্র। স্বতন্ত্র সত্তা দর্শনশাস্ত্রের থাকার দরকার নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্ত্রমাত্রই হবে আধুনিক জগতের দর্শন এবং সেই অনাগত যুগের দর্শনই হবে মার্কসের নব-দর্শনতত্ত্ব। যেহেতু এই দর্শন প্রণালী-বিজ্ঞান বৈ আর কিছু নয়, এর মূল তত্ত্বই হবে ন্যায় (Logic) অর্থাৎ ডায়লেকটিক্।• কাজেই ডায়লেকটিক জড়বাদ হ'ল এই নতুন ধরণের দর্শনতত্ত্ব এবং এতদিনকার প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র থেকে এর প্রকৃতি ও রীতি অত্যন্ত বিভিন্ন। †

ডায়লেকটিক জড়বাদের আসল কাঠামো হচ্ছে ন্যায় এবং এই কাঠামো দান করেছেন হেগেল। মার্ক্‌স হেগেলের আসল তত্ত্ব পরম সত্তাকেও (absolute spirit) বর্জন করে নিয়েছেন তাঁর প্রণালী-বিজ্ঞান এবং তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই হেগেলীয় প্রণালী-বিজ্ঞানের নামই ডায়লেকটিক। এই প্রণালী-বিজ্ঞানের কাঠামোতে মার্ক্‌স প্রতিষ্ঠা করেছেন ফয়েরবাকীয় নিরীশ্বরবাদী-মন্ত্রকে। ফয়েরবাক যে তত্ত্ব শিখিয়েছেন, তাকে ডায়লেকটিকের কাঠামোতে বসাতে গিয়ে যে সব আনুষঙ্গিক পরিবর্তন দরকার হয়েছে, সেই সব দরকারী সংস্কার সাধন করে' মার্ক্‌স ফয়েরবাকীয় দর্শনের রূপ বদলিয়ে তৈরী করেছেন ডায়লেকটিক জড়বাদ নামক দর্শন।

মার্ক্‌স যেমন হেগেলের খানিকটা বর্জন করে খানিকটা নিয়েছেন, তেমনি ফয়েরবাক থেকেও মূলতত্ত্বটুকু নিয়ে বাকী অংশকে ত্রুটি-বহুল বলে ত্যাগ করেছেন। ১৮৪২ সালে ফয়েরবাক "Preliminary Thesis for the Reform of Philosophy" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মার্ক্‌স সেই প্রবন্ধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধে ফয়েরবাক হেগেলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে' নিজের মতামতের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করেন। তাঁর মূলতত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করেন বিষয়ী-বিষয় (Subject-object) সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। তাঁর মতে বিষয়ী ও বিষয় অর্থাৎ চেতন অন্তঃসত্তা ও জড় বহিঃসত্তার (Being) মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এই ঐক্যের মধ্যেও আবার বহিঃসত্তার (Being) প্রাধান্য ও পূর্ববর্তিত্বই নিশ্চিত। ফয়েরবাকের কথায়, বাইরের জড়সত্তা স্ব-নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু চিন্তা ও চেতনা জড়সাপেক্ষ ও জড়-নিয়ন্ত্রিত।•

ফয়েরবাকের এই ধরণের কথা থেকে প্রধানত মার্ক্স ও তাঁর সমর্থকেরা তাঁকে জড়বাদী বলে মনে করে নিয়েছেন।

• "From the Marxian standpoint philosophy should be a methodology of Science and consist of Logic and Dialectics only." (Psychology : Kornilov—p. 245)

† "Dialectic Materialism is a philosophy of this kind, i.e., philosophy of Science (Kornilov, p. 24)

• ..."the true relation between thought and being may be expressed as follows : being is the subject and thought the predicate. Thought is conditioned by being, not being by thought. Being is conditioned by itself, has its basis in itself." (Preliminary Theses, 1842, Plekhanov, p. 1)

চেতন (Thought) এবং জড়ের (Being-র) সম্বন্ধ নিয়ে পৃথিবীতে অনেক বাগ-বিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং আজো হচ্ছে। দর্শন শাস্ত্রের আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল অনুসন্ধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়ার সমস্যাই হল বিষয়ী-বিষয় সমস্যা বা চেতনসত্তা-জড়সত্তা (Thought-Being) সমস্যা। আমাদের দেশেও শঙ্করাচার্য তাঁর অধ্যাস-ভাষ্য শুরু করেছেন 'যুষ্মদস্মদ' তত্ত্বের আলোচনা দিয়ে। আজকাল দার্শনিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি খুব জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই 'Idealism' (ভাববাদ) ও 'Materialism' (বস্তুবাদ) লেবেল এঁটে দুই কোঠা ভাগ করে দার্শনিকদের দু'য়ের কোন না কোন কোঠায় ফেলতে চেষ্টা করেন। এঁদের এই কোঠা ভাগ করার মূলসূত্রও এই বিষয়-বিষয়ী তত্ত্ব। যাঁরা চেতনসত্তাকে প্রাধান্য দেন বা বিষয়ীকে (subject) দর্শনের ভিত্তি করে থাকেন তাঁরাই ভাববাদী (Idealist) লেবেল পেয়ে থাকেন এবং যাঁরা জড় বস্তুসত্তা বা বিষয়কে (object) পূর্বতন ও মৌলিকতর বলে মানেন তাঁদেরকে জড়বস্তুবাদী (materialist) আখ্যায় সম্মানিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য 'Idealism' (ভাববাদ), 'Materialism' (জড়বস্তুবাদ) শব্দদুটোর মানে নিয়ে অনেক গণ্ডগোল রয়েছে, তবু মার্ক্স এবং তাঁর মতাবলম্বীরা এই কোঠা ভাগকে মেনে নিয়েই দার্শনিক আলোচনা করেছেন। এইজন্য আমরাও materialism (জড়বাদ) বা matter (জড়) ইত্যাদি পরিভাষার মানে নিয়ে কোনো তর্ক না তুলে কেবল মার্কসের মতগুলোর সঙ্গে ফয়েরবাখের মতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় সেই বিচারই করব।

ফয়েরবাক বলছেন, Being বা জড়সত্তাই Thought বা চেতনাসত্তার নিয়ন্তা, মার্কস-এর ভক্তরা Being মানে করেছেন matter বা জড় এবং এই পরিভাষা অনুযায়ী ফয়েরবাককে বলেন জড়বাদী বা materialist। এখানে এইটুকু শুধু আপত্তি করা যেতে পারে, যে ফয়েরবাক ধর্মের বিরুদ্ধে, খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরবাদের (Theism-এর) বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন, একথা ঠিক এবং তাঁকে নিরীশ্বরবাদী (Atheist) বললেও দোষ হবে না। কিন্তু জড়বাদ-বা materialism বলতে যা বোঝায় সে তত্ত্বকে ফয়েরবাক কোথাও সমর্থন করেছেন বলে অন্ততঃ আমাদের তো জানা নেই। বিশ্বলোকের আদি-অন্ত নিয়ে, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে তাঁর জড়বাদী আলোচনা ও সমর্থন কোথাও আছে বলা চলে এমন তো মনে হয় না। মার্কস অবশ্য তাঁকে materialist (জড়বাদী) বলেই ধরেছেন। কিন্তু materilaism (জড়বাদ) বলতে কি তিনি ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর materialism (জড়বাদই) বা কী ধরণের জড়বাদ সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করছি যে মার্কস এবং আর সবাই ফয়েরবাককে জড়বাদী বলেই ধরে নিয়েছেন। বিখ্যাত দার্শনিক এফ্. এ. লাঙ্গে (F. A. Lange) (১৮২৮-১৮৭৫) তাঁর "History of Materialism" (১৮৬৬) নামক বিশ্ববিখ্যাত বইতে ফয়েরবাককে জড়বাদী বলতে আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে ফয়েরবাকের মানবতা-ধর্ম (Humanism) মোটেই জড়বাদ নয়। প্লেখানফও (Plekhanov) এ-সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে সাহস করেন নি, বরং খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলেছেন, 'জর্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দর্শনে সেরা ওস্তাদ মেহরিং (Mehring) যে এবিষয়ে ঠিক কি মনে করেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।' *

কিন্তু তবুও প্লেখানফের নিজের মত হচ্ছে এই যে ফয়েরবাক

---

* I must admit that I do not clearly understand what F. Mehring thinks about this question, although Mehring is the chief and perhaps the only expert in Philosophy among the German Social Democrats." (Fundamental Probems of Marxism, Plekhanov ; p.6)

জড়বাদীই ছিলেন এবং এ- সম্বন্ধে মার্কস ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে তিনি একমত। ফয়েরবাকের নিম্নলিখিত তিনটি উক্তি থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ফয়েরবাক জড়বাদী ছিলেন :

(১) ঈশ্বর হচ্ছে আমার প্রথম চিন্তা ; যুক্তি হল দ্বিতীয়, আর তৃতীয় চিন্তা হচ্ছে মানুষ। (২) মগজ যে-জড়বস্তু দিয়ে গঠিত, সেই জড়ের প্রকৃতি আমরা যেই জানতে পারব অমনি বস্তুমাত্রেরই সুস্পষ্ট ধারণাও আমরা লাভ করব।•
(৩) যে সব জায়গায় ফয়েরবাক দেবতাকে মানব মনের প্রতীক বলে বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানেও ফয়েরবাক জড়বাদই প্রচার করেছেন। অবশ্য একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে উপরের উক্তিগুলোর কোনটা থেকেই বিশুদ্ধ জড়বাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরপরায়ণতা থেকে তিনি মানবপ্রীতির ধর্মে এসে পৌঁচেছেন এবং মানুষের মগজ নামক জিনিষটি জড় পদার্থ ও তাকে জানতে পারলেই সব রকমের জড়কে জানা সম্ভব হবে,—দু'য়ের কোনোটা থেকেই জড়বাদ প্রমাণিত হচ্ছে না।

যা-ই হোক, জড়-চেতন (Being-Thought) সম্পর্ক নিয়ে আগেকার উল্লিখিত মার্কসীয়রা ফয়েরবাককে জড়বাদী বলে ধরে নিয়েছেন। মানুষ জড়ের অর্থাৎ Being-এরই অংশ মাত্র। কাজেই মানুষের চিন্তা-চেতনার (Thought) সঙ্গে তার জড়সত্তার (Being) কোনই বিরোধ থাকতে পারে না—অংশের সঙ্গে অংশীর বিরুদ্ধতা কোথায় ? কাজেই চেতনা ও জড়ের (Thought and Being) ঐক্য প্রমাণ হয়ে গেল।•
কাজেই চেতন-জড়ের (Thought-Being) যে ঐক্য ফয়েরবাক দেখিয়েছেন, সেই ঐক্যই মার্কস নিজের দর্শনের সামিল করে নিয়েছেন। †

হেগেলের ভিত্তিভূমি থেকে ফয়েরবাকের ভিত্তিভূমি একেবারে বিপরীত দিকে। হেগেল প্রাধান্য দিয়েছেন Thought বা চেতনসত্তাকে এবং চেতনের প্রকাশই তাঁর মতে Being বা জড়সত্তা। এখানেও হেগেল Thought এবং Being-এর বিরুদ্ধতার নিরসন করেছেন এবং তাদের ঐক্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু এতে সত্যিকার ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে না। কারণ, এই দুইয়ের একপক্ষকে নগণ্য করে অর্থাৎ অপর পক্ষের ছায়ামাত্র করে

• (১) "God was my first thought ; reason, my second and man my third and last."

(২) "In the controversy between materialism and spiritualism, the affair turns…upon the human head. As soon as we have ascertained the nature of the matter out of which the brain is made, we shall speedily attain clear views, likewise, as to all other kinds of matter, as to matter in general." [Essence of Christianity (1841), Philosophy of the Future (1843), Essence of Religion (1845)]

• "Speaking generally, the laws of being are also the laws of thought That was how Feurbach put the matter. Engels said the same thing, though in other words, in his polemic against Durhing. It is already obvious how much of Feurbach's philosophy enters into the constitution of the philosophy of Marx and Engels." (Fundamental Problems of Marxim, Plekhanov. p. 11)

† "Here we have a view of the relations between being and thougt which was adopted by Marx and Engels and was by them made the foundation of their materialistic conception of history." (Fundamental Problems of Marxism, Plekhanov : p. 7)

দাঁড় করিয়ে যে ঐক্য তা মিথ্যা সামঞ্জস্য। হেগেল যখন thought কে subject এবং beingকে predicate বলে স্থান নির্দেশ করেছেন। তখন দাঁড়াল এই যে, বিরোধের একটা উপাদানকে অর্থাৎ—being বা জড় বা প্রকৃতিকে চেপে দিয়ে হেগেল এবং ভাববাদীমাত্রই বিরোধটাকেই চেপে দিলেন। কিন্তু একটা উপাদানকে চেপে দেওয়ার মানে এই নয় যে বিরোধটাই মিটে গেল, তার মীমাংসা হয়ে গেল।*

কিন্তু ভাববাদ এই জড় ও চেতনের ঐক্যকে ("unity of thought and being") কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, বরং matter-কে উড়িয়ে দিয়ে Thought-কে বড়ো করার ফলে ঐক্যভঙ্গই হবে ("...it ruptures that unity." Plekhanov, p.8) তবে জড়বাদী ফয়েরবাকই এই সমস্যার সত্যিকারের সমাধান করলেন। কেমন করে? জবাবে প্লেখানফ বলেছেন যে দেহই মানুষের একমাত্র আত্মবস্তু, এ ছাড়া আর কোনো আত্মা নেই। জড় দেহই আসল বস্তু এবং চিন্তা বা চেতনা তারই ক্রিয়াধর্ম বা গুণ। দেহই চিন্তা করে ও সচেতন হয়। কাজেই জড়বাদ এই পরমতত্ত্ব শেখালেন যে জড়দেহই হল subject বা মূলবস্তু এবং Thought বা চেতনা হলো তারই predicate বা গুণ।†

বিষয়-বিষয়ী, ভিতর-বাহির—এই ধরণের ঐক্য ফয়েরবাক তাঁর দর্শনে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এবং তাঁর সমর্থকরা (মার্কস থেকে প্লেখানফ পর্যন্ত) সবাই একেই চরম মীমাংসা বলে ঘোষণা করেছেন। তারস্বরে বিঘোষণ করা এক কথা, আর দার্শনিক বিচারের জোরে প্রমাণ করা অন্য কথা। হেগেল বলেছেন Thought বা চেতনাই হচ্ছে Prius বা মূল, আর Being বা জড়সত্তা তার Predicate। সেই কথাটিকে পাল্টে নিয়ে ফয়েরবাক বলেছেন: Beingই হচ্ছে Prius এবং Thought হল তার Predicate. কেবলমাত্র এই বিপরীত বিঘোষণার দ্বারাই কি করে যে জড়-চেতন (Being Thought) সম্বন্ধের সমস্যার সমাধান হেগেলের চেয়ে ভাল করে হয়ে গেল সেকথা দুর্বোধ। প্লেখানফ অবশ্য এই একটিমাত্র উক্তির মাহাত্ম্য ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং গদগদ হয়ে বলেছেন যে, ফয়েরবাকের তীক্ষ্ণ প্রতিভা যদি হেগেলকে এমনিভাবে সংশোধন করে নিতে পারত, তবে তদীয় শিষ্য মার্ক্স কিছুতেই তাঁর বিশ্ব-চমৎকারী দর্শনতত্ত্ব পরবর্তী যুগকে দান করতে পারতেন না।*

---

* It follows that Hegel and the idealists in general, only suppressed the contradiction by supprrersing one of its constituent elements, by suppressing the being or the existence of matter, of nature. But the suppression of one of the constituent elements of the contradiction does not mean that the contradiction is solved." (Plekhanov, p.8)

† "Hence in contradistinction to what the idealists contend, the real material being is the subject and thought is the predicate. Herein we find the only possible solution of that contradiction between being and thought against which the waves of idealism beat in vain. This solution is not arrived at by suppressing one of the elements of the contradiction. Both elements are preserved and their true unity is made manifest." (Plekhanov : p. 9)

* "If Marx began the elaboration of his materialist conception of history by a criticism of the Hegelian philosophy of right, he was only able to do so because Feurbach had already completed his criticism of Hegel's speculative philosophy." (Plekhanov : p.11)

হেগেল যদি পক্ষপাতদোষে দোষী হয়ে থাকেন তবে ফয়েরবাকও সেই দোষে সমান দোষী বলতে হবে। হেগেল যদি Being কে predicate স্থলে তাকে নগণ্য করে থাকেন কিম্বা, প্লেখানফের ভাষায়, 'suppress' করে থাকেন, তবে ফয়েরবাকও হেগেলের রীতি নকল করে Thought-কে Being-এর ছায়া বলে Thought-কে নগণ্য করে অর্থাৎ 'suppress' করে ফেলেছেন। অথচ প্লেখানফ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন যে দুটো পক্ষকেই সমান স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব দান করে সত্যিকার ঐক্য ('true unity') বিধান করা হয়েছে।—একথা একান্ত গায়ের জোরে কিম্বা ভক্তি-মূঢ়তার জোরেই বলা চলে, যুক্তির সঙ্গে এর কোথাও কোনো সম্বন্ধই নেই। *

যুক্তি থাক বা না থাক্, মার্কস্‌বাদীরা কিন্তু পরম তৃপ্তিসহকারে এই সমাধানকেই সকল জিজ্ঞাসার চরম উত্তর বলে মাথায় করে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন ফয়েরবাক হেগেলীয় দর্শনে প্রলয়ঙ্কর ভূঁইচাল সৃজন করেছেন এবং তার ফলে হেগেলবাদকে উল্টে নিয়ে (inverted) বিশ্বরাজ্যের সকল সংশয়কে ছেদন করেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনের সব চাইতে বড় তত্ত্ব হচ্ছে এই Being-consciousness বা জড় থেকে চেতনের পরিণতি তত্ত্ব। এবং এই তত্ত্ব তিনি ধার করেছেন ফয়েরবাকের কাছ থেকে। Inverted Hegelianism (উল্টানো হেগেলীয়বাদ) ফয়েরবাকই আবিষ্কার করেছেন এবং মার্কস তাঁর থেকে ধার নিয়ে একে কাজে লাগিয়েছেন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে। কাজেই মার্কস্‌ ফয়েরবাকের মন্ত্রশিষ্য ও উত্তরাধিকারী। একথায় অনেক মার্কস্‌-ভক্তের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা বলেন, মার্কস্‌ ফয়েরবাকের দর্শন একেবারে বদলে ফেলেছেন এবং তার বহু ত্রুটিকে সংশোধন করে এবং গুরুতর অভাবগুলোকে পূরণ করে মার্কসের প্রতিভা যে দর্শনকে নির্মাণ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিই বলা যায়। মার্কস্‌ তাঁর সার কথাটি নিয়েছেন ফয়েররবাক থেকে, একথা ডি. রিয়াজনফের (D. Ryaznov) পছন্দ হয়নি। তিনি এ কথার একটু নরম প্রতিবাদ করে বলছেন ও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। *

আমরা মনে করি প্লেখানফই এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যকে ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন; রিয়াজনফ বৃথা কথায় নিরর্থক প্রতিবাদ করে গুরুতর মৌলিকতার অবিমিশ্র ও অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য দান করবার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন। ফয়েরবাকীয় তত্ত্বের যে অভিনব প্রয়োগ মার্ক্স করেছেন তাতেই তাঁর মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং প্লেখানফ্‌ও এ-মৌলিকতাকে স্বীকার করেছেন। প্লেখানফ্‌ বলছেন: কালক্রমে মার্ক্স-এঙ্গেলসের বিশ্ব-দর্শন ফয়েরবাকের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল একথা বলা গুরুতর ভুল। বরং মার্ক্স এঙ্গেল্‌স-কৃত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার মূলে রয়েছে ফয়েরবাকের দর্শন। আর ফয়েরবাক-দর্শন আমাদের এই কথাই বলে যে চেতন জড়কে নয়, জড়ই চেতনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ‡

* "This solution is not arrived at by suppressing one of the elements of the contradiction. Both elements are preserved and their true unity is made manifest."

* "The statement is not perfectly correct. Marx radically modified and supplemented Feurbach's thesis, which is as abstract as little historical"....... (Ryaznov: Preface to Fundamental Problems of Marxism)

‡ "When we say that for a few years Marx and Engels were disciples of Feurback, this is sometimes taken as implying that in course of time their outlook on the Universe underwent such changes as to become completely different from that of Feurbach···This is a

কাজেই দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদের ভিত্তি যে-তত্ত্ব সে হল ফয়েরবাকীয় দর্শন। এই তত্ত্বই মার্কসের প্রথম ঋণ—ফয়েরবাকের ভাণ্ডার থেকে।

এই মূলতত্ত্ব—বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ (Subject-object relation) থেকেই আর একটি তত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে, তাকেও সংশোধিত আকারে মার্কস ফয়েরবাক থেকেই নিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, মার্কসের epistemology বা জ্ঞানতত্ত্ব। এই জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বটিও মার্কস ধার নিয়েছেন ফয়েরবাক থেকে। প্লেখানফ্ স্বীকার করেছেন মার্কসের জ্ঞানতত্ত্ব ফয়েরবাকের থিওরি থেকে সরাসরি ব্যুৎপন্ন।•

ফয়েরবাকের জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বও তাঁর বিষয়-বিষয়ী (Thought-Being) তত্ত্ব থেকেই স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এসেছে—তাঁর মূলতত্ত্ব যদি সাধ্য হয় তবে এ-তত্ত্বও তারই থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত। ফয়েরবাকের মতে জড়সত্তা বা Being-ই মানুষের চেতনসত্তাকে (Thought) নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, স্মরণ করে, অনুভব করে সে-সবই বাহিরের জড় সত্তার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বহির্জগতে যা ঘটে, তাই মানবচিত্তপটে প্রতিফলিত হয়ে সুখ-দুঃখ, স্মরণ-মননের আলোছায়া হয়ে দেখা দেয়। মানুষ চিন্তা-জগতে যা কিছু সৃজন-মনন করে' থাকে তাতে তার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু নেই; সে হচ্ছে বাহিরের জড়প্রকৃতির প্রভাবে তারই পরিণতি মাত্র। এই মতানুসারে মানুষ দাঁড়ায় শুধু নিষ্ক্রিয় যন্ত্র হয়ে, শুধু বাহিরের বস্তু বা বিষয়গুলোর ক্রিয়ার ক্ষেত্র হয়ে। সকল চিন্তায়, সকল অনুভূতিতে মানুষ নিষ্ক্রিয় বা passive।•

ফয়েরবাক বলেছেন : জড়সত্তা (Being) হচ্ছে চেতনা-ভাবনার (Thought) পূর্বগামী।‡

ফয়েরবাকের এই নিষ্ক্রিয় জ্ঞানবাদকে মার্ক্স ত্রুটি-দুষ্ট বলে এর সংস্কার সাধন করে চলনসই করে নিয়েছেন। মার্ক্সবাদীরা বলেন, মার্কসের উজ্জ্বলতম কৃতিত্ব হচ্ছে ফয়েরবাকের জ্ঞানতত্ত্বকে শোধন (brilliant rectification—Plekhanov : p 13)। এই অপূর্ব সংশোধনের ফলেই আজ জগতে মার্ক্সের নবদর্শন সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। মার্কস কি সংশোধন করলেন এবং ফয়েরবাকের কী ত্রুটি ছিল ?

grave error.…'It is not Thought which determines Being but Being which determines Thought.' This idea, which underlines the whole of Feurbach's philosophy, becomes for Marx and Eugles the foundation of the materialist interpretation of history. (F. P. of Marxism : Plekhanov : p. 21)

• "It must, however, be admitted that Marx's theory of cognition is directly derived from Feurbach's. If you like, we can ever say that, strictly speaking, it is Feurbach's theory brilliantly rectified and given a profounder meaning by Marx." (Plekhanov : p. 13)

• "According to Feurback, man, before thinking about the object, experiences its action on himself, contemplates it, feels it." (Plekhanov : p. 12)

‡ Thought is preceded by Being ; before thinking a quality, you feel it." (Plekhanov : p. 12)

(ক্রমশঃ)

রাকেশের জীবনে নতুন আলো
বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল।
হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষার তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। দৌড়তে দৌড়তে এসে একটি ছেলে বলল, "রাকেশ গাড়ী চাপা পড়েছে"। রাকেশের মায়ের হাত থেকে চায়ের পাত্র পড়ে গেল। 'কি হয়েছে, কোথায় সে,' —তিনি ব্যস্ত হলেন। রাকেশকে ততক্ষণে বাড়ীতে বয়ে আনা হয়েছিল —চোখ দুটি তার বোজা, দুমড়ে যাওয়া দেহটা রক্তমাখামাখি।
নিস্তব্ধ হাসপাতালে রাকেশ অচেতন। ছেলের সংকটাপন্ন সময়ে মোহনকে দুশ্চিন্তায় তিন দিন তিন রাত্রি কাটাতে হল। প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা ছাড়া তাঁরা আর কিছুই করতে পারেন নি। রাকেশ সেরে উঠলে গরীব দুঃখীদের কম্বল দান করবেন—এই মানত করলেন।
চতুর্থ দিনের দিন সকালে রাকেশ চোখ খুলল, মোহনের প্রার্থনা দেবতা শুনেছেন। মানতের কথা মনে পড়ল তাঁর। অথচ কিছু এমন ধনী তিনি নন। তিনি খুবই অসুবিধা ও দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে এমন অবস্থায় কাটাতে হয়নি।
ঠিক যেন উপহারের মত তাঁর হাতে এসে গেল 'প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা'র পলিসির প্রথম কিস্তির ২০০০ হাজার টাকা। মানত রক্ষা হল।
পাঁচ বছর রাকেশ রইল পঙ্গু হয়ে। তারপর ডাক্তারেরা তার পায়ের ওপর অস্ত্রোপচার করতে মনস্থ করলেন। হাসপাতালের খরচ মেটাবার ভাবনা মোহনকে আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। ভাগ্যক্রমে সেই সময় তাঁর পলিসির দ্বিতীয় কিস্তির ২০০০ হাজার টাকা পাওয়া গেল। ভাবনা রইল না আর।
মোহনের সমস্যার শেষ অবশ্য নেই। অস্ত্রোপচারের পর রাকেশকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। সবচেয়ে কাছে যে কলেজ, সেটিও ৪ মাইল দূরে। সেখানে রোজ হেঁটে পড়তে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়। তাহলে কি রাকেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! না। মোহনের কাছে ছিল জীবন বীমার পলিসির শেষ কিস্তির আরোও ৬০০০ হাজার টাকা। এই টাকায় তিনি রাকেশের জন্য একটি আটা-কল খুললেন।
এখন রাকেশ এই আটা-কলটি চালায় এবং পিতামাতার দেখা শোনা করে
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

রাসবিহারী বসু ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারে সমগ্র দেশ যখন জর্জরিত, তখন পূর্বাচলে অরুণের মতই বীর বিপ্লবী রাসবিহারীর আবির্ভাব। রাসবিহারী জানতেন, বিপ্লবকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা অবান্তর। শ্রী অরবিন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। এ যুগে বিশ্বমাতা শক্তিরূপেই সংস্থিতা ও প্রকাশিতা। শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে এই প্রকাশ ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, শক্তিকে আমরা ত্যাগ করেছি বলেই শক্তি আমাদের ত্যাগ করেছেন। বেঁচে থাকতে হলে ভারতকে অতীতের মত শক্তিশালী হতে হবে। তমের ঘনতমিস্রায় আচ্ছন্ন ও অন্ধ হয়ে আমরা অনেকেই বলছি, এ অসম্ভব ; ভারত ম্রিয়মাণ, তার কলেবর ক্ষীণ ও পাণ্ডুর, এ জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নির্বোধের উক্তি। কর্মবিমুখের উক্তি। ব্যক্তি বা জাতি কেউই দুর্বল হতে পারে না, যদি না সে স্বেচ্ছায় ক্লৈব্যকে বরণ করে নেয়। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছিলেন, জাতি কাকে বলে? দেশ বলতে কী বোঝায়? দেশমাতৃকা শুধু মৃত্তিকা নয়, বাক্যালঙ্কার নয়, নয় কেবল কল্পনাবিলাস। দেশমাতৃকা এক বিরাট শক্তি। লক্ষ লক্ষ লোক মিলে যে জাতি গড়ে ওঠে, তাদের সম্মিলিত শক্তিতে এঁর সৃষ্টি। সেই শক্তিকেই আমরা বলি ভারত, ভবানী ভারতী। কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন, তমের মায়াজালে তিনি আবদ্ধ। কী সেই তমঃ? তাঁর সন্তানগণের অজ্ঞতা ও জড়তা।

শক্তির এই মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপানের উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, সমগ্র ইতিহাসে আধুনিক জাপানের মত আর কোন জাতির মধ্যে শক্তির এত আকস্মিক ও বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা যায় নি। ভারতবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে তিনি ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করলেন—ভারত কখনও মরতে পারে না, কেন না পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ভারতবাসীর জন্যেই নির্দিষ্ট আছে মহত্তম স্থান, আছে বিশিষ্টতম ভূমিকা যা নিখিল মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করবে।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনকালে শ্রীঅরবিন্দের লেখনীনিঃসৃত এই বাণী শ্রীরাসবিহারীর তরুণ হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের প্লাবন নিয়ে আসে। সেই দৃপ্ত ভাব ও আবেগের তরঙ্গ তাঁকে বিপ্লবী বানিয়ে তোলে, শক্তিসাধনার অগ্নিমন্ত্রে বিশ্বাসী করে তোলে। দেশের তথা জাতির মুক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। যে গুরুভার বৈদেশিক শাসনযন্ত্র দেশের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে তাকে চূর্ণ করতে তিনি হয়ে ওঠেন বদ্ধপরিকর। এর জন্যে চাই অক্লান্ত নিরলস সংগ্রাম। তাই বীরের মত তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন—বিপ্লবের কণ্টকময় পথে সুরু হল তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রা।

বিপ্লবমাত্রেরই একটি সক্রিয় বিশিষ্ট নীতি থাকবে। সেই নীতিকে অবলম্বন করেই বিপ্লবের অগ্রাভিযান। মানুষের জীবনেতিহাসে বিপ্লব সূচনা করে আমূল পরিবর্তন। তাই কোন তুচ্ছ অনুযোগ বা ক্ষণিক অসন্তোষের ওপর বিপ্লবে গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্যে চাই অনেক, অনেক দৃঢ় ব্যাপক ভিত্তিভূমি। সেই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত নীতির

যজ্ঞবেদীতে শত শত সহস্র সহস্র লোক অকাতরে আত্মবলি দেয়।

শ্রী রাসবিহারী গীতার কর্মযোগের আদর্শে বিশ্বাস করতেন।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ"

'যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেও তুমি স্বর্গলাভ করবে, আর বিজয়ী হলেও তুমি বসুন্ধরাকে ভোগ করবে। অতএব হে কুন্তীনন্দন, তুমি যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও।'

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

'সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়কে তুল্যজ্ঞান করে সমরসজ্জায় সজ্জিত হও, পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না।'

যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমন ইতিহাসেও, ব্যক্তি বা জাতির কর্মের লক্ষ্যই তার বিচারের মানদণ্ড। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় অনেকগুলি অধ্যায় অতিক্রান্ত। আজ আমরা ভাবতে পারি কেন সেই আবেগপ্রবণ দেশপ্রেমিক নওজোয়ান রাসবিহারী দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। বিপ্লবের ধর্ম ও মাতৃ মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এ কার্যে প্রণোদিত করেছিল। তাঁর অবিচল বিশ্বাস ছিল, মূক, নিষ্পেষিত লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে গঠিত এই জাতির মধ্যে সত্যিকার পরিবর্তন এনে দিতে পারে একমাত্র সেই বিপ্লব যার গতিপথ রক্তলেখায় চিহ্নিত, যার মধ্যে থাকবে নিঃস্বার্থ নির্ভীক যুবকদের সক্রিয় ভূমিকা।

এই বিশ্বাসের বলেই তিনি হার্ডিঞ্জকে আক্রমণ করেন এবং কৌশলে আত্মগোপন করে জাপানে পলায়ন করেন। শৌর্যে, আত্মত্যাগে, জাতীয়তাবোধের গৌরবে জাপান ছিল তাঁর আদর্শস্থল। তাঁর অভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' তাঁকে দেবে নূতন আলোক ও অভিজ্ঞতার সম্পদ যার সহায়তায় ভারতে একটি শক্তিশালী বিপ্লব গড়ে উঠবে। এই বিশ্বাস এবং ত্যাগের মন্ত্রই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী প্রেরণা। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের তিনি শোনালেন তাঁর প্রাণস্পর্শী বাণী, 'যোদ্ধা ছিলাম আমি, আর একবার যুদ্ধ করব, এই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ।'

শ্রীরাসবিহারী বুঝেছিলেন, স্বাধীনতা পেতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। শুধু ভারতীয় নেতাদের একক সংগ্রাম সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। তাঁর আশ্রয়দাতা ও পরম হিতৈষী জাপানী নেতা তোয়ামার সান্নিধ্যে ও চীনের ডাঃ সান্-ইয়াৎ সেনের সহায়তায় তিনি ভারত-মুক্তি লীগের প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্দেশ্য, দূর প্রাচ্যের ভারতীয়দের একতাবদ্ধ করা। জাপানী সৈন্যেরা যখন থাইল্যাণ্ড অধিকার করল, তখন স্বামী সত্যানন্দ পুরী কয়েকজন ভারতীয় নেতাকে নিয়ে ব্যাংককে ভারত-মুক্তি লীগ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মালয় অভিযানকালে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে এই লীগের প্রতিনিধিগণও যাত্রা করলেন এবং স্থানীয় ভারতীয়গণের সাহায্যে মালয়ের সর্বত্র এই লীগের শাখা স্থাপন করলেন। পরে, সমগ্র পূর্ব এশিয়ায়, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ডাচ ইন্দোচীন, সাংহাই, বর্মা, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় উক্ত লীগের শাখা স্থাপিত হল। এই সমস্ত শাখাগুলি ভারতের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ ছিল এবং তাদের নেতা ছিলেন শ্রীরাসবিহারী। এই শাখাগুলির প্রতিষ্ঠা তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

১৯৪১ সালে জাপানে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভারতমুক্তি লীগের নেতৃত্বভার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ওপর ন্যস্ত করে তিনি বললেন, 'আমাদের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক, এ ছাড়া আমার আর কোন কামনা নেই। এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আমি আমাদের সুন্দর দেশের কোন নিভৃত প্রদেশে চলে যাব। হিন্দুস্থানের পূর্ণ

স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। ব্যক্তি, বর্ণ বা ধর্মের কোন বিভেদ যেন এর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।' জাপানে রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র এই দুই মহাপুরুষের সহাবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। নেতাজীর ওপর লীগের ভার অর্পণ করে রাসবিহারী নিশ্চিন্ত হলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধানতম উপদেষ্টা হিসাবে তিনি সর্বদাই নেতাজীর পাশে থাকতেন। ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী টোকিওতে এই বরেণ্য নেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বহুবাঞ্ছিত পরম সাধনার ধন স্বাধীনতার রক্ত-রাঙা প্রভাত তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

এই বার সৈনিকের অমর জীবন স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। এই অবদানের সম্যক পরিমাণ এখনও নির্ধারিত হয় নি। তাঁর ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবন যেন একটি ভাসমান হিমশৈল, তার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হলেও অধিকাংশই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। তাঁর জীবন একটা রীতিমত উপন্যাস—রোমাঞ্চকর উপন্যাস—তার চেয়েও অধিক। 'Truth is stranger than fiction'—কথাটা তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক বললেই তাঁর সম্পর্কে সব কথা বলা হয় না। শ্রী রাসবিহারী ছিলেন আদর্শ মানুষ। আদর্শ চরিত্র কি? যে চরিত্রের মধ্যে মানুষের স্বপ্নলব্ধ মনুষ্যত্বের একটা পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা মর্ত্যভূমির স্খলন-পতন-ত্রুটি এড়িয়ে যাত্রাপথ ত্যাগে আত্মোৎকর্ষে স্নেহপ্রেম-প্রীতিশ্রদ্ধায় সুশোভিত করে মানবত্বের শেষ পরিণামে গিয়ে পৌঁছায়, তাই আদর্শ চরিত্র। "উত্তররামচরিত" নাটকে ভবভূতি বাসন্তীর মুখ দিয়ে মহাপুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন:

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

শ্রীরাসবিহারীর চরিত্রেও দুই পরস্পরবিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় দেখা যায়। তাঁর চরিত্রও ছিল কোমলে-কঠোরে গড়া। অন্যায়কে তিনি জীবনে কখনও ক্ষমা করেন নি। ভারতবর্ষকে ক্রীতদাস করে রেখেছিল বলে ইংরেজ তাঁর চক্ষে ছিল ঘোরতর অপরাধী—তাঁর চিরশত্রু। এখানে তিনি বজ্রাদপি কঠোর। নেতাজী যেমন বলতেন—'No compromise with bondage'—বন্ধনের সঙ্গে সন্ধি কখনও নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর লিখিত ও কথিত বাণী পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় তাঁর হৃদয়ের সুন্দর সুকুমার বৃত্তিগুলি কি সুচারু-ভাবেই না বিকশিত হয়েছিল! নিঃস্ব, নিপীড়িত দেশের জনগণের দুঃখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠত। এখানে তিনি কুসুমাদপি মৃদু।

শ্রী রাসবিহারীর মত চরিত্র ইতিহাসে বিরল। এ চরিত্র তুলনারহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। শুধু মনে পড়ে তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারীকে—সুভাষচন্দ্রকে। উভয়েই উভয়ের উপমান। উভয়েই চরিত্রের অকলঙ্ক শুচিস্নিগ্ধ শুভ্রতায় অপরিম্লান। স্বামীজী চেয়েছিলেন একদল যুবক, যাদের থাকবে লৌহের মত পেশী আর ইস্পাতের মত স্নায়ু। তিনি বলেছিলেন, "A hundred such and the world is revolutionised" রাসবিহারী ও সুভাষ এই শ্রেণীর তরুণ, চিরতরুণ। উভয়ের সম্বন্ধেই বলা যায়:

"His words are bonds, his oaths are oracles,
his love sincere, his thoughts
immaculate,
His tears pure messengers sent from
his heart,
His heart as far from fraud as heaven from
earth."

—"The Two gentlemen of Verona"

রাসবিহারী স্মারক গ্রন্থ

Rashbehari Basu : his struggle for India's independence.

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক-সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। শ্রী রাসবিহারীর বিচিত্র জীবন কথা, তাঁর বক্তৃতা, বেতারভাষণ পত্রাবলী পুস্তকখানির প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ।

যদিও শ্রী রাসবিহারী বলতেন, পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তথাপি তাঁর বাণী ও রচনা পাঠ করলে জানা যায় শুধু স্বরাজ-প্রাপ্তিতেই তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তা নিবদ্ধ ছিল না। তাঁর মানসপটে অঙ্কিত ছিল স্বাধীন ভারতের একটি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল চিত্র। উন্নত বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনের পথে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা কি কি অন্তরায় সৃষ্টি করেছে ও তাদের দূরীকরণের উপায় কি - এ সমস্ত বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে তিনি দিয়ে গেছেন সুচিন্তিত অভিমত।

প্রধান সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ তাঁর মনোজ্ঞ ভূমিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীরাসবিহারীর ভূমিকাটির সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। এঁদের মধ্যে আছে বিশ্রুত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সম্পাদক সুকবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভগবান সিং জিয়ানী, ডাঃ কালিদাস নাগ, ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এককালে শ্রী রাসবিহারীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছিলেন; তাই বহু মূল্যবান ঘটনা ও তথ্য পরিবেশন করতে পেরেছেন। এ দিক থেকে গ্রন্থখানির স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মর্য্যাদা অনস্বীকার্য্য। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

পুস্তকের প্রথম দিকে কয়েকটি তথাকথিত বাণীর সন্নিবেশ দেখা যায়। এ গুলি কি প্রশংসাপত্র না বিজ্ঞাপন? এগুলি অনেকটা প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। মহানায়ক শ্রীরাসবিহারীর জীবন-দর্শন কোন প্রচার, পত্র বা বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না, শুধু তাঁর দেশবাসীর কাছেই নয়, সমস্ত স্বাধীনতাকামী জাতির কাছে। সকল মানব-প্রেমিকের কাছে এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত।

[ছাত্র জীবনে সুভাষচন্দ্র—১২২ পৃষ্ঠার পর]

থেকে তরুণমত তাঁর দুটি সমকর্মী মণীন্দ্র নাথ শেঠ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), আর শরৎ ঘোষ, যথাক্রমে অঙ্ক আর ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে।

স্পষ্টই বোঝা যেত, তাঁদের ওখানে আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছেলে জোগাড় করা। কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হল শশীদার কাজ কর্মও ততখানিই বিপ্লবোন্মুখ যতখানি সুরেশদার কর্মসূচী ও বিচিত্র চিন্তাধারা। এমনি ধারা আর একটি-দলের সংস্পর্শে আমি তার আগে এসে ছিলাম, কলকাতায়: দেবপ্রসাদ ঘোষ, হরিদাস মজুমদার প্রমুখ বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও জগদীশ মুখার্জির অনুগামীর দল। বহুধা চিন্তার সংঘর্ষে মুখর ছিল পথ খোঁজবার সেই দিনগুলি, তারই আত্মপ্রকাশ এই সব দলে।

শশীদার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে তেমনি সব শিক্ষক গড়ে তোলা, যাদের হাতে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের বীজ দেশের সর্বত্র। নিগ্রো নেতা বুকার ওয়াশিংটনের প্রতি শশীদার ছিল গভীর অনুরাগ।

আমায় তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেছিলেন; আমার জায়গা নির্দিষ্ট হল তাঁরই ঘরে। ভার দিলেন কলেজ থেকে, বিশেষ ক'রে হোস্টেলগুলো থেকে ছাত্র সংগ্রহের।

এমনি একটা—কিছুই চাইছিলাম আমি। আর আশ্চর্যজনক ভাবে অত্যন্ত সক্ষম সহকর্মীও জুটে গেলেন। শশীদা আর যুগলদা ছিলেন যেন একই পাখির দুটি ডানা। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় তাঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতেন না। যুগলদা আমায় নিষেধ করে দিয়ে ছিলেন, শশীদার কাছে আমাদের কার্যকলাপের বিন্দু বিসর্গও যেন না ভাঙি; আবার শশীদারও ছিল অনুরূপ নির্দেশ।

অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই এ ভাব কেটে গিয়ে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেন। সুরেশদার ভারি মনঃপূত হ'ল যুগলদার এখানের কাজ, এবং উত্তরোত্তর তিনি যাতায়াত বাড়িয়ে চললেন; তেমনিই যাতায়াত শুরু করলেন তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা: ৺যোগেন সাহা, নৃপেন বোস (পরে অভয় আশ্রমের), হেমেন্দ্র ঘোষ (পরে স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা), যোগেশ সুর (পরে চাঁদপুরে ডাক্তারি করতেন), কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার, অরবিন্দ মুখার্জি (প্রথমে খুলনা স্কুলের ছাত্র হিসেবে যুগান্তর দলের ৺চারু ঘোষের সহকর্মী) বিধু রায় (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক—পদার্থ বিদ্যায়), শশাঙ্ক মুখার্জি (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), এবং—সুভাষ বোস।

শেষোক্ত তিনজনই কটক থেকে এসেছেন। এঁরা তখন সুরেশদার দলের একনিষ্ঠ কর্মী সবাই।

ক্রমে ক্রমে সুভাষ সম্বন্ধে আরো কত কথা জানলাম সুরেশদা, যুগলদা', হেমন্ত এবং বিধুর কাছ থেকে। হেমন্ত ছিল খুবই চালাক-চতুর, সহজেই ছেলে পটাতে ওস্তাদ। কটকে যখন ভাল ছাত্র সুভাষকে গিরীশদার মনে ধ'রে গেল, হেমন্তকে তিনি বললেন, "জানকী বসুর এই ছেলেটার গলা থেকে টাই-টা খলাতে পারিস?"

"কপাল ঠুকে দেখতে পারি," হেমন্ত হেসে জবাব দিয়েছিল।

ক'দিন বাদেই নগ্নপদ সুভাষকে হেমন্ত এনে হাজির করেছিল গিরীশদার সামনে। গিরীশদার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো জীবন সেদিন সুভাষের মনে পাকা রং-এ' আঁকা রয়ে গেল। গিরীশদার শিক্ষার মূল কথা ছিল: লজ্জা ঘৃণা ভয় যতদিন ছাড়তে পারছ না, ততদিন তুমি যোগের বা সাধনার অনুপযুক্ত। সাধনার অঙ্গ হিসেবে তিনি রাতের পর রাত কাটিয়েছেন শ্মশানে, শকুনের সঙ্গে বসে পূতিগন্ধময় শব থেকে মাংস ছিঁড়ে খেয়েছেন। তাঁকে কে অনুসরণ করবে? কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগী ছিল সকলেই, বিশেষত সুভাষ।

সুরেশদা ও গিরীশদার শিক্ষার প্রতিটি শব্দ সুভাষ যেন গিলে খেত, এবং ফলে তার মন ঝুঁকল সন্ন্যাসের প্রতি।

বাস্তবিকই সে বলা নেই কওয়া নেই নিরুদ্দেশ হ'ল। অবশ্য তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল এবং ঘরেও ফিরিয়ে আনা হ'ল। সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ভর্তি হ'ল প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই পর্বেই শুরু হ'ল তার দৌলতপুর কলেজে যাতায়াত।

শিক্ষাব্রতী রূপে শশীদা বহু বছর কটকেও কাটিয়েছিলেন এবং গোপবন্ধু দাস যখন সত্যবাদী ওপ্‌ন্ এয়ার স্কুল খুললেন, শশীদা অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁকে। আদর্শ এই শিক্ষায়তনের প্রত্যেক শিক্ষকই শশীদাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ফলে, গিরীশদা, বিধু, শশাঙ্ক, সুভাষ—সকলেই পরিচিত ছিলেন শশীদার নামের সঙ্গে। দৌলতপুরে এ-হেন শশীদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তাই আমার মর্যাদা কমখানি বাড়িয়ে দেয়নি।

কলকাতা থেকে বা অন্যত্র থেকে বন্ধুরা দৌলতপুর কলেজে এলে আমরা তাদের আপ্যায়িত করতাম নৌ-বিহার দিয়ে। ছেলেদের ব্যবহারের জন্য কলেজে দুটো 'নাও' ছিল। সুস্থির হ'য়ে দাঁড় টেনে সে নৌকা চালানো আমাদের ধাতে ছিল না; তুমুল দাপাদাপি চলত তার বুকে, নৌকা-বাঁধা দড়ি দিয়েই জলের বুকেই খেলতাম টাগ-অব্-ওয়ার, ডুবিয়ে দিতাম নৌকো, তার উলটো-পিঠে চলত হটোপাটি, তারপর জল থেকে সেই নৌকা টেনে তুলে দাঁড় বেয়ে তীরে ফেরার পালা। তুমুল ঝড় জলের সন্ধ্যে হ'লেই খেলা আমাদের জ'মে উঠত প্রায়শ।

সুভাষের সে-বার বোধহয় দ্বিতীয়বার দৌলতপুরে আসা। সঙ্গে এসেছে বিধু আর শশাঙ্ক, একটা নৌকায় ক'রে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যুগলদাও ছিলেন। জোয়ারে ভেসে বহুদূর চ'লে গেলাম। বন্ধুদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম যে সুভাষ সাঁতার জানে না। তবু তাদের কথায় বিশ্বাস নেই। তাই সুভাষের পাশেই আমি বসেছিলাম। সাঁতারে বেশ দড় ছিলাম সেকালে। তখন সন্ধ্যার প্রকৃতি। আকাশে চাঁদ। শশাঙ্ক গাইতে গাইতে চললো—"ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।" অনেক দূরে চ'লে গেলাম, ফিরতি পথে ভাটার অপেক্ষায়। অস্বাভাবিক রকমে দিব্যি শান্তশিষ্ট ছেলেদের মতোই সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

কিন্তু ভাটার টান পড়তে না পড়তে বন্ধুদের শিষ্টতা হঠাৎ উবে গেল। শুরু হ'ল দড়ি ধ'রে টানা-হ্যাঁচড়ার খেলা। নৌকা গেল ডুবে। সুভাষ জলে প'ড়ে গেল আমি নজর রেখেছিলাম। সেখানটা অন্ধকার, ছায়া ঘন তীরের কাছাকাছি তখন আমরা। চট করে সুভাষের কোমরের কাছের ধুতি চেপে ধরলাম। জল সেখানে যথেষ্ট গভীর। টেনে তীরে তুললাম।

ভাটার অনুকূল স্রোতে আমাদের ফিরে আসতে তেমন সময় লাগল না। নৌকা তুলে বাঁধাছাঁদা করছি, ততক্ষণে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষ কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। খুঁজতে সুরু করলাম। কোথাও নেই সুভাষ। শেষ অবধি শশাঙ্ক আর আমি, কলেজের জমিতে মন্দির ছিল একটা, সেখানে গেলাম খুঁজতে। দাওয়ার এককোণে ডাঁই করা ছিল একটা ভাঙা বেড়ার বাঁশ চাটাই। তারই মাঝে খানিকটা আড়াল হয়ে সুভাষ দেখি ধ্যান করছে, দু-চোখে অজস্র ধারা। পরণে ভিজে ধুতি। টেনে তুলে তাকে নিয়ে এলাম হোস্টেলে।

সে-যুগে ভক্তিমূলক গান শুনলে তার চোখে বইত অঝোর অশ্রু। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে সকাল সন্ধ্যে শশীদা প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা করতেন। আমরা পাঁচ-ছ' জন কখনো বা দশ বারোজন উপস্থিত থাকতাম। আমাদের সুর-লয় থাক না থাক, একজন একজন ক'রে শশীদা আমাদের দিয়ে ভক্তি-মূলক গান গাওয়াতেন।

সেইদিনই বোধহয় সুভাষের প্রথম সকাল ওখানে। উঠতে বেশ দেরি হয়েছিল, আগের রাতের ট্রেনে বন্ধুরা দেরিতে আসবার দরুণ। ঘরের আধ-ভেজানো জানলা দিয়ে মিষ্টি রোদ এসে পড়েছিল সুভাষের গালে। সে গাইছিল স্বামী

বিবেকানন্দের গান, "চিন্তয় মম মানস হরি'। গণ্ড বেয়ে ঝরছিল অশ্রু। নূতন গলার সাড়া পেয়ে ছেলেরা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল এবং অপূর্ব সেই বদনের অধিকারীর পরিচয় জানবার জন্যে কৌতূহলী হ'য়ে ভীড় জমিয়েছিল।

সুরেশদার ব্যবস্থামতো যুগলদা ইংল্যাণ্ড চ'লে গেলেন। শিক্ষা শেষে তিনি কিন্তু বিয়ে ক'রে সেখানেই থেকে গেছেন। কার্লাইলে এখনো তিনি ডাক্তারী করছেন। দৌলতপুরে তাঁর স্থানে এলেন ডাঃ অমূল্য উকিল—যেমন কলেজের কাজে, তেমনি রাজনীতিতেও। সুরেশদার ধারণা ছিল ডাঃ উকিলও ওঁরই লোক বুঝি, কিন্তু আসলে যাদুগোপাল মুখার্জি, শ্রীরামপুরের ডাঃ আশুতোষ দাস প্রমুখ যুগান্তর দলের কর্মীরাই তাঁকে দল গড়তে পাঠিয়েছিলেন ওখানে।

অমূল্যদা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক 'মিশন'-এ হাত দিলেন। আমাদের কর্মসূচী বহুমুখী হ'য়ে উঠল। কলেজের দরিদ্র ভাণ্ডার নেহাত দরিদ্র অবস্থাতেই আমার হাতে তুলে দিলেন কর্তৃপক্ষ, সেই ভাণ্ডারের জন্যে টাকা তুলতাম স্থানীয় রেলস্টেশন এবং ষ্টীমারঘাটে কুলির কাজ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পন্থাতেই আমাদের সাহায্য করতেন। কলেজের মাঠগুলো তাঁরা আমাদের দিয়ে পরিষ্কার করাতেন, মাটি কাটিয়ে গর্ত বুঁজিয়ে সমান করাতেন, পারিশ্রমিক দিতেন। দেখতে দেখতে দরিদ্র ভাণ্ডারের আয় নব্বুই টাকা থেকে পাঁচশতে উঠল; কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীদের আমরা সেবা-শুশ্রূষা করতাম—শুধুমাত্র কলেজ হোষ্টেল গুলোতেই নয়, আশে-পাশের গ্রামগুলোতেও। শশাঙ্ক আর অরবিন্দের মতো বন্ধুরাও সে কাজে হাত লাগাত মাঝে মাঝে।

আরো গঠনমূলক সেবার একাধিক পন্থা অবিলম্বে দেখা দিল। আমরা তিনজন বন্ধু মিলে অসচ্ছল পরিবারের দুটি সহপাঠীর ব্যয়ভারের ঘাটতি পূরণ করতাম। কলেজের প্রতি হোস্টেলেই একটি করে দরিদ্র ছাত্রের খাই-খরচ চালানোর ব্যবস্থা ওখানে ছিল। দীর্ঘ একটি বন্ধের ভিতর একবার খবর এল যে আমাদেরই এক সহকর্মীর গ্রামের বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে; তার বাবা-মা তার জন্য মাসে দশ টাকার বেশি এখন থেকে আর পাঠাতে পারবেন না। আরেকটি বন্ধুকেও এ-কলেজ ছেড়ে দিয়ে অন্য-একটা কলেজে ভর্তি হ'তে হ'বে সেখানে সে জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনোর সুযোগ পাবে। কিন্তু তাকে আমরা দলছাড়া হ'তে দিতে চাইনে।

বন্ধের সময় সে-বার হোস্টেলে অমূল্য দা আর আমি মাত্র ছিলাম। ইতি মধ্যেই তিনি তাঁর সামান্য আয় থেকে প্রায় আদ্ধেক খরচ করছেন দলের কাজে, আর খরচ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ-হেন ক্ষেত্রে কী করা যায়, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন যা হোক একটা উপায় ভেবে বার কর। সেদিন রাতেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলশেভিক বিপ্লবের তখনো তিন বছর দেরি, তখনো আমরা কেউ সোশালিজম বা কমুনিজম শব্দটাও শুনিনি। অমূল্যদাকে বললাম: আমরা সব ক'জন বন্ধু এবং সহকর্মী মিলে একটা সুলভ বাসস্থান নিলে কিছু সুবিধা করা যেতে পারে। প্রত্যেকেরই অভিভাবকদের কাছ থেকে যা মাঝে মাঝে আসে একত্র করে তার থেকে কলেজের প্রাপ্য যা যা কেটে নিয়ে বাকি অর্থ দিয়েই আমাদের সব খরচ চালানো যায়! তাতে ক'রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া একটু সাদা-মাঠা হবে। হ'লেও কিছু এসে যাবে না! পরে বরং আমাদের মেসের লাগোয়া ক্ষেতে শাক-সব্জি ফলিয়ে খানিক উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাবে!

অমূল্যদা খুব খুশী হলেন। তিনি অধ্যাপক শরৎ ঘোষের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন। তিনি বন্ধ শেষ হবার আগেই ফিরে এলেন; করিৎ-কর্মা লোক তিনি, আমাদের জন্য খেজুর বাগান মেসটা তিনি খালি করিয়ে দিলেন—সেখানে আমরা কুড়িজন বিপ্লবী সহকর্মী সীট পেলাম। আমিই প্রথম মাসে

মেস পরিচালনার ভার নিলাম : ভালই চললো. সর্বোপরি আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর সোৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে ; তারা আত্মোৎসর্গের আদর্শে মন প্রাণ আগেই ঢেলে দিয়েছিল।

দৌলতপুর কলেজের আর একটা দিক ছিল, আজকের কম ছাত্রই যার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অনাড়ম্বর পল্লী-জীবনের প্রতিই ছিল তাঁদের অনুরাগ আটপৌরে কাপড়, সাধাসিধে খাওয়া-দাওয়াই ছিল তাঁদের সাধ্যের মধ্যে। কত ছাত্রই তো তখন খড়ম পায়ে ধুতির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে ক্লাসে আসত। কোনও অধ্যাপক তাতে কোনদিন বাদ সাধেননি।

এটা আমাদের পক্ষে কম সহায় ছিল না। আমাদের মেসে কয়েকটা ট্রাঙ্ক ছিল, বলতে গেলে যা আমাদের সকলের। তাতে কাচা কাপড়-চোপড় মজুত থাকত : যে যখন বাইরে যেত, সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বার ক'রে নিত।

গোটা ব্যবস্থাই সুরেশদা এবং তাঁর সহকর্মীদের—বিশেষত সুভাষের—কাছে যেমন চমৎকার লাগত, তেমনি প্রীত করত আর একজনকে, যাঁর কথা এবার আমি বলব।

বিরাট পুরুষ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর ভিতর দৌলতপুর কলেজে যাতায়াত শুরু করেছেন। তিনি তখন যশোর–ঝিনাইদা লাইট রেলওয়ে নির্মাণের কাজে ব্যস্ত। সন্ধার পর সাইকেল চ'ড়ে তিনি সচরাচর আসতেন, আবার ভোর হ'তেই চ'লে যেতেন। আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিলডিং হোস্টেল নিবাসী তাঁরই এক তরুণ অনুগামী আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায় ; এই বন্ধুটিও তখন আমাদের সঙ্গেই কাজ করত।

আমার সমস্ত অন্তর যেন যতীনদার মধ্যে খুঁজে পেল আমার বহু-বাঞ্ছিত নেতাকে। কিন্তু কচিৎ তাঁর মুখে রাজনীতির বা বিপ্লব সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা শুনেছি। আমার দৈহিক গঠন তাঁর পছন্দ হ'ল, সবে তখন আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি যে শরীরটা আমার বেশ মজবুত। গীতার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপনের কথাও আলোচনা করতেন। দৌলতপুরে আমার কাজ-কর্ম ও জীবন-ধারার খবর ও রাখতেন তিনি এবং এতে তাঁর সমর্থন ছিল ; তাঁর নির্দেশে যে দু-একটি বন্ধুকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছি, তারাও তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর এই নৈশ আগমন খুব ঘনঘন সম্ভব না হলেও আমাদের মনে-প্রাণে দিয়ে যেতেন অপূর্ব আনন্দের শিহরণ ; আমরা যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের। শশীদার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয় এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাও করতেন যতীনদা। শশীদার ঘরের সামনের খোলা বারান্দায় একমাত্র আমারই সৌভাগ্য হয়েছিল যতীনদার সঙ্গে একত্রে রাত কাটানোর—ক'টা মাত্র রাত, কিন্তু অবিস্মরণীয় !

এল ১৯১৪-১৮'র যুদ্ধ। যতীনদা তাঁর যশোরের ব্যবসার-পাট তুলে দিলেন। তার মধ্যে কিন্তু আরো ক'দিন তিনি দৌলতপুরে এলেন। আমাদের কাছে সম্ভাব্য এক অভ্যুত্থানের বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি, সতীশ সেনগুপ্ত, আশুতোষ দাস এবং সতীশ চক্রবর্তী। ফলে আমাদের কাজ যেমন ত্বরান্বিত তেমনি উত্তরোত্তর ব্যাপক হ'য়ে উঠল। যতীনদা তাঁর ব্যবসা তুলে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যতের ভার ঈশ্বর জানেন কার হাতে সঁপে দিয়ে বিপ্লবীদের পুরোভাগে যেদিন এগিয়ে এলেন, জেলায় জেলায় বিপ্লবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁর নাম মুখে মুখে শোনা যেতে লাগলো।

সুভাষ ও হেমন্ত, দু'জনেই আমায় ভালবাসত। মাঝে মাঝে আমায় ওরা ডাকতো কৃষ্ণনগরে ; সেখানকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ—বেণীমাধব দাস, হেম সরকার এবং রমেন্দ্র ঘোষ (শৈলেন ঘোষের দাদা), আমাদের কার্যকলাপের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। সে-যুগে বেণীবাবু সুপরিচিত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যেও।

কটকে তিনি বসু পরিবারের সবকটি ছেলেরই শিক্ষক ছিলেন, সে-বাড়িতে সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। প্রধানত এই ঋষি-তুল্য ব্যক্তিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুণই হেমন্ত অতগুলো সেরা ছাত্রকে দলে টানতে পেরেছিল। আমাদের প্রায়ই দেখা হত এবং আমাদের আলোচনা চলত ধর্ম ও রাজনীতি নিয়েই মূলত। সুভাষ সেখানে যেত কলকাতা থেকে, আমি দৌলতপুর থেকে। একবার সুভাষ আমার ওখানে বললো সাঁতার শিখিয়ে দিতে। খোড়ে নদীর অগভীর স্বচ্ছ জলে একদিনের চেষ্টাতেই সে মোটামুটি সাঁতার শিখে নিল।

সুভাষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল হেমন্ত। নতুন নতুন ভাবধারায় গজগজ করত হেমন্তের মাথা। তখন সে প্রচার করতে শুরু করেছে: বিপ্লবীদের নেতৃত্বপদে কারো অধিকার নেই, যদি না তিনি মুক্তপুরুষ হ'ন!

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা তিনজন খোড়ের ধারে বসে। অকস্মাৎ হেমন্ত আমায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা যতীন মুখার্জি কি মুক্তপুরুষ?"

আমি একটু চুপ করে রইলাম, একটু হেসে জবাব দিলাম, "আমি নিজেই তো জানিনে মুক্তপুরুষ কাকে বলে। তবে নিয়মিত গীতা পড়ি। আর নিজের জীবনে কাউকে যদি দেখে থাকি গীতার আদর্শকে মূর্ত করে তুলতে—সে একমাত্র যতীনদাকেই।" সুভাষ গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি বলে চললাম "বিভিন্ন বিপ্লবী দলের যত নেতাকে আমি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র যতীনদাই বিপ্লবীদের এত বছরের অন্তহীন পথ হাৎড়ানোর প্রয়াস উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন আলোর বন্যায়। তিনি বলেন যে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেন চরম আত্মদানের পথ দেখিয়েছে, এতোদিনে তাই সাড়া জেগেছে দেশ সুপ্ত জাতির ধমনীতে। আমরা এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করছি বর্তমানে। যদি সফল হই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দলে দলে উৎসর্গ করব আমাদের জীবন। পথ বেঁধে দেব এইভাবে। আমরা মরব, জাতি জাগবে, আর স্বাধীনতা আসবে তখনই যখন ধাক্কার পরে ধাক্কা খেয়ে আবর্তের পর আবর্তের সৃষ্টি হবে, আর তাতে সুপ্ত হয়ে উঠবে গোটা জাতির চেতনা। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতির সংগ্রামের ফলে আসবে স্বাধীনতা।"

আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়লো সুভাষ; সারা সন্ধ্যে আর একটি-মাত্র কথা শুনলাম না তার মুখে। সমসাময়িক আর দশটা সমস্যা নিয়ে হেমন্ত নানা আলোচনা চালাতে লাগল।*

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে আমি এরপর এসে ভর্তি হলাম থার্ড ইয়ারে। কিন্তু অনার্স ক্লাসগুলোর জন্যে আমায় যেতে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে, সেখানে ফিলসফি ক্লাসে সুভাষ আমার সহপাঠী। দর্শনে সুভাষের অত্যন্ত গভীর অনুরাগ। আমাদের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক পাতার পর পাতা মার্টিনোর "Natural Theologyর" মত সুরুহ-গ্রন্থ পড়ে চলছিলেন।

ক্লাসে আমাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। সুভাষ শুরু করলো দিনের পর দিন অজস্র প্রশ্ন করতে। অধ্যাপক বিরক্ত হলেও অবশেষে নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসতেন। ফলস্বরূপ,

---

* 'বিপ্লবে বিদ্রোহ' নিবন্ধে লেখক বলেছেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে যতীন্দ্রনাথ যখন জার্মানীর সাহায্য নিয়ে স্থানে স্থানে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র যুগান্তর দলে সবে যোগ দিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এবারে যুদ্ধ লাগবার সকল আয়োজন তিনি ইউরোপে থাকতেই দেখেন এবং এই পন্থাতেই অগ্রসর হবার সংকল্প করেন।..."

ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন, "প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদেশী শক্তির (জার্মানীর) সাহায্যে যেভাবে দেশ স্বাধীন করার কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৪১ সালে সুভাষবাবুও তাকে হুবহু অনুসরণ করলেন।..." (পৃঃ ৬০৪)—অনুবাদক।

ক্লাসটা তাঁর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল কতকটা। প্রতিটি পরীক্ষাতেই সুভাষ প্রথম হতে লাগল, আমি দ্বিতীয়। আমাদের দু'জনের আলোচনা রাজনীতির বেড়া ডিঙিয়ে দর্শনের প্রান্তরে এসে পড়ল। তার সঙ্গে কলেজে, তার এলগিন রোডের বাড়িতে, এবং সবচেয়ে বেশী হিন্দু হোস্টেলে আমার দেখা হত, এবং শেষের জায়গাটিতেই চলত আমাদের রাজনীতির চর্চা।

ওদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ব্যাপক এবং প্রবল হয়ে উঠল। আমরাও তাতে অংশ নিলাম। যতীনদা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। চারধার থেকে পুলিশ তৎপর হ'ল তাঁকে ধরতে।

সুরেশদার দলের মধ্যে অন্যরকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। হেমেনদার কণ্ঠে বর্ধমান অসন্তোষ: "কিসের অন্বেষণ করছি—আমরা?" সুরেশদার মুখে শুধু মাত্র অনির্দিষ্ট নেতিবাচক কয়েকটা আদর্শের কথা। যেমন ডাকাতি কোর না, বিয়ে কোর না! -কিন্তু কারণটা কি? অরবিন্দ মুখুজ্যের মুখে প্রকাশ্য বিপ্লবেরই প্রচার শোনা যাচ্ছে। বিধুর মুখেও। ১৯১৪ সালে উড়িষ্যার দশপাল্লা রাজ্যের খোণ্ড বিদ্রোহের পলাতক নেতা গোবিন্দ মিশ্র এবং আমাদের শশাঙ্ক—দুজনেই ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যোগেনদা এবং নৃপেন একটা অঘটনের গন্ধ পেয়ে আমার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলেন ত্রাসের চোখে। কিন্তু যোগেনদার সন্দেহ গভীরতর ছিল হেমন্তের প্রতি এবং ফলস্বরূপ সুভাষের বিদ্রোহের ভয়ও তাঁর মনে ছিল।

সুরেশদা কয়েক মাস কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে ফিরে এলেন। একদিন সন্ধ্যেবেলায় তিনি তাঁর তিন নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রীটের মেসে নিজেদের লোক অনেককে ডেকে বেদান্তের ওপর বক্তৃতা দিলেন। শেষ যখন হ'ল তখন বেশ রাত হয়েছে। সুভাষ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইল "সুরেশদা, বৈরাগ্য-শতকের একটা কপি কোথায় পেতে পারি?" উনি জবাব দিলেন, "গুরুদাসের দোকানে দেখ।" অমনি মেসের কার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে, তার সেই আটপৌরে শার্ট আর চটি প'রে সুভাষ ছুট্‌ল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। পরে শুনলাম, সেখান থেকে সারাটা পথ সে হেঁটে এলগিন রোডের বাড়িতে ফেরে, সারারাত জেগে বইটা প'ড়ে শেষ ক'রে সকালের দিকে ঘুমিয়ে নেয় একটু।

সুরেশদা ফিরে আসাতে তাঁর দলের আভ্যন্তরীন অবস্থা একটু ভালর দিকে গেল। যোগেনদার কিন্তু আর সইছিল না। সংগঠনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুরেশদার ডান-হাত। একটা কিছু ক'রে ফেলার জন্য তিনি তখন মরিয়া। হেমন্তের ওপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠলেন তিনি। ষড়যন্ত্রকারীদের পালের গোদা ব'লে অভিহিত করলেন তাকে। একদিন তাঁদের ২।১১ ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মেসে যেতেই ঘটলো নাটকীয় এক ব্যাপার। এই মেসটি আমাদের দৌলতপুরের খেজুরবাগান মেসের অনুকরণে গড়ে তুলেছিলেন ওঁরা। এটা উঠে যায় ৫৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে। একটা প্রতিনিধি স্থানীয় দল আমার কাছে এসে দাড়াল। বিধু ছিল, সুভাষ হেমন্ত, গোবিন্দ মিশ্র এবং আরো-ক'জন। অরবিন্দ মুখুজ্যে তাদের হ'য়ে মুখ খুলল। বলল, "ভূপেন, তোমায় বলা দরকার যে এখন থেকে আমরা আর সুরেশদার দলের নই, আমরা তোমার সঙ্গে একই দলে একযোগে কাজ করতে' চাই, একই আদর্শ নিয়ে।"

—এর কিছু আগেই হেমেনদা ওদের মেস ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন এবং ফরিদপুরের ইন্দু সরকারের সঙ্গে বৈঠক খানায় নতুন মেস খুলেছেন।

কিন্তু গোবিন্দ মিশ্র, হেমেনদা এবং শশাঙ্ক ছাড়া, এরা কেউই আসন্ন বিপ্লব অভ্যুত্থানের আয়োজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার আগেই ঘটে গেল ওটেন পর্ব, এবং প্রেসিডেন্সী

কলেজ থেকে সুভাষকে রাস্টীকেট করা হ'ল। সুভাষ কিন্তু নিজে আদৌ এই মারামারির মধ্যে সক্রিয় অংশ নেয় নাই, এ-কথা অনেকেই জানেন না। সে বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল বই-কি উক্ত অধ্যাপকের হাতে কমল বসুর নিগ্রহ দেখে, এবং উত্তেজিত হ'য়ে অনেককেই ওটেনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। সে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের বারান্দায় এমন ছোটাছুটি করছিল যে বিধু ওকে ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে বসিয়ে রেখে দিল। সমস্ত মারপিটটাই দলের অন্যেরা করে। গোটা হোস্টেলই তখন আমাদের দলের ছেলেতে এবং সমর্থকে ভর্তি। এর বেশ কিছু আগেই যতীনদা এবং শশীদা এবং অতুলদা (ঘোষ) নিয়মিত এ হোস্টেলে যাতায়াত করতে লেগেছেন এবং সতীশ চক্রবর্তী ও শৈলেন ঘোষ ছিলেন হোস্টেলবাসীদের মধ্যে সক্রিয় রূপে বিপ্লবের কর্মে রত।

সুভাষ চ'লে গেল কটকে। আমি গুপ্ত সমিতির কাজে গা ঢাকা দিলাম। তারপর ১৯১৮ সালে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে বসে কাগজে দেখলাম যে সুভাষ স্কটিস-চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পাশ ক'রে আই সি-এস পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। ১৯২০ সালের শেষে আমি যখন প্রথম বারে খালাস পেলাম, সে তখন কেম্ব্রিজে র‍্যাংলার হ'বে ব'লে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমরা যারা ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুযায়ী যুদ্ধ-বিরতির পরেও দু-বছর বন্দী ছিলাম, তাঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় নেতারা—হরিকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত—আমার আগেই ছাড়া পেয়ে এসেছেন। তাঁরা আমায় বললেন নাগপুর গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর কর্মসূচীর ব্যাখ্যা তাঁরই মুখ থেকে জেনে আসতে। আমি যদি গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝি যে তাঁর প্রোগ্রামের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আছে, তা হ'লে তাঁরা সবাই কংগ্রেসে যোগ দেবেন এবং জেলায় জেলায় গিয়ে কাজে হাত দেবেন—যে কাজের জন্যে সেদিন গুরুতর চাপ আসছিল আমাদের প্রত্যেকেরই উপর—অসহযোগী ছাত্র, শিক্ষক, আইন-জীবী এবং অন্যান্যদের তরফ থেকে আমার দ্ব্যর্থহীন প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বললেন যে দেশবাসী যদি তাঁর কর্মসূচী মেনে নেয় তবে তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট ব'লে ঘোষণা করবেন। আমি তাঁকে তখন কথা দিই, "আমরা বিশ্বাস করি না যে এর ফলে স্বাধীনতা অবিলম্বেই আসবে অদূর ভবিষ্যতে অস্ত্রের প্রয়োজন আসতে বাধ্য।* কিন্তু আপনার এই পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা আন্দোলনটা একটা বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করবে, অতএব আমরা অসংকোচে আপনার পাশে থাকছি। সামনের একটা বছর আমাদের পুরণো কর্মসূচী স্থগিত রাখছি আমরা।"

আমার কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত জেনে বন্ধুরা ছড়িয়ে পড়লেন জেলায় জেলায়।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতায় তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একদিন আমরা সবাই দুপুরবেলা দেশবন্ধুর বাড়িতে খাচ্ছি। দেশবন্ধুর পাশেই হেমন্ত, তার পাশে আমি, আমার পার্শ্বে অরবিন্দ মুখুজ্যে। সমসাময়িক পরিস্থিতির জটিল সমস্যাগুলোর কথা ভেবে দেশবন্ধুর মুখ চিন্তাকুল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, বঙ্গীয় সব বিদ্যায়তন ** এর ভার কে নিতে পারে?"

---

* লেখককে শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে বলেছিলেন,—"I don't want you to make a fetish of non-voilence, গান্ধী এসেছেন এক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তিনি। দেশকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু স্বাধীন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমি করি না। তোমরা নিজেদের অসিয়ে দিও না। ভবিষ্যতে আবার তোমাদের পথেই আয়োজন করতে হ'বে।" তার সাক্ষ্য দেয় চট্টগ্রাম, সাক্ষ্য দেয় কোহিমা। অনুবাদক।

** তিনি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন।

আমি ধীরে হেমন্তকে বললাম, "সুভাষ হ'লে কেমন হয়?"

আমার কথার জবাব না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে দেশবন্ধুকে ব'লে উঠল, "সুভাষকে ডেকে পাঠান।"

"কে সুভাষ?" দেশবন্ধু জিগ্যেস করলেন

"ওটেনকে মারবার অপরাধে যাকে রাস্টিকেট করা হয়েছিল।" হেমন্ত জবাব দিল।

"মানে, জানকীবাবুর ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা দেখি।"

কয়েক মাস পরের কথা আমি তখন ভবানীপুরে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই সহকর্মী কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষের সেবা-শুশ্রূষা করছি, তারা যক্ষায় ভুগছে। অরবিন্দ খবর পাঠাল: "সুভাষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

হেমন্তের বইয়ের দোকান ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাবে আমাদের দেখা হ'ল। সামান্য কিছু কথাবার্তার পর সুভাষ আসল প্রসঙ্গ পাড়ল বোম্বাই: পৌঁছেই সে দু'দিন গান্ধীজীর কাছে কাটায়; তারপর কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। দেশবন্ধুই দ্বিতীয় সর্বভারতীয় নেতা, তার মতে; কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। তারপর সে অন্যদের সঙ্গেও আলাপ করেছে। "কিন্তু চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে, সুভাষ বলল, "আমার মনে হল তোমার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। তাই খবর পাঠিয়েছিলাম। আমি কংগ্রেসে ঢুকতে এবং তার কাজ করতে চাই।"

"আমি ও তো গান্ধীজীকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়ে এসেছি নাগপুরে।"

"না, আমি একটু প্রভেদ রাখছি। দলে আমি এখনই যোগ দিচ্ছি না।"

"কিন্তু দলই তো নেই এখন। আমরা তো দলের কথা না ভেবে এখন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছি।"

"ভালই হ'ল তবে।"

ক'দিন বাদে মনোরঞ্জন দা (গুপ্ত) আমায় বললেন মধু দার (সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের) সঙ্গে সুভাষের আলাপ করিয়ে দিতে। এদেশে সেদিন মধুদার মতো প্রভাবশালী কংগ্রেস কর্মী (সত্যিকার অর্থে কর্মী) ছিল বিরল। দু'জনেই দু'জনকে পেয়ে মুগ্ধ হ'লেন। তাঁদের অন্তরঙ্গতা কিন্তু ঘনীভূত হ'ল উত্তর বাংলার বন্যার এবং ১৯২৪ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ব্যাপারে।—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় আমরা দ্বিতীয় বার জেলে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যখন বিভিন্ন জেলায় স্বরাজ্য দল সংগঠিত করছি, সেই সময় আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের গ্রেপ্তারের পর স্বরাজ্য দল গঠনের সর্বৈব দায়িত্ব সুভাষের উপর ন্যস্ত থাকাতে সে মধুদা, হরিদা এবং অমর ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেক জেলার কর্মীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু তার কিছু কাল আগে, সুভাষ তখনো জেলে, দেশবন্ধু ও, ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের একটা বৈঠক বসে।* আমি ছিলাম আহ্বায়ক গান্ধীজীকে প্রতিশ্রুত একটা বছর তার ঢের আগেই উৎরে গিয়েছে। চৌরি চৌরার ঘটনাও ঘটেছে। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তখন যুগান্তর দলকে পুনঃসংগঠিত করবার সঙ্কল্প নিলাম আমরা। স্থির করা হ'ল যে অস্ত্র আবার সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু ব্যবহার করা হবে না এখনো।

---

* উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন রায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, ডাঃ আশুতোষ দাস, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস ভূপতি মজুমদার মনো রঞ্জন গুপ্ত, জীবন লাল চট্টোপাধ্যায়, সূর্য সেন এবং লেখক। অসহযোগ আন্দোলনে এঁরা সবাই নেমেছিলেন।—অনুবাদক।

কিন্তু দলের সত্যিকার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় ১৯২৪ সালে, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সুযোগ নিয়ে; এই সত্যাগ্রহে নায়কের ভূমিকায় সুভাষও ছিল। এই হ'ল হেতু যার জন্যে সুভাষকে অল্প দিন বাদেই গ্রেপ্তার করে শুরুতে প্রথম বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুযায়ী, তারপর ১৮১৮ সালে তিন আইনে।

সুভাষ মুক্তি পাবার কিছু পরেই দল থেকে তাকে মনোনীত করা হল—কলকাতায় ১৯২৮ সালের আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর G. O. C. পদে। অভ্যর্থনা সমিতিও তাঁকেই নির্বাচিত করে ঐ পদে। তেমনি মনোরঞ্জন গুপ্তকে দেওয়া হল প্রদর্শনীর ভার, আর ভূপতি মজুমদারকে মূল কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ইউথ কংগ্রেসের ভার। দলের অন্যান্য নেতৃস্থানীয়রা বিভিন্ন দিকের দায়িত্ব নিলেন। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সাধারণ দায়িত্ব ছিল আমার। এই সংগঠনের সাহায্যে আমাদের দল চেয়েছিল দেশব্যাপী একটা স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সূচনা করতে। সুভাষের ব্যক্তিত্ব এই কাজের অনুকূল হয়েছিল অপরিমেয়-রূপে; কিন্তু অপ্রত্যাশিত বদল না তাকে। সেই থেকে সুভাষ এবং তার দাদা শরৎ বোস যুগান্তর দলের পরবর্তী কার্যক্রম সফল ক'রে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন—যে কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৩০ সালের চমকপ্রদ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে।

কিন্তু এসব প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের আওতার বাহিরে •

• [দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত Netaji Exhibition এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত Netaji Souvenir সংখ্যার "In College Days" প্রবন্ধের অনুবাদ।]

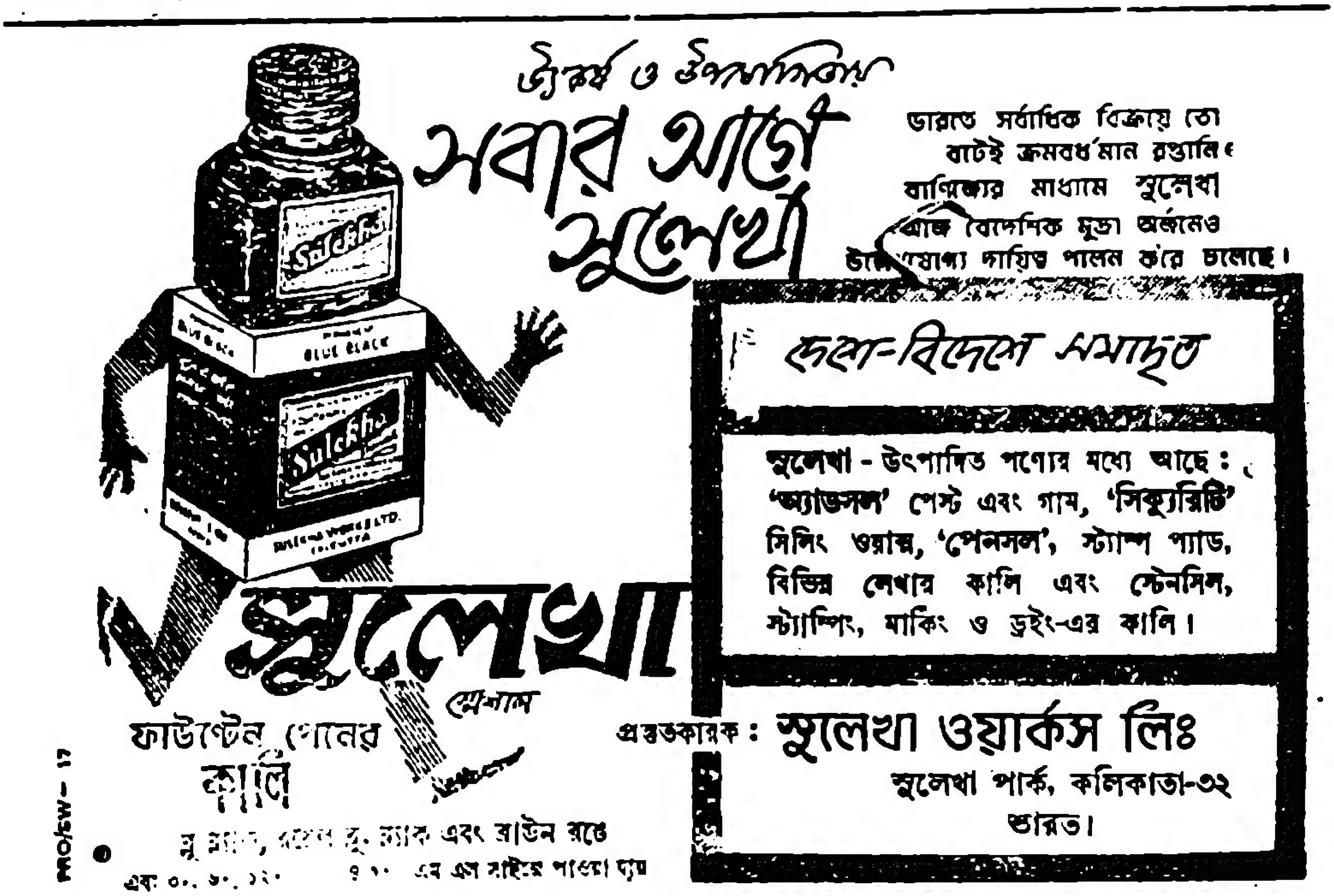

(৭২০ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায়

not to sympathize with this attitude I would gladly ask for a postponement of Swaraj activity if thereby we advance the interest of the Khilafat…"

যে খিলাফৎ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্যানইসলামিসিম্ বা বিশ্ব-মুস্লিম-ভ্রাতৃত্ব এবং যে সম্পর্কে একসময়ে গান্ধীজীর 'প্রিয় ভ্রাতা' মহম্মদ আলি ঘোষণা করতে ইতস্তত: করেননি যে আফগানিস্তান ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে তিনি আফগান শক্তির সহিত কেবলমাত্র যোগ দিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন না ভারতের হিন্দুরা যদি তাতে সাহায্য করতে রাজী না হয় তা হোলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাদের সেরূপ করতে বাধ্য করবেন—"জাতির জনক" মহাত্মা গান্ধী এই মনোভাবকে শুধু স্বাগতই জানাননি সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন! —তাঁর নিম্নলিখিত অবিশ্বাস্য উক্তিই তার প্রমাণ—

আফগানিস্তানের আমীর যদি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তবে তিনি আমীরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন। ভারতীয় জাতীয়তা নয়,—মুস্লিম জাতীয়তাকেই এর দ্বারা গান্ধীজী সমর্থন জানিয়েছেন বল্লে ভুল হবে না। বিদেশী শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা-লাভে বদ্ধপরিকর জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য কি এই ছিল? মহাত্মা গান্ধীর অগণিত অন্ধভক্তেরা এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। **স্বদেশ-প্রেম, ভারতীয় জাতীয়তা, এমন কি, ভারতবর্ষকেও উৎসর্গ করতে গান্ধিজী দ্বিধা করেন নি, মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য, অথচ এই মনোভাবের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন ভারতীয় ব্যতীত আর কেউ প্রকাশ্যে** নিন্দা অথবা বিরুদ্ধাচারণ করেননি—তাঁদের একজন শ্রীশঙ্করণ নায়ার আর একজন ডা: আম্বেদকার। শ্রীপট্টভি সীতারামিয়া গান্ধীজীর অতি বিশ্বস্ত অনুগামীও এই মনোভাবকে স্বীকার করতে পারেন নি। এবং পরোক্ষে হলেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন:

"Gandhiji's plan have all along been revealed to him by his own instinct, not evolved by the cold calculating logic of the mind. His inner voice is his mentor and monitor.…he saw things as if by a flash and framed his conduct by impulse."

কিন্তু একটা বিশাল জাতি তার স্বাধীনতা সংগ্রাম যে এই কষ্টিপাথরে বিচার করতে পারে না, তাকে বিশ্লেষণ বিচার করতে ও যুক্তিনির্ভর পথে চলতে হয়, তা গান্ধিজীর অনুগামীরা কখনো স্বীকার করেছেন বলে জানিনা। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা আনুগত্য কি জাতীয় স্বার্থের অপেক্ষাও বড়? ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় ভারতীয় "জাতির জনক" বলে অভিহিত গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার কারণ ভারতের মুক্তি নয় ভারতীয় মুস্লিমদের সন্তুষ্ট করা—তাঁর নিজের ভাষায় 'placate' করবার উপায় স্বরূপ। গান্ধিজীর একটা উক্তি এই সম্পর্কে উদ্ধৃতির যোগ্য:

"It provided such an opportunity of uniting Hindus and Mahammadans as would not arise in a hundred years."

পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে এই হিন্দু-মুস্লীম ঐক্যের ভিত্তি ছিল কত কৃত্রিম। বাস্তব ঘটনার-ঘাত প্রতিঘাতে তাসের ঘরের মতই এ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমনি গান্ধিজীর প্রভাবের মাহাত্ম্য (!) যে মালাবারে হিন্দুদের উপর মোপলাদের জঘন্যতম অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দুদের বিরুদ্ধতার কণ্ঠরোধ গান্ধিজী ও হিন্দু নেতারা করেছিলেন। এই অবাস্তব ও অস্বাভাবিক

মনোভাব ভারতের পরবর্তী ইতিহাসকে এক অভিশপ্ত পথে চালিত করেছে বল্লে নিশ্চয়ই ভুল হবে না।

সত্যের পূজারি গান্ধিজী খিলাফৎ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের কৃত্রিম বুনিয়াদ গঠনে কি কারণে বিশ্বাসী ছিলেন তা বোঝা দুষ্কর। তথ্য ও তারিখ উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে যে দুইটী প্রধান হাতিয়ারের সাফল্য সম্পর্কে সুউচ্চ দাবী জানান হয় তার প্রথমটী অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন ১লা আগষ্ট ১৯২০ সনে গান্ধিজী সুরু করেন প্রধানতঃ খিলাফৎ ও মুসলমানদের অসন্তোষ দূর করবার জন্য, পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং স্বরাজ লাভ পরবর্তী কালে প্রধান লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয় মাত্র। বিস্ময়ের বিষয় কংগ্রেসের অফিসিয়াল ইতিহাস এবং ১৯২২ সনে কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটি এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। এই পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তিলকের মনোভাবের উল্লেখ না করলে পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। সমসাময়িক অনেকের বিশ্বাস ১৯২০শের কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর মৃত্যু না হলে—অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হোত কি না সন্দেহ। তিলক অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি responsive cooperation বা পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণের অনুকূলে ছিলেন। এ কথার উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে ভারতের স্বাধীনতা একটীমাত্র নেতৃত্ব বা পন্থানুসরণের ফল নয় বিভিন্ন দেশপ্রেমিকের একাধিক ধারা এর পশ্চাতে নিঃসন্দেহ ছিল। প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতে আগমন উপলক্ষে যে হরতালের আয়োজন করা হয় এবং যে হরতাল কলকাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হয় তা সংগঠনের ভার ছিল আই সি এস পরিত্যাগকারী তরুণ সুভাষচন্দ্র বসুর উপর। স্টেটস্‌মেন ও ইংলিশম্যান দুটী ইংরেজী ও ইংরেজ পরিচালিত দৈনিক মন্তব্য করতে বাধ্য হয় যে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা কলকাতা নগরী দখল করেছে এবং সরকার গদি পরিত্যাগ করেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য সরকারকে আহ্বান করে। এরপর সরকারী নির্যাতন ও উভয়পক্ষের শক্তিপরীক্ষা সুরু হয়। কলকাতায় এই আন্দোলনে প্রথম প্রথম আশানুরূপ স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেয়নি কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস জনতার মনোভাব বুঝে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিজের একমাত্র পুত্র ও স্ত্রীকে বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করবার জন্য পাঠাবার ও বাসন্তী-দেবীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক নাম লেখাবার জন্য ভিড় করতে লাগলো এবং সমস্ত নগরীতে এত প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল যে মধ্যরাত্রে বাসন্তীদেবীর মুক্তির আদেশ দিতে সরকার বাধ্য হন এবং ভুলক্রমে বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মুখরক্ষা করবার চেষ্টা করেন। স্থায়ী কারাগার ভর্তি হয়ে অস্থায়ী শিবিরগুলিও ভর্তি হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে। বৃটিশের কারাগারের ভয়ও বিভীষিকা আর রইলোনা বরং কারাবরণ সম্মানজনক বলে লোকে মনে করতে আরম্ভ করলো। এই সময়কার সরকারী পীড়ননীতি ও জনতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু লেখেন।

এত বেশী সংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হতে লাগলো যে জেলের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো এবং বহুসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হোলো। কখনো আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অথবা স্থানান্তরে পাঠাবার অছিলায় বন্দীদের জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো ও জোর করে তাদের জেল থেকে বের করে দিয়ে মুক্তি দেয়া হোল। এই কৌশল প্রকাশ পাওয়া মাত্র কোনো বন্দী আর তার সেল পরিত্যাগ করে জেল কর্মচারিরা ডাকা সত্ত্বেও অফিসে যেতে রাজী হোলো না, ফলে বল প্রয়োগ করে তাদের জেল গেটে নেবার ও মুক্তি দেবার প্রয়োজন হোলো। সরকার পক্ষ তাদের

কৌশল পরিবর্তন করলো। বেধড়ক লাঠি ও বেটন ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী আদেশ জারী করা হোলো এবং আইন অমান্যকারীদের বন্দী করে ভ্যানে ভরে সহর থেকে ২০ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরবার জন্য ছেড়ে দেয়া হতে লাগলো। কখনো কখনো শীতের রাত্রে জলের হোস দিয়ে বিনা মূল্যে শীতল স্নানের ব্যবস্থাও করা হোল।

পরবর্তী কালেও এই বিশেষ ধরণগুলি অনুসরণ করা হোতে থাকলো। এমন কি বিদেশীদের নিকট থেকে স্বদেশী সরকারও এই প্রক্রিয়াগুলি শিখে আজ পর্যন্ত ব্যবহার করে চলেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন সরকার এই আন্দোলনের জাতীয় প্রকৃতি বুঝতে পারেননি এবং মূল কারণ দূর না করে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন ফলে আন্দোলনের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেল। অত্যাচার দিয়ে জাতীয় আকাঙ্খাকে কখনোই বন্ধ করা যায় না যুগে যুগে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। কোনো সরকারই সে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। বিশিষ্ট নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ যে নরমপন্থীরা এতদিন সরকারকে সমর্থন করে আসছিলেন তাঁরাও ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হলেন।

১৯২১শের ডিসেম্বর আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অনুষ্ঠান, নির্বাচিত সভাপতি সি আর দাস জেলে, কিন্তু তাঁর লিখিত সভাপতির ভাষণ পূর্বেই ছাপা ও বিলি হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগের অর্থ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন অসহযোগ আন্দোলন নেতিবাচক নয় বরং :

"We break in order to build, we destroy in order to construct ; we reject in order to accept" এই আন্দোলনের সময় বম্বেতে যে সংঘর্ষ হয় সে কথা উল্লেখ করে বলেন "bloodshed & disorder have been associated with every great movement, the fact that disturbances have taken place is no argument against the essential truth of our movement. We must device means to prevent the recurrence of these disturbances ; but I cannot & will not advise you to stay your hand from the non-cooperatim movement" কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল গান্ধিজীর নীতি ও কার্যক্রম। বর্দোলীতে গণ আইন অমান্য আন্দোলন অভিযান শুরু করবার সিদ্ধান্ত বড়লাটকে গান্ধিজী ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২ তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিতে জানান, যার উত্তরে ৬ই ফেব্রুয়ারী একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকার পক্ষ উত্তর দেন '৪ঠা ফেব্রুয়ারি গণ আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত গান্ধিজীর ঘোষণা ভ্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ এবং সরকার ও জনসাধারণের সামনে দুটী বিকল্প অবস্থা দেখা দিয়েছে, যথা আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা অথবা সভ্য সরকারকে চালু রাখা। সরকার দৃঢ়তাও সর্বশক্তিদ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। ভারত সরকার নগন্যসংখ্যক অনুগত নাগরিকদের সাহায্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করেননি নির্ভর করেছিলেন প্রধানতঃ সৈন্য ও পুলিসের উপর। কংগ্রেস ও সরকার উভয় পক্ষ শক্তি পরীক্ষার জন্য চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তুত হতে লাগলেন—সরকার অত্যাচারের সর্ব প্রকার আয়োজন চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হোলো সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সর্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেও হাসিমুখে কারাগারে যেতে লাগলো। সমস্ত ভারতের দৃষ্টি বর্দোলির উপর নিবদ্ধ হোলো। আন্দোলনের নেতৃত্ব করার জন্য স্বয়ং গান্ধিজী বর্দোলি গেলেন এবং আন্দোলন সুরু করা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রতিটি সর্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রয়োগ করা হোলো। ৩০শে জানুয়ারি একটা বিরাট সভায় ৪০০০ খদ্দর পরিহিত পুরুষ ও ৫০০ মহিলা প্রতিনিধি—গান্ধিজী ও বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গণ আন্দোলন সুরু করবার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। গান্ধিজী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখলেন "Bordoli has come to a momentous decision. It has made its final & irrovocable choice." কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বপ্রকার আইন অমান্য অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে বিরত থেকে বর্দোলির জনতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আহ্বান করলেন। সমস্ত ভারত তীব্র উদ্দীপনা ও গভীর উদ্বেগের সহিত জয়ের আশায় ও সম্ভাব্য পরাজয়ের শোচনীয় গ্লানির আশঙ্কায় রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো। গ্রন্থকার লিখেছেন কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে কেউ হয়তো পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে অনুমানও করতে পারেনি, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি-মুহূর্ত এত আয়োজন ও উদ্দীপনার মধ্যে সুরু হয়েছে সেই বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট মুহূর্তে সংগ্রাম সুরু হবার পূর্বেই চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ হোল গোরক্ষপুরের নিকটে চৌরি চৌরা নামে একটী ছোট গ্রামে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ২২ জন পুলিশ নিহত হয়। ফলে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসের এনকোয়ারি কমিটি পরবর্তী কালে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "সমগ্র দেশ পাশব-শক্তির উপর আত্মিক শক্তির শেষ জয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।" ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি বর্দোলিতে মিলিত হয়ে আইন অমান্য বা গ্রেপ্তার বরণ এবং সে উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মিছিল, সভা, সমিতি ও সর্বপ্রকার কাজ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকে এই ভাবে নিষিদ্ধ করার সংবাদ সমস্ত ভারতবর্ষকে বজ্রাহত করলো। এরপর সমগ্র দেশের রুদ্ধ আবেগ ও উত্তেজনা অবাঞ্ছিত পথে চালিত হোলো এবং একদিকে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেশকে আচ্ছন্ন করলো। সুভাষচন্দ্র বসু তখন দেশবন্ধুর সহিত এক জেলে কারারুদ্ধ, তিনি এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "The Dictator's decree was obeyed at the time…but no one could understand why Mahatma should have used the isolated incident at Chaura Chaura for strangling the movement all over the country. To sound the order of retreat just when public enthusisum was reaching the boiling point was nothing short of a national calamity. Deshabandhu was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling."

জওহর লাল নেহেরু জেল থেকে লেখেন "The sudden suspension of our movement after Chauri Chaura incident was resented I think by all the Congress leaders—other than Gandhiji of course…Chauri Chaura may have been and was deplorable…but were a remote village and a mob of excited peasants in a out-of the-way place going to put an end for sometime atleast to our national movement?....then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non-violent struggle....must we train the three hundred odd millions of India in the theory & practice of non-violent action before we could go forward?…If this was the sole condition of its function, then the non-violent method of resistance would always fail."

বিদেশী সাংবাদিক Louis Fischer দীর্ঘদিন পর এ

সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যথার্থই মন্তব্য করেছেন "At a word from Gandhi India would have risen in revolt. That word was not said instead all the enthusiatic sacrificing efforts were wasted or thrown away at the doctrine of non-violence."

বর্দোলীর আইন অমান্য সংগ্রামের বিপুল প্রস্তুতি, সমগ্র দেশের অভূতপূর্ব গণ সমর্থন ও উত্তেজনা, বর্দোলী হতে বহু দূরে সুদূর চৌরি-চৌরা গ্রামে জনতা ও পুলিশের শোচনীয় সংঘর্ষ এবং তার ফলে ২২ জন পুলিশ নিহত, কংগ্রেস নেতা অথবা প্রতিনিধিদের মতামত না নিয়েই আন্দোলন স্থগিত করে দেয়া—এই সমস্ত ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটী শোচনীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ যা পরবর্তী মুক্তি সংগ্রামকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করেছিল। গ্রন্থকার প্রচুর তথ্য, বিশিষ্ট নেতাদের উক্তি, নিরপেক্ষ মতামত উদ্ধৃত করে ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করেছেন গুরুতর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বহু পরিমাণে পশ্চাদগামী করেছিল—গান্ধিজীকে এই দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া যায় না।" এই মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। ভবিষ্যতের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্বার্থহীন বিচার বিশ্লেষণে এই মন্তব্যের সহিত সহমত হবেন এ সম্বন্ধে আমাদের সংশয়মাত্র নেই।

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের লাভ ক্ষতি ফলাফল বিচার করতে গিয়ে দু একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। যথা মোপলা বিদ্রোহ। মালাবার তীরে আরব বংশোদ্ভূত দরিদ্র, নিরক্ষর প্রায় ২০ হাজার হিন্দুদের প্রতিবেশী এক উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রায় হাজার দশেক মোপলা নামে এক মুস্লিম উপজাতি বাস করতো। ১৯২১ সনের উত্তেজনার মাস গুলিতে, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্তেজক বক্তৃতা, অবিলম্বে স্বরাজ লাভের অর্থ-এদের নিকট ইসলাম রাজত্বের সূচনা বলে ঘোষিত হোলো এবং নানা হিংসাত্মক কাজে এরা হাত দিল। বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয়ানরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হোলো। যারা পারলোনা তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হোল। কিন্তু মোপলাদের প্রধান অত্যাচার ও আক্রমণ সরকারকে নয়, হতভাগ্য সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সহ্য করতে হোলো। এই বিদ্রোহের শেষ অঙ্কে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটলো। ১৯২১-সের ১৯শে নভেম্বর ৭০ জন মোপলা বন্দীদের একটী দলকে স্থানান্তরিত করবার সময় গার্ডদের উদাসীনতায় রুদ্ধ গাড়ীতে বাতাস চলাচলের অভাবে শ্বাসরোধ হয়ে ৭০ জনেরই মৃত্যু হোল। এই শোচনীয় ঘটনা একদিকে শাসকদের অধীনস্থ পুলিশ ও অন্যান্য অফিসারদের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, অপর পক্ষে গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা হিন্দুদের উপর মোপলাদের নৃশংস অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অন্ধ হয়ে রইলেন।

অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়ও গান্ধীজীর মত নৈতিকতাবাদী সত্যাশ্রয়ী নেতার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য—যে তিনি হিন্দুদের উপর মোপলাদের অত্যাচারের গুরুত্বকে যথাসাধ্য লাঘব করবার চেষ্টাই শুধু করেননি "সাহসী মোপলাদের" অভিনন্দিত করেছিলেন। হিন্দু মুস্লিম ঐক্যের কৃত্রিম বুনিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য, হিন্দুদের দুঃখ কষ্ট অসম্মান সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন ছিলেন এ. অপবাদ না দিয়েও বৃহত্তর স্বার্থে হিন্দুদের এসব গলাধঃকরণ করবার প্রয়োজনীতায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। এই ভ্রান্ত নীতির উত্তরাধিকার আজকের অল্প-মাপের নেতারা পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছেন. যাকে সত্যাগ্রহ, সত্যাচরণ, অহিংসা, মানবতা বা উদারতা কোনো আখ্যাই দেয়া যায়না ; একমাত্র বলা যায় অদূরদর্শী, অবাস্তব ও পক্ষপাতদুষ্ট. এবং জাতীয় নীতি হিসাবে অনুসরণের সর্বপ্রকারে অযোগ্য। এই সব ভ্রান্ত ও অবাস্তব নীতি অনুসরণের মাশুল জাতি দিয়েছে

দেশবিভাগ ও পরবর্তী কালের ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঘটনাবলীর দ্বারা।

বর্দোলির পশ্চাদপসরণের পরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্যে আলিপুর জেলে বন্দী থাকাকালীন আইন সভাগুলির অভ্যন্তরে অসহযোগের নীতি সি আর দাসের চিন্তায় আসে এবং ১৯২২ এর মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভানেত্রীর ভাষণে বাসন্তী দেবী এই প্রস্তাব উত্থাপন করার পর তর্কের ঝড় ওঠে এবং ২৬শে ডিসেম্বর গয়াতে সি আর দাস কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জোরালো আবেদন করেন "These councils must be either mended or ended···hither-to we have succeded in doing much···the country knows that the people who adorn these chambers are not the true representatives of the people···but the councils are still there. It should be the duty of the Congress to boycott the councils more effectively from within. Reformed councils are really a mask which the Bureaucracy has put on." এবং ঐ মুখোস খুলে ফেলা কংগ্রেসের কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রীরাজগোপালাচারির আইন সভা প্রবেশের বিরুদ্ধ প্রস্তাব অধিকতর ভোটে পাশ হয় এবং নো চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার এই দুই দলে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যায়। নির্বাচিত সভাপতি পদত্যাগ করে বলেন' তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করছেন না এই ভরসায় যে অনতিকাল মধ্যে সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগুরুতে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রো-চেঞ্জারেরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্য দল নামে দল গঠন করলেন। সি আর দাস দলের নেতা এবং আর তিনজন সহ মতিলাল নেহেরু সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করলেন। হাকিম আজমল খান, ভি. জে. প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, সত্যমূর্তি এবং জয়কার এ দলে যোগ দিলেন। এরপর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন পারস্পরিক দোষারোপ সত্ত্বেও স্বরাজ্য দলের সংগঠন উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগলো এবং গয়াতে কাউন্সিল প্রবেশ নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে বাতিল হয়ে গেল। গ্রন্থকার সি, আর, দাস ও মতিলাল নেহেরুর দৃঢ়তা ও কর্মশক্তির সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। ১৯২৪ এর প্রথমে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন কিন্তু রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে সুতাকাটা, জাতিভেদ দূর ও হরিজনদের উন্নয়ন ও হিন্দুমুস্লীম ঐক্য স্থাপনের ত্রিমুখী গঠনমূলক কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করলেন। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন হিন্দু সমাজ থেকে জাতিভেদরূপ কলঙ্ক দূর করবার চেষ্টা একক ভাবে এত অধিক আর কোনো ব্যক্তি করেন নি এবং এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সত্য। জাতিভেদ প্রথা দূর করবার কাজে প্রভূত অগ্রগতি হোলো। কিন্তু হিন্দুমুস্লিম ঐক্য প্রচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোলো এবং বার বার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিল।

১৯২১ ২৮ এর রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন রিফর্মস্ ভারতীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নরমপন্থীরাও বিরুদ্ধ জনমত ও ব্যুরোক্রেসীর বিরুদ্ধাচরণের জন্য কিছুমাত্র সফলতা লাভ করতে পারলেন না অন্যদিকে পার্লামেন্টে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন "Britain will in no circumstances relinquish the responsibility to India That the British Civil Service must remain as the steel frame on which the whole structure of British administration in India must rest forever."

নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের বিস্ময়কর সাফল্য হোলো। সর্বত্র সুপরিচিত নরমপন্থীরা পরাজিত হলেন। জাতীয়তাবাদীরা সর্বত্র অধিক পরিমাণে নির্বাচিত হোলো। নরমপন্থীরা

ভারতীয় রাজনীতি থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪শে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সরকারী প্রস্তাবের, উপর মতিলাল নেহেরুর একটী সংশোধিত প্রস্তাব অধিক ভোটে গৃহীত হল। সম্মিলিত স্বরাজ্য ও জাতীয়তাবাদীদের এই প্রথম ঐতিহাসিক জয়ের পর আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সম্মিলিত স্বরাজ্য দলের জয়ী হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণর জেনারেল পরাজিত বিলগুলিকে সার্টিফিকেট দ্বারা পাশ করে চল্লেন। এই সব ঘটনা দেশবাসীর চোখে আইনসভাগুলির স্বরূপ খুলে দিল। ১৯২৫ শের কানপুর কংগ্রেসের আইনসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৬শের ১লা মার্চ আইনসভা থেকে সদলে মতিলাল নেহেরু বেরিয়ে এলেন, বলে গেলেন "There is no more use of us here · we have no further use for these sham institutions···we hope and trust that the nation will give a suitable reply to the truculent rejection of our demands." স্বরাজ্য দল চলে যাবার পর স্বরাজ্যদলের সহিত সহযোগিতা না করার দরুণ মিঃ জিন্না সরকারের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে উথাপন করলেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাব সমর্থনের অভাবে পরাজিত হোলো।

গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন আইন সভায় স্বরাজ্য দলের ভূমিকা দেশের প্রভূত উপকার করেছিল—এই প্রথম কেন্দ্রীয় আইন সভা যথার্থ জাতীয় সভার রূপ ধারণ করলো। জাতীয় অভিযোগসমূহ, জাতীয় আশা আকাঙ্খা বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত হোল এবং বৃটিশের নির্মম শাসনের মুখোশ সম্পূর্ণভাবে খুলে গেল। তিনি মন্তব্য করেছেন স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বহুপরিমাণে সফল হোলো।

ইতিমধ্যে ১৬ই জুন ১৯২৫ এ সি আর দাসের হঠাৎ মৃত্যু হল। স্বরাজ্যদলের কেন্দ্রবিন্দুর তিরোধানের পর ধীরে ধীরে দলে নানা মতভেদ দেখা দিল। ১৯২৬ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য স্থানে স্বরাজ্য দলের উল্লেখযোগ্য জয় হোল না। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেল হিন্দুরা যদিও অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসের সমর্থক আছেন মুসলমানেরা প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকরাই প্রধানতঃ জয়ী হয়েছে। ইতিমধ্যে খিলাফৎ কমিটির টিকে থাকবার আর কোনো যুক্তি রইলো না যখন কামাল পাশার সরকার সুলতানকে গদিচ্যুত এবং খলিফা পদ উঠিয়ে দিয়ে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করল! ফলে মুস্লিম-লীগ পুনরায় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলো। ১৯২৬ এর ডিসেম্বর ভারতে কমিউনিষ্ট দল প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রেট বৃটেনের কমিউনিষ্ট দলের মিঃ স্প্রাট ভারতে এলেন এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিষ্ট দলের পত্তন করলেন কিন্তু ১৯২৯ শের ২০শে মার্চ কমিউনিষ্ট দলের ২০ জন নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তারের ফলে দলের অগ্রগতি ব্যাহত হোলো, দীর্ঘ মকোদ্দমার পর ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৩এ তাদের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। হাইকোর্টে পরবর্তী আপিলের ফলে এই শাস্তি বহু পরিমাণে হ্রাস হোল এবং ১৯৩৫ এ সকলেই মুক্তি পান। কংগ্রেসের বাইরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভার নির্বাচিত সদস্যদের দিল্লীতে ভারতীয় গণতন্ত্রের কাঠামো তৈরী করবার উদ্দেশ্যে একটী কন্‌ফারেন্সে মিলিত হওয়া। ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড থেকে ফিরে শ্রীমতী বেসান্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। গান্ধীজীও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলেন এই সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আলি বিভিন্ন দলের নেতাদের নিমন্ত্রণ করলেন। এবং ১৯২৪ ২২শে নভেম্বরে বম্বেতে প্রায় ৪০০ বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতারা মিলিত হলেন—গান্ধীজী ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর উপর জোর দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিনেন্স সম্পর্কে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করবার প্রস্তাব আনলেন কিন্তু শ্রীমতী বেশান্ত

বেঙ্গল অর্ডিনেন্সের যৌক্তিকতা বিবৃত করে দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়া সত্ত্বেও—গান্ধীজীর প্রস্তাব বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। বেঙ্গল অর্ডিনেন্সের তীব্র নিন্দা করে এবং ঐ অর্ডিনান্স ও ১৮১৮ তিন আইনের বন্দী ও বিনা আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। **দীর্ঘদিন পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক মঞ্চ থেকে সম্মিলিতভাবে তাদের রাজনৈতিক দাবী জানালেন।** গান্ধীজী রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য কিভাবে আনা যায় সে বিষয় পথ নির্দেশ করবার জন্য একটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সর্বস্বীকৃতভাবে গৃহীত হত। স্বরাজের খসড়া প্রণয়ন ও হিন্দু মুস্লিম ঐক্য সাধন এই দুই ভাগে কমিটির কাজকে ভাগ করা হয় কিন্তু স্বরাজ সম্বন্ধে কোনো ঐক্যমত না হওয়াতে, ঐ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা হয় এবং হিন্দু মুস্লিম ঐক্যব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভব নয় বিশ্বাসে এ সম্পর্কেও অচল অবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থায় শ্রীমতী বেসান্ট তাঁর কমনওয়েলথ বিল বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত করবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই বিলের অনুকূলে প্রচার শেষ করে প্রথম ইংলণ্ড ও পরে আমেরিকায় যান অনুকূল আবহাওয়া ও ভারত-বিরোধী প্রচার বন্ধ করবার জন্য। হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের কৃত্রিম বুনিয়াদ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে। তারপর কামাল পাশার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়েও স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায় এবং মুস্লিম রাজনীতি আবার তীব্র সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। ভারত দ্রুত তার শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় অল্পই।

(ক্রমশঃ)

Phone : 22-5970

Space donated by :

S. C. BOSE, A. M. A. E.

SANITARY ENGINEER & CONTRACTOR.

309, Bepin Behari Ganguli Street, Calcutta-12

বিশিষ্ট মহিলা লেখিকাদের

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল-বিল, বঙ্গনারী— কঃ পন্থা ; ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ২·৫০

বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম উত্তর পূর্ববঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহকালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের মনোহারী বিবরণ। ১·৩০

সেলাইয়ের নকশা ॥ শ্রীযমুনা সেন

কাশ্মীরী ও লক্ষ্ণৌ নকশার সূচের ফোড়ের আভাসে তৈয়ারী। এর বিশেষত্ব, শিল্পীর সুন্দর সরল ও বিচিত্র মৌলিক নকশার রচনায়। ২·৫০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গীতে লেখা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৫·০০

দেহলি ॥ শ্রীহেমলতা ঠাকুর

এই গ্রন্থের ছোট গল্পগুলিতে মানবচরিত্রের, তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ১·৩০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেদার-বদরী ভ্রমণ-কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য। ৪·০০

কবিতাবলী ॥ শ্রীরমা চৌধুরী-অনূদিত

বৈদিক নারী ঋষি ও উত্তরকালীন নারী-কবিদের ২৫৩টি ঋক্, ১৪২টি সংস্কৃত ও ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ। ২·০০

। সম্প্রতি প্রকাশিত ।

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের প্রথম-আমলের অনেক চিত্র লেখিকা নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এই গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অনেক কাহিনী এতে আছে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনার বর্ণনায় রবীন্দ্র-জীবনের একটি বিশিষ্ট দিকও এতে উদ্ভাসিত। ৩·৫০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

হে দুর্দম, হে নির্ভীক

শান্তশীল দাশ

নেতাজী একটি নাম : এ নাম স্মরণে
একটি বিস্ময়কর সংগ্রামের ইতিহাস জেগে ওঠে মনে।
একটি জীবন নয়, একখানি ইতিহাস বিরাট বিপুল,
পাতায় পাতায় তার জলন্ত অক্ষরে লেখা একটি ব্যাকুল
অশ্রান্ত প্রাণের কথা, দীপ্ত গতিময়,
বাধা বিঘ্ন পদে পদে, মৃত্যু সাথে ঘটে যার নিত্য পরিচয়।
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির মৃত্যু তার করে অভ্যর্থনা :
দুর্জয় দুর্বার গতি সে চলে অপ্রতিহত,
অন্তরে কী নিঃসীম বেদনা!

জননীর শৃঙ্খলের জ্বালা তার বক্ষে বাজে,
সে-জ্বালা দুঃসহ :
চাই মুক্তি—রক্ত দাও, সেই মুক্তি এনে দেব,
সংগ্রামের প্রমূর্ত বিগ্রহ
বলে, আর ছুটে চলে দেশ হতে দেশান্তর পানে ;
অবসর নাই তার দাঁড়াবার এতটুকু ; শুধু শোনে কানে
শৃঙ্খলিতা জননীর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি—অশ্রান্ত সৈনিক
মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটে ; সে মহাযাজ্ঞিক
নিত্য নব যজ্ঞ-হবি সঞ্চয়নে ব্যস্ত সদা
মুক্তি চাই, শৃঙ্খল মোচন
জননীর—একমাত্র পণ।

সে যজ্ঞের ইতিহাস লেখা হয় রক্তাক্ত অক্ষরে :
কত না বিস্ময়কর কাহিনী সে ইতিহাস। সব ম্লান ক'রে
দেয় এই ইতিবৃত্ত,—অদ্বিতীয়, তুলনাবিহীন ;
দীপ্তি তার একই মতো রয়ে চিরদিন,
কখনো সে হবে নাকো ম্লান।

তোমারে প্রণাম করি হে দুর্দম, হে নির্ভীক,
মৃত্যুঞ্জয় পুরুষ প্রধান।

জয়হিন্দ্ রমেন্দ্রলাল রায়

অগ্নিবীণা মুহুর্মুহু 'জয়হিন্দ্'-তানে
ব্রিটিশের বক্ষদীর্ণ করে
দুরন্ত দুর্মদ বেগে দিল্লী অভিমুখে
ছুটে চলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ;
অরণ্য-পর্বত, ঝঞ্ঝা, উত্তাল তটিনী,
শ্বাপদ সঙ্কুল পথ, গিরি-উপত্যকা,
নিদারুণ বন্যা, ক্ষুধা, হিম-সম্প্রপাত,
তুষার, জলন্ত সূর্য, কঠিন পাষাণ,—
রুধিতে পারে না তার দৃপ্ত পদক্ষেপ
লালকেল্লা লক্ষ্য ধ্রুব
সত্য-সন্ধানের।

লক্ষ মুক্তি সেনা
মাতৃভূমি-উদ্ধারের সঙ্কল্পে নির্ভীক
মালয়-ব্রহ্ম আর এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত হতে
সশস্ত্র ঝঙ্কারে,
স্বর্গাদপি-গরীয়সি মৃত্তিকার পুণ্য স্পর্শ লাগি'
যাত্রা করে
ভারত-তীর্থ পানে,
কামানের প্রলয়-গর্জনে
প্রকম্পিত করি' চতুর্দিক ;
সমুন্নত শিরে
শত্রুরে বিনাশ করে সম্মুখ সংগ্রামে,
কিম্বা ত্যাজে প্রাণ যে-ব্রত-উদযাপনে,
নেতাজীর স্বপ্ন-ধ্যানে চিরন্তন তাহা
'জয়হিন্দ'-ওঙ্কারের অমৃত-আহ্বান !

গীতার শান্তি আর শক্তির সাধনা
যে-মন্ত্রে প্রাচ্যে পুনঃ লভে সমন্বয়,
হিমাদ্রি-শিখরে আজ তারি উদ্বোধন,
'জয়হিন্দ'-তূর্যে বাজে 'বন্দে মাতরম' ;
সংহতি-শৌর্য-সাম্য মন্ত্র সুগম্ভীর !—
ধন্য হউক যৌবনের বিদ্রোহ-ঘোষণা,
পুণ্যদীপ্ত প্রভাতের স্বাগত ভাষণে
নিখিল অন্তরে বাজে
নেতাজী-স্মরণ।

স্বাধীনতা ও সুভাষচন্দ্র

সমর গুহ

রাষ্ট্রীয় প্রভাবে বশংবদ ঐতিহাসিকদের অসত্য আচরণে উত্যক্ত হয়ে নেপোলিয়ান এক সময়ে সমসাময়িক ইতিহাসকে 'কর্তাভজা মিথ্যাচারী' বলে আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর ভূমিকা সম্বন্ধে ভারতের সমসাময়িক ইতিহাস এবং সরকারী দলীল ও বিবরণও ঠিক তেমনি 'কর্তাভজা' দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে ভারতের যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রভাবে লিখিত ইতিহাস শুধু বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ করেনি,—উপেক্ষা, অবহেলা ও সুপরিকল্পিত অস্বীকৃতির নীতি অনুসরণ করেছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বশীল কংগ্রেসী নেতৃত্বের বক্তব্য,—আজাদ হিন্দ পর্ব চরমপন্থী সুভাষ বোসের একটি অ্যাডভেঞ্চার মাত্র এবং এজন্য ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র বীর ও দুঃসাহসীর সম্মান তাঁর প্রাপ্য কিন্তু 'সুভাষ বোসের' কার্যাবলী ভারতীয় স্বাধীনতার গতি ও পরিণতি নির্ণয়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। তাই, ব্যক্তিগতভাবে নেতাজীকে সামান্য সম্মান সমসাময়িক কংগ্রেস-নেতৃত্ব দিলেও তাঁর কার্যক্রম যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়কে চরমভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে সম্বন্ধে এক চক্রান্তকর কালো পর্দা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর ঐতিহাসিক অবদান সম্বন্ধে।

একমাত্র গান্ধী-নেতৃত্ব এবং এই নেতৃত্বের অনুসঙ্গী গোষ্ঠি এবং কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পদ্ধতির ফলেই ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে,—দিল্লীর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রীয় স্তরের প্রতিটি কার্যে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে এবং সরকার প্রভাবে রচিত ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এরূপ সিদ্ধান্তকে দলীলরূপে স্বাক্ষর দিয়ে এক ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিশ্ব ও ভবিষ্যতের কাছে এই কথাটি উপস্থাপিত করার যে প্রচেষ্টা চলছে ঐতিহাসিক সত্য-হত্যার এরূপ নিদর্শন একমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব বলে এতদিন ধারণা ছিল। গান্ধীজী অথবা নেহেরু-প্যাটেল নেতৃত্ব জনতার চাপে 'বাম হস্তে' নেতাজীর প্রতি প্রগল্ভ সুখ্যাতির উক্তি করতে বাধ্য হলেও তাঁদের মনোভাব স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা সম্বন্ধে যে কত সংকীর্ণ ছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে মৌলনা আজাদ রচিত স্বাধীনতা অর্জনের অন্তিম পর্য্যায়ের ইতিহাসে। ১৯৪২ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয় সেই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী যে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সে সম্বন্ধে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স যে মন্তব্য করেন মৌলানা আজাদের বইটিতে শুধু এইটুকু কথার উল্লেখ ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা সম্বন্ধে আর সামান্যতম একটি কথারও উল্লেখ নেই। কিন্তু কোন্ মৌলিক কারণে বৃটিশ শক্তি ভারত-ত্যাগে শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েছে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশে উত্থাপিত ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের বিতর্কে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তার উল্লেখ করে বলেন যে বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে এজন্য যে সে সময়ে : We were sitting at tho top of a volcano,

ভারতের বুকে কে এই আগ্নেয়গিরিটির সৃষ্টি করেছিল? গান্ধীজী? নেহেরু? না, প্যাটেল?—কে এই আগ্নেয় পুরুষ ভারতীয় জনতা এবং ভারতীয় বৃটিশ ফৌজ সেকথা জানতো, এবং কর্তভজা ইতিহাসের কীর্তিকে অগ্রাহ্য করে এখন বৃটিশ ঐতিহাসিকেরাই সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে কেন নিরুপায় হয়ে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৃটিশ ঐতিহাসিক মোসলে ও মাইকেল এডোয়ার্ড সম্প্রতি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং হিউ টয় নামের আরেক বৃটিশ লেখক নেতাজীর জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাঁর কার্যক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করেছেন সেই তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য হয়ে উঠেছে যে নেতাজী এবং আজাদ হিন্দের প্রভাবে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে যে দেশপ্রেমের প্রেরণা এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তাই বৃটিশ-শক্তির ভারত-ত্যাগের গোড়াকার ঐতিহাসিক কারণ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নীতি পদ্ধতি ও নেতৃত্বের প্রকৃতি ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই সংগ্রাম ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত হয়েছে তিন ধারায়। নিয়মতান্ত্রিক, আইন অমান্য ও বৈপ্লবিক,—বিভিন্ন পর্যায় ও পর্বে এই তিন-পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আগ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল ভারতের স্বায়ত্বশাসন অর্জনের একমাত্র অবলম্বন। তখন পর্যন্ত অখণ্ড স্বাধীনতা এমন কি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের লক্ষ্যও স্থির হয়নি। প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আইন আমান্য ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্রয়ী পদ্ধতি। কিন্তু আইন অমান্য ছিল এই সময়ে অংকুরাবস্থ, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি সক্রিয় হলেও পর্যাপ্ত মুখর ছিল না,—এই পর্বে বৈপ্লবিক পদ্ধতিই ছিল প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় বিপ্লবের জনক শ্রীঅরবিন্দ যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভূমিকা রচনা করেন তা পূর্ণ স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চরম বৈপ্লবিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে প্রথম যুদ্ধের পটভূমিতে যখন ভারতে মাত্র ১৫ হাজার ফৌজ অবস্থিত ছিল সেই সময়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহের প্রয়াস করে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল। সেই সময়ে নরমপন্থী নিয়মতন্ত্র এবং বহু আত্মত্যাগ সত্ত্বেও চরমপন্থী বিপ্লববাদ বৃহত্তর ভারতীয় জনতার সংযোগ ও সহযোগীতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিপ্লববাদের তুলনায় নরমপন্থী কিন্তু নিয়মতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চরমপন্থী আইন অমান্য তথা বয়কট—অসহযোগীতা—আইন-অমান্যের কর্মপন্থার ভিত্তিতে গান্ধীজী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রধান নেতৃত্ব ও কর্ম পদ্ধতির সূচনা করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৩২ সালের খাজনা বন্ধ আন্দোলন এবং ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অপূর্ব দান। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও প্রত্যক্ষ আইন অমান্যের পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয় জনতার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ভারতবাসী বিপুলাংশে স্বদেশপ্রেম, জাতীয় মর্য্যাদাবোধ এবং ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী-নেতৃত্ব এবং গান্ধীজীর সাগ্রাম পদ্ধতি ছিল অবিসংবাদী। এই পর্বে নিয়মতান্ত্রিক বা বিপ্লবী যারাই গান্ধীজীর বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান মঞ্চ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নিষ্ক্রিয় হতে হয়েছে অথবা হিন্দুসভা ও মুসলীম লীগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক দল গঠন করতে হয়েছে। দেশবন্ধু আইনসভার অভ্যন্তরে নিয়মতান্ত্রিক আইন-অমান্যের কর্মসূচী

অনুসরণের দাবীতে গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধুর কর্মসূচীকে 'সহ্য করে' এই বিদ্রোহকে নিজের নেতৃত্ব মণ্ডলীর আয়ত্তে আনতে গান্ধীজী সক্ষম হন। নেহেরু-সুভাষ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করে গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেন নেহেরুকে লাহোর কংগ্রেসে নিজের স্থানে সভাপতিরূপে মনোনীত করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে গ্রহণ করে গান্ধীজী সেই যৌথ নেতৃত্বে ফাটল ধরিয়ে শেষ পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরুকে 'এক মৌখিক প্রগতিশীল ও সংগ্রামী' অনুগামীরূপে একান্ত বশংবদের পর্যায়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে তরুণ কংগ্রেস নেতৃবর্গ ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করেন তাঁরাও যে শেষ-প্রশ্নে স্বাতন্ত্রহীনভাবে গান্ধী-নেতৃত্ব এবং নেহেরু-প্রভাবের অনুসারী ছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের যুগসন্ধী সংকটের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব তার চরম স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে 'বিদ্রোহী' নেহেরুর ন্যায় বিদ্রোহী সুভাষকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টপদে সম্বর্দ্ধিত করে তাঁকে শেষ পর্যন্ত নেহেরুর ন্যায় বশংবদ অনুসারীরূপে পরিণত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বৃটিশ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ডের মতে: Gandhi believed he could convert the fiery revolutionary (Subhas Bose) to his own non-violent views. He was wrong. In 1939 Bose once again stood for president against Gandhi's wishes নেহেরু ও সুভাষের চরিত্র ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কত পার্থক্য ছিল সেকথা গান্ধীজী অনুধাবন করতে সক্ষম হননি বলেই নেহেরুর ক্ষেত্রে অবলম্বিত পদ্ধতিতে সুভাষকে নিজের নেতৃত্বের বশংবদ করে তুলবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরু ও সুভাষের মূল চরিত্রের ধাতুতে কি পার্থক্য ছিল বৃটিশ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড তার উল্লেখ করে লিখেছেন: Nehru was a Harrow educated aristrocrat with Fabian socialist ideas. Nehru was a thinker but not really a man of decisive action; though revolutionary in speech he was no more a revolutionary in fact than the bourgeois leaders of the British Labour party. With the two men, Nehru and Patel (not a thinker but a worker) Gandhi could carry on with his great experiment in mass action Only one outstanding personality—Subhas Chandra Bose—took different and violent path, and in a sense, India owes more to him than to any other man. (The Last Years of British India) বস্তুত ১৯৩৯ পরের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সুভাষের যুগ। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী ভারত-ছাড় সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় জনতা গান্ধীপন্থী অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির ঠিক বিপরীত কর্মসূচী অনুসরণ করেছে—জনতা অনুসরণ করেছে সুভাষের বৈপ্লবিক কর্মসূচী—বিপ্লবী সংগ্রামের পথে ক্ষমতাদখল ও প্রতি-সরকার গঠনের কর্মসূচী। ১৯৩৯ সালের পর থেকেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আবার প্রাধান্য লাভ করে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা,—ভারতের অভ্যন্তরে ১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের বাইরের প্রচেষ্টা তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর।

গান্ধী-সুভাষের পার্থক্য মৌলিক। গান্ধীজী ছিলেন মূলত একজন মানবদরদী মিশনারী স্বাধীনতার আদর্শের চেয়েও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী, আপোষপন্থী, বৃটিশ সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের নীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বৃটিশ সরকারের হাত থেকে এক মহত্বপূর্ণ নৈতিকতার দানরূপে স্বাধীনতা লাভের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সুভাষের কাছে ভারতের স্বাধীনতা

ছিল প্রধান লক্ষ্য, পদ্ধতির নৈতিক মূল্য ছিল তাঁর কাছে গৌণ। তিনি ছিলেন ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে বিশ্বাসী। গান্ধীজীর ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সুভাষ লক্ষ্য করেছিলেন যে এরূপ আন্দোলনে বিপুল জন সমর্থন সৃষ্টি হলেও,—ভারতে বৃটিশ-রাষ্ট্র ক্ষমতার মূল ধারক ও রক্ষক ভারতীয় সামরিক ও পুলিশ বাহিনী গান্ধী পন্থা দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। বস্তুত মূলত অহিংসব্রতী হওয়ায় গান্ধীজী নিজেও তা' চাননি,—তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন পর্যায়ে বা কোন পর্বেই গান্ধীজী ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান নি। কিন্তু সুভাষ চিন্তা করেছেন ঠিক তার বিপরীত। তিনি মনে করেছেন ১৮৫৮ সালের ঐতিহ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালান সম্ভব না হলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জন কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। তাই সুভাষ জাতীয় আন্দোলনে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবী কার্যক্রমের পক্ষে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ না থাকা সত্বেও বিপ্লবের আগুনকে অনির্বাপিত রাখার জন্য তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সবসময়ে যোগাযোগ রেখেছেন এবং বিপ্লবীদের অবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রেরণা দিয়েছেন। ভারত-ত্যাগের আগেই তিনি তাই দেশের সামনে গণ-আন্দোলণের মাধ্যমে অন্তিম পর্য্যায়ে বিদ্রোহী প্রভিশন্যাল গভর্নমেন্ট গঠনের লক্ষ্য রেখে যান—যা তিনি পরের অধ্যায়ে-আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজ গঠনের মাধ্যমে নিজেই কার্যকরী করে তোলেন।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বের মূল তাৎপর্য ছিল অহিংস আইন-অমান্য পন্থা বনাম বিপ্লব পন্থার সংঘাত। এই সংঘাতে ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক লক্ষ্য ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বকে পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সুরক্ষিত করা। কারণ ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্কা ছিল যে কংগ্রেস তথা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাত-ছাড়া হলেই কংগ্রেসের বিপুল সংগঠন ও জন-সংগঠন বিপ্লবের কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়বে। ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে আশঙ্কা ছিল বিপ্লববাদীদের কার্যক্রম সম্বন্ধে—যে কার্যক্রমকে শেষ পর্যন্ত সুভাষ আজাদ হিন্দ অভিযানের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করেন অহিংস আইন-অমান্যপন্থী গান্ধী এবং বিপ্লবপন্থী সুভাষকে কোন্ চোখে বিশ্লেষণ করে কি নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড লিখেছেন : The British felt that they had little to fear from Gandhi himself. As long as Gandhi was in control of Congress, they knew they had an ally. As long as civil disobedience remained non violent it did not greatly worry the Govenment. Gandhi's whole aim was to minimise violence, the Government's was the same. They were still capable of suppressing a few outbreaks of small scale violence, but if once Gandhi ceased to dominate Congress, the machine he had built up might well be used by more dynamic and violent people. A full scale rebellion could not be crushed. So the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect—jailing him occasionally to keep up appearances—while they took much more positive action against terrorists and those western style revolutionaries whom they really feared...Gandhi remained round the neck of

congress like Ancient Mariners albatross inhibiting its actions, dividing its purpose, confusing the genuine revolutionaries and ultimately ensuring partition of India. অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নৈতিক প্রভাব দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়-পরিবর্তনে তিনি সক্ষম হবেন বলে যে আশা পোষণ করে গান্ধীজী বিপ্লবপন্থা পরিহার করেন এবং নেতাজীর বিপ্লববাদের বিরোধীতা করেন সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড লিখেছেন: Gandhi saught to blackmail the British through an assault on their conscience. In this, as in many of his other habits, Gandhi was wrong. In India the moral content of the British rule could not be reached by black mail, for it had become petrified into a system. In Britain there was merely indiffernce. In fact the conscience of the British would have much more quickly roused if there had been widespread rebellion in India and a consequent attempt to suppres it. Gandhi and his methods were not understood. All that was recognised was that he was harmless.

সুভাষ ভারতের একমাত্র নেতা যিনি গান্ধীপন্থাকে চ্যালেঞ্জ করে সফল হয়েছিলে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস আইন-অমান্য পন্থার সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লববাদের কর্মসূচীকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দশকে তরুণ সুভাষের ভূমিকা ছিল বামপন্থী। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আপোষরফাবিরোধী প্রত্যক্ষ ও আশু সংগ্রামপন্থী এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হবার পরে তার সমস্ত লক্ষ্য ও কার্যক্রম ছিল বিপ্লববাদী। আগষ্ট বিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন বেতারের মাধ্যমে তিনি যে কর্মসূচী দেন ভারতীয় জনতা সেই বিপ্লবের পথই গ্রহণ করে যার ফলে আইন-অমান্য আন্দোলন কালের পূর্বেকার সরকারীপন্থার পরিবর্তে আগষ্ট বিপ্লব দমনের জন্য, এডোয়ার্ডের তথ্যানুযায়ী: The Government used British troops and air craft against mobs, machine gunning crowds from air atleast on five occasions. আজাদ হিন্দ পর্বে প্রত্যক্ষ জয় পরাজয়ের দুটি পরিণতির কথা চিন্তা করেই নেতাজী তাঁর চরম বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাপানী সৈন্যের সহযোগিতায় ইম্ফল দখল করে দ্রুত ভারতীয়দের শক্তি ও শৌর্যে ইম্ফল থেকে দিল্লী দখলের জাতীয় বিপ্লব পরিচালনা করা পর্য্যাপ্ত বিমান বহরের সাহায্যদানে জাপ-বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য তাঁর এই প্রত্যক্ষ কার্যক্রম সফল হয়নি; কিন্তু তাঁর আশা ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবে এবং এই প্রত্যাশাতে কংগ্রেস নেতৃবর্গকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ না করার নির্দেশ দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে আসন্ন যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের মাধ্যমে পাকা ফলের মত পূর্ণ স্বাধীনতা 'অর্জনের আশ্বাস' দিয়েছিলেন। পুনরায় অন্তর্ধান করার পূর্বে Post-war Revolution inside India-র যে ভবিষ্যত-বাণী নেতাজী করেছিলেন, তা যথাসময়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাস থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজের বিমান ও স্থল বাহিনীর 'জেনারেল ষ্ট্রাইক' ও নৌ বাহিনীর বিদ্রোহের কার্যক্রমের মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের যে আগুন জ্বলে ওঠে পিকেটিং, আইন-অমান্য ও নিরুপদ্রবে কারাবরণের ঐতিহ্য ও মৃদু-মানসিকতায় বর্দ্ধিত কংগ্রেস নেতৃত্ব তার প্রখর তাপের স্পর্শে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং 'বারদৌলি সত্যাগ্রহের সরদার'

পর্য্যন্ত নৌ-বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়ে মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকারের পরম বন্ধুর কাজ করেছেন। যুদ্ধোত্তর বিপ্লবকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যর্থ করে না দিলে ঐক্যবদ্ধ ভারতে অখণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা সুনিশ্চিতভাবে সেদিনে সম্ভব হোত।

একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বদেশপ্রেম ও ভারতীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং বিদ্রোহীর মনোভাব ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজ ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বিস্ফোরণোন্মুখ আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির শেষ ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। নেতাজী ও আজাদ হিন্দের ঐতিহ্যে যুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির সামনে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা বাস্তব ও প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং বিদ্রোহী ভারতীয় নৌ-সেনাদের গুলি বর্ষণে সেই আগুন জ্বলেও উঠেছিল,—কিন্তু ভরাডুবির হাত থেকে ব্রিটিশ শক্তির শেষ-রক্ষা হয় কংগ্রেসী নেতৃত্বেরই সাহচর্যে এবং ভীরুতার পরিণামে। সেই সময়ে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের উন্মাদনায় কম্যুনিষ্ট, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা—সব প্রতিক্রিয়াই 'জয় হিন্দের' আবেগে বন্যার জলের মত ভেসে গিয়েছিল—এমন কি বৃটেনে শ্রমিক সরকার তখন ভারত-বিখণ্ডনের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল,—তবুও কংগ্রেস নেতৃত্ব অখণ্ড ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। পরে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা ও খণ্ডিত জাতি দানপত্ররূপে কংগ্রেস নেতৃত্ব লাভ করেছে তাও নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল তারই অবদানে।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড নেতাজী সম্বন্ধে বলেছেন: The actions of one man were to have profound effect upon the future: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও ব্রিটিশ সরকারের মনে গান্ধীজী বা নেহেরু বিশেষ কোন ভীতি সঞ্চার করেনি,—ব্রিটিশ শক্তি সন্ত্রস্ত ছিল নেতাজীকে নিয়ে। এডোয়ার্ডের মতে: The British had not feared Gandhi, the reducer of violence, they no longer feared Nehru, who was rapidly assuming the lineaments of civilised statesmanship—even elder statesmanship. The British, however, still feared Subhas Bose or, rather, the violence he represented.

আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহ্য এমনভাবে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীকে প্রভাবান্বিত করেছিল যে লালকেল্লার তিনজন আই-এন-এ সেনানায়ককে যাবৎ জীবন কারাদণ্ড দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। কারণ, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অপ্রত্যক্ষ মত গ্রহণ করার পরে বৃটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে আর ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনাধীন রাখা সম্ভব হবে না। নেতাজীর বৃটিশ জীবনীকার হিউ টয় আজাদ হিন্দ ফৌজ কিভাবে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীকে বিদ্রোহের মনোভাবে প্রভাবিত করে তার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন: The result was a political consciousness which the Indian Serviceman had never before possessed···There can be little doubt that the serious naval mutinies and the unrest in the other two Services early in 1946 owed something to it. তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী নেতাজী ও আজাদ হিন্দের প্রভাবে কিভাবে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী প্রবুদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ বলেন: Today the national idea has spread···not least perhaps among some of those Soldiers who have done wonderful service

in the war. এই কথাই উল্লেখ করে তিনি ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বিতর্কে বলেছিলেন যে যুদ্ধের ঠিক পরেই আগ্নেয়গিরি মুখে ভারতের বৃটিশ শাসন গিয়ে পৌঁছেছিল। বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেছিলেন নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দের ঐতিহ্যে। কেন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হলো তার অন্তিম কারণ নির্ণয় করে হউ টয় লিখেছেন: There can be little that India National Army ...hastened the end of British rule in India. আরেক বৃটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডোয়ার্ড নাটোর ভাষায় এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি করে লেখেন: It stoutly dawned upon the government of India that the backbone of British rule, the Indian Army, might now no longer be trustworthy. The ghost of Subhas Bose, like Hamlets' father, walked the battlements of the Red Fort and his suddenly amplified figure over-awed the conferences that were to lead independence.

কংগ্রেস নেতারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে গান্ধীজীর নির্দেশ ও নেতৃত্বেই তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। ইতিহাসের কাছে একথাও অসত্য। নেহেরু-প্যাটেল নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর তৎকালীন দুই জন সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসু ও প্যায়ারীলাল একথা লিখেছেন যে গান্ধীজীর অমতে এবং তাঁকে না জানিয়ে ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শ্রীনির্মল বসু এবং বৃটিশ ঐতিহাসিক মোজলে একই কথা বলেছেন যে দেশভাগের প্রস্তাবের কথা শুনে নোয়াখালি থেকে ছুটে নয়া দিল্লীতে গেলে প্রথম সাক্ষাৎকারেই মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীকে বলেন: Well, Mr. Gandhi the Congress is to day with me and not with you গান্ধীজীকে না জানিয়ে, তাঁর পরামর্শ না নিয়ে দেশভাগের মত এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক প্রস্তাব যে কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে সেই অচিন্তনীয় পদক্ষেপ সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করে গান্ধীজীর সেক্রেটারী প্যায়ারী লাল লিখেছেন: Such thing would have been inconcievable in olden days.

নেহেরু একথা তাঁর জীবনী লেখকের কাছে স্বীকার করেছেন যে 'তিনি আর জেলে যেতে রাজী ছিলেন না।' নেহেরু-প্যাটেল তখন ক্লান্ত, উদভ্রান্ত, জিন্নার সাম্প্রদায়িক চালের সামনে হতভম্ব, দ্রুত রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের আগ্রহে অধীর,—তা না হলে যেখানে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এডোয়ার্ডের ভাষায়: The Labour party was as a whole pro-Nehru, the Fabian Socialist, and anti-Jinnah and the religious fanaticism they thought was his only raison d'etre. Atlee too despised Jinnah.—এরূপ সুবর্ণ-সুযোগের পরিস্থিতিতেও কোন নেতৃত্ব যে দেশ ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে ক্ষমতালাভের জন্য ব্যাকুল হতে পারে সেকথা অকল্পনীয়। এডোয়ার্ডের মতে: In modern term partition of India was an act of madness. শুধু এই উন্মাদের কাজ করেই ক্ষান্ত হননি নেহেরু-প্যাটেল নেতৃত্ব-যে গান্ধীজীর পক্ষপুটচ্ছায়ে তাঁদের নেতৃত্ব ও প্রভাব গড়ে উঠেছিল তাঁকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে ছেঁড়া কাঁথার মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন নি। গান্ধীজীর এই সময়কার মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এডোয়ার্ড লিখেছেন: When prizes of freedom were within grasp, Gandhi was no longer needed at the helm

নেহেরু-প্যাটেল নেতৃত্ব ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস ও

পটভূমি সম্বন্ধে নিজেদের অপরাধকে গোপন করে এক কৃত্রিম সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির সমস্ত ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এই বক্তব্য-গুলি স্বতঃসিদ্ধরূপে ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে: প্রথমত, একমাত্র গান্ধীজীর অবদানেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, দ্বিতীয়তঃ, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে, তৃতীয়তঃ ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। চতুর্থত, ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে অহিংসার ন্যায় এক মহৎ ও উচ্চতর আদর্শের অবদানে, পঞ্চমত, ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং বিনারক্তপাতে এবং ষষ্ঠত, ১৫ই আগষ্টই ভারতের স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীনেহেরু স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র প্রধান। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাষ্ট্র-কর্তৃত্বাসীন নেতৃত্বের এরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কৃত্রিম, অনৈতিক, অতাত্ত্বিক এবং অনৈতিহাসিক।

প্রথমতঃ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে বহু-নেতৃত্বের সম্মিলিত অবদান রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে প্রধান অবদান গান্ধীজীর। অহিংস-ধর্মের সাধক হিসাবে গান্ধীজীর স্থান যত উচ্চেই হোক না কেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজী ও নেতাজীর অবদান কারো চেয়ে কারোর কম নয়। দ্বিতীয়ত, ভারত-ভাগের পথে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে চুক্তি করে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গান্ধীজীর নয়—নেহেরু-প্যাটেলের যুগ্মনেতৃত্বের। তৃতীয়ত, ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করেছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ও আদর্শ তা ছিল না। ঐক্যবদ্ধ ভারতে সমন্বিত জাতীয় রাষ্ট্র ও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের যে লক্ষ্য ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্বে নেহেরু প্যাটেলের নেতৃত্ব অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেদের মানসিক বিভ্রান্তি ও ভীরুতার জন্য তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। চতুর্থত, ভারত শুধু গান্ধীজীর অহিংস আইন-অমান্যের পথে স্বাধীনতা লাভ করেনি,—নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম, অহিংস আইন-অমান্য এবং বিপ্লববাদের ত্রয়ী সংগ্রামের পরিণামে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে গান্ধীজীর অহিংস আইন-অমান্য ব্যাপক গণচেতনা ও সংগ্রামী জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে বটে কিন্তু ইংরেজ শক্তি ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়েছে ১৮৫৭ সালের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় এবং এই আশঙ্কা ও বিভীষিকা বৃটিশ শক্তির মধ্যে সৃষ্টি করেছিল নেতাজীর বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহ্য। পঞ্চমত, বিনা রক্তপাতে বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেনি। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ তথা ভারত ও পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই একমাত্র পাঞ্জাবেই ছয় লক্ষ নরনারী নিহত হয়েছে ও একলক্ষ তরুণী নারী অপহৃত হয়েছে। সমগ্র খণ্ডিত ভারতবর্ষের হিসাবে মৃত্যু অপহরণের সংখ্যা এই সংখ্যার দেড়গুণ। দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা হয়েছে দুই তরফে প্রায় দুই কোটি। পৃথিবীর কোন কালের, কোন দেশের বৈপ্লবিক ও রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং বিপ্লবের ক্ষেত্রে এরূপ মৃত্যু, নারী অপহরণের ও বাস্তু-চ্যুতির ভগ্নাংশ ঘটনাও ঘটেনি। ষষ্ঠত, ভারতের যথার্থ স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট নয়—২১শে অক্টোবর,—যে দিনে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের রাষ্ট্রীয় অধিকার সহ এবং বিশ্বের তেরটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতির বুনিয়াদে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একথাও ভাবী ইতিহাসে স্বীকৃতিলাভ করবে যে শ্রীনেহেরু নয়,—নেতাজীই স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান।

কর্তাভজা সমসাময়িক ইতিহাসের যুগ যতই অপসৃত হয়ে যাবে ততই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিকৃতি এবং এই প্রতিকৃতি রচনায় নেতাজীর ভূমিকা ও অবদান অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করবে। ভারতের স্বাধীনতায় নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা আজো অপূর্ণ রয়েছে,—ভারত-পথিকের সেই অসম্পূর্ণ যাত্রা কি সম্পূর্ণ হবে না?

॥ সম্পাদকীয় ॥

দুর্গাপুরে কংগ্রেস

গত ৬ই জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ৬৯তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। নেহেরু-বিহীন এই প্রথম কংগ্রেসে নেহেরু-উত্তর ভারতের সঙ্কট-সঙ্কুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র কংগ্রেস অধিবেশনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ-ছাড়া চীনের আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, কালোটাকার কারবার, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্বও দুর্গাপুরে আন্দোলিত হয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও তাঁর বক্তৃতায় উচ্চকণ্ঠে দেশের খাদ্য-মূল্য ও বেকার-সমস্যার কথা ঘোষণা করেছেন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার একুশ হাজার পাঁচশ কোটি টাকার বিনিয়োগ-বরাদ্দের বাস্তব-প্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের উপর এই বিনিয়োগের আঘাত, দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের যেমন একদিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে, তেমনি আর একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকারের উপর অতিরিক্ত আরও যে তিনহাজার কোটি টাকা সংস্থানের দায়িত্ব বর্তাবে তা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা, সে-সম্পর্কেও শ্রীকামরাজ সংশয় প্রকাশ করেছেন। শ্রীকামরাজের ভাষণে সংশয় আছে, সমস্যা আছে, সতর্কবাণী আছে কিন্তু প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নেই, সমাধানের পথনির্দেশও নেই। দেশের কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত না করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না—এই মামুলী ও অস্পষ্ট বক্তব্য কোনো নূতন তাৎপর্যই বহন করে আনে নাই। উপরন্তু বিরোধী দলগুলির উপর অহেতুক উষ্মাপ্রকাশ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টায় শ্রীকামরাজ পলায়নপর মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকামরাজ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যে বিরোধী দলগুলি খাদ্যসঙ্কট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে জাতীয় সঙ্কটরূপে গণ্য না করে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রীকামরাজ অনায়াসেই ভুলে গেছেন, চীন আক্রমণের পর জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিরোধীদলগুলির অকুণ্ঠ ও নিঃসর্ত সমর্থন কিভাবে অবহেলিত হয়েছে এবং এই পরিস্থিতিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে আজ শাসনক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে! খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে বিরোধীদের সময়োপযোগী প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করে মজুতদার-জোতদার ও কালোটাকার মালিকদের বশংবদ হয়ে চলেছিলেন সেদিন কংগ্রেসী শাসনতন্ত্র! পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও সরকার তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে। শ্রীকামরাজের কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে তিরস্কার নেই, ধিক্কার নেই। কারণ তারা শ্রীকামরাজেরই স্বজন। তাই বিরোধীদের উপর তিনি আক্রোশ বর্ষণ করে কর্তব্য সমাধা করেছেন।

কিন্তু শ্রীকামরাজের দলের মধ্যেই যে আজ প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার বিরুদ্ধে, সাধারণের মানুষের জীবনে সঙ্কটমোচনে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে? অধিবেশনে গৃহীত অর্থনৈতিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুরন্ত সমালোচনা তারই অভিব্যক্তি। ভুবনেশ্বরের গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রয়োগ সম্পর্কেই অভিযোগ দুর্বার হয়ে উঠেছে দুর্গাপুরে। অভিযোগকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র নবীন কংগ্রেসীরাই নন, যারা প্রবীণ, যাদের মধ্যে

অনেকেই কংগ্রেসের নীতি-নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছেন, তারাও মুখর। জগজীবন রাম প্রস্তাবের উত্থাপক হয়েও কঠোর সমালোচক, গ্যাডগিল, পুরুষোত্তম প্যাটেল, কে ডি মালব্য, কৃষ্ণ মেনন সরকারী নীতির ও গৃহীত প্রস্তাবের প্রয়োগে কংগ্রেসের অক্ষমতার দ্ব্যর্থহীন সমালোচক।

এই প্রস্তাবে কি বলা হয়েছে? কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ও পল্লী অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণ করতে হবে; বলিষ্ঠ ও সাহসিক চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধা কোথায়? প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি গুরুত্ব পেয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষের দিকেও কৃষি গুরুত্ব পেয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পুরো সময়ে কৃষি গুরুত্ব পেয়েও কাজ হলো না। ভূমি-ব্যবস্থার রূপান্তর, ভাগচাষী, ভূমিহীনদের জমির মালিকানা, কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য অল্প সুদে চাষীকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান, বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উন্নতি কেন হয় নাই, তার মূল্যায়ন ও প্রতিকারের অব্যর্থ ব্যবস্থার অন্তরায়গুলি কোথায় সে-সম্পর্কে ভূবনেশ্বর প্রস্তাবও যেমন নীরব, দুর্গাপুরের প্রস্তাবও তাই। প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনিচ্ছাই যে ব্যাধির মূলকারণ এই স্বীকৃতির সাহস শাস্ত্রী-কামরাজ-নন্দ চক্রের নাই। যদিও শ্রীনন্দ তাঁর কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ফোরামের পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে বিলাপ করে বলেছেন, 'যে হারে অগ্রগতি চলেছে তার পরিণতিতে পঞ্চম পরিকল্পনার অন্তেও আমাদের প্রতিশ্রুত অর্থ নৈতিক লক্ষ্যে সাধারণের জন্য নিম্নতম নিশ্চিত জীবনমানে পৌঁছানো যাবে কি?'

সামাজিক ন্যায়বিচার পত্তনের এবং সমাজবাদী কাঠামো গড়নের জন্য সমাজ পরিবর্তনের যে গতিবেগ প্রয়োজন সেজন্য কংগ্রেসী প্রচেষ্টা কতটা অন্তসারঃশূন্য, কালোটাকার উৎস-সন্ধানে ও দুর্নীতি উচ্ছেদে সরকারী কালক্ষেপণ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। দুর্গাপুরে কালোটাকার পরিমাণ নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর। এর পরিমাণ, কৃষ্ণমাচারী বলেছেন এক হাজার কোটি টাকা, সদাচার সমিতির গবেষণার ফল—দেশে চালু মুদ্রার পরিমাণ ২৫০০ থেকে ২৬০০ কোটি টাকা কিন্তু কালোটাকার পরিমাণ ৩,৪০০· কোটি টাকা। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে কালোটাকার ব্যাপারীরাই কৃষিপণ্য, খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য মজুদ রেখে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। শ্রীজগজীবন রাম একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও করেছেন দুর্গাপুরে! কিন্তু কংগ্রেসের চৈতন্য কালোটাকার আচ্ছন্ন না হয়ে থাকলে এর মূলোচ্ছেদে কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা দুর্গাপুরে ঘোষিত হলো না কেন? আয়কর আইন সংশোধনের পর উদ্ধারকৃত কালোটাকা সরকারী দখলে থাকবে. আইনে মাত্র এইটুকু পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে। কালোটাকা উদ্ধারের ব্যাপক কোনো আইন রচনায় অগ্রণী হতে কংগ্রেস কুণ্ঠিত বিধাগ্রস্ত। ব্যাধির উপশম হবে এই ব্যবস্থায়, ব্যাধির মূলোচ্ছেদ বহু দূরের বস্তু। মূল্য আরও বৃদ্ধিরোধে কালোটাকার উৎসাদন ও নিয়ন্ত্রিত বণ্টনের সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগের প্রতিশ্রুতির অভাব মূল্য-বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়ে গেছে,—দুর্গাপুরের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত আলোচনা। দুর্গাপুর অধিবেশনের পর দিল্লীর কংগ্রেস কর্মীদের বৈঠকে শ্রীশাস্ত্রীও আরও মূল্যবৃদ্ধি জন্য প্রস্তুতির সদুপদেশ দিয়ে আসন্ন সঙ্কটের সামনে চরম ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন।

নেহেরু-নেতৃত্বের অবসানের পর দুর্গাপুরে যৌথ-নেতৃত্বের প্রথম পরীক্ষা হয়ে গেলো। ভুবনেশ্বর-প্রস্তাব সমাজ-পরিবর্তনের ত্বরায়নে নেহেরু-নেতৃত্বের ব্যর্থতার শেষ-স্বীকৃতি কিম্বা নেহেরু-নেতৃত্ব পুনরুজ্জীবনের শেষ চেষ্টা। কিন্তু ভুবনেশ্বর প্রস্তাবে সে-নেতৃত্ব যে শেষরক্ষা পেলোনা, দুর্গাপুরের প্রস্তাব তারই নিষ্করুণ স্বীকৃতি। শ্রীনেহেরুর লোকান্তর সে ব্যর্থতায় ছেদ টেনে দিয়েছে। কিন্তু তার উত্তর-সাধকদের পথ সে-কারণে আরও দুর্গম হয়ে উঠেছে। শ্রীকামরাজ তার ভাষণে ঠিকই বলেছেন: 'অতীতের সব ভুল নেহেরুজীর বিরাট

নেতৃত্বের আড়ালে চাপা পড়েছে। কিন্তু অতঃপর আর জাতির ক্ষমা পাওয়া যাবে না।' দুর্গাপুর ভারতবর্ষের বঞ্চিত মানুষের সামনে কোনো আশার আলো দেওয়া দূরে থাকুক, তাদের বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়নের দিনগুলি যে আরও প্রলম্বিত হবে—পঞ্চম পরিকল্পনার প্রান্তসীমা অতিক্রম করে আরও অনির্দেশ্যকালেও তা সম্প্রসারিত হবে, সেই বঞ্চনা-লাঞ্ছনার প্রতিশ্রুতিই দুর্গাপুরের নিয়ন বাতির ঝলকানির ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ কি বঞ্চনার নির্বিরোধ প্রহর গুণে চলবে অনির্দেশ্যকাল? দুর্গাপুরে এই মূঢ়তা প্রশ্রয় পেলেও বঞ্চিত-বিক্ষুব্ধ মানুষের আচরণ নির্বোধের মত নয়। বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষা তাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে।

দুর্গাপুরে পরমাণু বোমা

দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের মামুলী আলোচনায় এবার চীনের পরমাণুবোমার প্রসঙ্গ কিছুটা ব্যতিক্রম এনেছিল। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে শ্রীমোরারজী দেশাই-এর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু বক্তা ভারতবর্ষে পরমাণুবোমা আয়ত্তের স্বপক্ষে সরব হলেও, প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রায় সব কণ্ঠই নীরব হয়ে যায়। পরমাণুবোমা আয়ত্তের বিপক্ষের যুক্তিও মামুলী (১) জোট নিরপেক্ষতা (২) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (৩) অহিংসা ইত্যাদি। চীনের বোমা যে পরিমাণে আফ্রো-এশিয়া জোটের ও জোট-নিরপেক্ষদের মধ্যে বহুদেশকে আকর্ষিত করে তাদের ওপরে চীনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে, সেই পরিমাণে ভারতবর্ষ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার নিরাপত্তাও বিপন্ন। এই অবস্থাতেও মামুলী যুক্তির অবতারণা করে দুর্বলতা ঢাকবার প্রয়াস হাস্যকর। নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের মামুলী যুক্তিগুলি অচল হয়ে পড়েছে কিনা তার পুনর্বিচার প্রয়োজন। প্রথমত যাদের সম্পর্কে ভারতবর্ষ জোট-নিরপেক্ষ থাকতে চায়, সে-সব রাষ্ট্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে জোট-নিরপেক্ষ কিনা? না তারা চীনা-জোটমুখীন? দ্বিতীয়, চীন ও ভারতের মধ্যে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখছে কিনা। না সেই সকল রাষ্ট্র চীনের সঙ্গেই সহাবস্থানের পক্ষপাতী বেশী, ভারতের সঙ্গে ক্রম-দূরত্ব ও বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিয়েও। তৃতীয়তঃ, 'গান্ধীজীর দেশ', 'নেহেরুর দেশ'—এই ধরণের ধুয়া তুলে যে সকল প্রমূল্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়, আদৌ তার অস্তিত্ব আছে কিনা? ভারতবর্ষ সামরিক শক্তিতে ক্রমশঃ ও শক্তিমান হচ্ছে। বিমান বাহিনী ও বোমারু বাহিনী বৃদ্ধি করছে। অহিংস প্রতিরোধের জন্য কি? কিম্বা প্রয়োজন হলে শত্রুপক্ষের ঘাটির ওপর বোমা নিক্ষেপ করবার জন্য? সুতরাং এই অবস্থায় অহিংসার বুলি আওড়ান অবান্তর। জাতির স্বার্থে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়া হবে না, বালুতে মাথা গুঁজে বিপদের দিনের জন্য অপেক্ষা করে কাপুরুষোচিত মৃত্যু বরণ করা হবে, না বৈদিশিক পরমাণু-শস্ত্র বিপদকালে সাহায্যের জন্য স্বভাবতই অগ্রসর হবে—মনের গোপনে কোন্ এই বরাভয় দেশের নেতৃত্বকে পরিচালিত করছে, তার সদুত্তর প্রয়োজন।

দুর্গাপুরে ব্যয়

দুর্গাপুর কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা তারস্বরে ঘোষণা করছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সমবায়ে সংগৃহীত চৌদ্দ লক্ষ টাকা দুর্গাপুর কংগ্রেসে ব্যয় হয়েছে। দুর্গাপুরের উদ্যোক্তারা চৌদ্দ লক্ষ টাকা তুলেছেন না চল্লিশ লক্ষ টাকা তুলেছেন,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের মধ্য দিয়ে কিম্বা পুঁজিপতিদের দানে—তা নিয়ে সাধারণের মনে সংশয় থেকেই যাবে—যতই উচ্চকণ্ঠে প্রচার হোক না কেন। কিন্তু এই স্বীকৃত চৌদ্দলক্ষেরও পাশে বিভিন্ন রাজ্যসরকার, কেন্দ্র সরকার এবং পাব্লিক সেকটেরের সংস্থাগুলি যে সহায়ক ব্যয় করেছে—তা সুকৌশলে চাপা দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনের সমগ্র ব্যয় এই হিসাবে সর্বসাকুল্যে ১ কোটি ১ লক্ষ টাকার কম নয়।

ব্যয়ের ফর্দ বিভিন্ন সংস্থার এইরূপ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাস্তাঘাটের জন্য দশ লক্ষ টাকা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাবদ ডাক ও তার বিভাগ ছয় লক্ষ টাকা, রেলওয়ে চার লক্ষ টাকা নূতন ষ্টেশন বাবদ, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড জল ও বিদ্যুৎ বাবদ তিন লক্ষ টাকা।

প্রদর্শনীতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার চার লক্ষ টাকা, উড়িষ্যা প্রায় দুই লক্ষ টাকা ও অন্যান্য রাজ্য দশ লক্ষ টাকা, রেলওয়ে দপ্তর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, হিন্দুস্থান ষ্টীল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ত্রিশটি পাবলিক সেক্টর ও অন্য প্রজেক্ট সর্বসমেত ব্যয় করেছে ৫২ লক্ষ টাকা।

এছাড়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের রাহা খরচ ও ভাতা, পশ্চিমবঙ্গের ৫০০০ পুলিশের-অফিসারসহ-রাহাখরচ ও ভাতা এবং তাদের যানবাহন সমেত প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সব চাইতে তাজ্জবের কথা ১০ই জানুয়ারী রবিবার ছাড়া দুর্গাপুরে জনসমাগম আদৌ হয় নাই। সেদিন ৮০,০০০ লোক সমাগত হয়েছিল। পরের দিন ৩০০০-এর বেশী নয়। অন্যান্যদিন কয়েক'শ মাত্র। কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোভাযাত্রা আদৌ ভীড় আকর্ষণ করতে পারে নাই।

চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নূতন ষ্টেশনে মাত্র ৩৬ ০০০ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে। এই ষ্টেশন থেকে স্পেশাল গাড়ীগুলির যাতায়াতের সময়-তালিকা প্রচারের জন্য ১২,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে, যাত্রীর অভাবে অনেক স্পেশাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বহুব্যয়ে তৈরী কৃষি-প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য থাকলেও দর্শক নাই।

দুর্গাপুর প্রকাণ্ড অপচয়ের ইতিহাস রেখে গেছে, আর রেখে গেছে কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর। দুর্গাপুর তাই সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে আদৌ সক্ষম হয় নাই।

আয়ুবের জয়

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আয়ুব খাঁ সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফতিমা জিন্নাকে ২১,০০০ ভোটে পরাজিত করে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। যে বিপুল গণসমর্থন ফতিমা জিন্নার স্বপক্ষে পাকিস্তানের সর্বত্র উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ফতিমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচার যে অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান উৎসারিত করেছিল, তার পরও ভোটের এই বিপুল ব্যবধান পাকিস্তানে বিরোধী সমর্থকদের মনে দারুণ হতাশা সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানেও আয়ুব ২২,০০০ ভোট ও ফতিমা জিন্না ১৮,০০০ ভোট পেয়েছেন, অথচ নির্বাচনের পূর্বে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়েছিল এই অঞ্চলে আয়ুবের শোচনীয় পরাজয় সমগ্র নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ঢাকা, করাচী প্রভৃতি, কয়েকটি সহরাঞ্চল ছাড়া সর্বত্রই আয়ুব সংখ্যাধিক্য পেয়েছে। ভয় ও অর্থের লোভ দেখিয়ে আশি হাজার মৌল গণতন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যকে স্ববশে আনা আয়ুবের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

আয়ুবের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানে বিরোধী-দমন সুরু হয়ে গেছে। সম্মিলিত বিরোধীদলের বহু নেতা ও কর্মীদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে গোটা পাকিস্তানকেই একটি "কারাগারে" পরিণত করা হয়েছে। আয়ুবের বিজয় উৎসবের নামে বিরোধী সমর্থকদের উপর দুরন্ত অত্যাচার সুরু হয়েছে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত করাচীর শহরতলীতে নারকীয় অত্যাচারের ফলে বহু ঘর-বাড়ী অগ্নিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়েছে, বহু শিশু নর-নারী হতাহত হয়েছে। আয়ুবের বিজয়োৎসবের নামে এই নির্বিচার লুণ্ঠন ও হত্যা সংঘটিত হয়েছে, কারণ এই অঞ্চলে ফতিমা জিন্না বিপুল সমর্থন লাভ করেছিলেন। আয়ুব ছলে-বলে-কৌশলেই মৌল গণতন্ত্রীদের সমর্থন লাভেই নিরস্ত হয় নাই, ফ্যাসীবাদীদের কায়দায় এবার বিরোধীদের উৎসাদনে উদ্যোগী হয়েছে।

নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন-রুশের বিরুদ্ধে আয়ুবের অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে

এবং এই কারণে 'পাকিস্তান বিপন্ন'—এই আওয়াজ তোলা হয়েছে। কাশ্মীর উদ্ধারের সঙ্কল্পও পাকিস্তানে আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী যেমন পাকিস্তানবাসীদের আশ্বাস দিয়েছেন, তেমনি মালিক ইস্পাহান গুল নামে এক উপজাতীয় নেতা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মজঃফরবাদে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা করেছেন, গেরিলাযুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত ২৫ লক্ষ উপজাতীয় কাশ্মীর দখল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। পাকিস্তান সরকার যেন তাদের বাধা না দেয়। চীনের সঙ্গে যোগসাজসে কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানী হামলার সম্ভাবনা আয়ুবের নির্বাচনের পর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অনিবার্যতাও কাশ্মীর দখলের সাম্প্রতিক হুঙ্কারের ইন্ধন যুগিয়েছে। ভারতের সহিত কাশ্মীরের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির এই ফাঁকটুকু দিয়ে কাশ্মীরের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা স্থায়িত্ব পেয়েছিল, যার পূর্ণ সুযোগ পাক-চক্রীরা এ যাবৎ নিয়ে এসেছে। এবার তার অবসান হল। আয়ুবের পুনর্নির্বাচন একদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের বনিয়াদ দৃঢ়তর করবে, অন্যদিকে অন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পাক-চীনা-সমঝোতার বনিয়াদ দৃঢ়তর করে পাক-ভারত সীমান্তের ও কাশ্মীরের বিপদ ঘনীভূত করে তুলবে। আয়ুবের ভারত-বিদ্বেষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনাপ্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ

মালয়েশিয়া অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গত ১লা জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত অভিযানের সঙ্কল্পও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সিদ্ধান্তে কম্যুনিষ্ট চীন উল্লসিত সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে 'a vile place for a few powers to share spoils' বলে চিহ্নিত করলেও রাশিয়া ইন্দোনেশিয়ার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে পারে নাই। কারণ, এই সিদ্ধান্তের ফলে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া সংঘাতে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে কোনো সংযমের প্রয়োজন থাকবে না এবং ইন্দোনেশিয়া দ্রুত চীনা প্রভাবের কুক্ষিগত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক সংঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।

ঘটনার পরিণতিও সেই দিকে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরে চীন-ইন্দোনেশিয়া—উত্তর ভিয়েৎনাম-উত্তর কোরিয়া জোট তৈরি হবার জল্পনা-কল্পনা চলেছে যার আবর্তে লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামও অবশেষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে। পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষও এই জোটের দিকে তাকে আকর্ষণ করবে।

ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্জনের পর এই কয়দিনের মধ্যেই মালয়েশিয়ায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মালয়েশিয়ার নানা অঞ্চলে ইন্দোনেশিয় গরিলাদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলেছে এবং মালয়েশিয় প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করবার জন্য বৃটিশ নৌবহর, বিমানবহর, ছত্রীবহর ও স্থলসৈন্য আমদানী হয়েছে। কমনওয়েলথের অন্যান্য এলাকা থেকেও সামরিক সাহায্য প্রসারিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার এই অভিযানের পশ্চাতে কম্যুনিষ্ট চীনের উদ্যোগ খুবই সুস্পষ্ট এবং চীন ও ইন্দোনেশিয়া একটি সামরিক জোটে আবদ্ধ হয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। পাকিস্তান, তিব্বত, লাওস, ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়ে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রচ্ছন্ন কিম্বা প্রকাশ্য অভিযান গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চীনা আনুগত্যের সামরিক আওতায় এনে অনায়াসে তার অন্তিম লক্ষ্য ভারতবর্ষকেও আচ্ছন্ন করবে। আন্দামান ও নিকোবরে চীনা অনুপ্রবেশের সংবাদও এই অনুমানকেই সমর্থন করছে। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক পার্শ্ব-পরিবর্তনের পশ্চাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট চীনের সুদূরপ্রসারী আক্রমণাত্মক কৌশল প্রসারিত হচ্ছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Phone : 22-2784 (Office)
35-2730 (Works)

UNITED PAINT INDUSTRIES

Manufacturers & Distillers of Coaltar, Road Tar, Coal Pitch, Creosote Oil-Light & Heavy, Phenyle, Wood Preservatives, Copal Varnish, Black Japan & Bituminous Paints.

40/1, STRAND ROAD, CALCUTTA-1

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩৭১

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভাষাগত গৃহযুদ্ধের পূর্বচ্ছায়া

সরকারী ভাষার প্রশ্নে ভারতবর্ষ আজ এক সর্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের সম্মুখীন। দক্ষিণ ভারতের সাম্প্রতিক ভাষা বিক্ষোভের গুরুত্ব যে কি মারাত্মকভাবে বিপদসম্ভাবী, সেকথার তাৎপর্য এখনও দিল্লীর নেতৃত্ব এবং হিন্দীভাষী অঞ্চল অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। দক্ষিণ ভারতের ঘটনাবলীকে নিন্দা করেও একটি ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে "এরূপ পরিস্থিতিকে পরিহার করার জন্য আমরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি কিনা সেকথাও আমাদের ভেবে দেখতেই হবে। আগে থেকেই সম্ভাব্য ঘটনার অনুধাবন এবং সেই ঘটনাকে ঘটতে না-দেওয়ার মত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বিদ্যমান।" কিন্তু হিন্দী-ভাষী নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত দিল্লীর কর্তৃপক্ষ আগেও এরূপ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি এবং এখনও দিতে প্রস্তুত বলে মনে হয় না। ভাষা সংঘাত আজ এক বিস্ফোরণ বিন্দুতে এসে উপস্থিত, তবুও এই সমস্যা সমাধানের মৌলিক গুরুত্ব অনুধাবনে দিল্লীর নেতৃত্ব এখনও সচেতন হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। সরকারী ভাষা সম্বন্ধে স্বর্গত নেহেরুর অভিমতের দোহাই দিয়ে অথবা 'অফিসিয়েল ভাষা আইনের' ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রীজী বা শ্রীনন্দ ভাষার সমস্যাকে যেভাবে লঘু করে দেখার প্রয়াস পাচ্ছেন তাতে শঙ্কিত হবার কারণ আছে যে দিল্লীর হিন্দী-নেতৃত্বের অক্ষম ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে হিন্দী-বিরোধী বিক্ষোভ এক মারাত্মক পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী থেকে হিন্দীতে সরকারী সার্কুলার পাঠাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই এই হিন্দী-প্রবর্তনের কার্যক্রম অগ্নিমুখ শরের মত গিয়ে আঘাত করেছে দক্ষিণ ভারতের হিন্দী-বিরোধী মনকে। হিন্দী-বিরোধী আগুন জ্বলেছে প্রথমে তামিলনাদে এবং এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তেলেগু, কানাড়ী ও মালায়লমভাষী অঞ্চলে, পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন এখনও প্রসার লাভ করে নি,—কিন্তু পরিবেশ ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে। বাংলা দেশের আবহাওয়াও দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে,—অবস্থা যে

কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। দক্ষিণ ভারতীরা স্বভাবত শান্ত ও ধীর প্রকৃতির। বিপ্লববাদী সংগ্রাম বা আগষ্ট বিপ্লবেও দক্ষিণীরা তীব্র বা উগ্ররূপে মারমুখী হয়ে ওঠেনি, কিন্তু স্বাধীন ভারতে তারা আজ এক প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছে। জনগণতন্ত্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এবং সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অগ্নিদহনে আত্মাহুতি দেওয়ার ফলে দিয়েম-গুষ্ঠের ন্যায় এক কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষিণ ভারতের ভাষা আন্দোলনে পাঁচজন তামিলভাষীর স্বেচ্ছায় ও আদর্শবাদী সংকল্পে আত্মদানের তাৎপর্য যে কত গভীর এবং এরূপ আত্মবিসর্জনের ফলে উদ্ভূত শক্তি-তরঙ্গ যে কী প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে সেকথা এখনও দিল্লীর হিন্দী-নেতৃত্ব বা হিন্দী-ভাষী নেতা ও সংবাদপত্রগুলি অনুধাবন করতে পারেনি। বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা যুগের গণসংগ্রাম দমনে মেসিনগান চালিয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও আগষ্ট বিপ্লবের সময়ে কিন্তু দক্ষিণীদের ভাষা বিক্ষোভের গণ-সংগ্রামকে দমন করার জন্য স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীকে মেসিনগান চালাতে হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনে এ-যাবৎ অগ্নিব্রতে আত্মদান করেছেন পাঁচজন এবং পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন প্রায় ৬০ জন এবং গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ১০০ জনেরও উপরে। উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলি ভাষা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা বা এই আন্দোলন সম্বন্ধে সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন নি। বরং দক্ষিণ ভারতের হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনকে 'গুণ্ডামী', 'অরাজকতা' 'বিনাশ-মূলক কাজ' 'জাতীয়তা বিরোধী কাজ' ইত্যাদি বলে নিন্দিত করে দক্ষিণ ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক গণআন্দোলনকে একটি আইন-শৃংখলার সমস্যারূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করছেন। হিন্দী-নেতৃত্বের এই আত্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গী এক অতি মারাত্মক সম্ভাবনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশকে।

আশ্চর্যের বিষয় হিন্দীর সমর্থনে হিন্দী-অঞ্চলের বাম-দক্ষিণ এবং কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতৃত্ব এক জোট হয়েছেন। ইংরেজী হটিয়ে হিন্দী বসাবার আন্দোলনের সবচেয়ে উগ্র প্রবক্তা হলেন ডঃ রামমনোহর লোহিয়া। যদিও তিনি কংগ্রেস শাসন উৎখাত করার স্বপক্ষে জোর বক্তব্য পেশ করে থাকেন, তবুও তাঁর পশ্চাতে কংগ্রেসের রক্ষণশীল দলের লোকসভার সদস্যদেরই নয় শুধু—হিন্দী অঞ্চলের কংগ্রেসী সভ্যদেরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বস্তুত, হিন্দীভাষী কংগ্রেসী মহল এবং জনসংঘের সবচেয়ে উগ্র ও অগ্রণী প্রবক্তা হলেন ডঃ লোহিয়া এবং হিন্দী-ভাষার প্রশ্নে ডঃ লোহিয়া ও কংগ্রেসের হিন্দী-নেতৃত্ব এবং জনসংঘের সঙ্গে এক অলিখিত আঁতাত গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভাবও বিচিত্র। দক্ষিণ ভারতে তারা পূর্ণভাবে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থন করছেন কিন্তু উত্তর ভারতের হিন্দী অঞ্চলে এই দলের নেতৃত্ব হিন্দীকে সরকারী ভাষা করার পক্ষে মূলত অভিমত প্রকাশ করেছেন। সরকারী মহল থেকে দক্ষিণ ভারতের হিন্দী আন্দোলনের জন্য দ্রাবিড় খাজাঘাম দলের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনকে একটি সংকীর্ণ দলীয় আন্দোলন বলে আখ্যাত করে এরূপ জন আন্দোলনের গুরুত্বকে লাঘব করার চেষ্টা হচ্ছে।

হিন্দী-বিরোধী জন আন্দোলনের বক্তব্য খণ্ডন প্রয়াসে শ্রীনেহেরুর বিঘোষিত নীতির নামে শাস্ত্রীজী যে বেতার-ভাষণ দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন, তার কোন কার্য্যকরী মূল্য নেই। অহিন্দীভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত ছাড়া ইংরেজীর স্থানে হিন্দী প্রবর্তন করা হবে না বলে শ্রীনেহেরু যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন

সেই নীতি অহিন্দী ভাষীদের আশঙ্কা দূর করতে পারে নি। শ্রীনেহেরুর দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে উগ্র হিন্দী নেতৃত্ব যেভাবে হিন্দী প্রবর্তনের প্রয়াসে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তাতেই একথা প্রমাণিত হয়েছে যে নেহেরুর মৌখিক আশ্বাসের মূল্য কতখানি। শ্রীনন্দ সরকারী ভাষা আইনের ব্যাখ্যায় যে বিস্তৃত সরকারী নোট প্রকাশ করেছেন তাতে অহিন্দী ভাষীদের আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই বক্তব্যে বলা হচ্ছে যে ভাষা বিলে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তাই যথেষ্ট এবং নতুন আইন প্রবর্তন বা সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। শ্রীনন্দের নোটে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে যুগপৎ ইংরেজী ও হিন্দী প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই,—শুধু অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলির জন্য ইংরেজী ব্যবহার করা হবে। সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রেও হিন্দীকে ইংরেজীর সঙ্গে পরীক্ষার মাধ্যম করার এবং ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শ্রীনন্দের নোটে মূলত সেই নীতিকেই সমর্থন করা হয়েছে। অবশ্য পার্লামেণ্টারী বিল রচনা, সরকারী গেজেট প্রকাশ ও সুপ্রীম কোর্টের ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়ে এই নোটে জানান হয়েছে যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইংরাজী বহাল থাকবে।

শাস্ত্রীর বক্তব্য বা নন্দের নোট বর্তমান ভাষা সমস্যার সমাধানে শুধু অপর্যাপ্ত নয় অকার্য্যকরও বটে। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো এই যে সরকারী ভাষা সম্বন্ধে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক নীতির আরও প্রয়োজন সে সম্বন্ধে সরকারী প্রবক্তাদের চৈতন্য নেই,—তারা মনে করেন যে হিন্দী নীতির উপরে একটু ইংরেজীর প্রলেপ দিলেই সরকারী ভাষা সমস্যার সমাধান হবে। সরকারী ভাষা সমস্যার সমাধানে সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবের বক্তব্য আরও বিস্ময়কর। তিনি ভাষা সমস্যার সমাধানে হিংসাত্মক কার্যক্রম পরিহার এবং হিন্দীভাষীদের উপরে ইংরেজী এবং অহিন্দীভাষীদের উপরে হিন্দী চাপাবার বিরোধিতা করেছেন। গত সতের বছরের কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাসে এমন একটি সমস্যা নেই যা জনতাকে রক্তাক্ত বিক্ষোভের পথে ঠেলে না দিয়ে সরকার দূরদর্শী নীতিদ্বারা যথাসময়ে সমাধান করেছে। দ্বিতীয়তঃ সরকারী ভাষা সম্বন্ধে তিনি যে নীতির কথা বলেছেন তার অর্থ ভারতবর্ষকে সরকারী ভাষার প্রশ্নে স্থায়ীভাবে দুইটি গোষ্ঠিতে পরিণত করা এবং পরিণামে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে দুইটি ভাষাগত রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হবার দিকে ঠেলে দেওয়া।

বিদেশী-ভাষা ইংরেজীর পরিবর্তে একমাত্র হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার যোগ্য এবং এই ভাষার প্রবর্তনেই জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে বলে একটি প্রচারকে স্বতঃসিদ্ধান্তে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। এরূপ বক্তব্য অতাত্ত্বিক এবং ভিত্তিহীন হওয়া সত্বেও অহিন্দী ভাষী জনতা হিন্দীকে একটি সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করতে বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দী নেতৃত্ব শুধু হিন্দীকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে প্রবর্তনেই সন্তুষ্ট নয়—এই নেতৃত্ব ইংরেজীকে সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে হিন্দীকে একচ্ছত্র ভাষারূপে প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর। এদের বক্তব্য এই যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা এবং জনতার ভাষা নয় তথা একটি বিশেষ সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণীর ভাষা। এরূপ নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দে ভুলে যান যে দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দী ও ভাষাগত ও ভৌগলিক অর্থে একটি 'বিদেশী' ভাষা এবং অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে বর্তমান 'ইংরেজী শিক্ষিত' বিশেষ সুবিধাভোগী ও কুলীন শ্রেণীর পরিবর্তে একটি 'হিন্দী শিক্ষিত' শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করার প্রচেষ্টার মধ্যে জাতীয় মর্যাদা ও জনতার ভাষা ইত্যাদির নামে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষা ও হিন্দীভাষীদের আধিপত্য ও কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার সচেতন বা অচেতন প্রয়াস রয়েছে

সেকথা অহিন্দী ভাষী জনতার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

ইংরেজী আজ আন্তর্জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ এসিয়ার সমস্ত দেশে এবং ইয়োরোপ ও এসিয়ার কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে ইংরেজী শিক্ষাদানের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় প্রগতির অন্যতম কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ লাভ। যারা বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী বর্জ্জনের পক্ষপাতী তারাও ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অজস্রভাবে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও রেওয়াজের অনুসরণ করে থাকেন।

আজ ভারতের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে পুনর্বিচার এবং মৌলিক নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সংবিধান পরিবর্ত্তন ও আইন প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে এই নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যে :

প্রথমতঃ, রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক, বিচার ও জনতার পারস্পরিক ভাবাত্মক আদান-প্রদানের ভাষা হবে আঞ্চলিক ভাষা।

দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার এবং আর্টস বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার বাহন হবে আঞ্চলিক ভাষা।

তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল শিক্ষার সর্বভারতীয় শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী।

চতুর্থতঃ, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বাহন হবে একমাত্র ইংরেজী ভাষা। অথবা, ইংরেজী ও হিন্দীকে অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে গণ্য করে ভারতের চৌদ্দটি জাতীয় ভাষাকেই পরীক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, সর্বভারতীয় সরকারী ভাষা হবে সমমর্য্যাদা ও সমভরূপে ইংরেজী এবং হিন্দী এবং সমস্ত সরকারী কাজকর্মে যুগপৎ ইংরেজী ও হিন্দী প্রবর্ত্তন করতে হবে।

এরূপ নীতি প্রবর্ত্তনেও হিন্দী ভাষা ও হিন্দী ভাষী জনগোষ্ঠি অহিন্দী ভাষীদের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা লাভ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভাষার নামে যদি হিন্দীকেই একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করা হয় তা হলে ভারতবর্ষকে ভাষার প্রশ্নে গৃহযুদ্ধে ও ভাঙনের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। দক্ষিণীরা স্থায়ীভাবে ইংরেজীকে অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী। এই দাবী স্বীকৃত না হলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীবিরোধী আন্দোলন স্বাধীন দ্রাবিড়ীস্থানের বিচ্ছেদাত্মক আন্দোলনে পরিণত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলে 'নতুন পাকিস্থান' প্রবর্ত্তনের পথ প্রশস্ত করে দেবে। হিন্দী ভাষী জনতার ভোট পাওয়ার সংকীর্ণ প্রশ্নের চেয়েও ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্ন আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাষার প্রশ্নে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আজ ভোটের স্বার্থের চেয়ে জাতীয় ঐক্যের সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

সমাজবাদী আন্দোলনে ভাঙন

গত বছর জুন মাসে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি ও সোস্যালিষ্ট পার্টির মিলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমাজবাদী আন্দোলন যে প্রবল প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল, বারাণসীতে গত ৩১শে জানুয়ারী সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট দলের সম্মেলনে প্রাক্তন প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব কর্ত্তৃক এই দুই দলের সংযুক্তি বিলোপ ঘোষণার পরিণতিতে সেই প্রতিশ্রুতি বিলীন হল। সংযুক্তির অল্প কালের মধ্যে সংযুক্ত দলের গড়নে ধীরে ধীরে ফাটল দেখা দিয়েছিল, তার কারণ, সংযুক্তির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রাক্তন সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া তার দলকে নিঃসর্ত সংযুক্তির পরামর্শ দিয়েও, নিজে সংযুক্ত দলের সদস্য পদ গ্রহণের পূর্বে এই দল কর্ত্তৃক পাঁচটি সর্ত

পূরণের দাবী জানালেন। সেই সময় থেকেই সংযুক্তিতে ভাঙনের গোড়া পত্তন হল এবং ধীরে ধীরে সংযুক্ত দলের অভ্যন্তরে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণভাবে লোহিয়া-ভক্তরা সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের চাইতে ডঃ লোহিয়ার প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিতে সুরু করে। এই দুই আনুগত্যের টানা-পোড়েনে তাদের আচার-আচরণে ও মতপ্রকাশে সর্ব স্তরেই পার্টি-বৈপরীত্য ও নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে পার্টিকে অচল করে তোলে শুধু তাই নয়, সংযুক্তির অপর অংশীদার প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের সততা ও সমাজবাদী নিষ্ঠার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কটূক্তি ও কটাক্ষের দৌরাত্ম্যে তাদের জর্জরিত করে ভাঙনের মানসিকতা অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।

নীতির দিক থেকে এই দুই দলের মতবৈষম্য, পার্টির কাঠামোতে আচার-আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধের দ্বন্দ্বকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল। এ-বিষয়েও ডঃ লোহিয়া অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন। সংযুক্তির পূর্বে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি কম্যুনিষ্ট-জনসংঘ-স্বতন্ত্র-লীগ নিরপেক্ষ কংগ্রেস বিরোধিতায় বিকল্প দলের দৃঢ় লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৬৩ সালের ভূপাল সম্মেলনে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির এই রূপায়ন ঘটেছিল। অপরপক্ষে সেই বছর সোস্যালিষ্ট পার্টির সম্মেলন অন্ত-নিরপেক্ষ একাকীত্ব বর্জন করে সকল বিরোধীদের সহায়তায় কংগ্রেস শাসন অপসারণের লক্ষ্য গ্রহণ করে। ফারাক্কাবাদের উপ-নির্বাচনে পাঁচমেশালী বিরোধীশক্তির সমবায়ে জয়ী হয়ে ডঃ লোহিয়া ও তার অনুচরেরা এই নির্বাচনী-কৌশলকে বুনিয়াদী নীতির পর্যায়ে উন্নীত কোরে, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির ওপর চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পার্টির অভ্যন্তরে এই নীতি-বিরোধী নেতৃত্বকে নানা অশোভন আখ্যায় আখ্যায়িত করতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় যে বিপদ ও দেশদ্রোহিতার আনুকূল্য নিহিত আছে, জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র-লীগ প্রভৃতিদলের সঙ্গে সমঝোতায় সমাজবাদী ও অসাম্প্রদায়িকতার মৌলিক নীতি বিসর্জনের যে অবশ্যম্ভাবিতা নিহিত আছে, নির্বাচনে আসন লাভের জন্য লোহিয়াপন্থীদের কাছে তা মূল্যহীন হলেও প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃত্বের কাছে তা আদৌ গ্রহণীয় ছিল না।

এই পটভূমিকায় বানারাস সম্মেলন আহুত হয়েছিল। তীব্রতর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ফ্যাসীসুলভ কায়দায় ব্যক্তিবাদের সুতীক্ষ্ণ আবেগ ও আবেদন সহকারে লোহিয়াপন্থীদের উদ্যোগ, গুরুতর রাজনৈতিক বিতর্কের জন্য সুস্থ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ কলুষিত করে দিয়েছিল। যুক্তির যেখানে অবকাশ কম, রাজনৈতিক বিতর্কের গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেখানে লাঞ্ছিত, গণতান্ত্রিক সমাধানের পরিবর্তে যেখানে বলপ্রয়োগের প্রবণতা প্রবল—সেখানে রাজনীতিতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। বানারাসেও তাই ঘটেছে। এই পরিণতির কলুষ থেকে সমাজবাদী আন্দোলনের পরিত্রাণের জন্য সংযুক্ত দলের অভ্যন্তরে প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব সংযুক্তির বিলোপ ঘোষণা করে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি পুনরুজ্জীবিত করে। সংযুক্ত সমাজবাদী আন্দোলনের সম্ভাবনায় ভবিষ্যত কিছু কালের জন্য চুরমার হয়ে গেল।

মাত্র কয়েকজনের সমবেত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে উপস্থাপিত করে সংযুক্তি বিলোপের যে পদ্ধতি প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তা সমর্থনীয় নয়। সম্মেলন আহ্বানের পর যে কোনো সমবেত সিদ্ধান্তের শরীক—যে সিদ্ধান্তের সঙ্গে মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে—সম্মেলনের প্রতিনিধিদের করতে হবে। সে সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের সমর্থন থাকলেও তাতে ক্ষতি নেই। প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব এ-ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতার ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের

পরিচয় দিয়েছেন। অথচ, সংযুক্তির সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান সাধন সম্মেলনেই হতে পারতো।

পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু নির্যাতন

নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অনেক রকম আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত না হতেই সংখ্যালঘুদের উপরে সরকারী নির্য্যাতন সুরু হয় এবং পাক-পার্লামেন্ট ও আইন সভার নির্বাচনের পর্বেও সেই নির্য্যাতন অব্যাহত হয়েছে। সংখ্যানুপাতে পূর্ব-বঙ্গে সংখ্যালঘু মৌল গণতন্ত্রীদের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নির্বাচিত সংখ্যালঘু প্রতি-নিধিদের সংখ্যা সম্ভাব্য সংখ্যার এক ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বাহ্নে এই সংখ্যালঘু মৌল গণতন্ত্রী-দের ভীতি প্রদর্শন করে আয়ুবকে ভোটদানে বাধ্য করার জন্য অনেক সংখ্যালঘু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিচিত যোদ্ধা এবং পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আরেকজন মন্ত্রী ও সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন ধর সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মার্শাল আয়ুব সংখ্যালঘুদের ভোট আদায়ের চেষ্টা করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালীন আটক সংখ্যালঘু নেতাদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি, উপরন্তু পাক-নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বে আবার সরকারী উদ্যোগে সংখ্যালঘু নির্যাতন সুরু হয়েছে। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ এলাকায়,—যে এলাকা এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ছিল,—সেই এলাকায় সম্প্রতি স্থানীয় সংখ্যালঘুরা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। পুলিস এই সম্মেলন নির্মমভাবে ভেঙ্গে দেয় এবং সংখ্যালঘু নেতাদের গ্রেপ্তার করে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের মধ্যে নেতাজীর অনুগামী ও ফরিদপুর এলাকার বিশিষ্ট নেতা শ্রীফণি মজুমদার অন্যতম।

সরকারী উদ্যোগে সংখ্যালঘু নির্য্যাতনের এই শোচনীয় ঘটনার মধ্যেও তবু আশ্বাসের কথা এই যে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ ও ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবর্গ ও সংবাদপত্রগুলি সংখ্যালঘু নেতৃবর্গের এরূপ গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ফরিদপুরের উকীল লাইব্রেরী গোপালগঞ্জের সরকারী নির্য্যাতন ও সংখ্যালঘু নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সম্প্রতি সংখ্যালঘু কমিশন পুনরুজ্জীবিত করে তার মধ্যে এমন একজন সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছে যিনি সংখ্যালঘু হলেও তাদের নেতা বা যোগ্য প্রতিনিধি নন।

পাক-চীন আক্রমণ কি প্রত্যাসন্ন ?

চীন ও পাকিস্তান ভারতের প্রতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে চরম বৈরীমনোভাব পোষণ ও প্রকাশ করছে এবং সেই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে ভারত সীমান্তের সংলগ্নে ব্যাপকভাবে সৈন্যসমাবেশ করেছে সেই ঘটনাবলী থেকে একটি মাত্র প্রশ্নই আজ ভারতীয় জনতার মনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে পাক-চীন আঁতাত কি অবিলম্বে এবং যুগপৎ ভারতের তিন সীমান্তের সামরিক সংঘাত সুরু করবে? পাক-চীনের আঁতাত ও চক্রান্ত, পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক শক্তিরূপে ব্যাপক সংখ্যায় চীনাদের অনুপ্রবেশ, তিব্বত সীমান্তে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি ও বিমান ঘাঁটি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, পাকেন সামার অপসারণ এবং সর্বোপরি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিপদজনক সামরিক পরিস্থিতি ও মালয় ও ইন্দো-নেশিয়ার সংঘাত আজ এক মারাত্মক সামরিক সম্ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যে কোন মুহূর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় ব্যাপক ও ভয়াবহ সামরিক দাবানল জ্বলে উঠতে পারে এবং সেই আগুনের শিখা থেকে ভারত অব্যাহতি পাবে না।

সম্প্রতি আয়ুব এক হুমকি দিয়ে বলেছেন যে অবিলম্বে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে শীঘ্রই তিনি 'সক্রিয় পন্থা'

গ্রহণ করবেন। ঠিক এরূপ উক্তি করার পরেই তিনি মার্চ মাসে চীন পরিদর্শনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি গত নির্বাচনে মিস জিন্নাকে সমর্থন করে কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও পিকিং ফ্যাসীবাদী আয়ুবকে সমর্থন জানায়। রাজনৈতিক আদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনেই যে চীন আয়ুবের সঙ্গে আতাঁত করেছে একথা বোঝা দুর্বোধ্য নয়। পোল্যাণ্ড আক্রমণ এবং পরে পশ্চিম দিকে অভিযানের জন্য যেরূপ সামরিক প্রয়োজনে ফ্যাসিষ্ট হিটলার কম্যুনিষ্ট ষ্ট্যালিনের সঙ্গে চুক্তি করেছিল ঠিক তেমনি ভারতকে সামরিক ক্ষেত্রে বিপন্ন করার জন্যই কম্যুনিষ্ট মাও-সে-তুঙ ফ্যাসিষ্ট আয়ুবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এই আতাঁতের সামরিক লক্ষ্য ভারতকে যুগপৎ তিন সীমান্ত থেকে বিপন্ন করা।

ভারত সীমান্ত যখন পাক-চীন দ্বারা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি? ভারত সর্বস্তরে অচেতন, অব্যবস্থিত এবং সংকল্পহীন জাতীয় সুরক্ষা সম্বন্ধে যে জাতীয় চৈতন্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন, জরুরী অবস্থা বহাল রেখে এবং দলগত স্বার্থে সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও,—সে সম্বন্ধে কোন জাতীয় তৎপরতা নেই। আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার প্রশ্নে পিকিং-অনুচর কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অথচ এরূপ গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তথ্য জ্ঞাপনের প্রয়াস নেই। শেখ আবদুল্লা সুস্পষ্টভাবে ভারত-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও 'হজ' করার অছিলায় এই কাশ্মীর নেতাকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ সাজসের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি ভারতে যে খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বে-সামরিক জনতার মনে স্বস্তির মনোভাব সৃষ্টি করে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনও ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতের আভ্যন্তরীণ জনজীবনে হতাশা ও বিক্ষোভের আবহাওয়া যখন তীব্র আকার ধারণ করেছে সেই সময়ে ভাষার দ্বন্দ্ব প্রচণ্ড গণবিক্ষোভে পরিণত হয়ে শেষে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ভারতের সীমান্তে বিপর্যয়ী পরিস্থিতির সম্ভাবনা সুস্পষ্ট কিন্তু ভারত সরকারের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চৈতন্য এবং প্রস্তুতি নেই।

শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আন্দোলন

১৪ই ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে প্রায় বিশ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক একদিনের প্রতীক অনশন ধর্মঘট করে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। দিল্লীর অনশনব্রতী শিক্ষকরা এগার দফা দাবী সহ একটি স্মারকলিপি পেশ করেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রাক্তন শিক্ষাব্রতী ডঃ রাধাকৃষ্ণানের কাছে। এই দাবীগুলির মধ্যে মাগ্‌গীভাতা দান, শিক্ষকদের পেনসন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা, অভিজ্ঞতানুযায়ী বেতনের হার নির্ধারণ, বি. টি. পরীক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, চতুর্থ পরিকল্পনার শিক্ষা খাতে ২,২০০ কোটি টাকা ধার্য করে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, শিক্ষকদের প্রাপ্য সুবিধা কেরাণীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

অন্যদিকে কলেজের অধ্যাপকরাও পরীক্ষা-বয়কটের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্দোলন সুরু করেছেন। অধ্যাপকদের দাবীগুলির মধ্যে নিয়মিত বেতনদান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতনহারকে নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করা, সরকারী ও বেসরকারী কলেজে সমভাবে বেতন নীতি প্রবর্তন, প্রতি কলেজে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা, কলেজ শিক্ষকদের বেতন হারের পুনর্বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধ্যাপকেরা এর মধ্যে কয়েকটি মৌন শোভাযাত্রাও পরিচালনা করেছেন। যদি অধ্যাপকদের

দাবী পূর্ণ না হয় তা' হলে অধ্যাপক সমিতি পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত করেছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যাদের উপরে জাতি গঠনের ভার অর্পিত রয়েছে সেই শিক্ষকশ্রেণী আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের শিক্ষক সমাজ শুধু বেতনের দিক থেকেই নয়, অন্যান্য সুবিধাদির দিক থেকেও চরমভাবে অবহেলিত। আর্থিক অসঙ্গতি ইত্যাদির অনেক অজুহাত সরকারের আছে কিন্তু সমস্ত অজুহাত খণ্ডন করে এই মূল কথাটি গৃহীত হওয়া উচিত যে যাদের উপরে ভবিষ্যত বংশধরদের গঠনের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলি পূর্ণ করা সরকারের বিশেষ ও আশু কর্তব্য।

বৃটিশ নেতা চার্চিলের দেহান্তর

বৃটিশ জাতিকে যিনি দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে ভরাডুবীর হাত থেকে রক্ষা করে প্রায় সুনিশ্চিত পরাজয়কে অকল্পনীয় বিজয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং মিত্রশক্তির অন্যতম নেতারূপে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেই যুদ্ধকালীন বৃটিশ নেতা উইনষ্টন চার্চিল বৃদ্ধ বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যে ডাকে তিনি যুদ্ধের সময়ে ভগ্নপ্রায় বৃটিশ জাতির মনোবল রক্ষা করে ধীরে ধীরে জার্মান আক্রমণের প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে যুদ্ধপ্রস্তুতির দিকে বৃটিশ জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং একদিকে আমেরিকা ও অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত করে হিটলারের চরম বিজয়কে চরম পরাজয়ে পরিণত করার কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ইতিহাসে এক অপূর্ব নিদর্শনরূপে লিপিবদ্ধ থাকবে। উচ্চ রাজনৈতিক ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বংশে জন্মলাভ করেও যৌবনে বুয়রযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করে তিনি জীবনের প্রারম্ভেই ভবিষ্যত সম্ভাবনার বীজ বপন করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা সংকটকালীন স্থির ও বাস্তববুদ্ধি, সামরিক অধিনায়কত্ব—বৃটিশ জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করবে। চার্চিল নেতৃত্ব লাভে সক্ষম না হলে বৃটিশ জাতি হয়তো হিটলারের কাছে প্রথম পর্বের আঘাতেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে চার্চিল সম্বন্ধে সুখ্যাতি করার কিছু নেই—কারণ তিনি প্রতিপর্বে ও প্রতি পদক্ষেপে একজন কঠোর সংরক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীরূপে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে অস্বীকার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার কোনরূপ নির্মম পন্থা গ্রহণেও পশ্চাৎপদ হননি। তবুও বৃটিশ জাতির অন্যতম নেতারূপে এবং সংকটকালীন যোগ্য, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে তিনি সকল জাতিরই শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন। অক্ষ শক্তিকে পরাজিত করার অন্যতম নায়করূপে চার্চিল প্রসিদ্ধি লাভ করলেও অক্ষশক্তির পরাজয় যে মিত্রশক্তির পরিপূর্ণ জয়ে পরিণত হয়নি যুদ্ধান্তে বারটি নতুন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের জন্ম তার স্বাক্ষর। চার্চিল নেতৃত্ব অক্ষ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রী শক্তিকে পূর্ণ বিজয়ের প্রতিষ্ঠাদানে সক্ষম হয়নি, ভবিষ্যতের ইতিহাসে এই মন্তব্য চার্চিল-জীবনের সুখ্যাতির অনুসঙ্গী হয়ে থাকবে।

পরলোকে পূর্ববঙ্গের নেতা শ্রীবসন্ত কুমার দাস

সিলেটের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস পরিণত বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। আসামের প্রথম কংগ্রেস সরকারের সময়ে তিনি আসাম আইনসভার স্পীকার ছিলেন এবং দেশভাগের পরে তিনি পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতারূপে এর বিভিন্ন মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে সংখ্যালঘুদের সেবা করেন। শারীরিক কারণে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তিনি বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েও পূর্ববঙ্গে থেকে যান এবং সেখানকার দুর্গত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিরুপায় হয়ে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসেন। পূর্ববঙ্গের চরম দুর্গতির দিনে তিনি যেভাবে সংখ্যালঘু সমাজের সেবা করেছেন সেজন্য আমরা স্বর্গত বসন্তকুমার দাসের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই। ১৮.২.৬৫

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায়

লীলা রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

খিলাফৎ আন্দোলনের বছরগুলিতে যে স্বল্পকাল স্থায়ী হিন্দু মুস্লিম-ঐক্য সম্পাদিত হয়েছিল তার ভিত্তির কৃত্রিমতা ধরা পড়লো ঐ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তীব্রতর রূপে সম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সুরু হোলো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'তানজিম' ও 'তবলীগ' এবং 'সংগঠন' আন্দোলন সুরু করলো বিশেষত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে যে সকল হিন্দুরা অবস্থার চাপে পড়ে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করেছে তাদের হিন্দুধর্মে পুনঃপ্রবেশের ব্যবস্থা করা হোলো শুদ্ধির দ্বারা। মুসলমানরা এই আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতা করতে লাগলো এবং এই সংঘর্ষের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট নামক মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সনে মুসলমানদের দ্বারা সংখ্যালঘু হিন্দুরা গুরুতর ভাবে অত্যাচারিত হয়। কংগ্রেস, মুস্লিমলীগ ও হিন্দুসভা এই তিনটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল এই ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করে—কংগ্রেস কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারূপ না করে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো, মুসলীম লীগ মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের অত্যাচারের পূর্বে হিন্দুরা মুসলমানদের বিরক্তির কারণ দিয়েছে বলে মন্তব্য করল, হিন্দুসভা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষয় ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং লাজপত রায় মন্তব্য করেন হিন্দুরা যদি অন্যায়ও করে থাকে তবু যে শাস্তি তাদের দেয়া হয়েছে তারা তা পাবার যোগ্য ছিল কি না? কংগ্রেস থেকে গান্ধিজী ও শৌকত আলিকে নিয়ে যুগ্ম অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হোলো কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারেন নি। ১৯২৩ এর কোকানাদ কংগ্রেসে ডাঃ আনসারি ও লালা লাজপৎ রায় একটি খসড়া প্যাক্ট ও বাংলা দেশে সি আর দাসের নেতৃত্বে বাংলার জন্য হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট সত্ত্বেও সম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হয়নি। গান্ধিজী গভীর বেদনায় ২১ দিনের আত্মশুদ্ধির জন্য ১৯২৪ ১৭ই সেপ্টেম্বর অনশন সুরু করলেন। দিল্লীতে ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করলেন মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যুক্তভাবে। ৩০০ প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন ও গান্ধিজীকে অনশন ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন, তা সত্ত্বেও গান্ধিজী পূর্ণ ২১ দিন অনশন করলেন। কিন্তু গান্ধিজীর অনশনকালেও অব্যবহিত পরেও ভারতবর্ষের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিল। গান্ধিজীর নেতৃত্বে ১৯২৪শের ডিসেম্বরে বহু আলাপ আলোচনা হোলো এই সমস্ত আলাপ আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বিভিন্ন আইন সভাতে দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্ধারণ। হিন্দু নেতারা বলেন কোহাটের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তাতে এ সময় সমস্যা মীমাংসার উপযুক্ত নয়, কিন্তু মুস্লিম নেতাদের মত ছিল আইন সভায় প্রতিনিধি সংখ্যা নিয়ে মত বিরোধের ফল হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ গুলি। গ্রন্থকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে মুস্লিম নেতারাই বাস্তব সত্যের কাছাকাছি ছিলেন, হিন্দু নেতারা নয় ঐসব আলোচনায় কোনো ফল লাভই হোল না। গান্ধিজী ১৯২৫ জানুয়ারী থেকে এই সব সম্প্রদায়িক মীমাংসার প্রচেষ্টা থেকে দূরে রইলেন।

ইতিমধ্যে একজন মুসলমান ১৯২৬ ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে। ১৯২২—১৯২৭ এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৪৫০ হত ও ৫০০০ আহত হয়।

অন্যদিকে বিদেশী শাসকদের ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহার ও মনোভবের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় তীব্রতা এনে দিল। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে আইন ও শাসনের ব্যাপারে নির্লজ্জ বৈষম্য মূলক ব্যবহার, ব্যক্তিগত জঘন্যতম অপরাধেও ইংরেজদের কোন শাস্তি না হওয়া, এদেশের মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে কুৎসিৎ মন্তব্য এবং তাদের প্রতি ঘৃণ্য অপরাধেও কোনো শাস্তি না হওয়া, বিনা বিচারে দেশপ্রেমিক তরুণদের বছরের পর বছর আটক বন্দী করে রাখা এবং তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালানো, এই সব ঘটনায় ইংরেজদের ন্যায়বিচার ও সততার উপর ভারতীয়েরা সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। স্বাধীনতার প্রতি আদর্শগত প্রীতির অপেক্ষা বিদেশী শাসকদের এই মনোভাব ও ব্যবহার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি গ্রন্থকারের এই মন্তব্যের যথার্থতা সমসাময়িকদের নিকট সত্য বলে অনুভূত ও স্বীকৃত হবে।

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ মনোভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হিসাবে গ্রন্থকারের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। আধুনিক কালে শ্রেষ্ঠ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অনবরত ইংরেজদের কাছে প্রচার করছিলেন প্রতি ৫ জন ইংরেজের একজনকে ভারতবর্ষ ভরণপোষণ করে। ভারতের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট লর্ড বার্কেনহেড ১৯২৫ ৭ই জুলাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ নীতি বিবৃত করতে গিয়ে বলেছিলেন "of the 440 millions of British citizens who constitute the British Empire, 320 millions are Indian. The loss of India would mean a shrinkage in the Empire from 13,250,000 to less then 11,500,00 sq miles" এবার ইংরেজ জনসাধারণের মনোভাবের পরিচায়ক হিসাবে দুটো বিবৃতি উল্লেখ করছি। পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত নায়ক মাইকেল ওডায়ার ভুল ও মিথ্যা তথ্যে পূর্ণ India at Stake নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ইংলণ্ডে যা উচ্চ প্রশংসিত হয়। Sunday Express বহু ইংরেজ জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ করে মন্তব্য করে "in the last resort we hold India by the sword and as guardians of civilization we dare not let it slip from our grasp."

অন্য একটি উদ্ধৃতি আরো স্পষ্টবাদিতার দাবী রাখে Joynson Hicks নামে একজন ইংরেজের উক্তি বহু ইংরেজের মনোভাবের পরিচায়ক "We conquered India by the sword and by the sword we should continue to hold it, I am not such a hypocrite as to say we hold India for the Indians. "We went with a yard stick in one hand and a sword in the other, with the latter we shall continue to hold them helpless while we force the former down their throats"

এর সঙ্গে ইংরেজের ভেদনীতির পরিচয় লর্ড অলিভারের —যিনি একসময় ভারতের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ছিলেন— উক্তিতে পাওয়া যাবে "no one with close acquaintance of Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is predominant bias in British officialism in favour of the Moslem community partly on the ground of closer sympathy but more largely as a make-weight against Hindu Nationalism.

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ভারতবর্ষের পরবর্তি ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৯ এর ভারতসরকারের আইন অনুযায়ী প্রতি দশ বৎসর অন্তর অন্তর রিফর্মস এর কার্যকারিতা বিচার, দায়িত্বশীল শাসনের পরিধি বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কমিশনের ব্যবস্থা ছিল সে অনুযায়ী রিফর্মসের কার্যকাল শেষ হবার দুবৎসর পূর্বে অকস্মাৎ ১৯২৭ ৯ই নভেম্বর সম্পূর্ণ ইংরেজদের নিয়ে গঠিত সার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটী কমিশনের কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতবাসীদের জন্য ভবিষ্যৎ সংবিধান গঠনের ব্যাপারে ভারতীয়দের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া এতই অস্বাভাবিক ও যুক্তিহীন ছিল যে সমস্ত ভারতবর্ষ তীব্র ক্ষোভ ও হতাশায় ফেটে পড়লো। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন সাম্প্রতিক কালের স্মরণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় নেতাদের এমন ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া আর দেখা যায়নি।

১৯২৮ এর ৩রা ফেব্রুয়ারি বম্বেতে সাইমন কমিশনের পদার্পণের দিন ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় সহরে সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয় এবং সর্বত্র 'সাইমন চলে যাও' অঙ্কিত বিরাট বিরাট পতাকাসহ বিশাল মিছিলে সারা ভারতবর্ষের ধিক্কার ও ঘৃণা কমিশনের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়।

সাইমন কমিশনের আগমনের ফলে একটি শুভ প্রতিক্রিয়া এই হোলো যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান গঠন সম্বন্ধে যথার্থভাবে সচেতন হোলেন এবং ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সনে দিল্লীতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনার পর ১৯২৮, ২৮-৩১ আগষ্ট পর্যন্ত লক্ষৌতে সর্বদলীয় কনফারেন্স মিলিত হয়ে সংবিধান সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির বিস্তৃত সুপারিশ গ্রহণ করলেন। নেহেরু কমিটির শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলি ছিল—

(১) পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন; অর্থাৎ প্রশাসনিক বিভাগ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সার্বভৌমিক ক্ষমতাযুক্ত আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকবে।

(২) সার্বভৌম পার্লামেন্টে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত ২০০ প্রতিনিধি বিশিষ্ট সেনেট ও প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত ৫০০ সভ্যবিশিষ্ট হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস্ থাকবে।

আইনসভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিম্নমত হবে (ক) হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচন।

(খ) সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য এবং অ-মুসলমানদের জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত কোথাও সংরক্ষিত আসন সংখ্যা থাকবে না।

(গ) পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে কোন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে না।

(ঘ) অন্যান্য প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধি সংখ্যা সংরক্ষিত থাকবে তবে তারা অতিরিক্ত ক্ষেত্রেও নির্বাচন অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

কিন্তু লক্ষৌর একতা ১৯২৮ এর ২২শে ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনসনে টিকল না। এবং এই সময়েই মুস্লিম সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে মহম্মদ আলী জিন্নার আবির্ভাব হোলো, এবং মুস্লিম লিগের পক্ষ থেকে তিনি নিম্নে উল্লিখিত নূতন দাবীগুলি দিলেন।

(ক) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ (খ) পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে যদি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার না থাকে তবে দশবৎসরের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য প্রতিনিধিত্ব (গ) এবং রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা কেন্দ্রের উপর অর্পিত না হয়ে প্রদেশের হাতে থাকবে। উত্তপ্ত ঝগড়াঝাটির মধ্যে জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি পরাজিত হলে তিনি কনভেনসন ত্যাগ করে গেলেন,

পরের দিন শিখরাও কনভেনশন পরিত্যাগ করার ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কনভেনশন স্থগিত ঘোষিত হোল।

তারপর থেকে মিঃ জিন্না প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগ দিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯২৯এর জানুয়ারীতে দিল্লীতে সম্মিলিত হয়ে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর নীতি সমর্থন করলো। মুসলমান ব্যতীত ও শিখ অ-ব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীরাও সম্পূর্ণভাবে নেহেরু সংবিধান অনুমোদন করেনি। তবে এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত দল ও শ্রেণীর মধ্যে ভারতবর্ষে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ মত ছিল এ কথা অনেকে মনে রাখেন না।

ক্রমেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তীব্রতর ও জোরালো হয়ে উঠলো এ সম্পর্কে একটী গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা এই সময়কার মনোভাবের সুন্দর পরিচয় দেবে। ১৯২৮ নভেম্বর কানপুরে সর্বদলীয় মুস্লিম কনফারেন্স চলা কালে কয়েকজন সভ্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর বিরোধিতা করলে, পর্দার আড়াল থেকে মহিলা প্রতিনিধিরা সভাপতির নিকট একটী লিখিত বিবৃতি পাঠান যে যদি পুরুষরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবার সাহস না রাখেন তবে (তাঁরা মহিলারা) পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের (পুরুষদের) স্থান অধিকার করে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এর প্রতিক্রিয়া আশানুরূপ হোলো এবং মাত্র একজনের বিরুদ্ধতায় ভোটে গৃহীত হল।

জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় ১৯২৮ শের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় গান্ধিজী দুপক্ষের মতের মধ্যে আপোষ রক্ষা হিসাবে ডমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে তরুণদল এর প্রবল বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু ৯৭৩ পক্ষে ও ১৩৫০ বিপক্ষ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব পরাজিত হয়। এই প্রস্তাব বামপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির পরিচায়ক। সুভাষচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন। "দেশ তৈরী ছিল কিন্তু নেতারা ছিলেন না।" ফলে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হোলো। যে প্রস্তাব সাইমন কমিশন গঠিত হবার পরেই অন্ততঃ কলকাতা কংগ্রেসে নেয়া উচিত ছিল তা নিতে নিতে ১৯২৯ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে হোলো। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন একথা নিঃসন্দেহযে কংগ্রেসের নরমপন্থী নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯২৯ বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম পুনরায় দেখা দিল। ১৯২৮ ৩০শে অক্টোবর লাহোরে সাইমন-কমিশন-বিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব করবার সময় লালা লাজপতরায় পুলিশের লাঠিতে আহত হন এবং তার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস হয়েছিল যে ঐ পুলিশের আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ এবং সহকারি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মিঃ সেণ্ডার্সকে লাহোরে হত্যা করা হয়। দিল্লীতে এসেমব্লীর অধিবেশন চলাকালীন ভগবত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করেন। দেশময় বহু ধরপাকড় হয় এবং ১৯২৯ এর মাঝামাঝি লাহোরে এক সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্রের মামলা সুরু হয়। মামলা চলাকালীন জেলে তাদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎসিং প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন সুরু করেন। তাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হলে সংবাদপত্রে, সভাসমিতি ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বন্দীদের প্রতি মানবীয় ব্যবহারের দাবী করে দেশময় তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। অবশেষে অন্যান্য সব বন্দীরা অনশন ভঙ্গ করতে রাজী হলেও যতীন দাস শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থেকে ১৯২৯ ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। সারা দেশে এই মৃত্যু সংবাদে গভীর বেদনা ও বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। টেরেন্স ম্যাকসুইনীর পরিবারের নিকট থেকে ছোট্ট একটুখানি উচ্ছ্বাসবিহীন অভিনন্দন

সমস্ত জাতিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে "Family of Terence MacSwiney heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come" কিন্তু গভীর বিস্ময়ের বিষয় গান্ধিজী এই অনশন সমর্থন করেননি। ইয়াং ইণ্ডিয়াতে যতীন দাসের এই মৃত্যুবরণ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কিন্তু যতীন দাসের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। সরকার পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে আইন কানুন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। যতীন দাসের এই আত্মাহুতির ফল স্বরূপ সর্বত্র যুব ও ছাত্র আন্দোলন খুব উদ্দীপিত হয় এবং কলকাতা, পুণা, আহম্মদাবাদ, লাহোর, নাগপুর আমরাবতি ও মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও যুব কন্‌ফারেন্স ও কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ ডিসেম্বরে লাহোরে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভানেতৃত্বে প্রথম সর্বভারতীয় ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ ব্যতীত কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে নানাস্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট দেখা দেয়। এদিকে বাংলাদেশে মন্ত্রীসভার বার বার পরাজয়ের ফলে ১৯২৩ যে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ভেঙে দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বাংলা কংগ্রেসকে নির্বাচনে লড়বার জন্য পরামর্শ দেন। নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকতর সংখ্যা লাভ করে এবং ১৯২৬এ যে সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিলেন তাদের অনেকে ১৯২৯ এর নির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু ১৯২৯, ১৫ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হঠাৎ কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করবার জন্য নির্দেশ দেন। সমস্ত ঘটনাটা খুবই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির মতামত পর্যন্ত আহ্বান করা হয়নি, কিংবা এই পরিবর্তিত নীতি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কোনরূপ ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য, যে মতিলাল নেহেরু মাত্র দুইমাস পূর্বে বাংলা কংগ্রেসকে নির্বাচন লড়বার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন তিনিও এই নির্দেশের সহিত সহমত হলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯২৯, ২৬শে জুলাইর অধিবেশনে এই নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে সমস্ত প্রশ্নটা কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেন। কিন্তু গান্ধীজি ও মতিলাল নেহেরুর সম্মিলিত চেষ্টায় কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ এবং কংগ্রেসে গান্ধিজী ও তাঁর নীতির প্রাধান্য প্রমাণ করলো। আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা— ১৯২৭ এর ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে ফিরে এসে জহওরলাল নিজেকে সোসিয়ালিষ্ট অভিহিত করতে শুরু করলেন এবং বামপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু ১৯২৯শের কংগ্রেসে তাঁকে সভাপতি করবার জন্য গান্ধিজী চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সম্পূর্ণভাবে জওহরলালকে প্রভাবিত করলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণের পর থেকে গান্ধিজীর নিরবচ্ছিন্ন সমর্থক হিসাবে জওহরলালকে দেখা গেল। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসু চিরদিনের জন্য বিভিন্ন পথের অনুসারী হলেন। বাংলা কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হোলো। একদল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গান্ধিনীতির সমর্থক ও অন্যদল সুভাষচন্দ্রের সমর্থকরূপে দেখা দিলো। এরপর থেকে বামপন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুই সকল বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে গান্ধিজীর নীতির বিরোধী-নীতির ধারক ও বাহক হিসাবে নিজ কর্তব্য করতে লাগলেন—এবং জওহরলাল সম্পূর্ণরূপে গান্ধিজীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন।

১৯২৯ ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে 'স্বরাজে'র অর্থ, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং আইনসভাগুলি থেকে সব কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলা হয় এবং কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ করবার অধিকার দেয়া হয়। স্পষ্টতই বোঝা যায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের পুনরু-

যাঁনে গান্ধিজী চিন্তিত হয়েছিলেন এবং তরুণ সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে কোনো অহিংস আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হবার পর নেহেরু-সংবিধানের প্রশ্ন বাতিল হয়ে যায় এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে নেহেরু রিপোর্টে শিখ মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা অসন্তোষ প্রকাশ করাতে ঐসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে এমন কোনো ব্যবস্থা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণীয় হবে না যা ঐ সকল সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য না হয়। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন এই ব্যবস্থায় সম্প্রদায়িকদের বিরোধীতার উপর অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে তাদের হাতেই "ভিটোর" ক্ষমতা দেওয়া হয়। এবং ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এরদ্বারা হারিকিরি করে।

লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করে বটে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসাবে পূর্বের আইন অমান্য আন্দোলন ও আইনসভা বয়কটের কার্যসূচী ব্যতীত নূতন কোনো কার্যসূচী রাখে না। মাত্র ৫ মাস পূর্বে ১৯২৯শে জুলাই কংগ্রেসে গান্ধিজীর নীতির যে পরাজয় হয়েছিল সেই লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করা হোলো বিশেষতঃ বাংলায় সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে মতবিরোধের জন্য। এবং পূর্বেকার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও গান্ধিজীর হাতে কংগ্রেসের সব ক্ষমতা দেওয়া হোলো। পরবর্তী ঘটনা থেকে কংগ্রেসের উপর গান্ধিজীর পূর্ণ কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারই শুধু নন সুভাষচন্দ্র বসুকেও বাদ দেয়া হোলো। এ দুজনকে নেয়া সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রবল মত থাকা সত্ত্বেও গান্ধিজী অটল রইলেন—তিনি বল্লেন তিনি এমন কমিটি চান যা একমত হবে অর্থাৎ তাঁর মতে বিনা দ্বিধায় সায় দেবে অহিংসা ঐক্য ও সংহতির পূজারী গান্ধিজীর এই মনোভাবকে তাঁর পূর্ণ সমর্থকরা কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন জানিনা আমাদের নিকট এই মনোভাব সম্পূর্ণভাবে এক নায়কত্বের মনোভাবের পরিপোষকই শুধু নয়, ভারত বিভাজনের শেষ অঙ্কের প্রথম সূত্রপাত।

১৯৩০ এর ২রা জানুয়ারি নূতন ওয়ার্কিং কমিটি মিলিত হয়েই কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব কার্যকরী করবার নির্দেশ দেন এবং কেন্দ্রীয় আইন সভা থেকে ২১ জন ও কাউন্সিল থেকে ৯ জন ও বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভা থেকে ১৪২ জন পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। ২৬শে জানুয়ারি সমস্ত ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসাবে পালিত হয় এবং স্বাধীনতার সংকল্প রূপে একটী ঘোষণা গান্ধিজী কর্তৃক প্রস্তুত করা হয় যা প্রতিবৎসর ২৬শে জানুয়ারি প্রতি সভায় পঠিত হবে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য লিখিত ও প্রচারিত হতে না হতে গান্ধিজী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ১১ দফা শাসন সংস্কার ঘোষণা করে এক বিবৃতি দিলেন। স্বাধীনতা সংকল্পের সঙ্গে যার কোন সামঞ্জস্য নেই।

গান্ধিজীর বিবৃতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি সবরবতীতে ওয়ার্কিং কমিটি আবার মিলিত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজী নীতিতে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাসীদের—আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করতে ক্ষমতা দিলেন। গান্ধিজীর ডাণ্ডি পদযাত্রা সুরু হবার পরে আহমদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৩০, ২১শে মার্চ এর অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবকে প্রশস্ততর করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে স্ব স্ব বিবেচনানুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার অধিকার দেয়া হয়।

এই আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার

অধ্যায়ে এই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছেন, তাঁর বর্ণনায় ইতিহাস শুধু বাঙ্ময় নয়, ছায়াছবির বাস্তবতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অধ্যায়টির বক্তব্যকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। গান্ধিজীর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ডাণ্ডি পদযাত্রা ও লবণ আইন ভঙ্গ। পরবর্তী অধ্যায়ে ধরশনায় লবণ আইন ভঙ্গ করা।

২। সরকারি প্রতিক্রিয়া বিভীষিকা, এবং নৃশংসতা।

৩। ভারতীয় নারীদের অভূতপূর্ব জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তা।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক।

৫। আইন অমান্য আন্দোলনের ফলাফল।

আন্দোলন সুরু করবার পূর্বে গান্ধিজী বড়লাট লর্ড আরুইনকে বৃটিশ শাসনের অন্যায় ও শোষণ বর্ণনা করে ১১ দফা দাবী সহ এক পত্র লেখেন। ১৯২৯ এর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই ১১ দফা অনেকের নিকটই অর্থহীন মনে হবে। —সেই পত্র সবরমতী আশ্রমের অধিবাসী রেজিনল্ড রেনল্ডস নামে এক ইংরেজ যুবক লর্ড আরুইনকে দেয়। আরুইন গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন না এবং গান্ধিজী যে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার কথা চিন্তা করছেন সে সংবাদে মুরুব্বির ঢংএ দুঃখ প্রকাশ করলেন। গান্ধিজী লিখলেন আমি নতজানু হয়ে রুটী চেয়েছিলাম কিন্তু পেলাম কেবল পাথর। "The English nation responds only to force" এরপর আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করাব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। এরপর সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি সবরমতীর উপর নিবদ্ধ হোলো এবং সপ্তাহকাল ধরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সবরমতী আশ্রমে উপস্থিত হলেন ১৯৩০ ১২ই মার্চ ৭৯জন পুরুষ ও নারী আশ্রম সদস্যসহ যাত্রা করে ২৪১ মাইল দূরে ২৪ দিনে অতিক্রম করে ডাণ্ডি গ্রামে ৫ই এপ্রিল গান্ধিজী উপস্থিত হলেন এবং ৬ই এপ্রিলের প্রত্যূষে সমুদ্রে অবগাহন করে সন্নিকট বালুকাচরের উপর তরঙ্গতাড়িত লবণের স্তর থেকে লবণ তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন ভঙ্গ করে জাতিকে অনুসরণের ইঙ্গিত দিলেন। দেশের সমস্ত নেতৃবর্গ ও জনগণের উপর এ কাজ গভীর প্রভাব বিস্তার করলো এবং নানাস্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরী করা সুরু হোলো। অল্প দিনের মধ্যে দেড় হাজার লোক বন্দী হোলো লাঠির আঘাত কুৎসিত অত্যাচার এবং যথেচ্ছ গ্রেপ্তার সত্ত্বেও জনসাধারণ অহিংস রইলো। সমস্ত পরিকল্পনাটী বিশেষ কুশলতার সহিত গান্ধিজী কার্যকরী করেছিলেন, গ্রাম থেকে গ্রামে তাঁর পদযাত্রা সমস্ত দেশে এক বিপুল সাড়া ও উত্তেজনা এনে দিল লবণ আইন ভঙ্গ করা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের আইন অমান্য করা হোলো। ডাণ্ডি পদযাত্রার পর গান্ধিজী বড়লাটকে লবণ আইন প্রত্যাহার করবার দাবী জানান যে দাবী অগ্রাহ্য হলে অগত্যা সুরাট জেলায় অবস্থিত ধরশনা লবণের ডিপোতে গান্ধিজী আক্রমণ চালাতে বাধ্য হবেন বলে জানান। এরপর ধরশনা যাত্রার প্রাক্কালে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আব্বাস তয়াবজি, গান্ধিজীর স্থান গ্রহণ করলে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এরপর সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করেন। ১৯৩০ ২১শে মে তারিখে ২৫০০ সত্যাগ্রহী সহ ধরশনা লবণ ডিপোর উপর পর পর কয়েকটি আক্রমণ চালানো হয়। ১লা জুন তারিখের আক্রমণে ১৫০০০ জন সত্যাগ্রহী অংশগ্রহণ করেন। লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলনে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

নারীদের অংশ গ্রহণ

১৯৩০ ১০ই এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়ার সংখ্যায় নারীদের পিকেটিং ও সূতাকাটায় অংশ গ্রহণের জন্য গান্ধিজীর এক আবেদনের প্রত্যুত্তরে নারীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে

যায়। সহস্র সহস্র নারীরা সত্যাগ্রহী হলেন, সংস্কারাবদ্ধ ও সম্ভ্রান্তবংশের নারীরা, বিপুল সংখ্যায় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করলেন। একমাত্র দিল্লীতেই ১৬০০ মহিলা গ্রেপ্তার হলেন। বিদেশীরা এমনকি ভারতীয়েরা পর্যন্ত এই অভূতপূর্ব নারী জাগরণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন। H. N. Brailsford ও Slocombe-র মত বিদেশী পর্যটকেরা এই অভূতপূর্ব ঘটনায় এত অভিভূত হন যে তাঁরা মন্তব্য করেন 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারীদের উপর যে বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তাছাড়া আর কিছুও যদি না করে থাকে তবু এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।'

আইনের অপব্যবহার

এ সময়ের সরকারী অত্যাচার ও নৃশংসতার তুলনা হয় না। ১৯২০ ২৭শে এপ্রিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে প্রেস অর্ডিনেন্স পাশ করা হয়। ১৩১টী সংবাদপত্র থেকে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার জামিন সংগ্রহ করা হয়। ৯টী সংবাদপত্র জামিন না দিয়ে প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বেআইনি ঘোষিত হয় এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করা যায়নি। অনেকস্থানে রেডিও মারফৎ প্রচার চালানো হতে থাকে এবং পুলিশ ট্র্যান্সমিটার স্টেশন বের করতে সক্ষম হয়নি। ওয়ার্কিং কমিটির হিসাব মত ৭৫০০০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। লোহা বাঁধান লাঠির আঘাত ও গুলি চালানোতে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। তীব্র অত্যাচারের মুখে জনতা অভূতপূর্ব সাহস প্রদর্শন করে। দুটি ঘটনা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পেশোয়ারে ১৯৩০ ২৩শে এপ্রিল স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং পূর্বাহ্নে সতর্ক না করে দিয়ে সৈন্যরা জনতার উপর আক্রমণ চালায় ও গুলি বর্ষণ করে। জনতা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। সরকারি হিসাবেই ৩০ জন হত ও ৩৩ জন আহত হয়। যদিও জনসাধারণ এই সংখ্যা সাত থেকে দশগুণ বেশী বলে মনে করে। একটী গাড়ওয়ালি কম্পানীর সৈন্যরা নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলি করতে অস্বীকার করায় তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কোর্টমার্শালে ১০ থেকে ১৪ বৎসরের সুদীর্ঘ মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। আর একটী ঘটনাও পেশোয়ারে ঘটে ১৯৩০ ৩১শে মে গঙ্গা সিং কম্বোজ নামে একজন সরকারি চাকুরে কাবুলি গেট দিয়ে সপরিবারে টোঙ্গাতে করে যাবার সময় একটী ইংরেজ লান্স কর্পোরেল ঐ টোঙ্গাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৯ বৎসর ও ১৬ মাসের দুটী শিশু তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং শ্রীমতী তেজকো বুকে ও হাতে গুরুতর আহত হন। ডিপুটি কমিশনারের অনুমতি ক্রমে কয়েক সহস্র লোকের একটী মিছিলে শিশু দুইটীর মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় সতর্ক না করেই সেই শব যাত্রী মিছিলের উপর মিলিটারি গুলি বর্ষণ করে ফলে শিশু দুইটির মৃতদেহগুলি পুনঃ পুনঃ মাটিতে ফেলে দিতে বাধ্য হয় এবং পুনরায় নূতন নূতন লোক দ্বারা নীত হয়। সরকারি হিসাবে ১৭ রাউণ্ড গুলি বর্ষণে ৯ জন হত ১৮ জন আহত হয়। জনমতের তীব্রদাবীসত্ত্বেও কোনো এনকোয়ারি কমিটি গঠিত করা হয়নি এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি বল্লভভাই পাটেল কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতিপদ ত্যাগ করেন তাঁকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের অধিকার দেয়া হয় না। গান্ধিজী ১৯৩০ ৮ই মের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে বড়লাটকে লিখিত তাঁর পত্র প্রকাশ করেন তাতে অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ দেয়া হয়। বাংলাদেশের মেদিনীপুর অঞ্চলের একটী ঘটনা আজও গভীর শ্রদ্ধার সহিত দেশবাসী স্মরণ করে থাকেন। মাতঙ্গিনী হাজরা নামক একজন বর্ষিয়সী মহিলা জাতীয় পতাকা হাতে একটি মিছিলের নেতৃত্ব করছিলেন প্রথমে পুলিশ তাঁর দক্ষিণ হাত লক্ষ্য করে গুলি

চালায় তবু তিনি বাম হাতে পতাকা ধরে থাকেন আর একটী গুলি এসে তাঁকে ভূপাতিত করে, তাঁর হাতে তখনো পতাকাটী ধরা ছিল। আর একটি মহিলা এই দৃশ্য দেখে তাঁর গৃহের অভ্যন্তর থেকে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দেন, একটি ইংরেজ টমি তাঁর গৃহে ঢুকে তাঁকে বেয়নটবিদ্ধ করে। বম্বের সোলাপুর সহরে পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষে ১২ জন হত ও ২৮ জন আহত হয়। একজন ধনী শেঠকে ফাঁসী দেয়া হয়।

নানা নূতন নূতন অত্যাচারের পদ্ধতি সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত হতে লাগলো। বম্বেতে বিদেশী বস্ত্রের এমন পরিপূর্ণ পিকেটিং হয়েছিল যে বিদেশী বস্ত্র লুকিয়ে লরীতে সরিয়ে ফেলবার সময় বাবুগণু নামে একটি বালক লরির গতিপথ রুদ্ধ করে কলাদেবী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। লরির চালক বালকটির উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায় বালকটির মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে।

অনেক স্থানে সরকারি খাজনা দেয়া বন্ধ করা হয়। কোনো কোনো স্থানে গাছ ও জঙ্গল কাটাও হয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যু তিথি উদ্‌যাপনের সাম্বৎসরিক সভা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩১, ৩১শে ডিসেম্বর এ লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কলকাতায় মিছিলে অংশগ্রহণকারি সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশ ভীষণভাবে প্রহার করে। নৃশংস ও অকথ্য জঘন্য অত্যাচার, যথেচ্ছ হত্যা ইত্যাদি অত্যাচার কাহিনী পৃথিবীর কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নাই—কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো তথ্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু ধরশনার লবণ ডিপোতে হাজার হাজার নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর আক্রমণ, পুলিশের লাঠির আঘাত ও মিলিটারীর অত্যাচার এত গুরুতর ও নৃশংস হয় যে এদের মধ্যে অনেকে পরে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। মিলার নামে একজন আমেরিকান সংবাদিক লণ্ডন ও ন্যুইয়র্কে ধরশনার অত্যাচারের কাহিনী এয়ার মেইলে পাঠাবার পর ১৩৫০টী সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয় এবং সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সারা ভারত যখন এই ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে আলোড়িত সাইমন কমিশন তার কাজ করে চলেছিল এবং ১৯৩০, ৭ই জুন এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হোল। তার সুপারিশগুলি এতই অসন্তোষজনক ছিল যে কেন্দ্রিয় আইন সভায় কোন কংগ্রেস সদস্য না থাকা সত্ত্বেও ঐ রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য হোল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেলেই মিলিত হয়ে একে পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ছেদ করবার অধিকার, দেশরক্ষা ও আর্থিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধিকার-সহ দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার এবং অতীতে বৃটিশরা যে সকল সুবিধা ভোগ করেছে যে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের সালিসীর দাবী করলেন। কংগ্রেসের এসকল দাবী বৃটিশ সরকার কোনো প্রকার গ্রাহ্য না করে ২ই নভেম্বর ১৯৩০ লণ্ডনে প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করা হোল এবং ১৯৩১, ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে চললো। এই বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিল না তবে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা ছিলেন। শ্রমিক সরকার যুক্ত-নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য চেষ্টা করলেন, কিছু কিছু মুস্লিম নেতারা রাজী ছিলেন কিন্তু অনেকে এতে রাজী হন্‌নি তাঁরা ৬টী প্রদেশে তাঁদের বিশেষ সুবিধা এবং বাংলা ও পাঞ্জাবে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী দাবী করলেন। ফজল-ই-হোসেন তাঁর আত্মকাহিনীতে ৩।১২।৩০এ মন্তব্য করেছেন Let the Hindus non-co-operate & let us build up sufficient strength during the next ten years" এরপর থেকে মুস্লিম নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী নেতাও ডমিনিয়ন স্টেটাসের জন্য সমর্থন জানাবার পূর্বে মুসলমানদের দাবী

মানতে হবে এই সর্ত আরোপ করেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কিছুদিন পূর্বের জাতীয়তাবাদী মহম্মদ আলি পর্যন্ত মন্তব্য করলেন "হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া সম্বন্ধে কেউ যেন ভুল না করে, প্রভুত্বের ভয়ই এর একমাত্র কারণ" তিনি কনফারেন্সকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। "আমি দুটী সমান পরিধির কিন্তু সমকেন্দ্রবিন্দুর নয় বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। একটি ভারতবর্ষ, অপরটী মুস্লিম-বিশ্ব ..আমরা জাতীয়তাবাদী নই অতি-জাতীয়তাবাদী"। কনফারেন্স শেষ হবার পূর্বে সব মুস্লিম সভ্যেরা একত্রে এই ঘোষণা করলেন প্রদেশে বা কেন্দ্রে কোনো প্রকার প্রগতি সম্ভবপর হবেনা মুস্লিমদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করে এবং ভারতীয় মুসলমানদের নিকট এই রক্ষা কবচ ব্যতীত কোন সংবিধান গ্রহণীয় হবেনা। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া দ্রুত ও তীক্ষ্ণ হোলো। গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবী কংগ্রেস চ্যালেঞ্জ করলো এবং কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তণ করবার মত কোনো কারণ ঘটেনি বলে মন্তব্য করলো। ৯৩১ এর ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই গোল টেবিল বৈঠকের ২৬ জন সদস্য কংগ্রেসকে গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তকে পূর্ণতা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন অবশেষে গান্ধিজী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ লর্ড আরুইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব দিয়ে পত্র লেখেন। ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার চলে এবং গান্ধিজীর সঙ্গে লর্ড আরুইনের কতকগুলি মীমাংসার সর্তস্থির নয় সেই সর্তগুলির মধ্যে ফেডারেশনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, সংখ্যালঘুদের অধিকার, ভারতের আর্থিক ঋণ ইত্যাদি সংরক্ষিত বলে স্থির হয়। স্পষ্টতঃই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ থেকে এই পশ্চাদপসরণ জওহরলালের উপর প্রবলভাবে আলোড়ন আনলো। তিনি এসময়ের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন "Gave me tremendus shock, was it for this that our people had beheved so gallantly for a year ,'' এই মনোভাব ব্যক্ত করা ব্যতীত তিনি আর কোনো কার্যকরী পন্থা নেননি এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য।

গান্ধি আরুইন প্যাক্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে নিরাশ করলো। তিনি গান্ধিজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন কিন্তু গান্ধিজীর মত পরিবর্তন করতে পারেন নি। বেশ কিছু লোক এই প্যাক্টকে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের পক্ষে জয় বলে বর্ণনা করলো যদিও গান্ধিজী একে কোনো পক্ষের জয় নয় বলে বললেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজীর আইন-অমান্য অভিযানের পূর্বেকার প্রকাশ্য ঘোষণার কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বলেছিলেন "Civil-Disobedience, begun this time, cannot be stopped and must not be stopped as long as there is a single resister left free or alive." হায়! সে দুর্জয় সঙ্কল্পের কি লজ্জাকর পশ্চাদপসরণ! হয়তো গান্ধিজী বুঝেছিলেন যে এই অসমান যুদ্ধে ভারতের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া ছিল সুদূর পরাহত।

কিন্তু তবু ঐতিহাসিক বলছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সহমত যে দেশের নিকট গান্ধিজী ও কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল, বিদেশী সরকারের প্রতিনিধি ও গান্ধিজী এক সঙ্গে প্যাক্টে সই দিলেন এবং সরকার কংগ্রেসকে সমকক্ষ ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করবার পক্ষে একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে পরোক্ষে স্বীকার করল। একথাও সর্বথা স্বীকার্য যে গান্ধিজীর আহ্বানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের জন্য অভূতপূর্ব সাহস, দুঃখবরণ ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিল এবং গান্ধিজীর এই অবদান চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করতে হবে।

করাচীতে ১৯৩১শের ২৯শে মার্চ কংগ্রেস অধিবেশনে

গান্ধি-আরুইন প্যাক্ট অনুমোদিত হোলো কিন্তু তার ঠিক ৬ দিন পূর্বে লাহোর ষড়যন্ত্রের আসামী ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেবের ফাঁসীর ফলে সমস্ত কংগ্রেস অধিবেশনে এক বিষণ্ণ আবহাওয়া চলল বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে গান্ধিজী এ বিষয় যথেষ্ট জোর দেন্‌নি এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধ সত্বেও এই কারণে বড়লাটের সহিত যোগাযোগ ছেদন করতে গান্ধিজী রাজী হন্‌নি। কংগ্রেসে দুটী প্রস্তাব একটী গান্ধি-আরুইন প্যাক্ট ও ভগৎ সিং ও তার সাথীদের আত্মত্যাগ সাহস ইত্যাদির প্রতি গভীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাবের মধ্যে কোনটী বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল বলা কঠিন। এই ধরণের বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলী গান্ধিজী এবং কংগ্রেসে তাঁর অনুসারীরা অনুমোদন করতেন না কিন্তু তা সত্বেও কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের চাপে এর সহিত কংগ্রেসের কোনো সংশ্রব নাই ও বিপ্লবাত্মক কাজ অনুমোদন করে না এই মুখবন্ধের পর ভগৎ সিং ও তার সাথীদের দেশপ্রেম আত্মত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে কংগ্রেস বাধ্য হোলো। এতে গান্ধিজী বিশেষ ব্যথিত হয়েছিলেন। এ ব্যতীত কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই কানপুরে হিন্দু মুস্লিম সংঘর্ষ বাধলো এবং সরকারি হিসাবে ১৬৬ জন হত ও ৪৮০ জন আহত হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীগণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী যিনি বহু মুসলমানকে রক্ষা করেছিলেন তাঁকে উদ্ধার কাজের মধ্যে ভুলিয়ে নিয়ে দু টুকরো করা হয়। নূতন ওয়ার্কিং কমিটি ১লা এপ্রিল মিলিত হয়ে গোল টেবিল বৈঠকের জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে কেবলমাত্র গান্ধিজীকে একক ভাবে নির্বাচিত করা হল।

গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন এই একক নির্বাচন নানাদিক দিয়েই বাস্তবতা-রহিত ছিল—কারণ অন্যান্য দল ও ব্যক্তিরা যেখানে নানাভাবে স্ব স্ব স্বার্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছিল সেখানে গান্ধিজীর একক প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না, বিশেষতঃ কূটবুদ্ধিতে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এঁটে উঠা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে সময়ে হিন্দু মুস্লিম সংঘর্ষ, গান্ধি আরুইন প্যাক্টের সর্ত সমূহ কার্যকরী না করা এবং জাতীয়তাবাদী মুস্লিম নেতা ডাঃ আনসারিকে গোল টেবিল বৈঠকে লর্ড অরুইনের পূর্বস্বীকৃতি সত্বেও আমন্ত্রণ না করা ইত্যাদি কারণে গান্ধিজী গোল টেবিল বৈঠকে না যাওয়াই স্থির করেন কিন্তু পরে নানা অবস্থার পর গান্ধিজী লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করেন এবং কংগ্রেস অফিসিয়াল ইতিহাস অনুযায়ী "সমস্ত বাধা দূর" হবার পর তিনি ২৯শে আগষ্ট লণ্ডন অভিমুখে রওয়ানা হন। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অফিসিয়াল ইতিহাসের পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র বসুর বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন যে "গান্ধিজী প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এসময় বলছিলেন যে হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা পূর্বাহ্নে মীমাংসা করবার উপর তাঁর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান নির্ভর করে। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছিলেন যে মুসলমানেরা যদি নিজেদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো ঐক্যবদ্ধ দাবী করে তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন। এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান সম্প্রদায় যারা দিল্লী-প্যাক্টের পর কংগ্রেসের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা দেখে ভীত হয়েছিল—তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা মনে করলো গান্ধিজীর গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়া না যাওয়ার চাবি কাঠি তাদের হাতে ·····ফলে আমি মহাত্মাকে বলি যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সম্মত দাবী গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীদের দাবী বলে উত্থাপিত করা উচিত—অন্যান্যদের দাবী নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কংগ্রেসের নেই। মহাত্মাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি আছে কিনা আমি তার উত্তর দিলাম যে পৃথক নির্বাচন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে আমার

মতামত দৃঢ়—এই আলোচনা কালে ডাঃ আনসারি ও জাতীয়তাবাদী কয়েকজন মুসলমান বলেন তাঁরা খুব দৃঢ় ভাবে বলেন যে যদি যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী পরিত্যাগ করা হয় তবে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান ও মহাত্মারও বিরোধিতা করবেন। এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এই সুদৃঢ় মতামতের জন্যই মহাত্মা পৃথক নির্বাচনে সম্মত হননি।"

এ সব সত্ত্বেও উইলিংডন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডাঃ আনসারিকে গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান নি এই অজুহাতে যে মুসলমান প্রতিনিধিরা তার বিরোধী ছিল সরকারের ভেদনীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা খুবই সুবিধাজনক ছিল কারণ তাঁরা বলতে পারবেন যে সমস্ত মুসলমানরাই কংগ্রেসেরবিরোধী ছিল।

২য়তঃ গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধিজীর উপস্থিতি ও তাঁর সুউচ্চ আদর্শবাদ বিশেষ রোমাঞ্চকর হোলো কিন্তু বৃটিশ সরকার ও জনসাধারণের উপর তাঁর বক্তৃতা, ব্যক্তিত্ব অথবা আহ্বান কোনো বাস্তব প্রভাব বিস্তার করেনি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সংবিধানের প্রশ্নের মীমাংসার পরে হবে একথা বার বার বলা সত্ত্বেও তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না এবং র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড মন্তব্য করলেন যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়ার দরুণ সংবিধান সম্বন্ধে অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তাঁর নিকট প্রত্যেককে লিখিত ভাবে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁকে সালিসী করার এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুরোধ করতে বলেন। কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য যদিও সকলে নয়—এই প্রস্তাব গ্রহণ করো এইরূপ অনুরোধ করে সই করে দিলেন। ভারতের সম্মিলিত দাবীর পরিবর্তে বৃটিশ কূটনীতির জয় হোলো। এর পরে সংবিধান রচনায় বিশেষ কোন অগ্রগতি না হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩১, ১১ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

গান্ধি নিজে যদিও বলেন তিনি "শূন্য হাতে ফিরছেন" কিন্তু ২৮শে ডিসেম্বর ভারতে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন যে মনে হোল যেন হাতের মুঠোয় স্বরাজ নিয়ে তিনি ফিরেছেন। কংগ্রেসের এধরণের বাস্তবতারহিত ভাবালুতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিক নির্ণয় ও শেষ পরিণতির জন্য বহুলাংশে দায়ী বলে আমরা মনে করি।

গান্ধিজী দেশে ফিরে দেখলেন গান্ধি আরুইন প্যাক্ট এর সর্ত কিছুমাত্র মানা হয়নি, পুলিশী অত্যাচারের কোনো অনুসন্ধান হয়নি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমিকর বন্ধের আন্দোলন কংগ্রেস কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী বন্ধ থাকে সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কৃষকেরা আলোচনা কালের জন্য কর আদায় বন্ধ রাখবার দাবী করে। এর উত্তরে সরকার সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের মধ্যে অহিংস সত্যাগ্রহের জন্য খোদাইখিদমতকারদের প্রতিষ্ঠান বে-আইনি ঘোষণা করা হয়. খান আব্দুল গফুর খান সহ অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

বাংলাদেশে গুরুতর অবস্থা দেখা দিল সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের পুনরুত্থান হয়। জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল ও মেদিনীপুরের তিনজন জেলা শাসককে পর পর হত্যা করা হয়। হিজলীর রাজবন্দীদের উপর গুলি করা হয় ও চট্টগ্রামকে তিন দিন ধরে বে-সরকারি ইউরোপীয়ান ও গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধীজি বড়লাটকে টেলিগ্রাম করলেন সরকারি অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে এবং সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বড়লাট তার উত্তর দিলেন যে গান্ধিজী যদি উত্তর প্রদেশ অথবা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কার্যকলাপের জন্য দায়ীত্ব অস্বীকার অথবা সে সব অনুমোদন না করেন

তবে তিনি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সরকার যে সব ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। উত্তরে গান্ধিজী সরকারি বিভীষিকার তীব্র প্রতিবাদ করে এই অবস্থায় যে আইন অমান্য আন্দোলন—বন্ধ নয় স্থগিত রাখা হয়েছিল মাত্র—তা পুনরায় শুরু করতে বাধ্য হবেন বলে জানান।

প্রখ্যাত সংবাদিক ভেরিয়ার আলউইন উত্তর প্রদেশের কৃষকদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেন "যাদের এক কণা খাদ্য বস্ত্র নেই তাদের নিকটও কর দাবী করা এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা। তাদের আয়ের ক্ষমতা শতকরা ৫০ ভাগ কমেছে কিন্তু করের পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে" উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধি পাঠানদের মধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করার জন্য সীমান্ত অর্ডিনেন্স চালু করা হয়, সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে মি: আলউইন মন্তব্য করেন যে গান্ধি-আরুইন প্যাক্টের ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস নয় অপর পক্ষই দায়ী। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন যে সত্যাগ্রহ স্থগিতের এই সুযোগে সরকার সত্যাগ্রহীদের ভবিষ্যতে পরাজিত করবার ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন সত্যাগ্রহীদের শায়েস্তা করবার জন্য কি ভাবে হাজার হাজার লাঠির ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।

৪ঠা জানুয়ারির ভোরে গান্ধি ও প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হোলো—খান সাহেব ও জওহরলাল কারাগারে ছিলেন এবং প্রায় ২০০০০ পুরুষ নারী ও শিশুকে নানাভাবে শাস্তিদান করা হোলো।

জেলে বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হোলো। বন্দীদের উপর মারপিট এবং সভ্য সমাজ বহির্ভূত নির্লজ্জ শাস্তি দেয়া হোলো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, নারী ও শিশুদের উপর অসদাচরণ, সরকারের খেয়ালে অন্তরীণ অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার চলতে লাগলো। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেত মারা এবং বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি মারা, সভা ভাঙ্গার জন্য গুলি করা হোতে লাগলো। এসবের ফলে সরকারি হিসাবেই ৩৪ জন হত ও ৯১ জন আহত হোলো।

সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়া লীগ ৪ জন ইংরেজ ও একজন ভারতবাসীকে নিয়ে গঠিত একটী ডেলিগেশন ভারতবর্ষে পাঠান। তাদের রিপোর্ট একটী খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ বিবরণ। এই কমিশন নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং এই মন্তব্য করেন যে সকলের মতেই গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা না করা বড়লাটের একটী গুরুতর ভুল হয়েছে।

হিজলী বন্দী শিবিরে ১৯৩০, ১৫ই সেপ্টেম্বর বন্দীদের উপর গুলি করা হয়। জাস্টিস্ এস সি মল্লিক আই সি এস এবং মি: জে সি ড্রাম্‌ণ্ড দ্বারা গঠিত সরকারি কমিটির মতে "সিপাইরা কয়েক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করে এবং এই যথেচ্ছ গুলি করবার বিন্দুমাত্র কারণও ছিল না।"

ভারতীয় গ্রামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ডেলিগেশন বলেন যে ভারতীয় গ্রামগুলি একটী স্বয়ংস্থ সত্ত্বা এক একটী গ্রাম হিন্দু মুসলমান, কৃষক ও শ্রমিক সকলের সত্ত্বাকেই প্রকাশ করে।...পুলিশ নিজেই নিজের বিচারক।...তার বিধিগুলি নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধমূলক...জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অসদ্ব্যবহার অতি সাধারণ ঘটনা।

সুসভ্য (?) ইংরেজ নারী বন্দীদের উপর কিরূপ ব্যবহার করে, অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার সম্মান নষ্ট করবার ভীতি প্রদর্শন, প্রহার, ধর্ষণ ইত্যাদির সাক্ষী এই ডেলিগেশন লিপিবদ্ধ করেন। বাংলা দেশে নারী বন্দীদের উপর নিকৃষ্টতম ব্যবহার করা হয়েছে এবং কলকাতায় ইংরেজ সার্জেন্টরা মেয়েদের বেত পর্যন্ত মেরেছে। ছোট ছোট শিশুদেরও কিরূপ হৃদয়হীনভাবে মারা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন ডেলিগেশন। এদেশের অনেকের মতে "সুসভ্য" ইংরেজ রাজত্বের একটী

বর্ণনা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। লে: কর্ণেল অসবর্ণ ডি এস ও তাঁর Must England lo e India? বইতে একটা সরকারী কর্মচারীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন সেই বীর পুঙ্গব অসবর্ণকে বলেন 'কয়েকদিন পিটুনী পুলিশ কোনো গ্রামে থাকার পর অতি বড় শক্ত আন্দোলনকারীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। 'কিভাবে' জিজ্ঞাসা করাতে সেই নরপশু উত্তর দেয় "Well they will help them-elves to everything within 24 hours there will not be a virgin or a four anna piece left in that village."

আইন অমান্য আন্দোলনে বহু সহস্র নারীসহ ১২০০০০ জন বন্দী হয়।

কিন্তু ১৯৩৩, ৮ই মে গান্ধিজী পুনরায় অকস্মাৎ আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত যদিও সমস্ত দেশকে স্তম্ভিত করলো তবু তখন অনশনের ফলে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুণ এই আন্দোলন স্থগিত রাখার বিশেষ আলোড়ন দেখা দিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে ভিয়েনাতে বল্লভভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই কাজ বিগত ১৩ বৎসরের জাতীয় সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেয়া আখ্যা দেন। আইন অমান্য আন্দোলন ও গান্ধি নেতৃত্বের ব্যর্থতার উল্লেখ করে এই দেশের আরো চূড়ান্ত নীতি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন এই মর্মে একটা বিবৃতি দেন। ভারতের অভ্যন্তরে বম্বের এফ্ কে নরীম্যানও গান্ধিজীর নীতি ও নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন কিন্তু এধরণের ২।৪টা ব্যতিক্রম ব্যতীত কংগ্রেসীরা গান্ধিজীর নীতিকে সমর্থন ও অনুসরণ করতে লাগলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে বলেছেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদএর বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করে আমৃত্যু অনশন ঘোষণার কোনো যুক্তিই ছিল না ১৯৩৩ এর মার্চে কলকাতা কংগ্রেসেও কংগ্রেস পুনরায় বলেছে বৃটিশ সরকারের প্রস্তুত কোনো সংবিধান গ্রহণ করবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এই যখন কংগ্রেসের মনোভাব ছিল তখন মাত্র দু মাস বাদে সেই অগ্রণীয় সংবিধানের একটীমাত্র বিধি নিয়ে সমস্ত দেশকে এক বিস্ময়কর বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবার কি যুক্তি আছে তা দুর্বোধ্য। দেশের সহস্র সহস্র পুরুষ নারীর পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ, মৃত্যুবরণ, অসহনীয় অত্যাচার অপমান সহ্য করার সার্থকতা কি ছিল? কোনো 'মহাত্মা'রও দেশের ভাগ্য নিয়ে এধরণের ছিনিমিনি খেলবার কোনো অধিকার নেই। গান্ধিজীর অন্ধ অনুসারীরা এর কোনো উত্তর দিয়েছেন কিনা জানি না।

আইন অমান্য-আন্দোলনের ফলাফল বিচার করে আমরা বলতে চাই প্রথম থেকে এ স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল না—এবং প্রতিবারের মতই গান্ধিজী আন্দোলন সুরু করবার সময়ে দেশকে যে প্রত্যাশা দিয়ে এসেছেন তা রক্ষা করতে পারেননি এবং আন্দোলন যখন লক্ষ্যে পৌঁছাবার অথবা মধ্যপথে তখন জাতীয় স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অবান্তর ও তুচ্ছ কোনো অজুহাতে আন্দোলনকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জাতিকে কারণ জানানোও প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ফলে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ধারা বার বার রুদ্ধ হয়ে তার দুর্জয় গতিবেগ হারিয়ে ফেলে নানা অবান্তর প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হয়ে অস্বচ্ছ ও ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ে। জনসাধারণ নেতাদের আদেশে চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করা সত্ত্বেও

তাদের এই দানের মর্যাদা নেতারা বিন্দুমাত্র দেননি— যার ফলে জনসাধারণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। গান্ধি নেতৃত্বের এই প্রকৃতি ও ধারাই ভারতবর্ষ বিভাগের জন্য ও পরবর্তী হাজার অমীমাংসিত প্রশ্নের জন্য দায়ী। তবে গান্ধিজীর আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এনেদিয়েছে এবং বিশেষভাবে ভারতের নারী জাগরণ গান্ধিজী প্রবর্তিত আন্দোলনের পরোক্ষ দান একথা ঐতিহাসিক ও ভারতের নারীরা নিঃসন্দেহ স্বীকার করবেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরিবেশ সৃষ্টিতে যেমন গান্ধি নেতৃত্বের দান প্রচুর, স্বাধীনতা লাভের শেষ অধ্যায়ের গ্লানিকর পরিণতির জন্যও গান্ধিজী ও তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট শিষ্যেরা দায়ী একথাও সম্পূর্ণ সত্য।

(ফাল্গুনে সম.প্য)

পূর্ব্বরাগ বিনোদ বেরা

তুমি আমার ঘুমের ঘন জলে
ক্রীড়ায় মাতো, মাতাল হও, তুমি
বাজিয়ে যাও জল-নুপুর দ্রুত
হৃদয় সৈকতে ছড়িয়ে গান।
হৃদয় সৈকতের তরুদল
সুখে ফোটায় অমর ফুল রাশি
গন্ধভার আমন্থর বায়ু
বোনে কুহক মনো অরণ্যের।
জ্যোৎস্না ঢালে বিপুল ভালোবাসা
প্রেমিকজন বিশ্ব পুলকিত ;
নক্ষত্রের পালক মেলে-জ্বেলে
আকাশ যেন বিশাল এক ময়ূর—
এখনি যেন কাঁপাবে ধরাতল
কেকারবের তীক্ষ্ণ স্বরাঘাতে।
এখনি যেন বিপুল জাগরণ
কিরণ ধারায় উৎসাহিত হবে
জাগো মধুর স্বপ্ন সুরময়
হাওয়ায় গড়ো অসম্ভব মিনার,
এবং তোমার অমর উড্ডয়ন
দেখবো ফুল হাল্কা প্রাণ নিয়ে।

সমস্ত বিস্রস্ত স্বপ্ন হেনা হালদার

সমস্ত বিস্রস্ত স্বপ্ন : যা কিছু বিহ্বল সুস্থ ছিল এ-ঘরের
অগণিত বান্ধবের সদয় বা সদাশয় প্রীতি
অলৌকিক ভালবাসা, ভাষার অলীক কারুকৃতি
হয়ে গেছে। গল্পকথা, কল্পনা বিলাসী প্রহরের।

খণ্ডখণ্ড ভাবনার খাণ্ডব দাহনে জ্বলে-জ্বলে
খাপছাড়া জীবনের হাঁপ-ছাড়া মুহূর্ত্তকে গড়ি,
পাণ্ডুর চাঁদের চোখে মমতার পাণ্ডুলিপি পড়ি,
রহস্যে-রভসে-রসে পেতে চাই অনিলে-অনলে।
প্রতীক্ষার প্রতিক্ষণ কণ্ঠাগত। গীত হীন গতি
সর্বনাশা অভীপ্সার সর্বগ্রাসা স্নায়ুর ক্ষুধারা
মুখবদ্ধ। বসুধার শুষ্ক বক্ষে ক্ষীণ বসুধারা
সুধার কলস থেকে দিতে চাওয়া : মিথ্যা আত্মরতি

যে হেতু অচ্ছোদে নেই স্বচ্ছতর জলের দুরাশা,
পরিণামে শূন্যতা-ই। যত কেলি নবরঙ্গে পাশা।

আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু : চিত্রভানু

সত্যের সহস্র রূপ সংসারের দৃষ্টি জুড়ে থাকে
—রূপমুগ্ধ সংসারের চোখ। সহস্রের অভিধাকে
প্রশ্ন করে' সত্যের অন্তর লোকে মহত্ত্বের পথ
খোঁজে তবু সত্যব্রত যারা। তাঁদের দ্বৈরথ
বহুরূপী বাহিরের বিচিত্র লীলার অন্তরালে
যে-পরম রূপকার একা মগ্ন আপন খেয়ালে
তারে ধ্রুব চিনিবার তরে। হে বিজ্ঞানী তপোধন,
সত্যকাম, সত্যজিৎ, তুমিও তাঁদেরই একজন।

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য চিত্রভানু

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য আর জলের সান্ত্বনা অকৃপণ
কোনোদিন হয়নি অভাব, তবু মানুষের মন
সুখের অভাবে ক্ষুণ্ণ, আনন্দের রুক্ষতায় দীন।
হায় সে খুঁজেছে সুখ মানুষের হাটে প্রতিদিন
কেনা বেচা পণ্যের নিয়মে ; সে যে মূঢ়, ভুলে তাই
বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে দান-মুক্ত ধারা, খোঁজে নাই
সহজের অকৃপণ অঞ্জলি, নিত্য যাহা প্রসারিত
তারই চিত্ত তরে। ধূলিক্লিন্ন প্রত্যহের অগণিত
প্রয়োজন ধূলি জালে চিত্ত তার করেছে মলিন ;
তাই সে মালিন্য মুগ্ধ, অস্বচ্ছ কোটরে অবলীন,
মর্ত্য মানুষের দ্বারে ব্যর্থ করে স্বর্গের আহ্বান।
পায়ে তার মুক্তিহীন সময়ের শিকলের টান ;
তবু যে-মুক্তির ডাক আকাশে আলোকে জলে বাজে
কোলাহলে পরিশ্রান্ত চিত্ত তার তাও শোনে না যে।

একান্তের ঘর সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

স্বতন্ত্র একটি ঘর নিভৃত আকাশে
আছে কী গোপন হয়ে না দেখার মত!
অথচ সে দেখে সবি। নিত্য শরাহত
জানে না বিভায় জ্বলে অনন্ত উল্লাসে।

আপাত মধুর রম্য দৃশ্যাবলী থেকে
সে-ত দূরে। কুহকের খেলায় মাতে না
রচে ধ্রুব দৃশ্যলোক কখনো হারে না ;
অবারিত তার দ্বার, অক্ষত বিবেকে
যদি কভু যেতে পারি নির্ভয়ে সেখানে
কপট সুহৃদে ভুলে। দক্ষ চাটুকার
ঘটাবে না মতিভ্রম। নিজেরে দেখার
সমস্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে অটল প্রমাণে
সে-ই দেয় অঙ্গীকার। তবু ভুলে থাকি
সে-দুর্লভ ধ্যানলোক একান্তে একাকী।

রাত্রিকে গ্রহণ করি ইরা সরকার

রাত্রিকে গ্রহণ করি রাত্রি জাগরণে
রাত্রিকে আত্মার মধ্যে আত্মস্থ করব
এই ইচ্ছা দ্যুতি দেয়
সমস্ত আলোর কোলাহলে।

মুঠো মুঠো অন্ধকার লোমকূপে স্নায়ুতে মননে
প্রাণের স্রোতের মধ্যে, রক্তের রণণে
স্নান করি অন্ধকারে দুঃখে যন্ত্রণায়
হাতরাখি মনের শরীরে
ক্ষমা করি ধৈর্য ধরি যেতে পারি অনেক গভীরে
নির্বিরোধ মকমল অন্ধকারে বসে
ভোর রাতে উঠে আসতে হবে,
আমায় উদ্ভিদ জন্মে
শহরে আলোয়।

আমি আজও সারারাত   দীপংকর চক্রবর্তী

আমি আজও সারারাত আগুন পোহাবো।
বদ্ধঘরে সারারাত আগুনে হলকায় দগ্ধ হতে হতে
কোনো এক মানুষীর কামনায় দগ্ধ হতে হতে
আমি আর বদ্ধঘরে ক'যুগ কাটাবো?

ক'যুগ কাটাবো বলো, জ্যোৎস্নারাতে সব গেছে বনে
আগুনে হলকায় আমি ক'রাত কাটাবো বলো বাহির অঙ্গনে
ভালবাসা পঙ্গু নাকি? জীবনের সহস্র শরিক?
কে আমাকে বলবে আজ, কে দেবে সম্বিৎ
আমি আজ কোন্ কক্ষে, বেদনায় ম্লান হবো বলে
আগুন আমাকে ঘিরল অকস্মাৎ সুতপ্ত আঁচলে।

আজও আমি সারারাত আগুন পোহাবো
সারারাত সারাদিন যুগ যুগ এপার ওপার
রমণীর মন নাকি সহস্রবর্ষের সখা। প্রিয়তর ধন
রমণীর মন নাকি লালরঙে আঁকা, পুষ্পিত চন্দন
তবে কেন অহোরাত্র হাহাকারে রজনী কাটাবো
আমি কেন সারারাত চারিধারে ঘুরে ঘুরে
আগুন পোহাবো।

আমি যে চেয়েছি পদ্ম সবৃন্ত কোরকে
লীলাবতী রৌদ্রের সুন্দরী
আমি তো চাই নি মায়া, লাস্যময়ী নারী
লীলাবতী রৌদ্রের সুন্দরী

রমণীকে ভালবেসে, অনুভবে চেয়েছি হৃদয়
লীলাবতী মগ্ন হল, আগুনেরা ক্রমে মগ্ন হয়।

আকাশে বাজাবো   মণি মুখোপাধ্যায়

অগ্নি সাক্ষী থাক। নৈঋতের তুমুল-আগুন।
আমি ভালোবাসি নুন, মাটি, যন্ত্রনার স্বাদ
রৌদ্রতাপ, শোক, জ্বালা, শঠ, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা
ঘণ্টাধ্বনি; অবশেষে সর্বউচ্চে তোমার মন্দির।

তোমার মন্দিরে আমি নগ্ন পায়ে যাবো।
কণ্টক, ঝড়ের ক্রোধ, প্রথিত চিন্তার বাঁকা হাসি
নির্ভয়ে উড়াবো দুই হাতে। তুমি ধ্রুব জানি।
তার চেয়ে ধ্রুবতর আমার অস্তিত্ব ঘিরে তোমার সত্তায়।

অগ্নি সাক্ষী থাক। নৈঋতের তুমুল আগুন।
আমি সূর্য-শরে আহত, রক্তাক্ত প্রতিদিন, তবু
পুষ্প চয়নের লঘু প্রলোভনে কখনো যাইনি আমি
বাগানের ছলনায়, কিংবা কোন মালঞ্চ ছায়ায়।

আমাকে নির্মাল্য দেবে তোমার বাহুর দীর্ঘ ছায়া,
তোমার হৃদয় পদ্ম করধৃত লীলার কমল,
আলম্ব চুলের টানে প্রবাহিত স্রোতস্বী দর্পণ,
তোমার দু'চোখে লেখা সমুদ্রের সুদূর ঠিকানা।

অগ্নি সাক্ষী থাক। নৈঋতের তুমুল আগুন।
আমি ভালোবাসি এই কথা আকাশে বাজাবো।
অগ্নি সাক্ষী থাক। নৈঋতের তুমুল আগুন।
আমি ভালোবাসি এ-সংবাদে তোমাকে সাজাবো।

কৈশোরের অলৌকিক বৃক্ষের জন্য বাবলু-কে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আবার কি ফেরা যায় তোমার কৈশোরে ? আরবার
ফেরা যদি যেতো আহা তোমার সাম্রাজ্যে আমি সব
তুচ্ছ করে যশ মান অর্থের দাসত্ব সব ছেড়ে
তোমার সাম্রাজ্যে দীন প্রজা হয়ে কাটাতাম কাল
বড়ো সাধ জাগে হাসি পুনর্বার প্রকৃতির মতো
ঘৃণা করি ভালোবাসি খেলার মতন মনে করে
দীঘির ওপারে বড়ো ঝড়ের তাণ্ডব .....ওই খানে
আমাদের বাস। কোনো কিশোরের দৈবী স্বপ্নছবি
ওইখানে ভয়ানক হিংস্র রেখে আর্তনাদ করি
যুবকের মতো শোনো হত ভাগ্য নাহিক সংসারে।

বাবলু, তোমার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। পৃথিবীর
সব কিশোরের চোখে ওরকম স্বপ্ন আঁকা থাকে
অমল কৈশোরে ছিল মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অমল কৈশোরে ছিল কণ্ঠ ভরে আনন্দিত গান
পাতাগুলি জলে উঠতো ভবিষ্যের স্বপ্নের দ্যুতিতে
শাখাগুলো চতুর্দিকে মেলে দিত উদ্ধত সীমানা

বাবলু! তোমার এই স্বপ্নের জগতে অধিবাসী
আমিও ছিলাম,—কণ্ঠ ভরা ছিল গান
বুকের মৃত্তিকা হতে উঠেছিল সে বৃক্ষ আকাশে
প্রতিটি পাতায় তার ছিল বহু বর্ণের পৃথিবী
পাতার আড়ালে ছিল বাসা বেঁধে অপরূপ সুধাকণ্ঠী পাখী
আর ছিল সংখ্যাতীত প্রজাপতি বিচিত্র বর্ণানী
আর ছিল চতুষ্পার্শে বাতাসের সামুদ্রিক তরঙ্গ ইত্যাদি।

কিন্তু আজ কণ্ঠ হতে কে নিয়েছে গান ?
কৈশোরের অলৌকিক বৃক্ষের পাতারা গেছে ঝরে
অন্য জগতের পানে উড়ে গেছে সেই সব সুধাকণ্ঠী পাখী
ডালপালা কেটে নিল সময়ের ধূর্ত কাঠুরিয়া
সে-প্রজাপতির পাখা হতে রং তুলে
ঢেলেছে ধূসর রং বর্ণহীন ঔজ্জ্বল্যবিহীন।

হায়! আমি এ কোন জগতে
তোমার সাম্রাজ্য হতে নির্বাসিত। যদি একবার
ফেরা যেতো, ঐ দূর কৈশোরের দীপ্ত সিংহাসনে
তোমার আসনতলে প্রজা হয়ে কাটাতাম কাল।

দু'টি কবিতা

ঈশ্বরের আশ্রয়ে : রবীন্দ্র গুহ

ইচ্ছা হয় চলে যাই ইচ্ছা হয় থাকি
দশমাস দশদিন কবরের নিচে
শহর ফেরত সব বন্ধুদের ডাকি।
গলায় কিসের দাগ ? পাপ ঢুকেছে
সে এক ভীষণ সাপ পাঁজরায় মণি
এবং বিষদাঁত বুকের ওপর, তবু
কাছে টেনে নিয়েছিল স্খলিত ধ্বনী
তার নাম পরিচিত পাগলা ঈশ্বর।

অনর্থ — রবীন্দ্র গুহ

শুনিয়া লজ্জায় মরি : এ শরীর স্রোতস্বিনী
সমুদ্রের মত। বর্তুল বুকের উপর
অধীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাম অভিমানী
সদাশয় সাপ ভয়ংকর।
এই বেলা ফিরে চলো, অন্ধকারে আরো ভয়
পশুরা দানব হয়, দ্বার রুদ্ধ যখন সময়।

সুখ এবং আমি
মঞ্জুলিকা দাশ

যেখানে তোমার খুশী যাও সুখগুলি,
তর্জনী সংকেত তুলে আনন্দের দেখাও ঘুলঘুলি।
উড়ে পায়রার মতো শব্দে, চড়ুইএর
গানের ঘুংঘুর তুমি চলে যাও, নৌকার ছইএর
ভিতরে সোহাগী সুখ, আদুরে মেয়ের মতো মাখো
সর্বাঙ্গ লুকিয়ে রাখো, পাটাতনে বসো, শুকনো খড়,
তা-ও বুঝি পিঠে লাগে, হেলানের বালিশ দেব কী ?
পাতার বিছানা চাও, হোগলার, শর।
কুয়াশা তাড়িয়ে দেবো রৌদ্র ঝিকিমিকি।
না হয় তৎপুর মেলে দিও, শীতের সন্ত্রস্ত পিঠ,
গরীব ভিক্ষুক, ছেঁড়া আঁচলের গিট
বাঁধি, কাঁধে ফেলি ছাখো আমি কবিষৎ
হৃৎপিণ্ড ক্ষত।
দুঃখ চিরসহচর, শৈশবকৈশোর বন্ধু, যৌবনের
প্রেমের ঈশ্বর।
নিতান্ত অসহ্য হলে সুতীক্ষ্ণ নখাগ্রে টুটি চেপে
মরবো নিশ্চিত, তবু আমি এ জীবন নিক্তি মেপে
সীমায়িত করবো না,— রাজকীয় খাটের ভিতর
শোব না কখনও আমি, অংকুশে বিদীর্ণ ঘাসে পেতে
রাত্রিকে পেরোবো দুঃখী উদয়াস্ত খেটে।

যে ফসল ঘরে তুলি আনন্দিত চাষীর মতন।
সমুদ্র গর্জনে তুলে জীবন-নর্তন।
ঘোরাও চরকীবাজী তুমি, ওড়াও হাউই, পিচকারী
আবীর দিন।
দোলের উৎসব রাত্রি,—আমি আজ একান্ত স্বাধীন
নিপীড়িত আজীবন, দু'চোখে বাষ্পীয় পোত, লবণ যন্ত্রণা,
হাসিমুখে সহ্য করি আমৃত্যু বঞ্চনা
ঠোঁটে, চিবুকের কালো তিলে,, গালে আঁচিলে দক্ষিণ।
ঘুলঘুলি দিয়ে চলে যাও তোমরা যেখানে খুশী,
সাধ্য নেই তণ্ডুলের কণা দিয়ে যৎসামান্য তুষি।
রোদে তুমি গলে মোম, হিমে হবে হিম।
বিরক্ত করো না যাও একঘেয়ে পানসে পালাও।
জয়েন্ট হাত পা ভাঙ্গা, মদেমত্ত রক্ত ঝিমঝিমা
দরদ দিওনা তুমি, খিড়কি ধরে যাও।

পথ চলা
কুমুদ রঞ্জন দাস

ভেবেছি সমুদ্র ডাকে, ডাকে দূরে মায়াবী আকাশ ;
রৌদ্রে রাঙা ধূলিপথ আছে কি আমারই প্রতীক্ষায়?
পাখির কূজনে ডাকে প্রান্তরের আতপ্ত বাতাস,
নীলাভ পাহাড়, বন, ঝর্ণা, নদী ডাকে কি আমায় ?

উজ্জ্বল বৈশাখী দিনে কে যেন দিয়েছে বরাভয় ;
দিগন্ত দিয়েছে ডাক ছুটে যেতে কিসের সন্ধানে।
সূর্যাস্তের দিনশেষে তারাদের অতন্দ্র বিস্ময়
কী যেন জাদুতে ভরা, আরো দূরে পথে যেতে টানে।

ধূলি রুক্ষ পথে নেমে পাইনিতো যাত্রার উদ্দেশ,
ঘরের বাধন ছিঁড়ে দিগন্তের সীমানার পারে
কোথাও আছে কি মুক্তি, দু'চোখে ছড়াবে স্বপ্নাবেশ।
পৃথিবী ছলনা করে, বুক ভরে নৈরাশ্য-আঁধারে।

তবু যেন কেউ ডাকে, দূরে যেতে কে আমারে ডাকে।
সহসা চকিত হই, জড়াই জটিল ঘূর্ণিপাকে।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

(৫)

ফয়েরবাকের সঙ্গে মূল পার্থক্য মার্ক্স-এর এইখানেই। ফয়েরবাক মানুষকে নিষ্ক্রিয় (passive) করে তাঁর দর্শনকে গড়েছেন ; মার্ক্স-এর মতে মানুষ কেবলই নিষ্ক্রিয় নয়, মানুষ ক্রিয়াশীল ও গতিমান-ও বটে। বহির্জগৎ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে, মানুষও তেমনি বাইরের বিষয়ের উপর আপনার প্রভাবের ছাপ এঁকে দেয়। প্রকৃতি ও মানুষ এবং বাহির ও ভিতর—এ দু'য়ের মধ্যে এই অনাদি ঘাত-প্রতিঘাত চিরদিন চলেছে এবং পরস্পরের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বজগৎ ও মানব সভ্যতা যুগের পর যুগ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে। বিষয়ী ও বিষয়ের (subject ও object-এর) মধ্যে এই যে পারস্পরিকতা (reciprocity)—এইটে মার্ক্স-শিষ্যদের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং এরই যাদু-প্রভাবে সকল সমস্যার দুয়ার অচিরে খুলে যাবে। এই পরমাশ্চর্য তথ্যটি ফয়েরবাকের চোখে কোনোদিন পড়েনি, তাই তাঁর দর্শনতত্ত্ব খানিকটা এদিকেই পথের মধ্যে খোঁড়া হয়ে থেমে গেছে। মার্ক্স-এর কৃতিত্ব ও প্রতিভা হলো দর্শনের প্রগতিকে এই অচল পঙ্কু থেকে মুক্তি দিয়ে ক্রমিক ঘাত-প্রতিঘাতের পথে প্রগতি বা progress-এর পথে পাঠানো।

ফয়েরবাক এবং অন্যান্য জড়বাদীরা Being-কে Thought-এর জনক বলে প্রমাণ করতে গিয়ে Thought-কে অর্থাৎ, মানব মন ও তার ক্রিয়াশীলতাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক বা ক্ষেত্র হিসাবে দাঁড় করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের জড়বাদ অত্যন্ত যান্ত্রিক (mechanistic) ও একপেশে হয়ে গেছে। মার্ক্সীয় দল বলেন যে, মার্ক্স পূর্বতন জড়বাদ এমন কি ফয়েরবাকীয় (ফয়েরবাক এঁদের মতে জড়বাদী) জড়বাদেরও সংস্কার সাধন করে এই দোষ থেকে মুক্ত করলেন এবং মানুষের সক্রিয়ত্বকে ঘোষণা করলেন। মার্ক্সের হাতে মানুষ সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টামাত্র থেকে সচল কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম থিসিস্-এ মার্ক্স লিখছেন :

"The chief lack of all materialistic philosophy upto the present, including that of Feurbach, is that the thing, the reality, sensation is conceived of under the form of the object (or under the form of contemplation) which is presented to the eye, but not as human sense (or concrete human activity), praxis (practical exercise) not subjectively." (Marx., Ist Thesis)

তৃতীয় থিসিসেও মার্ক্স এই কথাকে অন্য আকারে প্রকাশ করেছেন। মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে (active role) এখানে খুব স্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।• ১৮ শতকে ফরাসী

• "The materialistic doctrine that men are the products of conditions and education……forgets that circumstances may be altered by man and that the educator has himself to be educated." (Marx : 3rd Thesis)

দেশে যে জড়বাদের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তাতে মানুষের কর্তৃত্বকে খর্ব করে ফেলা হয়েছিল। পারিপার্শ্বিকের ওপরে অতিরিক্ত জোর দেবার ফলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল। মানুষের একটা স্বারাজ্য আছে যেখানে সে কর্তা এবং স্রষ্টা। মানুষ যদি পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সততই নির্দয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার সক্রিয় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে সে হয়ে দাঁড়ায় অবস্থার ক্রীড়নক মাত্র। সব কর্ম ও সকল চিন্তায় যদি মানুষ বহির্জগতের রজ্জুতে যান্ত্রিকভাবে বাঁধা পুতুল হয় তবে মানুষের সব চাইতে বড়ো বিশিষ্টতাকেই অস্বীকার করা হয়। ফরাসী জড়বাদীরা বিষয়কে (Being) প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষের সচেতন সক্রিয়ত্বকে তুচ্ছ করেছিলেন। এই কারণে তাঁদের জড়বাদও নিতান্ত প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়ে উঠেছে। এই যান্ত্রিক জড়বাদকে (Mechanical Materialism) মার্ক্স একপেশে ও অচল বলে অগ্রাহ্য করেছেন এবং স্বয়ং মানুষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে তাঁর নিজের জড়বাদকে পূর্বতন জড়বাদ থেকে বিশিষ্ট ও পৃথক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ যেমন পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তেমনি পারিপার্শ্বিককেও মানুষ অহরহ প্রভাবিত করছে এবং পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। বাহিরের জগৎ মানুষকে আঘাত করছে, আবার মানুষও বাহিরের জগৎ ও বস্তুকে প্রতিঘাত করছে। একদিকে মানুষ নিজে যেমন নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি সেও তার চারপাশের জগৎ ও প্রকৃতিকে বদলে দিচ্ছে। মানুষ সক্রিয় ও স্বাতন্ত্র্যশীল সত্তা। একদিকে সে যেমন বিষয় (object) হয়ে বিষয়ের ক্রিয়ার ক্ষেত্র; অন্যদিকে আবার সে তেমনি বিষয়ী (subject) হয়ে বিষয়কে জানছে, ভোগ করছে ও নিজের প্রয়োজনে বদলে নিচ্ছে। মানুষের এই active role বা সক্রিয় কর্তৃত্বই মার্ক্সের দর্শনতত্ত্বের বিশেষত্ব একথা মার্ক্সীয়রা ঘোষণা করে থাকেন। ফয়েরবাক ও পূর্বতন অন্যান্য জড়বাদীদের এই গুরুতর ত্রুটি মার্ক্স সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের জড়বাদ এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে নির্দোষ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে বিকশিত হয়েছে, এই দাবী মার্ক্সীয়রা সর্বদা করে থাকেন। মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে, মানুষ ও প্রকৃতি, এই দুই-ই নিত্য নব নব পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, নতুন সৃষ্টি এই পন্থাতেই সম্ভব হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতাও এই রীতিতেই গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অফুরন্ত নতুনের আবির্ভাব ঘটে এবং সভ্যতা স্তরে স্তরে ক্রমশ: উচ্চতর মার্গে আরোহণ করতে থাকে। এই তত্ত্বেরই নাম ডায়লেকটিক তত্ত্ব এবং এই ডায়লেকটিক তত্ত্ব না জানার ফলেই ফয়ারবাকীয় ও আঠার শতকীয় জড়বাদ যান্ত্রিকতার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই: মানুষের মানসিকতা বা চিত্তবৃত্তির (Consciousness) একটা সক্রিয়ত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ডায়লেকটিক জড়বাদ স্বীকার করেছে বলে এই যে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা—এটা যুক্তিতে টেকে কিনা। একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে যে আসলে পুরোনো জড়বাদ থেকে এই ডায়লেকটিক-অলঙ্কৃত নতুন জড়বাদ কোনো অংশেই কোনো বিশেষত্ব বা পার্থক্য দাবী করতে পারে না। ১৮ শতকের ফরাসীয় জড়বাদকেই আবার নূতন পোষাক পরিয়ে বর্তমান যুগের মনোহরণ-যোগ্য করে সভায় হাজির করা হয়েছে। একে দেখে অনেক চক্ষুই আজ ভুলেছে এবং ইতিমধ্যে সানন্দে অনেক কণ্ঠই গান ধরেছে:

"আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম নয়ন মেলে।"

কিন্তু যে চোখের দার্শনিক দৃষ্টি বাহ্যরূপে ভোলেনি, সে চোখ এই মনোহরণীয় সকল সাজ-সজ্জাকেই পলকে ধরে ফেলবে।

আসলে যান্ত্রিক জড়বাদ (mechanical materialism)

থেকে নবজড়বাদের কোনই তফাৎ নেই—যেটুকু বৈশিষ্ট্য এর আছে সে হচ্ছে এর কথার চমকপ্রদ মারপ্যাঁচ এবং পছন্দমত ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করে একে জীবনের সকল ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী করে স্থাপন করবার প্রয়াস। এই ডায়লেকটিক জড়বাদ বিশ্বভুবনের সকল দিককেই আগলে আছে এবং এর এই সর্বব্যাপিকা দশভুজা মূর্তির কাছে অন্ধ ভক্তি সহজেই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে।

দেখা যাক, যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে ডায়লেকটিক জড়বাদের কোনো মহৎ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সত্যি সত্যি আছে কিনা। এঁরা বলছেন, মানুষের active role বা সক্রিয় কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু একথার সঙ্গে এঁদের মূল সূত্রেরই দুর্দম বিরোধ বেধে যাচ্ছে না কি? 'It is not consciousness that determines existence, but on the contrary it is existence that determine consciousness."—একথার সঙ্গে মানুষের কর্তৃত্ব বা active role-এর সামঞ্জস্য হয় কি? মানুষের মানস-লোক যদি বহিঃসত্তার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত (determined) হন, তবে তার স্বাধীন কর্তৃত্বের কি মানে থাকে? যদি মানুষের মননের স্বাধীন কর্তৃত্ব সত্যি থাকে, তবে কাঠপোট্টা নিয়ন্ত্রণবাদের (determinism) তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মার্ক্স-এর epistemology বা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর নতুনত্ব ও বিশেষত্বের দাবী করবার কোনো ভিত্তি নেই। ফয়েরবাক মানুষের মনকে নিষ্ক্রিয় বলে দাঁড় করেছেন। বাইরের বিষয়গুলো মনের ওপর ক্রিয়া করে; তারই ফলে মানুষের সংবেদন (sensation) জন্মে, এবং মানুষ অনুভব করে, মনন করে। আগে বাইরের বস্তুর প্রভাবে সংবেদন, তার পরে মনন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলে মার্ক্স বলছেন, ফয়েরবাক বাইরের বাস্তব জগৎকে (objective Reality) বিষয়াকারে (under the form of object) বা চিন্তাকারে (under the form of contemplation) দেখতে চেয়েছেন—স্থূল মানবিক ক্রিয়ারূপে নয় (not as concrete human ctivity.)। কিন্তু মার্কসের নিজের মতে, মানুষের বস্তু-জ্ঞান জন্মে বিষয়ের ওপর প্রতিঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে। *

কাজেই মানুষ প্রকৃতির ওপরে তার প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন এঁকে দেয়, অর্থাৎ সে প্রতিঘাত (react) করে; আর এই প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ও ফলে মানুষের চিত্তে বস্তুর গুণ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। কেবল প্রকৃতিরই প্রভাবের ফলে নয়, মানুষেরও ক্রিয়ার ফলেও জ্ঞানোৎপত্তি হয়। জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাপারে মানুষেরও দান রয়েছে—সে-দান তার কেবল নিষ্ক্রিয় (passive) প্রতিক্রিয়া নয়, সক্রিয়তাও বটে।

কিন্তু মানুষের এই কর্তৃত্ব কতটা স্বাতন্ত্র্যবান্? যখনই মার্কস বলছেন যে এই কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র, সক্রিয় কর্তৃত্ব নয়, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ামাত্র, তখনই সেই ফয়েরবাকীয় তথা ১৮ শতকীয় কাঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদই (Determinisim) আবার দেখা দিচ্ছে। বহির্জগৎকে বদলে দিতে মানুষ যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাও ঘটে বহির্জগতের শাসনে বাধ্য হয়েই। মানুষের হাতপা নিয়ন্ত্রণবাদের লোহার শেকলে বাঁধা, তার মন কেবল বাহিরকে প্রতিফলিত ক'রে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ারূপে ফিরিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধা করছে। বহির্জগৎকে ফটো তুলে হুবহু নকল করাই যে মনের একমাত্র কাজ একথা মার্কস-এর কৃতী শিষ্য লেনিনও বলেছেন: বহির্জগৎ মানুষের জ্ঞানে নকল হয়ে, ফটোগ্রাফ হয়ে, প্রতিফলিত হয়ে (copied photographed and reflected) থাকে। Empirio-Criticism-এর ৩৮ পৃষ্ঠায়ও তিনি এই রকমের কথাই লিখেছেন; ** সেই একই কথার প্রতিধ্বনি

---

* "...Matherd says that our ego cognises an object by reacting upon it." (Plekhanov, Fundamental Problems, p. 12)

** "Matter acting on our senses, produces sensations. The sensatoins depend on the brains, nerves

করছেন। প্রকৃতি বাইরে থেকে মানুষের চেতনায় আঘাত ক'রে মানুষের বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন করে। এমনি করে মানুষ এখানেও সেই ফয়েরবাকীয় নিষ্ক্রিয়ত্বেই আবার অবনমিত হচ্ছে।

কার্নিলভ-ও বলেছেন, বাইরের বস্তু আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়, ডায়লেকটিক জড়বাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে being ও consoiouness-এর সম্পর্কটা এইরূপেই দেখা হয়।*

এখানে মানুষের নিজের কোনো কর্তৃত্ব নেই— জড় বহিঃসত্তা চেতন সত্তায় প্রতিফলিত হয় মাত্র। ফয়েরবাকের জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) থেকে এর পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্লেখানভও একথা বুঝেছিলেন, তাই মার্কসের স্বাতন্ত্র্যকে প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদন (sensation) চিন্তার পূর্বেই হয়ে থাকে, বস্তুর গুণ সম্বন্ধে আমরা প্রথমে সচেতন হই, তারপরে তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি। মার্ক্স একথা কখনো অস্বীকার করেন নি। তিনি কখনো বলেন নি যে, সংবেদন চিন্তার পূর্বগামী নয়, তাঁর মতে সংবেদন মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। আর এই সংবেদনের অভিজ্ঞতা সে লাভ করে বহির্জগতে তার নিজস্ব ক্রিয়াসূত্রে। আর মানুষের এই নিজস্ব ক্রিয়াতেও জীবনযুদ্ধই তাকে বাধ্য করে।⊕

যে আঘাত মানুষ বাহ্যপ্রকৃতির ওপরে ফিরে ফিরে করছে, সে আঘাতও সে নিজে করছে না, তাকে দিয়ে বাহ্য-প্রকৃতিই করাচ্ছে। এমনি করে মার্ক্স নিজের জড়বাদকে ফয়েরবাকের যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে বাঁচিয়ে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টির সামনে আসতেই সে বৈশিষ্ট্য আলোর সামনে ক্ষণিক কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আসল কথা, মানুষের যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্ব মার্ক্স স্বীকার করে নিতে চাইছেন, সে সবই বহিঃপ্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর বড় সাধের ডায়লেকটিক জড়বাদও যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়ত্ব (mechanical automatism) এবং কাষ্ঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদের বজ্রমুষ্টির অধিগত হয়ে পড়েছে।

মার্ক্সের বন্ধু এঙ্গেল্স্ নব-জড়বাদের জনৈক ঋষি। ফয়েরবাক সম্বন্ধে তাঁর যে বই আছে তাতে তিনিও অষ্টাদশ শতকের জড়বাদকে গালগাল দিয়ে নব-জড়বাদের মহিমা প্রচার করেছেন। তখন mechanics (বলবিদ্যা) সবে পুষ্টিলাভ করছে, আর তারই তাপে এবং জীববিজ্ঞানের শৈশব হেতু, পণ্ডিতেরা তখন সবকিছুতেই যান্ত্রিকতার দোহাই পাড়ছেন, এমনকি মানুষের জীবন ব্যাখ্যায়ও যান্ত্রিকতাবাদের প্রয়োগে সোৎসাহে লেগে গিয়েছেন।

আঠার শতকের জড়বাদের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস্-এর দ্বিতীয়

---

and retina etc., on matter organised in a definite way. The existence of matter is independent of sensation, Matter is primordial (Empirio-crticism, Lenin, p. 38)

* From the point of view of dialectic materialism, the relation is understood as the 'reflection' in our conciousness of objects of existence," (Psychology, p. 248)

⊕ "In both cases, thought is preceded by sensation; in both cases, we begin by becoming aware of the qualities of objects, not until after that do we think about them. Mathew never denied this. For him what was at issue was, not the undeniable fact that sensation precedes thought, but the fact that man is led to thought mainly by the sensations which he experiences in the course of his own action on the outer world…this action on the outer world is forced on him by the struggle for existence…" (Plekhanov, Fundamental Problems, p, 12-13)

আপত্তি হল : এ মতবাদ বিশ্বব্যাপারে পরিবর্তনশীলতা দেখতে পেখেনি।●

এঙ্গেলস-এর মতে জড়প্রকৃতি অবিশ্রান্ত পরিবর্তিত হচ্ছে স্বগুণে ও নিজের তাগিদে ; জড়বস্তুর (matter) অন্তর্নিহিত গতির (motion) ফলে নব নব বস্তুর বিকাশ—উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে তাদের বিবর্তন। জড়প্রকৃতি, জীবজগৎ, মানব জগৎ—এসবই জড়ের ক্রম-বিবর্তনের ফল। "Dialectics of Nature" নামক বইতেও এ-কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। বিশ্ব একটি সক্রিয় ব্যাপার (process), পূর্বতন জড়বাদ এই সত্যটিকে ধারণায় আনতে পারেনি বলেই তা যান্ত্রিকতার শেকলে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু নব-জড়বাদের এই উদ্‌গাতা যদিও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-ব্যাপারে মানুষের নিষ্ক্রিয়তাকেই সমর্থন করেছেন, অবশ্য নিজের অজান্তে। বহির্জগতে বস্তুনিচয় মানুষের মস্তিষ্কে তাদের ছাপ এঁকে দেয়, অনুভূতি, ইচ্ছা, চিন্তারূপে নিজেদের প্রতিফলিত করে। ⊖

কাজেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মার্ক্স জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ফয়েরবাক থেকে যে পার্থক্য দাবি করেছেন সে দাবি ভিত্তিহীন। সক্রিয় ভূমিকা বা 'active role' কথাটা অর্থহীন কথামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে ; তাঁর প্রচারিত সক্রিয় ভূমিকা আসলে নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর।

এখন মার্কসের সঙ্গে ফয়েরবাকের দ্বিতীয় পার্থক্য আলোচনা করা যাক। Being-Consciousness তত্ত্বে ফয়েরবাকই প্রথমে প্রচার করেন Being-এর প্রাধান্য। কিন্তু Being সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বেশিদূর এগোয় নি। মানুষের মনন-লোক ঐতিহাসিক পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় একথা অবশ্য ফয়েরবাক বলেছেন। মানুষের ঐতিহাসিক পরিবেশ মানে সামাজিক আবহাওয়া। মানুষে-মানুষে যাবতীয় সম্বন্ধ সমাজেরই রচনা, আর তা দ্বারাই মানুষের চিন্তা-জগৎ সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প—এ সবই মানুষের চিন্তা-লোকের ঐশ্বর্য এবং এ ঐশ্বর্য সবই মানুষের সমাজ-জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ। ●

কিন্তু সমাজের প্রভাব ও প্রাবল্য সম্বন্ধে এ উক্তির কোন নতুনত্ব আছে বলে কেউ মনে করবেন না। কারণ, সামাজিক ও মানবিক পারিপার্শ্বিক একটা পুরু আবহাওয়ার পরিমণ্ডল দিয়ে ব্যক্তিকে ঘিরে আছে—একথা জগতের বহু তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকই বলে গেছেন। হেগেলের সমাজ-দর্শনই আদর্শবাদের তরফ থেকে এই সমষ্টি-প্রাধান্যের প্রবল ঘোষণা। মার্ক্স-ও এ-তত্ত্ব হেগেল থেকেই শিখেছেন বলা যেতে পারে। কিন্তু মার্ক্স তাঁর ৬ষ্ঠ থিসিস্-এ যখন 'humanity'-কে সমাজ-অবস্থার বিগ্রহমূর্তি বলে নির্দেশ করেছেন, তখন খুব নতুন ধরণের কোনও কথা বলেন নি।¢

● The specific limitation of this materialism lies in its incapacity to represent the universe as a process, as one form of matter assumed in the course of evolutionary development." (Feurbach, p. 65-58)

⊖ "The realities of the outer-world impress themselves upon the brain of man, reflect themselves as feelings, thoughts, impulses, volitions, in short, as ideal tendencies." —(Engels, Feurbach, p 73)

● Art, religion, philosophy and sceince are only manifestations or revelations of *human essence*." (Quted from Feurbach in Fundamental Problems, p. 23)

"The *human essence* can only be found in the Community, in the unity of man with man." (Quoted from Feurbach in Fundamental Problems p. 23)

¢ 'Humanity is not an abstraction dwelling in each individual. In its reality, it is the ensemble of the conditions of society." (6th Thesis)

(শেষাংশ ৮৬৩ পৃষ্ঠায়)

টি এস এলিয়ট   অন্তশ্চিন্তা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা দেশে এলিয়ট সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল সম্ভবত তিরিশের যুগের শুরু থেকেই। আধুনিক কাব্য সম্পর্কে আলোচনাকালে 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এলিয়টের 'জার্নি অব দি মেজাই' কবিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরিচয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় আরো দু'জন কবি এলিয়ট কাব্য সম্পর্কে আলোচনার প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন, তাঁরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে। স্মর্তব্য এই যে সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় এলিয়ট কাব্য নির্দিষ্ট ছিল না এবং অধ্যাপক-সমাজ তখন পর্যন্ত এলিয়ট প্রতিভার যথার্থতা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হতে পারেননি। ফলত এলিয়টের আলোচনা ছিল তখন সাহিত্য পত্রের পাতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে। এলিয়ট কাব্যের প্রকরণ, ভাবানুষঙ্গ, উপমা ও চিত্রকল্প ইত্যাদির অভিনবত্বে অধ্যাপক-সমাজ সচকিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু এরূপ সর্ব বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কবিপ্রতিভাকে নিঃসংশয়ে বরণ করার পথে কোথায় যেন প্রবল বাধা বিদ্যমান ছিল। ১৯৪৮ সালে নবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকে অবশ্য এলিয়ট এ দেশের অধ্যাপক সমাজে বরণীয় হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এলিয়ট কাব্যকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় রইলো না।

বস্তুত বাংলা দেশের শিক্ষিত সাহিত্যসমাজ এলিয়ট কাব্যে এবং এলিয়ট প্রবর্তিত সমালোচনার ধারায় অবগাহন করতে পেরে হৃদয়মননজাত অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হতে পেরেছেন এসত্য এখনকার দিনে আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং কী সেই কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্য শিক্ষিত বাঙালী কবি-সমাজ ও সাহিত্য পাঠককে যা এত গভীর ও বিপুল ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে? সংক্ষেপে এলিয়টের কবিতার বৈশিষ্ট্য গুলোকে সম্ভবত নিম্নলিখিত দিক থেকে স্মরণ করা যেতে পারে। (১) এলিয়টের কবিতা গতানুগতিক কাব্যধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইংরেজি সাহিত্যের উনিশ শতকী সাহিত্য-সংস্কারে নিমজ্জিত সমালোচক সম্প্রদায়ের বিরোধীতাকে ক্রমশই তাঁর সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের তীব্রতার কাছে হ্রাস পেতে দেখা যায়। (২) ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যচিন্তায় দীর্ঘকাল বাদে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও অংশত তৃতীয় দশকে এলিয়ট ভাবনিষ্ঠ ও সৎসাহিত্যের (serious literature) গুণাবলী এবং শিক্ষিত মনের উপজাত মর্যাদা ও মান সঞ্চারিত করেন। (৩) এলিয়টের মত বহু ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠক বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আধুনিক কালের ইতিহাস, সময় ও সমাজচেতনার উপযোগী কাব্য রচনার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ক'রে এই প্রথম ইংরেজি কবিতাকে

য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্যের নিকটবর্তী করলেন। (৪) এলিয়টের কাব্য পাঠক উনিশ শতকের ইংরেজি কবিতার কাব্যধারার গতানুগতিক অনন্যু-প্রাণিতলাবণ্যের বন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ পেলেন এবং বিংশ শতকের ভগ্নপ্রায় নষ্টগন্ধ য়ুরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে সচেতন হলেন। (৫) অবলম্বনের দিক থেকে যথার্থ এবং পরিমার্জিত কাব্য-আঙ্গিক প্রবর্তনের মাধ্যমে কবিতার বহিরঙ্গের নবরূপ পাঠকের চোখের সামনে উন্মোচিত হ'লো। (৬) সহর ও সহরাঞ্চলের পরিবেশ, রুটিনবাঁধা ধাবমান যান্ত্রিক নিয়মপিষ্ট জীবনধারা থেকে আহরিত নানা উপকরণে সমৃদ্ধ চিত্রকল্প ও প্রতীক নির্মাণের অনবদ্য দক্ষতায় এলিয়ট কাব্য অল্প কালের ব্যবধানেই শিক্ষিত কাব্য পাঠককে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। (৭) কাব্যজীবনের শেষ পর্যায়ে বিশেষ এক ধরণের আধ্যাত্মিক অনুভব-সম্ভূত গোপন বিশ্বাসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেও বর্তমানকাল সময়চেতনার নিরবচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে অতীত ও ভবিষ্যৎ মানবসত্তার অঙ্গীভূত এই বোধ এলিয়টকাব্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। খুব সংক্ষেপে এবং মোটামুটিভাবে এলিয়ট প্রসঙ্গে এই ভাবনা প্রায় অনিবার্যরূপেই পাঠক সমালোচকের মনে জাগে।

'অনুচিন্তা' এলিয়টের কবিতা কিংবা তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যের (যা পরিমাণের দিক থেকে স্তূপাকৃত নয় কিন্তু যার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে প্রায় অপরিমাপ্য বলা যায়) কোনো আলোচনার উদ্যোগ নয় বলেই সে-সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অবান্তর। শুধু এই উক্তিই সঙ্গত যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এলিয়ট এমন একটি স্বতন্ত্র সমাজসত্তার প্রতিনিধি পূর্ববর্তী কোনো ধারণা কিংবা অনুভবের সঙ্গে যার তুলনাই চলতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এলিয়ট বিংশ শতকের পুরোপুরি য়ুরোপীয় কবি, বদলেয়র, লাফর্গ থেকে অনায়াসে কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তিনি; য়ুরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য অকৃত্রিম, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্য থেকে সংগৃহীত উপাদান তাঁর কবিতাকে বিষয়মহিমায় স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে বলতে পারা যায়। এলিয়টের কাব্যে আঙ্গিকের ক্রমবর্দ্ধমান বৈচিত্র্য যে-কোনো সুধীর কাব্যপাঠকের অনুভবের বিষয়, এবং তাঁর প্রথম যৌবনে, তেইশ বছর বয়সে লিখিত কবিতা 'দি লাভ সং অব্ জে, আলফ্রেড প্রুফ্রক' থেকে শুরু ক'রে 'বার্ণ্ট নর্টন' কিংবা 'লিটল্ গিডিং' পর্যন্ত পরিণত কালের কবিতাবলীর দিকে তাকালে আঙ্গিকের ক্রমরূপান্তর ও ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এলিয়ট নিজেকে ধ্রুপদী সাহিত্যিক (Classicist) ঘোষণা করলেও কবিতা সম্পর্কে তার অভিমতের জন্যে তিনি উনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় সাহিত্যচিন্তায় অবগাহন করেছিলেন; সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। ফ্লবেয়ার ও বদলেয়র এবং তাঁদের অনুগামী ফরাসী লেখকদের কাছ থেকে; অংশত আমেরিকার আরভিং বাবিট এবং এজরা পাউণ্ড ও টি, ই, হিউম লণ্ডনে থাকাকালীন নৈকট্যে এলিয়টকে প্রভাবিত করেছিলেন এসংবাদ একালের কাব্য-পাঠকের আর অজ্ঞাত নেই এবং সে-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

কবিতারচনায়, কাব্যনাট্য নির্মাণে এবং সমালোচনা সাহিত্যে এলিয়টের স্বাক্ষর সুমুদ্রিত এবং পরিমাণের দিক থেকে পরিমিত হলেও শিক্ষিত পাঠক সমাজে ও লেখক সমাজে তার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কাব্য গ্রন্থ 'প্রুফ্রক' (১৯১৭) এবং 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' (১৯২২), কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রল' (১৯৩৫) এবং 'দি ফ্যামিলি রি-য়্যুনিয়ন' (১৯৩৯), সমালোচনা গ্রন্থ 'দি ইউস্ অব পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউস্ অব ক্রিটিসিসম্' এখনকার যে কোনো শিক্ষিত ভারতীয় সাহিত্য পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় বস্তু। এলিয়টের পরবর্তীকালের

রচনাবলী এই আকর্ষণকে উত্তরকালে দৃঢ়তর করেছে বলতে পারা যায়। বাঙালী কবিদের মধ্যেও আধুনিককালে কয়েক-জন কবি এলিয়টের প্রভাবের অনুবর্তী হতে এক সময়ে ইতস্তত করেননি ; ঐ প্রসঙ্গে অন্তত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের নাম উল্লেখ্য। বর্তমান প্রবন্ধকারের 'ঘর' (১৯৪০) কবিতাটিও অনুরূপ অবস্থার দৃষ্টান্ত। মোটের ওপর, এলিয়ট প্রবর্তিত কাব্যরীতি ইদানীন্তনকালের বাংলা কবিতায়ও যে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য এনেছিল একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এলিয়টের সমালোচনা-পদ্ধতিও আধুনিক কালের বাঙালী সমালোচক-মনকে অনেক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। সমালোচনাকে বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তে ভারাক্রান্ত না ক'রে সংহতি ও গভীরতায় বুদ্ধিগ্রাহ্য করবার ইঙ্গিত এলিয়ট রচনায় প্রচ্ছন্ন। মোটের ওপর, গদ্যে ও কাব্যে এলিয়ট যে বিরল ক্ষমতার অধিকারী পরবর্তীকালের তরুণ সাহিত্যিক তার উত্তরাধিকারে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করেছেন। কাব্যচিন্তার জগতে এলিয়ট প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য নিম্নলিখিতরূপ : "যে-দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না হলেও, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাতে তিনি বিশেষভাবে বিত্তবান, এবং তাঁর বিদ্যা প্রগাঢ় ও বুদ্ধি অকুতোভয়। তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক ; কিন্তু সে আদর্শের প্রধান গুণ এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে, কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমূহ সমস্যার পুনরুত্থাপণ অনিবার্য লাগে। এই অন্বেষণের পরে তার সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘোচে কিনা, সেটা গণ্য নয়, এটাই স্মরণীয় যে তিনিই আমাদের মূর্চ্ছাগ্রস্ত বিচারবুদ্ধিকে জাগিয়ে দেন। তাঁর গদ্যে পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিককালে একান্ত দুর্লভ, হয়তো এইজন্যেই বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এইজন্যেই তিনি ভবিষ্যতের পূজা পাবেন।" বাংলা দেশের একজন প্রভাবশালী প্রতিনিধি—স্থানীয় আধুনিক কবির এই মূল্যায়ণ থেকেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ওপর এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা সহজতর হবে।

একজন সমালোচক এলিয়ট কাব্যের মূল লক্ষ্য নিরাসক্তি কিংবা নৈর্ব্যক্তিকতার সন্ধান বলে অভিহিত করেছেন। 'His central purpose can be described as a search for detachment or impersonality' তাঁর প্রথমদিককার কবিতাবলীতে বর্ণিত চরিত্রগুলোতে নেতিবাচক অর্থে এই নিরাসক্তি বিমূর্ত ; জীবনে যেহেতু তাদের কোনো তৃপ্তিজনক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি অনুপস্থিত। তাদের কোনো ব্যক্তিগত দৃঢ়প্রোথিত মূল বা প্রীতি-ভালোবাসা নেই এবং নিজেদের আবেগ বা তাড়নাকেও তারা ভয় পেয়ে থাকে। 'ফাঁপা মানুষ' এই অনুভূতির দৃষ্টান্ত। ওয়েস্টল্যাণ্ডের বিভিন্ন চরিত্র, 'সুইনি' এবং 'জেরনশন' উল্লেখ্য। এলিয়ট যে নৈর্ব্যক্তিকতার অনুসন্ধান করেছেন তাতে নিহিত জীবনকে দেখার বিভিন্ন ভঙ্গি ; আত্মসংযম থেকে নির্লিপ্ততা বা অনীহা পর্যন্ত বিভিন্ন ভঙ্গিসমূহ প্রকৃতপক্ষে এই সমাত্মসম্বন্ধের অঙ্গীভূত। সাংস্কৃতিক জগতে মার্কিন পরিবেশ থেকে য়ুরোপীয় পরিবেশের দিকে যাত্রা এবং য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে কাব্য-মুক্তির সন্ধানে তিনি অপর মার্কিন ঔপন্যাসিক হেনরী জেমস্-এর সমসাময়িক হলেও কেউ কেউ মনে করেন যে উনবিংশ শতকের গভীরতর ইতিহাসচেতনা এবং বিবর্তনবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি জেমস-এর চেয়েও গভীরে পৌঁছাতে পেরেছেন এবং নিজের সমসাময়িক কালের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের জগতের নিরবচ্ছিন্নতা-হীনতার সমস্যার মুখোমুখী হয়েও সাবিক উত্তরণ প্রচেষ্টায় কাব্যানুভূতিতে স্বতন্ত্র পরিবেশের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এলিয়টের ইতিহাসচেতনা এবং আধিবিদ্যক বাস্তবতার অনুসন্ধান প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর কবিতায় সময় নামক বিষয়টি সম্পর্কে নতুন একটি ব্যাখ্যা বা তাৎপর্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

রোমান্টিক কবিদের কবিতায় যে রকম প্রকৃতি (ওয়ার্ডস্বার্থ স্মরণীয়) তেমনি এলিয়ট কাব্যে সময় (Time) গোড়া থেকেই ('প্রুফক' থেকে 'ফোর কোয়ার্টেটস্' পর্যন্ত) বিভিন্ন পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা ও অর্থময়তার সূচনা করেছে। কিন্তু এলিয়ট কাব্যের পর্যালোচনা 'অনুচিন্তা'র উদ্দেশ্য নয় এবং সংক্ষেপে সেরূপ যে-কোনো চেষ্টাই সহজসাধ্য না হওয়াই সম্ভব। শুধু এইটুকু মন্তব্যের পুনরুল্লেখ অনিবার্য যে রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের তরুণতর বাঙালী কবিগোষ্ঠীর কাব্য-জগতে এলিয়ট প্রভাব কোনো কষ্টকল্পিত ধারণামাত্র নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা রক্তমাংসের মতোই একালের বাংলা কবিতার গঠনকার্যে অনিবার্য বিবেচিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর সূচনায় এলিয়টের মৃত্যুসংবাদ সমস্ত সংবেদনশীল বাঙালী বুদ্ধিজিবীকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, এলিয়ট দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন এবং কবিতা, কাব্যনাট্য এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে পারা যায়। তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজি কাব্যজগতে অডেনগোষ্ঠী এবং অডেনগোষ্ঠীর পরেও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডে ক্রুদ্ধ দশকের কবিসমাজ কাব্যচর্চায় স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। কিন্তু ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও অংশত তৃতীয় দশকে এলিয়টের যে ভূমিকা তার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোনো তুল্য কবি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এবং আদৌ দেখা যাবে কিনা তা' অনুমানের বিষয়।

[টমাস স্টের্নস্ এলিয়ট (জ ১৮৮৮) কবি, সমালোচক ও নাট্যকার। জন্মস্থান সেন্ট লুই, মিসৌরি। শিক্ষা: স্মিথ অ্যাকাডেমি, হারভার্ড, মার্টন কলেজ, অক্সফোর্ড। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এসে অল্প কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে লয়েড্স্ ব্যাঙ্কে কাজে যোগদান করেন। 'লভ সং অব আলফ্রেড জে প্রুফক' (১৯১৫) 'পোয়েট্রি' কাগজে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী ভিভেন হেউড্‌কে বিবাহ করেন। (১৯১৫), 'প্রুফক অ্যাণ্ড আদার অবজারভেশনস্' কাব্যগ্রন্থের (১৯১৭) প্রকাশ। ১৯১৭-১৯ পর্যন্ত ইমাজিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের মুখপত্র 'দি ইগোইষ্ট'-এর সহকারী সম্পাদক। 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' কাব্যগ্রন্থের (১৯২২) প্রকাশ। ঐ বছরেই এলিয়ট নিজের সাহিত্যপত্র 'ক্রাইটেরিয়ন' (১৯২২-১৯৩৯) প্রকাশ করেন। চার্চ অব ইংলণ্ডে প্রবেশ (১৯২৭) এবং 'অ্যাশ ওয়েড্‌নেসডে'র প্রকাশ (১৯৩০) হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যসাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৩২)। প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' (১৯৩৫) ক্যান্টারবেরী উৎসবের সময়ে প্রকাশিত। 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স' (১৯৩৫-৪২); পরবর্তীকালের কাব্যনাট্য 'ফ্যামিলি রি-য়ুনিয়ন' (১৯৩৯), 'দি ককটেল পার্টি' (১৯৫০), 'দি কনফিডেন্‌শিয়াল ক্লার্ক' (১৯৫৪) এবং 'দি এলডার ষ্টেটস্‌ম্যান' (১৯৫৮)। এলিয়টের গদ্য সমালোচনাগ্রন্থ সমূহের অন্যতম: 'দি স্যাকরেড উড্' (১৯২০) এবং 'দি ইউস্ অব পোয়েট্রি' (১৯৩৩) এবং 'অন দি পোয়েট্রি অ্যাণ্ড পোয়েটস্' (১৯৫৭); এছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্যেও লিখেছেন: 'ওল্ড পোসামস্ বুক অব প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস্' (১৯৩৯)। অর্ডার অব মেরিট পুরস্কারে পুরস্কৃত এবং নোবেল পুরস্কারে ভূষিত (১৯৪৮); ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। মৃত্যু: জানুয়ারী, ১৯৬৫]

জোয়ার

উপন্যাস
পূর্বপ্রকাশিতের পর

বিজন কুমার ঘোষ

পাঁচ

আলোক ওর ছেলেবেলার কতগুলি ঘটনা, কতগুলি ছবি, টুকরো কথা, দৃশ্যপট ইত্যাদি নিপুণ শিল্পীর মত মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে, যা হারাবার নয়, ভুলবার তো নয়ই। আজকের অনেক সুখের কথা, অনেক আনন্দের কারণ আলোক নিখুঁত ভাবে ভুলে যেতে পারে। পারে না ওই সব দুঃসহ স্মৃতি—যা আলোককে আনন্দ দেয়, দুঃখ দেয় তীব্রতম। কেন এমন হয়?

মহবতপুরের রায় বাড়ি। কত আনন্দ—সুখ দুঃখের স্মৃতির মুষলধারা। সব মনে পড়ে। তিন মাইল দূর থেকেও গাছপালার ভিতর ত্রিভুজাকৃতি চূড়োটা দেখা যেত আকাশের মধ্যে। কি বিরাট বাড়ি রায় বাড়ি! কি নিখুঁত তার কারুকাজ! স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের পিতা অমরেন্দ্রনাথ বাড়িটি তৈরী করান। তিনি ছিলেন সৌখিন মানুষ। অবশ্য রায় বাড়ির প্রত্যেকেই সৌখিন। সেকালেই নাকি এক লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ হয়েছিল তৈরী করাতে। যেখানকার যা ভাল জিনিষ—বার্মা থেকে সেগুন কাঠ, ভেনিস থেকে রঙিন কাচ, মধ্যপ্রদেশের মার্বেল পাথর—ত্রুটি ছিল না কোন দিকেই। ভিতরের বাগান, প্রাচীরের বাইরের বাগান, পুকুর ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ষাট বিঘা জমি। বাড়ির তিন দিকেই ধান ক্ষেত। গাছপালার ভিতর দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে—মখমল-সবুজ ধানের ক্ষেত। তিনতলার ঘরে বসলে বা ছাদে দাঁড়ালে পদ্মানদী দেখা যেত। বাড়িটা এমন ভাবে তৈরী, একতলা বাদ দিয়ে দোতলা তেতলার যে কোন ঘর বা ছাদ থেকে নদীর কোন না কোন অংশ দেখা যাবেই। দস্যি মেয়ের মত কখনো শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকত, কখনো মদ খেয়ে মাতাল হবার ভান করত। কাছে এসে ভয় দেখাত কোনবার, আবার খিল খিল করে হাসতে হাসতে দূরে সরে যেত বালুচরের ওড়না ফেলে। সকাল দুপুর সন্ধ্যায় বারো মাস ধরে কত রকমের রূপ দেখেছে আলোক—খর রৌদ্রের তাপে ম্রিয়মান হতে, মেঘের তলায় উদ্বেল হতে কি পূজোর দিনে কপালে কাশফুলের টিপ পরতে অথবা স্নিগ্ধ বেদনার মত টলমল করতে হেমন্তের বেলায়। সারা দুপুর ধরে উদ্দাম বাতাস; লাল নীল পাল তোলা নৌকোর মিছিল, সবুজের ছিটে লাগা বালুর চরে চখাচখির মেলা দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। বাড়ির পিছন দিকে একটি রাস্তা—বাবলা গাছের ঘোমটায় ঢেকে গোপনে পদ্মার অভিসারে বেরিয়েছিল। সেখানে রায়বাড়ির বোট অলস বুড়ো মানুষের ভঙ্গীতে দোল খেত। চলে আসবার কিছু আগে আলোক একটা একটা করে ঘোমটা খসে যেতে দেখেছিল। পদ্মা খুব কাছে এসে শাসাতে শুরু করেছিল। তবু আসল বিপদের কারণ পদ্মা হয়নি। আমাদের মত চোখ কান হৃদয় বিবেক সম্পন্ন মানুষ। সে কথা পরে।

রায়বাড়ির ছেলেদের হাতে পায়ে শেকল পরানো হয়নি

কোনদিন। আলোকের মনে পড়ে না বৃষ্টিতে ভেজার দরুণ কি ঝড়ের মধ্যে আম কুড়োবার জন্যে, অথবা ঢেউ খেলানো ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে দূর গাঁয়ে পাড়ি জমানোর অপরাধে কোনদিন বকুনি খেতে হয়েছিল। রায়বাড়ির কর্তারা ছেলেদের ওপর জুলুম, কি খুব বেশী নজর রাখা ভালবাসতেন না। সেটা এক দিক দিয়ে সাপে বর হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে অবাধ মিলনে বাধা পেতে হয়নি কোনদিন। সারা দুপুর রোদে পুড়ে পুড়ে বকুলতলার ঘাটে বসে পুঁটিমাছ ধরেছে। হঠাৎ বাবা এসে পিছনে সস্নেহে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ধমক দেননি। চোত-বোশেখে ঝড় তুফান উঠলে মনে পড়ে না আলোক কোনদিন ঘরের কোণায় বসে রামায়ণ-মহাভারত শুনেছে। পুলকদাদার পিছনে পিছনে ছুটে যেত ছোট্ট আলোক। বাগানে কত রকমের আমের গাছ ছিল মনে পড়ে, সেই সব বিরাট বিরাট গাছের তলা দিয়ে অন্ধকারের ভিতর কাঠবিড়ালীর মতন দৌড়ে দৌড়ে ছুটে যেত। পায়ে যেন সে সময় স্প্রীং বাঁধা ছিল। ঝড়ের পর তুমুল বৃষ্টি এলে প্রাণের সুখে ভিজত। কিন্তু কখনো রায়বাড়ির কর্তারা ঠাণ্ডা লাগবার ভয় দেখাননি, অথবা বলেননি ওরে ভিজিসনে সর্দি হবে। বরং মুষলধারার ভিতর ভিজতে ভিজতে এলে খুশিই হতেন। শুধু বলতেন, কাপড়টা এবার ছেড়ে ফেল। বকুলতলার পুকুরে চোখ লাল করে স্নান তো করতই, এমন কি একটু বয়েস হলে পদ্মায়ও যেতে শুরু করেছিল; অবশ্যই শীতকালে, গ্রীষ্মকালে, যখন নদীর জল বেদানার রসের মত টলমল করত। এপার ওপারের দূরত্ব খুব ঘন হত তখন। মাঝখানে দুধের সরের মত চর জাগত। আলোকের মনে পড়ে, কতদিন ওই সব চরে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে নদী পার হয়ে যেত—পাবনার দিকে। রাত্রিতে দূরে গাছপালার ভিতর আকাশ লাল হয়ে যেতে দেখে পাবনার অস্তিত্ব বোঝা যেত। ছোটবেলায় একবার বাবার আঙ্গুল ধরে পাবনায় গিয়েছিল আলোক। সেই প্রথম কৌতূহলী চোখে শহর দেখা। তাছাড়া, বরাবরই নদীর ওপারটাকে রূপকথার দেশ বলে মনে হত, যখন বাড়ির ছাদে দাঁড়াত কিম্বা ঘর থেকে ওপারের গাছপালা, কি আকাশ মেঘ ইত্যাদি লক্ষ্য করত। দুই দিন দুই রাত্রি ছিল পাবনায়। কি ভালই যে লেগেছিল তখন। খুব অল্প বয়েস তখন আলোকের। পাবনায় এক নামজাদা উকিল, রায় স্টেটের কাজকর্ম দেখা শোনা করতেন, তাঁর বাড়িতে বাবা প্রথম দিন অতিথি হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর বন্ধুর বাড়ি পাবনার পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার। সেখানে গোরাদা নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। বাবার বন্ধুর ছেলে। তিনি সারাদিন আলোককে নিয়ে টোঁ-টোঁ করতেন। খুব অল্প বয়েস হলেও কতগুলো টুকরো টুকরো স্মৃতি আশ্চর্য ভাবে মনের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। সুযোগ পেলেই তারা কাঁচের বয়ামে রঙিন মাছের মত নড়েচড়ে বেড়ায়। পাবনার সাদা ধবধবে এডোয়ার্ড কলেজ, তার সামনে সবুজ মাঠ; আলোক যেদিন কলেজ দেখতে গেল সেদিন এই মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল। বড় অদ্ভুত ধরণের খেলা। গোরাদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কাকে উইকেট বলে, কাকে রাণ বলে। কেমন করে আউট হয়। পাবনা হাসপাতালের কাছে একটি পুল ছিল। সেই পুলের দু'পাশে দুটো বিশালকায় ঝাউগাছ। সেই ঝাউগাছদের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। সারাদিন পদ্মা থেকে উড়ে আসা বাতাসে পাতার চিরুণী বুলিয়ে কি রকম যেন শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছিল। শহরের একধারে যে রাস্তাটা খেয়াঘাটের দিকে চলে গেছে সেখানে বোধহয় একটা পলিটেকনিক ইস্কুল ছিল। ব্যাস, এইটুকুই মাত্র মনে আছে। হ্যাঁ, পোষ্ট মাষ্টারবাবুর বাড়িতে বিরাট কই মাছ খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা ফুটে গিয়েছিল—সেটাও মনে আছে। এইটুকুই মাত্র পাবনার স্মৃতি। বড় আশ্চর্য, রোমান্টিক, স্নিগ্ধ অনুভূতি-প্রবণ মনে হয়েছিল শহরটাকে। কাঁচের বয়ামে রঙিন মাছের মতন।

বাড়িতে অনেক রকমের অতিথি ছিল বারো মাস। কেউ কেউ আর নড়তে চাইত না। রায়বাড়ির কর্তারাও তাদের কোনদিন বলেননি, চলে যাও। বৈঠকখানা ঘরে সবাইকে কুলোত না। শেষ দিকে নিচের বড় হলঘরখানাও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের। দুপুরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলোক দেখতে পেত রান্নাঘরের সামনে অতিথিসেবা চলছে। সারি সারি কলাপাতা। তা খান পঞ্চাশেক তো বটেই। যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা একটু গা বাঁচিয়ে বসেছেন। যাদের কৌলিন্যে কিঞ্চিৎ ঘাটতি, তারা একটু দূরে। খেয়ে দেয়ে তারা রান্নাঘরের পিছনে কলাপাতা ফেলে দিয়ে ইঁদারার জলে মুখ ধুয়ে নিত। তারপর পান চিবুতে চিবুতে রায় বাড়ির গুণগান করত। একবার এক ঠাকুরের চাকরী গিয়েছিল। সে নাকি পরিবেশনের সময় রায় বাবুদের দিকে টেনে সুখের পায়রা সম্পর্কে কি এক মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। বাবার কানে সে কথা যেতেই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে বরখাস্ত করেন সেইদিন-ই।

বাবার ছিল ফুল বাগানের শখ। অনেক পয়সা খরচ করেছিলেন ফুলের পিছনে। ঢেউ খেলান প্রাচীরের মধ্যে বিরাট বাগান। শীতকাল গ্রীষ্মকাল—যখন যে রকমের ফুল—বাগান আলো করে রাখত। রোজ বিকেলে পুবদিকের বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যেত জগন্নাথ মালি একটা বড় কাঁচি দিয়ে ফুল গাছের অবাধ্য ডালগুলিকে ছেঁটে দিচ্ছে। বিকেল বেলায় বাবা বাগানে ইজিচেয়ার পেতে বসতেন। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল ও রেকাবে কিছু আম, লিচু, পেঁপে, কিছু মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে হাজির হত গুণধর। বাবা তার থেকে একটি আধটি তুলে মুখে দিতেন কি দিতেন না, ইসারা করতেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর ফুলের সঙ্গে যেন অন্তরঙ্গ আলাপ করতে বসতেন। কোন গাছের গোড়া শুকিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ জগন্নাথকে ডেকে সোডিয়াম সার ফেলে দিতে হুকুম দিতেন। ফুল গাছেরাও যেন তাঁকে ভালবাসত। চিনত। তিনি বাগানে ঢুকলেই, আলোক স্পষ্ট দেখেছে, গাছগুলি অল্প বাতাসের মধ্যেও দোলাদুলি করত। যেন ঝিকমিক করে হেসে বলত, ওই যে আমাদের বন্ধু এসেছে। ফুলের গন্ধে কতদূর থেকে প্রজাপতি এসে জুটত। দুপুর রাতে, কতদিন এমন হয়েছে, দোতলার জানালা খুলে অবাক হয়ে যেত আলোক। জ্যোৎস্নার জলে ফুলগুলি ডুব দিচ্ছে পানকৌড়ির মত। ধীরবহ বাতাসে রজনীগন্ধার দীর্ঘ শীষ দুলছে। আলোয় আলোময়। গন্ধে মো-মো করে সারা জায়গাটা, সারা বাড়িটা। কতদিন এমন হয়েছে, জানালা খুলে ঘুমোতে ভুলে গেছে সারা রাত। শেষে পুব দিকে লাল-আলো জ্বলতে দেখে বিছানার কথা মনে পড়েছে। যেন স্বপ্নের পরীরা সারা রাত ধরে ফুলের বাগানে ওড়াউড়ি করেছে।

বাবার ছিল প্রচণ্ড সাহিত্যের নেশা। রায়বাড়ির কর্তাদের চেষ্টাতেই প্রধানত মহবতপুরে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে পড়ে, ফি হপ্তায় শান্তি পিওন গাদা গাদা রেজিস্টার্ড বুকপোষ্টে পত্র-পত্রিকা বয়ে নিয়ে যেত। ইংরেজী বাংলা নানা রকমের। কলকাতা থেকে ভারী ভারী পার্শেল যেত বইএর। ছোটদের জন্যে যেত শিশুসাথী। তিন ভাই বোন হাঁ করে বসে থাকত লোভীর মত। হাতাহাতি থেকে শেষ পর্যন্ত মারামারি। মনে পড়ে, সকাল থেকে ঘন মেঘ জমেছে। পদ্মার ওপার এপার দেখা যায় না। ঘোলা লাল জলের গর্জন। একটিও নৌকো নেই। ধু—ধু—। পদ্মার সাহসী মাঝিরা ঘাটে নৌকো বেঁধে পারে চলে গেছে। সারাদিন বাতাসের গর্জন। সারারাত শোঁ-শোঁ আওয়াজ—জানালার খড়খড়ির ফাঁকে আছড়ে পড়ে। গেটের দু'পাশে বিশাল ঝাউগাছগুলি আর শিশু গাছেরা ডালপালাশুদ্ধ বাতাসের পায়ে আভূমি প্রণাম জানায়। ইতস্তত বাবুই পাখির বাসা। ভিজে কাক। আহা বেচারারা! ছোট্ট আলোক বুকের মধ্যে অপর্যাপ্ত খুশি ভরে নিয়ে এক ছাদ থেকে

আরেক ছাদে উড়ে বেড়াত। সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিল গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। দুপুরের গায়ে সন্ধ্যার ছায়া লাগত সাত সকালে। ধান গাছগুলি একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতে হি-হি করে কাঁপত। পূব দিকের ঘরে বসে দিদিমণি গ্রামোফোন বাজাত প্রাণের সুখে। মাঝে মাঝে নিজের গলাটিও মিলিয়ে দিত—বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল—।……স্মৃতি—সব স্মৃতির সুরভিত পাপড়ি খসে পড়ে আলোক স্পষ্ট সেই সব অনির্বচনীয় শব্দ শুনতে পায় বুকের গভীরে। মনে পড়ে সন্ধ্যার ছায়া লাগা ঘন দুপুর। তেতলার সেই আশ্চর্য ঘরখানা—মেঘের দেশে ভাসত শ্রাবণ মাসে। জানালাগুলি ভাল করে এঁটে দেওয়া হয়েছে। বাইরে ঝুপঝুপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। খুব কোমল রঙের আলোটা জ্বালা হয়েছে। মেঘের মতন বাবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। ম্যাকবেথ পড়াচ্ছেন। ছোট্ট আলোক কিছুক্ষণ এলোমেলো এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে দিদির পাশে বসে পড়ত। ভোজসভায় বাঙ্কোর রক্তাক্ত কাটামাথা। এই জায়গায় এসে গা' হাত পা'গুলো ছমছম করত। ঘরের কোণায় কোণায়, সিঁড়ির অন্ধকারে ভূতেরা যেন বুকডন দিচ্ছে। দিদিকে জড়িয়ে ধরত প্রাণপণ। বাইরে কাচের জানলায় বাতাসের অবিশ্রান্ত আর্তনাদ। রান্নাঘর থেকে আসা ইলিশমাছ ভাজার রসাল ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ। মনে হত, সীমাহীন তেপান্তরের মাঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভূতেরা বুঝি এই দিকেই ছুটে আসছে—আলোকের দিকে। ভয়ে আলোক দিদির বুকের মধ্যে মিশে যেত। আঁচলটা গায়ের সঙ্গে ভাল করে জড়াতে গিয়ে শুনতে পেত বাবার ভারী কণ্ঠস্বর—টু মরো, এণ্ড টু মরো, এণ্ড টু মরো ক্রিপস ইন দিস পেটি পেস ফ্রম ডে টু ডে টু দা লাস্ট সিলাবেল অব রেকর্ডেড টাইম, এণ্ড অল আওয়ার ইয়েস্টার্ডেজ হ্যাভ লাইটেড ফুলস দি ওয়ে টু ডাস্টি ডেথ। আউট, আউট, ব্রীফ ক্যাণ্ডেল! লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং স্যাডো, এ পুওর প্লেয়ার, দ্যাট স্ট্রটস এণ্ড ফ্রেটস হিজ আওয়ার আপন দি স্টেজ, এণ্ড দেন ইজ হার্ড নো মোর ; ইট ইজ এ টেল টোল্ড বাই এন ইডিয়ট, ফুল অব সাউণ্ড এণ্ড ফিউরি, সিগনিফাইং নাথিং।……সারা বাড়িটা গমগম করত। সেই সব সকালের গল্প, দুপুরের গান, সন্ধ্যার ছায়া মনের মধ্যে তোলপাড় করে আজো ঢেউ তোলে। ছবির মতন চোখের সামনে ভাসে।

পুলকদাদা একবার কলকাতা থেকে কি একটা যেন পরীক্ষা দিয়ে এল। বাবা বললেন, এবার ওর এখানকার পড়াশুনা শেষ। এবার বিলেত যেতে হবে। মা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু রায়বাড়ির কর্তাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সে প্রতিবাদ ঝড়ের মুখে তৃণের মতন। প্রতিবাদ আদবেই টিকল না। দাদা বিলেত রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে বম্বে ট্রেনে। সেখান থেকে জাহাজে। জাহাজের নাম "এস এস ষ্টীফানো।" বিলেতে পৌঁছেই দাদা চিঠি লিখেছিল। জাহাজের ছবি, নিজের একখানা স্যুটপরা অপূর্ব ফটো, আলোকের জন্যে ছবির বই, একটা চাবি দেওয়া কলের রেলগাড়ি—পার্শেল করে দাদা আলোকের নামে পাঠিয়েছিল। শান্তি পিওন সেদিন মিষ্টি খাবার বায়না ধরেছিল। বাবা মিষ্টি মুখের পর একখানা কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট দক্ষিণা দিয়েছিলেন আনন্দে। বাবার ইচ্ছে ছিল পুলকদাদা লিংকনে ভর্তি হোক। শেষে ডাকসাইটে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসুক। বিষয় সম্পত্তি রাখতে গেলে আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ জানা দরকার। হয়ত তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, সংসারে এই রকম একজন আইনজ্ঞ বাস করুক। নিয়মিত চিঠি আসছিল দাদার দু' বছর ধরে। লিংকনের আবহাওয়া ভাল লাগছে, আইন পড়তে ভাল লাগছে, সহপাঠীরা মনের মত—ইত্যাদি। হঠাৎ একদিন চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল। বাবা চঞ্চল হলেন। শান্তি পিওন থমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ফিরে যেতে লাগল। হঠাৎ স্টেটসম্যানের পাঁচের পাতায় একদিন ছোট্ট একটা খবরের ওপর

বাবার সজল চোখ ঠিকরে পড়ল—লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু। বাবা লিংকনে তার করলেন। লণ্ডনে পুলকের যে সব বন্ধুরা ছিল, তাদের কাছেও উদ্বেগভরা তার গেল। অবশেষে উত্তর এল। পনের দিন পর। শান্তি পিওন হাঁউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এল। বেচারা কৌতূহলের আতিশয্যে রাস্তার মধ্যেই তারটা খুলে পড়েছিল। সে দিনটা আলোক কোন দিনই ভুলতে পারবে না। চৈত্রের দুপুর। গাছের পাতাগুলি ঝরে গেছে। অসহ্য গরম। একটুও বাতাস বয় না, একটাও পাখি ডাকে না। পদ্মা বেদানার রস নিয়ে পাবনার দিকে সরে গেছে। ফুলগুলি অকালে ঝরানো। তারপর সন্ধ্যা নামল। অমন বিষাদ ভরা শিয়ালডাকা সন্ধ্যা জীবনে দেখেনি আলোক। চাপ চাপ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর ডুবে গেল সবাই। এক ঘরে বাবা, এক ঘরে মা। অন্য ঘরে দিদি, পাশে আলোক। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল করে তুলেছিল। মা কাঁদছিলেন। বেশ জোরেই। বাবা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। মুখটা ব্লটিং পেপারের মত ধবধবে দেখাচ্ছিল। কত লোক সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেননি। দরজা এঁটে শুয়েছিলেন। জলস্পর্শও করেননি। পুলকের মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী—নিজেকে অপরাধী ভেবে ভীষণ শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ছোট ছোট স্মৃতি—পুলক দাদার সামান্য সামান্য কথাবার্তা কি ভীষণ দুঃখ দিচ্ছিল। যেন এই কাল রাত্রি—বিষাদ সন্ধ্যার শেষ নেই। নানান উড়ো খবরে যেটুকু জানা গেল, তা হচ্ছে, তিন দিনের বন্ধে ছুটি কাটাতে ডভনশায়ারে এক বন্ধুর বাড়িতে যায় পুলক দাদা। সেই যাওয়াই অগস্ত্য যাত্রা। তিন দিনের দিন ভোরে তুষার ঝড়ের ভিতর সমুদ্রোপকূলে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গলার কাছে তিনটে গভীর নীল দাগ ছিল। পুলিশ কুকুর এসেছিল সন্ধান শুকতে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও নাকি বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা আর ঐ ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। বিদেশের মাটিতে রায় বাড়ির সেরা ফুলটি ঝরে গেল।

বাবা জীবনে আরেকটি শোচনীয় ভুল করেছিলেন। আলোক লক্ষ্য করেছে, বাবার এই সব ভুল দ্বিতীয়বার শোধরাবার অবকাশ থাকে না। একেবারে চরম পরিণতি ডেকে আনে ম্যাকবেথের মত।

রায় বাড়ির সেরা সুন্দরী ছিল পূর্ণিমাদিদি। সবাই বলত, যে ঘরে যাবে সে ঘর আলো করবে। বিকেলে ফুলের বাগানে যখন বেল ফুল তুলতে যেত মনে হত যেন ফুলের দেশের রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত জানত। বাবা ওর জন্য মাষ্টার মশাই রেখে দিয়েছিলেন। তিনি বাড়িতেই থাকতেন। বাড়িতেই দিদির পড়াশুনার ব্যবস্থা। মাখন দিয়ে তৈরী দিদির দেহলতা। জ্যোৎস্নার মত গায়ের রং। বেদানার রসের মত টলমল করত চোখ দুটি আলোক অনেক সময় বিহ্বল হয়ে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আর দিদির মনটিও কত নরম ছিল! আলোক কখনো মনের সুখে ফড়িং ধরতে পারেনি, কি প্রজাপতি। দেখতে পেলেই দিদি ছাড়িয়ে দিত। কালীপুজোর সময় পাঁঠার ফিনকি রক্ত দেখে দিদি আর মাংস ছোঁয়নি। একবার পোষা টিয়া পাখিটা আকাশে উড়ে গেলে দিদি কেঁদে ভাসিয়েছিল। আকাশে কি ছোঁয়া পাওয়া যায়? হয়ত ঠিকমত আদর যত্ন হচ্ছে না। দিদির কত দুঃখ! সেই দিদি বড় হয়ে উঠলে নানান জায়গা থেকে স্রোতের মত সম্বন্ধ আসতে শুরু করল বাবা অনেক চিঠির ভিতর থেকে একটি চিঠি তুলে নিলেন। ছেলে বেজায় বড়লোক। বাপের একমাত্র সন্তান। লোহার ব্যবসা। গত যুদ্ধের সওকায় টু-পাইসের মুখ দেখা বিরল সৌভাগ্যের অধিকারীদের অন্যতম। বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি। বাবা কি টাকার বাণ্ডিলের সঙ্গে দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন? কিন্তু বাবা তো এরকম ছিলেন না। আলোকের অনেক সময় তাই সন্দেহ হয়। কেননা, ওই বাড়ির লোকেরা

রবি ঠাকুর সেক্সপীয়র নিয়ে মাথা ঘামান প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। বাদলের দিনে ওই বাড়িতে কেউ ভুলেও গেয়ে ওঠে না, মোর ভাবনারে কে হাওয়ায় মাতালো—। ওই বাড়িতে রেডিও খোলা হয় শেয়ার মার্কেটের সর্বশেষ অবস্থা জানতে। বাবা সব ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন এই বাড়ির উদার আবহাওয়া—বিশেষ মানসিকতার বাধা। শেষে টাকার বাণ্ডিলের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন করলেন। একমাত্র মেয়ে—সুতরাং অনুষ্ঠানের ত্রুটি হল না কোনদিকে। দুই রাত ধরে থিয়েটার হল, যাত্রা হল বিরাট প্যাণ্ডেল খাটিয়ে লোকজনে ঘর ভরে গেল। আনন্দের স্রোত বয়ে চলল কয়দিন। কিন্তু আলোকের মন কেঁদে উঠেছিল। লোহার মত লোকটাকে জামাইবাবু রূপে কল্পনা করতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছিল না। মোষের মত রং বিশ্রী মোটা। ঝকঝকে দাঁতগুলি হাসলে পরে ঠোঁটের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দিদির নরম গায়ে ধাক্কা দিয়ে কি যেন রসিকতা করছিল লোকটা। সবার সামনে ওই ভাবে হাসছিল। রী-রী করছিল গা। দিদির চোখেও সেদিন গোপন কান্না দেখতে পেয়েছিল। বিয়ের পরে দিদির সঙ্গে কিছুতেই যেতে চায়নি। শেষে যেতেই হল চোখে চোখে মিলিত কান্না দেখে। এটাই নাকি রেওয়াজ। কিন্তু দু'দিন পরেই চরম আঘাত পেতে হল। বালিগঞ্জে বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গায় কয়েকটি বিলিতি ঝাউ গাছ কোন রকমে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজমিস্ত্রীর কর্কশ কোলাহল শুনতে পেল আলোক সেখানে। কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে দিদির শাশুড়ী জানিয়ে দিলেন, টের পাওনা তো বাপু, পাড়াগাঁয়ে থাক: বালিগঞ্জে দুই রুমের ফ্ল্যাটের ভাড়া কত সে খেয়াল আছে?

তারপর সেই পুরনো ইতিহাস।

একটি দুটি চিঠি আসত মাঝে মাঝে। একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা দু'বার গিয়েছিলেন বালিগঞ্জের বাসায়। শেষের বার মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মা ব্যাকুল প্রশ্ন করছিলেন। বাবা একটারও উত্তর দেননি। সারাদিন ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। আলোকের মনে পড়ে বিয়ের চার বছরের মধ্যে দিদি একবার মাত্র মহবতপুরে এসেছিল। কিন্তু তিন দিন পরেই লোহার মত লোকটা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। ওই তিনটে রাত আলোক ঘুমোতে পারেনি। দিদিও না। সারারাত শুয়ে শুয়ে গল্প করেছে। দুপুর বেলায় যখন শিশুগাছ ঝাউ গাছের তলা দিয়ে পাল্কী চেপে লোহার মত লোকটা দিদিকে নিয়ে যাচ্ছিল, আলোকের বুকটা হাউমাউ করে কাঁদছিল। লোকটা দিদিকে একদিনও বেশী থাকতে দিল না।

বিয়ে সুখের হয়নি। রাত্রিবেলায় যখন দিদি গল্প করছিল তখন প্রবল কান্নার পাথর ঠেলতে হচ্ছিল সমানে। আলোকের নজর এড়ায়নি। রায় বাড়ির বড় আদরের মেয়ে। বাবার ভুল কি অমোঘ! কি নিষ্ঠুর! নিশ্চয়ই, বিশ্বপিতা বলে যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহলে বাবা তাঁর কাছে কিছুতেই ক্ষমা পাবেন না। বাবা হয়ত নিজেও তা বুঝতেন। কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ ছিল না।

দিদির স্বামী পাঁড় মাতাল। বারে বারে তার রাত কাটে। বারে বারে তার উপপত্নী ভাড়া খাটে। লোহার মত লোকটা একটা দিনের জন্যেও দিদিকে শান্তি দেয়নি। নিজের চরিত্রহীনতার অন্ত নেই, শেষে দিদির চরিত্রের ওপরেও সন্দেহ করতে শুরু করে। দিদির শ্বশুর বাড়ির লোকগুলোই যেন কেমন! কোনবার ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হলে দিদির কথা কারো মনে থাকে না। কিন্তু লাভে কোনবার কিঞ্চিৎ ঘাটতি পড়লেই দিদির দোষ হয়। অপয়া বৌ। অনেকবার এমন হয়েছে, দিদি সারা রাত জেগে বসে আছে, হয়ত শেষ রাতে পুলিশের লোকেরা গেঁজলা ওঠা পতি পরম গুরুকে ধরাধরি করে বয়ে এনেছে। শেষে মহবতপুরের রায় বাড়ি আগুনে পুড়ে গেলে, আলোকরা যখন ষ্টেশন রোডের বাড়িতে

বাস করতে শুরু করে অবস্থা তখন চরমে পৌঁছয়। দিদিকে মারধোর পর্যন্ত আরম্ভ করে দেয়। অনেক দিন দিদি সহ্য করতে না পেরে ষ্টেশন রোডের বাসায় পালিয়ে এসেছে। আলোক মনে করে, বাবার অকাল মৃত্যুর এও একটা কারণ। অতবড় সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেলে বাবার যেটুকু প্রাণবায়ু অবশিষ্ট ছিল, দিদিকে দেখার পর সেটুকুও বুঝি রইল না। কি চেহারা হয়েছিল দিদির ! চোখের কোলে মেঘ জমেছিল। মাখনের মত দেহ শুকিয়ে পোড়াকাঠ হয়েছিল। শেষে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশও দেখা যায়। পূর্ণিমাদিদির মত রায়বাড়ির আর কোন মেয়ে এত দুঃখ পায়নি। এত যন্ত্রণা সহ্য করেনি। ঈশ্বরের অভিশাপ ছাড়া আর কি।

হাতছাড়া বাড়িটা হয়ে গেলে আলোকরা ষ্টেশন রোড ছেড়ে চলে এল। দিদিকে সে কথা জানানো হল না। কেননা, দিদির বড় সাহস বেড়ে গিয়েছিল ইদানীং। ওরা অপমান করত। আসা মাত্র জেলখানার কয়েদীর মত পাকড়াও করে নিয়ে যেত। মাকে বাবাকে বলত, আপনারা কুমন্ত্রণা দিচ্ছেন, সংসার ভেঙে দিতে চাইছেন। আমরা আবার বিয়ে দেব। কেস করব। ইত্যাদি। মা গোপনে চোখের জল ফেলতেন। এ ছাড়া কি উপায় ছিল ? চার দিনের দিন ঘটনাটা ঘটল। দিদি ষ্টেশন রোডের বাড়িতে এসে দরজায় তালা ঝুলতে দেখে অভিমানে ক্যানিং ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিল। ষ্টেশন জুড়ে আর্ত চিৎকার উঠল। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষলেও ট্রেন কিছুটা এগিয়ে গেল। লাইনের ফাঁকে ছিন্নভিন্ন পূর্ণিমাদিদির সাধের জীবন ! দুটো পা'ই শরীর থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছে। কপালের পাশে বিভৎস রক্তের বিন্দু। ঢাকুরিয়ার রায়বাড়ির মানুষদের সবাই ভালবাসত। সবাই চিনতে পারল। একটা মটরে চাপিয়ে পূর্ণিমাদিদির নিষ্প্রাণ দেহটা যখন হালতুতে আনা হল তখন সারা ঢাকুরিয়ার লোক ভেঙে পড়েছে। আশ্চর্য ! সে দিনটাও ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় নারকেল গাছের পাতার আড়ালে সোনার থালার মত প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছিল।

"ইট ইজ এ টেল, টোল্ড বাই এন ইডিয়ট ফুল অব সাউণ্ড এণ্ড ফারি সিগনিফাইং নাথিং।"

রায় বাড়ির সেরা দুটি ফুল অকালে ঝরে গেল।

(ক্রমশ:)

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

ইউটোপিয়া ও বাস্তব : সভ্যতার সংকট

অরিন্দম সেনগুপ্ত

টমাস মুর থেকে সুরু করে উইলিয়াম মরিস, এডওয়ার্ড বেলামি, হলডেন, ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি অনেকেই ভবিষ্যৎ সমাজের সুখময় চিত্রকল্প রচনা করেছেন ; কিন্তু যতই ইউটোপিয়ার বাস্তব রূপায়নের সম্ভাবনা বাড়তে লাগল ততই চিন্তাবিদেরা পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। অলডুস হাক্সলের এ্যান্টি-ইউটোপিয়া ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড তার নজির। "Utopias now appear much more realisable than one used to think. We are now faced with a very different new worry. How to prevent their realisation ?" কারণ : এর জন্যে অনেক মূল্য দিতে হবে, গভীর অনুভূতি, মহৎশিল্প ও বিজ্ঞানের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হবে। ফ্রয়েডের মতে আদিম মানুষ সুখী হতে পারেনি কারণ প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ; আর ভবিষ্যৎ মানুষ সুখী হতে পারবে না, কারণ সভ্যতার প্রয়োজনে মানবমনের প্রবল তাগিদগুলির অবদমন ও তজ্জনিত হতাশা। অনবদমিত তাগিদ সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে, আর অবদমিত তাগিদ হতাশ মানুষকে সভ্যতাবিদ্বেষী করে তোলে : এই হ'ল সভ্যতার উভয় সংকট। জর্জ অরওয়েলের Nineteen Eighty-four-এ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের একটা বীভৎস ছবি দেওয়া হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি এড়াতে হলে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নূতন ভাবে গড়তে হবে। ডেনিস গ্যাবরের মতে : Our civilisation faces three great dangers. The first is destruction by nuclear war, the second is being crippled by overpopulation, and the third is the age of leisure."•

মানব সভ্যতার প্রথম সমস্যা : হ'ল বিশ্বগ্রাসী আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা। আণবিক যুদ্ধে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হবে না। যারা বেঁচে থাকবে তারা আবার প্রথম থেকে সুরু করবে। মানুষের মধ্যে যে অদম্য জীবনীশক্তি আছে তারই জোরে মানুষ আবার নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা খুবই কম, কারণঃ প্রথম আক্রমণ-কারীর পক্ষে শত্রুর প্রত্যাঘাতের ক্ষমতা (Dead man's revenge) সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয় ও তার ফলে আণবিক যুদ্ধে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য।• এই কারণেই কোন শক্তিই সর্বগ্রাসী আণবিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে না। নীচে একটা ফিরিস্তি দেওয়া হ'ল। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, শক্তির এই ভারসাম্য বেশ স্থায়ী।

হঠাৎ আক্রমণের পর যতগুলি ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষা পাবে তাদের সংখ্যা

• Inventing the Future : Dennis Gabor. Secker & Warburg, London, 1963.

যদি রাশিয়া ছোঁড়ে (ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা)

(প্রত্যাঘাত শক্তি)

১০০ ৫০০ ১০০০ ২০০০ ৫০০০

প্রথম আক্রমণের পূর্বে আমেরিকার ছিল (ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা)

১০০	৯৮	৯২	৮৪	৭১	৪২	১৮
৫০০	৪৯০	৪৫৮	৪২২	৩৫৫	২১০	৯০
১০০০	৯৮৩	৯১৭	৮৪৫	৭১০	৪২৪	১৮০
২০০০	১৯৬৬	১৮৩৪	১৬৯০	১৪২০	৮৪৮	৩৬০
৫০০০	৪৯১৫	৪৫৮৫	৪২২৫	৩৫৫০	২১২০	৯০০
১০০০০	৯৮৩০	৯১৭০	৮৪৫০	৭১০০	৪২৪০	১৮০০

(ক্ষেপণাস্ত্র)

রাশিয়া যদি ৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে আর আমেরিকার মাত্র ১০০ ক্ষেপণাস্ত্রও থাকে তবুও যে ৪২৮টি ক্ষেপণাস্ত্র বাঁচবে তা দিয়ে রাশিয়া ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। (এই হিসাবে পোলারিস্ ক্ষেপণাস্ত্র ও আণবিক অস্ত্র সজ্জিত বোমারু বিমানের সংখ্যা ধরা হয়নি।) এই কারণেই আশা করা যায় যে ঠাণ্ডা লড়াই তার গণ্ডী ছাড়িয়ে আণবিক যুদ্ধে পরিণত হবে না।

যদিও রাশিয়া ও আমেরিকা নীতির দিক থেকে নিরস্ত্রীকরণ মেনে নিয়েছে তবুও তারা এর বাস্তব রূপায়ণের দিকে এক পা ও এগোতে পারে নি। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস এর জন্যে দায়ী। পররাজ্যলোলুপ চীনের সামরিক শক্তির ক্রমোন্নতিও এই অবস্থার জন্যে অংশতঃ দায়ী। তাহলেও আশা করা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য ক্রমশঃ কমে আসবে ও কমে এই দুই দেশের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে। (চীনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।) আজ যেমন অনেক দেশেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়েছে, তেমনই একদিন আদর্শ-নিরপেক্ষ বিশ্ব-গঠন সম্ভব হবে।

সভ্যতার দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল জনসংখ্যাবৃদ্ধি। জনসংখ্যা যদি অস্বাভাবিক উঁচু হারে বাড়তে থাকে তবে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। তবুও মানুষ বাঁচবে, বাঁচার জন্যে লড়াই করবে। হয়তো তার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না; হয়তো জীবনে কোন আনন্দই থাকবে না, তবুও দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেই সে তার বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট উদ্দীপনার সন্ধান পাবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কেউই এই সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন নি। তার কারণও আছে। বিশ্বের জনসংখ্যা ১৯৩৫-এর পর থেকে হঠাৎ দ্রুততর গতিতে বাড়তে আরম্ভ করেছে। এর আগে এই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়নি। এই পরিবর্তন আগে ভাবা যায় নি। [শুধু যে জনসংখ্যা বাড়ছে তা নয়, ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।] এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি দু'ধরণের।

বৎসর	১৯২০	১৯৩০	১৯৪০	১৯৫০	১৯৬০
বিশ্বের জনসংখ্যা (কোটি)	১৮১.০	২০১.০	২২৪.৬	২৪৯.৫	২৯১.০

প্রথম ধরণের জনসংখ্যা ঘটছে অনুন্নত দেশগুলিতে। এসব দেশে জন্মহার একই রকম আছে বা পড়ছে, আর মৃত্যুহার দ্রুতগতিতে পড়ছে। বিজ্ঞানের, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের, উন্নতি, প্রয়োগ ও প্রসারের ফলে মৃত্যু নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনই এর কারণ। দ্বিতীয় ধরণের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে উন্নত দেশগুলিতে। এসব দেশে মৃত্যুহার খুব ধীরগতিতে পড়ছে, আর জন্মহার হঠাৎ বাড়তে সুরু করেছে। উন্নত দেশগুলিতে প্রাচুর্য ও অবসর মানুষকে বিরাট পরিবারের মধ্যে আনন্দ খোঁজার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমেরিকার শ্রমিক নেতা ওয়াল্টার রুথারকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে শ্রমিকরা এত প্রচুর অবসর নিয়ে কী করবে, তখন তিনি বলেছিলেন, "তারা তখন তাদের সন্তানদের অনেকখানি সময় দিতে পারবে।"

এখন প্রশ্ন হ'ল যে, জনসংখ্যা কী অবস্থায় ভারসাম্যে পৌঁছাবে—ম্যালথুসীয় অবস্থায় না কোন উন্নততর স্তরে? এই অবস্থায় যদি কোন প্রতিকার না করা যায়, তবে প্রাচ্যের দেশগুলিকে দুর্ভিক্ষ ও প্রতীচ্যের দেশগুলিকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও Eugenics-এর প্রয়োজনীয়তা আজ তাই অনস্বীকার্য।

মানব সভ্যতার তৃতীয় সমস্যা হ'ল প্রচুর অবসর। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগের ফলে শিল্পোন্নতির সংগে সংগে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় উৎপাদন বেড়ে যায়। এই কারণে ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে খুব কম লোকের সাহায্যেই প্রচুর উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তখন প্রত্যেকেই প্রচুর অবসর পাবে। অনুন্নত দেশগুলির দিক থেকে দেখলে এই অবস্থা বিশেষ কাম্য বলে মনে হয়, কিন্তু যে সব দেশে চরম শিল্পোন্নতির ফলে ব্যক্তিকে প্রচুর অবসর দেওয়া সম্ভব সেই সব দেশে এই অবস্থা একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি আমাদের নেই। সভ্যতার ইতিহাসে একটা সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি। অতীতে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বহুর পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করেছে। ভবিষ্যতে স্বল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যেই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে। এতদিন মানুষ প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করেছে, তখন তাকে স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুঝতে হবে। কীনস্ দূরদর্শী ছিলেন, তাই তিনি ১৯৩০ সালে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই বলেছিলেন :

"I think with dread of the readjustments of the habits and instincts of the ordinary man, bred into him for countless generations, which he may be asked to discard within a few decades.…Must we not expect a general nervous breakdown? We already have a little experience of what I mean—a nervous breakdown of the sort which is already common enough amongst the women of the well-to do classes. Unfortunate women, many of them, who have been deprived by their wealth of their traditional occupations—who cannot find it sufficiently amusing, when deprived of the spur of economic necessity, to cook and clean and mend, yet are quite unable to find anything more amusing.—To those who sweat for their daily bread leisure is a longed-for sweet—until they get it."

ব্যক্তির যৌন সমস্যা কী? এরিক ফ্রমের মতে মানুষ যেদিন পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করলো সেদিন থেকে সে তুচ্ছ শক্তিহীন অসহায় ও একক হয়ে পড়লো। এই অসহায়তা ও একাকিত্ব তার যৌন তাগিদ মেটানো অসম্ভব করে তুললো। মানুষের যৌন তাগিদ হচ্ছে তার সমস্ত শক্তির সমন্বয়ী বিকাশ। এ্যাডাম ও ঈভের স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার কাহিনীটির মধ্যে এই বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয়েছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর দুজনেই বুঝতে পারলো যে, তারা স্বতন্ত্র ও তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত যোগসূত্র নেই, পূর্বে যে প্রাকৃতিক যোগসূত্র ছিল তাও এখন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই তারা লজ্জা পেল। এ লজ্জার কারণ দৈহিক নগ্নতা নয় ; এর কারণ অনাবৃত আত্মিক বিচ্ছিন্নতা। তারপর থেকে মানুষ নানান্ ভাবে নানান্ উদ্ভাবনের দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করেছে, কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত সমাধান খুঁজে পায় নি। শিল্পোন্নয়নের যুগে মানুষ কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহের

জন্তে কাজ করতে বাধ্য হত (Compulsory work), ক্রমে কাজের মধ্যে ডুবে থাকা তার নেশা হয়ে উঠলো (Compulsive work)। মানুষের এই অভ্যাস ও চারিত্রিক গঠন পরিবর্তিত না হ'লে প্রচুর অবসরের যুগে মানুষের সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বৃহৎ পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় হয়তো একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আজ বৃহৎ পরিবার গঠনের ফলে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে ও আর এক সমস্যার (জনবহুলতা) সৃষ্টি হবে। অতীতে যখন মৃত্যু নিরোধ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিল না বা যখন তা নিতান্তই নিম্নস্তরের ছিল, তখন পরিবার বৃহৎ হলেও জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়তো না, কারণ অনেকেরই যৌবন প্রাপ্তির আগেই মৃত্যু হ'ত।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি ও প্রয়োগের ফলে এই তৃতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। মারণাস্ত্র উৎপাদনেই বেশীর ভাগ শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে, ফলে প্রথম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর একাংশ মৃত্যুনিরোধ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে দ্বিতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অবশিষ্টাংশ উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের জন্তে কাজে লাগানো হয়েছে, ফলে তৃতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার এই বিরাট উন্নতি ও বিস্তৃত প্রয়োগের ফলে মানবসভ্যতা এই তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পারস্পরিক ভীতি ও অবিশ্বাসের এই ভারসাম্য চিরস্থায়ী করা চলে না, আবার প্রাচুর্য্য ও অবসরের বন্যায় মানুষকে বিরাট পরিবার গঠন ও জনবহুলতার দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে জাতীয় স্বার্থে প্রণোদিত শিল্পে ও যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি মানবসভ্যতাকে এই পথে নিয়ে যাচ্ছে। সমবায় ভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্রে কল্যাণধর্মী বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের সহায়তায় হয়তো এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সে ক্ষেত্রে পরিবার ও বিশ্বরাষ্ট্র এর মধ্যে অন্য কোন সীমারেখা টানা চলবে না। শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি রোধ ও বিলুপ্তি বা ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় কাজ ও শক্তি ও সম্পদের অপব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বা একক মানুষকে নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়তো আপাত দৃষ্টিতে এই সমস্যার একটা সমাধান বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাতে এর প্রকৃত সমাধান হবে না। মানুষকে নূতন পরিবেশের সংগে নিজের সমন্বয় সাধনের জন্তে শিক্ষা দিতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে। নূতন ধরণের কাজের কথা ভাবতে হবে, বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে তার সৃজনীশক্তির অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন ক্রমশঃ কমে আসবে, ফলে মুষ্টিমেয় অসাধারণ লোকের* দ্বারাই সকলের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। তখন অন্য (সকলের সাধারণ লোকের) ** শ্রম যেন অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রমের মর্যাদা বজায় রাখতে হবে (যদিও এই পরিবর্তিত অবস্থায় শ্রমের মর্যাদা বলতে এখন যা বোঝায় ঠিক তা বোঝাবে না)। অতীতে (এবং এখনও

---

* গ্যাবরের ভাষায় "The uncommon man wants to leave a world different from what he found a better world enriched by his personal creation. For this he is willing to sacrifice much or all of the happiness that the common man enjoys."

** সাধারণ লোক বলতে বোঝায় সেই সব লোক যাদের কাছে "Life is a cycle. It starts with the discovery of the world around the child in which everything is new, it then goes on to the great discoveries of sex and love, and culminates in the-young family. It contains the smaller cycles of work, rest and recreation, of modest wishes and their fulfilment. It can be a happy iife to the end if there is not much physical suffering and if the old man (or woman) has learned to Jove the new generation more than himself.'

অনেক দেশে) বহু সাধারণ লোকের শ্রমের উপর কয়েকজন অসাধারণ লোকের জীবন ও কর্ম নির্ভর করত, ভবিষ্যতে কয়েকজন অসাধারণ লোকের দ্বারাই সকলের সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে, তাই সামাজিক দিক থেকে দেখলে অন্য সকলের (অর্থাৎ অধিকাংশ লোকেরই) কাজের কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকবে না। অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজ করার ও সমাজের কোন কাজে না লাগার এই হীনমন্যতার লজ্জা থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে অসাধারণ লোকদের সচেষ্ট হতে হবে। তাই হাক্সলে বলেছেন : "Happiness is a hard master—particularty other people's happiness."

মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের এই ছবি গ্যাবর তাঁর বইয়ে নানান্ দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সব সময়েই তিনি আদর্শগত সংঘাত, ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে থেকে এর বিচার করার ও সমাধানের পথ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। সব সময় তা হয়তো সম্ভব হয়নি। রাশিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমী মতগুলি ব্যাখ্যা করার সময় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন :

"I cannot of course compare it (the Western spectrum of images of the Soviets) with the 'truth', because the truth f.r me is my image, and as I am of the West, my own image is necessarily contained in the spectrum.' এই সততা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সভ্যতার ভবিষ্যতের এই ছবি আঁকার সময় তিনি বলছেন :" "The future cannot be predicted," কারণ "Rational thinking, even assisted by any conceivable electronic computors, cannot predict the future. All it can do is to map out the probability space as it appears at the present, and which will be different tomorrow when one of the infinity of possible states will have materialised." কিন্তু…"futures can be invented"—(and must be invented). কারণ তা না হলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ এমন ভাবে গড়তে হবে যাতে মানুষ সুখী হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন যন্ত্রবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা উভয়েরই নূতন নূতন উদ্ভাবন ও সমাজ ও ব্যক্তির মতগঠন ও সম্মতি। বুদ্ধিজীবীদের দায় ও দায়িত্ব তাই আজ এত বেশী, তাই আজ নৈরাশ্যবাদী বুদ্ধিজীবীর চেয়ে আশাবাদী পরমত সহিষ্ণু মানবপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন অনেক বেশী। তারাই আজ নূতন ভাবে বাঁচার, নূতন সভ্যতা গড়ার কাজে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে ; LaTrahison des clercs-এর অবাঞ্ছনীয় পরিণতির হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারবে। সেই ফরাসী সমালোচকের• মতে তৎকালীন লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও ব্যক্তির মর্যাদারক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালন না করে শ্রেণীবিদ্বেষ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, ইত্যাদি গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে আদর্শচ্যুত হয়েছেন। গ্যাবরের মতে আজকের লেখক ও মনস্বী ব্যক্তিরা বাঁচার জন্যে, নূতন পৃথিবী গড়ার জন্যে মানুষকে কোন অনুপ্রেরণা যোগাতে পারছেন না, শুধু সমকালীন সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও তজ্জনিত নৈরাশ্যের বিষে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছেন। গ্যাবর একে 'the new treason of the clercs' বলে অভিহিত করেছেন। আজ তাই চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের নূতন সভ্যতা গঠনের দায় ও দায়িত্ব এড়ালে চলবে না, নূতন আশা ও উদ্দীপনার সংগে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে হবে।

• Jullen Benda (1920) La Trahison des clercs

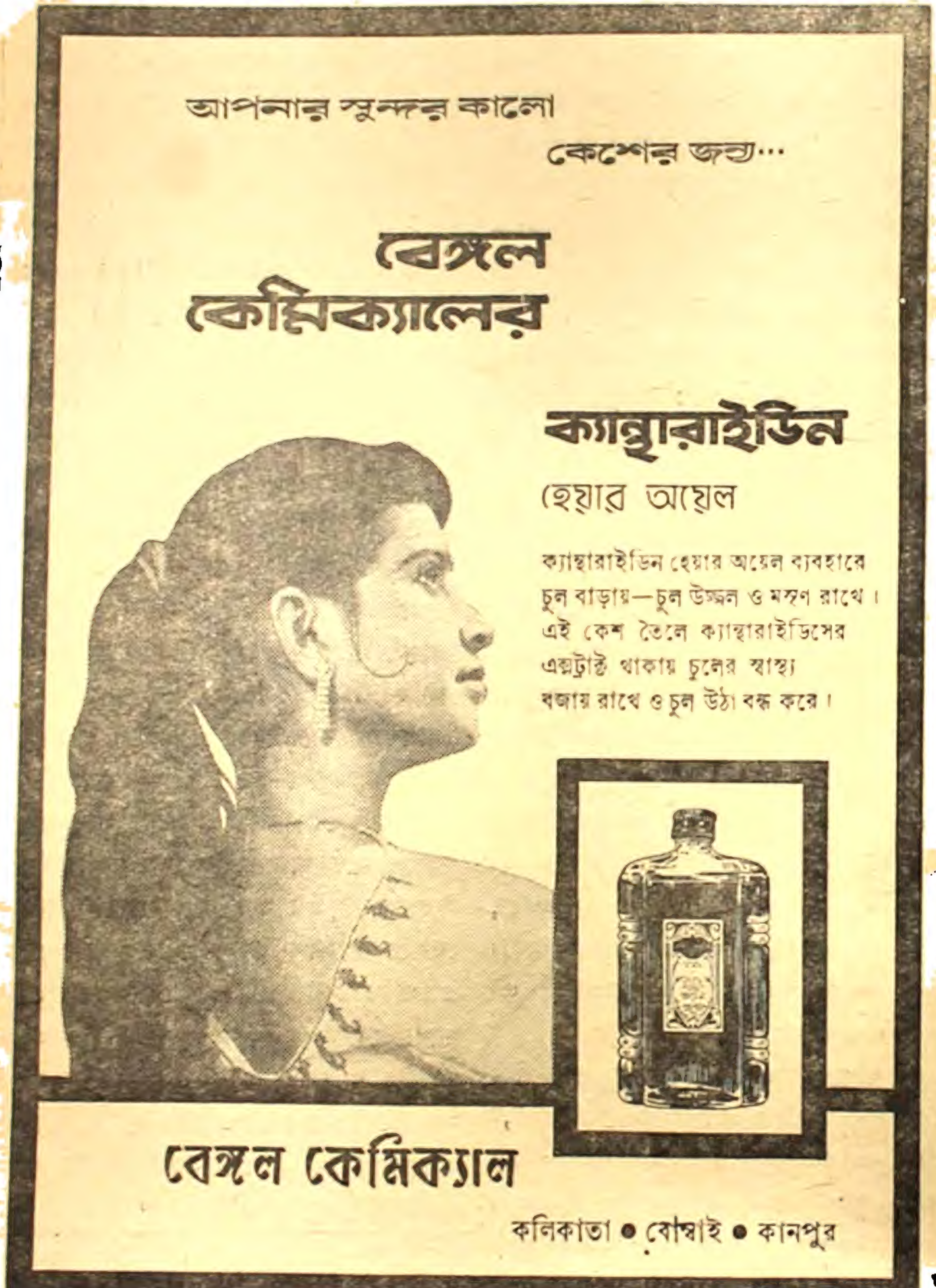

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...
বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে।
এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের
এক্সট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য
বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

ধলেশ্বরী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

চার

ঘোলা জলের তীব্র স্রোত গোঁসাই বাড়ির পিছ-দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে যেন ক্ষেপে উঠেছে। কী তার ডাক! যেন বন-শুওরের পাল শিকারীর ফাঁদে পড়ে গর্জায় আর গোঙায়। সেই বেবাক শুওরের আর্ত চিৎকার এক সঙ্গে ফেটে পড়েছে এখানে। অবিশ্রান্তভাবে গর্জে যাচ্ছে ধলেশ্বরীর উপচানো জলের পাগলা স্রোত। গোঁসাই বাড়ির পিছ-দুয়ারের পানা-পাগার চিনবার জো নেই। তার আশ-পাশের আম জাম কাঁঠালের বাগানে বুঝি ঝড় উঠেছিল ক-দিন আগে। ঠিক তেমনিই, ঝপাঝপ পড়তে লাগল বিশাল বিশাল গাছগুলো, আর চক্ষের নিমেষে বেতড়িপদ পাগলা স্রোত সহস্র মুখব্যাদন করে নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে ফেলল এক একটা গাছ। গোটা বাগান দেখতে দেখতে জল থৈ থৈ করতে লাগল।

এখানে ধাক্কা খেয়ে আহত জন্তুর মতন স্রোতধারা এসে আছড়ে পড়েছে সুবাসিনীর ভিটায়। এ-দিকটা মাঝিপাড়া থেকে অনেক দূরে। ভরা বর্ষার কথা আলাদা, কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণের ভরা বানের সময় টেউরার খাল পথে এখানে আসা বড় সিধা, তত সোজা নয় মাঝিপাড়া ডিঙিয়ে ফট করে এ দিগরে পা দেওয়া। পথ দুরা। কারণ মাঝি-পাড়ার পেছনে এলাকাটা প্রায় গহীন বনের তুলা। আগাছা কুগাছা আছে। চাইতান বড়ই হিজল আর আগ স্যাওড়ার পা জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বেতগাছ। সে জড়ানো এমন যে তার ফাঁক ফুক দিয়ে আলো পর্যন্ত ঢোকে না। খানাখন্দ রয়েছে। রয়েছে মহাদেব ঘোষের বাঁশ-বাদাড়, সেখানে মকটের ঝাড়, ক্যান্দার গাছের চারা আর তেলাকুঁচ লতার বেড়াজাল। তা ডিঙিয়ে গোঁসাই পাড়ার এ-দিগরে পা দেয় কোন বাপের বেটা! সুতরাং পথ সিধা না, দূর পথ। আগে যদু সরকারের বাড়ি, তা ছাড়িয়ে গোঁসাই পাড়া। ফুলচাঁদ গোঁসাইয়ের জবর বাড়িখান সকলের আগে নজরে পড়ে। পরে এক এক করে কয়েকটি বাড়ির অস্তিত্ব। তা ছাড়িয়ে সুবাসিনীর ভিটে। ঘাটে দাঁড়িয়ে সুবাসিনী চেঁচাচ্ছে। ডাকছে রামুকে। খানিক আগে এমন একটা শব্দ হয়েছিল, মনে হ'ল বুঝি গোটা স্বর্গটাই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। কী শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে সুবাসিনী। পূব দিকটা ফাঁকা, ধু ধু। উঠোনে দাঁড়ালে আগে কখনও সরাসরি আকাশ দেখা যেত না, পড়িমড়ি ছুটে আসতে দেখা গেল, পরিষ্কার আকাশ। আহা হা, সুবাসিনীর বড় সাধের আমের গাছটা নেই। চাপিলা আমের সেই ঝাঁকড়া গাছটা গোঁত্তা খাওয়ার মতন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জলের ওপর। ঘাটের কাছে। তারই একটা ডাল এমন বেখাপ্পাভাবে ঘাটে বাঁধা ডিঙি নাওয়ের

লগি ধরেছে যে, সুবাসিনী দেখতে পাচ্ছিল পোঁতা লগিটা কাৎ হতে হতে নেমে যাচ্ছে। যত নামছে, নাওটা ততই দূরে সরে যাচ্ছে ঘাটের সীমানা ছাড়িয়ে।

যেমনি দেখা অমনি ছুটে আসা। প্রায় ঝড়ের বেগে উন্মত্তের মতন ছুটে এল সুবাসিনী—যেন এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ার ঝাপট। চক্ষের নিমেষে ক্রমশঃ কাৎ হয়ে আসা লগিটি কোনক্রমে আঁকড়ে ধরে চিৎখির মারল। তার সেই গগনফাটা চিৎকার গাছগাছালি আশপাশের ঝোপঝাড় আর ঘোলা জলস্রোতে ধাক্কা খেয়ে গমগম করে উঠল, যেন নদীর উঁচু কান্দি থেকে জলগর্তে ঝাপ দেবার কালে শেষ-বারের মতন বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় চিৎকার ছাড়ল—অ-রা সু-রে···

না, রাসু এল না, অন্য কোনো জনমনিষ্যিরও সাড়া নেই। গাঁও দেউলীর শেষ প্রান্তের এই ভিটাখান বড় নিঃসঙ্গ, বড় একলা। কাছে পিঠে তেমন ঘরবাড়ি কোথায় যে, সুবাসিনীর গলা শুনে রাত্রির এই দ্বিতীয় যামে কেউ উঠে এসে বলবে, এই যে, এই যে, আমরা রয়েছি। না নেই। গোঁসাই পাড়ার কাছাকাছি বাড়িগুলি ফাঁকা-বাড়ন্ত বানের ভয়ে ওরা একাদিনের বন্দর পাড়ি জমিয়েছে।

লগি আঁকড়ে ধরেছিল সুবাসিনী কিন্তু গতরে এমন শক্তি নেই যে স্রোতের টানে সংসার করে টেনে নেওয়া গাছের খাবলার কবল থেকে নাও রক্ষা করে। লগি নীচু হচ্ছিল, সরেও যাচ্ছে। নাওটা খাড়া কাটের কাছে টেনে আনা পাঁঠার মতন দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। সে যাবে, সুবাসিনী রাখবে—রাত্রির মধ্যযামে সে এক বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ। স্রোতে টানা গাছের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। থেকে থেকে সুবাসিনী রাসুকে ডাকছিল। পরিত্রাহি গলায়। গোটা এলাকায় তখন বানের ডাকের সঙ্গে একটি নারীর আর্ত চিৎকার ভেসে বেড়াচ্ছিল।

প্রথমটা খেয়াল করে নি রাসু। আর এক ছিলিম তামাক সাজবে না সিগ্রেট ধরাবে এই চিন্তায় সে বুঁদ হয়েছিল। তার সমস্ত মন, চেতনায় আর একটি সৌদর মুখের ছায়া। রাত যত বাড়ছিল তত বাড়ছিল মনের অস্থিরতা। আচমকা কোনো শব্দে সে বারবার কান খাড়া করছিল এতক্ষণ। না, গোয়ালন্দের বন্দরে লাগা কালো বিশাল দৈত্যের মতন জাহাজটা যাবার জানান দিচ্ছিল না। সিথানের জানলার ঝাঁপ খুলে রাসু জল দেখছিল। ঘোলা জলের তীব্র স্রোত। হাতে হুকা, থেকে থেকে আনমনে অনেকবার ধরে টেনে যাচ্ছিল রাসু। শেষে বুঝি ফেটেও পড়তে চাইল। না, গুড়ুড়িতে তালি মারার মতন আঠার গোটা জাহাজটা বুঝি ঘাটার সঙ্গে আটকে রয়েছে।

অনেকক্ষণ, অনেক ধৈর্য, অপেক্ষা অস্থিরতা আর ক্ষোভের আগুনে দগ্ধাবার পর আচমকা সেই ভোঁ রব বেজেছে। সিটি। সিরাজগঞ্জের কিরাযাদার জাহাজ এবার বন্দর ছাড়বে। ছাড়বেই। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আইঢাই করে উঠল। বুকে মনে আরও অস্থিরতা। এতক্ষণ, এত দীঘল সময় ধরে রাসু এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল।···জাহাজ এবার বন্দর ছাড়বে। কেরায়া নাওয়ের বহর দেখতে দেখতে ছত্রখান হয়ে ছিটিয়ে পড়বে ধলেশ্বরীর বুকে। দূর দূর গাঁওয়ের সওয়ারী নিয়ে যাত্রা করবে ওরা। আর ঠিক তখন, তখনই সেই শুভক্ষণ। দরজার ঝাপ খুলে খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে যাবে রাসু। পা টিপে টিপে ঘাট তক পথ। তারপর টুক করে নাওয়ে উঠে পড়ে লগির বাঁধন খুলে দিয়ে একমাল্লাই ডিঙির পিছ গলুইয়ে বসবে সে বৈঠাখান নিয়ে। গাঁও দেউলী ততক্ষণে ঘুমে অচেতন। একটি ছোট ডিঙির মাল্লার বৈঠার ছপছপ শব্দ কারও কানে পশবে না। শিরায় শিরায় অদ্ভুত এক উত্তেজনা। তার নয়ন এখন পৈঠার আঁচল বিছিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বুঝি গাঙের দিকে।

এক ঝটকায় উঠে পড়ল রাসু। আকাশে চাঁদ উঠেছে।

জ্যোৎস্নায় ম ম করছে গোটা দিগর। জলের তীব্র স্রোতে যেন সহস্র চাঁদা মাছের চিকচিক রোশনী। মধ্যপাড়ার সীমানার আকাশে অনেকগুলো তারা মিটমিট করছে। জানলার ঝাঁপ ছুঁয়ে মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছিল কে একটা জোনাকি পোকার আলোকণা।

বাক্সতেই ছিল পিরান, রাসু সেই চেককাটা পিরান গায়ে চাপাল, আরশীর দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে কুপি জ্বলছিল, তার আলো অন্ধকারে রোশনী দিলেও এমন উজ্জ্বল্য দেয় নি যে গোটা রূপটাই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আবছাভাবে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হ'ল রাসু। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। এই পিরানটা তার মনে আলাদা খুশ দেয়। গোঁসাই পাড়ার নকু গোঁসাইয়ের ছেলেকে এমনি একটা পিরান পরতে দেখেছিল রাসু। হলুদ লাইনের ওপরে খয়েরী চেক। কলার খাড়া করে দেয় নকু গোঁসাইয়ের পোলা। ওপর পকেটে ভরা রুমালের কোণ দেখা যায়, মাথার চুল পেছনে আঁচড়ানো মুখে সিগ্রেট, ভকভক করে ধোঁয়া ছেড়ে পথ দিয়ে হাঁটে কলকাতার এই পড়ুয়া। সেই থেকে মনে সাধ জাগল রাসুর। গেল আষাঢ় ফজল মিয়ার কাছে ক্ষেতি কামলার কাজ করেছিল রাসু। আউশ ধানের ক্ষেতে কেটেছে বেশি সময়, বাকিটা তুলা পাটের সাফাই নিরানে। মাত্র দিন কয়েকে পকেট গরম। না, একটা পয়সাও সুবাসিনীকে দেয় নি রাসু। করকরে কটি টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল ছিদামপুরের রতন শা-র গদিতে। পিরানের কাপড় কিনে যোগেশ দর্জিকে মাপ দিয়ে এসে মনের খুশীতে রাসু এক বাক্স কাঁচি সিগ্রেট কিনে ফেলল। না, তামাক খাওয়া তার পোষায় না আর, বিড়িও না। নকু গোঁসাইয়ের পোলার মাফিক সে পথে হাঁটতে হাঁটতে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়বে গলগল করে।

অনেকক্ষণ নিজেকে দেখল রাসু। স্টীমার ঘাট ছাড়ার ডাক দিয়েছে। এখন তড়িঘড়ির সময়। পেঠার আঁচল পেতে তার মন-সোহাগী নয়ন উদাসীর মতন পথ দেখছে। জলের পথ। সে জানে, এই পথে আসবে তার কালাচাঁদ রাসু।

ডাক ছেড়েছিল কিন্তু শব্দ উঠছে না। ঘাটা ছেড়ে যাওয়ের নাম করছে না সিরাজগঞ্জের জাহাজ। ভোঁ মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও সেই কালা দৈত্যখান। রাসু বিরক্ত কুপিত। শালা ম্যারেচ....দাঁতে দাঁত চেপে আপন মনে গালাগাল করছিল। বুকের ভেতরে, সমস্ত গতরে অসম্ভব বাস্ততা, দূরের জাহাজের বাঁশের মতন রাসুকে ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলেছে। সময় আর কাটছিল না। গলার ভেতরটা কেমন শুকনো শুকনো লাগে। আর এক ছিলিম তামাক সাজবে না সিগ্রেট ধরাবে রাসু ভেবে পাচ্ছিল না। জাহাজের চাকা যতক্ষণ না চলছে ততক্ষণ তার বেরোবার জো নেই।

অনেকক্ষণ পরে রাসু সিগ্রেট ধরালো। বাস্তবিক এই নেশাটার এমনই গুণ যে, রাসুর মনে হচ্ছিল এ গাওয়ে তার তুল্য ছোকরা আর কেউ নেই। আলাদা এক সম্ভ্রম এবং মর্যাদাবোধ অনুভব করছিল রাসু। ফুক ফুক করে পর পর কটা টান মারার মাথায় সে চমকে উঠল। না, জাহাজ ছাড়ার শব্দ না, অন্য কেউ ডাকছে তাকে। কে। কান পাততে সুবাসিনীর গলার স্বর শুনতে পেল রাসু।

দু' আঙুলের নখে টিপে সিগ্রেটের মাথার আগুন ঝেড়ে ফেলে দিল রাসু। বাকি অংশটি উপর পকেটে রেখে চৌকাট মাড়িয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। কোনদিক থেকে ডাকটা আসছে ধরতে পারছিল না।...'মাসি' রাসু বিরক্তের গলায় ডাকল।

মাসি সুবাসিনীর ততক্ষণে বুঝি অন্তিমকাল আসন্ন। নীচু হতে হতে সরে যাওয়া সাপকে সে বাগে আনতে পারছিল না কিছুতে। ছেড়ে দিতে পারত, ছাড়ছে না। কারণ সাপটা হাতছাড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অঘটন ঘটে যাবে।

স্রোতের টানে আধাআধি-পাথালি করা নাওটা মুক্ত হয়ে ভেসে পড়বে অনির্দেশের পথে। সুবাসিনী প্রাণপণে লগি ধরে থাকা সত্ত্বেও রাখতে পারছিল না। তার সারা গা-গতর ঘামে নেয়ে উঠেছে। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। গোটা মুখটা বীভৎস আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।...অমা দলেশ্বরী, রক্ষা কর রক্ষা কর জোড়া কইতর দিমু তরে নাও ফিরাইয়া দে আমারে—সুবাসিনী বিড়বিড় করে বলছিল। ভীষণ ক্লান্তিতে প্রচণ্ড সংগ্রামে সে এত কাহিল যে গলা দিয়ে আর শব্দ ফুটছিল না। স্রোতের টানে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া গাছটার থাবলায় ধরা লগিটা সুবাসিনীকে টেনে জলে নামায় আর কি। এমন সময় রাসুর গলা। সুবাসিনী শেষবারের মতন সমস্ত শক্তি দিয়ে সাড়া দিল; বাঁচা বাঁচা আমারে টাইন্যা লইয়া যায় রে রাসু...

লইয়া যায়! গোটা উঠানে জ্যোছনা থ থ করছে। ঠিক মাঝখানে একবার টানটান হয়ে দাঁড়াল রাসু। মাসিরে লইয়া যায় কোন তাল্লরের পুতে, খাড়ও—চকিতে জ্যামুক্ত তীরের মতন দুর্বার গতিতে দৌড় মারল রাসু। ঘাট বরাবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাসু গিয়ে না পড়লে সুবাসিনী কেবল দহেই পড়ত না, তীব্র স্রোতের টান তাকে নিমেষের মধ্যে টেনে আনত মইস্যাখালির বাঁওরে। কোনোদিন আর এই জ্যান্ত মানুষটাকে দেখতে পেত না রাসু। ঝোড়ো বাতাসের মতন ছুটে গিয়ে সে, এক ঝটকায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়া সুবাসিনীকে ছিটকে ফেলে দিল উইন্তার দিকে। তারপর অনেক কৌশলে নাওটাকে উদ্ধার করে যখন পারে এসে পৌছল, দেখে সুবাসিনী অচৈতন্য। জ্ঞান বলতে তার মধ্যে এখন আর কিছু নেই।...মাসি, মাসি গো...রাসু লংমায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুবাসিনীর অচেতন দেহের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ কান্না। রাসুর মনে হ'ল এ জগতে তার আপন বলতে আর কেউ থাকল না। কেউ না।

রাসুর জীবনটাই এমনি। সব মানুষের একটা বাপ থাকে, রাসুর মনে পড়ে না সে কবে, কোন ছোটবেলায় তার বাপকে দেখেছিল। তার ছবিটা পর্যন্ত কখনও কল্পনার চোখে ভাসে না। মা ছিল, তিন বছর আগে কোন দুঃখে কে জানে গাঙের পানিতে ডুবে মরল মা। রাত্রে শুয়ে ছিল একই ঘরে—বেলায় লোকের চেঁচামেচি চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে উঠে এল রাসু। লোশা ভেসেছিল এলংজানির বাঁকে। মরা লাসটা লোকজনেরা তখন ডাঙায় তুলেছে। সে কী ভয়ানক মূর্তি মার। পরণে বস্ত্র নেই। পেট ফুলে ঢাক। গা গতর ভীষণ ফোলা ফোলা। মুখটা এত বিকৃত যে ও-দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেয়েছিল রাসু।

মা ছিল, শেষ আপনজন। সেই থেকে মাসিই রাসুর মা-বাপ। বয়স হয়েছে, একটু বা খিটখিটে স্বভাব—কথায় কথায় কাঁটা চলায় সর্বদা বকাবকি তা নইলে সুবাসিনী প্রকৃত আপন পোলার তুল্য মনে করে রাসুকে। বলে, তুই আমার সব। সুয়ামী থাকতে পোলাপান হইল না; না হইলে কি হইব, দেখ ভগবানে মিলাইয়া দিচে আমারে। রাসন আমার সুনার টুকরা পোলা। সেই সুবাসিনী অচৈতন্য। ঘাটের পাশে তার দেহটা পড়ে রয়েছে—সাড় নেই। অনেক ডাকাডাকি করল রাসু। বুকে মাথা ঘসে হাউ হাউ কাঁদল খানিক। তারও অনেক পরে চোখ চেয়ে তাকাল সুবাসিনী। ঘোলা চোখ, ভাসা ভাসা দৃষ্টি। নাওখান...সুবাসিনী আর কিছু বলতে পারছিল না। ভয়ের কষ্টের চিহ্ন তার মুখে। ঝাপসা চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে রাসুর মুখের দিকে।

'নাও?' চোখের জলে ধোয়া মুখ তুলল রাসু। সুবাসিনীর চোখে তাকাল খুশীর দৃষ্টি মেলে, 'তাই বো না মাসি গো। তিন ঠ্যালায় হালার দলিকের পুতরে পারে

আইজ্যা ফালাচি না। পাইয়া গাছের লগে বানচি হালারে গিঁটখান যা মারচি না মাসি, জব্বর।'

সুবাসিনীর ঝাপসা দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছিল। তৃপ্ত আনন্দিত জয়ের গর্বের চাউনি মেলে সে রাসুকে দেখছিল। হ্যাঁ, পুলাটা তার পুলার মতন। গায়ে-গতরে তাগদে কথায় রাসুর জুড়ি নাই সারা দেউলীতে। কিন্তু সুবাসিনী কি জানতো, তার আদর সোহাগের এই রাসু আর মাত্র খানিকক্ষণ। তার মন টানছে ধলেশ্বরী পারের কোন আঙিনায় বসা এক শঙ্খবতী কন্যা।

• • •

অনেক রাতে ছাড়া পেল রাসু। মাসিকে বিছানায় তুলে খানিক অপেক্ষা করেছিল, ঘুম আসা পর্যন্ত। তারপর সন্তর্পনে উঠে এসেছিল রাসু ঝাপ টেনে দিয়ে সোজা ঘাটে। পাইয়া গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার জব্বর গিঁট খুলতে যতটুকু সময়—তারপরই-এ ভিটের ঘাট থেকে একমাল্লাই ডিঙিটা ভেসে পড়ল। বৈঠা ধরার আগেই তীব্র জলস্রোত কোষবৎ ডিঙিকে নিমেষে গোঁসাইপাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলল মইষাখালির বাঁওরে। রাসু ততক্ষণে পিছ গলুইয়ে এসে বসেছে। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে একগলি দীঘল বৈঠাখান।

চাঁদ ততক্ষণে মধ্যগগনে উঠে এসেছে। ঈষাণ কোনে সামান্য মেঘের আভাষ ছাড়া গোটা আকাশ নীলাম্বরী শাড়ির তুল্য ঝকঝক করছে। অসংখ্য সোনালী চুমকির মতন ওখানে জ্বলছে হাজারো তারা। গোটা দিগরে জোছনার রোশনী—দিনের আলোর মতন দূর কি কাছের সকল বস্তু দেখা যাচ্ছে। তীব্র স্রোতের ওপরে জ্যোছনা পড়েছে। রাসুর মনে হচ্ছিল ছোট ছোট ঢেউ বুঝি তারা খুঁটি ছুঁড়ে দিচ্ছে। দিগর আলা করা চান্দের রোশনাইয়ে রাসু গোটা দিগর দেখত পাচ্ছিল। দূরে এলাসিনের জাহাজ ঘাটা এখন শূন্য। কালা দৈত্যের মতন জাহাজটা কখন যেন বন্দর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে চারাবাড়ির পথে। মাঝে মাঝে ওখানে দপ্ দপ্ করছে এক আধটা আলোর চমক। মইষাখালির দুই পাশের জমিতে আগুনের চিহ্ন নেই। কেবল জল আর জল। জলের তীব্র স্রোতধারা যেন মুঠো মুঠো করে ছিঁড়ে গোটা আবাদ ছয়লাপ করে ফেলেছে। সরকার বাড়ির দিকে কাষ্টিনপাটের কিছু চিহ্ন ছাড়া এ বাওরে আর কোন আবাদের নিশানা নেই।

মন চনমন করে উঠল রাসুর। দেরী হবার আশংকা তার ছিল, তবু জানে নয়নতারা ঘুমোবে না। ঘুমোতে পারে না। অনেকক্ষণ পৈঠায় বসে, হিজল তলায় প্রখর দৃষ্টি মেলে হয়তো সে মনমরা হবে, আকুলী বিকুলি তাকাবে এদিক ওদিক, শেষে ঘরের ঝাপ টেনে বিছানায় যাবে শোবে। কিন্তু দুই চক্ষের পাতা ভারী হয়ে আসবে না কখনও। কারণ নয়ন জানে, রাসু আসবে। আসবেই। আসন্ন ভবিষ্যতের এক টুকরো ছবি ভেবে নিতে পারছিল রাসু। নয়ন গোসা করবে। সন্ধ্যা থেকে যে-মন পথের বাঁধন বাঁধা—সেই পথ তার মনের মানুষ এনে দেয় নি। অভিমানে রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে নয়ন নিশ্চয় ঝাপ দিয়েছে দরজায়। সেই পাপড়ি মোলায় শঙ্খবতীর অভিমান পীড়িত অশ্রুত মুখটি রাসুর দুই চক্ষের নীল মণিতে যেন বিঁধে রয়েছে। নয়ন···নয়ন—নামটা যতবার মনে পড়ছিল সমস্ত মন চেতনা অস্থির হয়ে পড়ছিল রাসুর। এক আধটি ঘণ্টা নয়, পুরা একটা দিন আর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর সে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। অপেক্ষা করেছে এই শুভমুহূর্তের জন্য অতএব আর দেরি নয়। পিছ গলুইয়ের চরাটে একটা পা মেলে দিয়ে আয়েস করে বসল রাসু। শক্ত হাতে ধরা পাইয়া কাঠের দীঘল বৈঠার ফলায় তীব্র স্রোতকে ফালা ফালা করে প্রাণপণে সে বাইতে শুরু করল নাও।

না, উজানী ঘুরপথে আগ-গলুই বাড়িয়ে দিল না রাসু, সোজা পথ সে ধরে ফেলেছে ততক্ষণে। মাথার ওপারের

আকাশ চুপ করে অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে বুঝি। দূরে ধলেশ্বরী-রাশি রাশি উদ্দাম ঢেউয়ে উথল-পাথল হচ্ছে কালনাগিনী গাঙ। কী তার ডাক! কী ভীষণ গর্জানী—যেন গোটা পৃথিবীটা সে গ্রাস করতে চেয়েছিল, না পেরে এমন আহত বাঘডাসার মতন ফুঁসছে, ফুঁসছে। ঘরবাড়ি গাছগাছালি নাও জনপদ যা পাচ্ছে তাই গ্রাস করছে রাক্ষসীর মতন বিশাল মুখব্যাদনে।

নয়ন···নয়নতারা···নয়ন মণি—পাথরাইলের লালন বিশ্বাসের ছোট ম্যাইয়া। একটা দিনের একটা মুহূর্তের দেখা। ফুলচান গোসাইয়ের পাটের গাড়ি নিয়ে রাসু ফিরছিল করটিয়ার হাট থেকে। সকালে রওনা দিয়েছিল, বইল টানা গাড়িটা হেলে দুলে পাথরাইলের গাঁওয়ে এল ভর দুপুর বেলায়। চৈত্রমাসের রোদ খাঁ খাঁ করছিল। গায়ে গতরে জ্বালা, গাল গলা কপাল বেয়ে নদের ধারায় নেমে আসছিল ঘামের স্রোত। গাছগাছালির পাতা সেই তীব্র তাপে বুঝি ঝলসে যাচ্ছে। পাখি ডাকছে না। এমন মধ্য দুপুরে বাঁ পাশে ঝাঁকড়া বটতলার ছায়ায় গাড়ি ভিড়ালো রাসু। খানিক বিশ্রামের আশায়। শুধুই বিশ্রাম না, বুকের ছাতিও বুঝি ফেটে যেতে চাইছিল আকণ্ঠ তৃষ্ণায়। এক ঘটি শীতল পানির জন্যে তার তৃষাতুর আত্মা যেন আহত পাখির তুল্য ছটফট করছিল। কিন্তু চাইলেই জল পাওয়ার জো নেই এখানে।

গাড়ি থামলে, বইলের কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়েছিল রাসু। গরু দু'টো একটু জিরোক। জিরোবে সে নিজেও। কিন্তু তার আগে জল চাই। সমস্ত গলাটা যেন চৈত্রমাসের চষা ক্ষেতের ইটার মতন শুকনা চরচরা হয়ে আছে। রাসু এ-দিক ওদিক খুঁজল কিন্তু খাওয়ার মতন এক ফোঁটা জলও মিলল না। নিরাশ হয়েই ফিরছিল এমন সময় তার নজরে পড়ল অদূরের গেরস্ত বাড়িটা। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাসুর দু'টি চক্ষের তারা ইলশা মাছের চোচার মতন ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

না, দেরি নয়। অপেক্ষা ইতস্ততও না—হতাশার ঘন নিরন্ধ্র অন্ধকারে এক বিন্দু আলোকণার উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার মতন ত্বরিত গতিতে যাত্রা করল রাসু। এত দ্রুত যাচ্ছিল যে, তার মনে হচ্ছিল ওখানে, ওই গেরস্ত বাড়ির পূবকোণে যেন একটা বড় ইন্দারা সে দেখতে পেয়েছে। ওই ইন্দারের শীতল পানি রাসুর সকল তৃষ্ণা মিটাবে। কিন্তু তখন কি ছাই রাসু জানত যে, শুধুই ঠাণ্ডা শীতল জল না, এখানে, পাথরাইলের এই গেরস্ত বাড়িতে সে মনের মানুষেরও দেখা পাবে?

ইন্দারা বলে যা মনে ভেবেছিল, সেটি আসলে তা নয়, ঢাইগাদা। এখানে এসে থমকে দাঁড়াল রাসু। এ-কোণ ও-কোণ দেখল। কিন্তু জলের চিহ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। জনমনিষ্যিরও কোন সাড়াশব্দ পেল না রাসু। গোটা বাড়িটা শোলার বেড়ার আব্রু দেওয়া। ভেতরের কিছু নজরে পড়ছে না। এ-বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রাসু। কোমরের গামছা খুলে গাল গলা কপালের ঘাম মুছল। শেষে হাঁক ছাড়ল, 'অন্দর বাড়িতে কেউ আছেন নাহি?' একটি নয়, দুটি নয় অনেক ডাক। শেষে গলা চড়িয়ে জোরে হাঁক মারল রাসু, 'কর্তা কর্ত্রী যেই থাকেন আমারে এট্টুন জল দেন, তিয়াসে ছাতি ফাইট্যা যায় আমার।'

চড়া গলার ডাকে কাম দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর বাড়ি থেকে কচি নরম মধুর গলার সাড়া এল, 'ক্যারা কথা কন বাইর থনে?'

'আমি রাসু। রাসবিহারী কৈবর্ত্ত। চিনবার পারবেন না, দেউলীর মানুষ।'

'চান কী?'

'এট্টন জল খামু। করটিয়া হাটের থিকা আইতাছি—তিয়াসে আমার বুকের ছাতি ফাইট্যা যাইতাছে···'

'খাড়ন'। ভেতর থেকে আশার আলোর মতন ভরসা এল।

রাসু দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে থাকল। কুয়া কি ইন্দারা জানা নেই, কিন্তু তা থেকে জল উঠছে রাসু বুঝতে পারল। বালতির সঙ্গে পাটের ঠোকাঠুকির শব্দ আসছিল। শব্দটা যখন ওপরে উঠে এল আর স্থির থাকতে পারল না রাসু। সকল সংকোচের বালাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিমেষে ঢুকে পড়ল অন্দর বাড়িতে। ঝড়ের গতিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে জলতোলা মানুষের হাত থেকে ছোঁ মেরে বালতিটা কেড়ে নিয়ে মুখের সামনে প্রসারিত আঁজলায় করে ঢকঢক জল খেতে লাগল। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যের মত। দেখতে দেখতেই গোটা বালতির জল কাবার। শেষ আঁজলাটা নিজের মুখের ওপর মারল রাসু। চড়া রোদের তাপে ঝলসে যাওয়া মুখটা শান্তি পেল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বালতি রাখবে, এমন সময় চোখাচোখি। রাসুর মনে হল, তার সবকিছু ভুল, সবকিছু ভ্রম সবটাই স্বপ্ন বুঝি। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি মেয়ে নয়, বুঝি স্বর্গের অপ্সরা। ঘনপক্ষ্ম ভাগর চক্ষু নামিয়ে সেই অপ্সরা লাজে বুঝি কাঁপতে শুরু করেছে। কী রূপ কী রূপ—যেন চৈত্রের হাজা বিলে একটি নিটোল পদ্মফুল পাপড়ি মেলে ফুটে আছে। শঙ্খসাদা দেহের পরতে পরতে তার অকৃপণ যৌবন ঢলঢল। মেঘবরণ দীঘল চুলের গোছা গোটা পিঠ ঢেকে হাঁটুর নীচে নেমে এসেছে।

কথা কইতে পারল না রাসু। কয়েকটা ঢোক গিলল পরপর। বুকের অতলে বুঝি তখন অস্থ তৃষ্ণার পাখির পাখা ঝাপটানি শুরু হয়েছে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাসু। তার চোখের পলক পড়ছে না।

দীঘল বলিষ্ঠ পুরুষের এক জোড়া-মুগ্ধ বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সেই শঙ্খবতী লাজনম্র কন্যা কেঁপে কেঁপে সারা হচ্ছিল। তার সারা শরীর সরমের ভারে আনত।

দুপুর পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছিল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। কোথায় একটা ঘুঘু ডেকে উঠল অসময়। আর সব নিস্তব্ধ, নিথর।

অনেক পরে ভাগর দু'টি পদ্ম আঁখি মেলে তাকাল স্বপ্নের অপ্সরা। গোলাপ পাপড়ি অধর দুটি তার থরথর কাঁপছে। শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে এসে রক্তজবা করে তুলেছে গোটা মুখটা। এবার কথা কইল লাজবতী কন্যা। কোকিলের পারা স্বর 'তিয়াস নি মিটল ?'

'তিয়াস।' অভিভূতের মতন কথাটা উচ্চারণ করল রাসু। আবেগ কাঁপা গলায়। 'না মিটে না। তুমার মিঠা হাতের পানি আমার বুকের ছাতিতে দুনিয়ার হগল তিয়াস জমা কইরা ফ্যালাইচে…'এক পা আগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রাসু। 'নামখান কি শুনবার পারি ?'

'নাম দিয়া হইব কি ? পাশ ফিরে দাঁড়াল যৌবনবতী কন্যা। আঁচল তুলে নাকের ঘাম মুছল। বাড়িতে কেউ নাইক্যা। আবিয়াত মাইয়া আমি নাম কইবার পারি না।

'পার, পার,। দু' পা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল রাসবিহারী। 'কও, নামডা শুইন্যা চইলা যামু। বুকের পিঞ্জার ভইরা রাখুম ওই মিঠা নাম। আমারে ফিরাইও না তুমি।'

'মাইনষে ডাকে নয়ন। ভাল নাম নয়নতারা।'

কথা রেখেছিল রাসু। অপেক্ষা না করে চলে এসেছিল পথে। ঘুরে দাঁড়াবার আগে শেষ কথাটাও বলে এসেছিল। 'জপের মালা বানাইলাম তুমার নামরে। দিনে রাইতে নাম লমু। ঘুইরা ফিরা৷ আমি আমুম। ওই সোঁদর মুখখান বুকে না পাইলে সারা দুনিয়া আমি তচনচ কইরা ফেলামু কইয়া যাই।'

কথা রেখেছিল রাসু। কয়টিয়া হাটের নেশা সেই থেকে পেয়ে বসল তাকে। কাজে আসত। অকাজেও। সারা সপ্তাহের যম যন্ত্রনার অবসান ঘটত সোমবারে।

মালগুদামী অন্তের জিম্মায় রেখে পাথরাইলের পথে পা বাড়াত রাসু। কদাচিৎ খানি বাড়িতে দু' একটা কথা হত, কখনও আনাচে কানাচে। মুহূর্তের দেখা তবু এই দেখাটুকুই মনের সন্দিতে জলা হু হু আগুনে জলের ছিটা মারাতে পারত। মনের সকল আকাঙ্খার প্রতিমূর্তি নয়নতারা তাকে উন্মাদ করে ফেলেছে। কিন্তু তখন কি ছাই জানত রাসু, এ পৃথিবীতে চাওয়ার বস্তুটি সর্বদা সহজ লভ্য নয়। নয়নকে পাওয়ার পথে অনেক কাঁটার সঙ্কর রয়েছে? না জানত না, জানলে ধরা পড়ত না। দেউলীর জোয়ান মরদটা আগে থেকে জানতে পারলে তাকে শরীরে করে বয়ে নিয়ে যেতে হত না অসংখ্য নির্দয় অত্যাচার আর কঠিন প্রহারের চিহ্ন।

তাই নিয়ে যেতে হ'ল। আগের হাটবারে কথা হয়েছিল, পরের বারে কল্পিনী বিলের পারে যখন নয়ন আর রাসু অমনই এমন সময় ঘটনা ঘটেছিল। আচমকা কটি শক্ত সমর্থ জোয়ান জিগির ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্তের ধস্তাধস্তির পর শ্রান্ত রাসবিহারীর হাতটা যখন চার জোয়ানের বলিষ্ঠ মুঠোর মধ্যে ঠিক তখন, তখনই দেখল রাসু অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লালন বিশ্বাস। রাসুর পরান-পিত্তিমার বাপজান। তার হাতের মুঠোয় নয়নের দীঘল চুলের গোছা।

মুখ থেকে শিকার ছুটে যাওয়া বাঘের মতন গর্জন করে উঠতে চেয়েছিল রাসু। কিন্তু করল না। সে জানে কোন ক্রমে তাকে এই বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে। না হ'লে নয়ন বাঁচবে না, নিজের মনের তেল জ্বালানো প্রদীপের রোশনী কেঁপে কেঁপে নিভে যাবে। আর জ্বলবে না।

প্রচুর নিষ্পেষণ আর অত্যাচারের কলঙ্ক চিহ্ন সারা দেহে বহন করে ফিরে এসেছিল রাসু, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা সেদিন সে করেছিল, বর্ণে বর্ণে তা সত্য হ'ল। লালন বিশ্বাসের সজাগ পাহারা থেকে একদা উধাও হয়ে গেল নয়ন নামের পক্ষিনী। পাথরাইলের তামাম কৈবর্তপাড়া গোটা দিগর চষে ফেলেছিল তার সন্ধানে কিন্তু বেপাত্তা সেই কুমারী কন্যার সন্ধান আর মেলে নি। অমৃত মণ্ডলের ইটভাটা আড়ালে ভিড়নো ছিল রাসুর ছোট ছিপ নাওখান। অন্ধকারে সেই ছায়া ছায়া রমণী মূর্তি নাওয়ে উঠে এসেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পড়েছিল চারমাল্লাই দীঘল ছিপ। অক্লান্তভাবে চারটি দাঁড় পড়ছিল জলে; দেখতে দেখতে মাত্র কয়েকটা প্রহরের সে নাও এসে ভিড়েছিল দেউলীর ঘাটে। নিরাপদ আশ্রয়ে।

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেল রাসু। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি তাকে পিছ গলুই থেকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল প্রায়। কোনোক্রমে টাল সামলে নিয়েছে। সরকার বাড়ির আমবাগানে কখন যেন ঢুকে পড়েছে তার এক মাল্লাই ডিঙি। তীব্র স্রোতের টান নাওটাকে এমন ধেঁচকা ঠেলা মেরেছে যে ঝাঁকড়া এক হিজলের গুঁড়ির ওপর গোত্তা খেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরেছে নাও। না পথ ভুল হয় নি, সামান্য অন্যমনস্কতা মাত্র। রাসু নাও সামলে নিল। বাঁয়ে মোচড় ঘুরতেই দেখতে পেল নয়নদের ভিটা। ওখানে আলো নেই। নয়ন নিশ্চয় ভয়ানক চটেছে।

স্রোতের উজানী টানে আর বৈঠার বায়নে দেখতে দেখতে ডিঙিটা এসে ভিড়ল ঘাটে। অতি সন্তর্পণে নামল রাসু, নিঃশব্দে। লগি পুঁতল না, লম্বা দড়িটা দিয়ে শক্ত বাঁধন মারল ক্যাম্বার গাছে। তারপর পা টিপে টিপে উঠে এল ফাঁকা উঠানে। উঠান থেকে বারান্দায়। হাত বাড়িয়ে রাসু কপাটে টোকা মারল টুক টুক টুক....

ভেতরে শব্দ হ'ল। নয়ন জেগেছে। নয়ন আসছে। আর কিছু ভাবনার ফুরসৎ না দিয়ে অমনি খুলে গেল দরজা। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে নয়ন। 'এত রাইত..' চাপা ফিস-ফিসে গলা নয়নের।

রাসু কিছু বলল না। ঘরে ঢুকল। ঢুকে খিল তুলে দিচ্ছিল। (ক্রমশঃ)

(৮৩৬ পৃষ্ঠার পর)

মার্ক্সের এই উক্তির সঙ্গে খুব তফাৎ চোখে পড়ে না ফয়েরবাকের একথার : "The human essence can only be found in the community" কাজেই ফয়েরবাককে মার্ক্স ঐ ৬ষ্ঠ থিসিসে যে অপবাদ দিয়েছেন তার কোন ভিত্তি নেই। ফয়েরবাক কোথাও মানুষকে বিমূর্ত, বিযুক্ত ব্যক্তি-মানব ("an abstract isolated, human, individual)' অভিধায় ভূষিত করেছেন এমন কথা আমরা জানিনে। বরং তিনি মানুষকে সামাজিক বলেই বরাবর ধরেছেন। অবশ্য সামাজিক পরিবেষ্টনের মাহাত্ম্য কীর্তনে এঁদের দুজনের কারুরই যে মৌলিক কৃতিত্ব রয়েছে তা' নয়। কারণ, হেগেলই এ বিষয়ে এঁদের শিক্ষাগুরু এবং হেগেলকে এঁরা অনেক ব্যাপারে অস্বীকার করলেও হেগেলত্বকে অতিক্রম এঁরা কেউ করতে পারেননি। Ryazanov একথা স্বীকার করেছেন।●

প্লেখানভ বলছেন যে 'human essence' বা মানব-সার-এর গোড়ার তত্ত্বটিকে ফয়েরবাক ধরতে পারেননি। কিন্তু সামাজিক পারিপার্শ্বিকের পিছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে, কোন্ শক্তির দ্বারা সমাজের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই নিভৃত স্তরের কাহিনীটুকু তাঁর কাছে অজ্ঞাতই রয়েছে। সকল সামাজিক বিঘটনের (phenomenon) যা ভিত্তি ও উৎস, সেই আদি শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক (economic) শক্তি। সেই শক্তিকে আবিষ্কার করে জগতের দৃষ্টির সম্মুখে ধরেছে ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা ('Materialistic conception of history.') ।●

ইতিহাসকে জড়তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে, চৈতন্য-তত্ত্বের সাহায্যে নয়—একথাই ডায়লেকটিক জড়বাদী চলছেন। কিন্তু জড়তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে শেষটায় ভূগোলতত্ত্বে এসে ঠেকে। আর ভৌগোলিক শক্তিচক্রই হচ্ছে মার্ক্স-এর জড় পরিবেশ একথা মার্ক্সের উক্তিগুলো থেকেই ধারণা হয়। বর্তমান জড়বাদের বস্তু-উপাদানগুলি (material factors) যদি ভৌগোলিক উপাদান (geographical factors) ছাড়া আর কিছু না হয়, তবে ইতিহাসের ভিত্তি সম্বন্ধেও মার্ক্সের নূতন আবিষ্কার কিছু নেই। কারণ, ফয়েরবাক ও হেগেল—দুজনেই ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তির কথা বলে গেছেন। হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তিকে ("geographical

---

● "Furthermore, according to Fuerbach likewise the 'human essence is created by history. Thus he says: 'I only think as a subject educated by history, generalised, united to everything, to species, to the spirit of universal history. My thoughts do not have their beginning and their foundation directly in my special subjectivity; they are results; their beginning and their foundation are those of universal history itself.'......Thus *we already find in Feurbach the germs of the the materialistic conception of history.* In this respect, however, Feurbach does not get beyond Hegel.' (Notes 19, Ryazanov)

● "That conception discloses to us the causes which in the course of human evolution, determine "the community, the unity of man with man", that is to say, determine the mutual relations which bind man to man. This limit, this boundary, serves not merely to separate Mathew from Feurbach but also to show how close the two thinkers are one to the other. (Plekhanov, Funamental Problems of Marxism, p. 23)

foundation of universal history") মার্ক্স নিজেই প্রশংসা করেছেন। ফয়েরবাকও ভূগোলকে প্রাধান্য দিয়েছেন :●

কাজেই ইতিহাস বিবর্তনের মূল কোথায়, তা খুঁজতে খুঁজতে ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যন্ত এসে দেখা গেল যে ফয়েরবাককে ছাড়িয়ে মার্ক্স খুব বেশী দূর এগোতে পারেননি। এর পরেই মার্ক্স তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রবল করে তুলেছেন।

এখানে এসে মার্ক্স জড়বাদের সঙ্গে নতুন পথ ও নতুন গতি-বৈচিত্র্যকে জুড়ে দিয়েছেন। একথা স্বীকার সবাই করবে যে মার্ক্স অর্থনৈতিক (Economic) বা ভৌগোলিক (Geographical) শক্তিচক্রের সঙ্গে হেগেলীয় নীতিকে যে কৌশলে যোগ করেছেন তাতে এইখানেই তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ডায়লেকটিকের কুশল প্রয়োগ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উজ্জ্বল পরিচয়। এইখানেই ফয়েরবাক থেকে তাঁর আসল স্বাতন্ত্র্য এবং এইখানেই তাঁর বিশিষ্ট পার্থক্য। Being-Consciousness সম্বন্ধ নির্ণয়ে কিংবা জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বে (Epistemology) মানুষের সক্রিয় ভূমিকার (active role) আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর যে দাবি, তা' যে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক, একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ডায়লেকটিকের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিকত্বের দাবী অকাট্য। আমাদের মতে এখানেই—মাত্র এই একটি বিষয়েই ফয়েরবাকের সঙ্গে মার্ক্সের পার্থক্য খুব স্পষ্ট।

Being-এর গোড়ার স্বরূপ যে অর্থনৈতিক একথা ফয়েরবাকও মোটামুটি বলেছেন। কিন্তু যে Being-এর (প্রকৃতির) গতির ফলে ও প্রভাবে মানুষ ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, তার বিকাশের ও প্রগতির (forward movement, evolution) রীতি সম্বন্ধে মার্ক্স একটা ফর্মুলা দিয়েছেন, সেই ফর্মুলাই ডায়লেকটিক। দুটো বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত উন্নীত হয় একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যে এবং এই সামঞ্জস্যও পরের স্তরে নূতনতর বিরোধের মধ্য দিয়ে পরিণত হয় আরো একটি উচ্চতর বিকাশে। অর্থনৈতিক পরিবেশ (Being, Nature, Economic environment) অনবরত পরিবর্তনের পথে বিকাশ পাচ্ছে ; কিন্তু এ পরিবর্তন ঘটছে তার পদে পদে নিজেকে বিরুদ্ধতা ও নিরসন করে করে। আর্থিক পরিবেশকে আশ্রয় করে মানুষের মধ্যে শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে এবং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাতই ক্রমে ইতিহাসকে গড়ে তুলছে। সমাজের সমস্ত বিকাশ ও বিঘটনকে (-phenomenon) এই অর্থনৈতিক শক্তিচক্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন মার্ক্স। Being যে পরিবর্তিত হয়, বিকশিত হয় সে কেবলি ডায়ালেকটিক নীতিকে অনুসরণ করে'। Being-এর movement বা বিবর্তনের mechanismই হচ্ছে এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতি। Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর (স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির) বাঁধা ফর্মুলাকে ফয়েরবাক অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু মার্ক্স তাকেই সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন, এইখানেই গুরু শিষ্যের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য।●

● "The road which the history of mankind follows is obviously pre-determined, for man follows the road of nature as water runs in its channel.--*The essence of Hindustan is the essence of the Hindu. That which* the Hidnu is, that which the Hindu has become, *is only the product of the sun, the air, the water, the animals and the plants of Hindustan. How* could man, primitively, have originated from anything else than nature ?" (Quoted by Ryazanov, Fundamental Problems, footnote No. 19.)

● "One of the supreme merits of Mathew

এই ডায়লেকটিকই মার্ক্সবাদকে নতুন রাঙিয়ে দিয়েছে এবং ফয়েরবাকীয় মূল তত্ত্বকে অতি মনোহর ভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে মার্ক্স এই হেগেলীয় লজিকের কর্মূলাকে তার ওপরে এঁটে বসিয়ে দিয়েছেন. যাকে ইংরেজীতে বলে graft করা। ফয়েরবাক এই ডায়লেকটিককে যে বর্জন করেছিলেন তা সজ্ঞানে ও সুস্থ-মনেই করেছিলেন। ডায়লেকটিকের মানে ঠিক বুঝতে পারেননি বলে নয়, মানে বুঝেছিলেন বলেই একে একপেঁয়ে ও একচোখো নীতি বলে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি দার্শনিক হিসেবে একে বিচার করে দেখেছেন এবং দার্শনিক যৌক্তিকতার দিক থেকেই একে অমার্জনীয় বলে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দার্শনিক সত্য নির্ধারণের পথে সুবিধাবাদ বা ব্যবহারিক উপযোগিতার কোনো স্থান নেই। কোনো বিশেষ কার্য্যসাধনের সহায় হবে বলে বা জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করতে পারবে বলে, কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সত্য বলে গ্রাহ্য হতে পারে না, যদি সে তত্ত্ব প্রকৃতই বিচার-সহ সত্য না হয়। কাজেই ফয়েরবাক এই হেগেলীয় নীতিকে (ডায়লেকটিক) কাজে লাগাতে পারেন নি বলে দোষ দিতে পারিনে। "mako use" করার সুবিধাবাদী মনোভাব দার্শনিক জগতের কায়দা নয়। কাজেই ফয়েরবাক না-জেনে না-বুঝে ডায়লেকটিককে বর্জন করেছিলেন—অর্থাৎ ফয়েরবাক নিবুদ্ধিতার দরুণই এ-ভুলটি করেছিলেন একথা মার্ক্সীয় বলে থাকেন বটে, কিন্তু একথা আদৌ স্বীকার্য নয়। কারণ, ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপর এতে কটাক্ষ বাঁকাভাবেও আসে এবং তা' ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা অপছন্দ করবেনই।

একথা প্রচলিত আছে যে একদা মার্ক্স নিজেই এই ডায়লেকটিক-কে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিলেন যে যুগে, সেই প্রথম যৌবনে মার্ক্স হেগেলীয় সবকিছুকে ঘৃণা করতে শুরু করে-ছিলেন। হেগেলীয় আদর্শবাদের প্রতি বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় ডায়লেকটিক নীতিও তাঁর বিতৃষ্ণার বিষয় হয়েছিল। ফলে যে-নীতি পরবর্তিকালে একদিন বিশ্বসংসারের মোক্ষ সাধনের সোনার সিঁড়ি বলে ভক্তি-ভাজন হয়েছে, সেই নীতিও মার্ক্স কর্তৃক ঘৃণিত ও বর্জিত হয়েছিল। অবশ্য ঠিক কবে থেকে যে মার্ক্স আবার একে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন, সে খবর আজ নির্ণয় করা কঠিন। প্লেখানভের কাছে এ সংবাদটি ঠিক রুচিকর হয়নি। মার্ক্স এককালে ডায়লেকটিক-বিদ্বেষী ছিলেন একথা মার্ক্সের অপ্রাকৃত (! , প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধহয় এঁরা মনে করেন। কিন্তু একথাকে যে একেবারে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, প্লেখানভ তাও সাহস পাননি। তিনি এ অপবাদ থেকে মার্ক্সকে বাঁচাবার জন্তে এই পরোক্ষ যুক্তি দিয়েছেন যে এঙ্গেলস্ এই নীতিকে ভিত্তি করেই লেখা সুরু করেছেন Deutsch-Franzosische Jahrbucher" নামক কাগজে।* কিন্তু

---

and Fengler in this matter of materialism is that they elaborated a sound method. When Fuerbach concentrated all his efforts upon the struggle against the speculative element in Hegel's philosophy he failed to appreciate & make use of the dialectical element……This gap was filled in by Mathew & Fengler, who understood that it would be a mistake, when criticising Hegel's speculative philosophy, to ignore his dialectic." (Fundamental Problems, p. 25, Plekhanov).

* "Although at the first glance there may

(শেষাংশ ৮৬৩ পৃঃ)

এঙ্গেল্‌স্‌-এর লেখায় যদি ডায়ালেকটিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে মার্ক্স-ও নিশ্চয় তাতে শরীক ছিলেন। ১৮৪৩-সনের গ্রীষ্মকালে মার্ক্স প্যারীতে গিয়ে আর্নল্ড রুগ-এর (Arnold Ruge) সঙ্গে সহযোগিতায় উক্ত নামে কাগজ বের করেন এবং সমাজতান্ত্রিক মতামত প্রচার করেন।

যাহোক, মার্ক্সের লেখা থেকে নজীর দিয়ে প্লেখানভ এ অপবাদের নিরসন করতে পারেননি। ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপরে অযথা কটাক্ষ না করে সেটি করতে পারলেই সুশোভন হ'ত। আর একথা বললেও মার্ক্সের প্রতিভার প্রতি কটাক্ষ করা হয় না যে ডায়ালেকটিকের মহিমাও তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে অনেক পরে। হেগেলের দার্শনিক মতকে বর্জন করবার সময়ে তাঁকে ডায়ালেকটিকের গুণগান করতে দেখিনে। প্রথম যুগে, তাঁর ডায়ালেকটিকের মর্মবোধের (appreciation) কোনো নিদর্শন আমরা পাইনে। দার্শনিক বিচারে তত্ত্বহিসেবে যদি ডায়ালেকটিককে তিনি নিখুঁত বলে বুঝেই থাকেন, তবে যখন হেগেল-দর্শনের সমালোচনা ও বর্জন তাঁর একমাত্র চিন্তার ও চর্চার বিষয় ছিল, তখন হেগেলীয় দর্শনের এই একটিমাত্র মহৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্তুতিবাক্য মিলে না কেন? যাহোক, এ কথা মনে করা যেতে পারে যে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত সুনির্দিষ্টরূপে গড়ে ওঠবার পরে এই নীতির কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল হয় এবং এর উপযোগিতাও তিনি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন। কাজেই পরবর্তী সময়ে তিনি এই ডায়ালেকটিককে হেগেলের দর্শন থেকে সমূলে উপড়ে এনে নিজের সমাজ-দর্শনের ওপরে কলম (graft) করে বসিয়ে দেন বা। কাজেই ১৮৪৭ সনের আগে ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে পরিষ্কার ও স্পষ্ট উল্লেখ বা আলোচনা মার্ক্সের লেখায় আমরা দেখতে পাইনে। ১৮৪৭ সনে লেখা "Poverty of Philosophy" নামক অর্থনৈতিক বইতে তাঁর ডায়ালেকটিকের উল্লেখ ও ব্যাখ্যান সর্বপ্রথম মিলে। অবশ্য ১৮৪৫ সালের শেষদিকে লেখা Eleven Theses-এর চার নম্বর Thesis-এও এই ডায়ালেকটিকের আভাস পাওয়া যায়। এখানে জড় ভিত্তির স্ব-বিরোধ (Self-contradiction of the material foundation) এবং বিরোধের-নিরসন (elimination of the contradiction) ইত্যাদি কথায় তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শনের মূলনীতির অগ্র-পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। এই থিসিসেই তাঁর সঙ্গে ফয়েরবাকের পার্থক্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে। অন্যান্য থিসিসে তাঁর বক্তব্যে মৌলিক বিশিষ্টতা তেমন কিছু দেখা যায় না এবং ফয়েরবাক থেকে তাঁর সত্যিকার পার্থক্য তেমন কিছু নেই বলেই ধারণা হয়। একথাও আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র তাঁর ৪র্থ থিসিসেই তাঁর বক্তব্য ও মতামত ফয়েরবাকের মতামত থেকে বিশেষভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই থিসিসে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এর সঙ্গে ফয়েরবাকীয় Being-Consciousness তত্ত্বকে (অর্থাৎ Inverted Hegelismকে) মিশাল দিয়ে ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক দর্শনের গোড়াপত্তন করা হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

seem good grounds for such an opinion, it is controverted by the before-mentioned fact that in the Deutsch-Franzosische Jahrbucher Engels was already treating the method as the very soul of the new system." (Plekhanov, Fundamental Problems, p. 26)

পুস্তক পরিচয়

মস্কোর চিঠি। শুভময় ঘোষ

গ্রন্থপ্রকাশ : ৫-এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

চার টাকা

১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের নির্বাচনে অনুবাদকের কাজ নিয়ে শ্রীশুভময় ঘোষ মস্কো গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকটি বাঙলা পত্রিকার মস্কো-সংবাদদাতা হিসাবেও তাঁকে দ্বিতীয় দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মূলত সেই সূত্রে লিখিত হলেও মস্কোর চিঠির সমুদয় পংক্তি লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা ও অনুরাগে আরও ঘরোয়া ও দীপ্তিমান হয়ে আছে।

রুশ-জীবন সম্পর্কে এতাবৎকাল পর্যন্ত একমাত্র বাঙালী ভাষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রুশ-দেশ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয় জন্মশতবর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন নথিপত্রের যে সঙ্কলন করেছিলেন তারও অনুবাদ করেছিলেন শুভময় ঘোষ।) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মস্কোয় ছিলেন দু-সপ্তাহকাল, চতুর্থ দশকের সূচনা মুহূর্তে, সেই রচনা যদিও আজ ক্লাসিক পরিগণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ব্যক্তিগৌরবে, বিষয় মাহাত্ম্যে নয়। তার প্রায় তিন দশক পরে শুভময় ঘোষের এই নিবন্ধিকাগুলি ওই অর্ধ পরিচিত দেশ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে অগ্রসর হলো।

বিশেষভাবে শিল্প ও সংস্কৃতিই তাঁর উপজীব্য, কিন্তু তার প্রসার অনেকখানি। একদিকে যেমন তিনি পদার্পণ করেছেন রুশ চরিত্রের অন্তরঙ্গ ভূপরিমণ্ডল, অপরদিকে তেমনি শিল্পের সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্তিকাপরিসর। ভাষা-সাহিত্য-স্থাপত্য ছাড়াও নৃত্য-নাট্য-গীতি-বিষয়ে অন্তত পাঁচটি রচনা এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, অপিচ প্রতিটি আলোচনাই মানবিক স্পর্শোত্তাপিত। গালিনা উলানোভা কিংবা ইয়ুরি শাপোরিন, ভাখতাং চাবুকিয়ানি কিংবা শস্তাকভিচ তাঁর সাক্ষাৎকারে পরিচিতজনের মতো আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর অন্তত একটি রচনার মধ্যে এক পরিপূর্ণ ব্যালে-কে তিনি অক্ষরে জীবন্ত করে তুলেছেন, 'বলশই এর রোমিও-জুলিয়েৎ' তাঁর রচনা-গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে আছে। যে-সাহিত্য বিষয়ে বিপ্লবোত্তর রুশদেশের উগ্র সাহিত্য পিয়াসীদের সমবেতভাবে ব্যথিত করে সে সম্পর্কেও কয়েকটি সযৌক্তিক খণ্ডন এই বইকে সমধিক মহার্ঘ্য করেছে।

সব মিলে 'মস্কোর চিঠি' সাম্প্রতিক রুশ জীবন সম্পর্কে একটি প্রত্যক্ষ ও বিনম্র দলিল, সাংবাদিক সপ্রতিভার সঙ্গে আন্তরিক আর্দ্রতা মিলে একাধারে আকর্ষণীয় ও অভিজাত। সর্বোপরি বিষয়গৌরবে 'মস্কোর চিঠি' বাঙালী পাঠককে যে প্রথম দর্শনেই জয় করে নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়ের গন্ধ। কাব্যগ্রন্থ। সামসুল হক

ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা

দাম : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উনিশ শ' পঞ্চান্ন থেকে সুরু করে উনিশ শ' চৌষট্টি— এই দশ বছরের সমষ্টিগত ফসল সামসুল হকের "হৃদয়ের গন্ধ" কাব্যগ্রন্থ। কবি সামসুল হক প্রধানতঃ রোমান্টিক কবি। কবিতার প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম বাঙলার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে—"দুলছে ধানগাছ অন্ধকারে। ছন্দে দোল খায় শাপলা ফুল"। 'ধানগাছ' কিংবা 'শাপলা ফুল' অথবা

'হিজলের পাতা'—কবি চেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ধরা পড়েছে। কবির মধ্যে স্বভাবতই ব্যথা রয়েছে। ব্যর্থতাকেও কদাচ তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সেই ব্যথা—ব্যর্থতার মধ্যেও সামসুল হক আশাবাদী কবি। তিনি বলেছেন—"অনেক অবুঝ রাতে একমনে তারা গুণে গেছি। আশা নিয়ে: একবার খান শিস নড়ে উঠে কিনা।" অথচ কল্পনার কোন রঙে জীবন সাজিয়ে আশার মধ্যে কবি বাঁচতে চান না। বাস্তবের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একান্ত পরিচিত ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করতেই তিনি ভালোবাসেন—"পুরাতন দীর্ঘশ্বাসে পাখা রেখে হয়তো অনেক দূরে কোন এক প্রাচীন শালিক / মেঘনা যমুনা কিংবা কোন স্মৃতিশুদ্ধ নদী দেখবার / আশা নিয়ে উড়ে যায়: হায়রে, অবোধ পাখী, তুই তোর নিজের দেহের / সমুদ্রে তাকিয়ে দেখ, নিজ পায়ে মেঘনা যমুনা সব মিলেছে সেখানে।" যে কোন বিষয়বস্তু এমনিভাবে কবির রোমান্টিক মেজাজে গ্রাম বাঙলার সহজ সরল প্রতীকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"হৃদয়ের গন্ধ" কাব্যখানি পড়তে গেলে খুব সহজ ভাবেই কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে। জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত গাঙচিল, সেই যুবতীর চাল ধোয়া হাতের গন্ধ সরাসরি এখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু কবি জীবনানন্দের কাব্যে যে একটা আধুনিক জর্জরিত আত্মার আস্বাদন পাওয়া যায় সামসুল হকের "হৃদয়ের গন্ধে" তা অনুপস্থিত। কোথাও কোথাও জীবনানন্দের প্রভাব এমনভাবে এসে পড়েছে যার থেকে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ না হ'তে পারলে—ভাবনার কথা। এ-দিক দিয়ে কবির আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করা বোধ করি উচিত ছিলো। "হৃদয়ের গন্ধ" নামাকরণ সম্পর্কে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখানে কেমন যেন সপ্রযুক্ত বলে মনে হয় না। প্রেমেন মিত্রের "সাগর থেকে ফেরা"'র অনুকরণে কাব্যখানির ছাপা-বাঁধাই পরিষ্কার। প্রচ্ছদ অত্যন্ত দুর্বল, কোনপ্রকার অর্থ বহন করে না। কাব্যখানির ছন্দ আগাগোড়া ত্রুটিহীন। প্রথম থেকে যেন ধীরে ধীরে একটা পরিপূর্ণতার দিকে কবির যাত্রা ভবিষ্যতে কবি সামসুল হকের আরও কাব্যগ্রন্থ পাওয়ার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম।

নীরদ ভট্টাচার্য

রম্য ও রস রচনা

চণক-সংহিতা

কালিদাস রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

মূল্য: ৩ টাকা ৫০ পয়সা

রম্য রচনা যখন অবাঞ্ছিত ছত্রাকের মত সর্বত্র গজিয়ে চলেছে তখন প্রবীণ বিদগ্ধ কবি কালিদাস রায়ের চণক সংহিতার মত একখানি গ্রন্থের সংস্পর্শে আসা ভাগ্যের কথা। কেননা যথার্থ রম্য রচনার সঙ্গে যে ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোত যা তথাকথিত বাংলা রম্য রচনার মধ্যে সুদুর্লভ, আলোচ্য গ্রন্থটিতে তার হৃদস্পর্শ পাওয়া গেল সুপ্রচুর। কবিশেখর মহাশয়ের যে সুমিষ্ট বহুদর্শী ব্যক্তিত্বের কথা, যে সরস সাহচর্যের কথা প্রবাদের মতো বহুশ্রুত তার পরিচয় মাখা আছে এর প্রতিটি নিবন্ধে—আর এটাই আমাদের মতে এই গ্রন্থের সর্বোত্তম প্রাপ্তি।

আর আশ্চর্য, এই গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' কথা মনে পড়লো অথচ ভেবে দেখলে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে মিল প্রায় কিছুই নেই। এখানে নেই কমলাকান্তের মতো চিত্তহারী কোনো চরিত্র, নেই তার তির্যক দৃষ্টির মতো কোনো দৃষ্টিকোণ, নেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহৎ সাহিত্যিকের নিপুণ মুন্সীয়ানা তবু যেমন বঙ্কিমের বহুবিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর প্রকাশ হয়েছিল পূর্বোক্ত গ্রন্থে শিক্ষক কবির জীবনের নানা জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতার সরস সুন্দর এই অভিব্যক্তির সঙ্গে তার শুধু এই কারণেই একটা সগোত্রতা আছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'চণক সংহিতা'য় দুই জাতের রচনা স্থান পেয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধে লেখকের জীবনে নানা সরস করুণ অভিজ্ঞতা যেন প্রায় গল্পের স্বাদ আনে। কৃতীছাত্র, পুত্রদায়, বাজার, জুতোচুরি, সাহিত্যিকের বিড়ম্বনা, কালনেমির লঙ্কাভাগ, কবির বিবাহ, অবসরের বিড়ম্বনা এই পর্যায়ের রচনা। গল্প জীবনেরই অভিব্যক্তি বটে কিন্তু তবু এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে জীবনে যাতে গল্পের রসের নিটোলতা নেই। এই রচনাগুলিকে প্রায় সেই পর্যায়ে ফেলা যায়। (তবু 'কালনেমির লঙ্কাভাগে'র মত দু একটি লেখা কি নিটোল গল্প হয়ে ওঠেনি?) কিন্তু জীবনের এক ঘনিষ্ঠ দার্শনিক উপলব্ধি, বহুদর্শী মানুষের জীবন সমালোচনা, শ্লেষাত্মক উক্তি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কৌতুক কটাক্ষ, অদৃষ্টের পরিহাসের মতো কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, যা রসের প্রয়োজনে গল্প থেকে প্রায়শঃই সযত্নে বর্জিত হয় অথচ জীবনের সঙ্গে যা ওতপ্রোত, তার এখানে অনায়াসে আনাগোনা। এর প্রমাণ হিসাবে আমরা 'কৃতীছাত্র' প্রবন্ধটিকেই পড়তে বলবো। মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা গ্রহণ বর্জন করতে করতে এগিয়ে চলি। কিন্তু এক সময়ে হয়তো সেই বর্জিত অতীত বাঘের মতো সামনে এসে দাঁড়ায় এখানে 'তারাপদ' যেমন এসেছে। তার পরেও হয়তো আপশোষের কিছু নেই, আত্মসংশোধনের প্রয়োজন থাকছে না তবু যেন মনে করতে বাধ্য হতে হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ঠিকমতো সত্য হয়ে ওঠেনি। হিসাবে কোথাও ভুল ছিল অথবা নিয়তির বিধানে রয়ে গেছে সে ভুল। এ অভিজ্ঞতাটা বিশেষ ক'রে বার্ধক্যের। আর প্রবুদ্ধ কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তা অনাবৃত হয়ে উঠেছে।

এই রচনাগুলির দ্বিতীয় বিশেষত্ব এর স্বল্প পরিসরে আশ্চর্য সজীব চরিত্রের সৃজন শক্তিতে। 'কৃতীছাত্রে'র তারাপদের কথা আগেই বলেছি। 'জুতাচুরি'-র অবিনাশ, সাহিত্যিকের বিড়ম্বনার সুরপতি ও কমলা 'কালনেমির লঙ্কাভাগে' অজয় ও অমৃত, 'কবির বিবাহে' কিংশুক ও মধুপ 'অবসরের বিড়ম্বনা'য় মিঃ ঘোষ এই সব নামাঙ্কিত চরিত্র ছাড়াও এমন অনেক চরিত্র আছে যার নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি কিন্তু দু একটি পংক্তিতেও তাদের বৈশিষ্ট্যও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল যেমন 'কবির বিবাহে' পীনাঙ্গী শিক্ষয়িত্রী অথবা 'বাজার' প্রবন্ধের সেই ক্ষীণ দৃষ্টি বৃদ্ধ বাজার-ভাই যিনি কলেরা ঠেকাতে পচা আলু বাছতেন সযত্নে। এরকম আরো অনেক ছোট বড় চরিত্র।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা প্রবন্ধের আকারটি স্পষ্টতর। একটি বিষয়ের বন্ধনে সমস্ত ভাবনাগুচ্ছ এখানে অন্বিত। 'চণক সংহিতা', 'বইয়ের আদর', 'নাম বিকৃতি', 'নামের মানে', 'মোটর' প্রভৃতি এই জাতের রচনা। লেখাগুলি সরস এবং অনেকের পক্ষেই শিক্ষনীয়ও নিঃসন্দেহে। সব মিলিয়ে 'চণক সংহিতা' গ্রন্থটি চণকের মতই স্বাদু ও পুষ্টিকর। প্রবীণ ভাবাসেবীর এই নূতন ফসল বাংলা দেশের রসিক সমাজে সাদরে গৃহীত হবে এই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থের অন্তর্গত রসানুগ অলঙ্করণের জন্য শিল্পী সুধীর মৈত্র আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদপট সুরুচিসংগত ও সুন্দর।

অমূল্য বসু

নাইভিস্যার বজরা—রূপদর্শী
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য তিন টাকা

এখন থেকে প্রায় ১৪০ বছর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গাত্মক নক্শা রচনা করেছিলেন। তখন

থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের সমকালীন জীবনকে নকশার মধ্যে সরস করে প্রকাশ করায় যারা সফল হয়েছেন রূপদর্শী তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভূত হওয়ার কালে তিনি জনজীবনের সুখ দুঃখের যে বিচিত্র আলেখ্য নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন তার মহৎ মূল্য পরিশোধনীয় নয়।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটিও নক্শাজাতীয় রচনা বটে, কিন্তু ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না। আর 'রম্যরচনা' নামধেয় কোনো সর্বব্যাপক সংজ্ঞা দিয়ে আর পাঁচজনের মতো আমরা এ বইটি সনাক্ত করতে চাই না। রম্যরচনা বস্তুতঃ অক্ষমের সাহিত্য প্রয়াসের দুরাশা কি না সেই বিরস বিতর্ক এড়িয়ে আমরা অনায়াসে একে রসরচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এক্ষেত্রে অন্ততঃ রম্যরচনার করপুটে আশ্রয় পেয়ে মান বাঁচানোর দায় নেই।

বাস্তবিক 'রসরচনা' কথাটির ভিতরে যে স্বচ্ছতা আছে, কাল্পনিকতার ধোঁয়াটে বেড়াজাল ভাঙা যে জীবন-মুখর আসক্তা, ভাষা ও শব্দের আতস বাজীর বদলে ঝরঝরে তরতরে পল্লীশ্রীর মতো একটা সহাস্য সারল্য আছে সেই সারল্য আদিম ও দুর্লভ। তাই ডেঙ্গু রোগের মতো রম্যরচনার এই প্রাদুর্ভাবের কালে রসরচনাকে পৃথক করে পুনর্চিহ্নিত করার প্রয়োজন বোধ করছি।

এই সব লক্ষণেই 'মাইডিয়ার ব্রজদা' ও চিহ্নিত। এর ভাষা ও প্রকাশের সহজ সরল সারল্য একে অসাধারণ স্বাদুতা দিয়েছে। রসরচনায় অবশ্যই কাল্পনিকতারও ঠাঁই আছে। উদাহরণ আলোচ্য বইখানিই। ব্রজরাজ কারফর্মার কীর্তি কাহিনী আষাঢ়ে গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। তবু যেহেতু এখন এমন আড্ডাজীবী গুলবাজ মুখেন মারিতঃ মানুষের অভাব নেই সমাজে, তাই সেই মৌল সত্যের আশ্রয়ে এই কাল্পনিকতা সকৌতুকে পুষ্ট হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্পে'র ঘনাদার মতই রূপদর্শীর ব্রজদা একটি বিচিত্র রসের ভাণ্ডারী। এবং ব্রজদার উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার উদ্ভট বিবরণ যারা পড়তে ভালবাসেন মাইডিয়ার ব্রজদা তাঁদের সেই কারণেই ভাল লাগবে। শার্লক হোমস্ ব্রজদা ব্যোমরাজ ব্রজরাজ, ব্রজশাল চালের গাছ, ব্রজলীন সাদা হওয়ার ওষুধ ইত্যাদি নানা অদ্ভুত কাহিনী পড়ে সুখী হবেন তাঁরা। গল্পগুলো হাসির চুটকী। সাহিত্যে যারা গভীরতর রসের সন্ধানী 'মাইডিয়ার ব্রজদা' তাদের জন্য নয়।

আসলে এগুলো গল্পও নয়। নকশাও পুরোপুরি বলা চলে কি? জীবনের যে বাস্তব বিবরণ ও অভিজ্ঞতা নক্শার মৌল উপাদান তার যতটুকু এর একটি কাহিনীতে মিলবে তারচেয়ে বেশি এমন এক লক্ষ কাহিনী পড়লেও পাওয়া যাবে না। 'গুল্প' নামই এর যথার্থবোধক। ব্রজদা ঘটিত বিচিত্র গুলের গল্প। গুল্প।

পরিশেষে আমাদের একটি নিবেদন আছে। 'মাইডিয়ার ব্রজদাতে' যদিও রূপদর্শী শ্লেষের ভঙ্গিতে বাংলাদেশের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বাক্যবাণ হেনেছেন কখনো কখনো তবু বারবার মনে হয়েছে 'এহ বাহ্য'। কেননা প্রথম আবির্ভাব কালে বাংলাদেশের বিচিত্র পর্যায়ের মানুষের যে নিগূঢ় জীবন রসের সন্ধান দিয়ে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন তার অভাব এখন তাঁর রচনাকে তুচ্ছ করে দিচ্ছে। এই ধরণের হাল্কা রচনার প্রয়োজন ও চাহিদা রয়েছে যদিও, তবু এর পাশাপাশি তিনি এমন কিছুও সৃষ্টি করুন যাতে জীবন সম্পর্কে সেই রকম গভীর অনুধ্যানের পরিচয় থাকে। কেননা যারা ভিন্নতর রসের পিপাসু তাঁদের তৃপ্ত করার শক্তিও তাঁর রয়েছে।

বইটির মুদ্রণ পরিপাটি। অন্তর্বর্তী চিত্র ও অহিভূষণ মালিক অঙ্কিত প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও তৃপ্তিকর।

অম্বুজ বসু

অমল-আরতি
সুশীল রায়
এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১-সি কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২
মূল্য : পনেরো টাকা

দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার বিষয় ছিল উনিশ শতক, এখন ভুজনের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু তৎকালীন স্মৃতি-কথা ও আত্মপ্রসঙ্গ, অতঃপর সুশীল কুমার দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সজনীকান্ত দাস-এরও পরে উনিশ শতকের অন্তরঙ্গ জীবন কোনো কোনো প্রযত্নে পুনর্গঠিত হয়েছে, আলোচ্য বইটি তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম। অব্যবহিত সফলতাটি বিশেষভাবে পাঠকের মনে আছে। আলোচ্য বইয়েরই প্রথমাংশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য উনিশ শতকের খ্রীস্টীয় ও কৃষ্টিগত অভিযাত্রার পুরোবর্তী যে-ব্যক্তিটির জীবনকাহিনীর আশু প্রনীয়ণ প্রস্তাব করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল শ্রীরামপুর মিশনের পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউন্টস্-ব্যতীত যাঁর পরিচয় কোথাও লেখা ছিল না সেই রামরাম-চরিত্র-কে আশ্রয় করে ঐ শতাব্দীর প্রাগুষা ও প্রভাতলগ্নের এক বিশদ অন্তর্জীবন প্রকটিত করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী। অন্তত তারপর পণ্ডিতী সরকলার বলয়ে নির্বাসিত পূর্বপুরুষ-দের সম্বন্ধে আমাদের সাধারণজনের আগ্রহ কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ হয়েছে, ইতিহাসের জটিল পৃষ্ঠান্তরালে প্রচ্ছন্ন-থাকা পূর্বকাল সম্বন্ধে মমতা একটু বেড়েছে—একথা বলা যেতে পারে।

কিন্তু আলোচ্য বইটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, শুদ্ধার্থে—নিছক অতীত-চারণাও নয়, বিশেষভাবেই বিষয়-ভিত্তিক। লেখককে সেজন্যে একটু ভূমিকাও করে নিতে হয়েছে। গোড়াতেই বলে নিয়েছেন তিনি : 'সতীদাহ-প্রথা নিয়ে বইটি লিখিত। এজন্যে এ'কে সতীদাহ-উপাখ্যান বলা যায়।' এবং সতী-দাহের যে অনন্ত জনশ্রুতি ইদানীংকালে ঈষৎ নিষ্প্রভ ও প্রসঙ্গবহির্ভূত হয়ে পড়েছে তাকে প্রোজ্জ্বল করে নেওয়ার জন্য একাধিক জলচ্ছিতার আনুপূর্ব সমারোহ তিল তিল ঘটাতে হয়েছে সর্বসমক্ষে। অপিচ, সেই বিস্মৃতপ্রায় সমস্যাটিকে প্রত্যক্ষবৎ ধারালো করে তোলবার জন্য উপক্রমেই এক তুলনারহিত সেডিজম্ নির্মম অগ্নিশিখার মতো আকাশকে গ্রাস করে নিয়েছে, তার সামনে পাঠকেরও নিস্তার নেই। সূচনার ওই সতীদৃশ্য একটি বালিকার জীবনে তার নিয়তির মতো গূঢ়মর্মপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর ওই ঘটনা স্পর্শ করবার পরক্ষণেই দীর্ঘ প্রায়-ছয়শত পৃষ্ঠার এই উপন্যাস অপরিহার্য এবং সাবলীল তরণীর তুল্য রূপ নেয় পাঠকের সামনে ; অধিক কি, গত শতকীয় ঐ বিষয় নিয়েবেই ত্বক-স্পর্শী সমস্যা হয়ে ওঠারও বিলম্ব ঘটে না।

তদানীন্তন হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিডে সাহেব শেষ সতীদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁর যে চাক্ষুষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন এই উপন্যাসের মূল কাহিনী ও মূল চরিত্র সেই সূত্র থেকে গড়ে উঠেছে কিন্তু সেই সূত্র কাহিনীর সূচনাবিন্দু নয় অন্ত্যরেখা, পরন্তু ঐ মূল কাহিনী ও চরিত্রের ভূমিকা অসামান্য হলেও অন্যতম. আরও অজস্র শাখা উপন্যস্ত হয়েছে ঐ প্রবাহেরই পাশে পাশে—নিজের নিজের এলাকায় তারা প্রত্যেকেই সম্রাজ্ঞীর মতো—শুধু মালতী নিরুপমা কদম আর ভামিনীই নয়. গাড়ব ভাতছালার দরিদ্র কুটীরপ্রান্তে জননীলালিত দুঃসাহসিকের সেই পৃথিবী, কুমারটুলির বটতলায় নবরত্ন মন্দিরের ছায়াচিত্রিত সেই কবিয়ালের পৃথিবী, বলাগড়ের কুঠিতে সদ্যোদগত জীবন-দিগন্ত বা রলিনসনের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে সদ্য-সমাগত বিদেশীসংঘট্ট, ফিরিঙ্গিদের পদভরে ক্লান্তবাস পল্লী-রাস্তার নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নবেলা অথবা সেই বহুকীর্তিত হরিণবাড়ি কি গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী সেই নিশীথপৃথিবী—তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে দাবী করে আমাদের। কেরি সাহেব থেকে কুঁজো সাহেব পর্যন্ত আলোকরেখা একটি আত্মনির্ভর

স্বগত বৃলয় তৈরি করে নেয়। বলা যায় ১৮০২ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত যে আঠাশ বছর এই আখ্যায়িকার বিস্তার তার সমস্ত ললাটরেখা কপোলকুঞ্চন ও ভ্রূভঙ্গী এখানে সমাহৃত হয়েছে। হয়তো একমুহূর্তের একটি কান্নার শব্দে অন্য সব প্রসাধন নিমেষে প্রক্ষালিত হয়ে গেছে এবং রামমোহন রায় শুরু থেকে শেষপর্যন্ত প্রত্যেকটি বিপথ থেকে উপন্যাসটিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। আর তৎসত্ত্বেও, এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় সতীদাহ-উপাখ্যান, কি—আগাগোড়া উনিশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের বিষাদার্ত্র মর্মতিপ্রোথিত বিচলিত উচ্চাশী ও উদ্‌যোগতাড়িত বাঙলাদেশের স্মৃতিকথা।

অন্তত একবার নিজমুখেই বলেছেন : ‘স্মৃতি নিয়ে রোদন করার ইচ্ছে আমাদের নয়। কিন্তু ইতিহাসের যাবতীয় স্বাক্ষর বুঝি উহ্য হয়ে যাবে, এই আমাদের ভয়।’ হয়তো এই আশঙ্কা থেকেই ইতিহাসের যাবতীয় উপকরণ এই ইতিহাসের উহ্য স্বাক্ষরগুলিকেও অবয়বমণ্ডিত করে তোলার দায়িত্ব লেখক স্বীকার করেছেন। এর জন্য যে বিপুল ঐতিহাসিক নিষ্ঠার প্রয়োজন তার প্রস্তুতিপর্বের সংবাদ আমরা আগেই জেনেছিলাম। উনিশ শতকেরই বিশেষ একটি অধ্যায় ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। কিন্তু একেবারে আলাদা এই পরিসরটিও তিনি অনায়াসেই জয় করে নিয়েছেন—তাতে ভুল নেই। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও তাদের প্রত্যেকটি উচ্চারণে, ঘটনা-বর্ণনায় ও মনুষ্যস্বভাববিশ্লেষণে, সংগৃহীত ও সঞ্চিত পদসমুচ্চয়ে—সর্বত্র অসাধারণ এক ঐতিহাসিক সতর্কতা টের পাওয়া যায়। প্রকীর্তিত ও আকল্পিত সমস্ত ব্যক্তি ও সংঘটনই এই সদাজাগ্রত সচেতনতায় সুরচিত। সেই ঐতিহাসিক সহগামিনীর বিস্তারিত চিতার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন উৎসারিত হয়ে উঠেছে স্পন্দমান এক জীবনকাহিনী—রাধা যার নাম, এবং সেই প্রৌঢ়া নায়িকার সমস্ত জটিল পরিণাম থেকে তার সরল বালিকাবেলার কল্পসন্দর্ভে পিছু হেঁটে যেতে একটি অপরিচিত উজ্জ্বল ভূভাগ আবিষ্কারের মতো ভালো লাগে। প্রায়-প্রতিযোগী নিরুপমা-আন্টুনির উপাখ্যানের বাল্যপ্রণয়ের অংশটুকুও অবগুণ্ঠিত তথ্যের মতোই ভরে তুলেছে ইতিহাসকে।

স্পষ্টই ধরা পড়ে ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পীর লেখনী এসে সংযোজিত হয়েছে এই উপন্যাসে। একটি দুটি আঁচড়েই দীপ্ত হয়ে উঠেছে ফরাসগঞ্জ-গরিটি-সোনাদিঘি-চুঁচুড়া-বলাগড় এবং ভাগীরথীর রহস্যাকীর্ণ তরঙ্গাভিঘাত। সজীব হয়ে উঠেছে সায়েবলোকের ফূর্তির ঘাঁটি ও বাণিজ্যের বন্দর। কবির আসর আর চড়কের মেলা। পোড়ো বাগানবাড়ির নিভৃতনিকেতন থেকে রক্তবিকিরিত বিলাসবাটিকা পর্যন্ত সমান অনায়াস পদক্ষেপে লেখক প্রবেশ করেছেন, কোথাও স্বেদবিন্দু ঝরেনি। সমান উত্তাপ ও নিস্পৃহতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বৈদান্তিক সভার কথোপকথন ও প্রাকৃতসমাবেশের খিস্তি খেউড়। আড্ডাধারী শ্রীপতি গোমস্তা হৃদয়নাথ এবং লেখক রামরাম বসু ফুটে উঠেছেন সমান আবেগে—কারও প্রতি লেখকের পক্ষপাত ভারি হয়ে বসেনি।

নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধি ঈর্ষণীয়। আরও ঈর্ষণীয় কৃতার্থতার সঙ্গে রচিত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সংঘটন। উৎসব ও প্রাত্যহিকতা। শান্তিপুরের রাশ কিংবা মাহেশের স্নানযাত্রা বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খসহ চলচ্চিত্রের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং একটি দুটি আঁচড়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিকোপম পুরুষেরা। আর সবার বাড়া ঐশ্বর্য নিয়ে বুঝি ফুটে উঠেছে সেই উনিশ শতকীয় উপেক্ষিতা রমণীসমাজ—তাদের শতার্চ বাসনা ও দাহসমেত। বিধুমুখী-বিরজা-কদম-ভামিনী-চাঁপা ও কানাগিন্নী-এরা তাদের সকল অপূর্ণতাসহ বইয়ের পৃষ্ঠা আপন্ন করে রাখে। অন্তত অন্তঃপুরিকাসম্বের রূপোচ্ছলতা ও রূপরস বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এত স্পষ্ট করে এত বিশদভাবে আর কোথাও পড়া যায়নি।

এই উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে সাম্প্রতিক কয়েকটি

বছরের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে অতিসতর্কভাবে। একটি নিটোল গোলক রচনার পক্ষে এই অধ্যায় নিশ্চয়ই অনিবার্য—অতীতের জন্মান্তরের পরিণাম আশ্রিত হয়েছে এখানে। এবং ঐ প্রসঙ্গ এই বইয়ের পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক ও আরও গভীর করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্তত এই স্থানে দাঁড়িয়ে একটি কালাতিক্রম দোষ জানাতে ইচ্ছা করে। যে বর্ণনাকে তিনি ১৯৫৬র বলে দাখিল করতে চেয়েছেন বর্তমান সমালোচকের চোখে সমস্ত দিক থেকেই তা অন্তত আরও দুই বা তিনটি দশক পূর্ববর্তী। এমন কি লেখক-বিজ্ঞাপিত একটি ঐতিহাসিক তথ্যও এখানে সমালোচকেরই যুক্তির সপক্ষে ব্যবহার করা যায়। যতদূর জানি কবিতার প্রথম মাসিকপত্র বলে যাকে তিনি আসন দিতে চেয়েছেন বীজাণু-নামধেয় সেই 'জীবাণু' প্রকাশিত হয়েছিল ষষ্ঠ দশকে নয়, তার অন্তত তিন দশক পূর্বে।

যাই হোক, এই ছিদ্রান্বেষণ নেহাৎই লঘুতাপ্রসূত, এবং যে দেশে সমাপন সর্বদাই মধুরেণ সেখানে এর স্থানও অবিসংবাদী। সুদীর্ঘ এই উপন্যাসের কচিৎ-কোথাও এক-আধটি লিপিপ্রমাদ হয়তো আমাদের চোখে পড়েছে, কিন্তু আগাগোড়া এর বিশালতায় ও এর দীপ্তিকিরণে আমরা অভিভূত হয়েছি। বাঙলাভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্তত এরপর নানারকম রমণীয় দিবাস্বপ্ন অনায়াসেই দেখা চলে, ভবিষ্যতের বাঙলা সাহিত্য নানা দিক থেকেই শ্রীযুক্ত সুশীল রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ রয়ে গেল। এই বইয়ের প্রচ্ছদপট আমাদের মনঃপূত হয়নি শিরোফলকগুলি গ্রন্থানুগ এবং সাহায্যকারী। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকটি নতুন উপন্যাস

ফেরাই
সমরেশ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
তিন টাকা

ময়ূরী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
তিন টাকা

'ফেরাই' সমরেশ বসুর একটি নতুন উপন্যাস। প্রথমেই ভাল লাগে উপন্যাসটির আঙ্গিকগত নতুনত্বে, নৈপুণ্যে। তাস খেলার উপমা দিয়ে সুরু ও শেষ বইটি কবিতার আনন্দে মন ভরে দেয়—আর প্রেমের মত দুর্বোধ্য ও প্রাচীন বিষয়টি এর মূল বক্তব্য হলেও সেই প্রেমের নতুন পরিপ্রেক্ষিত, নতুন ধ্যানধারণার আরোপে শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের শক্তিরই উজ্জ্বল রূপ চোখে পড়ে।

মধ্যবিত্ত ঘরের একটি শিক্ষিত মেয়ে তুলিকা ও চারটি পুরুষ—শিল্পী শিবেন, বিত্তবান সৌম্যেন, রাজনীতিক কর্মী সারদা আর কবি মিহিররঞ্জনকে নিয়ে এই উপন্যাস। ইবসেনের নোরার মত জীবনজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়েছে তুলিকা। আধুনিককালের যে কোন মেয়ের মতই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে 'কত ধানে কত চাল, সেকথা কি জানে শুধু সে, যে মাঠে লাঙল দিয়েছিল? ধান যে সিদ্ধ করেছে, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটেছে, কুলোয় করে ঝেড়েছে, সে কি কিছুই জানে না? চারজন পুরুষই চিঠিতে তাদের প্রেম নিবেদন করেছে তুলিকাকে। সেই চারজনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণের বেদী খুঁজেছে তুলিকা, নিজের সাহসকেই সে এই অনুসন্ধানের অবলম্বন বলে মনে করেছে।' অবশেষে সে কিন্তু প্রকৃতির আবেদনকেই মেনে নিয়েছে, সমর্পণ করেছে

আত্মভোলা সেই শিল্পী শিবেনের কাছে নিজের সমস্তই, যার স্পর্শে ওর অধরে একদা আগুন জ্বলেছিল।

শিবেনই তার যোগ্য কারণ তুলিকার ভাষায় 'তোমার মধ্যে ঝড় আছে। ভূমিকম্প আছে। মারী মহামারী আছে। বান-বন্যা আছে। তবুও তোমার কাছে এসেছি। তোমার মধ্যে প্রতিনিয়ত বাঁচবার সংগ্রাম আমার জীবন। ত্যাগ বল, গ্রহণ বল, আমি কোন চুক্তি সই করে আসব না।'

সমরেশ বসু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চির-পুরাতন প্রেমের একটি নতুন ছবি দেখিয়েছেন।

"**মঞ্জুরী**" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি গল্প-সংকলন। নরেন্দ্রনাথের প্রতিটি গল্পই আমার কেমন উপন্যাসধর্মী মনে হয়। আর একটু বিস্তার করলেই গল্পগুলি এক একটি উপন্যাস হতে পারতো। শৈলীর দিক থেকে নরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করের সরল স্বচ্ছ এবং তির্যকতাহীন দিকটিকেই বেছে নিয়েছেন, তাতে আধুনিক গল্প-পাঠকের মাঝে মাঝে ক্লান্তিবোধ হলেও গল্পের ধর্মের অপহৃতি ঘটে না। 'শাপ' ও 'দ্বিরাগমন' এই সংকলনের দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

আর্য দেব

আবহ সঙ্গীত : নীরদ ভট্টাচার্য

প্রতিমা পুস্তক ॥ মূল্য দুই টাকা।

নীরদ ভট্টাচার্যের আবহ সঙ্গীত একটি আশ্চর্য উপন্যাস। এই জন্য নয় যে, এর বিষয়বস্তু জাহাজীমানুষ এবং তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা. আর এই জীবন সম্পর্কে আমরা বাইরের মানুষ একেবারেই অনভিজ্ঞ। বিস্ময়ের কারণ, যে সব কথা আমরা জানতাম না, যে সব মানুষ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ছিল না। আবহসঙ্গীত এক শুদ্ধ রাগিণীর মতই আমাদের তার গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। পড়তে পড়তে মনেই হয় না কোন উপন্যাস পাঠ করছি, যেন ঘটনার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আর চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ডকার্সদের সেইসব বিচিত্র কাহিনী। এইখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা। নীরদ ভট্টাচার্যের এটি প্রথম উপন্যাস। সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত না হলেও লেখক হিসাবে তিনি নবীন। নবীন শিল্পী তাঁর আবহ সঙ্গীতে যে দরদ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন প্রবীণের পক্ষেও তা ঈর্ষার বস্তু। লেখক সম্পর্কে নামের মোহ কাটিয়ে যে কেউ এই উপন্যাস পাঠ করবেন আনন্দ পাবেন।

অসীম সেনগুপ্ত

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনিল রায়ের সয়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"···সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তনব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"··· (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

"···নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :— ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

স্বাস্থ্য ও
সুখের জন্য
পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবার গঠন করুন

পরামর্শ এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্যাদির জন্য আপনার নিকটবর্তী পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান।

মনে রাখবেন : ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

DA 64/482 (Beng)

জয়শ্রী

২৯ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭১

সম্পাদকীয়

গিরিজাশংকর রায় চৌধুরীর লোকান্তর

মননশীল প্রাবন্ধিক, প্রামানিক রচনাকার ও বিশিষ্ট মনীষী-জীবনী লেখক গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী অশীতি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলার জীবনবেদ রচনা করেছেন তাঁদের প্রমূল্যবোধ কৈশোর ও যৌবনে গিরিজাশংকরের দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করেছিল। জীবনের প্রথম যুগে বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি দেখেছেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে নারায়ণ কাগজটির পরিচালনায় ও ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছেন। বাংলার বরেণ্য সন্তানদের প্রভাবে ও সাহচর্যে তাঁর মননশীলতায় যে গভীরতা ও স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিতে যে স্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি নিজের প্রতিটি রচনার মধ্যে তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই গভীর মননশীলতার জন্যই বর্তমান রম্য রচনার জোয়ারের মধ্যেও পাঠক মহলের সংখ্যার কথা গ্রাহ্য না করে গিরিজাশংকর প্রামাণ্য ও চিন্তাশীল রচনার ক্ষেত্র থেকে নিজের কলমকে লক্ষ্যান্তরিত করে সহজলভ্য অর্থ ও যশের আকাঙ্খী হননি। বাঙালীর চরিত্র গঠনে এবং বাংলার স্বদেশী ও বিপ্লববাদী আন্দোলনের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে গিরিজাশংকরের 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী', 'রাজা রামমোহন রায়', 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গিরিজাশংকরের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। জয়শ্রীর সঙ্গে গিরিজা-শংকরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল, এবং এই কাগজেই তাঁর প্রখ্যাত ও প্রামাণিক প্রবন্ধ 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমান লঘুচিন্তার যুগে বাঙালীর পৌরুষ ও গাম্ভীর্যকে সঞ্জীবিত রাখার যে প্রয়াস গিরিজাবাবু করেছেন তাঁর দেহান্তরে সেই প্রচেষ্টায় একটি শূন্যতা সৃষ্টি হবে। বাংলায় জাতীয় মানস সৃষ্টির যুগ ও প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য গিরিজা-শংকরের রচনাবলী ভবিষ্যৎকেও প্রভাবান্বিত করবে

এ আশা আমাদের আছে। ব্যক্তিগত ক্ষতির বেদনাসহ আমরা শ্রদ্ধেয় গিরিজাশংকরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানাই।

কেরল নির্বাচন

কেরল নির্বাচনে কোনো দলেরই কিম্বা সম্ভাব্য জোটেরই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলেও কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ও ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগে ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং চীনা আনুগত্যের দ্ব্যর্থহীন অভিযোগ সত্ত্বের বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিস্ময়কর সাফল্যের পাশাপাশি দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টদের পরিষদীয় ক্ষেত্রে প্রায়-বিলুপ্তি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কংগ্রেস ১৩৩টি আসনেই অর্থাৎ সব কয়টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩৬টি আসন পেয়েছে। বাম-কম্যুনিস্টরা ৭৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি এবং দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা ৭৮-এর মধ্যে মাত্র ৩টি। কেরল কংগ্রেসের সাফল্যও লক্ষণীয় ৬০টি আসনের মধ্যে ২৪টি। আর, এস, পি ১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে সব কয়টিই হারিয়ে তাদের সহযাত্রী দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের শরীক হয়েছে। এস, এস, পি বামপন্থী কম্যুনিস্ট জোটের অংশীদারীর ফলে ২৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৩টিতে সফল হয়েছে। মুসলীম লীগ ১৬টি আসনের ৬টি রক্ষা করেছে। এ-ছাড়া স্বতন্ত্র পার্টি ১টি ও নির্দলীয়রা ১০টি আসন পেয়েছে।

ধর্ম ও সম্প্রদায় বিদ্ধ কেরল-রাজনীতির—এই রাজ্যে প্রভূততম সংখ্যক শিক্ষিত ও স্বাক্ষর ভোটার সত্ত্বেও—বিষচক্র এবারকার নির্বাচনী ফলাফলও জর্জরিত করেছে। ইড়াভা যারা কেরলে সংখ্যাধিক, সমাজে যারা অনুন্নত হরিজন পর্যায়ের, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শঙ্কর যে সম্প্রদায়ভুক্ত—নায়ার শিকায় বিত্তে, প্রতিপত্তিতে যারা কেরলের সমাজপতি, মন্নথ পদ্মনাভন যাদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস, খৃস্টীয় সম্প্রদায় প্রাক্তন কংগ্রেসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যাকো এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন —লীগপন্থী মুসলমান—এদের টানাপোড়েনের ধারা নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এই টানাপোড়েনের ভিত্তিতেই কংগ্রেসী দলে ভাঙন-গড়ন, অন্যান্য দলও যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। মুসলীম লীগের স্থায়িত্বও মালাবারে মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার অব্যাহত অভিযানে। তাদের আসন সংখ্যা '৫৭ সালে ৯টি, ৬০ সালে ১১টি, ৬৫তে ৬টি। ভোটের শতকরা হার যথাক্রমে ৪·৭, ৫·৯ ও ৩·৭।

কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৫৭ সালে ৪৩, ৬০ সালে ৬৩ ও ৬৫ সালে ৩৬, ভোটের শতকরা হার যথাক্রমে ৩৭·৮৪, ৩৪·৪২ ও ৩২·৫। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের পরিণতিতে ১৫ জন কংগ্রেসী সদস্য শঙ্কর মন্ত্রসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়ে এই মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। অতঃপর তৃতীয় বারের জন্য কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। এই বিদ্রোহী কংগ্রেসীরাই কেরল-কংগ্রেস গঠন করে এবং সরকারী কংগ্রেস তাদের বহিষ্কার করে দেয়। শঙ্কর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে কংগ্রেসের উচ্চতম মহলের অনিচ্ছা, মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের মধ্যে ইড়াভা ও নায়ার-খৃস্টান টানাপোড়েনে শঙ্করের ইড়াভামুখীন নীতিকে কামরাজের প্রশ্রয় দান ও নায়ার-খৃস্টানদের প্রতি বিমুখতা নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের ভাঙনকে পাকা করে তাদের এই বিপর্যয় ডেকে আনে। অবশ্য কামরাজ নির্বাচনে পরাজয়ের পরও তাঁর ইড়াভামুখীন নীতির সমর্থনে বলতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এক হিসাবে কংগ্রেস পূর্বের চাইতে শক্তিশালী হয়েছে। তার উক্তির সমর্থনে কামরাজ বলেছেন ১৯৬০ সনের নির্বাচনী ফলের সঙ্গে তুলনা না করে ১৯৫৭ সনের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী ফল তুলনা করতে হবে। কারণ ১৯৬০ সালের একটি মোর্চা গঠন করে কংগ্রেস কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। আর ১৯৫৭-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল একক। সুতরাং একক

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৩টি আসনের তুলনায় কংগ্রেসে বিভেদ সত্ত্বেও বর্তমান নির্বাচনে ৩৬টি আসন লাভ হয়েছে। অবশ্য কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে ৫৬টি আসন এবং শতকরা ৪১·৯ ভাগ ভোট ১৯৬০-এর ৬০টি আসন ১৯৫৭ সালের শতকরা ৩৭·৮৪ কিম্বা ১৯৬০-এর শতকরা ৩৪·৪২ ভোটের তুলনায় ম্লান না হলেও একথা স্মরণ রাখতে হবে কংগ্রেস-বিরোধিতার জন্যই কেরল-কংগ্রেসের ভোটের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাম-কম্যুনিষ্টদের সংশয়াতীত চীনা-আনুগত্য সত্ত্বেও এবং ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি সত্ত্বেও, তাদের এই সাফল্য, বিশেষ করে কারারুদ্ধ ২৯ জন প্রার্থীর নির্বাচন, অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। একথা সত্য যে ১৯৫৭ সনের শতকরা ৩৫·২৮ ও ১৯৬০ সালের শতকরা ৩৯·১৪ ভোটের তুলনায় ১৯৬৫-র বাম ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টদের সম্মিলিত শতকরা ২৭·১ ভোট সামগ্রিকভাবে তাদের শক্তির হ্রাস সূচিত করছে। কিন্তু চীনা আক্রমণের পর কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে জনমতের বিরূপতা, তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার নিরবচ্ছিন্ন অভিযোগ এবং সর্বোপরি তাদের দুই দলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই শক্তি হ্রাস খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কেরালার নির্বাচনী ফল নিঃসন্দেহে তাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্রতম অনাস্থাসূচক। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি, কেরলায় তার প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বাম-কম্যুনিষ্টদের সাফল্য সম্ভব করে দেশকে চীনা আনুগত্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারণ কেরলের ঢেউ সমস্ত দেশে সঞ্চারিত না হলেই আশ্চর্যের হবে। কেরলের রায়ের পর নির্বাচিত বাম-কম্যুনিষ্টদের জেলে একদিনও বিনাবিচারে আটক রাখার কোনো যুক্তি নাই। যদি তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকে তা সপ্রমাণ করতে তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা চলে, বিনা বিচারে আটক রাখা চলে না। এই ঘটনার পর সমস্ত দেশে বাম-কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিনাবিচারে আটকের ব্যবস্থার ভিতও একেবারে ধ্বসে গেছে বিনাবিচারে আটকের ভিত্ যদিও কখনই পোক্ত নয়। "আদালতে বিচার না হয় মুক্তি" এই দুইয়ের মাঝে কোনো বিকল্প ব্যবস্থাই অবশিষ্ট রইলো না। আর যে পথ অবশিষ্ট থাকে—এই দলকে বে-আইনী ঘোষণা করার যে পথ কেউ কেউ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সেই পথ গ্রহণের নৈতিক অধিকার থেকে কংগ্রেস চ্যুত হয়েছে—কারণ আজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি দুরন্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যসঙ্কট, ভাষাগত সংঘাত, কাশ্মীর ও নাগানীতির পরিণাম তার প্রত্যক্ষ ফল। একদিকে চীনা আক্রমণের উদ্যোগের মুখে দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিরোধের মানসিকতা, অন্যদিকে চীনা আনুগত্য বৃদ্ধির ভূমিকার সম্প্রসারণ—কংগ্রেসীনীতির এই দ্বৈত-সঙ্কট কেরলের নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে।

কেরলে স্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কেরল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের কোনো কোয়ালিশনে যোগ দানের বিরোধী। তবে তারা অ-কম্যুনিস্ট কোয়ালিসনের প্রতি সমর্থন জানাতে পারে। এই ধরণের কোয়ালিশন—কেরল কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ ও নির্দলীয়দের সমবায়ে গঠিত—সম্ভব হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অপর পক্ষে বাম-কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের কোয়ালিশন কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সমর্থন পাবে না হয়তো মুসলীম লীগেরও নয়। তারা যদি এই তিন দল ছাড়া অপর সকলের সমর্থন পায়, তাহলে তারাও কিছুদিনের জন্য সরকার গঠন করতে পারে। অবশ্য তাদের সঙ্গে মুসলীম লীগ যোগ দিলেও স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। কারণ সেক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী

কম্যুনিষ্টরা এই সরকারের পশ্চাতে দাঁড়াবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কেরলের অদৃষ্টে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষা করছে, যে শাসনের অবসানে ৬৭ সালের নির্বাচনের জন্য কেরলকে তৈরী হতে হবে। কিন্তু কেরলের আবর্ত সেই অবসরে সারা ভারতে বিস্তৃত হবেই।

এই দ্বন্দ্বে সমাজবাদীশক্তির কোনো বিশিষ্ট ভূমিকা নেই। পি, এস, পির১৯৫৭ র শতকরা ১৫'৮ ভাগ ১৯৬০ ১৪ ভাগ ভোট ১৯৬৫ তে এস, এস, পির ৫'৪-এ পৌচেছে। এস, এস. পির নির্বাচনী-নীতি কেরলের সমাজবাদী আন্দোলনকে অনিবার্যভাবে বাম-কম্যুনিষ্টদের লেজুড়ে পরিণত করেছে। পি, এস পির পুনরুজ্জীবন সত্ত্বেও সারাভারতের সমাজবাদী আন্দোলনকে কেরলার রাহুগ্রস্ত ভূমিকার কালো'ছায়া গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখবে কতদিনের জন্য কে জানে ?

লোকসভায় সি-বি-আই রিপোর্ট ফাঁস

লোকসভায় উড়িষ্যা সংক্রান্ত সি-বি-আই রিপোর্টের প্রতিলিপি ফাঁস করে দিয়ে প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীহরি-বিষ্ণু কামাথ যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন অন্য দেশ হলে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সরকারী গদী এরই মধ্যে ওলট পালট হয়ে যেত। কংগ্রেস ব্যতীত নিরপেক্ষ মহল এবং বিরোধীদল-গুলি সমস্বরে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সি-বি-আই রিপোর্ট প্রকাশের ঘটনাটি যেন এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়,—এরূপ একটি মনোভাব প্রকাশ করে রিপোর্টের ব্যাপারটি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

কয়েকদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী বলেছেন যে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীবীজু পট্টনায়কের কাজে কিছু নীতিগত অসঙ্গতি থাকলেও, তাঁরা সরকারী কর্তৃত্বের সুযোগে কোনরূপ অর্থকরী সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দ বলেছেন যে উড়িষ্যা সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ তদন্ত করা হয়নি,—শুধু কিছু দলীল সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু শ্রীকামাথ সি-বি-আই রিপোর্টের যে অনুলিপি লোকসভায় পেশ করেছেন তার মধ্যে লিপিবদ্ধ তথ্য ও মন্তব্যের সঙ্গে সরকারী বক্তব্যের কোন সঙ্গতি নেই। সি বি-আই রিপোর্টের যে অনুলিপি শ্রীকামাথ প্রকাশ করেছেন তা' মূল রিপোর্টের যথার্থ প্রতি-লিপি কিনা সে সম্বন্ধেও কোন স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কেন্দ্রীয় সরকার এখনও জানান নি। গোপন দলীল বা রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করতে বাধ্য নন,—এরূপ একটি ব্যুরো-ক্র্যাটিক পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে সরকার পক্ষ নীরব রয়েছেন।

যেহেতু সরকার শ্রীকামাথের পেশ করা সি-বি-আই রিপোর্টের যথার্থতা অস্বীকার করতে সক্ষম হননি এব যেহেতু এরূপ গোপন রিপোর্ট কিভাবে হস্তান্তরিত হোলো তার সূত্র সন্ধানে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য একথা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে সি বি-আই রিপোর্টের কপিটি মূল রিপোর্টের একটি নির্ভুল অনুলিপি। এই রিপোর্টটির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দ উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা' যথার্থ নয়। উড়িষ্যার ব্যাপারে তদন্ত করেও নন্দজী লোকসভায় বলেছেন যে কোন তদন্ত করা হয়নি। সদাচারী নন্দ নৈতিক প্রমূল্যের যে সদালাপ করে থাকেন, তাঁর সদাচারব্রত যে কত নৈতিকতাহীন এই ঘটনায় শুধু তাই প্রমাণিত হয়নি,—তিনি লোকসভায় অসত্য তথ্য পরিবেশনের দায়েও অভিযুক্ত হয়েছেন। অপর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীও একদিকে লোক-সভায় সি-বি-আই রিপোর্ট সম্বন্ধে লোকসভাকে শুধু যে ভ্রান্ত তথ্য পেশ করেছেন তাই নয়,—উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর অসদাচরণে এবং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তি-গত স্বার্থে অর্থলাভের সহিত কাজে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কারণ, রিপোর্টে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা

যায় যে সরকারী ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করে উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র ও শ্রীবীজু পট্টনায়ক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। রেলমন্ত্রী থাকা কালে শাস্ত্রীজী একটি রেল দুর্ঘটনার পরোক্ষ দায়িত্ব নিজের উপরে নিয়ে নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। উড়িষ্যার সি-বি আই রিপোর্টএর গোপনীয়তা এবং শ্রীবীরেন মিত্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন তা' দেশবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দলের মন্ত্রীকে রক্ষা করার থেকে জাতির ও প্রশাসনিক নৈতিকমান রক্ষার দায়িত্ব অনেক বেশী।

বাংলা দেশের শ্রীঅতুল্য ঘোষ উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী বীরেন মিত্রের পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর নির্দোষীতার ও সততার জন্য সাফাই গেয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সি-বি-আই রিপোর্টে শ্রীবীরেন মিত্রের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নৈতিক অপরাধে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীবীজু পট্টনায়কের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করা, অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও উচিত। অবশ্য এরূপ সততা ও নৈতিক মূল্যের প্রতি মর্যাদাদান,শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীবীজু পট্টনায়কের ক্ষেত্রে দেশের জনসাধারণ আশা করে না।

সি-বি-আই রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে লোকসভায় প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী। সংখ্যার দাপটে এই প্রস্তাব যে নাকচ হয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিধি, অন্যদেশের গণতান্ত্রিক নজীর এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে শাস্ত্রীজী ও নন্দজী এই রিপোর্ট সম্বন্ধে সচেতনভাবে সত্য গোপনের এবং একটি রাজ্যের অপরাধী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্রয় দেওয়ার নৈতিক অপরাধে অপরাধী। ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করার মানসিক শক্তি কি এই কংগ্রেস নেতৃত্বয়ের নিকট আশা করা যায়?

পশ্চিম বঙ্গের বাজেট

এবারকার পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে নূতন কর ধার্য হয় নাই এবং সরকারী কর্মচারীদের ও কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির বদান্যতাই সোচ্চারে বিঘোষিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার হার অযৌক্তিক বৈষম্য টেনে এনে এবং শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রচারে কিছুটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' নীতি অবলম্বন করায়—এই কৃপণ দাক্ষিণ্যের গৌরবটুকুও ম্লান হয়ে গেছে। শিক্ষকদের মহার্ঘ-ভাতার ক্ষেত্রে গবর্ণিং বডিগুলির দেয় অংশের দায়িত্ব—যা মাধ্যমিকদের ক্ষেত্রে—পাঁচ টাকা মাত্র সরকার নিজের ওপর নেননাই, পরিবর্তন এইটুকুই। অবশ্য পেন্সনের ক্ষেত্রে সহায়তার সম্প্রসারণ প্রশংসনীয় বটে।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বাজেটের প্রকৃত স্বরূপ কি? বাজেটের পরিণতিতে আর্থিক বিন্যাসে সাধারণের জীবনে পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধির দিকে না কমতির দিকে। বাজেটের সঙ্গে পরিবেশিত অর্থ নৈতিক সমীক্ষার রেখাঙ্কনেই তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির দরুণ রাজস্বের বৃদ্ধি, ততোধিক বৃদ্ধি রাজস্বখাতে ব্যয়ের মাত্রায়। মূল্যবৃদ্ধির অব্যাহত গতির চাপে জীবনমান নিম্নগামী—স্বল্পতম আয় বিশিষ্ট লোকদের ওপর তার আঘাত দুর্বার। পাইকারী দরের বার্ষিক গড় ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৩-৬৪তে ১২৮ পয়েন্ট থেকে ১৩৪-এ পৌঁছায়, অর্থাৎ বৃদ্ধির মাত্রা শতকরা ৪'৭ ভাগ। ১৯৬৪-৬৫ সালের মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধ্বগতি। স্বল্পতম আয়সম্পন্নদের জীবনমানের সীমানা-সূচক ১৯৬৪-এর মার্চ থেকে সে-বছরের অক্টোবরের মধ্যেই ১২৮'০ থেকে ১৩৯'৪-এ বেড়ে গেলো।

এই রাজ্যে মাথাপিছু আয়েরও সেই দশা। ১৯৬০-৬১ সালের ৩২০ টাকা ১৯৬৩-৬৪তে ৩১৫তে নেমে গেছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৫'৭ ভাগ। এই অসঙ্গতির বোঝা রাজ্যসরকার জনসংখ্যা

বৃদ্ধির ওপর চাপিয়ে দিয়ে দায় সেরেছেন। প্রশ্ন থেকে যায় সরকারের দায় কি সামগ্রিক উন্নতি নয়? তিন বছরে কয়েক শ কোটি টাকা পরিকল্পনার খাতে ব্যয় করে যদি মাথাপিছু আয় কমে যায়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র মা ষষ্ঠির দোহাই দিয়েই আত্মপক্ষ সমর্থন করে অক্ষমতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

বেকারীর পরিস্থিতিতে কি আশার সঞ্চার হয়েছে সরকারী বাজেটের প্রয়োগ কুশলতায়? না, তাও নয়! তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়ায় বেকার সংখ্যা যা ছিল তিন বছরে আরও তিন লক্ষ তার সঙ্গে জুড়ে মোট বেকার সংখ্যা দাঁড়াবে তেইশ লক্ষ। পশ্চিম বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্প কর্মসংস্থানের পীঠস্থান। এখানে মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত এবং মূলধন ও নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত পঁচিশ জনের কম বিশিষ্ট ক্ষুদ্রশিল্পে অপেক্ষাকৃত কম। এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রভূততর সুযোগ গ্রহণে সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হয় নাই।

এবার (১৯৬৫-৬৬) অনুমিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১৫২ কোটি টাকা, চলতি বছরের ১৯৬৪-৬৫ সংশোধিত বাজেটে এই অঙ্কের পরিমাণ ১৩৮ কোটি টাকা। সুতরাং রাজস্ব বৃদ্ধির আনুমানিক পরিমাণ একবছরে ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। রাজস্ব খাতে এবার ব্যয়ের মাত্রা ১৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। চলতি বছরের চাইতে ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বেশী। এবার রাজস্বখাতে ১৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি রাজস্ববহির্ভূত খাতে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ বাড়তি দিয়ে মিটিয়েও যে কিঞ্চিদধিক ৭ কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে এবারকার প্রারম্ভিক তহবিল ১৩ লক্ষ টাকা ভেঙেও তাকে সামলানো যাবে না। মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। অবশ্য বৎসরান্তে এই ঘাটতি হয়তো থাকবে না। আগামীবার দেখা যাবে এবারকার অনুমিত বাজেটের তুলনায় আগামী বছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায় অনেক বেশী হয়েছে। ঘাটতিও কমলো কিম্বা মুছে গেলো। আয় কম দেখিয়ে, ঘাটতির ভেল্কি তুলে ধরবার মামুলী রেওয়াজ নূতন কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন কর না বসাবার বাহাদুরীটা নিতান্তই ছেঁদো। উপরন্তু নূতনকরের জন্য কোনো ফাঁকই আর অবশিষ্ট নেই। দায়ে পড়ে অর্থমন্ত্রীর এই লোক দেখানো নূতন কর বিমুখতার পাশে সরকারী ব্যবসায়ে ক্রমাগত ঘাটতির অঙ্কগুলি কি তার কপট-কৈবল্যকে বিদ্রূপ করছে না। ১৮টি সরকারী ব্যবসায়ের মধ্যে ৮টিতেই লোকসানের কৃতিত্ব রয়েছে সরকারের। কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবসায়, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর ব্যবসা, টুরিস্ট বাস ব্যবসা প্রভৃতি নিশ্চিত লাভের ব্যবসাগুলিতেও লোকসান দিয়ে কর না বসাবার আত্মশ্লাঘা বোধ করেছেন অর্থমন্ত্রী। বকেয়া কর, কর ফাঁকিরোধে অক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে লোকসান – এই সবগুলি খাতের যোগফল নিঃসন্দেহে জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর! তবে এটা সরাসরি আদায় না হয়ে অনেক অলি-গলি পেরিয়ে এই মাশুল জনসাধারণকেই বহন করতে হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর না বসিয়ে বাজারে ঋণ সংগ্রহ করবেন ১০ কোটি টাকার। অবশ্য বাজার ঋণের সাহায্যে মূলধনী অর্থ সংগ্রহের নীতি অর্থনীতি-গ্রাহ্য হলেও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতি রাজস্বের ওপর ঋণের সুদ ও আসলের বোঝা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে তার প্রতিক্রিয়াও বিষময় হবে।

ফেডারেল কাঠামোতে অর্থবিন্যাসের ব্যবস্থায় রাজ্য-সরকারগুলির কেন্দ্র-নির্ভরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কেন্দ্রের আর্থিক আনুকূল্যের অভাব সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর বিলাপ তারই নিদর্শন। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট রচনার মুখে এই বিলাপ আর্তনাদে পরিণত হতে বাধ্য। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় তার যৌক্তিক উল্লেখও রয়েছে। পর পর তিনটি ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় কর বণ্টন ও অনুদানের

ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের উপর যে অবিচার করেছে চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের সিদ্ধান্তে তার কিছুটা সংশোধনের দাবী খুবই স্বাভাবিক। ১৯৫২-৫৩ সালে কেন্দ্রীয় কর ও সাংবিধানিক দায়বদ্ধ অনুদানের মাথাপিছু অংশের ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র দেশে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ১৯৬২-৬৩ সালে নবম স্থানে অবনমিত হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহের অন্যতম পীঠস্থান এই পশ্চিম বঙ্গ। এই বৈষম্যের মূলে কেন্দ্রের অবিচার যে পরিমাণে, রাজ্য সরকারের অক্ষমতাও সেই পরিমাণে বর্তমান।

এই অক্ষমতার নিদর্শন আরও সুস্পষ্ট হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিশ্রুত সাহায্য আদায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতা। এই রাজ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার বিনিয়োগের অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছিল ৩১০ কোটি টাকায়—প্ল্যানিং কমিশন দেবে ১৬০কোটি। জাতীয় সঙ্কট ঘোষিত হবার পর এই অঙ্ক ১৫১'৪ কোটিতে কমিয়ে আনা হয়। এই প্রতিশ্রুত অর্থ দিতেও কেন্দ্রীয় সরকার অনিচ্ছা দেখাচ্ছেন। এই অনিচ্ছার মূলেও রাজ্য সরকারের অক্ষমতা গভীরভাবে নিহিত রয়েছে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর প্ল্যানিং কমিশন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ১৯৬৩-৬৪ সালে কৃষিখাতে বরাদ্দের দুই কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অক্ষম হয়েছেন। সুতরাং তৃতীয় প্ল্যানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মোট বরাদ্দ থেকে দুই কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হবে। খাদ্যসঙ্কটের মুখে যে রাজ্যের কৃষিদপ্তরের উন্নয়নমূলক বরাদ্দের অর্থ অব্যয়িত থাকে, কোন নৈতিক অধিকারে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ ধ্বনিত করবে? উপেক্ষাই তাদের অভিশাপ। আজ এই অভিশাপ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের এই ফলশ্রুতি!

ভারত সরকারের নেতাজী 'অ্যালার্জী'

যে মহাক্ষত্রিয় ও বিপ্লবী নাম, ঐতিহ্য ও আদর্শ বর্তমান চরম সংকটের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য একান্ত অপরিহার্য সেই কর্তব্য পালনের সচেতনতা তো দূরের কথা নেতাজীর নামটি মুখে নিতে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নন্দজী যেন লজ্জা বোধ করেন। নেহেরুর যুগে নেতাজীর নাম নেহেরু-ভক্ত মন্ত্রী ও কংগ্রেসের কাছে চরম 'অ্যালার্জী' ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেহেরু-পর্বের অবসানেও সেই সংকীর্ণ মনোবৃত্তির প্রক্রিয়া থেকে কেন্দ্রীয়-সরকার নিজেকে এখনও মুক্ত করতে পারে নি। দিল্লীতে মহানায়ক নেতাজীর মূর্তি স্থাপনের কি ব্যবস্থা করা হলো সে সম্বন্ধে লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নেতাজীর নাম উচ্চারণ না করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাষায় সংসদ সদস্যদের জানান যে "তাঁদের উল্লিখিত অপর নামটি আমাদের মনে আছে।" অপর নামটি মানে নেতাজীর নাম। ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে গান্ধীজীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এবং আরেকটি মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ করা হচ্ছে,—তথাপি নেতাজীর একটি মূর্তি দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা আজও কেনকরা হলো না সেই প্রশ্নের উত্তরেই নন্দজী উক্ত উক্তি করেন। নেতাজীকে 'উল্লিখিত অপর নাম'—রূপে আখ্যাত করার প্রয়াস শুধু নন্দজীর ন্যায় কংগ্রেসী-দলের-দৌলতে-গদীয়ান একজন কেন্দ্র মন্ত্রীর পক্ষে চরম ঔদ্ধত্যেরই নিদর্শন নয়—একজন মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ গর্হিত আচরণ সমগ্র জাতির পক্ষে গ্লানিকর। ভারতের পরম প্রিয় নেতার প্রতি এরূপ উপেক্ষা-সূচক উক্তি করে নন্দজী সমগ্র ভারতবাসী ও ভারতপ্রেমের আদর্শকে অপমানিত করেছেন। এই ঔদ্ধত্যের জন্য নন্দজীর লোকসভা ও দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করা উচিত। শ্রীকামাথ সত্যই বলেছেন যে নেতাজীর নাম আজও কংগ্রেস সরকারের কাছে এক 'অ্যালার্জী' হয়ে রয়েছে। কবে যে দেশবাসী নেতাজীর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই উপেক্ষা ও 'অ্যালার্জী'র যোগ্য উত্তর দেবে,—তা আজ এক জলন্ত প্রশ্ন হয়ে রয়েছে এযুগের ভারতবাসীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি

বিদেশীর কাছে গীতাঞ্জলীর পাণ্ডুলিপি বিক্রি করার গর্হিত প্রয়াসের সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ায় অন্তত এইটুকু ভাল হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলি যে অযত্নে আছে এবং সেগুলি যে সংরক্ষণের প্রয়োজন দেশবাসী সেকথা জানতে পেরেছেন এবং বাধ্য হয়ে সরকারও বিশ্বকবির পাণ্ডুলিপিগুলি সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বলে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী চাগলা লোকসভাকে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের চব্বিশ বছর পরেও রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কোন ব্যবস্থা হয়নি। যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে তারা জানিয়েছেন যে সরকারী গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করেও কোন সদুত্তর বা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কোন সুব্যবস্থার সন্ধান তাঁরা পাননি, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীচাগলা জানিয়েছেন যে শুধু গীতাঞ্জলীর নয়, অন্যান্য রবীন্দ্ররচনাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলিও ক্রয় করে সরকারী মহাফেজখানায় সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

রবীন্দ্র রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রশ্নে অন্যান্য মনীষী ও সাহিত্যিকের পাণ্ডুলিপি রক্ষার বিষয়টিকেও দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন। এরূপ অনেক পাণ্ডুলিপিই আজ বিনষ্ট হতে চলেছে অথবা বিনষ্ট হয়েছে।

আমাদের দেশের মনীষী ও সাহিত্যিকদের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলি স্বদেশেই রাখা উচিত এবং নিছক আর্থিক প্রলোভনের বশে যদি কেউ কোন বিদেশীর কাছে এরূপ পাণ্ডুলিপি বিক্রয়ের চেষ্টা করে তা'ও নিতান্তই অন্যায় কাজ। বিশ্বমৈত্রী ও সাংস্কৃতির প্রীতি-বন্ধনের জন্য যদি কোন বিদেশী গ্রন্থাগার বা সংরক্ষণগারে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন মনীষীর রচনাবলীর কোন অংশ বা নমুনা দান করা হয় তা' হলে সেরূপ কাজ অন্যায় মনে করা অনুচিত।

আমরা আশাকরি রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মনীষীদের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত সুব্যবস্থা গ্রহণে সরকার তৎপর হবেন।

শিক্ষক ধর্মঘট ও সরকার

আর্থিক দুর্গতি কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছলে যে শিক্ষক সম্প্রদায় প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে রাজপথের উপরে গিয়ে অবস্থান ধর্মঘট করতে বাধ্য হন এবং সমাজের যারা ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, আত্মসম্ভ্রম ও নৈতিকতার ধারক ও প্রতীক তাঁদেরকে এরূপ বিক্ষোভাত্মক আন্দোলনের পথে ঠেলে দেওয়ার তাৎপর্য যে সমাজের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সে কথা অনুধাবন করার মত ক্ষমতা কায়েমী স্বার্থবাদী ও আমলাতান্ত্রিক কংগ্রেস সরকারের নেই, তাই, শিক্ষক সমাজের সংঘবদ্ধ ও বিপুল আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এঁদের দাবী দাওয়া গুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার সামান্যতম দরদী মনোভাবও সরকার দেখাতে রাজী হননি, এবং যে সতের দফা দাবী শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছিল তার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। যে তিনটি বিষয় সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন তার গুরুত্ব সমস্ত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গৌণ।

শিক্ষকরা খুব ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের দাবী দাওয়া চতুর্থ পরিকল্পনায় পূর্ণ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে সরকারকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কেন্দ্র থেকেনিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধেও কোন মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃত হয়েছেন। শিক্ষক সমাজের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য,—এই মৌলিক প্রশ্নটিকে বিবেচনা করার প্রয়োজন বোধ পর্য্যন্ত সরকারের নেই। যে অর্থ সরকার শিক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন তা'ও নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় না।—মাসের পর মাস জমা হয়ে থাকে।

১০।৩।৬৫

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায়

লীলা রায়

গত বারের পর

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি একথা ঐতিহাসিক সত্য। এর কারণ গান্ধী নেতৃত্ব, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ভূমিকাকে স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে একমাত্র অবিসম্বাদী কারণ হিসাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার অশোভন আগ্রহ ও অনুদার মনোভাব। ঐতিহাসিকদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এর ব্যতিক্রম - যতটা জানি একমাত্র ব্যতিক্রম— এই কারণে তাঁকে নেহেরু ও তাঁর সহধর্মীদের কেবলমাত্র বিরাগভাজনই হতে হয়েছিল তাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রন্থকারকে অধ্যক্ষ করে যে কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে সেই কমিটিকে পর্যন্ত বাতিল করে দেয়া হয়; এবং লোকসভার নিকট বিপরীত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারি পন্থায় স্বাধীনতার ইতিহাস লেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সেই ইতিহাসের সিদ্ধান্ত ক্ষমতাসীনদের পূর্ব-নির্দ্ধারিত ছক, ফরমাইস ও পছন্দমত হতে পারে—ঐতিহাসিক তথ্য বা যুক্তি-নির্ভর হওয়ার কোনো প্রয়োজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা মনে করেননি বা করেন না যদিও তাঁরাই নিজেদের "গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার" এ-মাত্র ধারক ও বাহক বলে স্থানে অস্থানে, কালে অকালে জাহির করে থাকেন। তবু চিরদিনের জন্য যেমন সকল মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না তেমনি সত্যকেও কিছুদিন ধামাচাপা দেবার প্রচেষ্টা আপাতঃ সফল হতেও বা পরে কিন্তু চিরদিন তা কখনই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ একটি জাতির ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট বিকৃত করবার হীন চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গ্রন্থকার গান্ধিযুগে ভারতের বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীকে দুটী স্তরে বিভক্ত করেছেন ১ম ১৯২৩-২৮ ২য় ১৯২৮-৩৪। সরকারি বিভীষিকা ও ব্যাপক গ্রেপ্তার ও কারারোধের ফলে ১৯১৭র পর বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ১৯১৯ এর ২৩শে ডিসেম্বর রিফর্ম সম্পর্কিত রাজকীয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়, ভারতরক্ষা আইনে আটক বন্দীদের সহ—মুক্তিলাভ করে কিছু কিছু প্রাচীন বিপ্লবীরা গান্ধিজীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দিলেন, কিন্তু অনেকেরই অহিংস আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সি আর দাশের অনুরোধে গান্ধিজীকে সুযোগ দিতে রাজী হয়েছিলেন; কিন্তু ১৯২২ সনে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করা ও গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের পর ১৯২২এর এপ্রিলে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীরা মিলিত হয়ে একটী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এসময়ে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ সাহস, দেশপ্রেমের প্রশংসা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগলো এবং অনুশীলন ও যুগান্তর দল ব্যতীত যুবক সূর্য সেন চট্টগ্রামে একটি নূতন দল

স্থাপন করে সমস্ত জেলায় তার শাখা সংগঠিত করলেন। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করবার চেষ্টায় গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হোলো। দক্ষিণেশ্বরে একটি বড় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হোলো এবং কলকাতার রাস্তায় নিয়মিত বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার বিলি হোতে লাগলো। গভর্ণমেণ্ট ভীত হয়ে ১৯২৪ সনে নূতন একটা অর্ডিনেন্সের বলে সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। উত্তর প্রদেশে হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়াসন অথবা আর্মি নামে বিপ্লবী দল গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতীয় সংযুক্ত রাষ্ট্র স্থাপিত করা এদলের লক্ষ্য ছিল। বিহার উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে এদের শাখা ছিল। বাঙলা দেশের অনুরূপ পদ্ধতি এসব প্রদেশে অনুসৃত হোত। উত্তর প্রদেশে রামপ্রসাদ বিসমিল দলের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ডাকাতি না করে কেবলমাত্র সরকারি অর্থ লুট করবার নীতি এসময় প্রবর্তন করেন। এসময়েই বিখ্যাত কাকোরি ট্রেণ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। সবিশেষ চেষ্টা ও ব্যাপক ধরপাকড়ের পর সরকার সমস্ত ষড়যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন, ৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবের জন্য ১৫ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। ৪জনকে মৃত্যু দণ্ড ৪ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজন রাজসাক্ষী সহ ৪ জনকে মুক্তি, অবশিষ্টদের ৫ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে, বিপুল আন্দোলন হয় কিন্তু তাদের প্রাণরক্ষার সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রামপ্রসাদ ও আশফাক-উল্লার ফাঁসী হয়ে যায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় এই দেশপ্রেমিক দুটী দিয়েছিলেন সমস্ত দেশ তাতে অভিভূত হয়।

১৯২৮ সালে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ হ্রাস পাবার জন্য আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হোলো এবং ১৯৩০ সালের Criminal Amendment Act ও অর্ডিনেন্সের মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিপ্লবী কার্যাবলীর মধ্যে পরিকল্পনা ও সফলতায় সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টতম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয়। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা সূর্য সেন বহরমপুর কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ১৯১৬ সনে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং ১৯১৮ সনে চট্টগ্রামে ফিরে এসে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও একটা বিপ্লবী দল সংগঠন করেন। শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য তিনি 'মাষ্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। এর মধ্যে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তির পর আত্মগোপন করেন কিন্তু ১৯২৮ সনে আটক বন্দীদের কারামুক্তির পর বহিসাহায্য ব্যতীতই সরকারের সহিত সংগ্রাম করা সম্ভব প্রমাণ করবার জন্য আনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি সহকর্মীগণ সহ সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও ইয়োরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাতে চট্টগ্রাম এক সপ্তাহ কাল বৃটিশ শাসন-মুক্ত স্বাধীন থাকতে পারে। স্থির হয় তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন না এবং যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করবেন। যাতে তাঁদের আদর্শ নূতন নূতন তরুণদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে প্রেরণা যোগায়। সশস্ত্র যুদ্ধের বিস্ময়কর নিপুণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নেতা সূর্য সেনের এই পরিকল্পনায়। ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ ভারতীয় রিপাব্লিকান পার্টি চট্টগ্রাম শাখার নামে ইস্তাহার বিলি করা হয় সমস্ত সহরে এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ দেবার পর সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা বৃটিশ শাসনকে ধ্বংস করবার জন্য প্রত্যেকটি ভারতীয়কে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান জানান হয়। রাত্রি ১০টায় ৪টা দলে বিভক্ত হয়ে কংগ্রেস অফিস থেকে বিপ্লবীরা বের হয়ে, পুলিশ অস্ত্রাগার এবং অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। টেলিগ্রাফ অফিস ও টেলিফোন আফিস আক্রমণ করে ধ্বংস করা

হয় তারপরে সমস্ত দলটি পূর্ণ মিলিটারী কায়দায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য সেনকে রাষ্ট্রপতি করে ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে ডেপুটি পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল প্রতি-আক্রমণ চালায় এবং বিপ্লবীরা সহর পরিত্যাগ করে পাহাড়ের দিকে যেতে বাধ্য হয়। বন্দরের একটি জাহাজ থেকে একটি বেতার বার্তা প্রেরণের ফলে ২০শে এপ্রিল বাইরে থেকে সরকারী সাহায্য চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছে ৫৭ জন বিপ্লবী প্রত্যেকে ১টি রিভলবার, ১টি পিস্তল ও ১টি বন্দুক সহ তিন দিন ঘুরতে ঘুরতে ২২শে সকালে জালালাবাদ পাহাড়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। তারপর শুরু হয় বিপ্লবীদল ও বৃটিশ সৈন্যদলের মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ। বৃটিশের মেশিন গানে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে ১১ জন বিপ্লবী মৃত্যু বরণ করে—বৃটিশ পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর ছিল যদিও সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কি অপরিসীম সাহস, দক্ষতা মনোবল, ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ভারতের এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল তার যথাযথ বর্ণনা করা যায় না। এই ঘটনা বিবরণ সমস্ত দেশে বিশেষ বাংলা-দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করলো। দলে দলে তরুনেরা বিপ্লবী দলগুলিতে যোগদিয়ে নানাভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করল। পুলিশের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতাদানের ফলে ১৯৩৩-৩৪ এই বিপ্লবাত্মক কাজে ভাটা দেখা দিল। Bengal Criminal Amendment Act আইন নূতন করে প্রবর্তণ করা হোলো এবং ২১৬৭ জন রাজনৈতিককে এই আইনের বলে নানাভাবে আটক করা হোলো। ১৯৩৪ এর একটি সরকারী রিপোর্টে দেখাবার সরকার বলছেন "শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে সর্বস্তরে বিপ্লবী মনোভাব ব্যপ্ত হয়েছে……গান্ধিজীর প্রত্যাশার সম্পূর্ণ পরিপন্থী শান্তি আন্দোলন অনেকক্ষেত্রে হিংসাত্মক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল শুধু তাই নয়……আইন অমান্যকারী হিসাবে যারা রাজনৈতিক জীবন শুরু করে ছিল তারাও ক্রমে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় মেয়েদের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করা একগুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা ১৯৩১ শে ১৫টি মেয়েকে বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেণ্ট আইনে কারারুদ্ধ করা হয়।

গ্রন্থকার তারপর বাঙ্গাদেশের বিভিন্ন সহরে বিশেষতঃ ঢাকা ও মেদিনীপুরে বিপ্রবাত্মক কাজের বর্ণনা দেন ইতিমধ্যে কুমিল্লায় শান্তিও সুনীতি নামে দুটি বালিকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করে। বিএ ছাত্রী বীণা দাস সার জন এণ্ডারসনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ভাষণ দেবার সময় গুলি করে। পুলিশ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দীদের মুক্ত করবার জন্য জেল ধ্বংস করবার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। সূর্য সেন প্রীতি উয়েদেদ্দার, কল্পনা দত্ত ও আরো ২জন সহকর্মীসহ চট্টগ্রামের পটিয়া গ্রামে সাবিত্রী দেবী নামে একজন বিধবার গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। ক্যেমিরুণ ঐ বাড়ী ঘেরাও করে, দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়, ক্যমিরুণ গুলির আঘাতে হত হয়, দু'জন বিপ্লবীও মারা যায়। কিন্তু সূর্য সেন প্রীতি ও কল্পনা পালাতে সক্ষম হন।

২২শে সেপ্টেম্বর প্রীতি ওয়েদেদ্দার এর নেতৃত্বে নৃত্যগীত রত বহু ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহ পাহাড়তলীর রেলওয়ে ইন্ষ্টিটিউট আক্রান্ত হয় এবং একজন মহিলাকে হত এবং ১৩ জনকে গুরুতর আহত করে প্রীতি রিভলবারের গুলিতে আহত হয়ে গ্রেপ্তার-এড়াবার জন্য পটেসিয়াম সাইনাইড্ গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করে। অন্যেরা পালিয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৩৩ শের ফেব্রুয়ারীতে সূর্যসেন চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী গইরালা গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন গুর্খা সৈন্যরা বাড়ীটা ঘেরাও করে, যুদ্ধ চলে, গৃহস্বামী ও তার ভাইর হত হয়, কিন্তু বিপ্লবীরা পলায়ন করতে সক্ষম হয়।

সূর্য সেন একটি পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মগোপন করার অবস্থায় একটি গুর্খা সৈনিক দ্বারা ধৃত হন। এই বীর বিপ্লবী অবশেষে বন্দী হলেন। যে গ্রামবাসী তাঁর আত্মগোপনের স্থান বলেদিয়েছিল পূর্ণ দিবালোকে তাকে হত্যা করা হয়। বৃটিশ মিলিটারী অফিসাররা এই অসীম সাহসী বিপ্লবীর সাহস এবং একজন মিলিটারি জেনারেলের উপযোগী দক্ষতার প্রচুর প্রশংসা করেছে। সাধারণ লোকের ভালবাসা শ্রদ্ধা কি ভাবে এই আত্মত্যাগী বিপ্লবীকে দীর্ঘদিন সঞ্জীবীত রেখে রক্ষা করেছে তার বহু কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। বিচারে সূর্য সেনের ফাঁসীর হুকুম হয় এবং তাঁর ফাঁসী হয়ে যায়। তাঁর জীবন ও কার্যাবলী চিরদিন ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে গৌরবোদ্ভাসিত করবে সন্দেহ নেই।

ফরাসী চন্দননগরে যেখানে বহু বিপ্লবীরা আশ্রয় নেয়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি বাড়ী যেখানে জেল পলাতক দুই বিপ্লবী নেতা আত্মগোপন করেছিলেন, ঢাকা জেলার দেওভোগে বিপ্লবীদের ও পুলিশের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশকে পর্যুদস্ত করে বিপ্লবীরা পলায়ন করে এ ব্যতীত ১৯৩১ সনে হিজলী বন্দীনিবাসে পাহারাদারদের গুলিতে দুজন বন্দী হত—ও ২০ জন আহত হয়।

বাঙলার বাইরে কাকোরি ট্রেন ডাকাতির পর উত্তর প্রদেশে পুলিশের যথেচ্ছ অত্যাচারের ফলে বিপ্লবী কার্যকলাপে ভাটা পড়ে যায়। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার একমাত্র আত্মগোপনকারী পলাতক চন্দ্রশেখর আজাদ বিপ্লবী আন্দোলনকে উত্তর প্রদেশে পুর্নসংগঠন করতে প্রয়াসী হন এবং তাঁদের দলের হিন্দুস্থান স্যোসিয়ালিষ্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়াসন নামকরণ করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এরা রুশ দেশের ঘটনা এবং বম্বাই, কলকাতা, কানপুরের শ্রমিক ধর্মঘট দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার নেতৃত্বে করবার কালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায়ও লাহোর পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন এবং এর অল্পদিন পরেই মারা যান, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন ভগৎ সিং সহকারি পুলিশ কমিশনার মিঃ সেণ্ডার্সকে হত্যা করে।৬

ভারতের বিপ্লবীদের আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং লক্ষ্যে পৌঁছাবার সাধনায় আর সবকিছুকে তুচ্ছকরবার ক্ষমতা তাঁদের প্রতিটি পরিকল্পনা ও কাজে প্রমাণিত হয়। এই সময় পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা হয়েছিল যে বিপ্লবীরা বিপ্লবাত্মক কাজ করে আত্মগোপন করে কিন্তু দেশবাসীকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভুগতে হয়। দেশবাসীর এই ভ্রান্ত মনোভাব দূর করবার জন্য হিন্দুস্থান স্যোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়াশন স্থির করেন যে দুজন বিপ্লবীকে কোনো বিপ্লবাত্মক কাজ করতে পাঠান হবে এবং তারা গ্রেপ্তার বরণ করবে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রথম এমন কোনো রোমাঞ্চকর কাজ করা যাতে যে রাজনৈতিক অবসাদ ভারতবর্ষকে পেয়ে বসেছিল তা দূর হয় এবং ২য় দলের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রভূততম প্রচার হয়ে দেশে বিপ্লবী মনোভাব বিস্তার লাভ করে।

১৯২৯ এপ্রিলের প্রথম ভাগে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় আইন সভায় শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার অধিকার খর্ব করবার জন্য Trade Disputes' Bill এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ রোধ করবার জন্য Public Safety Bill আলোচিত হচ্ছিল। স্বভাবতই সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি কেন্দ্রীয় আইন সভার দিকে ছিল। এমন ভাবে দুটি বোমা তৈরী করা হোলো যার দ্বারা কোনো মারাত্মক ক্ষতি হবে না। ঠিক হয় Trade Disputes' Bill যদি গৃহীত হয় তবে ভোট গণনার ফল ঘোষণা হওয়া মাত্র বোমা ফেলা হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিলের ভোট গণনা ঘোষণার পরমুহূর্তে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ২টি

বোমা নিক্ষেপ করে, রিভলবারের কয়েকটি গুলি ছোড়ে এবং লাল ইস্তাহার নিক্ষেপ করে। কেউ হত হয় না একজন কিছু গুরুতর ও ৪।৫ জন সামান্য আহত হয় সমস্ত এসেম্ব্লী হলে সদস্য, দর্শক ও কর্মচারীদের পলায়নের চেষ্টায় তাণ্ডব চলতে থাকে, বিপ্লবীদ্বয়ের পক্ষে পালাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা শূন্য হলে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সার্জেনরা এলে রিভলবার ফেলে দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে। দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দ্বারা এই শাস্তিকে তারা অভিনন্দিত করে। এই বিপ্লবাত্মক ধ্বনি এরাই প্রথম ভারতবর্ষে উচ্চারিত করে। লাল ইস্তাহার ও কোর্টে এদের দুজনের যুক্ত বিবরণী সমস্ত দেশে বিপুল প্রচার লাভ করে। এই লালইস্তাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্তাহার ছিল যাতে বিপ্লবীদের মানসিকতা, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালীর বর্ণনা ছিল। ফরাসী এনার্কিষ্ট ও শহীদদের বিখ্যাত উক্তি দ্বারা এই ইস্তাহার শুরু হয় "বধিরকে শোনাবার জন্য উচ্চ কণ্ঠস্বর দরকার" এবং ইতিহাসের শিক্ষাকে আমরা আবার জোরের সহিত উপস্থিত করতে চাই ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ কিন্তু ভাবধারাকে হত্যা করা কঠিন। বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার স্বপ্ন থেকে ইংলণ্ডকে জাগাবার জন্য। কেন্দ্রীয় আইনসভাতে তাদের তরফ থেকে আমরা বোমা ফেলেছি যাদের মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে ভাষাদেবার আর কোনো উপায় নেই। কেন্দ্রীয় আইন সভাতে ফেলা হোলো কারণ আমাদের প্রতিবাদ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জন্মাবধি যে নিজের অকর্মণ্যতারই শুধু প্রমাণ দেয়নি ক্ষতিকরবার ক্ষমতারও প্রচুর প্রমাণ দিয়েছে।" তারপর বোমাদুটি যে মৃত্যু না ঘটাবার পরিকল্পনা নিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং কি ভাবে তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে এবং যে কোনো শাস্তির জন্য তারা প্রস্তুত বর্ণনা করে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর ঘোষণা করে তুচ্ছ "ব্যক্তিকে ধ্বংস করে একটি জাতিকে ধ্বংস করা যায় না।"

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ লাহোরে একটি এবং সাহারাণপুরে আর একটি বৃহৎ বোমার কারখানা—আবিষ্কার করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দলের বহু সদস্য সহ সমস্ত নেতারা ধরা পড়ে যায়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় এবং বোমার মামলার সকল আসামীরা ১২ই জুলাই থেকে অনশন শুরু করে। বটুকেশ্বর দত্ত লিখিত বিবৃতিতে অনশনের দুইটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন "এই উদ্দেশ্য নীতিগত, সুবিধা আদায়ের জন্য নয়। আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য এবং আমরা যুদ্ধবন্দীর ব্যবহার দাবী করি, সাধারণ অপরাধীদের মত ব্যবহার নয়।" অনশন ভাঙাবার জন্য সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং দুমাস পর বন্দীদের অভিযোগ বিবেচনা করা হবে এই সরকারি প্রতিশ্রুতি পেয়ে যতীন দাস ব্যতীত অন্যান্য সব বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেন। যতীন দাসের নিউমোনিয়া দেখা দেয়া সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সহিত একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেন "আমি শেষ পর্যন্ত চালাব" এবং এই আত্মত্যাগী বীর তাঁর প্রতিজ্ঞানুযায়ী শেষপর্যন্ত অটল থেকে ৬৪ দিনের পর ১৯২৯, ১৩ সেপ্টেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সমস্ত দেশ এই অগ্নিহোত্রীর উদ্দেশ্যে বিপুল শ্রদ্ধায় আনত হয়। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্তেরা এই অনশনের পরে আদালতে বিচারের জন্য আসতে অস্বীকার করে এবং সরকার একটি বিশেষ অর্ডিনেন্স জারী করে, আইনের নিয়মকানুন বহির্ভূত যথেচ্ছ ক্ষমতা একটি বিশেষ ট্রাইবুনেলের হাতে তুলে দেয়, এর ফলে প্রকাশ্য আদালতে পর্যন্ত পুলিশ বন্দীদের মারধর করে। কয়েকমাস ধরে এই বিচারের প্রহসনের পর ৭ই অক্টোবর ১৯৩০ সুখদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিংকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, ৭ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং বহু

সংখ্যককে দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি দেয়া হয়। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা হিন্দুস্থান সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়াসনের উপর শেষ আঘাত হানল, জন ৬ এক আত্মগোপনকারী নেতা ব্যতীত প্রায় সব বিশিষ্ট সদস্য ও নেতারাই হয় মৃত না হয় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। আত্মগোপনকারীদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদ নামে এই দলের একজন নেতা অবশিষ্ট সদস্যদের একত্রিত করলেন। এদের প্রথম কাজ হোলো লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বড় লাটকে হত্যা করা এবং দিল্লীর নিকটে ১৯২৯ ডিসেম্বরে বড়লাটের বিশেষ ট্রেনকে বোমাদ্বারা ধ্বংস করার চেষ্টা করা হোলো, ট্রেনের ক্ষতি হোলেও বড়লাট অক্ষত রইলেন। এরপর চন্দ্রশেখর একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করলেন এরপর পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধিপেল এবং দিল্লীর নিকট একটা কারখানা এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করলো পুলিশ। যদিও চন্দ্রশেখরকে ধরতে পারেনি। মৃত বা জীবিত এই বিপ্লবীকে ধরবার জন্য দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হোলো। সংবাদ পেয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে সাদা পোষাক পরা পুলিশ চন্দ্রশেখরকে ঘেরাও করে। চন্দ্রশেখর গুলি করে দুজন উচ্চ কর্মচারিকে আহত করে, কিন্তু অন্যত্র গুলি বিদ্ধ হয়ে অবশেষে এই বীর বিপ্লবীর জীবনান্ত হয়। আজাদের মৃত্যু উত্তর প্রদেশের গুপ্তবিপ্লবী আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং অনেকে কংগ্রেস অথবা কমিউনিষ্ট দলে যোগ দিল কেউ কেউ পুলিশের সংবাদদাতা পর্যন্ত হোলো। কিন্তু এসত্ত্বেও উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, বম্বাই সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে ১৯৩০-১৯৩৪ পর্যন্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। এই সময়কার একটা সরকারি রিপোর্টে বলা হয় "সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম বাংলা দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে এর অস্তিত্ব যেখানেই দেখা গেছে সেখানেই এর উৎসে দেখা গেছে বাঙ্গালীদের প্রভাব। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত অন্যকোনো প্রদেশে এত বিস্তৃতভাবে এর অনুকূল মনোভাব দেখা যায় নি।" গ্রন্থকার বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত। জাতীয় জীবনে এই আন্দোলনের প্রভাব পরিমাপ করবার জন্য উপযুক্ত তথ্যের সহিত এই অন্তর্দৃষ্টি নিঃসন্দেহ অপরিহার্য। এসম্পর্কে গ্রন্থকার যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন সে সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি "স্বদেশী যুগে যে বিপ্লবী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা গেছে কখনো ধীরগতি কখনো প্রবলভাবে গান্ধিজী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তা চলেছে। একটা সশস্ত্র ও অপরটা অহিংস এই দুইটী ধারা পাশাপাশি চলে এসেছে এবং পরস্পরকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করেছে।" অনেক পুরোণো বিপ্লবীরা বয়সের স্বাভাবিক প্রভাবে বিপ্লবী আন্দোলন পরিত্যাগ করে হয় রাজনীতি থেকেই বিদায় নেন না হয় গান্ধি শিবিরেই থেকে যান। কিন্তু তরুণতর দল "বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বিপ্লবী আদর্শ বৃদ্ধিই পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রশস্ততর হয়ে জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হয় তাদের এবং গান্ধিজী অনুসৃত অহিংসা ও বৃটিশের সহিত বোঝাপড়ার নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তাদের মনে বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত করবার প্রয়াস করে। ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির অনশন অনেক পরিমাণে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আদর্শকে প্রচারিত করবার জন্যই করা হয়েছিল। বটুকেশ্বর দত্ত তাঁর বিবরণীতে বলেছিলেন "বিপ্লবী আন্দোলন জাতির রাজনৈতিক প্রচেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বিপ্লবীরা জীবনদান করে জাতির সচেতনতা বাড়াবার জন্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপেক্ষা

নেতারা বৃটিশের সহিত আলাপ আলোচনায় অধিকতর বিশ্বাসী. বোমা নিক্ষেপ, অনশন ইত্যাদি আমরা করি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করবার জন্য।” গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন এই সকল পন্থা অবলম্বন দ্বারা যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছিল যতীনদাসের অনশনে এবং ভগৎ শিং এর ফাঁসী কাঠে মৃত্যুবরণে দেশময় উত্তেজনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন তার প্রমাণ। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দেশের আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোতে লাগল এই সকল ঘটনায়। বিপ্লবী মনোভাবের প্রসারে এসব বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯২৯ শের করাচি কংগ্রেসে গান্ধিজীকেও এই মনোভাবের নিকট নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এই সময় আর একটী বিশিষ্ট ঘটনা দেখা দিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ইডিওলজি স্পষ্টতর ভাবে সংযোজিত এবং বিস্তৃততর ভাবে প্রচারিত হোলো। এ বিষয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যুক্ত ইস্তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। “ভারতের বাহ্যিক প্রশান্তির নীচে একটী ঝড় ভেঙ্গে পড়বার জন্য গুমরিয়ে উঠছে। আকাশচারী অহিংসার নিষ্ফলতা আমরা প্রমাণ করেছি এবং আগামী দিনের বংশধরদের এসম্বন্ধে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।”

অহিংসা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে “বলপ্রয়োগ যখন আক্রমণাত্মক ভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে হিংসা আখ্যা দেয়া সঙ্গত এবং নৈতিক দিক দিয়ে এ অ-সমর্থনীয়। কিন্তু যখন কোনো ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এ ব্যবহৃত হয় তখন এ সম্পর্ক ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক সমর্থনযোগ্য। বলপ্রয়োগকে সর্বপ্রকারে বর্জন করার নীতি অবাস্তব ও কাল্পনিক।” বিপ্লবের সর্বাঙ্গিন আদর্শও এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে দেখাদেয় “বিপ্লব কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক নয় এর গঠনমূলক দিকও রয়েছে এবং কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সরিয়ে ভারতে রিপাব্লিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতেই তারা চায়নি তার সঙ্গে “সমাজতান্ত্রিক” এই আখ্যাটী দলের নামের সহিত যুক্ত করে রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ণয়েও অগ্রসর হয়েছে।

এই আদর্শগত পরিবর্তন নিঃসন্দেহ ক্রমবর্ধমান কমিউনিষ্ট প্রভাব সূচিত করে কিন্তু এ সময় পর্যন্ত এই প্রভাব সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তা-প্রত্যয়ী ছিলো এবং বিপ্লবীরা এই সময়ে ১৯৭২ এর অনুরূপ জাতীয় আদর্শ ও স্বার্থকে আন্তর্জাতিকতা বা অতি-জাতীয়তা দ্বারা প্রভাবিত হতে দেয় নি। এর সঙ্গে সঙ্গে এই সময় বিপ্লবীরা বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবাহারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এটাও বিপ্লবী ভাবধারার পরিপোষক ছিল।

সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অসম সাহস ও আত্মত্যাগের সহিত অনন্যসাধারণ কৌশল ও নিপুণতায় একটী পূর্ণাঙ্গ মিলিটারি অভিযানের বিস্ময়কর নিদর্শন বলে বিবেচিত হবে। গ্রন্থকার লিখছেন জাতির উপর এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারি।

১৯৩৫এ রিফর্ম চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র ও অহিংস উভয় প্রকার আন্দোলনেরই ধার কমে যায়। এবং ১৯৪২এ গান্ধিজী যখন আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃ প্রবর্তিত করতে ইচ্ছা করেও হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাবার জন্য পারেননি তখন বিপ্লবী মনোভাবের আবার প্রাদুর্ভাব হয় এবং সশস্ত্র আন্দোলন অহিংস আন্দোলনকে পরাভূত করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৯৪২ এর “ভারত ছাড় আন্দোলন বিপ্লবী মনোভাব ও কৌশলের সহিত গান্ধিজী প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের সংমিশ্রণের ইতিহাস। ভারতের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সর্বশেষ সংগ্রামে এই উভয় ধারা পরস্পরের পরিপোষক হিসাবে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৩৫ এর গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টকে ভারতবর্ষের

সর্বশ্রেণীর জনমত বর্জন করে। মডারেট দলের নেতা সি আই চিন্তামণি মন্তব্য করেন "বিগত দীর্ঘ বছরগুলির আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলশ্রুতি দেখে ভারতীয় জনমত স্তব্ধ হয়ে গেছে। মডারেট দলসহ বহু শ্রেণীর জনমত মনে করেছে এই ধরণের সংস্কারের চেষ্টা না করাই বরং ভাল ছিল।"

এই এক্টে ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোলো। এবং উড়িষ্যা ও সিন্ধু নামে দুটি নূতন প্রদেশ গঠিত হোলো। কেন্দ্রে ফেডারেল পদ্ধতি প্রবর্তন করবার পরিকল্পনা নিয়ে প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান করা হোলো এবং এই প্রথম তাদের আইন সঙ্গত ব্যক্তিত্বের প্রবর্তন হোলো এবং সকল প্রাদেশিক বিষয়গুলি জনমতের আয়ত্বে আনা হোলো। তবে গভর্ণরদের হাতে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোলো মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও আসামে দুই কক্ষ যুক্ত আইন সভা গঠিত হোলো। অফিসিয়াল ব্লক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ ভিত্তিক সদস্যপদ রহিত করা হেলো কিন্তু সাম্প্রদায়িক আসন বিভাগে পুণাপ্যাক্ট অনুযায়ী পরিবর্তনসহ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা Communal Award গৃহীত হোলো। উর্দ্ধতন আইন সভার জন্য বহু পরিমাণে উচ্চতর মান সহ সম্পত্তি ভিত্তিক সদস্য যোগ্যতা রয়ে গেল। নিম্ন আইনসভার জন্য নিম্নতর সম্পত্তির মান নির্দ্ধারিত হওয়ার ফলে ভোটারদের সংখ্যা চারগুণেরও বেশী বাড়লো।

কেন্দ্রে ফেডারেশন তখনি চালু করা হবে বলে স্থির হোলো যখন দেশীয় রাজ্যের শাসকবর্গ—দেশীয় রাজ্যের পূর্ণ জনসংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক প্রতিনিধি হিসাবে ইনস্ট্রুমেন্ট অব একশেসন দ্বারা রাজী হবে যাদের জন্য কেন্দ্রীয় উচ্চতর সভায় অর্দ্ধেক সদস্যপদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাজেই প্রদেশে দ্বৈত শাসনের অবসান হলেও কেন্দ্রে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা রাখা হোলো। এই অংশ কোনোদিনই চালু হয়নি কেন্দ্রীয় আইনসভা পূর্বের মতই চলতে লাগলো। কেবলমাত্র ফেডারেলকোর্ট, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ফেডারেল রেল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হোলো। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যর্থতা গান্ধিজী উপলব্ধি করলেন এবং মন্তব্য করলেন "The masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in the process of transmission"……এবং সবিশেষ চিন্তা ভাবনার পর স্থির করলেন যে এর পর ব্যক্তিগতভাবে গান্ধিজী ব্যতীত আর কেউ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে না। অন্যেরা গঠনামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন, উপরোক্ত মর্মে একটা বিবরণী লিখে গান্ধিজী "সত্যাগ্রহের শবযাত্রার' ব্যবস্থা করলেন। এই সময়ে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট কংগ্রেসীরা সকলপ্রকার অত্যাচারী আইন প্রত্যাহার এবং গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজী কর্তৃক যে জাতীয় দাবী উত্থাপিত হয়েছিল তার সপক্ষে সরকারি সংস্কার পরিকল্পনাকে বর্জন করবার প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য স্বরাজ্যদলকে পুনরুজ্জীবিত করে আগামী আইনসভার নির্বাচন লড়বার প্রস্তাব করেন। গান্ধিজী স্বরাজ্যদলের নির্বাচন লড়বার জন্য পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব কেবলমাত্র যে অভিনন্দিত করলেন তাই নয় তিনি মন্তব্য করলেন "that it was not only the right but the duty of every Congress man who believes in its utility to do so" যে প্রস্তাব ১৯২৩এ গৃহীত ১৯২৯এ পরিত্যক্ত হয়েছিল তা ১৯৩৪এ পুনরুজ্জীবিত করা হোলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজীর পরামর্শ গ্রহণ করে ১৯৩৪, ২০শে মে সরকারি ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলো।

একটী কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হোলো কিন্তু আলোচনায় গোটা সংস্কার পরিকল্পনা ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে মতামতে মূলগত পার্থক্য দেখা দিল মদনমোহন মালব্য ও এস এন এ্যনি একদিকে, অন্যান্যরা অপর দিকে। বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হলো। মোট ২৫০টী আসনের মধ্যে ১১৯ মুসলমান ও হিন্দুরা ৮০ পেল। স্বভাবতই মুসলমানরা রোয়েদাদের অনুকূলে ও হিন্দুরা প্রতিকূলে ছিল। এমনকি জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও এই রোয়েদাদের অনুকূলে গেল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মতভেদ থাকার দরুণ কংগ্রেস ঐ সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি অবলম্বন করলো যতদিন এই মতভেদ দূর না হয়।

ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ নেতিবাচক আত্মহত্যাকারি মতামত দেখে গান্ধি-নেতৃত্বের অবাস্তবতা ও অদূরদর্শিতা অতি প্রকট ভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধিজীর বিরুদ্ধমত গ্রহণ করবার কথা কেউ ভাবতেও পারতোনা। দেশের স্বার্থের অপেক্ষা গান্ধিজীর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যই তাদের নিকট বড় হোলো—কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালে এরাই অতি হেলায় গান্ধি নেতৃত্ব পরিত্যাগ করলো অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। কিন্তু তখন অবস্থা আয়ত্বের বাইরে। বারানসীতে ২৭—৩০ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হওয়াতে মালব্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে হিন্দুমত ক্রমবর্দ্ধমানভাবে চলে গেল। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ খোলাখুলি ভাবে বর্জন না করায় তাদের এতদিনের জাতীয়তা-বাদী আদর্শ সম্বন্ধে বলবার আর মুখ রইল না। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন 'গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করেছেন সময়ে অসময়ে ঘোষণা করে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো মীমাংসা তিনি গ্রহণ করবেন না যা মুসলমানদের সমর্থন পাবে না" ফলে কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের হাতে ভারতের সাংবৈধানিক অগ্রগতি সম্বন্ধে "ভিটোর" ক্ষমতা এবং জিন্নার হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার দেয়া হোলো যা তিনি বিশেষ কৌশলের সহিত ব্যবহার করলেন এবং গান্ধি ও কংগ্রেসের এই মনোভাবই যে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিলো এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় একেই বলা হয় "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি" যাতে একজনের বাস্তবতাহীন মতের যূপকাষ্ঠে একটি জাতির সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বলি দেওয়া হোল।

তারপর গান্ধিজী ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ এর ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেস ত্যাগ করবার ইচ্ছা ঘোষণা করে ১৭ই সেপ্টেম্বর একটা দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন যাতে তিনি চরকা খাদি মদ্যপাননিরোধ ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিলেন।

গান্ধিজীর যুক্তি ও কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাবের পৃষ্ঠপট আর যাই হউক কংগ্রেসীদের সচেতন যুক্তিপূর্ণ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ১৯৩৪, ২৬-২৮ অক্টোবর বোম্বাই কংগ্রেসে কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রে সদস্যদের যোগ্যতার সর্তে পরিবর্তন করা হোলো গান্ধিজীর মতানুযায়ী কিন্তু তারপরই গান্ধিজী ঘোষণা করলেন তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও থাকবেন না।

কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনের পর দেখাগেল সরকার পক্ষ ৪০ জনের বেশী সদস্যের সমর্থন পাবেন না। দুই বার বাজেট এসেম্ব্লীতে পরাজিত হোলো কিন্তু এতে কিছু কার্যকরী ফল হোলো না কারণ বড়লাট সরকার বিরোধীদের ভোটে পরাজিত বিলগুলি সার্টিফাই

করে পাশ করলো। কংগ্রেস হিন্দু মুস্লীম ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে যেতে লাগলো কিন্তু বিশেষ ফল হোলো না। সরকার বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমন করবার নীতি অব্যাহত রাখলেন এবং একমাত্র বাংলাদেশেই আটক বন্দীদের সংখ্যা ২৭০০ এ উঠলো। সরকারের প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় বন্দীদের আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-কর্তৃক অর্থ সংগ্রহে সরকার যখন বাধার সৃষ্টি করলো।

১৯৩০-৩৫ বৃটিশ সরকার ও গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে না এ কথা বলার ফলে মুসলমান নেতাদের সুবিধা হোলো এবং জিন্না বিশেষ কূটনৈতিক চালের সহিত এই অবস্থাকে কাজে লাগালেন। মুস্লিম লীগের তরফ থেকে "১৪ দফা" সর্ত দেওয়া হোলো। ১৯৩৬ এর নির্বাচনে জিন্নার নেতৃত্বে মুস্লিম লীগ ব্যতীত, পাঞ্জাবে সার ফজল ই হোসেনের ইউনিয়নিস্ট দল, বাংলায় ফজললহকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাদল, যুক্ত প্রদেশে ছত্রীর নবাবের জাতীয় কৃষক দল, সিন্ধুতে আব্দুল্লা হারুণ এবং বিহারে সৈয়দ আব্দুল আজিজ লীগের সহিত হাত মেলাতে অ-রাজী হলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফ্‌ফর খান কংগ্রেস-ধর্মী খুদাই খিদমৎগার দল গঠন করলেন।

মুস্লিম লীগের নির্বাচন ইস্তাহারে কংগ্রেসের সহিত বহুবিষয়ে সাদৃশ্য ছিল কিন্তু আসল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল তার শেষ অংশে "পৃথক সত্তা হিসাবে মুসলমানদের উন্নয়ন তাদের ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টিকে অগ্রসর করতে লীগ আগ্রহশীল এবং মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার দ্বারাই কেবলমাত্র তা সম্ভব।" লীগ এর পর থেকে মুসলমানদের এক ভিন্ন সত্তা হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং এই ঐক্যবদ্ধ সমষ্টির ভালমন্দ মুস্লিম লীগের বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করতে এবং এ ব্যাপারে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ অপছন্দ করতে লাগলো।

১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ উভয়ের দাবীই ভ্রান্ত প্রমাণিত হোলো, ৪৪০টী মোট মুস্লিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ২৬টী পেল তার মধ্যেও অধিকাংশই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমৎগার দলের। প্রমাণিত হোলো মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব নেই। মুস্লিম লীগের দাবীও যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হোলো, কারণ বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গুলিতেই বিশেষভাবে মুস্লিম লীগের পরাজয় লক্ষিত হোলো। বরং প্রভাবশীল মুস্লিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে মুস্লিম লীগের উল্লেখ-যোগ্য জয় হোলো। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন হিন্দুপ্রধান প্রদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তারা মুস্লিম লীগকে সমর্থন করেছে কিন্তু মুস্লিম প্রধান প্রদেশে তার প্রয়োজন ছিল না। যখন মুসলমানরা তাদের সমস্যাকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেখতে অভ্যস্ত হোলো তখন মুস্লিম লীগ মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল প্রতিষ্ঠান—বলতে গেলে একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে—দেখা দিল। জিন্নার প্রধান কৃতিত্ব অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে রাজনৈতিক চেতনা মুসলমানদের মধ্যে দিতে পেরেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত ও অন্যায় উভয় বিধ প্রচার ও কার্যক্রম দ্বারা এ সম্ভব হোলো, আর কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিশেষভাবে জওহরলাল নেহেরুর অবাস্তব আত্মম্ভরিতা একে সাহায্য করলো। লীগের সহিত সময় থাকতে কোনো বোঝাপড়া না করে পরবর্তীকালে লীগের নির্দিষ্ট সর্তে রাজী হয়ে পাকিস্তানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বোঝাপড়াতে বাধ্য হোলো। ১৯৩১শে কানপুর দাঙ্গা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাস্থানে দাঙ্গা হোলো ও কয়েক শত লোক হতাহত হোলো।

অন্যদিকে ১৯৩৫-৩৬ এ আইন অমান্য আন্দোলনের পর কংগ্রেসে গান্ধিজীর প্রভাব হ্রাস পেল যার ফলে ১৯৩৪ বম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে 'শান্তিপূর্ণ এ ন্যায়সঙ্গত' শব্দগুলির পরিবর্তে গান্ধিজীর অনুমোদিত 'সত্য ও অহিংসা' গৃহীত হোলো না। এই সময়েই সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। ১৯৩৪এ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় এবং বামপন্থী দলগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের প্রমাণ পাওয়া গেল। কৃষক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল এবং কিছু পরিমাণে শ্রমিকদের মধ্যেও জাগরণ দেখা দিল। এই সময়ে নিখিল ভারত কিষাণ সভা. নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির জন্ম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট দল কংগ্রেসের অভ্যান্তরে তরুণদের সমর্থন সংহত করতে শুরু করলো। কমিউনিষ্ট দল বেআইনী ঘোষিত হওয়ার ফলে কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট দলে যোগ দিয়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ ব্যবহার করতে লাগলো। সমাজতান্ত্রিকদের জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু এই দুইজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। এসময়ে নেহেরু Whither India নামীয় প্রবন্ধে সামাজিক ও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অনুকূলে এবং সর্বপ্রকার শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা ও স্থিতস্বার্থ অবসানের জন্য আবেদন করেন। ১৯৩৩, ১৮ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে বলেন "I do believe that fundamentally the choice before the world to-day is one between some form of Communism and some form of Fascism, I am all for the former, that is Communism......there is no middle road between Fascism and Communism. One has to choose between the two & I choose the Communist ideal."

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রবসুর মতামত উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রন্থকার বলছেন সুভাষচন্দ্র বসু নেহেরুর মতকে ভ্রান্ত মনে করতেন যেহেতু এই দুইটি মতবাদের মধ্যেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই বরং এই উভয়ের মধ্যে একটি সমীকরণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষই তা আবিষ্কার করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

নেহেরু ১৯৩৬ এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কমিউনিস্ট মতবাদের সপক্ষে ওকালতি করাতে এই মতবাদ প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্রয় পেল। কংগ্রেসে গান্ধিবাদেরই প্রাধান্য যা কমিউনিজমের ঘোরতর বিরোধী। জওহরলাল তাঁর মতবাদের সমর্থন কল্পে নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং অচ্যুত পটবর্দ্ধন এই তিন জন সমাজতন্ত্রীকে ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্য হিসাবে নিলেন। গান্ধিপন্থীরা ওয়ার্কিং কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং নেহেরু নিজের অবস্থা বুঝে পদত্যাগ করতে রাজী হয়েও অনুরোধে তা প্রত্যাহার করলেন। ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জওহরলাল গান্ধিজীর মতবাদকে গ্রহণ না করেও তাঁর অনুগামী হলেন। উল্লেখযোগ্য পরবর্তী বৎসর ১৯৩৬, ডিসেম্বর ফৈজপুরে কংগ্রেসে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়ে নেহেরু সমাজতন্ত্রী সদস্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট শক্তিদের নিন্দা ও বিশ্বের পদানত গণসাধারণ বিশেষভাবে ইউ এস, এস, আর এর সহিত ঐক্য ঘোষণা করতে রাজী হননি। তাঁর মতের এই পরিবর্তনে জন্য দায়ী নিঃসন্দেহ গান্ধিজীর প্রভাব। অতএব লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি ফৈজাবাদে ঘোষণা করলেন কংগ্রেস পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সমাজতান্ত্রিক নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। এধরণের মতামতের অ-দৃঢ়তা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে কি না তা আজকের দেশ-হিতৈষীদের নিশ্চয় নূতনকরে ভাবতে হবে।

১৯৩৭ এর নির্বাচনের ফল নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোলো। কংগ্রেস জনসাধারণের সংস্পর্শে এলো এবং এর ফলে জনতার রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়লো। প্রায় ৩২ কোটী ভোটার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলো। হাজার হাজার মেয়েরা তাদের নামসই করে ভোট দিল এবং আরো হাজার হাজার নিরক্ষর পুরুষেরা সত্ত নামসই করা শিখলে। সে সকল প্রদেশে কংগ্রেস আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো সে সব প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে এ আই সি সি অনুমতি দিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিকট এই স্বীকৃতি চাওয়া হোলো যে মন্ত্রীদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে গভর্ণরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না গভর্ণরগণ এই সর্তে স্বীকৃত হবার অধিকারী ছিলেন না। যাহোক শেষ পর্যন্ত বহু বিবরণী ও প্রতি-বিবরণীর পর বড়লটের একটি বিবরণী দেবার পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলো এবং কংগ্রেসের কার্য্যসূচী অনুসরণ করে জনসাধারণের কল্যাণকর বহু আইন কার্যকরী করলো। বাংলা ও পাঞ্জাবের অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও জনসাধারণের কল্যাণকর আইন সমূহ পাশ করে সাধারণের অবস্থার উন্নতি করতে প্রয়াস পেলো।

৫টি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো অন্য দুটিতে মাত্র একজন কিংবা দুইজনের সমর্থণ লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হোলো। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহে কেবলমাত্র কংগ্রেস দল থেকেই মন্ত্রী গ্রহণ করা স্থির হোলো, ফলে মুস্লিম লীগের মত সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের হয় কংগ্রেসে যোগদান অথবা দেশের শাসনে অংশ গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করা ব্যতীত উপায়ন্তর রইলো না। এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তপ্রদেশে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হোলো। এই প্রদেশে মুসলমানরা মাত্র ১৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় কেবল মুসলমানদের মধ্যেই নয় এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের তুলনায়ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল প্রধানতঃ এই প্রদেশে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি এবং মোগলযুগের স্থানীয় ঐতিহ্যের জন্য। এমন সব প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী মুসলমান ছিলেন যাঁদের নাম সারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলো। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পরে মোট ২২৮ আসনের মধ্যে ৬৪টী আসন পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য রক্ষিত ছিল। মুসলিমলীগ ২৬টী নির্দলীয় মুসলমানেরা ২৮টি, ৯টা জাতীয় কৃষক দল এবং মাত্র ১টী কংগ্রেস পেল। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কংগ্রেস ও লীগের কর্মসূচীতে মূলতঃ কোনো পার্থক্য ছিল না। দুই প্রতিষ্ঠানের নেতারা কম-বেশী ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ থেকে নির্বাচন লড়েছিলেন এবং একটী অলিখিত অথবা সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া ছিল যে মন্ত্রী সভায় দুটি আসন মুসলমানরা পাবে। কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুস্লিমলীগের দুইজন সদস্যকে এমন সর্তে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে কংগ্রেস স্বীকৃত হোল যার ফলে মুস্লিম লীগকে ভেঙ্গে দেয়া এবং তার সদস্যদের কংগ্রেস দলে যোগদানেরই সামিল হোয়ে দাঁড়ায়। "দেশে দুটি মাত্র দল আছে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার" নেহেরুর উক্তি বলে প্রচারিত এই মন্তব্যের বাস্তব রূপায়ণে গিয়ে দাঁড়ালো। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন কোনো বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ একথা বিশ্বাস করবেনা যে মুসলীম লীগ তার আলাদা অস্তিত্ব বিনষ্ট করে কংগ্রেসের আদেশে রাজনৈতিক হারিকিরি করবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবই সূচিত করে ফলও হয়েছিল মারাত্মক। মুসলমানরা বুঝলো কংগ্রেসে পৃথক সম্প্রদায়

হিসাবে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এবং কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্ত যে উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ পৃথক পথ অবলম্বনের এবং ক্রমে ক্রমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণ হোলো সে বিষয় সন্দেহমাত্র নেই।

নেহেরুর এইরূপ অবাস্তব মনোভাব এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রগল্ভতা যে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে কত অপ্রত্যাশিত পথেই না ভারতবর্ষকে পা বাড়াতে বাধ্য করেছে—হয়তো ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তার যথার্থ মূল্যায়ণ করবেন

গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি প্রায় হাস্যোদ্দীপক। মুস্লিম লীগের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি মুস্লিম লীগকে বর্ণনা করেছেন "a small upperclass organisation controlled by feudal elements" এবং মন্তব্য করেছেন" it had no influence on the Moslem masses & was hardly known by them. বৃটিশেরা ঠিক এই ধরণের মন্তব্য ও ধারণা কংগ্রেস সম্বন্ধে করতো। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন নেহেরু তাঁর নিজের তৈরী এক অবাস্তব পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো যোগ ছিলনা। "জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রকে কংগ্রেস দুইটি প্রধান স্তম্ভ" এবং কংগ্রেসকে পৃথিবীর মধ্যে "শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান" আখ্যা দেয়া অত্যন্ত অসময়োপযোগী হয়েছিল। মার্চ ১৯৩৯ ত্রিপুরী কংগ্রেসে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাব গ্রহণ ও গান্ধিজীকে কংগ্রেসের একনায়ক করার পর কংগ্রেসে গণতন্ত্রের অবশিষ্ট আর কিছু ছিল না। গ্রন্থকার আরো মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐক্যের উপর জোর দেবার সময় নেহেরু বিস্মৃত হয়েছেন যে ১৯১৬ সনে গান্ধিজী খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থণ করে "মুসলমানেরা সর্বপ্রথমে মুসলমান এবং পরে ভারতীয়" এই মতবাদকে সমর্থণ জানিয়েছেন এবং গান্ধিজীর এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক সত্তার সৃষ্টি হয়। এই কাজের পর কংগ্রেসের পক্ষে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে মুস্লিম লীগের সঙ্গে একত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার না করার পক্ষে কোনো যুক্তিই ছিল না এবং মুস্লিম লীগকে প্রত্যাখ্যান অত্যন্ত অবিবেচনা প্রসূতই শুধু নয়, খুবই যে বিপদজ্জনক হোলো তা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কংগ্রেস নেতারা আরো ভুল করলেন এই ভ্রান্ত ধারণা করে যে মুস্লিম লীগের দেশে বিশেষ কোনো প্রভাব নেই, যা সামান্য রয়েছে—তা নষ্ট করা সহজ. মুস্লিম জনতাকে কংগ্রেস-মুখী করবার জন্য কংগ্রেস একটা পৃথক মুস্লিমগণ সংযোগ-বিভাগ খুলল এবং কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতি সম্পর্কে মুস্লিম জনসাধারণকে সচেতন করবার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা হোলো। উচ্চশ্রেণীদের সম্পর্কে প্রচার খুব উঁচু নৈতিক মানের ছিল না। তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল কোনো মুসলমান যদি লীগে থাকে তবে সারা জীবন তাকে নিষ্ফলতা ভোগ করতে হবে ক্ষমতা ভোগে সরীক হবার কোনো সম্ভাবনাই তার থাকবেনা কারণ কংগ্রেস কখনো লীগের সঙ্গে হাত মেলাবেনা, যদিবা অন্যান্য মুস্লিম দলের সহিত সহযোগিতার কথা সে চিন্তা করতে পারে।

জিন্না এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং বিশেষ প্রতিভার সহিত কংগ্রেসের মুস্লিম-বিরোধী নীতিকে আক্রমণ করে, কংগ্রেসকেই অপরাধী প্রমাণ করলেন। "কংগ্রেস তার দাম্ভিক উক্তি সত্বেও মুসলমানদের জন্য কিছুই করেনি এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব জন্মাতে অসমর্থ হয়েছে।" সর্বশেষ একটি মূল্যবান উক্তি করলেন জিন্না যে সমানে সমানেই বোঝাপড়া হতে পারে এবং যতদিন না উভয় পক্ষ পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভয় না করে ততদিন বোঝাপড়া সম্ভব নয়" জিন্না এই সময় ঐক্যবদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ও হিন্দু কংগ্রেসের পরম শত্রু হিসাবে দেখা দিলেন।

ভাগ্যের পরিহাস যে কংগ্রেসের প্রচারের ফলে জিন্না ও লীগ মুসলমানদের চক্ষেবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। মুস্লিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পরই পাঞ্জাব, বাংলা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে মুসলিম দলগুলি যারা এতদিন লীগের বাইরে ছিল তারা মুস্লিম লীগে যোগ দিল। কংগ্রেসের তেরঙ্গা পতাকার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে লীগের সবুজ পতাকা উড়তে লাগলো। এবং লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সের ২।৩ মাসের মধ্যে ১১০টী লীগের শাখা—যার মধ্যে ৯০টীই যুক্তপ্রদেশে ও ৪০টী পাঞ্জাবে দেখা দিল। এই সফলতায় জিন্না অকস্মাৎ মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে আবির্ভূত হলেন এবং মুস্লিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করলো, "হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়—যতক্ষণ না কংগ্রেস লীগকে, মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মনে করে"। উপরন্তু আলোচনার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিটিতে কোনো মুসলমান থাকতে পারবে না এই নূতন সর্তও আরোপিত করলো। ৫০ বৎসরের ঐতিহ্য অস্বীকার করে মুস্লিম লীগের সহিত বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রথমোক্ত সর্ত স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে স্বভাবতই পারলোনা। ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে ২য় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলে গান্ধিজী ও জওহরলাল নেহেরু বোঝাপড়ার জন্য আর একবার নিষ্ফল চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে মুস্লিম লীগ কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে প্রচার করে পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে একটী কমিটি গঠন করে কংগ্রেস রাজত্বে মুসলমানদের দুরবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে প্রচার করলো। ফজলুলহকও "কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরবস্থা" নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করলেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণরদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের শাসনকালে সংখ্যালঘুদের বিশেষ মুস্লিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো নীতি অথবা কার্যকলাপ হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করতে। কোনো প্রদেশের কোনো গভর্ণরই তা করতে পারেন নি। বরং যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার হেরীহেগ অবসর গ্রহণকালে জানান "আমার বিচার অনুযায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে পক্ষপাতহীন ও ন্যায়সঙ্গত ভাবেই কাজ করেছেন। বরং কংগ্রেস শাসনের শেষদিকে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতি অবিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে যদিও এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি ছিল না।" এইসব প্রমাণের পর কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের অত্যাচারের প্রচার অসত্য অথবা অ-প্রমাণিত অভিযোগ বলে ধরতে হবে। কিন্তু প্রচারের ফলে মুসলমানরা বিশ্বাস করতে সুরু করলো যে তাদের ধর্মের সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে অগ্রগতির দাবী করতে পারে। এলাহাবাদে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ ইক্‌বাল সভাপতির অভিভাষণে এই মতকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে ভারতের অভ্যন্তরে মুস্লিম-ভারতের দাবী করলেন এই সময় রহমৎ আলি নামে কেম্ব্রিজ শিক্ষিত এক যুবক এই দাবীকে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে উপস্থিত করে গোল টেবিলের মুস্লিম সদস্যদের নিকট পাঠালেন। কিন্তু মুস্লিম প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবকে অবাস্তব ও ছাত্রের মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। কিন্তু যথার্থ বলতে গেলে এই যুবকই পাকিস্তানের জন্মদাতা এবং জিন্নার দ্বিজাতি-নীতির অগ্রবর্তী। রহমৎ আলির পরিকল্পনা ছিল, "পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান নিয়ে পাকিস্তান নামে প্রথম ৪টীর আদ্য অক্ষর ও পঞ্চমটীর শেষাংশ মুসলমানদের জাতীয় বাসভূমি গঠিত করা।" এই অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, এবং মুসলমানরা ১২০০ বৎসর ধরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমানরা বিজেতা হিসাবে এসেছে। হিন্দু ও

মুসলমানরা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, অর্থ নৈতিক উত্তরাধিকার ও বিবাহের আইন ও প্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্যন্ত এই পার্থক্য রয়েছে।" এবং রহমৎ আলি এই বলে শেষ করে "ভারতীয় জাতীয়তা রক্ষার জন্ত আমাদের জাতীয়তাকে বিসর্জন দেয়া আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের ও ইতিহাসের প্রতি এমন কি মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে ; যে পাপের স্খালন নেই।" প্রথমে এই পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও একথা সুস্পষ্ট পাকিস্তানের জন্মদাতা রহমৎ আলির এই থিসিস। এর উপর আর নতুন খুব বেশী কিছু যোগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে প্রস্তাব অবাস্তব বলা হয়েছিন মাত্র ৭ বৎসরের মধ্যে তা দানা বাঁধলো এবং ১৯৩০ এর মুস্লিম লীগের লাহোর অধিবেশন এক লক্ষ সদস্যদের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হোল, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলকে সার্বভৌম ও স্বাধীন মুস্লিম রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করে বলা হোলো "এ ব্যতীত অন্ত কোনো সাংগঠনিক ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।" সর্বাপেক্ষা শোচনীয় যে মুস্লিম রাজনীতিতে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন কংগ্রেস কিংবা কংগ্রেস বহির্ভূত হিন্দু নেতাদের কোনো দৃষ্টিই আকর্ষণ করেনি। এবং যে দুটি দাবী মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে অস্বীকার করেছে "ভারতীয় জাতীয়তা ও ভারতীয় ঐক্য" সে সম্বন্ধে জোর দিয়ে হিন্দুনেতারা ক্রুদ্ধভাবে "ভারতবর্ষকে কোনো ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হতে দেয়া হবে না' বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতে লাগলেন। গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবকে নিন্দা করে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। হিন্দু প্রেস নানাভাবে এই প্রস্তাবকে আক্রমণ করলো। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত গঠন-মূলক কোন প্রস্তাব অথবা পারস্পরিক বোঝাপড়ার কোনো চেষ্টাই হোলোনা।—সমস্ত ঘটনা বিচার করে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব দাবী করবার অপেক্ষা ১৯৪০এ মুস্লিম লীগের দাবী শ্রেষ্ঠতর ছিল।

১৯৩৭ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়নি। তার কারণ কংগ্রেস হাইকমাণ্ড মন্ত্রীত্ব ও নানা প্রশাসনিক ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষ ভাবে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে কিষাণরা সংগঠিত হয়েছিল এবং সর্বত্র কংগ্রেস কর্মী ও কিষাণদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিল। তরুণেরা কংগ্রেসের অহিংস নীতি ও তার নেতা গান্ধিজীর উপর আস্থা হারাচ্ছিলো। এতদিন কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বেশ শক্তিশালী ছিল কিন্তু এসময় থেকে কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী বামপন্থীদের অবির্ভাব হোলো। ১৯৩৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া তরুণতর শক্তির ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব সূচিত করে। পশ্চিমে যুদ্ধের মেঘ জমে উঠছিল। কংগ্রেস একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করল। তার মূল বক্তব্য "বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থের খাতির কোনো যুদ্ধে ভারত তার জনবল ও সম্পদকে ব্যবহার হতে দিতে পারে না এবং ভারতের জনগণের সম্মতিব্যতীতও ভারত কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।…এবং সেরূপ করার চেষ্টাতে বাধা দেয়া হবে।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দুটি বিভিন্নমুখী দলের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল। এর কারণ হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, "কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বৃটিশের সহিত কোনোরূপ বোঝাপড়া সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতাকে সর্ব-প্রকারে দৃঢ়তর করা হোল। এ ব্যতীত ১৯৩৮ এর শেষাংশে জাতীয় উন্নয়ন ও শিল্পায়নের পরিকল্পনা গঠনের জন্ত ন্যাশানাল প্লানিং কমিটি গঠিত হোলো। গান্ধিজী শিল্পায়নের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এতে তিনি বিরূপ হলেন। এ ব্যতীত, ১৯৩৮ সেপ্টেম্বরে মিউনিক প্যাক্টের পর কংগ্রেস সভাপতিরূপে জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্ত প্রকাশ্য প্রচার সুরু করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধিবাদীরা এইসবগুলি কারণেই বিরক্ত

হোলো। এঁরা তখন মন্ত্রীত্ব ও পার্লামেন্টারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত, জাতীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ তখন ছিল না। ঐবং গান্ধিজী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে ক্রমঃবর্দ্ধমান স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। ১৯৩৯ মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জন্ত আজাদ, সুভাষচন্দ্র ও পট্টভি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাবিত হোলো। আজাদ অ-রাজী হওয়াতে শেষোক্ত দুইজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হোলো, গান্ধিজী সীতারামিয়াকে সমর্থণ করলেন। সুভাষচন্দ্র ৯৫টী বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন। এর পরের ঘটনাগুলি, সম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সংক্ষেপে বিবৃত করলেই যথেষ্ট। "সীতারামিয়ার পরাজয় আমার পরাজয়" গান্ধিজীর এই ইতিহাসিক বিবৃতি সুভাষচন্দ্রের জয়কে অভিনন্দিত করলে। ফলে কংগ্রেসীদের মধ্যে যারা সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তনের ধুম পড়ে গেল।

জাতির জীবনে এই সন্ধিক্ষণে গান্ধিজী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাজকোটের রাজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে এবং অনশন শুরু করলেন এর প্রতিবাদে। গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রখ্যাত প্রস্তাবে বলা হোলো "এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কংগ্রেস ও জাতিকে একমাত্র মহাত্মা গান্ধিই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম অতএব কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটি এরূপভাবে গঠিত করা যাতে তাঁর বিশ্বাসভাজন হতে পারে। সভাপতির গুরুতর অসুস্থতা এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের আর একটি বিষাদপূর্ণ বৈশিষ্ট। সভাপতির রুলিং এর ফলে এই প্রস্তাব সাবজেক্ট কমিটিতে আলোচিত হোলো আই সি সিতে নয়। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে প্রথম দিনের অধিবেশন ফলে স্থগিত করা হোলো পরের দিন পর্যন্ত, এই প্রস্তাব সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। গান্ধিজীকে সরকারি ভাবে কংগ্রেসের একনায়ক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হোলো। এবং সেই সব প্রবীণ নেতারা এ ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করলেন যারা পশ্চিমের জাতিদের গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এই অধিবেশনেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে কংগ্রেসের সর্বশেষ স্বাভাবিক অধিবেশন গণতন্ত্রকে দূরাগত আদর্শ হিসাবেও পরিত্যাগ করে অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সূচনা করে দিল।

এই প্রস্তাবানুযায়ী, সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত মর্যাদার কথা পশ্চাতে ফেলে গান্ধিজীর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে তাঁর পরামর্শ চাইলেন কিন্তু গান্ধিজী তাঁকে কোনোভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে অক্ষমতা জানানোতে—২৯শে এপ্রিল ১৯৩৯ কলকাতায় এই সি সির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদত্যাগ করলেন এবং ১লা মে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হোলো। ২য় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত পদধ্বনির মধ্যে এই জাতি তার প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হোলো।

এরপর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামশক্তিগুলিকে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োজন সুভাষচন্দ্র বসু অনুভব করলেন কারণ দক্ষিণপন্থীরা গান্ধি নেতৃত্বাধীন সংহত ছিল, কিন্তু বামমতবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও সংহতির অভাবে তাদের কার্য্যকারিতা ছিল না। সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি এবং শার্দ্দুল সিং কবি শেরকে সহ সভাপতি করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি বামদল গঠনের উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হোলো। নূতন দল—বাংলায় ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবার প্রস্তাব গ্রহণ করল; কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এ আই সি সি ১৯৩৯ জুনের শেষে প্রস্তাব গ্রহণ করলো "যে-কোনো সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ, পরিচালনা ও আয়ত্বাধীন হতে হবে। অনুশাসনিক বিষয়ে মন্ত্রীদের অধিকারে প্রকাশ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস

কমিটিগুলি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, যদিও অ-প্রকাশ্যে মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। নীতির বিষয়ে কোনো মতভেদ দেখাদিলে পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত করতে হবে। কিন্তু প্রকাশ্যে আলোচনা করা চলবে না। সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অনুগামীরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি এবং ৯ই জুলাই সর্বভারতীয় বিক্ষোভ দিবস হিসাবে নির্দিষ্ট করা হোলো। বাংলা, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে বহু সভাসমিতি হোলো এবং বিশিষ্ট প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ এসব সভায় উপস্থিত হয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস সভাপতি, সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করলেন। মার্জিত, দীপ্ত উত্তরে সুভাষচন্দ্র বসু যা বলেছিলেন তার মর্ম "কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত দেয়া এবং প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য অথবা অমান্য করা এক কথা নয়। আমি এ আই সি সির ২টী প্রস্তাবে বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছি মাত্র। এ আই সি সিতে যে সব প্রস্তাব আসে তার সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত দেবার অধিকার প্রতি সদস্যের রয়েছে।···বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করবার জন্য আমরা মতামতের স্বাধীনতা দাবী করে থাকি ·····কিন্তু দেখাযাচ্ছে এই অধিকার কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা যাবে না, কেবলমাত্র বাইরেই এর সীমা নির্দিষ্ট। কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা কয়েক লক্ষ এবং তাদের মতামতকে প্রভাবিত করতে হলে প্রকাশ্য আলোচনা ব্যতীত কি ভাবে সম্ভব তা আমার বুদ্ধির অগম্য।" চিঠি শেষ হয় এই বলে "যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত কৈফিয়ৎ গ্রহণযোগ্য মনে না করেন তবে আমি যে কোনো শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি" এর নিষ্পত্তি হোলো কংগ্রেসের দু দুবার নির্বাচিত সভাপতিকে ১৯৩৯-আগষ্ট থেকে তিন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অথবা অন্যকোন নির্বাচিত পদের অযোগ্য ঘোষিত করে।

উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পশ্চাতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বলে সুভাষচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন "১৯৩৯ এর বহু পূর্ব থেকেই আন্তর্জাতিক সংকট ও বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং কংগ্রেস যাকে এই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতি নির্দ্ধারণ করে তার জন্য সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধি অনুগামীরা কোনো প্রকার জাতীয় সংগ্রামেরই বিরুদ্ধে ছিলেন। কাজেই গান্ধিজীর মতামতকে পরিবর্তিত করানোর সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হোলো তখন ফরওয়ার্ড ব্লক দলকে সংগঠিত করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করে গান্ধিজীর উপর চাপ আনা ব্যতীত আর কোনো পথ ছিল না।" সুভাষচন্দ্র বলছেন এই পথ কার্যকরী হোলো। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর গান্ধিজীর মতের পরিবর্তন সম্বন্ধেই এই ইঙ্গিত। এই সূত্রে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পরিত্যাগ করবার পূর্বে নেহেরুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কলকাতায় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তার উল্লেখ করে নেহেরু বলেন এই পদত্যাগ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত করবে তার উত্তরে সুভাষ চন্দ্র বলেন, "যে ঐক্য কার্যকারিতা বাড়ায় ও যে বাহ্যিক ঐক্য নৈষ্কর্ম্যের দিকে নিয়ে যায় এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত ঐক্যের খ্যাতিরে জাতীয় সংগ্রাম বিরোধী গান্ধিপন্থিদের নিকট আত্মসমর্পণ করলে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের পক্ষে সকলপ্রকার সক্রিয় পন্থা গ্রহণ অসম্ভব হবে।—অপরপক্ষে যদি বাম দল কোনো সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করে তবে সমস্ত কংগ্রেসের মতকে পরিবর্তিত করাতে পারে। কাজেই এটা সুস্পষ্ট এই বিশ্ব সঙ্কটের কালে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার প্রশ্নেই একদিকে সুভাষচন্দ্র ও অন্যদিকে গান্ধি ও নেহেরুর মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দিল—এবং ১৯৩৯ এর বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এ অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতের ভাগ্যও চির দিনের জন্যে না হোক দীর্ঘদিনের জন্য এমন একটি পন্থায় নিয়ন্ত্রিত

হোলো না, অবিশ্বাস্ত এবং শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য প্রমাণিত হোলো।

২য় বিশ্বযুদ্ধ ও কংগ্রেস—১৯১৪র মতই জার্মানির বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও যুযুৎসু রাষ্ট্রে পরিণত হোলো—তবে পার্থক্য এই ছিল যে এইবার কয়েকটা প্রদেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীরা শাসন করছিল। পাঞ্জাব, বাংলা ও সিন্ধুর অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বৃটেনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালো এবং আইন সভাগুলিও তাদের কাজকে সমর্থন করলো। হিন্দুসভা ও ন্যাশানাল লিবারেল ফেডারেশন বিনা সর্তে সরকারকে সমর্থন জানালো কংগ্রেস—কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলো, মুসলিম লীগ এই দুই প্রান্তিক মতবাদের মধ্যবর্তী হয়ে রইলো—পাঞ্জাব ও বাংলার লীগ মন্ত্রীদের সমর্থন জানাতেও বাধা দিল না।

গান্ধিজী ও নেহেরু উভয়েই বৃটেনের বিপদে গভীর সহানুভূতি জানালেন। গান্ধি লিখলেন "আমি এখন ভারতের মুক্তির কথা ভাবছি না। সে মুক্তি আসবে, কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পতনের পর জার্মানীর ধ্বংস ও পরাজয়ের উপর যদি তারা বিজয়ী হয় তবে ভারতের স্বাধীনতার কি মূল্য থাকবে ?" নেহেরু ৮ই সেপ্টেম্বর চীন থেকে দ্রুত ফিরে এসে আরো অগ্রসর হয়ে বল্লেন "বৃটেনের বিপদের সুযোগ ভারত গ্রহণ করবেনা সেদিক থেকে আমরা এ প্রশ্নকে দেখছি না। একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ও অন্যদিকে ফ্যাসিসম এবং অন্যায় আক্রমণ এই উভয়ের মধ্যে ভারতের সহানুভূতি নিঃসন্দেহ গণতন্ত্রের দিকে। আমি চাই ভারতবর্ষ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নূতন সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করুক।" গ্রন্থকার লিখছেন আশ্চর্যের বিষয় হরিপুরাতে ১৯৩৮, ফেব্রুয়ারী এবং ত্রিপুরাতে ১৯৩৯ মার্চে বৃটিশ বৈদেশিক নীতিকে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতী বলে বর্ণিত হয়েছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের জনবল ও সম্পদকে কিছুতেই ব্যবহৃত হতে দেয়া হবে না বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের নীতির সপক্ষে সাহসের সহিত দাঁড়ালেন এবং তাঁর দল ফরওয়ার্ড ব্লক এই মত প্রচার করতে লাগলো যে "১৯২৭ থেকে ভারতবর্ষ বলে এসেছে যে বৃটেনের যুদ্ধে ভারত অংশ গ্রহণ করবে না এখন সময় এসেছে কংগ্রেস সেই নীতিকে কাজে পরিণত করুক।" ফরওয়ার্ড ব্লক খোলাখুলি বল্ল তারা বৃটেনের জয় চায় না কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের উপরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারবে। সুভাষচন্দ্র বসু সমস্ত দেশে শতশত সভা সমিতিতে এই মত প্রচার করলেন এবং তাঁর মতামত কংগ্রেসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলো—ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধি ও নেহেরুর মতামত দিয়ে প্রভাবিত হতে অস্বীকার করলো এবং বল্ল তথাকথিত গণতান্ত্রিক বা স্বাধীনতার লড়াইয়ের সামিল তারা হতে পারে না যখন সে স্বাধীনতা থেকে ভারতকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বৃটিশ সরকারকে সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাদের লক্ষ্য এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সে লক্ষ্য কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তা ঘোষণা করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোলো। এর পর বড়লাট ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৯ ঘোষণা করলেন বৃটেনের নীতির লক্ষ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন কিন্তু বর্তমানে ১৯৩৫ এর শাসনবিধি চালু থাকবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এ "মুসলমানদের সম্বন্ধে একমাত্র মুস্লিম লীগই বলবার অধিকারী" এই দাবী করে মুস্লিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করলো "লীগ এই সর্তে বৃটেনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত যে মুস্লিম লীগের অনুমোদন ব্যতীত ভারতবর্ষের কোনো সংবৈধানিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা হবে না।"

বড়লাটের ঘোষণায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির পূর্ণ ব্যবহারের বেশী কিছু পেল না বলে কংগ্রেস বৃটেনের যুদ্ধে কোনো প্রকার সাহায্য দিতে অস্বীকার করলো এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের

(শেষাংশ ৯০৪ পৃষ্ঠার নীচে)

এবারের বাজেট

রাখাল দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট বাৎসরিক ঘটনা (অনেকের মতে দুর্ঘটনা) হলেও বোধ হয় ১৯৬৫/৬৬ সালের বাজেট কয়েক দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার আগে আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কয়েকটি দিক সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, এবারের বাজেট মূলত: এই সব পরিবর্তনেরই প্রতিক্রিয়া।

প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রাজনীতির দিক দিয়ে চিন্তা করলে বর্তমান বৎসর নতুন করের বোঝা চাপানোর পক্ষে বিভিন্ন কারণে মোটেই উপযোগী নয়। এই মন্তব্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার করের সম্পর্কে প্রযোজ্য। গত ২/৩ বছর প্রায় সব জিনিসেরই এবং বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। ফলে জনসাধারণের ওপর যে ভয়াবহ চাপ পড়েছে তাতে নতুন কর চাপানো হলে তারা হয় তো সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে বাধ্য হত। তার পর ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলটিও নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে যে নেতৃত্ব দেশকে পরিচালিত করছে তার মধ্যে দৃঢ়তার অভাবই সবচেয়ে লক্ষনীয়। বিভিন্ন ধরণের অপব্যয় ও দুর্নীতির ফলে এই নেতৃত্বের আজ আর বলার মুখ নেই যে সাধারণ লোক আরো ত্যাগ স্বীকার না করলে আর্থিক ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

আর্থিক পরিস্থিতির কথা ভাবলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বছরেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে। এটাও অবিসম্বাদিত সত্য যে বর্তমান পরিকল্পনা ঠিক যতটা সফল হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা হয় তো হবে না। এজন্য কী কী কারণ দায়ী তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মোট কথা এই যে বর্তমান বাজেটের উপরই চতুর্থ পরিকল্পনা মোটামুটি দাঁড়িয়ে থাকবে! কাজেই চতুর্থ পরিকল্পনার পাকাপোক্ত বনিয়াদ হিসাবে ১৯৬৫/৬৬ সালের বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর একটি তথ্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গত ৪ বছরে আমাদের দেশে করের বোঝা বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে। হিসাব করা হয়েছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে ভারতের জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ রাষ্ট্র কর আদায় করত। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ। কিন্তু একই সাথে জিনিষপত্র ও সেবামূলক কার্যে সরকারের চলতি খরচ বেড়ে গেছে। এই ব্যয় ছিল আগে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ অংশ। কিন্তু বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশ। অতএব, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে সরকারের অবদান দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে। অবশ্য এজন্য দায়ী প্রধানতঃ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি যা ভারতকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করতে হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে জাতির আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় শিল্প-প্রচেষ্টাও অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সরকারেরই প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব ঘটেছে। এই ঘাটতি ক্রমাগত ব্যাঙ্কব্যবস্থার কাছে ঋণ নিয়ে পূরণ করার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু বেশি দিন এই নীতি সক্রিয় থাকলে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই আবশ্যক হয়ে পড়েছে আয়ের

চেয়ে ব্যয় কমিয়ে রাজস্বখাতেও উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে তা দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন জোরদার করে তোলা। বস্তুতঃ বহুদিন ধরে ভুল পথে চলার পর আজ আমরা বুঝতে পেরেছি যে ঘাটতির সাহায্যে (Deficit Financing) আর্থিক উন্নয়ন ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব নয়। সবশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতে প্রত্যক্ষ করের হার মোটেই কম নয়। কিন্তু প্রশাসনিক অক্ষমতা এবং দুর্নীতির ফলে সম্ভাব্য করদাতাদের একটা বিরাট অংশ আজ ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। দুটি উদাহরণ দিলেই এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। অসংখ্য মাঝারি ব্যবসাদারের ভাল আয়ের পথ খোলা থাকলেও তাঁদের প্রায় কোনও প্রত্যক্ষ করই দিতে হয় না। অথচ একটু তৎপর হলেই ঐ ধরণের ব্যবসায়ীদের কর ব্যবস্থার আওতার মধ্যে এনে ফেলা যায়। আবার একথাও সত্য যে বড় বড় সহরের অধিকাংশ বাসগৃহের মালিক যদিও করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটিকে কর দিতে বাধ্য হন, তাহলেও বাড়ী ভাড়া হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের ওপর প্রদেয় আয়কর তাঁরা অধিকাংশ দেন না। পৌর প্রতিষ্ঠান এবং আয় কর বিভাগের মধ্যে সামান্য সহযোগিতা এই সব বাসগৃহের মালিকদের আয় কর দিতে বাধ্য করতে পারে। বড় বড় রুই কাত্‌লা যাঁরা নানাভাবে কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের কথা বেশী না বললেও একথা সুস্পষ্ট যে আয় ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ করের প্রান্তিক হার (Marginal Rates) অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে ভারতে বেশি হলেও রাজস্ব পাওয়া যায় সে তুলনায় সামান্যই।

আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কয়েকটি দিক আলোচনা করা হল, কারণ বর্তমান লেখকের বিশ্বাস ১৯৬৫/৬৬ সালেতে বাজেট মোটামুটি এসব দিক থেকেই প্রভাবিত হয়েছে। এবার আমরা এই বাজেট সম্বন্ধে আলোচনায় আসতে পারি।

এবছরের বাজেটের প্রথম বিশিষ্ট্য এই যে বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এই বাজেটই প্রথম উদ্বৃত্ত বাজেট। অবশ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই সামান্য—মাত্র ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। তাহলেও প্রায় এক দশক ধরে ঘাটতি বাজেটের পর এই প্রথম উদ্বৃত্ত দেখা দিল। বস্তুতঃ যে সব কর বর্তমান সেগুলোর হারে হিসাব করলে এই উদ্বৃত্ত ১০ কোটি টাকার মত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী কয়েকটি করের হার কমিয়ে কিছুটা রেহাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন (৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা)। তলায় রাজস্ব ও মূলধন বাজেটের কাঠামো দেওয়া গেল।

রাজস্ব ও মূলধন বাজেট

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	বাজেট
রাজস্ব খাত	১৯৬৪-৬৫
আয়	২১,২৪,৩০
ব্যয়	২০,৪১,৩১
	+৮২,৯৯

	বাজেট
মূলধন খাত	১৯৬৪-৬৫
আয়	১৯,৯২,৯৯
ব্যয়	১৯,১৪,৮৯

	সংশোধিত
রাজস্ব খাত	১৯৬৪-৬৫
আয়	২২,২৮,৪১
ব্যয়	১৯,৯৯,২৬
	+ ২,২৯,১৫

	সংশোধিত
মূলধন খাত	১৯৬৪-৬৫
আয়	২০,৮৭,৭০
ব্যয়	১৯,৯৫,০০

রাজস্ব ও মূলধন বাজেট
(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	বাজেট
রাজস্ব খাত	১৯৬৫-৬৬
আয়	২৩,৫৩,০৯
	—৬,৩৮ (প্রস্তাবিত রেহাই)
ব্যয়	২১,১৬,৪৮
	+২,৩৬,৬১
	—৬,৩৮

	বাজেট
মূলধন খাত	১৯৬৫-৬৬
আয়	২১,৮৩,৯৫
	—৬,৩৮
ব্যয়	২০,৯৩,৭৯

কর ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত সরলীকরণ এই বাজেটের আর একটি বিশেষত্ব। বস্তুতঃ আমাদের কর ব্যবস্থা বিনা প্রয়োজনে অত্যধিক জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাজেটে এধরণের জটিলতা দূর করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আয় করের হারের বেলায় বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে। উভয় ধরণের ব্যক্তিদের আয়ই সমান হারে করযোগ্য হবে। তবে প্রথম দুহাজার টাকা পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিকেই আয় কর দিতে হবে না। বিবাহিত হলে আরো দেড়হাজার টাকা এবং প্রতিটি সন্তানের জন্য (দুটি সন্তান পর্যন্ত) চারশ টাকা করে ছাড় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, কোনও বিবাহিত ব্যক্তির দুটি সন্তান থাকলে তাঁকে চার হাজার তিন শ' টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর আয় কর দিতে হবে না। আয় কর ও অতিরিক্ত করের (Super Tax) পার্থক্যও বর্তমান বাজেটে তুলে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেক স্তরেই আয় কর কিছুটা কমেছে। গতবছরের প্রস্তাব অনুযায়ী ১ লক্ষটাকা আয়ের ওপর ৪৪ হাজার ৬১৫ টাকা কর দিতে হত। সে জায়গায় এখন কর দিতে হবে ৩৯ হাজার ১৬০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৫ হাজার টাকা কম।

কয়েকটি উৎপাদন শুল্ক সামান্য হ্রাসের ফলে জুতো কয়েক ধরণের মোটা ও মাঝারি কাপড়, সাইকেলের সরঞ্জাম ইত্যাদির দাম কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে করা চলতে পারে। অবশ্য যদি উৎপাদন শিল্প কর হ্রাস হওয়ার সাথে সাথে জিনিসের দাম কম হয় তবেই এই সুফল দেখা যাবে। কিন্তু মোটের ওপর আমদানি ও উৎপাদন শুল্কের (পরোক্ষ কর) বোঝা বিশেষ কমে নি। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের আদায়ীকৃত করের অধিকাংশই পাওয়া যায় পরোক্ষ কর থেকে। আমদানি দ্রব্যের ওপর বাজেটের ১০ দিন আগে শতকরা ১০ ভাগ যে শুল্ক প্রবর্তন করা হয়েছে তাও এই বাজেটে বহাল রইল। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ করে বর্তমান বাজেটে যে সামান্য হ্রাস করা হয়েছে তাতে আয়ের দিক থেকে সরকারের খুব সামান্যই ক্ষতি হবে।

সহরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির ওপর অতিরিক্ত সম্পদ কর (Additional Wealth Tax) ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এথেকে আদায় হবে মাত্র ১'৫ কোটি টাকা কাজেই এই নতুন করের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সামাজিক লক্ষ্যের কথা ভেবেই এই কর বসানো হয়েছে। সহরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির ওপর অত্যধিক লগ্নি বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ দিকে চালিত করা এবং কয়েক জন লোকের হাতে স্থাবর সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন দূর করাই এই নতুন করের উদ্দেশ্য। এক লক্ষ বা আরো বেশি লোকসংখ্যাসমন্বিত সহরের ক্ষেত্রেই এই কর প্রযোজ্য হবে। কোনও বড় সহরে অবস্থিত কোম্পানি যদি তার কারখানা ছোট জায়গায় নিয়ে যেতে চায় তাহলে এই কোম্পানি জমি ও বাড়ীঘর বিক্রি করে মূলধনে যে লাভ করবে তার ওপর প্রযোজ্য কর ঐ কোম্পানিকে ফেরত দেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রীর ধারণা এই রেহাই বড় বড় সহরের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে সাহায্য করবে।

শিল্প বাণিজ্যের সংগঠিত অংশকে আরো কয়েকটি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি বাড়ানোর ব্যাপারে কয়েকটি সুবিধা। এই ধরণের সুবিধা এবারই প্রথম

দেওয়া হল। শতকরা ৭ টাকা সুদে নতুন করে স্বর্ণ বণ্ড প্রচলিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধার করার জন্য অর্থমন্ত্রী এক অভিনব পরিকল্পনা করেছেন। আগে জানানো হয় নি এমন আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা করে দিলে বাকি ৪০ ভাগ ঐ ব্যক্তি নিজের কাছে রাখতে পারবে এবং তার নামও জানানো হবে না। এই সুবিধা এ বছরের মে মাস পর্যন্ত থাকবে।

মোটের ওপর বর্তমান বাজেট প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা সরল করে এবং করের হার কিছুটা কমিয়ে ফেলে কর ফাঁকি বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। এই প্রয়াস কত দূর সফল হবে তা সময়ই বলতে পারে।

যাই হোক সাধারণ মানুষের দিক দিয়ে দেখলে এ বছরের বাজেট অন্যান্য বছরের তুলনায় যে অনেকটা শুভ সংবাদের পথে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায় (শেষাংশ ৯০০ পৃষ্ঠার পর)

পদত্যাগ করতে পরামর্শ দিল। ২৭ অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৯ এর মধ্যে সমস্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলো। বড়লাট এতে বিশেষ স্বস্তিবোধ করলেন কারণ ১১টার মধ্যে ৮টা প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীরা শাসন করলে যুদ্ধ সাহায্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারতো। ভারত সরকার মুস্লিম লীগের সাহায্য লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করলো তাতে মুস্লিম লীগের মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পেল।

কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে আর কোনো কার্যকরী পথ গ্রহণ করলো না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক নিশ্চেষ্ট ছিল না। যুদ্ধ সহযোগিতার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করা ছাড়াও ১৯৪০ মার্চে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার উদ্যোগে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি নিখিল ভারত আপোষ-বিরোধী কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করা হোলো। এই কন্‌ফারেন্স যুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম ঘোষণা করলো এবং ১৯৪০ ৬ই-১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহে ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতময় আইন অমান্য অভিযান শুরু করলো। জুন ১৯৪০ এ গ্রেপ্তারের পূর্বে—সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধিজীর উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী আবেদন করে বল্লেন "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং এখন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের দায়িত্ব পালন করা উচিত" কিন্তু গান্ধিজী উত্তর দিলেন "দেশ প্রস্তুত নয় এবং এই অবস্থায় সংগ্রাম শুরু করলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতি হবে বেশী।"

১৯৪০, ২০ মে পণ্ডিত নেহেরু এক বিস্ময়কর বিবৃতিতে বল্লেন "বৃটেন যখন জীবন মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের সম্মানের পরিপন্থী। বৃটেনের ধ্বংসের পরিবর্তে আমরা স্বাধীনতা চাই না, অহিংসার পথ এ নয়।" কিন্তু গান্ধিজীর বেশীর ভাগ সহকর্মীদের নিকট অহিংসা কাজের কৌশল ছিল মাত্র নীতি নয়। গান্ধিজী ১৯৩৯, ২২শে জুলাই হিটলারকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে আবেদন করে চিঠি দিলেন। বৃটিশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যেও দুইটা খোলা চিঠিতে হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে আত্মিক শক্তিদ্বারা হিটলারকে নিরস্ত্র করবার জন্য আবেদন জানালেন।

ইতিমধ্যে গান্ধিজীর মতামতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেল "আমাদের অগ্রগতি অন্যান্য দলগুলির সহিত বোঝাপড়া না হলে সম্ভব নয় এটা ভ্রান্ত ধারণা।" অথচ এই গান্ধিজীই ২য় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া না হলে। ৮ই আগষ্ট ১৯৪০, বড়লাট আর একবার "বর্দ্ধিত কমিটির" প্রস্তাব করলেন এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলো। গান্ধিজী ১৭ই নভেম্বর ১৯৪০ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলেন এই সত্যাগ্রহ দেশে কোনো প্রভাবই বিস্তার করে নি। ১৯৪১ পর্যন্ত একে স্থগিত করা অথবা একে গণ-আন্দোলনে পরিণত করা কোনোটাই করতে রাজী হন নি গান্ধিজী। (ক্রমশঃ)

(অনিবার্য কারণবশতঃ এবার শেষ করা গেল না, আগামীবার শেষ করার ইচ্ছা রহিল।)

ভ্রম সংশোধন

মাঘ সংখ্যা জয়শ্রীর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায় প্রবন্ধের ৮২৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারাগ্রাফে ৭ম লাইনে বিঠল ভাই প্যাটেলের স্থানে অনবধানতা প্রযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেল হয়েছে সেজন্য আমরা দুঃখিত। জঃ সঃ

হেগেলীয় দর্শন

অমিল রায়

৬

হেগেল ও মার্ক্স

ডায়লেকটিকের নবরূপ হেগেলের আবিষ্কার। এর কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে মার্ক্স একে গ্রহণ করেছেন। হেগেলের ডায়লেকটিকের সঙ্গে মার্ক্স-এর ডায়লেকটিকের কোনই পার্থক্য নেই। বরং হেগেলের ভাষা ও পরিভাষা সমেত তাঁর এই তত্ত্বকে মার্ক্স একেবারে অবিকল গ্রহণ করেছেন। হেগেল যে অর্থে ও যে ভঙ্গীতে ডায়লেকটিককে বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন, মার্ক্স-ও ঠিক সেই একই অর্থে ও একই ভঙ্গীতে তার ডায়লেকটিককে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। ডায়লেকটিক সম্বন্ধে আলোচনা মার্ক্স অতি সামান্যই করেছেন। বস্তুত, দর্শন সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা অতি বিরল। তবুও নবজড়বাদকে বুঝতে হলে মার্ক্স-এর সেই ক'টি বিরল উক্তিকে সম্বল করে চলতে হবে।

মার্ক্স-এর এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই তাঁর ১৮৪৫ সনে লেখা "Eleven Theses on Feurbach" নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সূত্র আছে—যে সূত্রগুলোর মধ্যে মার্ক্সবাদের দর্শন ও সমাজতত্ত্ব মোটামুটিভাবে আভাসে বিবৃত হয়েছে।

ফয়েরবাক বলেছেন জড় বহিঃসত্তা (Being) থেকেই চেতনা-লোকের (Consciousness) জন্ম হয়। আর Eleven Theses-এর চতুর্থ-সূত্রে মার্ক্স বলছেন যে এই বহিঃসত্তা বা জড় প্রকৃতির ("material foundation") একটা পরমাশ্চর্য স্বভাব হচ্ছে নিজেকে অনবরত খণ্ডন করে করে চলা। জড় প্রকৃতির ভিতরেই এই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রেরণা নিহিত হয়ে আছে যে সে নিজের বিরুদ্ধতা নিজে করবে। জড়সত্তার স্বধর্মই হল পূর্বরূপকে লঙ্ঘন করে পরবর্তিরূপকে বিকশিত করে তোলা। পূর্বের স্তরকে অতিক্রম করে তবেই পরের স্তর অর্জিত হতে পারে।• এই তত্ত্বকেই হেগেল প্রকাশ করেছেন অন্য ভাষায়। হেগেল বলেন পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের বিরোধ (contradiction)। মার্ক্সও তাঁরই ভাষা ও ভাবের প্রতিধ্বনি করে বলছেন প্রকৃতির অবিরত নিজেই বিরুদ্ধতা (contra dict) করে চলেছে এবং পরিবর্তী স্তরে গিয়ে আগের দুই স্তরের বিরোধের উপশম হচ্ছে ("elimination of

---

• 'The fact that the material foundation annuls itself and establishes for itself a realm in the clouds can only be explained from the heterogeneity and self-contradiation of the material foundation. This itself must first become understood in its contradiations and so become thoroughly revolutionised by the elimination of the contradiotion.' (4th Thesis on Feurbach)

contradiction")। হেগেলীয় ভাষার ও ভাবের নিঃসন্দেহ আমদানী আমরা দেখতে পাই প্রথম এই ৪র্থ থিসিস-এ, (অবশ্য এঙ্গেলসও একথা উল্লেখ করেন নি)। *

এরপর "Poverty of Philosophy"তে (১৮৪৭) দেখা যায় ডায়লেকটিক নীতির পরিপূর্ণ স্বীকার ও গ্রহণ। এখানে মার্ক্স হেগেলের স্পষ্ট উল্লেখ করে হেগেলীয় ডায়লেকটিক নীতি হেগেলীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্ব সংসারের গুহ্যতম স্বরূপ হল 'গতি' (movement) বা পরিবর্তন। হেগেলের মতে এই গতি পরিবর্তন প্রকট হচ্ছে পর পর তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যাদের নাম তিনি দিয়েছেন thesis (স্থিতি), antithesis (প্রতিস্থিতি) ও synthesis (সংস্থিতি)।

উদ্ধৃত উক্তিটিতে একথা স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে যে মার্ক্সীয় ডায়লেকটিকই হেগেলীয় ডায়লেকটিক,—অবিকল ও পুরোপুরি। হেগেলের নীতির সর্বাঙ্গীন পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, একথা এখানেই আমরা প্রথম নিঃসংশয়ভাবে পাই। কিন্তু এখানে মার্ক্স হেগেলের আদর্শবাদকে ব্যঙ্গ করে এই কথাটিও ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর নিজের জড়বাদ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে (idea বা pure reason) বিশ্ব-যাত্রার মূল কারণ বলে স্বীকার করে না। মার্ক্স-এর একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞান (Pure reason)। তিনি জড়সত্তাকে (Being বা material conditions) মূল কারণ বা ভিত্তি বলেন—বিশুদ্ধ জ্ঞানকে (Pure Reason বা Idea) নয়। এখানে অবশ্য ফয়েরবাকের মতকেই তিনি হেগেলের বিরুদ্ধে দাঁড় করেছেন—এ তত্ত্ব তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়। হেগেলের সঙ্গে তাঁর তফাৎ হচ্ছে তাহলে মূল সত্তা নিয়ে—যে সত্তাকে প্রাচীন ও অমর বলা যায় এবং যার সম্বন্ধে নির্দেশ করা চলে,. "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এই মূলতত্ত্বকে হেগেল বলেছেন "Idea" বা ভাবপদার্থ; আর মার্ক্স বলছেন জড়ভূমি "(material conditions)।" এছাড়া পদ্ধতি বা method সম্বন্ধে দুই-এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যে ডায়লেকটিক পরিবর্তন-রীতি ও যে বিকাশক্রম ভাবপদার্থের (Idea) স্বধর্ম বলে হেগেল আরোপ করেছেন সেই অবিকল রীতি ও ক্রম মার্ক্স আরোপ করেছেন জড়-প্রকৃতিতে তারই স্বধর্ম বলে। কিন্তু যে ডায়লেকটিক পদ্ধতি (method), যে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি-ক্রম (Thesis-antithesis-synthesis ক্রম) হেগেল দেখেছেন ভাবপদার্থের (Idea) গতিতে, ঠিক সেই পদ্ধতি

* "In what does the movement of pure reason consist ? To pose, oppose and compose itself, to be formulated as thesis, antithesis and synthesis, or better still, to affirm itself, to deny itself and to deny its negation . ...But once it has placed itself in thesis, this thesis, this thought, opposed to itself, doubles itself into two contradictory thoughts, the positive and the negative, the yes and no. The struggle of these two antagonistic elements, comprised in the anti-thesis constitutes the dialectic movement. The yes becoming no, the no becoming yes, the yes becoming at once yes and no, the no becoming at once no and yes, the contraries balance themselves, neutralise themselves, paralyse themselves. The fusion of these two contradictory thoughts constitutes a new thought which is the synthesis of the two. This new thought unfolds itself again in two contradictory thoughts which are confounded in their turn in a new synthesis." (Porperty of Philsophy, pp. 116-118, Kerr & Co. edition, 1920, Chicago)

(method) ও ক্রমই মার্ক্স দেখেছেন জড়শক্তির বিবর্তনে। কিন্তু মার্ক্স পরে এককালে এই দাবী করতে চেয়েছেন যে তাঁর নিজের ডায়লেকটিকের ঠিক বিপরীত হচ্ছে হেগেলের ডায়লেকটিক। দুই দর্শন ঠিক একই পদ্ধতিকে (method) ভিত্তি করেনি—এ দুটি দর্শনের ডায়লেকটিক পদ্ধতি (method) পরস্পর আলাদা প্রকৃতির ও বিভিন্ন স্বরূপের। এই পদ্ধতিগত (methodological) পার্থক্যের কথা পাওয়া যায় মার্ক্সের পঁচিশ বছর পরের এক লেখায় অর্থাৎ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Das Capital এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। এখানে তিনি তাঁর ডায়লেকটিক সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করেছেন।

এই ভূমিকায় মার্ক্স বলছেন যে তাঁর নিজের ডায়লেটিকের প্রকৃতি হেগেলীয় ডায়লেকটিকের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত। *

কিন্তু পরের বাক্যেই তাঁর এই দাবীর যে কারণ ও প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেছেন, তা নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। তাঁর পার্থক্যের কারণ তিনি বলেছেন :

হেগেলের কাছে ভাবপদার্থ ই (thought বা idea) আদিতম এবং The Real হচ্ছে তার প্রকাশ বা সৃজন। মার্ক্স-এর কাছে The Real হচ্ছে আদিমতম এবং ভাব-পদার্থ (thought) তার প্রকাশ বা বহিঃপ্রকাশ। ‡ এখানে পার্থক্য কেবল আদিম সত্তা নিয়ে। বিশ্ব-বিবর্তনের আদিতে "পরমঃ পুরানঃ", "পরং নিধানং" কি—সেই তত্ত্ব নিয়ে দুইয়ে পার্থক্য। কিন্তু সেই সনাতন সত্তা যাই হোক না কেন, তার বিকাশের রীতি একই। ভাব-পদার্থ (Thought) বা জড়পদার্থ (matter) দুই-ই ডায়লেকটিক ফর্মূলা অনুযায়ী স্ব-বিরোধের তিনটি স্তরকে পার হয়ে প্রগতির পথে নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই মার্ক্স ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতি (method) নিয়ে নয়—পার্থক্য আদিম ও সনাতন মৌলিক সত্তা কি তাই নিয়ে। এতে একের ডায়লেকটিক রীতি অপরের ডায়লেকটিক রীতি মূলত পৃথক (Fundamentally different") বা একেবারে বিপরীত (direct opposite)—একথা আদৌ যুক্তিসহ নয়। হেগেল যে চেতনকে (Thought) বিশ্বের আদি বলে নির্ধারণ করেছেন তাকে ডায়লেকটিকের "mystifying aspect" বলে মার্ক্স বিদ্রূপ করেছেন। অবশ্য এই রহস্যাবৃতির (mystification) ত্রুটী সত্ত্বেও হেগেলকে করুণামিশ্রিত সম্মানে আপ্যায়িত করা হয়েছে এই বলে যে : তিনিই সর্বপ্রথম ডায়লেকটিকের সাধারণ রূপটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। *

মার্কস-এর মতে ডায়লেকটিক হেগেলের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং এর গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে হেগেলের নির্দেশও মার্কস যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন : হেগেলের লেখায় ডায়লেকটিক তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে

* "My own dialectic method is not only fundamentally different from the Hegelian Dialectical method, but is its direct opposite." (Preface to 2nd Edition 'Capital', 1872)

‡ "For Hegel, the thought process…is the demiurge of the real…In my view, on the other hand, the idea is nothing other than the material when it has been transposed and translated inside the human head."

* "Although in Hegel's hands, Dialectic underwent a mystification, this does not obviate the fact that he was the first to expound the general forms of its movement in a comprehensive and fully conscious way." (Preface to 2nd Edition : Capital)

আছে। এর রহস্যাবরণের তলায় যুক্তির যে শাঁসটুকু লুকোনো রয়েছে তা আবিষ্কার করতে হলে একে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে হবে। •

ডায়লেকটিক হলো বিবর্তন ও পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরণের কায়দা। স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ক্রমে যে একটি বিশেষ গতি তাকেই বলা হয় 'ডায়লেকটিক'। এই ত্রি-সমন্বিত সর্পিল গতি বা ডায়লেকটিক রীতি হেগেল ও মার্কস উভয়েরই মতে বিশ্বগতির একমাত্র ছন্দ। এই ডায়লেকটিক ছন্দে বা তালেই বিশ্বলোকের চলার গান বেজে উঠেছে, এই তালই সার্বভৌম ও সার্বকালীন তাল, যে তালে আদিকাল থেকে চিরকাল অবধি তৃণ থেকে তারা পর্যন্ত সারা নিখিল বিশ্ব অশ্রান্ত ছন্দে অনন্ত উন্নতির পথে ছুটে চলেছে। একথা হেগেল ও মার্কস উভয়েরই কথা এবং এতে দুইয়ের কোনো পার্থক্যই নেই। পার্থক্য তাঁদের ডায়লেকটিক নিয়ে নয়—ডায়লেকটিক রীতি অনুসারে (dialectically) যা বিবর্তিত হয়, সেই বস্তু নিয়ে।

তাঁদের পার্থক্য পরিবর্তনের রীতি বা ফর্মূলা নিয়ে নয়—যে সত্তা ঐ রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে তাকে নিয়ে। এ মতানৈক্য Subject-Predicate সম্বন্ধ নিয়ে, এ মত-পার্থক্য জড়-চেতনের (Being-consciousness) সম্পর্ক নিয়ে। একজন বলছেন চৈতন্যই হল Subject, জড় হচ্ছে Predicate; অপরে তার উল্টো ক্রম নির্দেশ করে বলছেন, জড়ই হচ্ছে Subject এবং চৈতন্য তার Predicate। জড় আগে, না চৈতন্য আগে—পার্থক্যটা হচ্ছে এই নিয়ে; বিকাশের রীতি বা ডায়লেকটিক নিয়ে নয়।

মার্কসের ডায়লেকটিক বস্তুত হেগেলেরই ডায়লেকটিক। কাজেই মার্কসের দর্শনকে বুঝতে হলে হেগেলের ডায়লেকটিককে বুঝতে হবে। ডায়লেকটিককে নিয়ে আলোচনাই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য। এই কারণেই আমরা এখন হেগেলীয় ডায়লেকটিককে বোঝবার চেষ্টা করব। কারণ প্লেখানভ বলছেন, হেগেলকে না বুঝলে মার্কসকে বোঝবার চেষ্টা বৃথা। আজকাল হেগেলকে না বুঝেই মার্কসকে বোঝবার চেষ্টা অনেকে করে থাকেন। এজন্য তাঁরা মার্কসকে ভুল বুঝে থাকেন। •

হেগেলের মতবাদকে ডায়লেকটিক ভাববাদ ("Dialectic idealism") বললে মার্ক্স-এর দর্শনকে ডায়লেকটিক জড়বাদ ("Dialeatic Materialism") নাম দেওয়া যেতে পারে। তফাৎটা শুধু ভাববাদ (idealism) ও জড়বাদের (materialism),—ডায়লেকটিকের নয়।

এই ভূমিকার তের বছর আগে লেখা তাঁর 'Critique Political Economyর ভূমিকায় মার্ক্স সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় ডায়লেকটিক জড়বাদের মূলতত্ত্ব বিবৃত করেছেন। এখানেও ফয়েরবাকীয় জড়সত্তা-চেতন-সত্তার (Being-consciousness) তত্ত্বকে তিনি প্রচার করেছেন; ডায়লেকটিক সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখানে নেই। তারপরে ১৮৬৭ সনে লেখা Capital-এর প্রথম খণ্ডে স্থানে স্থানে ডায়লেকটিকের ও ডায়লেকটিক জড়বাদের কতকগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কটি স্থানে মার্ক্স-এর যে

• "In Hegel's writngs Dialectic stands on its head. You must turn it right way up again, if you want to discover the rational kernel that is hidden away within the wrappings of mystification." (Preface to 2nd Edition : Capital)

• "One of the chief reasons is that now-a-days people are ill-informed, first concerning the Hegelian philosophy, without a knowledge of which it is difficult to grasp Marx's method." (Fundamental Principles p. 4 : Plekhanov)

ওটিকয়েক উক্তি রয়েছে তার থেকে মার্ক্সের ডায়ালেকটিক জড়বাদের স্বরূপকে ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই কারণে মার্ক্স-এর নিজস্ব মতামত সম্বন্ধে অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এবং তা নিয়ে নানা রকমের মতভেদ ও ব্যাখ্যারও সূচনা হয়েছে।

পরে এই নতুন জড়বাদের বিস্তৃত বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন এঙ্গেলস্ তাঁর (i) Anti-duhring (ii) Ludwig Feurbach ও (iii) Dialectics of Nature—এই তিনখানা বইতে। এঙ্গেলসই আসলে এই ডায়লেকটিক জড়বাদকে একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ দান করে গেছেন—যে নির্দিষ্ট রূপ মার্ক্স-এর লেখায় নেই। মার্ক্স-এর উক্তিগুলোর যে ব্যাখ্যা এঙ্গেলস করেছেন সে ব্যাখ্যাকে যুক্তিসঙ্গত বলে অনেকেই মনে করেন না। মার্ক্স যা স্পষ্ট করে বলেন নি অথচ তাঁর অস্পষ্ট উক্তি থেকে মানে করাও যেতে পারে এমনি সব তত্ত্বকে ডায়ালেকটিক মতবাদ বলে এঙ্গেলস্ ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, মার্ক্স-এর উক্তিগুলোর অন্যরকম মানেও করা যায় এবং সে ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। যাহোক, বর্তমানে নতুন জড়বাদের পীঠস্থানে যে নমুনার ডায়ালেটিক জড়বাদ মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শন বলে গ্রাহ্য হয়েছে, তাতে এঙ্গেলস্-এর ব্যাখ্যাত জড়বাদই গৃহীত হয়েছে। এঙ্গেলস্ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাকেই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন লেনিন, প্লেখানভ এবং বুখারিন (Bukharin)। এঁরা তিনজন এঙ্গেলসের পথ অনুসরণ করেছেন এবং এঙ্গেলস-এর দর্শনকে নানা তথ্য ও বিচারে আরও পল্লবিত করে প্রচার করেছেন। এঙ্গেলস-এর ব্যাখ্যাকে গোঁড়া সম্প্রদায়ের (orthodox section) ব্যাখ্যা বলা হয় এবং বর্তমানে মার্ক্সবাদ নামে যে সমাজদর্শন পরিচিত তাকে এঙ্গেলসবাদ বললেই শোভনতর হয়। লেনিন তাঁর 'Empirio-Criticism' নামক বই-তে এঙ্গেলস-এর মতের ভিত্তিতেই একরোখা অনড় জড়বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই সূত্রে নানা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। ইতিপূর্বে প্লেখানভও তাঁর নানা বইতে এই গোঁড়া ধরণের জড়বাদকেই ছন্দোবন্ধে অলঙ্কৃত করেছেন। সর্বশেষে বুখারিন তাঁর 'Historical Materialism' নামক বইতে আধুনিক ও অত্যাধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে এঙ্গেলস-এর ব্যাখ্যাকে আরো বিস্তারিত ও বিপুলতর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এঙ্গেলস-এর মৃত্যু হয় ১৮৯৩ সালে। তার পরে ৩২ বছরের মধ্যে ডায়লেকটিক জড়বাদ একটা পূর্ণ বিকশিত মতবাদ হয়ে প্রচারিত হয়েছে। মার্কস-এর মধ্যে যা ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট ও অশরীরী, এঙ্গেলস তাকেই দান করলেন একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ ও দেহ। তার পরে সেই শরীরী মূর্তিকে লেনিন, প্লেখানভ, বুখারিন প্রমুখ পরবর্তিগণ পূর্ণ বিকশিত করে নানা অলঙ্কারে ফুলে ভূষিত করে সমাজ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত করেছেন।

এঁরা সবাই বলছেন, জড়বাদ ডায়লেকটিকের স্পর্শ-সম্পাতে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে, জড়বাদের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। ডায়লেকটিকই এই নবরূপায়ন ঘটিয়েছে। এঁরা ডায়লেকটিককে নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা করেন নি, কারণ ডায়লেকটিকের সব তত্ত্বগুলো হেগেল থেকেই এঁরা সবাই নিয়েছেন। কর্ণিলভ বলছেন :

মার্কস-এর ডায়লেকটিক হেগেলেরই ডায়লেকটিক এবং কাজেও হেগেলই এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন।• সুতরাং, মার্কস-এর দর্শনকে বুঝতে হলে, হেগেলীয় ডায়লেকটিক বুঝতে হবে। হেগেলের আলোচনাই এ-সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও বিস্তারিত। এই

• "The main principles of Dialectics, were as is well-known, established, formulated, and proved in the first instance by Hegel." (Psychology,' 30. p 252)

কারণে আমরা হেগেলীয় ডায়লেকটিককে বুঝতে চেষ্টা করব।

ডায়লেকটিক (ক)

এই ডায়লেকটিক জিনিষটি কি তা বুঝতে হলে আমাদের লজিকের রাজ্যে পা বাড়াতে হবে। লজিক শাস্ত্রের মোটামুটি তত্ত্ব কয়টি না বুঝলে ডায়লেকটিক বোঝা হবে না। ডায়লেকটিক লজিক নামক নূতন লজিক হেগেলের সৃজন। একদা হেগেলের কোন বন্ধু একটি স্কুল-পাঠ্য লজিক লিখবার অনুরোধ তাঁকে জানিয়েছিলেন। তার জবাবে হেগেল যা বলেছিলেন সে কটি কথাতেই পূর্ব প্রচলিত লজিকশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ও পুরোপুরি ফুটে উঠেছে।

সেই পুরনো লজিককে হেগেল প্রাণহীন, ঐশ্বর্যহীন, আবর্জনা বলে মনে করেছেন। দু' পাতার মধ্যে সেই প্রাচীন লজিকের সকল তত্ত্বকে লিখে শেষ করা যায়— কারণ, এতে সার পদার্থ যা আছে সে অতি অকিঞ্চিৎকর। পুরনো লজিক কেবলই বৃথা কথার কচকচি বৈ আর কিছু নয়।* কাজেই একে নির্বাসিত করে এর বদলে সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে নূতন লজিক। পুরনো লজিক সম্বন্ধে হেগেলের এই ধারণা ও মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর অভিনব ডায়লেকটিক লজিক। ডায়লেকটিক লজিককে বুঝতে হলে পুরনো লজিকের মূলতত্ত্বগুলোকে বুঝতে হবে। তাই এই চিরকেলে লজিক (traditonal logic) কি সে সম্বন্ধে দুটো কথা এখানে আলোচনা করা দরকার।

মানুষ সত্যকে জানতে চায়। এ চাওয়ার উৎস তার নিজের স্বভাব বা স্বধর্মে। মানুষের অন্তরেই জেগে রয়েছে সেই অশান্ত প্রেরণা যা তাকে অসত্য থেকে সত্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আদিকাল থেকে মানুষ যা কিছু জেনেছে, বুঝেছে ও লাভ করেছে, তার সেই সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রাপ্তির পেছনে রয়েছে তার সত্যের প্রতি অনির্বাণ পিপাসা। এই পিপাসা জ্বলছে তার বুকে অতন্দ্র দীপ্তিতে চিরকাল। এই পিপাসা জ্বলেছে সেই বিস্মৃত অতীতে, যেদিন জান্তব-প্রায় জীবনের নিবিড় অজ্ঞান মানুষকে বিপুল অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিল। এই সত্যানুসন্ধান থেকে জন্ম নিয়েছে লজিক শাস্ত্র। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হয়েছে তার অশান্ত বুদ্ধি আর বহ্নি-সম চঞ্চল চিন্তাকে নিয়ে, সেই দিন থেকেই পৃথিবীতে লজিক রয়েছে কোন না কোন রূপে। কিন্তু বিধিবদ্ধ, সুনিয়ত বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে লজিক কবে থেকে আছে, তার ইতিহাস আজো দুর্ভেদ্য। কবে প্রথম লজিক কোথায় কে রচনা করেছিল আজ নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের আদি গঙ্গোত্রীর দিকে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে হিন্দু জাতিই সর্বপ্রথম লজিক-শাস্ত্রকে সৃজন করেছিল। গোতম ও কণাদের লজিক সূত্রাকারে বাঁধা হয়েছিল সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৪র্থ শতকে। এরও বহু যুগ আগেই যে লজিক-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। "অস্থৃষ্টং বিগ্রাকে" (বৈঃ সূঃ IX : ii, 12) কল্পারম্ভ করবার জন্য কবে যে সুনিয়ন্ত্রিত যাত্রা সুরু হয়েছিল তার ঠিকানা আজ জানবার উপায় না থাকলেও, এটুকু বলা চলে যে অতি প্রাচীন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে এই ভারতবর্ষেই একদিন চিন্তানুশীলনের আলো জ্বলে উঠেছিল।

---

* "The traditional logic is···one which can by no means remain as it is : it is a thing nobody can make anything of, it is dragged along like an old heirloom, only because a substitute,—of which the want is universally felt—is not yet in existence. The whole of its rules still current, might be written on two pages : every additional detail beyond these two is perfectly fruitless scholastic subtlety···" (Hegel : Wallace : Preface, p. xii)

কিন্তু হেগেল পুরনো চিরাগত লজিক ("traditional logic") বলতে হিন্দু লজিককে মনে করেন নি। কারণ, এর সন্ধান তিনি জানতেন কিনা সন্দেহ। তিনি Greeko-Roman পরিমণ্ডলে জাত সন্তান এবং সেই সংস্কৃতি-প্রদীপ থেকে শিখা নিয়েই তাঁর নিজের জ্ঞানের দীপকে জ্বালিয়েছিলেন। দীপালোকিত পৃথিবী বলতে তিনি য়ুরোপের চার সীমার ভিতরের ভূখণ্ডকেই বোঝেন এবং তার বাইরে যদি কিছু থাকে সে শুধু অকূল অন্ধকারের রাজ্য। হেগেল পুরনো লজিক বলতে গ্রীক লজিককেই বুঝেছেন।

ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যে যখন আরোহী-অবরোহী (deductive ও inductive) লজিকের দীপ্তি বিকীরিত করছিলেন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মনীষিগণ, সেই সময়ে (৩৮৪-৩২০ খ্রী: পূ: অব্দে) গ্রীস দেশে এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর প্রচারকার্য করছিলেন Lyceum-এ। এরিস্টটলই পাশ্চাত্য লজিকের জন্মদাতা এবং এই এরিস্টটলীয় লজিকই আজো পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চিন্তা করতে ও তত্ত্বানুসন্ধান করতে শেখাচ্ছে। এরিস্টটল সৃষ্ট লজিককে বলা হয়ে থাকে Formal Logic।

(ক্রমশ)

অকারণে — বিজয় কুমার দত্ত

কাছে এসে ভয় করে। পাছে তুমি নত কণ্ঠস্বরে
তোমাকে চিনিনা বলে অপরিচয়ের মৃঢ় নিষ্ফল পর্দায়
হঠাৎ অদৃশ্য হও। অথচ নিশ্চিত কেন, প্রত্যাবর্তনের
বেলা শেষে
ছিলাম অবহসুখে, আনন্দের নিহিত আভায় ?

যদি এ ভয়ের চিহ্ন পথের দুধারে ছিল মাটির গভীরে
শিকড়ে মজ্জায় রসে গাছের শরীরে —
সেদিন বুঝিনি কেন, এই ভেবে চোখ দুটি জলে আসে
ভরে।

সমস্ত তেমনি আছে, যেমন যাবার বেলা দেখেছি সেদিনে
বকুল গাছের ছায়া ভোরবেলা মাধবীর আনত নিষ্ফল
অভিমানী কোমলতা। অথবা রাস্তায়
অভ্যস্ত ছবির মতো পরিচিত যাওয়া আসা, মুখর মিছিলে
স্কুটারে, সাইকেলে কিংবা পায়ে হাঁটা পথের দুধারে
সব মুখ, সব চেনা মানুষের যথাযথ জীবনের অস্থির সময়,
তবুও তোমার কাছে এসে কেন জমে ওঠে বুকচাপা ভয় ?

একটি নদীর নামে — গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গভীর বিস্ময় বুকে। অনেক নদীর সাড়া পাই
রক্তে আজ। আমি ডাকি বিশেষ নদীর নাম ধরে',
আজীবন যে আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে;
আজ আমার দিশা নেই, অন্ধকারে পথ হাতড়াই।

কাঠ কাঠ, বুক মরুবালি হয়, তথাপি তৃষ্ণার
শেষ কোথায়! হাতপাও অসাড় হয়, নেমে আসে ভয়,
চারিদিকে ঘিরে আসে রিক্ত একটা ক্লান্তির বলয়;
প্রাত্যহিকতার দুঃখ রোধনীয়, এ-দুঃখ দুর্ধার।

জানিনাতো আছে কিনা এর চেয়ে আরো বিপর্যয়।
স্থির কোনো প্রত্যাশায় যে-রাত্রি প্রভাত হবে, তার
আহ্বানে পেতেছি কান, জীবনকে সব যন্ত্রণার
নাগালের বাইরে নিতে গিয়ে হয় সর্বশক্তি ক্ষয়।

কবে প্রপাতের স্বর হৃদয়ের রক্তের ভিতরে
সাড়া তুলেছিল, ঘুরি অতৃপ্ত অনন্ত কালধরে।

স্বপ্নে ছোটো হাত — শোভন সোম

দেয়ালে লণ্ঠনে কাঁপা ছায়া গুলি মুছে গেছে আচ্ছন্ন আলোয়
গল্পের মুগ্ধতা নিয়ে কত দূর চলে গেছে দিদিমা ঠাকুমা
বানানো উজ্জ্বল স্বর্গ কেড়ে নিয়ে গিয়েছে বয়স
বিবর্ণ প্রহর গুলি ইদানীং রণাক্ষেত্রে শবের মতন।

নির্লিপ্ত দেয়ালময় পরতে পরতে পলেস্তারা
ঢেকেছে শিশুর হাতে আঁকা বহু অনর্গল রেখা
দ্বিতীয় বয়স বড়ো ভয়াবহ, বহুধা খণ্ডিত
যেন আমি, যেন আমি চারদিকের দেহি-দেহি মিটিয়ে চলেছি
চারদিকে প্রগলভ জিহ্বা, ইদানীং সব দৃশ্য বিম্বিত দর্পণ……
সব অসম্ভব নিয়ে চলে গেছে দিদিমা ঠাকুমা
প্রাচীন মুগ্ধতা গুলি মুছে গেছে আচ্ছন্ন আলোয়

তবুও স্বপ্নের মত ছোটো হাত সারাদিন বুকে হানা দেয়।

অন্তিম রৌদ্রে — গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শেষ রৌদ্রে শালিকের ওড়াওড়ি দেখে,
কেমন অবাক লাগে; সমুদ্র হাওয়ায়
সৈকতের দূর প্রান্তে ঝাউ এর ছায়ায়
প্রাচীন মন্দির; পথটা গেছে এঁকে বেঁকে।

অভিলাষ, বোঝেনা শালিকেরা;
রণ রক্ত প্রেম ঘৃণা হতাশা ও ভয়
হয়তো অনতিক্রম্য; কী যে দুঃসময়
হৃদয় আবিষ্ট করে। তবু যায় না ফেরা।

নিশ্চিতির রক্ত পথে বিনষ্টির ঘুণ
কখন প্রবেশ করে; ঝড় ভয়াবহ
মূর্তি নেয় অবেলায়, নিরন্ত আগুণ
দগ্ধ করে গৃহ, গ্রহ; স্মৃতি দুর্বিষহ।

শেষ রৌদ্রে শালিকেরা ওড়ে, সুখী পাখি
আলোর নেশায় মাতে; আমি স্তব্ধ থাকি।

অভিজ্ঞান — শোভন সোম

আয়না থেকে হাত বাড়িয়ে ধরতে এলো কে
বললে আমায়, তোর বাগানের রক্ত গোলাপ দে……
বাগানে ঐ একটি মাত্র গোলাপ ফুটেছে।

একটি মাত্র গোলাপ আমার সকল স্বেদের ফল
সব দিয়ে ঐ বেলা শেষের একক সম্বল
আয়না থেকে হাত বাড়িয়ে ছিঁড়তে এলো কে!

না দেবোনা কাউকে গোলাপ, বলতে গেলাম যেই
দেখি বাগান ভূলুণ্ঠিত, গোলাপ আমার নেই
আয়না জুড়ে বিরাজ করে বিরাট অন্ধকার
অপর দিকেও করুণাহীন বিকীর্ণ সংসার।

প্রিয়তমাসু : গৌতম গুহ

আকাশ ছেয়ে ঘনিয়ে এল কাল মেঘের ভয়
বুকটা যেন উঠল দুলে ক্ষুব্ধ নদীর মতো
তীর ছোঁব না কূল ছোঁব না, শুধু সাগরময়
বিলিয়ে দেব উতল হয়ে হৃদয় অস্তত ;
অধুরা হ'য়ে ডুব না দিলে যন্ত্রণা অক্ষয়

এমন করে ডাকবে তুমি কখনো ভাবিনি তো।

পথে পথেই প্রতিধ্বনি ঘুম ভেঙেছে যেই
রৌদ্র-মুকুট পরিয়ে দিল উদ্ভাসিত দিন
ধমক্ মত থম্‌কে ছিল স্তব্ধ এ-বক্ষেই
হারিয়ে গেল অতর্কিতে ; বিচিত্র কী রঙীন
লাগল ছোঁয়া আমার বুকে দুঃখ মাণিক্যেই

এমন করে সাজিয়ে দেবে কখনো ভাবিনি তো।

এম্‌নি করে পরিচয়ের বৃন্তে ফোটে ফুল
স্পর্শপরম দুঃখ বোঝে মোছে মলিন শোক
ক্ষুব্ধ হৃদয় অনায়াসেই অর্বাচীনের ঝোঁক
বিকল করে ; দোদুল্যমান ভ্রমর ও পারুল
সংগোপনে খসিয়ে ফেলে লজ্জার নির্মোক

এমন করে আসবে কাছে কখনো ভাবিনি তো।

চতুর্দশপদী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যস্ত অন্ধকার ঝলসে ওঠে—সেই অলোক শিথানে
সোমপত্রালির মতো জ্যোৎস্না ঝরেছিল কোনো রাতে।
অতিকায় মার্জারের তৃপ্তিরস গগনতরুর
রজতবিল্বক-হেন ঝরে ছিল। আমার বাগানে
কত পদচিহ্ন ছিল, কত পদচিহ্ন আত্মহারা
হয়ে উঠেছিল—কারা মুছে দিয়ে গিয়েছে কে জানে।
অন্তত উদ্‌ভ্রান্ত ওই অন্ধকার জানে না কিছুই।
ও কারও মুখের রেখা বলে যেতে চায়, কোনো স্বর
মুখস্থ শোনাতে চায়—কৃশ দীর্ঘ হাতে-হা-বেচারা—
আমার বুকের সব রাত্রি তুলে কৃশ দীর্ঘ হাতে
সুন্দরীর চোখের অঞ্জন চায় কৌশলে বানাতে।
ও জানে না অলৌকিক নিশিত অস্ত্রের ফলা ছাড়া
কেটে তোলা যায় না এ রাত। শুধু ব্যস্ত হয়ে দূর
জ্যোৎস্নার সঞ্চয় ছিঁড়ে আনে ও রক্তাক্ত ক-টি যুঁই।

একবার ঘুম ভেঙে যায় : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একবার ঘুম ভেঙে যায় আর অনন্ত যামিনী
দেখি চারিধারে।
দ্যুতিমঞ্জরীর মাঝে কীর্ণ হয়ে রয় শশিকলা।
তারই এক তারার দহন এসে নিঃশেষে আমারে
ছুঁয়ে থাকে, আর তার অপলক আর্ত দীপ্তিভারে
মুহ্যমান লাগে—বড় ভয়ানক মুহ্যমান লাগে।
ওই দ্যুতিমঞ্জরীর স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনি,
বলো আমি জানি যারে একমাত্র যারে আমি চিনি—
সে কোথায় থাকে।
সে কোন আকাশতলা ছুঁয়ে রয় কোন-আকাশতলা
চরণ-ছোঁয়ায় জ্বেলে রাখে।

অনুচ্চার : তিনটি কবিতা

মানস রায়চৌধুরী

১. এতকাল কাউকে বলিনি, শুধু বলেছি নীরব
তুমি জেগে ওঠো এই ভাবে
কিশোরীর গোপন লজ্জার মত বেড়ে ওঠো মৃদু,
রিবনে, সুগন্ধী তেলে, প্রথম শাড়িতে
বিস্ময়ের, বিষাদের, অস্ফুট খুশীর চূড়া পার হয়ে জাগো
অম্লান

ভাবনার অদেখা দিগন্তগুলি অতিক্রম করে
লীন জাগো আমার অন্তস্থঃ স্বপ্ন, সম্ভবা অনল
চতুর্দিক ঢেকে গেছে যান্ত্রিক শূন্যতা, এই বিচ্ছিন্ন উৎসারে
"জেগে ওঠো, জেগে ওঠো" এই মন্ত্র তবু অনুচ্চার
অন্ধকারে।

২. অপরাহ্নে চুপিচুপি পাতার ভিতরে লেখা ফোটে।
আমার বাগানী ঘরে ধাতব শব্দের চেয়ে আরো বিভীষিকা
কি করে সঞ্চিত হয় ? তুমি জানো ? কি করে পরিখা,
হৃদয়ের চতুর্দিকে অতি পুরাতন সব ব্যূহ ভেদ করে,
আখরোটে

শুকনো খোসায়, ফলে লেগে থাকে আমার নিয়তি
ছায়া নিচু হয়ে কথা বলে যায় জামরুল গাছে
শুনিনি, তাই কি মনে হয়েছিল এত ক্ষয় ক্ষতি
শান্তি ও সুরার অঙ্গীকার ধরে আছে ?

সূর্যের বিবর্ণ মুখ সারারাত, রাতের নিথরে
আমার এই পাঁচ ফুট ঘরে
কথা বলাবলি চলে নিরুত্তাপ বিছানায়, নৈশ করিডরে
দরজা খুলে নিজ্রান্ত হবার মতো উদাসীনতার দীপ্তি এখন
ভিতরে

জ্বলে ওঠে দাহহীন। গাছে, জলে, বিস্ফারিত আমার
অনুকূলে
প্রতি মুহূর্তেই যেন এই সব অভিজ্ঞতা গিয়েছিল খুলে।

৩. আনন্দ, প্রার্থনা আর, নিয়ত ক্ষয়ের
ক্রম পরিণতি পাই মুহূর্ত-জটিল এই বয়সে আমার
কোলাহল শোনা যায় পার্থিব জয়ের
বোঝা যায় দিনগুলি বিবর্জনে সোনা থেকে নিষ্ফল তামার
এখন প্রার্থনা ছাড়া, নতজানু অভিমান ছাড়া কোনো
রীতি

গ্রহণীয় হতে পারে ? কথা বলো, কথা বলো দাও
প্রতিশ্রুতি।

এতকাল মন্দির সোপান বড় ব্যবহৃত মনে হয়েছিলো
জনতালাঞ্ছিত সেই সিঁড়ি ভেঙে কোথায় মূর্তির অধিবাস
আমার উপাস্য কেন অত জনপ্রিয়তার আবর্তনে ধরা দিলো
কেন সে হয়নি খুব অস্ফুট আভাস—
কথা না বলেই আমি চলে গেছি, এইসব প্রশ্নের উজানে
এখন সম্পূর্ণ আলো দুই চোখ জেলে দেয়, গহন নির্জ্জনে
ফোটে আনুপূর্ব ছবি, মন্দির সোপান থেকে নারীর মুখের
সাঙ্কেতিক প্রতিলিপি, দৃষ্টির তমাল শাখা কত অসুখের
স্মৃতিরেখা ধরে আছে, এসে ছিল কত চিরন্তন
প্রস্তাব, তর্কের কূট ঘনত্ব, অন্ধকার পথের নির্জন
প্রতিফলনের শূন্যে আজ আসে, প্রার্থিত ক্ষয়ের
উৎসবের প্রিয়লগ্ন, "হাত তুলে কথা বলো" চির অভয়ের।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যরীতি

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

১লা মার্চ কবি ৮৩ তম জন্ম বৎসরে পদার্পণ করলেন। কুমুদরঞ্জন রবীন্দ্রসাময়িক ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের স্বীকৃত কবিদের অন্যতম। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁর আসন সুচিহ্নিত। তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি।

যু: সঃ—

রীতি ও বিষয়ের অবিচ্ছেদে কবিতারা প্রত্যেকে প্রাণময় এক একটি শরীরী সত্তা। বিষয়েরই নিজস্ব বিশেষ চাপে গড়ে কবিতার অনিবার্য রীতি। রীতি ও বিষয়ের ক্রমান্বিত সামীপ্যই ফলে কবিতার পৃথিবীর স্বাভাবিক ঘটনা, সাযুজ্য তার প্রার্থিত সিদ্ধি। এজন্য যেমন একদিকে রীতির পরিচয় থেকে পৌঁছোনো যায় এসে বিষয়ের রহস্যে তেমনি কবিতার বিষয়টি অধিগত হলে রীতির দিশাও কিছুটা মেলে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরও কবিতাগুলো পড়া হয়ে গেলে পাঠকের মনে তাঁর কাব্যবিষয়ের যে স্মৃতি থাকে, সেখান থেকেই তাঁর কাব্যরীতির, তাঁর বিশেষ শিল্পপদ্ধতি বিষয়ে মোটামুটি একটা খসড়া গড়ে তোলা যায়।

এ কবির কবিতার একটা বড় অংশের, বা বলা চলে প্রধানতম অংশেরই প্রেরণা কবির নিজের গ্রাম। এইখানেই কেটেছে আজীবন এবং এখনও। এখানকার মানুষ, পশু কীট পতঙ্গ পাখি, নদী গাছ সব কিছুর সঙ্গেই কবির দীর্ঘ সময়ের পরিচয়। এতদিনকার একসঙ্গে থাকার সহজ মমতার সম্পর্ক। এতদিনের চেনা সব বিষয় সুতরাং এদের কথা ছাড়া আর কথা কই, এবং প্রয়োজনই বা কোথায়। পরিচিতের জন্য ভালোবাসা থেকেই কুমুদরঞ্জনের কবিতা। পরিচিতের সম্পর্কে পরিচিতের সেই কথায়, তাঁর কবিতায় অতএব কোনো ব্যাকুল উচ্ছ্বাসের ভাব, অতৃপ্তি বা নিগূঢ় সন্ধানের ছায়া স্বভাবতই তেমন কিছু নেই। প্রিয় নদী অজয়, নানা যুগের সোমনাথ মন্দির, গ্রামে নেমেছে অন্ধকার রাত্রি, ফাটলে ফোটে ফুল, কিম্বা অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ, ভক্তি বা জীবনের সঙ্গে বহুজন্মের বাঁধন প্রভৃতি কথায় কখনো কখনো ঝুঁকেছেন অতিরেকে, অসঙ্গত সাদৃশ্যের কল্পনায়, চোখ রেখেছেন দূরাভিসারে। তবু এই উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা, এই দূরের দিকে তাকিয়ে রাখা, তাঁর সব কবিতা পড়া হলে মনে হবে অনেকটাই যেন ব্যতিক্রম। বিষয় ভাবনায় কুমুদরঞ্জনের আকর্ষণ প্রধানতই স্থিরতায় ও সীমায়িতে। নিজেও তিনি সে ব্যাপারে সচেতন অনেককালই। প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'একতারা'র ভূমিকায় লিখেছিলেন: "বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড় সুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থও নাই।" প্রথম জীবনের এই ভূমিকা থেকে এতদিনকার কাব্য জীবনে কুমুদরঞ্জন সরেও আসেননি বিশেষ।

বিষয়ের সে অনুচ্ছ্বাসিত মমতার ভাব থেকে তাঁর কবিতা কখনোই খুব দীর্ঘাকার হয়নি। অল্প পরিসরেই তাঁর কথা

শেষ হয়েছে। বলার চালে এসেছে বেড়া দিয়ে ঘেরা চেনা পরিবেশে দীর্ঘবাসের সহজ পরিতৃপ্তির ভাব, রচনা হয়েছে প্রধানতই নিরুত্তাপ, বিবরণধর্মী। কবিতার মধ্যে নিজেও জানিয়েছেন উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দের দাপতে তাঁর মধুকর ভীত সন্ত্রস্ত, সে চায় ছোট একটি মৌচাক খেজুর কুঞ্জে কিম্বা মাধবীর শাখায়। সে মৌচাকের রচনাভঙ্গীও এতই নিরাভরণ ও অনায়াস যে সময়ে সময়ে মনে হয় বুঝিবা সরলতম, বিশেষত সময়টা তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন, আকণ্ঠ নিমগ্নও কেউবা। রবীন্দ্রনাথের অন্ত বহুকাব্যের যেমন 'সোনার তরী' কি 'কল্পনা' বা 'পূরবী'র পাশে "গীতাঞ্জলী" বা "ক্ষণিকা" বা "পলাতকা"র রচনারীতি কিছু নিরাভরণ এবং সেই অর্থেই মাত্র সরল। না হলে এ সরলতার অভ্যন্তরেও প্রবাহিত ব্যাপ্ত বিষাদ, সীমাহীন আনন্দ; সেখানেও আছে ঘূর্ণী নক্রমকর পরিকীর্ণ; সে সরলতা মোহিনী মায়া, কখোন নিয়ে যায় চোখের পলকে দূরে, আরও দূরে। তার পাশে কুমুদরঞ্জনের সরলতার অর্থ আভরণহীনতাই শুধু নয়, তা পরিচিতের চেনামুখের। সে নয় মোহ বা মায়া, সে যেন মমতার স্নিগ্ধতা, প্রিয়জনেরই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অথচ সেও এক কবিতারই পৃথিবী। কুমুদরঞ্জনের কবিতার পৃথিবীটিই মমতার, স্নিগ্ধতার, স্পষ্ট আলোকিত সহজতার। এখানে যখন অলংকারের ব্যবহার তাতেও বহুবর্ণ বিলাসের চেয়ে ক্ষীণ দীপ্তিরই স্নিগ্ধ প্রবাহ। কবির নিজের ভাষায় দীপালীর দিনেও তিনি জ্বেলেছেন মাটিরই প্রদীপ, তবে সেদিন তারা সংখ্যায় কিছু বেশী এটুকুই যা পার্থক্য। নাহলে নিরাভরণ রচনার পাশে কুমুদরঞ্জনের অলংকৃত কবিতাও কিছু কম নয়।

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,...
বুড়ো খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে
এ জনমে মিলবে না তো আর।
(শেষ চিঠি, স্বর্ণ সন্ধ্যা)

হায় আঙুরের বাক্সে আমার রাখিল কে হীরাচুর?
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর বেদনায় ভরপুর?
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল আজি মন্দিরদ্বার,
আছে ধূপ দীপ বিল্বপত্র—দেবী যে নাহিক আর।
(শেষদান, অজয়)

সুনীল নভ সম প্রেম যে নিরমল
নাহিক উচ্ছ্বাস তাহাতে
ভাষা তো নিদাঘের বারিধি উচ্ছল
কল্লোল পারে শুধু জাগাতে।
(প্রেম ও ভাষা, বীথি)

পাঠাইতে পরের ঘরে কেঁদেছিলে বড়,
আজ কে কেঁদে ফিরে এলাম, মাগো কোলে কর...
সাঙ্গ হলো সে ফুলসাজ
ফুলদানী হায় ধুনাচি আজ,
কুশীকরে' কে আনিল কাজল লতাটিরে
(প্রত্যাবর্তন, অজয়)

অলংকৃত এরকম কবিতা ছাড়া আবার এমন কিছু রচনাও আছে যারা যেন বিশেষভাবে কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের দিকেই চোখ রেখে লেখা, অথচ পরিকল্পনার যান্ত্রিকতা অতিক্রমকারী আবেগের স্বাভাবিকতা সেসব অনেক কবিতার ক্ষেত্রেই অব্যাহত। সেক্ষেত্রেও অশ্রুনিবাস, অনাগতের দেশে, ভুল, ব্যাঙের অস্ত্র, বিষাদ ছবি, দ্বিতীয় শৈশব, কন্যারজনী, চেনাচেনা, দুঃখের রাজ্য, অমরবিদায় প্রভৃতি কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এদের ভেতর আবার দুরকম কবিতা আছে। একভাগের কবিতাগুলোর বক্তব্য খুব বড়কিছু বা বেশী কিছু নয়, আরেকভাগে বক্তব্য বিষয়টি তুলনায় কিছু গভীরতার দিকে অগ্রসর। উভয়তই অবশ্য কোনো বিশেষ

সাদৃশ্যের সূত্রে কিছু ছবি খণ্ড বা সম্পূর্ণ পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সে সাদৃশ্যের সূত্র কোথাও কবিতার নামে, কোথাও বা কবিতার মধ্যেই আভাসিত এবং ঐ সাদৃশ্যই এসব কবিতার বক্তব্য : খোকার কাজলচোখে জল ঝরছে, জল নেমেছে তরুণীর দুই নয়নে, কাঁদছেন বৃদ্ধ এবং অশ্রুপ্লাবিত সন্ন্যাসী। এরা প্রত্যেকেই কাঁদছে বা কাঁদে। সেই কান্নাই সকলের মধ্যে যোগসূত্র। অথচ প্রত্যেকেরই অশ্রুর জগৎটি স্বতন্ত্র। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে কবি এই স্বতন্ত্র জগৎগুলোর কল্পনা গড়ে তুলেছেন। খোকার চোখের জলে একটি কোমল কল্পনার পৃথিবী, নীলোৎপলের ফাঁকে সেখানে ডেকে যায় অমলধবল মরাল শাবক, মুক্তাগলা বৃষ্টিধারায় কেঁপে ওঠে সেখানকার পদ্মপাতা, পরীর ফুৎকারে হেমগিরিতে ছড়িয়ে পড়ে জুঁই এর খই। হাসিতে ভিজে আছে খোকার কান্না। টুকরো টুকরো এই ছবিতে প্রত্যক্ষ এক শৈশব ভুবন। তেমনি করে প্রকাশিত তরুণীর তরুণ নারীত্ব, বার্ধক্যের বিষতিক্ত যন্ত্রণা, সন্ন্যাসীর ভক্তিপূত মন্দাকিনীধারাস্নিগ্ধ এক পৃথিবী। এই স্বতন্ত্র চারটি অশ্রুজগতের প্রত্যক্ষতাই কবিকর্মের দিক থেকে যথেষ্ট সিদ্ধি। কিন্তু কুমুদরঞ্জন এক্ষেত্রে সম্ভবত আরও কিছু ভেবে থাকবেন যেজন্য চারটি স্বতন্ত্র কবিতা না রেখে 'অশ্রুনিবাস' এই একটি নামের সুতোয় তাদের চারটি স্তবক হিসেবে বেঁধে দিয়েছেন। সে নির্দেশ সম্ভবত এই যে এই চারটি জগৎ স্বতন্ত্র হয়েও এরা সকলেই কান্নার, একই সেই ক্রন্দন, তবু প্রত্যেকেরই নিজের জীবনের ছায়ায় সে কত বিচিত্র, এ কবিতা অশ্রুবিচিত্রার কবিতা। অথবা দেখা যেত পারে 'অনাগতের দেশে' কবিতাটি। যে ফুল আজও ফোটেনি, বাঁশীতে যে সুর আজও জাগেনি, যেদিন এখনও অনুদিত, অন্ধকারে অনুপস্থিত যে রাত্রি—কবির চেতনায় ভগীরথের গঙ্গাবতরণের প্রার্থনা, শবরীর রামের জন্য প্রতীক্ষা, কুব্জার প্রেম, যশোদার বাৎসল্য এবং সাধুর সাধনা, পাপীর যন্ত্রণার শান্তি ও অপ্রাপণীয়ের উদ্দেশে কবিদের দুর্বার প্রয়াসও যেন সেই সব ফুল সুর দিন রাত্রিরই সগোত্র। বিষয় ও বস্তুরা এখানে বিচিত্র ফলে তাদের ভাবসাদৃশ্যটি আরও আশ্চর্য। এরা সকলেই অসম্পূর্ণ, অসম্ভাবিত এবং সেজন্যই এদের জগৎটিও এক ও অবিচ্ছিন্ন তারই নাম অনাগতের দেশ। কবিতাটি পড়ে অনুভব করা যায় যে এই যা একটি নামমাত্র, সে-ও এক দেশ, গোপনতার, অন্ধকার আরাধনার, কোমল এবং অভিরাম। বিষয়গুলি নানাস্তরের, কিন্তু কবির সাদৃশ্য বোধের ফলে একটি নূতন মূল্যবোধের দিক যেন উদ্ভাসিত। ভগীরথ ও শবরীর, সাধু ও কবির সাধার স্পর্শে দিনরাত্রির আবির্ভাব ও ফুলের ফুটে ওঠায় জাগে অভাবিত মহিমা। আর অনুভবে প্রত্যক্ষ হয় সেই অনাগত দেশের রঙ ও চাপ—যা গোপন এবং অন্ধকার অথচ স্বচ্ছ ও মহিমামণ্ডিত বিরামহীন অশ্রুপ্রবাহে। এসব কবিতা শেষ হয়েছে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত মাত্রে। আবার 'অমর বিদায়' শ্রেণীর কবিতায় প্রতিটি চিত্র যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানেই ধ্রুবপদে কবিতাটির মূল সাদৃশ্য সূত্র ও বক্তব্য বারবার ধ্বনিত হয়ে সাদৃশ্যের নির্দেশটি স্পষ্টতর এবং অশ্রুনিবাস প্রভৃতির তুলনায় বক্তব্য গভীরতর। এ শ্রেণীর কবিতা ছাড়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ভৃত্য, বন্যা, ঝঞ্ঝা জাতীয় কিছু কবিতাতে বলার ঝোঁকটাই যেন বিশেষভাবে প্রসাধিত। তাছাড়া দীনতার আশ্রমে, সোনার স্মৃতি, দুঃখের রাজ্য, বীরভদ্র এবং বহু কবিতাতেই পুরাণের ব্যবহারে শুধু যে কুমুদরঞ্জনের মানসপ্রতিবেশ বিষয়েই অবহিত হতে হয়, তা' নয়, একথাও মনে হতে থাকে যে বক্তব্যকে সজ্জিত সমারোহ দানে তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত, অসতর্ক বা অনিচ্ছুক নন।

শেষ পর্য্যন্ত অলংকরণ এবং অলঙ্কারহীন এরকম কোনো ভাগে কুমুদরঞ্জনের বিশিষ্টতাকে সরলতাই যার নাম, চিহ্নিত করা সবসময়ে সম্ভব নয়। প্রয়োজন ও প্রেরণানুসারে তাঁর কবিতা ঐ দুই পথেই অগ্রসর হয়েছে। তবে এই দুই পদ্ধতির পার্থক্যটা কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে সম্ভবত এখানে যে, অলংকৃত রচনাভঙ্গীতে তাঁর নিজস্ব বিশেষ কাব্যজগৎ, মানসগঠন কখনো

কিছুবা আড়ালে পড়ে যায়। আর যেখানে বা আচ্ছন্ন নয় সেখানেও সাধারণত অলংকৃত বলবার ভঙ্গী ঘিরে পাঠকের মনে কঙ্কনঝংকার বা বিচিত্র বর্ণবিলাসের যে স্মৃতি জেগে থাকে, কুমুদরঞ্জনের অলঙ্কারের গতি সে দিকে নয়। নম্র শান্ত এবং প্রসন্ন তাঁর কবিস্বভাবেরই প্রসাদ তাঁর অলঙ্কার। আর সেজন্যই সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অলংকারহীন কবিতাতেই তাঁর আপন বিশিষ্ট সুর সাধনাটি এত অব্যবহিত।

আভরণহীন কুমুদরঞ্জনের সেইসব রচনাকে অনেকেই হয়তো কবিতা বলে স্বীকার করে নিতে সংশয় বোধ করবেন। কিন্তু অনেকগুলো সেরকম রচনা পড়বার পর যে অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে, সে-ও কবিতা পাঠকেরই অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের চৈতালি কাব্যের স্মৃতি থেকে বিষয়টি স্পষ্টতর করা যেতে পারে। চৈতালির অধিকাংশ রচনাই আপাত-দৃষ্টিতে কিছু দৃশ্য, ঘটনা বা বিষয়ের যথাযথ বিবরণমাত্র; কবিতা ঘিরে যতরকম অতিরেক এবং বিপর্যস্ততা পাঠকের মনে কাজ করে সব যেন কবি এ কাব্যে ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রেখেছেন। সত্যিই বুঝিবা এখানে সব অলঙ্কার ছেড়ে এসেছে তাঁর গান। স্বভাবেরই সহজ সুরে যেন এখানকার কথা, যেন 'কণিকার' প্রস্তুতি। অথচ এ-ও অনুভূত যে সেইসব কথা বর্ণিত বিষয়, ঘটনা এবং দৃশ্যের, অতিরিক্ত। কথাবলার এমনই একটি চাপ তৈরী হয়েছে যে সে কণ্ঠস্বর পরিচিতকেও রূপান্তরিত করেছে কবিতার অচেনায়, মনে হয় আমরাও এসবই দেখেছিলুম, তবু কি যেন দেখিনি তাই আর ফিরে তাকাই নি, এখন আবার দেখতে ইচ্ছে করে, বার বার ফিরে ফিরে। সবজড়িয়ে সাধনাপর্বের সাহিত্যসাধনায় বাংলাদেশের মানুষ ও নিসর্গ থেকে রবীন্দ্রচেতনায় যে একটি পরিপূর্ণতা ক্রমেই আসন্ন (ছিন্নপত্রে যার ক্রমবিকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট) সেই পূর্ণতার রসভারে আনত একটি মানসিকতার উপহারেই চৈতালির রচনাগুলিকে, সতর্ক না হলে নিরাসক্ত বিবরণ থেকে যাদের পৃথক করে চেনা অত্যন্ত দুরূহ, কবিতা ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। কুমুদরঞ্জনের রচনাভঙ্গীর দিক থেকে সরলতম রচনাগুলির অভিজ্ঞতাও অনেকটা সেই শ্রেণীর। চৈতালির শিকড় হয়তো বাঙলাদেশ কিন্তু তার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে বিপুল বিশ্বে বিশাল কালস্রোতে। কুমুদরঞ্জনের একতারা তার কাছে নিতান্তই আপনার গ্রামটিতে নিবদ্ধ-দৃষ্টি। তবু কবিতায় লেখা সেই গ্রামটি কবির চোখে না দেখলে আমরা নিজে এমনটি দেখতে পেতুম না যেমন পারেন না বহু গ্রামবাসীই। ডায়ারী লেখার মত করে লেখা সে সব কবিতাগুলো: নিষাদের শরবিদ্ধ হয়ে এসে পড়লো একটি পাখী, চোখের ওপরে দেখলেন সেই করুণ মৃত্যু—

তার সে চাহনি যে কথাটি হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।

অথবা, আত্মীয় পরিজনহীন বিপত্নীক বৃদ্ধ কামারের একমাত্র পুত্র। পাহাড়ের গায়ে যেন ঝরণাধারা, বৃদ্ধ পিতার তরুণ পুত্র। তার বিয়ে হলো "ভাঙামালকে অশোক ফুটিল যে রে।' সেই ছেলে মারা গেল, 'প্রতিপদ চাঁদ ডুবিল আঁধার করি'। অন্যত্র পোষা গরু দুটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রেতা। বাড়ীর ছোট ছেলে দুটি কাঁদছে। গরুটা পেছন ফিরে তাকায় বারবার:

কাতর সে কটি আঁখির ভাষাটি মরি।
বুঝাতে পারিনে আঁখি উঠে জলে ভরি।

আরেকটি কবিতায়: করবী ফুলে করবীর পাতায় সকালবেলা দুটি ডিম রেখে মারা গেল প্রজাপতি। একসময় নড়ে উঠলো করবীর ডাল। প্রজাপতিটি পড়ে গেল—

শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি।
শুভমঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি
নিঃশেষ করি ঢালি দিল যেন হৃদি।

এইরকম অতি পরিচিত এবং নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়েই কুমুদরঞ্জনের কবিতার আগ্রহ। অথচ যদিও বিষয় তুচ্ছ, বিচ্ছিন্নভাবে পংক্তিবিশেষেও অধিকাংশতেই তেমন আকর্ষণীয় কিছু নেই তবু কখোন অজ্ঞাতসারে এইরকম অনেকরচনা পর পর পড়ে গেলে পাঠককে ধীরে ধীরে সংক্রমিত করে একটি কোমল স্নিগ্ধ মনের অন্তর্গূঢ় সাহচর্য ও সেবা। এখানে সেটুকুই বিষয়ের অতিরিক্ত। আর এই অতিরিক্তের সংক্রমণেই যদি মহৎ তাকে না-ও বলা যায় কবির স্বীকৃতি দিতেই হয়। কারণ বিষয়ের অতিরিক্তেই কবিতার আশ্রয়। বিষয়ের অভিমুখে অন্তর্লীন করে তোলাই কবিতার কাজ, পাঠকের মনেও ঘনিয়ে তোলা সৃষ্টির অবকাশ ও প্রবণতা। বিষয়ের ঐ অতিরিক্তের রূপালি পাড় থেকেই এখানে অনুভব করা যায় একটি মন, আরও পরিণতিতে অনায়াসেই যা সর্বদা জেলে দিতে পারে দৃশ্য বস্তু বা ঘটনার অভ্যন্তরস্থ এক স্থির শিখা যারই দীপ্তিতে লৌকিকে জাগে অলৌকিকমায়া, চেনা হয়ে ওঠে অচেনা, বিবৃতিমাত্রই যেন বা কবিতা। কুমুদরঞ্জনের এ রকম অজস্র রচনা আছে সম্মিলিতভাবে যারা, যা লেখা আছে সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি, যেন অন্য কোথাও যেতে চাইছে, অন্য কোনকথা বলবার জন্য তারা প্রতীক্ষায় কম্পমান, অস্থির। কোমল বেদনার মত তাদের ঘিরে আছে প্রতিশ্রুতির স্পর্শ।

অথচ আশ্চর্য এই যে সেই সব অনেক কবিতার অলঙ্কার থাক বা নাই থাক শব্দ সুনির্বাচিত হোক বা না হোক সব মিলিয়ে তাদের ভাষার মধ্যে কোনো বিশিষ্টতা, বলবার রীতিতে কিছু বা স্বকীয়তা তেমন নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে না। ভারতচন্দ্র কিম্বা বিদ্যাপতি, সত্যেন্দ্রনাথ কি বিহারীলাল, এমনকি গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রমুখ কবি যেমন ভাষাভঙ্গীতেই স্বতন্ত্র কুমুদরঞ্জনের ভাষা ব্যবহারে সে জাতীয় কিছু স্বকীয়তা নেই। বিশিষ্টতার প্রায় সব চিহ্ন মুছে যাওয়া এবং প্রধানতই বিবরণধর্মী গদ্যে ব্যবহৃত ভাষার ছন্দেই কিন্তু কুমুদরঞ্জন গড়ে তোলেন তাঁর কবিতায় সেই প্রতিধ্বনির মত একটি ক্ষীণরেশ। গদ্যের দৃঢ়তা নেই, কিন্তু গদ্যের ঢিলেঢালা ভাবে কোনো মতে কথাটা বলে ফেলার ধরণেই তিনি কবিতায় ভাষা ব্যবহার করেছেন, অতি সহজ স্বাভাবিক অভ্যাসে। কবিত্বের চাপ ভাষার ভঙ্গীতে যেন ততটা নেই :

যুগযুগ পরে কোনো স্থলপথে হয়তো হইবে দেখা
পথিকের মত পরিচিত তটে আসিয়া দাঁড়াবো একা
জন্মান্তর সৌহার্দ্যের বাণী
হয়তো হইবে সমীরণে কানাকানি
শুধু চেনাচেনা লাগিবে তোমার আধোভোলা সুখস্মৃতি।

বিশেষত্বের স্পর্শবর্জিত এই ভাষা। জন্মান্তর সৌহার্দ্যের বাণী বাক্যাংশটি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জাগিয়েও এ কবিতার গদ্যময়তাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কবিতাটির বেদনার দিক থেকে আধভোলা শব্দটির ধ্বনিগত অনুষঙ্গ যথেষ্ট সঙ্গত বিবেচিত হবে না।

ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে
ভাবুক পথিক বলবে হেসে লোকটা ছিল খাসা। (হয়তো)

'ভাবুক পথিক' শব্দ ব্যবহার পূর্ববর্তী পংক্তিদ্বয়ের পরে কেমন যেন দীপ্তিহীন এবং 'খাসা' শব্দটিও কবিতার ভাব মণ্ডলকে কিছুটা চকিত করে স্বপ্নভঙ্গ ঘটায়। অথচ এইসব রচনাংশ কুমুদরঞ্জনের সার্থক ও প্রিয়পরিচিত কবিতারই অন্তর্গত। যেখানে কবিতার ততদূর সার্থকতানেই সেখানে বিবরণধর্মী এই গদ্যময়তা এবং শব্দব্যবহারে কাব্যগত অসতর্কতা তুলনায় প্রকটতর :

কেউ লেখনী কেউ তুলিকাধরি'
নামটি চাহে রাখতে অমর করি
উপকরে কেউ এ বর শুধু মাগি
শিশু যখন করে ইহার লাগি'

ইহার লাগিই যুদ্ধ দেবাসুরে
ইহার তৃষাই জাগছে ভুবনজুড়ে'।

সামান্য নহ তুমি ভাবময়ী তুমি যে অতুলনীয়া
মাটি হয়ে যাক সরস সদয় হিয়া
হেরেছি তোমার চিন্ময়ী রূপ আমি দুনয়ন ভরি'
ভুবন তুমিই তুমি ভুবনেশ্বরী।

প্রত্যয়মূল শব্দব্যবহারে যুক্তিশৃঙ্খলাপ্রধান গদ্যের ভাষা থেকে এখানে কোনো পার্থক্য নেই এবং অনুপস্থিত কোনো স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা।

ভাষাকে আটপৌরে রেখে তারই মধ্যে বিশিষ্টতা অথচ সেই আটপৌরে ভাষার একটি বিশিষ্ট আস্বাদ কণিকা বা পলাতকায় যেমন আছে কুমুদরঞ্জনে তেমনও নয়। আবার তিনি নন সোনার তরী, চিত্রা বা পূরবীর ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার অধিকারী। কুমুদরঞ্জনের কবিতার ভাষা এ দুয়ের মধ্যবর্তী। তার কিছু সাদৃশ্য হয়তো মেলে কালিদাস রায়, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ কবির অল্পবিস্তর অনুসৃত এক ভাষায় যার ভিত্তি প্রধানত সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞানচর্চা ও আনুষঙ্গিককর্মে ব্যবহৃত ব্যক্তিবিশেষত্ব বর্জিত পোষাকী বাঙলা, লেখাতেই যা সমধিক প্রযুক্ত, কখনো বা বক্তৃতাতেও। এরা কেউ কেউ সেই ভাষারই সঙ্গে কিছুটা যোগ করেছেন রবীন্দ্র প্রসাধন এবং কুমুদরঞ্জন সম্ভবত ন্যূনতম। তবুও যে কুমুদরঞ্জন এরকম এক ভাষাতেই হৃদয়ের কথা বলতে পারলেন, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো না তাঁ'র কবিতা এবং বহু শিক্ষিত কাব্যপাঠকেরই তিনি তৃপ্তিবিধান করেছেন, তা'র বড় কারণ তাঁর কথাবস্তুর অন্তর্গত কাব্যসংস্কার, যার কিছুটা ঐতিহ্যগত এবং কিছুটা গড়ে দিয়েছে তাঁর বিশিষ্ট মানসভঙ্গী। কুমুদরঞ্জনের কথাবস্তু আজীবন বাঙলা কবিতার দীর্ঘকালের স্বাভাবিক ও সাধারণ সংস্কারের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, সীমা অতিক্রম করেনি কখনোই। সমালোচক লিখেছেন 'তাঁহার অনুভূতির গভীরতা থাকিলেও, ভাবগুলি বিশেষ নয় সাধারণ।' ভাববস্তুর এই সাধারণত্বই সম্ভবতঃ ভাষার ক্ষেত্রেও কুমুদরঞ্জনকে বিশেষত্ব পরিহারে প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

অথচ বিবরণাত্মক গদ্যধর্মী এভাষায় কুমুদরঞ্জনের কবিতার ভাষারীতি অসুন্দরও হয়নি। বাঙলাদেশের পটশিল্পী যদি পিতৃপিতামহের ধারাটি নিপুণভাবে অনুসরণ করে' কিছু ছবি আঁকেন, না-আনেন নূতন বিরোধী-ধর্মের কোনো বিন্যাস, কুমুদরঞ্জনের ভাষায় সৌন্দর্য সেই গতানুগতিকতার দীর্ঘকালের প্রবহমান সংস্কারের অনুবর্তিতার বিরোধভীরু তৃপ্তি। ভাষা সম্পর্কে নতুন পদ্ধতির অনুশীলনে যেমন তিনি নিমগ্ন হননি তেমনি তাকে রক্ষা করেছেন রুচিহীনতা থেকে। আসলে কুমুদরঞ্জনের কবিতা বক্তব্যে পূর্ববর্তী যুগ থেকে বিশিষ্ট হয়েও কাব্যরীতির ক্ষেত্রে তাঁর আগের একশবছর, বা আরও পেছিয়ে গিয়েও বাংলাকবিতার যে রীতি, সেখান থেকে বিশেষ সরে আসেনি। হেমচন্দ্র বা রঙ্গলাল এমনকি ঈশ্বর গুপ্তও কুমুদরঞ্জনকে সহকর্মী সহব্রতী বলে চিনতে পারবেন এবং কৃত্তিবাস বা মঙ্গলকবিদেরও কোনো বাধা নেই, অথচ ইতিমধ্যে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের মত নায়ক বাঙলা কবিতায় আবির্ভূত, কিন্তু কুমুদরঞ্জন লিখেছেন সেই প্রাকৃতবিবরণেরই রীতিতে। অথচ তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজস্ব। পুরাতন সেই রীতিতে বক্তব্যের সেই নিজস্বতা এজন্যই প্রতিধ্বনির মত ক্ষীণ। হয়তো এই ক্ষীণতা থেকে আরও অগ্রসর হলে তাঁর রীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিত। কুমুদরঞ্জন অবশ্য ততদূর যাননি। ফলে তাঁর কাব্যরীতি প্রধানতই রয়ে গেছে বিবরণধর্মী, তবু পূর্বযুগের তুলনায় তাঁর মানসিকতা এই বহির্মুখী রীতির মধ্যেও সঞ্চারিত করে গেছে অন্তর্মুখিতা এবং সেখানেই কুমুদরঞ্জনের কাব্যরীতির স্বকীয় স্বাক্ষর।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

* * *

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

* * *

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

অনিল রায়ের — সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩'৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তনব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১'২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭ (ডাকে)

পাওয়া যাবে :—

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫'০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
কর্মবাণী	১'২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২'৫০
মানুষের মত মানুষ	'৬২
শিশু রামায়ণ	'৬২
শিশু মহাভারত	'৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩'০০
বাংলার মনীষী	১'২৫
বাংলার বিদুষী	২'০০
বীরত্বে বাঙালী	১'৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২'০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩'০০
রাজর্ষি রামমোহন	১'০০
রবীন্দ্রনাথ	১'০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১'২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১'৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১'৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

টার্কো*

কৃষ্ণা দাশগুপ্ত

এ রবিবার সকালে ছোটখাট তামাটে রঙের বিদেশীটিকে তার গীর্জার ধারের ছোট কুটিরটার বাগানে দেখা গেল। টার্কো নামের ছোট কালো কুকুরটির সঙ্গে সে কথা বলছিল। এই প্রথম গ্রামের অধিবাসীরা ওদের দেখলো। ছোট, প্রায় মেয়েলী হাতখানাতে সে একটি বিস্কুট উঁচু করে ধরেছিল।

"শুয়ে পড় টার্কো" সে বলে, "না টার্কো, উঠবে না, এই যে টার্কো, শুয়ে থাক, না টার্কো তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল টার্কো, তাকে দেখাচ্ছিল হত-বুদ্ধি এবং সতর্ক। সে একটি দো-আঁশলা কুকুর। সাদা বুকটা ছাড়া সবই তার কালো। একটি ফক্সটেরিয়রের মতই তার আকৃতি। হয়তো আর একটু পাতলা গড়নের, পায়ের দিকটা আর একটু লম্বা। "এখন শুয়ে পড়"—তার প্রভু বলে, টার্কো আধা বসা, আধা শোওয়ার ভঙ্গি করে লাফিয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করে তার প্রতিবাদ জানালো। তার মুখখানা ছিল কাটা কাটা এবং ছুঁচলো। তার মস্তবড় খাড়া এবং ছড়ানো কানদুটি তার মুখে একটি খেঁকশিয়াল বা বাদুড়ের ভাব এনে দিয়েছিল, আর তার মুখের শহুরে উজ্জ্বলতার ভাবটা বাড়িয়ে তুলেছিল। তার একটা চোখ খুব উজ্জ্বল এবং কালো, আর একটা ছিল সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।

তার ধৈর্যশীল প্রভু আবার চেষ্টা কোরলো—"এই টার্কো, বোসো, টার্কো স্থির হও।" কিন্তু টার্কো স্থির হোলো না। সে কাঁদলো, ঘেউ ঘেউ কোরলো। শেষকালে সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো এবং হাতদুটো জড়ো করে পাগলের মত উপর নীচে দোলাতে লাগলো, যেন প্রভুর কাছ থেকে বিস্কুটটা ভিক্ষা চাইছে।

একই রকম পাথরের নীচু দেয়াল ঘেরা বাগানটি, কাজেই গ্রামের ময়দান থেকে তার সবকিছুই দেখা যেত। দেয়ালটি কষ্টেসৃষ্টে হাঁটু সমান লম্বা হবে। প্রচুর পরিমাণ লতানে ফুল এবং হলদে এলিসিয়ামের বড় বড় ঝাড় ওর গায়ে জন্মা-চ্ছিল। কোন কোন জায়গায় দেওয়াল একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল, এবং পাথরগুলি অন্য লোকেদের দেওয়াল এবং পাথুরে রাস্তা সারাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দেওয়ালের ভিতরে বাগানটি অযত্নরক্ষিত, কিন্তু রংয়ের দাক্ষিণ্যে ঝলমল করে বাড়ছিল। এর মধ্যেই ঘাসটা কিছুটা এলোমেলো ভাবে ছাঁটা হয়েছিল, যাতে করে সাদা এবং বাদামী গোছা যেগুলিকে বহুবছর ধরে বাড়তে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। তখনও কাস্তেখানা কুটিরটির ইটের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। কিছু নিষ্কর্মা লোক দাঁড়িয়েছিল গ্রামের ময়দানটিতে। দুচারজন করে লোক গীর্জা যাওয়ার পথে এসে দেখা দিতে লাগলো। ছোটখাট অপরিচিত মানুষটি, বোধহয় লজ্জা পেয়ে বাগান

---

* T. O. BEACHCROFT-এর TURCO SHUTS THE DOOR-এর ভাবানুবাদ

ছেড়ে টার্কোর সঙ্গে ভিতরে চ'লে গেল। প্রার্থনার পরে ভিড় যখন আস্তে আস্তে কমতে লাগল, তখনও তাকে দেখা গেল না। পরে যখন একদল লোক জড় হয়ে সরাইখানার বাইরে বসে বিয়ার খাচ্ছিল, সে তখনও বাড়ীর ভেতরে বসে ছিল। দুএকবার সে বাইরে এসেছিল কাবেখানা তুলে রাখতে বা জট পাকানো অগোছালো ফুল দু একটা তুলতে।

ময়দানের ঠিক ওপারে যে গীর্জ্জা খামার তার মালিক, মিঃ কামিন্স পায়চারী করতে করতে 'দি ক্লাইম্বিং রোজ'এ এসে উপস্থিত হলো। তার পেছনে তার ওয়েলস্ দেশের ভেড়া পাহারা দেওয়ার কুকুর। বাইরে বড় দুটো গাছের ছায়ার নীচে পাতা বেঞ্চ ও টেবিলে যে দলটি বসেছিল, সে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কামিন্স ছিল বেঁটে, অনেকটা শূয়োরপানা, ছোটখাটো মানুষ। রোববার দিন গলা খোলা শার্ট, নী ব্রিচেস্ এবং কালি লাগানো রোজকার কাজ করবার জ্যাকেটটা পরেই থাকতো সে নির্ভাবনায়। প্রতি রবিবার শীত হোক বা গরম হোক বৃষ্টি হোক বা না হোক সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সে বিয়ার খাবেই।

"আচ্ছা", বলে খামারের মালিক, "দেখছি ক্যারিয়ারস কটেজে একটা নতুন লোকের আমদানী হয়েছে।"

"হ্যাঁ কামিন্স, লোকটা বিদেশীমতন দেখতে, ছে টখাটো এবং তামাটে", বল্লে জর্জ অলপোর্ট সরাইখানার মালিক। "লোকটা নিজের বাগানে বেরিয়েছিল গীর্জ্জার সময়ের আগে" আর একজন ফোড়ন কাটে, "কুকুরকে খেলা শেখাতে।" "কি জাতের কুকুর?" জিজ্ঞাসা করে কামিন্স।

"কোন জাতেরই নয়," বলে অলপোর্ট, "একটা ছোট দো-আঁশলা কুকুর"। "একচোখ কানা আবার, অদ্ভুত দেখতে একটা খেঁকি কুকুর।"

"তাকে খেলা শেখাচ্ছে," কামিন্স বলে, বিশেষ অবজ্ঞার সঙ্গে, "খেলা, অনেক অদ্ভুত জিনিষ করতে পারে বটে ওগুলো আমার মুরগীছানার পেছনে লাগলে খেলা দেখিয়ে দেব।"

খানিকটা চুপচাপ। কামিন্স উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো এবং মুখভঙ্গিমা ও হাতনাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অশোভন উক্তি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে লাগলো।—"ওই উটকো কোন বংশের ছেলে",—সে বলে উদ্দেশ্যহীনভাবে, রাস্তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে—"লম্বা ঠ্যাংওয়ালা দো-আঁশলা একটা কালো কুকুর নিয়ে এসেছিল আমার খামারের দিকে, আচ্ছারকম ধমকে দিয়েছি। বলেছি আর ওদিকে গেলে পুলিশে দেবো। খুব ভড়কে দিয়েছি। শোনো হে, আর এক গ্লাস দাও, ওই সঙ্গে একফোঁটা সাদা মদও মিশিয়ে দিও—সহরের আস্তাকুঁড়ের পোকা, তাই হচ্ছে এইসব লোকগুলো।" সে গালাগাল দিয়ে চলে। থারসাইটিসের ভূমিকা, তার প্রতি রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, এবং গত ক বছর নতুন আগন্তুক এবং বিভিন্ন পরিবর্তন তার প্রিয় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। একটু পরেই নবাগতটি টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু "দি ক্লাইম্বিং রোজ"এর সামনে ভীড় দেখে ফিরে নিজের ছোট্ট বাগানটির ভিতর দিয়ে টার্কোকে পিছনের মাঠে নিয়ে গেল। সামনের বিয়ারের দাগলাগা টেবিলটির উপর কামিন্স তার মোটা হাতের একটি চাপড় মারলো। তার একটি অদ্ভুত স্বভাব ছিল উত্তেজিত হয়ে উঠলে টেবিলে ঘুসি না মেরে চাপড় মারা। মুহূর্ত্তখানেক সে তার হাতটা টেবিলের উপর যেখানে খানিকটা বিয়ার পড়ে জমা হয়ে ছিল সেখানে রেখে বসে রইল এবং খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। খোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তার জিভের ডগাটা একটা পাকা ষ্ট্রবেরী ফলের মত দেখাচ্ছিল – তার রসনা —যেখানে শুধু সঞ্চিত হয়ে ছিল অপ্রিয় বাক্য এবং বিদ্বেষ।

"মনে হয়, রান্না চড়িয়ে গেছে," বলে কামিন্স, "শিগগির ফিরবে।" সে ঠিকই বলেছিল। বিশ মিনিট বাদেই দেখা গেল, ওকে ফিরে আসতে। কামিন্স তৃতীয়বার চাইল মদ, আর একটু বাদেই অলস গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের শান্তি নেমে এল গ্রামের ময়দানে।

পয়ের হপ্তাখানেক, গ্রামের লোকেরা নবাগতকে বিশেষ দেখতে পায়নি। সে নিজের কুটিরেই থাকতো। গ্রীষ্ম অপরাহ্নের দীর্ঘ গোধূলিতে পতঙ্গের ভেসে বেড়ানোর মত কখনও কখনও সে তার অগোছালো বাগানটিকে পরিষ্কার করে বেড়াতো। ইতিমধ্যে টার্কো তার প্রভুর থেকে অনেক বেশী আলাপ জমিয়ে ছিলো। ভিতরের একটা প্রেরণা থেকে সে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতো। নিয়মিত গ্রামের চারপাশে ছুটে বেড়ানোটা তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। ঘন ঘন লেজ নেড়ে শক্ত এবং চিন্তিত ভাবে হেঁটে, অন্যান্য সব কুকুরের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াতো সে ও প্রায় সর্বদাই চেষ্টা করতো তার ভাল চোখটা ওদের দিকে ফিরিয়ে রাখতে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতো তাদের দিকে। দ্বিতীয় দিনেই সে কর্ণেলের বিবর্ণ সোনালী রংয়ের লাব্রাডর কুকুর দুটোর সঙ্গে ভাব করে ফেললো। এমনকি তারা তাকে প্রায় নিজেদের বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন সে গিয়ে পড়লো পাঁচ ছটা আসল শেটল্যাণ্ডের দলের মধ্যে। চারিদিক দিয়ে তারা ওকে তেড়ে এলো। টার্কো লাফিয়ে লাফিয়ে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াতে লাগলো, কখনও এমুখো হয়ে, কখনও ওমুখো। কামিন্সের খামারের ওয়েলস দেশের ভেড়া পাহারা দেওয়ার কুকুর স্পাইক, সব সময়ই একটু বদমেজাজী ছিল। যখন টার্কো তার খামার বাড়ীর বাইরে এল, স্পাইক একেবারে দাঁড়িয়ে রইল, অবজ্ঞা সূচকভাবে দাঁত খিচিয়ে। স্পাইক ছিল একটি চমৎকার জানোয়ার, ধূসর এবং সাদাতে মেশানো, গলার লোমগুলো সাদা নাকটা লম্বা ও তীক্ষ্ণ।

রাণী অ্যানের আমলের ছোট্ট ইটের বাড়ীখানা, যার নাম ছিল ক্যারিয়ারস´ কটেজ, সেখানে কে থাকে, সেটা বোধহয় একটা কোন বিশেষ ব্যাপার ছিল না। কয়েকবছর ধরে ওটা নড়বড়ে অবস্থায় ভেঙ্গে পড়েছিল। নেদারবাইতে সম্প্রতি অনেক আগন্তুক আসছিল। যুদ্ধের জন্য লোক-অপসরণের পর থেকেই বাসস্থান সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবু এই প্রথম একজন বিদেশী নেদারবাইর একেবারে ভেতরে এসে হানা দিল - বাস্তব নেদারবাই যাকে তারা চিনত, সত্যিকার নেদারবাই—ওই ছোট্ট পুরোনো বাড়ীগুলো যা ঝকমক করত সময়ের দীপ্তিতে গ্রামের ময়দানের চারপাশে, আর বিরাট বিরাট এলম গাছগুলোর তলায়। নতুন আগন্তুকদের আগমনে এই ছোট্ট মন্ত্রপূত স্বর্গের অধিবাসীরা তাদের সম্পদের দিকে আবার তাকিয়ে দেখলো। নেদারবাইয়ের সুন্দর অংশগুলি ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দারিদ্র্যের ছাপ নিয়েছিল, কোন কোন জায়গায় কোথাও হয়ত একটি করোগেটেড্‌ ও লোহার ছাত দেখা যেত, বা কোন একটা বাংলো দেখে হয়ত মনে হতে পারতো যে প্যাকিংকেসের জোড়াতালি দিয়ে তার সবটাই তৈরী হয়েছে কিন্তু এখানে, এই ময়দান ঘিরে, বুড়ো কর্ণেলের বাগানের লম্বা ইঁটের প্রাচীর, এবং তাঁর রাণী অ্যানের আমলের বাড়ীর রং ছিল পাকা পীচ ফলের মতো। "দি ক্লাইম্বিং রোজ" ছিল একটি নীচু সাদা কালো বরগা দেওয়া বাড়ী, অষ্টম হেনরীর আমলের। কামিন্সের খামার ছিল ময়দান থেকে একটু দূরে গীর্জাভূমির পরেই, হনিসাকল ও আইভি কুঞ্জের আবরণ দিয়ে আড়াল করা। অন্য কখানি বাড়ী, সবগুলোই ছিল কাঁচা ইঁটের বা সরাইখানার মত কালো বরগা দেওয়া।

মিস হ্যালফোর্ড থাকতেন ক্যারিয়ারস কটেজের পাশের বাড়ীতেই। তাঁর নতুন প্রতিবেশী সম্বন্ধে তিনিই ক্রমশ: আরও খবর যোগাড় করলেন। মিস হ্যালফোর্ড ছিলেন গ্রামের পুরোনো স্কুল মাষ্টারের বোন এবং তাঁর কাজই ছিল, সবকিছু এবং সবাইকে জানা। গরমকাল শেষ হবার আগেই লোকে জানতে পারলো যে টার্কোর প্রভু একজন অস্ট্রিয়ান এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্ত থেকে সে এসেছিল। তার পদবীটা উচ্চারণ করা কষ্ট

ছিল, নাম ছিল ওয়ালথার, ওই নামেই সে পরিচিত হোলো। মিস হ্যালফোর্ড জার্মাণ উচ্চারণটা রেখেছিলেন, বাকী সকলে ওকে ওয়াল্টার বা ওই বিদেশীটা বলে ডাকতো। যুদ্ধের ক'বছর সে কোন রকম করে অষ্ট্রীয়াতে বেঁচেছিলো, শুধু যেন কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে রাজনৈতিক শরণার্থী হিসাবে পালাবার জন্য। সে অবশ্য এ সব নিয়ে আলোচনা করতে চাইতো না। মিস হ্যালফোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে হুঁ হাঁ দিয়ে যেত শুধু, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘ অন্তর্মুখী মৌনের ভিতর ডুবে যেত। সে অবশ্য আনন্দের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসত তার জন্মভুমির গ্রামের কথা, বিরাট পাইনবনের গাম্ভীর্যময় শান্তির কথা—যা ছিল ঋতু পরিবর্তনে অপরিবর্তনশীল যতক্ষণ না তারা বরফের তলায় হারিয়ে যেত, কিম্বা লুকানো হ্রদের কথা যাতে প্রতিফলিত হত আকাশের সুদূর নীলিমা। এই সবই সে মিস হ্যালফোর্ডকে বলেছিল তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা অতি সাধু ইংরিজিতে, থেমে থেমে, প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বাধা পেয়ে বলেছিল "কিন্তু·· তবুও"······। সে ছিল একটি দর্জি, মিস হ্যালফোর্ড জানতে পেরেছিলেন। একটি ছোট মফঃস্বল শহরে তার বাস ছিল। আশেপাশের গ্রামে তার খদ্দের। স্থানীয় শিল্প ও হস্তকলার উন্নতিতে সাহায্যকারী একটি সঙ্ঘের সদস্য ছিল সে। এখন সে লণ্ডনের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকরী নিয়েছিল জামা সেলাইয়ের জন্য হপ্তায় দুতিন-বার তাকে লণ্ডন যাওয়া-আসা করতে হোতো। অন্য-দিনগুলিতে এবং প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে ছুটীর বারে সে নিজের কুটীরে বসে কাজ করত। খুবই কঠোর পরিশ্রমের কাজ ছিল তার—"কিন্তু তবুও...."

তার স্ত্রী এবং ছোটমেয়েটি অষ্ট্রীয়াতে ছিল শিগ্‌গিরি সে আশা করত তারা ওর সঙ্গে মিলিত হবে, সেই জন্যই সে এদেশে বাস করতে এসেছে।

"যাই হোক, তারা এখানে নিরাপদে থাকবে," বলে মিস হ্যালফোর্ড, "সে কথা খুব জোর করেই বলা যায়।"

একটু হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

টার্কো সবসময় কাজ খুঁজে বেড়াতো, সে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো, ভাল চোখটা দিয়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো, তারপর বাইরে যাবার জন্য দরজা আঁচড়াতে লাগলো। ওয়াল্টার মাপ চাইবার ভঙ্গিতে বলে 'টার্কো সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত করে'।

"ওকে পেলেন কোথায়?" জানতে চাইলেন মিস হ্যালফোর্ড। "অনেকদিন আছে নাকি আপনার সঙ্গেই?" "ও ঘরছাড়া," বলে ওয়াল্টার "আমার মত ঘরছাড়া, যখন আমি লণ্ডনে ছিলাম, এই কুটিরটা নেবার আগে, তখন ওকে আমি খুঁজে পাই। ও খেতে পাচ্ছিল না। আমাদের এসে বল্ল ওকে ঘরে নিতে; আমাদের দিকে থাবা নেড়ে, আমার বাড়ীওয়ালী আর অস্বীকার করতে পারলো না। আমি ওকে কোনও খেলা শেখাতে পারিনি।" সে বলে চলে। "ও বড় বেশী উত্তেজনা প্রবণ। কিন্তু একটা খেলা ও জানে।" ওয়াল্টার তার থাকবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে দিল। "এবার টার্কো, দরজা বন্ধ কর।" মুহূর্তের মধ্যে টার্কো দরজার কাছে লাফিয়ে ওঠে জোরে ধাক্কা দিয়ে সেটা বন্ধ করে দিল। সে অনবরত ঘেউ ঘেউ করছিল।

"ঐ দেখুন" বলে ওয়াল্টার।

মিস হ্যালফোর্ড হাসলেন। "খুব সুন্দর খেলাটা," বলেন উনি।

"এটাতে সে কখনই ভুল করে না," ওয়াল্টার বলে। খুব তাড়াতাড়ি একের পর এক টার্কো পিছনের দরজা, সামনের দরজা, বইরের চালার দরজা সবগুলো বন্ধ করে দিল, সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে।

"এই খেলাটা ও আমার কাছে আসার আগেই জানতো।" বলে ওয়াল্টার," যে বাড়ীতে আগে ছিল, সেটা নিশ্চয় বেশ ভাল ছিল, এটাই ওর একমাত্র খেলা।"

গ্রীষ্ম গড়িয়ে শরতের তাজা দিনগুলিতে পৌঁছয় ওয়াল্টার প্রায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, সে একেবারেই মিশে যেত যদি না টার্কো থাকতো। টার্কোর গতিবিধি ছিল সর্বত্র—পরে কাজে লাগানোর জন্য পুঁতে রাখা হাড় খুঁজে বের করতো, লোকের রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতো, হাঁ করে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইতো—তার ভাল চোখটাতে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠতো, এক টুকরো ভাল খাবার বা হিংস্র আক্রমণ, দুটোর জন্যই যেন সে নিজে প্রস্তুত হয়ে থাকতো। রাত্তিরেও সে তার টহল চালিয়ে যেত ডাষ্টবিনগুলো নেড়ে হঠাৎ ধরা পড়লে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঘেউ ঘেউ করত। এগুলো সবই ছিল তার শহুরে স্বভাব, কিন্তু গ্রামে এসেও সে এগুলো ছাড়তে পারছিল না।

"ঐ বিদেশীটার কুকুরটার মাথায় ছিট আছে"—বলে কামিল, "বোকা একটা লক্ষ্মীছাড়া, সমস্ত জায়গাটা নোংরা করে রাখবে, পায়ে পায়ে বেড়াবে। খেকি কুকুরটা একদিন একটা কাণ্ড বাধাবে আমি বাজী রেখে বলতে পারি। কুকুর থেকে বাঁদর বলাই ঠিক।" সে নিজের ছড়ির আগাটা রাস্তায় পুঁতে দিয়ে, নাক দিয়ে অশ্রদ্ধাসূচক ঘোঁত ঘোঁত করে আওয়াজ করল।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা কিন্তু টার্কোকে পছন্দ করত। সে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে থাবা দুটো অনুরোধের ভঙ্গিতে উপর নীচে করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। বাচ্চারা বলত এটা টার্কোর প্রার্থনার ভঙ্গি।

"কি মজা টার্কো, চল, চল, তোমার প্রার্থনা উচ্চারণ কর টার্কো। কিন্তু সে কখনও কারও কথা শুনে ওটা করেনি। যাইহোক তার সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল দৌড়নোতে। বাড়ীর পিছনের মাঠে সে পাগলের মত দৌড়তো। সবচেয়ে বেশী সে ভালবাসতো অন্য কুকুরদের সঙ্গে দৌড়তে। কখনও কখনও কর্ণেলের সোনালী দাত্রাড়ুর গুলি বহু পিছনে পড়ে গিয়ে ছোটা থামিয়ে ওকে দেখতে থাকতো, গোলাপী জিভ বার করে। কোন কোন দিনে সে শেটল্যাণ্ডগুলোকে ছাড়িয়ে যেত, তারা কাছাকাছি এলেই পাগলের মত গতি বাড়িয়ে তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত। একবার স্পাইক চেষ্টা করেছিল টার্কোকে ধরতে তারপর ভীষণ রেগে গিয়ে ক্রুদ্ধ সরলরেখায় তার পেছনে ছুটতে লাগল। টার্কো সহজেই ওকে দূরে রাখতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত স্পাইক বিরক্ত হয়ে চলে গেল, টার্কো তখনও ছুটছে।

তার পরেরদিনই টার্কো স্পাইকের ব্যাপারে মস্ত ভুল ক'রল। সে হঠাৎ খামার বাড়ীতে লাফিয়ে উঠে চারিদিক শুঁকে বেড়াতে লাগলো। মুরগীগুলো কঁক কঁক করে ছুটে বেড়াতে লাগল। স্পাইক তার নিজের খাঁচাতে চেন দিয়ে বাঁধা ছিল, এবং বাঁধা থাকলেই তার মেজাজটা সর্বদাই বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতো। মুখ থেকে লালা ফেলতে ফেলতে এবং রাগে গরগর করতে করতে সে একটা হাউইবাজির মত লাফিয়ে উঠলো। খাঁচাটা টেনে নিয়ে চললো সে, তারপর কয়েক মিনিট কুকুর ও মুরগীর ঘূর্ণীনাচ চললো, ক্যাঁক ক্যাকানী, ঘেউ ঘেউ এবং দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে এই তাণ্ডব থামবার পর একটা মুরগীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কামিল ক্যারিয়ারস কটেজে এসে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে চোট পাট আরম্ভ ক'রলো—"ঐ কুকুরটাকে খুন করে ফেলা উচিত। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে ওর মাথা গুলি করে উড়িয়ে দাও। ও একটা কৃমিকীট। তোমার উচিত হয়নি গ্রামে এরকম

ধরণের কুকুর নিয়ে আসা। যদি আমার মুর্রেল পাইগুলোকে তাড়া করে তবে আমি ওকে গুলি ক'রব।

"আমি দুঃখিত," ওয়াল্টার বলে, "আমি দুঃখিত," সে নিজের সাদা হাতগুলি একটু সরায়, কেননা কামিন্স জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ওকে নিজের দরজার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কামিন্স চলে গেলে বিষণ্ণ প্রায় অন্যমনস্কভাবে ও বলে—"টার্কো দরজা বন্ধ করে দাও।"

এ ব্যাপারের পর থেকে কামিন্স, অনেক দোষই টার্কোর ঘাড়ে চাপাতে লাগলো। সারা নেদারবাইতে লোকে বলতে লাগলো—"ঐ বিদেশীটার হতচ্ছাড়া কুকুরটা।" বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের পরিবর্তে ওয়াল্টার দেখা পেতে লাগলো, বিরাগপূর্ণ মুখভাব এবং শূন্যদৃষ্টির।

"আমরা এই পোড়া কপালে বিদেশীদের চাইনা," কামিন্স বলতে লাগলো 'দি ক্লাইম্বিং রোজ' এ, বিয়ারের গেলাসের দিকে মেজাজী ভঙ্গিতে তাকিয়ে। "আমাদের এরোড্রামের পাশে চোরের মত ঘুরে বেড়ায়, ঐ সব ধরণের লোকেরাই সব গোলমাল করে. আমি সব সময়েই দেখেছি, কেন যে আমরা এদের ঘাড় ধরে বের করে দিই না।"

মিস হ্যালফোর্ড এ সম্বন্ধে তাঁর ভাই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বল্লেন. "কি দুঃখের বিষয়", তিনি বলেন, "অনায়াসেই এ ব্যাপারটা এড়ানো যেত। ওয়াল্টারের কাছে তার কুকুর যে কতখানি সেটা জেনে আমরা ওকে ছেড়ে দিতেও বলতে পারি না তাহলেই কিন্তু সবচেয়ে ভাল হ'ত।"

কয়েক সপ্তাহ কাটলে উনি বুঝলেন যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। তিনি কথাটা ভুলতেই পারলেন না। ওয়াল্টার টার্কোকে খুব বেশী ভালবাসত, কারণ টার্কোও ছিল তার মত সর্বহারা। টার্কো পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং ওয়াল্টারের কাছে এসে তার থাবা নেড়ে অনুনয় করেছিল—মানুষের ভালবাসা এবং আশ্রয়ের জন্য। ওয়াল্টার চেষ্টা করত ওকে ভিতরে রাখতে এবং কখনও কখনও দেখা যেত উপরের জানলা থেকে টার্কো উঁকি মারছে এবং কাঁদছে।

এক উজ্জ্বল ভোরবেলাতে, (সেটা ছিল প্রথম শরতের সময়) ওয়াল্টার ক্যারিয়ারস কটেজ থেকে চেয়ে দেখলো একটা দৃশ্য—ঢেউয়ের মত ধেয়ে চলে আসছে নেদারবাইয়ের একমাত্র পাকা সড়ক দিয়ে, এমন একটা দৃশ্য—যা সে তার জন্মভূমির পাহাড়ে কখনও দেখেনি। প্রায় বারো কি পনের জোড়া ফক্সহাউণ্ড, কালো, সাদা এবং বাদামী, মাথাগুলো সতর্ক, লেজগুলো খাড়া করে আসছিল।

ছোট নদীটির জল, কূল ছাপিয়ে, ওয়াল্টারের নীচু পাথরের দেওয়ালে লাফিয়ে উঠে আবার নেমে আসছিল, কিছু বালি ও পাথর নিয়ে। একটা হাউণ্ড, মিস হ্যালফোর্ডের বাগানের রাস্তায় গিয়ে তাঁর খোলা সদর দরজার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে উঁকি দিল।

একটা চাবুকের আস্ফালন এবং উঁচু গলার ধমকে সে আবার লাফিয়ে দলের সঙ্গে মিশে গেল। শিকারী আর্থার কুমুল, একটি বড় রোগা, কালো, ধীরগতি ঘোড়ার উপর বসে কুকুরের পালকে অনুসরণ করছিলেন। কুমুল সোজা হয়ে বসে ছিলেন, চাবুকের হাতলটা সজীব ভঙ্গিতে এক উরুর উপর ধরে। তার আগাটা মাটিতে লুটোতে লুটোতে যাচ্ছিল।

ওয়াল্টার তার উপরের জানলা থেকে উদগ্রীবভাবে তাকিয়েছিলো। সেটা ছিল একটা আলোভরা অক্টোবরের সকাল। সমস্ত বাতাস ছিল পরিষ্কার ঝকঝকে নীল। চড়াইর ডিমের মত বিবর্ণ, কিন্তু গভীর থেকে গভীরতম ছিল তার বিবর্ণতা।

উত্তরের উজ্জ্বলতার পটভূমিকায় 'দি ক্লাইম্বিং রোজ', ঝকঝক করছিল। সাদা কালো কাঁচের তৈরী একটা বাড়ীর মত, শরতের লালচে বাদামী পাতাগুলি একটার পাশে একটা ছড়িয়ে পড়েছিল, পরিচ্ছন্ন এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে, রূপোলী জল করা নীলকান্ত মণির মত। বাগানে এসে সে দেখলো যে

কুকুরের পালটা গ্রামের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচু দেওয়ালের ওপারে, দেখতে দেখতে মনে হোলো যেন সে একেবারে ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শিকারী ঘোড়া থেকে নামলো, তারপর সরাইখানার ভিতরের জানলা থেকে একটা হাত বেরিয়ে এলো, আর তাকে একপাত্র মদ ধরিয়ে দিলো।

গীর্জ্জার খামারের ফটকের ওধারে স্পাইক হঠাৎ রাগে জলে উঠে লাফালাফি আরম্ভ ক'রল। একটা বিরাট হাউণ্ড, প্রায় সমস্তটাই কালো থাবা উঁচিয়ে ফটক ধরে দাঁড়ালো, এবং গর্জ্জন করে প্রত্যুত্তর দিলো। আরও দুটো দাঁত খিঁচোতে লাগলো, ঠোঁট বেঁকিয়ে, লোম খাড়া করে। একটা রাখাল খামার বাড়ীতে কাজ করছিল, সে স্পাইককে শান্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার ওয়েলস হৃদয় এতগুলি বিদেশীর দঙ্গল দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছিল, এবং সে একটা থমথমে ভাব ছড়িয়ে দিচ্ছিল। রাস্তার ওপারে কর্ণেল তাঁর সোনালী লাত্রাভরদের ডেকে নিলেন।

ওয়াল্টার টার্কোর খোজে এদিকে ওদিকে চাইতেই দেখলো সে ময়দানের উল্টো দিকে রয়েছে। এক মুহূর্ত সে গীর্জ্জার পাঁচীলের উপর দাঁড়িয়েছিল, তারপরই সে লাফিয়ে পড়ে ভয়ে ভয়ে ঐ কুকুরের পালের পাশ দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো।

এবার যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটলো সেটা কেউই কখনও কল্পনাও করেনি। টার্কো যখন খামারবাড়ীর দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্পাইক আর একবার নতুন করে জলে উঠলো। একটা নারকীয় দাঁতখিঁচুনীর হাওয়া এলো কুকুরগুলো এবং হাউণ্ডগুলোর ভেতর থেকে। শিকারী চিৎকার করে উঠলো। একমুহূর্তের জন্য টার্কো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তারপরেই সে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ফিরে কামড়াতে লাগলো। এক মুহূর্ত পরেই সে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগলো। কালো হাউণ্ডটা ছুটলো ওর পিছুপিছু। তারপর প্রায় অর্দ্ধেকটা পালশুদ্ধ জিভ বার করে ওকে ধাওয়া করলো। টার্কো মরীয়ার মত চেষ্টা করলো একবার নিজের বাড়ী পৌছতে। কিন্তু সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে মিস হ্যালফোর্ডের বাগানের ভিতর ঢুকে বেড়ার ভেতর দিয়ে বাঁক নিয়ে পিছনের খোলা মাঠে গিয়ে পড়লো। ওয়াল্টার বাগানের উপর দিয়ে ছুটলো, টার্কোর কাছে পৌঁছবার জন্য, কিন্তু সে দেরী করে ফেলেছিল। নিঃশব্দ যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করা ছাড়া তার তখন আর কিছুই করার ছিল না। শিকারীর পাল তখন মাঠ পেরিয়ে নদীর দিকে ছুটছে। ময়দান থেকে আর্থার কুমুল চেঁচাতে লাগলেন। কিন্তু বেশীর-ভাগ হাউণ্ডই ছিল অর্দ্ধ শিক্ষিত, ইদানীং বছর কয়েক বিশেষ শিকার হয়নি। জিনটা কসে তিনি ওঠে পড়লেন তাঁর কালো ঘোড়ার উপরে মিস হ্যালফোর্ডের বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়া টপকে যাবার জন্য ঘোড়া চালিয়ে দিলেন, প্রথমে সে নড়তে চাইলো না, এবং শেষপর্য্যন্ত যখন সে বেড়া টপকে আস্তে আস্তে ছোটা আরম্ভ করলে ততক্ষণ টার্কো এবং যে হাউণ্ডগুলো সামনে ছিল, তারা চোখের বাইরে চলে গেছে।

ক্যারিয়ারস কটেজের সামনে কিছু লোক জড় হয়েছিল তারা ওয়াল্টারের কাছ থেকে জানতে চাইলো ব্যাপারখানা কি? সে কারো সঙ্গে কথা না বলে মাথা নেড়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। একটু পরেই দেখা গেল উপরের জানলা থেকে সে একদৃষ্টে মাঠের দিকে চেয়ে আছে।

সে দেখলো বড়মাঠটা পেরিয়ে ওরা ছুটছে। খোলা জায়গায় টার্কো সহজেই ওদের ছাড়িয়ে গেল। হানোর পাওয়ার মত করে সে ছুটছিল।—

"ও, টার্কো তুমি কত তাড়াতাড়ি ছুটতে পার। এখনও যদি তুমি ফিরে আসতে টার্কো, ছুটে বাড়ী আসতে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত। হাউণ্ডরা গন্ধ শুঁকে ছোটে,

তোমার বুক ফেটে যাবে আর ওরা তোমাকে টুকরো করে ফেলবে।"

দূরের একটা বেড়াঝোপের আড়ালে টার্কো অদৃশ্য হয়ে গেল. হাউণ্ডগুলো নিঃশব্দে ছুটতে ছুটতে তাকে অনুসরণ করলো একের পর এক। তারপর কালো ঘোড়াটা বেড়া টপকে গেল, তারপর চেয়ে দেখার জন্য পড়ে রইল শুধু মাঠ আর নীল অক্টোবরের আকাশের গায়ে সারি দেওয়া দূরের গাছগুলি।

মিস হালফোর্ড বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন—"আমার ভয় হচ্ছে টার্কো ধরা পড়ে যাবে।"

আমি শুনেছি, বহুদিন আগে হাউণ্ডগুলো একটা কুকুরকে তাড়া করেছিল, খামারের রাখাল বলে। "দু মাইল দৌড়ে তাকে ধরে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল একটা শেয়ালের মত।"

কামিল্স এর মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এসে এই দলে যোগ দিয়েছিল—"ঐ কুকুরটা আধা শেয়াল," সে বলে "আমি সব সময়ই বলিনি যে ওর মধ্যে কিছুটা অদ্ভুত ভাবে আছে দেখছ তো কি ভাবে ও আমার মুরগীর ছানাগুলির পিছনে লেগেছিল!"

রাখাল সায় দিল তার কথায়। "আমি বিশ্বাস করি না।" মিস হালফোর্ড দৃঢ়ভাবে বলেন। "শেয়ালের কিছুই নেই ওর মধ্যে, হয়ত কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টি করেছে ও কিন্তু ঠিক মানুষের মতই হয়ে গেছিল ও।"

"ইচ্ছে করলে শেয়ালকেও তুমি খেলা শেখাতে পার. তাই নয় কি?" বলে কামিল্স, "আমি এর আগেও পোষা শেয়াল দেখেছি।"

"কিছু যদি করা যেত।" বলেন মিস হালফোর্ড।

"কিছুই করা যাবে না।" বলে কামিল্স "ও ধরা পড়বেই।" "ওই হাউণ্ডগুলো একেবারেই পোষ মানেনি, বলেন মিস হালফোর্ড, এর ভেতর শেয়ালের ব্যাপার কিছু নেই. ওরা প্রায় তোমার প্যাইকের পেছনে লাগবার যোগাড় করেছিল, তার বেলায় তুমি কি বলবে কামিল্স?"

"সত্যিই", বলেন আর এক বৃদ্ধা, তিনি কাছেই থাকতেন, "কুমুসের উচিত হয়নি গ্রামের ভিতর ঐ অবস্থায় তার হাউণ্ডদের নিয়ে আসা।"

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, হঠাৎ সকলেই কামিন্সের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

"ঐ কুকুরটাকে নিয়েই ছিল ঐ বিদেশীটির সমস্ত জগৎ", সেই বৃদ্ধা আবার বলেন, "প্রায় সন্তানের মত।"

সমবেত মহিলারা মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গভীর-ভাবে। ছোট দলটি ছড়িয়ে পড়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে কুমুস ফিরে আসে। সে বলে যে টার্কো এবং সমস্ত হাউণ্ডের পালটা নেদার নদী সাঁতরে ওদিকে গেছে। তার ঘোড়া বিশেষ কিছু খায়নি বলে আর ছুটতে পারার অবস্থায় ছিল না।

অনেক পরে জানতে পারা গেল, বিভিন্ন সূত্র থেকে কোন রাস্তা দিয়ে তারা গেছে বিভিন্ন লোক তাদের বিভিন্ন জায়গায় দেখেছিল। টার্কো চেষ্টা করেছিল চক্রাকারে ঘুরে বাড়ী পৌঁছতে। চক্র কাটতে গিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক পরে নেদার নদী পড়লো। নদী সাঁতরাতে গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে সে অনেক শক্তি ক্ষয় ক'রে ফেলেছিল। এখানে হাউণ্ডগুলো ওকে প্রায় ধরে ফেলে। এরপর দেখা গেল সে উপত্যকার খামার থেকে ছুটে উঠছে একটা দীর্ঘ খাড়াই গড়ানে জমি বেয়ে। খামারের মালিক বৃথাই চেষ্টা করেছিলো ডেকে তাদের ফেরাতে।

পাহাড়ের চূড়ায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে একটা লুকোবার জায়গা খুঁজেছিল, কিন্তু হাউণ্ডের পালের অভিজ্ঞ পাণ্ডারা তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে পালাতে বাধ্য ক'রলো। কিন্তু এখানে তার গতি বিশেষভাবে শ্লথ হয়ে এলো, কারণ বোধহয় এখানেই তার পায়ের নীচে একটা কাঁটা ফুটে গিয়ে-

ছিল। অসম্ভব ক্লান্ত অবস্থায় সে পাহাড় থেকে নেমে এসে, আর একটা ক্লান্ত দীর্ঘ জলাভূমির রাস্তা ধরে,—অগ্রসরমান হাউণ্ডগুলো তখন তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। পথ খোঁজার বা এদিকে ওদিকে যাওয়ার সময় আর ছিল না। কিন্তু তখনই—যখন তার দম প্রায় ফুরিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, আহত থাবা নিয়ে টার্কো দেখলো যে দীর্ঘ পরিক্রমা তাকে প্রায় তার বাড়ীর কাছে নিয়ে এসেছে। এখনো প্রায় মাইল খানিক যাবার মত শক্তি তার অবশিষ্ট ছিল।

টার্কো এবং হাউণ্ডগুলো দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওয়াল্টার ছুটে বেরিয়ে এলো ক্যারিয়ারস্ কটেজের ফটকের সামনে। আমি ওকে দেখেছি, সে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওরা ফিরে আসছে।"

একমুহূর্তের জন্য সে দেখতে পেলো টার্কোর মুখটা ফেনা উঠছে, ভয়ার্ত যখন সে কোনরকমে লাফিয়ে পার হচ্ছিল গীর্জার পাঁচীলটা।

"টার্কো" ওয়াল্টার চেঁচিয়ে ওঠে, "টার্কো"। শেষবারের মত ময়দান পেরিয়ে ছুটে আসে টার্কো ওয়াল্টারের পাশ দিয়ে ক্যারিয়ারস কটেজের দরজার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওয়াল্টার চেষ্টা করলো ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে, বৃথাই চেষ্টা করলো হাউণ্ডগুলোকে তাড়িয়ে দেবার, পা পিছলে বাগানের রাস্তায় পড়ে গেল সে, তখন তিন চারটে হাউণ্ড তার উপরে উঠেছে।

"দরজা বন্ধ কর টার্কো," পড়ে যেতে যেতে সে চিৎকার করে উঠলো "দরজা বন্ধ কর"। হাউণ্ডগুলোর মুখের উপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, শোনা গেল ভিতর থেকে ক্ষীণ গলায় টার্কো দু একবার ডাকছে।

ক্ষণপরেই আর্থার কুমুস, কামিল স্বয়ং এবং সরাইখানার জলপোট সকলে মিলে এসে পড়লো। হাউণ্ডগুলোকে মেরে তাড়িয়ে তারা ওয়াল্টারকে সাহায্য করলো উঠে দাঁড়াতে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে বিবর্ণ এবং কম্পমান অবস্থায়, তবে বিশেষ আহত হয় নি।

"বেচারা টার্কো, আমার ভয় হয়, ও বড় বেশী ঝামেলার সৃষ্টি করে।"

গল্পটা নেদারবাইয়ে রটাবার জন্য মিস হালফোর্ডের প্রয়োজন হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে এটাই গ্রামের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। লোক ওয়াল্টারের দিকে উৎসুক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে চাইতে লাগলো।

পরের সপ্তাহকয়েক ধরে যে সব লোকের সঙ্গে সে কোনদিনও কথা বলেনি, তারাও তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছে কি না।

মনে হচ্ছে, একজন মানুষের একটা কুকুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—এবং কামিল এই ব্যাপারটাতে আগাগোড়াই ভুল করেছিল।

জোয়ার

উপন্যাস

গতবারের পর

বিজন কুমার ঘোষ

॥ ছয় ॥

ক'দিন ধরে আলোকের স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে। সেই সঙ্গে জ্বর। একটু কাশিও। তিন দিন অফিস কামাই করতে হল। এই তিনটে দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক চিন্তা করেছে, অনেক ভাবনা ভেবেছে। সব মহব্বতপুরের। পূর্ণিমাদিদির, পুলকদাদার কথা, বাবার কথা। মা সর্বক্ষণ পাশে বসে ছিলেন এই ক'দিন। রায় বাড়ির শেষ সলতে। আলোকের প্রবল আপত্তিতে ডাক্তার ডাকতে পারেননি। খবরের কাগজে ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে সেই অনুযায়ী কয়েকটা ট্যাবলেট আনাতে পেরেছিলেন নিতাইকে দিয়ে। সেইগুলি খাওয়াতে খাওয়াতে মা ছেলেতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সব মহব্বতপুরের।

—মা চল না একবার মহব্বতপুরে বেড়াতে যাই?

—অনেক হাঙ্গামা আছে খোকা। পাশপোর্ট ভিসা কত কি লাগে।

—সে সব করেই—

—কি দেখবি? সব তো শ্মশান!

—আমাদের বাড়িটাই না হয় শ্মশান হয়েছে। আরো তো অনেক দেখার আছে। মহব্বতপুরের বাগান, নদীর ধার—

—মরার মুখ বেশী দেখতে নেই খোকা। ওতে দুঃখই বাড়ে।

চুপ করলেন পূর্ণশশী দেবী। খোকাও চুপ। রায় বাড়ির ছেলেরা তাদের অনুরাগের ধারা কখনো ভুলতে পারে না। পূর্ণশশী দেবীর বুকে দুঃখ হু হু করে বাড়তে লাগল। খোকা এ কয়দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলি পুলকের কথা জিজ্ঞাসা করেছে. পূর্ণিমার কথা। এই বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। এই সব দুপুর একা একা কি দীর্ঘ মনে হয়। কি দুঃসহ! খোকা যা খামখেয়ালী, হয়ত বিয়েই করবে না। রায় বাড়ির রেখা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে একদিন।

—মা?

সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

—কি বলছিস খোকা? শরীরটা এখন ভাল লাগছে একটু?

—হ্যাঁ ভাল। খুব ভাল। মা?—

—কি?

—ওরা আমাদের বাড়িতে আগুন দিল কেন? বাবার মুখে তো শুনতাম ওরা আমাদের অনুগত প্রজা।

—কি জানি বাবা। সবই অদৃষ্ট।

পূর্ণশশী দেবীর সব মনে পড়ে খোকার কথায়। সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সাধের রায়বাড়ি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। বজ্রপাতের মত দরজা জানালা কপাট কাটার শব্দ চারিদিকে। তিন মাইল দূর থেকে সদরুদ্দিনের বাড়ির জানালা ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন পূর্ণশশী দেবী। পাশে আলোক। তার পাশে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়। তিল তিল জমানো সম্পদ—রায় পরিবারের লীলা নিকেতন

শ্মশান হয়ে যেতে দেখেছিলেন সারারাত। সাতদিন ধরে নাকি রায়বাড়ি আগুনে পুড়েছিল। কলকাতায় চলে আসবার পর সদরুদ্দিনের চিঠিতে জানতে পেরেছিলেন। আলোক জানে না চারিদিকে গণ্ডগোল লাগার পর, লুঠতরাজ আরম্ভ হলে উনি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চারপাশের অনুগত মুসলমান প্রজারা এসে আশ্বাস দিয়েছিল, আমাদের ছেড়ে যাবেন না কর্তা। অনেক নুন খেয়েছি। যদি কিছু হয় বুঝবেন আমরা মারা গেছি। লুঠতরাজ বাইরের মুসলমানের কাজ। ওরা বাড়ি পাহারা দেবার মেহনত হিসেবে মাত্র দু' হাজার টাকা চেয়েছিল। উনি খুশি করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকাই ধরে দিয়েছিলেন। হায় মানুষ। মানুষ দুই মুখে কথা বলতে ভালবাসে। মনে আছে, রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত যখন বাইরের মুসলমানেরা আগুন দিতে এল, তখন মশালের আলোয় অনেক অনুগত মুখ দেখে চমকে উঠেছিলেন। অতবড় বাড়ি, খাট পালঙ্ক, শ্বেত পাথরের টেবিল, কৌচ, ডায়নামো, সেকালের অয়েল পেন্টিং, সেই সঙ্গে সুখ দুঃখের বিপুল স্মৃতি—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। ঘন অন্ধকার। আল্লা-হো-আকবর। বিভৎস চিৎকার। কতকালের জমাট বাধা উন্মত্ততা। তবু এই ক্রুর অন্ধকারের ভিতরেও একটু ভীরু আলোর শিখা দেখা গেল। তাঁর নাম সদরুদ্দিন। সুখের পায়রারা তখন উড়ে গেছে। রায় স্টেটের বরকন্দাজ সদরুদ্দিনের পিছনে পিছনে বাবলা গাছে ঢাকা অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা পালিয়ে গেল। ফিরে তাকাবারও অবসর হয়নি, কি দীর্ঘশ্বাস ফেলবার। কেননা আগুনের তাপে পিঠ পুড়ে যাচ্ছিল, ঝলসে যাচ্ছিল। আগুন চোখের জলের সঙ্গে ভয় ভাবনা আতঙ্কও যেন শুষে নিচ্ছিল দ্রুত। সেই রাত ভোলবার নয়। সদরুদ্দিনের বাড়িতে দুই রাত ছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা টের পেয়ে যায়। অতর্কিতে ঘেরাও করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই সদরুদ্দিন ওদের নিয়ে গভীর জঙ্গলের পথে পাড়ি দেয়। শেষে ঢাকা মেলে উঠিয়ে দিয়েও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পোড়াদহ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়। যখন গাড়িটা ছাড়ে তখনও প্লাটফরমের একপাশে দাঁড়িয়ে ওর ছেঁড়া গেঞ্জিটা নাড়ছিল বাতাসে। পূর্ণশশী দেবী সেদিন ওর চোখে জল দেখেছিলেন। মনে হয়েছিল, ওরাই পৃথিবীর আসল মানুষ। সবার আগে মানুষের হৃদয়ের রং দেখতে পায়। ধর্ম, কি অন্য কোন বাজে রংএর দিকে ফিরেও তাকায় না। সেদিন ঢাকা মেলে আসতে আসতে সদরুদ্দিনকে দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল।

পূর্ণশশী দেবী আঁচলে চোখ মুছলেন।

—মা, বাবা তো অজাতশত্রু ছিলেন।—আলোক যেন কিছুতেই সেকথা ভুলতে পারছে না।

—হ্যাঁ। তা তো ছিলেন।

—তাহলে?

—পৃথিবীতে সদরুদ্দিনের সংখ্যা খুব কম। বুঝলি নে খোকা?

খোকা এবার বুঝতে পারল। চুপ করল। পৃথিবীতে সদরুদ্দিনদের সংখ্যা খুব কম—মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়ে দেওয়ালে টিকটিকির দিকে তাকাল। টিক-টিক-টিক। মা বললেন, সত্য-সত্য-সত্য। তবে সংখ্যা খুব কম হলেও তারা হারিয়ে যায় না বা মুছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা ধিক ধিক করে জ্বলে। ঠিক প্রয়োজনের মুখে বেরিয়ে পড়ে, দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে অন্ধদের পথ দেখায়। কতগুলি মানুষের জন্যেই আজো পৃথিবীতে বাতাস বয়, পাখি ডাকে, সকালের সোনালী আলোয় নারকোল গাছের পাতা দোল খায়। —বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালায় চোখ দুটোকে অলস করে এই ধরণের ভাবতে ভাল লাগল। মা উঠে গেলেন। কেননা, মহব্বতপুরের গল্প দুইজনকেই পীড়া দিচ্ছিল প্রচণ্ড।

আজ শনিবার। আলোককেও একটু পরে উঠতে হবে।

আজ অফিস কামাই করার কোন মানে হয় না। আজ একটায় ছুটি। অনেকদিন কেয়ার খবর নেই। কেয়া কি ভুলে গেল? শহরে মেয়েরা হয়ত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। নিত্য নতুন ফ্যাসন, নিত্য নতুন আস্বাদ চাই জীবনে। হয়ত নতুন কোন ঝাঁঝাল আস্বাদ দিতে পারছে না আলোক। আলোকের মনে পড়ল, অনেকদিন মিনতিদের বাড়িতে যাওয়া হয় না। মিনতির চোখ দুটো বটগাছের নিচে শান্ত দীঘির মত। ক্লান্ত পথিক আলোক। সেই দীঘির জলে হাত পা' ডুবিয়ে অবগাহন করতে, পান করতে শরীরের সমস্ত রোমকূপ উন্মুখ। বস্তুত, বিছানায় শুয়ে থাকার কয়টা দিনে কেবলি মিনতির কথা মনে পড়েছে। সত্যি খুব অন্যায় এতদিন না যাওয়া। ঠিক করল, আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে মিনতিদের বাড়ি যাবে।

অফিসে প্রচুর কাজ জমে ছিল। তিনদিন আসেনি তার ফল। অনেক নতুন অর্ডার এসেছে। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হল। বম্বের অফিসের জন্যে অনেকগুলি চিঠি ড্রাফট্ করতে হল। বিভিন্ন ফাইলে মন্তব্য এবং সই দিতে দিতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। সুতরাং আর নয়। বেয়ারাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলে লিফটে চড়ে নিচে নেমে এল। দারোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকে স্প্রীংএর মত উঠে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল আকাশে মেঘ। ভীষণ গরম। অনেকদিন পর ক্লান্তি লাগছে। খিদেও। হোটেল থেকে খেয়ে নেবে নাকি? না। মিনতিদের বাড়ি যাচ্ছি অনেকদিন পর। ওর হাতের রান্না হোটেলের বাবুর্চির চেয়ে ভাল। ট্যাক্সি এসে গেল।—বেহালায় চল, বলে উঠে পড়ল আলোক। আজ বৃষ্টি হতে পারে। বিদ্যুৎ চমক। গড়ের মাঠে প্রচণ্ড ভীড়। বোধ হয় খেলা আছে। এদিকে রেস কোর্স। সেখানেও ভীড়। কেয়ার সঙ্গে এক শনিবারে ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছিল। কেয়া কি হারিয়ে গেল ভীড়ে? বোধ হয় সুশোভন লাহিড়ীর বিলেত যাত্রার সম্ভাবনা দৃঢ় হয়েছে এতদিনে। কেননা, অনেকদিন কেয়া খবর দেয় না, টেলিফোন করে না, কি অফিসে এসে বলে না আমি ক্লান্ত। হয়ত অন্যত্র ক্লান্তি অপনোদন হচ্ছে। মনে পড়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জার আগের দিন অফিস থেকে ফিরবার মুখে মটরে সজ্জিত মুখার্জীকে দেখেছিল। তাঁর পাশে বোধ হয় কেয়া। ভাল করে দেখবার আগেই মটরটা বেগে বেরিয়ে গেল।

টাকশাল। রাস্তার বাঁ দিকে প্রকাণ্ড সরকারী ভবন। এখন উদ্বাস্তুরা বাস করছে। ওখানে আলোকের এক বন্ধু ছিল। মনে পড়ল, বছর খানেক আগে একবার এসেছিল। তার নাম মৃণাল বিশ্বাস। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল কিছুদিন। অদ্ভুত প্রাণশক্তি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গোঁয়ার গোবিন্দ যাকে বলে। লেখাপড়ায় ভাল। কিন্তু একদম বই ছুঁত না। ক্লাশ কামাই করতে পারলে যেন হাতে স্বর্গ পেত। অথচ গরীবের ছেলে। আলোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেই কটা বছর। সেই মৃণাল একদিন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ধূমকেতুর মত ব্যবসা জগতে উদয় হল। বই-এর। কলেজ স্ট্রীট থেকে বই এনে বিভিন্ন বই-এর দোকানে পৌঁছে দিত। কমিশন থাকত। ওর বিধবা মায়ের হাতে তৈরী তিলের নাড়ু খেয়েছে অনেকদিন। সবাই পাশটাস করে বেরিয়ে গেল, ও রইল পড়ে। হঠাৎ শুনতে পেল, ব্যবসা ফেল পড়েছে। বাজারে প্রচুর দেনা। রাতারাতি একদিন কলকাতার বাস উঠিয়ে চলে গেল ক্যানিং। তারপর সবাই একদিন শুনল মৃণাল লঞ্চ কোম্পানির সারেং হয়েছে। বড় অদ্ভুত জীবন ওর। বেপরোয়া। আলোকের হিংসে হয় একেক সময়। অনেকদিন পর ওর নামে একটা চিরকুটও এসেছিল—আলোক জংলী বন্ধুকে ভুলে গেলে? একদিন এসো না? লঞ্চে নিয়ে বেড়াব। সুন্দরবন ছাড়িয়ে সমুদ্র দেখিয়ে আনব। জান আমি সারেং?

বনমালী রোডের মুখে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। মিনতি-

দের বাড়ি এখান থেকেও বেশ অনেক দূরে। কিন্তু জীর্ণ বাড়ির সামনে ঝকঝকে ট্যাক্সি দাঁড়াক, কি জোড়া জোড়া চোখে কৌতূহল উঁকি মারুক—এ চায় না আলোক। তাই নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। মিটারে উঠেছে দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। তিনটে টাকাই দিয়ে দিল। আগামী বছরে যদি বিলেত যেতে হয় তাহলে এই অভ্যাসটি রাখা দরকার। ওখানে ট্যাক্সি চড়ে টিপস না দিলে নাকি ভীষণ জোরে ধন্যবাদ দেয়।

দুপুরের মেয়াদ কমে আসছে। গুঁড়ি গুঁড়ি রেশমের সুতোর মত বৃষ্টি পড়তে লাগল গায়ে। লাল সুরকি ঢালা বনমালী নস্কর রোড। বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় সুরকিগুলি ঝকমক করছে। দুই পাশে পান বিড়ির দোকান, মুদিখানা, খেলার মাঠ। গেরস্ত বাড়ি। চলটা ওঠা পুরোন সেকেলে বাড়ি। অনেকদিন এই পথটা ভুলে ছিল আলোক। হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে মনে পড়ল। তা কতদিন?

ওই যে ভুলু! মিনতিদের পোষা কুকুর। আজ শনিবার। নিশ্চয়ই মিনতির ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে। এখন গেলে ওকে বাসায় পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। কোথায় যেন জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বনমালী নস্কর রোড শেষ হয়ে এল। রাস্তাটা এবার সবুজ মাঠের ভিতর হারিয়ে গেছে। সেখান থেকে সরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে বাঁ দিকে। সেটা ধরে একটু এগোলে পুকুরের পাড়ে মিনতিদের বাড়ি। মিনতি এখনো স্কুল থেকে আসেনি। মিনতির ছোট বোন আরতি সবে শাড়ি পরতে শুরু করেছে, বারান্দায় বসে কয়েতবেল মাখা খাচ্ছিল, এক গাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল:

— কি ব্যাপার, এত দিন পরে বুঝি মনে পড়ল?

— তোমার দিদি কোথায় আরতি?—আলোক বারান্দায় একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর সাবধানে বসল।

— এ সেই দিদির খোঁজ? কেন আমরা কি হরিজন নাকি?

আলোক হাসল। শাড়ি পরলেই মেয়েদের অকালপক্কতা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আরতি বলল, বসুন। একটু পরেই দিদি এসে যাবে। সেলাই শিখতে গেছে।

বৃষ্টি থেমেছে। আবার গুমোট গরম। মিনতির অনেক গুলি ভাইবোন, সবাই একসঙ্গে খাই খাই শুরু করেছে। আরতি একটা থালায় তেল দিয়ে মুড়ি মেখে সামনে ধরে দিল।

— আমাকে দিলে না?—মিটিমিটি হাসতে লাগল আলোক।

— দিদি এসে দেবে আপনাকে।

— কেন, তুমি দিলে?

— আমি হরিজন।

হাসল দুজনেই। হাসি থেমে গেল। তবু আরতি খানিকক্ষণ চেয়েই রইল অপলক চোখে। যে দৃষ্টির পিছনে কি একটা বক্তব্য প্রচ্ছন্ন। আলোক বুঝতে পারে। নতুন শাড়িপরা দেহটা নতুন জলপাগা লাউডগার মতন। সব সময় অস্থিরতা। চঞ্চলতা।

— আলোকদা।

— কি বলছ?

— আমাকে একটা চাকরী দেবেন?

— তুমি? কি চাকরী করবে?—আলোক বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে তাকাল। এবারে দেহে কোন চঞ্চলতা নেই, বা অস্থিরতা। শান্ত। চোখ দুটি মাটির দিকে।

— চাকরীর আগেই যদি বিয়ে হয়ে যায়?—আলোকের চোখে দুষ্টুমি।

— হবেই না—

— কেন চেষ্টা চরিত্র চলছে নাকি গোপনে?

— যান, আপনার সবটাতেই ঠাট্টা।—মুখটা আরক্তিম

হল : দিদির কাছে শুনেছি আপনি বড় অফিসার। তা দিন না একটা চাকরী—

— মুড়ি খেতে চাইলাম দিলে না, এখন আবার চাকরী চাইছ।—আলোক অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল।

লজ্জা পেল আরতি।

— বারে দিদি এসে দেবে তো। মুড়ি কি খাবেন। দিদি হালুয়া তৈরী করবে।

আলোকের বলতে ইচ্ছে হল, আমি হরিজনের হাতের তৈরী হালুয়াও খাই। কিন্তু চুপ করে রইল।—আপনি বড় অফিসার। মনের মধ্যে বসন্তের বাতাস উঠল। অনেককে চাকরী দিয়েছে ওদের কোম্পানিতে। তবে এখন আর এত সুদিন নেই। বড় অফিসার হলেও কর্ম সংস্থানের সীমা আছে। দেশের বেকার সমস্যার সীমা নেই। তাই চাকুরী প্রার্থীদের ইদানীং এই ধরনের কথা বলে ঠেকিয়ে রাখে, (১) বড্ড দেরী করে ফেলেছ, কিছু দিন আগেও অনেক লোক নেওয়া হল ; (২) কোয়ালিফিকেশন বাড়াও, বি, এ, টা পাশ কর তারপর ; (৩) ইউনিয়ন হয়েছে, ইচ্ছেমত লোক নিতে পারি না ; (৪) এই বয়সে কি চাকরী করবে ; (৫) একটা এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যাও, লোক নেওয়া হলে ভেবে দেখব খন—ইত্যাদি। কিন্তু আরতির সামনে বসে এই ধরনের পালিশ করা কথা বলতে ইচ্ছে হল না। আরতির বাবা নিবারণবাবুর সঙ্গে আলোকের আলাপ অনেক দিনের। আলোক তখন অন্য একটা ফার্মে চাকরী করত। নিবারণবাবু সেখানে এ্যাকাউন্ট সেকসেনের টাইপিস্ট ছিলেন। সেই সূত্রে আলাপ। ভদ্রলোককে ভাল লাগত। চোখ দুটো বাবার মতই শান্ত, স্নিগ্ধ। যেন সর্বক্ষণ মায়া ঝরছে। টিফিনের সময় পেছনের ঘোরান সিঁড়ির গায়ে দাঁড়িয়ে শুকনো রুটি চিনি দিয়ে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখানে আলোককে দেখে দারুণ লজ্জা পেয়েছিলেন। অনেকটা রবি ঠাকুরের গল্পের 'গিন্নি'র মত। আলোকও খুব লজ্জা পেয়েছিল। এ সব হল মানুষের অতি নিভৃত কোন। এখানে উঁকি দেওয়া বারণ। ভদ্রলোক একদিন আলোককে নিয়ে গিয়েছিলেন বনমালী নস্কর রোডের বাসায়। আজন্ম বিলাস ব্যসনে লালিত আলোক দারিদ্র্যের করাল দাঁত দেখল প্রথম। দেখে শিউরে উঠল। বহু সন্তানের জনক নিবারণ বাবু। তাঁর স্ত্রী বহুদিন ধরে পক্ষাঘাত রোগে ভুগতে ভুগতে কঙ্কালসার অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। বর্তমানে নানান উপসর্গও দেখা দিয়েছে। আলোককে যেদিন নিয়ে আসেন সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। লোকালয় ছাড়িয়ে দূরে পুকুর পারে বাস। মাটির ঘর। ভিজে মাটির বিরক্তিকর সোঁদা গন্ধ। পৃথিবীতে এত দারিদ্র্য থাকতে পারে—ভেবে ভেবে যেন বিস্মিত হচ্ছিল আলোক। মেঘের জন্যে সন্ধ্যার আগেই হারিকেন জ্বালান হয়েছিল। সেই হারিকেনের চার পাশে আলোককে ঘিরে অনেক গুলি শীর্ণ পেটমোটা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কত গুলি ? গুণে দেখবারও রুচি হয়নি আলোকের। নিবারণবাবু এক নাগাড়ে দারিদ্র্যের ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তোতাপাখির মত। এমন কি আত্মহত্যাও শ্রেয়—এমনও মত প্রকাশ করলেন মাঝে মাঝে। আলোক বিষণ্ণ বোধ করছিল—অবসাদ। তবু হঠাৎ মেঘ কেটে গেলে, আমোদিত আলোর ভিতর, দীঘির মত কাকে যেন দেখতে পেল। সে মিনতি। নিবারণ বাবুর প্রথম সন্তান। কি স্নিগ্ধ মুখশ্রী। হঠাৎ আলোকের অপরূপ লাগল। সিক্ত আঁখি পল্লবে সরলতা। চা দিতে, হালুয়া পরিবেশন করতে গিয়ে একটি দুটি আলাপ হল। নিকটবর্তী কলেজে আর্টস্ নিয়ে পড়ে। শান্ত স্বরে বলল কথা কয়টি। আর যতক্ষণ কথা বলল না ততক্ষণ তাকিয়ে রইল আলোকের দিকে। সে দৃষ্টির মধ্যে এমন সরলতা মাখান ছিল—যা নাকি কোন রঙে রাঙাতে ইচ্ছে হয় না। আশ্চর্য ! মিনতিকে দেখার পর নিবারণবাবুকে খুব

বেশী বিরক্তিকর বলে মনে হল না। নিবারণবাবু যেন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি কোমল ঐশ্বর্য রচনা করে রেখেছেন, ভেবে আনন্দ হল। সেদিন আর কিছু হয়নি। মেঘের জন্যে কাদাজল ভেঙে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই বুঝি সেই ফার্মটি ছেড়ে দেয়। তবু সম্পর্ক ছেদ হয়নি। মাঝে মাঝেই গিয়েছে আলোক। প্রথম প্রথম ওরা বিব্রত হত। তারপর অবশ্য গা সওয়া হয়ে গেছে। আলোক মিনতির হাতের মুগের ডাল দেওয়া কলমিলতার ঝোল খেয়েছে বহুদিন। মিনতি আরতির সঙ্গে জিঞ্জিরা পোলের ওধারে যাত্রা দেখতে গেছে; নিমাই সন্ন্যাস। রাত্রি গাঢ় হয়েছে, অন্ধকার—এই অজুহাতে রাত্রিবাস ও করেছে বার কয়েক। সত্যিই, মিনতি মেয়েদের জাত আলাদা—কতবার ভেবেছে আলোক। কেয়া আর মিনতি—যেন দুই কাননের পাখি। ওদের মধ্যে কোনদিন মুখ দেখাদেখি হয় না। শহর আর গ্রাম। লেভেল ক্রসিং এর এপার আর ওপার। যেন আবহমানকালের বিরোধ।

সন্ধ্যা তখনো ঘোর হয়নি। দেখল সবুজ শাড়ি পরে মিনতি আসছে। পুকুরের ধারে ও এখন রয়েছে। দেখতে পেয়ে হাসল মিনতি। আলোক ও। দীর্ঘ দাহের পর হঠাৎ বিকেলে বৃষ্টি নামলে যে রকম শান্তি ঝরে, ঠিক সেই রকমের। মিনতির শাড়ি মাঠের সবুজের সঙ্গে মিশে গেছে। মিনতির মুখ দীঘির মতন ঝিকঝিক করছে খুশিতে। শাড়িটা একটু উঁচু করে, উঠোনের কাদা এড়িয়ে পা' টিপে টিপে বারান্দায় উঠল।

— অনেক দিন পর এলেন। ভাল আছেন তো?

— না, ভাল না।

— কেন, কি হল?

মিনতির মুখে উদ্বেগ দেখে খুশি হল আলোক। এবং অনেক দিন আসেনি, তার জন্যে কোন অনুযোগ নেই, দেখার আনন্দেই খুশি। কেয়া হলে তুমুল কাণ্ড বাধাত। হয়ত হাতের রুমালটা ভিজে যেত এতক্ষণে। আর আলোকও 'ভালনা' এই কথা কটি উচ্চারণ করতে পারত না সহজ ভাবে।

আলোক চোখে চোখে রেখে বলল, জ্বর হয়েছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—হবে না জ্বর! আপনি যা অনিয়ম করেন। জামাটা যে ভিজে গেছে দেখছি। নিন্ খুলে ফেলুন।

আলোকের ভাল লাগল সন্ধ্যায় বারান্দার কোনে বসে 'শরৎচন্দ্র' টাইপের কথাবার্তা। আজকাল এসব শোনা যায় না বড়।

আলোক বলল, তোমার কাছে নালিশ আছে।

— কি নালিশ?—যেন ভয় পেল।

— অনেক ক্ষণ বসে আছি, সেই দুপুর থেকে। আরতির কাছে খেতে চাইলাম, ও দিল না।

আরতি ঘরের মধ্যে ছিল। ছুটে এল এই কথা শুনে। দুই বোনে ঝগড়া লাগল। আলোক ভীষণ মজা পেল। শেষে যথারীতি মিনতি বলল, দাঁড়ান আমি খাবার তৈরী করছি।

ঘরের ভিতর চলে গেল।

একটু ফিরে, আপনি আসুন না ঘরে—

— ভীষণ গরম। বাইরেই ভাল।

— কি খাবেন?

— তোমার যা ইচ্ছে—

— হালুয়া করি?

— কর।

ফিরে যাচ্ছিল, আলোক ডাকল।

— তোমার বাবা কখন আসবেন? আজ তো শনিবার।

— বাবার ফিরতে ফিরতে ভীষণ দেরী হয় আজকাল।

— টিউশনি?

— না। অফিসের পর ভবানীপুরের এক দোকানে খাতা লেখেন। নটা পর্যন্ত থাকতে হয়।

— ফিরতে ফিরতে নিশ্চয়ই দশটা।

— হ্যাঁ, তা হয়।

— তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

— কেন, রাতটা থাকুন না? অনেক দিন তো আসেন না।

— মা চিন্তা করবে।

আর কথা হল না। মিনতি খাবার তৈরী করতে চলে গেল। ভীষণ খিদে লেগেছে। ফিরপোতে নেমে দুপুরে খেয়ে নিতে চেয়েছিল। না, তার চেয়ে মিনতির হাতের তৈরী অনেক বেশী সুস্বাদু। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটা দেখল। প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। জায়গাটা প্রায় হাসনুর মতই। কোথাও যে প্রাণের শব্দ আছে—বোঝা যায় না। অন্ধকারে ছাওয়া। গাছপালার রং কালো। মাথার ওপর বিদ্যুত চমক। অনেক দিন এখানে আসে না আলোক। মিনতি থাকতে বলছে। থাকবে নাকি? মিনতির হাতের ঝোল খেয়ে, ময়লা বালিশে মাথা রেখে, ব্যাঙ ডাকা টিপ টিপ বৃষ্টির রাতটা কাটিয়ে দেবে নাকি? না—মা চিন্তা করবে। এই তিন দিনের জ্বরে স্মৃতির অতলে অবগাহন করেছে অবিরাম। মহবতপুর, নদী, ফুলের বাগান, ঝাউগাছ, বাবা, পূর্ণিমাদিদি পুলক দাদা। দেখেছে, এই সব সম্পর্ক কি প্রাচীন! কি সুন্দর! পৃথিবীতে এত মানুষ, কিন্তু কেউ বাবার মত না, পূর্ণিমাদিদির মত না, পুলক দাদার মত না। এই সব মহান সম্পর্কে ঢিল ছুঁড়তে নেই, কি আঘাত করতে। আজকাল মানুষ বড় অধৈর্য। কথায় কথায় তারা ঢিল ছুঁড়তে ভালবাসে। আঘাত দিয়ে সুখ পায়। অথচ তাদের বোঝা উচিত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভিতর তাদের মাপের মানুষ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁরা একক। মহাসমুদ্রে দ্বীপের মতন। আলোকের কেউ নেই। সবাই চলে গেছে একে একে। কেবল মা রয়ে গেছে আজো। তাঁকে কিছুতেই দুঃখ দিতে পারে না। তিন দিন জ্বর হয়েছিল, তিন দিন পাশে বসে ছিলেন। পৃথিবীতে মাতৃস্নেহ বড় প্রাচীন আর একঘেয়ে। তবু এক মুহূর্তের অভাব বায়ুশূন্যতার মতই বিভীষিকাময়।

— কি এত ভাবছেন?

তাকিয়ে দেখল মিনতি এসে গেছে। হাতে খাবারের প্লেট। চা। আলোক চমকে উঠল। গভীরতা ছিঁড়ে যাওয়ায় একটু যেন বিরক্তও হল।

— মার কথা ভাবছিলাম।

— কেমন আছেন তিনি?

— ভাল।······ না, খুব ভাল না—

— আমাকে তো নিয়ে গেলেন না!

— নিয়ে যাব।

— খান এবার। বুঝতে পারছি খুব খিদে পেয়েছে।

বিদ্যুত চমক। আরো গাঢ় অন্ধকার। এদিকের রাস্তায় আলো আসেনি। মাঠের ভিতর থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোমাদের ভয় করে না?

—অভ্যাস হয়ে গেছে।

মিনতি এবার অনেক কাছে। ভিতরে আলো জেলে মিনতির ভাই বোনেরা তার স্বরে পাঠ মুখস্ত করছে। অন্ধকার বারান্দা। খুন্তির শব্দ রান্নাঘরে। আরতি রান্না করছে। কিছুক্ষণ আগে আরতি একটা চাকরী চাইছিল। ব্যাঙের ডাকটা এবার খুব কাছে। যেন ঘরের পিছনে।

—সাপে ধরেছে বোধ হয়।

—হ্যাঁ, প্রায়ই এরকম হয়। গা' সওয়া হয়ে গেছে।

—আলোকের ভাল লাগল কথাটা। গা সওয়া হয়ে গেছে। আহা, মাটির মানুষ! একটু যেন হাওয়া উঠল এই

সময়। গুমোট ভাবটা কাটতে আরম্ভ করেছে। গাছপালার মাথাগুলি দুলছে বাতাসে।

— এবার উঠি। রাত হল।

—না না, বসুন। ও, সাপে ব্যাঙ ধরেছে তাই ভয় করছে?

—মোটেই না।—হাসল আলোক: আমরা পাড়াগাঁর ছেলে। ভয় পাই না।

—তাহলে আর কি—

—মা একলা আছেন।

—আপনার মা তো একলা থাকায় অভ্যস্ত।

— ইদানীং মার কথা ভাবি।

—ইদানীং তাহলে লক্ষ্মী ছেলে।

মুচকি হাসল আলোক। খিল খিল করে হাসল মিনতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। গাছপালার মাথায় হাওয়ার বেগ। শন শন আওয়াজ। নিবারণবাবু কখন আসবেন কে জানে। ভিজে মাটির গন্ধ। ব্যাঙের ডাকটা বুঝি মিলিয়ে এল। পেট মোটা সাপটা মাঠের সবুজে আকাবাঁকা হাটছে। আলোকের পাটা যেন শির শির করে উঠল। সাপটা যেন টুলের তলায় কুণ্ডলী পাকানো। মোড়াটা টেনে সাগ্রহে খানিকটা এগিয়ে এল মিনতি।

—বুঝতে পারছি আপনার ভয় করছে।

হাসল নীরবে। অন্ধকারে দাঁত দেখা গেল শুধু। আলোক ওর একটা হাত তুলে নিল। নিজের হাতে। মৃদু চাপ দিল। শিরা ওঠা হাত। হাড়ের পরিমাণও বেদনাদায়ক। খবরের কাগজে এই ধরণের হাতের মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেয়—'গৃহকর্মে নিপুনা।' কেয়ার হাতটা নরম তুলতুল। শালিক পাখির ডানার মত। যেন একটু চাপ দিলেই রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুবে। ওই হাত গৃহকর্মে নিপুনা নয়। ওই সব মেয়েদেরই কি কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়, কনভেনেন্টেড বা আই এ এস পাত্র চাই?

—কি এত ভাবছেন?—একটু যেন অধৈর্য হল।

—ভাবতে ভাল লাগছে।

—আপনি কবি তাই।

—তোমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায় মিনতি। ঘরে বসে মেঘ দেখা যায়, যতদূর চোখ যায় সবুজ মাঠ দেখা যায়—

আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, হাসির দমকে স্তব্ধ হতে হল।

—দু' দিন বাস করুন তাহলেই মজাটি টের পাবেন। সাপ ব্যাঙ, জলকাদা আর বিচ্ছিরি অন্ধকারে—

আলোক ভাবতে লাগল, এরা এক একটি গোবিন্দদাস। প্রকৃতির রসে বঞ্চিত। আকাশ বাতাসের রূপ দেখতে হলে একটু মেহনত করতে হয় বৈ কি। প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া আত্মহত্যার সমতুল। প্রকৃতিই জীবনকে সুখি করতে জানে। হঠাৎ ছেদ পড়ল, মিনতি যখন বলল, আর অবশ্য পাড়াগাঁ থাকবে না; তখন আলোককে বিস্ময় প্রকাশ করতেই হল, তার মানে?

—তার মানে আমরা গভর্ণমেন্ট স্কীমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি।—মিনতি যেন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলতে চাইল: মাপ জোক হচ্ছে। রাস্তার ধারে লাইট বসবে। পিচ বাঁধানো হবে। সব জমি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। তিন গুণ চার গুণ দাম।

—কারখানা বসবে না?

—হ্যাঁ, তাও হবে নাকি শুনছি।……আমাদের চাকরীর সুবিধে হবে।

—মদের দোকান?

—জানি না।

কোন গ্রাম শহর হচ্ছে শুনলে এখন আর ততটা দুঃখিত হয় না। গা' সওয়া হয়ে গেছে। কেননা, খবরের কাগজ খুললে এই ধরণের খবর ভুরি ভুরি দেখা যায়। তবে এই জায়গাটার সঙ্গে মিনতি যেন মিলিয়ে ছিল এতকাল। আলোক

তাই চিন্তিত হল। বৃশ্চিক্রিয় শহর তাহলে এত দূরেও তার দূষিত হাত বাড়িয়েছে। সেই কারখানা, মদের দোকান, মাইকের গান আর সস্তা চায়ের দোকান। সেই অল্প বয়সী মেয়েদের দেখলে শিস দেওয়া। কোথাও মুক্তি নেই। পৃথিবীর সমস্ত নিভৃত কোণগুলি একে একে স্টীম রোলারে গুঁড়িয়ে যাবে। সেই সব নিভৃত কোণ উদ্বাস্তু হয়ে হৃদয়ে আশ্রয় নেবে। তবে সেই সব দরদী হৃদয়ও খুব বেশী পাওয়া যাবে না আর।

আলোক জিজ্ঞাসা করল, শহর হলে তুমি খুশি হবে?

—নিশ্চয়ই। কেন হব না?

আলোক অন্ধকারেও মিনতির মুখে তৃপ্তির হাসি দেখতে পেল। মনে পড়ল অনেক দিন আগে মার মুখে চারগুণ দরে জমি বিক্রী হচ্ছে, কারখানা হচ্ছে, অমুক হবে তমুক হবে—এই সব সাত সতের শুনতে শুনতে তৃপ্তির হাসি দেখতে পেয়েছিল। একটুও অমিল নেই কোথাও। দু'জনেই সমান তৃপ্ত। কস্তুর মত শহরের আকর্ষণ প্রবলতর। আলোক বুঝতে পারেনি। 'নিশ্চয়ই। কেন হব না?' রাস্তা মসৃণ হবে। রাস্তার পাশে দিনের মত আলো জ্বলবে। কর্কশ কারখানা বসবে। আরতির মত মেয়েরা সেখানে চাকরী পাবে। পাড়াগাঁয়ে কি চাকরী পাওয়া যায়? জ্যামিতির মাপে আকাশটা ছোট হতে থাকবে ক্রমশ। সকালের পাখির কূজনের চেয়ে হয়ত কারখানার ভোঁ মধুর শোনাবে। একদিন ভেবেছিল, 'মিনতি নারকেল গাছে ছাওয়া এই গভীর পুকুরের মতন। স্নিগ্ধতা দিতে জানে। শান্তি দিতে জানে। কখনো ঢেউ তুলতে জানে না। এই বাড়ির গাছপালার সঙ্গে, নির্জনতার সঙ্গে, বনফুলের সঙ্গে মিনতির এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।' ভুল—সব ভুল। মা হয়ত মনে মনে এই রকম একটি মেয়েই কামনা করেন রায়বাড়ির রেখা ধরে রাখতে। আশ্চর্য, আলোকও একদিন মাকে গিয়ে বলবে ভেবেছিল, 'মা তোমার বৌ কেয়া হতে পারবে না। রায় বাড়ির বৌ হবার যোগ্যতা ওর নেই। কিন্তু এই বাড়ির পুকুরের জলের মত স্নিগ্ধ এক মেয়ে আছে। তার নাম মিনতি।' যেদিন এই সব কথা ভেবেছিল, খুশিতে উথলে উঠেছিল। আজ নতুন করে ভাবতে গিয়ে কান্না পেল। কেয়াকে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল। সেই জন্যে মনে গর্ব ছিল, বুঝি মিনতিকেও বুঝতে পেরেছি। লক্ষ্য করল আলোক, ওর হাতের মধ্যে এখনো মিনতির হাতটা রয়েছে। আস্তে ছেড়ে দিল। মিনতি কি বুঝতে পারল? কেননা, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাগ করলেন?

—না।

—তাহলে কথা বলছেন না?

—তুমি বল।

—আমি কি বলব?

—তোমাদের ইস্কুলের কথা বল।

—আমাকে ছাড়িয়ে দেবে শিগ্‌গীর।

—কেন?

—ইস্কুল আর বিনের মাস্টার রাখবে না।

—তুমি পরীক্ষাটা দিলেই পার।

—পয়সা নেই।

অলোক চুপ করল। ভিতর থেকে গোঙানি আসছে। মিনতির মায়ের। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা জনিত। মিনতির ভাইবোনেরা খাবার বায়না ধরেছে। ওদের জন্যে কিছু আনলে হত। আরতি চাকরী চেয়েছে। ইস্কুল আর বিনের মাস্টার রাখবে না। হয়ত এবার মিনতিও চাইবে। যেদিকে তাকায় ঘরের কোনায় কোনায় ঝুলকালির মতন দারিদ্র্য ঝুলছে। পচা ডোবার গন্ধ বাতাসে। এবার উঠতে হবে। অনেক রাত হল।

মিনতি বলল, আরেকটু বসুন না। বাবাও এসে যেতে পারে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আলোক। আবার ধপ করে বসে

পড়ল। যেন একটুও জোর নেই শরীরে। একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না। তবু উঠে যাবার মতও শক্তি নেই, কি মনের জোর। হঠাৎ মিনতি বলে উঠল, ক্যানিংএর ওধারে আপনার এক বন্ধু আছে না?

—হ্যাঁ। কেন বল তো?—অন্ধকারেও আলোক মিনতির মুখের ভাষা পড়তে চাইল।

—না, আপনি একদিন তার গল্প করেছিলেন মিণ্টএর পাশ দিয়ে আসতে আসতে—

—করেছিলাম।

—তিনি তো লঞ্চের সারেং?

—হ্যাঁ—উত্তরোত্তর বিস্ময়।

—চলুন না একদিন বেড়িয়ে আসি? আলোকদা, আমি বড় ক্লান্ত—

সেই সাপটা যেন ছোবল মারল পায়ে। আলোক কিছু বলতে পারল না। অন্ধকারে কেঁপে গেল শরীরটা। মিনতি তার অবরুদ্ধ কথাগুলি প্রকাশ করে হালকা হতে চাইল: ভীষণ ক্লান্তি শরীরে। আলোকদা, আপনি কথা বলছেন না কেন? সকালে টিউশিনি, দুপুরে ইস্কুল, সন্ধ্যায় সেলাইএর দোকান—আর পারি না। ভীষণ ক্লান্ত আমি—বলতে বলতে কাছে সরে এল। যেন আলোককের প্রশস্ত বুকে ক্ষণিক মাথা রাখবে। সত্যিই যদি মাথা রাখতে চায়? আলোক দেবে কি আশ্রয়? না। আগে হলে দিত। যখন মিনতি ক্লান্তির কথা জানত না। মিনতি জানে না, সোৎসাহে শহরকে আহ্বান জানালে গোপনে দুরারোগ্য ক্লান্তিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়। ক্লান্তি শহরের হৃৎপিণ্ড। লেন-বাইলেন-শিরা-উপশিরার রক্তধারা একদিন হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। আলোক স্মরণে আনল অনেক দিন আগে, বুঝি কেয়ার জন্মদিন ছিল; হালচুর রুপোলি জ্যোৎস্নায় সমুদ্রে হারিয়ে যেতে যেতে কেয়াও হঠাৎ বলে উঠেছিল, আলোক, আর পারি না। ইচ্ছে হয় এলগিন রোড ছেড়ে তোমার দেশে এসে বাস করি। শান্তির দেশে। সেদিন এই কথা শুনে চমকে উঠেছিল। মনে মনে খুশিও হয়েছিল। আজকের চমক সাপের ছোবলের মত। অবশ করে দেয় সমস্ত দেহ মন। অলোক যেন আর উঠতে পারছে না। পায়ের তলার মাটিটা সরে গেল। এই মাটি সরে যাওয়াকে কি বিশ্বাসঘাতকতা বলে? হয়ত তাই। কেয়া আর মিনতি—দুই মেরুর অধিবাসিনী। এখন একে অপরের মেরুতে পৌঁছুতে চাইছে। ওদের এই চাওয়াটা কি আন্তরিক? আলোক পুনর্বার বিশ্বাস করে ভুল করবে? আলোক নিজে কোন্ জগতের অধিবাসী? নাকি মাঘ নিশীথের কোকিলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে হেমন্তর মাঠে ঘুমিয়ে থাকবে অনন্তকাল। স্বপ্ন দেখবে অফুরন্ত।

(ক্রমশ)

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

১।	যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা :	২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২।	প্রকাশের কাল :	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম, জাতি, ঠিকানা :	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, ১০।৬৯ এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলি:—৩৩
৪।	প্রকাশকের নাম, জাতি, ঠিকানা :	কিরণচন্দ্র মিত্র ভারতীয়, ১০।৬৯ এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলি:—৩৩
৫।	সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা :	লীলা রায়, ভারতীয়, ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:—৪৭
৬।	স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা :	লীলা রায়, ভারতীয়, ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:—৪৭

আমি কিরণচন্দ্র মিত্র ঘোষণা করিতেছি যে, উপযুক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য

তারিখ
১৬।৩।৬৫

স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র
প্রকাশক

ধলেশ্বরী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

(পাঁচ)

ঘটনাটা ঘটে গেল আচমকাই। পরিত্রাহি চিৎকার নয়, যেন শেষ উইন্টার মেঘ-ছাওয়া আকাশে অপেক্ষমান কালবৈশাখী প্রচণ্ড আক্রোশে ছুঁড়ে দিয়েছে একটি ভয়ঙ্কর ঠাঁটা। তামাম দুনিয়ার কানের পরদাকে চৌফলা করে সেই ঠাঁটা পড়ল এসে দুই মাল্লা কেরায়া-নাওয়ের আগ-গলুইয়ের চরাটের ওপর। বর্ষার ঘোলা জলে গ্রাস করা গাঁও গেরাম, মাঠ-ঘাঠালি আর বিশাল বিলের বাতাসকে ঘুটে ফেলেছে সেই শব্দ। দূর ও কাছের জলের বুকে ধাক্কা খেয়ে তখনও সেই কানের পরদা ফালাফালা করা চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল খু···ড়া···ড়া·· ড়া

একেবারে আকস্মিক ঘটনা।

প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারে নি শিবচরণ, ঐ নিদারুণ শব্দে সে ভ্যাবলা মেরে গিয়েছিল; হুঁশ পুরাপুরি নেই অথচ যেন আছে। সেই পরিত্রাহি গগন-ফাটা চিৎখিরের ডাকটাই কেবল সে মনে করতে পারছিল। সেই সঙ্গে চিত্তলের পারা গতিবেগে· চলা নাওটা প্রচণ্ড রকমের এক ঝাঁকুনি খেল। পিছ নাওয়ের চরাট থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে শিবচরণ প্রাণপণ চেপে ধরল হালের ডাণ্ডা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁট. চেপে ধরে সিধা, টানটান হয়ে খাড়িয়ে পড়ল দেউলীর বাঘা মাঝি শিবচরণ কৈবিত্তি।

ব্যাপারটা মালুম হতে আরও সময় লাগত শিবচরণের। কিন্তু ছইয়ের অন্দরে তখন হুটোপুটি লেগে গেছে। কেরায়াদারেরা ভড়কানো পোলা দুইখান প্রাণভয়ে গলা-ফাটানো বেখাপ্পা চিল্লানি চেঁচিয়ে উঠল। পিছ ছইয়ের আব্রু ঠেলে কাটা রয়নার বিচির তুল্য ছিটকে বেরিয়ে এসেছে জাঁদরেল আলুর কারবারী জাহেদ ব্যাপারী। তার বেঁটে মোটা শরীরের তখন জব্বর ভুঁইকাপ।···ইয়াআল্লা, কী অইল, অইল কি খুদা··হায় হায় রে·· ডাকাইত · ডাকাইত···' জবাইয়ের মতলব বোঝা বকরীর মতন থরথর করে কাঁপছিল জাহেদ ব্যাপারী।

ডাকাইত কথাটা যেন তীব্র শরাঘাতের মতন শিবচরণের মনকে ছুঁয়েছে।··ডাকাইত! শিবচরণের শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া প্রবীণ রক্তে নতুন যৌবনের উদ্দামতা। রক্তে আগুন জ্বলে উঠল, কানের দুই পাশের রগ দুটো চিরিক মেরে ফুলে উঠেছে ততক্ষণে। চক্ষের নিমেষের মধ্যে ওপর ছইয়ের বেসিজিল পাঁজা থেকে বউরা বাঁশের খাটো লগিখান ফুরুৎ করে টেনে নিয়ে টানটান হয়ে বুকের চওড়া ছাতিখান চেতিয়ে রুখে দাঁড়াল দেউলী মাঝিপাড়ার বুড়া বাঘ শিবচরণ কৈবিত্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে এ-দিগরে পড়ল আরও একখান

টাটা। 'হেই সাবাস ..' দেউলীর নাওয়ের মুখে আছে মুন ইবলিশের ছাওরে—। গমগমে সেই গলার স্বরও ঘোলা জলের স্রোত আর ঘূর্ণীতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হল।

কিন্তু না, জবাব এল না, নাও ভাসানী ডাকাতের দল প্রত্যুত্তরে সমবেত গলায় জিগির তুলল না। শিবচরণের গলার তীব্র হাঁক দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর নিঃশব্দ। কেবল তীব্র বাতাসের ধাক্কায় ফুলে ওঠা বাদামের টানে ডানকেনির গতি-পাওয়া নাওটা টানা জলকাটার শব্দ তুলছিল ছল…ল……। আর তখনই ছইয়ের আব্রু-অন্দর থেকে চিকন গলার হাউ হাউ কান্নার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঘুমিয়ে পড়া প্রান্তরের শান্তিকে কালাফালা করে চিরে ফেলল।

কে! চমকে উঠল শিবচরণ, অন্তর থেকে কে যেন সহসা ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি মেরেছে। স্বর ফুটল না: চেরা, ফ্যাসফেসে গলার খানিকটা অস্ফুট অব্যয় বেরিয়ে এল মাত্র। কান দু'টো তৎক্ষণে সজাগ উন্মুখ হয়ে উঠেছে—যেন আর একবার ওই স্বর শুনলেই মানুষটাকে চিনে নেওয়া যাবে।… কান্দে ক্যারা, ক্যারা? দীর্ঘনিশ্বাসের মতন গলায় নিজেকে শুধলো শিবচরণ, আচ্ছন্ন অভিভূত মনকেও অদৃশ্য হাতের ঝাঁকুনি মারছিল। না না-না, এ কান্দন না, শিবচরণের মনে হল খেজুরের বাঙ্কিকাটা সুতীক্ষ্ণ ছেনির ধার-দেওয়া চকচকে আগা দিয়ে কেউ যেন তার কলজেটাকে দু'ফাক করে দিচ্ছে।.. হ্যাঁ, এই কান্না, এমনি কান্না—মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন সাঁড়াশির চাপ মেরে শিবচরণের গলার নলি পিষে ফেলছে।'...হৈম। তীব্র যন্ত্রণার চাপে নিষ্পেষিত একটা যান্ত্রিক স্বর শিবচরণের কণ্ঠা পেরিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিশ্বাস বন্ধ।…

জাহেদ ব্যাপারী তৎক্ষণে ডাঙায় তোলা নিজের পুঁটির মতন শেষ খিচুনি মারছে। অল্প ভরসায় কমে এসেছে সেই ভয়ানক কাঁপুনি। ঠিক এমন সময় ফুলজান বিবি ডুকরে উঠল। বিবির গলায় আচমকা ওই স্বর লহমার মধ্যে অস্থির করে তুলল জাহেদকে। হাত ফসকানো রাগার মতন প্রায় পিছলে অন্দরে ঢুকতে গিয়ে আর এক ঘটনা। নীচু হয়ে পিছ ছইয়ের পরদায় হাত দিতেই দৈত্যের মতন এক বিশাল থাবা আচমকা থাবলা দিয়ে চেপে ধরেছে জাহেদের কাঁধের কাছের পিরানের অংশ। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান। সেই টানে ছিটকে পড়তে গিয়েও পড়ল না জাহেদ। বিশাল থাবায় মুঠি করে ধরা পিরানের জন্য সে টাল সামলালো। ভয়ে মুখ পাংশু, বিবর্ণ। ঘাড় কাৎ করে মানুষটাকে দেখে নিল জাহেদ। থরথর কাঁপা গলায় কেঁদে ফেলল জলিল খাঁর ব্যাপারী পোলা, 'মাইরো না, মাইরো না মাজি…খুদা কসম আমি…।

'কান্দে ক্যারা!' প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি মেরে চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল দেউলীর বাঘ শিবচরণ কৈবিত্ত।

জাহেরদের তৎক্ষণে পরাণ খাঁচাছাড়া। লুঙ্গি ভরে চ্যারচ্যার করে পেচ্ছাব করে ফেলেছে মিঞার, তোতলাচ্ছে বেদম, 'আ-আমার বিবিজান মাজি, ফুলজান। কসম খাইয়া কইতাচি আর কেউ না

অল্পক্ষণ। তারপর মুঠি আলগা করে ব্যাপারীকে ছেড়ে দিল শিবচরণ। জোরে নিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াল। ঠিকই তো, হৈম আসবে কোত্থেকে? বহুকাল আগে, অনেক কাল আগে গাঙ্ ধলেশ্বরীর সহীন কোলে…গলায় কলসী বাইন্দ্যা…'

'বাঁচাও বাঁচাও—' খুব অসহায়ের গলায় তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে হৈম।

থাবলা থেকে ছাড়া পেয়ে জাহেদ মিঞা আব্রু তুলে সুরুৎ করে ঢুকে পড়েছে অন্দর ছইয়ে। পোলা দুইখ্যান ভয়ে সিটিয়ে এসেছে, আধাদি পাশাপাশি চিথরায়। ফুলজান চোখ বন্ধ করে, দু' কানে হাত চেপে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছিল।

দুই ছেলেকে কাছে টানল জাহেদ, বুকের কাছে।

'আল্লা রসুল, খুদা হাফেজ …' মনে মনে দরগায় সিন্নি মানত করে এগিয়ে এল ব্যাপারী। বিবির গায়ে হাত রাখল. 'হইল কি ফুলজান. ডাকাইতের হপ্পন গ্যাখলা মনে লয়।'

না না, মাথা নেড়ে জানান দিল আগের হৈম, এখনকার ফুরফুরা ফুলজান বিবি। হাত বাড়িয়ে সে আক্রর ওপার দেখিয়ে দিল। যেখানে বিপিনের বিশালকায় দেহটা অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ অনেক সময় পরে জ্ঞান ফিরে এল বিপিনের।

আগ নাওয়ের ভেসরা ভগরায় পাটাতন জলে ছপছপ করছে। ঘটি ঘটি জল তুলে মুখে চোখে ঝাপটা মেরেছে শিবচরণ। কয়েক কুড়ি জল-ঝাপটা খাওয়ার পর দাঁত খুলেছিল, ওষ্ঠ কাঁপল—শেষে চোখ মেলে তাকাল বিপিন। পাতা তুলতে মনে হল, এ চোখ চোখ নয়, ঝুমকা জবার কলি। মাথাটা নামিয়ে আনল শিবচরণ, বিপিনের কানের কাছে প্রায়।' বিপন্না…' খুব নরম, আদর এবং স্নেহের স্বরে ডাকল।

বোজা চক্ষুর দু'টি করে পাতা আলগোছে ফাঁক হয়ে এল। সামান্য, কেমন ঘোলা ঘোলা ঝাপসা লাগছে খুড়ার মুখখান। বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারল না বিপিন। যেমনি খুলেছিল, তেমনি চোখের পাতা বন্ধ করে খুব আস্তে ক্ষীণ গলায় জবাব দিল, 'উ…'

'তুখার কষ্ট হইত্যাচে রে…?'

কথা বলল না, বিপিন, পাটাতনের ওপর রাখা মাথাটা নাড়ল বার দুয়েক ; না না না না।

'এট্টুন জল খাইয়া গলাখান ভিজাইবা. বিপিন…'

বিপিন শুনল কিন্তু কথা বলল না। বড় ক্লান্তি। তার কাছে সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো ঠেকছিল। বেসিজিল। কেমন এক স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব। সবটা সে স্মরণ করতে পারছিল না—যেন আধা ঘুম আধা জাগরণের অবস্থা। তবু চোখ বন্ধ অন্ধকারে খুব চেনা, বড় চেনা চেনা একখানি মিষ্টি মুখ বার বার ফুটে উঠতে উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনও সেই মুখে হাসি হাসি ভাব। কখনও বিমর্ষ মলিনতা। নামটা …কী যেন এই মেয়েটির নাম. কী খ্যান? হ… হ · হ… হ… হৈ…হ্যাঁ, হৈম হৈম… বিপিনের জল-ঝাপটা খাওয়া শীতল চোখের ডিম দুটি তপ্ত হয়ে উঠল, জ্বালা করছিল। সেই জ্বালার জল অশ্রু হয়ে চোখের কোণে ফুটলেও নদীর জলের সঙ্গে তা মিশে গেল। কেউ জানল না, ওই নামটা, মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসছে। চাঁদের রোশনি খাড়ে-কাচা-বুতির তুল্য আর নেই—অনেক মলিন হয়ে এসেছে। চড়া হলুদের ভাব মেশানো জ্যোছনা আগ রাত্রির মতন উজ্জ্বল নেই, ঝকঝকেও না। বিশাল নীলাভ আকাশে অনেক তারার বাতি জ্বলেছিল, ছিল খানেক আগেও। কিন্তু এখন চাপ চাপ কালো মেঘের ফাঁকফুক দিয়ে এক আধটা তারার এক চক্ষু হাসি মিটমিট করছে। এই জ্বলছে এই নিবছে। সারা আকাশ জুড়ে এখনও শকুনের ডানার পারা ঝাপসা ধোয়াটে মেঘের আনাগোনা। ময়লা তুলোর পাঁজের মতন এই মেঘ সারা আকাশে ছড়ানো।

খানিক আগে নাওয়ে ডাকাতপড়া সন্ত্রাস উঠেছিল এখন তার অবস্থা আর এক রকমের। গোটা নাও নিস্তব্ধ। বাদামে বাড়ন্ত বাতাস, দুই মাল্লাই কেরায়া নাওখানা ভয়-পাওয়া পানকৌড়ির মতন তরতর করে ছুটছে। বাতাসের ঝাপটায় জেগে ওঠা অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউ পিঁপড়ের সারির মতন ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে আগ-গলুইয়ের নীচে। বাদাম তোলা নাওয়ের জলকাটা তীব্র গতিবেগ টানা শব্দ তুলছে। অবিরাম বয়ে যাওয়া সেই শব্দটা কৃষ্ণযাত্রা গানের হারমনির স্বরের মতন।

নাওয়ের ওপরে কোনো শব্দ নেই। ত্রাসে যেন বোবা হয়ে রয়েছে এ নাওয়ের মাল্লা আর কেরায়াদার। আক্র

দেওয়া ছাপ্পড়ের অন্দর নিঃসাড়। জাহেদব্যাপারীকে হালে চালান করে দিয়েছে শিবচরণ। দিয়ে সে এসেছে আগ-নাওয়ে। যেখানে বিপিনের অচেতন দেহটা খানিক মাত্র আগে চৈতন পেয়ে লালচক্ষু মেলে তাকিয়েছিল, এখন আবার সে চোখ বন্ধ করেছে বিপিন।

আর জল-ঝাপটা নয়, ঘটি সামনে নিয়ে বসে রয়েছে শিবচরণ। বিপিনের শিথানের নাও-কাষ্টিতে বসে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে শিবচরণ। দু' চোখের দৃষ্টিতে তার তখনও শংকা এবং উদ্বেগের ভাব জড়ানো। মধ্যরাত পেরোনো চান্দের রোশনী আগ রাইতের মতন ঝকঝকে না হ'লেও, তা শিবচরণের মুখটাকে স্পষ্ট করেছে। বয়েসের ভারে অল্প আলগা হয়ে আসা মুখের চামড়ায় জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম জ্যোছনার ছোঁয়া পেয়ে চিকমিক করছিল।

প্রথমে দেখতে কষ্ট হচ্ছিল হৈমর। সামান্য ঘন বুনন শাড়ির সুতোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়েও সে ভাল করে দেখতে পারছিল না শিবচরণকে। এখন সে চুলের কাঁটা দিয়ে ফাঁক করা সুতোর গর্তের পথে এক চক্ষু দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই তো, এই তো তার বাপ। ওই দু'খানা শক্ত ড্যানা, প্রশস্ত রোমশ বুক—ছোটবেলায় কতদিন বাবার বুকের ওপর শুয়ে আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে হৈম। বুকের মধ্যে অসহ্য এক তীব্র যন্ত্রণার দাপাদাপি। বহুকালের পুরণো ব্যথাটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, বুকের পাঁজর বুঝি চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠা পেরিয়ে উথলে আসছে ভীষণ কান্না। না না না, মুখ সরিয়ে এনে অন্দর ছইয়ের ভীরু আলোয় মাথা নাড়ল হৈম, 'আমারে কাহিল কইরো না খুদা পরমেশ্বর—বাপের মুখ আমি দেখুম না ; না—'

কিন্তু সুদৃঢ় সংকল্প অটুট রাখতে পারল না হৈম। পারা যায়ও না। সেই দেউলীর জাহাজ-ঘাটা থেকে শিবচরণের গলার স্বর বারবার ট্যাটার ফালার মতন তার বুকে বসছিল। কথা যখন শুনেছে, চিনতে যখন পেরেছে কথা তখন চক্ষের দেখাটা দেখতে আর কসুর কিসের।… এক আধটা দিন নয়, দীর্ঘ পনেরো বছর। এতকাল পরে চক্ষের সামনে আবাল্যের সেই পিতাকে পেয়েও যে আবাগী দেখতে পায় না, দেখে না, সে মনিষ্যি না, পাথর।

পনেরো বছর…চোখ মুছতে গিয়েছিল হৈম, মুছল না। তার সমস্ত বুক নিংড়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো ফং করে। চোখের সুমুখে কেমুন ঝাপসা ঝাপসা পাতলা খুয়াব—প-নে রো ব ছ-র… ঘুমের গলায় স্বপ্নের মধ্যে যেন অস্ফুটে কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করল হৈম। দেউলী মাঝিপাড়ার ছবিখান তার মনের মধ্যে বার কয়েক চরকির তুল্য ঘুরপাক খেয়ে স্থির হ'ল।

বাপ-সোহাগী মেয়ে হৈম। বাপের প্রথম সন্তান। অনেক আদর, কত না যত্নের মধ্যে মানুষ। কিন্তু কোথায় গেল সেই যত্ন আত্তি ভালবাসা সোহাগ। কপালের এমনি ফের গোটা দেউলী মাঝিপাড়ার সকল মানুষের কোল পাওয়া সেই সোনার পিত্তিমা হৈম এখন ফুলজান বিবি ; জাহেদব্যাপারীর নিকা করা বউ।

রূপ, এত রূপ দিয়েছিল পরমেশ্বর, সেই রূপই কাল হ'ল হৈমর। গাঙ ধলেশ্বরী পারের জল-হাওয়া, আম-জাম-হিজল আর ছৈত্তান গাছের ছায়া, বাপ-মায়ের অনেক সোহাগ নিয়ে কৈশোর পেরিয়েছিল হৈমবতী। চোখের সেদিন আলাদা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়ে যে মানুষটাকে চিনে নিয়েছিল, জীবনের একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়েছিল হৈম, সে বিপিন। চন্দ্রকান্ত কৈবর্তের একমাত্র পোলা বিপিন কৈবর্ত। কী চেহারা, কী স্বাস্থ্য—মানুষ না, নাটমন্দিরে বসানো দুর্গা ঠাকুরের চালির কোনার দিকে ময়ূরের পিঠে বসা কাত্তিক ঠাকুর য্যান।

শুধুই কাত্তি না, গোটা পাড়ার অস্থির যৈবন বুঝি। হৈমর মনে আছে, সেবার চৈতপূজার কল আটকেছিল টেউরার ডাকেরা। বেলা তখন দুইফর। এমন সময় প্রাণপণে ছুটে এল উত্তর পাড়ার রাধারচরণ কৈবিত্তির বড় পুলা ক্ষেত্র

মোহন। সিধা এসে খাড়া হয়েছিল শিবচরণের আঙিনায়। এসেই এক চিৎকার। দেখতে দেখতে উইস্তা দুইফরের মাঝি পাড়ার ঘর ঘর থেকে মাল্লারা ছুটে এল। শিবচরণ জিরান নিচ্ছিল, ক্ষেত্রের আচমকা চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে একছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হা-হা করে। কী হইল ক্ষ্যাত্রমোহন?

ততক্ষণে ভুয়ায় বসে পড়েছে ক্ষেত্র। দুইফরের রোদ—পোড়া কুত্তার নাহান হাঁপায় আর হাঁপায় কথা কইবার পারে না। জল চেয়েছিল, হৈম এক পালি জল আনল। তা খেয়ে তবে শান্ত হয় মানুষটা। শেষে কয় আসল কথাখান।

মাইধ্যানের রেবতী কবিরাজের বাড়ি রাত্রিবাস করেছিল দেউলীর গাজন সন্নিসির দল। পাওনা গণ্ডা মিলেছে অনেক। রাত্রিতে কালীকাচের নাচ হয়েছে। সকালে দুই পালা খাটনা। তারপর এ-বাড়ি ও বাড়ি করে অবিনাশ করের আঙিনা। হাজমারা চৈধরাণীর পালা গাওনা করে দল ফিরে আসছিল ঢেউর‍্যার মুচি পাড়ার পাশ দিয়ে। এমন সময় জিগির। শুকনা বিলের সীমানা জুড়ে অসংখ্য মাথা আর মাথা। 'হালার গিদ্দরেরা বল্লম উল্লম লইয়া খাড়াইচে খুড়া…'ক্ষেত্র হাঁপাচ্ছিল তখনও। 'কয় ঘুইরা যাওন লাগব—সিধা যাইবার দিব না—'

'দিব না—?' কথা নয়, যেন একটা হুঙ্কার ছেড়ে দু'পা ছিটকে পেছনে হড়কে এল শিবচরণ, 'এতখানি কথা কয়……হারামীর পুতের স্যাকেরা? মাথা লইচস কয়ডা আগে ক—'

'পারি নাইক্যা খুড়া…'মুখ নীচু করল ক্ষেত্রমোহন, দেউলীর বাঘের চক্ষে তাকায় এমন তাগৎ নাই। 'আগো লগে সড়কি কোচ রইচে…'

'হ্যাই কৈবিত্তির পুত, মুখ সামলাইয়া—'ক্ষিপ্তের মতন দুই লাফে ক্ষেত্রমোহনের সামনে এসে দাঁড়াল শিবচরণ, মাথার বাবরিতে ঝাঁকি মেরে হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেলাজ বেশরম…' দাঁতে দাঁত ঘষছিল শিবচরণ, চোখে আগুনের হলকা 'মাথা লইবার পারস নাই, তুই আইচস শিয়ালের নাহান পলাইয়া …'ঝাপিয়ে পড়তে গিয়েছিল শিবচরণ কিন্তু পারল না। আচমকা ছুটে এসে সামনে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিপিন। 'ক্ষ্যান্ত দ্যাও খুড়া, ক্ষ্যান্ত দ্যাও। অরে মাইরা ফায়দা নাই ক্যা…।' সহসায় খপ করে শিবচরণের হাতটা চেপে ধরে ফেলল বিপিন, হ্যাঁচকা টান মারল একটা—জোরে। 'আওগাও দেহি, হালার স্যাকের মুণ্ডু দিয়া পয়জার বানাইতে হইব খুড়া…'

যেমন কথা তেমনি কাজ। সহসা পরিত্রাহি গলায় জিগির ছাড়ল বিপিন। আর নিমেষের মধ্যে পিলপিল করে ছুটে এল অগণন মানুষের স্রোত। দেউলী মাঝিপাড়ার চার দিগরের তামাম ঘর খালি করে শ শ মানুষ লাঠি সোটা বল্লম ট্যাটা আর রাম দা নিয়ে হাজির হ'ল শিবখুড়ার আঙিনায়। তিলেকমাত্র সময় থাকল না ওরা। নিমেষের মধ্যে উন্মত্ত জনস্রোত ছুটে এল ঘাটে। অগণন মানুষের গলা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল 'জয় ধলেশ্বরী'''জয়'—উদ্দাম গাঙের পানি হাতে হাতে তুলে নিয়ে মাথায় ছিটলো সবাই। তারপরই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের পালের মতন বিশাল দলটা ছুটে গেল ঢেউর‍্যার পথে।

খুব একটা কাইজ্যা হয় নি। দেউলী মাঝিপাড়ার জোয়ান বাঘের থাবলায় গুটি দশেক মানুষ মাটিতে শয্যা নিয়েছিল। তারপর মিটমাট। ফৈজুদ্দিন মোল্লা বিজয়ী দলের সঙ্গে চলে এসেছিল দেউলীতে। বড় নরম মানুষ, মিঠা হাসি, দরদী কথা লোকে বলে ফৈজুদ্দিন পীর। হৈম দেখেছে, পীর কিছুদিন ভগমানের মতন হাসে, কথা বলে, যাদু জানে। বিপিনকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিল মোল্লার। হাত রেখেছিল মাথায়—'সাবাস জোয়ান। খুদাতায়ালার দোয়া পাইচস বেটা তাগৎ পাইচস শেরের। নাম রাখবি, মান রাখবি মাঝিপাড়ার…'

সবাইকে ডেকে মোল্লা সাহেব কাইল্যা করতে বারণ করেছিল। 'মানিষ্যি হইল গ্যা হগ্‌গলই সমান। কোরানে যে কথা কয়, সায়েবগো বাইবেলেও কয় সেই কথা। আর তুমাগো রামায়ণ মহাভারতও তাই, বুঝলানি কৈবিত্তির পুত? তাইলে মোদ্দা কথাটা হইল কি জান নি? আমরা হইলাম গ্যা ভাই ভাই ···এক বাপের হগ্‌গল পুলা·· ···'

মানুষ যেমন খতম করেছিল বিপিন, তেমনি গায়ে সেও কম দাগ বয়ে আনেনি। শরীরের ইতস্তত তার রক্তারক্তি। ভর দুইফরে জ্বর এল কাঁপন দিয়ে। কী খিঁচুনি, কী খিঁচুনি···। তখন মাথার কাছে বসে থাকত হৈম, হাত বুলোতো কপালে। আর বিপিন তার ঠাণ্ডা হাতটা দু' মুঠোয় খানিক চেপে ধরে বুকের ওপর রাখত। চোখ তুলে তাকাত হৈমর মুখের দিকে। কথা কইত না বিপিন কিন্তু চক্ষের চাউনি যে কথা বলত, হৈম তা বুঝতে পেরেছে কতদিন।

কতদিন ·····কতদিন কাটল। তারপর সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। মধ্যপাড়ার মণ্ডলবাড়ির বড় পোলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল হৈমর। তখন বৈশাখ পড়েছে। গাঙ ধলেশ্বরী জল সরতে সরতে দেউলী মাঝিপাড়াকে দীনদুঃখী অসহায় করে নেমে গেছে অনেক দূরে। বালি আর বালি—মাঝি পাড়া উঠে যাবে জল সোঁতার কিনারে। বিনা জলে জীবন চলে বায়নাদারের। এমন দিনে সম্বন্ধ এল। মাইঠ্যানের মাখন গোঁসাইয়ের শিষ্য মণ্ডলেরা, শিবচরণও তারই শিষ্য। সেই সুবাদে সম্বন্ধ। দেখা দেখি, পাওনা থাওনার কথা চুকলে দিন সাব্যিস্তি হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে, হৈমর মন টানে না। তার অন্তর জুড়ে ফুটে রয়েছে বিপিন নামের একটি বলিষ্ঠ মূর্তি। সেই মূর্তির কত পরশ তার দেহে, কত আদর সোহাগের নামাবলী তার গায়ে—কোন পরাণে সেই প্রাণনিধি ছেড়ে হৈম আর এক পুরুষের গলায় মালা দেবে? না পারবে না—কিছুতেই পারবে না হৈম।

কয়েকটা অস্থির আর উদ্বেগ দিন রাত্রি খসে গেল চৈত্রমাস থেকে। অবশেষে মিলেছিল সুযোগ, সুযোগ। ভুইঞাবাড়ির নির্জন খেঁজুর তলায় মিলেছিল বিপিন আর হৈম। সন্ধ্যা তখন সবেমাত্র তার কালো আঁচল বিছিয়েছে এ দিগরের ওপর। কিন্তু সে মিলন বেফায়দা, বেফসল। শক্ত সমর্থ জোয়ান হ'লে কি হবে, সিধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না বিপিন। কেবল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল। কথা বলে না, জবাব দেয় না—শুধুই কাঁদে। হৈম বুঝেছিল, বিপিন প্রেমের কাছে বড় কাহিল মানুষ। বড় নরম, বড় কোমল। অনেক চেষ্টা করেছিল হৈম। কিন্তু কিছুতেই রাও কাটে না বিপিন। শেষে মরিয়া হয়ে উঠল হৈম। হাঁটু গেড়ে বসে তীব্র হতাশায় ভেঙ্গে পড়া বিপিনের দু' কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি, মেরেছিল রাগে এবং যন্ত্রণায়। 'চুপ মাইরা আমারে সব্বনাশের মুখে ঠেইলা দিও না, তুমার দুইখান পায়ে পড়ি আমি···' লহমায় বিপিনের পায়ে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল হৈম।

খানিকক্ষণ কথা কইল না জোয়ান বিপিন। কেমন ভাসা ভাসা উদাস চাউনিতে দেখে নিয়েছিল হৈমকে ক্ষণমাত্র। তারপরেই হৈমর গোটা দেহটা যেন ছোঁ মেরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে খানিক নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু টপ টপ করে হৈমর সিঁথি ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

'আমারে লইয়া অন্য কুন ঠেঁই চল তুমি। তুমার চখের সামনে আর একজনের গলায় আমি মালা দিবার পারুম না, কিছুতেই পারুম না।' হৈম কাঁদছিল। বিপিনের চওড়া বুকে মুখ গুঁজে, ধসে কেঁদে যাচ্ছিল হৈম। 'পরমেশ্বর আমার এইডা কী করল, শিব কালাইয়া আমি···'

'উপায় নাইক্যা হৈম···' অনেক পরে কথা কইল বিপিন। 'শিবখুড়ার মনে দাগা দিবার পারুম না। বিয়্যা ঠিক কইরা

ফ্যালাইচে খুড়ায়—কথার খিলাপ করব না। তুমি কেন আগে আমারে কইলা না…

'আগে কমু!' বিপিনের প্রশস্ত বুক থেকে মাথা তুলে এনে তার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল হৈম। 'আমার কওন শুইন্যা তুমি কাম করবা? তাইলে এতখানি আদর দিছিল্যা ক্যান, ক্যান আমারে কও নাই এই ডা খেলা- আমারে তুমি চাও নাই, কোনোদিন চাও নাইক্যা …'

আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে মুহূর্তে ছিটকে সরে এল হৈম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ছুট। বিপিনের চোখের সামনে থেকে ঘন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল হৈম।

অনেক বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশা আর অসহায়ত্ব নিয়ে কদিন কাটল। চৈত্রমাস ততদিন শেষ হয়ে গিয়েছে। বৈশাখ এসেছিল। এমন এক সন্ধ্যায় গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হৈম। সিধা ধলেশ্বরীর কিনারে। সারা আকাশ কালো হয়েছিল বিকেল থেকে, সাঁঝতক বাতাসের দাপট বাড়ল। দেখতে দেখতে উদাস ঝড়। সেই ঝড় মাথায় নিয়ে বিশাল বালিয়াড়ি পেরিয়ে ছুটে এসেছিল হৈম। বাঁচাও বাঁচাও সই ধলেশ্বরী। আমার মান অপমান জীবন যৈবন তুমার পায়ে রাখি, আমারে পথ দেখাও, দিশা ফিরাইয়া দাও। মনের মনুষরে তুমি শক্ত কইরা খাড়া করাও…

চিন্তার জালটা আচমকা ছিঁড়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে বসেছে বিপিন। আব্রুর ফুটো দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল হৈম। তবু মুখটা আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। দেখে দেখে যেন মন ভরে না।

'উঠছ ক্যান বিপন্যা, শরীল কাহিল, আর এটুন শুইয়া থাক….'শিবচরণ বাধা দিচ্ছিল। 'মাথাডা আগের নাহাল ঘুরায় না!'

'না'। ক্লান্ত কাহিল গলা বিপিনের। সিধা হয়ে বসে, আব্রুর দিকে তাকাল বিপিন। তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। মনে হচ্ছিল, তার বুকের পাঁজর কয়খান খুলে নিয়ে কেউ হৃদয়ের অন্দরে রেখে দিয়েছে। হৈম…মনে মনে নামটা উচ্চারণ করল বিপিন। তার ঠোঁট দুটি ভীষণ কাঁপছিল। চোখের পলক পড়ছে না।

বাতাসের টানে বাদামখান তীব্র গতি দিয়েছে নাওকে। তরতর করে সে এগিয়ে যাচ্ছে আমনের বাড়ন্ত ডগা ডলীতে দলে দলে। অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে হিন্দানগর চকতৈল আইট্টা আর মুন্সীগাওয়ের সীমানা অতিক্রম করে পাথরাইলের গা ছুঁয়ে, অনেক বিল-বাঁওর পেরিয়ে ধান কাওনের ক্ষেতে বিলি কেটে, জলঘাসের ঘন বন মাড়িয়ে দুই মাল্লাই কিরায়া নাওখান এইমাত্র পড়ল নাপী নটরার হাজী খালে।

পথ এবার উজানী, সিধা উত্তরমুখী। মলিন চাঁদের রোশনাই সামনের জলধারাকে কাল নাগিনীর শরীলের তুল্য চকচকে করে তুলেছে। প্রশস্ত খালের দুরন্ত সোঁত অসংখ্য গোখুরার নাহান হিসহিসায়, ফোঁসায় আর ছোবল মারার আগ মুহূর্তের মতন গর্জে ওঠে থেকে থেকে। বুড়ো চিতলের লেজুরের ঘাইয়ের নাহান হাজী খালের পানি স্রোতের ধাক্কায় আছড়ে পড়ে পারের মাটিতে। কী ডাক, কী ডাক! অনেক মাটি-খাওয়া ঘোলা জলের ক্ষ্যাপা অস্থির দুরন্ত সোঁত পাক খায়, চক্কর মারে, বাতাসের আচমকা ঝটকার মতন সামনে যা পায় নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তার অস্তিত্ব। মালুম হয় খালের গহীন তলায় বুঝি কোনো উন্মাদ তারস্বরে টানা অট্টহাসি হাসছে।

হাজী খালের সোঁত সহস্রেক জোয়ানের জেদ নিয়ে বইছে। কিন্তু বাতাস আগের তুল্য তীব্র নেই। যেন অনেক ছোটা-ছুটি করার পর ক্লান্ত হাওয়া জিরানের ঠাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালে টান নেই বাতাসের, বাদামে ধরা হাওয়া পাললা দিয়ে পারছে না; মালদারী কিরায়া নাওখান চার বিগৎ না এগোয় তো আড়াই বিগৎ পিছলে চলে আসে পেছনে। হালে বসে জাহেদ বেসামাল বেদিশা।

'নাও য্যান কেমুন করে গো মাঝি…'পিছ নাও থেকে

অসহায় গলা ভেসে এল জাহেদের। 'হালার বাসাতে উলটা ঠ্যালা মারবার লাগছে…'

কিন্তু জবাব এল না। আগ নাওয়ের সকল শংকা কাটলেও শিবচরণ এখনই বিপিনকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না। ঝিম ধরে বসে রয়েছে বিপিন। চোখ বন্ধ করে।

মরা চান্দের আলোয় খালপারের গাছগাছালি দেখা যাচ্ছিল। জলডুমুর হিজল আর ছৈতনের বন ইতস্ততঃ। পাশের ঝাকড়া ঝাওড়া গাছ থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল কটি পাখি। পাকুড়ের ডাল থেকে রাতজাগা কাকের ডাক ভেসে আসছিল থেকে থেকে।

বাচ্চা দু'টো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। হৈম দেখল; মুখ ঘুরিয়ে। তারপর তার আশ না-মেটা দৃষ্টিকে আরও এগিয়ে আনল। ছইয়ের আব্রুর কাপড় নাক ছুঁয়েছে। থেকে থেকে কপালের ওপরেও পরশ দিয়ে যাচ্ছিল। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য। হৈম কোনোদিন ভাবতে পারে নি আবার সে তার প্রিয়জনের কাউকে কখনও দেখতে পাবে। কিন্তু পেল। আগ নাওয়ে শুধুমাত্র তার আপন মনিষ্যিই না, বসে আছে পরমেশ্বরের মতন তার বাপ আর, আর একটা মানুষ যার মূর্তিখান বুকের পিঞ্জরায় অনেক দিন ধরে বেঁচে ছিল। শেষে একদিন মরল। হিঁদুর ঘরের মেয়ে মুসলমানের বিবি হয়েছিল। হবার পরও ওই মূর্তি আর কম বয়েসের কলিজায় ধরা জ্বালাটি বহু রাতে হৈমকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে করতে মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ, এ মুহূর্তে হৈমর সারা মন ভীষণ আঁকুপাকু করছে। ফেলে আসা দিনের সামান্য একটা ছেদের জন্যে সে আলাদা হয়ে গেছে—কোনোদিন আর বাপের কোলে সে ফিরে যেতে পারবে না, মনের মানুষকে চোখের সামনে রেখে পুড়ে পুড়ে শেষ হতে পারবে না হৈম।

পারব না! এক দুর্জয় শক্তি আচমকা ভর করল হৈমর মনে। তার কানের কাছের রগ দু'টো কাটা পাঠার-পাঁচ পরানের মতন দ্রুত খিঁচুনী মারে। পাটা ফুলে উঠেছে নাকের; নিশ্বাসও তপ্ত—বুকের কোথাও তুষের আগুনে আচমকা বাতাসের ঝাপটা লাগার মতন জলুনি ফুটছে। দু' চোখের কোল বেয়ে নেমে এসেছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা।…দেখা যায় না-দেখে সইতে পারছিল না হৈম, তবু সে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। চোখ জ্বালা করছিল, পাতা টেনে দৃষ্টি রুদ্ধ করল সে। ধরা গলায় অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে আপন মনে হৈম ডাকছিল,…বাবা….বাবা…বাবা…'। এই ডাক যেন হৈমর সমস্ত হৃদয়টাকে মুচড়ে দিচ্ছিল …।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রী

বৈশাখ
১৩৭২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ও
বাংলা সাময়িক পত্র

এটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা। বাংলা সাময়িক পত্রের জন্ম মুহূর্ত থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্য্যন্ত একটি মূল্যবান ইতিহাসও এই সংখ্যায় সংযোজিত হবে।

পরিকল্পিত বিষয় সূচী

রামানন্দ প্রসঙ্গে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জীবনী প্রসঙ্গ
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : আন্তরিক চিত্র ও স্মৃতিচারণ
রামানন্দ : প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়্যু
রামানন্দ : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে

সাময়িক পত্রের আদিপর্ব : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সাময়িক পত্র : বঙ্কিম পর্ব
রবীন্দ্র পর্ব
কল্লোল পর্ব
লিটল ম্যাগাজিন
সাময়িক পত্র ও রাজনৈতিক চেতনা

লেখক সূচীসহ বিস্তৃত বিবরণ চৈত্রের জয়শ্রীতে প্রকাশিত হবে।

দাম : ১·০০ সডাক : ১·৬৫

জয়শ্রী

৩১২, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-৪৭

ফোন : ৪৬-৪১১৬

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনামে সঙ্কট

৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভিয়েৎনামের সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। এই দিন প্রত্যূষে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী অংশে ত্বরিত আক্রমণে ভিয়েৎ কং মার্কিনী সেনাবাহিনীদের একটি প্রধান দপ্তর ও একটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে অন্তত সাতজন মার্কিনী সেনাকে নিহত এবং একশ নয়জনকে আহত করে। ভিয়েৎনামে সংঘাত হবার পর মার্কিন ঘাটির উপর এটা নাকি প্রচণ্ডতম আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রত্যাঘাতরূপে একই দিনে মার্কিনী ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিমানবাহিনী উত্তর ভিয়েৎনামের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটি বোমাবিধ্বস্ত করে। উত্তর ভিয়েৎনামে এই প্রতিআক্রমণের সময় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোশিজিনের উত্তর ভিয়েৎনাম রাজধানী হ্যানয়ে উপস্থিতি ভিয়েৎনাম সঙ্কটের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। গত কয়েকমাসে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক অস্থিরতা পুনঃ পুনঃ সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবার পাশাপাশি বিদ্রোহী ভিয়েৎ কং-এর বর্ধিত শক্তির পরিচয় দুঃসাহসিক গরিলা আক্রমণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিনী সামরিক হস্তক্ষেপ যেমন অনিবার্যভাবে তীব্রতর হচ্ছে তেমনি তার প্রতিক্রিয়ারূপে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের দাবী কোনো কোনো মহলে সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং এই অঞ্চলকে বৃহৎ শক্তির আওতার বাইরে রেখে নিরপেক্ষ-করণের অন্তর্ভুক্তির দাবীও প্রবলতর হচ্ছে। ৭ই রাত্রে সাইগণের ৯০ মাইল দক্ষিণে মার্কিনী হেলিকপ্টার ঘাটিতে ভিয়েৎ কং-এর আক্রমনের পর ৮ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় পূর্বদিনের লক্ষ্যস্থল উত্তর ভিয়েৎনামের ডং হয়তে মার্কিনী আক্রমণ চলে। ৯ই বিন দিন্নাতে তিনটি মার্কিনী-হেলিকপ্টার ভিয়েৎকং-এরা ভূপাতিত করার পর মার্কিনী ভিয়েৎ কং সংঘাত প্রবল হয়ে ওঠে। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিনগিন-এ প্রায় ৬০০ ভিয়েৎনামী সৈন্য আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩০০ বিধ্বস্ত হয়। সাইননের উত্তর-পশ্চিমে ভিয়েৎ কং-এর বোমায় কুই নন সহরে মার্কিনী সেনাবাহিনীর একটি চারতলা আবাসস্থান বিধ্বস্ত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারীও দুইবার উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক লক্ষ্যের উপর প্রচণ্ড মার্কিনী ও ভিয়েৎনামী প্রতিআক্রমণ চলে। প্রথমবারের আক্রমণ চলে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে অবস্থিত তিনটি বিমানবাহী জাহাজ থেকে।

মার্কিনী পাল্টা আক্রমণের সুরুতেই প্রেসিডেন্ট ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিনী পরিবারবর্গের অপসারণের এবং বিন দিন-এ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হক্ ক্ষেপনাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপনের নির্দেশ এবং অন্যান্য অস্ত্রসম্ভার প্রেরণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন ৭ই ফেব্রুয়ারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন হ্যানয় যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী ও সেখানকার মার্কিনী সামরিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং জনসনের ভাষায় We have no choice now but to clear the decks and make absolutely clear our continued determination to back South Vietnam in its fight to maintain its independence." একই দিনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিজিন হ্যানয়তে একটি সমাবেশে বলেন উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রান্ত হলে সোভিয়েত সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কোসিজিন আরও বলেন সোভিয়েট ইউনিয়ন, কিম্বা চীন কিম্বা উত্তর

ভিয়েৎনাম কেউই যুদ্ধ চায় না কিন্তু তাদের defensive capacity বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভিয়েৎনামের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির পূর্ণ দায়িত্ব আমেরিকাকে বহন করতে হবে—'Fraught with serious complications for which the U. S. A will bear full responsibility.'

এই সংঘাতের মুখে চীনাদের ভাষা সোভিয়েত রুশ কিম্বা উত্তর ভিয়েৎনামের চাইতে আরও মারমুখী। ৯ই ফেব্রুয়ারী চীন স্পষ্টই ঘোষণা করে "উত্তর ভিয়েৎনামে বিমান আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে হবে। যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় চীনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে।" চীনাদের পত্রিকা People's Daily'র মন্তব্য আরও উগ্র: "Debts are Debts and they must be repaid, when debts accumulate, they will have to be repaid at compound interest." পিকিং-এ দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে যোগ দিয়ে চাউ-এন-লাই এই চীনা হুমকির প্রতি সমর্থন জানিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামকে উৎসাহিত করেছেন। মস্কোতে অবশ্যি মাত্র দুই হাজার চীনা ও ভিয়েৎনামী ছাত্র মার্কিণ দূতাবাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এই সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। মস্কোর সাধারণ মানুষের উত্তর ভিয়েৎনামের জন্য উদ্বেল হতে দেখা গেল না। পিকিং ও মস্কোর উত্তর ভিয়েৎনামের বিপদ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার এই বৈষম্য, দুই দেশে উত্তর ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার বৈপরীত্য সূচিত করেছে। অবশ্যি গত আগষ্ট মাসে টনকিন উপসাগরে মার্কিণ আক্রমণের পর লাওস-ভিয়েৎনাম অঞ্চলে বিপদে নিরুত্তাপ ক্রুশ্চেভ-নীতির পরিবর্তে বর্তমান কোসিজিন-নীতিকে উত্তপ্ত করে তুলে চীন-সোভিয়েট বৈপরীত্যে অনস্বীকার্যভাবে ছেদ টেনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রুশ-নীতিকে চীনামুখীন করে তুলেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক অস্থৈর্য এই অঞ্চলের পরিণামের বিরুদ্ধে মার্কিণী প্রতিরোধকে দ্রুত উত্তর ভিয়েৎনামের দিকে ঠেলে দিয়ে উত্তর ভিয়েৎনাম-মার্কিণী সংঘাতে পরিণত করতে পারে। সেক্ষেত্রে চীনারা নিশ্চেষ্ট থাকবে না। সশস্ত্র 'চীনা ভলান্টিয়ারদল' তখন উত্তর ভিয়েৎনামের রণক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবে, যেমন করেছিল কোরিয়ার যুদ্ধে। এবং সোভিয়েত রাশিয়াও সেদিন তাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে বাধ্য হবে ক্রুশ্চেভ-উত্তর উগ্র চীনমুখীন রুশ নীতি অনুসরণে।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ আণবিক যুদ্ধে কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধে পরিণত হবে, না সেই সঙ্কটময় সম্ভাবনার পূর্বে ইন্দো-চীনের দিয়েন-বিয়েন-ফুতে ফরাসী বিপর্যয়ের পর ১৯৫৪ সনের জেনেভা সম্মেলনের পুনরাবৃত্তি হয়ে আমেরিকা আলোচনা বৈঠকে সম্মত হবে, তা সঠিক উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। দ্যগল যে চীন-সমেত পাঁচ প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন কিম্বা এই অঞ্চলে নিরপেক্ষ বলয় সৃষ্টির ভারত-ফরাসী প্রস্তাব কোনটাই বৃহৎ শক্তিবর্গ গ্রাহ্য করে নাই। আমেরিকা কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক ঘাঁটিগুলি বিপন্ন করেছে। সোভিয়েট রুশ কতটা প্রত্যক্ষ ঝুঁকি নেবে তার উপর নির্ভর করবে এই সংঘাতের ভবিষ্যৎ। কিউবার পুনরাভিনয় হলে এই অঞ্চলে চীন-মার্কিন সংঘাত আর এক ধাপ অগ্রসর হবে। আর যদি সোভিয়েটও পাল্টা ঝুঁকি নেয় তাহোলে কিছুকালের জন্য সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায় পিছিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আর এক পদক্ষেপ করেছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মার্কিন সেনাবাহিনীর ভিয়েৎনামের ভূখণ্ডে অবতরণের জন্য নৌবহরের অন্তর্বর্তী বাহিনীরা সাইগনের উত্তরে উদ্যোগী হয়েছে। এ-যাবৎ প্রায় ২৩ হাজার মার্কিনী সামরিক পরামর্শদাতার উপস্থিতি ভিয়েৎনাম সেনাবাহিনীর সহায়তার কাজ করছিল এবার সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সুরু হল। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে এ-ঘটনা এই প্রথম।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধে এ-ধরণের প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ

ভিয়েৎকং-এর প্রাধান্য ও প্রভাবের স্বীকৃতির বাধ্য। ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং-এর প্রাধান্যের সঙ্গে এই যুদ্ধে চীনের প্রাধান্যের সমস্যাও যে জড়িয়ে আছে, সে-সম্পর্কে মার্কিনী-মহল উদ্বিগ্ন হয়েই বে-পরোয়া হয়ে উঠছেন কিনা বলা যায় না। কারণ ফেব্রুয়ারীতেও তারা উত্তর ভিয়েৎনামে যুদ্ধ প্রসারিত হবে না বলা সত্ত্বেও যুদ্ধ দ্রুতগতিতে উত্তরে সম্প্রসারিত হয়েছে। এদিকে ভিয়েৎনাম সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার দাবীতে প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে তাল রেখেই কি মার্কিনী সামরিক সমাবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সে-সম্পর্কে নানা গবেষণা রয়েছে। কারণ, কোনো কোনো মহলে এ-ধারণা রয়েছে যে মার্কিনী সরকার রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে সামরিক মীমাংসার দুর্গম পথে পা বাড়াবেন না এবং তাঁর এই সামরিক সমাবেশ রাজনৈতিক মীমাংসার কূটনীতিকে চীনের পরিবর্তে রাশিয়ার সঙ্গে সর্তালোচনার পৃষ্ঠভূমি মাত্র। হ্যানয়ে কোসিজিনের উপস্থিতির সমকালে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক মীমাংসার আসরে রাশিয়ার উপস্থিতি অনিবার্য করে তোলা। কারণ, মার্কিনী মারমুখীনতার সামনে সোভিয়েত রুশের উপায়ান্তর থাকবে না উত্তর ভিয়েৎনামের পাশে এসে না দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কটকে এড়িয়ে থাকবার। সে ক্ষেত্রে চীনের অসপত্ন প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শুধু নয়। গোটা এশিয়া ও আফ্রিকায় সোভিয়েত রুশকে এই এলাকায় নিঃসঙ্গ করে ফেলবে। ক্রুশ্চেভ-উত্তর সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কেরা সেই সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্যই তাদের উন্মুখতা —যা ক্রুশ্চেভ-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। মার্কিনী সামরিক তৎপরতা এই উন্মুখতাকে বৃদ্ধি করবে। এবং সোভিয়েতও ভিয়েৎনাম লাওস সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসায় শরীক হবে, শুধু চীন নয়। সুতরাং, মার্কিনী সামরিকনীতির পশ্চাতে এই কৌশলের অবস্থিতি কোনো অবাস্তব কল্পনা নয়। যদি এই আয়োজন ব্যর্থ হয়, এবং রাজনৈতিক মীমাংসার পথ রুদ্ধ হয়ে সামরিক মীমাংসার দিকে সঙ্কট গতিশীল হয়, মার্কিনী আয়োজনে সেই সম্ভাবনার জন্যও প্রস্তুতি রয়েছে। মাও সে-তুং-ও সম্প্রতি যুদ্ধের অনিবার্যতা ঘোষণা করে সেই সম্ভাবনার কথাই রাজনৈতিক মীমাংসার দাবীদারদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে সেই যুদ্ধ মাও সে-তুং-এর ১০।১৫ বছরের সময়সূচীর বহুপূর্বেই আবির্ভূত হতে পারে।

৯।৩।৬৫

২০১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৯ বর্ষ ১২শ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৭১

সম্পাদকীয়

পাক-চীন চক্রান্তের লক্ষ্য কি ?

পাক-চীন নেতৃবর্গের পারস্পরিক মোলাকাৎ ও দেশভ্রমণ এবং হিমালয় সীমান্তে বিপুল চীনা ফৌজের সমাবেশ এবং কুচবিহার, ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তে পাক সৈন্যের মোতায়েন ও ঘনঘন গুলিবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনাবলীর যে সামরিক বিশ্লেষণ হওয়া উচিত সেরূপ কোন গভীর প্রয়াস হয়েছে বলে দিল্লী মহল থেকে কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি অথবা লোকসভায়ও তার প্রতিফলন হয়নি। পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্ট্র্যাটিজিক এলাকায় অর্থাৎ পশ্চিম কাশ্মীরে পাকসৈন্য ও পূর্ব কাশ্মীর সীমান্তে চীনসৈন্য এবং চুম্বী উপত্যকায় চীনফৌজ ও ঠিক তার দক্ষিণাঞ্চলে পাক সৈন্য যেভাবে এবং যেরূপ সামরিক স্ট্র্যাটিজিক কম্বিনেশনে সমাবেশ করা হয়েছে তার সংকেত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে যেভাবে পাকিস্তান ও চীনের ফৌজ সমাবেশ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দু'টি দেশের রাজনৈতিক প্রধানদের ঘন ঘন পারস্পরিক আলোচনা ও অন্যান্য দেশভ্রমণ আরম্ভ হয়েছে তার অর্থ যে একটি মারাত্মক সামরিক চক্রান্তের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা এবং এরূপ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতীয় প্রতিক্রিয়া রোধের প্রয়াস—এরূপ সন্দেহ করা অযৌক্তিক নয়।

চীনের দু'জন মুখ্য ব্যক্তি, চৌ-এন-লাই ও চেন-ই দুবার করে রাওলপিণ্ডি ও ঢাকায় পাক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং যেন এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চৌ-এন-লাই মুসলীম দেশগুলি পরিভ্রমণ করে পাকিস্তানের কাশ্মীর অভিযানের সপক্ষে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। পক্ষান্তরে আয়ুবের চীন সফরের পরেই রাওয়ালপিণ্ডিতে আবার চীনা নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বিশিষ্ট পাক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে

মস্কো ভ্রমণ, চীনের আক্রমণাত্মক চক্রান্তের পশ্চাতে রুশ নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে মনোভাব জানার প্রয়াস বলে ধরে নেওয়াই ভারতের পক্ষে কূটনৈতিক প্রয়োজন।

পাক-চীন নেতাদের এরূপ অতিমাত্রিক ও ঘন ঘন যোগাযোগ, বিদেশ সফর এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিপুলায়তন ফৌজ সমাবেশের ঘটনাবলীর উপরে শ্যেন দৃষ্টি রাখা ও তার তাৎপর্য্য অনুধাবনের চেষ্টা করা আজ ভারত সরকারের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সর্বাধিক কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত সরকার যে পাক-চীন চক্রান্ত সম্বন্ধে যথাযথভাবে সচেতন, জনসাধারণের পক্ষে সেকথা উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ, দেশবাসীকে পাক-চীনের চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন করে সম্ভাব্য সংকটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য একটি জাতীয় মানসিকতা সৃষ্টি করা আজ আমাদের এক আশু জাতীয় কর্তব্য। জাতীয় সচেতনতা ব্যতীত জাতীয় প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে ভারতবর্ষ আজ যেরূপ মারাত্মক সামরিক ও জাতীয় সংকটের সম্মুখীন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে এবং জনজীবনে তার পর্য্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় চৈতন্য নেই।

করপোরেশনের নির্বাচন

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার লাভের পরে করপোরেশনের ১০০ আসনের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫১, ইউ-সি-সি ৩৫ প্রগতিশীল নাগরিক ব্লক—৭, এবং স্বতন্ত্র-৯ সংখ্যক আসন লাভ করেছে। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় যে যারা নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তারা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। ইউ-সি-সির মধ্যে প্রায় ১০ জন নির্দলীয় প্রার্থী জয়লাভ করেছেন এবং কংগ্রেসের মধ্যেও যে সমস্ত অ-রাজনৈতিক ব্যক্তি এবারেই প্রথম কংগ্রেসের সদস্য হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যেও অনেকে জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেসের সুপরিচিত ও করপোরেশনের ব্যাপারে কংগ্রেসী স্তম্ভ বলে স্বীকৃত কয়েকজন ব্যক্তি পরাজিত হয়েছেন। যারা নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাদের মধ্যে প্রায় ২৭ জন প্রার্থী জয়লাভ করেছেন।

করপোরেশনের প্রধান লক্ষ্য পৌর কল্যাণ। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে দলগত রাজনীতির মঞ্চে পরিণত করা উচিত নয় এবং কলকাতা করপোরেশনকে কংগ্রেসের কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে মুক্ত করা উচিত বলে যে অভিমতটি কলকাতার নাগরিক জীবনে ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে এবারের নির্বাচনে সেই রাজনীতি ও দলবাজী-নিরপেক্ষ পৌরকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে কার্যকরী হয়েছে। প্রগতিশীল নাগরিক ব্লক যদি যথা সময়ে গঠিত হতো এবং এই ব্লকের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি বিভ্রান্তিকর বিবৃতি না দিতেন তা' হলে এই ব্লকের দৃষ্টিভঙ্গী নাগরিকদের অধিকতর সমর্থন লাভ করতো।

এবারেও কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দলের প্রার্থীরা যেভাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং এই দল দুইটি করপোরেশনকে যেভাবে একটি দলগত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির মঞ্চে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর রয়েছে,—সেকথা বিবেচনা করে প্রধান দল দুইটির কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু প্রগতিশীল নাগরিক ব্লক ও নির্দলীয় ব্যক্তিরা যদি দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনার উপরে জোর দেন তা' হলে এরূপ অভিমতের প্রভাবে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মে কিছু উন্নতি হতে পারে এবং আগামী নির্বাচনে এই মতের সমর্থকরাই নাগরিকদের সমর্থন লাভে সমর্থ হবে।

করপোরেশন নির্বাচনে জয় পরাজয়ে জাল ভোটের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে একটি অভিযোগ আগেও শোনা গেছে। বিভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এবারে জাল ভোটের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি

হয়েছে। বহু নিরপেক্ষ মহলের অভিমত যে করপোরেশন নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের প্রায় ২৫ শতাংশ জাল ভোট। যে প্রার্থী জাল ভোটের ব্যবস্থা করতে যতখানি পারদর্শী তার জয়লাভের সম্ভাবনা তত বেশি,—এরূপ একটি ধারণা করপোরেশনের নির্বাচনে প্রায় বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, যোগ্য, সৎ ও কর্মক্ষম এবং আদর্শবাদী বহু ব্যক্তি করপোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিরস্ত থাকেন। জাল ভোট রোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে পৌর প্রতিষ্ঠানকে কায়েমী স্বার্থ ও দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করা কোন সময়েই সম্ভব হবে না।

আবার সীমান্ত বন্ধের ষড়যন্ত্র

উদ্বাস্তু মন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী বিদায়ী মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্নার চেয়েও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের মনে। এ পর্যন্ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কোন কার্যকরী পরিকল্পনা বা উদ্যোগ তিনি করেন নি, বরং দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে শ্রীশৈবাল গুপ্তর মত উদ্বাস্তু-দরদী ও যোগ্য ব্যক্তিকে অপসারণ করে তিনি শুধু আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দেন নি,—তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বাস্তব কার্যক্রম বিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীনেহেরু পর্যন্ত কোনদিন পূর্ববঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করার কথা কল্পনা করেন নি,—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সীমান্ত বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন এবং মহাবীর ত্যাগী মহাশয় মহা বিক্রমে সীমান্ত বন্ধ করে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের সীমান্ত বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে এক চরম নির্মমতার নীতি গ্রহণ করেছেন ভারত সরকার। আগত উদ্বাস্তুদের জোর করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সীমান্তের ওপারে অথবা তাদের কারাগারে আবদ্ধ করা হচ্ছে। ওদিকে প্রতিরুদ্ধ উদ্বাস্তুদের উপরে পাকিস্তান নানাভাবে লাঞ্ছনা চালাচ্ছে। যারা ঘর বাড়ি সর্বস্ব হস্তান্তরিত করে সীমান্তের পারে এসে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের দুরবস্থার কথা অকল্পনীয়।

নারী ও শিশুরা সীমান্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে যে চরম দুর্ভোগ, ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং তাদের আর্ত কণ্ঠের আর্তনাদ যে সীমান্তের দেয়ালে এসে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে,—সে সম্বন্ধে কোন মানবিক প্রতিক্রিয়া ভারত সরকারের নেই। ভারত সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি আজ এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে আগত উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানের পঞ্চম বাহিনীর পর্যায়ে ফেলতেও দিল্লীর নেতৃত্ব দ্বিধাবোধ করছেন না। নিঃসংকোচে দিল্লীর কর্তারা অজুহাত দেখাচ্ছেন যে পাকিস্তানের চরদের অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্যই সীমান্ত বন্ধের হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেন ভারতে অজস্র পাকিস্তানী চরের অভাব আছে অথবা তাদের ভারতে যাতায়াতের কোন বাধা আছে। ভারতের মত বিরাট দেশের সরকার পাকিস্তানী চর রোধের জন্য সীমান্ত বন্ধ করার মত দায়িত্বহীন উক্তি করতে পারে সেকথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

শুধু ভারত ভাগের সময়েই নয়—তারপরেও ভারত ভাগ কালীন সরকারী নেতৃত্ব বারবার একথা ঘোষণা করেছেন যে পূর্ব বাংলার সীমান্ত কোন সময়েই রুদ্ধ করা হবে না এবং দেশভাগের ফলে বিড়ম্বিত পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা আশ্রয় লাভের জন্য ভারতে আসবে তাদের আশ্রয়চ্যুত করা হবে না। কিন্তু কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নেতৃত্ব সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ রাখতে ইচ্ছুক নন্। সীমান্ত রুদ্ধ করার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় মন্ত্রীরা সীমান্ত অতিক্রান্ত উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে লোকসভায় যে আশ্বাস দিয়েছেন তা' নিতান্তই অন্তঃসার শূন্য। উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে শ্রীমহাবীর ত্যাগী শুধু যে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন তাই নয়—তিনি উদ্বাস্তু স্বার্থ

বিরোধী এবং পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘুদের প্রতি হৃদয়হীন মনোভাবেরও পরিচয় দিচ্ছেন। শ্রীমহাবীর ত্যাগীর স্থানে একজন পূর্ববঙ্গাগত বাঙালীকে উদ্বাস্তু মন্ত্রী করা উচিত।

শেখ আবদুল্লার দেশদ্রোহী কাজ

হজ করার নাম করে শেখ আবদুল্লা এবং আফজল বেগ ও অন্যান্য শেখ সহচরেরা পশ্চিম ইয়োরোপ এবং বিশেষ করে মুসলীম দেশগুলিতে 'স্বাধীন কাশ্মীর' গঠনের স্বপক্ষে আন্তর্জাতীয় সমর্থন সৃষ্টি করার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্প্রতি আলজেরিয়াতে শেখ আবদুল্লা ভারত-বৈরী লালচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি চীন পরিভ্রমণের জন্য চীন প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণও গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শেখের চীন ভ্রমণ ভারত সরকারের অভিপ্রেত নয় বলে জানান হলে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টো 'সানন্দে' জানিয়েছেন যে প্রয়োজন হলে পাকিস্তান আবদুল্লাকে চীন ভ্রমণের পাসপোর্ট দেবে।

আবদুল্লা শুধু হজ করার জন্যই বাইরে যাওয়ার পাসপোর্ট চেয়েছিলেন এরূপ একটি 'বালসুলভ' সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে ভারত সরকার সপার্ষদ শেখ সাহেবকে ছাড়পত্র দিয়েছেন সেকথা বিশ্বাস করতে হলে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিপক্কতা সম্বন্ধে শঙ্কিত হতে হয়। আরও শঙ্কিত হতে হয় একথা জেনে যে আবদুল্লাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে একজন 'কাশ্মীরের মুস্লিম নাগরিক' রূপে। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যের কোন নাগরিক রাজ্যের নামে পাসপোর্ট পেয়েছেন বলে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভারতে নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন দপ্তরের বিভ্রান্তির জন্য এভাবে 'কাশ্মীরী' রূপে স-সহচর আবদুল্লাকে কাশ্মীরী পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি, —শেখ আবদুল্লা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি দৌত্যের ভূমিকা গ্রহণের যে 'সদিচ্ছা' প্রকাশ করেছিলেন সেই কূটনৈতিক প্রভাবেই শ্রীনেহেরুর জীবিতকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারেই সচেতন নীতি হিসেবে আবদুল্লাকে কাশ্মীরী পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল।

শেখ আবদুল্লাকে ভারতীয় নাগরিক নয়—কাশ্মীরী নাগরিক রূপে স্বীকৃতিদানের অর্থ যে শেখ সাহেবের 'স্বাধীন কাশ্মীর' গঠনের দাবীকে নৈতিক সমর্থন দেয়া সেকথা নেহেরুর মনে হয়নি এবং নেহেরু-উত্তর দিল্লী নেতৃত্বেরও মনে হয়নি। আবদুল্লার কার্যকলাপের সুযোগ দানের জন্য বর্তমান দিল্লী নেতৃত্ব দায়ী। নেহেরু নীতি সমর্থনের অজুহাতেই যে আবদুল্লাকে কাশ্মীরী নাগরিক রূপে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেকথা বলবার মত নৈতিক সাহস ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র দপ্তর দেখাতে পারে নি। আবদুল্লাকে কাশ্মীরী নাগরিকের মর্যাদা দানের পশ্চাতে কোন 'রাজনৈতিক নীতি', 'চক্রান্ত', না 'বিভ্রান্তি' না কোন দপ্তরের 'কর্তব্য-বিচ্যুতি' দায়ী, সে সম্বন্ধে এখনও কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য লোকসভায় পেশ করা হয়নি। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দিনে শেখ আবদুল্লাকে কত টাকা নিয়ে বাইরে যেতে দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের জন্য তিনি কোথায় এত অর্থ পাচ্ছেন সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্য জানান হয়নি।

নিজেদের অপকাজের প্রতিক্রিয়া রোধের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আরেকটি কাশ্মীরী ডেলিগেশন পাঠাবার প্রস্তাব হয়েছে এবং শেখের পাসপোর্টের মেয়াদ সীমিত করে হজ যাত্রার প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য দেশের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো যে ভারত সরকার শেখ আবদুল্লাকে একজন কাশ্মীরী নাগরিক রূপে স্বতন্ত্র কূটনৈতিক মর্য্যাদা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছেন,—না এই কাশ্মীরী নেতাকে একজন ভারতীয় নাগরিক রূপে গণ্য করেন,—সেই মূল প্রশ্নের উত্তরের উপরে শেখের কার্য-কলাপে কতখানি রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা হয়েছে তার মাত্রা নির্ণয় এবং শাস্তি

বিধানের নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করতে হবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে নেহেরু-নীতি পরিবর্ত্তনের সাহস না হলে শাস্ত্রী-সরকারকে আরও অনেক নাজেহাল হতে হবে।

নেহেরু স্মরণে শিলা স্বাক্ষর

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যকালীন অধ্যায়ে পণ্ডিত নেহেরুর অবদানের গুরুত্ব স্বীকার না-করা অনৈতিহাসিকতার সামিল। তাই রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে নেহেরু-ভক্তদের পক্ষ থেকে নেহেরুর ও তথা ভারতের প্রথম প্রধান-মন্ত্রীর স্মৃতিরক্ষা করার উদ্যোগ স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় যদি মাত্রা ছাড়িয়ে নেহেরুকে অতি মানবীয় মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় ত' হলে সে কাজের প্রতিবাদ না-করে উপায় নেই,—যদিও কোন রাষ্ট্রনেতার স্মৃতিরক্ষার বিষয়কে বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত না-করার চেষ্টা করাই শোভনীয়।

পণ্ডিত নেহেরুর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে কেন্দ্র সরকার স্থির করেছেন যে মহাপ্রাণ ভারত-সম্রাট অশোকের শিলালিপির অনুকরণে পণ্ডিত নেহেরুর বাণী বিভিন্ন পর্বতের গায়ে খোদিত করে রাখা হবে ভবিষ্যত বংশধরদের স্মরণের জন্য। পণ্ডিত নেহেরুকে অশোকের সমপর্য্যায়ে তোলার এরূপ প্রচেষ্টা শুধু অন্যায় নয়,—মাত্রাহীন অতিভক্তির লক্ষণ। বিস্ময়ের কথা যে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষায় তাঁর বাণী এবং শিলাস্বাক্ষরণের কোন আগ্রহ বা উদ্যোগ দিল্লী কর্তৃত্বের মহলে দেখা যায়নি কিন্তু যে নেতার দৌলতে তাঁরা দিল্লীর 'তক্‌তে'র অধিকারী হয়েছেন তাঁর প্রতি দলীয় ও ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই বোধহয় দিল্লীর সরকারী নেতারা পণ্ডিত নেহেরুকে অশোক-সমতুল করে তাঁর স্মৃতিকে অতি-মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আগষ্ট বিপ্লবে এবং ভারতীয় রাষ্ট্র ও জাতির বিখণ্ডনের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইতিহাসে নেহেরুর গান্ধী-নেতৃত্বের বিরোধিতা ইতিহাসে এক মসীলিপ্ত অধ্যায় রূপে স্বাক্ষরিত হয়ে আছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সংবিধান বা গণতন্ত্র অথবা পরিকল্পনার অর্থনীতির জন্য পণ্ডিত নেহেরুর কৃতিত্ব অনেকখানি কিন্তু সবখানি নয়। এযুগের ভারতকে আধু-নিকতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে তিনি সহায়তা করেছেন,—স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এটাই পণ্ডিত নেহেরুর একমাত্র অবদান। কিন্তু এও সত্য যে ভারতের সুরক্ষা, কাশ্মীর, পাকিস্তান, চীন, উদ্বাস্তু, ভাষা, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অসঙ্গতি প্রভৃতি,—যে সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ভারত হাবুডুবু খাচ্ছে সেই সমস্ত সমস্যা নেহেরু-নীতির অবদান। নেহেরু-নীতির ফলে আজ ভারতের স্বাধীনতাও আবার বিপন্ন হবার উপক্রম হচ্ছে। এরূপ একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতার বাণী শিলাঙ্কিত করার প্রয়াস কিছু লোকের অতি-ভক্তিকে জাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ারই সামিল। নেহেরুর স্মৃতিরক্ষা করা হোক,—শোভনীয় ও সঙ্গতভাবে তা' করা হোক,—মাত্রাহীন অতি-ভক্তির আতিশয্যে নয়।

নেতাজী ও ভারত সরকার

শৌলমারী সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী বলেছেন যে "নেতাজী সুভাষচন্দ্র ফিরে এলে তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়া হবে।" শ্রীশাস্ত্রীর এই উক্তি দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করেছে মাত্র। কারণ, এরূপ উক্তি আন্তরিকতাহীন এক কপট রাজনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছু নয়। নেতাজীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা প্রকাশে ভারত সরকার উদ্যোগী হয়নি, যে নেতার বৈপ্লবিক কার্যক্রমের অবদানে দিল্লীশ্বরেরা ক্ষমতার গদি লাভ করেছেন তাঁর প্রতি সাধারণভাবে জাতীয় ঋণ স্বীকৃতির সরকারী উদ্যোগ বর্তমান দিল্লীশ্বরেরা দেখাতে অগ্রণী হন নি। পার্লামেন্ট ভবনে, এবং সরকারী অফিসে অনেক

রাষ্ট্র নেতার চিত্র শোভা পাচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় সংগ্রামে যাঁর স্থান গান্ধীজীর সমাসনে তাঁর প্রতিকৃতি সরকারের কোন ভবনে রাখবার জাতীয় ঋণ স্বীকার দিল্লী সরকার অনুভব করেন নি। গান্ধীজী ও নেহেরুর ঐতিহ্যে ভারতীয় মনকে অতি-সম্পৃক্ত করে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টায় সরকারের কোন বিরতি নেই, কিন্তু আজকের জাতীয় সুরক্ষার কঠিন সমস্যার যুগেও নেতাজীর বীর্যবত্তা এবং স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্যে ভারতীয় জনতা ও সামরিক বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার সামান্যতম আগ্রহও দিল্লীর নেতাদের নেই। নেতাজী একজন 'বীর'—এই বিবৃতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শোনার কোন প্রয়োজন দেশবাসী অনুভব করে না এবং তিনি ফিরে এলে 'নেতাজীকে বীরের সম্মান দেওয়া হবে'—এই উক্তিকেও দেশবাসী দিল্লী নেতৃত্বের কপটোক্তি বলেই মনে করে।

কংগ্রেসী সমাজবাদের নমুনা

কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের একজন সর্বোচ্চ স্তরের নেতা শ্রী এস, কে, পাতিল ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠির ত্রাণ কর্তা রূপে অবতীর্ণ হয়ে তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে "তিনি শিল্পপতিদের ব্যাপকহারে নিন্দার বিরোধী" এবং তাঁর মতে "এদেশে শিল্পপতিরাই একমাত্র দানব নয়।" পুঁজিপতিদের দান-ধ্যান এবং স্বদেশপ্রেমের সুখ্যাতি করে শ্রীপাতিল বলেন, "গত ৫০ বছরে কংগ্রেস যদি ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে তা' হলে তার ৯০ শতাংশই এসেছে শিল্পপতিদের কাছ থেকে। এমন কি বিগত কেরলা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও শিল্পপতিদের সাহায্যেই নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয়েছে।" সত্য সমাজতন্ত্রের সমর্থক কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের মধ্যে একজনের এরূপ অতি-সরলোক্তির উপরে টিকা নিষ্প্রয়োজন।

অনাস্থা প্রস্তাব এবং দুর্নীতি বিরোধী দিবস

উড়িষ্যার মন্ত্রীদের উচ্চ মহলে দুর্নীতির যে সন্ধান কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কমিটি পেয়েছে সেই গোপন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তা' সরকারীভাবে প্রকাশ করায় এবং উড়িষ্যার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবী অস্বীকৃত হওয়ায় কংগ্রেস সরকারের প্রতি যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থিত হয় সেই প্রস্তাবের ভাগ্য সম্বন্ধে কারো কোন সংশয় ছিল না। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতা সুরেন দ্বিবেদী এবং তার আগে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ যেভাবে কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি-পোষণ-নীতির উপরে কষাঘাত হেনেছেন তার জন্য তাঁরা দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। দুর্নীতির গুপ্ত দলীল প্রকাশ করার জন্য যেখানে তাঁরা সমস্ত দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছেন এবং জাতীয় নৈতিকতার মানরক্ষায় এক বিশেষ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন সেই কাজটিকে গর্হিত আখ্যা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী চাগলা দেশবাসীর দৃষ্টিতে নিজের নৈতিক মূল্যবোধকেই ক্ষুণ্ণ করেছেন। অন্যদেশ হলে এরূপ কাজের ফলে সরকারী গদী ওলট-পালট হয়ে যেতো, – কিন্তু লোকসভায় বিরোধী কণ্ঠের ক্রুদ্ধ তরঙ্গাঘাতে কংগ্রেস নেতৃত্বের নৈতিক মূল্যবোধে কোন বিবেক-চাঞ্চল্যই সৃষ্টি হয় নি। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস সরকারের এরূপ দুর্নীতি পরিপোষক কাজের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ২৫ এপ্রিল সর্বভারতীয় দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি আদর্শসঙ্গত কাজ করেছেন।

সুচা সিংহের গ্রেপ্তার

কায়রণ হত্যাকারী বলে অভিহিত সুচা সিংহের গ্রেপ্তারের জন্য পাঞ্জাব পুলিসের প্রশংসা যথার্থই প্রাপ্য। কিন্তু এরূপ কাজের জন্য যেরূপ সরকারী ধন্যবাদের জোয়ার দেখা গেছে এবং শ্রীনন্দ যেভাবে গিয়ে পুলিস কর্মচারীদের

ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দিত করেছেন তা' মাত্রাধিক বলেই গণ্য হবে। কেন্দ্রমন্ত্রীর যদি নিজেদের পদমর্যাদার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন তা হলে আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের উপরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। কর্তব্য পালনের সপ্রশংস স্বীকৃতি প্রয়োজন—কিন্তু মাত্রাধিকভাবে নয়।

সিকিম-দরবারে পাক নিঃমন্ত্রণ

অভিষেক উৎসবের ভাষণেও সিকিমের মহারাজা ঘোষণা করেছেন যে সিকিমের সুরক্ষার ভার ভারত সরকারের উপরে ন্যস্ত রয়েছে। এরূপ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি সত্বেও, কিভাবে সিকিম দরবারের অভিষেক উৎসবে পাকিস্তানের হাই কমিশনার নিমন্ত্রিত হলেন তা বিস্ময়ের কথা। সিকিম অত্যন্ত ষ্ট্র্যাটেজিক অঞ্চলে অবস্থিত—তাই পাক হাই কমিশনারের সামরিক ও অন্যান্য সহচর সহ এই অঞ্চল ভ্রমণের সুযোগ দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈথিল্য না চক্রান্ত—কি কারণে পাক-প্রতিনিধি সিকিম দরবারে নিমন্ত্রিত হলেন সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পরলোকে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ী

সুখ্যাত কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং 'জাগরী'র লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যানুরাগী মহলে গভীর অভাববোধের সৃষ্টি হবে। সাবিত্রীবাবু নানাভাবে জয়শ্রীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর 'জলন্ত তলোয়ার' কাব্যটি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস পাঠকের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দানের কথা স্মরণ করে আমরা পরলোকগত সাহিত্যিকদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

বর্ষ শেষ

ভারতীয় রাজনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা-বর্ষ শেষ হলো। এক বৎসর রাজনৈতিক রূপান্তরের পরে সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভাষা আন্দোলন। দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত শহীদ তাঁদের ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন, মাতৃভাষা সচেতন বাঙালী তাঁদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। র‍্যাশন প্রথা চালুর ভেতর খাদ্য-সংকট সামলাবার আপাতত একটি ব্যবস্থা হয়েছে বটে—কিন্তু আগামী কয় মাসে প্রমাণিত হবে যে খাদ্য সমস্যা যথার্থ কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে। খাদ্য-সংকট, ভাষা সংকট, দুই সীমান্তের সংকট—এই ত্রয়ী সংকটের ছায়া বহন করে সূর্য্যাস্ত হলো ১৩৭১ সালের। জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তরে একটি অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার লক্ষণ। বিগত বছরটি কোন বিক্ষুব্ধ স্রোতের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়ে বিদায় নিলো,—কে জানে তার গতি ও পরিণতি!

বিষ্ণুপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

প্রথমদিনের অধিবেশনের রিপোর্ট কলকাতার ১৭ই এপ্রিলের কাগজে [যুগান্তর] পাওয়া গেল।

মূল সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা তুলেছেন যার প্রতি আমাদের চিন্তা আকৃষ্ট হওয়া উচিত:

১। বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকারের দাবী।
কারণ, 'বাঙলা ভারতের সমৃদ্ধতম ভাষা ও অন্যদিকে জাতীয় সংগীতের ভাষা'।

২। 'ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব' সম্পর্কে বলেছেন,

'আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের ভাণ্ডারস্বরূপ সংস্কৃতভাষা যুগে যুগে সর্বভারতীয় ঐক্য বিধান করিয়াছে, আর বৃটিশ যুগে আন্তর্জাতিক যোগ স্থাপনের ভাষা ইংরেজি, আমাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আবার উনিশ শতকের মনস্বী বাঙালীগণ যুগপৎ ইংরেজি ও

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়াছেন বলিয়াই বাঙলা সাহিত্য এত অল্পকালের মধ্যে এমন অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।'

কথা নূতন নয় তবে সত্য, সত্য বারবার দৃঢ়স্বরে উচ্চারিত হবার দরকার আছে, এবং যোগ্য ব্যক্তির থেকে। কিন্তু বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে সরকারকে বাধ্য করার যে দাবী তার বাস্তব পন্থা কী হবে?

সরকারী জাতীয় সঙ্গীত যে বাঙালী কবির বাঙলা একটি গান তা একটা আকস্মিক ঘটনা এবং তার মূলগত কারণ এই যে এই ভাষায় অনন্য অদ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা বাঙালী কবির নাম অবাঙালী নির্বাচক মহিলার জানা ছিল না।—প্রসঙ্গত বলা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'-র বাইরে সর্বভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত হবার মত আর কোন গান নেই,—যার সুর, প্রবল বলশালী ছন্দের ধীর মন্থর দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক ব্যাপক আলোড়ন শ্রবণমাত্রেই শ্রোতার অন্তকরণ—সে যে-দেশেরই হোক,—প্রগাঢ় দেশমাতৃকার ভাবে উদ্দীপ্ত করে দেয়।—ভাষা জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা, সেইহেতু তাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করা হোক, এ একটা সুযুক্তি হলেও জোরালো যুক্তি নয়। এর উল্টো বিপদের দিকটাও চিন্তা করতে হয়। কারণ ডেমোক্রেসির সূত্র অনুসারে কথা উঠতে পারে নূতন জাতীয় সঙ্গীত তাহলে সেইভাবে মিশ্রভাষায় লেখা হোক যাতে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না কারণ সব প্রধান আঞ্চলিক ভাষারই শব্দ সমষ্টি সমভাবে সেখানে বন্টিত থাকবে।

ইংরেজ একদিন এই দেশ জয় করেছিল। ইংরেজিও বাধ্য হয়ে সেদিন শিখতে হয়েছিল। কালক্রমে সেই ভাষা চিন্তার মধ্যে মিশে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি-বোধ-ও চেতনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই চিন্তারই রেশ টেনে সেনশাস্ত্রী মহাশয় ভাষণের শেষ দিকে বলেছেন:

"এ যুগে উৎকট ভাষাপ্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে 'ইংরেজি হঠাও' এই মনোভাবের মধ্যে, বাঙ্গালীকে এই অসুস্থ মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইবে। একদিকে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে স্বাধীন ভারতে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনও বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহারা বঙ্গবাণীর সেবক হইবেন তাঁহাদিগকেও উত্তমরূপে ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুশীলন করিতে হইবে।"

অধিবেশনের অন্যতম প্রধান বক্তা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত 'কামনা' এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণযোগ্য:

"সাহিত্য সম্মেলনের মধ্য দিয়া জাতির ভাব, চিন্তা মনন-শীলতা কেন্দ্রায়িত হউক। নূতন জীবনের চেতনা নূতন সৃষ্টির পথে বাঙালীকে সংহত করুক।"

বিষ্ণুপুর সম্মেলনের স্থান হিসাবে ভালো নির্বাচন, কিন্তু সময়টা?

যতীন্দ্রনাথ মিত্রের লোকান্তর

ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে যারা সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম প্রবীণ নেতা যতীন্দ্রনাথ মিত্র ৮ই এপ্রিল লোকান্তরিত হয়েছেন। বঞ্চনার ও লাঞ্ছনার জীবন বরণ করে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ দেশে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের সূচনাতে ১৯২৮সালে জামসেদপুরের ঐতি-হাসিক ধর্মঘটের পুরোভাগে আপন স্থান করে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরলসভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের সংগ্রাম ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন। যতীন্দ্রনাথ এককালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালে আবার রাজনীতি-নিরপেক্ষ শ্রমিক আন্দোলন গঠনে হিন্দ মজদুর সভায় যোগ দেন। উভয় সংগঠনেই তাঁর নেতৃত্বের আসন সুনিশ্চিত ছিল।

স্বল্পবাক্, অমায়িক ও সহকর্মী-বৎসল এই প্রবীণ নেতার মৃত্যু বাংলাদেশের শ্রমিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যে শূন্য-সৃষ্টি করেছে, তা পূরণ করা দুরূহ হবে। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

১৭।৪।৭৫

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায়

লীলা রায়

গত বারের পর

বৃটেনের নীতি ১৯৪০-৪১ ১৯৪১ আগষ্ট ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক চার্টারে যুক্তভাবে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করল; তাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই কথাগুলিও ছিল "এই শক্তিগুলি বিশ্বের সকল জনসমষ্টির নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত করবার অধিকার রয়েছে বলে স্বীকার করে। এবং যে সকল দেশ সার্বভৌমিকত্ব ও স্বয়ং-শাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল অধিকার তাদের প্রত্যার্পিত হতে দেখতে ইচ্ছুক।" ভারতের সকল শ্রেণী শেষোক্ত ধারাকে বিশেষ-ভাবে অভিনন্দিত করলো। কিন্তু চার্চিল ১৯৪১, ৯ই সেপ্টেম্বর হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করলেন "আটলান্টিক চার্টার ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় যদিও তিনি মনে করেন আগষ্ট মাসের ভারত সম্পর্কে বৃটেনের ঘোষণার সঙ্গে আট-লান্টিক চার্টারের মূলগত পার্থক্য নেই। ভারতে বৃটেনের দৃঢ়তম বন্ধুরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হোলো। কংগ্রেস ঘোষণা করল "বৃটেন ভারতবর্ষকে যথার্থ স্বাধীনতা দিতে যে ইচ্ছুক ছিল না তা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রমাণিত হোলো।" গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন পরবর্তী ঘটনাসমূহ চার্চিলের এই ঘোষণার পরি-প্রেক্ষিতে ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে বিচার করতে হবে। এদিকে জাপান সিঙ্গাপুর জয় করার পর দ্রুত বর্মা ও মণিপুরের পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। জাপানের এই অগ্রগতির ফলে ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়াকে গ্রন্থকার বর্ণনা করে বলেছেন জাপানের অগ্রগতি ভারতকে আরো বৃটিশ-বিরোধী করলো, কারণ ভারতবাসীরা যথার্থই মনে করলো বৃটেনের অধীনতার জন্যই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। নাহোলে ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের কোনো ঝগড়া নেই। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতনের ফলে, বৃটেনের অপরাজেয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের বিশ্বাস নষ্ট হোলো। ভারতবর্ষকে বৃটেন রক্ষা করতে পারবে বলে ভারতবাসীরা বিশ্বাস হারালো। কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্তিত হয়নি কিন্তু তার নেতৃত্ব পরিবর্তিত হোলো— জাপানের অগ্রগতির ফলে গান্ধিজীর বিশ্বাস হোলো যে বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে যুদ্ধে ভারতের সাহায্যের পরিবর্তে। কিন্তু গান্ধিজী ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যও অহিংসার নীতি পরিবর্তন করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই ১৯৪১, ২৩শে ডিসেম্বর বরদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজীকে সত্যাগ্রহ শুরু করবার দায়িত্ব থেকে রেহাই দিল। এবং জাপানী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে সর্বত্র নিজেদের সংগঠন করে দেশবাসীকে সেবা করবার জন্য নির্দেশ দিল। ১১ মার্চ ১৯৪২ রেঙ্গুনের পতনের ৪ দিন পর চার্চিলের ঘুম ভাঙলো তিনি ঘোষণা করলেন ওয়ার কেবিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ভারত সম্পর্কে নীতি গ্রহণ করেছে এবং এই বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে যথাসম্ভব শিগ্‌গির ভারতবর্ষে পাঠানো

হচ্ছে। গ্রন্থকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বিভাগের গোপনীয় দলিলপত্র প্রকাশের পরে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছেন দূরপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির পরাজয়ে এবং ভারতের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক ও মিলিটারি অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলতার সম্বন্ধে চিয়াং কাই সেক ও নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি মারফং সংবাদ পেয়ে রুজভেল্ট অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে চার্চিলের উপর সর্বপ্রকারে সম্ভাব্য চাপ দিতে লাগলেন। লণ্ডনে তার বিশেষ প্রতিনিধি ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ চার্চিলের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামত রুজভেল্টকে জানালো Inquiry about India নামে একটী দীর্ঘ কেবেল থেকে এর উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার। ক্রিপস মিশান গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লুই জনসনকে নতুন দিল্লীতে পাঠান হয় সমস্ত সংবাদ তৎপরতার সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে জানাবার জন্য। কাজেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং আমেরিকার জনসাধারণের সমর্থন না হারাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত ক্রিপস মিশনকে ভারতে পাঠান হয়। কিন্তু এই মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় প্রথমতঃ এর বিষয়বস্তু অ-গ্রহণীয় ছিল ২য়তঃ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও কমাণ্ডার-ইন্-চীফ এর দায়িত্ব বিভাগ সম্বন্ধে একদিকে ক্রিপস ও অন্যদিকে বড়লাট ও কমাণ্ডার-ইন্-চীফের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং চার্চিল শেষোক্তদের মত গ্রহণ করার ফলে ক্রিপসের আর কিছু করবার ছিল না। ফলে মিশন ব্যর্থ হোলো—জনসন সমস্ত দেখে শুনে মন্তব্য করেছেন “London wanted a Congress refusal” ক্রিপস মিশন এর উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও সদিচ্ছার নজীর সৃষ্টি করা। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর গান্ধিজীর মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হোলো—বৃটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় গান্ধিজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারালেন। এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য সুভাষচন্দ্র বসু বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। জওহরলাল কিন্তু ফ্যাসিসমএর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সপক্ষে যুদ্ধ করবার মতে তখনও অটল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ. আই সি. সি তে এই দুই মতের মাঝামাঝি এক প্রস্তাব নেয়া হোলো। গান্ধিজী ১৯৪২ মে মাসে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখলেন যা ধীরে ধীরে “ভারত ছাড়” আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলো। তিনি লিখলেন “যুদ্ধ শেষ হবার পরে নয়, যুদ্ধ চলাকালীনই বৃটিশ ও ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হতে হবে। এবং সেই সর্বোত্তম শেষ কর্তব্য সমাধানের জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভারতে বৃটেনের অবস্থিতি জাপানীদের ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ স্বরূপ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাপানের প্রতি মনোভাবে পার্থক্য ছিল কংগ্রেস সভাপতি আজাদের মনোভাব ছিল ‘জাপান আমাদের দিকে আসছে এখন আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা জাপানকে উৎসাহিত করতে পারে।” ১৯৪২, ১৪ই জুলাই ওয়ার্দ্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি “ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণ করলো তাতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে মিত্র শক্তি যুদ্ধের প্রয়োজনে, বা ভারতের উপর জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করতে অথবা চীনের উপর জাপানের চাপ বাড়তে দেবার জন্য যদি ভারতে সৈন্য রাখার প্রয়োজন বোধ করে তবে কংগ্রেস তাতে বাধা দেবে না। প্রস্তাব শেষ করা হয় এই বলে “বৃটেন কংগ্রেসের এই দাবী যদি অগ্রাহ্য করে তবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবে এবং এই ব্যাপক আন্দোলন নিঃসন্দেহ গান্ধিজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য বম্বাইতে ১৯৪২ ৭ই আগষ্ট এ আই সি সির অধিবেশন আহ্বান করা হোলো।

সুভাষচন্দ্র বসু এই প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন “নিঃসন্দেহ কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ভারতের অধিকাংশ

জনগণের ইচ্ছারই প্রকাশ। এবং এই মত আমার মতের কাছাকাছি এসেছিল কারণ আমি সর্বদাই এই বিশ্বাস করেছি ভারতের সমস্যা সমাধানের প্রথম সর্ত ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান করা এবং ভারতের জনগণের এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। যদিও একে "প্রকাশ্য বিপ্লব" আখ্যা দেয়া হয়েছে—তবু বৃটেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা-যা আমি সর্বদা চেয়ে এসেছি এ তা ছিল না, সংখ্যায় নগণ্য হলেও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন যাঁরা বৃটেনের সহিত আপোষ আলোচনার কথা এখনো চিন্তা করছিলেন।"

এখনো গান্ধিজী বৃটেন কোন মারাত্মক পন্থা নেবে তা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু যখন ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিয়ে মিস স্লেড ওরফে মীরা বেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন গান্ধিজী বুঝলেন সরকার সহজে নতি স্বীকার করবে না,—যদিও তখনও বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধিজী আঁচ করতে পরেন নি। ১৯৪২ ৭ই আগষ্ট বম্বাইতে এ আই সি সিতে আলোচনার পর কয়েকজন কমিউনিষ্ট সদস্য বাদে বিপুল ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হোলো। এ আই সি সিতে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গান্ধিজী বক্তৃতায় বললেন "এই মুহূর্ত থেকে প্রতিটি পুরুষ-নারীকে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না। আমরা হয় লক্ষ্যে পৌঁছাব না হয় মরব। হয় ভারতকে আমরা স্বাধীন করবো না। হয় সে চেষ্টায় মৃত্যু বরণ করবো।"

৮ই আগষ্ট অধিক রাত্রে অধিবেশন শেষ হলো। পরের দিন ভোর হবার আগেই গান্ধিজী, আজাদ এবং কংগ্রেসের সব বিশিষ্ট নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। একসপ্তাহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সামান্যতম নেতারাও গ্রেপ্তার হলেন। এ আই সি সি, এবং সব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বেআইনী ঘোষণা, এলাহাবাদের প্রধান কার্য্যালয় ও কংগ্রেসের ফাণ্ড সরকার বাজেয়াপ্ত করলো। কিন্তু বৃটিশ সরকার যদি মনে করে থেকে থাকেন যে কংগ্রেসের নিম্নতম সাংগঠনিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করার দ্বারা আন্দোলনকে দমন করবেন তবে ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে খুব বড় রকমের ভুলই তাঁরা করেছিলেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে হিংসা অহিংসার প্রশ্নে নানা বিভিন্ন মতামত থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি দেশপ্রেমিক নিঃসন্দেহ ১৯৪২ এর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব, তাদের অপরিসীম ত্যাগ ও দুঃখবরণে গভীর গর্ব অনুভব করবে। এই আন্দোলনের বিশদ বিবরণ দেয়া নিষ্প্রোয়জন। বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে পরবর্তীকালে Congress Renponsiblity for August Disturbancces পুস্তিকা প্রকাশিত করে হিংসাত্মক কাজের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে অপর দিকে কংগ্রেস যদিও কোন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেনি কিন্তু এই সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে বহুতথ্য ভারতবাসী পেয়েছে এবং গ্রন্থকারের সহিত আমরাও মানি যে ১৯৪২ এর আন্দোলন গান্ধিজীর ব্যাখ্যানুযায়ী অহিংস আন্দোলন ছিল না। এই আন্দোলন এত অসম্ভব দ্রুতগতিতে ব্যাপ্ত হোলো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করতে এমন সব বিশেষ যন্ত্রব্যবহৃত হয়েছিল যে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত এ হওয়া অসম্ভব। সর্বত্র হিন্দু-ছাত্রেরা প্রাথমিকস্তরে এইসকল কার্য্যকলাপের নেতৃত্ব করেছে। সমস্ত তথ্য ও বিবরণ আলোচনা করে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন জনতার বিস্তৃত বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সংবাদ আদানপ্রদানের ও যাতায়াতের উপায় সমূহ যথা পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস টেলিগ্রাফের তার, রেললাইন, সরকারি দপ্তরসমূহ, পুলিশ ষ্টেশন ও অফিস সমূহ ধ্বংস করা। নিরস্ত্র জনতা, সংখ্যার জোরে এই সব কাজ করেছিল। ধ্বংসাত্মক কাজের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্থানে স্বরাজ

প্রতিষ্ঠার গঠনাত্মক কাজও হয়েছিল। বহুস্থানে প্রতি-সরকার গঠিত হয়। বিশেষভাবে বাংলা দেশে মেদিনীপুরের তমলুকে একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪২, ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪, ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত অল্প বিস্তর কার্যকরী ছিল। পরে গান্ধিজীর নির্দেশ অনুসারে একে ভেঙ্গে দেয়া হয়। বহু ঘটনা আছে যেখানে হাজার হাজার নিরস্ত্র জনতা সৈন্যদের মুখোমুখি হয়েছে। ২০০০০ হাজার জনতার একটা শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করবার কালে তমলুকের বীর দেশপ্রেমিকা মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন দান যে কোনো দেশের গর্বের বিষয়। যুক্ত প্রদেশের বালিয়াতে—জনসাধারণ সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা অচল করে ও শাসন ব্যবস্থা দখল করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে তাদের সাহায্য চান। চিত্তু পাণ্ডে একশত কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে ২০শে আগষ্ট বালিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী এবং প্রচণ্ড সরকারি অত্যাচার একে অনুসরণ করেছে। লাঠি, বেত, গুলি, গ্রেপ্তার, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ এতো চলেইছে ব্যাপক ধর্ষণের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা মর্মান্তিক। এক মহিষাদলেই একটী অন্তঃসত্বা নারীসহ ৭৪টী ধর্ষণের হিসেব পাওয়া যায় এবং অমানুষিক নোংরা, জঘন্য সব অত্যাচার করা হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু সম্ভবতঃ গভর্ণরের বিরুদ্ধতার জন্য কিছু করা হয়নি। প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীত্বত্যাগ করেন। কলকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেণীতে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ এর মধ্যে বিমান আক্রমণে ৩১৮ হত ও ৫৫৯ আহত হয়। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে সরকারি হিসেবে ৯৩০ হত ও ১৮৩০ আহত দেখানো হয় কিন্তু জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেছেন এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমে কম, সম্ভাব্য সংখ্যা ১০,০০০ মত হবে।

গান্ধিজী জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন "কর অথবা মর" কিন্তু বিপ্লবাত্মক ও গোপন কাজকর্মের কোনো কার্যসূচী দেননি, তবে পুরোণো বিপ্লবী দলগুলি কংগ্রেসে যোগদিলেও গান্ধিজীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। এমন কি গান্ধিজীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধিজী গ্রেপ্তার হবার পর অহিংসারনীতি পরিত্যাগ করে বিপ্লবাত্মক কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। তিনি জেলথেকে পলায়ন করে ১৯৪২ এর কেন্দ্রীয় 'এক্শান কমিটি' গঠন করে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই বিপ্লবাত্মক মনোভাব জয়প্রকাশ নারায়ণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যত্রও এই বিপ্লবী মনোভাব দেখা যায়। বিহারের আত্মগোপনকারী রাজনৈতিকেরা নেপালে চলে যায় এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ যথার্থই বলেছেন "আগষ্ট আন্দোলনের দায়িত্ব গান্ধির উপর দেয়া একমাত্র বৃটিশ শাসকদের মত মিথ্যাশ্রয়ীদের পক্ষেই সম্ভব।" কিন্তু বৃটিশ সরকার গান্ধিজীর অহিংস আন্দোলন অপেক্ষা ১৯৪২ এর বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক বেশী ভীত ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব উপযুক্ত সংগঠনিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী দেননি। কংগ্রেসের নেতারা "কর অথবা মর" এই আহ্বান জানিয়ে কারারুদ্ধ হলেন কিন্তু জনতা সেই আহ্বানের দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করে বর্ণনাতীত অত্যাচার ও অপমান সহ্য করলো যা চিরদিন এই জনগণের সাহস ও আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। ১হুকার মন্তব্য করেছেন "জেনারেল ভুল করেছিলেন কিন্তু নেতাবিহীন সৈনিকদের জয় হোলো। যারা ক্ষতিদের সহিত সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং স্বদেশের মুক্তির জন্য জীবনদান করেছিল।"

"ভারতছাড়" আন্দোলনের পর ভারতের রাজনীতিতে

গান্ধিজীর আর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না তাঁর জীবনের ২টা লক্ষ্যই ব্যর্থ হোলো অহিংস-পন্থায় স্বদেশের মুক্তি এবং হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য।

মুস্লিম লীগ আগষ্ট আন্দোলনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রইলো। কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ না করতে লীগ মুসলমানদের নির্দেশ দিল। কংগ্রেসের আন্দোলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মুস্লিম লীগ কংগ্রেসের কার্য্যসূচীর তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলো, এবং মন্তব্য করলো "এই আন্দোলনে কংগ্রেস নিজেদের স্বার্থ ব্যতীত মুসলমানদের স্বার্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতনতা দেখায়নি।" হিন্দুদের পাকিস্থান বিরোধী মত দ্বারা জিন্না ভীত হননি কারণ তিনি জানতেন শেষ সিদ্ধান্ত হিন্দুদের হাতে নয় বৃটিশের হাতে রয়েছে। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে লাগলো ১৯৩০-৩৩ এ কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করে সর্বপ্রকারে একে দুর্বল করবার জন্যই চেষ্টা করলো ১৯৩৪ এ সুতোকলের ধর্মঘটের জন্য কমিউনিষ্ট দল বে-আইনী ঘোষিত হবার পর এরা নূতন কৌশল অবলম্বন করলো। জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঢোকা এবং ভেতর থেকে একে ধ্বংস করার জন্য তারা কংগ্রেস স্যোসিয়ালিষ্ট পার্টিতে ঢুকলো। কমিউনিষ্টদের ১৯৪০ সনে কংগ্রেস স্যোসিয়ালিষ্ট দল থেকে বহিষ্কার করা হোলো। কিন্তু অন্ধ্র, তামিলনাড ও কেরালার দলকে কমিউনিষ্টরা নিয়ে গেল তাদের সঙ্গে। কমিউনিষ্টরা ছাত্র সংগঠনে, এবং ফরোয়ার্ড ব্লকেও ঢুকলো কিন্তু ২২শে জুন ১৯৪১ জার্মানি দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হওয়া মাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিবর্তিত হোলো এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের নির্দেশে বৃটিশের যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৪১, ১৫ ডিসেম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ফলে ১৯৪২, ২৪শে জুলাই কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে বে-আইনী করার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হোলো এবং কমিউনিষ্ট নেতাদের মুক্তি দেয়া হোলো। কংগ্রেসের প্রতিষেধক হিসাবে কমিউনিষ্টদের সিভিল ও মিলিটারি উচ্চপদে বৃটিশ সরকার ব্যবহার করতে সুরু করলো। এবং যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের বিরুদ্ধে যে সব কথা এতদিন কমিউনিষ্টরা বলে এসেছে সেগুলি বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা জাতীয়তা-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের বন্ধুরূপে ভোল ফিরালো। সর্বত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি বৃটিশের চর হিসাবে কাজ করতে লাগলো। স্বরাষ্ট্র বিভাগ পলিটব্যুরোর সদস্যদের এই কাজে নিযুক্ত করলো এবং আজাদ হিন্দের সৈনিক ও আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের কমিউনিষ্টরা ধরিয়ে দিতে সাহায্য করল। কমিউনিষ্ট পার্টি মুস্লিম লীগের সহিতও একটি গোপন বোঝাপড়া করেছিল। পাকিস্তানের দাবীই শুধু তারা সমর্থন করেনি এমন কি প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চল আলাদা-আলাদা জাতি ও তাদের পৃথক হয়ে যাবার অধিকার তারা স্বীকার করলো। কমিউনিষ্টদের এই ভূমিকার জন্য যুদ্ধের পরে তারা জাতির শ্রদ্ধা ও মর্যাদা হারালো।

এদিকে লর্ড লিনলিথগো ১৯৪৩ ২০শে অক্টোবর ৭½ বৎসর বড়লাটের পদে কাজ করে অবসর গ্রহণ করলেন তাঁর কার্য্যাবসান কালে সরকারের পোড়ামাটি নীতির জন্য ভারতবর্ষে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা চলছিল। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ের কমাণ্ডার-ইন-চিফ লর্ড ওয়াভেল লর্ড লিনলিথগোর পরে বড়লাট হলেন।

যুদ্ধ যদিও শেষ হয়নি, মিত্রশক্তিদের জয়ের সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল, কংগ্রেসের উপর এই ঘটনা প্রভাব বিস্তার করলো। যে সব সদস্যরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা কেন্দ্রীয় আইন সভায় যোগ দেয়া শুরু করলেন এবং মুস্লিম লীগের সহিত যুক্তভাবে বহু সরকারি প্রস্তাবকে পরাজিত করলেন। গান্ধিজীর মতামতেও পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি ওয়াভেলকে লিখলেন যে যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল একটি

জাতীয় সরকার গঠিত হয় তবে গান্ধিজী গণ-আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত করতে প্রস্তুত আছেন। ভারত সচিব তার পরদিনই হাউস অফ কমন্সে একথা উল্লেখ করে বলেন "গান্ধির প্রস্তাব ফলপ্রসূ আলোচনার সূত্রপাত হিসাবেও গণ্য করা যায় না", এর পর গান্ধিজী রাজগোপালাচারীর মাধ্যমে পাকিস্তানের ভিত্তিতে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে উৎসুক হলেন। ৬ বৎসরে ভারতীয় রাজনীতির শক্তি সমাবেশে কি বিরাট পরিবর্তন! জিন্নার সঙ্গে পাকিস্তানের ভিত্তিতে গান্ধিজীর দেখা ও আলোচনা করার প্রস্তাবে হিন্দু ও শিখেরা অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হোলো। ৯ই থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর আলোচনা হোল কিন্তু ফলপ্রসূ হোলো না। কিন্তু দুটী পরোক্ষ ফল হোলো মুস্লিম লীগ ও জিন্নার মর্যাদা বেড়ে গেল এবং বড়লাট সুস্পষ্ট বুঝলেন যে কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের মধ্যে কোনো আপোষ-রফা হওয়া সম্ভব নয় অতএব প্রতিশ্রুত যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থার জন্য বৃটেনকেই উদ্যোগী হতে হবে। ওয়াভেল অন্তর্বর্তী কালের জন্য কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার একটী প্রস্তাব দিলেন কিন্তু, লণ্ডন এতে সম্মত না হওয়াতে ওয়াভেল ব্যক্তিগতভাবে লণ্ডনে যাওয়া স্থির করলেন, ইতিমধ্যে ভুলাভাই দেশাই ও লিয়াকৎ আলি অন্য একটী প্রস্তাবে একমত হওয়াতে ওয়াভেল ভারত সচিবের নিকট এর সপক্ষে সুপারিশ করলেন কিন্তু পরে দেখা গেল যদিও গান্ধির অনুমোদন ছিল অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও জিন্না এ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না অতএব এই প্রস্তাবের কোন কার্যকরী ফল হোল না এবং ভুলাভাই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিলেন।

ওয়াভেল লণ্ডন থেকে ফিরে ২৮শে জুন, বড়লাটের নূতন একসিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত দলের ২১ জন নেতাকে এক কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করলেন, বড়লাট ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ ব্যতীত সমস্ত কাউন্সিলই ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হবে কেবলমাত্র কমাণ্ডার-ইন-চিফের হাতে সমর দপ্তর থাকবে। বহির্বিষয়ক দপ্তরও ভারতীয় সদস্যের হাতে থাকবে। এই কাউন্সিলের ৩টি দায়িত্ব থাকবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা বৃটিশ ভারতের শাসন পরিচালনা করা যে পর্যন্ত নূতন সংবিধান গঠিত ও কার্যকরী না হয় তৃতীয়তঃ সর্বসম্মত সংবিধান গঠন করবার উপায় নির্দ্ধারণ করা। যদিও জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সমূহ এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল কিন্তু গান্ধিজী হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ-হিন্দু ও তপশীল এই বিভাগ অপছন্দ করলেন এবং জিন্না দাবী করলেন একসিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যদের সকলকেই মুস্লিম লীগের সদস্য হতে হবে। গান্ধিজীর নানা প্রকার দ্বিধা সত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি এই কনফারেন্সে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এরপর কন্‌ফারেন্সের বৈঠক চললো কয়েকদিন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমান সদস্যদের সকলকেই মুস্লিম লীগের সদস্য হতে হবে জিন্নার এই দাবী এবং অপরপক্ষে কংগ্রেস তাদের সংখ্যার মধ্যে সর্বশ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করবার দাবী করলো, এই সব বিপরীত দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য করা অসম্ভব ছিল। জিন্নার দাবী গ্রাহ্য না হওয়াতে লীগ সহযোগিতায় অস্বীকৃত হোল। এবং ১৯৪৫ ১৪ই জুলাই কন্‌ফারেন্সের শেষ বৈঠকে ওয়াভেল কনফারেন্সের ব্যর্থতা ও পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে এই শেষ চেষ্টা এবং গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন "ভারতের ঐক্য রক্ষার এই শেষ সম্ভাবনা এইভাবে পরিসমাপ্ত হোলো।"

এই কন্‌ফারেন্সে একমাত্র লাভবান হোলেন জিন্না ও মুস্লিম লীগ। লীগ ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতিকে সফল বা ব্যর্থ করতে পারে তা প্রমাণিত হোলো, এবং অনেকেই আশা করতে লাগলো যে মুস্লিম লীগের দাবী শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হল এবং যেসব দল মুস্লিম লীগের বাইরে ছিল তারা বুঝলো লীগের বাইরে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নেই এবং দ্বিধাগ্রস্তেরা

মুস্লিম লীগের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হোলো, এতে জিন্নার উদ্দেশ্য সফল হোলো কারণ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হোলো। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টা এখানেই শেষ।

সুভাষচন্দ্র ও আই এন, এর ভূমিকা এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এশিয়া ও ভারতের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাসী, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আ-কৈশোর সুদৃঢ়-প্রত্যয়ী, দেশপ্রেমের এক অনির্বাণ প্রজ্বলিত শিখা. ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা মানমর্যাদা বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য রূপে উদাসীন, এক দুর্জয় ব্যক্তিত্ব, সম্পূর্ণ একাকী নিজের অপূর্ব জীবনের মশাল জ্বালিয়ে ভারতের বাইরে ঘুরছিলেন ইউরোপে, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত ঐ ঘনতমসাচ্ছন্ন দিন মাস বছরগুলিতে —যখন দিকে দিকে মানুষের তপ্ত শোণিতে গড়া কত সমাজ রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ছিল গড়ে উঠছিল. একটিমাত্র দূরাগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে—দুশ বছরের পরাধীনতা থেকে ভারতের মুক্তি। এই ইতিহাস লিখবার দিন আজ নয়।— আগামী দিনে যদি ভারতকে নিজের হারাণো লক্ষ্যকে খুঁজে পেতে হয় তবে নিঃসন্দেহ সে ইতিহাস জাতিকে জানতে হবে, অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হবে। গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন কিভাবে ১৯৪১র, ১৭ই জানুয়ারির মধ্য-রাত্রিতে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করে গোমো থেকে ট্রেনে. সর্বশেষ পায়ে হেঁটে ভারতের সীমা অতিক্রম করে পেশোয়ারে পৌঁছে মস্কো ও সেখান থেকে জার্মানি। জার্মানিতে ভারতীয় বন্দী সৈন্যদলের মধ্য থেকে ভারতীয় লিজিয়ন গঠন রাশিয়ার মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদানের পর ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে জার্মাণ ও জাপানী ঘোষণা। ১৯৪২ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটী জার্মাণ ইউ-বোটে একটীমাত্র সঙ্গীসহ কীল বন্দর থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করে. বৃটিশ রণপোত এড়িয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে মাদাগাস্কারের ৪২০ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৮শে এপ্রিল একটী রবার ডিঙ্গীতে করে ১২৯ নং জাপানী সাবমেরিণে স্থানান্তরিত হয়ে সুমাত্রায় পৌঁছে একজন জাপানী অফিসার দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে ১৩ই জুন ১৯৪৩ টোকিও পৌঁছান এবং পরের দিন জাপানী প্রধানমন্ত্রী টজোর সহিত সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্রের সহিত আলোচনার পর জাপানী ডিয়েটে ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানের ঘোষণা, ২রা জুলাই ১৯৪৩, এই ভাগ্য-চিহ্নিত ব্যক্তির সিঙ্গাপুরে আগমন এবং ৪ঠা জুলাই ভারতের নির্বাসিত দেশপ্রেমিক রাসবিহারী বসু কর্তৃক পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হস্তে হস্তান্তর। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের আনন্দোবেগ বিপুল অভিনন্দন এবং 'নেতাজী' নামে আখ্যায়িত হওয়া, পরের দিন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও ২রা আগষ্ট তার নেতৃত্ব গ্রহণ, ৩ মাসের সুদৃঢ় ট্রেনিং এর পর আজাদ হিন্দ ফৌজে সৈনিক গ্রহণ, নারীবাহিনী গঠন, সৈন্য বিভাগে হিন্দুস্থানীতে সমস্ত আদেশ দান, সাধারণ, অর্থ, সংবাদ পরিবেশন ও প্রচার, গোপন সংবাদ সংগ্রহ, সৈন্যসংগ্রহ ও ট্রেনিং ব্যতীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ, নারীদের বিষয়, জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পুর্নগঠন (রিকনস্ট্রাকশন) সাপ্লাই, বহির্বিভাগ, বাসগৃহ ও যাতায়াত বিভাগ সমেত ২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন। নয়টি বিশ্বশক্তি দ্বারা এই সরকারের স্বীকৃতি, টোকিওতে ২৮শে অক্টোবর বৃহত্তর এশীয় কনফারেন্সে যোগদান, জাপানী সম্রাট কর্তৃক পূর্ণ মর্যাদায় অভ্যর্থনা, ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ আন্দামান ও

নিকোবর দ্বীপ জাপান কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে দান, ঐ দ্বীপ দুইটির "শহীদ" ও "স্বরাজ" নামকরণ অর্থ সংগ্রহের জন্য বোর্ডের প্রতিষ্ঠা, পর পর এসব ঘটনাগুলি যেন ছায়া ছবির মত অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ঘটে চলে।

'তারা পরাজিত অতএব হতমান এবং একদা বৃটিশের বেতনভোগী ছিল এবং পুনরায় তাদের অর্থের দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া সম্ভব' এই অজুহাতে প্রথম জাপান কর্তৃক আই এন একে ইম্ফাল অভিযানে অগ্রবর্তীর ভূমিকা দিতে অস্বীকার, এবং জাপানী কমাণ্ডার-ইন্-চিফ ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট টিরাউচির প্রস্তাব যে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন জাপানী সৈন্যদল করবে এবং আই এন এ সিঙ্গাপুরে থাকবে কেবলমাত্র গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার দল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। এই প্রস্তাবে নেতাজী গভীর ভাবে নিরাশ হয়ে গর্বিত সুদৃঢ় উত্তর দেন— Any liberation of India secured through Japanese sacrifices is worse than slavery তিরুচী পরীক্ষামূলক ভাবে আই এন এর একটী রেজিমেণ্টকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে স্বীকার। গান্ধি আজাদ নেহেরু ব্রিগেড থেকে সৈন্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩এ মালয়ের তেইপিং এ একটী গরিলা রেজিমেণ্ট গঠন এবং তার নেতৃত্ব শাহানওয়াজ খানকে দান। এই রেজিমেণ্টের— সুভাষ ব্রিগেড নামকরণ। ৯ই নভেম্বর তেইপিং ত্যাগ, ১৯৪৪এর জানুয়ারীতে ৪০০ মাইল হেঁটে সুভাষ ব্রিগেডের রেঙ্গুনে আগমন, নেতাজীর ৫ঠা জানুয়ারী ১৯৪৪ রেঙ্গুনে আগমন, জাপানী কমাণ্ডার কবয়াবের আই এন এ কে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে জুড়ে দেবার প্রস্তাব, নেতাজীর এতে রাজী না হওয়া, এক ব্যাটেলেয়নের নীচে কোনো আই এন এ দলকে ভাঙ্গা হবে না, আই এন এ সৈন্যরা ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বে থাকবে, আই এন এ নেতাজী ও জাপানী কমাণ্ডার-ইন-চীফ এর দ্বারা যুক্তভাবে নির্দ্ধারিত কৌশল অনুসরণ করবে, ফ্রণ্টে আই এন এ কে একটী বিশেষ সেক্টর দেয়া হবে, ভারতের প্রতি ইঞ্চি মুক্ত ভূমি আই এন এ-শাসন বিভাগকে দেয়া হবে ভারতের মাটিতে একমাত্র ভারতীয় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়বে, ইত্যাদি সর্ত স্থির হয় বার্মাতে জাপানী জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল কাটাবুরা ১৯৪৪, ২৫শে জানুয়ারী নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতি হিসাবে কলকাতার উপর প্রচণ্ড আকাশ-আক্রমণ ও বোমা নিক্ষেপের প্রস্তাব করেন নেতাজী এতে রাজী না হওয়াতে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ রেঙ্গুন থেকে যাত্রার প্রাক্কালে নেতাজী তাঁর বিদায় ভাষণ দিলেন তিন হাজার সৈন্য এটেনসনে দাঁড়িয়ে নেতাজীর শেষ বিদায় সম্ভাষণের প্রতিটী কথা গিলতে লাগলো—ভাষণ শেষ হোলো সেই বিখ্যাত কথাগুলো দিয়ে "রক্ত রক্তকে আহ্বান করছে। উঠ, সময় নষ্ট করবার অবসর আমাদের নেই। অস্ত্র গ্রহণ কর। হয় শত্রু সেনাদের মধ্য দিয়ে আমরা পথ করে নেবো আর ভগবানের যদি অন্যরূপ ইচ্ছা থেকে থাকে তবে আমরা মৃত্যু বরণ করবো। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

ঐ অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সুভাষ ব্রিগেড সম্বন্ধে তার কমাণ্ডার শাহনওয়াজ খান বর্ণনা করেছেন "আই এন এ অত্যন্ত নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও সামান্য পরিমাণে রসদ সত্ত্বেও ১৫০ মাইল ভারতীয় সীমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং আই এন এ ব্রিগেড আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয় এবং খুব কমক্ষেত্রেই হার স্বীকার করে। এই অভিযানে আই এন এর ৪০০০ সৈন্য কেবলমাত্র হতই হয়। বর্মার জাপানী কমাণ্ডার সুভাষ ব্রিগেডের অভিযানের

পর নেতাজীর নিকট উপস্থিত হয়ে নত হয়ে বল্ল ইয়োর এক্সেলেন্সী, আমাদের ভুল হয়েছিল. আমরা আই এন এর সৈন্যদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম। এখন আমরা জেনেছি তারা বেতনভোগী সৈনিকমাত্র নয়, যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক।" ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা জাপানের বিরুদ্ধে গেল এবং রসদ, ঔষধপত্র ডাক্তার ইত্যাদির চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও অভাব দেখা দিল। জাপানী কমাণ্ডার পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন কিন্তু আই এন এর সৈন্য ও অফিসারেরা শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করবে তবু ফিরে যাবে না স্থির করাতে জাপানী সংযোগকারী অফিসার বিপদগ্রস্ত হয়ে নেতাজীর নিকট সংবাদ পাঠান এবং নেতাজী স্পষ্ট আদেশ দিলেন ফিরে যেতে।

১৯৪৪-৪৫ এর শীতকালে বৃটিশেরা প্রতি-আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করলো এবং বর্মা আবার বৃটিশের হাতে গেল। রেঙ্গুনে আই এন এ সৈন্যদের ১৯৪৫এর মের প্রথম দিকে বন্দী করা হোলো নেতাজী বর্মা পরিত্যাগ করলেন পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আশায়। তারপর নেতাজীর সাইগন ত্যাগ ও ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ তাইহকুতে ২টায় পৌঁছানর পরবর্তী সমস্ত ব্যাপারটী রহস্যাবৃত। জনমতের চাপে ভারত সরকারের 'শাহ নওয়াজ কমিটি' গঠন ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা প্লেন দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনা সত্য বলে গ্রহণ করার পর অনুসন্ধানে ধাঁড়িটানা হয়েছে। কমিটির অন্যতম সদস্য নেতাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ রিপোর্ট সই করতে অস্বীকার করেন এবং একটি সংখ্যালঘু রিপোর্ট দাখিল করেন অন্যান্য বহু ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়া সত্ত্বেও আর "অনুসন্ধানেরপ্রয়োজন নেই' এই মর্মে সরকার বারবার বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। দেশের অগণিত মানুষ সরকারের সঙ্গে একমত তো নয়ই বরং তাদের এ বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সরকারের এই উদাসীন মনোভাব এবং সত্য উদঘাটনে অনিচ্ছার পেছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও জঘন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ. কিন্তু এই "অহিংসা ও সত্যের" ধ্বজাধারীদের জানা দরকার এই মহা-বিপ্লবীর মৃত্যু নেই, রক্ত মাংসের শরীরে তিনি জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন। জাতি সে কথা বুঝবে আগামী দিনগুলিতে।

এরপর ফিরে যাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের শেষ অধ্যায়ের শেষ গ্লানিকর দিনগুলিতে।

গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন ১৯৪৫ এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা ছিল নৈরাশ্যপূর্ণ কারণ গ্রন্থকারের সঙ্গে ভারত ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায় পরিক্রমা করে আমরা দেখেছি ভারতের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হয়েছে ১৯৩৩, ১৯০৫ এ বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীরও অবসান হয়েছে. ১৯৪২ এর আন্দোলন—যা নামে অহিংস হলেও, যাতে বিপ্লবাত্মক ভাবধারা অতি পরিস্ফুট ছিল যে কারণে গান্ধিজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন না শেষ—হয়েছে। সর্বশেষ ভারতের বাইরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আই এন এ এবং ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন ও ভারতের স্বাধীনতা অভিযান, ১৯৪৪ জুলাই জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ শেষ হয়েছিল কাজেই ২য় যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন অত্যন্ত নৈরাশ্য পূর্ণ ছিল। এই জয়ের মুহূর্তে বৃটেন কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠমণি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আজকের ভারতীয়দের এই সাম্প্রতিক ঘটনার পশ্চাদপট অনুসন্ধান, উদঘাটন ও অনুধাবন করতে এবং তথ্যের সাক্ষ্যকে সত্যনিষ্ঠার সহিত স্বীকার ও গ্রহণ করে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে হবে; কারণ ভারত ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সাম্প্রতিক

ইতিহাসকে না বোঝা বা ভুল বোঝা একটী সন্ত-স্বাধীনতা প্রাপ্ত নানা সমস্যা পূর্ণ দেশের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক।

বৃটেনের ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্তের পেছনে যে তথ্য ও ঘটনাগুলি কাজ করেছে গ্রন্থকার অতি সুনিপুণ পরিচ্ছন্নতার সহিত তাদের উদঘাটিত করেছেন। জার্মানী ও জাপানকে বৃটেন পরাজিত করে নিজেকে বাঁচালো বটে কিন্তু তার জনবল ও অর্থবল এত প্রচণ্ড ভাবে বিধ্বস্ত হোলো যে যুদ্ধের শেষে বৃটেন ও ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর শক্তি থেকে ২য় শ্রেণীর শক্তিতে নেবে গেলো। এবং তাদের স্থান গ্রহণ করল যুক্তরাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট রাশিয়া।

এই বাস্তবতার শিক্ষাকে বৃটিশ জাতি কি পরিপূর্ণ' ভাবে গ্রহণ করেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইংলণ্ডের ১৯৪৫ এর সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে—বৃটিশ জাতির শুধু নয়, মিত্র শক্তির যুদ্ধ জয়ের পেছনের একজন চার্চিলের প্রতিভা ও মনোবলকে স্বীকৃতিদান সত্ত্বেও যুদ্ধজয়ের নেতা চার্চিলের হাতে নয়,—বৃটিশ জাতি তার ভাগ্যকে শ্রমিক দলের হাতে ন্যস্ত করল যুদ্ধাবসানে। চার্চিলের পরিবর্তে এট্‌লী বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হবার পর ভারত সম্পর্কে শ্রমিক দলের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হোল। গ্রন্থকার লিওনার্ড মসলের মন্তব্যের সহিত সাধারণভাবে একমত হয়েছেন যে যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে সিঙ্গাপুর, বার্মার পতন ও বৃটেনের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধজাহাজগুলো জাপানীদের ডুবিয়ে দেবার পর বৃটেনের শক্তি ও মর্যাদার প্রভূত হানি হোল। এই মর্যাদার জন্যই একজন মাত্র ইংরেজের পক্ষে দশ লক্ষ লোককে শাসন করা সম্ভব হোত। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন মসলে যদিও বৃটেনের ভারত ত্যাগের কারণগুলি মোটামুটি বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্বন্ধে অনুল্লিখিত রেখেছেন। সেটী হচ্ছে বৃটিশ ভারতের সৈন্যদলের প্রধান শক্তি ভারতীয় সিপাহীর ভূমিকা—ভারতের সিপাহীদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার উপর বৃটেন স্বভাবতই, নেতাজীর আই এন এ সংগঠনের পর আর নির্ভর ক:তে পারছিল না। বর্মা পুনরাধিকারের পর আই এন এর ও বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদলের সৈনিকদের মধ্যে যে বিপুল সাধীত্বের আদান প্রদান হয়েছিল বৃটিশের পক্ষে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ছিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষেও সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসছিল মুসলমানরা ক্রমশঃই লীগের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল কাজেই নির্বাচনের পূর্বে দুটী মাত্র দলে গিয়ে দাঁড়ালো কংগ্রেস ও লীগ এই দুটী সাধারণভাবে হিন্দু ও অ-মুসলমান এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করলো। মুস্লিম লীগ পাকিস্তানের প্রশ্নে এবং কংগ্রেস অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হোল। ঠিক এই সময়ে একটী ঘটনা সমস্ত ভারতবর্ষকে আমূল নাড়া দিয়ে গেল। বার্মার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ হাজার আই এন এ সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দী করে ভারতবর্ষে নিয়ে এসে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের অভিযোগ আনলো। এবং প্রথমে তিনজন অফিসার,—একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখের—ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বিচারের জন্য অর্ডিনেন্স দ্বারা একটী মিলিটারী ট্রাইব্যুনেল গঠিত হোলো। কংগ্রেস এই বিচারে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একটী আই এন এ ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত করলো। এতদিন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর দ্বারা গঠিত আই এন এর অমিত দেশপ্রেম, অপরাজেয় সাহস ও দুঃসাধ্য আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতীয়দের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু যখন দিনের পর দিন আই এন এ অফিসারদের বিচারের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণের নিকট এক বিস্ময়কর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উদ্ঘাটিত

হতে লাগলো তখন একদিকে অনস্বভূত গর্ব ও আনন্দ এবং অপর দিকে বিপুল ঘৃণা ও ক্রোধ সমুদ্রের উদ্বেলতা নিয়ে সমস্ত জাতিকে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করলো। আই এন এর দেশপ্রেমিকদের বিচারের বিরুদ্ধে জাতি ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং সারা ভারতবর্ষে বিপুল বিক্ষোভ ও তাকে দমন করবার জন্য বিদেশী সৈন্য ও পুলিশের গুলি সমান তালে পাল্লা দিয়ে চল্ল। সরকার এই অভিব্যক্তির সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বিচারে অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন দীপান্তরের শাস্তি হোলো, কিন্তু সে শাস্তিকে হ্রাস করে কেবল মাত্র তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হোলো। আই এন এর বিচারের উদ্বেলতার সুযোগে কংগ্রেস নির্বাচনে আশাতীত জয়লাভ করলো। যদিও সুভাষচন্দ্র বসু ও আই এন এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নেহেরু প্রমুখেরা যে মনোভাব ও নানা হীন মন্তব্য করেছিলেন তা জাতি ভোলেনি এবং একথাও সত্য যে তাঁদের মধ্যে ভারতবিরোধী কম্যুনিষ্ট দল ছাড়াও কেউ কেউ নেতাজীকে জাপানের নিজের স্বার্থে ব্যবহৃত কুইসলিং এর সহিত তুলনা করেছেন। ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা, ভারতের বাইরে কি অ-বর্ণনীয় অবস্থায় ভারতের মর্যাদা ও সম্মানকে মুহূর্তের জন্যও ক্ষুণ্ণ না করে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়েছেন, স্বভাবতই, আজ পর্যন্ত বহু অ-লব্ধ তথ্য সত্ত্বেও সে সত্যকে অপূর্ব ভাস্বরতায় পরিস্ফূট করে তুলেছেন শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার। এই তথ্য সমাবেশে জাপান ও জার্মানীর নিকট আত্ম বিক্রয়ের যে হীন ইঙ্গিত নানা কৌশলে কংগ্রেস নেতৃত্বের কেউ কেউ করে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে, তার ভিত্তি ধ্বসে গেছে যে কোনো সত্য-সন্ধানীর নিকট।

এই সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য অ-প্রাসঙ্গিক হবে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে ভারতের কমাণ্ডার-ইন্-চিফ সার ক্লড অচিন্‌লেকের জীবনীলেখক জন্ কোনেলএর বইতে পাওয়া যায় ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ এ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষণার পর ১৯৪৫ ১৯শে আগষ্ট শ্রীনগরে এক সাক্ষাৎকারে নেহেরুকে আই এন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন —উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও এর গুরুত্বের জন্য সম্পূর্ণটাই দেয়া হোল—

I was of opinion & am still of the opinion that the leadors & others of this Army has been misguided in many ways and had failed to appreciate the larger consequences of their unfortunate association with the Jnpanese. Three years ago I was asked in Calcutta what I would do if Subhas Bose led an army into India on the plea of liberating India. I replied that I would not hesitate to resist this invasion even though I did not doubt that Subhas Bose & his colleagues were motivated by the desire to free India & were in no ways tools of the Japanese. Nevertheless, they had put themselves on the wrong side, & were functioning under Japanase auspices. Therefore, whatever the motive behind these people, they had to be resisted in India & outside

...সারা ভারতে এবং বিশেষভাবে বৃটিশের প্রতি অনুগত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখে Auchinleck আই এন্ এ সৈনিকদের বিরুদ্ধে আর বিচার চালানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার পর নেহেরু ৪টা যে

১৯৪৬ Auchinleckকে ধন্যবাদ দিয়ে নিম্নলিখিত মর্মে পত্র দেন :—

"...I had not appreciated the political & international approach of some of the leaders of the Indian independence movement in South East Asia. I had differed from them in the past on international & national issues, nevertheless I felt kinship and sympathy for these people & I knew well what the reaction of the public mind in India would be·· ···Sensing all this I made my first public reference to the I. N. A. & followed this up with subsequent references···Then a strange & surprising thing happened, not strange, in itself but very surprising because of its depth and extent. Within a few weeks the story of the I. N A. had percolated to the remoted villages in India & everywhere there was admiration for them & apprehension as to their possible fate···whether one agrees with this or not, one should atleast understand how things happen & what forces lie behind them. **The widespread popular enthusiasm was surprising enough, but even more surprising was a similar reaction of a very large mumber of regular Indian army officers & men. Some thing had touched them deeply.** This kind of thing is not done & cannot be done by politicians or agitators or the like···

"ঐতিহাসিক", নেহেরুর এই "বিস্ময়ে" তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা অংশীদার কিনা জানি না, লেখিকা ও তাঁর মত আরো বহুশত স্বাধীনতাযোদ্ধা সেদিন কারান্তরালে—তাঁদের নিকট ভারতবাসীর এই প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজ মনে হয়েছিল এবং এর জন্য তাঁরা গর্ব অনুভব করেছেন যেমন করেছেন ১৯৬২তে চীনা আক্রমণ কালে ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের অভিব্যক্তিতে—যা দুশ বছরের ইংরেজ শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের "ইণ্টারনেশানাল" নেহেরু ও তাঁর মতাবলম্বীদের সুউচ্চ, আদর্শের বাস্তব রূপায়ণও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে নি।

এর পর Auchinleck এর সাক্ষ্য দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৫ বড়লাটকে লিখিত অচিন-লেকের পত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটা আলোকপাত করবে এ বিষয়ে :—

"...I am not in doubt myself that a great number of them (I. N. A.) especially the leaders, believed that Subhash Chandra Bose was a genuine patriot & that they themselves were right to follow his lead. There is no doubt at all from the mass of evidence we have that Subhash Chandra Bose acquired a tremendous influence over them & that his personality must have been an exceedingly strong one."

পুনরায় অচিনলেক বড়লাটকে ২২শে জানুয়ারি ১৯৪৬ এ একটি পত্র লেখেন একই বিষয়ে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি সেই চিঠি থেকে "...I know from my long experience of Indian troops how hard it is even for the best ·& most sympathetic British

officer to gauge the inner feelings of the Indian soldiar, & history supports me in this view. I do not think any senior British officer today knows what is the real feeling among Indian rank regarding the I. N. A. **I myself feel, from my own instinct largely, but also from the information I have had from various sources, that there is a growing feesing of sympathy for the I. N. A.··· It is impossible** to apply our standards of ethics to this problem or to shape our policy as we would, had the I. N. A. been men of our own race"

আর উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্ব পরিস্থিতি অনুধাবনে ও সেই পটভূমিকে বিশ্লেষণে, স্বাধীনতালাভের পন্থানুসরণে, ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও আচরণে সুভাষচন্দ্র ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন-পন্থী গান্ধিজী ও তাঁর বিশ্বাসভাজন নেহেরু থেকে। নেহেরুর মনোভাব ও মতামত উদ্ধৃত করেছি। আর উদ্ধৃত করেছি ভারতবাসীকে ২০০ বছর পরাধীন রেখে সর্বপ্রকারে তাকে শোষণ, তার মর্যাদা ও মনুষ্যত্বকে পদানত করে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষকে পশুবলে শাসন করেছে তার প্রতীক বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য দলের সর্বাধিনায়ক অচিনলেকের ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্তের মতামত, এই দুই প্রতিকূল সাক্ষ্য থেকে যদি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ২য় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার পেছনে বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে আই এন এ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দ: পূ: এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম যে বিপুল সচেতনতা এনে দিয়েছিল তাতে বৃটিশদের পক্ষে আর পূর্বের মত ভারতীয় সৈন্যদের আনুগত্যের দাবী ও আশা করা সম্ভব ছিল না। যদি বলা হয় আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ নানা কারণের মধ্যে একক এই একটি ঘটনার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক তবে নিশ্চয়ই অতি-শয়োক্তি হবে না। ভারতের স্বাধীনতা একমাত্র মহাত্মা গান্ধির অহিংস আন্দোলনের ফল বলে যাঁরা নিরন্তর ঘোষণা করে থাকেন ভারতবর্ষের ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতার ইতিহাস পরিক্রমা করে কোন ঘটনা অথবা ঘটনা সমূহের সমাবেশের ফল ক্ষমতা হস্তান্তরে বৃটেনকে বাধ্য করেছিল বলে তাঁরা মনে করেন? একটা জাতির ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করার দ্বারা বর্তমান ক্ষমতাসীন দল সত্যকে চিরকাল আবৃত করে রাখতে কখনোই পারবে না। যদিও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের স্বাধীনতা লাভে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে ভারত সরকার ও সাধারণ ভাবে ভারতবাসী তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেনি তবু—অন্যদেশ বসে নেই, তাদের নিজেদের স্বার্থেই বেশ কিছু বছর আগে আমেরিকা থেকে একদল রিসার্চ ছাত্র ফরোয়ার্ড ব্লক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে নেতাজীর সম্পাদকীয়গুলি দেখবার জন্য লেখিকার নিকট এসেছিল এবং পুরনো ফরওয়ার্ড ব্লকের সংখ্যাগুলো আগাগোড়া মাইক্রো ফিল্ম্ করে নিয়ে গিয়েছিল—সেগুলো ডেভেলাপ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ লাইব্রেরীগুলিতে রাখবার উদ্দেশ্যে। তাদের মুখে "We think the role of Subhas Chandra Bosc in the freedom stuggle of India has not been properly assessed" শুনে বেশ একটু চমকে উঠেছিলাম কারণ সুভাষচন্দ্র বসুকে আমেরিকা তার শত্রুপক্ষ বলেই জানে—এই প্রবন্ধ লেখা কালেও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিসার্চ ছাত্ররা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতে নেতাজীর প্রভাব এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ ব্যতীত অন্য সমাজবাদী মতবাদের

অনুসন্ধান করতে ব্যাপৃত আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আমেরিকার কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার পটভূমিকাতে হয়তো এই অনুসন্ধান। কিন্তু বছর ৮।১০ আগে তাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আজকের ভিয়েৎনাম নিয়ে আমেরিকার involvement নয়! সে যাক। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভের ১৮ বছর পরেও বর্তমান ক্ষমতাসীন দল জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার মুক্তি সংগ্রামের প্রামাণিক ইতিহাস দেবার কোনো চেষ্টা তো করেই নাই বরং সর্বপ্রকারে সেই ইতিহাসকে অবলুপ্ত ও বিকৃত করবার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তার সর্বাধুনিক প্রমাণ নেতাজীর স্মৃতি বিজড়িত এলগিন রোডের লালা লাজপৎ রায় রোড নামকরণ করতে তাদের "অহিংস" বিবেক কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই!

২৪শে মার্চ ১৯৪৬ দিল্লীতে কেবিনেট মিশন আসে এবং ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ক, খ, গ যথাক্রমে হিন্দু প্রধান, মুসলমান প্রধান এবং গ—বাংলা ও আসাম অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার আনুপাতিক আসন সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি—এই ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের আভ্যন্তরিন ও বহির্বিষয়ক সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনে একটা অন্তবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। বহু আলোচনা ও ব্যাখ্যার পর অন্তবর্তী সরকারের গঠন সম্পর্কে নানা বাধা দেখা দিল। এবং শেষ পর্যন্ত কেবিনেট মিশন ১৬ই জুন ১৯৪৬ ১৪ জন সদস্যযুক্ত একটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব দিয়ে বলে যে যদি প্রধান দুইটা রাজনৈতিক দল অথবা তার কোনো একটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় তবে বড়লাট ১৬ই মের বিবৃতির ভিত্তিতে সরকার গঠনে ইচ্ছুকদের নিয়েই একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে অগ্রসর হবেন। কিন্তু এসময় ওয়াভেল জিন্নাকে গোপনে স্বীকৃতি দেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন অথবা অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের যুক্ত অনুমোদন ব্যতীত অথবা একটির বিরুদ্ধতা সত্বে গৃহীত হবে না। এবং কংগ্রেসকে অন্তবর্তী সরকারে কোনো মুস্লিম সদস্য নির্বাচন করতে দেয়া হবে না। এই গোপন স্বীকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়াতে স্বভাবতই কংগ্রেস ২৫শে জুন অন্তবর্তী সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং ২৯শে জুন ১৯৪৬ কেবিনেট মিশন ভারত ত্যাগ করে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ১৬ই মের ক, খ, গ প্রস্তাব গ্রহণ করাতে উভয় দলকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু নেহেরু যিনি এসময় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন—এক সাংবাদিক বৈঠকে হটকারি ও নির্বোধ উক্তি করেন যে কংগ্রেস ঐ কেবিনেট মিশন প্রস্তাবকে প্রয়োজন মনে করলে পরিবর্তিত করতে পারবে। স্বভাবতই এতে জিন্না ক্রুদ্ধ হলেন এবং এর পর জিন্না ও লীগের মতামতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এলো এবং ২৯শে জুলাই ১৯৪৬এ মুস্লিম লীগ, কেবিনেট মিশন প্লেন প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের চূড়ান্ত দাবীতে অটল অবিচল হল এবং পাকিস্তান আদায় করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ (Direct Action) বেছে নিল।

নেহেরুর এই সময়কার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকজন নেহেরু-সমর্থকের উদ্ধৃতি দেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নেহেরুর জীবনীকার মাইকেল ব্রিচার এই সাংবাদিক বৈঠকের বিবৃতি সম্বন্ধে বলেছেন "One of the most fiery and porvocative statements of his forty years' of public life."

লিওনার্ড মসলে মন্তব্য করেছেন "Did Nehru realise what he was saying?...In the circumstances,

Nehru's remark was a direct act of sabotage ·· আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন "One of those unfortunate events which change the course of history."

গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে যখন ভারতের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের সমাধান দেখা যাচ্ছিল এই হটকারি উক্তি দ্বারা তা চিরতরে নষ্ট হল যেমন একবার ১৯৩৭ এ কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রীত্ব গ্রহণের লীগ প্রস্তাব সরাসরি বর্জন দ্বারা হিন্দু-মুস্লিম আপোষ রক্ষার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছিল—তেমনি ১৯৪৬ এ দুরাগত হলেও—হয়তো ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের সুযোগ শেষবারের মত নিষ্ফল হয়ে গেল। বড়লাট শেষবারের মত আবার অন্তবর্তী সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করে এক প্রস্তাব দিয়ে কংগ্রেস ও লীগকে তা গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন কিন্তু লীগ তা প্রত্যাখান করে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে বড়লাট ১২ই আগষ্ট ১৯৪৬ নেহেরুকে অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করলেন। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন এই একবার মাত্র মুস্লিম লীগকে ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতিতে বাধাসৃষ্টি করতে দেয়া হোল না।

নেহেরু অস্থায়ী সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৪ জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারের মধ্যে ৫টি আসন লীগকে দেবার প্রস্তাব করে জিন্নাকে আহ্বান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের নিজস্ব আসন সংখ্যার মধ্য থেকেও কোনো লীগ বহির্ভূত মুসলমানকে আসন দিতে জিন্না রাজী না হওয়াতে এই প্রস্তাব ব্যর্থ হোল।

এর পর মুস্লিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" আস্বাদ পেলো ভারতবর্ষ এবং এই আস্বাদই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভারত বিভাগে রাজী হতে বাধ্য করেছিল।

লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বলে ঘোষণা করা হোলো। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাবে ছিল "মুস্লিম জাতিকে বর্তমান বৃটিশ দাসত্ব ও ভবিষ্যৎ বর্ণ-হিন্দুর শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী আদায়ের জন্য মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংস্থা মুস্লিম লীগের পেছনে প্রতিটি মুসলমানকে দাঁড়াতে এবং সর্বপ্রকার আত্ম-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করছে।" প্রস্তাব গ্রহণের পর জিন্নার বক্তৃতাতে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্য পরিষ্কার হোল তিনি বল্লেন "আজ লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করছে লীগের ইতিহাসে এতদিন নিয়মতান্ত্রিক উপায় ব্যতীত অন্য হাতিয়ার ছিল না। আজ আমরা নিয়মতান্ত্রিকতাকে বিদায় দিলাম। ···এতদিন বৃটিশ ক্ষমতা ও অস্ত্রবলে এবং কংগ্রেস গণ-সংগ্রাম ও অসহযোগ দ্বারা—উভয়েই এক একটি পিস্তল হাতে আলাপ আলোচনা করেছে, আজ আমরাও একটি পিস্তল তৈরী করেছি ও তাকে ব্যবহার করবার অবস্থায় এসেছি।"

জিন্নার এই কথাগুলি পরবর্তী বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়ে ছিল। বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত একমাত্র লীগের পিস্তলই কার্যকরী হোলো অন্ততঃ কংগ্রেসের হাতে ঘটনা প্রভাবিত করবার মত কোন হাতিয়ারই রইলো না। এই "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল এই বাংলা দেশ যেখানে লীগ মন্ত্রীত্ব করছিল এবং ঐ পৈশাচিকতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই কলকাতা সহর যা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সংস্কার ও ধর্মের নব-জাগরণে এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তি সংগ্রামে যুগে যুগে এনেছে কত উপাচার, কত উৎসর্গ, কত সুকঠিন সাধনা। ১৯৪৬ এর ১৬ আগষ্ট ও তার পরবর্তী দিনগুলিতে হিন্দু মুসলমানদের তাজা খুনের স্রোতে তা ডুবে গেল ভেসে গেলো। সেদিনগুলিতে কলকাতা সহরে থাকবার অসহ্য অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছিল লেখিকা তাদের অন্যতম। সেদিন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ধারের কাজ করবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চলেছিল। যুদ্ধ দেখিনি কিন্তু শান্ত

স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের মধ্যে পরস্পরকে সেই অতর্কিত আক্রমণ ও নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যা এর তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র ঘটেছে কিনা সে ইতিহাস জানা নেই। যে কোন যুদ্ধে দুইপক্ষের মানসিক প্রস্তুতি এবং সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ থাকে কিন্তু এই নির্বিচার অর্থহীন হত্যার মধ্যে কোনই অর্থ খুঁজে না পেয়ে সভ্য মানুষের এই পরিচয়ে দুরন্ত ব্যস্ততার মধ্যে স্তব্ধ মূক হয়ে যেতে হয়েছে। এসম্পর্কে মসলে বলছেন "১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ এর প্রভাত থেকে পরবর্তী তিন দিন কলকাতাবাসী পরস্পরকে ৬০০০ এর মত টুকরো করে, আছাড়ে, পুড়িয়ে, ছোরা বিদ্ধ করে এবং গুলি করে মেরেছে এবং ধর্ষণ ও অঙ্গহানি করেছে আরো ২০০০০ এর মত।"

স্টেটসম্যান লিখেছে "এ দাঙ্গা ছিল না। তিনদিন ধরে এ ছিল খোলাখুলি নির্বাধ গৃহযুদ্ধ। কার উপর এই অপরাধের প্রধান দায়িত্ব বর্তাচ্ছে...তা পরিষ্কার। যার উপর এর প্রধান দায়িত্ব বর্তাচ্ছে তাকে আমরা দ্বিধাহীন ভাষায় অভিযুক্ত করছি, সে হচ্ছে প্রাদেশিক মুস্লিমলীগ মন্ত্রীসভা...এবং বিশেষভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।"

কংগ্রেস সভাপতি আজাদ সাক্ষ্য দিয়েছেন "সর্বত্র ট্রাক ভর্তি মিলিটারী অপেক্ষা করছিল রাস্তায় রাস্তায় কিন্তু তাদের চোখের সামনে হত্যা, লুট, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ চলছিল তারা চিত্রার্পিতের মত অপেক্ষা করছিল; তাদের উপর আদেশ ছিল 'স্টেণ্ড বাই' অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবার।" ১৬ই আগষ্ট ছুটী ঘোষণা করেছিল মুস্লিমলীগ মন্ত্রীমণ্ডল এবং কলকাতার নীচের তলা একে যথেচ্ছো কাজ করবার ঢালাও ছাড়পত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল...বহু পরে ১৪৪ ধারা ও পূর্ণ কার্ফু চালু এবং সৈন্যদলকে ডাকা হয়েছিল। কলকাতায় ইংরেজ গভর্ণর নিজেই বলেছিলেন দর্শকের ভূমিকায় আর কলকাতার ঘটনা সম্পর্কে গোপন রিপোর্টে লীগ মন্ত্রী মণ্ডলীর ভূমিকায় সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের পূর্ণ মাত্রায় ছিল" সেই কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী পন্থা নিতে আঙুলও নাড়েনি। হিন্দুরা মরিয়া হয়ে যখন প্রতিশোধ নিতে সুরু করলো এবং সপ্তাহকাল ধরে দু-তরফা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুট চললো মাত্র তখনই এ থামাবার প্রয়াস দেখা গেল এবং এই হত্যালীলা বন্ধ হোলো।

অন্তর্বর্তী সরকার :—আশ্চর্যের বিষয় কলকাতা যখন রক্তের সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছিল তখন কলকাতায় না এসে নেহেরু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরের দিন ১৭ই আগষ্ট থেকে—২৪শে আগষ্ট পর্যন্ত দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে বড়লাটের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ছিলেন ব্যস্ত। ২৪শে আগষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণার পর ওয়াভেল কলকাতায় এলেন এবং যা দেখলেন তাতে বিষাদগ্রস্ত হলেন। কিন্তু নেহেরু এসেছিলেন কি? গ্রন্থকার এসম্পর্কে কিছু লেখেন নি—সমসাময়িক আমাদেরও সে কথা মনে পড়ে না।

আজাদ এই ঘটনাকে যথার্থই ভারত ইতিহাসের এক চরম দুর্যোগ বলে বর্ণনা করে "গভীর দুঃখের সঙ্গেই এর প্রধান দায়িত্ব জওহরলাল নেহেরুর উপর দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন "যদিও জওহরলাল আমার প্রিয়তম বন্ধুদের অন্যতম এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান কারো অপেক্ষা কম নয়...।"

অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধীয় ঘোষণার পর ওয়াভেল মুস্লিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে একটী করুণ আবেদন করলেন কংগ্রেসের সম্ভাব্য অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও জিন্না একচুলও নড়লেন না।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে ওয়াভেল গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নিকট আবেদন

(শেষাংশ ৯২৫ পৃষ্ঠায়)

স্যার আশুতোষ : স্বপ্ন ও সাধনা

দিলীপ কুমার নন্দী

"......Above all sedulously cultivate your Vernacular, for it is through the medium of the Vernacular alone that you can hope to reach the masses of your countrymen."

Asutosh Mukherji.

"Men are always rare in all countries through whom the aspiration of their people can hope to find its fulfilment who have the thundering voice to say that what is needed shall be done ; and Asutosh had that magic voice of assurance."

Rabindranath Tagore.

[Calcutta Review, July, 1928]

শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এ নিয়ে বিদ্বজ্জনসভায় বিতর্ক ও বিতণ্ডার শেষ নেই। সেদিনও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী—যিনি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশবাসীর কাছে সুবিবেচক ও চিন্তাশীল বলে গণ্য হয়েছেন - তিনিও ইংরেজীর সমর্থনে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রানুরাগী সাধারণ পাঠকের একথা অজানা নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আজ থেকে প্রায় দীর্ঘ সত্তর বৎসর আগে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের সমর্থন জানিয়েছেন। আজও তাঁরই নির্দিষ্ট পথ ধরে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঐ সিদ্ধান্তের সপক্ষে অনলস আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি আশা রাখেন এ মতভেদের অচিরেই অবসান ঘটবে।

শিক্ষা এই বিষয়টির ওপর যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করতে শিখেছেন, তাঁরা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে সঙ্কট ও সঙ্কটের রূপটিকে স্বীয় ভাবে অনুধাবন করতে চাইবেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে যদি কখনও কেউ একটু দ্বিধাগ্রস্তও হন তাহলে দোষারোপ করা উচিৎ হবে না। অর্থাৎ এ বিষয়ে মত বিরোধ থাকাটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। সামগ্রিক বিচারে যেহেতু সমস্যাটি ছোট নয়, সমাধানে এ দীর্ঘসূত্রতার কারণ থাকা তাই অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আজ একথা ভাবতেও সত্যিই বিস্ময় লাগে যে, দেশীয় ভাষা পঠনপাঠন বিষয়েও একদিন এরকম প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল—এই বাঙলাদেশে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মূলে ছিলেন তৎকালীন একজন বাঙালী তরুণ গাণিতিক ও উদীয়মান ব্যবহারজীবী। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়ে কোন একটি বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করা যখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, তখন তিরিশ অনুত্তীর্ণ এই যুবক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সভার সভ্য হবার স্বপ্ন দেখছেন। সে স্বপ্ন একদিন সফল হোল। ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কর্ণেল জ্যারেট, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ বৎসরই ৩০শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সভার (Syndicate) সদস্য নিযুক্ত হলেন। সদস্যপদ লাভ করবার পর দু' বছর যেতে না যেতেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সভায় বিতর্কের অবতারণা করলেন।

দেশে সেদিন জাতীয়তাবোধ এসেছে বটে, তবে তেমন করে এ বোধটিতে বোধহয় তখনও দানা বাঁধেনি। তাই

শিক্ষানীতি আমরা উড্ সাহেবের ডেস্প্যাচের অনুসরণেই ঠিক করে নিয়েছি এবং তদনুসারেই কাজ চলছে। এমনি সময়ে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সভায় দেশীয় ভাষা পঠনপাঠন বিষয়ে এক প্রস্তাব আনলেন।[1] এ প্রস্তাবের প্রেরণা এসেছে তদানীন্তন উপাচার্যের সমাবর্তন (১৮৯০) ভাষণ থেকে। রেজিস্ট্রার এ. এম. স্যাস-কে লেখা পত্রে (১লা মার্চ, ১৮৯১) আশুতোষ এইভাবে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন—"...at the last convocation for conferring degrees, the Honble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian Vernaculars. He is reported to have said, "I also deem it not merely desirable but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical language." এবং বলেছেন, এ বিষয়টি বিবেচনার এখন যথেষ্ট সময় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। উপাচার্য বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৪ই মার্চ, ১৮৯১-এর সভায় আশুতোষ তাঁর প্রস্তাবে বলেন,—

"I—That in the Art Examinations, candidate who takes up Sanskrit should also be examined in either Bengali, Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Aarbic should be examined also in Urdu.

II—That the forgoing proposition be carried out in the manner following, that is to say :—

(A) In the F. A. Examination :—

i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding Vernacular languages.

ii) The first paper be devoted to the classical language and second paper to questions on the Vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the Vernacular.

(B) In the B. A. Examination :—

i) In addition to the text-books prescribed in the above named classical languages, text-books be also prescribed in the above-mentioned corresponding Vernacular languages.

ii) For the pass papers, the same scheme should be adopted as for the F. A. Examination.

iii) For the Honours papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the Vernacular text-books and an original composition in the Vernaculars

(C) In the M. A. Examination, in addition to the English essay required by para 5 of the M. A. Regulations, candidates be reqrired to write an essay in one of the above-named Vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or Vernacular language professed by them.'

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হোল। অত্যন্ত মূল্যবান পুরনো দলিল হিসেবে এটি গণ্য হয়ে থাকে, এবং পাওয়াও যায় না, তাই সম্পূর্ণ তুলে ধরলাম। এর মধ্যে লক্ষণীয়,—সেদিনের প্রস্তাবে পরীক্ষায় যাঁরা সংস্কৃত নেবে তাঁদেরই বাঙলা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতির কোন একটি ভাষা; আর

১ ১৪ই মার্চ, ১৮৯১।

ফারসী বা আরবী নিলে উর্দ্দু অবশ্য পাঠ্য বিবেচনা করা হয়েছিল।

উক্ত সভায় সে যুগের দেশী বিদেশী বহু বিখ্যাত মনীষী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রস্তাবটি শুনে সকলেই কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করে বিষয়টি 'কলা-পর্ষৎ' (Faculty of Arts)-এর কাছে বিবেচনার জন্য পাঠালেন। তদনুসারে, ১১ই জুলাই (১৮৯১)-এর পর্ষৎ সভায় উপস্থিত শিক্ষাবিদ্ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আশুতোষের প্রস্তাবটির সমর্থন জানালেন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকে—যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এগারজন সদস্য। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য নানা রকম সাম্প্রদায়িক ও নিয়মতান্ত্রিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করায় শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত ও কার্য্যকরী হোল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য বিবরণীতে ঘটনাটি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—

"Babu Umesh Chandra Datta seconded the motion. Raja Piyarimohan Mukherji proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examinations Regulations in the way suggested in the motion. Maulavi Suraj-ul-Islam seconded the amendment. Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdool Luteef, Babu Rajaninath Roy......opposed the motion. Babu Bankim Chandra Chatterji, Babu Chandranath Basu....spoke in favour of the motion. Babu Nilram Mukherji spoke against the motion. The Rev. Dr. Macdonald, Mr. A. M Bose, Babu Haraprasad Sastri supported the motion.

With the consent of the meeting the amendment was withdrawn being taken as a direct negative of the original motion. The motion was then put to the vote, and declared lost by a majority of 17 to 11.

—[Calcutta University Minutes, No. 1. 11th July, 1891]

ইতিহাস সচেতন পাঠক একথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, উনিশ শতকের জলহাওয়া মনীষার পুষ্টি সাধনই করেছে, তার অবদমন স্বীকার করেনি : আশুতোষ উনিশের ধারক রূপে সঞ্জীবিত হয়েছেন, তাই এ ঘটনায় তিনি দমে যান নি। বরং অপরিমিত ধৈর্য্য ও অধিকতর শক্তি নিয়ে তিনি কর্মব্রত উদ্‌যাপনে তৎপর হয়ে উঠলেন। ২০শে জুলাই (১৮৯১)—এর পরিচালনা সভায় বিষয়টি একটি কমিটির ওপর বিবেচার জন্য দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রস্তাব [১] তোলা হলে তা বাতিল হয়ে যায় ("Resolved—that the Syndicate cannot accede to the request.")।

এর পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় নবপর্য্যায়ে আশুতোষ বিষয়টির ব্যাপক প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরই প্রবর্তনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলাপর্ষৎ তখন বিষয়টি বিবেচনার জন্য এক কমিটি গঠন করেন। আশুতোষ উক্ত কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। এই কমিটির সুপারিশানুসারে সিনেটে স্থির হোল যে, এফ এ, ও বি, এ পরীক্ষায় বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় রচনার পরীক্ষা নেয়া হবে। ছাত্রেরা পরীক্ষায় পাশ করলে তাদের সার্টিফিকেটে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকবে, তবে রচনার পরীক্ষা দেয়া না দেয়া ছাত্রদের ইচ্ছাধীন।—এখানে আশুতোষেরর মূল

১ "To consider whether it is possible to devise some scheme by means of which greater encouragement may be given by the University to the study of the Indian Vernacular than has been hithertodone."

প্রস্তাবের আংশিক স্বীকৃতি লাভ ঘটল। আশুতোষ এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেও যে তিনি প্রস্তাবটির কথা ভোলেননি তা দেখা যাচ্ছে তাঁর একটি সমাবর্তন ভাষণে। এই ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন 'বিশেষ সমাবর্তন' উপলক্ষে, ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর। উক্ত সমাবর্তনে Hermann Jacobi, Sylvian Le'vi, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন এই বিশ্ববরেণ্য কবির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষাও বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পেয়ে গেল। অথচ, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সেদিনও এদেশের মনস্বী শিক্ষাবিদ্‌রা এ ভাষাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অচল বলে রায় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় তরুণ প্রস্তাবকের সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয়ে বিজ্ঞ সদস্যেরা প্রশংসা করেছেন, কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থন জানান নি।[৩]

ইতোমধ্যে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট সদস্য রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রস্তাবটির রূপায়নের দায় দায়িত্বও এসে পড়ল, তাঁরই ওপর। আশুতোষের নেতৃত্বে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নববিধি (New Regulations) প্রবর্তিত হোল, তাতে বি, এ পরীক্ষা পর্যন্ত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করবার জন্য কতকগুলি বই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি সংকলন প্রকাশ করে এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন।

কয়েক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত ষোল জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্যালোচনা সংসদ তার প্রাথমিক প্রতিবেদনে (১৪ই জুলাই, ১৯১৭), বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা মাধ্যমিক এবং স্নাতক শ্রেণীর কলা ও বিজ্ঞান উভয় পরীক্ষায় দেশীয় ভাষাকে আবশ্যিক করা উচিৎ বলে এক সুপারিশ করেন। পরপর তিন চার সপ্তাহব্যাপী এ নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। আলোচনা কালে অধিকাংশ সদস্যই সুপারিশটির সমর্থন জানালেও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞানে যাঁরা স্নাতক হ'তে যাচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রে 'কলা'র ছাত্রদের মত মাতৃ ভাষার পাঠ নেবার বিধি আরোপ করা যুক্তি সঙ্গত হবে না বলে মন্তব্য করেন। উত্তরে আশুতোষ বলেন—'That the advocates of Science had looked at the question from the point of view of Science alone. They contented that if a Vernacular language had to be studied in the manner recommended by the committee of sixteen, the B. Sc course would become so heavy that intelligent students would not be able to take it up....(Sir Asutosh said) he would be very sorry personally if the Vernacular was omitted from the B. Sc course.···He did not for a moment believe that in inclusion of Vernacular in the B. Sc course would be a real hardship for those who had studied their Vernacular faithfully up to the Intermediate stage; it should not act as a deterrent in practice."

[Calcutta University Minutes. 28th July, 1917 page 644]

এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, দেশীয় ভাষা শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারটি ১৮৯১ খৃস্টাব্দের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব পেতে সুরু করেছে এবং এ বিষয়ে বিরোধিতার পরিমাণও

• "The senators complimented the novice on his eloquence and admired his boldness, but doubted his wisdom, and by an overwhelming majority, rejected his proposal."

[Calcutta University Minutes, 20th Dec, 1913 page 2983]

অনেক কমে এসেছে। এই ভাবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মূল প্রস্তাবটি পর্যায় ক্রমে সামান্য কিছু ইতঃস্তত পরিবর্তিত আকারে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, প্রায় ২৬ বৎসর পর গৃহীত হোল। সুতরাং স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে আন্তরিক ভাবে যে সত্যটিকে তিনি একবার গ্রহণ করেছিলেন, তাকে অর্দ্ধপথে বর্জন করবার শিক্ষা তাঁর ছিল না। ব্রত উদ্‌যাপন করতে না পারা পর্য্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। ভগ্নোদ্যমও হতেন না কারণ তিনি জানতেন,—এই রূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনের বা দু'দশ বৎসরে সম্ভব নয়, আরম্ভ মাত্রেই ফল লাভের আশা নাই। কিন্তু আজ যাহা অসম্ভব বোধ হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।[৪] আর যদি একবার ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারলেন। তবে তিনি যে কি পরিতৃপ্ত হতেন তা তাঁরই কথা থেকে স্পষ্ঠ তর হবে। তিনি বলছেন,—আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয় নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয়, যে সেদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্তমান। ....বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্র ক্ষণ।"[৫]

এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের ভাষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রবেশাধিকার পেল। এরই পরবর্তী পর্যায়ে [illegible]ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এ আশা র[illegible] দুরাশা কি?

৪ ১০ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (বাঁকিপুর) প্রদত্ত অভিভাষণ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। ১৩২৩ সাল।

৫ ঐ

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

বসন্ত আসবেই
সন্তোষ দাস

এখন বন্ধ্যা কৃষ্ণচূড়ার বনে
রং নেই একটুও
চেনা গলিটার স্বাভাবিক শীর্ণতা
একই সে গানের ধুয়ো।

চৈত্রের শেষ, বৈশাখে জ্বালা শুরু
কৃষ্ণচূড়ার ডাল
ছাতে মেলে দেওয়া রাঙা শাড়ীটার মত
দু'হাতে ছড়াবে লাল।

তবু সে খবর লুকোনো ইস্তাহারে
একবারে অন্ততঃ
ছড়াবে না এই আধমরা গলিটায়
শীর্ণ রোদের মত।

এখন বন্ধ্যা কৃষ্ণচূড়ার বনে
একটুও রং নেই
তবু তো শীতের মৃত্যুর পরোয়ানা
স্বাক্ষর করে বসন্ত আসবেই।

স্বরূপ
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে ভয়ানক ব্যথা ওঠে নাভিকুণ্ড হতে।
মুহূর্তে ছড়ায় বিষ শিরায় শিরায়, দুর্বিসহ
সে যন্ত্রণা। ভেসে যাই অচেতন অন্ধকার স্রোতে,
ভাবিনা, পৃথিবী জুড়ে কোনো কিছু আছে অর্থবহ।
সম্মুখে পাতালপুরী কী নীরব, যেন বা শ্মশান,
শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে যেন সুরক্ষিত মৃতমুখগুলি,
ভয়ার্ত, করুণ দৃষ্টি মেলে যেন করিছে সন্ধান
কোথাও যায় কিনা দেখা কোনো দেবদূতের অঙ্গুলি।
চৈতন্য ফিরিলে দেখি কিছু নাই, পুনশ্চ মাতাল।—
করুণা ইত্যাদি পুনঃ জগতের মুখে ছুঁড়ে মারি।
কখন শিয়রে এসে দাঁড়ালো নিষ্ঠুর মহাকাল
কে রাখে হিসাব? যেন বিশ্ব আজ দুয়ারে ভিখারী
ভয়ানক ব্যথা ওঠে নাভিকুণ্ড, দেখি সে পাতাল
কক্ষে শোভা পায় যেন মৃতমুখ স্বয়ং আমারি।

একগুচ্ছ কবিতা
ইরা সরকার

রজনীগন্ধার মত রাত্রে ফোটে স্মরণীয় শব
সকালের দৃশ্যে তার মিছিলের মস্ত কলরব
কজনকে পরিশুদ্ধ বাস্তবের মুক্তাংগন দেয়
কজন চিন্তিত হয় অবিশ্বাসী মানুষের
ভাগ্যলিপি দেখে!

বৃদ্ধ যায়, শব থেকে শান্তি আসে পৌষের জ্যোৎস্নায়
যে গ্রামে জন্মেছি কবে তার মোহনায়
নতুন শহর দেখে পথ হেঁটে চেতনায় আনি
সমুদ্রের বুকভরা মায়ের মৃত্যুর হাতছানি

সময়ের সব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে মুছে
দিনান্তে নিজের খাটে ভয় ক্ষুধা সংশয়ের দাবী
ভুলে হাতে নিই একগুচ্ছ কবিতার চাবি
খুলি স্বপ্নদৃশ্যগুলি পুরনো সিন্দুকে
পূর্বপুরুষের সব দলিলের অস্পষ্ট মৌজায়
ঘোরাফেরা করে আসি আন্তর্জাতিকতা

এলিঅট সেই দেশে কেউ কেউ যাকে বলে স্বদেশ স্বধাম
পরিচিতি যা থাকে তা কবিতার গুচ্ছেই নীলাম
প্রত্যেক মুহূর্ত ভরে জীবিতের সম্মানের দামে
বাঁচার রোদ্দুরে ঝরে ঈশ্বরের অভীপ্সার ঘাম।

দশ বছর

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিরহঙ্কার কে ডেকে গেছে শেষ গোধূলিতে
ম্লান অন্ধকারে,
সব পরিবারসহ বৈকালী ভ্রমণ, কেনাকাটা—
দশ বছরের বন্ধু গল্প করে করে
হাল্কা করতে চেয়েছিল বয়সের ভার···
ঘন চুলে কে প্রেয়সী পায়ের ওপর থেকে জল মুছেছিল,
বলেছিল—হয়নি বয়স,
কোনখানে ছিল না বয়স—গাছে, কিংবা পাতায় শাখায়···
দশ বছর পরে সব যথাযথ আছে—
বৃক্ষ, ঘর, ফার্ণিচার, দেয়াল, ঘড়িটা।
শুধু চিন্তা, চিন্তার ভিতরে
সোনালী রূপোলী রেখা ভিড় করে আসে :
দশ বছর আরো পরে
আরো বহু দশবছর কাটে
নিরহঙ্কার যে ডেকে যায় সেই ডাকে চিরদিন দূর
ভীষণ বয়স।

জ্বর

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জলে ভিজে ফুলস্জলাটির মত
কেবলই সৌগন্ধ্যে ভরে দেবে
সমস্ত পথের চলাচল···
জলে-ভেজা নৌকোর ছবিটি কোন পুকুরঘাটের
স্নানসিক্ত মায়াবী ছবির আস্বাদে
ভীষণ ব্যাকুল রাখে।   সারাদিন, সারারাত সেই
জলের তরুণ শব্দ দুপুরে তীক্ষ্ণ কড়ানাড়া
প্রসাধন দ্রব্য উপযাচিকার,
যেন সবই আঁচলের প্রান্ত ভরে দিতে
ফুটে আছে।
জলে ভিজে বাইরে শীতল···
ভেতরে রক্তের তাপে তরঙ্গিত সমস্ত শরীর···
হাতে কি উত্তাপ এত হাত চেপে-রাখা
এখন হয়েছে খুব জ্বর ?

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল ডাইলান টমাস

অনুবাদ : স্নেহাকর ভট্টাচার্য

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল ত্রিকোণ তারকা
আলোর একটি হাসি শূন্যতার মুখে
একটি অস্থির শাখা শিকড়-নাবানো সমীরণে
প্রথম সূর্যের মজ্জা বেঁকে দ্বিধা হলো
জলন্ত দুর্বোধ্যলিপি অন্তরীক্ষে দিকে দিকে জেলে
ঘূর্ণমান স্বর্গ ও নরক মিশে এক হয়ে যায়।

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল ধূসর স্বাক্ষর
ত্রিবর্ণ এবং যেন নক্ষত্রখচিত একটি হাসির মতন
জলেতে অঙ্কিত হলো চিহ্নগুলি ক্রমে
মুদ্রিত মুখের ছাপ চাঁদের উপরে।
ক্রুশ আর শেষ পানপাত্র ছোঁয়া পবিত্র শোণিত
সৃষ্টির প্রথম মেঘ ছুঁয়ে এক চিহ্ন রেখে গেছে।

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল দাউদাউ উজ্জ্বল পাবক
জেলেছে স্ফুলিঙ্গ থেকে আবহাওয়া - সেই অগ্নিকণা
ত্রিনয়ন, রক্তচোখ এবং ফুলের মত ভোঁতা।
গড়ানো সমুদ্র থেকে জীবন জাগলো, ব্যাপ্ত হলো
ফেটে পড়লো শিকড়ে শিকড়ে, মাটি ও পাহাড় শুষে
জোগালো গোপন রস নব দুর্বাদলে।

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল শব্দ—যে শব্দ এনেছে
আলোর কঠিন ভূমি থেকে
শূন্যতার সকল অক্ষর ;
নিশ্বাসের মেঘময় উৎসমুখ থেকে
উঠলো শব্দের ধারা—জানালো এ হৃদয়ের কাছে
জন্ম ও মৃত্যুর সেই আদি বর্ণমালা।

সৃষ্টির আরম্ভে ছিল গোপন মগজ
সে মগজ কোষবদ্ধ হলো চিন্তার বস্তুতে
প্রথম সূর্যের দিকে গ্রহণের অভিযান আরম্ভের আগে
শিরায় শিরায় দ্রুত স্পন্দনের জন্মাবার আগে
হঠাৎ লাফিয়ে রক্ত আলোকের বাতাসে ছড়ালো
পাঁজরের প্রথম নবীন ভালোবাসা।

অমৃত সম্পর্কিত বাসুদেব দেব

নরকের গন্ধ তার সর্ব অঙ্গে। নরকের আলো
কপিশ প্রখর দুই চোখে জ্বলে। বুকের উপরে
নগ্ন নারী দেহ. নষ্ট চাঁদ, শয়তানের ধারালো
মুখচ্ছবি উল্কী আঁকা। যখন সে ফেরে এ-বিশ্বরে
মধ্যরাতে এলকোহল-অন্ধকার-স্বেদ-রক্ত ছেনে
কি আশ্চর্য, ডাইনিটা কয়েকটা বেহায়া স্বপ্নের
কারচুপি রেখে দিয়ে চলে যায়। ঘুমন্ত সে কেনে
সেইগুলি বহুমূল্যে ; ভোরবেলা বেচে দেয় ফের
ধুলোর মতন। তালপুকুর বাস স্টপে তখন
জিলিপি, রোদ্দুর আর ডাগর ডিখিরি মেয়েটার
গন্ধ তাকে ডাক দেয়। প্রহরীরা ঘুমে অচেতন।
'নরক, নরক…এ…' ঘণ্টা দিয়ে দারুণ চীৎকার
করে সে-কওয়ার্টার ছুটতে থাকে নরকের দিকে।

•

'অমৃত কোথায়'—বলো কে শুধাবে মৃত জননীকে ?

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

সত্যকে নির্দ্ধারণ করাই লজিকের কাজ। কিন্তু সত্য কি এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এ নিয়ে যুগে যুগে অনেক তর্কের অরণ্য সৃষ্ট হয়েছে। সব কিছুরই গোড়ার তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং", তাই সত্য বস্তুর আসল স্বরূপ যে কী তা খুঁজে খুঁজে এ অরণ্যেও পথ বের করা মুস্কিল। দার্শনিক তত্ত্বের অরণ্যে না ঢুকে এইটুকু বললেই চলবে যে গুহাহিত সত্যকে যারা বের করেছেন বলে দাবী করে থাকেন তাঁদের মধ্যে দুই দল হয়ে গেছে। মানুষের জীবন ভরে কত রকম-বেরকমের জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, কত অগণিত চিন্তা এবং উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাদের মানস-পটে। এর মধ্যে কোন্ জ্ঞানটি আসলে সত্য, আর কোনটিই বা মিথ্যা, এ তত্ত্বের নির্ণয় হবে কী করে? একদল বলছেন যে চিন্তাগুলো মানুষের মনে উঠছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা সঙ্গতি (consistency) থাকলেই বুঝতে হবে যে ঐ চিন্তাগুলো সত্য। যদি চিন্তাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে, যদি তারা পরস্পর-বিরোধী হয়, তবে ঐ জ্ঞান অসত্য। জ্ঞান আত্ম-সঙ্গত (self-consistent) হবে, আত্ম-বিরোধী (self-contradictory) হবে না। একটি জ্ঞান মনে উৎপন্ন হলে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কতকগুলো খণ্ড চিন্তা একসাথে গাঁথা হয়ে আত্মসম্পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানটি গড়ে উঠেছে। যদি ঐ খণ্ড চিন্তাগুলোর একটির সাথে অন্যটির ঐক্য বা যৌক্তিক সঙ্গতি না থাকে তবে সত্যজ্ঞান জন্মাতে পারে না। সত্য এঁদের কাছে আকার-নিষ্ঠ সত্য (formal truth)। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তাতে দুটি সত্তা সংশ্লিষ্ট আছে দেখতে পাই—একটি হচ্ছে মন, অপরটি বাইরের বিষয় (things)। এঁরা বলেন মনের চিন্তাগুলোর সঙ্গে বাইরের বিষয়ের মিল থাকবার দরকার নেই, চিন্তাগুলোর নিজেদের মধ্যে অমিল যদি না থাকে, তবেই ঐ চিন্তা-প্রসূত জ্ঞানকে 'সত্য' বলব।

ক্ষীরসমুদ্রে সোনার পদ্ম আছে;
ক্ষীরসমুদ্র পাতালে আছে;
কাজেই, পাতালে সোনার পদ্ম আছে।

উপরের সিদ্ধান্তটিকে আকার-নিষ্ঠ সত্যের দিক থেকে বিচার করে এ-দল একেই বলবেন "সত্য"। কারণ, তিনটি খণ্ড চিন্তার পরস্পরের মধ্যে কোনো অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি বা অনৈক্য নেই। বাস্তব জগতে ক্ষীর সমুদ্র, সোনার পদ্ম বা পাতাল বলে কোনো বিষয় বা বস্তু না-ও থাকতে পারে, তাতে উপরের যুক্তি বা তজ্জাত জ্ঞানের কোনো অসঙ্গতি বা অসত্যতা প্রমাণ হয় না। যুক্তির দিক থেকে, সঙ্গতির দিক থেকে, ঐ জ্ঞান সত্য। এ দলের মতে লজিক শুধু আকার-নিষ্ঠ

সত্য অর্থাৎ যৌক্তিকতা বা পারস্পরিক সঙ্গতিই খোঁজে, বাস্তবতা খোঁজে না। বাস্তবতা খোঁজা লজিকের কাজ নয়, অন্য বিজ্ঞানের কাজ। এঁদের লজিককে এই কারণেই আকার-নিষ্ঠ ন্যায় (formal logic) বলা হয়ে থাকে। এই লজিককে অবরোহী ন্যায়ও (Deductive Logic) বলা হয়। কারণ এঁদের আত্মসঙ্গত সত্য (formal truth) অবরোহী সত্য (Deductive truth) বই আর কিছুই নয়। কোন ব্যাপক সাধারণ জ্ঞান থেকে যদি কোন বিশেষ খণ্ডিত জ্ঞানকে যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে পাওয়া যায়, তবে অনুমিত জ্ঞানকে অবরোহী সত্য বলা হয়। ভারতীয় ন্যায় বৈশেষিকের ভাষায় সামান্য থেকে বিশেষ জ্ঞানে আসাকে অবরোহ (deduction) বলা যেতে পারে। সামান্য জ্ঞানের সঙ্গে যদি বিশেষ জ্ঞানের ঐক্য বা সঙ্গতি থাকে তবেই সেই বিশেষ জ্ঞানকে (deductive knowledge) 'আকার-নিষ্ঠ সত্য' (formal truth) বলা হয়। এই অবরোহী ন্যায়ের (Deductive Logic বা Formal Logic) স্রষ্টাকর্তা হলেন এরিস্টটল্।

অপর দল অবশ্য এই ধরণের সত্যকে সত্য বলে মানেন না। তাঁদের মতে বস্তু-নিষ্ঠ সত্যই (material truth) আসল সত্য। অর্থাৎ জ্ঞানের (thought) সঙ্গে বস্তু বা বাইরের বিষয়ের (things) ঐক্য বা মিলযদি না থাকে, তবে এই জ্ঞান অর্থহীন আকাশ-কল্পনা বই আর কিছুই নয়। এঁদের মতে জ্ঞানের আত্মসঙ্গতি (self-consistency) বা চিন্তাগুলোর পারস্পরিক ঐক্য থাকলেই কেবল চলে না, বাস্তব জগতের সঙ্গেও সঙ্গতি থাকতে হবে। এঁরা বলেন লজিক এই বস্তুনিষ্ঠ সত্যকেই (material truth) খোঁজে, কাজেই লজিক আসলে হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ন্যায় (material logic)। এই লজিককে Inductive Logic বা আরোহী ন্যায়ও বলা হয়। কারণ আরোহী সত্য (Inductive truth) আর বস্তুনিষ্ঠ সত্য (material truth) একই কথা। বাহ্য জগতের বস্তুগুলিকে একটি একটি করে উপলব্ধি করলে, একটি খণ্ড বা টুকরো জ্ঞান জন্মে। এই টুকরো বা বিশেষ জ্ঞানগুলোকে যুক্তির সাহায্যে একসাথে গাঁথলে একটি সাধারণ ও ব্যাপক জ্ঞান গড়ে ওঠে। বিশেষ থেকে সামান্য জ্ঞানে যখন উত্তীর্ণ হই, তখন 'inductive truth' বা আরোহ-লব্ধ সত্যকে লাভ করে থাকি। এই আরোহ-লব্ধ সত্য বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান থেকেই অনুমিত হয়ে থাকে। এইজন্য এই আরোহ-লব্ধ সত্যও বাস্তব জ্ঞান (material truth) বই অন্য কিছু নয়। কারণ জ্ঞানের (Thought) সঙ্গে এখানে বাইরের বস্তুর (thing) ঐক্য বা সঙ্গতি রয়ে । বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের যদি বিরোধ বা অনৈক্য থাকে তবে এঁদের মতে সে জ্ঞান অসত্য। এই আরোহ-লব্ধ বাস্তব ন্যায় (Indutive বা Material logic) হল পরবর্তী যুগের ন্যায়শাস্ত্র এবং অবরোহ-লব্ধ ন্যায় (Deductive বা formal logic) আদি ন্যায়শাস্ত্র। আরিস্টটল যেমন Formal logic বা আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের স্রষ্টা, তেমনি ত্রয়োদশ শতকের Franciscan সাধু রোজার বেকন (Roger Bacon, 12 14 94) এই আরোহ-লব্ধ ন্যায়ের (Inductive logic) জন্মদাতা। পরে ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) ও লর্ড ভেরুলম (Lord Verulam, 1501-1626) এই ন্যায়কে আরো বিকশিত করেন; এবং আরো পরে ১৯শ শতকের বিখ্যাত জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill, ১৮০৬-৭৩) এই লজিককে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিণত রূপ দান করে এর চরম উন্নতি সাধন করেন।

উপরের বিবরণ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে অবরোহী (formal) ও আরোহী (Inductive) ন্যায়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যত পার্থক্যই থাক, ন্যায়

শাস্ত্রীদের দুই দলই Consistency বা সঙ্গতিকে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকার করেন। অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য থেকে সত্যের জন্ম হতে পারে না—একথা দুই সম্প্রদায়েরই লজিকের ভিত্তি। আত্মসঙ্গতি (self-consistency) দুই লজিকেরই মূলগত। এমন কি, যা বাস্তব অর্থে (materially) সত্য হবে, তাকেও আত্মসঙ্গতির পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, self-consistent হতে হবে। যে কোন সিদ্ধান্তের প্রথম অংশ যদি অপর অংশকে বিরুদ্ধতা বা নিরসন করে, তবে সেখানে জ্ঞান না হয়ে হয় জ্ঞানের আত্ম-হত্যা। "গোল চতুষ্কোণ", "দ্বিপদ চতুষ্পাদ" ইত্যাদি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান হতেই পারে না; কারণ এরা প্রত্যেকেই আত্মবিরুদ্ধতা (self-contradiction) করছে। পরস্পর বিরোধী অসঙ্গত চিন্তা একে অন্যকে খণ্ডন করে, ফলে অঙ্ক কষলে জমার ঘরে যা বাকী থাকে তা জ্ঞান নয়, শূন্য (zero)। এই কারণে পরস্পর বিনাশী বিরুদ্ধতা (contradiction) জ্ঞানের পরিপন্থী। যেখানে এই বিরুদ্ধতা বা সঙ্গতির অভাব থাকবে সেখানেই জন্ম নেবে error বা দোষ, যার সম্বন্ধে রুশো বলেছেন "Error is mischievous" (Emile, III)

নির্ভুল জ্ঞানলাভ করতে হলে তাই অসঙ্গতি দোষকে (contradiction or inconsistency) বর্জন করতে হবে। একথা ন্যায় শাস্ত্রের সর্ব্ব-সম্মত নীতি। আর অসঙ্গতিকে বর্জন করার কথা কাউকে শিখিয়ে দিতেও হয় না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই মানুষ অসঙ্গতিকে এড়িয়ে চলতে চায়। যেখানে পরস্পর বিরুদ্ধতা চোখে পড়ে সেখান থেকে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মুখ ফেরায়। অসঙ্গতির উপর মানব-মনের অতি স্বাভাবিক বিরাগ সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ সর্বত্রই খোঁজে ঐক্য ও সামঞ্জস্য। যেখানে অসামঞ্জস্য বা অনৈক্য, সেখানে মানুষের বুদ্ধি পীড়া বোধ করে। সত্যকে মানুষ কল্পনা করে সামঞ্জস্য বা হার্মনির নিখুঁত বিগ্রহ বলে। সত্য সততই একম্ ও অদ্বিতীয়ম্। সত্য কখনো দ্বিবিধ ভাষণ করে না; একই কালে, একই ক্ষেত্রে সত্যের মুখ থেকে বিপরীত বাণী নির্গত হয় না। একই ক্ষেত্রে, একই ক্ষণে দুটো সত্য সম্ভব হয় না। সত্যের এই প্রকৃতিই মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনায় স্বতঃসিদ্ধ। যেখানে দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতি রয়েছে তাকে এড়িয়ে ও অতিক্রম করে মানুষ নিয়তই দ্বন্দ্বের অতীত ভূমিতে সত্যকে খোঁজে। ন্যায়শাস্ত্র মানুষকে এই অসঙ্গতি দোষ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে, যাতে করে মানুষ দ্বন্দ্বাতীত ও অসঙ্গতি-রহিত সত্যকে লাভ করতে পারে। লজিকের গোড়ার কথা সঙ্গতি (consistency) এবং লজিকের এই মূলনীতিকে বিশ্লেষণ করে তিনটি স্বতঃসিদ্ধ (Axioms) নির্ধারিত হয়েছে। সুসম্বদ্ধ ও সুসঙ্গত চিন্তা বা মনন করতে হলে এই তিনটি মূলনীতিকে বাদ দিয়ে মননক্রিয়া চলতে পারে না। যে কোন নির্ভুল চিন্তা করতে এবং যে কোন সত্য জ্ঞানকে লাভ করতে হলে, এই তিনটি নীতিকে অবলম্বন করেই চিন্তা করতে হবে। এই তিনটি নীতির প্রতি মানুষের আনুগত্য অতি স্বাভাবিক এবং এদের দিকে বুদ্ধির প্রবণতাও স্বতঃসিদ্ধ। অবশ্য কেন স্বতঃসিদ্ধ একথা নিয়ে অনেক বিতর্কই উত্থাপিত হতে পারে। এই ক'টি মনন-নীতিকে (Laws of thought) স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে অনেকেই আপত্তি করেছেন এবং স্বতঃসিদ্ধ মানে কি তা নিয়েও তর্ক কম হয়নি। Empiricisim ও Rationalism এর বিতর্ক আজকের নয় এবং সকলেই তার ইতিহাস জানেন। কেউ বলেছেন, যাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করি তার ইতিহাস জানলে এই তত্ত্ব বেরিয়ে পড়বে যে অভিজ্ঞতা থেকেই এরা জন্ম নিয়েছে এবং বহুদিন বহু অভিজ্ঞতায় সমর্থিত বলেই এরা মানব-মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছে। অপরদল অবশ্য বলেছেন, স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলো মানব মনে অন্তর্নিহিত রয়েছে অনাদি কাল থেকে। এরা অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা

প্রামাণ্যের জোরে বিশ্বাস ও আনুগত্য দাবী করে না। এরা প্রকাশ-স্বরূপ এবং আপনাদের নিজস্ব নিয়মেই এরা স্বতঃই মনের মধ্যে প্রকট হয়—"প্রদীপ-প্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" (গৌতম সূঃ ২।১৬)। **Empiricism-Rationalism**-এর প্রতর্ক অতি প্রাচীন ও পুরাণো এবং এ তর্ক ন্যায়ের গণ্ডীর বাইরে, দর্শন শাস্ত্রের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ বিতর্কের মধ্যে না গেলেও, একথা বলা যেতে পারে যে অসঙ্গতি-বর্জিত চিন্তা ও মনন করতে হ'লে এই নীতিগুলো ভিত্তি হিসেবে অজ্ঞাতসারেই হোক আর জ্ঞাতসারেই হোক, সবাই নিয়ে থাকে অতি স্বাভাবিক ভাবে, বিনা বিতর্কে। এদের উৎপত্তির ইতিহাস যাই হোক, মানব-মনের সকল মনন-ক্রিয়ার গোড়ার কথা এই তিনটি নীতি। লজিকের এই তিনটি মূলনীতি হচ্ছে :

১) Law of Identity (অভেদ নীতি

২) Law of Contradiction (বিরোধ নীতি),

৩) Law of Excluded Middle (বহির্ভুক্ত মধ্যপদ নীতি)।

এই তিনটি নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। কারণ, এই তিনটি মূলনীতিকে নিয়েই হেগেলের ও ও ন্যায়ের যা কিছু বক্তব্য।

১) Law of Identity—এই নীতি বলছে কোনো একটি বস্তু যা সে ঠিক তা-ই (a thing is what it is)। কিংবা ফর্মুলা করে লেখা যায় : "ক হচ্ছে ক" কিংবা "ক = ক" (A is A or A = A)। এর মানে হল এই যে, কোন একটি বস্তুকে একবার এক রকম বলে' পরে আবার অন্য রকম বলা চলতে পারে না। লজিকের পরিভাষা বা শব্দের মানে বদলানো চলতে পারে না। একবার কোন এক অর্থে কোন শব্দকে ব্যবহার করে পরে সেই শব্দকেই অন্য অর্থে ব্যবহার করে যুক্তি-তর্ক করা অসঙ্গত। রামকে রাম বলে অভিহিত করলে সেই ক্ষণেই আবার 'রাম, রাম নয়' বলা অন্যায়। যে অর্থে রামকে রাম বলা হয়েছে, সেই অর্থেই আবার তাকে রাম নয় বলা নিতান্ত অর্থহীন। জনস্টুয়ার্ট মিল এই নীতিকে এই রূপে ব্যাখ্যা করেছেন :—

> **"Whatever in true in one form of words**
> **is true in every other form of words**
> **which convey the same meaning"**
>
> **(Examination of Hamilton's**
> **Philosophy, 3rd Edn., p.466)**

এই নীতি থেকেই হ্যামিল্টনের "The Postulate of Logic" এসেছে। হ্যামিল্টন বলেছেন : কোন যুক্তি বা আলোচনা করতে হলে, যেসব শব্দ ব্যবহার করা হবে তাদের সঠিক মানে আগেই পরিষ্কার করে নির্দেশ করে নিতে হবে।*

এই অভেদ নীতিকে অনুসরণ করেই Jevons তাঁর 'Substitution of Similars' নীতি গঠন করেছেন। কোন দুটো বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে, একটি সম্বন্ধে যে কথা বলা চলে অন্যটি সম্বন্ধেও ঠিক তাই বলা চলে ‡ মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে বলেই একটি মানুষ সম্বন্ধে যে কথা খাটে সে কথা অন্যান্যদের সম্বন্ধেও খাটে। এই নীতির উপরেই ন্যায়ের 'আরোহ পদ্ধতি (Induction) দাঁড়িয়ে আছে।

---

* **"...before dealing with a judgment or reasoning expressed in language, the import of its terms should be fully understood." (Lectures III, p.114)**

‡ **"The one supreme rule of inference consists in the direction to affirm of anything whatever is known of its like, equal or equivalent.'** (Principles of Scie**e**, p.17)।

এখানে সাদৃশ্য মানে আংশিক identity অর্থাৎ কতকগুলো গুণের সাদৃশ্য।

Law of Contradiction—এই নীতি বলছে, "কোনও বস্তু একই সঙ্গে সেই বস্তু এবং ঠিক তার বিপরীত বস্তু হতে পারে না। কোনও বিশেষ বস্তু 'ক' একই সময়ে 'ক-নয়' হতে পারে না" (A thing cannot both be and not be A is not not-A) অর্থাৎ কোন জিনিষকে একবার 'লাল' বলে, একই সঙ্গে তাকে 'লাল নয়' বলা অর্থহীন। একই কালে একই অর্থে কোন দুটো বস্তু একেবারে বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুণমণ্ডিত, একথা বলা ও ভাবা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। যদি কোন জিনিষকে 'সৎ' বলি, তবে সেই ক্ষণেই সে 'অসৎ' হতে পারে না এবং যদি সে 'অসৎ' হয়, তবে একই সঙ্গে তাকে 'সৎ' বলা চলে না। দুটা বিরুদ্ধ আখ্যা বা বিশেষণের মধ্যে যদি একটি সত্য হয়, তবে অন্যটি সত্য হতে পারে না; এবং একই সময়ে ও একই অর্থে দুটো বিশেষণ বা আখ্যা একত্র সত্য হতে পারে না। সৎ ও অসৎ, নশ্বর ও অবিনশ্বর, সসীম ও অসীম ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বিশেষণগুলো একই সময়ে ও একই অর্থে কোন বস্তু সম্বন্ধে আখ্যান করা চলে না; অবশ্য বিভিন্ন কালে ও ভিন্ন অর্থে একই বস্তু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাষণ করা চলতে পারে। একই বস্তু আগে যদি 'সৎ' হয় তবে পরে 'অসৎ' হতে পারে, এতে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কিছু নেই। কোন লোককে আগে "ভালো" বললেও পরে "ভালো নয়" বলা যেতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে একই সময়ে 'ভালো' এবং 'ভালো নয়' বলা চলতে পারে না। স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন এই Law of Contradiction কে নাম দিয়েছেন "Law of non-contradiction." বা অবিরোধ নীতি। তিনি বলেন, সুসঙ্গত (consistent) চিন্তা করতে হলে পরস্পর বিরোধী চিন্তাকে বর্জন করতে হবে। কোন চিন্তা বা মনন যদি নিজেকেই খণ্ডন করে বা বিরোধিতা করে, তবে মনন নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়। পরস্পর বিরোধিতার অভাব (absence of contradiction) সকল প্রকার চিন্তা ও মননের একমাত্র শর্ত (condition)।* সকল মননের এই নীতিই হলো একমাত্র ভিত্তি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই দ্বিতীয় নীতিটি প্রথম নীতিরই (Law of Identity) আরেকটি রূপ মাত্র। আসলে Law of Identity (অভেদ-নীতি) এবং law of Contradiction (বিরোধ-নীতি) কিছু আলাদা নীতি নয়, তারা একই নীতির এপিঠ ওপিঠ মাত্র। যদি কোন বস্তু কেবল ঠিক সেই বস্তুটিই হয়, তবে সে বিপরীত বস্তু হতেই পারে না। একই তত্ত্বকে অস্তিমূলক ভাষায় বললে হয়ে দাঁড়ায় 'অভেদ নীতি' এবং নাস্তিমূলক ভাষায় হয় 'বিরোধ নীতি'। জন স্টুয়ার্ট মিল-ও তাঁর "Examination of Hamilton's Philosophy বইতে অনুরূপ কথাই বলেছেন ‡

(৩) Law of Excluded Middle:

এই নীতি বলছে কোন বস্তু হয় ঠিক সেই বস্তুই নতুবা সেই বস্তু নয়; এছাড়া কোনো তৃতীয় সম্ভাবনা সেই বস্তুর নেই বা হতে পারে না। † দুটা বিরুদ্ধ বিশেষণের মধ্যে হয় একটা

---

* "absence of contradiction as an indispensable condition of thought" (Hamilton Lecture III p. 81-82)

‡ "The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible" (pp. 471-72)

† A thing is either the given thing or something other than that given thing; there is not and cannot be any middle course.

নয় অন্য বিশেষণটা প্রয়োজ্য হবে ; এই দুটো ছাড়া তৃতীয় বা মধ্যবর্তী কিছুই সম্ভব নয়। কোনো জিনিষ যদি 'সৎ' না হয়, তবে নিশ্চয়ই 'অসৎ' হবে ; কিংবা যদি 'অসৎ' না হয় তবে 'সৎ' হবে। 'সৎ ও অসৎ' এই দুটি বিরুদ্ধ আখ্যার একটি প্রয়োজ্য হবেই। কিন্তু 'সৎ হবে না, অসৎও হবে না'—এতদতিরিক্ত কোন তৃতীয় বস্তু হবে কিংবা এ-দুটোর মাঝামাঝি (middle) কিছু হবে তা' একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। 'সৎ ও অসৎ' এই দুটো আখ্যায় আমাদের মনন-জগতের (universe of discourse) সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কাজেই এই দুটো বিরুদ্ধ বিশেষণের মধ্যস্থল বলে কোন জায়গা নেই এবং এদের বাইরেও কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। A হ'ল B অথবা নয় B ; A দুয়ের কোনোটাই নয়, এমন হতে পারে না।*

এখানেও একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই Excluded middle-এর নীতিও দ্বিতীয় নীতিরই অর্থাৎ বিরোধ নীতিরই (Law of Contradiction) রূপান্তর মাত্র। বিরোধ নীতি বলছে, দুটো বিরুদ্ধ গুণের দুটোই কোনও বস্তুর সম্বন্ধে একই কালে সত্য হতে পারে না। 'এখন বহির্ভুক্ত মধ্যপদের নীতি' বলছে, দুটো বিরুদ্ধ গুণের মধ্যে দুটো একই কালে কোনো বস্তুর সম্বন্ধে 'মিথ্যা' হতে পারে না। একটি নীতি বলছে, দুটো বিপরীত বিশেষণ (লাল ও নয়-লাল) একই সঙ্গে বা কালে 'সত্য' হতে পারে না ; একটাই মাত্র সত্য হবে। আর বিরোধ নীতি বলছে, দুটো বিরুদ্ধগুণ একই কালে মিথ্যা হতে পারে না ; একটা সত্য হবেই হবে। এখানে একটা তত্ত্বকে দু'রকম ভাষায় দু'রকম করে প্রকাশ করা হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলছেন, Excluded Middle-নীতি আমাদের এই অধিকার দেয় যে দুটি বিরোধী প্রস্তাবের একটির অস্বীকৃতি স্থলে আমরা অপরটিকে স্বীকৃতি দান করতে পারি।* এই দুটো নীতিই (of Contradiction & of Excluded Middle) প্রথমে আরিস্টট্‌ল্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরা বাস্তবিক পক্ষে একই নীতির দুই দিক মাত্র। Uberweg এই কারণে দুটো নীতিকে একত্র করে একটা পূর্ণাকার নীতি গঠন করেছেন ; তার নাম তিনি দিয়েছেন "Law of Contradictory Disjunction' (System of Logic)। তিনি বলেছেন : "To every definite question, understood in a definite sense, as to whether a given charateristic attaches to a given object, we must reply either yes or no ; we cannot answer yes & no.' (প্রধানতঃ অনুবাদ : System of Logic p. 12, Quoted of Fundamental Principles—'Dialectic & Logic')

দুটো বিপরীত গুণের সম্বন্ধে হয় 'হাঁ' বলতে হবে, নয় 'না' বলতে হবে। হাঁ ও না দুটোই এক সময়ে যেমন বলা চলে না, তেমনি কোনটাই বলব না, এমনও হয় না। কোনও বস্তু সম্বন্ধে একই কালে, হাঁ-ও বলব এবং না-ও বলব এ চলবে না। হয় "হাঁ" নয় "না"—একটা বলা যেতে পারে মাত্র। ‡

* A is either B or else is not B. There can not be middle course ; A cannot be neither

* "The doctorine of Excluded Middle empowers us to substitute for the denial of either of two contradictory propositions the assertion of the other.' (Examination of Hamilton's Philosophy, p.473)

‡ "A is either B or is not B. Any prediocite in question either belongs or does not belong

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে এই তিনটি নীতি (Law of Idnetity, Law of Contradiction, Law of Excluded Middle) বাস্তব পক্ষে একই নীতির তিনটি ভিন্নরূপ মাত্র। এদের আলাদা আলাদা করে দেখা যায় না, কারণ এরা একই অবিচ্ছিন্ন সত্য এবং একটিকে বললেই বস্তুতঃ অন্য দুটোকেও বলা হয়ে যায়। সুসংগত (consistent) চিন্তা বা মননের ভিত্তি এই তিনটি মূল নীতি। এদের ব্যাহত করলে, সকল জ্ঞান এবং মনন আত্ম-বিরুদ্ধতায় (self contradiction) দুষ্ট হয়ে পড়বে; চিন্তায় বা জ্ঞানে সঙ্গতি থাকবে না। এই তিনটি নীতিকে সাধারণতঃ আকারনিষ্ঠ সত্যের (বা Formal Truth-এর) নীতি বা অবরোহ নীতি (Deduction-এর নীতি) বলা হয়ে থাকে। আকারনিষ্ঠ ন্যায়ই এদের আবিষ্কার করেছে—অবশ্য আরোহ ন্যায় (Inductive Logic) এদের বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

আমরা আগেই দেখেছি যে হেগেল পুরোনো ন্যায় অর্থাৎ Formal Logic—যা আরিস্টটল্ থেকে চলে আসছে—তাকে অস্বীকার করে নতুন লজিক গঠনের প্রয়োজন আছে বলে লিখেছিলেন। তিনি 'পুরোনো আকার-নিষ্ঠ' ন্যায়ের নীতিগুলোকে নিতান্ত অকেজো ও প্রাণহীন ("carcases of dead thoughts") এবং অর্থহীন প্রলাপ বাক্য ("babble") বলে অভিহিত করেছেন। হেগেল আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের স্থলে নতুন ন্যায় সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করলেন—তার নাম হলো Dialectic Logic. (দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়)। হেগেলের প্রধান আপত্তি হল আকার-নিষ্ঠ ন্যায়ের ঐ তিনটি মূল নীতি (Laws of Thought) সম্বন্ধে। তিনি বলেন, আকারনিষ্ঠ ন্যায় জগতের ঘটনা ও বস্তুগুলোকে নেহাৎ কাঠখোট্টা ও অনড় অচল করে দেখেছে বলেই এই তিনটি বাঁধা-ধরা, কাঠখোট্টা আইনকে আবিষ্কার করেছে। সব বস্তুকে আলাদা করে, বিচ্ছিন্নভাবে কেটে কেটে দেখলে, তবেই ও-রকম নীতির কথা উঠতে পারে। আসলে, হেগেলের মতে, ও-তিনটি আইন নিতান্ত অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। হেগেল বিরুদ্ধতা (contradiction) শব্দটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর মতে বিরোধ বস্তুটার (contradiction) ওপরে আকার-নিষ্ঠ ন্যায়ের এত বিরাগ একেবারেই যুক্তিহীন; বিরোধকে বাদ দিলেই বরং কোনও মননক্রিয়া বা চিন্তা সম্ভব হয় না। আকারনিষ্ঠ ন্যায় যেমন বলে, বিরোধকে (contradiction) বর্জন করলে, তবেই সত্য-জ্ঞান লাভ হতে পারে তেমনি হেগেলের নতুন লজিক বলছে, বিরোধের (contradiction) ওপরে ভিত্তি করেই সকল মনন সত্যকে লাভ করতে পারে। আকারনিষ্ঠ ন্যায় এবং দ্বান্দ্বিক ন্যায় কাজেই একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখছে এবং এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জন্ম নিয়েছে নব ন্যায়—হেগেলের ডায়লেকটিক। এখন এই ডায়লকটিক কি বস্তু তা-ই এবার আমরা দেখব।

(ক্রমশঃ)

---

to any subject; or—of judgments opposed as contradictories to each other, the one is true, and the other false." (System of Logic p. 275, Uberweg.)

জয়শ্রী

বৈশাখ
১৩৭২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বাংলা সাময়িক পত্র

বিষয় সূচী

রামানন্দ প্রসঙ্গে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : আন্তরিক চিত্র ও স্মৃতিচারণ
সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, রামপদ মুখোপাধ্যায়।

রামানন্দ : প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়্যু
যোগেশচন্দ্র বাগল,

রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী
সুজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

বিচিত্র চিন্তায় ও কর্মে রামানন্দ
দেবদাস জোয়ারদার

সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে

সাময়িক পত্রের আদিপর্ব : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
রমেন্দ্র নারায়ণ সরকার

সাময়িক পত্র : বঙ্কিম পর্ব : হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্র পর্ব : সুখময় মুখোপাধ্যায়

কল্লোল পর্ব : অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

লিটল ম্যাগাজিন : সুশান্ত বসু

সাময়িক পত্র ও রাজনৈতিক চেতনা
পবিত্র কুমার ঘোষ

দাম : ১·০০ সডাক : ১·২৫

জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-৪৭
ফোন : ৪৬-৪১১৬

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : শেষ অধ্যায় (৯০৮ পৃষ্ঠার পর)

করলেন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে কলকাতার মত শোচনীয় ঘটনার হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বাংলা ও কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন। তারপর কেবিনেট মিশনের "ইনুটেনশন" ও কংগ্রেসের তার উপর নিজের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা হোলো ওয়াভেলের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজী ও নেহেরুর ব্যাখ্যা সমর্থন করলো তবে তার সঙ্গে যোগ করেদিল যে "গ্রুপিং" এর ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যার কোনো বিতর্ক উপস্থিত হলে ফেডারেল কোর্টে বিষয়টী মতমতের জন্ম দেয়া হবে এবং তার রায় কংগ্রেসের বিপক্ষে গেলেও মেনে নেয়া হবে। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ বড়লাটকে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হবার মত কোনো কাজ না করতে নির্দ্দেশ দেন এবং অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন করতে বলেন। বৃটিশ কেবিনেটের এই দৃঢ় মনোভাব লীগের উপর কার্যকরী হোলো এবং লীগ একজন তপশীলী হিন্দু সহ ৪ জন মুসলমান সদস্যের নাম পাঠালো। তবে এই অন্তর্বর্ত্তী সরকার কোনো সময়েই কেবিনেটের যুক্ত-দায়িত্বের নীতি অনুসরণ করেনি। সম্পূর্ণ পৃথক দুটী ব্লক, কংগ্রেস ও মুস্লিম-ব্লক নিজ নিজ নেতৃত্বের অধীনে কাজ করতে লাগলো। ফলে প্রতি ছোট বড় সব বিষয়ে সদা সর্বদা সংঘর্ষ লেগে থাকলো এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও লেগেই রইলো। মুস্লিম লীগ মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের সংঘর্ষ পাকিস্তান লাভের জন্ম সর্ব-ভারতীয় সংগ্রামের অংশ। বিহার, আহমেদনগর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি হিন্দু প্রধান স্থানে মুসলমানদের উপর হিন্দুরা প্রতিশোধ নিল। পার্থক্য এই যে এসব স্থানে সরকার, বড়লাট ও নেহেরু কঠিন হাতে এই সাম্প্রদায়িক কর্মকলাপ দমন করলেন কিন্তু কলকাতা ও নোয়াখালিতে সরকার কোন প্রকার কার্যকরী পন্থাই গ্রহণ করেনি। .এই সময় গান্ধিজীর পায়ে হেঁটে প্রথমে নোয়াখলিয়ে গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুস্লিম মৈত্রীর বাণী প্রচার, পরে বিহারেও ঘোরার মধ্য দিয়ে তাঁর চারিত্রের মহত্ত্ব চিরদীপ্যিমান হয়ে আছে—বাস্তব ফল লাভ যদিও বেশী কিছু হয় নি। এর পর গণ-পরিষদ আহ্বান করার বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনো মতৈক্য হোলো না কিন্তু ভারত সচিবের দৃঢ়তায় ৯ই ডিসেম্বর গণ-পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান করে সদস্যদের ২০শে নভেম্বর নিমন্ত্রণ পাঠান হোলো। মুস্লিম লীগ গণ-পরিষদে যোগ না দেবার সিদ্ধান্তে অটল রইলো। ১৯৪৬ ৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ সরকারের ঘোষণায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ কথাটী উল্লিখিত হোলো যে যদি গণ পরিষদ এমন কোনো সংবিধান প্রস্তুত করে যাতে ভারতীয়দের একটী বড় অংশ, অংশগ্রহণ করেনি তবে সেই সংবিধান অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর করে চাপানো হবে না। নিঃসন্দেহ এই ঘোষণা জিন্নার পক্ষে জয় সূচিত করলো। এ সত্ত্বেও মুস্লিম লীগ গণ-পরিষদে যোগ না দেবার সিদ্ধান্তে অটল রইলো। কংগ্রেস ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা অন্তর্বর্ত্তী সরকার থেকে মুস্লিম লীগের পদত্যাগ দাবী করলো। অথবা বিকল্পে কংগ্রেস পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। এই গুরুতর মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের তারিখ অবিলম্বে স্থির করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যদিও ওয়াভেল এতে একমত ছিলেন না। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনো প্রকার সমঝোতার পূর্বে বৃটিশের ভারত ত্যাগ অনুচিত হবে বলে তাঁর মত ছিল, শেষ পর্যন্ত এটলীর মত পরিবর্তিত করতে না পেরে ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন। এবং এট্‌লী ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ হাউস অব কমন্সে একটী ঘোষণায় বললেন ১৯৪৮ এর জুনের আগেই বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করবার ইচ্ছা এবং ভারতের জনসাধারণের স্বার্থে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কার নিকট হস্তান্তরিত হবে এর পূর্বেই

স্থির করতে হবে। এই কাজটা করার দায়িত্ব নিয়ে ১৯৪৭ মার্চে ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এলেন। মুস্লিম লীগ পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে সিন্ধুতে মন্ত্রীত্ব সুদৃঢ় করলো, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পেল। মুস্লিম লীগ পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে ভাঙতে না পেরে সেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করলো এবং শেষপর্যন্ত লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করলো। শিখেরা প্রবলভাবে বাধা দিল, পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল এবং সরকারি হিসাবেই দুহাজারের উপরে হত ও এক হাজারের উপর গুরুতর ভাবে আহত হোলো।

এই সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ই মার্চ ১৯৪৭ এ একটি প্রস্তাবে পাঞ্জাবকে মুস্লিম-প্রধান ও অমুস্লিম প্রধান এই দুই ভাগে বিভক্ত করবার এবং বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা যদি বাধ্য করে তবে সেখানেও অনুরূপভাবে ২টি প্রদেশে বাংলাকে বিভক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করলো। পাকিস্থানের জন্ম সম্পূর্ণ হলো। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে দুই পুরোধা প্রদেশকে বিভক্ত করে জীবন্মৃতের চাইতেও হীনতর অবস্থায় ফেলে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করলো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং তার ফাঁদে অবলীলাক্রমে পা দিলেন "অহিংস" উপায়ে স্বাধীনতা লাভ ও ক্ষমতালাভে লোলুপ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। জয় হোলো প্রতিক্রিয়ার ও বৃটিশ কূটনীতির। অর্দ্ধ শতাব্দী জুড়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, ১৯২৯এর পর থেকে ২৫ বৎসর ধরে গণ-সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অসহযোগ, আইন-অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০ ও পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী ও আত্মাহুতি, ১৯৪২এর "ভারতছাড়" আন্দোলনে শক্তিবাদী বিপ্লবাত্মক ও অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের অপূর্ব সংমিশ্রণ, এবং ভারতের বাইরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দঃ পূঃ এশিয়ায় জীবনপণ ভারতের মুক্তি সংগ্রাম এই দীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি কি এই ছিল, এরই জন্য কি চল্লিশ কোটি ভারতবাসী সর্বপ্রকার সম্ভাব্য অ-সম্ভাব্য আত্মত্যাগ করেছে? অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সক্রিয় সাহায্যে দেশ-বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের নজীর আর জানা নেই আমাদের। মসলের বইতে উদ্ধৃত নেহেরুর জীবনী লেখক মাইকেল ব্রিচারের প্রশ্নের উত্তরে দেশবিভাগে রাজী হবার কারণ সম্পর্কে নেহেরুর উত্তর:

"The truth is that we were tired men, & we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again & if we had stood out for a united India as we wished to, prison obviously awaited us. We saw the fires burning in the Punjab and heard every day of the killings. The plan for partition offered a way out & we took it."

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান যোদ্ধার মুখে এক আশ্চর্য উক্তি। একটি জাতির ইতিহাস কি একটি ব্যক্তির শ্রান্তি, ক্লান্তি, বার্দ্ধক্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, না হওয়া উচিত? এই একটি উক্তি দ্বারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের উপর মালিকর সমাপ্তি টেনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশ ও প্রদেশ বিভাগ কি বাস্তবিক পক্ষে "offered a way out", সীমান্তের দু পারে রয়ে গেল ভারতে ৭ কোটি মুসলমান, পূর্ব পাকিস্তানে

এক কোটি হিন্দু—এই ১৮ বছরে দফায় দফায় চলেছে সংখ্যালঘু নিধন নারী ও শিশুদের উপরে পৈশাচিক অত্যাচার পাকিস্তানে, আর তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও ঘটেছে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হত্যা। এবং অনুমান করা কিছু কঠিন ছিল না, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব কি করে আশা করলেন অ-সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের আবহাওয়া ও পরিবেশ প্রস্তুত করবেন ভারতে, অথবা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পাকিস্তান অস্থায়ী হবে যা নেহেরু বলেছিলেন ত্রিচারকে। তার সবচেয়ে আশ্চর্য গান্ধিজী এই দেশবিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের ঘোরতর বিরোধী হয়েও কি কারণে এ আই সি সিকে দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায়নি আজও।

প্যাটেল ও নেহেরু দেশবিভাগ গ্রহণ করার পরেও গান্ধিজী তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন আজাদ। ১৯৪৭ ৩১শে মার্চ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লীতে এলেন গান্ধিজী—গ্রন্থকার আজাদের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন

"I went to see him (Gandhiji) at once & his very first remark was Partition has now become a threat. It seems Vallabhbhai, & Jawharlal have surrendered. What will you do now, will you stand by me or have you also changed?"

I replied, 'I have been and am against partition. Never has my opposition to partition been so strong as to-day......my only hope now is in you. If you stand against partition, we may yet save the situation. If you however acquisce, I am afraid India is lost.'

Gandhiji said "What a question to ask? If the Congress wishes to accept partition it will be over my dead body. So long as I am alive I will never agree to the partition of India. Nor will I if I can help it, allow Congress to accept it."

তার পরদিন আজাদ দেখা করতে গিয়ে গান্ধিজীর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন দেখেন এবং অত্যন্ত চকিত হয়ে শোনেন গান্ধিজী প্যাটেলের যুক্তি গুলিরই পুনরাবৃত্তি করছেন। কিন্তু বিদগ্ধ গ্রন্থকার বলছেন যে প্রাপ্ত নথীপত্রের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় গান্ধিজীর মতামতের পরিবর্তন এত অকস্মাৎ বা এত পরিপূর্ণভাবে হয়নি। বরং শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ বিভাগকে বাধা দিয়ে এসেছিলেন এবং প্রার্থনা সভাতে পার্টিশনের বিরুদ্ধে প্রচার করে যাচ্ছিলেন, যার জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ আপত্তি করছিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তারও গান্ধিজীর দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে মতই প্রকাশ পেয়েছে। লেখিকার ব্যক্তিগত সাক্ষ্যও হয়তো অবান্তর হবে না। ১৯৪৭ এর ১৪ই ও ১৫ই জুন দিল্লীতে এ আই সি সিতে ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হবে। শেষ চেষ্টা হিসাবে গান্ধিজীর নিকট পাটনায় যাওয়া স্থির করে গান্ধিজীকে তারিখ দেবার জন্য তার করলাম। উত্তর এলো যে কোনো দিন পাটনায় গিয়ে দেখা করবার জন্য। ১৮ই কি ১৯শে জুন ১৯৪৭ পাটনায় গেলাম আমি ও অনিলবাবু। দর্শনপ্রার্থীদের বসিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা হোলো। গান্ধিজীর স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার পরিবর্তে তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম। দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন What is the result of the gallup poll? অমৃত বাজার পত্রিকা তখন gallup poll নিচ্ছে দেশ বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের সপক্ষে—সেদিনই শেষ ফলাফল বের হবার কথা, গান্ধিজীর প্রশ্ন সে সম্পর্কে। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে

সহরে সহরে তখন বহু সভা সমিতি করে চলেছি আমরা জনমত সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে। পাঁচ, দশ হাজার করে জনতা এসেছে সে সব সভায়, কিন্তু কোনো কাগজে তার এক লাইন বিবরণ প্রকাশ পায় নি। সেদিন আমাদের ক্ষমতা হয়নি দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলবার। তীব্র প্রতিবাদ ও দৃঢ়ভাবে বিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত করা ছাড়া আমরা—যারা নেতাজীর নেতৃত্বে চলছিলাম তারা আর কিছু করতে পারি নি সেদিন। এর জন্য সংবাদ-পত্রগুলিতে দেশদ্রোহী, মুস্লিম লীগের চর ইত্যাদি আখ্যা ছাড়াও আরো বহু দুর্ভোগ জুটেছিল আমাদের ভাগ্যে। যাক সেকথা।

দেশ ও প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের উত্তেজিত যুক্তিকে থামিয়ে দিয়ে গান্ধিজী বল্লেন "I am much more against partition than you are" বিশেষ করে বল্লেন বাংলার কথা "Bengal will rue the day the partition takes place" সাগ্রহ দাবী জানালাম আপনি কেন তবে প্রতিবাদ করছেন না—আপনার মত কেন প্রকাশ করছেন না? গভীর বেদনার সঙ্গে বল্লেন "my lips are sealed. You go to Pandit Nehru & Sarder Patel. "তোমরা যদি দেশ বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পার আমি তার নেতৃত্ব নেব।" বল্লাম এত দ্রুত সব হয়ে যাচ্ছে, সময় কোথায় জনমত তৈরী করবার। গভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে বল্লেন "Who is going to give you time." চলে এলাম।

গান্ধিজীর ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও A. I. C. C. তে কেন তিনি দেশ বিভাগের সপক্ষে মত দিয়েছিলেন সেটা চিরদিনের জন্য হয়ে থাকবে এক ঐতিহাসিক বিষয়। গান্ধিজীর একান্ত অনুগত শিষ্য—যিনি নোয়াখালী পদযাত্রার সময় তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন—অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু My last days with Gandhiji পুস্তকে গান্ধিজীর এই বিস্ময়কর কাজের পেছনে সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন হয়তো বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে গান্ধিজী তাঁর দীর্ঘ দিনের বিশ্বস্ত একান্ত অনুগত অনুসরণকারিদের মতামতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রতিষ্ঠিত করবার মত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে পারেননি, অথবা এতদিন ধরে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুলে ছিলেন সেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে জাতিকে নেতৃত্বহীন করতে চান নি বা উভয় কারণই মিলিতভাবে তাঁর সে সময়কার মানসিকতার জন্য দায়ী। সে যা হোক ভারতের ভাগ্য-বিধাতা সেদিন নিশ্চয় শেষ প্রতিরোধ প্রত্যাশা করেছিলেন সত্যনিষ্ঠ, মানব-প্রেমিক গান্ধিজীর নিকট থেকে কিন্তু সেই শেষ প্রত্যাশাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

বিদগ্ধ গ্রন্থকার ঊনবিংশতি শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের অবাস্তব মতবাদ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব পরিচালিত হয়েছিলেন, যদিও বরাবরই বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল এবং সেই পার্থক্যকে স্থায়ী করবার জন্য ইংরেজের চেষ্টার অন্ত ছিল না যেমন মিন্টোর পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী যা পরবর্তীকালে কংগ্রেসও স্বীকার করেছে। তারপর ঊনবিংশতি শতকের সূচনায় স্যার সৈয়দ আহমেদ ও বিংশতি শতকের সূচনায় জিন্না কর্তৃক দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার, কংগ্রেস যা মতে না হোক আচরণে স্বীকার করে নিয়েছে। ১৯৩৪ সনে মুসলমানদের সম্মতি ব্যতীত ভারতীয় সংবিধানের কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কংগ্রেস গ্রহণ করবে না বলে স্বীকৃতি দেয়, ১৯৪২ এ ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি দেশ বিভাগ চায় তবে দেশ বিভাগ তাদের দিতে হবে বলে গান্ধিজীর উক্তি এবং ১৯৪৪ এ দেশ

বিভাগের ভিত্তিতে জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনা, ১৯৪৫ এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ যে ভারতের কোনো অংশের জনসাধারণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাখার কথা কংগ্রেস ভাবতেও পারে না, পাকিস্তানে স্বীকার করাই হিন্দু মুস্লিম সমস্যার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান বলে রাজগোপালচারীর সুপারিশ, ১৯৪৬এর জানুয়ারীতে নেহেরুর পাকিস্তানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয়া, ১৯৪৭ এর মার্চে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাবকে (অতএব বাংলাকেও) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করবার প্রস্তাব স্বীকার করে নেয়া—এই সমস্ত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকারের সহিত একমত না হয়ে উপায়ন্তর নেই যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতিনিধি—কংগ্রেস বাক্যে ও প্রকাশ্যে অস্পষ্ট অবাস্তব লক্ষ্য উচ্চারণ করেছে কিন্তু আচরণে ও কাজে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অনুসরণ করেছে। কংগ্রেসের আগাগোড়া আচরণে মুসলমানদের খুশী করবার, তাদের অন্যায় দাবী স্বীকার করে নেবার পক্ষে যতটা আগ্রহ, বহুগুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও অ-মুসলমান জনসংখ্যার মতামত, স্বার্থ ও ভবিষ্যৎকে রক্ষা করবার দায়িত্ব বোধ সমপরিমাণে দেখা যায়নি; অথচ ডিমোক্রেসী—গণতন্ত্রের-নামে তাঁরা এসব করে এসেছেন। অনিচ্ছুক অংশের উপর কিছু চাপিয়ে না দেওয়া সম্বন্ধে তাঁদের দৃঢ়তা দেখা গেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু হিন্দু ও অ-মুসলমানদের মতামত তাঁরা কোনো স্তরে নিয়ে ছিলেন কি? নেবার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন কি? ভারতের চার হাজার বছরের ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ধর্মগত সত্তাকে বিনা মূল্যে অতি সহজে ক্ষমতা লাভের লুব্ধতায় বিভক্ত করবার অবিমৃষ্যকারিতা শুধু নয়, গর্হিত অন্যায় তাঁরা করেছেন এই ভূভাগের ভবিষ্যৎ অধিকারীদের উপর সে কথা ভুলতে পারি না আমরা। দেশকে সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাগ করে তারপর অ-সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয় ঐক্যের ফাঁকা বুলি কার্যকরী হবে এটা আশা করা কি খুব বেশী নয়? গান্ধিজীর ঐতিহ্যের কথা—ও "নেহেরু নীতির" কথা এই ১৮ বৎসর ধরে অহরহ জাতি শুনছে—কি সে ঐতিহ্য? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাধান ও শেষ ফল, কি অহিংসার পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে হয়েছে? ভারত ইতিহাস পরিক্রমা করে কি তারই প্রমাণ পাওয়া গেল? এই বিশ্লেষণ দিয়েই কি আগামী দিনের—ভারতীয় তরুণ তরুণীদের প্রত্যয় আনা যাবে এবং কোনো স্থির লক্ষ্য দেয়া যাবে? গত ১৮ বৎসরে কি উপস্থিত করেছেন তাঁরা দেশের সামনে—অনবরত পরস্পর-বিরোধী উপদেশ ও গোঁজামিল অবাস্তব নীতি ছাড়া? অসংখ্য সমস্যার মধ্যে মাত্র কয়েকটা সমস্যাকে রাখছি। একটা স্বাধীন দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও প্রধানতম জাতীয় কর্তব্য হিসাবে (১) সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নবলব্ধ স্বাধীনতা ও দেশের সুরক্ষায় কি ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা গত ১৮ বৎসরে? "নেহেরু নীতির" হাবাহীন ষ্টিম রোলার জাতির ভাগ্যে জুটেছে এবাধিক্রমে গত ১৮ বৎসর। কিন্তু ১৯৬২র চীনা আক্রমণের ধাক্কায় তাসের ঘরের মত কি ভেঙে পড়েনি জাতীয় সুরক্ষা, প্রস্তুতি ও সতর্কতা অভূতপূর্ব জাতীয় উদ্বেলতা দেখা দিয়েছিল সেই আক্রমণের মুখে কিন্তু অর্থ ও অলঙ্কার ভিক্ষা করা ছাড়া নেতারা দেশের তরুণদের দ্বিধাহীন কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন কি দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিতে? সে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি বা মেরুদণ্ড এঁদের নেই। সে সময় আমাদের সহকর্মীরা উত্তর-পূর্ব-সীমান্তে গিয়ে দেখে এসেছেন জাতীয় প্রস্তুতি ও তার অবস্থা। সে সম্পর্কে লোকসভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে "নেহেরু নীতির" আক্রমণে তাঁদের বিধ্বস্ত হতে হয়েছে—কিন্তু দেশের শত্রুদের তারা বিধ্বস্ত করতে পারেনি দেশের সীমান্তে। পরম দেশপ্রেমিকদের "যুদ্ধবাজ" war-psycosisএর প্রবক্তা ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে নির্বোধ সমর্থকদের হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু দলের

স্বাধীনতা, মর্য্যাদা, সম্মান ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করতে পেরেছেন কি?

(২) জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নবলব্ধ স্বাধীনতা লাভের পর কি কি উপায় বাস্তব অবলম্বন করেছেন নেতারা যাতে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়? ভাষাগত প্রদেশ গঠনই কি দেশের সামনে সর্বাপেক্ষা বড় ও আশু মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করছিল? কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অতএব একে পূরো করতে হবে এটা একেবারেই কাঁচা কথা। আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যথা দেশ থেকে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করবে, শোষণ বন্ধ করবে—সেসব প্রতিশ্রুতি কি গত ১৮ বৎসরে কার্যকরী করা হয়েছে? (৩) উদ্বাস্তু নেতাদের ক্ষমতা লুকতার জন্য যে পাঞ্জাব ও বাংলার প্রায় ১ কোটির বেশী "স্বাধীনতা যোদ্ধা" ও তাঁদের বংশধরেরা হতাহত, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত ও লক্ষাধিক তরুণী ধর্ষিত, অপহৃত, মানুষের ধারণার অতীতভাবে নিগৃহীত, খোলাবাজারে ছাগল ভেড়ার মত বিক্রীত হয়েছে সেই বর্তমান স্বাধীন ভারতের ঘৃণার পাত্র উদ্বাস্তুদের জন্য কি করেছেন তাঁরা? মনে পড়ে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবসের রাত ১২টা, সেদিনটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম ঢাকায় থাকার জন্য এক বন্ধুর খোঁড়ায় আমাদের হৃত অধিকার, অত বিপর্যস্ত ভাইবোনদের পাশে দাঁড়াবার তাদের বেদনা অপমান, বিপদের সাক্ষী হবার জন্য। তাদের সেবা করবার, ভালবাসবার অধিকার নিয়ে বিনিদ্র রাত্রির মধ্য প্রহরে শুনলাম বেতারযোগে ভেসে এলো নেহেরুর কণ্ঠস্বর — "We think of our brothers & sisters who have been cut off from us by the political boundaries & who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us & will remain of us whatever may happen & we shall be sharers in their good & ill fortune alike" তারপর কয়েক দফা genocide এর আঘাত পেয়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও অ-মুসলমানেরা। বারবারই ভারতের ক্লীব নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন ঐ হতভাগ্যদের ভারতে আসতে দিতে ভারতের "অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে" সেই অজুহাতে এবং আরো বহু উচ্চাঙ্গের যুক্তি দিয়ে। যেমন ১৯৫০ এর ৭ই মার্চ পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্গীয় মেঘনাদ সাহা প্রমুখদের সঙ্গে একটি ডেপুটেশন নেহেরুর নিকট নিয়ে গিয়েছিলাম — পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানিয়েছিলাম সুদৃঢ় ভাষায় মুহূর্তের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর মনুষ্যত্ব বোধহয় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "other methods" নেবার হুমকি শোনা গিয়েছিল ঐ একবারই তাঁর কণ্ঠে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী আচরণে নিশ্চিত জেনেছি সে উক্তি ছিল মুখের কথা, অন্তরের ভাষা নয়, বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় সংকল্প ত নয়ই। ঠিক পরবর্তী কালে এমন সব বিস্ময়কর যুক্তি দিয়েছিলেন যথা বাংলার স্বার্থ দেখা যেমন তাঁর কর্তব্য তেমনি সারা ভারতের প্রতিও তাঁর দায়িত্ব রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। সর্ব ভারতের সম্মতি ব্যতীত ২১ পারসেন্টের জন্য ৭৯ ভাগ জনতার স্বার্থে জলাঞ্জলী দিতে পারেন না তিনি। এ ধরণের যুক্তির অভিনবত্বে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, জাতীয় স্বার্থকে নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে নয়, বণিক বুদ্ধিতে লাভ ক্ষতির অঙ্ক দিয়ে দেখতে হবে। দেশ আক্রান্ত হলে নিশ্চয়ই সেই একই যুক্তি দিয়ে কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে "মিটিয়ে ফেলাও" এঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কথায় কথায় এঁরা গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করেন। কিন্তু তাঁর যথার্থ মতাদর্শকে কখনো কি জাতির সামনে রেখেছেন এঁরা? আজ বন্ধ করে দিয়েছেন সীমান্তের পথ — ক্লীব কাপুরুষেরা সে নিয়ে গুরু গম্ভীর বাক্ বিস্তার করতে লজ্জা বোধ করেন না। গান্ধীজীর হিংসা অহিংসার নীতিকে

আমরা যুক্তিনির্ভর কোনো দিনই মনে করিনি, করতে পারবো না, কিন্তু তাঁর তথাকথিত অনুগামীদের সঙ্গে যে তাঁর বহু যোজনের দূরত্ব ছিল সে বিষয় ভারত ইতিহাস পরিক্রমায় বহু সাক্ষ্য পেয়েছেন পাঠকেরা। এ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ। আজ তাঁদের উপহার দিচ্ছি গান্ধিজীর কয়েকটি উক্তি। ৩রা জুন ১৯৪৭সনে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে যখন জানান যে কংগ্রেস দেশ বিভাগে রাজী হয়েছে সে সম্পর্কে মহাত্মাজীর প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ "to yield even an inch to force of circumstances was wholly wrong. The Working Committee holds that they had to yield to force of circumstances পুনরায় ২৭শে জুলাই ১৯৪৮ এর হরিজন পত্রিকায় কারো সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গান্ধিজী বলেছিলেন "the leaders had agreed to partition as the last resort. They did not feel they had made a mistake. Rather than let the whole country go to the dogs, they agreed to the partition, hoping to give the conutry a much needed rest. He felt differently. He had said that he would rather let the whole country be reduced to ashes than yield an inch to violence. ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ এর আর একটি উক্তি "I was against war in any form. But if there be no other means of securing justice from Pakistan, if Pakistan refuses to admit her misdeeds & wants to minimise their gravity, then the Indian Union will have to fight against Pakistan. War is no joke, no one wants war. But I shall not advise anybody to submit to wrong.

এর পরিপ্রেক্ষিতে নেহেরু নীতির একটা সাক্ষ্য দেয়া নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না ১৯৫২ ১৬ই অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বাদে, সর্বদলীয় জনসভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে অর্থনৈতিক অবরোধের যে দাবী উত্থিত হয়েছিল তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন কোনো কঠোর নীতি আমরা নিতে পারি না, ভারতবর্ষ শক্তিশালী—দুর্বলের নীতি হচ্ছে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কিন্তু সবলের নীতি সংগ্রাম ও সংঘর্ষের পরিবর্তে "healing touch" সে healing touch এর আস্বাদ পাচ্ছে আজ ১৮ বৎসর ধরে পূর্ব পাকিস্থানের দুর্ভাগা মানুষ, পুরুষ, নারী, শিশু। সম্প্রতি এই ১৯৬৪র জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত সরকারী হিসেবেই ৬লক্ষের অধিক ভারতে এসেছে। হত হয়েছে দশহাজারের বেশী World Jurists' Commision এর ভারতীয় শাখা কর্তৃক একমাস ব্যাপী দণ্ডকারণ্যে মানা ও কুরুদ ক্যাম্পে সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবী ১২ জন নারী পুরুষের একটি দল সাহায্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নিয়েছিলেন হাজার হাজার নারী পুরুষের – তার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে Indian Jurists Commision এর সম্পাদক পুরুষোত্তম ত্রিকমদাস কর্তৃক – ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের সে সম্পর্কে বক্তব্য কি? কোন্ healing touch এর যাদুদণ্ড এদের জন্য ব্যবস্থা করবেন এই স্বার্থান্ধ দুর্বৃত্তেরা বা কারা? তাঁরা কি মনে করেন তাঁদের ছেঁদো আত্মতুষ্টির নজীরে দেশের লোক মাথা নেড়ে বলবে আহা! কি মহান নীতি!

(৪) হিংসা ও অহিংসা—কবে শেষ হবে এই ধোঁয়াটে অবাস্তব নীতি, প্রতিরক্ষার ব্যয় বাড়াব পৃথিবীর যত দেশ রয়েছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যাব শস্ত্র ভিক্ষা করতে, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী না করার নীতি নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করবো, কিন্তু লজ্জাহীনের মত পারমাণবিক শক্তিগুলির "ছত্রচ্ছায়া" দাবী করে নিজেদের সুউচ্চ নৈতিক

মান নিয়ে বড়াই করবো ! জোয়ানদের অপ্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যু মুখে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না দেশ "নেহেরু নীতি"র দৌলতে শত্রু মনোভাবাপন্নদের দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে গেল৭ সে সম্বন্ধে "অস্তিচেপাবীন' নীতি অবলম্বন করবো না হয় সর্বত্র "অর্ক্ষ তেজভির" বিজ্ঞতা প্রয়োগ করে দেশের ভূমিকে শত্রুদের দিয়ে দিতে দিতে শূন্যে গিয়ে ঠেকবো ! কতদিন আর এসব লুকাচুরি চলবে দেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে ! মনে পড়ে গত চীনা আক্রমণের সময় নেফা সীমান্তে ভ্রমণকারী সহকর্মীদের নিকট ভারতীয় জোয়ানদের প্রতিনিধিরা বলছিল "সামনের দিক থেকে আক্রমণকে আমরা ভয় পাই না, ভয় পাই আমাদের পেছন দিক থেকে ছুরি মারার !" নেতারা উত্তর দিন কি তাঁদের নীতি ? অহিংস থাকার সুনাম রক্ষার জন্য পরের দেশের ছেলেরা এসে তাঁদের শত্রুদের বিতাড়িত করে তাঁদের ভিটেমাটি রক্ষা করবে ? আর কতদিন লোকসভা, বিধান সভার মঞ্চে মঞ্চে আত্মস্তুতি শুনবে দেশ ? দেশ এদের সরিয়ে দিয়ে হিংসা-অহিংসার ধোঁয়াটে নীতি নয় বাস্তববাদী সুস্পষ্ট মনুষ্যত্বের নীতি অনুসরণ করবে কবে ?

(৫) দুর্নীতি—দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করবার জন্য মন্ত্রী মণ্ডলীর কি ব্যাকুল আকুতি, বিভিন্ন সময়ে "সদাচারের" আচরণ বিধির ফর্দ অবিরত দেশের সামনে রাখা হচ্ছে অথচ এবারকার লোকসভায় উড়িষ্যার দুই মুখ্যমন্ত্রীর সদাচারের যে পরিচয় পেয়েছে দেশ সি বি আই রিপোর্ট ফাঁস হবার মাধ্যমে তার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উক্তি ও ব্যবহার নিশ্চয়ই দুর্নীতি দূর করবার পক্ষে সদৃঢ়, সক্রিয় ও শক্তিশালী পদক্ষেপ নয়। এই রিপোর্ট ফাঁসের জন্য শ্রীকামাথ ও শ্রীদ্বিবেদী সমস্ত দেশের ধন্যবাদার্হ। উড়িষ্যার এই দুই মন্ত্রীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন সর্বভারতীয় সোদিও প্রতাপ বঙ্গীয় কংগ্রেসী নেতা—অতুল্য ঘোষ—ঐ দুই মহানচরিত্রকে "চরিত্র হত্যা"র শিকার হতে দেখে। এদেশেই ক্ষুধার্তের খাদ্যে ও রোগীর ঔষধে বিষাক্ত ভেজাল দেয়া হয় এবং এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনামাত্রে শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত ব্যক্তিদের অ-কৃপণ সার্টিফিকেট সদা উদ্যত হয়েই থাকে ! এরপর এঁরা যখন সদম্ভে ঘোষণা করেন কংগ্রেসের নির্বাচনী জয় সাম্প্রদায়িকতা, নীতিহীনতা ও শোষণকারী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে জনমতের রায়—তখন এঁদের মস্তিষ্কের তারিফ করতে হয়। কিন্তু এইসব সদম্ভ ঘোষণা দ্বারা ঘনায়মান বিপদ থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে তো ? এ দেশটা তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয় বা দেশের কোটি কোটি জনতা তাঁদের প্রজা নয়। আজকের তরুণতরুণীরা জীবনপণ করে তার প্রমাণ নিশ্চয়ই দেবে। যেমন দিয়েছে ভারতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে দুর্যোগের দিনে যুগে যুগে ভারতের তারুণ্য শক্তি, যেমন দিয়েছেন এ যুগে ভারতের জাগ্রত মনুষ্যত্বের প্রতীক, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন চির সংগ্রামী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, জীবনপণ আত্মদান, আদর্শ অনুসরণে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, ভারতের আগামী দিনের ইতিহাস স্রষ্টাদের পথের নির্দেশ ও অভ্রান্ত লক্ষ্য দেবে।

মুখবন্ধে প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার একটি সুবিখ্যাত সংস্কৃত উক্তির উল্লেখ করেছেন : "there may be somewhere at sometime, somebody who would agree with my views and appreciate them ; for time is eternal and the world is wide and large." —সে কথার উল্লেখ করে শেষ করছি এই দীর্ঘ নিবন্ধ, প্রতি ভারতপ্রেমিক, দেশব্রতীকে তিনখণ্ডে সমাপ্ত এই ইতিহাস পাঠ করবার অনিবার্য কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে। যে নির্ভীকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত সমসাময়িক ইতিহাসের মূল্যায়ন করেছেন গ্রন্থকার, সে মূল্যায়নকে মূলতঃ গ্রহণ করতে পেরে গভীর আনন্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছে লেখিকা।

সমাপ্ত

রক্ত সূত্র

সত্যেন্দ্র আচার্য

তোমাকে কেন, তোমার জন্মের পর থেকেই আমার নজরের ওপর রাখিনি তার কৈফিয়তের অবকাশ এটা নয়। শুধুমাত্র আমার আত্মহননের প্রবৃত্তি নিয়েই তোমার কাছে এই আমার ভূমিকা অনু। এ চিঠি তোমাকে আমি না লিখতেও পারতাম, আমার নজরের ওপর থেকে যেমন করে সব দিনগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে চোখের ওপর শেষ হয়ে গেল— বাকী দিনগুলো এমনি করেই হয়ত ঝরে যেত। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে তুমি কি জানতে, আমার ইচ্ছা, ভালবাসা, আমার এই পৃথিবীর ওপর বেঁচে থাকার অবিরাম আগ্রহ তিলে তিলে কেমন করে আমারই সঙ্গে মরে গেল?

তুমি আমার অনেক আদরের কন্যা অনু। তবু বলতে এখন দ্বিধা নেই সেই তোমার প্রতি আমার কর্তব্য আমি করিনি। কেন করিনি, সে কৈফিয়ত এখন দেবনা। তোমার মা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছ থেকে তোমাকে জেনে নিতে বলতাম। পিতার দাবী নিয়ে কন্যার কাছে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার মাকে আমি প্রাণ ভরে ভালবাসতাম।

তোমাকে ঘিরে, প্রতিনিয়ত মনে পড়ে আমাদের ছোট্ট সংসারটুকু খুব সুখের ছিল। তবু ঘৃণা করতেন তোমার মা একটি লোককে যার প্রবৃত্তি তোমার মাকে শান্তি দিত না। তোমার মা এমন একটা লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বলে খুব বকত, ভীষণ বকত আড়ালে। তোমার মাকে খুব ভালবাসতাম বলে।

তবু এ-লোকটার প্রতি আমার অপরিসীম করুণা ছিল। এই লোকটাকে দেখলেই আমার সমস্ত বিশ্বাস, এই লোকটার প্রতি আমার সহানুভূতি জানিয়ে দিত। ভাবতাম, আহা, ভালবাসা এমিনিই হয়। সব আইন, সব অহঙ্কার, সব দর্প, সবসব যখন ভালবাসার আগুনে আসলে এমনি করে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—তখন বোধহয় এমনিকরেই ভেতরটা কাঁদে তার। তাই বোধহয় সে লোকটাকে কোনদিন, কোন মুহূর্তের জন্যেও তোমার মা সহ্য করতে পারতেন না, তার ব্যর্থতাকে আমি সান্ত্বনা দিতাম। ছিঃ! হাত পেতেছ, তুমি পুরুষ মানুষ না নপুংসক?

এই লোকটাকে তোমার তোমার মা-এর মতই সেই ফ্ল্যাটবাড়ির আরো অনেকে ঘৃণা করত। কেন করত জানি না। আমার ফ্ল্যাটে-ঢুকলেই তোমার মা আমার শাসাত। হয়ত অনেকের মত তোমার মার মা-রো খুব ভয় ছিল— পাছে তার স্বামী এই হীন প্রবৃত্তির লোকটার সঙ্গে মদ খায়, ঘোড়া ধরে, কিম্বা—

কিম্বা তার স্বামী এই হীন প্রবৃত্তির লোকটার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ্যালয়ে গমন করে।

লোকটা কিন্তু আমার চোখে সৎ ছিল। আমার প্রিয় ছিল। কারণ, আমি অসৎ নই ব'লে। ওর বেদনা আমি বুঝতাম। ওর ব্যর্থতা আমি জানতাম। তাই নামমাত্র সহানুভূতির ছোঁয়া দিলেই ও অবলীলায় বলতে পারত, জীবনে কোনদিন ভালবাসবনা যবীন। ওর কণ্ঠস্বর ভেজা ভেজা মনে হত।

আর তত যেন এই নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নির্জন দ্বীপে এই অসহায় লোকটার প্রতি তোমার মা বিরূপ হতেন। কিন্তু

শুধু তোমার মা-এর অপ্রসন্ন দৃষ্টির বাইরে আমার প্রাণের উত্তাপ, আত্মীয়তা ওর দিকে ছুঁড়ে দিতাম।

ঠিক তক্ষুনি পাশের ঘর থেকে উপহাস করতেন তোমার মা। আমাকে। আমার বন্ধুকে। অকারণ কিছু সুর আর অনাবশ্যক কাজের শব্দ উঠত ঘরে। কোন কোন দিন তাক্তিলোর আগুনে একবাপ কফি গরম করে এনে সমুখে দাঁড়াতেন। আমি লজ্জায় চোখ বুজোতাম।

কিন্তু চমকে উঠত মণিময় তক্ষুনি। তোমার মা'র ঠোঁটের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে আলতো কথার ঘা দিত। তোমার মা'র ঠোঁট থেকে ঝরে পড়া জলতরঙ্গ যেন আত্মহারা হয়ে শুনত মণিময়। আমি বলতাম, কফি যে তোমার জুড়িয়ে যাচ্ছে মণি?

যাচ্ছে, না?

যাচ্ছে না?

যাক। মণিময় তাকাত আমার চোখে।

যাক, যাক। তোমার মা হাসতেন।

আমি বিরক্তি প্রকাশ করতাম। "খেয়ে নিলেই ত পার।" ফ্যাল ফ্যালকরে শুধু আমার চোখে তাকিয়ে থাকত মণিময়। 'কি।'

বোধ হয় কিছু বলতে চাইত মণিময়; বুঝতাম। কিন্তু গলা দিয়ে কিছু শব্দ বেরোবার আগেই তোমা মা হাসতেন। বুঝতাম ঠোঁটের ডগা পর্যন্ত উঠে আসা কথাগুলো আবার মণিময় চালান করে দিচ্ছে পেটের ভেতর।

তোমার মার শরীরের উঁচু-নীচু ভাঁজে ভাঁজে শাড়িটা লেপ্টে আছে দেখত। মায়ের শরীরের ওপর যত লাবণ্য তা যেন চোখ দিয়ে চাটত মণিময়। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে তোমার মার সাদা আঙুল, গলার নিচেটা, চোখের মণি আর সাদা ঘাড় দেখত বুঝতাম।

তোমার মা ঘৃণা করছে বুঝতাম। তোমার মার কপালের উপর বিরক্তির চিত্র ফুটলে মণিময় তখন তাক্তিলোর আগুনে তৈরী করা কফির এক চুমুক জিভের ওপর তুলে নিত, নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। বহুক্ষণ পরে কফিটুকু পেটের দিকে টেনে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে বলত, তুমি যে কত সুখী রবীন।

কেন? আমি অস্পষ্ট উচ্চারণ করতাম। হাসতাম।

নয়? আমার হাতটা খপকরে ওর মুঠোয়, তুলে নিত, নিয়ে বলত, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়না রবীন?

কেন?

আমার কেউ নেই বলে?

আমি উত্তর দিতে পারতাম না তখন। ও তাকাত আমার চোখে। বলত, শুধু দুঃখ আর আমি এ-জগতে বেঁচে আছি রবীন।

আমি তখন আরো দুঃখ দিতে চাইতাম। বলতাম, আর তুমি প্রেম করছ না মণিময়?

প্রেম? যেন আমার কথায় একটা প্রত্যয় খুঁজে পেত। পরক্ষণেই বলত, আমার দুঃখ নিয়েই আমি চলে যাব। মৃত্যু আমার একমাত্র সুখ রবীন। আমার ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু এসে কবে যে শুষিয়ে দিয়ে যাবে রবীন—

অশ্রু, আজ কিন্তু আমিও ভাবি তাই। ভাবি, প্রতি মুহূর্তে ভাবি, আমাকেও মৃত্যু এসে অমনি করে তুলে নিয়ে যাক। মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে নতুন জগতে চলে যাই আমি। পৃথিবীর ওপর আমার এই দুর্বিসহ জীবনটা আজ, সেদিনের মণিময়-এর মতই অসহায়, অসহনীয়। কিন্তু কেন? প্রেম, ভালবাসা আশা-আকাঙ্খা সবি ত ছিল আমার। আমার চোখের ওপর তোমার মার মৃত্যু বড় বেশী করে মনে পড়ে আজ। মৃত্যু এসে আমাকে শুষিয়ে দিক আজ।

(শেষাংশ ১০১৯ পৃষ্ঠায়)

জোয়ার

উপন্যাস
গতবারের পর

বিজন কুমার ঘোষ

কতগুলি দুরন্ত দিন বয়ে গেল। কতগুলি দুরন্ত মাস। জুন ছিল, জুলাই গেল, আগষ্ঠ এল। এখন সেপ্টেম্বর। কাশ ফুলের দিন। শান্ত পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল পড়েছিল অনেক দিন আগে। এখন ক্রমাগত ঢিল পড়তে শুরু করেছে। তাই দিনগুলি দুরন্ত, মাসগুলি দামাল।

সামাল দিতে দিতে আলোক তাই পরিশ্রান্ত।

অফিসে প্রচুর কাজ। ইদানীং প্রমোশন ঘটায় কাজের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কলকাতা অফিসে ওয়াই. জে, বিলিমোরিয়া সাহেবের পরেই ওর স্থান। সামনের মাস থেকে গাড়ি পাচ্ছে। বিলিতি কোম্পানি প্রমোশনের বেলায় বংশমর্যাদার দিকেও দৃষ্টি রাখে। এবং সেদিকে আলোকের কিছুমাত্র ঘাটতি নেই, বিলেতের কোম্পানির ডিরেক্টররা তা জানেন। আগামী বছরের প্রথমেই হয়ত আলোককে বিলেত যেতে হতে পারে। হেড অফিস থেকে খবর এসেছে। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে। কলকাতা অফিসের জোনাল ম্যানেজার ওয়াই, জে, বিলিমোরিয়া সাহেবের সার্ভিস কাল আর তিন বছর মাত্র। বলা যায় না, বিলেত থেকে ঘুরে এলে ওই পদ আলোকেরও হয়ে যেতে পারে।

তখন আরো সম্মান। আরো দায়িত্ব। হয়ত নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় পাবে না। শনিবার সকলের একটায় ছুটি হলেও আলোকের উঠতে উঠতে প্রায়ই দেরী হয়ে যাবে। হয়ত আলোক ইচ্ছে করলেই বারোটা কি এগারোটা যখন খুশি অফিস ছেড়ে চলে যেতে পারে কিন্তু যাবার উপায় নেই। ওই যে অলিখিত আইনটি রয়েছে 'দায়িত্ব'। কলকাতা অফিসের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে গুরুত্বও। এর মূলে আলোকের অবদান অনেকখানি। ডিরেক্টর বাহাদুরেরা তা জানেন। অনেক গুলি ম্যানেজিং এজেন্সি আছে এখানে। তাছাড়া কলকাতা অফিসের আণ্ডারে পশ্চিমবাংলায় একটি চিনির কল, একটি কাগজের কল, অনেক গুলি পাটকল এবং কাপড়ের কলও আছে। ওয়াই, জে, বিলিমোরিয়ার অতি বিশ্বস্ত প্রিয়জন আলোক রায়। সুদর্শন চেহারা, চোস্ত ইংরেজী বুলি, লোককে বিশ্বাস করাবার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং অনুভূতি-প্রবণ ব্যক্তিত্বে বিলিমোরিয়া সাহেব মুগ্ধ হয়ে কোম্পানির সেলস ডিপার্টমেন্টটা আলোকের হাতেই সম্পূর্ণ সমর্পন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন! কম কথা বলেন বিলিমোরিয়া সাহেব। বলেছেন, আই লাভ ইয়ু আই লাইক ইয়ু, আই ডিপেণ্ড অন ইয়ু। আলোক সে কথার সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। বিভিন্ন কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে তার অবাধগতি। সেখানে সে 'নাইস চ্যাপ' নামে অভিহিত। ফরেন বিজনেস ম্যাগনেটদের সঙ্গেও আলোকের দহরম মহরম। ঘন ঘন অর্ডার। ইদানীং সেলস্ ডিপার্টমেন্টের ওপর এত কাজের প্রেসার পড়েছে যে প্রচুর লোক নিতে হয়েছে। ডিপার্টমেন্টও অনেক বড় হয়েছে আগের তুলনায়। ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল আলোক। কলেজ ইউনিভার্সিটি পেরুনো যে সব ছেলেদের ও নিয়েছে।

প্রত্যেকেই বাছাবাছা। প্রত্যেকেই দশটা পাঁচটার দম দেওয়া কলের ঘোড়ার মতন, কাজ করবার জন্যে উন্মুখ। হৃদয়ানুভূতির কোন দাম দেয়নি সেখানে। কেন দেবে? যাদের দেখেছে কবি-কবি চেহারা, ঢুলু ঢুলু আঁখি, বাবরি চুল, তাদের দুএকটা কথার পরেই নিষ্ক্রান্ত হতে ইঙ্গিত করেছে। তাদের ভিতর একজন, বোধ হয় কোম্পানিরই কোন কর্মচারীর আত্মীয়, রায়সাহেব সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল করেছিল। হলে সে ঢুকেই সপ্রতিভ ভাবে বলেছিল, আমি কবিতা ভালবাসি স্যার—

আলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, কবিতা ভালবাসার চাইতে যদি টাইপে স্পীডটা বেশী হত তাহলে কনসিডার করতাম—একটু থেমে, আবার: কবিতা ভালবাসলে চাকরী জোটে না। কবিতা বাজারের জিনিস নয়।

একটু আগে কেয়ার টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে উঠেছিল। যেন স্বর্গলোকের বার্তা। বহুদিন এই ধরনের টেলিফোন আসে না। বুঝি ভীষণ কাজের মানুষ হয়ে গেছে আলোক। কাজ আর কাজ। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছে আলোক, সে প্রয়োজনের দাস হয়ে পড়ছে। ফাইলের লাল ফিতে গলায় মালার মত জড়িয়ে আস্তে আস্তে ফাঁস হয়ে উঠছে। সকাল সকাল অফিসে আসতে হয় আজকাল। ফিরতে ফিরতেও অনেক দেরী। তবু কাজ কমে না একটুও। দায়িত্ব, প্রমোশন, বিলেত যাওয়া—একসঙ্গে তিনটে তাঁর হৃদয়ে মরুভূমি ডেকে আনছে তাড়াতাড়ি। মুক্তি নেই। আলোকেরও বেরিয়ে যাবার শক্তি নেই আজ। দায়িত্বের একটা অদ্ভুত মোহ আছে। ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারের পদমর্যাদা মনে আরেক ধরণের রঙ ছড়ায়। আগে আগে একেক সময় মনে হত, দুত্তোর! জীবনটা কি শুধু ঘানি টানবার জন্যেই? ইচ্ছে হত, সব কিছু ফেলে একদিন মৃনালের মত উদ্দাম জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে। হায়, আজ আর তার উপায় নেই। মাস কয়েক আগে এক ইন্সিওরেন্স এজেন্ট ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়ে হঠাৎ দুম করে একটা ইন্সিওরেন্স করিয়ে ফেলে। চব্বিশ হাজার টাকার। যদিও জানে, কুড়ি বছর পরে চব্বিশ হাজার টাকার বাজার দর নেমে যাবে আট হাজার টাকায়। তবু একেক সময় মনের মধ্যে বসন্তের ফুল ফুটতে থাকে—খ্যাতির বৃক্ষ, অর্থের বৃক্ষ, পদমর্যাদার বৃক্ষ আশ্রয় করে। আবার একটা সময় আসে যখন এই আলোকই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়। নিজেকেই যেন চিনতে পারে না। বড় অদ্ভুত লাগে তখন। ডক্টর জেকিল এণ্ড মিস্টার হাইডের মত রোমাঞ্চকর। যখন হালতুতে গভীর রাত্রে, কি সন্ধ্যায় ঘন বর্ষার মধ্যে নীল আলো জেলে পাঠ করতে থাকে —এই ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর···

······তখন কোথায় থাকে অর্থের লোলুপতা, খ্যাতির বিড়ম্বনা, পদ মর্যাদার অভিশাপ। বুকটা হু হু করে, একেক সময় বেলুনের মত ফুলে উঠে পৃথিবী ছিঁড়ে নীল হাওয়ার সমুদ্রে উড়তে চায়। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ দুঃখ-বিষাদ-অচিন রহস্যময়তা এই ছোট্ট বুকে বাসা বাঁধে। আলোক যেন নিজেই দুই কাননের পাখি। তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাস করে লেভেল ক্রশিংএর এপারে, আরেক ভাগ ওপারে। জাগতিক পরিভাষায় তাদের দুই নাম—কেয়া আর মিনতি। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু। তবে এখন যেন আলাদা করে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছে আলোক, সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হৃৎপিণ্ডে রক্তের জোয়ার উজান বইছে একধার থেকে অন্যধারে। সীমারেখা মুছে যাচ্ছে। নাহলে আচম্বিতে আলোক কেন ইন্সিওরেন্স করাতে গেল, যদিও জানে এই টাকা দেশের উন্নতির জন্যে খাটবে। আর দেশের উন্নতি মানে তো দেশকে রাতারাতি শহর বানানো। হালতুতে যে কারখানাটি উঠবে তার মালিক হয়ত ইন্সিওরেন্স কোম্পানি থেকে মোটা টাকা ধার করবে এক সময়; তার ভিতর

নিশ্চয়ই আলোকের প্রিমিয়ামের একটা অংশও থাকবে। তাহলে আলোক পরোক্ষে উৎসাহ দিচ্ছে—এ কথা বলা যায়। হায়, এখন আর পথ নেই। শত ইচ্ছে থাকলেও মৃণাল বিশ্বাসের মত উদ্দাম জীবনের পথে পা বাড়াতে পারবে না। আগে আগে কতবার ভেবেছে, কি হবে চাকরী করে? কাজের মধ্যে ডুবতে ডুবতে আকাশে হাত পা ছুঁড়ে কি লাভ? কিন্তু ছিঁড়তে পারে কই। পৃথিবীর সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে যে। ইন্সিওরেন্স-চাকরী-বিলেত যাওয়া—এই সব অদৃশ্য শিকলের মোচড়ে প্রাণ-ভোমরা ওষ্ঠাগত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপনে। কতদিন রামলালের বাজারে অক্রুর চায়ের দোকানে মাটির ভাড়ে চা খাওয়া হয় না! পুকুরে জাল ফেলেনি কতদিন! এমন কি অফিসে লেট হবার ভয়ে পুকুরে গা' ডুবিয়ে স্নান পর্যন্ত করে না। বাথরুমে জল তুলে দেয় নিতাই, কাকস্নান সারে। অযত্নে মরশুমী ফুলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুকুরের পূব দিক্‌টা, দক্ষিণ দিকটা জুড়ে দুর্বিনীত জঙ্গলে জট পাকাচ্ছে। পরশুদিন মা ওখানে একটা সাপ দেখেছিলেন। কবিতার বইগুলোতে ধুলো জমেছে ইঞ্চি পরিমাণ। আলোকের সেই সব প্রিয় দিনগুলি কি এত শিগ্‌গির মুছে গেল? আর হয়ত লিচুগাছে বাদুড় তাড়াবার জন্য টিন বাঁধতে যাবে না কোনদিন। তবু বুকের মধ্যে সূক্ষ্ম সূচের জ্বালা অনুভব করে যখন তখন। যখন অফিসের জানালা-দিয়ে শ্রাবণের শেষ মেঘ দেখা যায়, কি লাটভবনের দীর্ঘ দেবদারুর মাথা আন্দোলিত হতে থাকে ধীরে স্বচ্ছে। তখন মনে হয় মহাকাল বুঝি যৌবনের কাপে দ্রুত চুমুক দিচ্ছে। বুকের মাঝখানের 'লালাবাবু' যেন স্পষ্ট শুনতে পায়, বেশ যায়। তখন, সত্যি বলতে কি, বড় অদ্ভুত লাগে সুখে দুঃখে ছাওয়া ছোট জীবনটা। ডিটেকটিভ উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠার মত রহস্যঘন। রেলগাড়ির জানালায় দ্রুত অপসৃয়মান বৃক্ষের মত লোভনীয়। কান পেতে থাকলে হৃৎপিণ্ডে রক্তের জোয়ার-ধ্বনি শোনা যায়। সত্যি, তখন দুই জীবনই অপূর্ব লাগে। লেভেল ক্রসিংএর এপার ওপার—দুটোই সমান কাঙ্ক্ষিত। ডালহৌসী স্কোয়ারের ব্যস্ত-বাগীশ দিন, কি হালতুর নিরালা কোণ—দুটোই পরম সত্য। যে মানুষ রকেটে মহশূন্যে পাড়ি দেবে তাকেই হয়ত কোন না কোন সময়ে আসতে হবে হালতুর মত নিরালা গৃহকোণে, শান্তির জন্যে, স্নিগ্ধতার জন্যে। কেননা ব্যস্ততাই জীবন নয়। আবার অলসমায়াও জীবনকে ফোটাতে জানে না। তাহলে জীবন কি সমন্বয় সাধনের যন্ত্র? নাটবল্টু? আলোক যেন স্পষ্ট দেখতে পায় লেভেল ক্রসিং ধীরে ধীরে আকাশে উঠে যাচ্ছে। কারা যেন দ্রুত চলাফেরা করছে—এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। সব একাকার। সব সমুদ্র। সব সমুদ্রেই জোয়ার-ধ্বনি।

টেলিফোন এসেছে। কেয়ার। জরুরী নাকি দরকার। ঠিক ছটার সময় ফিরপোর নিচে দাঁড়াতে হবে। কেয়া আসবে। দরকারী কথা আছে। কি কথা? জিজ্ঞাসা করেছে আলোক। কানে কানে বলব—উত্তর দিয়েছে কেয়া।

দিন পনের আগে আলোক এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়েছিল। কেয়ার জ্বর। তেতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে শুয়ে ছিল নিরিবিলি। আলোককে দেখে চমকে উঠেছিল। পরে হাসি দিয়ে সামলাতে হয়েছিল অপ্রস্তুত ভাবটা।

—অনেক দিন পরে এলে। বোসো।

—অনেক দিন তুমি খবর দাও না—।

—আমার জ্বর হয়েছে।

—জ্বর তো তিন দিন। তার আগে?

—তুমি কি এতদিন পরে ঝগড়া করতে এলে? আলোক হাসল।

—এখন কেমন আছ?

—ভাল।

পাশের ইজিচেয়ারটায় বসতে গিয়ে লক্ষ্য করল মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। মৃদু। রেগুলেটরটা বোধ হয় দুই কি তিন। টেবিলে কতগুলি নানা রঙের মিক্‌চার। ভূমধ্যসাগরীয় আপেল। খোসা ছাড়ান বেদানা। আলোক কপালে হাত দিল। গরম বোধ হচ্ছে না। বুকে হাতের পিঠ রাখল। স্বাভাবিক।

—মনে হচ্ছে তুমি যেন ডাক্তার।—কেয়া ম্লান হাসল।

—জ্বর আছে কি নেই সেটা [illegible]তে পারি।

—আছে?

—নেই।

কেয়ার মত মেয়েরা তিন দিনের জ্বরে কেমন নেতিয়ে পড়ে। আলোক ভাবল। অথচ মিনতির মত মেয়েদের কাছে তিন দিনের জ্বর অঙ্গের ভূষণ। এই নিয়ে তারা সকালে টিউশনি করে। দুপুরে ইস্কুল সন্ধ্যায় সেলাই শিখতে যায়।

ভজহরি এই সময় চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু কেক আর স্যাণ্ডউইচ। সে সব সরিয়ে রেখে চায়ে চুমুক দিল। ফুলের গন্ধ চায়ে। এই ধরণের চায়ের বিজ্ঞাপন দেখেছে হাজরা রোডে, 'সদ্য বাগান থেকে তোলা।' নিতাইএর চা মুখে দেওয়া যায় না। জকুর দোকানের চা ভাল। ফিরপোর চা আরো ভাল।

—মিনতি দেবীর খবর কি?—আড় চোখে তাকাল কেয়া।

চমকে উঠল আলোক।

—হঠাৎ এ কথা?

—চোখ দেখে বুঝতে পারি। বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে যেন।

—চোখে লেখা থাকে নাকি মিনতির খবর?—এবার আলোক অনেকটা স্বাভাবিক।

—অনেক দিন আস না। আমাকে আর ভাল লাগে না। কোথায় বা যাবে, নিশ্চয়ই মিনতির কাছে।—কেয়া হাসল।

—ইহাই উপপাদ্য বিষয়।—আলোক আরো জোরে হেসে উঠল। তারপর লোভ হল সুযোগটা ছেড়ে দিই কেন? কিন্তু একবার ভাবল যদি ওর অসুখটা বেড়ে যায়? এরা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার জাত। তবু কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বলেই ফেলল, সঞ্জিত মুখার্জীর কি খবর?

—হঠাৎ?—দুটো ভুরুই সম্পূর্ণ বেঁকে গেল। চোখের মণি দুটো যেন সাপ হয়ে ছোবল মারছে। আলোক ঈষৎ প্রমাদ গুণল। কিন্তু যে বাকপটুতার জন্যে অফিসে সুনাম এবং পদোন্নতি তা কি শুধু অফিসের গণ্ডির মধ্যেই? আলোক ফিলমী নায়কের মত কায়দা করে খোয়া ছেড়ে বলল, হঠাৎ সঞ্জিত মুখার্জীর কথা মনে পড়ল।

—না। মোটেই হঠাৎ নয়।—গর্জন করে উঠল কেয়া।

—তাহলে তাই।—নির্লিপ্ত স্বর আলোকের: তবে ছেলেটা ভাল নাচে—একটু থেমে: নাচায়ও—।

—একশো বার নাচব। তোমার কি?—উন্মত্ত হয়ে উঠল যেন মুহূর্তে। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে কেয়ার মুখটা। ভয়ঙ্কর আর কর্কশ।

—আলোকও শেষ দেখতে চায়। তেমনি অনাগ্রহভাবে বলল, আমার কিছুই না। তুমি এক লক্ষ বার নাচো।

—তোমার ছোট মন। তোমার হিংসে হয়।

—তাহলে তাই।

ঘৃতাহুতি পড়ল যেন অগ্নিতে। বিছানায় উঠে বসল, তুমি যখন মিনতির গল্প কর, তুমি যখন নিবারণবাবুর দুঃখ নিয়ে হা-হুতাশ কর?

—করিই তো। সেটা তো মিথ্যে নয়।

—তাহলে সঞ্জিত মুখার্জীও মিথ্যে নয়। জেনে রেখো আমি ওর বাগদত্তা।

—চমৎকার! নিমন্ত্রণ পত্রটা যেন ঠিক সময়ে পাই।

—তুমি ছোটলোক! বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত থাকবারও যোগ্য নও।

—জো হুকুম—আলোক আরো বিষাক্ত শ্লেষ উগাড় করতে যাচ্ছিল, এমন সময় কেয়ার মা এসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আলোক যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। কেয়া একটা চাদরে আপাদ মস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ল।

—এই যে বাবা আলোক, দাঁড়ালে কেন? বোসো বোসো—বলতে বলতে অতি কষ্টে মিনিট খানেক মহড়ার পর নিকটবর্তী কৌচে দেহটাকে বিন্যস্ত করলেন: শুনছি নাকি তোমার বিলেত যাওয়া পিছিয়ে গেল?

বিরক্ত হল আলোক: কোথা থেকে শুনলেন?—এঁদের এই এক কথা, দেখা হলেই কেবল বিলেত যাওয়া আর বিলেত যাওয়া! বিলেত দেশটা যেন বৈকুণ্ঠধাম!

—কেয়া বলছিল—

—হ্যাঁ। ঠিক কথা।—আলোকের এবার সংযমের অভাব ঘটল।

—তোমার মা কেমন আছেন?—উনিও যেন উষ্ণতার আভাস পেলেন।

—ভাল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আড় চোখে ঘুরন্ত পাখাটার গতিবিধি লক্ষ্য করলেন। এবং তার পরেই যেন বলবার মত একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলেন।

—হ্যাঁ বাবা, তুমি ওই জঙ্গলে পড়ে রয়েছ কেন? কি যেন নাম—

—হালতু।—আলোকই জুগিয়ে দিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হালতু। —উনি খুশি হলেন: নামটা ঠিক হয়নি, হবে কালতু!—নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন: কি বিচ্ছিরি মশা সেখানে! কেয়া বলছিল—

আলোক লক্ষ্য করল, টেবিলের তলায় একটি মশা উড়ছে। খুশি হল দেখে। মশারাও লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে এলগিন রোডে আসতে পারে! বলল, শুধু কি মশা, সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড়—কি নেই?

—তাহলে এদিকে চলে আসলেই তো পার?

—আমরা যে গাঁয়ের মানুষ!—আলোক নিখুঁত ভাবে উচ্চারণ করল।

উনি আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কোনি রকমে খাটের পায়া ধরে উঠলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন।

—আমি বড় ব্যস্ত আছি বাবা। সঞ্চিত বিলেত যাবে, উনি বাড়িতে পার্টি দিচ্ছেন—

আলোক চমকে উঠে না চেনার ভান করল।

—কে সঞ্চিত?

—সঞ্চিত মুখার্জী।—উনি একগাল হেসে উঠলেন আলোকের অজ্ঞতায়: চেন না বুঝি সঞ্চিতকে? ওই যে কেয়ার জন্মদিনে নাচল। বড় ভাল ছেলে।—তারপর হাতের সব কয়টি আঙুল তুলে: বেহারে ওদের পাঁচ পাঁচটি কোল মাইন—

আলোকের ভীষণ হাসি পেল। হাসি চেপে রেখে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে স ঞ্চি ত মু-খা-র্জী নামটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, যেন ভগবানের নাম নিচ্ছে। দেখে উনি খুশি হলেন। তবে কুণ্ডলী পাকান চাদরের তলা থেকে 'ন্যাকামি' কথাটা বেরিয়ে এল চকিতে। সেটা শুধু আলোকই শুনতে পেল।

ফিরপোর নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠছিল আলোক। সাড়ে ছটা বেজে গেল তবু কেয়া আসছে না। লোকজনের উত্তেজিত চলাফেরা। ঘামের বিটকেল গন্ধ। ধাক্কাধাক্কি। অন্য সময় হলে আলোক দশ মিনিটের বেশী একটুও দাঁড়াত না। কিন্তু সেদিনের অপ্রীতিকর কথা কাটাকাটির জন্যে আলোক দুঃখিত। কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে

ভালবাসে না। তবু কেন যে সেদিন রসনা সংযত করল না! হ্যাঁ, কেয়াকে ও ভালবাসে। একটুও ফাঁক নেই সেখানে। সেদিন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কথা কাটাকাটি করেছে, কেয়াকে দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে কতগুণ গভীর দুঃখই না আলোক পেয়েছে। কেয়ার মুখখানা বার বার মনে পড়ছিল। কেয়াকে বুঝি এতখানি দুঃখ কেউ দেয়নি। সে রাত্রে আলোক ঘুমুতে পারেনি। ফোটা ফোটা জল ঝরেছে অজস্র। একান্তই পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার এসব। তবু আলোক নিরুপায়। কেয়াকে অবিরাম ভালবাসে এই তার একমাত্র পরিচয়। ভালবাসার পরিমাপ হল সেদিন বাড়ি ফিরে। অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নার ভিতর পুকুর ঘাটে বসে ছিল একাকী। যেন নির্জনতার মধ্যে শান্তি পেতে চাইছিল। কোথাও বুঝি কাছে পিঠে একটা রাত পাখি সাথীকে ডেকে চলেছিল একটানা। সেদিন আকাশে বাতাসে জ্যোৎস্নায় শুধু কেয়ার করুণ মুখই ভাসছিল।

ওই যে কেয়া! প্রতীক্ষা সার্থক হল। বুকটাকে ঢেউ এর মত লাগল সহসা। কেয়া ট্রাম থেকে নামছে। রাস্তা পার হচ্ছে। এদিক ওদিক চাইছে। যেন আর ঠিক রাখতে পারছে না নিজেকে। এগিয়ে গেল। সারা মুখ ভর্তি হয়ে হাসি উপচে পড়ছে। যেন পৃথিবীর সুন্দরতম মহৎ হাসি হাসছে ও।

কেয়া হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। ছটা চল্লিশের কাঁটা ছাড়িয়ে গেছে তখন। দেখে করুণ হল মুখটা।

—বড্ড দেরী হয়ে গেল আলোক।

—তুমি যে এসেছ এতেই আমি খুশি—আলোক বলল, তুমি না এলে আমি দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম!

—ছিঃ আলোক! তুমি এখনো আমার ওপর রাগ পুষে রেখেছ।

—না কেয়া। তোমার ওপর রাগ করে আমি নিজেই ভয়ানক দুঃখ পেয়েছি। এখন রাগ নেই।

—আমার হাত ধর।

আলোক মাখনের মত হাত খানা ধরল। কত দিন পর কেয়াকে কাছে পেয়েছে। স্পর্শের ভিতর দিয়ে সেটা জানাতে চাইল। এসপ্লানেডের মোহন রূপ সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে। ক্রমশই পাপড়ি মেলতে আরম্ভ করবে যত রাত গভীর হবে। কতদিন ফিরপোর বারান্দায় নিরালা টেবিলে বসে ফোটা ফুলের মত শহরের রূপ ফুটতে দেখে বিভোর হয়েছে। এই সাধের শহর ছেড়ে কোথায় যাবে? ভাবাই যায় না। এই শহরে অনেক দুঃখকষ্ট আছে, হিংসা লোভ কদর্য হানাহানি আছে। তবু এখানেই প্রাণ আছে, গভীরতা আছে, জীবনের প্রবহমানতা আছে। আলোকের কোষে কোষে, শিরায় শিরায়শহরের সৌরভ প্রবাহিত। হঠাৎ এই মুহূর্তে মা মেয়েকে মায়াবী নারীর মত মনে হল—চির মোহময়ী। আলোক দুই হাতে কলকাতা ও কেয়ার হাত ছুঁয়ে রয়েছে যেন।

সন্ধ্যার সুগন্ধী ভীড় এড়িয়ে আলোক কেয়ার পাশে গর্বিত পা' ফেলছিল। কেয়ার হাতটা কি নরম! মাখন ছেনে তৈরী হয়েছে। আলোক কখনো জোরে, কখনো মৃদু ছোঁয়ায় হৃদয়ের অবিরাম উত্তাপ জানাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর চমক ভাঙল হাওড়া স্টেশন দেখে। মনে পড়ল ওরা রাস্তা পার হয়ে কার্জন পার্কের ঘাসে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরেছিল। কিছু এলোমেলো কথাবার্তাও হয়েছিল। তারপর ট্রামে উঠল। কেয়াকে নিয়ে ট্রামে চড়া বোধ হয় সেই প্রথম। কন্ডাক্টর কাছে এলে কেয়া যেন কি জিজ্ঞাসা করেছিল। দু' খানা টিকিট কেটে ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখল ব্যস, আর মনে নেই। তারপর এই হাওড়া স্টেশন। সারাক্ষণ আলোক বাচ্চা ছেলের মত কেয়ার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কেয়ার পাশে বসে নিজেকে বড় নিশ্চিন্ত আর নির্ভাবনা লাগছিল। গভীর আর চিন্তাক্লিষ্ট কেয়া—যেন চিন্তার সমুদ্রে মাছের মত তলিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ।

হঠাৎ হাওড়া স্টেশন জালের মত ভাসিয়ে তুলল ওপরে। কেয়া সচকিত হয়ে বলল, শিগ্‌গীর দুটো টিকিট কাট তো চন্দননগরের—

—চন্দননগর? আলোক যেন আকাশ থেকে পড়ল। এরকম একটা প্রস্তাব ওর কাছে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

কেয়া তাড়া দিল—

—হাঁ করে চেয়ে আছ কেন? সাতটা বত্রিশে টেন।

—কিন্তু—কিন্তু—আলোকের যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না: এত রাতে চন্দননগরে যাবে কেন? কে আছে সেখানে?

—প্লিজ, প্রশ্ন কোরো না—ভীষণ করুণ দেখাল কেয়ার মুখ খানা: আমি যা বলি তাই কর—

আলোক ভয় পেয়ে এগিয়ে গেল।

—তোমার কি হয়েছে বল তো? মুনা কি কিছু বলেছে?

—কিছু হয়নি আলোক—কৌতূহলী অনেক জোড়া চোখের সামনেই হাত ধরল কেয়া: এক দিনের জন্যে আমাকে সুলতান হতে দাও- একদিনের জন্যে তুমি আমার হও।

—আচ্ছা আচ্ছা—আলোক অত্যন্ত খুশি হয়ে চন্দননগরের কাউণ্টারে হাত বাড়িয়ে দিল: দু' খানা ফার্স্ট ক্লাশ—

ইলেকট্রিক ট্রেন। মুহূর্তে মুহূর্তে এর গতিবেগ। সুদৃশ্য কোচ। কামরাটাকে মনে হচ্ছে যেন ড্রয়িং রুম। হাওড়া লিলুয়া বেলুড় বালি উত্তরপাড়া—চোখের পলকে ম্যুভি ক্যামেরার মত অদৃশ্য হল। স্পীডের যুগ। আলোক হৃষ্টচিত্তে স্পীড অনুভব করতে লাগল সর্বাঙ্গে। কেয়া জানালার পাশে বসে আছে চুপটি করে। শ্রাবণের শেষ বেলার মত বিষন্ন। গম্ভীর। কি উদ্দেশ্য? কোথায় নিয়ে যাবে? জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়। ভৌতিক নৈঃশব্দ। যেন একটা কথা বললেও ঘরের মেঝেতে কাচের গ্লাশ পতনের মত খান খান হয়ে যাবে। তবে আলোক নিশ্চিন্ত। কেয়া মহম্মদ বিন তোঘলক সেজে যেখানে খুশি নিয়ে যাক, যা ইচ্ছে করুক। আলোক বাধা দেবে না। কেননা, একদিনের সুলতান চির দিনের হতেও কোন আপত্তি নেই। এ কয়টা দিনের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে বুঝে ফেলেছে আলোক কেয়া তার আত্মার অংশ। তৃষ্ণার জল। অফিসের পদমর্যাদা, মাইনের অঙ্ক তুচ্ছ হয়ে গেছে সব। জীবনে শান্তি না থাকলে, কেয়া না থাকলে ওসবের কোন মানে হয় না। যার স্মৃতি বিরক্তিকর। যার উপস্থিতি কিম্বা আদর-অনুযোগ আরো বিরক্তিকর। বুঝতে পারেনি কেয়া তার তৃষ্ণার জল। কি হাহাকার, কি দারুণ মরুভূমি শরীরের শিরায় শিরায় দস্যুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে আতঙ্কে দিশাহারা, ভয়ে শাঁখের মত সাদা হয়ে গেছে আলোক। আত্মার অংশ কেয়া সেদিন মুখের ওপর বলতে পারল আমি বাগদত্তা? এত বছরের সম্পর্ক, তিলে তিলে জমানো প্রেম ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল? আত্মহত্যা করেনি কেন পূর্ণিমাদিদির মত ট্রেনের নিচে মাথা পেতে? অপঘাতে মৃত্যু তো ওদের বংশের ধারা। আলোক কেন সেই পরম ধারা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করল না? কেন? কেন? এই বিষ মাখান 'কেন'র তীর অবিরাম আলোককে বিঁধেছে। এই কয়টা দিনের সীমাহীন অত্যাচারে সমস্ত শরীরটাই আগ্নেয়গিরি হয়ে গিয়েছিল। তার উত্তপ্ত লাভা স্রোত আকাশ বাতাস বিষন্ন করে তুলেছিল। হালতুর ছায়া ঘেরা বাগান, স্নিগ্ধ পুকুরঘাট, পাখিদের কূজন—যা এতদিন আলোকের প্রাণ ছিল -সব ষড়যন্ত্র শুরু করে আলোকের চারপাশে আগুনের বৃত্ত রচনা করেছিল। আলোক জানে না বিফলতা কি বস্তু। প্রেমের মানে কি জানে না। জানে কেয়া তার পাশে আছে। যখনি ক্লান্তি, বিষাদ ইত্যাদি আধুনিক ব্রহ্মাস্ত্র-গুলি আক্রমণ শুরু করবে তখনি ও কেয়ার কাছে ছুটে যাবে। ফিরপোর নিরালা টেবিল, মেট্রোর ভিনদেশী জীবন, গড়ের মাঠের পবিত্র বাতাস ইত্যাদি ক্লান্তি বিষাদগুলিকে ছালা ভর্তি বিড়ালের মত পার করে দিয়ে আসবে বহু দূরে। হায়!

সেই কেয়াই বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু দূরে সরে যাবে ভাবতে পারেনি। বুকের কাছে জলকষ্টের মত সর্বক্ষণ বেদনা। চন্দ্র সূর্যের মত ভেবেছিল কেয়াও বুঝি স্থির, অচঞ্চল। আর কোনদিন কেয়া ফোন করবে না। গড়ের মাঠে হাওয়া খাবার জন্যে ননীর মত হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকবে না। সঞ্জিত মুখার্জী—বিহারে যাদের পাঁচটি কোলিয়ারী—যে বিলিতি জ্যাজ বাজনার তালে তালে নাচতে পারবে—যে বিলেত যাচ্ছে—সেই সঞ্জিত মুখার্জী কেয়ার কোমর জড়িয়ে পাশে পাশে হাঁটছে। আলোক তাই দেখতে দেখতে ভয়ংকর ভাবে শূন্যতা অনুভব করবে। পা' কাঁপবে। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে রাস্তায়। রহস্যের গন্ধ পেয়ে লোক ছুটে আসবে। ঘৃণী, জুতোর শুকতলা শোঁকাও—মন্তব্য ছুঁড়বে কেউ কেউ। আলোক যেন আর ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলে ভয়ংকর শূন্য হরিধ্বনি দেয়।

কেয়া ফিরে এসেছে আবার। আলোক গভীর আবেগে তাকাল। জানালার পাশে শিলা মূর্তির মত কেয়া। কি করুণ মুখ! কি স্নিগ্ধ! ট্রেনটা এই সময় একটা ছোট ব্রিজের ওপর উঠল। ব্রিজটা পেরিয়ে গেল। চোখের পলকে স্পীড বাড়ছে। এই স্পীডের পিছনে কত বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়ার নিপুণ কারিগরের বিদ্যা বুদ্ধি শ্রম জড়িত। সেই বিদ্যা বুদ্ধি শ্রমের তুঙ্গ শিখরে বসে আলোক মানুষ জীবনের একটা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিভূত হতে হতে জড়িত স্বরে ডাকল. কেয়া!

কেয়া চমকে উঠে তাকাল আলোকের চোখে। আরেক বার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল সারা কম্পার্টমেন্টে। কেউ নেই। আলোকের গালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

চন্দননগর—

ক্রমশঃ

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বত্রগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে idcology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ ;(ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৭বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সামান্য পথ, অনেক দূর

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

খানিকটা হেঁটেই হাঁপাতে শুরু করলাম। স্টেশন যে খুব দূরে তা নয়। তবু আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

স্টেশনে এসে যখন পৌঁছলাম তখনও ট্রেন আসতে অনেক দেরি। আমি আপ্-প্লাটফর্ম-এর একটা বেঞ্চিতে বসে খানিকটা জিরিয়ে নিলাম। তারপর ধীরে-সুস্থে টিকেট-ঘরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এক টাকার একটা নোট ফুটোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললাম,—'একখানা কলকাতার টিকেট দিন তো।'

টিকিটবাবু কিংবা স্টেশন মাস্টার চা খাচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে সেটা শেষ করলেন। তারপর নোটটা হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন,—'আরো তিনটে নয়া পয়সা দিন্।'

বুঝলাম, আবারও টিকেটের দাম বেড়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। বিনা বাক্যব্যয়ে আবার একটা পাঁচ নয়া পয়সা ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু টিকিটবাবু সেটি গ্রহণ করলেন না। ঠেলে দিয়ে তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—'এ দিয়ে কী হবে? আমিই আপনাকে পাঁচ নয়া পয়সা দেবো। কাছে দু'নয়া পয়সা নেই।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার বেশ একটু সময় লাগল। হাজার হলেও বিষয়টা অঙ্কের। আমার কাছে কিঞ্চিৎ গোলমেলে লাগাই স্বাভাবিক। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমি বুঝলাম। তখন কাছের একটা পানের দোকান থেকে পয়সা ভাঙিয়ে এনে দিলাম।

টিকিট নিয়ে ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে ডাউন প্লাটফর্ম-এ এসে দেখি অসিত সেখানে দাঁড়িয়ে। দেখে খুশীই হলাম। যাক, দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম,—'তুমি কখন্ এলে অসিত?'

অসিত বললে,—'আমি তো আপনার পিছু-পিছুই এলাম।'

আমি আশ্চর্য হলাম।—'আমার পিছু পিছু! কৈ তোমাকে তো টিকেট কাটতে দেখলাম না!'

—'টিকিট!'—অসিত হাসল। বললে,—'যাব তো খড়দায়, তার আবার টিকিট কী!'

তার বলার ভাব দেখে মনে হল খড়দা যেতে হলে কারো টিকেট কাটার দরকার করে না। তবু আমি কিছুটা ইতস্তত করে বললাম,—'কিন্তু যদি টি. টি. আই. ওঠে?'

'—কী যে বলেন!'—অসিত প্রায় উড়িয়েই দিল কথাটা। তারপর একটু থেমে বেশ গম্ভীরভাবে বললে,—'ওঠে তো উঠবে। আমি ও'সব ভয় করি না। সব রকম বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সাহস আমার আছে।'

এর পর আমি আর কী বলতে পারি? এ'হেন সাহসী ব্যক্তিকে আর কিছু বলতে সাহসও পেলাম না।

আশ্চর্যের কথা, ট্রেনে বসার জায়গা পেলাম। আমি আর অসিত জানলার দিকে পাশাপাশি আরাম করে বসলাম। আমাদের রো'-র শেষপ্রান্তে ক'জন যাত্রী কোলের ওপর কাপড় বিছিয়ে হৈচৈ করে তাস খেলছেন। বোধহয় ডেলি-প্যাসেঞ্জার। ও'পাশে স্ত্রীপুত্রসহ এক ভদ্রলোক সপরিবারে বসে। ও' কোণে একটি তরুণী মেয়ে কোলে একটি গীটার নিয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এ'দিকে কয়েকটি ছাত্রী বই খাতা নিয়ে। আমার সামনে এক

ভদ্রলোক একটা মোটা বই খুলে নিবিষ্ট মনে পড়ে চলেছেন। ভদ্রলোকের গায়ে পাঞ্জাবী চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চেহারা দেখে মনে হল শিক্ষাব্রতী। হয়তো কোনো কলেজের অধ্যাপক। আমি আড় চোখে কয়েকবার তাঁর খোলা বই-টার দিকে তাকালাম। কিন্তু দূর হতে দেখার দরুণ কিংবা বিদ্বেতে না-কুলোবার জন্যই ঠিক বুঝতে পারলাম না কী বই।

কাঁচড়াপাড়া আসতেই কামরা একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। একটি ছোটো মেয়ের হাত ধরে একজন অন্ধ ভিক্ষুকও উঠল। এবং উঠেই গলার শির ফুলিয়ে ভীষণ চীৎকার করে গান শুরু করে দিল। কিন্তু সে কি সত্যিই গান? আসলে তা' এই দারুণ ভিড় ও গণ্ডগোলের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এক প্রাণান্তকর প্রয়াস।

আমার কাছে আসতেই আমি ভিক্ষুকের কৌটায় একটা দু' নয়া পয়সা ফেলে দিলাম। দেখে অসিত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল। গম্ভীরভাবে জানাল যে এভাবে ভিক্ষুকদের পয়সা দিয়ে প্রশ্রয় দেওয়া কদাচ উচিত নয়। কারণ, তাহলে এরা এই আরামের ব্যবসা ছেড়ে আর কোনোদিন কাজকর্ম করতে চাইবে না।

এরকম কথা অবশ্য আমি কাগজপত্রেও বহবার পড়েছি। কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তা-ও নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো খুবই খাঁটি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কারণ, আমার ধারণা, ভিক্ষা বৃত্তি কোনো মানুষই স্বভাবত পছন্দ করে না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই বোধ-হয় মানুষ প্রথমে ভিক্ষা শুরু করে। কেউ নিদারুণ অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়, কাউকে আবার ভিক্ষুক ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনা মত শৈশবেই ভিক্ষা করতে বাধ্য করে। তারপর যা হয়,—দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে এদের লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পূর্ণই অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং ভিক্ষা বৃত্তি রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। তখন হয়তো তারা সহজে তা ছাড়তে চায় না। কিন্তু এজন্য মূলত সমাজ ও রাষ্ট্রই কি দায়ী নয়? আমার তো ধারণা, নিশ্চিত দায়ী এবং প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। সুতরাং সহানুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নভাবে একে দেখা এবং কোনো দায়িত্ব পালন না-করেই শুধুমাত্র ভিক্ষুকদের সমালোচনা বা নিন্দা করা নিছক আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়।—অবশ্য এই ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে এই সব কোনো কথাই আসে না। কারণ, এ লোকটি নির্ভেজাল অন্ধ এবং সে-কারণে, আমাদের দেশে অন্তত, কর্মক্ষম নয়।

এইসব ভালো-ভালো কথা ভাবতে ভাবতে দেখি নৈহাটী স্টেশন এসে গেছে। এখানে গাড়ি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়ায়। আমি আর অসিত দু'জনে দু'ভাঁড় চা চেয়ে নিলাম। তারপর আরাম করে একটা পান মুখে দিয়ে আবার কামরার দিকে ভালো করে তাকালাম। ইতিমধ্যে আরো অনেক লোক উঠেছে। সেই সঙ্গে একজন ক্যানভাসার এবং আবার একজন অন্ধ ভিক্ষুক। অসিত বললে,—'সর্বনাশ, এবার দেখছি নরক একেবারে গুলজার হয়ে উঠল। একে তো এই বাহান্নজনের কামরায় প্রায় নিরানব্বই জন লোক। তার ওপর যদি ক্যানভাসার আর ভিক্ষুক মশাই গলাবাজির কম্‌-পিটিশন্ চালান তাহলে আর রক্ষা নেই।'

কিন্তু দেখা গেল অসিতের ভয় অমূলক। ভিক্ষুক ও ক্যানভাসারের মধ্যে বেশ একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে মনে হল। একজনের শেষ হলে তবেই অন্যজন শুরু করল। প্রথমে দেখলাম ভিক্ষুককেই চান্স দেওয়া হল। এবারও ভিক্ষুককে আমি পয়সা দিলাম। তবে পাঁচ নয়া পয়সা দিতে হল। কারণ, দু'পয়সার মুদ্রা আমার কাছে আর ছিল না। তবে তা আমার কিছু খারাপ লাগল না। বরং ভালোই লাগল বলা চলে। অবশ্য, বলাবাহুল্য, আমি যে খুব ভালো লোক বা দাতাকর্ণ তা একেবারেই নয়। আমি কদাচিৎ বাইরে যাই হই। আর তার ফলে এ'ভাবে ভিক্ষুকের

সংস্পর্শে আমাকে খুব কমই আসতে হয় তাছাড়া একজন উপার্জনহীন রুগ্ন মানুষ আমি, কীই বা কাকে দিতে পারি? সুতরাং নিজের বিশেষ স্বার্থহানি না করেও এই যে আমি অপরকে সামান্য কিছুও সাহায্য করতে পারছি এই বোধ আমাকে বেশ আনন্দ দানই করল।

কিন্তু আশ্চর্য, অন্ধ ভিক্ষুকের বোধ হয় শেষ নেই। কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, ইছাপুর—এই তিনটি স্টেশন বাদ দিয়ে পলতায় দেখি আবার আর একজন উঠল। তবে এবারকার ব্যাপারটি কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং হয়তো কিঞ্চিৎ আকর্ষণীয়ও। অন্ধের হাত ধরে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী বৌ। ভাবখানা যেন স্বামীর হাত ধরে স্ত্রী বার হয়েছে ভিক্ষায়। অন্ধের দেহ অতিশয় শীর্ণ, শুষ্ক। পরনের কাপড়টিও অত্যন্ত নোংরা ও ছেঁড়া। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকটির গায়ের টকটকে লাল ব্লাউজ ও টিয়াপখি রঙের শাড়ি কোনোটাই ছেঁড়া বা অপরিষ্কার নয়। এবং চেহারাটিও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পার্থক্যটা সহজেই নজরে পড়ে।

অসিত আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে,—'দাদা, এই বৌটা নির্ঘাত ওর ভাড়া করা।'

আমি বললাম,—'আমারও মনে হচ্ছে।' কিন্তু এ'কথা বলা সত্ত্বেও আমি যখন ভিখিরীর কৌটায় যৎকিঞ্চিৎ দিলাম তখন অসিত রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ চাপাস্বরেই সে বললে,—'আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়। এ'রকম বিচার-বিবেচনা না-করে পয়সা দেওয়া সত্যিই রীতিমত অন্যায়।'—সে আমাকে এইভাবে ভিক্ষা দেওয়ার একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও শোনালো। কিন্তু তাতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত না-হয়ে শুধু বললাম,—'লোকটার চেহারা দেখেছো? ও'কি সুখে আছে মনে হয়?'

অসিত বললে,—'কেন থাকবে না? চেহারা তো ওর গাঁজা খেয়ে খেয়ে ও'রকম হয়েছে।'

এর উত্তরে আমি আর কিছু বললাম না। তবে আমার মনে হল, যদি তাই হয় সেটাই বা এমন অন্যায় কী। যাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তাবোধ নেই এবং সুস্থ আনন্দ সম্ভোগেরও যাদের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই তারা যদি শেষ পর্যন্ত অসুস্থ আনন্দ বা নেশা-ভাঙ ইত্যাদিরও শরণাপন্ন হয় তাহলে সেটা কি তাদের পক্ষে দোষের বলা চলে? আমার তো মনে হয় চলে না।

যাই হোক, আমার কাছ হতে আর কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে অসিত এবার আমাদের সামনের বেঞ্চে যে-ভদ্রলোক এতক্ষণ একমনে বই পড়ছিলেন তাঁকে ধরল। তিনি বোধহয় আমাদের কথাবার্তা শুনেই একটু মুখ তুলে ছিলেন। হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়েও ছিলেন। অসিত কিঞ্চিৎ বিরক্ত-স্বরে এবার তাঁকেই প্রশ্ন করলে,—'আচ্ছা দাদা, বলতে পারেন আমাদের দেশে অন্ধের সংখ্যা কত?'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন,—'আমাদের দেশে অন্ধের সংখ্যা মনে হয় অনেক। খুব সম্ভব চল্লিশ কোটির মত হবে।'

—'অ্যাঁ,—কী বললেন? চল্লিশ কোটি!'—অসিত প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।—'চল্লিশ হাজার বলুন।'

ভদ্রলোক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তেমনি অনুত্তেজিত স্বরে বললেন,—'না, আমার তো মনে হয় প্রায় চল্লিশ কোটিই আমাদের দেশে অন্ধ। তা না-হলে এইটুকু পথ আসতে-না-আসতেই আপনি এতজন অন্ধ ভিক্ষুক দেখতে পেতেন না।' তিনি অসিতের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

অসিত একটুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর এটি যে ব্যঙ্গোক্তি বোধহয় বুঝতে পারলো। সে আর কথা না-বাড়িয়ে বেশ অসন্তুষ্টভাবেই তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। আমিও মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

ট্রেন হু হু করে ছুটে চলেছে। অনেকদিন পর ট্রেনে উঠেছি। বেশ লাগছে দেখতে। অসংখ্য গৃহ, পথ, প্রান্তর, পুষ্করিণী মুহূর্তে পার হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। এইভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে কোথায় ছুটে চলেছে তা-ও আমাদের জানা। যাচ্ছে শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখানেই এর যাত্রা শেষ। তারপর আবার হয়তো ফিরবে।—আচ্ছা, এই যে ট্রেন, স্টেশন এবং আরো অনেক কিছু, এসবকে যদি অন্য কিছুর প্রতীক কল্পনা করি তাহলে কেমন হয়?—তাহলে হয়তো বেশ একটা হিং টিং ছট্‌ বানানো যায় কিংবা একটা সেকেলে দার্শনিক রূপক।—ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও বোধহয় নানা দিকে ছুটে যেতে থাকে।

খুব সম্ভব টিটাগড় স্টেশনের কাছেই যথারীতি সেই পরিচিত দৃশ্য আবার চোখে পড়ল। রেলপথের পার্শ্ববর্তী প্রাচীরের ওপারেই বোধহয় ওখানে বেশ্যাপল্লী। দেহোপজীবিনীরা অনেকেই পাঁচিলের ওপর উঠে বসে আছে। দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। স্ত্রীলোকেরা সাজগোজ করে পাঁচিলের ওপর বসে-বসে সিগারেট টানছে এ দৃশ্য যেমন হাস্যকর তেমনি বেদনাদায়ক। কী রকম অবস্থার চাপে কতকাল থাকলে স্ত্রীলোকও এইরকম আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তা ভাবতে গিয়ে আমি সত্যিই কূল পেলাম না। বলাবাহুল্য, এ-ও এক অতি পুরাতন সামাজিক ব্যাধি এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত এরও মূলে প্রধান কথা হচ্ছে সেই অর্থনীতি।

আমার ও অসিতের মাঝখানে ছোটো র‍্যাশন্‌ ব্যাগের মত আমার একটা থলি রেখেছিলাম। তার মধ্যে একটা বই-এর পাণ্ডুলিপি ও আরো কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র ছিল। জনৈক বিশালবপু যাত্রী হঠাৎ সেই থলিটা বাঙ্কে তুলে রাখতে আদেশ করলেন। তাঁর অভিপ্রায় তিনি স্থানটুকুতে বসবেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে আমাদের চক্ষুস্থির। বলে কী! এ যে ছুঁচের মধ্যে উট গলানোর মতই অসম্ভব ব্যাপার। এই ইঞ্চি তিনেক জায়গায় তাঁর বিশাল পশ্চাদ্দেশ তিনি কীভাবে সংস্থাপন করবেন? সবিনয়ে তাঁকে বলাও হল সে-কথা। কিন্তু তিনি সে-সব কিছুই শুনতে চাইলেন না। জোর করে ঠেলে-ঠুলে আমাদের চিড়ে-চ্যাপটা করে কোনোক্রমে বসে পড়লেন। আমাদের তখন ত্রাহি-মধুসূদন অবস্থা। আমি তো উঠে পড়তে পারলেই বাঁচি। কিন্তু উঠি কী করে? আমার একটা ঠ্যাঙ তখন পাহাড়ের তলায়।

শেষ পর্যন্ত অসিত এই বিপদ হতে রক্ষা করলে। দেখলাম, যে-কোনো রকম বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সাহস বা যোগ্যতা তার সত্যি আছে। সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সেইভাবে কাঠ মেরে বসে থেকে অতঃপর বেশ নিঃস্পৃহ কণ্ঠেই লোকটিকে বললে,—'আপনার কিন্তু দাদা এখানে না-বসাই উচিত ছিল।'

—'কেন মশাই, কেন?'—ভদ্রলোক প্রায় রুখে উঠলেন।

অসিত কিন্তু একটুও উত্তেজিত হল না। বরং বেশ মোলায়েম ভাবেই অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে,—'আপনারই ভালোর জন্যে।—আমরা দু'জনই টি বি পেশেণ্ট কিনা। আসছিও টি বি হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের একেবারে কোলের ওপর বসাটা আপনার পক্ষে—'

অসিতের কথা আর শেষ করতে হল না। লোকটির মুখ হতে একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হল। মুহূর্তে একবার অসিতের একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রায় স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে পড়লেন তিনি তারপর আশপাশের যাত্রীদের 'সরুন তো-সরুন তো' বলতে-বলতে দ্রুতপদে একেবারে কামরার অপর প্রান্তে গিয়ে হাজির। বলাবাহুল্য, অনেকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। কী ব্যাপার? কেউই ঠিকমত বুঝতে পারলেন না। কারণ, অসিত ভূতের মন্ত্র খুবই মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিল। তার ফলে অন্য কারোরই তা শ্রুতিগোচর হয়নি। যাই হোক, অনেকের

কৌতূহলের পাত্র হয়ে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ করলেও আমরা আবার ভালোভাবে ঠিক হয়ে বসলাম।

খড়দা স্টেশন এলে অসিত নেমে গেল। আমার পাশে এবার একজন মহিলা এসে বসলেন। মহিলাটির বয়স বছর ত্রিশের মত হবে। তিনি বসেই সরু সরু দুটো কাঁটা বার করে কী যেন বুনতে শুরু করে দিলেন। বোনার সময় মাঝে-মাঝেই তাঁর বাহু আমার শরীর বেশ স্পর্শ করছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁকে খুব সচেতন বলে মনে হল না। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো অপরিচিত লোক নয়, তিনি যেন তাঁর এক আত্মীয়ের পাশে এসে বসেছেন। তাঁর এই সহজ অনাড়ষ্ট ভাবটি আমার বেশ ভালো লাগল। আর যাই হোক, এ' থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে একজন সত্যিকার ভদ্রলোক মনে করেছেন।

আরও দু'তিনটে ষ্টেশন নির্ঝঞ্ঝাটে পার হলাম। কলকাতা নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে। আর বেশী দেরি নেই পৌঁছতে। আমি সামনের ভদ্রলোকের ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম।

ভেবেছিলাম বাকী পথটুকুও নির্ঝঞ্ঝাটেই যাবে। কিন্তু তা হল না। বেলঘরিয়া স্টেশন থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল শুনতে পেলাম দূরে প্ল্যাটফর্ম হতে কে যেন চেঁচিয়ে বললে,— 'ওরে পটলা নেমে পড়—নেমে পড়। শুনছি দমদমে নাকি মোবাইল বসেছে।'

পটলা কোন্ কামরায় উঠেছিল এবং সে নামল কিনা কিছুই অবশ্য টের পেলাম না। তবে আমাদের কামরায় দেখলাম ক'জন ঝপ্ ঝপ্ করে চলন্ত ট্রেন হতে লাফিয়ে পড়ল। ট্রেনের গতি অবশ্য তখন খুবই সামান্য, তবু চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন হতে লাফানো সহজও নয়, নিরাপদও নয়। শেষের জন যখন লাফ দেয় তখন অনেকেই জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে 'গেল—গেল' বলে চিৎকার করেও উঠেছিলেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি দেখা গেল।

দরজার কাছে যে-ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলে উঠলেন,—'কোথায় কে প্ল্যাটফর্ম হতে গুল ছেড়েছে আর পটলারা সব দিগ্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ মেরেছে। একজন তো আর একটু হলেই পটল তুলেছিল। যত সব ইয়ের কাণ্ড!'

কিন্তু দমদমে এসে দেখা গেল, না গুল নয়, সত্যিই বোধ হয় সেখানে মোবাইল কোর্ট বসেছে। অনেক পুলিসের আমদানি হয়েছে। একটা জায়গায় প্রায় শ'খানেক নর-নারীকে জড়ো করা হয়েছে। তার মধ্যে দামী স্যুট-পরা পুরুষ এবং সুদৃশ্য শাড়ি ও ভ্যানিটি-ব্যাগ শোভিত মহিলাও কয়েকজন আছেন। সকলেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

ট্রেন ভালোভাবে থামতে-না-থামতে আমাদের কামরাতেও জন তিনেক টি. টি. ই. লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর শুরু হল টিকেট চেক্ করা। তাঁরা যে সকলের কাছেই টিকেট দেখতে চাইছিলেন তা নয়। মনে হচ্ছিল যেন এলোপাথাড়ি চেক্ করা হচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, যার কাছেই তাঁরা টিকেট চাইছিলেন দেখলাম তারই টিকেট নেই। আমার কাছে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। একবার আমার মনে হল, আমি ছাড়া বোধহয় এ কামরায় আর কেউই টিকেট কাটেন নি কারণ, দেখা গেল যে-জন-পনেরোর কাছে টিকেট চাওয়া হল তারা সকলেই টিকেট বিহীন। প্রত্যেকেই অবশ্য টিকেট না-করতে পারার নানা রকম কৈফিয়ত দিচ্ছিলেন। কিন্তু সে-সব কিছুই শোনা হল না। সকলকেই বলা হল, আগে কামরা থেকে নামুন তারপর সব শোনা হবে। সকলকেই নামিয়ে নেওয়া হল।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। কামরা এখন অনেকটা ফাঁকা। অনেকেই অনেক কথা বলতে শুরু করলেন।

একজন মুখ বিকৃত করে বললেন,—'ছি ছি! এতগুলি লোক টিকিট কাটেনি! এর মধ্যে ভদ্রলোকও তো দেখলাম অনেক। ছি ছি!'

—'ছি ছি আবার কী?' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন প্রতিবাদ করে উঠলেন।—'কোথা থেকে কাটবে মশাই টিকিট? দেখতে পাচ্ছেন না দেশের কী অবস্থা! লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। আর যারা বেকার নয় তাদেরও অধিকাংশ যা পায় তাতে শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র জোটানোই ভার।—তাছাড়া ট্রেনে উঠতে পারা যায় না, উঠলে বসতে পাওয়া যায় না,—ঝুলে-ঝুলে প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হয়।—কেন কাটবে মশাই টিকিট? আমি কেটেছি নেহাৎ ভীতু লোক বলে।'

এর উত্তরে আবার আর একজন বললেন,—'না না, এ' কোনো যুক্তি নয়। দেশে অসংখ্য বেকার আছে, দারিদ্র্য আছে, ট্রেন-ভ্রমণেও প্রচুর অসুবিধা,—সবই মানছি। সেজন্য সুস্থ উপায়ে আন্দোলন করুন। কিন্তু তাই বলে টিকিট কাটবেন না কেন? এতে যে পরিণামে আপনার নিজেরই ক্ষতি। এই ভাবে টিকিট ফাঁকি দিতে দিতে শেষে জীবনের সবকিছুতেই ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস দেখা দেবে।'

—এর উত্তরে আগের জন যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর পাশ হতে আবার আর একজন তর্কের খেই টেনে নিলেন। বললেন,—'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। একদিক থেকে আপনি যা বলেছেন তা খুবই খাঁটি। সত্যিই এ'ভাবে টিকেট ফাঁকি দিতে থাকলে আমাদের স্বভাব নষ্ট হবে। এবং বলাবাহুল্য হচ্ছেও তাই। শুধু তাই নয়, মুখে আমরা যাই বলি না কেন, এতে হয়তো অলক্ষ্যে আমাদের অবচেতন মনে একটা অপরাধ-বোধও জন্ম নিচ্ছে। তাতে ব্যক্তিত্ব বিকৃত হচ্ছে, চরিত্রও তার স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারাচ্ছে। এবং এমনিভাবে সমাজও দূষিত ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ'সবই আমি স্বীকার করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ'সবের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে বা কারা দায়ী তা একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি?—আপনি সুস্থ উপায়ে আন্দোলনের কথা বলেছেন। যদিও এই দেশে বর্তমানে সুস্থ ও সবল আন্দোলন গড়ে তোলা বেশ কঠিন—তবু আন্দোলন কি একেবারে হচ্ছে না?—অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু কী হচ্ছে তার ফলে? দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশা বেড়েই চলেছে। দিনে দিনে প্রায় অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে। এবং মনে হচ্ছে এর যেন কোনো প্রতিকারই নেই। বস্তুত এইজন্যই আজ অসংখ্য মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা নানারকম বাঁকা পথ নিচ্ছে। এটা খুবই স্বাভাবিক।—কর্তারা কি এ'সব বোঝেন না বলতে চান? সবই বোঝেন। তাঁরা সব বুঝে-সুঝেই নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশের সর্বনাশ করে চলেছেন।'

আর একজন বললেন,—'এত সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না মশাই। তবে এটা ঠিক যে, এ জন্যে গচ্চা দিয়ে মরতে হচ্ছে এই নিরীহ গোবেচারী আমাদেরই। এইভাবে এতলোক ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই ট্রেনের ভাড়া দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছে।—কোম্পানিকে তো যে-করে হোক লাভের কড়ি রাখতে হবেই।'

—'কী যা তা বলছেন আপনি।'—আর একজন মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন।—'কোম্পানি আবার কী? কোম্পানি তো আমাদের জাতীয় সরকার। তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন না?—তাছাড়া এঁরা প্রতি ট্রেনে নিয়মিত চেক্ করেন না কেন? আমি তো খুবই কম দেখি চেক্ করতে।—এঁদের ভাবটা কী রকম জানেন?—ওই যে একশ্রেণীর লোক আছেন, বাড়ির ছেলে-পুলেদের পড়াশোনা একেবারেই দেখাশোনা করেন না, শুধু ন'মাসে ছ'মাসে কোনো অভিযোগ শুনে বা কোনো কারণে হঠাৎ একদিন তাদের নিয়ে বসেন,—তারপর কিছুই পড়াশোনা করেনি দেখে দারুণ রেগে-মেগে দুদ্দাড় পিটতে শুরু

করেন—অনেকটা সেই রকমের। এতে কি সত্যিকার কোনো কাজ হয়? এভাবে বাড়ির ছেলেপুলেদের যেমন শিক্ষা হয় না তেমনি অনগ্রসর দেশের জনসাধারণেরও নয়।'

হঠাৎ আমার মনে হল, কথাটা তো ভদ্রলোক মন্দ বলেন নি! বেশ বলেছেন—সত্যিই আমাদের মত অনগ্রসর দেশে এখন নিয়মিত চেকিং বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য তা শুধুমাত্র ট্রেনে টিকেট-চেকিং নয়,—জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বকর্মে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশের মধ্যে সমাজবোধ ভালো ভাবে না-জাগছে এবং অনুভব ও অনুশীলনের দ্বারা তা স্বভাবে পরিণত না-হচ্ছে ততদিনই বোধহয় এই চেকিং নিরন্তর, নিরলস ও নিরঙ্কুশ হওয়া একান্তই দরকার।

এইভাবে নানা কথা ভাবতে-ভাবতে এবং এই ধরণের বিভিন্ন কথা শুনতে-শুনতে ক্রমশ এগিয়ে চললাম। অবশেষে এক সময় ট্রেন এসে প্রায়ান্ধকার শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করল। থলিটা হাতে নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। আমাকে আবার এখান থেকে অনেক দূর যেতে হবে। আমার গন্তব্যস্থল এখান থেকেও অনেক দূরে।

কবিতার বই

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সভা ভেঙ্গে গেলে
স্বদেশ রঞ্জন দত্ত । ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বন্দ্বও
মলয় শঙ্কর দাশগুপ্ত । পাখি জানে
সুশান্ত বসু । বকুল তলা
শোভন সোম । শরবিদ্ধ
আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত । উজ্জয়িনী
শান্তি বসু । কাল নদী রূপ
শান্তি লাহিড়ী । প্রিয়তমা । নির্বাসিত কথা মালা
অমিতাভ দাশগুপ্ত । মুমূর্ষু শিশুর জন্য টফি
সানমুল হক । হৃদয়ের গন্ধ
মণি মুখোপাধ্যায় । স্মরণে বিস্মরণে
ও মৃদুলেন্দু মিত্রের সাম্প্রতিক কবিতা

সাহিত্য

১৮ পদ্মপুকুর রোড । কলিকাতা-২০

বিজ্ঞপ্তি

চৈত্রে যাঁদের চাঁদা শেষ হচ্ছে তাঁরা অনুগ্রহ করে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে আগামী বৎসরের দেয় চাঁদা মণি-অর্ডার কিংবা ক্রসড্ চেকে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথায় ১৩৭২ এর বৈশাখ সংখ্যা ভি, পি, যোগে পাঠানো হবে।

কার্যাধ্যক্ষ, জয়শ্রী

নিম-এর গুণ সম্বন্ধে বিখ্যাত লোকজনেরা কী বলেন দেখুনঃ

দাঁতের পক্ষে নিম

জয়পুর, জানুয়ারি ৫

রাজস্থানের রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ ঊনবিংশতিতম নিখিল ভারত দন্তবিদ্যা সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দন্তচিকিৎসা সংক্রান্ত শাখাটি এখনও যে অন্যান্য বহুতর জিনিসের মত যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করেনি এটা দুঃখের কথা। রাজ্যপাল বলেন যে, যদিও তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন, তাহলেও তাঁর মনে হয় যেসব পুরনো পদ্ধতির অনুশীলন ক'রে ভারতবর্ষের লোকে পুরুষানুক্রমে দাঁত ভাল রাখতে পেরেছে—সেইসব পদ্ধতির প্রতি আরেকটু বেশী ক'রে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শহুরে লোকেরা নিজেদের শিক্ষিত মনে ক'রে নিমের দাঁতন করার পুরনো অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। আজ যদি তাঁদের পুরনো অভ্যাস ফিরিয়ে আনা যায় তাতে ভালই হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় (কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৫) প্রকাশিত সংবাদের বঙ্গানুবাদ

'নিম টুথ পেস্ট'-এ নিমের যাবতীয় উপকারিতা তো আছেই, উপরন্তু এতে আছে আধুনিক বিজ্ঞানজাত ভেষজ। নিম যে দাঁতের পক্ষে মহোপকারী, এ বিষয়ে সমস্ত দাঁতের ডাক্তারই একমত। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রায় নিমের দাঁতন যোগাড় করা ও দৈনন্দিন ব্যবহার করা সহজ নয়। কিন্তু দাঁতের স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে 'নিম টুথ পেস্ট' নতুন ও পুরনো পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে মিলিয়েছে। এই পেস্টে একদিকে যেমন পাবেন খাঁটি নিমসার, তেমনি এতে আছে ভাল টুথ পেস্টের যাবতীয় সদ্‌গুণ। এর সুবিধে এই যে, আপনি যেখানেই থাকুন, যখনই চান ব্যবহার করার জন্য 'নিম টুথ পেস্ট' পাবেন।

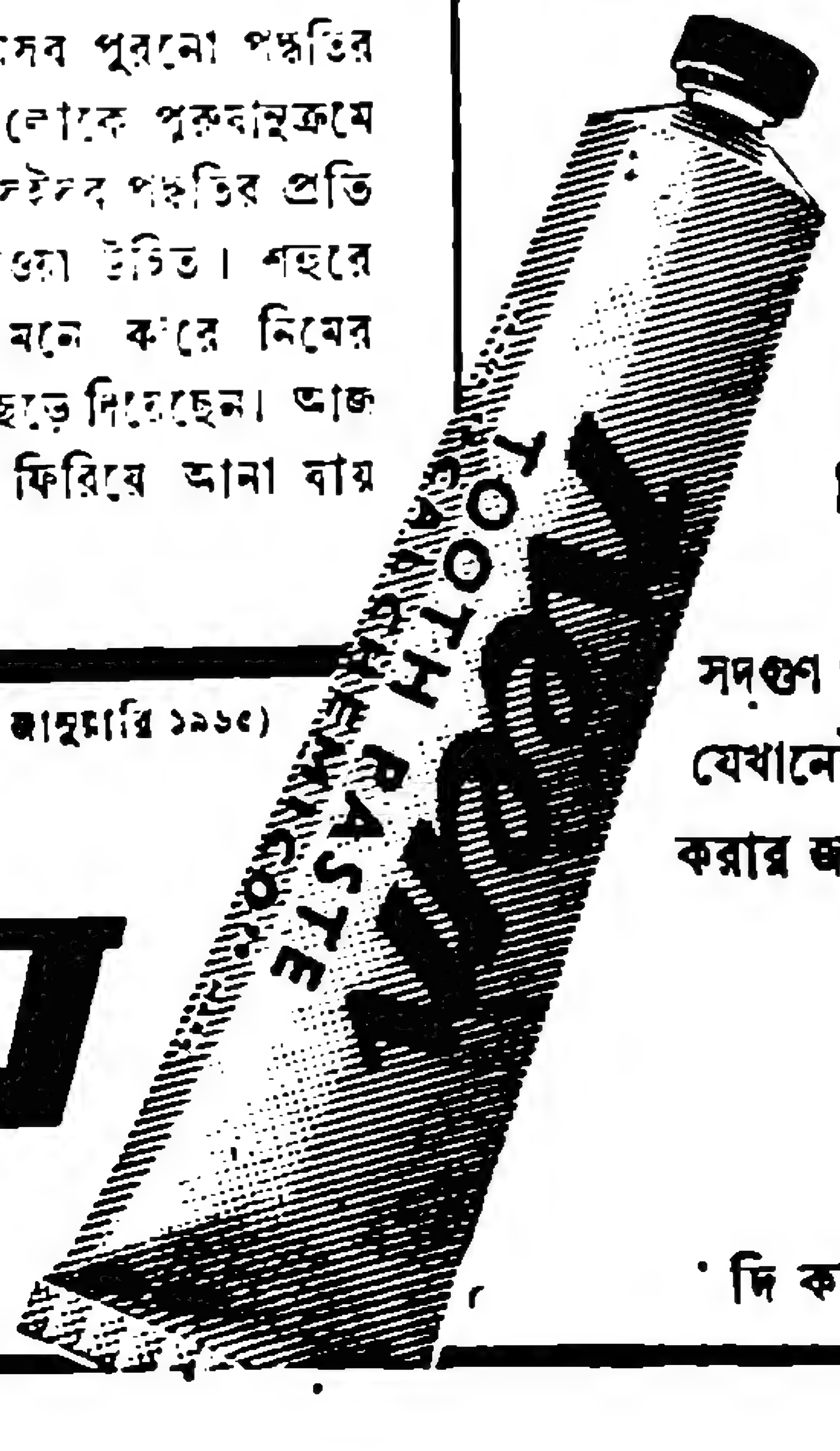

নিম টুথ পেস্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

CNC-2 BEN

(১০০২ পৃষ্ঠার পর)

অথচ সুস্থ দেহ মনের স্থিতধী পুরুষ আমি। তবু পৃথিবীর ওপর সুখের সন্ধানে ঘুরে মরি। তোমার মা-এর স্মৃতি বুকে নিয়ে দেশে দেশে, পথে প্রবাসে ঘুরে বেড়াই। তোমাকে চিরকাল আমার চোখের ওপর থেকে সরিয়ে রেখে নিজেকে হাল্কা করতে চেয়েছি। কিন্তু তাতে তুমি আমাকে মুক্তি দিলে না। তোমার চোখ মনে পড়লেই তোমার মাকে মনে পড়ে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম: তোমার মা আমার চোখের ওপর থেকে সরে গেলে মানুষের হাহাকার আমি দেখেছিলাম। চোখের ওপর আমার বন্ধুও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তার বেদনা আমি বুকের ওপর তুলে নিলাম।

অথচ এই লোকটাকে তোমার মা আমার চোখের ওপর কী অবজ্ঞাটাই না করত! সময় সময় খুব দুঃখ হত আমার। তোমার মাকে এ-সম্বন্ধে অনেক রকম ভেবেও কিছু বলতে পারিনি।

তোমার মা তত বেশী রসিকতা জুড়ে দিতেন। লোকটা শিশুর মত একদিন কেঁদেছিল, পারি না রবীন—

কী পারনা মণিময়—

আমি বাঁচতে চাইনা।

কী অত বৈরাগ্য তোমার? তখন অন্ততঃ আমারো রাগ হত খুব।

কিছু উত্তর দিতে পারত না তখন। শুধু বলত, দুঃখ আমার চোখের ওপর। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে ওর চওড়া বুকের ওপর টপটপ করে পড়ত দেখতাম। ও বলত, বড় আমি নিঃস্ব রবীন, বড্ড খালি। তুমি আমায় ঘৃণা করনা রবীন।

কিন্তু আশ্চর্য রকমের ঘৃণা করতেন তোমার মা। আজ তোমার মা নেই। তাই মনে পড়ে মণিময়-এর কথা। মণিময়ও কবে এ ফ্ল্যাট ছেড়ে পালিয়ে গেছে আমার চোখের ওপর থেকে। তবু মনে পড়ে তোমার মাকে লুকিয়ে লম্বা-চওড়া সুপুরুষ লোকটাকে আমি বুকে চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, ছিঃ কেঁদনা মণি। হাতদুটোকে মুঠোয় ভরে বলেছিলাম, "হাত পেয়েছ, তুমি পুরুষ না মণিময়?"

ও তাকাত আমার চোখে। তোমার মা ও ঘরে শব্দ তুলত বিনা কাজের। ও আমার চোখে তাকিয়ে শব্দ শুনত।

বলতাম, পুরুষমানুষ না? যন্ত্রণা পাও, দুঃখ পাও, জীবনটাকে ভেঙে-চুরে আবার নতুন করে গড়।

না। জীবন আমি চাইনা রবীন।

কেন না। কিসের এত দুঃখ তোমার।

না। খুব লম্বা করে উত্তর দিত মণিময়। একদিন প্রশ্ন করেছিল ওই লোকটা—তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব ভালবাস, না?

আমি চুপ করে থেকেছি।

বাস না?

এ আর নতুন কথা কি মণিময়। আমি ঠোঁটের উপর হাসি রেখেছিলাম।

ও বলেছে, তোমার স্ত্রী আমায় খুব ঘৃণা করেন, না?

আমার স্ত্রী অত অনুদার নয়।

খানিক চুপ করে থেকে বলত, তুমি খুব সুখী রবীন।

কেন? খুব জড়িয়ে জড়িয়ে তখন অস্পষ্ট উচ্চারণ করতাম। কেন?

ও বসে থাকত। কৃষ্ণচূড়ার মাস হলে ও ফুলে তাকাত। বর্ষার মেঘ এলে আকাশ দেখত। থমথমে আকাশের দিন, ঝড় উঠত একটু পরেই, বৃষ্টি নামত। ও বলত আচ্ছা রবীন—

বল। তাকাতাম, আমি।

ও বৃষ্টি থেকে চোখ তুলে এনে আমার চোখের ওপর রাখত। আচ্ছা, মেয়েদের তুমি বিশ্বাস কর রবীন—

না করার কী আছে।

তোমার স্ত্রীকে ?

ওর ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করতে তখন খুব কষ্ট হত আমার। শুধু ঠোঁটের উপর থেকে হাসি মুছে ফেলে ওকে বিদ্রূপ করতাম। বলতাম, পরস্ত্রী বা পরচর্চা আমি ঘৃণা করি। কথাগুলো একটু কর্কশ বলে মনে হত নিজের কানেই।

আর ঠিক তখনি তোমার মা আসতেন এ-ঘরে। হাসতেন, বলতেন, কী যে গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছ তোমরা—

না, গভীর আর কি! লজ্জায় হাসতাম। হেসে হাল্কা করতাম অবস্থাটা। কৃষ্ণচূড়ার মাস হলে আর ফুলে ফুলে তাকাত না মণিময়। আকাশের মেঘের ঘনঘটা ওর চোখের ওপর অন্ধকার তুলে দিত তখন। আকাশ, ফুল, বাইরের আলো এবং হাওয়া সব, এ সবের ওপর থেকে মনটাকে মণিময় গুটিয়ে নিত তখন। চোখ রাখত তোমার মার চোখে। তোমার মা ও ঘরে আবার ফিরে যেতেন তক্ষুণি।

ও ঘরে অকালের শব্দ উঠত আবার। গানের ভাঙা কলি ওকে বধ্য করত। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পালিয়ে যেত লোকটা।

খিলখিল করে হাসতে হাসতেই এ-ঘরে এসে ঢুকতেন তোমার মা। পাশে বসতেন। বকতাম। বলতাম, অকারণ মানুষকে দুঃখ দিতে নেই। লাভ কি তাতে। বরং পাপ প্রশ্রয় পায় তাতে। তোমার স্বামীকে অত খাটো করবে কেন?

একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়তেন তোমার মা।

হেসনা। আমি কপট বিরক্তি প্রকাশ করতাম।

তোমার মা হাসির রেশ ঠোঁটের ওপর জিইয়ে রেখে বলতেন, তুমিও আশ্চর্যত!

কেন?

কেমন করে সহ্য কর তুমি? হাসত। দেখ, শেষ পরে আমার ভাগে না ভালবাসা কিছু কম পড়ে যায়।

কেন, ওকি মানুষ নয় নাকি? আমি তোমার মা-এর আঙুল কটা ছড়িয়ে ধরলে ভীষণ লজ্জা পেত তখন। আঃ ছাড়ো।

না। ও মানুষ নয়, না?

একটা জানোয়ার। তোমার মা একটু সরে বসতে চাইত। না, কী যে না তুমি?

বলতাম, তুমি ওকে খুব ঘৃণা কর, না? ও হাসত, না, ছাড় আগে। করি, যাও। গায়ে আঁচল তুলত।

কেন করবে? আমি সোহাগ দিয়ে আঁচল খসাতাম। বলতাম, ঘৃণা আমি ভাল বাসিনা।

আর কোন প্রতিবাদ করত না। আমার গলার ওপর ওর সাদা, নরম হাত তুলে দিয়ে আমাকে যেন ছুঁত। বলত, খুব তুমি রাগ কর, না?

আমি ওর সাদা আঙুল আমার মুঠোয় বন্দী করে ওর ঠোঁটে, এবং কপালে আমার ভালবাসার স্পর্শ দিতাম। চোখ বুজিয়ে আমাকে যেন অনুভব করত তখন। আমার বুকের ভেতর নিশ্চুপ পড়ে থেকে ও আমার রক্তের গান শুনত। আমাদের ভালবাসায় আমরা সুখী ছিলাম। তারপর তুমি এই পৃথিবীতে এলে একদিন।

আজ সব মনে পড়ে অনু। তুমি আসার পর থেকে তোমার মা-কে দেখতাম আরো বেশী ঘৃণা করছে মণিময়কে। মণিময় তোমাকে আদর করলে তোমার মা যা করতেন, তাতে তোমার মা যে কতখানি স্নেহান্ধ হতে পারেন তা আজ মনে পড়ে।

মনে পড়ে তোমার মা একদিন উল বুনছিলেন তোমার জন্যে। তুমি ঘর আলো করে ঘুমোচ্ছিলে। তখনো শীত আসেনি। তবু হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া ছিল। এসে ঢুকল মণিময়। তোমার জন্যে অনেক খেলনা নিয়ে এসেছে। তুমি তখন একমাস হল এসেছ।

তোমার মা চকিতে তোমার ঘুমন্ত নরম ছোট্ট

শরীরটাকে একেবারে বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলেন ও ঘরে। মণির প্রতি তোমার মাএর এই আচরণ আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না।

মনে পড়ে লজ্জায় মণিময় আর দাঁড়াতে পারেনি। আমি ওর হাতধরে বলেছি, বস মণিময়। বেশ আর শীত পড়েছে, না?

ও বসতে চায় না।

চা খাও একটু। কোনও তোমার কাজ নেই এখন যে চলে যাচ্ছ?

ওর চোখে লজ্জা এবং ভয় দেখলাম সেই প্রথম। বলেছি, কেন এসব নিয়ে এলে এত? সবেত বয়েস একমাস অথচ অত খেলনায় ওর এক বছর চলে যাবে। যেন এই খেলনা দিয়ে তোমাকে অনেক দিন ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল মণিময়।

ও একটু ইতস্তত: করছিল। কিছু বলছিল না। তোমার মা ওঘরে তোমাকে আদর করছিলেন। চাঁদ ডেকে তোমার ছোট্ট কপালে টিপ দিচ্ছিলেন। তোমাকে জাগিয়ে আবার গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াতে চাচ্ছিলেন।

মণিময় হঠাৎ বসে পড়েছিল আমার পাশে। বলেছিল, অন্ততঃ শেষ বারের মত তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে গেলে পাপ হবে রবীন।

পাপ?

হাঁ তাই।

এ সব কী বলছ তুমি?

হাঁ তাই। মণিময় তাকিয়েছিল। তোমার চোখের ওপর আর কোনদিনও আসব না তাই। না বললে পাপ হত তাই।

তোমার কথা আমি কিছু ধরতে পারছি না মণি। এসব কী বলছ তুমি মণিময়। তোমার দুঃখ আমি বুঝি। জীবন নিয়ে ঘুরে ঘুরে শান্তি পাবে তাবো?

শীতের হাওয়ায় জানলার ওপর হলুদ রঙের—পর্দায় ঢেউ উঠছিল। তোমার মা তোমার কপালে তখনো টিপ পরাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকল মণিময়। তারপর বলল, তোমার কোনদিন আমি কোন উপকারে আসিনি রবীন।

নাইবা এলে। কোন ক্ষতিও ত করনি তুমি।

ক্ষতি? ও চমকে উঠেছিল। কী জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, তাই বোধ হয় বুঝতে পারনি তুমি।

না না, এ সব কী বলছ তুমি। অত তুমি ছোট নও মণিময়।

আজ তোমার অনেক ক্ষতি করব বলে এসেছি রবীন। যেমন শিশুকে ভয় দেখায় তেমনি করে ও আমার চোখে তাকাল।

আমাকে আর কোনদিন দর্শন দেবেনা এইত? এইত বলতে চাও তুমি? বেশ ত তাই কর। চিরজীবন সেই ক্ষতিটাই মনের ওপর এঁকে রাখব। তোমার স্মৃতি আঁকা থাকবে তাতে। বলনা, কী ক্ষতি করবে তুমি? আমি ত তোমার কোন উপকার করিনি মণি?

…অঙ্গু,…আমার কলম কাঁপছে এখন। বাকীটুকু লিখতে বেজায় কষ্ট হচ্ছে। সেদিন রাতেই তোমার মা আমার চোখের ওপর মরে গেলেন। এই আকস্মিকতায় মৃত্যু সম্ভাবনায় আমি পাগল হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু পারিনি তোমার চোখ আমার চোখের ওপর তুলে দিয়ে গেলেন বলে। মণিময়ের খেলনা দিয়ে তোমাকে ভোলালাম। তোমার হাসি, সমস্ত বেদনা ভুলিয়ে আমাকে মুক্তির আনন্দে টানতে লাগল। মণিময়-এর স্মৃতি আমার চোখের ওপর জ্বলত। তোমার কচি চোখ হাসত। তোমার মা-কে তত মনে পড়ত।

একদিন মণির দেওয়া খেলনা গুলো সব তোমার চোখের উপর ভেঙে ফেলতে লাগলাম। মণির স্মৃতি ভুলে যাব বলে। তুমি ভয়ঙ্কর কেঁদে উঠেছিলে তক্ষুণি। ভীষণ ভয় পেয়েছিলে। আর শোনো, সেদিন থেকে তোমার চোখ, হাসি, তোমার কচি ঠোঁট আমার চোখে দুর্বহ ঘৃণা জাগাত। মা-মরা মেয়েটির প্রতি কোন করুণা হয়নি বলে সেদিন থেকে এই দীর্ঘ পনেরোটা বছর আমার চোখ থেকে আড়ালে রেখেছি তোমায়।

আর কেন ভেঙেছিলাম জান? এতদিন যাকে তুমি মৃত বলে জানতে, সে আজো মণিময়ের সঙ্গে উধাও হয়ে বেঁচে আছে বলে। আর তুমি তাদেরই কন্যা বলে।"

> **বিজ্ঞপ্তি**
>
> অনিবার্য কারণ বশতঃ এবার 'ধলেশ্বরীর' কিস্তি দেয়া লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেজন্য আমরা দুঃখিত।
>
> জ: স:

পুস্তক পরিচয়

মনমর্মর। মণিময় মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯। দুই টাকা।

মণিময় মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সাথে আমরা পরিচিত। তার পরিচয় 'মনমর্মর' প্রকাশে বহু কৃতী ও বিদগ্ধজনের আগ্রহ ও সহযোগিতা। 'মনমর্মর' বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পঁয়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। অজানা রসন্ধানে কবি ছুটেছেন দেশবিদেশে, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কবিতাগুলিতে পরিস্ফুট। শব্দচয়নে কবির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তবে অনেক সময় তার অর্থ ও বক্তব্য দুর্বোধ্য। যথা 'ওষ্ঠির আস্বাদ' 'বাসোক নিষ্পিষ্ট স্পৃহা নির্বাণ প্রকোপ' 'সদ্যত: ত্রিঘাত সমীহা' 'দ্রাবিড় উচ্ছ্বাস' 'আধুত অবোধ মনে' 'ঐকণ্য এষণা ঘন' প্রভৃতি কিসের অর্থবহ ঠিক বুঝতে পারিনি।

আশীষ মজুমদার

উজ্জয়িনী। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সাহিত্য। তিন টাকা।

সুপরিচিত কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের নবতম কাব্যগ্রন্থ 'উজ্জয়িনী'। অপরূপ সুন্দর প্রচ্ছদ মূল্যবান কাগজে লাইনোয় ছাপা বইখানি 'সাহিত্য' প্রকাশনের মর্যাদা বাড়িয়েছে। নানারকমের আস্বাদের কবিতায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন কবি। আঙ্গিকে তাঁর ক্লাসিক ছাঁচ', অদ্ভুত এবং সেকারণেই সরলতা স্পষ্ট। এই সংশয়ের যুগে 'দিনের মতন সূর্য, রাত্রিতেও চাঁদ হয়ে জ্বলে'—এই ভাস্বর সত্যভাষণে মুখর কবি। স্মৃতিচারণের মধ্যেও এ যুগের স্বাভাবিক বেদনায় পীড়িত তিনি :

এখানে বালুচরে ফসল নেই
সবুজ শুকিয়ে আসে ক্রমশঃই,
মিলিত কল্পনা ছিল তো অল্প না
এখন স্মৃতি ছাড়া, অন্য জমা কই। (দূর-সান্নিধ্য)

প্রেমই বোধ হয় একালের কবির শেষ অবলম্বন। সেখানে যদিও এযুগের অতৃপ্তির স্পর্শ থাকে—'তোমাকে আমার হলো না তো জানা'—তবু প্রেমরূপ ধ্রুবনক্ষত্রই আশ্রিতজনকে পথ চেনায়:

তোমাকে আমার হলো না তো জানা।
হলো না সম্পূর্ণ পরিচয়,
কবে হবে, এই যে বিস্ময়
রাত্রি, সন্ধ্যায় সারাদিনে
কত পথ হেঁটে হেঁটে কত পথ চিনে
এই যে চাঞ্চল্য উৎসাহ
এই তো জিইয়ে রাখে, এ প্রাণের গতির প্রবাহ।
(অন্বেষা)

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

অমর জহর। পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা এণ্ড কোং। এক টাকা।
ডাকের কথা। অনুবাদ ঐ। ঐ। চার টাকা।

সুপরিচিত শিশু-সাহিত্যিক পতিতপাবন বাবুর রচিত দুখানি বই। প্রথম বইটিতে জহরলাল নেহেরুর সমস্ত জীবনী নানারকম ছন্দে পদ্যে নিপুণতাবে বিবৃত হয়েছে। বাহুল্যবর্জিত এই জীবনী, এবং এত বড় জীবনের মধ্যে থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা বেছে নিয়ে লেখক নিজের অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

লরিন জিলিয়াকাসের বিখ্যাত গ্রন্থ "From piller to post"-এর অনুবাদ দ্বিতীয় গ্রন্থটি। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ডাক বা ডাক বিভাগের যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেকথাই বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রাঞ্জল অনুবাদে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের পরিচয় পাওয়া গেল। পরিশেষে, অনুবাদক ভারতের ডাকব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ কাহিনী সন্নিবেশ করেছেন। আমরা দুটি বইয়েরই বহুল প্রচার কামনা করি।

রেবতী গুহ

যুগপরিক্রমা। দুই খণ্ড। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-১২। আট টাকা ও আট টাকা।

আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অদ্ভুত একটি হ্যালোকচারীর প্রতিকল্প স্বয়ং জানিয়েছিলেন, রহস্যচ্ছলে কথিত সেই হাউইয়ের উপমা একই সঙ্গে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিকেও অভিযুক্ত করে গেছে। ব্যবহারিক জীবনের সফলতাগুলি—অর্থ ও প্রতিপত্তি, জীবিকা ও সম্মানের সফলতা তিনি আকণ্ঠ ভূষন করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রত্যেক কণিকাই সোপার্জিত ও প্রবাজিত; অপরদিকে এ-দেশের রাজনীতি সমাজ বা সাহিত্য যে পরিমাণে তাঁর দেশে সিক্তি হয়েছে ততোধিক অনায়াসে তাঁকে বিসর্জন দিয়েছে অনচ্ছ কাচের আড়ালে। নরেশচন্দ্রের মতো সাম্প্রতিকজনের কীর্তি ও মনীষাও এখনই থরে থরে লক্ষিত হয়েছে কৌতূহলী গবেষকের উৎসাহবিধায়, আর যে প্রাণশক্তিবলে তিনি জীবনের সব কটি ভূভাগে নিজের পদচিহ্ন উৎকীর্ণ করে বেড়িয়েছিলেন সেই অনন্যস্ফুলিঙ্গ সব ঝরে গেছে বলে তার নিশানাও যেন আর মিলতে চায় না, বাঙলাদেশের ধারণক্ষমতা কিংবা স্মৃতির উপর বিশ্বাস রাখা খুবই দুরূহ।

অথচ তাঁর জীবনকাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যায় জীবদ্দশায় প্রতিটি মুহূর্তই খুব স্পষ্ট করে তিনি বেঁচেছিলেন। তাঁর মতামত ছিল দ্ব্যর্থহীন ও যুক্তিনিশিত, জীবনযাত্রার

সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের কোনো বিরোধ ছিল না। 'পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ' বলে যে জনমতের বর্ণনা করেছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন সেই প্রগতিরই পুরোহিত। সম্ভবত কারণেই বিবর্তন ধর্মকে তাঁর অতীব স্বাভাবিক লেগেছিল, আর সেই revaluation of values—যা তাঁর দাবি ছিল সমাজের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে, তাকে তিনি নিজেরও কৃত্য বলে মেনেছিলেন। সমাজচিন্তা কিংবা আত্মচিন্তা—সর্বত্রই তিনি 'দৃষ্টির ক্ষুদ্র সঙ্কুচিত পরিসরের সীমা' ভাঙতে চেয়েছিলেন।

যে সময়ে তিনি যৌবন স্পর্শ করেছিলেন এবং যৌবন অতিক্রম করেছিলেন, তখনও পর্যন্ত সত্য ধর্ম বা সমাজ-ইত্যাদি শব্দগুলি আমাদের কালের মতো এত অপ্রচল হয়ে পড়ে নি। তখনকার দিনে ঐগুলি সমস্যা হিসেবেই পরিগণিত হতো বলে আধুনিকতার আর তরুণগণ তাঁকে কী পরিমাণ ক্ষোভিত করেছিল তা আরও উজ্জ্বল লাগে। শাস্ত্রের দোহাই-এর অর্থহীনতা তাঁকে শ্রমসহ প্রতিপাদন করতে হয়েছিল, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মকেন্দ্রিকতাবিষয়ে তাঁকে সোচ্চার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। তাঁর অজস্র সময় গেছে সমাজপতিদের প্রতিপক্ষতায়, কিন্তু প্রতিটি গেল-গেল-উৎকণ্ঠিত উচ্চরোলের সম্মুখে তিনি যে আধুনিকতার সুস্পষ্ট একটি সৌধ নির্দেশ করে দিয়েছেন, সেখানে তাঁর ঐতিহাসিক কৃত্যের স্বাক্ষর রয়েছে। সমসাময়িক কথাসাহিত্যে আবির্ভূত যে নতুন এবং বিসদৃশভাবে অপরিচিত বাঙালিসমাজ অসত্য—এই তিরস্কারে অভিহিত হয়েছিল, সেই আত্মতোষকে তিনি চিনিয়ে দিতে ভোলেন নি। অথবা, বিবর্তনের প্রতি স্বাভাবিক ভীতি ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয়রহিত শাসনে নির্বাক করতে চেয়েছেন।

> যৌথ পরিবার ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া হাহাকার বা নিন্দাবাদে ফল হইবে না। এ ভাঙন আবেষ্টনের অপরিহার্য ফল। সে পরিবর্তনকে সমাজজীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইতে হইবে।

যে-উদ্যমে আবহমানকালচলিত নীতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের পুনর্বিচারে অগ্রসর হয়েছেন: 'কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় সে সম্বন্ধে সব যুগে এক নিয়ম খাটে না।'—সেই একই উৎসাহে ঘোষণা করেছেন।

> গত শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় যে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আর এক শতাব্দী পরে আমি আমার সমাজকে সমস্তভাবে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে আহ্বান করিতেছি।

এবং এই সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছে সেই নিরঞ্জন সত্যের দাবি:

> যে সত্যনিষ্ঠ সে কোনও কথা মানিয়া লইবে না; কোনও কথা সত্য বলিয়া মানিবার পূর্বে তাহার মত ও বুদ্ধির নিকট তাহা যাচাই করিয়া লইবে।

নরেশচন্দ্রের আধুনিকতা তাঁর সন্ধিবিহীন সত্যনিষ্ঠা থেকেই জাত।

বলা বাহুল্য, সত্য সর্বদাই বিশ্বাসের বিকল্প, কালগত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে যা যা তিনি পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেছিলেন তা সবই অনাগতকে অধিষ্ঠিত করবার প্রেরণায়। নতুন প্রাণাবেগকে তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্নাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। এবং ফলত, একদিকে তিনি হিন্দুর পরিপূর্ণ অধিকারে বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন অন্ত্যজদের, আর অচ্যুত একই পর্যায়ে টেনে নিতে চেয়েছিলেন অন্যান্য সব সম্প্রদায়কে—তাদের পরিপূর্ণ অধিকারে, আশ্চর্য লাগে সেখানে তাঁদের প্রশ্ন নেই, আছে ভাঙন রোধের প্রণয়:

> ১. অস্পৃশ্যতা-বিচার একটা প্রকাণ্ড ভাঙিবার মন্ত্র—ইহাকে আমাদের বর্জন করিতে হইবে। অন্যান্য

> জাতিদিগকে…হিন্দুর ধর্ম ও আচারে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।
>
> ২. আমরা যদি পণ করিয়া বসি যে সাহিত্যে যে শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া বাহিরের কোনও শব্দ বা শব্দ সমষ্টি, লৌকিক কোনও ধাতু বা নূতন কোনও প্রত্যয় গ্রহণ করিব না এবং কেহ গ্রহণ করিলে তাহাকে অপপাত্রিত করিব—এবং যদি আমরা এ পণ রক্ষা করিতে পারি তবে আমরা লাভ কি করিব জানি না, কিন্তু আমরা হারাইব অমূল্য সম্পদ—ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায় অবহেলা করিব।

এই ভাঙনরোধের কিংবা নতুন গড়ার কারণেই সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশ চিন্তারও পরে সাহিত্যের কাছে সমর্পিত না গিয়ে তাঁর উপায় ছিল না, তাঁর মনে হয়েছিল নতুন মূল্যমানগুলিকে সাহিত্যকারই পারেন লিপিবদ্ধ করতে এবং সবাইকে তা বোঝাবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁর মনে হয়েছিল একমাত্র সাহিত্যকারই সত্যনিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য সত্যজীবন চিত্রিত করা। এই সত্য তিনি বিনিঃশেষে জেনেছিলেন। হয়তো সার্বভৌম বিচারে সাহিত্য নরেশচন্দ্রের অনন্তবর্ত্ম নয়, অন্তিম সরণীও নয়; কিন্তু সাহিত্য তাঁর অন্যতম অনিবার্য মাধ্যম—হয়তো অপরাপরগুলির তুলনায় প্রিয়তর ও প্রখরতর। সাহিত্যকার হিসাবে নরেশচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কতদূর হয়েছিল এই মুহূর্তে তা বোঝার বাধা আছে, কিন্তু সাহিত্যে সত্যব্রত হয়ে তিনি যে পরিমাণ কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন তার জনশ্রুতি আজও আমাদের কানে আসে। রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ অনাচারে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার উচ্চারণ করেছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। বোঝা যায় এই মাধ্যম তাঁর অনেকখানিই ধরে রেখেছিল।

ভাবতে ভালো লাগে, রক্ষণশীল হবার মতো সম্পন্নতা ও গৃহস্থালি থাকা সত্ত্বেও নরেশচন্দ্র চলিষ্ণু যাযাবর তারুণ্যের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, রচনা ব্যাপারে অশিক্ষিত পটুত্বের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, কিন্তু বৈদগ্ধ্যের সকরুণ রাজহর্ম্যের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তিনি পথের আবর্তকে ধিক্কার দেননি, সেই আবর্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোনো গোষ্ঠীতে তাঁর বন্ধন ছিল না বলে রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র-বিরোধীগণ একযোগে তাঁকে ভুলেছেন, আর যে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' সূত্রপাত স্বয়ং করেছেন তাও বানাবদল করে অন্যত্র গেছে বলে তাঁর কণ্ঠস্বর সেখানেও শোনা যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতের রসিকসমাজ অন্তত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তিটির পাশে একমুহূর্ত দাঁড়াবেন।

> তাঁহার [নরেশচন্দ্রের] সহিত পরিচয় আমার নাই; কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন।
>
> —সাহিত্যের রীতি ও নীতি

ভবিষ্যতের ইতিহাসকার অন্তত বাঙলাসাহিত্যের সেই সন্ধিমুহূর্তে নরেশচন্দ্রের ভূমিকার জন্য অনেকখানি পরিসর অনিবার্যভাবে ছেড়ে দেবেন সন্দেহ নেই।

'যুগপরিক্রমা' এই দু-খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। অব্যবহিত লুপ্ত সূত্রটি এর মধ্যে অনেকখানি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন, সাহিত্য, এবং স্মরণী-পর্যায়ে নিবেদিত এই নিবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর বহুচারী মনটির সঙ্গে তাঁর বিচার-ভীরুতা ও পরিহাসনিপুণতা নামক আপাতবিরোধী ও ঈর্ষণীয় চারিত্রসূত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। সবগুলিই বক্তৃতাসূত্রে অথবা সাময়িক পত্রের তাড়নায় লিখিত, অপিচ এরই মধ্যে 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক ঐতিহাসিক প্রতিবাদটি এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পর্কিত অনবদ্য স্মৃতিকথাটির স্বাদ অবিস্মরণীয়। কিছু পীড়নীয় মুদ্রণপ্রমাদ সত্ত্বেও

অধিকাংশ নিবন্ধেরই শেষে যে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয়েছে সমগ্র যুগটি অনুধাবনে পাঠকের পক্ষে তা বিশেষ সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয়। এবং 'যুগপরিক্রমার' পাঠককুল নরেশচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর প্রতি যদি পুনর্বার আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনীষী রবীন্দ্রনাথ। শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

এই গ্রন্থের সাতটি সুলিখিত নিবন্ধে লেখক পূর্ণায়ত রবীন্দ্রপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিবন্ধগুলি সম্ভবত প্রাথমিক রবীন্দ্রপাঠকের মুখ চেয়ে লেখা, তদুপরি তাঁর সঙ্কলন নৈপুণ্য রবীন্দ্র-শিক্ষার্থীদেরও বিশেষ উপযোগী। বস্তুত উদ্ধৃতিপ্রাচুর্য তাঁর রচনাকে বিতর্কাতীত করতে গিয়ে প্রায়শই যথেষ্ট এবং নির্ভরযোগ্যও করে তুলেছে, এবং তথ্যাহরণেরও পিছনে লেখকেরও নিতান্ত সরল অভিপ্রায়ই সমর্থিত হয়। অর্পিত রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ ও তার সফলতার যে কারণগুলি লেখক প্রতিপাদন করেছেন (পৃ: ৭ এবং পৃ: ৬১) তার উপরে নির্ভর করা সাধারণ পাঠকের পক্ষেও কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর হওয়া সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রমনীষার যে ঠাসবুনোট ধারাবাহিকতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানে তাঁর পরিশীলন সহজেই টের পাওয়া যায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

30 APR 1965

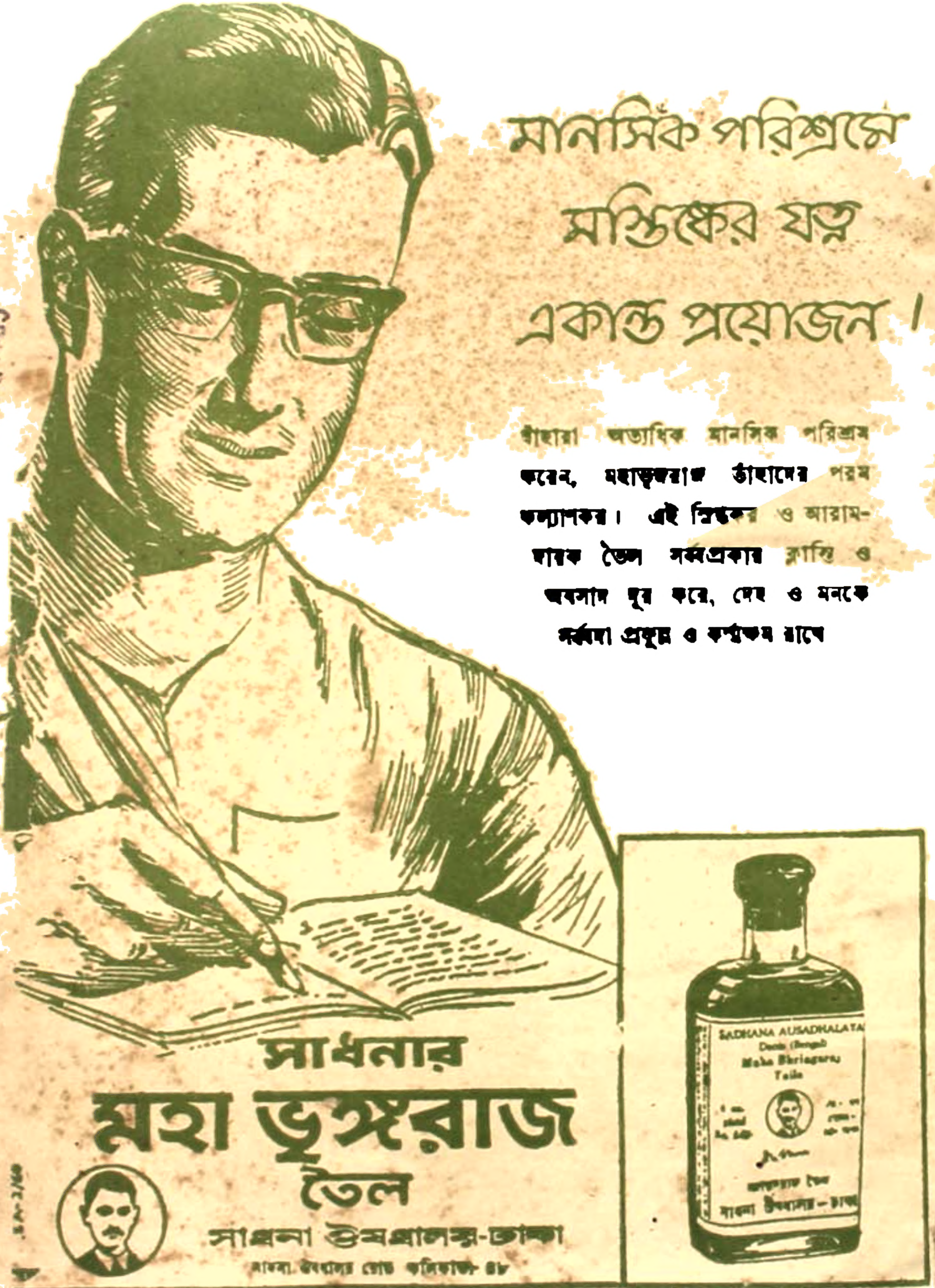

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

Central Registration No. 2870 57 Per Copy 75P With Postage 78P.
HEAD OFFICE JAYASREE — Gangulibagan, Naktala, Calcutta-47